লা মিজারেবল

ভিক্টর হুগো

লে মিজারেবল

ভিক্টর হুগো

অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা—৯

ভূমিকা

প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে লিখিত ভিক্টর হুগোর 'লে মিজারেবল' (১৮৪৫-৬২) উপন্যাসখানি আয়তনের বিশালতায়, চরিত্রচিত্রনের বৈচিত্র্যে ও গভীরতায়, কাহিনীগত রূপকল্পনার সুউচ্চ উত্তুঙ্গতায়, ঘটনা সমাবেশের সুবিপুল সমারোহে ও কেন্দ্রগত যোগসূত্রের অবিচ্ছিন্ন গ্রন্থনৈপুণ্যে শুধু পাশ্চাত্ত্য জগতের কথাসাহিত্যে নয়, সারা বিশ্বের কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি হিসাবে কালোত্তীর্ণ মহিমায় মূর্ত ও অধিষ্ঠিত হয়ে আছে আজও। একমাত্র লিও টলস্টয়ের সুবৃহৎ ও প্রায় সমআয়তনবিশিষ্ট উপন্যাস 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' হুগোর 'লে মিজারেবল'-এর সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে এক তুলনীয় মর্যাদার দাবি করতে পারলেও উপন্যাস আর্টের গৌরব, গভীরতা ও শিল্প সৌকর্যের দিক থেকে 'লে মিজারেবল' যে আরও উন্নত ধরনের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ফরাসী ভাষায় 'লে মিজারেবল' কথাটির শব্দগত অর্থ দীন-দুঃখীরা হলেও লেখক ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সাম্রাজ্যতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের অধীনে সমাজের নিচেরতলার সেই সব মানুষদের এক সকরুণ জীবনকাহিনীর চিত্র এঁকেছেন, দুঃখ দৈন্যের অভিশাপে বিকৃত যাদের জীবনচেতনা দারিদ্র্যসীমার শেষ প্রান্ত পার হয়ে ন্যায়নীতির সব জ্ঞান হারিয়ে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার অপরাধ প্রবৃত্তির অতল অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে যায়। জনদ্রেত্তে নামধারী থেনার্দিয়ের ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাদের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, দারিদ্র্যের অভিশাপজনিত মানুষের দেহগত ও মনোগত বিকৃতি তাদের প্রকৃতিকে এমন এক পাশবিক হিংস্রতা দান করে যা তাদের সমস্ত প্রাণমন ও কর্মপ্রবৃত্তিকে শুধু অস্তিত্বরক্ষার এক সর্বাত্মক ও প্রাণবস্তুকর প্রয়াসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে।

কোনও কোনও সমালোচকের মতে 'লে মিজারেবল' উপন্যাসে মূল কাহিনী বা আখ্যানবস্তু ও অজস্র উপকাহিনী আর চরিত্রগুলির মধ্যে কেন্দ্রগত ঐক্য রক্ষিত

হযনি। দিগনেব যে বৃদ্ধ বিশপ মিবিযেল বা বিযেনভেনুব জীবন কাহিনী নিযে এ গ্রন্থেব শুরু, সেই বিশপেব জীবন যত পুণ্যময়ই হোক না কেন, মূল কাহিনীব সঙ্গে তাব কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে বাখা দবকাব যে খৃস্টীয জীবনচৈতন্য ও নীতিবোধেব চূড়ান্ত আদর্শটিকে বিশপ মিবিযেলেব মধ্যে রূপাযিত কবে তুলতে চেযেছেন লেখক, বিশপেব মৃত্যু হলেও সে আদর্শেব মৃত্যু হযনি। তাব অবিনশ্বব অমিতপ্রভব আত্মাব আলো তাব প্রদত্ত দুটি রুপোব বাতিদানেব মধ্যে এক শুচিশুভ্র অধ্যাত্মচেতনায মূর্ত হযে উঠে নাযক ভলজাঁব আত্মিক সংকটেব মাঝে সাবাজীবন তাকে পথ দেখিযে এসেছে। বিশপেব আত্মিক উপস্থিতিব প্রতীকস্বরূপ এই বাতিদান দুটিকে সযত্নে নিজেব কাছে বেখে সাবাজীবন বযে নিযে গেছে সে, একটি দিনেব জন্যও তাব প্রভাবকে সে অস্বীকাব কবতে বা এড়িযে যেতে পাবেনি। এই দুটি বাতিদানেব মধ্যে জ্বলতে থাকা মোমবাতিব আলো তাব মৃত্যুকালে তাব মুখেব উপব পড়ে এবং সে আলোব জ্যোতি মৃত্যুব অন্ধকাব মহাসমুদ্রেব উপব দিযে তাব আত্মাকে পাব কবে নিযে যায স্বর্গলোকেব পথে। ওযাটাবলু যুদ্ধেব যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিববণ এ উপন্যাসে সংযোজিত হযেছে তা পাঠকদেব কাছে ক্লান্তিকব ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও ইউবোপ ও বিশ্বেব ইতিহাসে এ যুদ্ধেব গুরুত্ব এবং নেপোলিযনেব চবিত্র ও তাব শেষ পবিণতিব যে ব্যাখ্যা দান কবেছেন লেখক তা সত্যিই বিস্ময়কব। তাছাড়া এ উপন্যাসেব অন্যতম প্রধান চবিত্র মেবিযাসেব পিতা কর্নেল পঁতমার্সি যে যুদ্ধে সক্রিয অংশগ্রহণ কবে এবং তাকে মৃত্যুব কবল থেকে উদ্ধাব কবে অন্যতম চবিত্র থেনার্দিযেব মেবিযাসেব মনে যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব আনে, কাহিনীব মধ্যে তাব একটি সুদূবপ্রসাবী তাৎপর্য আছে।

উপন্যাসেব নাযক জাঁ ভলজাঁব মতো এমন বিবর্তনধর্মী চবিত্র সাবা বিশ্বসাহিত্যেব মধ্যে বিবল। সে তাব জীবনেব চাবটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এমন চাবটি চবিত্রেব সংস্পর্শে আসে যাবা তাব আত্মিক সংকটকে ঘনীভূত কবে তুলে তাব জীবনেব মোড় ফিবিযে দেয। এই চাবটি চবিত্র হলো বৃদ্ধ বিশপ মিবিযেল, ইনসপেক্টব জেভার্ত, ফাতিনেব মেযে কসেত্তে আব তাব প্রেমিক যুবক মেবিযাস।

যে সমাজ ও বাষ্ট্রযন্ত্রে চোব ও অপবাধীদেব জন্য নির্মম শাস্তিব বিধান আছে, অথচ গবীবদেব কাজিবোজগাব ও অন্নসংস্থানেব ব্যবস্থা নেই, উনিশ বছবেব কাবাবাসেব শেষে জেল থেকে বেবিযে আসাব পব সেই নিষ্ঠুব সমাজ ও বাষ্ট্রশাসনেব বিরুদ্ধে এক চবম ঘৃণা আব বিদ্রোহাত্মক প্রতিক্রিযায ফেটে পড়ে যখন ভলজাঁব সমগ্র অন্তবাত্মা, তখন বিশপ মিবিযেলেব অহেতুক এবং অপবিসীম দযা সমস্ত বিদ্বেষেব বিষ এবং ঘৃণাব গবল নিঃশেষে অপসাবিত কবে তাব মন থেকে, হতাশা আব মৃত্যুব অন্ধকাবেব মাঝে এক সৃষ্টিশীল আশাবাদে তাকে সঞ্জীবিত কবে এক মহাজীবনেব পথ দেখিযে দেয তাকে। এবপব সমাজেব আইন শৃঙ্খলাব প্রতিভূ কর্তব্যপবাযণ ও নীতিবাদী ইনসপেক্টাব জেভার্ত আসে তাব জীবনে। মন্ত্রিউল-সুব-মেব অঞ্চলে কাচেব কাবখানাব মালিক হিসাবে প্রভূত ধনসম্পদ ও যশমান অর্জন কবে এবং সেখানকাব মেযব

হয়ে ভলজাঁ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন একদিন জেভার্ত এসে তাকে বলে শ্যাম্পম্যাথিউ নামে একটি লোকের কথা যাকে জাঁ ভলজা ভেবে সেই সব অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে যে সব অপরাধে ভলজাঁ নিজে অপরাধী। ফলে আবার এক আত্মিক সংকটের সম্মুখীন হয় ভলজাঁ। সে ভাবতে থাকে, ক্রমবর্ধমান সম্পদ ও সম্মানে পরিপূর্ণ আপাতস্বর্গসুখসমৃদ্ধ তার বর্তমান জীবনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিলে তিলে মৃত্যু তথা নরকযন্ত্রণা ভোগ করে যাবে, না শ্যাম্পম্যাথিউকে মুক্ত করে তার জায়গায় ধরা দিয়ে জেলে গিয়ে নরক ভোগ করতে করতে এক চরম আত্মতৃপ্তির অতিসূক্ষ্ম এক স্বর্গসুখের সুবাসিত সুষমায় বিভোর হয়ে থাকবে মনে মনে। অবশেষে আবার স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করে সে। তারপর কয়েদী হিসাবে একটি জাহাজে কাজ করার সময় একটি বিপন্ন লোককে বাঁচাবার পর জাহাজ থেকে পড়ে গিয়ে সাঁতার কেটে পালিয়ে যায় ভলজা। ঘটনাসূত্রে উপস্থিত লোকেরা ভাবে সে সমুদ্রে ডুবে মরা গেছে। এরপর সে মতঁফারমেলে গিয়ে ফাঁতিনের অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য তার মেয়ে কসেত্তেকে থেনার্দিয়েরের হোটেল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এই কসেত্তের আবির্ভাবই ভলজার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তার আশ্রয়হীন আত্মীয়স্বজনহীন ঊষর মরুজীবনে শিশু কসেত্তেই নিয়ে আসে সবুজ সজল এক আশ্বাস, যে আশ্বাস থেকে ভলজার শুষ্কসত্তায় মনুষ্যত্বগুলো তাদের প্রাণরস আহরণ করে আশান্বিত ও ঊর্ধ্বায়িত হয়ে উঠতে থাকে এক নতুন আশায়। জীবনের এক নতুন অর্থ ও মূল্যবোধ খুঁজে পায় সে কসেত্তের মধ্যে। একাধারে পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর সমন্বিত স্নেহভালবাসার সুতো দিয়ে এমন এক জটিল ও দুশ্ছেদ্য সম্পর্কজাল রচনা করে কসেত্তেকে ঢেকে রাখে, যে জাল ছিন্ন করে পৃথিবীর কোনও শক্তি কোনওদিন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না তার কাছ থেকে। তাই সে যখন জানতে পারল মেরিয়াস নামে এক যুবককে ভালবাসে কসেত্তে তখন এক নীরব নিরাতিশয় মর্মবেদনার আঘাতে তার অন্তরাত্মার ভিতটা কেঁপে উঠল। তবে আবার সে যখন দেখল বিপ্লবী যুবক মেরিয়াস ব্যারিকেডে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং তার মৃত্যু অবধারিত তখন সে কসেত্তের কথা ভেবেই নিজে ব্যারিকেডে গিয়ে আহত অচেতন মেরিয়াসকে ব্যারিকেড থেকে উদ্ধার করে তার মাতামহ মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। সহসা কসেত্তের প্রতি ভলজার সর্বগ্রাসী সর্বাত্মক স্বার্থান্ধ ভালবাসা আত্মত্যাগের এক অম্লান মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে কসেত্তেকে স্বেচ্ছায় তুলে দেয় মেরিয়াসের হাতে। তার সঙ্গে যৌতুক হিসাবে দেয় তার সারাজীবনের সব সঞ্চিত অর্থ। সেই সঙ্গে তাদের সুখের সংসারে থেকে বাকি জীবনটা অনাবিল শান্তিতে কাটিয়ে দেবার জন্য কসেত্তে ও মেরিয়াসের কাছ থেকে এক সাদর আহ্বান আসে ভলজার কাছে। এই আহ্বানই আবার এক চরম আত্মসংকট নিয়ে আসে ভলজার জীবনে এবং তার শেষ পরিণতিকে ত্বরান্বিত করে তোলে। একদিকে ন্যায় আর সত্যাভিত্তিক আত্মত্যাগ, অন্যদিকে মিথ্যা আর প্রতারণাভিত্তিক জীবনের ভোগ উপভোগ। ভলজার জীবনে এই হলো শেষ আত্ম

সংকট এবং এ সংকটে ন্যায় ও সত্যের খাতিরে চরম আত্মত্যাগ, আত্মনিগ্রহ ও স্বেচ্ছামৃত্যুর পথে ধীরে ধীরে নিজেকে ঠেলে দেয় ভলজাঁ। এইভাবে একে একে তার জৈব জীবনের সব কামনা-বাসনাকে জয় করে চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে পরম আত্মোপলব্ধির সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গিয়ে মৃত্যুহীন এক মহাজীবনের দিগন্তবিসারী আলোকমালাকে ভাসিত দেখতে পায় সে তার চোখের সামনে।

ভলজাঁ ও বিশপ মেরিয়েল ছাড়া যে কয়টি চরিত্র রেখাপাত করে আমাদের মনে সেগুলি হলো নিঃসীম অভাব আর অর্থলোলুপতার দ্বারা নিয়ত তাড়িত থেনার্দিয়ের, কর্মফলাকাঙ্ক্ষাহীন উদাসীন মেবুফ, উগ্র আভিজাত্যবোধ ও রাজনৈতিক মতবাদ আর স্নেহমমতাকেন্দ্রিক হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ, মেরিয়াসের প্রতি অতৃপ্ত আত্মঘাতী প্রেমের আগুনে জ্বলতে থাকা পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়া এপোনিনে আর তুলনাহীন বালকচরিত্র গাভ্রোশে। তার আত্মা যেন জীবন ও মৃত্যুর থেকে অনেক বড়। সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের মাঝে নাচগানের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে পরিহাস করতে করতে যেভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নেয় সে, একই সঙ্গে মৃত্যুকে জয় করে আবার পরাজিত হয়ে এবং পরিশেষে সমস্ত জয় পরাজয়ের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে সেই আত্মার বিজয়গৌরব যেভাবে ঘোষণা করে তা দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারি না।

'লে মিজারেবল যেন উপন্যাস নয়, অর্ধশতাব্দীকালীন এক জাতীয় জীবনের জয়পরাজয়, উত্থানপতন, সুখদুঃখ ও আশাআকাঙ্ক্ষাসম্বলিত এক মহাকাব্য। মহত্তর কোনও সৃষ্টির গৌরব এই অনন্যসাধারণ উপন্যাসের কালোত্তীর্ণ মহিমাকে খর্ব করতে পারেনি আজও।

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

১৮১৫ সালে মঁসিয়ে শার্লস ফ্রাঁসোয়া বিয়েনভেনু মিরিয়েল যখন দিগনের বিশপ হন তখন তাঁর বয়স প্রায় পঁচাত্তর। ১৮০৬ সাল থেকে এই বিশপের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি।

যে কাহিনী আমি বলতে যাচ্ছি তার সঙ্গে এই ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর বিশপ পদ লাভের সময় তাঁকে কেন্দ্র করে যে সব গুজব রটে তার কিছু বিবরণ আমাকে অবশ্যই দিতে হবে। কোনও মানুষ সম্বন্ধে লোকমুখে যে সব গুজব শোনা যায়, তার কীর্তিকলাপের মতো এই সব গুজব বা জনশ্রুতিরও একটা বড় রকমের প্রভাব দেখা যায় তার জীবন ও ভাগ্যে। মঁসিয়ে মিরিয়েল ছিলেন আইকস পার্লামেন্টের কাউন্সেলার ও নোবলেসী দ্য রোব-এর সদস্যের পুত্র। শোনা যায় তার বাবা তার মৃত্যুর পর তাঁর পদে যাতে অধিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য ছেলের অল্প বয়সে অর্থাৎ আঠারো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা করেন তাঁর। পার্লামেন্টের সদস্যদের পরিবারে এই ধরনের প্রথাই প্রচলিত ছিল সেকালে। কথিত আছে এই বিয়ে সত্ত্বেও শার্লস মিরিয়েলকে কেন্দ্র করে অনেক গুজবের সৃষ্টি হয়। তার চেহারাটা বেঁটেখাটো হলেও তিনি বেশ সুদর্শন ছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি বিয়ে করে সংসারী হন এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন।

তারপর ফরাসী বিপ্লব শুরু হতেই পার্লামেন্টের সদস্যদের পরিবারগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং মিরিয়েল দেশ ছেড়ে ইতালিতে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে নতুনভাবে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর স্ত্রী এই সময় বুকের গোলমালে ভুগে মারা যায়। তাঁদের কোনও সন্তানাদি ছিল না। যাই হোক, এই বিপ্লবের পর কি ঘটল মিরিয়েলের জীবনে?

তবে কি তার আপন পরিবার ও পুরনো ফরাসী সমাজব্যবস্থার ব্যাপক ভাঙন, বিদেশ থেকে দেখা দেশের মধ্যে ঘটে যাওয়া ১৭৯৩ সালের মর্মান্তিক ঘটনাবলী এক বৈরাগ্যবাসনা আর নিঃসঙ্গতার প্রতি প্রবণতা জাগিয়ে তোলে? যে সব বিক্ষুব্ধ ঘটনাবলীর উত্তাল তরঙ্গমালা তাঁর জীবনের বহিরঙ্গের উপর আঘাত হেনে চলেছিল ক্রমাগত সেই আঘাত হয়ত তাঁর মধ্যে সঞ্চার করেছিল এক রহস্যময় জীবনবিমুখতা যা তাঁর স্বভাবটাকে একেবারে পাল্টে দিয়ে পাহাড়ের মতো এমন এক উত্তুঙ্গ প্রশান্তি দান করে যার ফলে জীবনের সকল ঝড়ঝঞ্ঝা ও দুঃখবিপর্যয়ের মাঝে অটল ও অবিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন! কিন্তু এমন কথা কেউ ঠিকমতো বলতে পারে না। তাঁর সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই জানা যায় যে ইতালি থেকে দেশে ফিরে এসেই তিনি যাজকের পদ গ্রহণ করেন।

১৮০৪ সালে মিরিয়েল ব্রিগনোলের পল্লীগীর্জার যাজক হন এবং সেখানে এক নির্জন পরিবেশের মধ্যে বসবাস করতে থাকেন।

সম্রাট নেপোলিয়নের রাজ্যাভিষেকের সময় মিরিয়েলকে তাঁর গীর্জার কিছু কাজের ব্যাপারে একবার প্যারিসে যেতে হয়। এই সময় যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, সম্রাটের কাকা কার্ডিনাল ফ্রেস্ক তাঁদের অন্যতম। একদিন তিনি যখন কার্ডিনালের ঘরের বাইরে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁর কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন তাঁর ঘরে। ঘরে যাবার পথে নেপোলিযন মিরিয়েলকে তাঁর পানে সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করেন, কে আপনি আমার দিকে এভাবে তাকিযে আছেন ?

মিরিয়েল উত্তর করেন, মহাশয়, আমার মতো একজন অতিসাধারণ ব্যক্তি আপনার মতো এক মহান ব্যক্তির পানে তাকিয়ে আছে। এতে হয়ত আমরা উভযেই উপকৃত হতে পারি।

সেদিন সন্ধ্যাতেই সম্রাট নেপোলিয়ন কার্ডিনালকে মিরিয়েলের কথা জিজ্ঞাসা করেন। তার কিছু পরেই একথা জানতে পেরে আশ্চর্য হযে যান মিরিয়েল যে তিনি দিগনের বিশপ পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

মঁসিয়ে মিরিয়েলেব বাল্যজীবন সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না বা জোর করে কোনও কিছু বলতে পারত না। ফরাসী বিপ্লবের আগে তাঁর পরিবার সম্বন্ধে যারা সব কিছু জানত তাদের কেউ ছিল না তখন। একটা সামান্য গাঁ থেকে একটা ছোট শহরে আসার পর তাঁকে নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। অনেকে অনেক কথা বলতে থাকে। কিন্তু পদমর্যাদার খাতিরে সব কিছু সহ্য করে যেতে হয তাঁকে। তবে তাঁর সম্বন্ধে এই সব চর্চা নিতান্ত অর্থহীন গুজব আর মনগড়া কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাই হোক, দিগনের বিশপ হিসাবে আসার পর থেকে বছর কয়েকের মধ্যে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়া সব গুজব আর যত সব গল্পকাহিনী স্তব্ধ হযে যায়। সে সব কথা ভুলে যায় সকলে। কেউ কোথাও সে সব কথার আর উল্লেখ করত না।

মঁসিয়ে মিরিযেল যখন দিগনেতে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর অবিবাহিত বোন ম্যাদময়জেল বাপতিস্তিনে আর মাদাম ম্যাগ্‌লোরি। ম্যাদময়জেল বাপতিস্তিনে ছিল বিশপ মিরিয়েলের থেকে দশ বছরের ছোট আর ম্যাগ্‌লোরি ছিল বাপতিস্তিনের সহচরী দাসী আর সমবয়সী। ঘরসংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম সব ম্যাগলোরিই করত।

বিগতযৌবনা ম্যাদময়জেল বাপতিস্তিনের চেহারাটা ছিল বরাবরই লম্বা আর রোগা। যৌবনের কোনও সৌন্দর্য ছিল না তার দেহে। কিন্তু চেহারাটা রোগা হলেও তার চোখে-মুখে এমন এক শান্তশ্রী ছিল যাতে তাকে এক নজরেই একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা বলে মনে হত। সততা আর মহানুভবতার যে একটি নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, বাপতিস্তিনে সারাজীবন জনহিতকর কাজ করে আসার জন্য সেই সৌন্দর্যের একটি স্নিগ্ধ জ্যোতি সব সময় আচ্ছন্ন করে থাকত তার মুখমণ্ডলকে। যৌবনে তার যে দেহটি ছিল শীর্ণ

ও অস্থিচর্মসাব, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে এক স্বচ্ছ উজ্জ্বলতাব আধাব হযে ওঠে সেই শীর্ণ দেহটি। তাব চেহাবা দেখে যৌবনেই মনে হত সে যেন কোনও কুমাবী নাবী, এক বিদেহী আত্মা, এক অবযবহীন ছাযা যে ছাযা থেকে সব সময় বিচ্ছুবিত হতে থাকে এক আশ্চর্য জ্যোতি। তাব বড বড আযত দুটি চোখেব দৃষ্টি সব সময অবনত থাকত মাটিব উপব। মনে হত তাব আত্মা মাটিব পৃথিবীতেই বিচবণ কবে বেডায সদাসর্বদা।

বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হযে দিগনেতে আসাব সঙ্গে সঙ্গে সবকাবী বিধান অনুসাবে প্রচুব সম্মান পেতে থাকেন মিবযেল। পদমর্যাদাব দিক থেকে তিনি ছিলেন ফ্রান্সেব সেনানাযকেব নিচেই। তিনি দিগনেতে আসাব পব যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি তাব সঙ্গে দেখা কবেন, তাবা হলেন মেযব আব কাউন্সিলাব প্রেসিডেন্ট। আব তিনি যাদেব সঙ্গে দেখা কবেন তাবা হলেন প্রধান সেনাপতি আব পুলিশ বিভাগেব প্রধান।

তিনি বিশপ পদ গ্রহণ কবাব পব থেকে তাব কাজকর্ম দেখাব জন্য উৎসুক হযে প্রতীক্ষা কবতে লাগল শহবেব লোকেবা।

২

দিগনেতে বিশপেব প্রাসাদোপম বাডিটা ছিল হাসপাতালেব পাশেই। সুন্দব পাথব দিযে গডা এই প্রাসাদটি প্যাবিস বিশ্ববিদ্যালযেব ধর্মতত্ত্বেব ডক্টব পুগেৎ আব দিগনেব তদানীন্তন বিশপ সিমোবেব অ্যাবটেব দ্বাবা নির্মিত হয ১৭১২ সালে। আবাম ও স্বাচ্ছন্দ্যেব সব বকম ব্যবস্থাই ছিল প্রাসাদেব মধ্যে। সেখানে ছিল বিশপেব নিজস্ব কামবা, বসাব ঘব, শোবাব ঘব আব সামনেব দিকে ছিল বিস্তৃত এক উঠোন। উঠোনেব চাবদিকে ছিল ফল ও ফুলেব সুন্দব সুন্দব গাছে ভবা এক বাগান। বাগানেব কাছে একতলায খাবাব ঘবটি ছিল যেমন বড আব তেমনি সুন্দবভাবে সাজানো। ১৭১৪ সালে মাসিযে পুগেৎ এই খাবাব ঘবেই কযেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এক ভোজসভায আপ্যাযিত কবেন। সেই সব ব্যক্তিদেব মধ্যে ছিলেন ফিলিপ দ্য ভেন্দোম, গ্রাদ প্রিযব অব ফ্রান্স, চতুর্থ হেনবিব প্রপৌত্র আব স্যাব্রেব দেস্ত্রী। সাতজন সজ্জনশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিব পূর্ণাবযব চিত্র এই ঘবেব দেওযালে টাঙানো ছিল এবং চিত্রগুলিব তলায মর্মবপ্রস্তবেব উপব সোনাব অক্ষবে লেখা ছিল ঐ ব্যক্তিদেব পবিচয়লিপি।

হাসপাতালেব বাডিটা ছিল দোতলা এবং তাব সামনেও একটি বাগান ছিল। তবে বাডিটা খুব একটা বডসডো ছিল না।

দিগনেতে আসাব পব তৃতীয় দিনে হাসপাতালটা দেখতে যান বিশপ মিবিযেল। দেখাব পব হাসপাতালেব ডিবেক্টবকে তাব প্রাসাদে সঙ্গে কবে নিযে আসেন।

খাবাব ঘবে বসে ডিবেক্টবকে প্রশ্ন কবেন মিবযেল, কতজন বোগী আছে হাসপাতালে?

পাঁচশজন মাঁসযে।

বোগীব সংখ্যা তো দেখছি অনেক।

রোগীদের বিছানা ও খাটগুলো গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে স্থানাভাবে।

তা তো দেখছি।

ওয়ার্ডগুলো এক একটি ছোট ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাতে আলো-বাতাস খেলে না।

হ্যাঁ। ব্যাপারটা তাই।

আবহাওয়াটা উজ্জ্বল থাকলেও একটু সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের বাগানে বসার জায়গা থাকে না।

আমারও তাই মনে হয়।

আর কোনও মহামারী দেখা দিলে যেমন এ বছর টাইফাস রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে এবং বছর দুই আগে এক মারাত্মক সামরিক জ্বর দেখা দিলে একশো জন রোগীকে সামলাতে হয় আমাদের এই হাসপাতালে। তখন কি যে করব তা বুঝে উঠতে পারি না।

মিরিয়েল বললেন, আমিও সেকথা ভেবেছি। আচ্ছা, এই ঘরটাতে কতগুলো রোগীর বিছানা ধরতে পারে?

ডিরেক্টর আশ্চর্য হয়ে বলল, বিশপের খাবার ঘরে?

বিশপ ঘরখানার আয়তন ঘুরে দেখে আপন মনে বললেন, অন্তত কুড়িটা বিছানা ধরবে।

এরপর স্পষ্ট করে বললেন, শুনুন মঁসিয়ে ডিরেক্টর, একটা ভুল হয়ে গেছে। আপনাদের পাঁচ-ছ'টা ছোট ঘরে ছাব্বিশটা রোগী থাকে, অথচ আমাদের এই এত বড় বাড়িতে যেখানে ষাটজন লোক থাকতে পারে সেখানে আমরা মাত্র তিনজন থাকি। এমন অবস্থায় আমরা বরং ঐ বাড়িতে চলে যাব আর আপনারা এই বাড়িটা হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করবেন।

পরদিনই বিশপের প্রাসাদে ছাব্বিশজন গরীব রোগী চলে এল আর বিশপ চলে গেলেন হাসপাতালের বাড়িতে।

মঁসিয়ে মিরিয়েলের ব্যক্তিগত কোনও সঞ্চয় ছিল না। বিপ্লবে তাঁর পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। তাঁর বোনের বাৎসরিক যে পাঁচশো ফ্রাঁ আয় ছিল, গত এক বছরে সেই আয় নানা পারিবারিক প্রয়োজনে খরচ হয়ে যায়। কারণ সামান্য এক গ্রাম্য যাজক থাকাকালে তাঁর আয় খুব কম ছিল। বিশপ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার বাৎসরিক বেতন পনের হাজার ফ্রাঁতে দাঁড়ায়। এই টাকা থেকে সারা বছরের ব্যক্তিগত খরচ হিসাবে মাত্র এক হাজার ফ্রাঁ রেখে বাকি সব টাকা তাঁর এলাকার মধ্যে নানা ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজে ব্যয় করার একটি খসড়া তৈরি করেন। তার থেকে বোঝা যায় তার এলাকায় গরীব-দুঃখীদের দুঃখমোচন, গরীব ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি, কারাগারের উন্নতি, দুঃস্থ পরিবারের রোজগারী বন্দীদের মুক্তি, যত সব গ্রাম্য গীর্জার ও যাজকদের উন্নতি প্রভৃতির ব্যাপারে তিনি তাঁর আয়ের প্রায় সবটাই খরচ করতেন।

দিগনের গীর্জায় মঁসিয়ে মিরিয়েল আসার পর থেকে তাঁর সংসারের আয় ব্যয়

সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেন তা তাঁর বোন ম্যাদময়জেল বাপতিস্তিনে অকুণ্ঠভাবে মেনে নিতে বাধ্য হন। বাপতিস্তিনের কাছে মিরিয়েল ছিলেন একাধারে বড় ভাই, মহামান্য বিশপ এবং পরম বন্ধু। মিরিয়েলকে তিনি এতই ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন যে বিশপ যখন কোনও কথা বলতেন বা কাজ করতেন তখন তাঁর বোন মাথা নিচু করে তাঁর সব কথা শুনতেন, তাঁর সব কাজ সমর্থন করতেন। একমাত্র ম্যাগলোরি মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করত। বিশপের আয়ব্যয়ের যে খসড়া পাই তার থেকে জানতে পারি তিনি বাইরে তাঁর ব্যক্তিগত খরচের জন্য মাত্র এক হাজার ফ্রাঁ রেখে দিতেন। তাঁর বোনের পাঁচশো ফ্রাঁ বাৎসরিক আয় ছিল। দু'জনের মোট পনেরশো ফ্রাঁ আয়ে তাঁদের সংসার চালাতে হত।

এই আয়ের মধ্যেই তাঁদের অতিথিদের আপ্যায়ন করতে হত। দিগনের গীর্জায় যখন কোনও গ্রাম্য যাজক যোগদান করতে আসত বিশপের সঙ্গে তখন তাঁরা সাধ্যমতো খরচ করে আদর-আপ্যায়ন করতেন।

দিগনেতে আসার তিন মাস পরে বিশপ একদিন বাড়িতে বললেন, এখনো আমার টাকার টানাটানি চলছে।

ম্যাগলোরি বলল, আমারও তাই মনে হয়। মঁসিয়ে সরকারের কাছে আপনার ভ্রমণকার্যের জন্য যানবাহন খরচ বাবদ কিছু টাকার জন্য আবেদন করতে পারেন।

বিশপ বললেন, ঠিক বলেছ ম্যাগলোরি।

সত্যি সত্যিই সরকারের কাছে আবেদন জানালেন বিশপ। কিছুদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে বিশপের যানবাহন ও ডাকখরচের জন্য বাৎসরিক তিন হাজার ফ্রাঁ মঞ্জুর করলেন।

এই টাকা মঞ্জুরির ব্যাপারটা শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। এক চাপা প্রতিবাদের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যেতে লাগ অনেক জায়গায়। সম্রাটের কাউন্সিলার একজন সিনেটার মন্ত্রীর কাছে এর প্রতিবাদ জানিয়ে এক চিঠি লিখলেন। তিনি লিখলেন, যানবাহন খরচ? যে শহরে চার হাজারেরও কম লোক বাস করে সেখানে আবার যানবাহন খরচ কিসের? ডাকখরচ আর গ্রামযাত্রাই বা কিসের? গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবারই বা কি দরকার? পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে কোনও রাস্তাঘাট বা যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই সেখানে গাড়িতে করে নিয়মিত চিঠি বিলি করার কীই বা প্রয়োজন? লোকে ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করে। শাতো আর্নোতে দুরান্স নদীর উপর যে সেতু আছে তা বোধ হয় গরুর গাড়ির ভার সহ্য করতে পারবে না। সব যাজকরাই এক প্রকৃতির—লোভী এবং কৃপণ। এই বিশপটি প্রথম প্রথম কিছু গুণের পরিচয় দিয়ে এখন আবার আর পাঁচজন সাধারণ যাজকের মতই নিজমূর্তি ধারণ করেছে। তাঁর আবার গাড়ি চাই, যানবাহনের ব্যবস্থা চাই। আগেকার আমলের বিশপরা যে সব বিলাসব্যসন ভোগ করতেন ইনিও তাই চান। এই সব যাজকদের দ্বারা কোনও কাজই হবে না।

ম্যাগলোরি কিন্তু টাকা মঞ্জুরির কথাটা জানতে পেরে খুশি হলো। সে একদিন

বাপতিস্তিনেকে বলল, মঁসিয়ে প্রথমে পরের কথা খুব ভাবতেন, এখন তাঁকে নিজের কথা কিছু ভাবতে হচ্ছে। তিনি দানের কাজে সব টাকা খরচ করে ফেলেছেন। এখন এই তিন হাজার ফ্রাঁ আমাদের হাতে থাকবে।

কিন্তু সেইদিন সন্ধ্যাতেই কিভাবে ঐ তিন হাজার ফ্রাঁ খরচ করবেন তার একটা খসড়া তৈরি করে তাঁর বোনের হাতে দিয়ে দিলেন বিশপ।

এছাড়া চার্চের ধর্মীয় ব্যাপারে ও দানের কাজে আরও যে সব খরচ হত সে খরচের টাকা তিনি ধনীদের কাছ থেকে চাঁদা হিসাবে আদায় করতেন। ধনীদের কাছ থেকে অনেক সময় চাঁদা তুলে গরীবদের দান করতেন। যে সব ধনীদের কাছে চাঁদা বা ভিক্ষা চাইতে যেতেন না মিরিয়েল, তাঁরাও তাঁর নামে দানের টাকা পাঠিয়ে দিতেন। এইভাবে অনেকেই সাহায্য করত। এক বছরের মধ্যেই দানের ব্যাপারে মোটা টাকা এসে জমল বিশপ মিরিয়েলের হাতে। কিন্তু এত সব টাকা হাতে আসা সত্ত্বেও মিরিয়েলের জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্তন হলো না। দানের জন্য জমা টাকা থেকে একটা পয়সাও ব্যক্তিগত ব্যাপারে খরচ করতেন না তিনি। তাছাড়া হাতে টাকা আসতে না আসতেই তা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন মিরিয়েল। দানের থেকে দারিদ্র্য ও অভাব সব সময়ই অনেক বেশি বলে মাঝে মাঝে টাকার টানাটানি হত। তখন তাঁকে ব্যক্তিগত সংসারের খরচের টাকা থেকে সে টাকার অভাব পূরণ করতে হত।

তখনকার দিনের একটি প্রথা ছিল: বিশপরা যখন গ্রামাঞ্চলে তাঁদের কোনও চিঠি বা নির্দেশপত্র পাঠাতেন তখন সেই সঙ্গে তাঁদের খৃস্টীয় নামগুলি ও ডাকনামগুলির একটি তালিকা দিতে হত তাঁদের। সেই সব নাম থেকে যে নামটি সবচেয়ে অর্থপূর্ণ মনে হত গ্রামবাসীদের, বিশপকে তারা সেই নামে ডাকত। বিশপ মিরিয়েলকেও তাঁর এলাকার গ্রামবাসীরা 'বিয়েনভেনু' এই নামে ডাকত। 'বিয়েনভেনু' কথাটির অর্থ হলো স্বাগত।

আমরা বিশপ মিরিয়েলের যে জীবন-চিত্র আঁকতে চলেছি তা হুবহু সত্য না হলেও তার সঙ্গে তাঁর জীবনের অনেক মিল আছে।

৩

বিশপ যদিও যানবাহন খরচের টাকাটা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন তবু গ্রাম পরিক্রমার বা পরিদর্শনের কাজে কোনওরূপ অবহেলা করতেন না তিনি। দিগনে অঞ্চলটা ছিল পাহাড়-পর্বতে ঘেরা এবং তার ভূমি প্রকৃতি ছিল বন্ধুর। সমতল জায়গা খুব কমই ছিল। দিগনের অধীনস্থ এলাকার মধ্যে ছিল বত্রিশটা গ্রাম্য গীর্জা, একচল্লিশটা ছোট গীর্জা আর দুশো পঁচিশটা ব্যক্তিগত গৃহসংলগ্ন উপাসনাকেন্দ্র। এই সমস্ত গীর্জা আর উপাসনাকেন্দ্রগুলি ঘুরে বেড়িয়ে দেখা কোনও লোকের পক্ষে সত্যিই এক কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু বিশপ মিরিয়েল শত কষ্টকর হলেও তা করতেন। তিনি নিকটবর্তী গ্রামগুলি পায়ে হেঁটে যেতেন, সমতল জায়গাগুলি মালবাহী গাড়িতে এবং পার্বত্য

এলাকাগুলি ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া-আসা করতেন। তাঁর বোন ও ম্যাগলোরিও প্রায়ই তাঁর সঙ্গে যেতেন। তবে যে সব জায়গায় পথ খুবই দুর্গম সেখানে বিশপ একাই যেতেন।

একদিন সিনেজ নামে একটি ছোট শহরে যান বিশপ মিরিয়েল। সেখানে যাজকদের এক সরকারী অফিস ছিল। তিনি সেখানে একটি গাধার পিঠে চেপে যান। তাঁর হাতে তখন পয়সা বেশি না থাকায় অন্য কোনও যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারেননি। তাঁকে গাধার পিঠে শহর ঘুরতে দেখে মেয়র তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসে আশ্চর্য হয়ে যায়। শহরের লোকরা হাসাহাসি করতে থাকে।

মিরিয়েল তখন শহরের সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি বুঝতে পেরেছি, কেন আপনারা আশ্চর্য হয়েছেন। আপনারা ভাবছেন, আমার মতো সামান্য এক যাজক কেন যীশু খৃস্টের মতো গাধার পিঠে চড়ে এসেছে এবং এটা তার অহঙ্কারের পরিচায়ক। কিন্তু আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, এ কাজ আমি অভাবের বশবর্তী হয়েই করেছি, অহঙ্কারের বশে নয়।

এইভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে শান্ত ও সহজভাবে কথাবার্তা বলতেন মিরিয়েল। প্রথাগত ধর্মীয় প্রচার বা বক্তৃতার পরিবর্তে সরলভাবে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে জনগণকে শিক্ষা দিতেন। এমন কোনও গুণানুশীলনের কথা তিনি বলতেন না যা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

এমন কোনও যুক্তি বা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতেন না, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না। কোনও অঞ্চলের অধিবাসীরা গরীবদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে তিনি প্রতিবেশীদের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের বোঝাবার বা শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেন। ব্রিয়ানকলের লোকদের কথা একবার ভেবে দেখ। তারা গরীব, নিঃস্ব ও বিধবাদের আর সকলের থেকে তিনদিন আগে খড় কেটে নেবার সুযোগ দেয়। গরীবদের ঘরবাড়ি ভেঙে গেলে গাঁয়ের সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা বিনা পয়সায় তাদের ভাঙা ঘর মেরামত করে দেয়। এইভাবে সেখানকার লোকেরা সুখে শান্তিতে বাস করছে। তিনশো বছরের মধ্যে সেখানে কোনও খুন হয়নি।

যে সব গাঁয়ের লোকেরা নিজেদের ফসল লাভের ব্যাপারটাকেই বড় করে দেখত তাদের শিক্ষা দেবার জন্য মিরিয়েল বলতেন, এমব্রামের অধিবাসীদের কথাটা একবার ভেবে দেখ তো। যে সব বাড়ির মালিকরা একা অর্থাৎ যাদের ছেলেরা সৈন্যবিভাগে কাজ করে এবং মেয়েরা শহরে চাকরি করে, ফসল কাটার সময় গাঁয়ের লোকেরা সেই সব বাড়ির কর্তাদের সাহায্য করবার জন্য নিজেরা তাদের ফসল কেটে দেয়। গাঁয়ের কোনও লোক রুগ্ন বা পঙ্গু হয়ে পড়লে অন্য সব লোকেরা তাকে সাহায্য করে এবং তার ফসল কেটে সব শস্য তার ঘরে এনে দেয়।

কোনও গাঁয়ের কোনও পরিবারে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ উপস্থিত হলে বিশপ তাদের বলতেন, একবার দোভোলির পার্বত্য অধিবাসীদের কথা ভেবে দেখ দেখি, ঐ অঞ্চলটায় বারো মাসই শীত; বসন্ত আসে

না কখনো। প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একটিবারের জন্যও কোনও নাইটিঙ্গেল পাখি ডাকেনি কখনো। সে গাঁয়ে এক ব্যক্তি মারা গেলে তার ছেলেরা সব পৈত্রিক সম্পত্তি বোনদের বিয়ের জন্য রেখে শহরে চাকরি খুঁজতে যায়।

কোনও গাঁয়ের কৃষকরা মামলা-মোকদ্দমায় অনেক খরচপত্র করলে মিরিয়েল তাদের বলেন, একবার কেরাম উপত্যকার অধিবাসীদের কথা ভেবে দেখ। সেখানে তিন হাজার কৃষক বাস করে। যেন একটি ছোটখাট প্রজাতন্ত্র, তাদের কোনও আদালত বা বিচারক নেই। সেখানে মেয়র সব কিছু করেন। তিনি অধিবাসীদের অবস্থা ও আয় অনুসারে কর ধার্য করেন, কর আদায় করেন, ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেন, উত্তরাধিকারের সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেন। বিভিন্ন অভিযোগের বিচার করেন, কিন্তু কারোও কাছ থেকে কোনও পয়সা নেন না। তিনি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলে সকলেই তাঁর কথা মেনে চলে।

কোনও গাঁয়ে কোনও স্কুলমাস্টার না থাকলেও বিশপ কেরাম উপত্যকার কথা উল্লেখ করেন। বলেন, ওখানকার অধিবাসীরা কি করে জান? যে সব ছোট ছোট গাঁয়ে মাত্র দশ-পনেরটা পরিবার বাস করে, যে সব গাঁ একটা স্কুল চালাতে পারে না বা কোনও মাস্টার রাখতে পারে না, সেইসব গাঁয়েব জন্য কেরাম উপত্যকার অধিবাসীরা নিজেরা চাঁদা তুলে কয়েকজন ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক নিযোগ করে। সেই সব শিক্ষকরা এক একটি গাঁয়ে গিয়ে এক এক সপ্তাহ করে কাটিয়ে সেই সব গাঁযের ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে লেখাপড়া শেখায়। এই সব ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকরা গ্রাম্য মেলাগুলিতেও যায়, আমি নিজে তা দেখেছি। যে সব শিক্ষক শুধু পড়তে শেখায় তাদের মাথার টুপিতে একটা করে কলম গোঁজা থাকে, যারা পড়তে এবং অঙ্ক কষতে শেখায় তাদের দুটো কলম আর যারা পড়তে, অঙ্ক কষতে আর লাতিন ভাষা শেখায় তাদের তিনটে করে কলম থাকে। তবে এই শেষোক্ত শিক্ষকরাই বেশি জ্ঞানী। কিন্তু অজ্ঞতা বা নিরক্ষরতা সত্যিই বড় লজ্জাজনক ব্যাপাব। কেরাম উপত্যকার লোকদের মতো তোমাদের এই শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এমনি করে গম্ভীরভাবে কথা বলে গ্রামবাসীদের শিক্ষা দিতেন বিশপ মিরিযেল। যখন হাতের কাছে কোনও বাস্তব দৃষ্টান্ত খুঁজে পেতেন না তখন বাইবেল থেকে যীশুর কোনও কথামৃত তুলে ধরতেন। কোনও গুরুগম্ভীর শব্দ ব্যবহার না করে অল্প কথায় মূল শিক্ষণীয় বিষয়টি তুলে ধরতেন। বাগ্মিতা হিসাবে যীশুর কথকতার রীতি অবলম্বন করতেন। তিনি যখন কিছু বলতেন তখন অনুপ্রাণিত হয়ে স্বতস্ফূর্তভাবেই তা বলতেন। অন্তরের গভীর হতে উৎসারিত সে সব কথা সহজেই অনুপ্রাণিত করে তুলত শ্রোতাদের।

৪

বিশপ মিরিয়েলের সব আলাপ-আলোচনার স্রোত হালকা আর সরস সুরে এক বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় প্রবাহিত হত। যে দু'জন নারী অর্থাৎ তাঁর বোন বাপতিস্তিনে

আর ম্যাগলোরি তাঁর চিরজীবনের সাথী ছিল, তিনি তাদের থেকে কখনো বড ভাবতেন না নিজেকে। তিনি নিজেকে তাদের স্তরের মানুষ হিসাবেই ভাবতেন। যখন তিনি কথা বলতে বলতে কোনও কারণে হাসতেন তখন মনে হতে তিনি যেন কোনও সরলমতি বালক।

ম্যাগলোবি সব সময় মিরিয়েলকে 'হে মহান বিশপ' বলে সম্বোধন করত। একদিন বিশপ তাঁর পড়ার ঘরে একটি আর্মচেয়ারে বসে বই পডছিলেন। সহসা তাঁর অন্য একটি বই-এর দরকার হয। কিন্তু বইটা সবচেযে উপরের তাকে থাকায তিনি উঠে গিযে হাত বাড়িযে তাকটা নাগাল পেলেন না, কারণ তাঁর চেহাবাটা বেঁটেখাটো ছিল। তিনি তাই ম্যাগলোরিকে বললেন, ম্যাগলোরি, দযা কবে একটা চেযাব এনে দেবে ? তার উপর দাঁড়িযে বইটা পাডব। তুমি আমাকে মহান বললেও আমাব মাথাটা ঐ তাকটার মতো উঁচু নয়।

কোঁতেসী দ্য লো নামে বিশপ মিবিযেলেব দূর সম্পর্কের এক আত্মীয ছিল। কোতেসী প্রাযই বিশপের কাছে এসে তাঁব তিন ছেলেব ভবিষ্যৎ নিযে আলোচনা কবত। সুযোগ পেলেই বিশপেব কাছে এসে সে শুধু তার ছেলেদের কথা তুলত। কোতেসীর কযেকজন ধনী বৃদ্ধ আত্মীয় ছিল যাদেব মৃত্যুব পর তার ছেলেরা তাদেব সব সম্পত্তির উত্তরাধিকাবী হবে। তাব ছোট ছেলে তাব বাবার এক কাকাব মৃত্যুব পব তার সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে; মেজ ছেলে তার কাকার সব সম্পত্তি পাবে পোষ্যপুত্র হিসাবে আর বড ছেলে একজন লর্ডের সব বিষয় সম্পত্তি পাবে উত্তরাধিকাবী হিসাবে। মিরিযেল সাধাবণত কোতেসীব এই সব কথাগুলো দিনেব পব দিন ধৈর্য ধবে শুনে যেতেন। আপন সন্তানদেব ভবিষ্যতেব আশায উদ্দীপিত কোনও এক মাযের নির্দোষ আবেগের সুরে বলা কথাগুলো একঘেয়ে হলেও সহ্য কবে যেতেন তিনি। কিন্তু সেদিন অন্যমনা হযে কি ভাবছিলেন মিরিযেল। কোতেসী তাই মৃদু বাগের সুরে বলল, কি যে ভাবছ তা ঈশ্ববের নামে বলছি বুঝতে পারছি না।

বিশপ বললেন, আমি ভাবছি সেন্ট অগাস্টিনের কথাটা। অগাস্টিন বলতেন, তোমার সব আশা সেই তাঁর হাতে সমর্পণ কবো যাব কোনও উত্তরাধিকারী নেই।

আব একবার স্থানীয কোনও এক ভদ্রলোকের মৃত্যুসংবাদ জানিযে বিশপকে এক চিঠি পাঠায মৃতের আত্মীযবর্গ। সে চিঠিতে মৃতের যত সব উপাধি আর তার পাবিবাবিক সম্মানের কথা লেখা ছিল। চিঠিখানা পড়ে মিরিযেল বললেন, মৃত্যুর পিঠটা কত চওডা! মৃতের কত সম্মানের বোঝা সে পিঠকে বহন করতে হয। মানুষ তাব গর্ব ও আত্মগরিমার পরিচয দেবার জন্য সমাধিস্তম্ভকেও মাধ্যম হিসাবে ব্যবহাব করে।

মাঝে মাঝে কোনও ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে কিছু হাস্যপরিহাসের কথাও বলতেন বিশপ। একবার যুবকবযসী এক গ্রাম্য যাজক দিগনে বড গীর্জায় ধর্মীয প্রচারের কাজে আসে। একদিন দানশীলতা সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ এক বক্তৃতা দেয়। ধনীরা যাতে মৃত্যুর পর নরকযন্ত্রণা পরিহার করে স্বর্গলাভ করতে পারে তার জন্য তাদের মুক্ত হাতে

গরীব-দুঃখীদের দান করতে উপদেশ দেয় সেই যুবক যাজক। নরকের বিভীষিকাটা সে ভাষা দিয়ে আবেগের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলে। সেই সভায় মঁসিয়ে জেবোরাঁদ নামে এক কৃপণ ধনী ছিল। সে কাপড়ের ব্যবসা করে অনেক ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু গরীবদের কোনও কিছু দান করত না। এই বক্তৃতা শোনার পর মঁসিয়ে জেবোরাদ প্রতি রবিবার উপাসনা শেষে গীর্জা থেকে বার হবার সময় ফটকের কাছে যে সব বৃদ্ধা ভিখারিণী ভিড় করে থাকত তাদের একটি করে পয়সা দিত। একথা বিশপ মিরিয়েলের কানে যেতে তিনি মন্তব্য করলেন তাঁর বোনের কাছে, মঁসিয়ে জেবোরাদ এক পয়সার বিনিময়ে যতটুকু স্বর্গ পাওয়া যায় তাই কিনছেন।

ধনীদের কাছে দান চাওয়ার সময় অনেকে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করত। তবু তাতে দমে যেতেন না বিশপ। একবার এক ধনী কৃপণ প্রকৃতির মানুষকে গরীবদের কিছু দান করতে বলেন মিরিয়েল। মার্কুই-এর কাঁধের উপর হাত রেখে তিনি বলেন, আমাকে কিছু দান করুন মার্কুই।

মার্কুই তখন সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, আমার নিজের অনেক গরীব আত্মীয় আছে বাড়িতে।

বিশপ তখন উত্তর করেন, ঠিক আছে, আপনাদের সেই গরীবদের আমার হাতে তুলে দিন।

একদিন বড় গীর্জায় উপদেশ দানের সময় এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, ফ্রান্সে কুড়ি হাজার তিনশো কৃষকের বাড়িতে একটা করে দরজা আর দুটো করে জানালা আছে প্রতি ঘরে। আঠারো হাজার আটশো বাড়িতে একটা করে জানালা আছে আর একটা করে দরজা আছে, আর ছেচল্লিশ হাজার তিনশো বাড়িতে প্রতি ঘরে একটা করে মাত্র দরজা আছে। প্রতি দরজা ও জানালা পিছু কর ধার্য থাকার জন্যই এই জানালা দরজার সংখ্যার এই রকম তারতম্য দেখা যায়। ঈশ্বর বাতাস দান করেছেন, কিন্তু মানুষের আইন সেই বাতাস কেনাবেচা করছে, তা নিয়ে ব্যবসা করছে। আমি আইনকে আক্রমণ করছি না বা দোষ দিচ্ছি না, আমি শুধু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ঈসেয়ার, ভার প্রভৃতি আল্পস পর্বতের নিম্নাঞ্চলে কৃষক অধিবাসীরা এমনই গরীব যে তাদের ময়লা ফেলার গাড়ি নেই, পিঠে করে তারা ময়লা ফেলে। রাত্রিতে জ্বালার মতো বাতি নেই। তারা শুকনো ডালপালা আর রেড়ির তেলে ভেজা সলতে পুড়িয়ে অন্ধকার দূর করে। ডফিনে প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলে রুটি তৈরি করতে পারে না বছরের সব সময়। তারা ছয় মাস ঘুঁটের জ্বালে রুটি তৈরি করে রেখে দেয়। পরের ছয় মাস দারুণ শক্ত হয়ে যাওয়া সেই রুটিগুলো ধারাল দা দিয়ে কেটে চব্বিশ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে তবে খায়। সুতরাং হে আমার প্রিয় ভাইসব, দয়া করো। তোমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল হও।

বিশপ মিরিয়েলের গ্রামাঞ্চলে জন্ম হওয়ায় তিনি গাঁয়ের মানুষদের কথা বুঝতে পারতেন। মিদি, ডফিনে, ল্যাঙ্গুয়েদক প্রভৃতি আল্পসের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের ভাল বুঝতে পারতেন বলে তারা তাঁকে তাদের কাছের মানুষ বলে

ভারত। তিনি বড় বাড়িতে ও কুঁড়েঘরে সব জায়গায় সহজভাবে থাকতে পারতেন ও সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন। তিনি অনেক গুরুগম্ভীর কঠিন বিষয়কে সহজ সরল ভাষায় স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের বুঝিয়ে দিতে পারতেন তাদের ভাষা বলতে ও বুঝতে পারায় তাদের অন্তরে সহজেই পথ করে প্রবেশ করতে পারতেন। সৌখীন ধনী অথবা সাধারণ লোক – সকলকেই সমান জ্ঞান করতেন তিনি। তিনি তাড়াহুড়ো করে কোনও কিছু বিচার করতেন না। আনুপূর্বিক সমস্ত অবস্থা খুঁটিয়ে না দেখে কোনও বিষয়ে মন্তব্য করতেন না। কারো কোনও শোকের কথা শুনলে তিনি প্রথমেই বলতেন, আগে আমাকে দেখতে দাও, শোকটার উদ্ভব কি করে হলো। তিনি নিজে অতীতে একদিন পাপ করায় পাপ সম্বন্ধে তার নীতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করার জন্য কোনও ভূমিকা না করেই বলতেন, মানুষের দেহের মাংস একই সঙ্গে তার বোঝা আর প্রলোভনের বস্তু। এই প্রলোভন সম্পর্কে সতর্ক থেকে তার লোভকে সংযত করে চলতে হবে। একমাত্র যখন কোনও মতেই তা সম্ভব নয় তখনই সে দেহের দাবি মেনে চলবে। এই দাবি মেনে চলার ব্যাপারটা শোকের হতে পারে, কিন্তু সে শোক তুচ্ছ। এতে মানুষের যে পতন হয় তা সম্পূর্ণ পতন নয়। এ পতন তার হাঁটুর কাছে এসে থেমে যায় অর্থাৎ সে নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেই শোক থেকে মুক্ত হয় সে। সাধু হওয়াটা অবশ্য একটা ব্যতিক্রম, সবাই তা পারে না, কিন্তু সবাই ইচ্ছা করলেই সত্যবাদী হতে পারে। ভুল করো, দোষ করো, পাপ করো, কিন্তু সত্যবাদী হও, খাঁড়াখাড়ি ব্যবহার, অকপট সরলতার সঙ্গে তা প্রকাশ করো। যতদূর সম্ভব কম পাপ করাটাই হলো মানব জগতের নীতি। কিন্তু একেবারে পাপ না করাটা দেবদূতদেরও স্বপ্নের বস্তু। সকল পার্থিব বস্তুই পাপের অধীন, যেন কোনও মাধ্যাকর্ষণজাত শক্তি তাদের পাপের দিকে টানতে থাকে।

কারো কোনও দোষ সম্বন্ধে মানুষের কোনও অবিবেচনাপ্রসূত ঘৃণা বা ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখে তিনি হেসে বললেন, এ দোষ তো সকলেই করে যারা ভণ্ড তারাই সে দোষ বা অপরাধ গোপন করে রাখতে চায়।

সামাজিক শাসনের দ্বারা প্রপীড়িত নারী ও শিশুদের প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল। তিনি বলতেন, নারী, শিশু, ভৃত্য, দরিদ্র, দুর্বল এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদের অপরাধ বা কোনও পাপ হলো আসলে স্বামী, পিতা, প্রভু, ধনী ও বলবানদেরই পাপ।

তিনি আরও বলতেন, অজ্ঞ ও অশিক্ষিতদের শিক্ষা দান করে যতদূর সম্ভব সকলকে অবৈতনিক শিক্ষা দান না করার জন্য সমাজকেই দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার জন্য সমাজই দায়ী। এ অন্ধকার সমাজেরই সৃষ্টি। অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষই পাপ করবে। কিন্তু প্রকৃত পাপী হলো সেই যে সে অন্ধকার সৃষ্টি করবে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিশপ মিরিয়েলের এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আমার মনে হয় এ দৃষ্টিভঙ্গি তিনি লাভ করেন বাইবেলের উপদেশামৃত থেকে।

একদিন বিশপ যখন তাঁর বৈঠকখানা ঘরে বসে ছিলেন তখন কোনও এক লোকের অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। এই অপরাধের কথাটা তখন শহরের সকলের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছিল। সেই অপরাধের জন্য অপরাধী অভিযুক্ত হয়েছিল আদালতে এবং অল্প দিনের মধ্যে সে বিচারের রায় বার হবে। অপরাধী লোকটি একটি মেয়েকে ভালবাসত। তাদের একটি সন্তান হয়। লোকটির সঞ্চিত অর্থ সব ফুরিয়ে যাওয়ায় সে দারুণ অভাবে পড়ে এবং সেই অভাবমোচনের জনা জাল নোটের কারবার করে। সেকালে জাল নোট ছাপার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। সেই লোকটার তৈরি প্রথম জাল মুদ্রাটি এক জায়গায় চালাতে গেলে মেয়েটি গ্রেপ্তার হয়। মেয়েটিকে আটক করা হলে সে কোথায় কার কাছ থেকে সে মুদ্রা পেয়েছে সেকথা প্রকাশ করল না। তার হাতে সেই মুদ্রা ছাড়া আর কোনও তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া গেল না। সে ইচ্ছা করলেই তার প্রেমিককে ধরিয়ে দিতে পারত এবং তার ধ্বংস ডেকে আনতে পারত। কিন্তু কোনও কথাই বলল না সে এবং এ বিষয়ে জেদ ধরে রইল। তখন সরকারপক্ষের উকিল এক ফন্দি আঁটল মেয়েটির কাছ থেকে আসল কথা বার কবার জন্য। কতকগুলি জাল চিঠি বার করে সরকাবপক্ষের উকিল মেয়েটিকে বলল, তার প্রেমিক অন্য এক মেয়েকে ভালবাসে এবং তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। মেয়েটি সেকথা বিশ্বাস করে তার প্রেমিকের উপর রেগে যায়। তখন সে ঈর্ষা ও প্রতিশোধ বাসনার বশবর্তী হয়ে সব কথা ফাঁস করে দিয়ে তার প্রেমিককে ধরিয়ে দেয়। দু'জনেরই বিচার হবে আদালতে এবং লোকটির জেল অথবা ফাঁসি হবে। সরকাবী উকিলের বুদ্ধি ও কৌশলের কথা উল্লেখ করে শহরের সব লোক উল্লসিত হয়ে উঠতে লাগল। এই উকিল ভদ্রলোক মেয়েটির ঈর্ষাকাতরতা এবং প্রতিশোধ প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে আসল সত্যকে প্রকাশ কবে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করে।

সব কিছু নীরবে শোনার পর বিশপ বললেন, ওদের বিচার কোথায় হবে?

উপস্থিত সবাই বলল, এইক্সের আদালতে।

বিশপ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সরকারপক্ষের উকিলের কোথায় বিচার হবে?

দিগনেতে একবার একটি বড সকরুণ ও মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে। এক খুনের আসামীর মৃত্যুদণ্ড হয়। আসামীটি একেবারে নিরক্ষর নয়। আবার খুব একটা শিক্ষিতও নয়। তার বিচার শহরের লোকদের মনে এক বিরাট কৌতূহলের সৃষ্টি করে। লোকটির ফাঁসির দিনে সেই কারাগারের যাজক অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফাসির সময একজন যাজকের দরকার। স্থানীয় ছোট গীর্জার যাজককে ডাকা হলে সে বলে এটা তার কাজ নয়, [illegible]। তখন বিশপ মিরিয়েলকে এই খবরটা জানানো হয।

বিশপ তখন বললেন, যাজক ঠিকই বলেছেন, এ কাজ তাঁর নয, আমার।

তিনি তৎক্ষণাৎ জেলখানায় সেই ফাঁসির আসামীর ঘরে চলে গেলেন। তিনি লোকটির নাম ধরে ডেকে তার একটি হাত ধরে তার সঙ্গে পরম আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কোনও কিছু না খেয়েই সারাটি দিন ও রাত তিনি লোকটির সঙ্গে জেলখানাতেই রয়ে গেলেন। তার আত্মার শান্তি কামনা
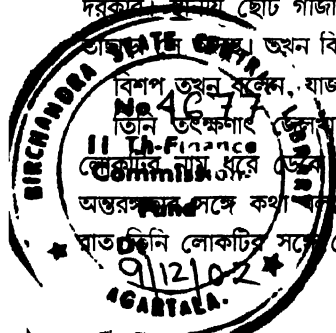
কবে ঈশ্ববেব কাছে প্রার্থনা কবতে লাগলেন তিনি। তাকে আত্মস্থ হবাব জন্য উপদেশ দিলেন। জীবন, মৃত্যু ও ঈশ্বব সম্বন্ধে গভীবতম সত্যেব কথাটি খুবই সহজ ও সবলভাবে তাকে বললেন। তিনি তাব সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা কবতে লাগলেন যাতে মনে হবে তিনি একেবাবে লোকটিব পিতা, ভ্রাতা এবং বন্ধু। আবাব বিশপকপে তাকে আশীর্বাদ কবলেন। লোকটি ফাঁসিব কথা শুনে হতাশ হযে পড়ে। নিবিড়তম হতাশাব মধ্য দিযেই জীবনাবসান ঘটত তাব। যে মৃত্যুকে সে এক অন্ধকাব শূন্যতা বলে ভাবত সেই মৃত্যুব সামনে এসে এক অপবিসীম বিভীষিকাব কথা চিন্তা কবে কাপতে থাকে সে। যে বহস্যময এক অবগুণ্ঠন মৃত্যুকে জীবন ও আমাদেব চোখেব দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল কবে ঢেকে বাখে, লোকটিব মৃত্যুদণ্ডেব সংবাদ সে অবগুণ্ঠনকে ছিন্নভিন্ন কবে দেয। তখন সেই ছিন্নভিন্ন অবগুণ্ঠনেব অচ্ছন্দ অবকাশেব মধ্য দিযে মৃত্যুলোকেব পানে তাকিযে সে শুধু দেখতে পেল বাশিকৃত এক বিপুল অন্ধকাব। কিন্তু বিশপ সেই অন্ধকাবেব মাঝে আলো দেখালেন তাকে।

পর্বাদন সকালে আসামীকে যখন বধ্যভূমিব দিকে হাতবাধা অবস্থায নিযে যাওযা হচ্ছিল তখন বিশপও তাব পাশে পাশে যাচ্ছিলেন। তাব মাথায ছিল বিশপেব মস্তকাচ্ছাদন আব গলায ক্রসটা ঝোলানো ছিল। লোকটিব যে মুখখানা গতকাল বিষাদে কালো হযে ছিল আজ সে মুখ এক অজ্ঞাত, অকাবণ ও অনাবিল আনন্দেব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হযে উঠেছে। জীবনেব শেষ মুহূর্তে মৃত্যুলোকেব দ্বাবপ্রান্ত অতিক্রম কবাব সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্ববকে পাবাব আশায সহসা উজ্জীবিত হযে উঠেছে যেন তাব প্রশান্ত ও স্থিতধী আত্মা। ঘাতকেব খড়্গ লোকটিব উপব পড়াব ঠিক আগেব মুহূর্তে বিশপ তাকে চুম্বন কবে বললেন, মনে বেখো, মানুষ যাকে হত্যা কবে ঈশ্বব তাকে পুনরুজ্জীবিত কবেন। ভাইবা কাউকে বন্দী কবলে পবমপিতা ঈশ্বব তাকে মুক্ত কবেন। এখন প্রার্থনা কবো, ঈশ্ববে বিশ্বাস বাখ এবং মহাজীবনেব পথে গমন কবো যেখানে আছেন তোমাব পবম পিতা।

বিশপ যখন তাব কাজ শেষ কবে বধ্যভূমি থেকে বেবিযে এলেন তখন তাঁব চোখেব দৃষ্টি দেখে সবাই বিস্মযে অবাক হযে গেল। সে দৃষ্টিব মধ্যে তখন একই সঙ্গে ছিল এক সককণ গ্লানিমা আব উজ্জ্বল প্রশান্তি। কোনটা বেশি আকর্ষণ কবছে তাদেব তা বুঝতে পাবল না কেউ।

সেদিন বাড়ি ফিবে বিশপ তাব বোনকে বললেন, আমি এতক্ষণ আমাব কর্তব্য পালন কবছিলাম।

জীবনে এমন অনেক মহৎ কাজ আছে যাব মানে সাধাবণ মানুষ বুঝতে পাবে না। দিগনে শহবেব অনেক লোকও তেমনি বিশপ মিবিযেলেব অনেক মহৎ কাজেব মানে বুঝতে পাবত না। বলত, ওটা বিশপেব এক কৃত্রিম আবেগ ছাড়া আব কিছুই নয। তবে বিশপ সম্বন্ধে একথা বিলাসী ধনী ব্যক্তিবাই তাদেব বসাব ঘবে বসে আলোচনা কবত। শহবেব সাধাবণ মানুষ বিশপেব দযা মমতাব জন্য সত্যিই গভীবভাবে শ্রদ্ধা কবত তাঁকে।

ফাঁসির যন্ত্র হিসাবে গিলোটিন প্রচলিত হতে ব্যক্তিগতভাবে বিশপ একটা জোর আঘাত পান মনে। এ আঘাতটা কাটিয়ে উঠতে সময় লেগেছিল তাঁর।

সাধারণত যখন নতুন করে কোনও বধ্যভূমি নির্মাণ করা হয় তখন এক গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় মানুষের মনে। তবে গিলোটিন বস্তুটি নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত মানুষের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতাম না আমরা। কিন্তু গিলোটিন দেখার পর হতে মৃত্যুদণ্ডের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আপন আপন মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে সব মানুষ। জোসেফ দ্য মেস্তার মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেন। কিন্তু সীজার দ্য বেকারিয়া মৃত্যুদণ্ডকে এক জঘন্য ব্যাপার বলে অভিহিত করেন। গিলোটিনকে অনেকে মানুষের অপরাধ সম্বন্ধে আইনের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হিসাবে গণ্য করলেও আসলে তা হলো প্রতিহিংসার মূর্ত প্রতীক। তা কখনই নিরপেক্ষ হতে পাবে না অথবা আমাদের নিরপেক্ষ থাকতে দিতে পারে না। যারা এই গিলোটিনকে দেখে নিজের চোখে, তারা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যায়, শিউরে ওঠে। গিলোটিনের ঐ ধারাল খড়্গের আঘাতে সব সামাজিক সমস্যা যেন এক শেষ পরিণতি লাভ করে। গিলোটিন লোহা, কাঠ আর দড়ি দিয়ে গড়া যেন এক নিষ্প্রাণ যন্ত্রমাত্র নয়, এটি যেন এক অবাধ অনিবারণীয় ইচ্ছার ভাবমূর্তি যে সব সময় তার কুটিল উদ্দেশ্যগুলো সাধন করে চলেছে একের পর এক করে। এ যন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গ ও অংশ যেন মানুষের সব কথা শুনতে পায়, যেন বুঝতে পারে, দেখতে পায় সব কিছু। ঘাতকের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই গিলোটিন যেন মৃত মানুষের মাংস গ্রাস করে, তার রক্ত পান করে। এটি যেন বিচারক আর যন্ত্রনির্মাতার হাতে গড়া এক রাক্ষস যে রাক্ষস সাক্ষাৎ মৃত্যুর ভিতর থেকে তার নাড়ীভুড়ি ছিঁড়ে নিজের প্রাণবস্তু আহরণ করে এক ভয়ঙ্কর জীবন যাপন করে চলে।

বিশপ মিরিয়েল যখন প্রথম গিলোটিন দেখেন তখন এই কথাই তাঁর মনে হয়। গিলোটিনে কোনও এক লোকের এই প্রথম ফাঁস দেখে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি। বাড়িতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে সেই ভয়ঙ্কর প্রশান্তটা মিলিয়ে গেল। তাঁর মনের মধ্যে সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার কথাটা ভূতের মতো আনাগোনা করছিল বারবার। সাধারণত তিনি কোনও কর্তব্য পালন করে বাড়ি ফিরলে এক তৃপ্তির অনুভূতি তার চোখে-মুখে ফুটে থাকে। কিন্তু এবার তার পরিবর্তে তার মন ছিল এক পাপচেতনার দ্বারা ভাবাক্রান্ত। সাধারণত তিনি বাড়িতে অনেক সময় আপন মনে বিড় বিড় করে কথা বলতেন। সেদিনও তিনি এমনি করে এক একাত্মক সংলাপে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন আর তার বোন সে সংলাপ মন দিয়ে শুনছিল।

বিশপ বলছিলেন, আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা এত ভয়ঙ্কর। মানবজগতের বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুনের প্রতি এভাবে উদাসীন থেকে শুধু ঐশ্বরিক বিধি নিয়ে এতখানি মগ্ন থাকা আমার উচিত হয়নি। মৃত্যু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হাতে। মৃত্যুর মতো এমন একটা অজ্ঞাত ও রহস্যময় ব্যাপারের উপর খবরদারি করার কোনও অধিকার নেই মানুষের।

এই সব চিন্তা ভাবনাগুলো ক্রমে একে একে মিলিয়ে গেল বিশপেব মন থেকে। তবে সেদিন থেকে বধ্যভূমিব পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথটা যতদূব সম্ভব এড়িয়ে যেতেন তিনি।

বিশপ মিবিয়েলকে যেকোনও সময়ে ডাকলেই তিনি যেকোনও রুগ্ন ও মুমূর্ষু ব্যক্তিব শয্যাপাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। এটা যে তাব জীবনেব এক প্রধান আব মহান কর্তব্য একথা ভুলে যেতেন না তিনি। কোনও অনাথ বা বিধবাব বাড়ি যাবাব জন্য তাকে ডেকে পাঠাবাব কোনও প্রয়োজন হত না। কোনও মৃত্যুসংবাদ পাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেই চলে যেতেন। যে ব্যক্তি তাব প্রিয়তমা স্ত্রীকে হাবিয়েছে অথবা যে মাতা সন্তানহাবা হয়েছে তাব পাশে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা ধবে নীববে বসে থাকতেন তাব শোকে সান্ত্বনা দিতেন। কখন কথা বলতে হবে বা কখন চুপ কবে থাকতে হবে তা তিনি বুঝতেন। তাব সান্ত্বনা দানেব পদ্ধতিটা ছিল উন্নত ধবনেব। তিনি কখনো শোকার্ত ব্যক্তিকে বিস্মৃতিব অতলগর্ভে তাব শোক দুঃখকে বিলীন কবে দেবাব উপদেশ দিতেন না, তিনি চাইতেন শোকার্ত ব্যক্তি এক নতুন আশা ও ঈশ্বব বিশ্বাসেব সাহায্যে তাব সব শোকদুঃখকে এক বিবল মহত্ত্বেব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কবে তুলুক। তিনি শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিদেব বলতেন, মৃতেব প্রতি তোমাদেব দৃষ্টিভঙ্গিব পবিবর্তন কবো। পচনশীল এক মবদেহেব জন্য শোক দুঃখ কবে কোনও লাভ নেই। তোমবা যদি স্থিবভাবে ভেবে দেখ তাহলে দেখবে তোমাদেব মৃত প্রিয়তমেব অমব আত্মাব আলো ঈশ্ববেব বুকেব মধ্যে স্থান লাভ কবছে।

তিনি জানতেন বিশ্বাসই মানুষকে শান্তি দেয়। শোকার্ত ব্যক্তিকে তিনি সব সময় ঈশ্ববেব প্রতি নিবিড় আত্মসমর্পণেব মধ্যে দিয়ে শান্তি পেতে বলতেন। যে দুঃখ শুধু মৃত্যুব অন্ধকাব গহ্ববটাকে বড় কবে দেখে সে দুঃখকে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্রেব আলো হিসাবে দেখতে শেখাতেন

৫

মঁসিয়ে মিবিয়েলেব ব্যক্তিগত জীবন আব সামাজিক জীবনেব মধ্যে কোনও ভেদ ছিল না। দুটি জীবন সমান্তবালভাবে এক ধাবায় চলত। যাবা তাঁকে কাছ থেকে দেখত তাবা তাঁব সে জীবনেব কঠোবতা আব আত্মনিগ্রহ দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে যেত।

বিশপ [illegible] চিন্তাশীল ব্যক্তিদেব মতে মিবিয়েল [illegible] কম ঘুমোতেন। বস্তুত যতটুকু সময় ঘুমোতেন তাব ঘুমটা গভীব হত। সকালবেলায় তিনি এক ঘণ্টা ধ্যান কবতেন। তাবপব তিনি বড় গীর্জায় অথবা তাব নিজস্ব বক্তৃতামঞ্চ থেকে সমবেত উপাসনাসভা পবিচালনা কবতেন। সভাব কাজ শেষ হলে তিনি [illegible] আব রুটি খেয়ে তাব কাজ শুরু কবতেন।

একজন বিশপকে অনেক কাজ কবতে হয়। সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে। তাব অধীনস্থ নির্দিষ্ট মণ্ডলীব বিভিন্ন চার্চেব যাজকদেব সঙ্গে দেখা কবতে হয় প্রতিদিন।

অনেক ধর্মীয় সভায় তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হয়, বিধান দান করতে হয়, বিভিন্ন গীর্জা থেকে প্রকাশিত কাগজপত্র দেখতে হয়, এই ধরনের অজস্র ধর্মীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করতে হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন গ্রাম্য গরীব যাজকদের কাছে চিঠি দিয়ে পাঠাতে হয়, যাজকদের নীতি উপদেশমূলক বক্তৃতার লিপিগুলি খুঁটিয়ে দেখতে হয়। বিভিন্ন জায়গায় মেয়র ও যাজকদের মধ্যে কোনও বিরোধ বাধলে তার মীমাংসা করতে হয়। তারপর পোপ ও সরকার সংক্রান্ত চিঠিপত্রগুলি দেখে তার জবাব লিখতে হয়। মোট কথা, তাঁকে হাজার রকমের কাজকর্ম সম্পন্ন করতে হয়।

এইসব কাজকর্ম সম্পাদন করে যেটুকু সময় পেতেন মিরিয়েল সেই সময় তিনি গরীব-দুঃখীদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের কাজে ব্যয় করতেন। এর পরেও যদি কিছু অবসর পেতেন তাহলে তিনি তাঁর বাগানে গিয়ে গাছপালার যত্ন করতেন, অথবা ব্যক্তিগত লেখাপড়ার কাজ করতেন। পড়ালেখার কাজ আর বাগানের কাজ একই জাতীয় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলতেন মানুষের মন বা আত্মাটাও এক বাগান। পড়াশুনা বা জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে যে বাগান পরিমার্জিত হয়।

দুপুরবেলায় তিনি যা খেতেন তা প্রাতরাশের থেকে সামান্য কিছু বেশি। বেলা দুটোর সময় আবহাওয়া ভাল থাকলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন তিনি। হয় তিনি গ্রামাঞ্চলে চলে যেতেন হাঁটতে হাঁটতে অথবা শহরের রাস্তা দিয়ে গরীব দুঃখীদের বাড়ি যেতেন। একটা লম্বা ছড়ি হাতে মাথাটা নিচু করে চিন্তান্বিতভাবে পথ হাঁটতেন তিনি। তাঁর জুতোজোড়া ছিল ভারী এবং মোজা দুটো ছিল নীলচে রঙের। মাথায় থাকত ঝালর দেওয়া বিশপের টুপি।

যে পথ দিয়ে তিনি যেতেন সে পথের দু'ধারে একটা আলোড়ন পড়ে যেত। যত সব শিশু আর বৃদ্ধরা তাদের বাড়ির দরজার কাছে বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানাত তাঁকে, শীতার্ত ব্যক্তিরা যেমন প্রতপ্ত সূর্যালোককে অভ্যর্থনা জানায়। যারা অভাবগ্রস্ত তাদের তিনি তাদের বাসায় গিয়ে দেখতেন। তিনি সকলকে আশীর্বাদ করে তাদের ধন্য করতেন এবং নিজেও ধন্য হতেন। পথে যেতে যেতে মাঝে মাঝে থেমে অনেক শিশু আর তাদের মায়েদের সঙ্গে হেসে কথা বলতেন। যখন তাঁর হাতে টাকা থাকত তখন তিনি গরীবদের বাড়ি যেতেন আর যখন টাকা থাকত না তখন তিনি ধনীদের বাড়ি যেতেন।

বাইরে কোথাও যাবার সময় বিশপের আলখাল্লাটি তিনি পরে যেতেন। সেটি একেবারে অচল না হওয়া পর্যন্ত পরতেন। সেটা দু'-এক জায়গায় ছিঁড়ে গেলেও তা গ্রাহ্য করতেন না। তবে গরমকালে সেটা পরে বাইরে বেরোতে কষ্ট হত।

সন্ধে সাড়ে আটটার সময় তিনি বাড়িতে তাঁর বোনের সঙ্গে রাতের খাওয়া খেতেন। ম্যাগলোরি পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। তাঁর নৈশভোজনের মধ্যে থাকত শাকসবজীর ঝোল আর শুকনো রুটি। এর থেকে কম খরচের খাওয়া আর হতে পারে না। যদি কোনও যাজক নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে থাকত তাহলে ম্যাগলোরি সেই সুযোগে কিছু মাছ বা মাংসের ব্যবস্থা করত। যাজকরা তাঁর বাড়িতে খেতে ভালবাসত আর বিশপও তা সমর্থন করতেন।

নৈশভোজনের পর আধ ঘণ্টা তাঁর বোন আর ম্যাগলোরির সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন মিরিয়েল। তারপর নিজের শোবার ঘরে চলে যেতেন। তাঁর শোবার ঘরটা ছিল নিচেরতলায়। বাপতিস্তিনে আর ম্যাগলোরি উপরতলায় তাদের শোবার ঘরে চলে যেত। শোবার ঘরে গিয়ে পড়ালেখার কাজ করতেন মিরিয়েল অনেক রাত পর্যন্ত। তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর প্রচুর পড়াশুনা এবং পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বাইবেলের 'জেনেসিস' বা সৃষ্টিতত্ত্বের একটি পঙ্‌ক্তির উপর একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সেই পঙ্‌ক্তিটাতে ছিল 'জেনেসিস' সৃষ্টির আগে শুধু ছিল জল এবং ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর ঘুরে বেড়াত। তিনি এই পঙ্‌ক্তিটির সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লিখিত অনুরূপ পঙ্‌ক্তিগুলি মিলিয়ে দেখেন। আরবী শাস্ত্রে লিখিত একটি পঙ্‌ক্তিতে আছে, 'ঈশ্বরের বাতাস বইতে লাগল।' ফ্লোবিয়াস জোশেফ লিখেছেন, স্বর্গ থেকে বাতাস নেমে এল মর্ত্যে। চ্যালভিযন অনূদিত রব্বি অঙ্কেলোতে আছে, ঈশ্বরপ্রেরিত বাতাসের রাশি জলের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল।

আর একটি প্রবন্ধে তিনি টলেমার ভূতপূর্ব বিশপ শার্লস লুই হুগোর ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত লেখাগুলি নিযে আলোচনা করেন। এই রচনাগুলি আগের শতাব্দীতে কযেকটি পুস্তিকা ও পাম্পলেটে প্রকাশিত হয়।

কখনো কখনো কোনও গভীর বিষয পড়তে পড়তে দিবাস্বপ্নের মধ্যে মগ্ন হযে পড়তেন। তার মাঝে মাঝে সেই দিবাস্বপ্নের গভীর হতে উঠে এসে দু' একটা পঙ্‌ক্তি লিখতেন। যে বই তাঁর হাতে থাকত সেই বই-এর কোনও না কোনও পাতার উপর পঙ্‌ক্তিগুলি লিখতেন। এই লেখাগুলির সঙ্গে তাঁব হাতের বই-এর কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমরা একটি বই এর উপর তাঁর লেখা কযেকটি ছত্র পাই। তাতে এক জায়গায় লেখা ছিল, তুমি হচ্ছ এই :

যাজক সম্প্রদায তোমাকে বলে 'সর্বশক্তিমান', ম্যাকারীরা তোমাকে বলে 'স্রষ্টা', একেসীয়দের কাছে লিখিত পত্রাবলীতে তোমাকে 'স্বাধীনতা' বলে অভিহিত করা হয়েছে, বারুক তোমাকে বলেছেন 'অনন্ত', বাইবেলের প্রার্থনাস্তোত্রে তোমাকে বলা হযেছে 'প্রজ্ঞা আর সত্য', দি বুক অফ কিংস, তোমাকে বলেছেন 'লর্ড' বা প্রভু, ওল্ড টেস্টামেন্টেব ক্রাজোডাসে বলা হযেছে তুমিই 'ঐশ্বরিক বিধান', লেভিটিকাস বলেছেন, তুমিই 'পবিত্রতা', এসড্রাস তোমাকে বলেছেন, 'ন্যাযপরাযণতা', সৃষ্টিতত্ত্বে তোমাকে বলা হয়েছে 'ঈশ্বব', মানুষ তোমাকে বলে 'পরম পিতা' ; কিন্তু সলোমন বলেছেন তুমি 'পবম করুণা' এবং এইটিই তোমার সবচেযে সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ নাম।

রাত্রি ন'টা বাজতেই বাড়ির মহিলা দু'জন উপরতলায তাদেব শোবার ঘরে চলে যেত।

এবার দিগনের বিশপ যে বাড়িতে বাস করতেন সে বাড়ির একটি বিবরণ দান করা উচিত।

৬

যে বাড়িতে বিশপ বাস করতেন তার দুটি তলা ছিল। প্রত্যেক তলাতে ছিল

তিনটি করে ঘর। এ ছাড়া ছাদের উপর একটি ঘর ছিল। বাড়িটির পিছন দিকে এক একর সমান একটি বাগান ছিল। বাড়ির মেয়েরা উপরতলায় আর বিশপ নিচেরতলায় থাকতেন। বিশপের যে তিনটি ঘর ছিল তার মধ্যে রাস্তার দিকের ঘরটি খাবার ঘররূপে ব্যবহৃত হত। দ্বিতীয় ঘরটি শোবার ঘর ও পড়ার ঘররূপে ব্যবহার করতেন। তৃতীয় ঘরটি তাঁর বক্তৃতার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। বক্তৃতার ঘরের এক প্রান্তে একটি বিছানা পাতা থাকত অতিথিদের জন্য। বিছানাটির পাশে পর্দা ফেলা থাকত। গীর্জা সংক্রান্ত ব্যাপারে গ্রাম্য যাজকদের প্রায়ই বিশপের কাছে আসতে হত। পর্দা দিয়ে আড়াল করে রাখা হত বিছানাটা ; যেন মনে হত একটা শোবার ঘব।

বিশ পর এই বাড়িটি আগে ছিল হাসপাতাল। হাসপাতালের যে ঘরটিতে ওষুধ দেওয়া হত রোগীদের সেই ঘরটিকে দু'ভাগ করে ভাঁড়ার ঘব ও রান্নাঘরে পরিণত করা হয়। বাগানের একটি অংশে একটি গোয়ালঘর তৈরি কবে সেখানে দুটি গরু রাখা হত। গরুতে যা দুধ দিত তার অর্ধেক বিশপ বাড়িতে বেখে অর্ধেক হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতেন।

বিশপের শোবার ঘরটি ছিল বড়। শীতকালে ঘবটাকে উত্তপ্ত কবাব জন্য অনেক কাঠের দরকার। দিগনেতে কাঠের দাম খুব বেশি হওয়ার জন্য শীতকালে প্রয়োজনমতো জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে পারতেন না। শীতকালে রাত্রির দিকে শীতে খুব কষ্ট হওয়ায় বিশপ গোয়ালঘরের একটি দিক ঘিরে সন্ধ্যার সময় সেইখানে বসে পড়াশুনো করতেন। তিনি বলতেন, 'এটি আমার শীতের বিশ্রামাগার।' কিন্তু তার সেই শীতের বিশ্রামাগারে একটি কাঠের টেবিল আর চারটি চেয়ার ছাড়া আর কোনও আসবাবপত্র ছিল না। একটি কাঠের বোর্ডকে বক্তৃতাব ঘরে বেদী হিসাবে সাজিয়ে রাখা হত।

দিগনের ধনী ধার্মিক ও ভক্ত মহিলারা বক্তৃতাকক্ষে একটি ভাল বেদী তৈরির জন্য কয়েকবার চাঁদা তুলে টাকা দিয়েছিল বিশপের হাতে। কিন্তু সে টাকা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেন বিশপ। তিনি বলেন, যে সব হতভাগ্য নিরুপায় হয়ে ঈশ্বরের কাছে অন্তরের সঙ্গে সান্ত্বনা চায় তাদের আত্মাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বেদী।

বসার ঘরে বেশি চেয়ার ছিল না। দুটি মাত্র বসাব টুল ছিল। তাব শোবার ঘরে মাত্র একটি আর্মচেয়ার ছিল। যখন বিশপেব বসাব ঘরে ছ' সাতজন অথবা দশ বারো জন অতিথি আসত, বিভিন্ন ঘব থেকে চেয়াব আনতে হত। এগার জনের বেশি অতিথি এলে বিশপকে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হত। আর গ্রীষ্মকাল হলে চেয়ারের অভাবে তিনি অতিথিদের বাগানে নিয়ে গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে কথা বলতেন।

অতিথিদের বিছানাব পাশে যে একটা চেয়াব ছিল তার একটা পা ভাঙা থাকায় সেটা দেওয়ালের গা ঘেঁষে সেঁটে রাখা হয়েছিল। সুতরাং সেটা বার করে ব্যবহার করা চলত না। বাপতিস্তিনের ঘরে ইজি চেয়ার ছিল, কিন্তু সিঁড়িগুলো সরু থাকায় জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকানোর সময় ভেঙে যায়। তার ফলে সেটাও ব্যবহার করা চলত না। বাপতিস্তিনের অনেক দিনের ইচ্ছা মেহগনি কাঠের আর হলুদ ভেলভেটের

গদিওযালা একটা আর্মচেযাব কিনবে। কিন্তু তাব দাম পাঁচশো ফ্রাঁ। অথচ গত পাঁচ বছবেব মধ্যে সে মাত্র বিযাল্লিশ ফ্রা দশ স্যু জমাতে পেবেছে। ফলে সেই দামী আর্মচেযাব কেনাব আশাটা ত্যাগ কবতে হয বাপতিস্তিনকে। এমনি কবে অনেক স্বপ্নই সফল হয না আমাদেব।

বিশপেব শোবাব ঘবেব মতো এমন সাদাসিধে ঘব দেখাই যায না। এ ঘবে ছিল বাগানেব দিকে একটি জানালা আব দটি দবজা -একটি দবজা খাবাব ঘবে যাবাব জন্য আব একটি বক্তৃতাব ঘবে যাবাব জন্য। একটি লোহাব খাটে বিছানা পাতা থাকত, তাব উপবে ছিল সবুজ সার্জেব এক চাদোযা। খাবাব ঘবে যাবাব দবজাটাব পাশে ছিল বই এব তাক। তাকগুলি বইযে ভর্তি ছিল। আগুন কবাব জাযগাটা ছিল কাঠেব, কিন্তু দেখে মনে হত মার্বেল পাথবেব। তাব সামনে দুটো ফুলদানিতে দুটো কুকুবেব মূর্তি ছিল। দেওযালেব গাযে যেখানে আগুন জ্বালানো হয তাব উপব যে তাক ছিল তাব মাথায আযনাব পবিবর্তে চাবকোণা একখণ্ড ভেলভেটেব উপব একটা তামাব ক্রস ঝোলানো ছিল। জানালাব পাশে একটা বড় টেবিলে অনেক কাগজপত্র ছড়ানো ছিল আব তাতে একটা দোযাত ছিল। টেবিলেব পাশে ছিল একটা কমদামী আর্মচেযাব আব বিছানাব খাটেব পাশে প্রার্থনা কবাব জন্য একটা টুল ছিল। এই টুলটা আসলে বক্তৃতাব ঘবে থাকত এবং দবকাবেব সময আনা হত।

বিছানাব দুপাশে দুটি ফ্রেমে আঁটা ছবি ছিল। ছবি দুটি ভূতপূর্ব এক বিশপ ও কযেকজন যাজকেব। ছবি দুটি ছিল আগেকাব হাসপাতালে। হাসপাতালেব এই বাড়িটাতে আসাব পব থেকে বিশপ এগুলি উত্তবাধিকাবসূত্রে পেযে যান যেন। ছবিগুলি এ বাড়িতে আসাব পব ম্যাগলোব যখন ঝাড়ামোছা কবছিল তখন তা দেখতে পেযে যান বিশপ। দেখেন ছবিতে আঁকা বিশপ ও যাজকবা সবাই ১৭৮৫ সালেব এপ্রিল মাসে কাজে নিযুক্ত হন। জানালায যে পর্দাটা ছিল তাব অনেকটা ছিঁড়ে যায এবং ম্যাগলোব বাধ্য হযে সেই ছেঁড়াটা ঢাকাব জন্য তালি দিযে দেয। তালিটা দেওযা হয ক্রসেব আকাবে। তা দেখে খুশি হন বিশপ। গোটা বাড়িটাকে বাইবে থেকে ব হাসপাতালেব মতই সাদা কবা হযেছিল।

খাবাব ঘবেব টেবিলে ছযটা রুপোব কাটা চামচ চকচক কবত আব দুটো রুপোব ভাবী বাতিদান ছিল। বিশপেব নিজস্ব ধনসম্পদ বলতে এ ছাড়া আব কিছু ছিল না। এই রুপোব জন্য গর্ব অনুভব কবত ম্যাগলোব। কোনও অতিথি বাতে খেতে এলে সেই বাতিদানে মোমবাতি বেখে তা জ্বালত। বিশপ একদিন রুপোব কাটা চামচগুলো সম্বন্ধে মন্তব্য কবেন, এই রুপোব জিনিসগুলোব সাহায্য ছাড়া খাওযাব অভ্যাস ত্যাগ কবতে পাবছি না আমি

বাগানটা চাবদিকে একটা সাদা পাচিল দিযে ঘেবা ছিল। বাগানেব মধ্যে যাকা জাযগাটায বর্গক্ষেত্রাকাব চাব টুকবো জমি ছিল। তাব তিনটেতে ম্যাগলোব শাকসবজী লাগাত আব একটাতে ফুলগাছ বসিযেছিলেন বিশপ। বাগানে কিছু ফলেব গাছও ছিল। একদিন ম্যাগলোব বাগেব সঙ্গে বিশপকে বলেছিল, মঁসিযে, আপনি আমাদেব

সব কিছুর সদ্ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু আপনি ফুলগাছ বসিয়ে জমিটা নষ্ট করছেন। ফুলের থেকে চাটনির দরকার বেশি। তাই ওখানে ফুলের বদলে চাটনির জন্য কিছু সব্জী লাগালে ভাল হত।

বিশপ তার উত্তরে বলেন, ভুল করছ তুমি। সংসারে প্রয়োজনীয় বস্তুর মতো সুন্দরেরও প্রয়োজন আছে। বোধ হয় সুন্দর যে কোনও বস্তুর থেকে বেশি প্রয়োজনীয়।

প্রতিদিন বাগানে দু'-এক ঘণ্টা করে কাটাতেন বিশপ। ফুলগাছগুলোর যত্ন করতেন। কখনো তিনি গাছের গোড়া থেকে আগাছা উপড়ে ফেলতেন, কখনো মাটি খোঁচাতেন, কখনো বা নতুন গাছ বসাতেন। কিন্তু মালীর দক্ষতা তাঁর ছিল না। গাছগুলোর কিভাবে ক্ষতি বা বৃদ্ধি হয় সে জ্ঞানও তাঁর ছিল না। উদ্ভিদবিদ্যায় কোনও আগ্রহ ছিল না তাঁর। যে সব পোকামাকড় গাছের চারাগুলোর ক্ষতি করে সেগুলোকে ওষুধ দিয়ে মারার কোনও ব্যবস্থা করতেন না তিনি। তাঁর একমাত্র আগ্রহ ছিল ফুলের প্রতি। তিনি ফুল ভালবাসতেন। পণ্ডিত লোকদের শ্রদ্ধা করতেন তিনি। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি নিজের হাতে জলপাত্র হাতে বাগানের গাছগুলোতে জল দিতেন।

বাড়ির কোনও দরজায় তালাচাবি দেবার কোনও ব্যবস্থা করেননি বিশপ। বাপতিস্তিনে ও ম্যাগলোরি বিশপকে অনেক করে তাঁর শোবার ঘরের দরজায় খিল দিতে বলেন রাত্রিতে। কিন্তু বিশপ তা শোনেননি। তাঁর দেখাদেখি তারাও আর খিল দিত না। ম্যাগলোরি অবশ্য মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করত এ ব্যাপারে।

মিরিয়েল এ ব্যাপারে তাঁর নীতির কথাটি একদিন বাইবেলের একটি পাতার উপর লিখে রাখেন, 'ডাক্তারের সঙ্গে যাজকের এখানেই তফাৎ। ডাক্তারের বাড়ির দরজা কখনো বন্ধ করা চলবে না। যাজকের বাড়িও সব সময় খোলা রাখতে হবে।' 'এ ফিলজফি অফ মেডিক্যাল সায়েন্স' নামে একখানি বই-এর উপর একদিন তাঁর একটা লেখা পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল, আমিও কি একজন ডাক্তার নই? আমারও রোগী আছে। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা হতভাগ্য, যারা দীন-দুঃখী তারাও তো মনের দিক থেকে রুগ্ন এবং সেই রোগ প্রতিকারের জন্যই তারা আসে আমার কাছে।

আর একটি বইয়ে তিনি একবার লেখেন, রাত্রিকালে যদি কোনও লোক বাড়িতে আশ্রয় চাইতে আসে তাহলে তার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করো না। যে ব্যক্তি দেখবে তার নাম-ধাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক তারই আশ্রয়ের বেশি দরকার।

একদিন এক যাজক বিশপের সঙ্গে দেখা করতে এসে ম্যাগলোরির অনুরোধে বিশপকে প্রশ্ন করেন, কেন আপনি সব সময় সব ঘরের দরজা খুলে রাখেন? তালা বা খিল কিছুই দেন না। এতে বিপদ ঘটতে পারে এক সময়।

বিশপ মিরিয়েল তখন যাজকের কাঁধের উপর একটি হাত রেখে একটি প্রার্থনাস্তোত্র থেকে একটি ছত্র উদ্ধৃত করে বলেন, ঈশ্বর যদি কোনও নগর রক্ষা করতে না চান তাহলে প্রহরীর দৃষ্টি যতই সজাগ হোক তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই থেকে তিনি বলেন, কোনও সেনাদলের কর্নেলের মতো একজন যাজকেরও সমান পরিমাণ সাহস আছে। তবে সে সাহস বড় শান্ত এবং নিরুচ্চার।

এই সময় একদিন আব একটি ঘটনা ঘটে যা বিশপেব চবিত্রেব উপব বেশ কিছুটা আলোকসম্পাত কবে। সুতবাং ঘটনাটিব উল্লেখ না কবে পাবা যাবে না।

এক সময় গাসপার্দ বে'ন মতো ভযঙ্কব দস্যুদল অলিউনেব পার্বত্য অঞ্চলেব আশপাশেব গাঁগুলো লুটপাট কবে তাণ্ডব চালাতে থাকে। ক্রাভাত্তে নামে এই দস্যুদলেব এক নেতা পুলিশেব ভযে পাহাডে গিযে লুকিযে থাকে। যে সব দস্যু বেচে ছিল এবং যাবা ধবা পডেনি তাদেব নিযে প্রথমে সে বিলেতে ও পবে পিদমতে কিছুদিন লুকিযে থাকাব পবে প্যাবিসেব বার্মিলোনেত্তে অঞ্চলে এসে ওঠে।

ক্রাভাত্তেব সাঙ্গপাঙ্গদেব প্রথমে জাঞ্জিযাবে ও পবে তুলেতে দেখা যায। পবে তাবা জুং দেল এগলে পাহাডেব গুহায পালিযে গিযে লুকিযে থাকে। বাত্রিকালে গুহাব আশ্রয থেকে বেবিযে এসে তাবা পার্শ্ববর্তী গাঁগুলোব উপব ঝাঁপিযে পডে যা পাবত লুটপাট কবে পালাত।

কোনও এক বাতে ক্রাভাত্তে তাব দলবল নিযে এমব্রাসেব একটি বড গীর্জায ঢুকে ধর্মীয জিনসপত্র সব চুবি কবে নিযে যায। তাব অত্যাচাবে গ্রামবাসীবা সন্ত্রস্ত হযে ওঠে। পুলিশ তাদেব অনুসবণ কবে ধবাব অনেক চেষ্টা কবে কিন্তু সব বাবেই তাবা পাহাডে জঙ্গলে পালিযে যায। কখনো কখনো আবাব পুলিশেব সঙ্গে লডাই কবে পালিযে যায। সত্যিই ক্রাভাত্তে ছিল এক দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্ত।

এইভাবে যখন এই অঞ্চলে এক সন্ত্রাসেব বাজত্ব চলছিল তখন সেখানে একদিন পবিদর্শনেব কাজে এসে পডেন বিশপ মিবিযেল। আসাব পথে চাস্তেলাব নামে এক জাযগায সেখানকাব মেযবেব সঙ্গে তাব দেখা হয। মেযব যিবে যেতে বলেন বিশপকে। লার্কে পর্যন্ত সমস্ত পার্বত্য এলাকাটা তখন একবকম ক্রাভাত্তেব দখলে। তাব ওপাবেও তাব আধিপত্য বিস্তৃত। সঙ্গে বক্ষী নিযেও ওদিকে যাওযা যাবে না। ওদিকে যাওযা খুবই বিপজ্জনক. শুধু শুধু তিন চাবজন বক্ষীব প্রাণ যাবে

তা শুনে বিশপ বললেন. সত্যিই তাই ? আমি বক্ষী সঙ্গে না নিযেই যাব।

মেযব আবাব বললেন. মঁসিযে. ওখানে যাবাব কথা মনেও ভাববেন না।

বিশপ মিবিযেল বললেন. আমি এই কথাই ভাবছি যে ওখানে আমি কোনও বক্ষী ছাডাই যাব এবং ঘণ্টাখানেকেব মধ্যেই আমি বওনা হব।

একা যাবেন ?

হ্যাঁ একা।

না মঁসিযে. যাবেন না।

বিশপ তখন বললেন. ঐ পাহাড অঞ্চলে আদিবাসীদেব একটি গাঁ আছে। আমি সেখানে তিন বছব যাইনি। ঐ সব আদিবাসীবা আমাব বন্ধু। ওবা বড শান্তিপ্রিয। উপত্যকায ছাগল চবায আব বাঁশি বাজায। মাঝে মাঝে ঈশ্বব সম্বন্ধে তাদেব সঙ্গে কথা বলাব জন্য একজন লোকেব দবকাব। একজন বিশপ যদি দস্যুব ভযে ভীত সন্ত্রস্ত হযে তাদেব কাছে না যায তাহলে কি ভাববে তাবা ? আমি যদি না যাই তাহলে আমাব সম্বন্ধেই বা কি ভাববে ?

মেয়র বললেন, কিন্তু মঁসিয়ে, আপনি যদি দস্যুদের কবলে পড়েন ?

বিশপ বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই পড়তে পারি। আপনি যখন বললেন তখন আমি অবশ্যই দেখা করব তাদের সঙ্গে। ঈশ্বরের কথা তাদের বলার জন্য তাদেরও নিশ্চয় একজন লোকের দরকার।

কিন্তু তারা তো একদল নেকড়ের মতো।

আর সেইজন্যই হয়ত যীশু আমাকে তাদের রাখাল হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। ঈশ্বরের বিধানের কথা কে বুঝতে পারে ?

তারা আপনার সব কিছু অপহরণ করবে।

আমার কিছুই নেই।

ওরা আপনাকে হত্যা করতে পারে।

মন্ত্র উচ্চারণরত একজন বৃদ্ধ যাঁজককে কেন তারা মারবে ?

আপনি যদি তাদের সঙ্গে দেখা করেন ঈশ্বর যেন আপনার মঙ্গল করেন।

আমি আমার গরীবদের জন্য তাদের কাছে ভিক্ষা চাইব।

মঁসিয়ে, আমার অনুরোধ, যাবেন না। শুধু শুধু আপনার জীবন বিপন্ন করবেন না।

বিশপ তার উত্তরে বললেন, আপনার সব কিছু বলা শেষ হয়েছে মঁসিয়ে মেয়র ? আমার জীবন রক্ষার জন্য আমাকে কিন্তু এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি। আমাকে পাঠানো হয়েছে মানুষের আত্মাকে রক্ষা করার জন্য।

সুতরাং কারো কোনও নিষেধ বা অনুরোধ বাধা দিতে পারল না বিশপকে। তিনি চলে গেলেন। বিশপের এই অনমনীয় জেদের কথাটা ক্রমে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। সকলে তাঁর কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেল।

তাঁর বোন ও ম্যাগলোরিকে সঙ্গে নিলেন না বিশপ। শুধু পথ দেখাবার জন্য একটি স্থানীয় ছেলেকে সঙ্গে নিলেন। তাঁরা টাট্টু ঘোড়ায় চেপে গেলেন। পথে কারো সঙ্গে দেখা হলো না। নিরাপদেই তাঁরা সে পার্বত্য আদিবাসীদের গাঁয়ে পৌঁছলেন। সেখানে পুরো একপক্ষকাল রয়ে গেলেন বিশপ। তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করলেন, ধর্মে দীক্ষা দিলেন, অনেক নীতি শিক্ষা দিলেন।

অবশেষে গাঁ ছেড়ে আসার আগে একদিন প্রার্থনাসভার শেষে 'তে দিউম' বা 'হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি' নামে এক স্তোত্রগানের অনুষ্ঠান করতে বললেন স্থানীয় যাজককে। কিন্তু এই অনুষ্ঠান করতে গিয়ে একটা সমস্যা দেখা গেল। সেই গ্রাম্য গীর্জায় এই অনুষ্ঠানের উপযুক্ত ধর্মীয় পোশাক পাওয়া গেল না।

বিশপ তবু বললেন, যাই হোক, তোমরা ঘোষণা করে দাও নীতি উপদেশ দানের পরই 'তে দিউম' অনুষ্ঠিত হবে। কিছু না কিছু একটা উপায় হবেই।

আশপাশের গীর্জাগুলোতে পোশাকের জন্য লোক পাঠানো হলো। বিভিন্ন গীর্জা ঘুরে যা কিছু পাওয়া গেল তাতে দেখা গেল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে না।

এমন সময় কোথা থেকে হঠাৎ দু'জন অশ্বারোহী এসে একটা বড় সিন্দুক বিশপের

কাছে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। সিন্দুকটা নামিয়ে দিয়েই অশ্বারোহী দু'জন চলে গেল। সেটা খুলে দেখা গেল কিছুদিন আগে এমব্রাসের গীর্জা থেকে যে সব মূল্যবান সোনা ও হীরের জরি বসানো ধর্মীয় পোশাক চুরি গিয়েছিল সেই সব পোশাক সিন্দুকটাতে গুছিয়ে রাখা আছে। তার সঙ্গে একটা কাগজে লেখা ছিল, ক্রাভেত্তে এগুলো মসিয়ে বিয়েনভেনুর হাতে তুলে দিল।

বিশপ বললেন, দেখলে তো ? আমি আগেও বলেছিলাম কিছু একটা উপায় হবে যে সামান্য কুরে বা গ্রাম্য যাজকের পোশাকে সন্তুষ্ট থাকে ঈশ্বর তাকে একদিন আর্কবিশপের পোশাক দান করেন।

গ্রাম্য যাজক বলল, কিন্তু যে লোকটি এ পোশাক দিয়ে গেল সে ঈশ্বর না শয়তান ?

বিশপ তার পানে কড়াভাবে তাকিয়ে বললেন, ঈশ্বর

বিশপ চাস্তেলারে ফিরে দেখলেন তাকে দেখার জন্য পথের দু'পাশে শহরের সব লোক সার দিয়ে দাড়িয়ে আছে। শহরের গীর্জায় তার জন্য বাপতিস্তিনে আর ম্যাগলোর অপেক্ষা করছিল। বিশপ তাদের বললেন, আমি ঠিক বলিনি ? একজন গরীব যাজক গরীব পার্বত্য উপজাতিদের কাছে গিয়েছিল শুধু হাতে, ফিরে এল হাত ভর্তি করে। আমি গিয়েছিলাম একমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাসকে সম্বল করে কিন্তু ফিরে এসেছি একটি গীর্জার হারানো ধনসম্পদ নিয়ে।

সে রাতে বিছানায় শুতে যাবার আগে বিশপ বললেন, দস্যু ও নরঘাতকদের কখনই আমাদের ভয় করা উচিত নয়। এরা যে সব বিপদের সৃষ্টি করে তা বাইরের ব্যাপার, সে বিপদ তুচ্ছ। আমরা নিজেরাই হচ্ছি নিজেদের ভয়ের বস্তু কুসংস্কার হচ্ছে প্রকৃত দস্যু আর হিংসা হচ্ছে প্রকৃত খুনী। আমাদের দেহের উপর আঘাত হানার বা অর্থহানি ঘটাবার কেউ যদি ভয় দেখায় তাহলে কেন আমরা ভয় পাব না বিব্রত বোধ করব ? আসলে আমাদের আত্মার নিরাপত্তা সম্পর্কে, দেখতে হবে আমাদের আত্মাকে কেউ যেন ভয় না দেখায় বা তার কোনও বিঘ্ন না ঘটে।

এবার বিশপ তার বোনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, একজন যাজক কখনো আর পাঁচজনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কথা ভাববে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কোনও কাজ হতে পারে না। ঈশ্বর মানুষকে যে কাজ করার অনুমতি দেন মানুষ সেই কাজই করতে পারে। আমরা শুধু বিপদে পড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। কিন্তু আমাদের নিজেদের জন্য কোনও কিছু প্রার্থনা করা উচিত নয়, আমরা প্রার্থনা করব যাতে আমাদের জন্য আমাদের ভাইরা যেন কোনও পাপকর্মে জড়িয়ে না পড়ে।

এই ধরনের ঘটনা অবশ্য খুব একটা বেশি ঘটত না। আমরা শুধু যে সব ঘটনার কথা জানি সেই সব ঘটনার কথা বলতাম। তবে এই ধরনের কাজ জীবনে অনেক করে যেতেন মিরিয়েল।

এমব্রাস গীর্জার হারানো ধনগুলি নিয়ে বিশপ কি করেছিলেন সেকথা আমরা ঠিক জানি না। সেগুলি সত্যিই বড় মূল্যবান বস্তু, বড় লোভনীয়। গরীবদের মঙ্গলের

জন্য সেগুলি সত্যিই খুব উপযুক্ত, সেগুলি আগেই অপহৃত হয়েছিল। এবার সেই অপহৃত দ্রব্যগুলি অন্য পথে পরিচালিত করে সেগুলির একটা সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে! তবে আমরা কোনও মন্তব্য করতে চাই না এ বিষয়ে। এ বিষয়ে আমরা বিশপের একছত্র লেখা পেয়েছিলাম এক জায়গায়। তিনি লিখেছিলেন, এবার আমাকে স্থির করতে হবে এগুলি আমি গীর্জাকে ফেরৎ দেব না হাসপাতালে নিয়ে যাব।

৮

যে সিনেটার ভদ্রলোকের নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি সে সিনেটার ছিল এমনই একজন লোক যে এক দৃঢ সংকল্পের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ করে যেত, যে তার স্বার্থপূরণের পথে বিবেক, ঈশ্বরবিশ্বাস, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি কোনও কিছুর দ্বিধা বা বাধা মানত না বা তার আপন লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হত না। এই সিনেটার আগে ছিল এক দক্ষ সরকারী অ্যাটর্নী যে তার ছেলে, জামাই ও আত্মীয়-বন্ধুদের স্বার্থটা সব সময় বেশি করে দেখত এবং তার লাভের পথে পাওয়া যে কোনও সুযোগ হাতছাড়া করত না। কারণ এ সুযোগ হাতছাড়া করাটাকে সে বোকামি এবং অবান্তর বলে ভাবত। সে ছিল বুদ্ধিমান এবং সুশিক্ষিত। সে নিজেকে দার্শনিক এপিকিউরাসের শিষ্য বলে ভাবত, যদিও পিগল্ট লেব্রানেব মতো নিচু স্তরের লেখকদের নীতিই সে বেশি মেনে চলত। সে চিরপ্রতিষ্ঠিত চিরন্তন সত্যের কথাগুলি হেসে উড়িয়ে দিত এবং আমাদের মহান বিশপের কাজকর্মকে বাতুলতা বলে তাঁর সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

একবার আধা-সরকারী অনুষ্ঠানে এই সিনেটার মঁসিয়ে মিরিয়েল আব পুলিশের এক বড়কর্তার সঙ্গে এক ভোজসভায় মিলিত হয়। খাওয়ার পর সে মদের ঘোরে বলতে থাকে, আসুন মঁসিয়ে, এবার কিছু কথা বলা যাক। একজন সিনেটার আর বিশপের মধ্যে নীতির দিক থেকে খুব একটা মিল হতে পারে না। আমরা দু'জনেই ঈশ্বরের অনুগৃহীত ব্যক্তি। তবে আমি স্বীকার করছি আমার এক নিজস্ব জীবনদর্শন আছে।

বিশপ বললেন, তা তো বটেই। কোনও মানুষের জীবনদর্শন হচ্ছে তার বিছানার মতো যার উপর সে শোয় প্রতিদিন। আপনার সে জীবনদর্শনের শয্যা হচ্ছে কুসুমশয্যা।

সিনেটার বলল, এখন কিন্তু আমরা সাধাবণ মানুষের মতো কথা বলব।

সাধারণ শয়তান বলতে পারেন।

আমি একথাও স্বীকার করি যে মার্কুই দ্য আর্গেনস, পাইরো, হবস, মঁসিয়ে নাইজিওন প্রভৃতি দার্শনিকদের ভণ্ড পাণ্ডিত্যাভিমানী বলে মনে করি না। তবে আমার বই-এর তাকে আরও অনেক দার্শনিকের বই আছে।

যাদের দর্শন আপনার নিজস্ব দর্শনের মতো।

সিনেটার বলল, আমি দিদেরোকে মোটেই পছন্দ করি না। তিনি হচ্ছেন ভাববাদী, বাগাড়ম্বরসর্বস্ব বাগ্মী, এমন একজন বিপ্লবী যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। তিনি

ভলতেযারের থেকে আরও গোঁড়া। ভলতেয়ার বলতেন নীডহ্যাম স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরের কল্পনা আর বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে স্বতস্ফূর্ততাব নীতি এই দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয়কে তলিযে ফেলেছেন। এই নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন নীডহ্যামকে নিয়ে। কিন্তু ভলতেয়ারের এটা অন্যায়। কারণ নীডহ্যাম যে পাঁকাল মাছের কথা বলেছেন তাতে এই কথাই প্রমাণ হয ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নেই সৃষ্টির ব্যাপারে। পাঁকাল মাছের মতো জগৎ ও জীবনের সৃষ্টির ব্যাপাবেও পরম পিতার কোনও প্রয়োজন থাকতে পাবে না। হে আমার প্রিয় বিশপ, এ বিষয়ে জেহোভা তত্ত্বও আমি বুঝতে পাবি না। এ তত্ত্ব থেকে শুধু শীর্ণ আর বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষের সৃষ্টি হযেছে। আমি মহান সর্বস্ব থেকে মহান শূন্যতা বেশি পছন্দ করি। স্বীকারোক্তি হিসাবে আমি আপনার কাছে সবলভাবে স্বীকার করছি, আমি একজন সবল সাদাসিধে মানুষ। আপনাদেব যীশুব প্রতি আমার কোনও ভালবাসা নেই। তিনি শুধু বৈরাগ্য আর আত্মত্যাগ প্রচাব করে গেছেন যা ভিক্ষুকদের প্রতি কৃপণের উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বৈবাগ্য এ ত্যাগ কিসের জন্য? একটি নেকড়ে কখনো অন্য নেকড়েব মঙ্গলের জন্য কিছু ত্যাগ করেছে একথা আমি কখনো শুনিনি। প্রকৃতিকে অনুসরণ কবা উচিত আমাদের। যেহেতু মানুষ হিসাবে আমরা সব জীবের ঊর্ধ্বে, আমাদেব এক উন্নততর জীবনদর্শন থাকা উচিত। আপনি মানুষ হয়ে যদি অন্য কোনও মানুষের নাকের ডগা ছাড়া আব কিছু দেখতে না পান তাহলে সব কিছু বিষযে মাতব্বরি কবে লাভ কি? যে জীবন আমরা পেয়েছি সে জীবন যতদূর পারি সুখে কাটানো উচিত। এ জীবনের পর স্বর্গ বা নরক বলে কিছু আছে একথা আমি পবিষ্কার অবিশ্বাস করি। আপনি শুধু ত্যাগ কবে বৈবাগ্যেব প্রয়োজনীযতাব কথা আমাকে বলবেন। আমাকে প্রতিটি কাজ চিন্তা ভাবনা করে করতে হবে, ন্যায অন্যায়, ভাল মন্দ নিযে আমাব মস্তিষ্ককে বিব্রত থাকতে হবে সব সময। কিন্তু কেন? কারণ পবে [illegible] বিচার হবে, সব কর্মাকর্মেব জন্য আমাকে জবাব দিতে হবে। কখন? না, আমার মৃত্যুব পরে। আমার মৃত্যুব পব আমাকে ধরার জন্য নিশ্চয় এক চতুর বিচারকের প্রযোজন হবে। কারণ তখন আমার প্রেতাত্মাব হাতে একমুঠো ধুলো ছাডা আব কিছুই থাকবে না। কী উদ্ভট কল্পনা! আমরা বাস্তব সত্যকে স্বীকার না কবে যাব' আইসিসেব আচলেব তলায় ভাঁকলুক মাবে তাদেব নিয়ে মাতামাতি করি। আসলে ভাল-মন্দ বলে কিছু নেই। এই নীতি। সব কিছু বাদ দিয়ে একমাত্র বাস্তব সত্যকে আমাদের খোঁজা উচিত। সব কিছু তলিয়ে দেখতে হবে, বস্তুর স্বরূপকে দেখতে হবে। তাই [illegible] সত্যকে ধবাব জন্য দবকার হলে পৃথিবীব তলদেশেব শেষ প্রান্তে যেতে হবে। [illegible] হযে গড়ে উঠে আনন্দ উপভোগ করাটাই গৌরবের। আমি যদি বালষ্টতাব সঙ্গে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারি এটাই যথেষ্ট। মানুষেব অমরত্ব একটা বিশ্বাস মাত্র, এক মধুর প্রতিশ্রুতির মিথ্যা সান্ত্বনা––আপনি ইচ্ছা কবলে তা বিশ্বাস করতে পারেন। আদম হতে পারাটা কত আনন্দের কথা অথবা কোনও বিদেহী আত্মা অথবা পিঠে নীল ডানাওয়ালা কোনও দেবদূত হবে মানুষ? তার্তুলিয়াঁ না কে যেন বলছিল না

ঈশ্বরের অনুগৃহীত বা আশীর্বাদধন্য মানুষ একদিন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করে বেড়াবে। আমরা হব আকাশের ফড়িং। আমরা ঈশ্বরকে দেখব। যত সব বাজে কথা। ঈশ্বর হচ্ছে এক অদ্ভুত ধরনের ভণ্ড প্রতারক। একথা আমি অবশ্য লিখব না, একথা আমি শুধু মদ্যপানের সময় আমার বন্ধুদের কাছে চুপি চুপি বলব। স্বর্গের লোভে এ জগতের সব কিছু ত্যাগ করা হলো বস্তুকে ফেলে ছায়াকে ধরতে যাওযার মতোই এক বাতুলতামাত্র। অনন্তের হাতের পুতুল হওয়া আমার ধাতে সইবে না, আমার দ্বারা তা হবে না। আমি কে? কিছুই না। আমি একজন সিনেটার। কিন্তু জন্মের আগে কি আমার কোনও অস্তিত্ব ছিল? না। মৃত্যুর পর কি আমাব কোনও অস্তিত্ব থাকবে? না। আমি শুধু একমুঠো মাটির দ্বারা গঠিত এক বস্তু। আমি পৃথিবীতে কি করব? আমাকে সেটা ঠিক করে নিতে হবে।

আমি দুঃখ ভোগ করতে পারি অথবা আনন্দ উপভোগ করতে পারি। আমাকে সেটা বেছে নিতে হবে। এই দুঃখভোগের শেষ পরিণতি কি? এর পরিণতি হচ্ছে বিস্মৃতি। তবু আমাকে দুঃখভোগ করে যেতেই হবে। আনন্দ উপভোগেরই বা পরিণতি কোথায়? বিস্মৃতিতে। তবু আমি আনন্দ উপভোগ করেই যাব। আমি এটা স্থির করে ফেলেছি, এটা আমি বেছে নিয়েছি। মানুষ হয় খাবে, অথবা কাবো দ্বারা খাদিত হবে। আমি খেয়েই যাব। ঘাসের থেকে দাঁত থাকা ভাল। আপনি যা কিছুই করুন না কেন, পরিণামে মৃত্যু আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছে। আমাদেব মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুর পর তাদের উজ্জ্বল কীর্তির সমাধিস্তম্ভ লাভ করবে, কিন্তু সবাইকেই নবকে যেতে হবে। মৃত্যুতেই সবার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। এক সম্পূর্ণ সর্বভূতে বিলুপ্ত, সবাই অদৃশ্য হয়ে যাবে। আমার মৃত্যুর পর কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে এবং আমাকে কিছু বলবে এই কথা শুনলে আমার হাসি পায়। এটা বুড়ীদের এক অবাস্তর অর্থহীন রূপকথা। শিশুদের জন্য আছে শয়তান আর বযস্ক লোকদেব জন্য আছে জেহোভা। না, আমাদের মৃত্যুর পর সব কিছুই অন্ধকাব। আপনি সাধু বা শয়তান। সার্দানাপেলাম বা ভিনসেন্ট পল যাই হোন না কেন, সমাধিব ওপারে সকলের জন্যই বিরাজ করছে নরকের অন্ধকার। এইটাই হলো সত্য কথা। মানবজীবনের একমাত্র কাজ হলো বাঁচার মতো বাঁচা। যতদূর সম্ভব জীবনেব সদ্ব্যবহার করুন। আমার এক নিজস্ব জীবনদর্শন আছে, আমার বাছাই করা একজন দার্শনিকও আছে। তবে আমি যতসব আজগুবি কথা বিশ্বাস করে বোকা বানাতে চাই না নিজেকে। তবে আমি একথা বলতে চাই না যে এ বিশ্বাসের কারো কোনও প্রযোজন নেই একেবারে। যারা নিঃস্ব, দরিদ্র, যারা পেট ভরে খেতে পায না, যাদের কোনও ঘরবাড়ি নেই, যারা অধঃপতিত বা নিচে নেমে গেছে, তাদের বাঁচার জন্য একটা বিশ্বাস চাই। আমরা তাদের পুরাণ ও গল্পকথা শোনাই,——আত্মা, অমরত্ব, স্বর্গ, ভাগ্য এই সব কিছুর কথা বলে সান্ত্বনা দিই এবং তারা এই সব কথাগুলো গোগ্রাসে গিলে খায়। তারা মাখনের পরিবর্তে এই সব কথার অমৃত তাদের শুকনো রুটিগুলোতে মাখিযে নেয়। যাদের কিছুই নেই, একেবারে নিঃস্ব, তাদের ঈশ্বব আছে। কিছু না

থাকার থেকে এটা ভাল এবং আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি চাই বস্তুবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকতে। ঈশ্বর থাক সাধারণ মানুষদেব জন্য।

বিশপ হাততালি দিয়ে উঠলেন।

তিনি আবেগের সঙ্গে বললেন, চমৎকার কথা। এ ধরনের বস্তুবাদ কি চমৎকার জিনিস! সকলেই এ বস্তুবাদ লাভ করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তা লাভ করে সে তো আর নিজেকে বোকা বানাতে পারে না। সে তো আর কেটোর মতো নির্বাসিত করতে পারে না নিজেকে। স্টিফেনের মতো পাথরের আঘাত খেয়ে মরতে পারে না অথবা জোযান অফ আর্কের মতো জীবন্ত দগ্ধ হতে পারে না। একজন দায়িত্বহীন মানুষের সব আনন্দ সে লাভ করতে পারে, সে তার সহজ অতিসরল মন নিয়ে সারা পৃথিবীটাকে পরিক্রমা করতে পারে—এই ধরনের একটা আত্মপ্রসাদও সে অনুভব করতে পারে -অনেক সম্মান ও শক্তি সে লাভ করতে পারে, লাভজনক নাস্তিকতা, বিশ্বাসঘাতকতা, বিবেকের সঙ্গে সুবিধাজনক আপোস এই সব কিছুকেই সে প্রশ্রয় দিতে পারে এই সব কিছুই উদরস্থ করে সে তার সমাধিতে যেতে পারে। কত আনন্দেব কথা! আমি আপনাকে তিরস্কার করছি না মঁসিয়ে সিনেটার। আমি আপনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। আপনি বলেছেন, আপনারা যারা সমাজের উপরতলার মানুষ তাদেব এক নিজস্ব জীবনদর্শন আছে। যে দর্শন সূক্ষ্ম, মার্জিত, যে দর্শন শুধু ধনীদের ক্ষেত্রেই থাকে, সব অবস্থাতেই যা খাপ খায় সে দর্শন জীবনের যত কিছু আনন্দলাভের পক্ষে নিঃসন্দেহে এক চমৎকার হাতিয়ার। যারা এ বিষযে সিদ্ধ তাদের অন্তরের গভীর হতে এ দর্শন উৎসারিত। কিন্তু আপনি সহৃদয় ব্যক্তি, যে সব সাধারণ মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের প্রতি আপনার কোনও ঈর্ষা বা ক্ষোভ নেই।

৯

দিগনের বিশপ কিভাবে তাঁর পারিবারিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন এবং তাঁর বাড়ির দু'জন মহিলা তাদের কর্ম, চিন্তা, প্রবৃত্তি ও জীবনের উদ্দেশ্যকে বিশপের কর্ম ও চিন্তার অনুগত করেছিল তা লিখে প্রকাশ না করে তার সারা জীবনের বান্ধবী ভিকোঁতেসী দ্য বযশেভ্রনকে লেখা একখানি চিঠি উদ্ধৃত করব।

দিগনে, ১৬ই ডিসেম্বর

প্রিয় মাদাম,

তোমার কথা না বলে আমাদের একটা দিনও কাটে না। এটা যেন আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে তোমাকে চিঠি লেখার আর একটা কারণ আছে। এখানে আসার পর আমাদের ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে ম্যাদময়জেল ম্যাগলোর দেওয়ালে একটা জিনিস দেখতে পায়। কাগজের তলায় কিছু দেওয়ালচিত্র দেখতে পাই আমরা। একটি চিত্রে দেখা যায় টলেমা মিনার্ভার কাছ থেকে নাইট উপাধি গ্রহণ করছেন। তাতে সন তারিখ সব লেখা আছে। আর একটি চিত্র টলেমার

বাগানবাড়ির, যে বাগানে একটি রাত রোমের মহিলারা কাটান। ম্যাগলোরি ঘরটা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছে এবং সেটা এখন যাদুঘরের মতো দেখাচ্ছে। ছবিগুলো রং করতে ছয় ফ্রাঁ খরচ হবে। কিন্তু টাকাটা গরীব-দুঃখীদের দান করাই ভাল। তার থেকে আমার ঘরের জন্য একটা গোল মেহগনি কাঠের টেবিল কিনব।

আমি সুখেই আছি। আমার দাদা খুব ভাল লোক। তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব আর্ত ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের দান করেন। আমাদের সংসারে কখনই সচ্ছলতা থাকে না। এ অঞ্চলে শীত খুব বেশি এবং এ অঞ্চলের অভাবগ্রস্ত শীতার্ত ব্যক্তিদের শীত নিবারণের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হয়। যাই হোক, কোনওরকমে আমরা নিজেদের গর " রাখার ব্যবস্থা করি এবং অন্ধকারে আলো জ্বালি না, এটাই আমাদের বড যন্ত্রণার কথা।

আমার দাদার কিছু দোষও আছে। কিন্তু উনি বলেন এ দোষ বিশপের থাকা উচিত। তুমি হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে না, আমাদের ঘরে কখনো তালাচাবি দেওয়া হয় না। যে কোনও লোক ইচ্ছা করলেই আমার দাদার ঘরে সোজা ঢুকে পড়তে পারে। তিনি কোনও কিছুই ভয় করেন না, রাত্রিতেও ভয় করেন না। তিনি বলেন, এটা তাঁর এক ধরনের সাহস।

তিনি আমাকে বা ম্যাগলোরিকে তাঁর সম্বন্ধে কোনও কথা ভাবতে দেন না। তিনি যত সব বিপদের ঝুঁকি নেবেন, অথচ আমাদের তা নির্বাক দর্শকের মতো দেখে যেতে হবে। তাঁকে বুঝতে, শিখতে হবে। তিনি বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যান, কাদার উপর দিয়ে যাতায়াত করেন, দারুণ শীতকেও গ্রাহ্য করেন না। তিনি অন্ধকার, দুর্গম পথ বা পথের বিপদ-আপদ—কোনও কিছুই ভয় করেন না।

গত বছর তিনি এমন এক অঞ্চলে একা যান যে অঞ্চলটা ভয়ঙ্কর দস্যুদের দ্বারা অধ্যুষিত। আমাদের কাউকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন না। তিনি সেখানে একপক্ষকাল ছিলেন। আমরা ভেবেছিলাম তিনি মারা গেছেন দস্যুদের হাতে। কিন্তু তিনি অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসে বললেন, 'আমি তোমাদের দেখাব আমি কিভাবে অপহৃত হয়েছি।' এই বলে তিনি একটি বাক্স খুলে সেই সব ধনরত্ন বার করলেন যা কিছুদিন আগে এমব্রাস গীর্জা থেকে চুরি যায় এবং সেগুলি ডাকাতরা তাকে ফিরিয়ে দেয়। তিনি যখন সেখান থেকে ফিরে আসেন আমি তখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। তাকে কিছুটা তিরস্কারও করেছিলাম [illegible] তিরস্কারের কথাগুলো বলেছিলাম যাতে কেউ তা শুনতে না পায়।

ক্রমে আমি ভাবতে থাকি, কোনও বিপদ তাঁকে কোনও কাজে বাধা দিতে পারবে না, তিনি নির্ভীক, দুর্জয়। এইভাবে তাঁর জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত ও অভ্যস্ত হয়ে উঠি আমি। ম্যাগলোরি যাতে তাঁকে বিরক্ত না করে তার জন্য নিষেধ করি আমি। তিনি ইচ্ছামতো যত সব বিপদের ঝুঁকি নেন। আমি রোজ রাতে ম্যাগলোরিকে তার ঘরে শুতে পাঠিয়ে আমি আমার ঘরে তাঁর জন্য প্রার্থনা করি, তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি। ভাবি, তাঁর যদি কোনও বিপদ ঘটে তাহলে আমাদেরও তাঁর সঙ্গে

মবতে হবে। তাহলে আমাব ভাই এবং বিশপেব সঙ্গে আমাদেবও মৃত্যুপুবীতে যেতে হবে। তাঁব এই হটকাবিতা আমাব থেকে ম্যাগলোবিব পক্ষে সহ্য কবা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন সে অনেকটা অভ্যস্ত হযে গেছে এবং শোবাব আগে সেও আমাব সঙ্গে প্রার্থনা কবে। শযতান যদি তাব ঘবে ঢোকে কেউ তাকে বাধা দিতে পাববে না। কিন্তু আমাদেব বাড়তে কোনও কিছু হাবাবাবই বা কি আছে ? আমাদেব সঙ্গে এমন একজন সব সময আছেন যিনি সবাব থেকে শক্তিমান। শযতান আমাদেব বাড়িতে আসতে পাবে, কিন্তু সেই সর্বশক্তিমান আমাদেব বাড়িতে বাস কবেন।

এই হলো তাব কথা। আমাব দাদা আমাকে আব কোনও কথা বলেন না। তিনি কিছু না বললেও তাঁব সব কথা আমি বুদ্ধি এবং ঈশ্ববেব বিধানে আস্থা বাখি। এক মহান আত্মাব সঙ্গে এইভাবে আমবা বাস কবি।

ফক্স পবিবাবেব যে সব কথা তুমি জানতে চেযেছ সে সব কথা তাকে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম আমি। তুমি জান তিনি এই ব্যাপাবে সব কিছুই জানেন এবং সব কিছুই তাব মনে আছে। তিনি এখনো মনে প্রাণে বাজতন্ত্রবাদীই বযে গেছেন। ফক্স পবিবাব কেন অঞ্চলেব এক প্রাচীন নর্ম্যান পবিবাব। ঐ পবিবাবেব বাল দ্য ফক্স, জা দ্য ফক্স, টমাস দা ফক্সেব পাঁচশো বছবেব পুবনো অনেক নথিপত্র আছে। এবা সবাই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। এই পবিবাবেব সেনাব দ্য বশেফোর্ট নামে এক ভদ্রলোক বডদবেব একজন সামন্ত ছিলেন। এই পবিবাবেব শেষ বংশধব লী এতিযেন আলেকজান্দাব সামবিক বিভাগেব একজন কর্নেল ছিলেন এবং তিনি ব্রেতোব ছোটখাটো এক অশ্বাবোহী দলেব সেনাপতিত্ব কবেন। তাব কন্যা মেব লুই যবাসী বাহিনীব এক বড সামবিক অফিসাব, দাক লুই দ্য গ্রেদ্রতেব পুত্র আমিযে শার্লসকে বিবাহ কবেন। এই পবিবাবেব নাম ফক্স বা ফক।

আশা কাব মাদাম, তুমি তোমাব সাধুপ্রকৃতিব আত্মীয কার্ডিনালকে আমাদেব কথা বলবে। তোমাব প্রিয সিলভান তোমাব কাছে সব সময থাকে এবং তোমাকে চিঠি লিখতে দেয না। কিন্তু সে ভাল আছে জেনে সুখী হলাম। সে আমাকে আজও ভালবাসে জেনে খুশি হলাম। আমাব শবীব ভালই আছে, তবে দিন দিন চেহাবাটা বোগা হযে যাচ্ছে। আমাব কাগজ ফুবিযে আসছে। প্রীতি নিও। ইতি।

বাপতিস্তিনে।

তোমাব বৌদি এখন এখানেই আছেন তাঁব ছোট সংসাব নিযে। তোমাব ভাইপোব ছেলেটি বেশ সুন্দব। সে পাচ বছবে পড়েছে। সে তাব ছোট ভাইকে নিযে খেলা কবে বেড়াচ্ছে।

এই চিঠিটি থেকে বোঝা যাবে এই দু'জন মহিলা তাদেব সহজ নাবীসুলভ বুদ্ধিব দ্বাবা একজন মানুষকে ভালভাবেই চিনতে পেবেছিল এবং বিশপেব জীবনযাত্রাব সঙ্গে খাপ খাইযে নিযেছিল। বিশপ ইচ্ছামতো তাব কাজ কবে যাচ্ছিলেন। অনেক সময তিনি অনেক দুঃসাহসিক কাজ বিপদেব ঝুঁকি নিযে কবতেন। তা দেখে তাব বোন শিউবে উঠত ভযে। ম্যাগলোবি প্রতিবাদ কবতে যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেবে

উঠত না। কোনও কিছুই তাঁকে তাঁর কর্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। তারা বুঝতে পারত তারা বিশপের ছায়া মাত্র; বিশপের কোনও কাজের ব্যাপারে বাধা দেওয়ার মতো কোনও ক্ষমতাই তাদের নেই। তারা শুধু সময়মতো চেষ্টা করে যেত। ক্রমে বিশপের ব্যাপারটা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেয়।

বাপতিস্তিনে জানত এবং মুখে বলত তার দাদার মৃত্যু মানেই তাদের মৃত্যু। ম্যাগলোরি মুখে একথা না বললেও মনে মনে তা জানত।

১০

বাপতিস্তিনে তার বান্ধবীকে চিঠিটা লেখার পর অল্প দিনের মধ্যেই এমন একটি দুঃসাহসিক কাজ করেন বিশপ যা দস্যু-অধ্যুষিত সেই পার্বত্য এলাকায় যাওয়ার থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক। দিগনের অনতিদূরে একজন লোক নিভৃতে আত্মগোপন করে ছিল। লোকটি বিপ্লবী কনভেনশনের একজন ভূতপূর্ব সদস্য ছিল।

দিগনের সমস্ত লোক লোকটার নাম শুনলেই ভয়ে শিউরে উঠত। লোকটা যেন এক রাক্ষস। কনভেনশনের সদস্য যেন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যদিও সে রাজার মৃত্যুর স্বপক্ষে ভোট দান করেনি তথাপি নীতিগতভাবে সে তাই চেয়েছিল। তাই রাজহত্যায় তার হাত ছিল বলে একটা কুখ্যাতি ছিল তার। তা যদি হয় তাহলে বৈধ রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তার বিচার হলো না কেন? তারা তার মাথা কাটতে পারত, আবার সে জীবন ভিক্ষা চাইলে তাকে মার্জনা করা হত। আবার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তাকে নির্বাসিত করাও হত। আর সব বিপ্লবীদের মতো সে আবার নাস্তিক ছিল। তাই শকুনির চারদিকে ভিড় করা সন্ত্রস্ত বাজহাঁসের দলের মতো শহরের লোকরা ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে দেখত তাকে।

কিন্তু লোকটা কি সত্যিই একটা ভয়ঙ্কর শকুনি ছিল? সে তো নির্জনে নিভৃতে এক জায়গায় বাস করত।

রাজার মৃত্যুর ব্যাপারে সে ভোট না দেওয়ায় নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিতদের তালিকায় তার নাম ছিল না। তাই সে ফ্রান্সে থাকতে পেরেছিল। শহর থেকে কিছু দূরে এমন একটা নির্জন উপত্যকায় বাস করত যেখানে যাবার কোনও রাস্তাঘাট ছিল না। লোকে বলত সে নাকি একটুকরো জমি চাষ করত এবং নিজের থাকার জন্য আদিম কালের মতো একটা কুঁড়ে তৈরি করে ছিল যেটাকে একটা পশুর গুহা বলা যেতে পারে। কেউ তার কাছে যেত না। লোকে বলত সেটা ঘাতকের ঘর। সেই উপত্যকায় যাবার যে একটা পথ ছিল লোকটা সেখানে বাস করতে যাবার পর থেকে কেউ সেখানে যাতায়াত না করায় পথটায় বন গজিয়ে ওঠে।

একমাত্র বিশপ সেই উপত্যকা দিয়ে যেতে যেতে তার শেষ প্রান্তে গাছপালাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে ভাবতেন, ওখানে এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তি বাস করে। তারপরই মনে ভাবতেন, তার কাছে একবার আমার যাওয়া উচিত।

তবে কথাটা প্রথমে স্বাভাবিক এবং সরল মনে হলেও কিছুটা ভাবনা-চিন্তা করার

পর সেটা অদ্ভুত আর অসম্ভব মনে হলো তাঁর। কিছুটা বিতৃষ্ণা জাগল তাঁর মনে। কারণ সাধারণ লোকে যা ভাবত তা তিনিও ভাবতেন। একজন ভূতপূর্ব নাস্তিক বিপ্লবী তাঁর মনে স্বাভাবিকভাবেই যে বিতৃষ্ণা জাগায় তা ক্রমে ঘৃণায় পরিণত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এটাও ভাবতেন যে রাখাল কি কখনো ভেড়াকে ভয় বা ঘৃণা করে সরে যায় তার থেকে? কখনই না। কিন্তু এ ভেড়াটা তো শয়তান। বিশপ একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েন। তিনি কয়েকবার লোকটার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে আসেন।

একদিন শহরে একটা কথা শোনা গেল। যে একটা গ্রাম্য ছেলে লোকটার কাছে কাজ করত, সে হঠাৎ শহরে ডাক্তারের খোঁজে আসে। লোকটার নাকি খুব অসুখ। জানা গেল তার শরীরের একটা অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। শহরের লোকরা বলাবলি করতে লাগল, বুড়ো রাক্ষসটা মরতে বসেছে, কেউ কেউ আবার বলতে লাগল, ভালই হয়েছে।

সেদিন বিকালের দিকে তাঁর ছেঁড়া আলখাল্লাটা ঢাকার জন্য একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়লেন বিশপ।

তিনি যখন পশুর গুহার মতো বুড়ো লোকটার কুঁড়েতে পৌঁছলেন তখন দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। একটা খাল পার হয়ে একটা ঝোপের পাশ দিয়ে একটা ছোটখাটো বাগানের বেড়া ঠেলে এগিয়ে গিয়ে কুড়েটা দেখতে পেলেন বিশপ। একটু দূর থেকে দেখতে পেলেন তিনি, বৃদ্ধ পাকা চুলওয়ালা লোকটি সেই কুঁড়ের দরজার কাছে একটা সাদাসিধে ঈজি চেয়ারের উপর বসে সূর্যাস্ত দেখছে আর যে ছেলেটা তার ফাইফরমাশ খাটত সেই ছেলেটা তার হাতে এক বাটি দুধ দিচ্ছে।

দুধটা খেয়ে লোকটা ছেলেটার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলল, ধন্যবাদ! এখন এটাই আমি চাইছিলাম।

বিশপের পায়ের শব্দ পেয়ে সেদিকে তাকাল লোকটা। দীর্ঘকাল পর একজন মানুষকে তার কাছে আসতে দেখায় সীমাহীন বিস্ময়ের এক অনুভূতি তার চোখেমুখে ফুটে উঠল।

লোকটা বিশপকে বলল, আমি এখানে আসার পর থেকে একমাত্র আপনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমার কাছে এলেন। আপনি কে মঁসিয়ে?

বিশপ উত্তর করলেন, আমার নাম বিয়েনভেনু মিরিয়েল।

বিয়েনভেনু মিরিয়েল! এ নাম আমি তো কখনো শুনিনি। তবে লোকে যাকে মঁসিয়ে বিয়েনভেনু বলে আপনি কি সেই?

হ্যাঁ, তাই।

লোকটি হাসিমুখে বলল, তাহলে আপনি তো আমারও বিশপ।

অল্পবিস্তর তাই।

করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল লোকটি। কিন্তু বিশপ তা ধরলেন না। তিনি শুধু বললেন, তাহলে কি আমি ভুল খবর পেয়েছি? আপনাকে তো খুব একটা অসুস্থ দেখাচ্ছে না।

বৃদ্ধ লোকটি বলল, আমার সব কষ্টের অবসান হতে চলেছে।

একটু থেমে সে আবার বলল, তিন ঘন্টার মধ্যেই আমি মারা যাব। আমি চিকিৎসাবিদ্যার কিছুটা জানি। আমি জানি আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। গতকাল শুধু আমার পা দুটো অসাড় হয়ে যায়। আজ সকালবেলায় সেই অসাড় ভাবটা হাঁটু পর্যন্ত উঠে আসে, এখন আবার দেখছি সেটা কোমর পর্যন্ত উঠে এসেছে। এই পক্ষাঘাত রোগটা আমার হৃৎপিণ্ডটাকে আক্রমণ করলেই আমি আর বাচব না। সূর্যাস্তটা সত্যিই খুব সুন্দর। তাই না কি? আমি ছেলেটাকে চেয়ারের চাকাটাকে ঘুরিয়ে এই দিকে আনতে বললাম যাতে আমি শেষবারের মতো পৃথিবীটা দেখতে পারি। আপনি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, আমি বিরক্তবোধ করব না। আপনি একজন মুমূর্ষু লোককে দেখতে এসে ভালই করেছেন। এই সময় একজন সাক্ষী দরকার। সব লোকেরই এক একটা খেয়ালখুশি থাকে। আমি চেয়েছিলাম আগামীকাল সকাল পর্যন্ত বাঁচতে, কিন্তু আমি জানি আমার জীবন আর মাত্র তিন ঘন্টা আছে। দিনের আলোব আর প্রয়োজন নেই, আমি নক্ষত্রের আলোয় মবব।

এবপর ছেলেটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, যাও তুমি শোওগে। তুমি গতকাল সারারাত জেগেছ, এখন ক্লান্ত।

ছেলেটা ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। লোকটি তখন নিজেব মনে বলতে লাগল, ও যখন ঘুমোবে তখনই আমার মৃত্যু হবে। দুটি ঘুম পাশাপাশি চলবে।

রুগ্ন মুমূর্ষু লোকটির অবস্থা দেখে বিশপ যতটা বিচলিত হবেন ভেবেছিলেন ততটা বিচলিত তিনি হলেন না। এই ধরনের লোকের মধ্যে ঈশ্বরের কোনও উপস্থিতি অনুভব করতে পারলেন না তিনি। তাঁর প্রতি লোকটাব ভাবভঙ্গি ভাল লাগল না। সাধারণ মানুষের মতো মহান ব্যক্তিদের স্বভাবে কতকগুলি অসংগতি থাকে। যে বিশপ সাধারণত কারো কাছ থেকে কোনও সম্মান চান না, তাঁকে 'মহান বিশপ' বলে সম্বোধন করলে তিনি তা হেসে উড়িয়ে দিতেন, বিবক্ত বোধ কবতেন। আজ এই ভূতপূর্ব বিপ্লবী তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান না দেখানোয এবং তাঁকে মঁসিয়ে হিসাবে সম্বোধন না করায় তিনি ক্ষুণ্ন না হয়ে পাবলেন না। সাধারণ যাজক আর ডাক্তারবা অবশ্য সর্বত্র যথাযোগ্য সম্মানের প্রত্যাশা করে এবং তা না পেলে ক্ষুণ্ন হয। কিন্তু বিশপ তো সে ধরনের লোক নন। কাবো কাছ থেকে কোনও সম্মান প্রত্যাশা করা তাঁর স্বভাব নয়, এটা তাঁর অভ্যাসের বাইবে। বিপ্লবী কনভেনশনেব ভূতপূর্ব সদস্য, জনগণের প্রতিনিধি এই বৃদ্ধ লোকটি একদিন সত্যিই খুব সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

লোকটা বিশপকে যথাযোগ্য সম্মান না দেখালেও তার কথাবার্তায একটা অন্তবঙ্গতার ভাব আর একটা নম্রতা ছিল, যে নম্রতা সব মুমূর্ষু লোকদের মধ্যে দেখা যায়।

বিশপ লোকটির প্রতি কোনও অযথা বা অসংযত কৌতূহল না দেখালেও সহানুভূতিমিশ্রিত এক মনোযোগে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তাকে। সেই সহানুভূতির বশে অন্য কেউ হলে তিনি তাকে তিরস্কার করতেন। কিন্তু বিপ্লবীদের অন্য চোখে দেখতেন। তাঁর মতে বিপ্লবীরা হলো পলাতক দস্যুদের থেকে একটু উপরে এবং দানশীলতার পরিসীমার বাইরে।

লোকটি অল্প সময়ের মধ্যে মরবে বললেও তখনো সে শান্তভাবে খাড়া হয়ে বসেছিল। তার স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছিল চারদিকে। এই অশীতিপর মুমূর্ষু লোকটি যেকোনও মনোবিজ্ঞানীকে তাক লাগিয়ে দেবে। বিপ্লবের সময়ে এই ধরনের সহিষ্ণু ও শক্তিমান লোক অনেক দেখা গেছে। কিন্তু লোকটার সহ্য করার শক্তি সত্যিই অসাধারণ। ঠিক এই মুহূর্তে মৃত্যু তার এত কাছে ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও তাকে দেখে সুস্থ ও সবল বলে মনে হচ্ছে। তার দৃষ্টির স্বচ্ছতায়, তার কণ্ঠের দৃঢ়তায়, তার কাঁধ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের [illegible] সঞ্চালনে এমন একটা উদ্ধত [illegible] ভাব দেখা যায় যা মৃত্যুকে অস্বীকার করছে, যা কখনই মাথা নত করতে [illegible] মৃত্যুর কাছে। মুসলমানদের মৃত্যুদূত [illegible] আজ তার আত্মাকে [illegible] নিতে এলে সে নিজে নিজেই ফিরে যাবে, ভাববে সে ভুল করে [illegible] পড়েছে। মনে হচ্ছে লোকটা যেন ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিচ্ছে। সে মরতে চাইছে বলেই সে মরছে। মৃত্যু জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারছে না তাকে। [illegible] একটা মুক্তির আনন্দ তাকে আচ্ছন্ন করে আছে যেন। তার একটা পা [illegible] হয়ে গেছে আর তাই মৃত্যুর অন্ধকার একমাত্র সেই জায়গাটাতেই এসে চেপে ধরেছে। তার একটা পা [illegible] গেছে, কিন্তু তার মাথাটা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে আছে এখনো এবং মনে হচ্ছিল তার সমস্ত প্রাণশক্তি এখনো তার আয়ত্তেই আছে এই বিরল মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন প্রাচ্যের এক রূপকথার নায়ক রাজা যার দেহের উপর দিকটায় মাংস আছে আর নিচের দিকটা মর্মর প্রস্তরে গাথা।

বৃদ্ধের সামনে যে একটা পাথর ছিল তার উপরে বসলেন বিশপ। বসেই কোনও ভূমিকা না করেই তার ধর্মীয় উপদেশ দানের কাজ শুরু করলেন। তিনি প্রথমে বললেন, একটা বিষয়ের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে। আপনি অন্তত রাজার মৃত্যুর জন্য ভোট দেননি।

'অন্তত' কথাটার যে একটা ঝাঁঝ ছিল তা লক্ষ্য করে কঠোরভাবে লোকটি বলল, আমাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে কিন্তু খুব একটা বেশি দূর যাবেন না মঁসিয়ে। আমি এক অত্যাচারীর উচ্ছেদের জন্য ভোট দিয়েছিলাম।

তার মানে ? বিশপ জিজ্ঞাসা করলেন।

তার মানে এই যে মানুষ আসলে শাসিত হয় এক অত্যাচারীর দ্বারা যার নাম হলো অজ্ঞতা। এই অত্যাচারীরই উচ্ছেদ আমি চেয়েছিলাম। এই অত্যাচারীই রাজতন্ত্রের জন্ম দেয়। রাজতন্ত্রের যা কিছু শক্তি ও প্রভুত্ব তা মিথ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু জ্ঞানের যা কিছু শক্তি তা সত্যের ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ শাসিত হবে জ্ঞানের দ্বারা।

বিশপ বললেন, জ্ঞান আর বিবেক।

ও দুটো এক জিনিস। বিবেক হচ্ছে জ্ঞানেরই অন্তর্নিহিত এক শক্তি।

আশ্চর্য হয়ে এই কথাগুলি শুনতে লাগলেন বিশপ। তার মনে হলো এটা যেন জীবনকে দেখার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। বিপ্লবী আবার বলতে লাগল, রাজা ষোড়শ

লুইয়ের ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমি ভোট দিযেছিলাম। আমি মনে করি না কোনও মানুষকে হত্যা করার অধিকার আমার আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, অন্যায়কে উচ্ছেদ করা আমার কর্তব্য। আমি নারীদের বেশ্যাগিরি, ক্রীতদাসপ্রথা, শিশুদের উপর অবিচার প্রভৃতি অত্যাচারগুলির উচ্ছেদের জন্য ভোট দিয়েছিলাম। প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিয়ে আমি আসলে এই সব অত্যাচারের অবসান ঘটাতে চেযেছিলাম। আমি সৌভ্রাতৃত্ব, ঐক্য আর এক নতুন যুগের প্রভাতের জন্য ভোট দিয়েছিলাম। সমস্ত রকমের কুসংস্কার আর মিথ্যাচারের পতন ঘটাতে সাহায্য করতে চেযেছিলাম, ভেবেছিলাম এগুলির ধ্বংস হলেই সব অন্ধকার কেটে গিযে আলোর যুগ আসবে। দুঃখের পৃথিবী অনাবিল আনন্দের আধারে পরিণত হবে।

বিশপ ব নলেন, কিন্তু সে আনন্দ অনাবিল আনন্দ নয নিশ্চয়।

বিপ্লবী বলল, আপনি বলতে পারেন এটা অনিশ্চিত আনন্দ, কারণ রাজতন্ত্রেব পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অতীত আবার ফিরে আসায সে আনন্দ বিলীন হয়ে যায। হায়, আমার কাজ অসমাপ্ত রযে গেল। আমরা পুবনো রাষ্ট্র ও সমাজের কাঠামোটাকে ধ্বংস করেছিলাম, ভেঙে দিয়েছিলাম, তার ভাবধারাকে ধ্বংস কবতে পারিনি। শুধু অত্যাচারের উচ্ছেদ ঘটালেই চলবে না, যুগ-যুগান্তব্যাপী প্রথাগুলিরও পবিবর্তন দরকাব। আমরা কারখানাটাকে ভেঙে ফেলেছিলাম কিন্তু তার যন্ত্রটা আজও চলছে।

আপনারা ধ্বংস করেছিলেন ; ধ্বংসেরও প্রযোজন আছে ঠিক। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ধ্বংসকার্য ক্রোধের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয সে ধ্বংসকার্য কোনও শুভ ফল দান কবতে পারে না।

হে আমার লর্ড বিশপ, ন্যাযপরায়ণতার এক নিজস্ব ক্রোধ আছে। সেই ক্রোধই হলো অগ্রগতির বা প্রগতির এক উপাদান। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে যাই বলা হোক না কেন, খৃস্টের আবির্ভাবের পর থেকে এ বিপ্লব মানবজাতির পক্ষে অগ্রগতিব পথে এক বিরাট পদক্ষেপ। অসমাপ্ত রয়ে গেলেও এ বিপ্লব মহান। সমাজের অবরুদ্ধ আবেগকে এ বিপ্লব মুক্ত করে দেয। অনেক বিক্ষুব্ধ অন্তবকে শান্ত কবে, সারা বিশ্বে সভ্যতাব এক নবজোযার এনে দেয়। অন্ধকাবে আলো দেখায অজস্র মানুষকে। ফরাসী বিপ্লব যেন মানব জাতির পবিত্র তৈলাভিষেক।

বিশপ গুঞ্জনধ্বনির মতো বলে উঠলেন, কিন্তু ১৭৯৩ সালের বিভীষিকা?

বিপ্লবী কনভেনশানের সেই ভূতপূর্ব সদস্য চেযাবে সোজা হয়ে বসে গম্ভীরভাবে গলার স্বর উঁচু করে বলল, হ্যাঁ, ১৭৯৩ সালের কথায আসছি। পনেরশো বছব ধরে মেঘ ঘন হয়ে উঠছিল, অবশেষে ১৭৯৩ সালে ঝড ওঠে। আপনারা এই ঝড়কেই বজ্র বলে ধিক্কার দিচ্ছেন।

বিশপ কথাটার মানে বুঝতে পারলেন। তবু প্রতিবাদের সুরে বললেন, বিচারক যা কিছু বলেন বা করেন তা সব ন্যায়বিচারের নামে চালিয়ে দেন। যাজক বলেন করুণার কথা যে করুণা ন্যায়বিচারের এক উর্ধ্বতন স্তর। বজ্র কখনো ভুল করে না। আর ষোড়শ লুই ?

মুমূর্ষু বিপ্লবী হাত বাড়িয়ে বিশপের একটি হাত ধরে বলল, আপনি কি ষোড়শ লুই-এর জন্য শোকে বিলাপ করছেন? তিনি যদি এক নিষ্পাপ শিশু হতেন তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে কাঁদব। আমার কাছে রাজপরিবারের দুটি শিশুহত্যা খুবই দুঃখজনক। শুধু কাত্রুশের ভাই হওয়ার জন্য একটি নির্দোষ শিশুকে প্লেস দ্য গ্রেভে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং পঞ্চদশ লুই এর পৌত্রকে শুধু রাজার পৌত্র বলেই হত্যা করা হয়।

বিশপ বললেন, অতশত নাম আমার জানার দরকার নেই।

কাত্রুশ না পঞ্চদশ লুই? কার নামে আপনার আপত্তি?

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইলেন। এখানে আসার জন্য অনুশোচনা বোধ করতে লাগলেন বিশপ। তবু তিনি বেশ কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠলেন। কেন তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

মুমূর্ষু বলল, শুনুন মঁসিয়ে, আপনি সত্যের স্থূল দিকটা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু খৃস্ট তা করেন, সুদখোর উত্তমবর্ণের মন্দির থেকে বিতাড়িত করেন। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের দ্বারা অনেক সত্যকে তুলে ধরতেন। তিনি বলতেন, যারাই আমার কাছে আসবে তাকেই কষ্টভোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি শিশু বৃদ্ধের মধ্যে কোনও পার্থক্য মানতেন না। হেরদের পুত্রের সঙ্গে বারব্বাসের পুত্রের মেলামেশাটাকে তিনি খারাপ ভাবতেন না। নির্দোষতার একটি নিজস্ব মর্যাদা আছে, বাইরের কোনও পৃথক মান মর্যাদার প্রয়োজন হয় না। ছেঁড়া কাপড়ে ও রাজপোশাকে নির্দোষিতা সমান মর্যাদাজনক, তার মহত্ত্ব সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে থাকে অম্লান আর উজ্জ্বল।

বিশপ শান্ত নিচু গলায় বললেন, তা অবশ্য বটে।

বিপ্লবী বলল, আপনি সপ্তদশ লুই এর নাম করেছেন। আমাদের পরস্পরের বক্তব্য ভাল করে বোঝা দরকার। আপনি কি অভিজাত, নীচজাত, ছোট-বড় নির্বিশেষে সব নির্দোষ, আর শহীদ, সব শিশুর জন্য চোখের জল ফেলতে বলছেন? তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে কাঁদব তাদের জন্য। কিন্তু আমাদের ৯৩ সাল ও সপ্তদশ লুই এর আগে চলে যেতে হবে। আপনি যদি শিশুদের জন্য অশ্রুপাত করেন তাহলে আমিও রাজপরিবারের শিশুদের জন্য অশ্রুপাত করব।

বিশপ বললেন, আমি সকলের জন্যই অশ্রুপাত করব।

কিন্তু সকলের জন্য সমানভাবে অশ্রুপাত করতে হবে। তবে তুলনামূলকভাবে সাধারণ জনগণের শিশুদের দাবই বেশি কারণ তারাই দীর্ঘকাল দুঃখকষ্ট ভোগ করে এসেছে।

কিছুক্ষণ আবার দু'জনেই চুপ করে রইল। বিপ্লবী এবার কনুই এর উপর ভর দিয়ে তার এক দিকের গালে আঙুল দিয়ে একটা চিমটি কেটে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুমূর্ষু জীবনের স্তিমিতপ্রায় প্রাণশক্তির একটা জ্বলন্ত আগুন জ্বলতে লাগল তার দু'চোখে। তার কথাগুলো বিস্ফোরণের মতো জ্বালাময় শব্দ করে উঠল বিশপের কানে।

বিপ্লবী বলতে লাগল, জনগণ বহুদিন ধরে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করে এসেছে মঁসিয়ে। সেইটাই সব নয়। আমাকে প্রশ্ন করার এবং সপ্তদশ লুই সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কথা বলার আপনি কে? আমি আপনাকে চিনি না। এখানে আসার পর থেকে আমি কাউকে দেখিনি, কেউ আমার কাছে আসেনি, আমি কোথাও যাইনি। শুধু এই ছেলেটা আমার কাছে কাজ করে এবং একেই আমি দেখি। অবশ্য আপনার নাম আমার কানে এসেছে এবং এটাও শুনেছি যে লোকে আপনাকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাতে কিছু বোঝা যায় না। চতুর লোকেরা নানা উপায়ে সাধারণ লোকদের মন জয় করে, তাদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। আমি আপনার গাড়ির চাকার শব্দ কোনওদিন শুনিনি। আপনি নিশ্চয় গাড়িটা দূরে কোথাও রেখে এসেছেন। আমি আবার বলছি আমি আপনাকে চিনি না। আপনি বলছেন আপনি বিশপ। কিন্তু তাতে আপনার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায় না। আমি আবার আপনাকে প্রশ্ন করছি, আপনি কে? আপনি বিশপ, চার্চের রাজা, প্রভূত ঐশ্বর্য ভোগের অধিকারী এক ব্যক্তি। দিগনের বিশপের মাইনে বছরে পনের হাজার ফ্রাঁ, দশ হাজার ফ্রা তাঁর পিছনে খরচ। সব মিলিয়ে বছরে পঁচিশ হাজার ফ্রাঁ। আপনি এক বিরাট প্রাসাদে বাস করেন, অনেক চাকরবাকর আছে সে প্রাসাদে, আপনার রান্নাঘরে অনেক খাবারের প্রাচুর্য। প্রতি শুক্রবার মুরগীর মাংস পরিবেশন করা হয় খাবার টেবিলে। খৃস্টের নামে আপনি গাড়ি চড়ে বেড়ান অথচ খৃস্ট নিজে খালি পায়ে হেঁটে বেড়াতেন, উচ্চপদস্থ যাজক হিসাবে প্রচুর ভোগ-সুখ ও আরাম-স্বাচ্ছন্দের উপকরণ আপনি ভোগ করেন। কিন্তু এতে আপনার আসল স্বরূপ বা সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। আপনি তাহলে আমাকে জ্ঞানের কথা শোনাতে এসেছেন মনে হয়। কিন্তু কার সঙ্গে আমি কথা বলছি? কে আপনি?

বিশপ মাথা নত করে একটি প্রার্থনাস্তোত্রের একটি ছত্র উদ্ধৃত করে বললেন, আমি একটি কীটমাত্র, মানুষ নই।

মুমূর্ষু বিপ্লবী যত কঠোর ভাব ধারণ করল বিশপ ততই বিনম্র হয়ে উঠলেন। তিনি শান্তভাবে বললেন, মনে করুন আপনি যা বললেন তা সব সত্য। আমার আয়, আমার ঐশ্বর্য, আমার গাড়ি, আমার খাওয়া দাওয়ার যে সব কথা বললেন তা সব সত্য হলেও একটা কথা আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে করুণা কেন মানবজীবনের একটা প্রধান গুণ নয়। মার্জনা কেন মানবজীবনের প্রধান কর্তব্য নয় এবং ১৭৯৩ সালটি কেন ক্ষমার অযোগ্য নয়।

বৃদ্ধ বিপ্লবী কপালে হাত দিয়ে কি মুছল। তারপর বলল, আপনার কথার উত্তর দেবার আগে প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি মঁসিয়ে। আপনি আমার অতিথি এবং যথাযোগ্য সৌজন্য দেখাতে পারিনি। আমরা আমাদের আপন আপন ভাবধারার কথা আলোচনা করছি এবং এক্ষেত্রে যুক্তি দিয়ে সব কথা বলতে হবে; আপনার সম্পদ আর সুযোগ-সুবিধাভোগ তর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি সুবিধার জন্য, কিন্তু এটা সুরুচির পরিচায়ক নয়। কিন্তু এগুলো আর আমি উল্লেখ করব না।

বিশপ বললেন, এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে।

আপনি আমাকে একটা জিনিস ব্যাখ্যা কবতে বলেছেন। আপনি বললেন ১৭৯৩ সাল ক্ষমাব অতীত।

বিশপ বললেন, হ্যা। মাবাও যে গিলোটিন নিযে এত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সে বিষযে কি বলতে চান আপনি ?

সৈন্যবা যখন প্রোটেস্ট্যান্টদেব উপব নির্যাতন চালাচ্ছিল ক্যানে বুসতে তখন 'তে দিউম' গানেব অনুষ্ঠান কবেছিল সে বিষযেই বা আপনি কি বলতে চান ?

উত্তবটা খুবই কডা। তীক্ষ্ণ তববাবিব মতো এ উত্তবটা বিদ্ধ কবল বিশপকে। বিশপ কেপে উঠলেন। তিনি কোনও উত্তব খুঁজে পেলেন না। তবে বুসেতেব উল্লেখ কবায তিনি বেগে গেলেন। যাবা মহান ব্যক্তি তাদেব কিছু না কিছু দুর্বলতা হযত থাকে, কিন্তু তর্কেব খাতিবে তাঁদেব অশ্রদ্ধা কবাটা সত্যিই বাগেব কথা।

বৃদ্ধ বিপ্লবী হাপাতে লাগল। তাব শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তবে তাতে একটুও ম্লান হযনি তাব দৃষ্টিব স্বচ্ছতা। সে বলতে লাগল, আমবা আব একটু এগিয়ে গিযে ব্যাপাবটা দেখতে পাবি। সমগ্রভাবে বিচাব কবলে দেখা যাবে বিপ্লব মানবতাব এক বিবাট প্রতিষ্ঠা, শুধু ১৭৯৩ সালটাই তাব ব্যতিক্রম। আপনি এ সালটাকে ক্ষমা কবতে পাবেন না। কিন্তু মঁসিযে, সমগ্রভাবে বিচাব কবলে বাজতন্ত্রই কি ক্ষমাব যোগ্য ? স্বীকাব কবি ফ্যাবিযাব অপবাধী, কিন্তু মন্ত্রী ভানকে কি বলবেন ? ফুকিযেব তিনভিল একজন শযতান ছিল ঠিক, কিন্তু লামযগনান বেভিলকে কি বলবেন ? ম্যালিযার্দ ঘৃণ্য হতে পাবেন, কিন্তু সযতাভানে কি ? জোঁর্দে কুপ তেতিব থেকে মার্কুই দ্য লুভয কি বেশি ভযঙ্কব মঁসিযে, আমি বানী মেবি অঁতানোতেব মৃত্যুব জন্য দুঃখ প্রকাশ কবি ঠিক, কিন্তু হুগেনো নাবীব জন্যও কম দুঃখ বোধ কবি না। বাজা লুই এব আমলে সেই নাবীকে একটা খুঁটিতে কোমব পর্যন্ত অনাবত অবস্থায দাঁড কবিযে বাখা হয আব তাব শিশুসন্তানকে তাব সামনে ধবে বাখা [illegible]। শিশুটি তাব স্তনদুধ খাবাব জন্য জোবে কাদতে থাকে। তখন মেযেটিকে বলা হয তাব শিশুসন্তানেব জীবন আব তাব শালীনতা– এই দুটিব মধ্যে একটিবে বেছে নিতে হবে তাকে। একটি মাতাব উপব এই অত্যাচাবকে আপনি কি বলবেন মঁসিযে ? আপনাকে একটা কথা মনে বাখতে হবে [illegible]বিপ্লবেব অবশ্যই কতকগুলি কাবণ আছে। এব যা কিছু ভযঙ্কব ভবিষ্যতেব মা[illegible] [illegible] [illegible] এব কাবণগুলি বুঝতে পাবলে [illegible] এব একমাত্র [illegible] এক নতুন [illegible] উদ্ভব। [illegible] মধ্যে অনেক [illegible] কাজ অনুষ্ঠিত হলেও [illegible] একটা [illegible] জিনিস [illegible] প্রতি অকৃষ্ঠ আলিঙ্গন। যাই হোক, এ বিষযে আব [illegible] কিছু [illegible]। আমাব বলাব আবও কিছু আছে। তাছাডা আমাব মৃত্যু আসন্ন।

বিশপেব দিকে না তাকিযেই বৃদ্ধ বলতে লাগল, [illegible] নিষ্ঠুবতা দেখা দেয তাকে আমবা বিপ্লব বলি। বিপ্লবেব শেষে আমবা [illegible] অনেক মাবামাবি কাটাকাটি ও অনেক কিছু ধ্বংস হযেছে ঠিক, কিন্তু মানবজাতি তা সত্ত্বেও কিছুটা এগিযে গেছে।

কথাগুলো বলে বৃদ্ধ আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও সে বুঝতে পারেনি, তুকের পথে সে বিশপের আত্মরক্ষার অনেকগুলি বেড়া একে একে ভেঙে ফেললেও একটা প্রধান বেড়া তার শক্তির এক দুর্ভেদ্য দুর্গ তখনো অজেয় রয়ে গেছে।

বিশপ এবার কিছুটা কড়াভাবেই বললেন, সব প্রগতিরই উচিত ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলা। অধর্মাচরণের দ্বারা কোনও মঙ্গলই সাধিত হতে পাবে না। কোনও নাস্তিক কখনো মানবজাতির ভাল নেতা হতে পারে না।

বৃদ্ধ এ কথার উত্তর দিল না। তার দেহটা একবাব কেপে উঠল। সে আকাশেব পানে একবার তাকাল। তার চোখ থেকে একবিন্দু জল গালেব উপর গড়িয়ে পড়ল। সে আকাশের দিকে মুখ করেই আমতা আমতা করে বলতে লাগল, তুমি হচ্ছ পূর্ণ! তুমিই একমাত্র সত্য।

একটু থেমে বৃদ্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, অনন্তের একটা অস্তিত্ব আছে এবং সে অস্তিত্ব একমাত্র ওখানেই আছে! এই অনন্তেব যদি আত্মা না থাকে তাহলে কোনও জিনিসই থাকবে না। কিন্তু আত্মা আছে। অনন্তের আত্মাই হলো ঈশ্বব।

শেষের কথাগুলি সে বলল স্পষ্ট ভাযায, আবেগকম্পিত স্বরে। তাবপব সে চোখ বন্ধ করল। কথাগুলো বলতে পরিশ্রম হযেছে তাব। কযেক মুহূর্তের মধ্যেই যেন কযেকটা বছর পার হযে গেছে। সে আরও ক্লান্ত হযে পড়েছে আগের থেকে আর এই ক্লান্তিই যেন মৃত্যুর আরও কাছে এনে দিযেছে তাকে।

বিশপ দেখলেন নষ্ট করার মতো সময নেই। তিনি যাজক হিসাবে এখানে এসেছিলেন। তার সকল ঔদাসিন্য ক্রমে পরিণত হলো এক গভীর আবেগে। বৃদ্ধের মুদ্রিত চোখ দুটির পানে তাকিযে তার হিম হযে যাওযা বরফ হাতটি ধরে তাব উপব ঝুঁকে বললেন তিনি, এখন এই মুহূর্তটি ঈশ্বরেব। এ মুহূর্তের যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে না পারাটা সত্যিই কত দুঃখজনক, সেটা আপনি মনে করেন না?

বৃদ্ধ চোখ খুলে তাকাল। এক ছাযাচ্ছন্ন গাম্ভীর্য ফুটে উঠল তার চোখেমুখে। দুর্বলতার জন্য সে ধীরে ধীবে বলতে লাগল, হে আমাব লর্ড বিশপ, পড়াশুনা, চিন্তা আব ধ্যানের মধ্যে দিযে আমি জীবন যাপন করেছি। আমাব বযস যখন ষাট তখন দেশেব কাজের জন্য আমাকে ডাকা হয। আমি সে ডাকে সাড়া দিই। দেশেব মধ্যে অনেক কুপ্রথা এবং কুসংস্কাব ছিল, আমি তাদেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলাম, অনেক অত্যাচার-অবিচার আমি ধ্বংস করেছিলাম, অনেক মানবিক অধিকাব এবং নীতিকে আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। আমার দেশ যখন আক্রান্ত হয তখন আমি তাকে রক্ষা করেছিলাম। ফ্রান্সকে বিদেশীরা আক্রমণেব ভয দেখালে আমি দেশেব জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করি। আমি কখনই ধনী ছিলাম না, এখনও আমি গরীব। রাষ্ট্রেব কর্তাদেব মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আমাদেব রাজকোষ এত বেশি ধনরত্নে পূর্ণ ছিল যে সোনা-রুপোর চাপে দেওযালগুলো ভেঙে যাবার ভযে দেওযালগুলোব বাইরে থাম গেঁথে সেগুলোকে ঠেকা দিযে জোবালো করতে হয। তবু আমি পভার্টি স্ট্রীটের একটা হোটেলে বাইশ স্যুতে খেতাম। আমি উৎপীড়িতদেব দুঃখমোচন করি এবং

আর্তদের সান্ত্বনা দিই। আমি বেদীর কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিলাম তা ঠিক, কিন্তু দেশের ক্ষতস্থান বেঁধে দেবার জন্যই তা করেছিলাম। আলোকোজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের পানে মানবজাতির অগ্রগতির জন্যই আমি সংগ্রাম করেছিলাম। ক্ষমাহীন অত্যাচারের অগ্রগতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। বহুক্ষেত্রে আমি আপনাদের বিরুদ্ধবাদী হলেও অনেক যাজককে রক্ষা করেছিলাম। ফ্ল্যান্ডার্সের অন্তর্গত পিথেঘেমে যেখানে একদিন মেরো ভিঙ্গিয়ান রাজাদের গ্রীষ্মকাল ছিল তার কাছাকাছি একটা চার্চ ছিল। ১৭৯৩ সালে ধ্বংসের কবল থেকে সে চার্চকে রক্ষা করেছিলাম। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি, আমার যথাশক্তি মানুষের মঙ্গল সাধন করেছি। এতে আমার যশের হানি হয়, আমাকে পীড়ন সহ্য করতে হয়, আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়, আমাকে বিদ্রূপ করা হয়। আমি জানি এখনো পর্যন্ত অনেক লোকে বিশ্বাস করে আমাকে ঘৃণ্য করার তাদের অধিকার আছে। বহুলোকের কাছে আমি ধিকৃত। আমি তাই ঘৃণার বস্তুরূপে নির্জনে বাস করে আসছি, অথচ আমি কাউকে ঘৃণা করি না। এখন আপনি আমার কাছে কি চান ?

সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে বিশপ বললেন, আপনার আশীর্বাদ।

বিশপ যখন মুখ তুলে তাকালেন তখন দেখলেন বৃদ্ধ লোকটির চোখেমুখে অদ্ভুত এক প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। বিশপ দেখলেন তার মৃত্যু হয়েছে।

সেদিন রাতে চিন্তামগ্ন অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন বিশপ। সারারাত তিনি প্রার্থনা করে কাটালেন। পরদিন কিছু কৌতূহলী লোক বিশপকে সেই জনপ্রতিনিধির কথা জিজ্ঞাসা করায় বিশপ শুধু নীরবে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে কি দেখালেন। তার পর থেকে দুঃস্থ ও আর্তদের প্রতি বিশপের মায়ামমতা আরও বেড়ে যায়।

এরপর কেউ যদি বুড়ো শয়তান বলে অভিহিত করত সেই বিপ্লবীকে তাহলে বিশপ চুপ করে কি ভাবতেন। তিনি ভাবতেন যে লোকটি তাঁর সামনে মারা গেল, তার উন্নত বিবেক তার নিজের পূর্ণতার প্রতি সংগ্রামকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে।

তবে সেই বিপ্লবী বৃদ্ধটির মৃত্যুকালে তার কাছে যাওয়ার জন্য শহরের অনেকেই সমালোচনা করতে থাকে বিশপের। যখন সব বিপ্লবীরাই নাস্তিক, যেখানে তাদের কাউকেই ধর্মান্তরিতকরণের কোনও আশা নেই সেখানে কেন গিয়েছিলেন বিশপ ? তার আত্মাটাকে শয়তানে কিভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেটা দেখার জন্যই কি গিয়েছিলেন তার শয্যাপাশে ?

মৃত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী এক বিধবা মহিলা ঔদ্ধত্যকে বুদ্ধি বলে ভাবত। সে একদিন বিশপকে বলল, আমরা আশ্চর্য হয়ে সবাই ভাবছি মসিয়ে, আপনি হয়ত একদিন বিপ্লবীদের মতো মাথায় লাল ফিতে ব্যবহার করবেন।

বিশপ বললেন, লাল রংটা এমনই যে তা সব ক্ষেত্রেই চলে। আশ্চর্য এই যে যারা বিপ্লবীদের লাল ফিতেকে ঘৃণার চোখে দেখে তারাই আবার লাল টুপি পরে।

১১

এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভুল হবে যে মসিয়ে বিয়েনভেনু একজন

দার্শনিক যাজক ছিলেন। সেই জনপ্রতিনির্ধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের পর থেকে তাঁর মনে যে বিস্ময় জাগে সে বিস্ময় তাঁকে আরও শান্ত করে তোলে।

যদিও রাজনীতি নিয়ে তিনি কখনো মাথা ঘামাতেন না তথাপি সেকালে দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তার মনোভাব কি ছিল সে বিষয়ে কিছু বিবরণ দান করা উচিত। আর তার জন্য কয়েক বছর পিছনে যেতে হবে আমাদের।

বিশপের পদে তিনি অধিষ্ঠিত হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে সম্রাট তাঁকে আরও কয়েকজন বিশপের সঙ্গে ব্যারন পদে ভূষিত করেন। আমরা যতদূর জানি, ১৮৩৯ সালের ৫ই, ৬ই জুলাই পোপকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফরাসী ও ইতালীয় বিশপদের এক ধর্মীয় সভায় যোগদানের জন্য নেপোলিয়ন তাঁকে ডাকেন। এই সভা প্যারিসের নোতার দ্যাম গীর্জায় কার্ডিনাল ফ্রেস্কের সভাপতিত্বে ১৮১১ (রাজা, দুটি সালে মিলছে না) সালের ১৫ই জুন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় মোট পঁচানব্বই জন বিশপের মধ্যে মঁসিয়ে মিরিয়েলও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি মূল সভা ছাড়া আরও তিন চারটি ছোটখাটো সভায় যোগদান করেন। মনে হয় যে পার্বত্য অঞ্চলে তিনি থাকতেন সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়া সকল গ্রাম্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত থাকার জন্য তাঁর কৃষকসুলভ বেশভূষা ও জীবনযাত্রা প্রণালী সভায় বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তিনি সভার জাকজমকপূর্ণ আদবকায়দায় অস্বস্তিবোধ করায় তাড়াতাড়ি দিগনেতে ফিরে আসেন। এ বিষয়ে তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমার উপস্থিতিতে ওরা অস্বস্তিবোধ করছিল। যে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তারা একেবারে অনবহিত, আমি যেন সেই জগতের এক ঝলক অপ্রত্যাশিত হাওয়া আমার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম তাদের কাছে। বাইরের জগতের রুদ্ধ দরজাটা সহসা আমি যেন খুলে দিয়েছিলাম তাদের সামনে।

তিনি আরও বলেছিলেন, তোমরা কি আশা করতে পার ? অন্যান্য বিশপরা যেন এক একজন রাজপুত্র। আমি সামান্য একজন চাষীদের যাজক ছাড়া আর কিছুই নই।

মোট কথা, তিনি সেই সভায় যোগদান করতে গিয়ে অসন্তুষ্ট হন। একদিন তার এক নামকরা সহকর্মীর বাড়িতে গিয়ে বলেন, কত সব বড় বড় দামী ঘড়ি, কত সুন্দর সুন্দর কার্পেট, কত সব জমকালো সাজ পোশাক পরা চাকর বাকর। আমার পক্ষে এসব সত্যিই অস্বস্তিকর। এই সব বিলাসব্যসনের মধ্যে আমি থাকতে পারব না। এসবের মধ্যে থাকলে আমার প্রায়ই মনে পড়ে [illegible] লোক ক্ষুধায় [illegible] কষ্ট পাচ্ছে। কত গরীব আছে, কত সব গরীব।

বিলাসব্যসনের প্রতি বিশপের ঘৃণা খুব একটা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ বিলাসিতাকে ঘৃণা করলে বিলাসের উপকরণের সঙ্গে জড়িত অনেক শিল্পকর্মকেই ঘৃণা করতে হয়। কিন্তু একজন যাজকের পক্ষে তার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের বাইরে যেকোনও বিলাসের উপকরণই ঘৃণ্য ও বর্জনীয়। সেক্ষেত্রে বিলাসিতা এমনই একটি মনোভাব যার সঙ্গে বদান্যতা বা দানশীলতার কোনও সম্পর্ক নেই। ধনী যাজক এক বৈপরীত্যের প্রতিমূর্তি। যাজকদের অবশ্যই গরীবদের আপনজন হিসাবে তাদের কাছাকাছি থাকা উচিত। কিন্তু

একজন কিভাবে গবীবদেব দুঃখকষ্টেব সংস্পর্শে দিনবাত আসতে বা থাকতে পাবে যদি না তাব বেশভূষা বা চালচলনেব মধ্যে দাবিদ্র্যেব ছাপ না থাকে? আমবা কি এমন কোনও লোকেব কল্পনা কবতে পাবি যে সাবাদিন কোনও জ্বলন্ত লোহাব হাপবে বা ফার্নেসেব সামনে কাজ কববে, অথচ তাব গায়ে তাপ লাগবে না, অথবা সে তাব মাথাব চুল ছোট ছোট কবে ছাটবে না অথবা তাব হাতেব নখে কালো দাগ ধববে না বা তাব মাথা বা গা থেকে এক ফোটা ঘাম ঝববে না অথবা তাব মুখে একটুকবো ছাই থাকবে না। এক যাজকেব দানশীলতাব প্রথম প্রমাণ হলো দাবিদ্রসুলভ জীবনযাত্রা।

এটাই ছিল দিগনেব বিশপেব ব্যক্তিগত মত এবং যাজকবৃত্তি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। তবে তাব মানে এই নয় যে সে যুগেব ভাবধাবাব কোনও অংশই তিনি কোনও ব্যাপাবে গ্রহণ কবতেন না। ববং কতকগুলো সমস্যামূলক ব্যাপাবে সে যুগেব প্রচলিত ভাবধাবাবই অনুবর্তন কবে চলতেন। তিনি তখন যে সব ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা সভা হত তাতে খুব একটা বেশি যোগদান কবতেন না। বাষ্ট্র ও চার্চ সংক্রান্ত কোনও বিবোধমূলক সমস্যা সম্পর্কে তিনি কোনও মন্তব্য কবতেন না। কিন্তু যদি কোনও সময় এ ব্যাপাবে কোনও মন্তব্য কবতেন তাহলে দেখা যেত তাঁব মনেব মধ্যে বক্ষণশীলতাব থেকে অতি আধুনিকতাব উপাদানই বেশি থাকত। আমবা যেহেতু তাঁব একটি পূর্ণ জীবনচিত্র আঁকছি এবং কোনও কিছুই গোপন বাখতে চাই না সেইহেতু আমবা অবশ্যই একথা স্বীকাব কবব যে নেপোলিয়নেব পতন শুরু হবাব সময় তিনি তাব ঘোব বিবোধী ছিলেন। ১৮১৩ সাল থেকে তিনি সম্রাটবিবোধীদেব বিক্ষোভ মিছিলকে সমর্থন কবতেন এবং অভিনন্দন জানাতেন। এলবা থেকে ফেবাব সময় সম্রাট নেপোলিয়ন যখন বিশপেব অঞ্চল দিয়ে যান তখন তিনি দেখা কবতে চাননি সম্রাটেব সঙ্গে। সম্রাটেব সংকটেব সময় তিনি কোনও সমবেত প্রার্থনাসভাব অনুষ্ঠান কবাব অনুমতি দেননি।

এক বোন ছাড়া বিশপেব দুই ভাই ছিল। দুই ভাই এব মধ্যে একজন ছিল সামবিক বিভাগেব বড় অফসাব আব একজন পুলিশেব বড় কর্তা। বিশপ তাব ভাইদেব সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ বাখতেন। কিছুদিন ধবে তাব যে ভাই সৈন্যবিভাগে সেনাপতিত্বেব কাজ কবত তাব সঙ্গে মন কষাকষি চলছিল বিশপেব। কাবণ তাব সেনাপতি ভাই একবাব বাবোশো সৈনিকেব একটি দলেব সেনাপতি হিসাবে নেপোলিয়নকে ধবাব জন্য তাব পিছু ধাওয়া কবে, কিন্তু আসলে তাব ধবাব ইচ্ছা ছিল না অর্থাৎ এমনভাবে যায় যাতে হাতেব নাগালেব বাইবে চলে যেতে প্রচুব সুযোগ পান নেপোলিয়ন। তাব অন্য ভাই প্রাদেশেব কাজ থেকে অবসব গ্রহণেব পব প্যাবিসে বাস কবছিল। সে মানুষ হিসাবে খুবই ভাল ছিল বলে বিশপ তাকে স্নেহেব চোখে দেখতেন।

আব পাঁচজন সাধাবণ মানুষেব মতো মঁসিয়ে বিয়েনভেনুও কোনও এক বাজনৈতিক দলমতেব সঙ্গে জড়িয়ে পড়তেন। মাঝে মাঝে অনেক তিক্ততা আব মোহমুক্তিব বেদনা অনুভব কবতেন। বিশপেব মহান আত্মা সব সময় যতসব চিবন্তন ও শাশ্বত আধ্যাত্মিক

বিষয়ে নিমগ্ন থাকলেও সমকালীন সমাজ জীবনের বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলির আঘাতে একেবাবে অবিচলিত থাকতে পারত না। অবশ্য তাঁর মতো লোকের রাজনৈতিক মতামতেব সঙ্গে জড়িয়ে না পড়াই উচিত ছিল। তবে এ বিষয়ে ভুল বুঝলে চলবে না আমাদের। আমরা যেন রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে প্রগতিবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, মানবতাবাদ প্রভৃতি যে সব প্রত্যয় বা বিশ্বাসগুলি সব মনীষী ও মহাপুরুষদের সকল চিন্তাশীলতাব মূল ভিত্তি সেগুলিকে গুলিয়ে না ফেলি বা এক করে না দেখি। যে সব বিষযেব সঙ্গে আমাদের এই বইটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, শুধু পরোক্ষ বা গৌণভাবে জড়িত সেই সব বিষযের গভীরে না গিয়ে আমরা শুধু এই কথাই বলতে পারি যে মঁসিযে বিয়েনভেনু রাজতন্ত্রবাদী না হলেই ভাল হত। ধ্যানস্নিগ্ধ প্রশান্ত চিন্তার যে উদ'ল ক্ষেত্রটি জুড়ে সত্য, ন্যায় ও বদান্যতার শাশ্বত নীতিগুলি এক অম্লান অন্তহীন ভাস্বরতায উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করে সেই মহান ধ্যানসমুন্নতির স্তর থেকে তাঁব দৃষ্টি এক মুহূর্তেব জন্য বিক্ষুব্ধ মানবজীবনের সমস্যাবলীর উপর নেমে না এলেই আরও ভাল হত তাঁর পক্ষে।

যদিও আমরা স্বীকার করি, ঈশ্বর মঁসিযে বিয়েনভেনুকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য পাঠাননি তবু সম্রাট নেপোলিযন ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন তখন তিনি যদি বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সম্রাটের বিরোধিতা করে উচ্চ মনের পরিচয় দিতেন তাহলে আমরা তাঁর গুণগান না করে পারতাম না। কিন্তু উদীযমান কোনও নক্ষত্রেব ক্ষেত্রে যা প্রশংসনীয় ও গৌরবময, সে নক্ষত্র অস্তম্লান হযে পড়লে তা আব তেমন প্রশংসনীয় বা গৌরবময় মনে হয় না। যে যুদ্ধ বিপজ্জনক আমবা সেই যুদ্ধকেই শ্রদ্ধা করি এবং সে ক্ষেত্রে যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যায় তারাই চূড়ান্ত জয়ের গৌরব লাভ করে। যে মানুষ কারো সুখসমৃদ্ধির সমযে কোনও কথা বলে না তার বিরুদ্ধেই তার দুঃখ বিপদের সময কোনও কথা বলা উচিত নয। সাফল্যের সময়ে যে কাউকে আক্রমণ করতে পারে একমাত্র সে ই তার পতন ঘটানাব বৈধ অধিকারী। ঈশ্বরের বিধানের কাছে আমরা মাথা নত করে থাকি। ১৮১২ সালে থেকেই যে আইনসভা এতদিন সমর্থন করে আসছিল ১৮১৩ সালে সম্রাটের বিপর্যযে উৎসাহিত হয়ে সহসা নীরবতা ভঙ্গ করে সোচ্চার হযে ওঠে। এটা খুবই পবিতাপ আর লজ্জার কথা। এ কাজ কোনওমতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ১৮১৪ সালে মার্শালরা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সিনেটের অধঃপতন ঘটে। এ যেন এতদিন কাউকে দেবতা বলে মেনে পরে তাকে অপমান করা; পৌত্তলিক হযে পুতুল বা প্রতিমার উপর থুতু ফেলার মতো এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। ১৮১৬ সালে যখন শেষ বিপর্যয়ের ধ্বনি শোনা যায় আকাশে-বাতাসে, যখন সমস্ত ফ্রান্স তা শুনে ভযে কেঁপে উঠতে থাকে, নেপোলিয়নের উপর ঘনিয়ে ওঠা ওয়াটার্লু যুদ্ধের ছায়া দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়, যখন ভাগ্যহত যে পুরুষের দিকে সেনাদল ও সাধাবণ মানুষ বেদনার্ত হৃদয়ে শেষবারের মতো হাত বাড়িয়ে সম্ভাষণ জানায় তখন সে পুরুষ কখনই উপহাসের পাত্র নন। এক বিশাল শূন্যতার মাঝে পতনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে

এক মহান জাতির সঙ্গে এক মহান পুরুষের যে মিলন ঘটে সেই মিলনের নিবিড়তার মাঝে যে একটি মহৎ ও মর্মস্পর্শী দিক ছিল সে দিকটি না দেখা বা উপেক্ষা করা দিগনের বিশপের মতো একজন মহাত্মা ব্যক্তির পক্ষে ভুল হয়েছে।

এ ছাড়া বিশপের আর কোনও দোষ ছিল না। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, সরলমনা, বুদ্ধিমান, বিনয়ী এবং যোগ্য। তিনি ছিলেন পরোপকারী, সত্যিকারের একজন যাজক, সাধুপ্রকৃতির লোক এবং মানুষের মতো মানুষ। এমন কি তাঁর রাজনৈতিক মতামতের আমরা সমর্থন করতে পারি না, এবং যার জন্য আমরা তাঁর নিন্দা করে থাকি, সেই সব রাজনৈতিক মতামতের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন উদার।

সম্রাট সৈন্যবিভাগের এক ভূতপূর্ব সার্জেন্টকে টাউন হলের কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। লোকটি আগে অস্টারলিজের যুদ্ধে এক বিরাট বাহিনীতে যোগদান করে বীরত্ব দেখিয়ে সম্মানসূচক পদক পায়। কিন্তু সে যখন-তখন এমন সব মন্তব্য করত যে সব মন্তব্যকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথা বলে মনে করত লোকে। তার পদক থেকে সম্রাটের মুখটা মুছে গেলে সে আর পদক তিনটে পরত না। সে বলত, 'আমার বুকের উপর এই তিনটে বিষাক্ত ব্যাঙ চাপিয়ে রাখার থেকে মরা ভাল।' নেপোলিয়নের দেওয়া ক্রশটাও সে পরত না। আবার সপ্তদশ লুই সম্বন্ধে কোনও কথা উঠলেও সে বুদ্ধি করে কিছু বলতে পারত না। বরং সে বলত, উনি তো প্রুশিয়া চলে যেতে পারতেন। এর দ্বারা প্রুশিয়া আর ইংল্যান্ডের প্রতি তার ঘৃণার ভাবটাকে প্রকাশ করে। সে এসব কথা প্রায়ই বলত বলে তার চাকরি যায় এবং তার ফলে স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে সে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বিশপ তখন তাকে ডেকে গীর্জার দেখাশোনার ভার দেন।

মঁসিয়ে বিয়েনভেনু ছিলেন একজন সার্থক যাজক, সকল মানুষেরই বন্ধু। দিগনেতে তিনি নয় বছরের যে যাজকজীবন যাপন করেন তাতে তাঁর সরলতা আর শান্ত স্বভাব দেখে সেখানকার জনগণের মনে ভক্তি জাগে তার প্রতি। এমন কি নেপোলিয়নের প্রতি তার বিরূপ মনোভাবটাকে লোকে ক্ষমার চোখে দেখতে থাকে। সাধারণ সরলমনা জনগণ তার কাছে ভিড় করত। তারা যেমন তাদের সম্রাটকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত দেবতার মতো, তেমনি বিশপকেও ভালবাসত।

১২

কোনও সেনাপতির অধীনে যেমন অনেক ছোটখাটো অফিসার থাকে তেমনি একজন বিশপের অধীনেও অনেক ছোট ছোট যাজক থাকে। প্রত্যেক বিশপের অধীনে চার্চে একজন করে লোক থাকে যারা তাঁর ফাইফরমাশ খাটে। এইভাবে তারা বিশপের কাজকর্ম করে তাঁর মন জয় করতে পারলে তাদের পদোন্নতি ঘটে।

সেকালে প্রতিটি চার্চ এক একটি রাষ্ট্রের মতো ছিল। চার্চের বিশপরা যেমন ধর্মীয় কাজকর্ম করে যেতেন তেমনি শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিশপের চারদিকে ভিড় করে রাজনীতির কথাবার্তা বলত, তারা দেশের ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে যোগসূত্র বজায় রেখে চলত। ছোটখাটো যাজকরাও আপন আপন পদোন্নতির চেষ্টা করত।

বিশপবাও প্রায সকলেই উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং আপন আপন উচ্চাভিলাষ পূবণেব চেষ্টা কবে যেতেন। একজন বিশপ ভাল কাজ দেখিযে বিশপ থেকে আর্কবিশপ ও পবে কার্ডিনাল হতে পাবতেন। এইভাবে সেকালে একজন যাজক ভবিষ্যতে বাজা পর্যন্ত হতে পাবতেন। এইভাবে প্রতিটি বড চার্চে ছোট-বড যাজকদেব মধ্যে উচ্চাভিলাষ আব দিবাস্বপ্নেব স্রোত বযে যেত।

কিন্তু মঁসিযে বিযেনভেনুব মনে উচ্চাভিলাষেব কোনও আগুন জ্বলত না। তিনি ছিলেন শান্ত, বিনম্র এবং মিতব্যযী। গবীবানাব মধ্য দিযে তিনি তাব জীবনযাত্রা নির্বাহ কবতেন। তাঁব চার্চে বাজনীতিব বা কূটনীতিব কোনও আলোচনা বা জল্পনা কল্পনা চলত না। তাব ফাইফবমাশ খাটা বা হুকুম তামিল কবাব জন্য কোনও লোক ছিল না। বিশপেব মনটি ছিল যেন এক শান্ত সাজানো সুন্দব বাগান। সে বাগান তাব সাবা জীবনব্যাপী যে এক স্নিগ্ধ ছাযা বিস্তাব কবেছিল সে ছাযায ভবিষ্যতেব কোনও গোলাপী স্বপ্নেব কোনও আলো দেখা যেত না। কোনও উচ্চাভিলাষেব বীজ অঙ্কুবিত হযে ওঠাব কোনও সুযোগ পেত না সে বাগান। তাব অধীনে যে সব যাজক কাজ কবত তাবাও তাদেব পদোন্নতি ঘটিযে কোনও উচ্চাশা পূবণেব সুযোগ পেত না। আব তাব জন্য কোনও যুবকবযসী যাজক বেশিদিন থাকতে চাইত না তাব কাছে। চার্চে কোনও বিশপেব অত্যধিক আত্মনিগ্রহ এবং দাবিদ্র্যসুলভ জীবনযাত্রা অন্যান্য যাজকদেব মধ্যে সংক্রামিত হয সমাজে। তাদেব ভোগবৃত্তিগুলি অবদমিত ও কঠিন হযে পডে ক্রমশ, এই ত্যাগ ও তিতিক্ষাকে যাজকবা তাদেব উন্নতিব পথে বাধা বলে মনে ভাবত। তাই তাবা বিশপ বিযেনভেনুকে ছেডে চলে যেত। আমবা এমন এক অদ্ভুত সমাজে বাস কবি যেখানে সাফল্যলাভ বা উচ্চাভিলাষ পূবণ মানেই দুর্নীতি। দুর্নীতিব উচ্চভূমি থেকে চুযে চুযে যে বস পডে তাই হলো এখানে সাফল্য।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পাবে সাফল্য মানেই এক কুৎসিত ব্যাপাব। মানুষ ভুল কবে এটাকে একটা বড বকমেব গুণ বা যোগ্যতা বলে ভাবে। সাধাবণ মানুষেব জীবনেব সাফল্যেব প্রভাব ও প্রভুত্ব অসাধাবণ। সাফল্য অর্জনেব যে ক্ষমতা এক ভণ্ড প্রতিভা ছাডা আব কিছুই নয, যে ক্ষমতা বা প্রতিভা আবহমান কাল হতে প্রভুত্ব কবে আসছে মানবসমাজেব উপব, ইতিহাস হলো তাদেব সবচেযে বড শিকাব। সাফল্য মানেই বক্তপাতেব পথে উচ্চাভিলাষ পূবণ আব এই বক্তপাতেব ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাকেই মানুষ যোগ্যতা ও প্রতিভা বলে এসেছে, বীবত্ব হিসাবে তা খ্যাত হযে এসেছে ইতিহাসে। একমাত্র জুভেনাল আব ট্যাসিটাস এই প্রতিভাতে বিশ্বাস স্থাপন কবতে পাবেন না। আজকাল আবাব এই সাফল্যেব ঘবে এসে এক দবকাবী জীবনদর্শন বাসা বেঁধেছে সাফল্যলাভই তাব নীতি। সমৃদ্ধিলাভই হলো যোগ্যতা। লটাবিতে জিতে যাও, তাহলেই তোমাকে সবাই বলবে চতুব লোক। বলবে যোগ্য আব বুদ্ধিমান। ভাগ্যই হচ্ছে সব; কোনওবকমে একবাব সৌভাগ্যলাভ কবতে পাবলেই তোমাকে বড বলবে সবাই। এ শতাব্দীতে দেখা যায সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাডা সাধাবণ মানুষেব শ্রদ্ধাভক্তিব ব্যাপাবটা বড ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন। গিল্টি কবা নকল সোনাকেই তাবা

আসল সোনা ভাবে। কোনওরকমে পেলেই হলো। জনগণ হচ্ছে এক বৃদ্ধ নার্সিসাসের মতো যে শুধু নিজেকেই ভালবাসে, নিজের আত্মার উপাসনা করে। মোজেস, এসকাইলাস, দান্তে, মিকালাঞ্জেলো অথবা নেপোলিয়নের বিরাট গুণ ও প্রতিভাগুলিকে সাধারণ মানুষে ছোট করে দেখে এবং তারা মনে করে এ গুণ এ প্রতিভা যে কোনও মানুষ চেষ্টা করলেই অর্জন করতে পারে। সাধারণ মানুষ ভাবে যে কর্মচারী কোনওবকমে ডেপুটির পদ পায়, যে বাজে ব্যর্থ নাট্যকার কোনওরকমে কর্নেলের মতো এক হাসির নাটক লিখে নাম পান, যে সেনাপতি কোনওমতে একটা যুদ্ধ জয় কবে, অথবা যে যোদ্ধাপ্রহরী কোনওরকমে হারেম জয় করে বসে তারা সবাই প্রতিভাবান। যে ধুরন্ধর ব্যবসায়ী সৈন্যবিভাগে জুতো সরববাহ করে বছবে চার হাজার পাউন্ড আয় করে, যে সুদখোর বছবে কোনওরকমে আট মিলিযন পাউন্ড আয় করে, যে যাজক জোর গলায় ধর্মপ্রচার করে বিশপ পদে উন্নীত হয, কোনও এস্টেটের যে গোমস্তা টাকা রোজগার করতে করতে অবসব গ্রহণ করার পব অর্থমন্ত্রী হয—লোকে এদের সবাইকে প্রতিভাবান বলে। লোকে আজকাল কোনও মেযে মুখে বং মাখলেই তাকে সুন্দরী বলে, ... ভাল দামী পোশাক পবলেই তাকে বাজসম্মান দান কবে। কাদাব উপরে পাতিহাঁসের নক্ষত্রাকার ছাপ দেখলে লোকে তাকে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ভাবে।

১৩

দিগনের বিশপের ধর্মীয় গোঁড়ামির সমালোচনা কবা আমাদের কাজ নয়। তাঁর মতো এক মহান আত্মা শুধু শ্রদ্ধা জাগায় আমাদের মনে। একজন খাড়াখাড়ি লোকের জীবনসত্যকে তার নিজস্ব খাতিরেই মেনে নিতে হবে নির্বিবাদে। বিভিন্ন মানুষের স্বভাবের ভিন্নতা সত্ত্বেও মানবজীবনের মহত্ত্বেব যে একটি নিজস্ব সৌন্দর্য আছে সে সৌন্দর্য সহজ বিশ্বাসের মধ্য দিযেই উজ্জ্বল হযে উঠতে পারে, বরণীয় হযে উঠতে পারে।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশপেব যে কতকগুলি গোপন রহস্যেব দিক ছিল তা একমাত্র মৃত্যুর পরেই প্রকটিত হয়ে উঠতে পারে। তবে আমরা শুধু এইটুকু জোর করে বলতে পাবি যে তাঁর ধর্মবিশ্বাসেব ক্ষেত্রে কোনও ভণ্ডামি ছিল না। হীবেতে যেমন কোনও খাদ থাকে না, তার ধর্মবিশ্বাসেও কোনও খাদ ছিল না। এই নিখাদ ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যেতেন। তাতে তাঁর বিবেক তৃপ্ত হত। তিনি যে ঈশ্বরেব প্রতি বিশ্বস্ত সে বিষয়ে নিশ্চিত হতেন তিনি।

ধর্মবিশ্বাস ছাড়া বিশপের আর একটি গুণ ছিল। মানুষের প্রতি এক নির্বিশেষ নিখাদ ভালবাসার অন্তহীন প্রবাহে তাঁর অন্তর প্লাবিত হত সতত। এই ভালবাসার জন্য শহরের আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী ও তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিকরা তাঁকে দুর্বলমনা ভাবত। বিশপের এই ভালবাসার আতিশয্যটা আসলে কি তা অনেকে বুঝে উঠত না। আসলে এটা ছিল ... নই পরোপকার প্রবৃত্তি যা সকল মানুষ ও এমন কি ইতর

প্রাণীদেব পর্যন্ত আলিঙ্গন কবত এবং সর্বত্র প্রসাবিত ছিল। কোনও বিছুকেই ঘৃণা কবতেন না তিনি, ঈশ্ববেব সৃষ্টি হিসাবে সব কিছুকেই তিনি ভালবেসে যেতেন। এমন কি অনেক ভাল ভাল মানুষেব প্রতি উদাসীন থেকে পশুদেব ভালবাসা দান কবতেন। অন্যান্য যাজকদেব মধ্যে এ বিষযে যে অসহিষ্ণুতা দেখা যেত দিগনেব বিশপেব মধ্যে তা ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণদেব মতো অত সাত্ত্বিক পজাবী না হলেও তিনি প্রাযই স্তোত্রগান কবতেন আপন মনে। কে জানে মহান ব্যক্তিদেব আত্মা কেন ঊর্ধ্বে গমন কবে আব পশুদেব আত্মা কেন নবকেব দিকে গমন কবে। কোনও কোনও কুৎসিত চেহাবা বা বিকৃত কোনও প্রবৃত্তি তাকে ভীত কবে তুলতে পাবত না তিনি অবশ্য তাতে বিচলিত হতেন, মাঝে মাঝে দুঃখবোধ কবতেন এবং জীবনেব এই সব অবাঞ্ছিত বহিবঙ্গেব অন্তবালে কি কাবণ থাকতে পাবে তা খোজাব চেষ্টা কবতেন। তিনি মাঝে মাঝে ঈশ্ববেব কাছে জীবন ও জগতেব সব কিছু [illegible] কবাব জন্য প্রার্থনা কবতেন। এক স্থিতধী প্রজ্ঞা আব প্রশান্তিব সঙ্গে তিনি [illegible] যত সব অসংগতি, প্রকৃতি জগতেব যত কিছু বিশৃঙ্খলাব কথা চিন্তা কবতেন এবং সেই চিন্তাভাবনাব কথা মাঝে মাঝে তব মুখ থেকে [illegible] বেবিয়ে আসত। একদিন তিনি যখন বাগানে বেড়াচ্ছিলেন তখন এই ধবনেব [illegible] বেবিয়ে আসে তব মখ থেকে। তিনি ভাবছিলেন তিনি একা [illegible]। [illegible] থেকে কযেক পা দূবে তাব বোন ছিল তিনি তা দেখতে পাননি। [illegible] হঠাৎ থমকে দাড়ালেন তিনি। একটা বড় কালো মাকড়শা দেখতে পেলেন।

বাপ্তিস্তিনে শুনতে পেলেন তাব ভাই বলছেন, [illegible] কোনও দোষ নেই।

এই সব আপাত অবাস্তব মহত্ত্ব ও মহানুভবতাব [illegible] হযনি কেন কে জানে। এই সব কথাগুলি যদি [illegible] হয় তাহলে সেন্ট ফ্রান্সিস ও মার্কাস অবেলিয়াসেব কথাগুলোকে [illegible] হিসাবে গণ্য কবতে হবে। একবাব একটি পিপড়েকে তাব পথে দেখতে পেয়ে [illegible] কষ্ট কবে সেটাকে পাশ কাটিযে যান। এক একসময তিনি [illegible] ঘুমিযে পড়তেন। কিন্তু তাকে সে অবস্থায দেখে আবও শ্রদ্ধা জাগত মনে।

মাসযে বিযেনভেনুব বাল্যজীবন ও যৌবনেব [illegible] সব কথা [illegible] যায তা থেকে জানা যায তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিলেন এবং তিনি হিসাব আশ্রয নিতেন না। সকল মানুষ ও জীবেব প্রতি তব যে করুণাব স্রোত সতত প্রবাহিত হত, সে করুণাব স্রোত তাব কোনও সহজাত প্রবৃত্তি হতে উৎসাবিত হত না, উৎসাবিত হত এমন এক গভীব প্রত্যয থেকে যে প্রত্যয তব দৈনন্দিন জীবনযাত্রাব মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাব ভিতব দিযে জলেব ফোটাব মতো চযে চযে পড়ত তব অন্তবে। পাহাড়েব উপব থেকে জল ঝবে পড়াব জন্য যেমন ঝর্ণা বা গিবিখাতেব সৃষ্টি হয, মানুষেব স্বভাবেব মধ্যেও তেমনি প্রত্যযেব জল ঝবে পড়ে পড়ে একটি নদীখাতেব সৃষ্টি হয।

১৮১৫ সালে তাব বযস হয পচাত্তব। কিন্তু তাকে দেখে ষাট বছবেব বেশি বলে

মনে হত না। তাঁব চেহাবাটা লম্বা ছিল না, তবে স্থূলতাব দিকে একটা ঝোঁক ছিল এবং এই স্থূলতাব ভাবটাকে কমাবাব জন্য তিনি বোজ অনেকটা কবে হাঁটতেন। তিনি যখন লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতেন তখন তাঁব পিঠটা একটু ধনুকেব মতো বাঁকা দেখাত। এব থেকে অবশ্য কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ষোড়শ পোপ গ্রেগবি আশী বছব বযসেও খাড়া হযে হাসি মুখে চলতেন। তবু পোপ হিসাবে খ্যাতিলাভ কবতে পাবেননি। বিশপ বিয়েনভেনুব চেহাবাটা সুদর্শন ছিল, কিন্তু তব ব্যবহাবটা এমনই মধুব ছিল যে তাঁব চেহাবাব কথাটা কেউ মনে বাখত না।

তাব কথাবার্তায যে শিশুসুলভ এক সবলতা আব সুষমা ছিল তাতে সকলেই স্বচ্ছন্দ অনুভব কবত। তাব সমস্ত দেহ হতে একটা জ্যোতি বিচ্ছুবিত হত। তিনি যখন হাসতেন, তখন তাব সাদা ঝকঝকে সুন্দব দাঁতগুলো বেবিযে আসত, তখন সবাই তাব শিশুসুলভ সবলতায মুগ্ধ হযে তাকে তাদেব আপনজন ভাবত। অনেকে বলত, 'যেন এক সুন্দব ছেলে।' আবাব অনেকে বলত, 'কী ভাল লোক!' নেপোলিযন যখন তাকে প্রথম দেখেন তখন তাব মনেও এই ভাব জাগে। যে কোনও লোক তাকে প্রথম দেখলেই এইবকম ভাব মনে জাগত তাব। কিন্তু কযেক ঘণ্টা তাব কাছে থাকলে দেখা যেত তাঁ চিন্তামগ্ন চেহাবা ক্রমশ পাল্টে আবও মনোহাবী হযে উঠছে। তাব মাথায পাকা চুল থাকায তাব প্রশস্ত উদাব ললাট আবও গম্ভীব দেখাত। তিনি সব সময় ঈশ্ববচিন্তায বিভোব ও ধ্যানমৌন থাকাব জন্য সে ললাট আবও মহান ও শান্ত দেখাত। অন্তবেব সততা থেকে এক স্তব্ধমহান গাম্ভীর্য উৎসাবিত হযে ছড়িয়ে থাকত তাব সাবা দেহে। তাকে দেখলেই এক সদাহাস্যময দেবদূতেব কথা মনে পড়ত যে যেন পক্ষবিস্তাব কবে হাসি ছড়াচ্ছে। তাকে দেখলেই এক অবর্ণনীয শ্রদ্ধা জাগত সকলেব মনে, মনে হত তাবা যেন এসে পড়েছে পবম করুণাময এক মহান ব্যক্তিব কাছে যাব সর্বাঙ্গ থেকে সতত এক সর্বব্যাপী কবুণা ও মমতাব মধু ঝবে পড়ছে।

আমবা আগেই দেখেছি দৈনন্দিন জীবনে সব সময় তিনি কোনও না কোনও কাজে ব্যস্ত থাকতেন। প্রার্থনা, অফিসেব কাজ, ভিক্ষাদান, আর্তদেব সান্ত্বনাদান, বাগানেব কাজ, তব দেহটি যখন এই সব কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকত, মনটি তখন তাব সৌভ্রাতৃত্ব, মিতব্যাযিতা, আতিথেযতা, ত্যাগ, বিশ্বাস আব পডাশুনোব কথায ভবে থাকত। এইভাবে সৎ চিন্তা আব সৎ কর্মেব মধ্য দিযেই দিনগুলো কেটে যেত তাব। কিন্তু সাবাদিন সব কাজ কবেও তব মনে হত কিছু কবা হল না যদি বাত্রিতে শোবাব আগে আবহাওযা ভাল থাকলে বাগানে দ এক ঘণ্টা একা না কাটাতেন। ঘুমোবাব আগে স্তব্ধগম্ভীব নৈশ আকাশে ব তলে কিছুক্ষণ ধ্যান বা ঈশ্ববচিন্তা কবা ক এক অত্যাবশ্যক আনুষ্ঠানিক কর্ম বলে ধবে নিযেছিলেন তিনি।

বাড়িব মহিলা দু'জন তখন শুতে চলে যেত। তাবা উপবতলায গিযে যদি ঘুমিযে না পড়ত তাহলে তাবা শুনতে পেত বাগানেব পথে একা একা পাযচাবি কবে বেড়াচ্ছেন বিশপ। আপন নিঃসঙ্গতায আপনি বিভোব হযে তিনি যেন আকাশে উদাব প্রশান্তিব

সঙ্গে আপন অন্তরের প্রশান্তিকে মিলিয়ে নিয়ে দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বস্তুর মাঝে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের সন্ধান করে চলতেন মনে মনে। অজ্ঞাতলোক হতে যে সব চিন্তা ঝরে পড়ত নিঃশব্দে তার সামনে তাঁর অন্তরকে প্রসারিত করে দিতেন তিনি। এই সব মুহূর্তে বিশ্বসৃষ্টির সর্বব্যাপী ঐশ্বর্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নক্ষত্রালোকিত রাত্রির মাঝে ক্রমোন্মীলিত গন্ধবিহীন কুসুমরাজির মতো তিনি যখন ধীরে ধীরে আপন অন্তরকে উন্মীলিত করে দিতেন তখন তিনি বুঝতে পারতেন না, তিনি কি পেলেন বা কি দিলেন, বাইরে থেকে কি এসে প্রবেশ করল তাঁর অন্তরে আর তাঁর অন্তর থেকেই বা কি বেরিয়ে গেল, বুঝতে পারতেন না কি ঘটছে তাঁর অন্তর্জগতে। এইভাবে বিশ্বসৃষ্টির অনন্তত্বের সঙ্গে তাঁর আপন অন্তরের অনন্তত্বের এক রহস্যময় আদান-প্রদান চলত।

জাগতিক সব বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের মহত্ত্ব এবং জীবন্ত অস্তিত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন বিশপ। অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতেন, তাঁর বোনের সামনে পরিদৃশ্যমান শান্ত সসীম বস্তুর মাঝে অসীম অনন্তকে ধরার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বোধাতীত এই সব বিষয়কে বুঝতে না পেরে তিনি শুধু চিন্তা করে যেতেন। তিনি ঈশ্বরকে নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতেন না, তিনি শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করে যেতেন। অণু-পরমাণুর যে সুষম সমন্বয় প্রতিটি বস্তুর অবয়বকে গড়ে তুলে তাকে সত্তা দান করে, তাকে শক্তি দেয়, একের মধ্যে অসংখ্য এবং সমগ্রের মধ্যে ভিন্নতার সৃষ্টি করে এবং এক আলোক বিকীরণ করে তার মাধ্যমে সৌন্দর্যের জন্ম দেয়, সেই আণবিক সমন্বয়ের কথা ভাবতেন তিনি। এই সমন্বয় এবং অন্তহীন যোগ-বিয়োগের লীলাই জীবন এবং মৃত্যু।

বাগানে একটি বেঞ্চের উপর বসে তার ভাঙা রঙের গায়ে পিঠটা হেলান দিয়ে ফলের গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আকাশের তারার পানে তাকিয়ে থাকতেন তিনি। সারা বাড়িটার মধ্যে এই জায়গাটা বড় প্রিয় ছিল তাঁর কাছে।

সারা দিনরাতের মধ্যে এই অবসরটুকু ছাড়া আর কিছুই চান না বিশপ। রোজ দু'বার করে বাগানে যেতেন তিনি—একবার দিনের বেলায় বাগানের কাজ করতেন, গাছের যত্ন নিতেন আর রাত্রিবেলায় বাগানে বসে ঈশ্বরচিন্তা করতেন। তাঁর কর্মব্যস্ত দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে মুক্ত আকাশের চন্দ্রাতপতলে এই ছোট্ট জায়গাটুকু ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে যথেষ্ট। পায়ের তলায় ছড়ানো অসংখ্য ফুল আর মাথার উপরে অসংখ্য তারা নিয়ে এই স্বল্পপরিসর জায়গাটুকুতে পায়চারি আর চিন্তা করা—আর কি চান তিনি!

১৪

আমরা বিশপের যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিবরণ দান করেছি তাতে মনে হবে তিনি ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী। কিন্তু আসলে বিশপ এক নিজস্ব জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিঃসঙ্গ নির্জন মনের উদার পটভূমিতে সঞ্জাত এই জীবনদর্শন অনেক সময় প্রথাগত প্রচলিত ধর্মমতের সঙ্গে খাপ খেত না। যারা মঁসিয়ে বিয়েনভেনুকে চিনত

ও জানত তাদের এই ধারণাই হত তাঁর সম্বন্ধে। তারা বুঝত তাঁর অন্তরই ছিল সব চিন্তার উৎস, অন্তরের আলো থেকেই তাঁর সব ভাব ও প্রজ্ঞার উদ্ভব হত।

কিন্তু কোনও এক বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেননি তিনি। অনেক দার্শনিক কথা চিন্তা করতেন তিনি শুধু নির্জনতার শান্ত আকাশে। এই সব নির্জন চিন্তার ফলে সহজ ও স্বতস্ফূর্তভাবে যে সব তত্ত্বকথা তাঁর অন্তর থেকে বেরিয়ে আসত সেই সব কথাই বাইরে বলতেন তিনি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তাঁর যুক্তিকে বিব্রত করে তুলতেন না কখনো। একজন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ অনেক বেশি সাহসের পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু একজন বিশপকে সতর্কতার সঙ্গে চলতে হয়। যে সব সমস্যা দেশের বড় বড় চিন্তাশীল ও ধর্মগুরুদের ভাবনার বস্তু সেই সব সমস্যা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতেন না তিনি। সেই সব জটিল সমস্যার দ্বারপ্রান্তে এসে এক ধর্মগত ভয়ে থমকে দাঁড়াতেন তিনি। সে দ্বারপ্রান্তের ওপারে অন্ধকার প্রশস্ত বারান্দা প্রসারিত হয়ে আছে, কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য অশ্রুত কণ্ঠস্বর যেন সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করছে তাঁকে। যে দুঃসাহসী ব্যক্তি সেখানে জোর করে প্রবেশ করে তাকে দুঃখ পেতে হয় পরিশেষে। কিছু কিছু প্রতিভাধর পুরুষ সীমাহীন নির্বিশেষ কল্পনা আর অন্তহীন ধ্যান-ধারণার গভীরে গিয়ে যে সব তত্ত্ব উপলব্ধি করেন সেগুলিকে তাঁরা প্রথমে ঈশ্বরকেই সমর্পণ করেন। সেই তত্ত্বকথাগুলিই এক একটি ব্যক্তিগত ধর্মমতে পরিণত হয়। তবু তার মধ্যে অনেক প্রশ্নের অবকাশ আছে, অনেক দায়িত্ব জড়িয়ে আছে তার সঙ্গে।

মানুষের চিন্তার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। মানুষ কোনও কিছু বুঝাতে না পারলেও সেই দুর্বোধ্য বিষয়কে সে তার উদ্ধত চিন্তা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। প্রাকৃত বা বস্তুজগৎকে ফেলে সে এক তুরীয়লোকে উঠে যায়। সেখানে চিন্তার কর্তা এবং চিন্তার বস্তু মিলে মিশে এক হয়ে যায়। যাই হোক, কিছু লোক অবশ্য আছেন যাঁরা তাদের চিন্তার দিগন্তের ওপারে পরম সত্যের চূড়াটি স্পষ্ট দেখতে পান। সে যেন এক ভয়ঙ্কর অন্তহীন সীমাহীন এক বিশাল পাহাড়। মঁসিয়ে বিয়েনভেনু এই সব নেতাদের একজন ছিলেন না; তার সে প্রতিভা ছিল না। তিনি সেই বিশাল পাহাড়ের অভ্রভেদী চূড়াগুলিকে বিশ্বাস করতে পারতেন না যার থেকে সুইডেনবার্গ ও পাস্কেলের মতো মহান পণ্ডিতরা পড়ে গিয়ে উন্মাদ হয়ে যান। অবশ্য এই সব শক্তিশালী চিন্তাশীলদের চিন্তার একটা মূল্য আছে, কারণ এই চিন্তার থেকেই আমরা পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। কিন্তু বিশপ বিয়েনভেনু সে পথে না গিয়ে এক সহজ পথ ধরেন। সে পথ হচ্ছে বাইবেলের হোলি গসপেলের পথ।

তিনি এলিজার পোশাক পরে বর্তমানের কুয়াশাচ্ছন্ন কঠিন ঘটনাজালের উপর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির কোনও আলোকসম্পাত করতে চাইতেন না। সেই দূরদৃষ্টির আলোকটিকে এক উজ্জ্বল জ্যোতিতে পরিণত করতে পারতেন না। তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বা ঋষি ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক সাধারণ সরল প্রকৃতির মানুষ যিনি সকলকে নির্বিশেষে ভালবেসে যেতেন।

তিনি ধর্মগত সীমাকে অতিক্রম কবে তাঁব প্রার্থনাব বস্তুকে অতিমানবিক আশা আকাঙ্ক্ষা পূবণেব লক্ষ্য পর্যন্ত প্রসাবিত কবতেন ঠিক। কিন্তু আমাদেব ভালবাসাব যেমন একটা সীমা আছে, তেমনি প্রার্থনাবও একটা সীমা আছে। তবে ধর্মগত সীমাব বাইবে ধর্মগ্রন্থনির্দিষ্ট বিষযবস্তুব বাইবে প্রার্থনা কবাটা যদি খৃস্টীয ধমমতেব বিবোধিতা হয তাহলে সেন্ট টেবেস ও সেন্ট জেবোফ খৃস্টবিবোধী ছিলেন।

তাঁব অন্তব শুধ্ মানুষেব দুঃখমোচনেব চিন্তায সব সময বিব্রত থাকত। তাব মনে হত সাবা জগৎ অন্তহীন দুঃখদুর্দশায ভবা। তিনি সর্বত্রই দেখতেন শুধ্ দুঃখকষ্টেব উত্তাপ এবং সে দুঃখকষ্টেব কাবণ জানতে না চেযে সেই দুঃখেব ক্ষত নিবাময কবাব জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কবে যেতেন তিনি। বাস্তব দুঃখদুর্দশাব ভযঙ্কব অবস্থা দেখাব সঙ্গে সঙ্গে তাঁব মমতা ও সমবেদনা বেড়ে গেল। সেই দুঃখদুর্দশাব হাত থেকে কিভাবে মুক্ত কবা যায মানুষকে তিনি তাব উপায খুজতেন এবং আব পাঁচজনকে সে উপায বলে দিতেন। তাব কেবলি মনে হত পৃথিবীব সব মানুষ যেন এক অসহনীয দুঃখেব নিবিডতায সান্ত্বনা পাবাব জন্য উন্মুখ হযে আছে।

অনেক মানুষ সোনাব জন্য খনি খোড়ে। কিন্তু বিশপ বিযেনভেনুব কাছে দুঃখ দাবিদ্র্যই ছিল সোনাব খনি। সে খনি খুড়ে তাব থেকে শুধু কৰুণা কুড়িযে আনতেন তিনি। বিশ্বব্যাপী দুঃখকষ্টেব জন্য বিশ্বব্যাপী বদান্যতাব এক প্রযোজনীযতা অনুভব কবতেন। 'পবস্পবকে ভালবাস' এই ছিল তাব নীতি এবং এই নীতিই ছিল তাব জীবনেব সব। এব বেশি আব কিছু চাইতেন না তিনি।

যে সিনেটাবেব কথা আমবা আগেই উল্লেখ কবেছি, যিনি বিশপকে দার্শনিক বলতেন, তিনি একদিন তাকে বলেন, আপনি দেখুন, এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ একে অপবেব সঙ্গে সংগ্রামে মত্ত এবং যে বলবান সেই জযলাভ কবে সে সংগ্রামে। পবস্পবকে ভালবাস এই নীতি এক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আব কিছুই না।

বিশপ তখন তাব সঙ্গে কোনও বিতর্ক না কবে বলেন, ঠিক আছে, এটা যদি নির্বুদ্ধিতা হয, তাহলে সব মানুষেব আত্মাব উচিত ঝিনুকেব মধ্যে মুক্তাব মতো সে নির্বুদ্ধিতাকে বুকেব মধ্যে ধবে বেখে তা বক্ষা কবা। তিনি তাই কবতেন। সেই নির্বুদ্ধিতাকে বুকেব মধ্যে ঢেকে বেখে তিনি চলতেন, যে সব বড় বড় প্রশ্ন এক একটি অন্তহীন বিশাল শূন্যতা গভীবতা নিযে চিন্তাশীল মানুষদেব মস্তিষ্ক ও ভীত কবে তোলে, তিনি সেগুলিকে এড়িযে যেতেন। আস্তিকবা এই সব প্রশ্নেব বিশাল গভীবতাব মধ্যে ঈশ্ববকে দেখতে পায, আব নাস্তিকবা সেখানে ঈশ্ববকে না পেযে নবকে গমন কবে। মানুষেব ভাগ্য, ভাল মন্দ, মানুষে মানুষে বিবাদ বিসম্বাদ, মানুষেব ও পশুব চেতনা, মৃত্যুতে মানুষেব রূপান্তব, সমাধিতে মানুষেব পুনর্জীবনেব কল্পনা, গতিশীল আত্মাব নতুন নতুন প্রেমেব অভিজ্ঞতা, বস্তু ও তাব সত্তা, মানুষেব আত্মাব স্বরূপ, স্বাধীনতা, প্রযোজন, খাড়াই পাহাড়েব মতো এই সব সমস্যামূলক প্রশ্নগুলি বিবাট চিন্তাশীল ব্যক্তিদেব অভিভূত কবে। লুক্রেশিযা, পল ও দান্তেব মতো দার্শনিক ও চিন্তাশীল এই সব প্রশ্নেব অন্তহীন অন্ধকাব শূন্যতাব মাঝে সন্ধানী দৃষ্টিব আলো

ফেলে তাব সমাধান খুজতে গিযে সেই অনন্ত শক্তির সন্ধান পান যা সমস্ত আলোব উৎস।

মঁসিযে বিযেনভেনু ছিলেন এমনই এক সবল মানুষ যিনি এই সব প্রশ্ন ও সমস্যাগুলিকে বাইবে থেকে দূব থেকে দেখতেন, তাদের খুব কাছে গিযে সমাধানেব চেষ্টা করতেন না। এই সব প্রশ্নেব দ্বাবা মনকে কখনো পীড়িত হতে দিতেন না। ইহলোক অতিক্রম কবে পবলোকেব চিন্তায মগ্ন হযে থাকতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

১৮১৫ সালেব অক্টোবব মাসেব প্রথম দিকে সূর্যাস্তের এক ঘন্টা আগে একজন পথিক পদব্রজে দিগনে শহবেব পথে প্রবেশ কবল। শহবেব কিছুসংখ্যক লোক যাবা খোলা জানালা বা দবজা দিযে তাকে দেখল, এক অস্পষ্ট সংশযে আচ্ছন্ন হযে উঠল তাদেব মন। এমন অবাঞ্ছিত অশোভন বেশভূষায কোনও পথিককে সাধাবণত দেখা যায না। বযসে লোকটি ছিল মধ্যবযসী, প্রায চল্লিশেব কাছাকাছি। চেহাবাটা ছিল বলিষ্ঠ, কাঁধ দুটো চওড়া, দেহেব উচ্চতা মাঝামাঝি। মাথায ছিল একটা চামড়াব টুপি। তাতে তাব মুখেব আধখানা প্রায ঢাকা ছিল। বোদে পোড়া মুখখানা থেকে ঘাম ঝবছিল। তাব গাযেব চাদবটা দড়িব মতো পাকানো ছিল এবং তাব পবনেব জ্যাকেট পাযজামা সবই ছেঁড়া ছিল। তাব পাযে মোজা ছিল না, জুতোয পেবেক আঁটা ছিল। তাব মাথাব চুলগুলো লম্বা কবে ছাটা ছিল, কিন্তু মুখেব দাড়িটা লম্বা হযে উঠেছিল। বেশ কিছুদিন কাটা হযনি দাড়িটা। ঘাম আব পথেব ধুলো আবও শোচনীয কবে তুলেছিল তাব চেহাবাটাকে।

এ শহবেব কেউ চিনত না তাকে। হযত সে দক্ষিণ দিকেব উপকূলভাগ থেকে এসে শহবে ঢুকছিল। ঠিক সেই পথ দিযে শহবে ঢুকছিল যে পথ দিযে সাত মাস আগে নেপোলিযন কেনস থেকে প্যাবিসে গিযেছিলেন। সে নিশ্চয সাবাদিন পথ হেঁটেছিল, তাই তাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বাজাবেব কাছে সাধাবণেব জল খাবাব জন্য একটা ঝর্ণা ছিল, তাতে সে দু'বাব জল খায।

ব্যু পযশে ভার্তেব কোণেব কাছে সে বাঁদিকে ঘুবে টাউন হলেব দিকে পথ ধবে। সে টাউন হলে ঢুকে আধ ঘন্টা পবে বেবিযে আসে। টাউন হলেব দবজাব কাছে একটা পাথবেব বেঞ্চেব উপব একজন পুলিশ বসেছিল যেখান থেকে ৪ঠা মার্চ জেনাবেল দ্রাউন্ড সমবেত জনতাকে নেপোলিযনেব গলফ জুযানে অবতবণেব ঘোষণাপত্রটি পড়ে শুনিযে চমকে দেয। পথিক পুলিশেব কাছে এসে টুপি খুলে অভিবাদন জানাল তাকে। পুলিশ তাকে প্রতি অভিবাদন না জানিযে তাব চেহাবাটাকে খুঁটিযে দেখতে লাগল। পথিকটি সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতেই সে তাব নিজেব কাজে অফিসেব ভিতব ঢুকে গেল। সেকালে দিগনেতে একটি সুদৃশ্য পান্থশালা ছিল, তাব নাম ছিল ত্রয দা কোলবা

আর তার মালিকের নাম ছিল জ্যাকিন লাবারে। গ্রেনোবেলের ত্রয় ডফিন নামে পান্থশালার মালিক আর এক লাবারের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক ছিল। সম্রাটের গলফ জুয়ানে অবতরণকালে ত্রয় ডফিন সম্পর্কে অনেক গুজব রটেছিল। লোকে বলত গত বছর জানুয়ারিতে জেনারেল বার্ট্রান্ড গোপনে ত্রয় ডফিন গাড়িচালকের ছদ্মবেশে এসে সৈনিকদের পদক আর কিছু নাগরিককে মুদ্রা দান করে যায়। আসল কথা হলো এই যে সম্রাট নেপোলিয়ন গ্রোনোবেলে এসে মেয়র যেখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছিল সেখানে না থেকে তিনি ত্রয় ডফিনে চলে যান। বলেন, সেখানে তাঁর এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। তাতে ত্রয় ডফিনের খ্যাতি চারদিকে পঁচিশ মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে দিগনের ত্রয় দ্য কোলবার খ্যাতিও বেড়ে যায়। লোকে বলে ত্রয় কোলবার মালিক ত্রয় ডফিনের মালিকের জ্ঞাতি ভাই।

পথিক দিগনের ত্রয় কোলবার দিকে এগিয়ে যায়। হোটেলের রান্নাঘরটি রাস্তার দিকে ছিল। পথিক সেই খোলা রান্নাঘর দিয়ে হোটেলে প্রবেশ করল। রান্নার উনোনগুলিতে তখন আগুন জ্বলছিল। হোটেলের মালিক তখন রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল। সে তখন ওয়াগনে করে আসা একদল লোকের খাবার তৈরি করছিল। লোকগুলো পাশের ঘরে কথাবার্তা বলছিল আর হাসাহাসি করছিল। ওয়াগনে করে আসা লোকরা হোটেলে বেশি খাতির পায় একথা সবাই জানে।

দরজা দিয়ে পথিক রান্নাঘরে প্রবেশ করতেই হোটেল মালিক বলল, আমি মঁসিয়ের জন্য কি করতে পারি?

পথিক বলল, খাবার আর একটা বিছানা চাই।

পথিককে খুঁটিয়ে দেখে হোটেল মালিক বলল, তা অবশ্যই পাওয়া যাবে, তবে তার জন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে।

তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা চামড়ার থলে বার করে পথিক বলল, আমার কাছে টাকা আছে।

হোটেলের মালিক বলল, তাহলে আপনি থাকতে পারেন। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

চামড়ার থলেটা আবার তার পকেটে রেখে তার পিঠে সৈনিকদের মতো যে একটা ব্যাগ ছিল সেটা মেঝের উপর নামিয়ে রাখল। তারপর হাতের লাঠিটা ধরেই আগুনের পাশে একটা টুলের উপর বসে পড়ল পথিকটি। দিগনে শহরটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলে অক্টোবর মাসেই সেখানে দারুণ শীত পড়ে। হোটেল মালিক রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও মাঝে মাঝে পথিকের পানে তাকিয়ে কি দেখছিল।

হোটেল মালিক এক সময় বলল, আপনার খাবার কি তাড়াতাড়ি চাই?

পথিক উত্তর করল, হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি।

ঘরের দিকে পিছন ফিরে বসে আগুনে গা-টা গরম করছিল পথিক। হোটেল মালিক জ্যাকিন লাবারে একটা খবরের কাগজ থেকে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে তার

উপর পেন্সিল দিয়ে দুই-এক লাইন কি লিখল। তারপর তার একটা বালকভৃত্যকে ডেকে সেই কাগজটা তার হাতে দিয়ে কি বলতেই ছেলেটা টাউন হলের দিকে তখনি চলে গেল। পথিক এসব কিছুই দেখতে পেল না।

সে হোটেল মালিককে জিজ্ঞাসা করল, খাবার কি শিগ্‌গির পাওয়া যাবে?

হোটেল মালিক বলল, হ্যাঁ, শিগ্‌গির পাওয়া যাবে।

ছেলেটি ফিরে এসে একটুকরো কাগজ এনে হোটেল মালিকের হাতে দিতেই সে সেটা ব্যগ্রভাবে ধরে নিল। তারপর একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগল। পরে সে পথিকের কাছে গিয়ে দেখল পথিক এক মনে কি সব ভাবছে।

হোটেল মালিক বলল, দুঃখিত মঁসিয়ে, আমি এখানে আপনাকে থাকতে দিতে পারব না।

পথিকটি মুখ ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কিন্তু কেন? আমি টাকা দিতে পারব না বলে আপনি কি ভয় করছেন? আপনি কি আগাম টাকা চান? আমি তো বলেছি আমার কাছে টাকা আছে।

কথাটা তা নয়।

তাহলে কি?

আপনার কাছে টাকা আছে। কিন্তু—

কিন্তু কি?

আমার হোটেলে ঘর খালি নেই।

পথিক তখন শান্ত কণ্ঠে বলল, তাহলে আমাকে আস্তাবলে একটা জায়গা করে দিন।

সেখানে আমি থাকতে দিতে পারি না।

কেন পারেন না?

সেখানে ঘোড়াগুলো গোটা ঘরটা জুড়ে থাকে।

তাহলে খড়ের গাদার কাছে। খাওয়ার পর সেটা দেখা যাবে।

আপনাকে আমি খাবার দিতে পারব না।

হোটেল মালিকের দৃঢ় ও স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে পথিকের সর্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠল। সে বলল, কিন্তু আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি। সকাল থেকে পথ হাটছি আমি। প্রায় চব্বিশ মাইল পথ হেঁটেছি। কিছু না কিছু আমাকে খেতেই হবে।

হোটেল মালিক বলল, আপনাকে কিছুই দিতে পারব না আমি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি?

সব খাবার ও ঘর সংরক্ষিত করে রেখেছে।

কাদের দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছে?

ওয়াগনে করে আসা লোকেদের।

ওরা সংখ্যায় কত জন?

বারো জন।

কিন্তু কুড়ি জনের মতো খাবার ও ঘর আছে এখানে।

ওরা সব কিছুর জন্য আগেই অগ্রীম টাকা দিয়ে রেখেছে।

পথিক আবার বসে পড়ে আপন মনে বলতে লাগল, আমি একজন ক্ষুধার্ত পথিক। আমি এখানেই বসে থাকব।

হোটেল মালিক পথিকের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে বলে উঠল, চলে যাও এখান থেকে।

তা শুনে চমকে উঠল পথিক। সে কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই হোটেল মালিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলতে লাগল, আর কথা বলে লাভ নেই। তুমি কে, কি কর তা কি আমার কাছ থেকে শুনতে চাও ? তোমার নাম হচ্ছে জাঁ ভলজা। আমি টাউন হলে লোক পাঠিয়েছিলাম এবং দেখ কি লিখে দিয়েছে।

একটা কাগজের টুকরো পথিকের সামনে হোটেল মালিক ধরতেই তার উপরকার লেখাটা পড়ে ফেলল সে। তাতে লেখা ছিল, আমি সকলের সঙ্গেই ভদ্র ব্যবহার করতে চাই। দয়া করে চলে যান।

আর কিছু না বলে পথিকটি টুল থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর পিছন ফিরে না তাকিয়ে আনমনে বড় রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল সে। অপমানবোধের এক জ্বালাময় বিষাদ আচ্ছন্ন করে ছিল তার মনকে। কিন্তু যদি একবার সে মুখ ঘুরিয়ে পিছন ফিরে তাকাত তাহলে সে দেখতে পেত হোটেলের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হোটেল মালিক তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে কি সব বলছে আর তার চারদিকে একদল লোক ভিড় করে দাড়িয়ে আছে। বুঝতে পারল তার এই আকস্মিক আসার কথাটা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচারিত হয়ে পড়বে সারা শহরে।

এসব কিছুই দেখতে পায় না সে। দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষ পিছন ফিরে কখনও তাকায় না। কারণ সে জানে দুর্ভাগ্য পিছন থেকে তাড়া করে মানুষকে। নিঃসীম নিবিড় হতাশার চাপে ক্লান্তির কথা ভুলে গিয়ে অজানা শহরের পথ দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে এগিয়ে চলল সে। হঠাৎ ক্ষুধার জ্বালাটা আবার অনুভব করতে লাগল সে। সে দেখল সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। রাত্রির মতো একটা আশ্রয় দরকার।

সে জানত কোনও ভাল বাসস্থান আর সে পাবে না। তার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সে চায় গরীব-দুঃখীরা যেখানে থাকে সেই ধরনের ছোটখাটো একটা পান্থশালা। যেতে যেতে হঠাৎ সে দেখল যে পথ দিয়ে সে হাঁটছিল তার শেষ প্রান্তে একটা ঘরে একটা টর্চের আলো ঝুলছে। সেই আলোটা লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল সে।

র‍্যু দ্য শোফা অঞ্চলে ওটা হচ্ছে একটা ছোটখাটো হোটেল। হোটেলটার কাছে এসে পথিক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঘরের ভিতরটা দেখল। দেখল ঘরের ভিতরে টেবিলের উপর একটা আলো জ্বলছে। জনকতক লোক মদ পান করছে। হোটেল মালিক আগুনের পাশে বসেছিল আর উনোনে কি একটা রান্নার জিনিস সিদ্ধ হচ্ছিল।

হোটেলে ঢোকার দুটো প্রবেশপথ ছিল — একটা সামনের দিকে আর একটা পিছন দিকে একটা উঠোনের উপর দিয়ে গোবরের স্তূপের পাশ দিয়ে। পথিক সামনের দিক দিয়ে যেতে সাহস পেল না। সে তাই পিছন দিকে উঠোন পার হয়ে দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল।

হোটেল মালিক বলল, কে আসে ?

পথিক বলল, খাবার আর একটা বিছানা চাই শোবার।

তাহলে ভিতরে আসতে পার। দুটোই পাবে।

পথিক ঘরের ভিতর ঢুকে উনোনের জ্বলন্ত আগুনের আভা আর টেবিল ল্যাম্পের আলোর মাঝখানে দাড়াতেই উপস্থিত সকলেই তার পানে তাকাল। সে তার পিঠের ব্যাগটা যখন নামাল তখনো সকলে নীরবে তাকিয়ে ছিল তার পানে।

হোটেল মালিক বলল, উনোনে ঝোল সিদ্ধ হচ্ছে। এস বন্ধু, শরীরটা একটু গরম করে নাও।

পথিক আগুনের ধারে বসে তার ক্লান্ত পা দুটো ছড়িয়ে দিল। ঝোল সিদ্ধর একটা মিষ্টি গন্ধ আসছিল। মাথার টুপিটা মুখের উপর অনেকটা নামানো থাকায় তার মুখের যতটা দেখা যাচ্ছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল সে সচ্ছল সুখী পরিবারের লোক। কিন্তু দীর্ঘ... দু... কষ্টে জর্জরিত হওয়ার ফলে তার অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখখানায় বিষাদ জমে থাকলেও সে মুখ দেখে বোঝা যায় তার চেহারা বেশ বলিষ্ঠ। বৈপরীত্যমূলক অদ্ভুত একটা ভাব ছিল সে মুখে। সে মুখে একদিকে ছিল আপাতনম্রতার একটা ছাপ আর অন্যদিকে ছিল আপাতপ্রভত্বের এক ঔদ্ধত্য। তার ঘন ভ্রূযুগলের নিচে তার চোখ দুটো ঝোপের তলায় আগুনের মতো জ্বলছিল।

ঘরের মধ্যে যে সব লোক মদ পান করছিল তাদের মধ্যে একজন মৎস ব্যবসায়ী ছিল। আজ সকালে সে যখন ঘোড়ায় চেপে এক জায়গা দিয়ে আসছিল তখন এই পথিকের সঙ্গে দেখা হয়। পথিক নিদারুণ ক্লান্তির জন্য ঐ মৎস ব্যবসায়ীকে তার ঘোড়ার উপর তাকে চাপিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করে কিন্তু মৎস ব্যবসায়ী তার উত্তরে জোরে চালিয়ে দেয় তার ঘোড়াটাকে। আবার কিছুক্ষণ আগে জ্যাকন লাবারে যখন তার হোটেল থেকে এই পথিককে তাড়িয়ে দেয় তখনও ঐ মৎস ব্যবসায়ী হোটেলের দরজার সামনে দাড়িয়েছিল। সে এখানে এসে সবাইকে সেকথা বলে দেয়। হোটেল মালিক সেকথা জানত না। পথিক এ হোটেলে এসে ঢুকে আগুনের ধারে বসতেই সে হোটেল মালিককে ডেকে তাকে জানিয়ে দিল কথাটা।

সেকথা শুনে হোটেল মালিক পথিকের কাছে এসে তার কাধে একটা হাত দিয়ে বলল, এখান থেকে তোমাকে চলে যেতে হবে।

পথিক মুখ তুলে শান্তভাবে বলল, তোমরাও তাহলে জেনে ফেলেছ ?

হ্যা।

ওরা আমাকে ওদের হোটেল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এখান থেকেও তোমায় তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু কোথায় যাব আমি ?

অন্য কোথাও।

পথিক তখন হাতে লাঠিটা আর পিঠে ব্যাগটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বড় রাস্তায় আসতেই একদল ছেলে কোথা থেকে এসে ঢিল ছুঁড়তে লাগল পথিকের উপর। সে তখন তার লাঠিটা ঘোরাতেই ছেলেগুলো পাখির ঝাঁকের মতো পালিয়ে গেল।

পথিক এবার একটা জেলখানার সামনে এসে দাঁড়াল। সে ফটকের সামনে একটা শিকলে ঝোলানো ঘণ্টাটা বাজাতেই দরজা খুলে একজন প্রহরী বেরিয়ে এল।

পথিক তখন তার টুপিটা মাথা থেকে সরিয়ে বলল, মঁসিয়ে, আপনি দয়া করে রাতটার মতো এখানে আমাকে থাকতে দেবেন ?

প্রহরী বলল, এটা কারাগার, পান্থশালা নয়। গ্রেপ্তার না হলে এখানে থাকতে পাওয়া যায় না।

এই বলে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

পথিক এবার বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিপথে ঢুকে একটা বাগান দেখতে পেল। সেই বাগানের ভিতর একটা একতলা বাড়ি ছিল। সে বাড়ির একটা ঘরের খোলা জানালা দিয়ে আলোর ছটা আসছিল। পথিক জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর দৃষ্টি ছড়িয়ে দেখল, প্রশস্ত ঘরখানার মাঝখানে খাটের উপর একটা বিছানা পাতা ছিল। বিছানার উপর ক্যালিকো কাপড়ের একটা চাদর পাতা ছিল। ঘরের এককোণে একটা দোলনা ছিল। টেবিলে একটা পাত্রে মদ ছিল। প্রায় চল্লিশ বছরের একটি লোক টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসে একটি শিশুকে তার হাঁটুর উপর দাঁড় করিয়ে তাকে নাচাচ্ছিল। তার সামনে এক যুবতী নারী একটি শিশুকে স্তনদান করছিল। পিতা তার শিশুকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল আর মা হাসিমুখে তা দেখছিল। একটি পিতলের ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল ঘরখানা।

পথিক জানালার ধারে দাঁড়িয়ে এই মধুর দৃশ্যটি দেখতে দেখতে ভাবতে লাগল। সে কি ভাবছিল সে-ই তা জানে। সে হয়ত ভাবছিল এই সুখী পরিবারে হয়ত আতিথেয়তার অভাব হবে না। যেখানে এত আনন্দ সেখানে একটুখানি বদান্যতা আশা করা হয়ত অন্যায় হবে না।

পথিক দরজার উপর মৃদু করাঘাত করল। কিন্তু ঘরের ভিতরে কেউ তা শুনতে পেল না। সে আবার দ্বিতীয়বার দরজায় করাঘাত করতে স্ত্রী তা শুনতে পেয়ে তার স্বামীকে বলল, কে হয়ত ডাকছে।

স্বামী বলল, ও কিছু না।

পথিক তৃতীয়বার দরজায় করাঘাত করতেই স্বামী এবার বাতিটা হাতে নিয়ে দরজা খুলল।

লোকটির চেহারাটা লম্বা। তাকে দেখে মনে হলো সে একজন চাষী, কিন্তু কোনও

কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করে। সে চামড়ার একটা আলখাল্লা পরে ছিল। তার ভ্রূযুগল ঘন।

পথিক বলল, মাপ করবেন মঁসিয়ে, আমি যদি আপনাকে টাকা দিই তাহলে আপনি কি আমাকে এক প্লেট ঝোল আর আপনার বাড়ির বাইরে বাগানেব ধারে এই চাতালটায় রাতের মতো থাকতে দেবেন ?

লোকটি বলল, টাকা দিলে কোনও ভদ্রলোককে অবশ্যই আমি আশ্রয় দেব। কিন্তু আপনি কেন কোনও হোটেলে গেলেন না ?

হোটেলে কোন ঘর খালি নেই।

সেকি ? আজ তো হাটবার নয়। আপনি লাবারতে গিয়ে একবার দেখেছিলেন ?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

তাহলে ?

পথিক অস্বস্তিসহকারে বলল, কেন জানি না, ওরা আমাকে থাকতে দিল না।

অন্য হোটেলে দেখেছিলেন ? যেমন র‍্যু দ্য শোফা ?

পথিকের অস্বস্তি বেড়ে গেল। সে বিড বিড করে বলল, ওরাও আমাকে থাকতে দিল না।

লোকটির মুখেব উপব এবার এক অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠল। লোকটি পথিকের আপাদমস্তক একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বলল, তুমি কি তাহলে—

এই কথা বলেই সে ঘরের ভিতব ঢুকে বাতিটা নামিয়ে রেখে দেওয়াল থেকে তার দোনলা বন্দুকটা এনে পথিককে বলল, বেরিয়ে যাও। চলে যাও এখান থেকে।

স্বামীর কথায তাব স্ত্রী ছেলে দুটিকে ধবে বলে উঠল, তবে কি ডাকাত ?

পথিক বলল, আমি অনুরোধ করছি মঁসিয়ে, আমাকে একগ্লাস জল দিন।

লোকটি বলল, বন্দুকের গুলি ছাড়া আর কিছুই পাবে না তুমি।

এই কথা বলেই সে দবজাটা বন্ধ করে দরজায খিল দিয়ে দিল।

রাত্রি ক্রমশই গভীর হয়ে উঠছিল। আল্পস পর্বতেব তুহিনশীতল কনকনে বাতাস বইছিল।

সেই বাগানটা থেকে বেরিয়ে এসে গলির ধারে আবও একটা বাগানেব মধ্যে দেখল পাতায ঢাকা একটা কুঁড়ে বয়েছে। বাস্তা মেরামতের যারা কাজ করে তারা পথের ধারে এই ধরনের কুঁড়ে তৈরি করে অস্থায়ীভাবে সেখানে থাকাব জন্য। পথিক ভাবল এখন কুঁড়েটার মধ্যে কোনও লোক নেই। সে তাই কাঠের বেড়াটা ডিঙিয়ে পার হয়ে কুঁড়েটার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। ভিতরটা বেশ গরম। তার মধ্যে খড়ের বিছানা পাতা ছিল। সে তার পিঠ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে সেটা মাথায দিয়ে শুতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা কুকুরের গর্জন শুনে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল সে। সে বুঝল এই কুঁড়েটা কুকুর থাকার ঘর।

কুকুরটা পথিককে আক্রমণ করে তার পোশাকগুলো আরও ছিঁড়ে দিল। পথিক তার লাঠি ঘুরিয়ে কোনওমতে বেরিয়ে গেল বাগান থেকে।

সে আবার গলিপথে এসে পড়ল। একটা পাথরের উপর বসে আপন মনে বলে উঠল, আমি কুকুরেরও অধম।

সেখান থেকে উঠে শহরটাকে পিছনে ফেলে ক্রমাগত হাঁটতে লাগল সে। শহর থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে তার সামনে একটা ফাঁকা মাঠ দেখতে পেল। সম্প্রতি ফসল উঠে যাওয়ায় মাঠটাকে ন্যাড়া মাথার মতো দেখাচ্ছিল। রাত্রির অন্ধকার আর আকাশটাকে মেঘে ছেয়ে থাকার জন্য দিগন্তটা কালো হয়ে ছিল। আকাশে চাঁদ না থাকায় অন্ধকারটাকে আরও ঘন দেখাচ্ছিল।

পথিক দেখল সারা মাঠটার মধ্যে একটা মাত্র গাছ ছাড়া আর কিছু নেই। নৈশ প্রকৃতির রহস্যময় আবেদনে সাড়া দেবার মতো কোনও সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতি তার ছিল না। সমস্ত অন্ধকার আকাশ, নিঃসঙ্গ গাছ, শূন্য মাঠ, প্রান্তর সব কিছুকে এমন গভীরভাবে শূন্য মনে হচ্ছিল এবং সেই শূন্যতার কৃষ্ণকুটিল পটভূমিতে তার আপন অবস্থার নিঃসঙ্গতাটাকে এমন অসহনীয় মনে হচ্ছিল যে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না সেখানে। তার মনে হলো মাঝে মাঝে প্রকৃতি এমনি করে প্রতিকূল হয়ে ওঠে মানুষের।

নিরুপায় হয়ে সে আবার দিগনে শহরে ফিরে এল। কিন্তু তখন নগরদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। সেকালে আক্রমণের আশঙ্কায় উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল শহরটা। দু' দিকে দুটো ফটক ছিল। কিন্তু ফটক বন্ধ হয়ে গেলেও ভাঙা প্রাচীরের এক জায়গায় একটা ফাঁক দিয়ে শহরে প্রবেশ করল সে।

রাত্রি তখন আটটা বাজে। অজানা পথের এদিক-ওদিক ঘুরে এগোতে লাগল সে। একসময় সে বড় গীর্জাটার পাশ দিয়ে যাবার সময় গীর্জার দিকে ঘুষি পাকিয়ে হাতটা নাড়ল। সেই পথটার এক কোণে একটা ছাপাখানা ছিল। এই ছাপাখানাতেই একদিন সম্রাট নেপোলিয়নের ঘোষণাপত্র ছাপা হয়। অতিশয় ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে ছাপাখানার দরজার বাইরে একটা পাথরের বেলচার উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সে।

একজন বয়স্ক মহিলা বড় গীর্জা থেকে বেরিয়ে এসে পথিককে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখে তাকে বলল, এখানে কি করছ তুমি ?

পথিক বলল, হে আমার সদাশয় মহিলা, তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি কি করছি। আমি এখানে শুয়ে ঘুমোব।

এই সদাশয় মহিলা একজন মার্কুইপত্নী ছিলেন। তিনি বললেন, এই বেঞ্চিতে শোবে ?

পথিক বলল, আমি উনিশ বছর কাঠের উপর শুয়েছি। এখন পাথরের উপর শুয়েছি।

তুমি কি সৈনিক ছিলে ?

হ্যাঁ সৈনিক।

তুমি কেন কোনও হোটেলে গেলে না ?

কারণ আমার টাকা নেই।

মার্কুই বললেন, হায়, আমার কাছে এখন মাত্র চার স্যু আছে।

কিছু না থাকার চেয়ে এটা ভাল।

পথিক মার্কুই-এর কাছ থেকে চার স্যুই নিল। মার্কুই তখন বললেন, এ পয়সাতে হোটেল খরচ হবে না। কিন্তু তুমি হোটেলে গিয়ে চেষ্টা করে দেখেছ? রাত্রিতে তুমি এখানে থাকতে পারবে না। তুমি নিশ্চয় শীতার্ত এবং ক্ষুধার্ত। নিশ্চয় কোনও দয়ালু ব্যক্তি তাঁর ঘরে থাকতে দেবেন তোমাকে।

আমি প্রতিটি বাড়িতে খোঁজ করে দেখেছি।

তুমি কি বলছ কেউ তোমাকে—

প্রতিটি বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মহিলাটি তখন পথিকের কাঁধে একটা হাত দিয়ে রাস্তাটার ওপারে বিশপের প্রাসাদের পাশে একটা ছোট বাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, তুমি প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে দেখেই বলছ?

হ্যাঁ।

ঐ বাড়িতে গিয়ে দেখেছ?

না।

তাহলে ওখানে যাও।

২

দিগনের বিশপ সারাদিনের কাজ সেরে শহর থেকে সন্ধ্যার সময় ঘুরে এসে তার ঘরে জেগে ছিলেন। তিনি তখন খৃস্টানদের কর্তব্য সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও পণ্ডিতদের মতামতগুলি খুঁটিয়ে দেখছিলেন। সব ধর্মীয় কর্তব্যগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেখতে হবে তাঁকে। প্রথমে সামাজিক কর্তব্য, তারপর ব্যক্তিগত কর্তব্য। খৃস্টানদের সামাজিক বা সম্প্রদায়গত কর্তব্যগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করেন সেন্ট ম্যাথিউ। এই সামাজিক কর্তব্যগুলি হলো ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য, নিজের প্রতি কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য আর সমস্ত জীবের প্রতি কর্তব্য। ব্যক্তিগত কর্তব্যগুলি বিশপ অন্য এক জায়গায় প্রকাশিত দেখেছিলেন। সেন্ট পিটার রোমানদের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে রাজা এবং প্রজাদের কর্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করেন। তারপর এফেসীয়দের কাছে লিখিত একখানি চিঠিতে ম্যাজিস্ট্রেট, স্ত্রী, মাতা ও যুবকদের কর্তব্যগুলি নির্ধারণ করেন। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্তের কর্তব্যের কথাগুলি হিব্রুদের কাছে একটি চিঠিতে আর কুমারীদের কর্তব্যগুলি কোরিন্থীয়দের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে লিপিবদ্ধ করেন। বিশপ বিয়েনভেনু বিভিন্ন জায়গায় লিখিত এই সব কর্তব্যগুলি বাছাই করে এক জায়গায় সেগুলি লিখে রেখেছিলেন যাতে সকল শ্রেণীর লোকের মঙ্গল হয়।

সেদিন রাত্রি আটটার সময় বিশপ তাঁর হাঁটুর উপর একটা বড় বই খুলে রেখে

সেটা পড়তে পড়তে কয়েকটা টুকরো কাগজে কি লিখছিলেন। এমন সময় ম্যাগলোরি একবার বিশপের ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে আলমারি থেকে কি একটা জিনিস বার করে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বিশপ যখন বুঝলেন খাবার টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর জন্য তাঁর বোন অপেক্ষা করে বসে আছে তখন তিনি আর দেরি না করে বইটা নামিয়ে রেখে খাবার ঘরে চলে গেলেন। তাঁদের খাবার ঘরটা ছিল আয়তক্ষেত্রাকার এবং তার একটা দরজা রাস্তার দিকে আর একটা দরজা বাগানের দিকে ছিল। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলছিল।

ম্যাগলোরি তখন খাবার দেবার আগে টেবিলটা সাজাচ্ছিল আর বার্পতিস্তিনের সঙ্গে কথা বলছিল। টেবিলের উপর একটা বাতি জ্বলছিল। দু'জন মহিলারই বয়স ষাটের উপর হয়েছিল। ম্যাগলোরির চেহারাটা ছিল মোটা আর বলিষ্ঠ। বাপর্তিস্তিনের চেহারাটা ছিল রোগা রোগা। ম্যাগলোরিকে দেখে চাষী ঘরের মেয়ে আর বাপর্তিস্তিনেকে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা বলে মনে হত। ম্যাগলোরির উপরকার ঠোঁটটা মোটা আর নিচের ঠোঁটটা সরু ছিল। তার চোখে-মুখে এক উজ্জ্বল বুদ্ধি আর অন্তরে উদারতার ছাপ ছিল। ম্যাগলোরির চেহারার মধ্যে এক রাজকীয় ঔদ্ধত্যের ভাব ছিল। বার্পতিস্তিনের মধ্যে এক শান্ত ও সাধু প্রকৃতির ভাব ছিল। সে কথা কম বলত। তার ধর্মবিশ্বাস প্রগাঢ় ছিল। প্রকৃতি তাকে মেষশাবক করে পৃথিবীতে পাঠায়, ধর্মবিশ্বাস তাকে দেবদূতে পরিণত করে।

বিশপ যখন খাবার ঘরে ঢুকলেন তখন ম্যাগলোরি বার্পতিস্তিনেকে জোর গলায় একটা বিষয়ের কথা বলছিল যেটা সে এর আগেও বলেছে এবং সেটা বিশপ জানেন। বিষয়টা হলো বাড়ি ও সামনের দিকে দরজাটা বন্ধ করে রাখার কথা। আজ সে সেই পুরনো বিষয়টার সঙ্গে একটা ঘটনার কথা যোগ করে দিল। সে বলল আজ সন্ধ্যায় বাজার করতে গিয়ে শহরে একটা গুজব শোনে। অদ্ভুত চেহারা আর বেশভূষাওয়ালা একটা ভবঘুরে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই বলছে আজ বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকা বা দরজা খুলে রাখা উচিত নয়। আজকাল শহরের মেয়র আর পুলিশের বড় কর্তার সঙ্গে মনকষাকষির জন্য পুলিশী ব্যবস্থা ভাল নয়। কাজেই নাগরিকদেরই নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। সদর দরজায় তালা দিতে হবে আর সব ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে হবে।

বিশপ কথাগুলো শুনলেন। কিন্তু কোনও মন্তব্য না করে আগুনের ধারে গিয়ে বসলেন। ম্যাগলোরি দরজা বন্ধ করার কথাগুলো আবার বলতে লাগল।

বাপর্তিস্তিনে তার দাদাকে বিরক্ত না করে ম্যাগলোরিকে সমর্থন করার জন্য বিশপকে বলল, ম্যাগলোরি কি বলছে তা শুনেছ?

বিশপ বললেন, হ্যাঁ, কিছুটা শুনেছি।

তারপর তিনি হাসিমুখে ম্যাগলোরির দিকে তাকিয়ে বললেন, ব্যাপার কি? আমরা কি কোনও ঘোরতর বিপদে পড়েছি?

ম্যাগলোরি তখন ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি করল। বলল, লোকটা এক ভবঘুরে, ভয়ঙ্কর ধরনের এক ভিখিরি। সে জ্যাকিন লাবারের হোটেলে গিয়েছিল। কিন্তু তারা তাড়িয়ে দিয়েছে। গার্সেন্দি বাজারের পথে পথে তাকে অনেকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। তার পিঠে সৈনিকদের মতো একটা ভারী ব্যাগ আছে আর তার মুখটা ভয়ঙ্কর রকমের দেখতে।

বিশপ বললেন, তাই নাকি ?

বিশপের আগ্রহ দেখে ম্যাগলোরি ভাবল, বিশপ তার ভয়ের কথাটা সমর্থন করছেন। সে তখন উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগল, হ্যাঁ মঁসিয়ে, আজ রাতে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে। চারদিকে পাহাড়ঘেরা এই ছোট শহরটার রাস্তাঘাটগুলো পীচের মতো অন্ধকার। পথে একটা আলো নেই। আমি যা বলছি ম্যাদময়জেলের তাতে সমর্থন আছে।

বাপতিস্তিনে বলল, আমি কিছু বলছি না, দাদা যা করবেন তাই হবে।

ম্যাগলোরি বলল, আমরা বলছি কি মঁসিয়ে অনুমতি দিলেই আমি এখনি একজন কামারের কাছে গিয়ে আমাদের দরজার কিছু তালাচাবি করাতে পারি এবং ভাল খিল লাগাবার ব্যবস্থা করতে পারি। আমাদের দরজায় যা খিল আছে তাতে কোনও লোককে আটকানো যায় না। যেকোনও লোক রাত্রিবেলায় ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। মঁসিয়ে আবার রাত দুপুরে বাইরে থেকে লোককে ডেকে আনেন।

এমন সময় দরজায় জোর করাঘাতের শব্দ হলো।

বিশপ বললেন, ভিতরে এস।

৩

ঘরের দরজা খুলে একজন লোক প্রবেশ করল। এই লোকটিই হলো সেই পথিক যাকে আমরা আগেই দেখেছি। পথিক ঘরে ঢুকেই দরজার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জ্বলন্ত আগুনের আভায় তার মুখটাকে খুব ক্লান্ত ও অশান্ত দেখাচ্ছিল। তার পিঠে সেই ব্যাগটা আর হাতে একটা লাঠি ছিল। ছেঁড়া ময়লা বেশভূষায় তার চেহারাটা কুৎসিত আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

ম্যাগলোরি তাকে দেখে মুখটা হাঁ করে ভয়ে কাঁপতে লাগল। কোনও কথা বার হলো না তার মুখ থেকে। বাপতিস্তিনে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে চিৎকার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার দাদার দিকে তাকিয়ে শান্ত হয়ে রইল।

বিশপ শান্তভাবে আগন্তুককে দেখতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই আগন্তুক ঘরের তিনজনকে দেখে নিয়ে কড়া গলায় বলতে লাগল, শুনুন, আমার নাম জাঁ ভলজাঁ। আমি একজন মুক্ত জেল কয়েদী। আমি উনিশ বছর জেলে ছিলাম। চারদিন আগে ওরা আমায় জেল থেকে ছেড়ে দেয় এবং আমি পন্তার্লিয়ের যাচ্ছি। আমি তুঁলো থেকে চারদিন পথ হেঁটে এখানে আসি। আজ আমি সকাল থেকে তিরিশ মাইল পথ হেঁটেছি, এই শহরে এসে আমি একটি হোটেলে যাই, কিন্তু হোটেল মালিক আমাকে তাড়িয়ে দেয়। কারণ আমি প্রথমে আমার জেল ফেরতের হলুদ

টিকিটটি টাউন হলের কর্তৃপক্ষকে বিধিমতো দেখাই। আমি তখন আর একটি হোটেলে যাই, তারাও আমায় চলে যেতে বলে। কেউ আমায় স্থান দিতে চায়নি। আমি কারাগারে যাই, কিন্তু রক্ষীও দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি একটা কুকুরের আস্তানায় রাত্রিবাসের জন্য যাই, কিন্তু কুকুরগুলোও আমায় তাড়িয়ে দেয় মানুষদের মতো। তারপর আমি শহরের বাইরে মাঠে যাই শোবার জন্য, কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে দেখে চলে আসি। আমি একটা পাথরের বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ি। তখন একজন মহিলা আমাকে এই বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। তাই আমি এখানে এসে দরজায় করাঘাত করি। এ বাড়িটা কি হোটেল? আমার কাছে টাকা আছে। উনিশ বছর জেলখানায় কাজ করে আমি একশো নয় ফ্রাঁ পনের স্যু পাই। আমি এখানে থাকা-খাওয়ার জন্য যা লাগবে, তা যাই হোক আমি দিতে রাজী আছি। আমি অতিশয় ক্লান্ত, বারো লীগ পথ আমি হেঁটেছি। আমি দারুণ ক্ষুধার্ত। আমাকে এখানে থাকতে দেবেন?

বিশপ বললেন, ম্যাদময়জেল ম্যাগলোরি, দয়া করে টেবিলে আর একটা খাবার জায়গা করবে?

ভলজাঁ কথাটা বুঝতে না পের জ্বলন্ত চুল্লীটার কাছে এল। বলল, আমার কথা আপনারা শোনেননি? আমি একজন জেলফেরৎ কয়েদী। আমি জেলে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছি।

সে তার পকেট থেকে একটা হলুদ কাগজ বার করে বলল, এই হলো আমার হলুদ টিকিট। এই জন্যই সবাই আমাকে তাড়িয়ে দেয। আপনারা এটা পডতে চাইলে পড়ে দেখতে পারেন। আমিও পড়তে পারি। জেলখানায় শ্রেণীবিভাগ আছে। এতে লেখা আছে, জাঁ ভলজাঁ জেলের আসামী মুক্ত, তার জন্ম—সে উনিশ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছে, তার মধ্যে হিংসার আশ্রয় নিযে ডাকাতি করার জন্য পাঁচ বছর, জেল থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করার জন্য চৌদ্দ বছর—অতিশয বিপজ্জনক লোক। এই হচ্ছে আমার পরিচয়। সকলেই আমায় তাডিযে দিয়েছে। আপনারা আমাকে থাকতে দেবেন? এটা কি একটা হোটেল? আমাকে কিছু খাবার আর রাত্রির মতো থাকতে দেবেন? আপনাদের কি আস্তাবল আছে?

বিশপ বললেন, ম্যাগলোরি, অতিথিদের বিছানাটায় একটা পরিষ্কার চাদর পেতে দাও।

বিশপের কথা বিনা প্রতিবাদে মহিলা দু'জন মেনে চলত, একথা আগেই আমরা বলেছি। ম্যাগলোরি বিশপের আদেশ পালন করতে চলে গেল।

বিশপ এবার লোকটির দিকে ঘুরে বললেন, আপনি বসুন মঁসিয়ে, শরীরটাকে একটু গরম করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার দেওয়া হবে এবং আপনি খেতে খেতেই বিছানা প্রস্তুত হয়ে যাবে।

লোকটি এবার বিশপের কথাটা বুঝল। তার চোখ-মুখের কঠোর ভাবটা সহসা কেটে গিয়ে তার জায়গায় বিস্ময়, অবিশ্বাস এবং আনন্দের ভাব ফুটে উঠল। সে শিশুসুলভ উচ্ছলতার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সে বলল, আপনারা সত্যিই আমাকে

খাবাব আব থাকাব জায়গা দেবেন ? আমি একজন জেল কয়েদী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না ? আপনি আমাকে মঁসিয়ে বলে সম্বোধন কবলেন। কিন্তু অন্য সবাই আমাকে বলেছে, বেবিয়ে যাও, কুকুব কোথাকাব ! আমি ভেবেছিলাম আপনাবাও তাড়িয়ে দেবেন, তাই আমি আগেই সব কথা বললাম। আমাব আসল পবিচয় দান কবলাম। যে মহিলা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তাঁব কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। বাতেব খাওয়া আব বিছানা। তোষক, চাদব, বালিশ— উনিশ বছব আমি কোনও বিছানায শুইনি। ঠিক আছে, আমাব টাকা আছে, আমি দাম দিতে পাবব। আপনাব নামটা জানতে পাবি স্যাব ? আপনি খুব ভাল লোক। টাকা আমি দেব। আপনি নিশ্চয একজন হোটেল মালিক। তাই নয কি ?

বিশপ বললেন, আমি একজন যাজক এবং এখানেই থাকি।

যাজক ! কিন্তু সত্যিই খুব ভাল যাজক। তাহলে আমাকে টাকা দিতে হবে না ! আপনিই এই বড গীর্জাব ভাবপ্রাপ্ত যাজক ? আমিই বোকা, আপনাব মাথায যাজকেব টুপিটা আমি এতক্ষণ দেখিনি।

কথা বলতে বলতে পথিক তাব পিঠেব ব্যাগটা আব হাতেব লাঠিটা ঘবেব এক কোণে বাখল। তাবপব হলুদ টিকিটটা পকেটেব মধ্যে ভবে বেখে বসল। বর্পতি ন্তনে তাব দিকে তাকিযে তাকে দেখছিল। সে বলল, আপনি একজন মানুষেব মতো মানুষ মঁসিযে। আপনি কোনও মানুষকে ঘৃণা কবেন না। যাজক যদি মানুষ হিসাবে ভাল হয তাহলে সত্যিই মানুষেব উপকাব হয। তাহলে আমাকে কোনও টাকা পযসা দিতে হবে না ?

বিশপ বললেন, না। কত পেযেছেন আপনি ? একশো নয ফ্রা ?

আব পনেব স্যু।

এ টাকা কতদিনে বোজগাব কবেছেন ?

উনিশ বছবে।

পথিক বলল, টাকাটা আমাব কাছে এখনো প্রায সবটাই আছে। এই কদিনে আমি এব থেকে শুধু পচিশ স্যু খবচ কবেছি। এ পযসাটা আমি গ্রেস্সি নামে এক জাযগাতে গাডি থেকে মাল নামিযে দিযে বোজগাব কবেছিলাম। আমাদেব জেলখানায মার্শেল থেকে একজন বিশপ আসতেন। জেলখানাব ভিতবে যে বেদী ছিল তাব সামনে তিনি সমবেত প্রার্থনাব অনুষ্ঠান কবতেন। তাব মাথাব টুপিটাতে সোনাব জবিব কাজ কবা ছিল। দুপুবেব বোদে তাই চকচক কবত টুপিটা। তাকে আমবা ভাল কবে দেখতেই পেতাম না। তিনি আমাদেব কাছ থেকে অনেকটা দূবে থাকায কি বলতেন তা শুনতেও পেতাম না।

ঘবেব দবজাটা খোলা ছিল। বিশপ উঠে গিযে সেটা বন্ধ কবে দিলেন। ম্যাগলোবি বাডতি এক প্লেট খাবাব নিযে এলে বিশপ বললেন, ওটা যথাসম্ভব আগুনেব কাছে বাখ।

বিশপ এবাব অতিথিকে বললেন, আল্পস পর্বত থেকে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইছে। আপনাব নিশ্চয খুব শীত লাগছে মঁসিযে ?

বিশপ যতবার পথিককে 'মঁসিয়ে' বলে সম্বোধন করেন পরম বন্ধুর মতো ততবারই তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এক ভূতপূর্ব জেলের কয়েদীকে এই ধরনের সৌজন্য দান করাটা লবণসমুদ্রে ভাসমান কোনও জাহাজডুবি মানুষকে সুপেয় জলদানের মতো বাঞ্ছিত অথচ অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা। অপমানিত মানুষই সম্মানের পিপাসায় আর্ত হয়ে ওঠে।

বিশপ বললেন, এই বাতিটার আলো তেমন জোর নয়।

তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে ম্যাগলোরি বিশপের শোবার ঘর থেকে দুটো রুপোর বাতিদান নিয়ে এসে তাতে দুটো বাতি জ্বালিয়ে খাবার টেবিলের উপর রাখল।

পথিক আবার বলল, মঁসিয়ে, আপনি বড় ভাল লোক। আপনি আমাকে ঘরে জায়গা দিয়ে আমার জন্য বাতি জ্বেলেছেন, আমাকে খাবার দিয়েছেন, অথচ আমি আমার কথা সব বলেছি।

বিশপ তাঁর একটি হাত পথিকের একটি বাহুর উপর রেখে বললেন, আপনার কিছুই বলার দরকার ছিল না। এ বাড়ি আমার নয়, খৃস্টের, তার নামেই আমি ভোগ করি। এখানে এলে কোনও মানুষকে তার নাম-ধাম বলতে হয় না, বলতে হয় শুধু কি বিপদে সে পড়েছে। আপনি বিপদে পড়েছেন, আপনি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, নিরাশ্রয়; সুতরাং আপনি এখানে স্বাগত। আপনাকে এ বাড়িতে স্থান দেওয়ার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই। যে কোনও নিরাশ্রয় ব্যক্তিই এখানে আশ্রয় চাইলে পাবে। এ বাড়িতে আমার থেকে আপনাদের অধিকারই বেশি। এখানকার সব কিছুই আপনাদের। কেন আমি আপনার নাম জিজ্ঞাসা করব? তাছাড়া আপনার নাম তো আমার আগেই জানা ছিল।

পথিক বিস্ময়ে চমকে উঠে বলল, আমার নাম আপনি জানেন?

বিশপ বললেন, অবশ্যই জানি। আপনার নাম হলো ভাই।

পথিক বলল, মঁসিয়ে যাজক, আমি এখানে বড় ক্ষুধার্ত অবস্থায় আসি। কিন্তু এখন সে ক্ষুধা আমি অনুভব করতেই পারছি না। সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে।

বিশপ অন্তরঙ্গভাবে বললেন, আপনি অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন।

হ্যাঁ, অনেক কষ্ট—কৃষি শ্রমিকদের মতো লম্বা আলখাল্লার মতো নোংরা পোশাক, হাতে শিকল, কাঠের তক্তার উপর শোয়া, তীব্র শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করা, কঠোর পরিশ্রম, তার উপর মাঝে মাঝে চাবুকের আঘাত—এই সব কিছু সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। এমন কি যখন আমি শুয়ে থাকতাম তখনো শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত আমায়। কুকুরেরাও আমার থেকে ভাল থাকত। এইভাবে উনিশ বছর কাটাতে হয়েছে আমাকে। এখন আমার বয়স ছেচল্লিশ। আবার তার উপর এক হলুদ টিকিট সঙ্গে আছে আমার। এই হলো আমার কাহিনী।

বিশপ বললেন, তা থাক। শুনুন, একশো ধার্মিক যাজকের সাদা পোশাকের থেকে একজন পাপীর চোখে এক বিন্দু অনুতাপের অশ্রু ঈশ্বরের কাছে অনেক আনন্দদায়ক। আপনি যেখানে দুঃখভোগ করতেন সে জায়গাটি যদি আপনি সেখানকার

মানুষদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা আর ক্রোধ নিয়ে ত্যাগ করেন তাহলে আপনি আমাদের করুণার পাত্র হবেন, কিন্তু যদি আপনি কারো প্রতি কোনও অভিযোগ না রেখে শান্ত মনে সকলের প্রতি শুভেচ্ছা পোষণ করে সে জায়গা ত্যাগ করেন তাহলে আপনি মহত্ত্বে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যাবেন।

ম্যাগলোরি ততক্ষণে খাবারের সব ডিশগুলি টেবিলের উপর সাজিয়ে দিয়ে গেছে। এক একটি ডিশে ছিল একটা করে বড় পাঁউরুটি, কিছু মাখন, কিছুটা তেল, নুন, কিছু শুয়োর ও ভেড়ার মাংস, আর ডুমুরের ঝোল। তার উপর ছিল জল ও মদ। বিশপ দৈনন্দিন যে মদ ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত মদ থেকে আনা কিছু পুরনো ভাল মদ এনে পরিবেশন করল ম্যাগলোরি।

বিশপ তাঁর নিজস্ব প্রথা অনুসারে অতিথিকে তাঁর ডান দিকে বসালেন। তাঁর বোন বসল তাঁর বাঁ দিকে। বিশপের মুখের প্রসন্ন ভাব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তিনি অতিথিবৎসল।

বিশপ খেতে খেতে একসময় বললেন, টেবিলে একটা জিনিসের অভাব দেখা যাচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল ম্যাগলোরি। এই বাড়িতে মোট ছয় জনের খাবার মতো রুপোর কাঁটাচামচ আছে। এই বাড়ির প্রথা হলো এই যে কোনও অতিথি এলে খাবার টেবিলে ছয় জনের কাঁটাচামচ সব বার করে সাজিয়ে রাখতে হবে টেবিলে। এ যেন সামান্য কিছু একমাত্র ঐশ্বর্যের শিশুসুলভ ও নির্দোষ প্রকাশ। এই ঐশ্বর্যের এক আবরণ দিয়ে বিশপ যেন তার সংসারের দীনতা ও দারিদ্র্যকে ঢাকার প্রয়াস পেতেন।

ম্যাগলোরি রুপোর সব কাঁটাচামচ এনে খাবার টেবিলে পাতা সাদা ধবধবে কাপড়ের উপর সাজিয়ে দিল সেগুলো।

৪

খাবার টেবিলে সেদিন কি কি কথা হয়েছিল তার বিবরণ মাদাম দ্য বয়শেভ্রনকে লেখা বাপতিস্তিনের একটি চিঠির অংশ থেকে বোঝা যাবে। বাপতিস্তিনে তাদের সেই অতিথি আর দাদার মধ্যে সে রাতে খাবার সময় যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তার একটি পূর্ণ বিবরণ দান করে। সে লেখে....লোকটা প্রথমে কোনও দিকে নজর না দিয়ে বুভুক্ষুর মতো খেয়ে চলেছিল একমনে। অবশেষে মদ পান করার পর সে বিশপকে বলল, মসিয়ে যাজক, ওয়াগনের লোকগুলো কিন্তু আপনাদের থেকে ভাল খায়।

সত্যি বলতে কি কথাটা শুনে আমি আঘাত পাই মনে। কিন্তু আমার দাদা সহজভাবে বললেন, তার কারণ আমার থেকে তারা বেশি পরিশ্রমের কাজ করে।

লোকটা বলল, না। কারণ তাদের বেশি টাকা আছে। আমি দেখছি আপনারা গরীব। হয়ত আপনি খুবই একটা ছোট গ্রাম্য যাজক। ঈশ্বর করেন যেন তাই হয়।

বিশপ বললেন, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, তিনি ঠিকই করেছেন।

একটু থেমে বিশপ আবার বললেন, মঁসিয়ে জাঁ তলর্জা, আপনি কি পন্তালিয়ে যাচ্ছেন ?

ঐ পথেই আমাকে যাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল সকাল হলেই আমাকে রওনা হতে হবে। ও পথে যাওয়া খুবই কঠিন। দিনে গরম, রাত্রিতে দারুণ ঠাণ্ডা।

আমার দাদা বললেন, আপনি এক ভাল অঞ্চলেই যাচ্ছেন। বিপ্লবে আমার পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় একেবারে। আমি তখন ফ্রোশেকোঁতে চলে যাই এবং সেখানে দৈহিক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করি। ওখানে কাজের কোনও অভাব নেই। কাজ খুঁজতে আমার কষ্ট হয়নি, কারণ ওদিকে গোটা অঞ্চলটা কাগজের কল, তৈলশোধক কারখানা, লোহা আর তামার কারখানা, ঢালাই কারখানা প্রভৃতি কল কারখানায় ভর্তি। ঐ অঞ্চলের নাম লডস, শাতিলিযন, অজিনকোর্ট আর বোরে।

এই সব জায়গাগুলোর নাম করার পর আমার দাদা আমার দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা, ঐ অঞ্চলে আমাদের কোনও আত্মীয় নেই ?

আমি বললাম, আগে ছিল। অন্যান্যদের মধ্যে মঁসিযে দ্য লুসেনেত আমাদের এক আত্মীয় ছিলেন। তিনি নগরদ্বারের এক ক্যাপ্টেন।

আমার দাদা বললেন, ১৭৯৩ সালের পর আমাদের আর কোনও আত্মীয় সেখানে ছিল না। আমাদের মধ্যে শুধু আমরাই অবশিষ্ট ছিলাম। ওখানে অনেক মাখনের কারখানা আছে। কারখানার মালিকরা হচ্ছে দুই শ্রেণীর। একদল মালিক হলো ধনী আর একদল মালিক হলো গরীব চাষীর দল। তারা কয়েকজন করে মিলে একটি করে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। মাখন তৈরির কাজ শুরু হয় এপ্রিলের শেষের দিকে। তারপর জুনের মাঝামাঝি চাষীরা তাদের গরুগুলো পাহাড়ের উপত্যকায় চরাতে নিয়ে যায়।

আরও বেশি খাবার জন্য আমার দাদা অনুরোধ এবং উৎসাহিত করছিলেন তাকে। তিনি নিজে যে মদ কোনওদিন বেশি দাম বলে খান না, মভ থেকে আনা ভাল মদ তিনি তাকে খেতে বললেন, তারপর আমার দাদা মাখন তৈরির কথা বলছিলেন এবং মাঝে মাঝে থামছিলেন যাতে আমি এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারি। একটা জিনিস দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। লোকটি কি ধরনের ছিল তা আমি আগেই তোমায় বলেছি। আমার দাদা কিন্তু সন্ধে থেকে কখনো বা খাবার সময়েও লোকটার কোনও পরিচয় জানতে চাননি এবং তিনিও নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেননি। সাধারণত একজন বিশপের পক্ষে একজন দুষ্কৃতকারীকে হাতের কাছে পেয়ে কিছু উপদেশ দানের এটাই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। এইভাবে তিনি তার মনে রেখাপাত করতে পারতেন। অন্য কেউ হলে মৃদু ভর্ৎসনা আর নীতি উপদেশের বাক্যদ্বারা তার দেহ ও আত্মাকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারতেন। সহানুভূতির সঙ্গে এই আশা করতেন যে ভবিষ্যতে সে তার পথ পরিবর্তন করে ভালভাবে বাঁচবে।

কিন্তু আমার দাদা লোকটা কোথায় জন্মেছে, সে কথাও তাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন না। তার জীবনকাহিনীর কথা জানতে চাইলেন না। তার জীবনকাহিনীর মধ্যে নিশ্চয় কিছু অপরাধের কথা ছিল। আমার দাদা সেই সব অপরাধের কথাগুলোকে পরিষ্কার এড়িয়ে গেলেন। আমার দাদা একবার পন্তালিয়েরের নির্দোষ, নিরীহ পার্বত্য অধিবাসীরা কিভাবে মুক্ত আকাশের তলে সন্তুষ্ট চিত্তে আনন্দের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে চলে তার কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন পাছে তাতে লোকটা রুষ্ট হয়। আমার দাদার মনে তখন কি ছিল আমি পরে সেকথা জানতে পেরেছিলাম। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন জাঁ ভলজাঁ নামে সেই লোকটা আগে থেকেই হয়ত তার পাপচেতনায় জর্জরিত ছিল। তাই হয়ত তিনি তাকে তখনকার মতো সেই পাপচেতনার বোঝা থেকে তার মনটাকে মুক্ত করে তাকে অনুভব করাতে চাইছিলেন সেও আর পাঁচজনের মতো মানুষ। এটাও কি এক ধরনের বদান্যতা নয় ? এক সূক্ষ্ম মানবতাবোধের বশবর্তী হয়ে এইভাবে ধর্মপ্রচার ও নীতি উপদেশ দানের কাজ থেকে বিরত থাকা কি প্রকৃত যাজকের কাজ নয় ? তার মনের ক্ষতটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাটাও কি প্রকৃত সহানুভূতির ধর্ম নয় ? আমার মনে হয় এটাই ছিল তাঁর মনের আসল ভাব। তবে এটা ঠিক যে তিনি তাঁর এই ভাবের কোনও লক্ষণ আমার কাছেও কিছুমাত্র প্রকাশ করেননি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি জাঁ ভলজাঁর সঙ্গে একজন সাধারণ লোকের মতো খেয়ে গেলেন যেমন তিনি কোনও যাজক বা পদস্থ সরকারী অফিসারের মতো কোনও সম্মানিত অতিথির সঙ্গে খেতেন।

আমাদের খাওয়া যখন শেষ হয়ে আসছিল তখন দরজায় আবার করাঘাত হলো। দরজা খুলতে দেখা গেল মাদাম গার্লেদ ছেলে কোলে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার দাদা ছেলেটার কপালে চুম্বন করে আমার কাছ থেকে পনের স্যু ধার করে মাদাম গার্লেদকে দিলেন। জাঁ ভলজাঁ এদিকে কোনও নজর দিল না। তাকে তখন খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মাদাম গার্লেদ চলে গেলে আমার দাদা ভলজাঁর দিকে ঘুরে বললেন, আপনি তো এবার শুতে যাবেন। ম্যাগলোরি তাড়াতাড়ি খাবার টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেলল। আমি বুঝলাম এবার আমাদের চলে যেতে হবে। লোকটাকে ঘুমোতে দিতে হবে। এই ভেবে আমরা উপরতলায় চলে গেলাম। কিন্তু কিছু পরেই আমি আমার ছাগলের চামড়ার কম্বলটা লোকটার কাছে পাঠিয়ে দিলাম, কারণ সেদিন খুব শীত ছিল এবং তাতে তার শরীরটা বেশ গরম হবে। আমার দাদা সেটা জার্মানি থেকে কিনে এনেছিলেন। সেই সঙ্গে খাবার টেবিলে ব্যবহার করার জন্য হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা একটা ছুরিও কিনে এনেছিলেন। ম্যাগলোরি ফিরে এলে আমরা প্রার্থনার কাজ সেরে চলে গেলাম আর কোনও কথা না বলে।

৫

তার বোনকে রাত্রির মতো বিদায় দিয়ে মঁসিয়ে বিয়েনভেনু দুটি রুপোর বাতিদানের মধ্যে একটি তুলে নিয়ে তাঁর অতিথিকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। অতিথিদের

শোবার ঘরে যেতে হলে বিশপের শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। ম্যাগলোরি তখন রুপোর কাঁটাচামচগুলো আলমারিতে গুছিয়ে রাখছিল।

অতিথির জন্য বিছানাটা পাতা হয়ে গিয়েছিল। লোকটা বিশপের সঙ্গে সেই শোবার ঘরটায় গিয়ে বাতিটা টেবিলের উপর রাখল।

বিশপ বললেন, ভাল করে শান্তিতে ঘুমোন। কাল সকালে এখান থেকে যাবার আগে আমাদের গরুর দেওয়া একপাত্র গরম দুধ পান করে যাবেন।

লোকটি বলল, ধন্যবাদ হে যাজক।

এই কথাটা বলার পরই হঠাৎ সে এমন এক ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে দাঁড়াল যা মেয়েরা দেখলে সত্যিই দারুণ ভয় পেয়ে যেত। কি আবেগের বশবর্তী হয়ে সে সেই মুহূর্তে এমন ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করল তা জানা যায় না, সে নিজেও হয়ত তা জানত না। সে কি এর দ্বারা সতর্ক করে দিচ্ছিল বিশপকে অথবা ভয় দেখাচ্ছিল? অথবা এটা একটা তার সহজাত দুর্বার প্রবৃত্তির অদম্য আত্মপ্রকাশ? যাই হোক, লোকটা সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশপের দিকে ভয়ঙ্করভাবে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, চমৎকার! কি আশ্চর্যের ব্যাপার! আপনি আমায় আপনার শোবার ঘরের পাশেই শুতে দিচ্ছেন!

হঠাৎ সে এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। সে হাসিতে এক দানবিক উচ্ছ্বাস ছিল। সে আবার বলল, আপনি কি করছেন তা একবার ভেবে দেখেছেন? আপনি কি করে জানলেন যে আমি কখনো কাউকে হত্যা করিনি?

বিশপ শান্তভাবে বললেন, এটা ঈশ্বরের কাজ।

বিশপের ঠোঁট দুটি একবার প্রার্থনার স্বগত উচ্চারণে নড়ে উঠল, তিনি নিজেকে নিজে কি বলছিলেন। তারপর তিনি তাঁর ডান হাতটি তুলে দুটি আঙুল প্রসারিত করে লোকটিকে আশীর্বাদ করলেন। লোকটি তার মাথাটা একবারও নত করল না। বিশপ সেদিকে আর না তাকিয়ে নীরবে তাঁর শোবার ঘরে চলে গেলেন।

অতিথির বিছানার পাশে একটা পর্দা ফেলে দিয়ে বেদী থেকে বিছানাটাকে পৃথক করে রাখা হত। বিশপ একবার সেই পর্দার পাশে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি অন্যদিনকার মতো বাগানে চলে গেলেন। সেখানে পায়চারি করতে করতে সেই সব রহস্যের কথা ভাবতে লাগলেন যে সব রহস্য ঈশ্বর রাত্রির নীরব শান্ত অবকাশে সজাগ ব্যক্তির সামনে উদ্‌ঘাটিত করেন।

লোকটি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে সে পরিষ্কার চাদরপাতা ভাল নরম বিছানাটার আরাম তার সজাগ সচেতন অনুভূতি দিয়ে উপভোগ করতে পারল না। সে বাতিটা নিভিয়ে দিয়েই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

বিশপ যখন বাগান থেকে তাঁর শোবার ঘরে চলে এলেন তখন রাত্রি প্রায় দুপুর। কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা বাড়িটাই এক গভীর ঘুমের মধ্যে ঢলে পড়ল।

শেষ রাতের দিকে জাঁ ভলজাঁ জেগে উঠল।

ব্রাই নামে একটি গাঁয়ের এক গরীব কৃষক পরিবারে জাঁ ভলজাঁর জন্ম হয়। শৈশবে

সে লেখাপড়া শিখতে পারেনি। একটু বড় হলে সে ফেবারোলে গাছ কাটার কাজ করতে যায়। তার মার নাম ছিল ম্যাথিউ এবং তার বাবার নাম ছিল জাঁ ভলজাঁ। ডাক নাম ছিল ভ্লাজা।

বাল্যকালে ভাবুক প্রকৃতির ছিল জাঁ ভলজা। মনের মধ্যে কোনও বিষাদ না থাকলেও সে প্রায়ই কি সব ভাবত, তবে তার অন্তরটা ছিল সরল। তার চেহারার মধ্যে আকর্ষণ করার মতো কিছু ছিল না। কিশোর বয়সেই সে বাবা মা দু'জনকেই হারায়। তার মা প্রথমে রোগভোগে মারা যায়। তার বাবাও গাছ কাটার কাজ করত এবং একদিন গাছ কাটতে গিয়ে একটা গাছ তার উপর পড়ে যাওযায় সে মারা যায়। জা ভলর্জার আত্মীয় বলতে ছিল তার এক দিদি। তার দিদির স্বামী তখন বেঁচে থাকলেও দিদির সংসারে অভাব ছিল। তার সাতটা ছেলেমেয়ে ছিল। দিদিব স্বামীও হঠাৎ মারা যায়। তখন তাদের বড় ছেলের বযস আট। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর তার দিদিই জাঁ ভলজাঁকে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। তখন তার বযস চব্বিশ। দিদির সংসারেই থাকত-খেত সে। দিদির স্বামীর মৃত্যুর পর জাঁ ভলজাঁ খেটে দিদির সংসার চালাতে লাগল। বেশি খেটে কম মাইনে পেত সে। তার সারা যৌবন এই কষ্টের পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কেটে যায়। যৌবনে কারো ভালবাসা সে পায়নি। কোনও মেয়ের প্রেমে পড়ার কোনও সুযোগ পায়নি।

সারা দিনের কাজ শেষ করে ক্লান্ত হযে বাড়ি ফিরে নীরবে রাতের খাওযা সেরে ফেলত জাঁ ভলজাঁ। তার সামনে তার খাবারের পাত্র থেকে দু এক টুকরো ভাল মাংস তুলে নিয়ে তাব কোনও না কোনও ছেলেমেয়েকে দিত তার দিদি। জাঁ ভলজাঁ সেদিকে ইচ্ছা করেই কোনও নজর দিত না। তার দিদির বাড়ির কাছে একটা খামারে এক চাষী পরিবার বাস করত। দিদির ছেলে-মেয়েরা সেই চাষী পরিবার থেকে প্রায় দিনই তাদের মার নাম করে এক জগ করে দুধ এনে নিজেরা কাড়াকাড়ি করে খেত। তাদের মা জানতে পারলে তাদের মারত। কিন্তু জাঁ ভলর্জা তা জানত এবং তার দিদিকে লুকিযে সেই দুধের দাম দিয়ে দিত।

গাছকাটার মরশুমে গাছ কাটাব কাজ করে রোজ চব্বিশ স্যু করে পেত। কিন্তু মরশুম শেষ হযে গেলে সে ফসল তোলা বা পশুচারণের কাজ করত। বছরের সব সমযেই সে কিছু না কিছু একটা করত এবং তার দিদিও কাজ করত। কিন্তু সাতটা ছেলেমেযের ভরণপোষণ চালাতে বড় কষ্ট হত তাদের। দারিদ্র্যগ্রস্ত এই সব ছেলেমেয়েরা সব সময় অনাথ শিশুদের মতো ঘুরে বেড়াত। একবার শীতকালে জা ভলজাঁদের সংসারে বড় দুঃসময় দেখা দিল। জাঁ ভলজার তখন কোনও কাজ ছিল না। সে বেকার বসে ছিল। কোনও রোজগার ছিল না। সংসারে খাবার কিছু নেই, অথচ সাতটি ক্ষুধার্ত ছেলেমেযের মুখে কিছু না কিছু দিতে হবে।

কোনও এক রবিবার রাত্রিতে মবেযার ইসাবো নামে ফেবারোলের এক রুটির কারখানার মালিক যখন শুতে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ রুটি রাখার ভাঁড়ার ঘরের জানালার কাঁচের সার্সি ভাঙার শব্দ শুনতে পায। ইসাবো দেখে একটা লোক জানালার কাঁচ

ভাঙার সেই ফাঁকটা দিয়ে একটা হাত ঢুকিয়ে একটা রুটি তুলে নিল। রুটি নিয়ে হাতটা বেরিয়ে গেল জানালা থেকে। ইসাবো তখন চোরটাকে তাড়া করল। লোকটা রুটি চুরি করে পালাচ্ছিল। কিন্তু ইসাবো তাকে ধরে ফেলল। চোরটার হাত থেকে তখনো রক্ত বার হচ্ছিল।

তখন চলছিল ১৭৯৫ সাল। বাড়ির দরজা ভেঙে বে-আইনী প্রবেশ ও চুরির অপরাধে অভিযুক্ত ভলজাঁর বিচার হয় স্থানীয় আদালতে। তার একটা ছোট বন্দুক ছিল। সেটা নাকি সে বৈধ ব্যাপারে ব্যবহার করত না। প্রমাণ পাওয়া গেল সে মাছ চুরি করত। মাছ চুরির কাজটা চোরাই মাল চালান করার মতোই অপরাধজনক। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে, যারা অপরের বাগানে গিয়ে পশুপাখি মেরে আনে বা মাছ চুরি করে তারা শহরের চোরাই মাল চালানকারী খুনী অপরাধীদের মতো কখনই ভয়ঙ্কর নয়। শহর মানুষকে হিংস্র এবং দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে। বন, পাহাড, নদী, সমুদ্র মানুষকে হঠকারী করে তোলে। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ মানুষের মধ্যে বন্য দুর্বার ভাবটাকে জাগিয়ে তোলে বটে, কিন্তু তার মানবিক গুণ বা অনুভূতিগুলিকে ধ্বংস করে না।

বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলো জাঁ ভলজাঁ। সভ্য জগতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, এমন অনেক আইনের বিধান আছে যা এক একটি মানুষের জীবনকে ভেঙে দেয়। এমন এক একটি মুহূর্ত আসে মানুষের জীবনে যখন সমাজ এক একটি মানুষকে ত্যাগ করে দূরে ঠেলে দেয়। তাকে নিঃস্ব ও সর্বহারা করে তোলে। জাঁ ভলজাঁ পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

১৭৯৬ সালের ২২শে এপ্রিল যেদিন প্যারিসে মোতেনেত্তের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয় সেদিন বিকেত্রের জেলখানায় জাঁ ভলজাঁ একজন শৃংখলিত কয়েদী হিসাবে অবস্থান করছিল। যার বয়স এখন নব্বই এমন এক প্রাচীন কয়েদী তখন একই জেলখানায় ছিল। সেদিন জেলখানার উঠোনে কয়েদীদের চতুর্থ সারিতে শৃংখলিত অবস্থায় জাঁ ভলজাঁ বসে ছিল। সে তার অজ্ঞ অশিক্ষিত সরল চাষী মনে এই কথাই শুধু বুঝতে পেরেছিল যে তার অবস্থা সত্যিই ভয়ঙ্কর এবং তার অপরাধের অনুপাতে তার শাস্তিটা খুবই বেশি। যখন হাতুড়ির ঘা দিয়ে তার গলায় লোহার বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হত তখন সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। সে তার হাত তুলে বোঝাতে চাইত সে যা কিছু করেছে তার বোনের সাতটি ছেলেমেয়ের জন্যই করেছে।

এরপর তাকে একটি মালবাহী গাড়িতে করে সাতাশ দিনের পথ অতিক্রম করে গলায় শিকল বাঁধা অবস্থায় তুলোঁতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে তখন এক লাল আলখাল্লা পরিয়ে দেওয়া হয়। তার পূর্ব জীবনের যা কিছু মুছে দেওয়া হয়। তার নামটাও যেন মুছে গিয়েছিল। সে যেন আর জাঁ ভলজাঁ নামে কোনও লোক ছিল না। সে শুধু একজন কয়েদী যার নম্বর ছিল ২৪৬০১। তার বোন ও বোনের ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে কি ঘটল তার কিছুই জানতে পারল না। কোনও গাছকে যখন করাত দিয়ে কাটা হয় তখন তার পাতাগুলোব অবস্থা কি হয় তা সবাই জানে।

এ সেই একই পুরনো কাহিনী। এই সব দুঃখী মানুষরা ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হলেও সহায়সম্বলহীন ও নিরাশ্রয় অবস্থায় যেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে কেন্দ্রচ্যুত হয়। নিষ্ঠুর ভাগ্যের বিধানে এই সব হতভাগ্যের দল আপন আপন জীবনের পথে চলে যায়। মানবজাতির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে সে পথ থেকে দূরে সরে পিছু কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় তারা তা কে জানে! তাদের আপন আপন জেলা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাদের গাঁয়ের গীর্জার গম্বুজ, গাঁয়ের পাশের ঝোপঝাড়ের কথা সব যেন ভুলে গিয়েছিল ভলজাঁ। মাত্র কয়েক বছরের কারাবাস অতীত জীবনের সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল যেন। তার মনের মধ্যে যে ক্ষত ছিল এতদিন একেবারে উন্মুক্ত, ক্রমে সেখানে যেন একটা ঢাকনা পড়ে গেল। তুলোঁতে থাকাকালে সে মাত্র একবার তার বোনের খবর পেয়েছিল। তুলোঁতে চার বছর থাকাকালে চতুর্থ বছরের শেষের দিকে সে খবর পায়। কার কাছ থেকে কিভাবে খবরটা পেল সে কেউ বলতে পারে না। তবে সে জেনেছিল তার বোনকে প্যারিসের পথে দেখতে পাওয়া গেছে। তার বোনের কাছে তখন শুধু তার কনিষ্ঠ সন্তান সাত বছরের একটি ছেলে ছিল। বাকি ছয়টি ছেলেমেয়ে কোথায় গেল তা কেউ জানে না। তাদে[illegible] মাও হয়ত জানে না। তার বোন একটি ছাপাখানায় কাজ করে কোনও এক জায়গায় থাকে। তার বাচ্চা ছেলেটাকে একটি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। সকালে উঠেই তাকে ছ'টার সময় দোকানে হাজির হতে হয়। ছেলেটির স্কুল খোলে সাতটায়। তাই ছেলেটিকে সঙ্গে করে তার দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় এক ঘণ্টা, কারণ দোকানের ভিতর তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। শীতের সময় ছেলেটির বড় কষ্ট হয়। সে শীতে কুঁকড়ে কাঁপতে থাকে। বৃষ্টি এলে এক বৃদ্ধা দয়ার বশে ছেলেটিকে তার আস্তানায় আশ্রয় দেয়।

ছেলেটি সাতটা বাজলেই স্কুলে চলে যেত। ভলজাঁ শুধু তার বোনের এইটুকু খবরই পেয়েছিল। তার দিদির এই কাহিনী তা[illegible] মনের মধ্যে অতীতের একটা রুদ্ধ জানালা খুলে হঠাৎ এক ঝলক আলো এনে তার প্রিয়জনদে[illegible] কথা মনে পড়িয়ে দেয় এবং পরক্ষণেই সে জানালাটা রুদ্ধ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য। তারপর থেকে সে তার দিদির আর কোনও খবর পায়নি, সেও তাদের দেখতে পায়নি।

তুলোঁর জেলখানায় থাকাকালে চতুর্থ বছরেই জেল থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে জাঁ ভলজাঁ। এ ব্যাপারে জেলখানার অন্যান্য কয়েদীরা তাদের প্রথা অনুসারে সাহায্য করে তাকে। জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে দু'দিন গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় সে। প্রতিমুহূর্তে ধরাপড়ার ভয়ে সচকিত হয়ে আহার নিদ্রাহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ানোটা যদি মুক্তি হয় তাহলে মাত্র দু'দিনের জন্য সে-মুক্তি পেয়েছিল সে। প্রতিটি পথিক দেখলেই আঁতকে উঠত সে। কোনও কুকুর ডাকলে বা কোনও ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেলে চমকে উঠত। এইভাবে দু'দিন কাটাবার পর আবার সে ধরা পড়ে। ট্রাইবুনালের বিচারে আগেকার কারাদণ্ডের সঙ্গে নতুন করে তিন বছরের কারাদণ্ড যুক্ত হয়। এরপর ষষ্ঠ বছরে আবার একবার পালায় জেল থেকে। কিন্তু বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পায়নি।

জেলখানায নাম ডাকার সময় তাকে না দেখে প্রহরীরা তার খোঁজ করে। রাত্রিবেলায় ডকের কাছে এক জায়গায় তাকে দেখতে পেয়ে তাকে ধরে আনে। এবার সে প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই করে এবং তাদের বাধা দেয় বলে এবার তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়। তাকে দুটো শিকল দিয়ে বাঁধা হয়। দশম বছরে সে আবার পালায এবং আবার ব্যর্থ হয়ে ধরা পড়ে। আবার তিন বছরের কারাদণ্ড বেড়ে গিয়ে সবসুদ্ধ ষোল বছরের কারাদণ্ড হয়। চতুর্থবার পালাবার অপরাধে আবার তিন বছর বেড়ে গিযে তার মোট কারাদণ্ড উনিশ বছরে গিয়ে দাঁড়ায়। ফলে ১৭৯৬ সালে কারাগারে প্রবেশ করে উনিশ বছর পর ১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসে সে মুক্ত হয়। তার অপরাধ ছিল মাত্র একটা, একটি জানালার কাঁচের সার্সি ভেঙে একটা পাঁউরুটি চুরি করা।

এইভাবে একটি পাঁউরুটি চুরির ঘটনা একটি জীবনকে নষ্ট করে দেয়। জাঁ ভলজার মতো ক্লদ গুয়েকও একটি পাঁউরুটি চুরি করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। ইংলন্ডের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায প্রতি পাঁচটি ডাকাতির মধ্যে চারটির প্রত্যক্ষ কারণ হলো ক্ষুধা।

জাঁ ভলজাঁ যখন প্রথম জেলখানায যায তখন সে কাঁদতে থাকে, ভযে কাঁপতে থাকে। কিন্তু যখন মুক্ত হয় তখন সে কিছুই কবেনি, পাথরেব মতো শক্ত হয়ে ছিল। নিবিড হতাশা নিযে সে জেলে গিয়েছিল, কিন্তু যখন সে ফিরে আসে তখন আশা বা নিরাশা কিছুই ছিল না তার মনে। তার অন্তর্লোকে কি আলোডন বা পরিবর্তনের খেলা চলেছিল তা কে জানে?

৭

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা উচিত আমাদের। আমাদেব মনে হয এ সব দিকে সমাজের নজর দেওয়া উচিত। এটা সমাজেরই কাজ।

আমরা আগেই বলেছি জাঁ ভলজাঁ লেখাপড়া শিখতে পারেনি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে সে নির্বোধ ছিল। সহজাত বুদ্ধির একটা স্ফুলিঙ্গ তার মধ্যে ছিল। যে দুঃখ আগুনের দেহ এনেছিল তার জীবনে, সেই দুঃখই আলোব এক অপূর্ব জ্যোতি নিয়ে আসে। প্রথম প্রত্যুষের আলোর মতো সে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হযে ওঠে তার মনের প্রতিটি দিক-দিগন্ত। যতই সে বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়েছে, শৃঙ্খলের বন্ধনে আপীড়িত হয়েছে, কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হযে পড়েছে, নির্জন কারাকক্ষের নিঃসঙ্গতায অশান্ত হযে উঠেছে, ভূমধ্যসাগরীয সূর্যের জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হযেছে এবং কাঠের তক্তার কাঠিন্যে নিদ্রা তার বিঘ্নিত হয়েছে প্রতি রাত্রে, ততই সে নিজের বিবেকের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শুধু ভেবেছে।

সে একাধারে নিজেই নিজের বিচারক ও জুরী হয়ে নিজের মামলার নিজেই বিচার করেছে।

সে যে অন্যায়ভাবে দণ্ডিত এক নির্দোষ নিরপরাধ লোক নয়, একথা সে স্বীকার করেছে। আবেগের আতিশয্যবশত যে কাজ সে করে ফেলেছে তা অবশ্যই নিন্দার্হ।

যে পাউরুটি সে চুরি করেছিল তা চাইলে হয়ত সে পেত আর যদি চাইলে তাকে না দিত সে দান অথবা কর্মপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত। কিন্তু কোনও অর্ধভুক্ত মানুষ কি অপেক্ষা করতে পারে, এ প্রশ্ন কেউ করলে তার উত্তরে বলা যায় ক্ষুধার জ্বালায় খুব কম লোকই মরে। মানুষের দেহমন এমনভাবে গঠিত যে দীর্ঘকাল দুঃখকষ্ট ও নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেও সে কখনো মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। তাকে আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরতে হত এবং তাহলে তার দিদির ছেলেমেয়েদের সুবিধা হত। সমাজকে গলা টিপে ধরে মারতে যাওয়ার আগে তার সীমিত ক্ষমতার কথাটা ভাবা উচিত ছিল। চুরির রাস্তা ধরে সে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত হবে, তার এই ধারণাটাকে প্রশ্রয় দিয়ে নির্বোধের মতো কাজ করেছে সে। যে মানুষকে অখ্যাতির পথে নিয়ে যায় সে পথ কখনো মুক্তির পথ হতে পারে না। মোট কথা, সে যে অন্যায় করেছে একথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছে সে।

কিন্তু এরপর নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে কতকগুলো। সে কি শুধু একাই এ কাজ করে বসেছে? কাজ করতে ইচ্ছুক কোনও লোক যদি কাজ বা খাদ্য না পায় তাহলে সেটা কি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়? তাছাড়া দোষ স্বীকার করাটাই কি একটা ভয়ঙ্কর শাস্তি নয়? সে অপরাধ করে যত না অন্যায় করেছে, আইন তাকে লঘু পাপে গুরু শাস্তি দিয়ে কি তার থেকে অনেক বেশি অপরাধ করেনি? ন্যায়বিচারের দাড়িপাল্লায় শাস্তির দিকটা কি ঝুঁকে পড়েনি? এইভাবে একদিকের পাল্লা ভারী হয়ে ঝুঁকে পড়ায় তার ফল কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যায়। যে অপরাধী তার দিকে পাল্লাটা না ঝুঁকে ঝুঁকল সেই দিকে যেদিকে চাপানো ছিল শাস্তির বোঝা। পালাবার চেষ্টার জন্য কারাদণ্ডের দেওয়ালটা বারবার বাড়িয়ে দেওয়া কি দুর্বলের উপর সবলের এক ধরনের আক্রমণাত্মক অত্যাচার নয়? এটা কি ব্যক্তির উপর সমাজের অবিচার নয় এবং উনিশ বছর ধরে এই অত্যাচার-অবিচার অনুষ্ঠিত হয়ে আসেনি?

সে নিজেকে প্রশ্ন করল, কারো উপর অর্থহীন প্রাচুর্য আর কারো উপর নিষ্ঠুর অভাব আর নিঃস্বতা চাপিয়ে দেবার অধিকার সমাজের আছে কি না, একজন নিঃস্ব গরীবকে প্রয়োজন আর আতিশয্যের জাঁতাকলে পিষ্ট করার অধিকার আছে কি না -কাজের প্রয়োজন আর শাস্তির আতিশয্য। যে সব লোক সম্পদের সমবণ্টন চায় তাদের সঙ্গে এইরকম নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করাটা কোনও সমাজের পক্ষে এক দানবিক নির্মমতার কাজ নয়?

সে এইসব প্রশ্ন করল এবং সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দান করল।

সে ঘৃণার সঙ্গে সমাজকে ধিক্কার দিল। সে যে সব দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে তার জন্য সমাজকেই দায়ী করল এবং সংকল্প করল যদি কোনওদিন সুযোগ পায় তাহলে সে সমাজের কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে। পরিশেষে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, যে অপরাধ সে করেছে আর তার উপর যে শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কোনও প্রকৃত সামঞ্জস্য নেই। আইনের দিক থেকে যদিও এই শাস্তিটা কোনও অন্যায় নয় তথাপি নীতির দিক থেকে অসংগতিপূর্ণ এবং অন্যায়।

জাঁ ভলজাঁর ক্রোধটা হয়ত অবান্তর এবং অবিবেচনাপ্রসূত মনে হতে পারে। কিন্তু তার ক্রোধের মধ্যে গভীর একটা জোরালো যুক্তি ছিল। তাই সে সংগত কারণেই ক্ষুব্ধ হয়েছিল সমাজের উপর।

তাছাড়া সমগ্রভাবে সমাজ তার ক্ষতি ছাড়া কিছুই করেনি। যে সমাজের প্রতিটি লোকই ন্যায়বিচারের নামে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে তার প্রতি। যারাই তার দেহ স্পর্শ করেছে তারাই তাকে আঘাত করেছে। শৈশব থেকে একমাত্র তার মা আর দিদি ছাড়া কারো কাছ থেকে শুনতে পায়নি সে একটু ভালবাসার কথা বা কারো চোখে একটু সদয় দৃষ্টি দেখতে পায়নি। চরম দুঃখভোগের সময় তার শুধু বারবার মনে হয়েছে গোটা জীবনটাই একটা সংগ্রাম এবং সে সংগ্রামে সে হেরে গেছে। এই সংগ্রামে ঘৃণাই ছিল তার একমাত্র হাতিয়ার এবং জেলখানায় যতদিন সে ছিল সে হাতিয়ারটাকে শান দিয়ে তীক্ষ্ণ করেছে এবং সেখান থেকে আসার সময়েও সেই তীক্ষ্ণ হাতিয়ারটাকে সঙ্গে করে এনেছে।

তুলোঁতে যাজকদের দ্বারা পরিচালিত একটা স্কুল আছে। যে হতভাগ্য শিক্ষাদীক্ষাহীন লোক পড়াশুনো করতে চায় তাদের সেখানে লেখাপড়া শেখানো হয়। সেই স্কুলে জাঁ ভলজাঁ কিছুদিন গিয়েছিল। তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ। সেখানে সে লিখতে পড়তে ও কিছু অঙ্ক কষতে শেখে। কিন্তু তখন তার মনে শুধু এই চিন্তাই ছিল যে তার মনের উন্নতিসাধন করা মানে যুক্তি দিয়ে তার ঘৃণার ভাবটাকে সুরক্ষিত করা। অনেক অবস্থায় দেখা যায় মানুষের শিক্ষা আর জ্ঞান তার কুভাব ও কুমতিকে বাড়িয়ে দেয়।

সমাজকে তার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করে ধিক্কার দিতে গিয়ে ঈশ্বরের যে বিধান সমাজকে সৃষ্টি করেছে সেই বিধানের উপরেই সে বিরূপ রায় দান করে বসে এবং সে বুঝতে পারে এটা তার অন্যায়। ফলে নিজেকেও সে ধিক্কার দেয়। সুতরাং তার উনিশ বছরের এই পীড়ন ও দাসত্বের কালে তার আত্মা একই সঙ্গে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয়। একদিকে তার মধ্যে আলো প্রবেশ করে আর সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিকে অন্ধকার প্রবেশ করে।

আমরা দেখেছি জাঁ ভলজাঁ আসলে খারাপ প্রকৃতির লোক ছিল না। যখন সে কারাগারে যায় তখনো তার মধ্যে সদ্‌গুণ ছিল। কারাগারে থাকাকালে সমাজকে ধিক্কার দিতে গিয়ে পাপবোধ জাগে তার মধ্যে। ঈশ্বরকে ধিক্কার দিয়ে সে অধর্মাচরণ করছে একথা সে জানত।

এখানে একটা কথা ভাববার আছে।

কোনও মানুষের স্বরূপ বা স্বভাবটাকে কি সমগ্র ও মূলগতভাবে পাল্টানো যায়? যে মানুষ ঈশ্বরের বিধানে সৎ প্রকৃতির হয়ে জন্মেছে তাকে কি অন্য মানুষ অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির করে তুলতে পারে? ভাগ্য কি মানুষের আত্মাকে নতুন করে অন্য রূপে গড়ে তুলতে পারে এবং কারো ভাগ্য খারাপ বলে সেও কি খারাপ হয়ে উঠতে পারে? প্রতিকূল অবস্থা বা দুর্ভাগ্যের চাপে কারো অন্তর কি একেবারে বিকৃত ও

কুৎসিত রূপ ধারণ করতে পারে? কোনও উঁচু স্তম্ভকে কি নিচু ছাদ দিয়ে ঢাকা যায়? প্রতিটি মানবাত্মার মধ্যে কি দেবভাবের এমন এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নেই যা ইহলোকে ও পরলোকে অমর ও অবিনশ্বর, যা সহজাত সততার দ্বারা পুষ্ট ও সংরক্ষিত হয়ে গৌরবময় ও অনির্বাণ এক আলোকশিখায় পরিণত হয়, যাকে কোনও পাপ সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত করতে পারে না?

এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল প্রশ্ন। কোনও মনোবিজ্ঞানী যদি আইনের দ্বারা দণ্ডিত, সমাজ ও সভ্যতার দ্বারা ধিকৃত জাঁ ভলজাঁকে শ্রমহীন কোনও শান্ত অবকাশে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ বুকে নিয়ে চিন্তান্বিতভাবে বসে থাকতে দেখতেন তাহলে তিনি ঐ সব জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি তা পারতেন না। সেই মনোবিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারতেন জাঁ ভলজাঁর মনের মধ্যে যে দুরারোগ্য ব্যাধি ঢুকেছে তার জন্য তিনি দয়া বোধ করতেন কিন্তু তার কোনও প্রতিকার কবতে পারতেন না। দান্তে যেমন নরকের দ্বারে গিয়ে এক বিশাল অন্ধকার খাদ দেখে চমকে উঠেছিলেন তেমনি তিনি জাঁ ভলজাঁর আত্মার মধ্যে এক বিশাল শূন্যতা দেখে ভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। তার কপালে ঈশ্বব যে আশার কথা তাঁর আঙুল দিয়ে লিখেছেন সে কথা তিনি মুছে দিতেন।

কিন্তু ভলজাঁর ব্যাপারটা কি? তার যে আত্মিক সরল অবস্থার কথা আমরা পাঠকদের কাছে চিত্রিত করেছি, সে অবস্থাটা কি তার কাছেও তেমনি সরল ছিল? তার নৈতিক অধঃপতনের মধ্যে মূলে যে সব উপাদান কাজ করেছিল তা কি সে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল? তার মতো অশিক্ষিত স্থূল প্রকৃতির এক মানুষ কি কখন কিভাবে ক্রমান্বয়ে তার আত্মা ওঠানামা করতে করতে তার নীতিচেতনার শূন্য গভীরে তলিয়ে যায় তার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারে? আমবা তা পারব না এবং আমরা সেটা বিশ্বাস করতে পারব না। এত দুঃখকষ্টের পরেও তার অজ্ঞতার জন্য সে সরলভাবে চিন্তাগুলোকে সাজিয়ে কোনও কিছু বিশ্লেষণ করতে পাবল না। অনেক সময় সে তার আপন অনুভূতিরই তল খুঁজে পেত না। সে যে ছায়ার মধ্যে বাস করত, ছায়ার মধ্যেই কষ্ট ভোগ করত, সে ছায়াকে ঘৃণা করত, সে যেন নিজেকে নিজে ঘৃণা করত। সে একজন অন্ধ লোকের মতো মনের অন্ধকারে কি যেন হাতড়ে বেড়াত, স্বপ্নাবিষ্টের মতো সেখানে থাকত সব সময়। মাঝে মাঝে অতিরিক্ত দুঃখভোগের জন্য এক প্রচণ্ড ক্রোধের আবেগে ফেটে পড়ত সে। সে ক্রোধের একটি অগ্নিশিখা তার সমস্ত আত্মাকে আলোকিত করে তার জীবনপথেব সামনে-পিছনে যে সব নিয়তিসৃষ্টি ফাঁক ছিল তার উপর এক জ্যোতি বিকীরণ করত।

কিন্তু এই সব আলোর ছটা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অপসৃত হয়ে পড়ত। ফলে আবার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠত তার চারদিকে। সে কোথায় তা নিজেই বুঝতে পারত না।

এই ধরনের শাস্তির মধ্যে এমন এক নির্মম পাশবিকতা আছে যা ধীরে ধীবে

মানুষের মনটাকে ক্ষয় করে ফেলে তাকে পশুতে পরিণত করে তোলে। এক একসময় হিংস্র হয়ে ওঠে সে পশু। জাঁ ভলজাঁর বারবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা মানবাত্মার উপর আইনের কঠোরতার এক অভ্রান্ত প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কখনো কোনও সুযোগ পেলেই পরিণাম বা অতীত অভিজ্ঞতার কথা কিছু না ভেবেই বারবার পালাবার চেষ্টা করত। রুদ্ধদ্বার নেকড়ে বাঘের মতো দরজা খোলা পেলেই সে পাগলের মতো ছুটে যেত সেই দিকে। তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে সে দরজা দিয়ে পালাতে বলত, আর যুক্তিবোধ তাকে সেখানেই থাকতে বলত। এই ধরনের এক প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে অদৃশ্য হয়ে যেত তার যুক্তিবোধ। ফলে তার মধ্যে পশুটাই রয়ে যেত এবং সে ধরা পড়লে তাকে যে বাড়তি শাস্তি দেওয়া হত তা সেই পশুর হিংস্রতাকে বাড়িয়ে দিত।

একটা কথা অবশ্যই বলা উচিত যে জেলখানার অন্যান্য কয়েদীদের থেকে জাঁ ভলজাঁর দৈহিক শক্তি অনেক বেশি ছিল। যে কোনও শক্ত কাজে সে ছিল চারটে লোকের সমান। সে অনেক ভারী ভারী বোঝা তুলতে পারত। একবার তুলোর টাউন হল মেরামতের একটা কাঠের ভারী বাড়ি পড়ে যাবার উপক্রম হলে সাহায্য না আসা পর্যন্ত ভলজাঁ কাঁধে করে বেশ কিছুক্ষণ সেটাকে ধরে রাখে।

তার দৈহিক শক্তির থেকে বুদ্ধি ও কৌশল আরও বেশি ছিল। যেসব দেওয়াল বা কোনও খাড়াই পাহাড়ে কোনও হাত-পা রাখার জায়গা নেই, সেসব দেওয়াল বা পাহাড়ের উপর সে অবলীলাক্রমে উঠে যেত এক সুদক্ষ যাদুকরের মতো। এইভাবে যেকোনও তিনতলা বাড়ির ছাদের উপর উঠে যেতে পারত সে।

সে খুব কম কথা বলত এবং হাসত না কখনো। তার মুখ থেকে কোনও জোর হাসি বা অট্টহাসি বার করা খুবই কঠিন ছিল। কখনো কেমনে কোনও প্রবল আবেগ না জাগলে সে কখনো হো হো শব্দে হাসত না। তাকে দেখলেই মনে হত সে যেন সব সময় ভয়ঙ্কর এক চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

এইভাবে দিন কাটাত সে। এক অসংগঠিত অসংহত চরিত্রের অলস উপলব্ধি আর অসংগত বুদ্ধিবৃত্তির ভারী বোঝাভার নিয়ে এক অন্তহীন বিহ্বলতার সঙ্গে সে শুধু এই কথা অনুভব করে যেত যে এক বিরাট দানবিক শক্তি সব সময় পীড়ন করে চলেছে তাকে। অস্বচ্ছ অপ্রচুর আলোর যে বৃত্তসীমা তার জীবনকে ঘিরে রেখেছিল সে বৃত্তের বাইরে ঊর্ধ্বলোকে তাকিয়ে সে কি কিছু দেখার চেষ্টা করত? যদি তা করত তাহলে সে ভয় আর ক্রোধের এক মিশ্র অনুভূতির সঙ্গে দেখতে পেত আইন, কুসংস্কার, মানুষের সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের অসংখ্য তথ্যপুঞ্জ সমন্বিত পিরামিডের মতো এক অদ্ভুত আকারের সুবিশাল সৌধ দাঁড়িয়ে আছে তার মাথার উপরে-- যে সৌধকে আমরা সভ্যতা বলে অভিহিত করে থাকি। সেই অদ্ভুত সৌধের পুঞ্জীভূত রূপটাই অভিভূত করত তাকে। তার মধ্যস্থিত উপাদানগুলো পৃথকভাবে স্পষ্ট করে বুঝতে পারত না সে। তবে মাঝে মাঝে সেই তথ্যপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলো জিনিসকে স্পষ্ট করে দেখতে পেত সে---যেমন জেলখানার প্রহরী, পুলিশ, বিশপ

আর সবার উপর মুকুটমণ্ডিত সম্রাট। এই সব দূরস্থিত ঐশ্বর্যের বস্তুগুলো কমানোর পরিবর্তে বাড়িয়ে দিত তার মনের অন্ধকারটাকে। সে দেখত কত মানুষ আসা-যাওয়া করছে তার মাথার উপর দিয়ে। কত আইন, প্রথা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, মানবজীবনের কত ঘটনা প্রভৃতির অজস্র উপাদানে ঈশ্বর যে সভ্যতাকে জটিল করে তুলেছেন সে সভ্যতা শান্ত নিষ্ঠুর এক ঔদাসিন্যের চাপে তার আত্মাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। যারা দুঃখ-বিপর্যয়ের অতল গহ্বরে পতিত, যারা নরকের অন্ধকারে দিশাহারা, যারা সমাজ ও আইনের দ্বারা অবজ্ঞাত ও ধিক্কৃত সেই সব হতভাগ্য মানুষ তাদের ঘাড়ের উপর এক নিষ্করুণ সমাজের দুর্বিসহ বোঝাভার অনুভব করে চলে। সে বোঝাভার দেখে বাইরের লোকেরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই অবস্থার মধ্যে জাঁ ভলজাঁ কি সব ভাবত। কিন্তু কি ভাবত সে?

জাঁতাকলের মাঝখানে সামান্য এক শস্যদানার চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা বিষয়বস্তু হতে পাবে তার? কল্পনার সঙ্গে বাস্তব এবং বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশে তার মনের কাঠামোটাকে এমন করে তুলেছিল যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জেলখানায় কঠোর শ্রমের কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে দাঁড়িযে কি ভাবত সে। তার সে যুক্তিবোধ আগের থেকে আরও পবিণত ও আরও বিচলিত হয়ে উঠেছিল তা এক সহজ অবিশ্বাসের মধ্যে ঢলে পড়ত। যে সব ঘটনা তার সামনে ঘটত সে সব ঘটনাব মানে বুঝতে না পেরে তাদের অকল্পনীয ও অচিন্ত্যনীয় মনে হত। বড অদ্ভুত মনে হত তার চারপাশের জগৎকে। নিজের মনে মনে বলত এই সব কিছুই স্বপ্ন। যে প্রহরী তার কাছে দাঁড়িযে থাকত তাকে ভূত বলে মনে হত তাকে কোনও আঘাত না করা পর্যন্ত।

প্রকৃতি জগৎ সম্বন্ধে তার কোনও চেতনাই ছিল না। জাঁ ভলজাঁ সম্বন্ধে একথা বলা প্রায ঠিক হবে যে সূর্যের কোনও অস্তিত্ব ছিল না তার কাছে। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কোন সত্যের আলোয় প্রতিভাত হয়ে থাকত তার আত্মা।

জাঁ ভলজাঁর উনিশ বছরের সশ্রম কারাজীবন তার জীবন ও আত্মাকে যেন ভেঙেচুরে নতুন রূপে গড়ে তুলেছিল। ফলে সমাজের কাছ থেকে যে অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন তাকে সহ্য করতে হয়েছে তাব বিরুদ্ধে মন তার বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সমাজেব প্রতি প্রতিশোধ বাসনা জাগে তার অন্তরে। এই প্রতিশোধ বাসনার বশবর্তী হয়ে সে দুই ধরনের কুকর্ম করে বসত। এক একসময সে কোনও ভাবনা-চিন্তা না করে অন্ধ ক্রোধের আবেগে অনেক কুকর্ম করে বসত। আবার অনেক সময় ঠাণ্ডা মাথায যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে অনেক অন্যায করে বসত। তবে তার সকল অন্যায, কুকর্ম বা অপকর্মের পিছনে সমাজেব বিরুদ্ধে এক দুর্মর দুর্জয় প্রতিশোধ বাসনা কাজ করে যেত। তার এই শেষোক্ত যুক্তিভিত্তিক কুকর্ম করার আগে তার মনের সব ভাবনা-চিন্তা পরপর তিনটি স্তর অতিক্রম করে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হত। এই তিনটি স্তর ছিল—যুক্তি, সংকল্প আর গোঁড়ামি। তার সমস্ত আবেগ ও প্রবৃত্তি ক্রোধ, তিক্ততা আর পীড়নজনিত এক চেতনাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অনুশাসিত হত। তাব

এই ক্রোধাবেগ অনেক সময় কোনও নিরীহ নির্দোষ লোক তার সামনে পড়ে গেলে তার উপরেও বর্ষিত হত। তার সমস্ত চিন্তার শুরু এবং শেষে ছিল মানব সমাজে প্রচলিত আইন-কানুনের প্রতি এক তীব্র ঘৃণা। সাধারণত এই ভয়ঙ্কর ঘৃণা কোনও ঐশ্বরিক বিধানের দ্বারা প্রতিহৃত না হলে তা বাড়তে বাড়তে সমস্ত সমাজ, মানবজাতি ও ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল বস্তুকে গ্রাস করে ধীরে ধীরে। তখন সে সমগ্রভাবে মনুষ্যবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। যে কোনও লোকের ক্ষতি করার এক দুর্বার বাসনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। জেল থেকে বেরিয়ে যে হলুদ টিকিট তার কাছে সব সময় থাকত সে টিকটের উপ: লেখা ছিল, অতিশয় বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর লোক। দিনে দিনে তার অন্তরাত্মাটা একেবারে শুকিয়ে যায়। জগৎ ও জীবনকে দেখার সহজ, স্বাভাবিক ও স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে সে। তার উনিশ বছরের দীর্ঘ কারাজীবনের মধ্যে কোনওদিন একফোঁটা চোখের জল ফেলেনি সে।

৮

জাহাজের যাত্রীটি লাফিয়ে পড়ল জলে।

কিন্তু জাহাজ থামল না। অনুকূল বাতাসের সহায়তায ধ্বংসোন্মুখ জাহাজটা এগিযে চলেছে চরম পরিণতির দিকে। আত্মহননের লক্ষ্য থেকে কোনও মতেই বিচ্যুত হবে না যেন সে। সেই পথে অনিবারণীয় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলতে লাগল সে।

লোকটা জলে ডুব দিয়ে আবার উঠে এল। সে দু'হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু কেউ তার কথা শুনতে পেল না। বাতাসের আনুকূল্যে জাহাজ তার কাজ করে যেতে লাগল। কিন্তু যে যাত্রীটি জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপ দিল তার কি হলো তা জাহাজের নাবিক বা কোনও যাত্রীর সেদিকে কোনও নজর ছিল না। অন্তহীন বিশাল সমুদ্রে যেন সূচ্যগ্রপ্রমাণ এক চিহ্ন।

লোকটা হতাশ হয়ে অপসৃয়মান জাহাজটার পানে তাকিয়ে ডাকতে লাগল। কিন্তু ভূতের মতো দেখতে জাহাজটা দ্রুত আড়াল হয়ে গেল তার দৃষ্টিপথ থেকে। কিছুক্ষণ আগেও সে ঐ জাহাজেই ছিল। নাবিকরা অন্য সব যাত্রীদের সঙ্গে ডেকের উপর ছিল। সেও তাদের সকলের সঙ্গে সমান ভাবে আলো-বাতাস ভোগ করেছে। কিন্তু তার একটু পরেই সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দেয়।

চারদিক থেকে দানবিক ঢেউগুলোর আঘাতের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল, সে চঞ্চল বাতাসের আঘাতে ঢেউগুলো সব উত্তাল হয়ে উঠল। তার মুখে সমুদ্রের নোনা জল এসে লাগতে লাগল। যে ভয়ঙ্কর সমুদ্রটা তাকে গ্রাস করতে চাইছে সেই অন্ধকার সমুদ্রটাই তার কাছে ঘৃণার এক মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠল।

তবু সে মরীয়া হয়ে সাঁতার কেটে যেতে লাগল। ঢেউ-এর সঙ্গে লড়াই করতে করতে তার শক্তি ক্ষয় হতে লাগল। সে মাথার উপর দেখল ঘন মেঘমালা আকাশটাকে আচ্ছন্ন করে আছে। সারা সমুদ্রের অনন্ত পটভূমি জুড়ে মূর্তিমান মৃত্যুকে যেন হেঁটে

বেড়াতে দেখল সে। পৃথিবীর দূর প্রান্ত থেকে অজানা কত সব দূরাগত শব্দের ধ্বনি শুনতে পেল সে। আকাশে ভাসমান মেঘমালার কোলে কোলে পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার মাঝে দেবদূতেরা পাখা মেলে উড়ে আসে। কিন্তু সে দেবদূতেরা কি করতে পারে তার জন্য ? তারা শুধু গান করতে করতে পাখা মেলে উড়ে যায় আর সে শুধু বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে যায়।

অনন্ত আকাশ আর অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলল সে। সমুদ্র হচ্ছে এক বিশাল সমাধিগহ্বর আর আকাশ হচ্ছে শবাচ্ছাদন। তখন অন্ধকার ঘন হয়ে আসছিল। যতক্ষণ তার শক্তি ছিল দেহে ততক্ষণ সে সমানে সাঁতার কেটে এসেছে। এদিকে জাহাজটা তার যাত্রীদের নিয়ে অনেকক্ষণ আগেই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। গোধূলির বিশাল ছায়ান্ধকারে এক অসহায় নিঃসঙ্গতার মাঝে সে শুধু অনুভব করল চারদিক থেকে অসংখ্য তরঙ্গমালা তার কাছে ছুটে আসছে। শেষবারের মতো একবার ভয়ে চিৎকার করে উঠল সে। কোনও মানুষকে ডাকল না। কিন্তু ঈশ্বর কোথায় ?

যে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি যার নাম ধরেই ডাকুক না কেন, কেউ কোনও সাড়া দিল না সে ডাকে। না সমুদ্রের জলরাশি, না অনন্ত প্রসারিত আকাশ কেউ সাড়া দিল না তার ডাকে। সে সমুদ্র ও বাতাসকে ডাকল। কিন্তু তারা যেন একেবারে বধির। তার চারদিকে গোধূলির ধূসর অন্ধকার, অন্তহীন নিঃসঙ্গতা আর উদ্দাম অবিরাম জলকল্লোল। তার অন্তরে তখন শুধু শঙ্কা আর অবসাদ, তার তলদেশে তখন অতলান্তিক শূন্যতা। পায়ের তলায় দাঁড়াবার কোনও জায়গা নেই। সে শুধু বুঝতে পারল তার দেহটা অন্ধকারে ভেসে চলেছে। ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আসছে তার সর্বাঙ্গ। তার হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সে হাতে কিছুই ধরা নেই। শুধু বাতাস, সমুদ্রের কল্লোল আর আকাশের তারাদের অর্থহীন ধ্বনি। কি করবে সে? হতাশা চায় আত্মসমর্পণ, ক্লান্তি বা অবসন্নতা চায় মৃত্যু। সেও অবশেষে সব সংগ্রাম ত্যাগ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। সে ডুবে গেল।

এই হলো মানবসমাজের এক অপরিনামদর্শী অগ্রগতি। তার চলার পথে কত জীবন, কত আত্মা নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে তার দর্পিত পদভরে। এ যেন এক আশ্চর্য মহাসমুদ্র যার মধ্যে নিষ্ঠুর আইনের দ্বারা নির্বাসিত কত মানষ কোনও সাহায্য না পেয়ে নৈতিক মৃত্যু ববণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই সমুদ্র হচ্ছে নির্মম নিষ্করুণ এক সামাজিক অন্ধকার, দুঃখের অতলগর্ভ খাদ যার মধ্যে আইনে দণ্ডিত হতভাগ্য মানুষদের সমাজ ফেলে দেয়। যে সব মানুষের আত্মা এই সমুদ্রগর্ভে সমাধি লাভ করে তাদের কেউ উদ্ধার করতে পারে না।

৯

জেলখানা থেকে বার হবার সময় জাঁ ভলজাঁ যখন 'তুমি মুক্ত' এই কথা দুটো শুনল তখন সে যেন তা বিশ্বাস করতে পারছিল না, অবিশ্বাসের অন্ধকারে মনটা

যেন ধাঁধিয়ে গেল তার। সহসা যেন আলোর একটা তীর এসে চোখ দুটোকে বিদ্ধ করল তার। সে আলো হলো জীবনের আলো, জীবন্ত মানুষের আলো। কিন্তু ফুটে উঠতে না উঠতে সে আলো ম্লান হয়ে গেল মুহূর্তে। স্বাধীনতার কল্পনায় সে যেন অভিভূত হয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তে এক নতুন জীবনের আশ্বাসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল সে। কিন্তু হাতে একটা হলুদ টিকিট পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্বাধীনতার অর্থটা বুঝতে পারল।

এর পরেও ছিল আরও মোহমুক্তি। সে আগে ভেবেছিল এতদিন কারাগারে কাজ করে যে টাকা উপার্জন করেছে তা সব মিলিয়ে হবে একশো সত্তর ফ্রাঁ। কিন্তু রবিবারগুলোর খাটুনি সে ভুল করে ধরেছিল। সে সব বাদ দিয়ে সে মোট পেল একশো উনিশ ফ্রাঁ পনের স্যু।

এর মানে সে বুঝতে পারল না। সে ভাবল তাকে ঠকিয়েছে তারা। জেলকর্তৃপক্ষ তার খাটুনির টাকা চুরি করে নিয়েছে।

জেল থেকে যেদিন সে ছাড়া পায় সেদিন সেখান থেকে বেরিয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে গ্রেসী নামে একটা জায়গাতে সে দেখল একটা কারখানার সামনে মাল নামানো হচ্ছিল ওয়াগন থেকে। তখন সে সেখানে কুলীর কাজ করতে চায়। সেখানে লোকের দরকার ছিল বলে মাল খালাস করার কাজে তাকে নিল তারা। সে যখন কাজ করছিল তখন একজন পুলিশ এসে তার পরিচয় জানতে চাইলে সে তার হলুদ টিকিটটা দেখায় তাকে। তারপর আবার কাজ করতে থাকে। দিনের শেষে একজন কুলীকে সে তাদের পারিশ্রমিক কত করে তা জানতে চায়। তাকে বলা হয় এ কাজের রোজ হচ্ছে তিরিশ স্যু। কিন্তু ফোরম্যান লোকটা তার হলুদ টিকিট দেখতে পাওয়ায় সে তার কাছ থেকে মজুরি চাইতে গেলে সে তাকে মাত্র পঁচিশ স্যু দেয়। সে বার বার তিরিশ স্যু দাবি করলে ফোরম্যান তাকে বলে, নেবে নাও, না হলে আবার তোমাকে জেলে ঢুকতে হবে।

আবার সে বুঝতে পারল সে প্রতারিত হলো। এর আগে সমাজ তাকে প্রতারিত করেছে। এবার সে পেল ব্যক্তিবিশেষের প্রতারণা। সে বুঝল জেল থেকে খালাস মানেই মুক্তি নয়। একটা লোক জেলখানা ত্যাগ করলেই সে মুক্ত হয় না, তার দণ্ড ঘোচে না। সমাজের কাছে সে চিরদণ্ডিতই রয়ে যায়।

গ্রেসীতে যে ঘটনা ঘটেছিল এই হলো তার বিবরণ। দিগনেতে সে কি রকম অভ্যর্থনা লাভ করে তা আমরা আগেই জেনেছি।

১০

গীর্জার ঘড়িতে দুটো বাজতেই ঘুম থেকে জেগে উঠল জাঁ ভলজাঁ।

বিছানার অতিরিক্ত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতিই ঘুমটা দীর্ঘ হতে দেয়নি তার। সে উনিশ বছর কোনও বিছানায় শোয়নি, তবু তক্তার কাঠই ছিল তার একমাত্র শয্যা। সে তার পোশাক না খুলেই শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। ঘুমটা তার খুব একটা

দীর্ঘায়িত না হলেও সে চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছিল আর তাতে তার দেহের ক্লান্তিটা দূর হয়ে যায় একেবারে। কখনই খুব বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় না ভলজাঁ।

চোখ মেলে অন্ধকারেই একবার তাকাল সে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ার জন্য বন্ধ করল চোখ দুটো। কিন্তু গতকাল সারাদিন বিভিন্ন রকমের আবেগানুভূতি আর চিন্তার পীড়নে মস্তিষ্কটা গরম থাকায় ঘুমটা ভাঙার পর আর নতুন করে ঘুম এল না তার। সে আর ঘুমোতে পারল না ; শুয়ে শুয়েই ভাবতে লাগল।

তার মনের মধ্যে জোর আলোড়ন চলছিল তখন। নতুন-পুরনো অনেক চিন্তা আসা-যাওয়া করতে লাগল তার মনে। অনেক চিন্তা এল আর চলে গেল। কিন্তু একটা চিন্তা বারবার ফিরে আসতে লাগল। সে চিন্তা অন্য সব চিন্তাকেই মুছে দিতে লাগল জোর করে। সে চিন্তা হলো বিশপের টেবিলের উপর নামিয়ে রাখা রুপোর কাঁটাচামচগুলো।

খাবার সময় টেবিলের উপর সেগুলো দেখেছিল সে। তারপর দেখেছিল শোবার সময় ম্যাগলোবি সেগুলো বিশপের ঘরের ভিতর আলমারিতে রাখে। সে দেখে নিয়েছে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে বিশপের ঘরে ঢুকলেই ডান দিকের আলমারিতে আছে সেগুলো। সেই খাঁটি রুপোর জিনিসগুলো বিক্রি করলে তার থেকে অন্তত দু'শো ফ্রাঁ পাওয়া যাবে। সে উনিশ বছরের মধ্যে যা রোজগার করেছে তার দ্বিগুণ, যদিও জেলকর্তৃপক্ষ তাকে না ঠকালে সে আরও কিছু বেশি পেত।

পুরো একঘণ্টা সে দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ভুগতে লাগল ; কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। গীর্জার ঘড়িতে তিনটে বাজল। সে চোখ খুলে বিছানায় বসল। বিছানার পাশে পড়ে যাওয়া পিঠের ব্যাগটা কুড়িয়ে নিল। পা দুটো ঝুলিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় বসে রইল সে। সারা বাড়িটার মধ্যে একমাত্র সে-ই জেগে ছিল। হঠাৎ পা থেকে জুতো দুটো খুলে পাপোষের কাছে রেখে দিয়ে আবার ভাবতে লাগল।

সেই কুৎসিত চিন্তাটা ভারী বোঝার মতো আবার আ -যাওয়া করতে লাগল মনের মধ্যে। তার মাঝে মাঝে অন্য অপ্রাসঙ্গিক চিন্তাও আসতে লাগল। ব্রিভেত নামে জেলখানার এক কয়েদী তার পায়জামাটা পা থেকে গুটিয়ে বেঁধে রাখত সুতোর একটা দড়ি দিয়ে।

সকাল পর্যন্ত হয়ত এইভাবে বসে বসেই ভাবত ভলজাঁ। কিন্তু ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বাজার একটা ঘণ্টা পড়তেই সচকিত হয়ে উঠল আবার।

এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল বাড়ির কোথাও কোনও শব্দ শুনতে পাওয়া যায় কি না। দেখল গোটা বাড়িটা তখনো নীরব। সে জানালাটা কোথায় তা বুঝতে পেরে সেদিকে এগি. " গেল। রাত্রির অন্ধকার ছিল তখনো। আকাশে সেদিন পূর্ণ চাঁদ থাকার কথা হলেও ভাসমান মেঘমালায় চাঁদটা মাঝে মাঝে চাপা পড়ে যাওয়ায় আলো-ছায়ার খেলা চলছিল আকাশে। মেঘে চাঁদটা ঢাকা পড়ে যেতেই অন্ধকারটা গাঢ় দেখাচ্ছিল।

ঘরের ভিতরটা গোধূলির ধূসর অস্পষ্ট আলোয় কিছুটা আলোকিত ছিল। তাতে

ঘরের মধ্যে যাতায়াত করা যায়। জানালার কাছে ভলজাঁ দেখল জানালাটা শুধু একটা ছিটকিনি দিয়ে আঁটা আছে। কপাটটা খুলতেই আর কোনও বাধা নেই। জানালাটা দিয়ে সহজেই বাগানে যাওয়া যায়। জানালাটা খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া এসে ঘরে ঢুকতেই জানালাটা বন্ধ করে দিল সে। এবার বাগানটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেখল বাগানটা চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আছে। পাঁচিলটাতে অবশ্য ওঠা সহজ। বাগানের ওপারে গাছে ঘেরা একটা বড় অথবা ছোট রাস্তা আছে।

বাগানটা খুঁটিয়ে দেখার পর সে আবার তার ঘরের মধ্যে ফিরে এল। মনে হলো এবার একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে। তার পিঠের ব্যাগটা খুলে সে তার মধ্যে তার জুতোজোড়াটা ভরে নিল। তারপর পিঠের উপর ঝুলিয়ে নিয়ে টুপিটা মাথায় পড়ল। ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ছোট লোহার রড বার করে সে বিছানার উপর রেখেছিল। রডটার একদিকে সূচলো। সে এটা নিয়ে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে তা বোঝা গেল না। তুলোঁর জেলখানায় সে যখন কাজ করত পাহাড়ে তখন এই ধরনের যন্ত্র পাথর কাটার কাজে ব্যবহার করত তারা।

সেই লোহার যন্ত্রটা এক হাতে নিয়ে ঘরের কোণ থেকে তাব লাঠিটা তুলে আর এক হাতে নিল। তারপর সে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বিশপের শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দেখল দরজাটা খোলা রয়েছে। বিশপ সেটা বন্ধ কবেননি।

১১

ভলজাঁ কান পেতে কি শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনও শব্দ ছিল না সে ঘরে।

ভলজাঁ প্রথমে তার আঙুলের ডগা দিয়ে দরজাটায় একটু ঠেলা দিল। দরজাটা একটু ফাঁক হলো, অথচ কোনও শব্দ হলো না। কিন্তু দরজাব সামনেই একটা টেবিল ছিল পথরোধ করে। সে দেখল দরজাটায় আরও জোরে একটু ঠেলা দিলে টেবিলটা সরে যাবে। সে তাই এবার জোরে ঠেলে দিল দরজাটা এবং তাতে জোর একটা ক্যাঁচ করে শব্দ হলো।

ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল ভলজাঁর। ভয়ের আবেগে সেই মুহূর্তে তার মনে হলো দরজাটার যেন এক অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে এবং তাই সেটা বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে দেবার জন্য কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করছে। কাঁপতে কাঁপতে ভয়ে পিছিয়ে এল সে। তার মনে হলো অর নাকের প্রতিটি নিঃশ্বাসের শব্দ যেন ঝড়েব গর্জন। তবে তার মনে হলো এ শব্দ ঠিক ভূমিকম্পের শব্দ নয় এবং তাতে নিশ্চয় বাড়িটা জেগে উঠবে না। তবু সে ভাবল দরজার শব্দটায় জেগে উঠবে বৃদ্ধ বিশপ। তাঁর বোন চিৎকার করে উঠবে। চারদিক থেকে সাহায্য করার জন্য লোক ছুটে আসবে। তার কেবলি মনে হতে লাগল আবার তার সর্বনাশ হয়ে গেল।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল সে। নড়াচড়া করতে সাহস পেল না। এইভাবে কয়েক মুহূর্ত পার হয়ে গেল। দরজাটা তার সামনে তেমনি খোলা

রয়ে গেছে। সে সাহস করে একবার ঘরের ভিতরে দেখল। দেখল কেউ জেগে ওঠেনি বা কেউ নড়াচড়া করছে না। ঘরের মধ্যে কোনও শব্দ শুনতে পেল না সে। বুঝল শব্দটা তাহলে কাউকে জাগাতে পারেনি।

বিপদটা কেটে গেল। যদিও তার বুকের মধ্যে একটা আলোড়ন চলছিল তবু সে পিছন ফিরে চলে গেল না। তার একমাত্র চিন্তা শুধু কাজটা সেরে ফেলা। এবার সে বিশপের শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরের ভিতরটা দারুণ শান্ত ছিল। তবে তখনো কিছুটা অন্ধকার থাকায় ঘরের ভিতরে চেয়ার-টেবিল, কাগজপত্র, বই, টুল, পোশাক-আশাক প্রভৃতি যে সব জিনিসপত্র ছিল তা সে বুঝতে পারল না। আধো-আলো আধো-অন্ধকারে সেগুলোকে এক একটা বস্তুপুঞ্জ বলে মনে হলো। সাবধানে পা টিপে এগিয়ে যেতে লাগল ভলজাঁ। ঘরের অপর প্রান্ত হতে ঘুমন্ত বিশপের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কানে আসছিল তার। হঠাৎ যেটা সে চাইছিল সেটা বিছানার পাশে পেয়ে যাওয়ায় চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

প্রকৃতি যেন অনেক সময় আমাদের কর্মাকর্মের উপর গুরুগম্ভীরভাবে মন্তব্য করে আমাদের ভাবিয়ে তোলে সে বিষয়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আকাশে মেঘ জমে ছিল। ভলজাঁ যখন বিশপের বিছানার পাশে থমকে দাঁড়িয়েছিল তখন হঠাৎ মেঘটা সরে যেতেই এক ঝলক চাঁদের আলো জানালা দিয়ে এসে বিশপের মুখের উপর পড়ল। বিশপ শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন। রাত্রিতে খুব শীত থাকার জন্য বিশপ সে রাতে হাত পর্যন্ত বাদামী রঙের একটা পশমী জ্যাকেট পরেছিলেন। তাঁর মাথাটা বালিশের উপর ঢলে পড়েছিল। তাঁর হাতের আঙুলে একটা যাজকের আংটি ছিল। তাঁর যে হাত দুটি কত মানুষের কত মঙ্গল করেছে, কত উপকার করেছে, সে হাত দুটি চাদরের বাইরে ছড়ানো পড়ে আছে। তাঁর মুখের উপর ফুটে অ[illegible] অদ্ভুত এক প্রশান্তি, এক পরম তৃপ্তি আর পরম সুখের স্নিগ্ধ আলো, যে আলোর প্রতিফলন আর কোথাও দেখা যায় না। ধার্মিক লোকের আত্মা যে রহস্যময় স্বর্গীয় সুষমার অমৃতে মিলে মিশে এক হয়ে যায়।

মোট কথা, বিশপের মুখে তখন ছিল এক স্বর্গীয় জ্যোতি। এ জ্যোতি তাঁর আপন অন্তরাত্মা থেকে বিচ্ছুরিত এক জ্যোতি, এ জ্যোতি তাঁর আপন বিবেকের জ্যোতি। যে মুহূর্তে চাঁদের আলো জানালা দিয়ে এসে তাঁর অন্তরের জ্যোতির সঙ্গে মিলিত হয়ে এক হয়ে গিয়েছিল তখন সেই ঘরখানার নরম অন্ধকারে তাঁর মুখের উপর একটা স্বর্গীয় জ্যোতি ফুটে উঠেছিল। চাঁদের উজ্জ্বলতা, বাড়ি আর বাগানের নিস্তব্ধতা, নৈশ পরিবেশের অটল প্রশান্তি—এই সব কিছু শিশুসুলভ এক অনাবিল ঘুমের মধ্যে ডুবে যাওয়া বিশপের শ্রদ্ধাজনক মুখখানার উপর এনে দিয়েছিল এমন এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য আর মহত্ত্ব যা ক্রমশই অচেতনভাবে ঈশ্বরানুভূতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

সেই লোহার যন্ত্রটা হাতে নিয়ে নৈশ ছায়ার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জাঁ ভলজাঁ। বৃদ্ধ বিশপের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন ভয়

হচ্ছিল তার। এমন দৃশ্য এর আগে কখনো দেখেনি সে। তার নীতি চেতনার স্তরে দুই বিপরীত ভাবের এক তুমুল দ্বন্দ্ব চলছিল তখন। একদিকে এক পাপকর্মের অনুষ্ঠানে উন্মুখ প্রবৃত্তির পটভূমিকায় তার বিপন্ন বিবেকের অক্ষম উপস্থিতি আর একদিকে এক অসতর্ক ও নির্দোষ নিরীহ মানুষের সুগভীর নিদ্রা। এই নিঃসঙ্গ নীরব দ্বন্দ্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে জাঁ ভলজাঁ এক মহান ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠল ধীরে ধীরে।

জাঁ ভলজাঁর মনের সেই অনুভূতিটা অন্য কেউ তো দূরের কথা, সে নিজেই তা প্রকাশ করতে পারবে না। এক পরম প্রশান্তির সামনে অগ্রসরমান এক চরম হিংসার রূপকে কল্পনা করে নিতে হবে আমাদের। তার যে মুখে শুধু এক বিহ্বল বিব্রত বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সে মুখ দেখে তাব মনের ভাব বোঝা সম্ভব ছিল না। সে নিচের দিকে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মনের কথা ধরতে পারাটা সম্ভব ছিল না কারো পক্ষে। তবে সে যে বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েছিল তা তার তখনকার চেহারা বা মুখচোখের ভাব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু কি ধরনের আবেগ ছিল তার মনের মধ্যে তা বোঝা যাচ্ছিল না।

বিছানা থেকে তার দৃষ্টিটা সরিয়ে নিল ভলজাঁ। তখন তার মুখচোখের ভাব থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তার মন তখন পরস্পরবিরুদ্ধ দুটি স্রোতের টানে ভেসে চলেছিল—একদিকে মৃত্যু আর একদিকে মুক্তি। হয় তাকে ঘুমন্ত বিশপের মাথাটাকে ভেঙে গুঁড়ো করে দিতে হবে অথবা তাঁর হাতটাকে চুম্বন করতে হবে।

কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর ভলজাঁ তার বাঁ হাত দিয়ে মাথা থেকে টুপিটা তুলে আর ডান হাতে সেই লোহার যন্ত্রটা ধরে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল। বিশপ তখনো শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন। তার ভয়ঙ্কর দৃষ্টি যেন ভেদ করতে পারছে না বিশপের শান্ত নিদ্রার আবরণটাকে। বিছানার পাশে আলনার উপরে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটা ছোট মূর্তি ছিল। যীশু যেন দু'হাত বাড়িয়ে ঘরের মধ্যে দু'জন লোকের একজনকে আশীর্বাদ আর একজনকে ক্ষমা দান করছেন।

ভলজাঁ হঠাৎ টুপিটা আবার মাথায় পরে ঘুমন্ত বিশপের দিকে না তাকিয়ে আলমারিটার কাছে চলে গেল। চাবিটা কাছে পেয়ে গেল বলে আর তালা ভাঙতে হলো না। চাবি খুলে আলমারি থেকে রুপোর কাঁটাচামচের ঝুড়িটা নিয়ে আবার তার ঘরে চলে গেল। তারপর তার পিঠের ব্যাগটা খুলে তার মধ্যে রুপোর কাঁটাচামচগুলো ভরে নিয়ে ঝুড়িটা ফেলে দিল। ব্যাগটা পিঠে নিয়ে ছড়িটা হাতে ধরে খোলা জানালা দিয়ে বাগানে লাফ দিয়ে পড়ে পাঁচিলে উঠে বিড়ালের মতো একমুহূর্তে ওদিকের রাস্তাটায় পড়ল।

১২

পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের সময় তাঁর বাগানে কাজ করছিলেন মঁসিয়ে বিয়েনভেনু। এমন সময় ম্যাগলোরি ছুটতে ছুটতে উত্তেজিতভাবে তাঁর কাছে এল।

ম্যাগলোরি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মঁসিয়ে মঁসিয়ে, আপনি জানেন রুপোর জিনিসপত্র রাখা ঝুড়িটা কোথায় ?

বিশপ বললেন, হ্যাঁ জানি।

ম্যাগলোরি বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। জিনিসটা গেল কোথায় তা আমি বুঝতেই পারছিলাম না।

কিছুক্ষণ আগে খালি ঝুড়িটা বাগানের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখতে পান বিশপ। তিনি ঝুড়িটা তুলে ম্যাগলোরির হাতে দিয়ে বলেন, এই নাও।

ম্যাগলোরি বলল, কিন্তু এটা তো খালি। রুপোর জিনিসগুলো গেল কোথায় ?

বিশপ বললেন, তাহলে তুমি রুপোর জিনিসগুলো চাইছ ? সেগুলো কোথায় তা তো আমি জানি না।

ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। সেগুলো চুরি গেছে। গতকাল রাতে যে লোকটা এসেছিল সেই সেগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে।

এই বলে লোকটা অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট যে জায়গায় শুয়েছিল সেখানে ছুটে চলে গেল। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। বিশপ তখন ঝুড়ির চাপে পিষ্ট একটা ফুলগাছের উপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছিলেন।

ম্যাগলোরি বলল, মঁসিয়ে মঁসিয়ে, লোকটা চলে গেছে। রুপোর জিনিসগুলো সব চুরি করে নিয়ে গেছে।

কথা বলতে বলতে বাগানের চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল ম্যাগলোরি। দেখল রাস্তার দিকের বাগানের পাঁচিলের এক জায়গার একটা-দুটো ইট খসে পড়েছে। ঐ ভাঙা জায়গাটা যেন চোর পালানোর সাক্ষী হয়ে আছে।

ম্যাগলোরি বলল, ঐ যে ঐ পথে পালিয়েছে রাক্ষসটা। সে পাঁচিল পার হয়ে রাস্তায় চলে গেছে। আমাদের সব রুপোগুলো চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

কিছুক্ষণ ভাববার পর বিশপ গম্ভীরভাবে ম্যাগলোরির দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললেন, প্রথম কথা ওগুলো কি সত্যি সত্যিই আমাদের ছিল ?

হতবাক ও হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাগলোরি। কোনও কথা খুজে পেল না। কথাটার মানে কিছু বুঝতে পারল না।

বিশপ আবার বলতে লাগলেন, আমি দেখছি এতদিন ধরে জিনিসগুলো রাখা আমারই ভুল হয়ে গেছে। আসলে ওগুলো গরীব-দুঃখীদের জিনিস। যে লোকটা সেগুলো নিয়ে গেছে সেও গরীব নয় তো কি ?

ম্যাগলোরি বলল, আমার বা আপনার বোনের জন্য বলছি না, মঁসিয়ে এবার থেকে কি করে খাবেন ?

আপাত বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে বিশপ বললেন, টিন বা সীসের কাঁটাচামচ কিনে আনবে।

তার থেকে গন্ধ বার হবে।

তাহলে লোহার কাঁটাচামচ আনবে।

তার একরকম বাজে স্বাদ আছে।

তাহলে কাঠের কাঁটাচামচের ব্যবস্থা করবে।

কিছুক্ষণ পর খাবার ঘরের যে টেবিলে গতরাতে জাঁ ভলজাঁ বসে খেয়েছিল সেখানে বসে বিশপ তাঁর বোনের পাশে বসে প্রাতরাশ খাচ্ছিলেন। একসময় খেতে খেতে তিনি খুশি মনে তাঁর বোনকে বললেন, দেখ, আসলে কাঠের হোক বা যারই হোক, কোনও কাঁটাচামচের দরকারই নেই। একপাত্র দুধে একটা রুটি ডোবাতে কোনও কাঁটাচামচের দরকার হয় না।

ম্যাগলোরি নিজের মনে মনে স্বগতোক্তি করল, আর কীই বা আশা করতে পার তুমি। একটা বাজে লোককে ঘরে থাকতে দিয়ে খাইয়ে ভাল বিছানায় শুইয়ে তার ফলে পেলে কি না সে সব চুরি করে নিয়ে গেল। ঘৃণায় ও রাগে সর্বাঙ্গ আমার কাঁপছে।

বিশপ আর তাঁর বোন যখন প্রাতরাশ খাওয়ার পর টেবিল থেকে উঠে যাচ্ছিলেন তখন দরজায় কে করাঘাত করল বাইরে থেকে। বিশপ বললেন, ভিতরে এস।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে তিনজন পুলিশ একটা লোকের ঘাড ধবে ঘরের মধ্যে ঢুকল। লোকটা হলো জাঁ ভলজাঁ।

তিনজন পুলিশ ছাড়া একজন সার্জেন্ট দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এগিযে এসে বিশপকে ডাকল, মঁসিয়ে—

একথায় ভলজাঁ আশ্চর্য ও হতবুদ্ধি হয়ে বোকার মতো বলে উঠল, মঁসিযে! উনি তাহলে কুরে বা ছোট যাজক নন?

সার্জেন্ট তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো। উনি হচ্ছেন মহামান্য বিশপ।

মঁসিয়ে বিয়েনভেনু তখন তাদের কাছে ছুটে এলেন। তিনি ভলজাঁকে দেখেই বললেন, তুমি তাহলে আবার এসেছ? তোমাকে দেখে আনন্দিত হলাম। তুমি কি রুপোর বাতিদান দুটো নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলে? ওগুলোও খাঁটি রুপোর এবং দু'শো টাকা দাম হবে। আমি তো ও দুটোও দিয়েছিলাম। তুমি হয়ত ভুলে গেছ।

জাঁ ভলজাঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে সেই বিস্ফারিত চোখের অপরিসীম বিস্ময় আর বিহ্বলতা নিয়ে তাকিয়ে রইল বিশপের পানে। তার সেই চোখমুখের অদ্ভুত ভাব থেকে তার মনের অনুভূতি অনুমান করা সম্ভব ছিল না।

সার্জেন্ট বিশপকে বলল, মঁসিয়ে, তাহলে কি ধরে নেব এই লোকটা যা বলেছে তা সত্যি? তাকে ছুটতে দেখে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করি। তার পিঠের ব্যাগের মধ্যে এই রুপোর জিনিসগুলো পাই তাই—

বিশপ হাসিমুখে বললেন, আর ও বলেছে একজন বৃদ্ধ যাজক যার ঘরে রাত কাটিয়েছে সে তাকে ওগুলো দিয়েছে। এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। আপনারা অবশ্য ওকে এখানে ধরে আনতে বাধ্য। কিন্তু আপনারা ভুল করেছেন।

সার্জেন্ট বলল, তাহলে বলতে চান ওকে আমরা ছেড়ে দেব?

নিশ্চয়।

পুলিশরা ভলজাঁকে ছেড়ে দিতে সে আমতা আমতা করে বলল, আমি তাহলে এবার সত্যিই কি যেতে পারি?

ভলজাঁ যেন ঘুমের ঘোরে ঘুমজড়ানো কণ্ঠে বলল কথাগুলো।

একজন পুলিশ বলল, তুমি কি শুনতে পাওনি?

বিশপ বললেন, এবার কিন্তু রুপোর বাতিদান দুটো নিয়ে যেতে ভুলবে না।

আলনার উপর থেকে বাতিদান দুটো এনে ভলজাঁর হাতে তুলে দিলেন বিশপ। তার বোন ও ম্যাগলোরি কোনও কথা বলে অথবা কোনও প্রতিবাদসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হস্তক্ষেপ করল না বিশপের কাজে। ভলজাঁর হাত দুটো কাঁপতে লাগল। সে অন্যমনে যন্ত্রচালিতের মতো বাতিদান দুটো নিল।

বিশপ ভলজাঁকে বললেন, এবার তুমি শান্তিতে যেতে পার। এবার যদি কোনওদিন ঘটনাক্রমে এ বাড়িতে আস তাহলে আর বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। এ দরজায় কোনওদিন তালা দেওয়া হয় না।

এবার পুলিশদের দিকে ঘুরে বিশপ বললেন, ধন্যবাদ ভদ্রমহোদয়গণ!

পুলিশরা চলে গেল। ভলজাঁ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন মনে হলো সে পড়ে যাবে। বিশপ তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি ভুলে যেও না তুমি কথা দিয়েছ তুমি তোমার সব টাকা দিয়ে এমন একটা কিছু কাজ করবে যাতে তুমি একজন সৎ লোক হয়ে উঠতে পার।

ভলজাঁর মনে পড়ল না কি প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছে! সে তাই চুপ করে রইল। এব আগেব কথাগুলোই বিশপ ধীরে ধীরে নিচু গলায় বললেন, জাঁ ভলজাঁ, হে আমাব ভাই, এখন আব কোনও পাপ নেই তোমার মধ্যে। এবার থেকে তুমি শুধু ভাল কাজ করে যাবে। তোমার আত্মাকে যত সব কুটিল চিন্তা আর অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য তোমার আত্মাকে কিনে নিযেছি আমি এবং তারপর ঈশ্বরকে তা ফিরিযে দিযেছি।

১৩

শহর ছেড়ে একবকম ছুটতে ছুটতে ভলজাঁ গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পড়ল। কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে তার কিছু খেযাল ছিল না তার। এইভাবে পথে পথেই সারা সকালটা কেটে গেল তার। এর মধ্যে কিছু সে খায়নি, কোনও ক্ষুধাও বোধ করেনি। যে অদ্ভূত চেতনা বা অনুভূতি তার মনটাকে তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার মধ্যে ছিল এক ধরনের রাগ। কিন্তু এ রাগ কার উপর তা সে জানে না। এই ঘটনায় সে সম্মান বা আঘাত কি পেয়েছে তা সে বঝতে পারছে না। গত কুড়ি বছরের মধ্যে কোনও কোনও অসতর্ক মুহূর্তে তার মনে কোনও মমতামেদুর ভাব জাগলে সে কঠোরভাবে তা অবদমিত করেছে। তার মনের অবস্থা তখন সত্যিই বড় ক্লান্ত ছিল। সে ভযে ভয়ে বুঝল একদিনের অন্যায় অবিচার আর দুর্ভাগ্যের চাপে তার মনের মধ্যে যে একটা ভয়ঙ্কর শান্ত নিষ্ক্রিয় ভাব গড়ে উঠেছিল, এখন সেটা ধসে

পড়ছে। কিন্তু তার পরিবর্তে আবার কোন নতুন ভাব গড়ে উঠবে? এক এক সময় আবার জেলখানায় ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় তার যা আগে কখনো হয়নি। জেলখানায় গেলে আর কিছু না হোক অন্তত কোনও দুশ্চিন্তা থাকবে না তার মনে। তখন বছরটা প্রায় শেষ হয়ে এলেও কিছু ফুল তখনো ছিল পথের ধারের বনে-ঝোপে। সেই সব বুনো ফুলের গন্ধে ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ল তার। বিস্মৃতির অতল গর্ভে সমাহিত সেই সব স্মৃতিগুলো সত্যিই দুঃসহ তার পক্ষে।

এই সব মানসিক অশান্তি আর গোলমালের মধ্য দিয়ে সারাটা দিন কেটে গেল তার। বিকালে সূর্য অস্ত যাবার সময় যখন সব বস্তুর ছায়াগুলো বড বড় হয়ে উঠল তখন এক প্রান্তরের ধারে একটা ঝোপের পাশে সে বসল। প্রান্তরটা একেবারে ফাঁকা আর জনশূন্য। দূর দিগন্তের একদিকে আল্পস পর্বতের চূড়া অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। দিগনে শহর থেকে সে প্রায় সাত মাইল দূরে চলে এসেছে। একটা পায়ে চলা পথ তার পাশ দিয়ে প্রান্তরটা ভেদ করে দূরে চলে গেছে।

নিবিড় পথক্লান্তির সঙ্গে নিদারুণ মানসিক দুশ্চিন্তা আরও ভয়াবহ করে তুলেছিল তার চেহারাটাকে। এমন সময় এক জীবন্ত মানুষের শব্দ কানে এল তার। মুখ ফিরিয়ে দেখল একটা বছর দশেকের ছেলে গান গাইতে গাইতে সেই হাঁটা পথটা দিয়ে আসছে। তার পিঠের উপর বাঁধা একটা বাক্সের মধ্যে তার জিনিসপত্র সব ছিল। মনে হলো সে একজন ভবঘুরে জাতীয় ছেলে যে গাঁয়ে গাঁয়ে চিমনি পরিষ্কারের কাজ করে বেড়ায় ছেঁড়া পায়জামা পরে। পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে থেমে খেলা করছিল সে। তার হাতে চল্লিশটা স্যু ছিল, তা নিয়ে লোফালুফি করছিল সে। সেটা উপরে ছুঁড়ে দিয়ে উল্টো দিক দিয়ে লুফে নিচ্ছিল। এই পয়সাই তার জীবনের একমাত্র সম্বল।

জাঁ ভলজাঁকে দেখতে না পেয়ে সে ঝোপটার ধারে দাঁড়িয়ে পয়সাটা নিয়ে আবার খেলা করতে শুরু করে দিল। এবার সে পয়সাটা গড়িয়ে দিতে লাগল। গড়াতে গড়াতে পয়সাটা ভলজাঁর পায়ের কাছে এসে পড়ল। পায়ের কাছে আসতেই পা দিয়ে পয়সাটা চেপে দিল ভলজাঁ।

ছেলেটা দেখেছিল তার পয়সাটা কোথায় গেছে। সে সোজা ভলজাঁর কাছে চলে এল। জায়গাটা একেবারে নির্জন। পথে বা প্রান্তরের কোথাও একজন মানুষ নেই। মাথার অনেক উপরে এক ঝাঁক উড়ন্ত পাখির কলরব ছাড়া আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। অস্তম্লান সূর্যের কিছু আলো এসে ছেলেটার মাথার সোনালী চুল আর ভলজাঁর মুখের উপর পড়েছিল।

ছেলেটি বলল, মঁসিয়ে, আমার পয়সাটা দেবেন?

তার কণ্ঠে শিশুসুলভ এক সরল বিশ্বাসের সঙ্গে নির্দোষিতা আর অজ্ঞতার একটা ভাব ছিল।

ভলজাঁ বলল, তোমার নাম কি?

পেতিত গার্ভে মঁসিয়ে।

চলে যাও।

দয়া করে আমার পয়সাটা ফিরিয়ে দিন মঁসিয়ে।

জাঁ ভলজাঁ মাথা নিচু করে বসে রইল। কথাটার কোনও উত্তর দিল না।

ছেলেটি আবার বলল, দয়া করুন মঁসিয়ে।

ভলজাঁ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার পয়সা। একটা রুপোর মুদ্রা।

ভলজাঁ যেন কথাটা শুনতে পেল না। ছেলেটা তখন তার ভারী জুতোপরা পাটা সরিয়ে পয়সাটা বার করার চেষ্টা করতে লাগল। সে বারবার বলতে লাগল, আমার পয়সাটা দিয়ে দিন। আমার চল্লিশটা স্যু। এবার কাঁদতে লাগল জোবে। ভলজাঁ এবার মাথাটা তুলল। সে আশ্চর্য হয়ে ছেলেটার পানে তাকাল। তারপর তার ছড়িটা খুঁজতে খুঁজতে ভয়ঙ্কর গলায় বলে উঠল, কে এখানে?

ছেলেটা বলল, আমি পেতিত গার্ভে মঁসিযে। আপনি দয়া করে পাটা সরিয়ে আমার চল্লিশ স্যুর মুদ্রাটা দিযে দিন।

ছেলেটা রেগে গিয়ে কড়া গলায বলল, আপনি পাটা সরাবেন?

ভলজা উঠে দাড়িয়ে বলল, চলে যাও বলছি। এখনো আছ?

সে তার একটা পা দিয়ে তখনো ছেলেটার মুদ্রাটাকে চেপে রইল। পা-টা সরাল না।

ছেলেটা ভলজাব মুখের দিকে তাকিযে ভয পেয়ে গেল। কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হযে দাড়িয়ে থাকার পর সে আর পিছন ফিরে না তাকিযে বা কোনও কথা না বলে ছুটে পালাল। ছেলেটা ছুটতে ছুটতে হাপযে পড়েছিল। এক একবার পথের উপর দাঁড়াচ্ছিল। সে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ভলজাঁ। কিন্তু একটু পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে সূর্য অস্ত গেল। গোধূলির ছাযা ঘন হয়ে উঠল জাঁ ভলজাঁব চারদিকে। সারা দিন তার কিছুই খাওয়া হয়নি। গাযে জ্বব বোধ করছিল। যেখানে দাড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে বইল স্থির হযে। ছেলেটার চলে যাওযার পর এক পাও নড়েনি কোথাও। সহসা সে তার সামনে দেখল ঘাসের উপর নীল রঙের একটা ভাঙা পাত্রের একটা টুকরো পড়ে রযেছে। গায়ে জোর ঠাণ্ডা লাগতে বুকের উপর শার্টটা বেঁধে নিল। তাবপর মাটির উপর পড়ে থাকা ছাড়টা কুড়িযে নিতে গিয়ে তার পায়ের তলায় এতক্ষণ ধরে পড়ে থাকা চল্লিশ স্যুর মুদ্রাটা দেখতে পেল। ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগল সে।

তা দেখে এক বৈদ্যুতিক আঘাত পেযে যে- চমকে উঠল সে। আপন মনে বলে উঠল, এটা কি? মনে হলো চকচকে রুপোর মুদ্রাটা তার উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে তাকে দেখছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িযে থাকার পর সে সরে গিয়ে মুদ্রাটা হাতে তুলে নিযে তাব চারপাশে নিরাপদ আত্মগোপনের এক আশ্রয় খুঁজতে থাকা ভীত সন্ত্রস্ত এক জন্তুর মতো দৃষ্টি ছড়িয়ে তাকাতে লাগল।

কোনও দিকে কিছুই দেখতে পেল না সে। রাত্রির অন্ধকার নেমে আসছিল। গোটা প্রান্তরটা ঠাণ্ডা হিম হয়ে উঠেছে। তার উপর নীলচে এক কুয়াশা নেমে এসে গোধূলির শেষ আলোটুকু অকালে মুছে দিয়েছে। ছেলেটা যেদিকে পালায় সেই পথেই জোর পায়ে হাঁটতে লাগল ভলজাঁ। কিছুদূর যাওয়ার পর একবার থেমে আবার তাকাল চারদিকে। এবারও কিছুই দেখতে পেল না সে। তখন জোর চিৎকার করে ডাকতে লাগল, পেতিত গার্ভে! পেতিত গার্ভে!

সে একবার থামল। কিন্তু কারো কোনও সাড়া পেল না। এক কুয়াশাঘন অন্ধকার প্রান্তরের বিশাল শূন্যতা আর অখণ্ড স্তব্ধতার মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল সে। সে স্তব্ধতার মাঝে তার সব কণ্ঠস্বর নিঃশেষে তলিয়ে গিয়েছিল কোথায়। তীক্ষ্ণ কনকনে বাতাস বইতে লাগল। ঝোপঝাড়ের গাছগুলো প্রচণ্ড রাগে ডালপালা নেড়ে ভয় দেখাতে লাগল যেন তাকে।

আবার পথ হাঁটতে লাগল সে। সহসা ছুটতে শুরু করে দিল। ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে পেতিত গার্ভের নাম ধরে হতাশ কণ্ঠে ভয়ঙ্করভাবে ডাকতে লাগল। পেতিত গার্ভে সে ডাক শুনতে পেলে কোথাও হয়ত লুকিয়ে পড়ত।

ভলজাঁ দেখল ঘোড়ায় চেপে একজন যাজক আসছে। সে তার কাছে গিয়ে বলল, মসিয়ে লে কুরে। একটা ছেলেকে এই পথে যেতে দেখেছেন? পেতিত গার্ভে নামে একটি ছেলে?

না, আমি কোনও ছেলেকে দেখিনি।

ভলজাঁ পাঁচ ফ্রাঁর দুটো মুদ্রা বার করে যাজকের হাতে দিয়ে বলল, দরিদ্রদের সেবার জন্য এটা নিন মসিয়ে লে কুরে...ছেলেটার বয়স বছর দশেক হবে। তার পিঠে একটা বাক্স ছিল। হয়ত সে চিমনির ঝাড়ুদার অথবা ঐ ধরনের কিছু কাজ করে।

আমি তাকে দেখিনি।

পেতিত গার্ভে তার নাম। এখানকার পাশাপাশি কোন গাঁয়ে থাকে কি?

যাজক বলল, আমি তা জানি না। মনে হয় সে এখানকার ছেলে নয়। বিদেশি কোনও ভবঘুরে। ওরা মাঝে মাঝে আসে।

আরও দুটো পাঁচ ফ্রাঁর মুদ্রা বার করে যাজকের হাতে দিয়ে ভলজাঁ বলল, দরিদ্রদের সেবার জন্য এটাও রেখে দিন।

যাজক ঘোড়াটা চালিয়ে দিলে ভলজাঁ চিৎকার করে বলে উঠল, মঁসিয়ে ল্যাবে, আমাকে গ্রেপ্তার করুন, আমি চোর।

যাজক ভয়ে ঘোড়াটাকে জোরে ছুটিয়ে চলে গেল।

যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকেই যেতে লাগল ভলজাঁ। অনেকক্ষণ [illegible] পেতিত গার্ভের নাম ধরে অনেক ডাকল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল [illegible] পেল [illegible]। মাঝে মাঝে পথের ধারে এক একটা ঝোপ [illegible] মনে হতে লাগল কোনও মানুষ [illegible]ছে। কিন্তু পরে [illegible]

ধারণা আছে? এই সব ঘটনার সঙ্গে যে সব ব্যাপার জড়িয়ে আছে তা কি সে বোঝে? কেউ কি তার কানে কানে একটা কথা ফিস ফিস করে বলেনি যে সে আজ জীবনের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে যেখানে মধ্যপথ বলে কিছু নেই। এখন থেকে হয় তাকে মানুষ হিসাবে খুব ভাল হতে হবে অথবা খুব খারাপ হয়ে উঠতে হবে, হয় তাকে বিশপের থেকে আরও অনেক বড হতে হবে অথবা শয়তানের থেকে নীচ হতে হবে, হয় তাকে মানবতা ও মহত্ত্বের সর্বোচ্চ স্তরে উঠে যেতে হবে অথবা নীচতা ও হীনতার সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যেতে হবে।

আমরা আবার এ প্রশ্ন করতে পারি, জাঁ ভলজাঁ কি তার মনের মধ্যে এসব কথা বুঝতে পেরেছিল? দুঃখ-বিপর্যয় অবশ্য মানুষের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। তবু ভলজাঁ এই সব জটিল ব্যাপারগুলো ঠিকমতো বুঝতে পেরেছিল কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ সব চিন্তা তার মনের মধ্যে ঢুকেছিল তার স্পষ্ট কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না, শুধু অস্পষ্টভাবে তার একটা ধারণা করে নিতে হয। তাছাডা এ সব চিন্তা তার মনের মধ্যে ঢুকে তাব মনটাকে এক বেদনার্ত ও দুর্বিসহ আলোডনেব মধ্যে ফেলে দেওযা ছাড়া তাব কোনও ভাল করতে পারেনি। নারকীয় এক কুটিল অন্ধকারে ভরা কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেই বিশপের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার তার মনশ্চক্ষুকে একেবারে বিহ্বল করে দিয়েছিল, দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর কোনও লোক হঠাৎ উজ্জ্বল দিবালোক দেখতে পেলে তার চোখ দুটো যেমন ধাঁধিযে যায়। বিশপের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সততা ও শুচিতায় যে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি এনে দিয়েছিল তার জীবনে, সে প্রতিশ্রুতি সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ হযে প্রবল ভযে কাঁপিযে তুলেছিল তাকে। সত্যি সত্যিই হতবুদ্ধি হয়ে পডেছিল সে। অন্ধকার কোটর হতে অকস্মাৎ নির্গত কোনও পেঁচা যেমন সূর্যোদযের আলোকবন্যায় বিহ্বল ও বিব্রত হযে পড়ে, তেমনি সহসা পুণ্যের উজ্জ্বলতায় চোখে অন্ধকার দেখছিল সে।

সে বুঝতে না পারলেও একটা জিনিস নিশ্চিত যে সে আর আগেকার সে মানুষ নেই। তার অন্তরের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে, তার মনের কাঠামোটাই বদলে গেছে একেবারে। বিশপ তাকে এ কথা বলেনি বা তার অন্তরকে স্পর্শ করেনি একথা জোর গলায় বলে বেড়াবার মতো শক্তি তার আব নেই।

এই ধরনের মানসিক গোলমাল ও গোলযোগের মধ্যে পেতিত গার্ভের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। সে তার চল্লিশ স্যু চুরি করে। কেন সে একাজ করেছে? সে নিশ্চয় এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। সুদীর্ঘ কারাবাস তার মনের মধ্যে যে অশুভ শক্তি জাগিয়ে তোলে সেই শক্তিই কি তার অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে তোলে? হযত তাই, অথবা যতটা ভাবছি ততটা নয়। তবে মোট কথা, যে পেতিত গার্ভে নামে ছেলেটার পয়সা চুরি করেছিল সে মানুষ নয়, জাঁ ভলজাঁর মধ্যে যে একটা পশু ছিল সেই পশুটাই তার অভ্যাসগত ও প্রকৃতিগত পাশবিকতার বশে পয়সাটার উপর পাটা চেপেছিল। আর তখন ভলজাঁর ভিতরকার মানুষটা নতুন

চিন্তাগুলোর সঙ্গে বুদ্ধি দিয়ে লড়াই করে চলেছিল। সে যখন বুঝতে পারল তার ভিতরকার পশুটা একাজ করেছে তখন সে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, নতুন অবস্থার মধ্যে যে মানসিকতা তার গড়ে উঠেছিল তাতে সে বেশ বুঝতে পারল, যে কাজ সে করে ফেলেছে সে কাজের মানসিক প্রতিক্রিয়া সে সহ্য করতে পারবে না।

যাই হোক, তার এই শেষের কুকর্মটা তার মনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করল। তার মনের সব বিশৃঙ্খলা ভেদ করে এ ঘটনা এমন এক আলোকসম্পাত করল তার মনের উপর যার ফলে তার মন ও বুদ্ধি অন্ধকার থেকে আলোটাকে পৃথক করতে পারল এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণের মতো তার কাজের ন্যায়-অন্যায়ের উপাদানগুলো বিচার করে দেখতে পারল।

প্রথমেই সে কোনও নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরার মতো কোনও কিছু নতুন করে চিন্তা করার আগে ছেলেটাকে খুঁজে তার পয়সাটা ফেরৎ দিতে চাইল। যখন সে তা পারল না তখন সে সত্যিই হতাশ হয়ে বসে পড়ল। যে মুহূর্তে সে 'পাপী শয়তান' এই কথা দুটো উচ্চারণ করল তখন সে তার ভিতরকার যে মানুষটা থেকে এতদিন বিচ্ছিন্ন ছিল সে তাকে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। অথচ বাইরে সে দেখল সে একটা রক্তমাংসের মানুষ, অপরাধী পাপী জাঁ ভলজাঁ যার হাতে ছড়ি, পিঠে চুরি করা জিনিসপত্রে ভরা একটা ব্যাগ, মুখখানা কালো এবং মনে কালো মুখখানার থেকে কালো কুটিল যত চিন্তা।

অতিরিক্ত দুঃখভোলা মানুষকে করুণাপ্রবণ করে তোলে। জাঁ ভলজাঁও কেমন যেন কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। জাঁ ভলজাঁ নামে মানুষটার মুখোমুখি হয়ে সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল কে ওই মানুষটা। নিজেকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

এই সব মুহূর্তে যখন মনের সমুদ্রটা ভয়ঙ্করভাবে শান্ত হয়ে ওঠে এবং অন্তর্দৃষ্টিটা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে তখন আমাদের চিন্তাগুলো বাস্তব জগৎটাকে পরিহার করে গভীরে চলে যায়। তখন এই পরিদৃশ্যমান বাস্তব জগৎটাকে আর আমরা দেখতে পাই না, তখন শুধু আমরা আমাদের অন্তরের জগৎ, তার অন্তর প্রকৃতিটাকেই দেখতে পাই।

এইভাবে সে যখন নিজের মুখোমুখি হয়ে আপন অন্তরের রহস্যময় গভীরে তলিয়ে গিয়ে ভাবছিল তখন হঠাৎ বাইরে থেকে একটা টর্চের আলো এসে লাগল তার চোখে। প্রথমে সে ভাবল এটা তারই চেতনার আলো। কিন্তু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে সে বুঝল একটা মানুষ এ আলো ফেলেছে আর সে মানুষ হলো দিগনের সেই বিশপ।

তখন তার মনশ্চক্ষুর সামনে দুটো মানুষের মূর্তি ফুটে উঠল —একজন বিশপ আর একজন জাঁ ভলজাঁ। প্রথমে মনে হলো জাঁ ভলজাঁর দানবিক চেহারাটার বিশাল ছায়ায় বিশপের মূর্তিটা ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু ক্রমে ভাবতে ভাবতে সে দেখল বিশপের উজ্জ্বল জ্যোতির তীব্রতায় জাঁ ভলজাঁ মুখ লুকিয়ে পালিয়ে গেছে কোথায়। জাঁ ভলজাঁ একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেতে বিশপ একাই দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে।

সামনে যারা বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গা-ঢাকা দেয় তারা আবার প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে থাকে। যারা একদিন যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষে যোগদান করে, তারা সম্মান ও পুরস্কার লাভ করতে থাকে। যারা একদিন ছিল রাজতন্ত্রের বিরোধী তারা আবার দৃঢ়ভাবে প্রকাশ্যে রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেখাতে থাকে।

এই হলো ১৮১৭ সালের মোটামুটি এক চিত্র। লোকে এখন এসব কথা প্রায় সব ভুলে গেছে। এই সব ছোটখাটো ঘটনা বাতিল করে দিয়ে ইতিহাস বড বড় ঘটনা নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের জীবনকাহিনীতে এই সব আপাততুচ্ছ ছোটখাটো ঘটনারও মূল্য আছে। ইতিহাসস্বরূপ বিশাল বনস্পতির শাখা-প্রশাখায় যে সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলি পাতার মতো বিরাজ করতে থাকে তারা কেউ মৃত্যুহীন নয় একেবারে। এক একটি বছরের উপাদানেই শতাব্দীর বিশাল মুখমণ্ডলটি রচিত হয়।

১৮১৭ সালে প্যারিসের চারজন যুবক হাস্যকৌতুকে বিশেষ নাম করে।

২

তুলুজ, লিমোজে, ক্যাহর আর মঁতাবাঁ থেকে চারজন ছাত্র প্যারিসে পডতে আসে। তারা ছিল বছর কুড়ি বয়সের সাধারণ যুবক। মোটামুটি ধরনের দেখতে। তাদের সম্বন্ধে ভাল বা মন্দ, পণ্ডিত বা মূর্খ, বুদ্ধিমান বা বোকা কোনওটাই ঠিকমতো বলা যায় না। তাদের স্বভাবের সঙ্গে স্ক্যান্ডিনেভিয়া আর ক্যালিডোনিয়া অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বভাবের একটা মিল ছিল। তাদের চালচলন ছিল অস্কারসুলভ, ইংরেজ ভাবাপন্ন তখনো হয়ে ওঠেনি।

তুলুজ থেকে আসা যুবকের নাম ছিল ফেলিক্স থোলোমায়েস, ক্যাহরের যুবকের নাম ছিল লিস্তোলিয়ের, লিমোজে থেকে যে যুবক এসেছিল তার নাম ছিল ফেমিউল আর মঁতাবাঁর যুবকের নাম ছিল ব্ল্যাকিভেল। যুবকদের প্রত্যেকেরই একজন করে প্রেমিকা ছিল। ব্ল্যাকিভেল ভালবাসত ফেবারিতেকে। ফেবারিতে আগে ইংলন্ডে বাস করত। লিস্তোলিয়ের ভালবাসত ডালিয়াকে। তার প্রিয় ফুলের এই নামটা সে নিজে পছন্দ করে ধারণ করে। ফেমিউল ভালবাসত জেফিনেকে। অনেকে আবার তাকে জোশেফাইন বলে ডাকত। থোলোমায়েস ভালবাসত ফাঁতিনেকে। তার সোনালী চুলের জন্য লোকে তাকে লা ব্লঁক বা সুন্দরী বলে ডাকত।

ফেবারিতে, ডালিয়া, জেফিনে আর ফাঁতিনে—এই চারজন মেয়েরই মোহিনী শক্তি ছিল। তারা সব সময় চকচকে পোশাক পরত, গায়ে গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করত। তাদের মুখগুলো হাসিখুশিতে ভরা থাকত। তবে তাদের দেখলেই বোঝা যেত তারা আগে দর্জির কাজ করত এবং সূচীশিল্পের কাজ তখনো ছাড়েনি তারা। তারা এখন প্রেমে পডলেও তাদের আগেকার কর্মজীবনের শান্ত নম্র একটা ভাব তাদের চোখে-মুখে ফুটে ছিল তখনো। নারীদের অধঃপতন শুরু হলেও তাদের চরিত্রের ধাতুর মধ্যে একটা পবিত্রতার বীজ রয়ে যায় এবং এই মেয়েগুলিরও তাই ছিল। এই মেয়েগুলির

মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট ছিল তাকে সবাই 'বেবী' বলে ডাকত। আর যে সবচেয়ে বড় ছিল বয়সে তাকে সবাই 'বিগ সিস্টার' বা 'বড় বোন' বলত। বড় বোনের বয়স ছিল তেইশ। এদের মধ্যে যে তিনজন বড় ছিল তারা ছিল অনেক অভিজ্ঞ, বেপরোয়া এবং প্রেমের ব্যাপারে অভ্যস্ত আর সুন্দরী ফাঁতিনে প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা জীবনে প্রথম অর্জন করছিল এবং তার আস্বাদ অনুভব করছিল।

ডালিয়া, জেফিনে আর ফেবারিতের জীবনে একাধিক প্রেমের অভিজ্ঞতা ছিল। আগে তাদের জীবনে তাদের প্রেমকাহিনীর নায়ক হিসাবে যে তিন জন যুবক আসে তারা হলো অ্যাডলেফ, আলফোনসে আর গুস্তভ। দারিদ্র্য আর চটুল প্রেমাভিনয় সুন্দরী খেটে খাওয়া শ্রমিক মেয়েদের এক অপ্রতিরোধ্য প্রলোভন হিসাবে এসে তাদের জীবনটাকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। দারিদ্র্য তাদের খোঁচা দেয়, আর তার পীড়ন তাদের কুপথে ঠেলে দেয়। প্রেম তাদের তোষামোদের পথে নিয়ে যায়। এই দুই-এর আবেদনের কাছে তারা অসহায় এবং তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে না তারা। যে প্রেমের ফুল তাদের উপর ছুড়ে দেওয়া হয় তা পরে পাথর হয়ে তাদের আঘাত করে। এই ভাবে তারা নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনে। যে আশা আপাতগৌরবময় অথচ এক দুর্বোধ্য ছলনায় জটিল, সে আশার মোহ তাদের জীবনের পথ থেকে সরিয়ে দূরে নিয়ে যায়।

এদের মধ্যে ফেবারিতে কিছুকাল ইংলন্ডে থাকায় জেফিনে আর ডালিয়া তাকে খাতির করত। ছোটবেলা থেকেই তার একটা বাড়ি ছিল। তার বাবা ছিলেন গণিতের শিক্ষক। অহঙ্কারী আত্মম্ভরী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। যৌবনে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েন। কিন্তু বিয়ে করেননি তাকে। ফেবারিতের জন্ম হয় তারই গর্ভে। ফেবারিতের বাবার বয়স বাড়লেও নারীলোলুপতা কমেনি। তার বাবার কাছে থাকত না ফেবারিতে। মাঝে মাঝে দেখা করতে যেত। ফেবারিতে একবার তার বাড়িতে থাকাকালে কোনও এক সকালে রক্তচক্ষু এক বয়স্ক মহিলা তার ঘরে ঢুকে হঠাৎ বলে, তুমি জান আমি কে? আমি তোমার মা। মহিলাটি ঘরে ঢুকে নিজের হাতে খাবার বার করে খেয়ে একটা তোষক নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মহিলাটি খুব বদমেজাজী ছিল এবং ফেবারিতের সঙ্গে একটা কথাও বলত না কখনো। সে তার বাবার কাছে তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনত।

ডালিয়া ভালবাসত লিস্তোলিয়েরকে। এই ভালবাসা কিভাবে গড়ে ওঠে তা কেউ জানে না। তবে ডালিয়ার গোলাপী আঙুলের নখগুলো খুব সুন্দর ছিল। এই সুন্দর নখ নিয়ে কোনও মেয়ে কঠোর শ্রমের কাজ করতে পারে না। কাউকে ধার্মিক হতে হলে আগে তাকে হাত দুটিকে উৎসর্গ করতে হবে। সে হাতে কঠোর শ্রম করতে হবে। জেফিনে ফেমিউলকে প্রেমিক হিসাবে লাভ করে তার গায়ে পড়া ঢলে পড়া ভাব আর তোষামোদসূচক আদরের কথাবার্তার দ্বারা।

যুবকরা ছিল পরস্পরের 'কমরেড' আর মেয়েরা ছিল পরস্পরের বান্ধবী। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রেম আর বন্ধুত্ব পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলতে থাকে।

করে বাইরে যায়। ১৮৬২ সালে সারা ফ্রান্সের মধ্যে প্যারিসই ছিল একমাত্র শহর আর সব শহরতলী।

আটজন ছেলেমেয়ে শহর থেকে দূর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে তখনকার দিনে যত রকমের গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদ প্রচলিত ছিল তাতে স্বেচ্ছায় গা ঢেলে দিয়ে মত্ত হয়ে উঠল। আর গ্রীষ্মের ছুটি সবে মাত্র শুরু। উষ্ণ উচ্ছল গ্রীষ্মের দিন। আগের দিন চারজন মেয়ের পক্ষ থেকে থোলোমায়েসকে একখানি চিঠি লিখে পাঠায় ফাঁতিনে। কারণ সে-ই একমাত্র লিখতে পারত। তাতে লেখে 'সেই বড় চমকের জন্য খুব সকালে উঠতে হবে।'

সেদিন তারা সকাল পাঁচটায় উঠেছিল। তারা ঘোড়ার গাড়িতে করে প্রথমে সেন্ট ক্লাউতে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে জল দেখে তারা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। তেতিনযেরে তারা প্রাতরাশ খেয়ে ইচ্ছামতো দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াতে থাকে। তারা পুকুরে সাঁতার কাটে, গাছে চড়ে, জুয়ো খেলে, ফুল তোলে, ক্রীমপাফ কেনে এবং গাছ থেকে আপেল পেড়ে খায়।

পিঞ্জরমুক্ত পাখির মতো মেয়েরা হাসিখুশিতে উজ্জ্বল হযে বেড়াতে থাকে। তারা পুরুষদের টিকা-টিপ্পনী কেটে ঠাট্টা-তামাশা করতে থাকে। এ হলো প্রথম যৌবনজীবনের উন্মত্ততা, কতকগুলি অবিস্মরণীয় মুহূর্তের সমষ্টি, এ যেন কতকগুলি বড় বড় মাছির রঙিন ডানার উচ্ছসিত কম্পন। প্রথম যৌবনের এই সব কথা কি তোমাদেব কারো মনে নেই? তোমরা কি কেউ কখনো কোনও সুন্দরী মেযেকে নিযে হাত ধরাধরি করে ঝোপে-ঝাড়ের বা কোনও জলাশযের ধারে বেড়াওনি? পথের ছোটখাটো বাধা-বিপত্তি কখনো এই সব প্রমোদাভিলাষী দলের কারো মনে কোনও বিরক্তি উৎপাদন করতে পারেনি। ফেবারিতে একবার অবশ্য তাদের সাবধান করে দিযেছিল, পথে ঐ যে খোলাহীন শামুক দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে বৃষ্টি আসার লক্ষণ।

মেয়ে চারজনের দেহসৌন্দর্য আর বেশভূষা ছিল সত্যিই মনোমুগ্ধকর। তারা সেন্ট ক্লাউডে বাদামগাছের তলায় সকাল ছ'টার সময় যখন বেড়াচ্ছিল তখন একজন বয়স্ক কবি তাদের দেখে অবাক হয়ে যান। মেয়েদেব মধ্যে সবার বড় এবং ব্ল্যাকিভেলের বান্ধবী তেইশ বছরের ফেবারিতে সবার আগে আগে গাছগুলোর তলা দিয়ে যাচ্ছিল। যত সব খাল-নালা ডিঙিয়ে ঝোপঝাড়ের পাশ কাটিয়ে একরকম নাচতে নাচতে পথ হাঁটছিল আর সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জেফিনে আর ডালিয়া দু'জনে ঘন হয়ে পাশাপাশি পথ হাঁটছিল। একে অন্যের সম্পূরক হিসাবে ইংরেজি আদব-কায়দা দেখাচ্ছিল। তখন মেয়েদের মাথার চুল কুঞ্চিত কবার রীতি প্রথম প্রচলিত হয়। বায়রন সুলভ এক ভাবময় বিষাদে স্বেচ্ছায় গা ঢেলে দেওয়ার এক রীতিও শিক্ষিত মেয়েদের সমাজে প্রচলিত ছিল। পরে এ বিষাদ ইউরোপের শিক্ষিত পুরুষদের পেয়ে বসে। জেফিনে আর ডালিয়া তাদের পোশাক আঁট করে পরেছিল। লিস্তোলিয়ের আর ফেমিউল তাদের বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপকদের সম্বন্ধে কি সব আলোচনা করছিল।

তারা ফাঁতিনেকে আইনের অধ্যাপক মঁসিয়ে ডেলভিনকোট ও মঁসিয়ে ব্লোদের মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হয় তা বোঝাচ্ছিল। ব্ল্যাকিভেল সমানে ফেবারিতের গায়ের শালটা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। যেন এই কাজের জন্যই তার জন্ম হয়েছে পৃথিবীতে।

দলের নেতা হিসাবে তখনো সবার পিছনে ছিল থোলোমায়েস। সে রসিক ছিল, কিন্তু তার রসিকতার মাঝে নেতৃত্বসুলভ এক গাম্ভীর্য ছিল। তার কথা সবাই মানতে বাধ্য হত। তার পোশাক বলতে ছিল একটা ঢিলা পায়জামা, আর একটা শার্ট। হাতে ছিল একটা ছড়ি আর মুখে একটা চুরুট। তার সঙ্গীরা বলাবলি করত, ঐ পায়জামা পরলে থোলোমোয়েসকে সত্যিই অসাধারণ দেখায়।

ফাঁতিনে ছিল আনন্দের প্রতিমূর্তি। তার সাদা সুন্দর দাঁতগুলো যেন হাসির জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। তার হাতে সব সময় থাকত সাদা ফিতেওয়ালা একটা খড়ের তৈরি বনেট। তার মাথায় সোনালী চুলের রাশগুলো প্রায়ই ছড়িয়ে পড়ত মাথার চারদিকে। তার ঠোঁট দুটো সব সময় খোলা থাকত আনন্দের আবেগে। তার মুখের কোণ দুটো যেমন একদিকে কোনও উদ্ধত যুবকের অগ্রপ্রসারী প্রেমোচ্ছ্বাসকে আহ্বান করছিল অন্যদিকে তেমনি তার চোখের বড় বড় অবনত পাতাগুলো এক অব্যক্ত বিষাদ ছড়িয়ে সেই ঔদ্ধত্যকে খর্ব করার প্রয়াস পাচ্ছিল। তার পোশাক ও বেশভূষার মধ্যে একই সঙ্গে এক মিষ্টি গানের ছন্দ আর শীতল আগুনের শিখা অদৃশ্য অবস্থায় বিরাজ করছিল। অপর তিনজনের পোশাক মাঝামাঝি ধরনের ছিল। তাতে কোনও পারিপাট্যের আতিশয্য ছিল না। সব মিলিয়ে ফাঁতিনের চেহারাটার মধ্যে একই সঙ্গে এক সংযমের শাসন আর উদ্ধত প্রেমের ছলনা লুকিয়ে ছিল। অনেক সময় মানুষের নির্দোষিতার মূলে থাকে কৃত্রিমতার একটা প্রয়াস, জোর করে ভাল হবার একটা সচেতন চেষ্টা।

হাসিখুশিতে উজ্জ্বল মুখ, সুন্দর চেহারা, ভারী ভারী পাতাওয়ালা নীল চোখের গভীর চাউনি, ঈষৎ ধনুকের মতো বাঁকা পা, সুঠাম গঠন, সাদা ধবধবে গায়ের মাঝে দু' একটা নীল শিরার উঁকিঝুঁকি, যৌবনলাবণ্যপুষ্ট গাল, ঈজিয়ার জুনোর মতো ঋজু ঘাড়, জামার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাওয়া কোনও এক নামকরা ভাস্করদের গঠিত মূর্তির মতো সুন্দর দুটো কাঁধ —এই হলো ফাঁতিনের দেহের মোটামুটি বিবরণ। আত্মসচেতনতার দ্বারা সংযত, আনন্দোৎফুল্লতায় সঞ্জীবিত এক সুন্দর প্রতিমা।

আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হলেও নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনও অহঙ্কার ছিল না ফাঁতিনের। কোনও সৌন্দর্যের উপাসক যিনি সকল দেহসৌন্দর্যের মধ্যে এক নিখুঁত পরিপূর্ণতার সন্ধান করেন তিনি হয়ত ফাঁতিনেকে দেখে তার চেহারার মধ্যে কোনও না কোনও খুঁত ধরার চেষ্টা করবে । আবার তিনি হয়ত তার মধ্যে এক প্রাচীন সৌন্দর্যরীতি ও সামঞ্জস্যের সুষমা খুঁজে পাবেন। সৌন্দর্যের দুটি দিক আছে——রূপাবয়ব আর ছন্দ। রূপাবয়ব হচ্ছে আদর্শ আঙ্গিক বা আধার, আর ছন্দ হচ্ছে গতি।

আমরা আগেই বলেছি ফাঁতিনে ছিল আনন্দের প্রতিমূর্তি। কিন্তু সেই সঙ্গে

শালীনতাবোধ, নারীসুলভ গুণশীলতারও কোনও অভাব ছিল না তার মধ্যে। কেউ যদি খুঁটিয়ে তাকে দেখত তাহলে বুঝতে পারত তার যৌবনের উন্মাদনার অন্তরালে নববসন্ত আর ফুল্লকুসুমিত এক প্রেমের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আত্মস্বাতন্ত্র্যের এক অজেয় দুর্গও ছিল। জীবনে প্রথম প্রেমের ঘটনায় সে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করত এক অপার বিস্ময়ের চমক আর নির্দোষিতাজনিত এক অবুঝ আশঙ্কা, যে আশঙ্কার দ্বারা সাইককে ভেনাস থেকে সহজে পৃথক করা যায়। তার সরু সরু লম্বা আঙুলগুলি যেন কোনও কুমারী সন্ন্যাসিনীর মালা জপ করার ভঙ্গিতে মৃদু সঞ্চালিত হত, মনে হত সেগুলি যেন এক পবিত্র অগ্নিশিখার অন্তরালে ভস্মাচ্ছাদিত এক একটি স্বর্ণদণ্ড। যদিও থোলোমায়েসকে তার অদেয় কিছুই ছিল না, তবু সে মাঝে মাঝে যখন গম্ভীর হয়ে উঠত, যখন সংযমশাসিত কুমারীত্বের কঠোর একটা ভাব ফুটে উঠত তার চোখে-মুখে, গভীর অনমনীয় এক আত্মমর্যাদাবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলত তাকে, যখন তার যৌবনজীবনের সকল আনন্দোচ্ছলতা ত্যাগ আর আত্মনিগ্রহের অগ্রপ্রসারী আক্রমণে অভিগ্রস্ত হয়ে পড়ত সহসা তখন দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠত যে কেউ। সেই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হত সে যেন [illegible]লোচনা নিষ্করুণ কোনও দেবী। তখন তার কপাল, নাক ও চিবুকে এমন সব রেখা ফুটে উঠত যাতে তার সমগ্র মুখমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট হত, আর সঙ্গে সঙ্গে তার নাক আর উপরকার ঠোঁটের মাঝখানে অপরিদৃশ্যপ্রায় এমন এক সুন্দর কুঞ্চন দেখা দিত যা সতীত্বের এক দুর্বোধ্য নিদর্শন, যা দেখে একদিন, [illegible] মাঝে বার্বারোসা ডায়েনার প্রেমে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

অনেক সময় ভালবাসা ভুল হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু [illegible] মনের সততা সে ভুলকে অতিক্রম করে চলছিল স্বচ্ছন্দে।

৪

সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত [illegible] মনে হচ্ছিল সমস্ত প্রকৃতি যেন ছুটির [illegible] প্রান্তর থেকে ফুলের গন্ধ [illegible] আসছিল। নদীতীরে [illegible] দুলছিল। মৌমাছিরা মধু [illegible] বেড়াচ্ছিল [illegible] প্রভৃতি ফুলের উপর প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছিল [illegible] পার্কটাকে কোথা থেকে [illegible] পাখি এসে [illegible]

প্রকৃতির এই [illegible] এক [illegible] আটজন যুবক-যুবতী। [illegible] ছিল [illegible] প্রেমের [illegible] ভাবছি [illegible] তাকালেও [illegible]

মুখগুলো বিকৃত দেখায়। এরপর ওরা বাদাম গাছে ঘেরা বড় দোলনাটায় পালাক্রমে দুলল। দোলনায় দোলবার সময় হাসিতে ফেটে পড়ছিল ওরা। তুলু থেকে আসা থোলোমায়েসের স্বভাবটায় স্প্যানিশ ভাবটা তখনো পুরোমাত্রায় ছিল। সে মনের সুখে একটা গান ধরল। গানটার অর্থ হলো, আমি বাজাজ থেকে এসেছি। প্রেমই আমায় ডেকে এনেছে এখানে। আমার আত্মা এখন আমার চোখের তারায় এসে ফুটে উঠেছে, কারণ তুমি তোমার পা দেখাচ্ছ আমায়।

একমাত্র ফাঁতিনেই দোলনায় দুলল না।

ফেবারিতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, আমি কোনও লোকের অহঙ্কার দেখতে পারি না।

গাধায় চড়ার শখ মিটলে ওরা একটা নৌকো ভাড়া করে পাসি থেকে ব্যারিয়ের দ্য লেতয়েনে গেল। ওরা সকাল পাঁচটায় বেরিয়ে সারাদিন এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করছে। তবু ওরা ক্লান্ত হয়ে ওঠেনি। ফেবারিতে বলল, রবিবারে ক্লান্তি বলে কোনও কথা নেই। রবিবারে কেউ ক্লান্ত হয় না কখনো। ওরা র‍্যু বুজোঁর উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে দূরে গাছপালার মাথায় শ্যাম্প এলিনার চূড়াটা দেখতে পেল।

ফেবারিতে মাঝে মাঝে বলছিল, কিন্তু সেই বিস্ময়ের চমকটা কোথায় ?

থোলোমায়েস বলল, তোমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।

৫

পাহাড়ের চূড়োয় উঠতে গিয়ে এবার ওরা কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখনো ওদের দুপুরের খাওয়া হয়নি। এবার ওরা সবাই খাবার কথা বলতে লাগল। তখন ওরা শ্যাম্প এলিসীর বিখ্যাত রেস্তোরাঁ বম্বার্দার একটি শাখা হোটেল ক্যাবারে বম্বার্দায খেতে গেল। হোটেলটা ছিল র‍্যু দ্য রিভেলিতে।

সেদিন রবিবার বলে হোটেলটায় ছিল দারুণ ভিড। সব ঘরগুলো লোকে ভর্তি। ওরা একটা বড় অপরিচ্ছন্ন ঘর পেল। ঘরটার একপ্রান্তে পার্টিশান করা একটা ছোট ঘর ছিল। তার মধ্যে একটা বিছানা ছিল। ঘরের মধ্যে দুটো টেবিলের ধারে কযেকটা চেয়ার ছিল। ওরা চারজন সেই চেয়ারগুলোতে বসল। দুটো খোলা জানালা দিয়ে এলম্ গাছের ফাঁক দিয়ে নদী দেখতে পেল ওরা। তখন আগস্ট মাস। বৈকাল সাড়ে চারটে বাজে। সূর্য সবেমাত্র অস্ত যেতে শুরু করেছে। টেবিলের উপর খাবাব ও মদ দেওয়া হলো। প্রচুর হৈ-হুল্লোড করতে লাগল ওরা।

শ্যাম্প এলিসীতে তখনো সূর্যের আলো ছিল। জনাকীর্ণ পথে ধুলোর ঝড উঠছিল। পথে অনেক ঘোড়ার গাড়ি যাওয়া-আসা করছিল। অ্যাভেনিউ দ্য নিউলি দিযে একদল সৈন্য চলে গেল। তাদের সামনে একদল বাদক জয়ঢাক বাজিযে যাচ্ছিল। তুলিয়েরের প্রাসাদের চূড়ার উপর উডতে থাকা সাদা পতাকাটা অস্তম্লান সূর্যের ছটায় গোলাপী দেখাচ্ছিল। প্লেস দে লা কঙ্কর্দে তখন লোকের দারুণ ভিড। সেই ভিড়ের মধ্যে অনেকে কোটের বোতামে সাদা ফিতেয় জড়ানো রুপোর ফুল গুঁজে বেড়াচ্ছিল।

এখানে-সেখানে একদল করে ছোট ছোট মেয়ে দর্শকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বুর্বন গাইছিল।

রবিবারের পোশকপরা অনেক শ্রমিক বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে ভিড় করেছে শহরের পথে। তাদের অনেকে মদ পান করছিল, কেউ কেউ ঘোড়ায় চেপে বেড়াচ্ছিল। সকলেই হাসিখুশিতে মেতে উঠেছিল। তখন দেশে শান্তি বিরাজ করছিল। রাজতন্ত্রীদের পক্ষে সময়টা ছিল বেশ নিরাপদ। পুলিশের বড়কর্তা কাউন্ট অ্যাঙ্গলে রাজার কাছে প্যারিসের শ্রমিক ও সাধারণ জনগণ সম্বন্ধে এক গোপন রিপোর্ট পেশ করেন। সে রিপোর্টে বলা হয়, মহাশয় সব দিক বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায়, এই সব জনগণ থেকে ভয়ের কিছু নেই। তারা যেমন উদাসীন তেমনি বিড়ালের মতো অলস। গ্রামাঞ্চলের নিচের তলায় মানুষরা কিছুটা বিক্ষুব্ধ আছে, কিন্তু প্যারিসের জনগণের মধ্যে কোনও বিক্ষোভ নেই। তাদের চেহারাগুলোও বেঁটেখাটো এবং তারা দু'জনে একজন পুলিশের সমকক্ষ হতে পারে। রাজধানী প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে আমাদের ভয়ের কিছু নেই। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্যারিস ও শহরতলীর জনগণের চেহারা বিপ্লবের আগে যা ছিল তার থেকে অনেক খারাপ হয়ে গেছে। তারা মোটেই বিপজ্জনক নয়। এক কথায় তারা বড় উদাসীন, কোনও কিছুরই খেয়াল রাখে না।

কিন্তু কোনও পুলিশের বড়কর্তাই বিশ্বাস করে না যে বিড়ালও সিংহ হতে পারে। পুলিশের বড় কর্তারা যাই বলুক প্যারিসে অনেক কিছুই ঘটে। এটাই হচ্ছে প্যারিসের জনমতের রহস্য। তাছাড়া কিছুকাল আগেও প্রজাতন্ত্রীরা এই বিড়ালদেরই স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক হিসাবে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এই ধরনের এক বিড়ালেরই এক বিরাট ব্রোঞ্জ মূর্তি কোবিনথের মেন স্কোয়ারে পিরেউসের মিনার্ভার মূর্তির অনুকরণে দাঁড়িয়ে আছে। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর পুলিশ প্যারিসের জনগণ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আশাবাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্যারিসের সাধারণ জনগণ মোটেই ঢালা বা উদাসীন প্রকৃতির নয়। ফরাসীদের কাছে প্যারিসের অধিবাসীরা গ্রীকদের কাছে এথেন্সের জনগণের মতো। উপর থেকে তাদের দেখে মনে হবে তাদের মতো এত ঘুমোতে কেউ পারে না, কেউ এত তাদের মতো উচ্ছল এবং অলস প্রকৃতির নয়। কিন্তু এ ধারণা স্পষ্ট ভ্রান্ত। তারা উদাসীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। কিন্তু যখন কোনও বৃহত্তর গৌরব অর্জনের জন্য তাদের ডাক পড়বে তখন এক প্রচণ্ড সংগ্রামশীলতায় আশ্চর্য ও অভাবনীযভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে তারা। প্যারিসের কোনও একটা লোক হাতে একটা বর্শা পেলে সে ১০ই আগস্টের যুদ্ধের অবতারণা করতে পারে আর যদি সে একটা বন্দুক পায় তাহলে অস্টারলিৎ-এর যুদ্ধ বাধিয়ে তুলতে পারে। এই প্যারিসের লোকই ছিল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তারের মূল শক্তি, তারাই ছিল বিপ্লবী দাঁতনের মূল ভিত্তি। লা পার্টির ডাকে তারা সেনাবিভাগে যোগ দেয় দলে দলে। স্বাধীনতার ডাকে তারা পদভরে রাজপথ ও ফুটপাথগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সুতরাং সাবধান। রাগে তাদের মাথার চুল একবার খাড়া হয়ে

উঠতে তারা এক মহাকাব্যসুলভ বীরত্ব লাভ করে, তাদের সামান্য জামাগুলো গ্রীকবীরের সামরিক পোশাক বা বর্মে পরিণত হয়। তাদের গণঅভ্যুত্থান গর্দন কোর্কের যুদ্ধের রূপ নেয়। যুদ্ধজয়ের ঢাকের শব্দে শহরের অলিতে-গলিতে বাস করা অধিবাসীরা এক মহাশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। বেঁটেখাটো লোকগুলোর চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে। তাদের সংকীর্ণ বুকগুলো থেকে বেরিয়ে আসা নিঃশব্দ নিঃশ্বাসগুলো এক মত্ত প্রভঞ্জনের রূপ পরিগ্রহ করে দিগন্তপ্রসারী আল্পস পর্বতের চূড়াটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। প্যারিসের এই সব ছোটখাটো লোকগুলোকে ধন্যবাদ, এদের দ্বারা সংঘটিত বিপ্লবই সেনাবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করে সারা ইউরোপ জয় করে একদিন। তারা যুদ্ধের গানে আনন্দ পায়। সে গানের সুর [illegible] প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায়। 'কারমাগনোল' গান গেয়ে তারা ষোড়শ লুই-এর [illegible] উল্টে দেয় আর 'মার্সেলাই' গান গেয়ে সারা পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারে।

কোঁতে [illegible] যুবক-যুবতীর কাছে ফিরে যাব, যাদের [illegible] বম্বার্দা হোটেলে [illegible] চলেছিল।

২

টেবিলের কোনও আলোচনা আর প্রেমিকদের [illegible] অলীক আর বিলীয়মান। প্রেমিকদের আলোচনা [illegible] আলোচনা ক্ষণস্থায়ী এক সুবাস।

ফেমিউল আর ডালিয়া গুনগুন করে গান গাইছিল। থোলোমিয়েস মদ খাচ্ছিল। জেফিনে হো হো করে হাসছিল, আর ফাঁতিনের মুখে ছিল মৃদু হাসি। লিস্তোলিয়েরের হাতে সেন্ট ক্লাউডে কেনা কাঠের যে [illegible] ছিল সেটা সে বাজাচ্ছিল।

ফেবারিতে তার প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে বলল, ব্ল্যাকিভেল, আমি তোমাকে দারুণ ভালবাসি।

এ কথায় ব্ল্যাকিভেল এক প্রশ্ন করে বসল, আমি যদি তোমাকে আর ভাল না বাসি তাহলে তুমি কি করবে ফেবারিতে?

ফেবারিতে বলল, আমি? ঠাট্টা করেও এসব কথা বলবে না তুমি। যদি তুমি আমাকে ভাল না বাস তাহলে আমি তোমাকে ছাড়ব না, তোমার পিছু পিছু ঘুরব, আমি তোমাকে মারব। তোমার চোখ দুটো উপড়ে ফেলব ; তোমাকে গ্রেপ্তার করাব।

ব্ল্যাকিভেল যখন কথাটা শুনে পুরুষোচিত অহঙ্কার আর আত্মতৃপ্তির হাসি হাসছিল, ফেবারিতে তখন আবার বলল, তুমি কি ভেবেছ, অসভ্য কোথাকার! আমি চেঁচামিচি করব, পাড়ার সব লোককে জাগাব।

ব্ল্যাকিভেল এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে আনন্দে চোখ দুটো বন্ধ করে কি ভাবছিল। ডালিয়া তখন খেতে খেতে ফেবারিতেকে চুপি চুপি কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করল।

ডালিয়া বলল, সত্যি সত্যিই কি তুমি ওকে ভালবাস?

লিস্তোলিয়ের বলল, আমাদের সকলেরই জ্ঞানবুদ্ধি আছে।

ব্ল্যাকিভেল বলল, হে আমার প্রিয় থোলোমায়েস, আমার শান্ত ভাবটা একবার দেখ।

থোলোমায়েস বলল, তুমি স্বয়ং মার্কুই দ্য 'মঁতকাম' হয়ে উঠেছ।

মঁতকামের মার্কুই ছিলেন সে যুগের এক প্রখ্যাত রাজতন্ত্রবাদী। কথাটা ঠাট্টার ছলে বললেও তাতে কাজ হলো। ব্যাঙডাকা কোনও জলাশয়ে ঢিল ছুঁড়লে যেমন ব্যাঙগুলো একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়, তেমনি সবাই চুপ করে গেল।

থোলোমায়েস শান্ত কণ্ঠে নেতা হিসাবে তার প্রভুত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বলতে লাগল, শান্ত হয়ে আরাম করে বস বন্ধুগণ। ঠাট্টার ছলে যে কথাটা মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেছে সেটাকে আর ধরো না। আকাশ থেকে ঝরে পড়া এই সব তুচ্ছ কথাগুলোকে কোনও গুরুত্ব দিতে নেই। ঠাট্টা-তামাশা হচ্ছে পলায়মান আত্মা থেকে ঝরে পড়া এক বস্তু। সেটা যে কোনও জায়গায় পডতে পারে। তা যেখানেই পড়ুক এই সব চটুল রসিকতার বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মা তখন আকাশে উঠতে থাকে। পাহাড়ের মাথার উপর একটা সাদা দাগ দেখলে ঈগল কখনো তার উড়ে চলার কাজ বন্ধ করে না। আমি যে ঠাট্টা বা রসিকতা ঘৃণা করি তা নয়। তাদের যেটুকু মূল্য আছে আমি শুধু সেইটুকুই তাকে দিতে চাই; তার বেশি নয়। মানবজাতির মধ্যে অনেক মহাপুরুষ ও মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরাও রসিকতা করতেন মাঝে মাঝে। যীশু একবার পিটারকে নিয়ে তামাশা করেছিলেন। মোজেস একবার আইজাককে নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন। এসকাইলাস পলিনিয়েস আর ক্লিওপেট্রা অক্টেভিয়াসকে নিয়েও তামাশা করেছিলেন। তবে আমরা দেখতে পাই অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধের আগে ক্লিওপেট্রা এই ঠাট্টার কথাটা না বললে আমরা তোরিনা নগরের কথাটা কেউ মনে রাখতাম না। 'তোরিনা' শব্দটা এসেছে একটা গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ হলো কাঠের চামচ। যাই হোক, আমরা আবার আমাদের মূল কথায় ফিরে যাই। হে আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি আবার বলছি, কোনও হৈ-হুল্লোড় বা হট্টগোল নয়, কোনও আতিশয্য বা উচ্ছলতা, চপলতা নয়। আনন্দোৎসবের মত্ততায় আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে বিসর্জন দিলে চলবে না। আমার কথা শোন, আমার আছে অ্যাম্ফিয়ারাসের বিজ্ঞতা আর বুদ্ধি আর সীজারের টাক। ঠাট্টা-তামাশা আর খাওয়া-দাওয়ারও একটা সীমা থাকা উচিত। মেয়েরা, তোমরা আপেল ভালবাস, কিন্তু এ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এখানেও সুমতি আর কলাকৌশলের ভূমিকা আছে। গোগ্রাসে সব কিছু গিলে অতি ভোজন করলে শাস্তি পেতে হয়। পাকস্থলীর উপর নীতিবোধ চাপিয়ে দেবার জন্যই ঈশ্বর অজীর্ণ রোগের সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং মনে রেখো, আমাদের সব আবেগানুভূতির, এমন কি প্রেমাবেগেরও একটা পাকস্থলী বলে জিনিস আছে যার গ্রহণ ক্ষমতার একটা সীমা আছে। যথাসময়ে সব কিছুর শেষে আমাদের 'ইতি' লিখে দেওয়া উচিত। সংযমের রশ্মি দিয়ে কামনার বেগ প্রবল হয়ে উঠলে তাকে টেনে ধরা উচিত। ক্ষুধার দরজা সময়ে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অবস্থা বিশেষে

আমরা অসংযত হয়ে উঠলে আমাদের নিজেদেরই বন্দী বা গ্রেপ্তার করা উচিত। যিনি কোন সময়ে কি করা উচিত সেটা জানতে পারেন তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। আমার উপর আস্থা স্থাপন করতে পার, কারণ আমি কিছুটা আইন পড়েছি, অন্তত পরীক্ষার ফল তাই বলে। কখন কি করতে হবে বা বলতে হবে তা আমি জানি। প্রাচীন রোমে পীড়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আমি লাতিন ভাষায় এক গবেষণামূলক তত্ত্ব রচনা করেছি। আমি অল্প দিনের মধ্যে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করব। সুতরাং এর থেকে বোঝা যাবে আমি একেবারে অপদার্থ নই। আমি চাই তোমরা কামনা-বাসনার দিক থেকে নরমপন্থী হও এবং আমার মতে এটাই বিজ্ঞজনোচিত পরামর্শ। সেই মানুষই সুখী যে যথাসময়ে বীরের মতো কোনও জায়গায় প্রবেশ করে, আবার সময় হলে চলে যায়।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলো শুনছিল ফেবারিতে।

ফেবারিতে বলল, ফেলিক্স নামটা কি সুন্দর! ফেলিক্স শব্দটা লাতিন। এর মানে হচ্ছে সুখী।

থোলোমায়েস আবার বলতে লাগল, বন্ধুগণ, তোমরা কি কামনার দংশন থেকে মুক্তি পেতে চাও? তোমরা বাসরশয্যা বাতিল করতে চাও অথবা কুটিল প্রেমের ছলনাকে পরিহার করতে চাও? তাহলে তা সহজেই করতে পারবে। এটাই হলো ব্যবস্থাপত্র। বিরামহীন বিনিদ্র শ্রমের মধ্য দিয়ে তোমাদের নিজেদের ক্ষয় হয়ে যেতে হবে, আহার নিয়ন্ত্রণ করে প্রায় উপবাসে জীবন কাটাতে হবে, সামান্যতম পোশাক পরতে হবে আর ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হবে।

লিস্তোলিয়ের বলল, আমি কিছুদিনের মধ্যেই এক নারীকে লাভ করব।

থোলোমায়েস আবেগে চিৎকার করে উঠল, নারী! নারী থেকে সাবধান! নারীদের চটুল চঞ্চল অন্তরকে যারা বিশ্বাস করে তারা জাহান্নামে যাক। নারীরা হচ্ছে অবিশ্বস্ত এবং চঞ্চল প্রকৃতির। সে সাপকে তার প্রাতদ্বন্দ্বিনী ভেবে ঘৃণা করে, অথচ সেই সাপ তার সামনের বাড়িতেই থাকে।

ব্ল্যাকিভেল বলল, থোলোমায়েস, তুমি মাতাল হয়ে পড়েছ।

হয়ত তাই।

তাহলে অন্তত আনন্দ করো।

গ্লাসে মদ ঢেলে উঠে দাঁড়িয়ে থোলোমায়েস বলল, ঠিক আছে। মদের জয় হোক। মেয়েরা, আমাকে ক্ষমা করবে। স্পেনদেশীয় রীতি। মদই মানুষকে নাচায়। শোন ভদ্রমহিলারা, বন্ধুর একটা উপদেশ শোন। ইচ্ছা হলেই তোমার প্রেমের অংশীদার পরিবর্তন করতে পার। ইংরেজ নারীদের মতো কোনও নারীর অন্তরে আবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য প্রেমের জন্ম হয়নি, এক বাধাহীন গণ্ডীহীন আনন্দচঞ্চলতায় অন্তর থেকে অন্তরে ঘুরে বেড়াবার জন্যই প্রেমের সৃষ্টি হয়েছে। ভুল করাই মানুষের কাজ, এটা প্রবাদের কথা। আমি বলি ভালবাসা মানেই ভুল করা। ভদ্রমহিলাগণ, আমি তোমাদের প্রত্যেককেই শ্রদ্ধা করি। জেফিনে, জোশেফাইন, তোমরা একটু কম কটুভাষিণী হলে

এবং ক্রোধের অভিব্যক্তিটা একটু কম হলে তোমরা আরও বেশি মনোহারিণী হয়ে উঠতে পারতে। আর ফেব্রারিতে, একদিন ব্ল্যাকভেল্ভে যখন কয়েক গোলন বয়সের একটা রাস্তা পার হচ্ছিল তখন সাদা মোজাপরা একটি মেয়ে তাকে পথ দেখায় এবং তাতে এত আনন্দ পায় যে মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলে সে। ফেব্রারিতে, তোমার ঠোঁট দুটো গ্রীক ভাস্কর্যের মতো। একমাত্র হউর্টেনসিয়া নামে চিত্রকর শুধু দেবতার ছবি আঁকায় নাম করে সেই তোমার মুখের ছবি নিখুঁতভাবে আঁকতে পারত। তোমার আগে আর কোনও মেয়ে ঐ নামের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। ভেনাসের মতো তোমাদের আপেল দাবি করা উচিত আর ঈভের মতো তোমাদের সে আপেল খেয়ে ফেলা উচিত। এইমাত্র তুমি আমার নামের কথা বলছিলে এবং আমি তাতে কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। 'বসন্ত নামের শব্দার্থের সঙ্গে ... হলাম। আমার নাম যেশিলস্ত্র, কিন্তু আমি সুখী নই। শব্দগুলো মিথ্যাবাদী, তাদের কথা বিশ্বাস করা উচিত নয়। মিস ডলোরসা, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে নাম পাল্টে গোলাপ রেখে দিতাম। ফুলের যেমন গন্ধ থাকা উচিত, মেয়েদের তেমনি গুণ থাকা উচিত। ... সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। সে বড় স্বপ্নালু আর সূক্ষ্ম চেতনাসম্পন্ন। তার চেহারা পরীর মতো হলেও তার অবনত বিষাদগ্রস্ত চোখ দুটো সন্ন্যাসিনীর মতো। শ্রমজীবিনী হলেও স্বপ্নের আয়নার মধ্যে ডুবে থাকে মনে হয়। সে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে গান করে, প্রার্থনা করে, কিন্তু কি দেখে কি করে তা সে নিজেই জানে না। সে এমন এক বাগানে প্রায়ই চলে যায় যেখানে এত পাখি আছে যে বাস্তব কোনও জীবন বা জগতে তা নেই। আমি কি বলছি শোন সিসিলিয়া, আমি বলছি আলেয়া, একটা মায়া মাত্র...কিন্তু সে শুনছে না, তার সোনালি স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে। তার মধ্যে সব কিছুই সবুজ, সজীব, মেদুর, যৌবন আর প্রভাতী আলো। ফাঁতিনে, তোমার নাম রাখা উচিত ছিল মার্গারেট অথবা পার্ল। তুমি যেমন দল প্রাচ্যের ঐশ্বর্যশালিনী কোনও দেশের মেয়ে। আর একটা উপদেশের কথা শোন মেয়েরা, বিয়ে করো না তোমরা। কিন্তু একথা আমি কেন বলছি? কেন আমি আমার নিঃশ্বাস ক্ষয় করছি? বিয়ে ব্যাপারটাকে মেয়েরা কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যতই উপদেশ দিন না কেন, মেয়েরা যে কাজই করুক, বা যত গরীবই হোক, তারা শুধু এমন স্বামীর স্বপ্ন দেখে যে হীরে বোঝাই করে এনে তাদের কাছে ঢেলে দেবে। সে যাই হোক, তোমরা বড় বেশি চিনি খাও। তোমাদের যদি কোনও দোষ থাকে তো সে দোষ একটাই। তোমরা শুধু চঞ্চল মিষ্টি বস্তুমাত্র। তোমাদের ঝকঝকে দাঁতগুলো শুধু চিনি খেতে চায়। কিন্তু মনে রেখো, চিনি নুনের মতোই। নুন চিনি দুটোই বেশি খেলে শরীরটাকে শুকিয়ে দেয়। শিরায় রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয়, রক্তের গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়, রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দেয়। ফুসফুসেতে ঘায়ের সৃষ্টি করে। এইভাবে তা মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়। বহুমূত্র থেকে যক্ষ্মারোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং হে ভদ্রমহিলারা, তোমরা চিনি খেও না, দীর্ঘদিন জীবিত থাক।...এবার আমি পুরুষদের কথা বলব। হে ভদ্রমহোদয়গণ, তোমরা বিজয় অভিযান শুরু করো। তোমরা

তোমাদের বন্ধুদের প্রেমিকাকে নির্মমভাবে ছিনিয়ে নাও। ঘুষি বা তরবারি চালিয়ে এগিয়ে যাও। প্রেমের ব্যাপারে বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই। যেখানেই সুন্দরী নারী সেখানেই প্রকাশ্য যুদ্ধ, কোনও ক্ষমা নেই। সুন্দরী নারীরাই যত অনর্থের মূল, তারা কীটদষ্ট কুসুমের মতো। নারীর সৌন্দর্যই অনেক ঐতিহাসিক যুদ্ধের কারণ। নারীরা পুরুষদের বৈধ শিকার। যুদ্ধ জয়ের পর রোমুলাস মেথাইন নারীদের বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন নর্ম্যান্ডির উইলিয়াম বহু স্যাক্সন নারীকে এবং সীজার রোমের বহু নারীকে ধর্ষণ করেন। যারা নিজেরা ভালবাসা পায় না তারা শকুনির মতো অপরের প্রেমাস্পদের উপর ভাগ বসাতে চায়। যে সব হতভাগ্য পুরুষের কোনও প্রেমিকা নেই, ইতালির সেনাদলের কাছে বলা বোনাপার্টের একটি কথার পুনরাবৃত্তি করে তাদের বলতে চাই আমি, সৈনিকগণ, তোমাদের কিছুই নেই, অথচ সৈনিকদের সব আছে।

হাঁপ ছাড়ার জন্য থোলোমায়েস একবার থামল। ব্ল্যাকিভেল, লিস্তোলিয়ের আর ফেমিউল একটা রাগে গান ধরল। যে গানের কোনও যুক্তি বা মাথামুণ্ডু নেই, যা মনের মধ্যে কোনও রেখাপাত করতে পারে না, শুধু তামাকের ধোঁয়ার মতো উড়ে যায়, উবে যায় মুহূর্তে। এ গানের উদ্দেশ্য হলো থোলোমায়েসের আবেগটাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া। গ্লাসের মদটা এক চুমুকে শেষ করে আবার তাতে মদ ঢেলে তার কথাটা শেষ করার জন্য আবার বলতে লাগল, জাহান্নামে যাক যত সব জ্ঞান! আমি যা কিছু বলেছি সব ভুলে যাও। আমরা সতী নারী বা পরিণামদর্শী পুরুষ কোনওটাই হব না; আমি চাই শুধু আনন্দের মত্ততা। খাওয়া-দাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের আলোচনার জলাঞ্জলি দিয়ে আনন্দ করো। হজম, বদহজম সব চুলোয় যাক। পুরুষরা বিচার চায় আর মেয়েরা ফুর্তি আর আমোদ উৎসব চায়। এই বিশ্বসৃষ্টি কত সুন্দর, কত ঐশ্বর্যমণ্ডিত! কত আনন্দে ভরা এই পৃথিবী। বসন্তের পৃথিবী উজ্জ্বল সূর্যালোকে মুক্তোর মতো চকচক করছে। পথে-ঘাটে পাখির গান ঝরে পড়ছে অবিরল ধারায়। অ্যাভেনিউ দ্য অবজারভেতোরিতে কত সুন্দরী ধাত্রীরা শিশুদের দিকে অজান। দৃষ্টি রেখে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে বসে আছে। আমার অন্তরাত্মা পাখির মতো অনাবিষ্কৃত কোনও অরণ্যে অথবা নির্জন সাভানা অঞ্চলে উড়ে যেতে চায় যেখানে সব কিছুই সুন্দর, সব কিছুই মনোরম। মাছিরা ঝাঁক বেঁধে সেখানে সূর্যের আলোয় উড়ে বেড়ায়, যে সূর্যের আলো থেকে অনেক সঙ্গীতমুখর পাখির জন্ম হয়। আমাকে চুম্বন করো ফাঁতিনে।

কিন্তু অন্যমনস্কভাবে সে ফেবারিতেকে চুম্বন করল।

৮

জেফিনে বলল, এ হোটেলের থেকে ইডনের খাবার ভাল।

ব্ল্যাকিভেল বলল, আমি বম্বার্দাকে বেশি পছন্দ করি। পরিবেশটা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। নিচের তলায় দেওয়ালগুলোতে আয়না আছে।

ফেবারিতে বলল, আমি শুধু দেখতে চাই আমার প্লেটে কি খাবার দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এখানকার কাঁটাচামচগুলো দেখ। হাতলগুলো সব রুপোর। ইডনে এগুলো হাড়ের।

থোলোমায়েস জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কি দেখছিল।

ফেমিউল তাকে বলল, থোলোমায়েস, লিস্তোলিয়েরের সঙ্গে আবার ঝগড়া হচ্ছে।

থোলোমায়েস বলল, বিবাদ ভাল, তবে ঝগড়া আরও ভাল।

ফেমিউল বলল, আমরা দর্শনের একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সেকার্তে ও স্পিনোতার মধ্যে তুমি কাকে পছন্দ করো?

থোলোমায়েস বলল, আমি পছন্দ করি বিখ্যাত ক্যাবারে গায়ক দেসজিয়েতকে।

এরপর বিচারের পর রায়দানের ভঙ্গিতে সে বলতে লাগল, আমি বাঁচতে চাই। এখনো পৃথিবীর পরমায়ু শেষ হয়নি, সুতরাং এখনো আমরা বাজে কথা বলে ফুর্তি করতে পারি। আর এই ফুর্তির জন্য অমর দেবতাদের ধন্যবাদ দিই আমি। আমরা মিথ্যা কথা বলি, তবু হাসি। আমরা কোনও কিছু মেনে নিয়েও তাতে সংশয় পোষণ করি। চমৎকার। ন্যায়মূর্তির আশ্রয়বাক্য থেকে অপ্রত্যাশিত অনেক কিছু অনেক সময় বেরিয়ে আসে। পৃথিবীতে এখনো এমন অনেক লোক আছে যারা বিস্ময়ের চমকে ভরা বৈপরীত্যের বাক্স খুলে বা বন্ধ করে অনেকখানি আনন্দ পায়। হে মহিলাগণ, তোমরা এখন যে মদ পান করছ শান্তিতে তা এখানকার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিনশো সত্তর মাইল দূরে কোরাল দ্য ফ্রেইরার আঙ্গুরক্ষেতে তৈরি হয় এবং সেখান থেকে চালান আসে। একবার ভেবে দেখ, তিনশো সত্তর মাইল দূর থেকে এই বম্বার্দা হোটেলে যে মদ আসে তা লিটার প্রতি সাড়ে চার ফ্রাঁতে এখানে বিক্রি হয়।

ফেমিউল প্রতিবাদ করে কি বলতে গেল। সে বলল, থোলোমায়েস, তুমি নেতা, তোমার মতই আইন। কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখেছ—

থোলোমায়েস সে কথা গ্রাহ্য না করে বলতে লাগল, বম্বার্দা হোটেলের জয় হোক। বম্বার্দা এলিফ্যান্টার মিউনোফিসের সমান মর্যাদা পাবে যদি সে আমাকে একটা নাচের মেয়ে যোগাড় করে দেয়। আবার সে যদি আমাকে সঙ্গদানের জন্য একটা মেয়ে এনে দিতে পারে তাহলে সে শেরোনেউসের থাইজেলিয়নের মর্যাদা পাবে। বিশ্বাস করো মহিলাগণ, আপুলিউসের কথা থেকে জানতে পারা যায় গ্রীস ও মিশরেও বম্বার্দা নামে হোটেল ছিল। সলোমন তাই হয়ত বলতেন, জগতে নতুন কোনও কিছুই নেই। আবার ভার্জিল বলেছিলেন, আসলে একই প্রেম যুগে যুগে বিভিন্ন নরনারীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। আজ যেমন কয়েকটি যুবতী তাদের যুবক প্রেমিক এক একজন লুইকে নিয়ে সেন্ট ক্লাউডে নৌকোবিহার করে বেড়াচ্ছে তেমনি অতীতে একদিন অ্যাসপেসিয়াও পেরিক্লিসের সঙ্গে জাহাজে করে সামস দ্বীপে বেড়াতে যায়। অ্যাসপেসিয়া কে ছিল, তোমরা তা জান কি? সে এমন একটা যুগের মেয়ে ছিল যখন মেয়েদের আত্মা বলে কোনও জিনিস ছিল না। তথাপি তার মধ্যে এমন একটা আত্মা ছিল যা একই সঙ্গে গোলাপী এবং লাল, যে আত্মা একই সঙ্গে ছিল অগ্নিশিখার থেকে তপ্ত আর স্নিগ্ধ, সকলের থেকে শীতল। নারীচরিত্রের দুটি প্রান্তসীমাকে

সে অতিক্রম করেছিল। সে ছিল বারবণিতা দেবী, সে ছিল অংশত সক্রেটিস আর অংশত মেলন লেসকৎ। আসলে সে যেন প্রমিথিউসের সেবার জন্য সৃষ্ট হয়েছিল। অবশ্য প্রমিথিউস যদি তা চাইত।

কথা বলার আবেগ তখন পেয়ে বসেছিল থোলোমায়েসকে এবং তাকে তখন থামানো কঠিন হত যদি না তখন তাদের ঘরের বাইরে জানালাটার তলায় গাড়ি টানতে টানতে একটা ঘোড়া হঠাৎ পড়ে না যেত। ঘোড়াটা ছিল মাদী এবং বয়সে বুড়ী। গাড়ি টানার সামর্থ্য তার ছিল না। গাড়িটা টানতে টানতে ঘোড়াটা তাই ক্লান্তির নিবিড়তায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর যেতে পারছিল না। গাড়ির চালক গালাগালি করছিল। নির্মমভাবে চাবুক মারতে লাগল। কিন্তু ঘোড়াটা আর চলল না, পড়ে গেল। তখন গাড়িটার চারদিকে ভিড় জমে গেল। গোলমাল শুনে থোলোমায়েস ও তার দলের সবাই জানালা দিয়ে উঁকি মারতে লাগল।

সবাই অন্যমনা হয়ে ঘটনাটা দেখতে ব্যস্ত থাকায় থোলোমায়েস ফেবারিতেকে কাছে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। ফেবারিতে বলল, কিন্তু চমক কোথায় ? তোমরা যে বলছিলে আমাদের চমকে দেবে ?

থোলোমায়েস বলল, ঠিক বলেছ। এখন তার সময় হয়েছে। ভদ্রমহোদয়গণ, এবার মেয়েদের চমক দেখাতে হবে। মহিলাগণ, কয়েক মিনিট ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

ব্ল্যাকিভেল বলল, তাহলে প্রথমে চুম্বন দিয়ে শুরু করা যাক।

থোলোমায়েস বলল, আর সে চুম্বন হবে কপালে।

এরপর প্রত্যেকটি প্রেমিক তার প্রেমিকাকে চুম্বন করল। তারপর পুরুষরা একযোগে সারবন্দীভাবে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে হাততালি দিয়ে উঠল ফেবারিতে। বলল, কি মজার ব্যাপার!

ফাঁতিনে বলল, বেশি দেরি করো না কিন্তু, আমরা অপেক্ষা করে থাকব।

৯

মেয়েরা সবাই জানালার ধারে বসে রইল রাস্তার দিকে তাকিয়ে। তারা দেখল পুরুষরা হাত ধরাধরি করে যেতে যেতে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। তারপর শ্যাম্প এলিসীর পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফাঁতিনে চিৎকার করে একবার বলল, বেশি দেরি করো না।

জেফিনে বলল, ওরা কি আনবে বলে মনে হয় ?

ডালিয়া বলল, আমার মনে হয় নিশ্চয় সুন্দর কিছু আনবে।

ফেবারিতে বলল, আমার তো মনে হয় সোনার একটা কিছু আনবে।

অদূরে জলের ধারে আবার কি একটা গোলমাল শুনে সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো ওদের। গাছের ফাঁক দিয়ে ওরা দেখতে পেল জলের ধারে কিসের একটা গোলমাল হচ্ছে। তখন ডাকগাড়ি যাবার সময়। শ্যাম্প এলিসী শহরটার পাশ দিয়ে নদীর বাঁধটার

স্বভাবতই উদ্বিগ্ন আমাদেব জন্য। তাঁবা চান আমবা এখন তাঁদেব কাছে ফিবে যাই। আমবা তাদেব বাইবেলবর্ণিত অমিতব্যয়ী পুত্রেব মতো যাবা ঘবে ফিবে গেলেই তাবা মোটা বাছুব কেটে ভোজ দেবাব কথা বলেছেন। যেহেতু আমবা কর্তব্যপবাযণ সন্তান, তাদেব কথা আমাদেব শুনতেই হবে। তোমবা যখন আমাদেব এই চিঠিটা পড়বে তখন পাচটা দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়া আমাদেব বাড়িব পথে নিয়ে যাচ্ছে। আমবা যেন দূবে বহু দূবে পালিয়ে যাচ্ছি। তুলোব পথে ধাবমান গাড়িগুলো যেন তোমাদেব প্রেম আব যৌবনেব ফুলে ভবা পথ থেকে আমাদেব উদ্ধাব কবে সমাজ জীবনেব [illegible] কর্তব্যেব পথে নিয়ে চলেছে আমাদেব। আমবা এখন আমাদেব সেই সামাজিক কর্তব্যেব পথে ঘন্টায় প্রায় ছয় মাইল বেগে এগিয়ে চলেছি। [illegible] ও [illegible] প্রতি কর্তব্য আছে আমাদেব। আমবা সদাচাবণেব মাধ্যমে [illegible] সে কর্তব্য পালন কবি, দেশ এটাই আশা কবে আমাদেব কাছ থেকে [illegible] বড কর্তা, সন্তানেব পিতা, স্থানীয [illegible] ও আইন[illegible] সদস্য। আমাদেব এই আত্মত্যাগেব জন্য তোমবা আমাদেব সম্মান কববে, শ্রদ্ধা কববে, [illegible] জন্য কিছুটা চোখেব জল ফেলবে। তাবপব আমাদেব জাযগায় এসে [illegible] প্রেমিক গ্রহণ কবো [illegible] তোমাদেব সম্ভব যদি দুঃখে [illegible] হয় তাহলেও আমাদেব কবাব কিছুই থাকবে না। [illegible] কবতে পাব। বিদায়।

প্রায় দুই বছব [illegible] তোমাদেব যথাসম্ভব [illegible] আমাদেব প্রতি কোনও বিদ্বেষভাব [illegible] না।

[illegible] ব্ল্যাকিভেল
[illegible]
লিস্তোলযেব
[illegible] থোলোমাযেস

পুনঃ [illegible] আমবা দিয়ে দিয়েছি

মেযেবা পবস্পবেব দিকে তাকাতে লাগল।

ফেভাবিতেই প্রথম নীবৰতা ভঙ্গ কবে কথা বলল, যাই [illegible], এটা কিন্তু বেশ মজাব ঠাট্টা।

জোফিনে বলল, সত্যিই ব্যাপাবটা বড মজাব।

ফেবাবিতে বলল, আমি বেশ বলতে পাবি এটা ব্ল্যাকিভেলেব পবিকল্পনা। এজন্য তাকে আবও ভালবাসতে ইচ্ছে কবছে। ভালবাসতে না বাসতেই ওবা হাবিয়ে যায। এটাই হলো জগতেব বীতি।

ডালিযা বলল, না, এটা থোলোমাযেসেব পবিকল্পনা। এটা কখনো তাব মাথা ছাড়া আব কাবো মাথা থেকে বাব হতে পাবে না।

ফেবাবিতে বলল, তা যদি হয তাহলে ব্ল্যাকিভেল নিপাত যাক, আব থোলোমাযেস দীর্ঘজীবি হোক।

ডালিযা-জেফিনে একসঙ্গে বলে উঠল, থোলোমাযেস দীর্ঘজীবি হোক।

কথাটা বলেই হাসতে লাগল ওরা।

প্রথমটায় ফাঁতিনেও হাসতে লাগল ওদের সঙ্গে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে সে তার ঘরে গিয়ে একা একা কাঁদতে লাগল। এটা তার জীবনে প্রথম প্রেম। থোলোমায়েসের কাছে সে অনুগত স্ত্রীর মতো বিলিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। তার একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে সে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্যারিসের অনতিদূরে মঁতফারমেল গাঁয়ে একটা ছোট হোটেল ছিল। হোটেলটা এখন আর নেই। হোটেলটা রুয়েন দু বুলেঙ্গার অঞ্চলে অবস্থিত ছিল আর সেটা থ্রেনাদিয়ের দম্পতি চালাত। হোটেলটার সামনে দরজার উপর একটা কাঠের বোর্ডের উপর ছবি আঁকা ছিল। তাতে একটা সৈনিক তার পিঠের উপর তারকাচিহ্নিত সেনাপতির পোশাকপরা অবস্থায় আর একজনকে বয়ে নিয়ে চলেছে। ছবিটিতে রঙের সাহায্যে চাপ চাপ রক্ত আর ধোঁয়ার রাশি দেখানো হয়েছে। ছবিটার মাথার উপর লেখা আছে, দি সার্জেন্ট অফ ওয়াটারলু।

কোনও হোটেলের সামনে কোনও যাত্রীবাহী গাড়ি বা মালবাহী ওয়াগন বা বড় ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকাটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু ১৮১৮ সালের বসন্তের এক সন্ধ্যায় হোটেলের সামনে এক বিরাট মালবাহী ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন চিত্রকর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আশ্চর্য হয়ে যায়। ওয়াগনটার শেষের দিকে লোহার পাটাতনওয়ালা একটা অংশ বড় বড় দুটো চাকার উপর দাঁড়িয়েছিল। তার থেকে একটা লোহার শিকল ঝুলছিল। সে শিকল দিয়ে গোলিয়াথ, হোমারের পলিফেমাস বা শেকস্‌পীয়ারের ক্যালিবনের মতো দৈত্যদের বাঁধা যেত।

ওয়াগনটা তখন রাস্তাটা জুড়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন তার অন্য কোনও কাজ ছিল না। তার থেকে ঝুলতে থাকা শিকলটার একটা অংশ মাটির উপর পড়েছিল আর দুটো বাচ্চা মেয়ে সেটা ধরে দোলনার মতো দুলছিল। বাচ্চা দুটির মা কাছেই বসেছিল। একটি মেয়ের বয়স আড়াই বছর আর একটি মেয়ের বয়স মাত্র দেড় বছর। একটা শাল দিয়ে তাদের মা বাচ্চা দুটিকে শিকলটার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছিল যাতে মেয়ে দুটি খেলা করতে করতে পড়ে না যায়। মা ভাবছিল শিকলটা বাচ্চাদের খেলার পক্ষে সত্যিই একটা মজার বস্তু। মেয়ে দুটিও তাতে খুবই আনন্দ পাচ্ছিল। তাদের তখন দেখে লোহার স্তূপের উপর দুটো ফুটন্ত গোলাপের মতো মনে হচ্ছিল। তাদের চোখগুলো বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল আর তাদের গোলাপী গালগুলো হাসিতে ফুলে উঠেছিল। তাদের মধ্যে একজনের মাথার চুল বাদামী আর একজনের চুল কালো। তাদের নির্দোষ নিষ্পাপ মুখগুলো আনন্দের উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ছোট মেয়েটির অনাবৃত পেটটা দেখা যাচ্ছিল। ক্রীড়ারত আত্মভোলা এই শিশুদের সরল সুন্দর এক দৃশ্যের পটভূমিকায় ওয়াগনের উপর দিকটা এক একটা বিরাটকায় দানবের

বিকৃত মুখের মতো দেখাচ্ছিল। শিশুকন্যাদের মার চেহারাটা তেমন সুন্দর না হলেও এই দৃশ্যের সঙ্গে তাকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। সে তখন হোটেলটার সামনে বসে তার মেয়েদের দোলাচ্ছিল তন্ময় হয়ে। সূর্যাস্তের এক রঙিন আভা তাদের মুখের উপর তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। শিশুরা যখন শিকলটা ধরে ঝুলছিল পালাক্রমে তখন শিকলটা থেকে একটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল নিষ্প্রাণ লোহার শিকলটা যেন এক অস্পষ্ট অস্ফুট প্রতিবাদে ফেটে পড়ছিল। মা যখন তার শিশু সন্তানদের নিরাপত্তার দিকে সতত সজাগ দৃষ্টি ছড়িয়ে তাদের দেখাশোনা করছিল তখন তার মুখের উপর একই সঙ্গে পশু ও দেবদূতের মিশ্রিত ভাব ফুটে উঠছিল।

শিশুদের দোলাবার সময় মা অনুক্ত সুরে একটা গান গাইছিল। সে তখন এমন তন্ময় হয়ে আত্মভোলা এক ভাবের আবেশে বিভোর হয়ে ছিল যে হোটেলের সামনের রাস্তায় কি হচ্ছিল না হচ্ছিল সে বিষয়ে তার কোনও খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙল। কে তাকে বলল, আপনার মেয়ে দুটি খুবই সুন্দর মাদাম।

শিশুকন্যাদের মা তাকিয়ে দেখল তার সামনে এক যুবতী মেয়ে কোলে একটি সুন্দর মেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে আছে ভ্রমণকারী একটা ভারী বড ব্যাগ।

আগন্তুক যুবতী মহিলার কোলে যে শিশুটি ছিল তার বয়স দুই থেকে তিনের মধ্যে। সে তখন নিশ্চিন্তভাবে তার মার কোলে ঘুমোচ্ছিল। সে একটা লিনেনের সুন্দর ফ্রক পরেছিল। তার আপেলের মতো গোলাপী গাল দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তার স্বাস্থ্য ভাল। চোখদুটো বেশ বড় বড়।

আগন্তুক যুবতী মাতাটিকে দেখে গরীব মনে হচ্ছিল। সে হয়ত কোনও শহরে শ্রমিকের কাজ অথবা কোনও গাঁয়ে চাষীর কাজ করে। বয়সে সে যুবতী এবং সুন্দরী ছিল, কিন্তু তার পোশাক-আশাক দেহগত লাবণ্য প্রকাশের উপযুক্ত ছিল না। তার মাথায় চুল ছিল প্রচুর এবং সে চুলের একটি গোছা মাথায শক্ত করে পরা টুপির পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে তার চিবুকের উপর ছড়িয়ে পডেছিল। সে যদি একবার হাসত তাহলে হয়ত তার সুন্দর ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখা যেত। কিন্তু সে হাসেনি। জমাটবাঁধা এক অব্যক্ত বিষাদের জন্য তার মুখটা ম্লান আর চোখদুটো শুকনো দেখাচ্ছিল। সে তখন খুব ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তার কোলের ঘুমন্ত শিশুটার পানে সে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। তার গায়ে ছিল ক্যালিকো কাপড়ের জামা আর মোটা পশমের একটা কোট। গলায় জড়ানো ছিল একটা বড় নীল রুমাল। তার হাত দুটো ছিল খসখসে এবং ডান হাতের তর্জনীটাতে ছিল ছুঁচ ফোটার দাগ। এই যুবতী মেয়েটিই হলো ফাঁতিনে।

আসলে সে ফাঁতিনে হলেও তাকে তখন চেনা যাচ্ছিল না। তবে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তার দেহসৌন্দর্য তখনো অটুট ছিল। কিন্তু বিষাদের কতকগুলি কুটিল রেখা, এক অব্যক্ত দুঃখবাদের এক নীরব নিরুচ্চার সূচনা নেমে

এসেছে তার অত্যুজ্জ্বল গাল দুটিতে। তার মসলিন পোশাক-আশাকের সেই পারিপাট্য, আনন্দের উজ্জ্বলতা, গানের অবিচ্ছিন্ন সুরধারা সব চলে গেছে তার জীবন থেকে। গাছের উপর শুভ্রোজ্জ্বল তুষারকণাগুলি নিঃশেষে ঝরে গেলে যেমন গাছের শূন্য শাখাগুলিকে কালো কালো দেখায় তেমনি ফাঁতিনের জীবন থেকে সব আনন্দের উজ্জ্বলতা আর সুরের ধারা নিঃশেষে চলে গিয়ে কেমন যেন বিবর্ণ ও ম্লান হয়ে উঠেছিল তার সমগ্র মুখমণ্ডল।

ফাঁতিনেদের সেই প্রমোদ ভ্রমণের পর দশটি মাস কেটে গেছে। তার মধ্যে কি ঘটে গেছে তার জীবনে তা অনুমান করা খুব একটা কঠিন হবে না।

তার যে জীবন একদিন এক নিবিড় নিশ্ছিদ্র ঔদাসিন্যে ভরে ছিল, সে জীবনে নেমে এল এক কঠোর বাস্তব সচেতনতা, এল লাভ ক্ষতি আর দেনাপাওনার এক অবাঞ্ছিত হিসাবপ্রবণতা। তাদের প্রেমিকরা চলে যেতেই ফাঁতিনে ফেবারিতে, ডালিয়া আর জেফিনের সঙ্গে সব যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাদের থেকে। সে শুধু একা নয়, যে বন্ধন ছিঁড়ে নির্মমভাবে সকলে চলে যায় সে বাঁধন মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলে মুক্ত করে ফেলে নিজেদের। সকলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পরস্পর থেকে. এই বিচ্ছেদের ঘটনার এক পক্ষকাল পরে কেউ যদি তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিত তাহলে তারা নিজেরাই তাতে আশ্চর্য হয়ে যেত। ফাঁতিনে একেবারে নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে পড়ে। এই সব প্রেমের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদটাই স্বাভাবিক এবং এক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। সন্তানের পিতা সন্তানকে ছেড়ে চলে গেলে তার সব ভার স্বাভাবিকভাবেই মার উপরে এসে পড়ে। এবার নিজের রুজি-রোজগারের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয় ফাঁতিনেকে। থোলোমায়েসের সংস্পর্শে এবং সাহচর্যে আসার পর থেকে তার আগেকার চাকরিটাকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে সে। কাজ বা রুজি-রোজগারের উপর সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে আমোদ উৎসবের প্রতি দেখা দেয় এক অত্যধিক প্রবণতা। যে সব কাজ বা চাকরি আগে সে সহজেই পেত, সে সব কাজকে সে অবহেলা করতে থাকায় সব যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে সে। সব চাকরির পথ একে একে বন্ধ হয়ে যায় তার সামনে। ফলে যখন তার সত্যি সত্যিই চাকরির দরকার দেখা দিল তখন চেষ্টা করেও চাকরি পেল না কোনও। সে লিখতে-পড়তে জানত না, ছোটবেলায় সে শুধু কোনওরকমে নাম সই করতে শেখে। সে একজনকে টাকা দিয়ে থোলোমায়েসকে পাঠাবার জন্য তিনখানা চিঠি লেখায়, কিন্তু থোলোমায়েস একটা চিঠিরও উত্তর দেয়নি। আজ সে যখন মেয়ে কোলে করে রাস্তায় বার হয় তখন রাস্তার লোকেরা তাকে বিদ্রূপ করে। উপহাসের সুরে কি সব বলাবলি করতে থাকে। ফলে থোলোমায়েসের উপর কঠোর হয়ে ওঠে তার মনটা। এখন সে কি করবে এবং কোথায় যাবে? সে অন্যায় করেছে ঠিক, কিন্তু আসলে সে সৎ এবং গুণবতী। সে যখন দেখল অধঃপতনের এক অতলান্তিক খাদ তার সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তখন সে ভয়ে পিছিয়ে না গিয়ে সাহস ও ধৈর্যসহকারে তার সম্মুখীন হলো।

বসতে বলল। সে নিজেও তার সামনে এক জায়গায় বসে বলল, আমার নাম থেনার্দিয়ের। আমি আর আমার স্বামী এই হোটেলটা চালাই।

মাদাম থেনার্দিয়েরের চেহারা বেশ বলিষ্ঠ, হাড়গুলো দারুণ শক্ত আর মোটা। মাথার চুলগুলো লালচে। যেন কোনও সৈনিকের স্ত্রী; মোটাসোটা এবড়ো-খেবড়ো চেহারা। অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে কোনও সূক্ষ্মতা নেই। তবু দেহটা তার যতই রুক্ষ হোক, যত সব জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাস পড়ে তার মনটা বেশ কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। তার বয়স তিরিশের বেশি হবে না। দেহে তখনো তার ছিল পূর্ণ যৌবন। দরজার সামনে না বসে থেকে সে যদি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে তার বলিষ্ঠ পুরুষালি চেহারা দেখে ভয় পেয়ে যেত ফাঁতিনে। ফলে কোনও কথাই সে তাকে বলতে পারত না।

থেনার্দিয়েরের সামনে বসে ফাঁতিনে তার জীবন কাহিনী সব বলল। তবে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে বলল। সে বলল, সে ছিল প্যারিসের এক শ্রমিকের স্ত্রী। তার স্বামী সম্প্রতি প্যারিসে মারা গেছে। সে সেখানে কোনও চাকরি না পেয়ে গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছে কাজ খুঁজতে। সে আজ সকালেই প্যারিস থেকে রওনা হয়। কিছুটা পথ গাড়িতে আর কিছুটা পথ হেঁটে সে মতফারমেলে এসে পৌঁছেছে। তার কোলের শিশু মেয়েটিও কিছুটা হেঁটেছে। তারপর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার কোলে।

কথা বলতে বলতে ফাঁতিনে একবার তার কোলের ঘুমন্ত শিশুটাকে আদর করে চুম্বন করতেই সে জেগে উঠল। তার মার মতো নীল বড বড চোখ দুটো খুলে চারদিকে তাকাতে লাগল। ছোট ছোট শিশুরা এইভাবে অনেক সময় পরিবেশকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আর হয়ত ভাবে সারা পৃথিবীতে একমাত্র তারাই দেবদূত আর সবাই মানুষ। এরপর ফাঁতিনের শিশু মেয়েটি চারদিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ জোর হাসতে লাগল। তার মা তাকে থামাবার চেষ্টা করলেও থামাতে পারল না, আরও জোরে খিল খিল করে হাসতে লাগল এবং তার মার কোল থেকে নেমে যেতে চাইল। মার কোল থেকে নেমে শিশুরা যে শিকলটাতে দোলনার মতো করে দুলছিল সেটা দেখে আনন্দে কি বলল। মাদাম থেনার্দিয়েব তার মেয়েদের দোলনা থেকে নামিয়ে বলল, এবার তোমরা সকলে মিলে খেল।

শিশুদের এই বয়সে তাদের বন্ধুত্ব খুব তাডাতাড়ি গডে ওঠে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনটি শিশু একযোগে খেলা করতে লাগল। তারা পরম আনন্দে মাটিতে গর্ত খুঁড়তে ল্যাগল। ফাঁতিনের বাচ্চা মেয়েটি একটা কাঠের টুকরো পেয়ে তাই দিয়ে গর্ত খুঁড়তে লাগল। গর্ত নয় যেন ইঁদুরের কবর।

এদিকে তাদের মারা কথা বলতে লাগল। থেনার্দিয়ের ফাঁতিনেকে বলল, তোমার মেয়ের নাম কি ?

ফাঁতিনে বলল, কসেত্তে।

আসলে তার মেয়ের নাম ছিল ইউফ্রেজি। ইউফ্রেজি নামটাই চলতি কথায় বলতে বলতে সেটাকে কসেত্তে করে তুলেছে ফাঁতিনে। যেমন করে অনেক সময় জোশেফ

থেকে সাধারণের মুখে মুখে চলতি কথায় বোপিতা আর ফ্রাঁসোয়া সিলেক্তে হয়ে দাঁড়ায়। ভাষাগত এই রূপান্তর ভাষাবিজ্ঞানীদের বিস্ময়ে অভিভূত করে তোলে।

থেনার্দিয়ের আবার প্রশ্ন করল, ওর বয়স কত?

ফাঁতিনে বলল, তিন বছরের কাছাকাছি।

বাচ্চারা তখন একই সঙ্গে এক প্রবল আশঙ্কা আর আনন্দের উত্তেজনায় দল বেঁধে দাঁড়িয়ে কি দেখছিল। কিছু একটা ঘটেছে। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটা বড় পোকা বেরিয়ে পড়ায় তারা সকলেই একই সঙ্গে ভয় পেয়ে যায় আর আনন্দের আবেগে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা তিনজনে তখন ঘন হয়ে দাঁড়ায়।

মাদাম থেনার্দিয়ের তাদের পানে তাকিয়ে বলল, শিশুরা কত তাড়াতাড়ি পরস্পরকে চিনে ফেলে। যেন মনে হচ্ছে ওরা তিন বোন।

কথাটা শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠল ফাঁতিনে। এই কথাটাই সে শুনতে চাইছিল। সহসা সে মাদাম থেনার্দিয়ের একটা হাত তুলে নিয়ে বলল, তুমি আমার মেয়েকে তোমার কাছে রেখে দেবে ভাই?

মাদাম থেনার্দিয়ের চমকে উঠল। 'হ্যাঁ' বা 'না' কোনও কিছুই বলল না।

ফাঁতিনে আবার বলতে লাগল, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে ওকে নিয়ে যেতে পারি না। আমাকে এখন কাজ খুঁজতে হবে এবং সঙ্গে বাচ্চা থাকলে কাজ পাওয়া যায় না। ও অঞ্চলের লোকরাই বড় একগুঁয়ে এবং যুক্তিহীন। ঈশ্বর যেন এখানে আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছেন। আমি তোমার মেয়েদের দেখে ভাবলাম যার বাচ্চারা এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন তার মা না জানি কত ভাল! ও যদি তোমাদের এখানে থাকে তাহলে ওরা ঠিক তিন বোনের মতো খেলা করবে। বল, তুমি ওর দেখাশোনা করবে এখানে রেখে?

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, কথাটা ভেবে দেখতে হবে আমাদের।

ফাঁতিনে বলল, আমি ওর জন্য মাসে ছয় ফ্রাঁ করে দিতে পারি।

এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে এক পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, মাসিক সাত ফ্রাঁর কম হবে না, আর দু' মাসের অগ্রীম দিতে হবে।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, সাত ফ্রাঁ করে হলে ছয় মাসে বিয়াল্লিশ ফ্রাঁ লাগবে।

ফাঁতিনে বলল, ঠিক আছে।

সেই পুরুষকণ্ঠ আবার বলল, আরও পনের ফ্রাঁ বাড়তি লাগবে।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, তাহলে সবসুদ্ধ সাতান্ন ফ্রাঁ লাগছে।

কসেত্তের মা ফাঁতিনে বলল, ঠিক আছে, তাই পাবে। আমার কাছে মোট আশি ফ্রাঁ আছে। তোমাদের সাতান্ন ফ্রাঁ দিয়ে দিলে " থাকবে তাতে আমি পায়ে হেঁটে গাঁয়ে পৌঁছতে পারব। আমি চাকরি পেলে কিছু জমিয়েই ওকে দেখতে আসব।

পুরুষের সেই কণ্ঠস্বর ভিতর থেকে আবার বলল, ওর পোশাক-আশাক আছে তো?

মাদাম থেনার্দিয়ের ফাঁতিনেকে বলল, ও হলো আমার স্বামী।

ফাঁতিনে বলল, আমি তাই অনুমান করেছিলাম। ওর পোশাক যথেষ্ট আছে। এক সম্রান্ত মহিলার মতো ওর সিল্কের পোশাকও আছে।

পুরুষ কণ্ঠস্বর বলল, ওগুলো আমাদের দিয়ে যাবে।

ফাঁতিনে বলল, অবশ্যই দিয়ে যাব। আমি কি আমার মেয়েকে নগ্ন অবস্থায় রেখে যাব ভাবছ?

যে পুরুষ এতক্ষণ ঘরের ভিতর থেকে কথা বলছিল সে এবার দরজার কাছে এসে দেখা দিয়ে বলল, ঠিক আছে।

এইভাবে সব বোঝাপড়া বা দরাদরি শেষ হয়ে গেল। ফাঁতিনে রাতটা হোটেলেই কাটাল। তারপর সকাল হতেই সব টাকা মিটিয়ে দিয়ে হোটেল থেকে চলে গেল। তার মেয়ের পোশাকগুলো বার করে দিতে ব্যাগটা হালকা হয়ে গেল। ফাঁতিনে বলল, সে তাড়াতাড়ি চলে আসবে তার মেয়েকে দেখতে। তবু যাবার সময় ফাঁতিনের বুকে ছিল এক হতাশার বোঝা। ফাঁতিনে যখন সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন হোটেলের পাশের বাড়ির একজন লোক তাকে দেখে মাদাম থেনার্দিয়েরকে বলে, আমি এই মাত্র দেখলাম একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল তার অন্তরটা ফেটে যাচ্ছে।

থেনার্দিয়ের এরপর তার স্ত্রীকে বলল, তুমি মেয়েগুলোকে নিয়ে বেশ ফাঁদ পেতেছিলে। তবে আরও পঞ্চাশ ফ্রাঁ হলে ভাল হত।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, কিন্তু তার মানেটা কি হলো?

২

ব্যাগ যত ভালই হোক, একটা ছোট্র ইঁদুর সেটাকে কেটে ফেলতে পারে ধীরে ধীরে।

এই থেনার্দিয়েররা কে ছিল?

এখন আমরা তাদের কথা বলব সংক্ষেপে। ফলে তাদের চরিত্রের পুরো চিত্রটা পাওয়া যাবে।

থেনার্দিয়েররা সমাজের এমন একটা স্তরের মানুষ যে স্তরটা উচ্চ আর নীচ এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রেণীর সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। সমাজের উঁচু তলার যে সব লোকরা কোনও কারণে যারা নিচে নেমে গেছে অথবা যে সব নিচু তলার লোকরা কোনওক্রমে কিছুটা উপরে উঠে এসেছে ওরা তাদের মাঝামাঝি এবং তাদের থেকে কিছু কিছু উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছিল ওদের শ্রেণীগত স্তরটা। ফলে তাদের ভাল গুণগুলো কিছুই পায়নি, পেয়েছিল শুধু তাদের দোষগুলো। ওরা যেমন শ্রমিক শ্রেণীর উদারতা পায়নি, তেমনি বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মানজনক সততারও কিছু পায়নি।

আসলে তারা অবস্থার দিক থেকে আপাতদৃষ্টিতে বামনের মতো মনে হলেও ঘটনার আনুকূল্য পেলে সহসা দৈত্যাকার হয়ে উঠতে পারে। মেয়েটার অন্তরে সুপ্ত ছিল নিষ্ঠুরতার এক বীজ আর লোকটার অন্তর ছিল শয়তানিতে ভরা। দু'জনেই

ছিল যত রকমের অন্যায় ও পাপকর্মে বিশেষভাবে পারদর্শী। সংসারে এক ধরনের মানুষ আছে যারা ক্রে মাছের মতো, যাদের গতি শুধু ছায়া আর অন্ধকারের দিকে, যারা কখনো সামনের দিকে এগিয়ে যায় না, যারা শুধু পিছনের দিকে যায়। তাদের জীবনের সব অভিজ্ঞতাই বিকৃত হয়ে ওঠে এবং তারা ক্রমশই গভীরতর অন্ধকারের দিকে চলে যায়। থেনার্দিয়েরদের জীবনেও তাই ঘটেছিল।

যারা মুখ দেখে মানুষের মনের কথা বুঝতে চায় তাদের কাছে থেনার্দিয়ের ছিল একটা সমস্যা। এমন কতকগুলো লোক আছে যাদের চারদিকে এমন একটা শূন্যতা ঘিরে থাকে যার জন্য তাদের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি না, আমরা তাদের বিশ্বাস করতে পারি না। এই ধরনের লোকেরা আমাদের সামনে বা পিছনে যেখানেই থাক না কেন, আমাদের পক্ষে তারা হয়ে ওঠে ক্ষতিকর আর ভয়াবহ। তাদের স্বরূপ কিছুতেই জানা যায় না, তাদের মধ্যে সব সময় অজ্ঞেয়তার একটা রহস্যময় উপাদান রয়ে যায়। তাই তারা কখন কি করে বসবে তা কেউ ঠিকমতো বলতে পারে না। অনেক সময় তাদের চোখের চাউনি দেখে তাদের মনের কুমতলবের কথা জানা যায় কিছুটা। তারা যদি কোনও কথা বলে অথবা কিছু করে তাহলে আমরা সে কথা বা কাজের মধ্যে তাদের অতীত কিম্বা ভবিষ্যতের কোনও রহস্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করে থাকি।

থেনার্দিয়ের আগে সৈনিকের কাজ করত। সে সার্জেন্ট ছিল। সে নিজে বলত ১৮১৫ সালের সামরিক অভিযানে যোগদান করে। এর ফলে কি ঘটেছিল আমরা পরে তা জানতে পারব। সে যে যুদ্ধ করতে জানে এবং সে যে একদিন সৈনিকের কাজ করত তা তার হোটেলটা দেখলেই বোঝা যায়। নিজের হাতে আঁকা কতকগুলো যুদ্ধের ছবি সে হোটেলটার এখানে-সেখানে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছে। সে ছবি আঁকতে ভাল না জানলেও সব বিষয়ে মাতব্বরী করতে চায় এবং সব কিছুই খারাপ করে বসে।

সে যুগে কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ম্যাদময়জেল দ্য স্কুদেরি থেকে শুরু করে মাদাম বার্থেলেমি হেদত এই ধরনের উপন্যাস লিখে বেশ নাম করেন। এই সব উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক অশ্লীলতার উপকরণ ছিল এবং প্যারিসের পাঠকদের মনে রোমান্টিক ভাবধারা সঞ্চার করত। মাদাম থেনার্দিয়ের বেশি লেখাপড়া না জানলেও এই ধরনের উপন্যাস পড়ার মতো ক্ষমতা ছিল তার। মাদাম থেনার্দিয়ের ঐ সব উপন্যাস গোগ্রাসে গিলত যেন এবং তার থেকে খারাপ জিনিসগুলো গ্রহণ করত। যেমন এই সব উপন্যাস পাঠের ফলেই তার স্বামীর প্রতি এক রোমান্টিক আনুগত্য সব সময় প্রদর্শন করত মাদাম থেনার্দিয়ের। কিন্তু তার স্বামী লেখাপড়া জানলেও আসলে এক দুর্বৃত্ত ছিল। তার বুদ্ধি এবং রুচি খুবই স্থূল প্রকৃতির ছিল। তবে সে পিগলত্ লেব্রানের ভাবপ্রবণতার সমর্থক ছিল। মেয়েদের আচার-আচরণ ও চালচলন সম্বন্ধে সে প্রথাগত রক্ষণশীলতায় বিশ্বাসী ছিল। একথা সে মুখে বলত। মাদাম ছিল তার স্বামীর থেকে পনের বছরের ছোট। যখন বিয়োগান্তক উপন্যাসের

পরিবর্তে আনন্দোচ্ছল হালকা ধরনের উপন্যাসের প্রচলন দেখা গেল দেশে তখন মাদাম থেনার্দিয়েরও সেই সব বাজে বই-এর ভক্ত হয়ে উঠল। এই সব কিছু পাঠের অবশ্যই একটা অশুভ প্রভাব আছে এবং এই প্রভাবের ফলেই মাদাম থেনার্দিয়ের তার বড় মেয়ের নাম রাখে এপোনিনে। আর তার ছোট মেয়ের নামটা গুলনেয়ারের পরিবর্তে আজেলমা রাখা হয়।

আসলে ঐ যুগটায় নামকরণের এক অরাজকতা চলছিল। এটাকে এক সামাজিক ব্যাধির উপসর্গ বলা যেতে পারে, আবার তা রোমান্টিক উপন্যাস পাঠেরও ফল হতে পারে। যার ফলে গ্রামের চাষীদের ছেলেদের নাম রাখা হত আর্থার, আলফ্রেড, আলফনসে। অন্যদিকে কাউন্ট পরিবারের ছেলেদের নাম রাখা হত টমাস, পীয়ের অথবা জ্যাক। দুটি সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে নামকরণের এই বিপরীতমুখী ভাব দেশে সাম্যের বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রসারের প্রত্যক্ষ ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। এক নতুন যুগের হাওয়া বইছিল যেন সর্বত্র। জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে যে কোনও বৈপরীত্যের পিছনে খোঁজ করলেই ফরাসী বিপ্লবের এক গভীরতর তাৎপর্য অবশ্যই খুঁজে পাব আমরা।

৩

শুধু অকুণ্ঠ দুর্নীতিপরায়ণতা সমৃদ্ধি আনতে পারে না কখনো। থেনার্দিয়েরদের হোটেলের অবস্থা দিনে দিনে খারাপের দিকে যাচ্ছিল।

ফাঁতিনে তার মেয়ের জন্য যে সাতান্ন ফ্রাঁ দিয়ে গিয়েছিল তাতে তাদের অনেকটা উপকার হয়। তাতে এক ঋণের মামলা থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু একমাস পর আবার অভাব দেখা দিল তাদের। সংসারে একেবারে টাকা নেই, কোনও আয় নেই। মাদাম থেনার্দিয়ের কসেত্তের দামী পোশাকগুলো সব প্যারিসে নিয়ে গিয়ে বন্ধক দিয়ে ষাট ফ্রাঁ নিয়ে এল। ঐ টাকাটাও ফুরিয়ে গেলে থেনার্দিয়ের দম্পতি কসেত্তেকে অনাথ শিশু হিসাবে দেখতে লাগল। তাকে তাদের মেয়েদের ছেঁড়া ফেলে দেওয়া জামাগুলো পরতে দিত। তাকে কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে টেবিলের তলায় খেতে দেওয়া হত একটা কাঠের পাত্রে।

ইতিমধ্যে মন্ত্রিউলে ফাঁতিনে একটা চাকরি পায়। সেখান থেকে প্রতি মাসেই সে তার মেয়ের খবর পাবার জন্য থেনার্দিয়েরদের চিঠি লিখত। প্রতিবারই তার চিঠির উত্তরে থেনার্দিয়েররা ফাঁতিনেকে জানাত তার মেয়ের স্বাস্থ্য খুব ভাল আছে।

ছয় মাস কেটে যাবার পর আগের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ফাঁতিনে তার মেয়ের মাসিক খরচ হিসাবে ছয় ফ্রাঁর পরিবর্তে সাত ফ্রাঁ করে পাঠাতে থাকে। এইভাবে এক বছর কেটে গেলে থেনার্দিয়ের ফাঁতিনের কাছ থেকে মাসিক বারো ফ্রাঁ করে দাবি করে। ফাঁতিনেকে যখন জানানো হলো তার মেয়ে বেশ সুখেই আছে তখন সে নির্বিবাদে তা দিয়ে যেতে লাগল।

এমন অনেক মানুষ আছে সংসারে যারা ভালবাসার অভাব ঘৃণা দিয়ে পূরণ করে।

মাদাম থেনার্দিয়ের যখন দেখল কসেত্তে তার মেয়েদের সব অধিকারে ভাগ বসাতে এসেছে তখন সে তাকে ঘৃণা করতে থাকে। মাতৃস্নেহের এটাই কুৎসিত স্বার্থপরতার দিক। কসেত্তের দাবি খুবই কম হলেও মাদাম থেনার্দিয়ের ভাবল সে দাবি পূরণ করা মানে তার মেয়েদের একটা প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা। তার মনে হলো কসেত্তে যেন তার মেয়েদের প্রয়োজনীয় প্রাণবায়ুর একটা অংশ কেড়ে নিতে এসেছে। সাধারণ নারীদের মতো মাদাম থেনার্দিয়েরের অন্তরটাও ছোট ছিল। সে অন্তরে বেশি দয়া বা স্নেহমমতার স্থান ছিল না।

মাদাম থেনার্দিয়ের কসেত্তেকে প্রায়ই তিরস্কার এবং মারধোর করত। কসেত্তে তার প্রতিটি পদক্ষেপে শুধু ভর্ৎসনা পেত আর তারই সামনে তার মেয়েদের আদর করত মাদাম থেনার্দিয়ের।

মার দেখাদেখি এপোনিনে আর আজেলমা নামে মেয়ে দুটিও দুর্ব্যবহার করত কসেত্তের সঙ্গে।

এইভাবে দুটি বছর কেটে গেল।

গাঁয়ের সবাই বলাবলি করতে লাগল, থেনার্দিয়েররা খুব ভাল লোক। তারা ধনী নয়, তাদের অবস্থা ভাল নয়, কিন্তু তারা একটা অনাথা মেয়েকে মানুষ করছে। মেয়েটাকে বোঝা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাদের উপর।

গাঁয়ের লোকরা ভাবত কসেত্তের মা তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

এদিকে থেনার্দিয়েররা কোনওক্রমে জানতে পারে কসেত্তে তার কুমারী মাতার এক অবৈধ সন্তান। এরপর কসেত্তের মাসিক খরচ বারো থেকে পনের ফ্রাঁতে বাড়িয়ে দেয়।

থেনার্দিয়ের একদিন তার স্ত্রীকে বলে, মেয়েটি বড় হচ্ছে এবং তার খাওয়াও বেড়েছে। আমার আরও টাকা চাই তার জন্য। তা না হলে ময়েটাকে তার মার কাছে দিয়ে আসব।

এইভাবে বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল। কসেত্তের বয়স যেমন বাড়তে লাগল তেমনি তার দুরবস্থাও বেড়ে যেতে লাগল। তার বয়স পাঁচ হতেই বাড়িতে তাকে দিয়ে ঝি-এর কাজ করানো হতে লাগল। পাঁচ বছরের শিশু কাজ করতে না পারলেও তখনকার কালে অনাথা মেয়েদের এইভাবে খাটানো হত এবং এইভাবে তাদের জীবিকার্জন করতে হত। আমরা সম্প্রতি দামোনার্দ নামে এক যুবকের বিচারকাহিনী থেকে জানতে পারি সে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে নিরাশ্রয় ও অনাথ হয়ে খেটে জীবিকার্জন করত এবং মাঝে মাঝে চুরি করত।

কসেত্তেকে অনেক ফাইফরমাস খাটতে হত। ঘরের মেঝে মুছতে হত, উঠোন ঝাঁট দিতে হত। থালা-ডিশ ধুতে হত। বোঝা বইতে হত। থেনার্দিয়ের দম্পতি তাকে দিয়ে বেশি করে এই কাজ করাত কারণ সম্প্রতি তার মা নিয়মিত প্রতি মাসে টাকা পাঠাত না। খরচের টাকা দু'-এক মাসের বাকি পড়ে যায়।

ফাঁতিনে যদি তিন বছর পর মঁতফারমেলে আসত তাহলে সে তার মেয়েকে দেখে

চিনতেই পারত না। সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল অবস্থায় যে মেয়েকে সে হোটেলে রেখে যায় সে মেয়ে এখন রোগা আর ম্লানমুখ হয়ে গেছে। থেনার্দিয়েররা বলত, মেয়েটা বড় চতুর আর চঞ্চল।

ক্রমাগত দুর্ব্যবহার তাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং ক্রমাগত দুঃখভোগ তাকে কুৎসিত করে তোলে। শুধু চোখ দুটোর সৌন্দর্য রয়ে গিয়েছিল। তাতে তার দুরবস্থাটা আরও বেশি করে প্রকটিত হয়ে উঠত। কারণ চোখদুটো বড় বড় হওয়ার জন্য তাতে তার অন্তরের বেদনাটা বেশি পরিমাণে প্রকাশ পেত। প্রতিদিন শীতের সকালে সূর্য ওঠার আগেই যখন ছয় বছরের একটা মেয়ে ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলের বাইরের দিকের বারান্দাটা একটা বড় ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিত তখন তাকে দেখে যে কোনও লোকের অন্তরটা বিদীর্ণ হয়ে যেত দুঃখে। ঝাঁটাটা এত বড় ছিল যে সে তার ছোট হাতে ভাল করে ধরতেই পারত না।

পাড়ার লোকেরা তাকে বলত লা লুয়েত্তে অর্থাৎ লার্ক পাখি। গাঁয়ের লোকেরা এই প্রতীক নামটাই তার পক্ষে প্রযোজ্য ভেবেছিল, কারণ সে ছিল লার্ক পাখির মতোই সশঙ্কচিত্ত, কম্পমান এবং ক্ষীণকায় এবং লার্ক পাখির মতো প্রতিদিন সকাল হওয়ার আগেই উঠত। কিন্তু সে ছিল এমনই পাখি যে কখনো কোনও গান গাইত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

যে মা একদিন মঁতফারমেলের হোটেলে তার শিশুকন্যাকে নিশ্চিন্তে রেখে চলে গিয়েছিল সে মায়ের কি হলো এখন আমরা তা দেখব।

থেনার্দিয়েরের কাছে তার মেয়েকে যেদিন রেখে ফাঁতিনে চলে যায় মন্ত্রি-উল-সুর-মেরে সেটা হলো ১৮১৮ সাল।

তখন থেকে দশ বছর আগে মন্ত্রিউল ছেড়ে চলে আসে ফাঁতিনে। এদিকে সে যখন ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে ডুবে যেতে থাকে তখন তাদের এই জেলা শহরটা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। গত দু' বছরের মধ্যে ঐ অঞ্চল শিল্পের দিক থেকে এমনই উন্নত হয়ে ওঠে যে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে।

মন্ত্রিউল শহরের পুরনো আঞ্চলিক শিল্প হলো জার্মানির কালো কাঁচ আর ইংলন্ডের কালো পালিশ করা এক ধরনের ছোট ছোট বল যা দিয়ে জপের মালা তৈরি হয়। কিন্তু কাঁচা মালের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় এ শিল্পের কোনও উন্নতি হচ্ছিল না এবং শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন দেওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৮১৫ সালের শেষের দিকে শহরে কোথা থেকে একজন নবাগত আসে যে এই শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচা মালের রদবদল করে। সে আগে ব্যবহৃত গাছের রস থেকে তৈরি এক ধরনের আঠার পরিবর্তে গালা ব্যবহার করতে থাকে। তাতে

উৎপাদন ব্যয় অনেক কমে যাওয়ায় শ্রমিকদের বেশি করে বেতন দিতে পারা যায়। ফলে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা উপকৃত হয়। উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের দাম কমিয়ে দেওয়ায় বেশি পরিমাণে মাল বিক্রি হতে থাকায় লাভ বেশি হতে থাকে। ফলে মাত্র তিন বছরের মধ্যেই নবাগত এ অঞ্চলে এক বিরাট শিল্পবিপ্লব নিয়ে আসে। সে কম টাকায় উৎপাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রচুর লাভ করে ধনী হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে তার চারপাশের গোটা অঞ্চলটাই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে থাকে তার পথ অনুসরণ করে।

এ জেলার কোনও লোক তাকে চেনে না। তার জন্মপরিচয়ের কিছুই জানা যায়নি। সে কিভাবে কোথায় জীবন শুরু করে তাও কেউ জানতে পারেনি। লোকে শুধু বলত মাত্র কয়েক শ' ফ্রাঁ নিয়ে এ শহরে সে প্রথম আসে। এই অল্প টাকা মূলধন হিসাবে খাটিয়ে কৌশলে এবং বুদ্ধি খাটিয়ে শিল্পে উন্নতি করে ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলের লোকদেরও উন্নতি হয়।

সে যখন প্রথম এখানে আসে তখন তার চেহারা ও বেশভূষা একজন শ্রমিকের মতো ছিল। তখন ছিল ডিসেম্বর মাস। সেই ডিসেম্বরের কোনও এক সন্ধ্যায় সে যখন সকলের একরকম অলক্ষ্যে শহরে এসে ঢোকে, সেই সময় শহরে ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তখন এই নবাগত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে দুটি বিপন্ন শিশুকে উদ্ধার করে আনে। তার অবশ্য বিশেষ কোনও ক্ষতি হয়নি। সেই শিশু দুটি ছিল পুলিশ বিভাগের এক ক্যাপ্টেনের। তাই কেউ তার পরিচয়পত্র দেখতে চায়নি এবং পুলিশের কর্তারা সন্তুষ্ট ছিল তার প্রতি। সবাই তাকে পীয়ের ম্যাদলেন বলে ডাকত। প্রথম আসার দিনে তার পিঠে একটা ব্যাগ আর হাতে একটা ছড়ি ছিল।

২

তার বয়স হবে প্রায় পঞ্চাশ এবং আচরণ ও কথাবার্তা থেকে তাকে সৎ প্রকৃতির বলে মনে হত।

শিল্পের দ্রুত উন্নতি হওয়ায় মন্ত্রিউল শহর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠল। স্পেন থেকে অনেক অর্ডার আসতে লাগল। সেখানে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে। বিক্রির পরিমাণ এত বেড়ে গেল যে পীয়ের ম্যাদলেন আরও দুটো নতুন কারখানা তৈরি করল—একটা পুরুষদের আর একটা শুধু নারীদের জন্য। বেকার লোকরা দলে দলে কাজের জন্য আবেদন করতেই তারা কাজ পেয়ে গেল এবং জীবন ধারণের উপযোগী ভাল বেতন পেতে লাগল। ম্যাদলেন চাইল পুরুষ-নারী সব কর্মীরা সৎ হবে, তাদের নীতিবোধ উন্নত হবে। পুরুষ ও নারী কর্মীদের পৃথকভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করায় নারীদের শালীনতা হানির কোনও অবকাশ রইল না। এ ব্যাপারে ম্যাদলেন ছিল অনমনীয় ও আপোসহীন। কারো কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করত না সে। মন্ত্রিউল শহরে এক সৈন্যনিবাস থাকায়

নারীদের চরিত্রহানির অনেক সুযোগ ছিল বলে ম্যাদলেন বিশেষভাবে কড়াকড়ি করত। যে শহর একদিন কাজকর্মের সুযোগ হারিয়ে স্থিতিশীল এক আবর্তে পরিণত হয়ে উঠেছিল আজ তা এক উন্নত শিল্পের ছত্রছায়ায় কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। ক্রমে সমস্ত অঞ্চল থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর হয়ে যায়। প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু পয়সা এল। প্রতিটি ঘরে কিছু সুখশান্তি এল।

কর্মব্যস্ততার মাঝে অর্থসঞ্চয়ের দিকেও মন দিল ম্যাদলেন। ব্যবসা ছাড়া নিজে আলাদা করে একটা মোটা টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিল। ১৮২০ সালে লোকে জানত লাফিত্তের ব্যাঙ্কে তার নামে মোট ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ফ্রাঁ জমা ছিল। তবে টাকাটাই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। ব্যবসার উন্নতিই ছিল তার সবচেয়ে বড লক্ষ্য। ব্যাঙ্কে ঐ জমা টাকা ছাড়াও সে শহরের গরীবদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য এক লক্ষ টাকা খরচ করে।

আগে শহরের হাসপাতালটা অর্থাভাবে ভুগছিল। ম্যাদলেন টাকা দিয়ে দশটা বেড বাড়িয়ে দিল। মন্ত্রিউলের যে অঞ্চলে ম্যাদলেন থাকত সেখানে মাত্র একটা স্কুল ছিল। ম্যাদলেন সেখানে আরও দুটো স্কুল গড়ে তুলল—একটা ছেলেদের আর একটা মেয়েদের জন্য। সে তার টাকা থেকে স্কুলমাস্টারদের বেতন বাডিযে দ্বিগুণ করে দিল। তাছাড়া অকর্মণ্য, অনাথ ও নিরাশ্রয় বৃদ্ধদের জন্য এক আবাস স্থাপন করল যেখানে তারা বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেত। নতুন কারখানা স্থাপনেব সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের থাকার জন্য কোয়ার্টার করে দিল। তখনকার দিনে ফ্রান্সে অসহায় দুস্থ বৃদ্ধদের এ ধরনের কোনও আবাস ছিল না।

ম্যাদলেন যখন প্রথম কাজ শুরু করে তখন শহরের সবাই বলত, লোকটা টাকা উপায় করতে এসেছে। সে ধনী হতে চায়। কিন্তু যখন তারা দেখল যে নিজে সব টাকা সঞ্চয় না করে এখানকার জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করতে চায তখন তারা বলাবলি করতে লাগল ও কোনও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণ করতে চায়। অনেকে ভাবল এ কথার কিছুটা যুক্তি আছে, কারণ ম্যাদলেনের ধর্মের দিকে মতিগতি ছিল। সে প্রতি রবিবার সকালে চার্চে গিয়ে সমবেত প্রার্থনাসভায যোগদান করত। স্থানীয় ডেপুটি সব বিষয়ে ম্যাদলেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। ম্যাদলেন হাসপাতালে দশটা বেড রোগীদের জন্য দান করায় সেও দুটো বেড দান করে। ম্যাদলেন নিয়মিত চার্চে যাওয়ায় সেও সকাল-সন্ধে প্রার্থনায় যোগ দিত। অথচ আগে সে ঈশ্বরে বিশ্বাসই করত না।

১৮১৯ সালে গুজব শোনা গেল পুলিশের বড় কর্তাদের পরামর্শে এবং জনসেবার কাজ দেখে রাজা মঁসিয়ে ম্যাদলেনকে মন্ত্রিউলের মেয়র মনোনীত করেছেন। যারা আগে বলত ম্যাদলেনের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ আছে তাদের ধারণা সত্যি হয়েছে জেনে তারা খুশি হলো। সমস্ত শহর উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। গুজবটা ক্রমে সত্যে পরিণত হলো। কয়েকদিন পরে লে মন্ত্রিউল পত্রিকায় রাজার মনোনয়নের খবরটা প্রকাশিত হলো। কিন্তু পরের দিন মঁসিয়ে ম্যাদলেন এই মেয়রের পদ প্রত্যাখ্যান করল।

১৮১৯ সালে ম্যাদলেনের সব শিল্পকর্ম এক শিল্প প্রদর্শনীতে দেখানো হলো। যে সব নতুন পদ্ধতি সে উদ্ভাবন করে সেই সব পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। জুরিদের পরামর্শক্রমে রাজা আবার ম্যাদলেনকে লিজিয়ন দ্য অনার বা গ্র্যান্ড ক্রস উপাধি দান করার কথা ঘোষণা করেন। অনেকে তখন বলতে থাকে ম্যাদলেন মেয়রের পদ প্রত্যাখ্যান করলেও এই সম্মান ঠিক গ্রহণ করবে। ও হয়ত এই ধরনের সম্মানই চাইছিল। কিন্তু ম্যাদলেন গ্র্যান্ড ক্রসও প্রত্যাখ্যান করে।

আসলে ম্যাদলেন সকলের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যারা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বরাবর জল্পনা কল্পনা করত এবং নানারকম ভবিষ্যদ্বাণী করত, তাদের সব ধারণা একে একে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হওয়ায় তারা এই বলে কোনওরকমে মুখরক্ষা করে বলত, যাই হোক, ও যা হোক কিছু একটা চায়, মতলব কিছু একটা আছে।

সারা জেলা ম্যাদলেনের কাছে ঋণী এবং সারা জেলার গরীবরাও তার কাছে ঋণী। ম্যাদলেনের অবদান অমূল্য এবং তার জন্য তাকে সম্মান দেওয়া উচিত। তার কারখানার কর্মীরা তাকে শ্রদ্ধা করত। ম্যাদলেন যখন ব্যবসায়ে লাভ করতে করতে প্রচুর ধনী হয়ে ওঠে তখন শহরের লোকেরা তাকে সম্মান করে 'মঁসিয়ে ম্যাদলেন' বলত। কিন্তু ম্যাদলেনের কারখানার সব কর্মীরা ও তাদের ছেলেমেয়েরা আগের মতোই তাকে পীয়ের ম্যাদলেন বলত। এই নাম শুনেই সবচেয়ে খুশি হত সে। তার মুখে হাসি ফুটে উঠত। সে ক্রমে বড় হয়ে উঠতেই বিভিন্ন জায়গা যাবার জন্য তার কাছে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। সমাজের উঁচু তলার লোকরা তার খোঁজ করতে লাগল। মন্ত্রিউলের কিছু অভিজাত বাড়ির বৈঠকখানার যে দরজা সাধারণ ব্যবসায়ীদের সামনে উন্মুক্ত হত না কখনো সে দরজা লক্ষপতি মঁসিয়ে ম্যাদলেনের জন্য উন্মুক্ত ছিল সব সময়। অনেকে অনেক জায়গায় তাকে নিয়ে যাবার জন্য তার কাছে আসত। কিন্তু সবার সব নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করত সে।

এ নিয়ে তখন আবার এক লোকনিন্দার সৃষ্টি হয়। নিন্দুকরা বলতে থাকে, লোকটা আসলে অজ্ঞ আর অশিক্ষিত। কেউ জানে না সে কোথা থেকে এসেছে। উচ্চ ভদ্র সমাজে গিয়ে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানে না। সে লিখতে-পড়তে পারে কি না তাতেও সন্দেহ আছে।

নিন্দুকরা সব সময়ই তাদের নিন্দার ভিত্তি হিসাবে একটা করে যুক্তি খুঁজে বার করত। প্রথমে যখন সে ব্যবসা করে টাকা করতে থাকে তখন তারা বলত, লোকটা পাকা ব্যবসাদার। যখন সে জনকল্যাণকর কাজে অনেক টাকা দান করতে থাকে তখন তারা বলত, লোকটা রাজনীতিতে নেমে নেতা হতে চায়। যখন সম্মান প্রত্যাখ্যান করে তখন তারা বলত লোকটা আরও বেশি সম্মান চায়। আবার সে যখন ভদ্র সমাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তখন তারা বলত লোকটা নিরক্ষর চাষী।

১৮২০ সালে অর্থাৎ মন্ত্রিউলে তার আসার পাঁচ বছর পর সে অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নে তার অবদান এমনই আশ্চর্যজনক হয়ে ওঠে এবং তার জনহিতকর কাজের জন্য

জনগণ তার এমনই প্রশংসা করতে থাকে যে রাজা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আবার মন্ত্রিউলের মেয়র মনোনীত করেন। কিন্তু এবারও সে মেয়রের পদ প্রত্যাখ্যান করে। তবে এবার তার প্রত্যাখ্যান পুলিশের বড় কর্তারা স্বীকার করল না। তাছাড়া শহরের বিশিষ্ট লোকরা এবং সাধারণ জনগণ তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকায় শেষ পর্যন্ত সে মেয়রের পদ গ্রহণে রাজী না হয়ে পারল না। একদিন রাস্তার ধারের একটি বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এক বুড়ি ম্যাদলেনকে বলতে থাকে, মেয়রের কাজ হলো জনগণের উপকার করা। সুতরাং জনগণের উপকার করার এই সুযোগ ছেড়ে দিতে চাইছ কেন তুমি ?

এইভাবে ম্যাদলেনের জীবনে উন্নতির তৃতীয় স্তর শুরু হলো। এ অঞ্চলে প্রথম এসে যে যখন ব্যবসা শুরু করে তখন সে ছিল পীয়ের ম্যাদলেন। তারপর তার ধনসম্পদ যখন বাড়তে থাকে, ব্যবসায় উন্নতি হতে থাকে তখন সে হয়ে ওঠে মঁসিয়ে ম্যাদলেন অর্থাৎ শহরের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি। পরে সে হয়ে উঠল শহরের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি মঁসিয়ে লে মেয়র।

৩

কিন্তু মেয়র হলেও বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখা দিল না ম্যাদলেনের জীবনযাত্রায়। এখানে প্রথম আসার দিন যেমন ছিল তেমনি সাদাসিধে রয়ে গেল সে। তার গায়ের রংটা ছিল শ্রমিকদের গায়ের রঙের মতো তামাটে। কিন্তু মুখের উপর ছিল চিন্তাশীল দার্শনিকের ছাপ। সে সব সময় একটা চওড়া টুপি আর গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো লম্বা ঝুলওয়ালা কোট পরত। সে মেয়রের কাজ করে যেত, কিন্তু কথা কম বলত। সে যতদূর সম্ভব অপরের অভিবাদন বা সৌজন্যমূলক কথাবার্তা এড়িয়ে চলত। যথাসম্ভব নীরবে সে ভিক্ষা বা দানের জিনিস অভাবগ্রস্ত লোকদের বিতরণ করত। মেয়েরা তার সম্বন্ধে বলাবলি করত, লোকটা যেন এক দয়ালু ভাবুক। অবসর সময়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে একা একা বেড়িয়ে সে সবচেয়ে আনন্দ পেত।

সে সব সময় একা খেত। তার পাশে একটা বই থাকত খাবার সময়। তার একটা বাছাই করা বই-এর ছোটখাটো লাইব্রেরি ছিল। সে বই ভালবাসত। বই-ই ছিল তার একমাত্র বন্ধু যারা তার কাছ থেকে কিছু চাইত না। হাতে টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার অবসর সময় বেড়ে যায় এবং সেই সময়টা সে বই পড়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করে আত্মোন্নতির চেষ্টা করত। তার ভাষা আগের থেকে আরও মার্জিত, ভদ্র, স্পষ্ট এবং ন্যায়সঙ্গত হয়ে উঠল।

সে যখন একা একা বেড়াতে বার হত তখন তার হাতে একটা ছোট শিকারী বন্দুক থাকত। কিন্তু সেটা কদাচিৎ ব্যবহার করত। তবে কখনো দরকার হলে সেটা ব্যবহার করলে তা নির্ভুল লক্ষ্যের পরিচয় দিত। সে কখনো কোনও নিরীহ নির্দোষ প্রাণী বধ করত না অথবা ছোট ছোট পাখি মারত না।

তার বয়স যৌবন পার হয়ে গেলেও তার গায়ে শক্তি ছিল প্রচুর। কোনও লোক

বিপদে পড়লে সে তার দু' হাত বাড়িয়ে তাকে সাহায্য করত। কোনও ঘোড়া পড়ে গেলে সে ঘোড়াটাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিত। কোনও গাড়ির চাকা মাটিতে বসে গেলে সে কাঁধ না দিয়ে হাত দিয়ে ধরে সেটাকে টেনে তুলে দিত। কোনও বলদ পালিয়ে গেলে সে তার শিং ধরে আটকে দিত তাকে। কোনও গাঁয়ের ভিতর গেলে সে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে খুশি হত, তার চারদিকে মাছির ঝাঁকের মতো ভিড় করত।

সে নিশ্চয় আগে গাঁয়ে বাস করত। কারণ সে চাষীদের চাষের কাজ সম্বন্ধে প্রায়ই যে সব উপদেশ দিত তাতে তার চাষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান আছে তা বোঝা যেত। ফসলের উপর কিভাবে ওষুধ ছড়িয়ে পোকা নষ্ট করতে হয় তা সে চাষীদের বলে দিত। কিভাবে জমিতে নুন দিতে হয় তাও সে বলে দিত। ফসল ভরা জমিতে যে সব আগাছা গজিয়ে উঠে ফসল নষ্ট করে তার উপায় বলে দিত ম্যাদলেন। ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ করারও ব্যবস্থা বলে দিত।

একদিন মাঠের ধার থেকে ম্যাদলেন দেখল একদল চাষী মাঠে পাটশাকের মতো এক ধরনের শুকনো আগাছা তুলে ফেলে দিচ্ছে। তা দেখে ম্যাদলেন তাদের বলল, এই চারাগাছগুলো এখন শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কাঁচা অবস্থায় এর শাকগুলো রান্না করে খাওয়া যায়। এর গাছগুলো থেকে শনের মতো এক রকমের সুতো বার হয়। সেই সুতো থেকে কাপড় পর্যন্ত বোনা যায়। শাকগুলো গবাদি পশুরা কাঁচা খেতে পারে। এর বীজগুলো ভূমির ধারে ধারে বা ফাঁকা জায়গায় ছড়িয়ে দিলেই প্রচুর পরিমাণে এই গাছ জন্মায়। এর জন্য আলাদা করে চাষ করতে বা যত্ন করতে হয় না।

ছেলেমেয়েরা ম্যাদলেনকে বেশি ভালবাসত। কারণ সে খড় আর নারকেলের খোলা থেকে খেলনা তৈরি করতে পারত।

যে কোনও মৃত্যুই দুঃখ জাগাত তার মনে। যে কোনও সময়ে চার্চের দরজায় শোকসূচক কালো রং দেখলেই ভিতরে ঢুকে পড়ত সে। কোনও লোক মারা গেলে মৃতের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেও শোক প্রকাশ করত। কারো শোক-দুঃখ দেখলেই তার অন্তর কাঁদত। তার সহজাত বিষাদ আর শোকের সঙ্গীত যেন এক সুরে বাঁধা ছিল। মৃত্যুর অন্তহীন শূন্য গহ্বরের এপারে দাঁড়িয়ে কয়েকজন জীবিত মানুষ যে অন্ত্যেষ্টিকালীন গান গাইত সে গানের সকরুণ সুরধারা ম্যাদলেনের মনটাকে যেন মৃত্যুর ওপারে অনন্ত অজানিত এক পরলোকের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

অনেক সময় অনেক দয়ার কাজ খুব সতর্কভাবে গোপন করত ম্যাদলেন, যেন সে কাজ এক ঘৃণ্য কুকর্ম। অনেক সময় সে কোনও গরীব লোকের বাড়িতে দরজা ঠেলে চুপি চুপি ঢুকে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে টেবিলের উপর একটা স্বর্ণমুদ্রা রেখে আসত। বাড়ির মালিক বাইরে থেকে এসেই ঘরের দরজা খোলা দেখে ভাবত বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। কিন্তু পরে সে আশ্চর্য হয়ে দেখত টেবিলের উপর স্বর্ণমুদ্রা পড়ে রয়েছে। কোনও চোর যদি ঢুকে থাকে তো সে চোর বাড়ির কোনও জিনিসপত্র

বা টাকাকড়িতে হাত দেয়নি, বরং তাকে এক স্বর্ণখণ্ড দান করে গেছে। বুঝত সে চোর হলো পীয়ের ম্যাদলেন।

সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হলেও ম্যাদলেন ছিল বড় বিষণ্ন। লোকে বলত, লোকটা ধনী হলেও অহঙ্কারী নয়। সৌভাগ্যবান হলেও সে সুখী নয়।

ম্যাদলেন মানুষ হিসাবে ছিল সত্যিই বড় রহস্যময়। লোকে বলত সে নাকি তার শোবার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয় না। সে ঘরটা নাকি সন্ন্যাসীদের গুহার মতো করে মড়ার মাথার খুলি আর হাড়-কঙ্কালে ভর্তি। এই সব কথা শুনে অনেক সাহসী যুবতী মেয়ে সোজা ম্যাদলেনের কাছে গিয়ে বলত, মঁসিয়ে, আপনার শোবার ঘরটা একবার দেখতে পারি ? লোকে বলে, ওটা নাকি একটা গুহা।

ম্যাদলেন মৃদু হেসে তাকে সঙ্গে করে তার শোবার ঘরে নিয়ে যেত। কিন্তু সে ঘরে ঢুকে কেউ আশ্চর্যজনক কোনও বস্তু দেখতে না পেয়ে হতাশ হত। তারা দেখত ঘরটা মেহগনি কাঠের সাধারণ সাদাসিধে ধরনের আসবাবে ভর্তি। সে ঘরের মধ্যে দুটো রুপোর বাতিদান ছিল।

তবু সবাই বলত, পীয়ের ম্যাদলেনের নির্জন শোবার ঘরটায় ঢুকলেই সন্ন্যাসীর গুহা অথবা সমাধিগহ্বর বলে মনে হয়।

লোকে এই বলে গুজব রটাত যে লাফিত্তে ব্যাঙ্কে ম্যাদলেনের লাখ লাখ ফ্রাঁ জমা আছে এবং ব্যাঙ্কের সঙ্গে তার ব্যবস্থা আছে সে যে কোনও সময়ে ব্যাঙ্কে সোজা চলে গিয়ে লাখ লাখ ফ্রাঁ তুলে নিয়ে আসতে পারে। মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কে গিয়ে ম্যাদলেনকে অবশ্য কিছু করে টাকা তুলে আনতে হত। কিন্তু লোকে যেখানে লাখ লাখের কথা বলত সেখানে লাখটা ছিল আসলে হাজার।

৪

১৮২২ সালে খবরের কাগজে দিগনের বিশপ মঁসিয়ে মিরিয়েলের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হলো। তিনি বিরাশি বছর বয়সে পবিত্র ধর্মস্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সংবাদে আরও জানা যায় মৃত্যুর কয়েক বছর আগে অন্ধ হয়ে যান বিশপ মিরিয়েল। তবে তাঁর বোন সব সময় তাঁর পাশে থেকে তাঁর সেবা করে যেত।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা যেতে পারে। এ জগতে কোনও জীবনই সম্পূর্ণরূপে সুখী নয়, কোনও মানুষই জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তবু অন্ধ হয়েও অনেকে সুখী হতে পারে।

কোনও অন্ধ লোকের পাশে যদি তার স্ত্রী, কন্যা অথবা বোন সব সময় থেকে দরকারমতো সেবা করে যায়, যদি তার নিরন্তর উপস্থিতি থেকে তার অন্তরের মমতার একটা পরিমাণ বোঝা যায়, যদি তার পোশাকের খসখস শব্দ অথবা গানের গুনগুন শব্দ থেকে তার বাঞ্ছিত মধুর উপস্থিতির কথা জানা যায়, নক্ষত্রকেন্দ্রিক এক দেবদূতের মতো সেই মমতাময়ী সেবাকারিণী সেই অন্ধ লোকের সঙ্গ কখনো ত্যাগ না করে তাহলে সেই অন্ধ লোকের মতো সুখী আর কেউ হতে পারে না। জগতে সবচেয়ে

বড় সুখ হলো ভালবাসার এক নিবিড় আশ্বাসে অভিষিক্ত হওয়া। সব দিক দিয়ে নিঃস্ব এবং ভালবাসার অযোগ্য হয়েও শুধু ভালবাসার খাতিরে ভালবাসা পাওয়া সত্যিই কত সুখের। অন্ধ লোক এই ধরনের ভালবাসা এবং সেবা পায়। এ ভালবাসা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয় কিছু না পেয়েও সব কিছু পেয়ে গেছে সে। ভালবাসার আলোয় নিষিক্ত হয়ে তার মনে হয় সে আর আলো থেকে বঞ্চিত নয়। যে ভালবাসা একেবারে বিশুদ্ধ এবং নিঃস্বার্থতায় পবিত্র, যে ভালবাসা নিশ্চয়তার দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সে ভালবাসা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আর কোনও অন্ধত্ব থাকে না। যে মানুষ কোনও ভালবাসা পায়নি সে অনন্ত আলোর মাঝেও অন্ধকার দেখে আর সেই অন্ধকারে তার প্রেমহীন আত্মা এক প্রেমময় আত্মাকে হাতড়ে বেড়ায় যখন দেখে এক জীবন্ত নারীমূর্তি তার প্রেমময় আত্মাকে তার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে তার সেবার জন্য সতত প্রস্তুত হয়ে আছে, যে নারীর ওষ্ঠাধর তার ললাটকে স্পর্শ করছে, তার হাত তার সেবায় সতত নিয়ত হয়ে আছে, তার মেদুর নিঃশ্বাস তার দেহগাত্রের উপর নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে, যখন দেখে তার মমতা আর শ্রদ্ধার ‹এক নিবিড়তম অনুভূতি তার নিঃসঙ্গতার অসহায়তাকে নিঃশেষে দ্রবীভূত করে দিয়ে তাকে ঘিরে আছে সব সময়ের জন্য, তখন তার মনে হয় ঈশ্বরের অনন্ত করুণা নেমে এসেছে সেই নারীর হাতের মধ্যে। স্বয়ং ঈশ্বরই মূর্ত হয়ে উঠেছেন সে নারীর মধ্যে। এ সুখের থেকে বড় সুখ আর কি হতে পারে? তখন তার সমগ্র অন্তরাত্মা স্বর্গীয় সুষমাসিক্ত এক অদৃশ্য ফুলের মতো ফুটে ওঠে যার রহস্যময় আলোর উজ্জ্বলতা তার দু'চোখের সব অন্ধত্বকে দূর করে দেয়। সে তখন আর কোনও আলো চায় না। যে অন্ধকার ভালবাসার ছোঁয়ায় আলোর ফুল ফুটে ওঠে জীবনে সে অন্ধকারের বিনিময়ে কোনও আলোই চায় না মানুষ। এক জ্যোতিষ্মান দেবদূতের মতো সে নারী সেই অন্ধকে ঘিরে থাকে সব সময়, তাকে ফেলে কোথাও যায় না। মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্য স্বপ্নের মতো অদৃশ্য হয়ে গেলেও পরমুহূর্তেই সে আবার ফিরে আসে বাস্তবতার মাঝে। সে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহমন হতে বিচ্ছুরিত জ্যোতির উষ্ণতার এক পরম আস্বাদ পাই আমরা, তার প্রশান্ত ব্যক্তিত্বের প্রেমময় উপস্থিতি আনন্দের উচ্ছ্বসিত প্লাবন নিয়ে আসে আমাদের নীরস প্রাণে। অন্ধকারের মাঝেও তার জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠি আমরা। আমাদের সেবা, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে নারীর মমতামধুর ভালবাসা বারবার ধ্বনিত হয়, তার সেবায়, বারবার সিক্ত ও অভিস্নাত হয়ে নবজীবন লাভ করি আমরা। ছায়াচ্ছন্ন এক ব্যাপ্ত বিষাদের মাঝে এক স্বর্গসুখের সন্ধান পাই আমরা।

এই স্বর্গসুখের জগৎ থেকেই পরলোকে চলে যান মঁসিয়ে বিয়েনভেনু।

মন্ট্রিউলের এক পত্রিকায় বিশপ বিয়েনভেনুর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়। আর তার পরদিনই মঁসিয়ে ম্যাদলেন কালো পোশাক পরে শোক পালন করতে থাকে। এ নিয়ে শহরের লোকের মুখে আলোচনা চলতে থাকে। এই ঘটনার মাঝে কেউ কেউ ম্যাদলেনের অতীত জীবনের রহস্যের সন্ধান করতে থাকে। শহরের অভিজাত লোকেরা তাদের

বৈঠকখানায় বসে বলাবলি করতে থাকে, ম্যাদলেন দিগনের বিশপের জন্য শোক পালন করছে। বিশপ হয়ত ওর কোনও আত্মীয় ছিলেন। এতে অভিজাত সমাজে তার খাতির বেড়ে যায়। শহরের বয়স্ক মহিলারা ঘন ঘন দেখা করতে আসে ম্যাদলেনের সঙ্গে। যুবতী মেয়েরা তাকে হেসে অভিবাদন জানাতে থাকে।

একদিন সন্ধ্যার সময় এক বিধবা মহিলা এসে তাকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা মঁসিয়ে মেয়র, দিগনের বিশপ কি আপনার জ্ঞাতিভাই ছিলেন ?

ম্যাদলেন বলল, না মাদাম।

বিধবা বললেন, কিন্তু আপনি তো শোকপালন করছেন।

ম্যাদলেন বলল, কারণ যৌবনে আমি তাঁদের বাড়িতে ভৃত্য ছিলাম।

শহরে যখন কোনও ভবঘুরে ছেলে চিমনি পরিষ্কার বা ঝাঁট দেবার কাজ করতে আসত তখন ম্যাদলেন তাকে ডেকে পাঠাত। তার নাম জিজ্ঞাসা করত, তাকে টাকা দিত। কথাটা প্রচারিত হতে অনেক ভবঘুরে ছেলে প্রায়ই এ শহরে আসত।

৫

ক্রমে মঁসিয়ে ম্যাদলেনের বিরুদ্ধে সব প্রতিকূলতা, যত নিন্দাবাদ স্তব্ধ হয়ে গেল। মানুষ বড় হলেই তাকে অনেক নিন্দা সহ্য করতে হয়। ম্যাদলেনকেও তাই করতে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে তা অতীতের ঈর্ষাত্মক ঘটনার কাহিনী হিসাবে চাপা পড়ে গেল লোকের মনের মধ্যে। ১৮২১ সাল পর্যন্ত ম্যাদলেনের প্রতি স্থানীয় জনগণের শ্রদ্ধাভক্তি বেড়ে যেতে থাকে ক্রমশ। তার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ায় প্রায় কুড়ি মাইল দূর থেকে বহু লোক মেয়র মঁসিয়ে ম্যাদলেনের নানা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। ম্যাদলেন অনেক ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা মিটিয়ে দিত। অনেকের অনেক শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে তাদের মধ্যে মিল করিয়ে দিত। সকলেরই তার বিচার-বিবেচনায় আস্থা ছিল। তার কথাই ছিল যেন আইন। এইভাবে মাত্র ছয়-সাত বছরের মধ্যেই সারা প্রদেশে তার যশ মহামারী রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

একটা মাত্র লোক এই ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল। ম্যাদলেন যত ভাল কাজই করুক না কেন, লোকটা তা কখনো স্বীকার করত না ভাল বলে। তার প্রতি সব সময় একটা সংশয় আর অবিশ্বাসকে পোষণ করে চলত। কতকগুলো লোকের মধ্যে পাপ প্রবৃত্তি খুব প্রবল থাকে যে প্রবৃত্তি নিখাদ ধাতুর মতো খাঁটি এবং যে প্রবৃত্তির দ্বারা মানুষের প্রতি অনুরাগ-বিরাগ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই পাপ প্রবৃত্তির জন্য সেই সব মানুষগুলো আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে কোনও বুদ্ধি বা যুক্তির পরামর্শ মানতে চায় না। তারা সকলেই শুধু ঘৃণা করে যায়। তাদের মনের সংশয় আর অবিশ্বাস কোনও অপরিচিত-লোক দেখলেই বিড়ালের পিছনে কুকুর আর খেঁকশিয়ালের পিছনে সিংহের মতো ছুটে যায় তার পিছনে।

ম্যাদলেন যখন রাস্তা দিয়ে দু'ধারের নাগরিকদের অভ্যর্থনা পেতে পেতে হাসিমুখে কোথাও যেত, লম্বা চেহারার ঝুল কোটপরা একটা লোক ছড়িহাতে দাঁড়িয়ে তাকে

লক্ষ্য করত। ম্যাদলেন যতক্ষণ পর্যন্ত তার চোখের আড়াল হয় ততক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে যেত লোকটা। লক্ষ্য করত সে তার নিচের ঠোঁটটা উপরের ঠোঁটের উপর চাপিয়ে মাথাটা আপন মনে নাড়ত। যেন আপন মনে বলত, লোকটা কে ? আমি আগে নিশ্চয় কোথাও দেখেছি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

লোকটা দেখতে এমনই যে তাকে একবার দেখলেই মনে রেখাপাত করে। মনের মধ্যে কেমন এক অজানা ভয় জাগে। লোকটার নাম হলো জেভার্ত এবং সে পুলিশের লোক।

মন্ত্রিউল-সুর-মের-এর পুলিশ ইনস্পেক্টার সে তার যথাকর্তব্য পালন করে গেলেও মাঝে মাঝে তার কাছের লোকে তাকে ঘৃণা করত। ম্যাদলেন যখন প্রথম মন্ত্রিউলে আসে জেভার্ত তখনও আসেনি। ম্যাদলেন কিভাবে তার কাজ-কারবার শুরু করে তা সে দেখেনি। সে যখন মন্ত্রিউলের পুলিশ ইনস্পেক্টার হিসাবে তার কার্যভার গ্রহণ করে তখন ম্যাদলেন নাম আর টাকা দুটোই করেছে। সে তখন পীয়ের ম্যাদলেন থেকে মঁসিয়ে ম্যাদলেন হয়ে উঠেছে।

সাধারণত পুলিশ অফিসারদের মধ্যে কিছু ভাল প্রবৃত্তির সঙ্গে একটা প্রভুত্বের ভাব থাকে, কিন্তু জেভার্তের মধ্যে ছিল শুধু অবিমিশ্র প্রভুত্বের ভাব, তার মধ্যে ভাল কোনও প্রবৃত্তি ছিল না।

মানুষের আত্মা যদি মানুষে দেখতে পেত তাহলে সে বুঝতে পারত প্রাণীজগতের বিভিন্ন পশু-পাখিগুলো মানুষের আত্মারই এক একটা প্রতিরূপ। সামান্য ঝিনুক থেকে ঈগল পাখি, শুয়োর থেকে বাঘ—সব আছে মানুষের মধ্যে। কোনও কোনও মানুষের মধ্যে আছে আবার দু' তিন রকমের জন্তুর স্বভাব।

আসলে প্রাণীজগতের সব জন্তুই মানুষের ভাল-মন্দ স্বভাবের এক একটা বস্তুর প্রতিরূপ। তাদের আত্মারই এক একটা বাস্তব প্রতিফলন। ঈশ্বর আমাদের চোখের সামনে পশুদের হাজির করিয়ে আমাদের শিক্ষা দিতে চান। তবে মানুষের আত্মার মধ্যে বুদ্ধি বলে একটা জিনিস আছে এবং শিক্ষালাভের একটা শক্তি আছে। সুপরিচালিত সামাজিক শিক্ষার দ্বারা মানুষ তার আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বার করে এনে কাজে লাগাতে পারে। আমরা এই সামাজিক শিক্ষার দ্বারা কোনও মানুষকে বা পশুকে দেখে তাদের ভিতরকার স্বভাবের কথা জানতেও পারি। কোনও মানুষের চেহারা বা দেহাবয়ব দেখে তার অন্তরের স্বরূপটা বুঝতে না পারার কোনও কারণ থাকতে পারে না।

জেভার্তের জন্ম হয় কারাগারে। তার মা জ্যোতিষের কাজ করত। তার বাবা কাজ করত নৌবহরে। বড় হয়ে জেভার্ত বুঝতে পারল সমাজে প্রবেশ করার কোনও অধিকার নেই তার। সমাজের কাছে সে এক ঘৃণ্য জীব। কিন্তু সে সমাজ দুটো শ্রেণীর লোককে ভয় করে এবং তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়। এই দুটো শ্রেণীর একটা সমাজের ক্ষতিসাধন করতে চায়, সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনতে চায় অর্থাৎ তারা সমাজবিরোধী, আর এক শ্রেণী হলো সমাজের রক্ষাকর্তা। জেভার্ত দেখল এই দুটো শ্রেণীর একটাকে তার বেছে নিতেই হবে।

ভবঘুরে ধরনের সমাজবিরোধীদের সে ঘৃণা করত, কারণ সে নিজে একদিন তাদের শ্রেণীভুক্ত ছিল। সে তাই পুলিশেই যোগদান করে।

এদিক দিয়ে সে বেশই উন্নতি করে। চল্লিশ বছর বয়সেই সে পুলিশ ইনস্পেক্টার হয়। অথচ যৌবনে সে মিদিতে ছিল এক জেলপ্রহরী। যাই হোক, এবার আমরা জেভার্তের মুখটা খুঁটিয়ে দেখব।

তার নাকটা ছিল থ্যাবরা; নাসারন্ধ্র দুটো ছিল বেশ বড় বড়। নাকের দু'দিকে ছিল দুটো লম্বা-চওড়া গালপাট্টা। এক নজরে দেখলেই তার গালপাট্টা দুটো কালো ঝোপের মতো দেখায়। জেভার্ত খুব হাসত। কিন্তু যখন সে হাসত তার সব দাঁতগুলো আর দাঁতের মাড়ী দেখা যেত। তার নাকের দু'ধারে দুটো বড় বড় টোল খেত। জেভার্ত যখন হাসত না তখন তাকে বুলডগের মতো দেখাত আর যখন সে হাসত তখন তাকে বাঘের মতো দেখাত। তার ভ্রূ দুটো সংকীর্ণ ছিল, কিন্তু চোয়াল দুটো বড় ছিল। তার লম্বা চুলগুলো কপালটাকে ঢেকে থাকত। তার ভ্রূ দুটো প্রায় সব সময় কুঞ্চিত থাকত বলে তার ক্রোধটা প্রকটিত হয়ে উঠত। তার চোখ আর মুখ দুটোই ভয়ঙ্কর দেখাত।

তার মনের ভাবধারার দুটো প্রধান উপাদান ছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি তার একটা কুটিল শ্রদ্ধা ছিল এবং সেই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তাদের প্রতি তার একটা ভয়ঙ্কর ঘৃণা ছিল। চৌর্য, নরহত্যা প্রভৃতি যে কোনও অপরাধকে সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে ধরে নিত সে।

সামান্য পিওন থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত যে সব লোক প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত থাকত, জেভার্ত তাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখত এবং যে কোনও প্রশাসনিক কাজকে সে পবিত্র মনে করত। যারা আইন ভঙ্গ করত তাদের প্রতি এক প্রবল ঘৃণা, বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা অনুভব করত। কোনও বিষয়ে তার কোনও বিচারকে সে অভ্রান্ত বলে মনে করত। তার কেবলি মনে হত তার সে বিচারের মধ্যে কোনও ত্রুটি বা ফাঁক নেই। সে একদিকে বলত, সরকারী কর্মচারিরা কোনও অন্যায় করতে পারে না। ম্যাজিস্ট্রেটরা সব সময় ঠিক বিচার করে থাকে। আবার অন্যদিকে অপরাধীদের সম্বন্ধে বলত, ওরা একেবারে অধঃপতিত, ওদের দ্বারা আর কিছু হবে না, ওরা জীবনে আর কোনও ভাল কাজ করতে পারবে না। যে সব উগ্র মনোভাবাপন্ন লোকরা আইনের শক্তিকে সর্বোচ্চ, সার্বভৌম আর অবিসম্বাদিত বলে মনে করে জেভার্ত তাদের সঙ্গে একমত। সে ছিল স্টইক সন্ন্যাসীদের মতো আত্মনিগ্রহে কঠোর, আবার ভোগে আগ্রহী। কল্পনাপ্রবণ ভাববাদী লোকদের মতো সে ছিল একই সঙ্গে বিনম্র এবং অহঙ্কারী। তার চোখের দৃষ্টি ছিল একই সঙ্গে হিমশীতল আর মর্মভেদী। প্রহরীর মতো সব সময় সজাগ থাকাই তার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তার বিবেকটাকে সে তার নীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। যেটাকে সে কর্তব্য বলে মনে করত সেই কর্তব্য কর্মই ছিল তার ধর্ম। গুপ্তচরের মতো সে সবার কাজকর্ম অলক্ষ্যে লক্ষ্য করে যেত। একমাত্র অভিশপ্ত এবং হৃতভাগ্য ব্যক্তিরাই তার কু-নজরে পড়ত বা তার হাতে ধরা পড়ত।

জেল থেকে পালানোর জন্য সে হয়ত তার বাবাকেও গ্রেপ্তার করতে পারত এবং আইন ভঙ্গ করার জন্য সে হয়ত তার মাকেও দণ্ড দান করতে পারত এবং এ কাজকে সে পবিত্র ধর্মীয় কাজ বলে মনে করত। সে যে কঠোর কর্তব্যপরায়ণতায় অবিচল, আত্মনিগ্রহ আর নিষ্ঠুর সততার জীবন যাপন করত, তার মধ্যে কোনও ফাঁক বা বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ছিল না। সে ছিল মনে-প্রাণে নিঃসঙ্গ। পুলিশের কাজে তার এক অদ্ভুত সততা আর নিষ্ঠা ছিল। ব্রুটাস আর দাগী অপরাধী থেকে পুলিশের বড়কর্তা হওয়া ভিদোকের সংমিশ্রণে গড়া সে যেন ছিল মর্মর প্রস্তরনির্মিত এক নির্মম গুপ্তচরের প্রতিমূর্তি।

জেভার্তের স্বভাব ছিল সব কিছু গোপনে লক্ষ্য করা। যারা ছিল জোশেফ দ্য মেস্তারের দলের লোক এবং রাজতন্ত্রের উপাসক, যারা সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাজতন্ত্রের সমর্থনে পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখত তারা জেভার্তকে এক আদর্শ রাজকর্মচারির প্রতীক হিসাবে ভাবতে পারত।

সাধারণত জেভার্তের কপালটা দেখা যেত না। টুপিটা কপালের উপর নামানো থাকত। চোখ দুটো ভ্রূযুগলের নিচে কেমন যেন চাপা পড়ে থাকত, তার হাত দুটো জামার আস্তিনের নিচে ছড়িটাকে ধরে থাকত বলে সাধারণত তা দেখা যেত না। কিন্তু দরকার হলে তার কপাল, চোখ, মুখ, হাত, হাতের ছড়ি এই সব কিছু ঝোপের আড়ালে লুকোনো শত্রুর মতো অকস্মাৎ বেরিয়ে এসে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করত।

অবসর সময়ে বই পড়ত জেভার্ত, যদিও বই পড়া কাজটাকে অলসদের কাজ হিসাবে ঘৃণা করত সে। যাই হোক, সে পড়তে পারত এবং একেবারে অশিক্ষিত ছিল না। তার কথাবার্তা থেকেও এটা প্রায়ই বোঝা যেত। তার কোনও নেশা ছিল না, বা সে কোনও কুকর্ম করত না। তবে তার মন ভাল থাকলে সে একটু করে নস্যি নিত। এটাই ছিল তার একমাত্র নেশা।

বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর বাৎসরিক পরিসংখ্যান তালিকায় পদমর্যাদাহীন নিচের তলার যে সব মানুষদের নাম ছিল তাদের কাছে জেভার্ত ছিল এক ত্রাসের বস্তু। তার নাম শুনলে তারা ছিটকে পালাবার চেষ্টা করত, দেখা হয়ে গেলে তারা ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে যেত। জেভার্ত তাদের কাছে ছিল এমনই ভয়ঙ্কর।

মঁসিয়ে ম্যাদলেনের উপর কড়া নজর রেখে এক অপার সংশয় আর বিস্ময়ের সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে যেত জেভার্ত। ম্যাদলেনও ক্রমে এটা জানতে পারে। কিন্তু সে এটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এ নিয়ে সে কোনওদিন প্রশ্ন করেনি জেভার্তকে, তাকে ডেকে পাঠায়নি অথবা তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। সে জেভার্তের এই গুপ্তচরগিরি সহ্য করে যায়। আর পাঁচজন লোকের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করত তেমনি জেভার্তের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করে যেত।

এ বিষয়ে জেভার্ত যা দু'-চারটে কথা বলেছিল তার থেকে বোঝা যায় সে মঁসিয়ে ম্যাদলেনের পূর্ব জীবনের অনেক খোঁজ-খবর পেয়েছে, সে কোথায় কি কি করে তা সে জানতে পেরেছে। এক দূর গ্রামাঞ্চলের যে একটি পরিবার অন্যত্র চলে যায়

সেই পরিবার সম্বন্ধে অন্য একজন খোঁজ-খবর নিচ্ছে। জেভার্ত একদিন নিজের মনেই বলে ওঠে, এইবার বলছি তাকে।

কিন্তু এর পরই সে নীরব হয়ে যায় একেবারে। তার থেকে মনে হয় সন্ধানের যে সুতোটা সে খুঁজে পেয়েছিল সে সুতোটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে।

কোনও মানুষের স্বভাব বা প্রবৃত্তি কখনো অভ্রান্ত হতে পারে না একেবারে। সে যত সতর্কভাবেই চলুক না কেন, কখনো কখনো সে অসতর্ক হয়ে পড়বেই। মঁসিয়ে ম্যাদলেনের মধ্যে শান্ত ভাব দেখে জেভার্ত হতবুদ্ধি হয়ে যেত। ম্যাদলেনের ব্যাপারে সে যে এত খোঁজ-খবর নিচ্ছে তা সে তাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে বা বুঝতে দিত না। কিন্তু কোনও একদিনের ঘটনায় সে এমন একটা আচরণ করে ফেলল যাতে সে নিজেই মঁসিয়ে ম্যাদলেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলল।

৬

একদিন শহরের একদিকে একটা কাঁচা পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা গোলমাল শুনতে পেল ম্যাদলেন। দেখল এক জায়গায় একদল লোক জড়ো হয়েছে। এগিয়ে গিয়ে ম্যাদলেন দেখল পীয়ের ফকেলেভেন্ত নামে একজন লোকের গাড়ির ঘোড়াটা পড়ে যাওয়ায় সে নিজে গাড়ির তলায় চাপা পড়ে গেছে।

পীয়ের ফকেলেভেন্ত ছিল সেই সব লোকদের একজন যারা তখনো পর্যন্ত ম্যাদলেনকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারেনি বা তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেনি। সে অল্প লেখাপড়া শিখে দলিল নকলের কাজ করত। কিন্তু ম্যাদলেন যখন এ অঞ্চলে আসে তখন ফকেলেভেন্তের কারবার খারাপের দিকে যেতে থাকে। ফকেলেভেন্ত যখন দেখল তার চোখের সামনে ক্যরবার করতে করতে ম্যাদলেন ফুলে উঠল, তার কারখানায় কত লোক কাজ করে ভাল বেতন পেতে লাগল তখন অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় ম্যাদলেনের উপর দারুণ ঈর্ষা অনুভব করতে লাগল সে। অথচ সে শ্রমিকের কাজও করতে পারত না, কারণ তখন তার বয়স হয়েছিল এবং সে শক্তি তার ছিল না। বাড়িতে অবশ্য তার ছেলে-পরিবার কেউ ছিল না। তার একটা ঘোড়া আর একটা গাড়ি ছিল। অন্য কোনও উপায় না দেখে ফকেলেভেন্ত ঘোড়ার গাড়িটা বার করে ভাড়া খাটাতে লাগল। এরপর মাল বয়ে বেড়াত।

ঘোড়াটার পিছনের পা দুটো ভেঙে যায়। সে আর উঠতে পারবে না। ফকেলেভেন্ত গাড়ির তলায় এমনভাবে চাপা পড়ে যায় যে গাড়ির সমস্ত ভারটা তার বুকের উপর পড়ল। কারণ গাড়ির চাকাগুলো কাদার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল ক্রমশ। গাড়ির তলা থেকে ফকেলেভেন্তকে টেনে বার করার অনেক চেষ্টা করা হয়। কিন্তু করা যায়নি। জেভার্তও ঘটনাস্থলে গিয়ে পড়ে। সে গাড়িটা কেটে ফকেলেভেন্তকে বার করার জন্য একজন কর্মকারকে ডেকে পাঠায়।

এমন সময় ম্যাদলেন সেখানে যেতে সকলে সম্ভ্রমভরে সরে গিয়ে তার জন্য পথ করে দিতে লাগল। ম্যাদলেন জানত, কর্মকারকে ডাকতে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আসতে পনের মিনিট সময় লাগবে।

আগের দিন জোর বৃষ্টি হওয়ায় মাটি ভিজে ছিল। তাই গাড়ির চাকাগুলো ক্রমশই বসে যাচ্ছিল। ফলে ফকেলেভেন্তের বুকের উপর বেশি করে চাপ পড়ছিল। আরও কিছুক্ষণ দেরি হলে তার বুকের পাঁজরগুলো ভেঙে যাবে।

ম্যাদলেন বলল, পনের মিনিট, অনেক সময়।

একজন বলল, কিন্তু কোনও উপায় নেই।

ম্যাদলেন ভিড় করা জনতার দিকে তাকিয়ে বলল, এমন কেউ নেই যে গাড়ির তলায় ঢুকে পিঠ দিয়ে গাড়িটা তুলে ধরবে? তাহলে সহজেই ফকেলেভেন্ত বেরিয়ে আসতে পারবে। আমি তাহলে তাকে পাঁচ লুই দেব।

কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না ভিড়ের মধ্য থেকে।

ম্যাদলেন বলল, দশ লুই দেব।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলল, এর তলায় যে ঢুকবে তাকে শয়তানের মতো শক্তিমান হতে হবে।

তা না হলে সে নিজেই চাপা পড়ে মরবে।

ম্যাদলেন বলল, কুড়ি লুই দেব।

তবু কেউ এগিয়ে এল না।

ম্যাদলেন এবার জেভার্তকে দেখতে পেল। এতক্ষণ তার নজর যায়নি সেদিকে।

জেভার্ত বলল, প্রচুর শক্তির দরকার। একটা বোঝাই করা গাড়ি পিঠ দিয়ে তোলা সহজ ব্যাপার নয়।

ম্যাদলেনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জেভার্ত কুটিলভাবে বলল, আমি মাত্র একজনকে জানি মঁসিয়ে ম্যাদলেন যে এটা করতে পারে। সে ছিল একদিন কয়েদী।

ম্যাদলেন আশ্চর্য হয়ে বলল, তাই নাকি?

জেভার্ত বলল, হ্যাঁ, সে ছিল তুলোঁর জেলখানায়।

ম্যাদলেনের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল।

এদিকে গাড়ির চাকাগুলো আরও বসে যাচ্ছিল। ফকেলেভেন্ত যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে বলছিল, আমাকে বাঁচাও, আমার বুকের পাঁজরগুলো ভেঙে যাচ্ছে। আমার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে।

ম্যাদলেন আবার একবার ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, কুড়ি লুই-এর বিনিময়েও কেউ এই লোকটিকে বাঁচাবার জন্য একবার চেষ্টা করবে না?

জেভার্ত বলল, আমি যার কথা বললাম একমাত্র সে-ই পারে।

ম্যাদলেন ইতস্তত করতে লাগল। সে একবার জেভার্তের শকুনিসুলভ চোখের দিকে আর একবার স্তব্ধ জনতার দিকে তাকাল। তারপর নিজেই গাড়ির তলায় ঢুকে পড়ল।

ম্যাদলেন প্রথমে কনুই-এর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে দু'বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। বাইরে থেকে একদল লোক বলল, পীয়ের ম্যাদলেন, চলে এসো ওখান থেকে।

ভিতর থেকে ফকেলেভেন্তও বলল, চলে যান মঁসিয়ে ম্যাদলেন, আমি আর বাঁচব না, আপনি চলে যান। আপনিও মারা যাবেন।

ম্যাদলেন কোনও কথা বলল না।

জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সহসা বসে যাওয়া চাকাগুলো ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। ম্যাদলেন চাপা গলায় বলতে লাগল, আমাকে একটু সাহায্য করো।

হঠাৎ সবাই ছুটে এসে গাড়িটা তোলার চেষ্টা করতে লাগল। একটা লোকের শক্তি আর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেল সবাই। ফকেলেভেন্ত বেঁচে গেল।

গাড়িটা উঠে যেতেই ম্যাদলেন উঠে দাঁড়াল। তার মুখটা ঘামে ভিজে গিয়েছিল। তবু একটা তৃপ্তির অনুভূতি ছড়িয়ে ছিল তার মুখে। তার পোশাকটা ছিঁড়ে গিয়েছিল এবং তাতে কাদা লেগে গিয়েছিল। ফকেলেভেন্ত ম্যাদলেনের সামনে নতজানু হয়ে বসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগল। ম্যাদলেনের চোখে-মুখে এক তৃপ্তি ও বিজয়গর্বের সঙ্গে এক কাতর ভাব ছিল। সে ভাবের সঙ্গে জেভার্তের ভয়টা তখনো ছিল। সে শান্তভাবে জেভার্তের মুখপানে তাকাল। দেখল জেভার্ত তখনো তার মুখপানে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে।

৭

সেদিনকার দুর্ঘটনায় গাড়িচাপা পড়ে ফকেলেভেন্তের হাঁটুর একটা চাকতি ভেঙে যায়। ম্যাদলেন তাকে সঙ্গে করে একটা হাসপাতালে ভর্তি করে তার দেখাশোনা করার জন্য দু'জন নার্স নিযুক্ত করল। এ হাসপাতালটা তার শ্রমিকদের সুবিধার জন্য তার একটা কারখানার মধ্যেই করেছিল। পরের দিন সকালে ফকেলেভেন্ত তার ঘরে বিছানার পাশে একটা টেবিলের উপর এক হাজার ফ্রাঁর নোট পেল। তার সঙ্গে একটি কাগজে ম্যাদলেনের হাতে লেখা ছিল, আমি আপনার গাড়ি ও ঘোড়ার ব্যবস্থা করছি।

ফকেলেভেন্তের গাড়িটা ভেঙে যায় এবং ঘোড়াটা মারা যায়। ফকেলেভেন্ত সেরে উঠল কিছুদিনের মধ্যে। কিন্তু তার হাঁটুটা শক্ত আর খাড়া হয়ে রইল। হাঁটুটা আগের মতো মুড়তে পারল না। কয়েকজনের পরামর্শে ম্যাদলেন প্যারিসের সেন্ট আঁতোনের অন্তর্গত এক কনভেন্টে এক মালীর কাজ যোগাড় করে দিল ফকেলেভেন্তকে।

এই ঘটনার কিছু পরেই মঁসিয়ে ম্যাদলেন দ্বিতীয়বারের জন্য মেয়র নির্বাচিত হলো। শহরের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠল সে। সে যখন মেয়রের পোশাক পরে বার হত তখন তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষার এক কাঁপন জাগত জেভার্তের বুকের মধ্যে, ভেড়ার চামড়া ঢাকা এক নেকড়ে দেখে এক শিকারী কুকুরের মধ্যে যেমন কাঁপন জাগে। তবে যতদূর সম্ভব মেয়রকে এড়িয়ে চলত জেভার্ত। সরকারী কোনও কর্তব্যের খাতিরে মেয়রের কাছে জেভার্তকে যেতে হলে সে প্রথামতো তাকে সম্মান জানাতে বাধ্য হত।

ম্যাদলেনের জন্য শহরের বহিরঙ্গটারই শুধু উন্নতি হয়নি, অদৃশ্য কয়েকটি দিকেও তার উন্নতি হয়। শহরের অধিবাসীদের অবস্থা আগে যখন খুব খারাপ ছিল তখন কর ঠিকমতো আদায় হত না। আবার সেই বাকি কর আদায় করার জন্য বেশি

লোক লাগত এবং তার জন্য খরচ বেশি হত। কিন্তু বর্তমানে শহরবাসীদের আয়ের উন্নতি হওয়ায় কর সবাই সহজে দিয়ে দেয় এবং কর আদায়ের জন্য খরচও অনেক কম হয়। অর্থমন্ত্রী মন্ত্রিউল-সুর-মেরের কথা উল্লেখ করে অন্য শহরের মেয়রদের শিক্ষা দেন।

মন্ত্রিউল শহরের যখন এই রকম অবস্থা চলছিল তখন একদিন ফাঁতিনে ফিরে আসে সেখানে। কেউ তার কথা মনে রাখেনি। তবে তাকে কষ্ট পেতে হয়নি তার জন্য। কারণ ম্যাদলেনের কারখানার দরজা তখন খোলা ছিল। সে মেয়েদের কারখানায় একটা চাকরি পেয়ে যায়। কাজটা তার কাছে নতুন এবং সে কাজ সে ভাল জানতও না। বেতনও খুব একটা বেশি ছিল না। তবু এই চাকরিটা পাওয়াতে ফাঁতিনের খুবই উপকার হলো। সে অন্তত তার জীবিকাটা অর্জন করতে পারল।

৮

ফাঁতিনে যখন দেখল সে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে তখন তার খুশির অন্ত রইল না। সৎভাবে পরিশ্রম করে জীবিকার্জন করতে পারাটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ফলে কাজের প্রতি তার আগ্রহ আর নিষ্ঠা বেড়ে গেল। সে তার থাকার জন্য ছোটখাটো একটা ঘর ভাড়া করল। সে একটা আয়না কিনল। সেই আয়না দিয়ে সে তার মুখ-চোখ, যৌবন, দেহসৌন্দর্য, সাদা দাঁত, সুন্দর চুল—সব কিছু দেখত এবং দেখে আনন্দ পেত। অতীতের অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনার কথা ভুলে গেল সে। সে শুধু তার মেয়ে কসেত্তের কথা ভাবত। তার ভবিষ্যৎ কিভাবে গড়ে তুলবে সে তার জন্য অনেক পরিকল্পনা করত মনে মনে।

তার বিয়ে হয়েছে একথা কারো কাছে বলেনি ফাঁতিনে। সুতরাং তার যে মেয়ে আছে একথাও বলতে পারেনি কাউকে। প্রথম প্রথম সরকারী চিঠি লেখানোর লোকের কাছে গিয়ে তাকে দিয়ে থেনার্দিয়েরদের কাছে চিঠি ও টাকা পাঠাত। কিন্তু পরে কথাটা জানাজানি হয়ে যায়। অনেকে মন্তব্য করতে থাকে মেয়েটা মিথ্যা কথা বলে।

যাদের সঙ্গে আমাদের কোনও স্বার্থের ব্যাপার নেই, যাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, আমাদের চালচলন ও কাজকর্মের দিকে তাদের নজরই বেশি। তা না হলে সন্ধের দিকে একটা লোককে ফাঁতিনের বাসার কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাবে কেন? আবার পিছনের দিকে রাস্তাটাতেই বা দু'-একজনকে দেখা যাবে কেন?

কতকগুলো লোক আছে যারা অবসর সময়ে ভাল কাজ না করে শুধু এক তরল কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পরের খোঁজখবর নিয়ে বেড়াবে। তারা অপরের জীবনের কোনও অজানা রহস্যের সন্ধান করার জন্য দিনের পর দিন কষ্ট করবে, খরচ করবে আর সেই রহস্য অবশেষে উদ্‌ঘাটন করতে পারলে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারার জন্য এক অকারণ আত্মতৃপ্তি লাভ করবে।

অনেকে আবার শুধু পরচর্চা করতে ভালবাসে আর সেই পরচর্চা করতে গিয়ে অকারণে ঈর্ষায় ফেটে পড়ে। প্রতিবেশীদের প্রতি অনুভূত ঈর্ষার আগুনে পরচর্চা ইন্ধন জোগায়।

ফাঁতিনের জীবনযাত্রার উপর অনেকেই লক্ষ্য রাখত। কয়েকজন মেয়ে শ্রমিক তার দেহসৌন্দর্যের জন্য, বিশেষ করে তার চুল আর দাঁতের জন্য ঈর্ষাবোধ করত। তার সঙ্গে কারখানায় যে সব মেয়ে কাজ করত তারা মাঝে মাঝে দেখত ফাঁতিনে মুখটা ঘুরিয়ে চোখের জল মোছে। তার মেয়ের কথা বা তার পুরনো প্রেম আর প্রেমিকের কথা মনে পড়ে গেলে বেদনায় বিহ্বল হয়ে ওঠে তার অন্তরটা।

পরে একটা কথা জানাজানি হয়ে গেল। অনেকে জানতে পারল, প্রতি মাসে দু'বার বিশেষ এক জায়গায় চিঠি পাঠায় ফাঁতিনে আর যার কাছে চিঠি পাঠায় তার নাম থেনার্দিয়ের এবং জায়গাটার নাম মঁতফারমেল।

যে লোকটা চিঠি লিখে দিত ফাঁতিনের সে কোনও কথা গোপন রাখতে পারল না শেষ পর্যন্ত। তাকে একদিন কয়েকজন লোক একটা মদের দোকানে নিয়ে এক পেট মদ খাইয়ে দিতেই সে আসল কথাটা বলে ফেলল। বলল, ফাঁতিনের একটি সন্তান আছে। তখন অনেকে বলতে লাগল, 'ও বাবা, মেয়েটা তাহলে এই ধরনের নোংরা প্রকৃতির!' শহরের এক কৌতূহলী মহিলা সোজা মঁতফারমেলে গিয়ে থেনার্দিয়েরদের সঙ্গে কথা বলল। সে ফিরে এসে বলল, যাওয়া-আসায় আমার তিরিশ ফ্রাঁ খরচ হয়েছে, তবে এখন আমি সব জানতে পেরেছি। আমি তার মেয়েকে দেখেছি।

এই মহিলা হলো মাদাম ভিকতারনিয়েন। সমাজের সাধারণ মানুষের নীতির অভিভাবিকা। তার বয়স ছাপ্পান্ন। বয়স হওয়ার জন্য তার মুখটা কুৎসিত দেখাত। তার গলার স্বরটা ছিল কাঁপা কাঁপা, তবে মনটা ছিল তেজী। ১৭৯১ সালে তার যখন যৌবন ছিল, সে এক যাজককে বিয়ে করে। এখন তার বয়স হলেও এবং চেহারাটা শুকিয়ে গেলেও সে তার স্বামীর স্মৃতিটা বুকে ধরে বেঁচে আছে। সে ঈর্ষাকাতর এবং মনটা তার হিংসায় ভরা। তার স্বামী যতদিন বেঁচে ছিল, তাকে কড়া শাসনের মধ্যে রেখেছিল। তার অল্প যা কিছু সম্পত্তি ছিল সে ধর্মের কাজে দান করে। তারপর সে আরাসের বিশপের দয়ার উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করত। এই মাদাম ভিকতাবনিয়েন মঁতফারমেল গিয়ে ফিরে এসে বলে, আমি তার সন্তানকে দেখেছি।

মাদাম ভিকতারনিয়েন যে মাসে থেনার্দিয়েরদের সঙ্গে দেখা করতে যায় সেই মাসে তারা কসেত্তের খরচ বাবদ সাত ফ্রাঁ থেকে বারো ফ্রাঁ দাবি করে এবং পরে পনের ফ্রাঁ চায়।

এদিকে ফাঁতিনের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। সে মন্ত্রিউল জেলা ছেড়ে কোথাও যেতে পারছিল না, কারণ বাড়িভাড়া আর আসবাবপত্র বাবদ দেড়শো ফ্রাঁ ধার ছিল। সে কারখানার সুপারভাইজারকে এই টাকার কথা বলে। সুপারভাইজার তাকে টাকা দিয়ে বরখাস্ত করে। তার চাকরির স্থায়িত্ব ছিল না, অস্থায়ী কর্মী হিসাবেই সে ঢুকেছিল। লজ্জা আর হতাশার চাপে অভিভূত হয়ে সে বাসার ভিতরেই থাকত সব সময়। কারখানার কাজ ছেড়ে সে বাসাতেই আশ্রয় নিয়েছিল। তার দোষের কথাটা জানাজানি

হয়ে যায়। মেয়রের কাছে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলার মতো সাহস ছিল না। মেয়রের কাছে যাবার জন্য অনেকেই তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু সে লজ্জায় ও ভয়ে যেতে পারেনি। সুপারভাইজারের মাধ্যমে দয়াবশত মেয়র ম্যাদলেন পঞ্চাশ ফ্রাঁ ফাঁতিনেকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কাজ থেকে তাকে ছাড়িয়ে দেয়, কারণ সে ছিল ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে ভীষণ কড়া। ফাঁতিনে তার মালিকের রায় মেনে নেয়।

৯

এইভাবে মাদাম ভিকতারনিয়েনের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

এদিকে মঁসিয়ে ম্যাদলেন ফাঁতিনেকে কোনওদিন দেখেনি এবং তার সম্বন্ধে কিছুই জানত না। সুপারভাইজার মালিকের নামে যা কিছু করার নিজেই করেছে। মেয়েদের কারখানায় মোটেই যেত না ম্যাদলেন, তার কাজ দেখাশোনাও করত না। এর জন্য যে একজন অবিবাহিতা মেয়েকে সে কারখানা দেখাশোনা করার জন্য সুপারভাইজার নিযুক্ত করে তার উপর সব ভার দেয়। সুপারভাইজার মেয়েটি ছিল সৎ এবং সরলমনা। তার অন্তরে দয়ামায়া ছিল। তবে যে পরিমাণ কঠোর নীতিজ্ঞান ছিল তার, সে পরিমাণ ক্ষমাগুণ ছিল না। তার কাজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল ম্যাদলেনের। সুপারভাইজারই ফাঁতিনের ব্যাপারটার সব কিছু বিচার করে। সে নিজেই রায় দেয়। ম্যাদলেনকে কিছুই জানায়নি এবং ফাঁতিনেকে ছাড়িয়ে দেবার পর সে তাকে মেয়রের নাম করে যে পঞ্চাশ ফ্রাঁ দেয় তা গরীব-দুঃখীদের দান-খয়রাতের জন্য তার হাতে যে একটা ফান্ড ছিল তার থেকে দেয়। এই ফান্ডটা মেয়র তার কাছেই রেখেছিল।

ফাঁতিনে কারো ঘরে কাজ করার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু কেউ তাকে কাজ দিতে চায়নি। বাড়িভাড়া আর আসবাবের টাকা বাকি থাকায় সে শহর ছেড়ে কোথাও যেতে পারছিল না। শেষে যে পঞ্চাশ ফ্রাঁ সে পায় তা সে দু'জন পাওনাদারকে ভাগ করে দেয়। সে মাত্র বিছানা ছাড়া আর সব আসবাব ছেড়ে দেয়। সব দেনা দেওয়ার পর তার কাছে মোট একশো ফ্রাঁ থাকে।

সে তখন সেনানিবাসের সৈন্যদের জামা সেলাই করে দিয়ে বারো স্যু করে পেত। তার থেকে তার মেয়ের খরচের জন্য দশ স্যু করে চলে যেত। এই সময় অভাবের জন্য প্রতি মাসে ঠিকমতো তার মেয়ের জন্য টাকা পাঠাতে পারত না।

দারিদ্র্য আর অভাবের মধ্য দিয়ে কিভাবে দিন কাটাতে হয় তা ফাঁতিনে এক বৃদ্ধার কাছে আগেই শিখেছিল। শীতকালে কিভাবে আগুন ছাড়াই থাকতে হয়, কিভাবে পেটিকোট দিয়ে কম্বলের অভাব পূরণ করতে হয়, জানালা দিয়ে আসা রাস্তার আলোয় রাতের খাওয়া সেরে বাতির খরচ বাঁচাতে হয়—এ সব জানা ছিল তার।

ফাঁতিনে একদিন তার এক প্রতিবেশিনীকে বলল, আমি যদি রাতে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা করে ঘুমোই এবং বাকি সময়টা কাজ করি তাহলে তাতে আমার চলে যাবে। মনে খাওয়ার চিন্তা না থাকলে কম খেয়েও বেঁচে থাকা যাবে।

মেয়েটা এই সময় কাছে থাকলে দুঃখের মাঝেও মনে কিছুটা শান্তি পেত ফাঁতিনে।

কিন্তু কতকগুলো অসুবিধা ছিল এ বিষয়ে। প্রথম কথা, সে তার এই ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের কথা তার মেয়েকে জানতে দিতে চাইছিল না। দ্বিতীয় কথা, থেনার্দিয়েরদের কাছে তার যে ঋণ ছিল তা শোধ করে না দিলে মেয়েকে তারা ছাড়বে না। তার উপর যাওয়া-আসার পথখরচ আছে।

যে অবিবাহিতা বৃদ্ধা মহিলা ফাঁতিনেকে দারিদ্র্যের মধ্যে কিভাবে জীবন যাপন করতে হয় তা শেখায়, তার নাম হলো মার্গারিতে। সে লেখাপড়া বেশি জানত না, কোনওরকমে নাম সই করতে পারত। তবে সে খুব ধার্মিক ছিল এবং তার দয়া-দাক্ষিণ্যও ছিল।

ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাবার পর প্রথম প্রথম লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ে ফাঁতিনে। সে ঘর হতে বার হতে পারত না। তার মনে হত সে রাস্তায় একবার বার হলেই সকলেই তার পানে তাকাবে। ছোট শহরে অধঃপতিত নারী সকলের ঘৃণা আর অবজ্ঞার বস্তু হয়। কোনও প্যারিসের মতো বড় শহরে কেউ কারো খবর রাখে না। কেউ কারো বিচার করে না। প্যারিসে যেতে পারলে তার ভাল হত। কিন্তু এখন তা আর সম্ভব নয়। তাছাড়া দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। দু' তিন মাসের মধ্যেই একে একে সব লজ্জা কেটে গেল তার। সে এবার রাস্তায় বার হলো, মাথা উঁচু করে হাঁটল, যেন কিছুই হয়নি। একদিন মাদাম ভিকতারনিয়েন ফাঁতিনেকে পথে দেখে খুশি হলো। বেশি খেটে এবং ভাল করে খেতে না পেয়ে শরীরটা রোগা হয়ে গিয়েছিল ফাঁতিনের। তার দেহসৌন্দর্যের অনেকখানি শুকিয়ে গিয়েছিল। তার শুকনো কাশিটা আবার বেড়ে উঠেছিল। তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে মাদাম ভিকতারনিয়েনের শয়তান আত্মাটা এক কৃষ্ণকুটিল সুখের আস্বাদ, এক বিষাক্ত তৃপ্তি অনুভর করল।

তবুও এত দুঃখের মাঝে সকালের দিকে ফাঁতিনে যখন তার মাথার রেশমের মতো চুলের লম্বা গোছাটা হাতে ধরে চুল আঁচড়াতে তখন একটা গর্ব অনুভব না করে পারত না সে।

১০

ফাঁতিনের যখন কারখানার কাজটা চলে যায় তখন শীতের শেষ। সে গ্রীষ্মকালটা কোনওরকমে কাটাল। তারপর আবার শীত এল। ভয়ঙ্কর শীত, উষ্ণতা বলতে নেই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু ধূসর কুয়াশা। বন্ধ জানালা দিয়ে বাইরের কোনও কিছু দেখা যায় না। সমস্ত আকাশ মেঘ আর কুয়াশায় ঢাকা থাকে। কখনো কখনো দরজায় একটুখানি ক্ষীণ সূর্যের আলো এসে দাঁড়ায়। ভয়ঙ্কর শীত শুধু আকাশ থেকে বৃষ্টি আনে আর হিমে মানুষের বুকগুলোর রক্ত জমিয়ে দেয়। ফাঁতিনের পাওনাদারেরা টাকার জন্য চাপ দিতে লাগল।

ফাঁতিনের রোজগার একেবারে কমে গেল আর ঋণের বোঝা বেড়ে যেতে লাগল। থেনার্দিয়েররা কড়া ভাষায় চিঠির পর চিঠি দিতে লাগল। সে চিঠি পড়লে ফাঁতিনের

বুক ফেটে যায়। একবার তারা লিখল কসেত্তে রাতে নগ্ন হয়ে থাকবে। তার পশমের পোশাকের জন্য দশ ফ্রাঁ লাগবে। চিঠিটা পড়ে সারাদিন ভাবতে লাগল ফাঁতিনে। সন্ধের সময় একটা নাপিতের দোকানে গেল সে। তার কোমর পর্যন্ত লম্বা চুলের গোছাটা দেখাল।

নাপিত বলল, কি সুন্দর চুল!

ফাঁতিনে বলল, এই চুলের জন্য তুমি কত দেবে?

নাপিত বলল, দশ ফ্রাঁ।

ফাঁতিনে বলল, ঠিক আছে, কেটে নাও।

তাই দিয়ে সে একটা পোশাক কিনে এনে থেনার্দিয়েরদের কাছে পাঠিয়ে দিল। তারা সেটা পেয়ে রেগে আগুন হয়ে গেল। কারণ তারা টাকা চেয়েছিল। তারা পোশাকটা তাদের মেয়ে এগোনিনেকে দিয়ে দিল। কসেত্তে শীতে কাঁপতে লাগল।

এদিকে চুলটা হারিয়ে ফাঁতিনের মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। সে আর চুল আঁচড়াতে বা বাঁধতে পারত না। সমস্ত মানুষের উপর মনটা বিষিয়ে গেল তার। সকলের মতো আগে সে ম্যাদলেনকে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু যখন দেখল ম্যাদলেন তাকে কারখানা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তার জন্যই এত দুঃখ-কষ্ট তখন সে তাকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল। একদিন কারখানার পাশ দিয়ে যাবার সময় যখন দেখল কারখানায় ঢোকার জন্য মেয়েরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তখন সে পাগলের মতো হাসতে আর গান করতে লাগল। একজন বুড়ি তা দেখে বুঝতে পারল, মেয়েটা অকালে মারা যাবে।

অন্তরে ক্ষোভ আর প্রচণ্ড রাগ নিয়ে সে একটা লোককে প্রেমিক হিসাবে ধরল। লোকটা কুঁড়ে এবং পথে পথে গান গেয়ে বেড়াত। ফাঁতিনেকে মারধর করত, অবশেষে তাকে ছেড়ে একদিন চলে গেল।

এত কিছু সত্ত্বেও তার মেয়েকে ভালবাসত ফাঁতিনে। যতই সে দুঃখ-কষ্টের গভীরে নেমে যেতে লাগল, ততই সে একটা আশাকে আঁকড়ে ধরল। সে আপন মনে বলত, একদিন আমি ধনী হব আর কসেত্তেকে তখন আমি আমার কাছে রাখব। এই ভেবে নিজের মনে হাসল। তার কাশিটা তাকে কায়দা করতে পারত না। রাত্রিতে মাঝে মাঝে ঘাম দিত।

থেনার্দিয়েররা আবার একটা চিঠি দিল। তাতে লেখা ছিল, কসেত্তের অসুখ করেছে। এই রোগটা এ অঞ্চলে খুব হচ্ছে। রোগটার নাম মিলিটারি ফীভার। এক ধরনের দূষিত জ্বর সৈনিকদের থেকে ছড়িয়ে পড়ে। তার জন্য তাদের ওষুধ কেনার পয়সা নেই। ফাঁতিনে যদি চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ ফ্রাঁ না পাঠায়, এক সপ্তার মধ্যে তাহলে তার মেয়ে মারা যাবে।

চিঠিটা পড়ে পাগলের মতো হাসতে লাগল ফাঁতিনে। সে মার্গারিত্তেকে বলল, চমৎকার! চল্লিশ ফ্রাঁ কোথা থেকে পাব? ওরা কি পাগল?

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চিঠিটা আবার পড়ল ফাঁতিনে। তাদের সে ঘর থেকে

রাস্তায় চলে গেল হাসতে হাসতে। একজন জিজ্ঞাসা করল, এত হাসির কারণ কি? ফাঁতিনে বলল, চল্লিশ ফ্রাঁ। এক গ্রামের এক গরীব চাষী চল্লিশ ফ্রাঁ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে।

ফাঁতিনে দেখল রাস্তার উপর এক জায়গায় অনেক লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তখন এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা লোক দাঁত বিক্রি করার জন্য বক্তৃতা দিচ্ছে আর তাকে ঘিরে একদল ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। যাদের দাঁত নেই তাদের কাছে এক একটা দাঁতের সেট বিক্রি করার চেষ্টা করছে সে। তার মজার মজার কথা শুনে অনেকে হাসছিল। ফাঁতিনেও ভিড়ের মধ্যে ঢুকে হাসতে লাগল। এমন সময় সেই দাঁত বিক্রেতা ফাঁতিনেকে বলল, তোমার দাঁতগুলো তো বেশ সুন্দর। তোমার উপরকার পাটির দুটো দাঁতের জন্য দুটো স্বর্ণমুদ্রা দেব।

ফাঁতিনে বলল, উপরকার পাটির দুটো দাঁত?

লোকটা বলল, হ্যাঁ, দুটো সোনার মুদ্রা অর্থাৎ দুটো নেপোলিয়ঁ যা ভাঙালে চল্লিশ ফ্রাঁ পাবে।

ফাঁতিনে বলল, কি ভয়ঙ্কর কথা!

একজন বুড়ি কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, দুটো নেপোলিয়ঁ। তোমার ভাগ্য ভাল।

ফাঁতিনে কানে আঙুল দিয়ে পালিয়ে গেল। চিৎকার করে বলতে লাগল, ভাল করে ভেবে দেখ মেয়ে। চল্লিশ ফ্রাঁ। যদি তোমার মনের পরিবর্তন হয় তাহলে আজ সন্ধ্যায় তিলাক দার্জেন্তে আমাকে পাবে।

ফাঁতিনে রাগে আগুন হয়ে একরকম ছুটতে ছুটতে তার বাসায় গিয়ে মার্গারিতেকে সব কথা বলল। সে বলল, এই ঘৃণ্য লোকটাকে কেন ঘুরে বেড়াতে দেয়? ও বলল, আমার উপরকার পাটির দুটো দাঁত তুলে নেবে। আমাকে তাহলে ভয়ঙ্করভাবে বিশ্রী দেখাবে। চুল আবার গজাবে, কিন্তু দাঁত আর বেরোবে না। মানুষ নয়, লোকটা একটা রাক্ষস। তার থেকে জানালা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরা ভাল। ও আবার বলল, তিলাক দার্জেন্তে ওর সঙ্গে সন্ধেবেলায় দেখা হবে।

মার্গারিতে বলল, দাম কত দেবে বলল?

ফাঁতিনে বলল, দুটো নেপোলিয়ঁ বা স্বর্ণমুদ্রা।

মার্গারিতে বলল, তার মানে চল্লিশ ফ্রাঁ?

ফাঁতিনে বলল, হ্যাঁ, চল্লিশ ফ্রাঁ।

চিন্তান্বিত অবস্থায় ফাঁতিনে সেলাই-এর কাজ করতে লাগল। মিনিট পনের কাজ করার পর সে একবার উঠে গিয়ে থেনার্দিয়েরদের চিঠিটা পড়ল। তারপর আবার তার জায়গায় গিয়ে মার্গারিতেকে বলল, আচ্ছা মিলিটারি ফীভারটা কি? তুমি এ রোগের নাম শুনেছ?

মার্গারিতে বলল, হ্যাঁ, একটা রোগ।

এ রোগের জন্য কি অনেক ওষুধ লাগে?

হ্যাঁ, খুব জোরাল ওষুধ দরকার।

কিভাবে রোগটা হয়?

যেমন করে সব রোগ হয়।

মেয়েদের এ রোগ হয়?

এ রোগ ছেলেদেরই বেশি হয়।

এ রোগে মৃত্যু হয়?

প্রায়ই মৃত্যু হয়।

ফাঁতিনে ঘর থেকে বেরিয়ে আবার চিঠিটা পড়তে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় সে বাসা থেকে বেরিয়ে র‍্যু দ্য প্যারিসের দিকে চলে গেল দ্রুত পায়ে।

পরদিন সকালে মার্গারিতে যখন ফাঁতিনের ঘরে ঢুকল তখন দেখল সে বিছানায় শুয়ে নেই। সে মেঝের উপর বসে রয়েছে এক জায়গায় হাঁটু দুটো জড়ো করে এবং বাতিটা জ্বলতে জ্বলতে একেবারে পুড়ে গেছে। মার্গারিতে ফাঁতিনের সঙ্গে সেলাইয়ের কাজ করত বলে রোজ সকালে এসে ফাঁতিনেকে ওঠাত। একই বাতিতে তারা কাজ করত। মার্গারিতে বুঝল সারারাত ঘুমোয়নি ফাঁতিনে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, হা ভগবান! কি হলো তোমার?

ফাঁতিনে বলল, আমার কিছুই হয়নি। আমি এখন সুখী, আমার মেয়ে আর ওষুধ অভাবে মরছে না।

এরপর টেবিলের উপর নামানো দুটো স্বর্ণমুদ্রার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল ফাঁতিনে।

মার্গারিতে বলল, এ তো অনেক টাকা! কোথায় পেলে এত টাকা?

ফাঁতিনে বলল, আমি রোজগার করেছি।

বলতে বলতে হাসল ফাঁতিনে। মার্গারিতে দেখল তার হাসিটা রক্তমাখা। মুখে তখনো রক্ত লেগে ছিল ফাঁতিনের। তার উপরকার পাটিতে দুটো দাঁত ছিল না বলে ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছিল।

টাকাটা মঁতফারমেলে পাঠিয়ে দিল ফাঁতিনে।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে থেনার্দিয়েররা মিথ্যা কথা বলেছিল। কসেত্তের কোনও অসুখ করেনি।

এদিকে চুল আর দাঁত হারিয়ে ফাঁতিনে রেগে আয়নাটা ফেলে দিয়েছিল। তিনতলার একটা ঘরে তাকে থাকতে হত। সেখানে শীত আরও বেশি। ফাঁতিনের কোনও খাট ছিল না। বিছানা বলতে মেঝের উপর একটা তোষক পাতা থাকত। আর একটা ছেঁড়া কম্বল। একটা আধভাঙা চেয়ার ছিল ঘরের এক কোণে। আর একটা জলের বালতি ছিল। তাতে জলটা জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল শীতে। যারা ফাঁতিনের কাছে টাকা পেত সেই সব পাওনাদারেরা রাস্তায় তাকে দেখতে পেলেই শান্তিতে পথ চলতে দিত না। অনেক সময় অনেক পাওনাদার বাসায় এসে তাগাদা করত। গোলমাল ও হৈ-চৈ করত টাকার জন্য। তার জামা ময়লা হয়ে গিয়েছিল। মোজা দুটো ছিঁড়ে গিয়েছিল। ছেঁড়া জামায় তালি বসিয়েছিল। সে প্রায় সারারাত চিন্তা করে আর চোখের জল ফেলে কাটাত। ঘুম হত না। পিঠে আর কাঁধের কাছে একটা ব্যথা অনুভব

করত। খুব কাশি হত। সে পীয়ের ম্যাদলেনকে গভীরভাবে ঘৃণা করত বলে তার বিরুদ্ধে কিছুই বলত না কারো কাছে। সে প্রতিদিন সতের ঘণ্টা করে সেলাই করত, কিন্তু তাতে মাত্র নয় স্যু করে পেত। জেলখানার এক কন্ট্রাকটার তাদের বেতন কমিয়ে দেয়। সতের ঘণ্টা কাজ করে মাত্র নয় স্যু পাওয়ায় তাতে কোনওরকমে খাওয়া ছাড়া আর কিছুই হত না। তার পাওনাদারেরা ক্রমশই অশান্ত হয়ে উঠতে লাগল। তারা আর কোনও কথা শুনতে চায় না। আর সে কি করবে? পাওনাদারদের অবিরাম তাগাদার জ্বালায় সে পশুর মতো হয়ে উঠল। এমন সময় একদিন থেনার্দিয়ের এক চিঠিতে জানাল, সে যদি একশো ফ্রাঁ না পাঠায় তাহলে তারা কসেত্তেকে তাদের বাড়ি থেকে বার করে দেবে। সম্প্রতি রোগ থেকে উঠে দুর্বল অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াবে সে। তাতে সে অবশ্যই মরবে।

একশো ফ্রাঁ কি করে যোগাড় করবে সে? দিনে নয় স্যুর জায়গায় একশো স্যু করে রোজগার করতে হবে তাকে। তবে একটামাত্র পথ আছে। সে ভাবল, ঠিক আছে, আমি তাই করব, আমি এবার আমার দেহ বিক্রি করব।

ফাঁতিনে বারবণিতা হয়ে গেল।

১১

ফাঁতিনের কাহিনী হলো সমাজ একটি মানুষকে কিভাবে চিনে নেয় তার কাহিনী। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, নিঃসঙ্গতা, শীতার্ত অসহায়তা, নিরাপত্তার অভাব, নিরাশ্রয়তা প্রভৃতির হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ কিভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, আত্মবিক্রীত হয় তার এক সকরুণ কাহিনী। দারিদ্র্য তাদের বিলিয়ে দেয় আর সমাজ তাদের হাত বাডিযে নিয়ে নেয়।

আমাদের সমাজ যীশু খৃস্টের উপদেশাবলীর দ্বারা অনুশাসিত হয়। কিন্তু সেটা নামে মাত্র। সে উপদেশ তারা আসলে মেনে চলে না। আমরা বলি ক্রীতদাসপ্রথা ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে চলে গেছে, কিন্তু ক্রীতদাসপ্রথা এখনো আছে এবং সেটা শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই চলে এবং তার নাম হলো বেশ্যাগিরি।

এ প্রথা নারীদের উপর পীড়ন চালায়। তাদের যৌবন, সৌন্দর্য, মাতৃত্ব সব কেড়ে নেয়। অথচ তাতে পুরুষরা কোনও লজ্জা পায় না।

যে অবস্থার মধ্যে ফাঁতিনে এখন পড়েছে তাতে আগেকার সেই ফাঁতিনে নামে সুন্দরী মেয়েটির কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার বাইরের সৌন্দর্য আর অন্তরের সত্তা সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন সে একেবারে যেন পাথর হয়ে গেছে ভিতরে-বাইরে। এখন তাকে স্পর্শ করা মানে হিমশীতল এক পাথরের মূর্তিকে স্পর্শ করা। কোনও লোক এলে তাকে গ্রহণ করে, নিজেকে বিলিয়ে দেয় তার কাছে, কিন্তু মনে মনে তাকে উপেক্ষা করে, ঘৃণার চোখে দেখে। তার ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন শেষ কথা বলে দিয়েছে তাকে। খারাপ যা কিছু ঘটার সব ঘটে গেছে। সে সব দুঃখ জেনে গেছে, সব দুঃখ সহ্য করে সে দেখেছে, শেষ অশ্রুবিন্দুটুকু সে পাত করেছে।

নিদ্রা যেমন প্রসারিত হয়ে চিরনিদ্রা বা মৃত্যুতে পরিণত হয়, তেমনি ভাগ্যের কাছে তার নীরব আত্মসমর্পণ ধীরে ধীরে এক হিমশীতল ঔদাসিন্যে পরিণত হয়। আর সে কোনও দুঃখকষ্টকে ভয় করে না, আর সে কোনও দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ বা মুক্তি পাবার ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না। এখন যদি সমস্ত আকাশটা তার মাথায় ভেঙে পড়ে, সমুদ্রতরঙ্গ যদি ছুটে এসে তাকে গ্রাস করে তাহলেও তাতে তার কিছু যায় আসে না।

এখন ফাঁতিনের মনে হয় ভাগ্যের বিধানে পাওয়া দুঃখ আমরা ভোগ করে কখনো করতে পারি না একথা মনে করা ভুল। ভাগ্য যত দুঃখই দিক না কেন, আমরা তা ভোগ করতে পারি, অপরিসীম আমাদের সহনশক্তি। ভাগ্যের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সহনশক্তিও অবশ্যই বেড়ে যায়।

কিন্তু এই ভাগ্য কি? কোথায় আমাদের নিয়ে যায় সে ভাগ্য? এই ভাগ্য কারো উপর সুপ্রসন্ন আর কারো উপর অপ্রসন্ন হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ঈশ্বরই দিতে পারেন।

১২

মন্ত্রিউল-সুর-মেরের মতো ছোট শহরে একশ্রেণীর যুবক আছে যারা তাদের বছরে পনের হাজার ফ্রাঁ বাজে খরচ করে উড়িয়ে দেয়। প্যারিসের পীয়ার বা জমিদাররা বছরে আড়াই হাজার ফ্রাঁ বাজে খরচ করে। এই ধরনের লোকরা সাধারণত বড় অপদার্থ এবং অলস প্রকৃতির হয়। তারা কোনওরকমে একবার কিছু টাকা রোজগার করলেই হোটেলে ঘুরে বেড়ায় আর বড় বড় কথা বলে। তারা কখনো শিকার করে, কখনো বিলিয়ার্ড খেলে আর যখন-তখন মদ খায়। আসলে সারা জীবনের মধ্যে ভাল-মন্দ কাজই করে না, শুধু বাজে কাজে ঘুরে বেড়িয়ে জীবনটাকে নষ্ট করে।

মঁসিয়ে ফেলিক্স থোলোমায়েস যদি প্যারিসে না এসে গাঁয়েই াকত তাহলে ঐ ধরনের এক অলস ভবঘুরে হয়ে উঠত। তবে এই ধরনের লোক গরীব হলে তাকে ভবঘুরে বলত আর ধনী হলে বলত অমিতব্যয়ী ভদ্রলোক। এই ধরনের লোকরা মোচ রাখত। গাঁয়ের ভবঘুরেরা বেশি বড় বড় মোচ রাখত। তারা হাতে একটা করে ছড়ি রাখত এবং নাটকীয় ঢঙে কথা বলত।

সে যুগে স্পেনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধ চলছিল। মোরিলোর সঙ্গে লড়াই চলছিল বলিভার। যারা ছোট কানাওয়ালা টুপি পরত আর রাজতন্ত্রের সমর্থনে কথা বলত তাদের বলা হত মোরিলো। আর যারা উদারনীতিভাবাপন্ন ছিল আর চওড়া কানাওয়ালা টুপি পরত তাদের বলা হত বলিভার।

যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে তার আট-দশ ..স পরে ১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমে কোনও এক তুষারাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় এক অলস ভবঘুরে ধনী অফিসারদের এক কাফেতে ভাল পোশাক আর মোরিলোদের মতো টুপি পরে একটি মেয়ের সঙ্গে বসে কথা বলছিল। মেয়েটি একটি লো-কাট গাউন পরেছিল আর তার মাথায় ফুল গোঁজা ছিল।

ভদ্রলোক ধূমপান করছিল। তখনকার দিনে ধূমপান খুব সৌখীনতার পরিচায়ক ছিল। লোকটি মেয়েটার মুখে বারবার ধোঁয়া ছাড়ছিল আর ঠাট্টা করে কি সব বলছিল। মেয়েটির মুখখানা বিষণ্ন ছিল। সে তখন ক্লান্ত ও অবসন্ন থাকায় সে গ্রাহ্য করছিল না লোকটাকে।

ওরা কাফের বাইরে তুষারপাতের মধ্যেই বেড়াচ্ছিল। লোকটি যখন দেখল মেয়েটি তাকে তেমন গ্রাহ্য করছে না তখন পথ থেকে একমুঠো বরফ কুড়িয়ে মেয়েটির অনাবৃত ঘাড়ের উপব দিয়ে দিল। লোকটির নাম ছিল মঁসিয়ে বামাতাবয। মেয়েটি একবার জোরে চিৎকার করে উঠে তার হাতের নখ দিযে লোকটার মুখটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিতে লাগল। সে বাঘিনীর মতো উগ্র রূপ ধারণ করল। তার ফোকলা মুখ থেকে যত সব নোংরা গালাগালি বার হতে লাগল। মেয়েটি হলো ফাঁতিনে।

গোলমাল শুনে কাফের ভিতর থেকে অফিসাররা ছুটে এল। ধস্তাধস্তি করতে থাকা একজন নারী আর একজন পুরুষকে ঘিরে একদল জড়ো হযে হাসাহাসি করতে লাগল। লোকটা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল আর ফাঁতিনে তাকে চড-লাথি মারছিল আর চিৎকার করছিল উন্মাদের মতো।

সহসা ভিড়ের মধ্য থেকে একজন লম্বা লোক এগিয়ে এসে ফাঁতিনের একটা হাত ধরে ফেলল। ফাঁতিনের পোশাকের উপর কাদা লেগে ছিল। যে লোকটি ফাঁতিনের হাত ধরেছিল সে তাকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এস। লোকটিকে দেখে চুপ করে গেল ফাঁতিনে। প্রচণ্ড রাগে আগুন হয়ে থাকা মুখখানা সহসা ম্লান হযে গেল আর ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে চিনতে পেরেছিল লোকটি জেভার্ত, পুলিশের লোক।

সুযোগ বুঝে মঁসিয়ে বামাতাবয় এক ফাঁকে তাড়াতাড়ি পালিযে গেল।

১৩

কৌতূহলী দর্শকদের ভিড় সরিয়ে জেভার্ত ফাঁতিনেকে টানতে টানতে কাছাকাছি একটা পুলিশ ফাঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ফাঁতিনে কোনও বাধা দিল না। কেউ কোনও বাধা দিল না। দর্শকরা আনন্দে চিৎকার করতে করতে তাদের অনুসরণ করতে লাগল। দর্শকদের কুৎসিত আনন্দ দেখে চরম অপমান আর লজ্জাবোধ করতে লাগল ফাঁতিনে।

পুলিশ ফাঁড়ি রাস্তার ধারে একটা ঘর। ঘরের দরজাটা ছিল রাস্তার দিকে। ঘরের ভিতর একটা স্টোভ জ্বলছিল। ঘরের ভিতর ফাঁতিনেকে নিয়ে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল জেভার্ত। এতে দর্শকরা হতাশ হলো। দর্শকরা ঘাড উঁচু করেও কিছু দেখতে পেল না।

ঘরের এক কোণে ফাঁতিনে গিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত এক জন্তুর মতো বসে রইল। অফিসে যে সার্জেন্ট কর্তব্যরত ছিল সে একটা বাতি জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখল। জেভার্ত পকেট থেকে একটা সাদা কাগজ বার করে কি লিখতে লাগল।

দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে এই ধরনের মেয়েরা সম্পূর্ণ পুলিশের দয়ার

উপর নির্ভর করে। পুলিশ তাদের যে কোনও শাস্তি দিতে পারে, তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা একেবারে কেড়ে নিতে পারে। জেভার্তের মনে চিন্তার আলোড়ন চলতে থাকলেও তার মুখে কোনও আবেগের চিহ্নমাত্র ছিল না। এসব ক্ষেত্রে সে পুরোপুরি তার বিবেকের নির্দেশে চলতে পারে, কোনও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও নির্দেশ চাইতে হবে না। এই অফিসের চেয়ারটাই হলো বিচারপতির আসন। এই চেয়ারে বসেই সে আসামীর বিচার করে রায় দেবে। সে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখল এটা একটা অপরাধ। মঁসিয়ে বামাতাবয় তার চোখে সমাজের এমনই এক গণ্যমান্য লোক যিনি এক তিনতলা বাড়ির মালিক এবং যাঁর ভোটাধিকার আছে। এই ধরনের এক বিশিষ্ট নাগরিককে সমাজবহির্ভূতা এক বারবণিতা মারধোর করেছে। জেভার্ত নিজে তা দেখেছে। সে আপন মনে লিখে যেতে লাগল।

তার লেখা শেষ হলে তাতে সই করে কাগজটা ভাঁজ করে সার্জেন্টের হাতে দিয়ে বলল, রক্ষীকে দিয়ে এই মেয়েটাকে জেলে পাঠিয়ে দাও।

এরপর সে ফাঁতিনের দিকে ঘুরে বলল, তোমাকে ছয় মাসের জন্য জেলে যেতে হবে।

নিবিড় হতাশার সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, ছয় মাস! ছয় মাস জেল! সারাদিনের খাটুনির বিনিময়ে মাত্র সাত স্যু? কসেত্তের কি হবে? আমার মেয়ের কি হবে? মঁসিয়ে ইনস্পেকটার, আপনি কি জানেন থেনার্দিয়েরের কাছে আমার একশো ফ্রাঁ ঋণ আছে?

জোড়হাত করে মেঝের উপর নতজানু হয়ে বসল ফাঁতিনে। তারপর বলতে লাগল, মঁসিয়ে জেভার্ত, আমাকে দয়া করুন। এটা আমার দোষ নয়। আপনি যদি জানতেন ব্যাপারটার মূল কারণটা কি। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমার কোনও দোষ নেই। একজন ভদ্রলোক যাকে আমি চিনি না, আমার ঘাড়ের উপর বরফ দেয়। আপনি দেখছেন আমার শরীর ভাল নেই। তারপর সে যত সব অবাঞ্ছিত অন্যায় কথা বলতে থাকে। সে বলে আমি দেখতে কুৎসিত এবং আমার দাঁত নেই, যেন আমি এসব জানি না। কিন্তু আমি কিছু বলিনি। আমি ভাবছিলাম ও আমাকে ঠাট্টা করছে। আমি নীরবে হাঁটছিলাম এমন সময় আমার ঘাড়ের উপর বরফ চাপিয়ে দেয়। মঁসিয়ে জেভার্ত, যা ঘটেছিল তা বলার মতো কি কেউ নেই? আমার অবশ্য রেগে যাওয়াটা অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে, যদি কেউ অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার ঘাড়ের উপর বরফ চাপিয়ে দেয় তাহলে আপনি নিশ্চয় আত্মবিস্মৃত হয়ে সব সংযম হারিয়ে ফেলতেন। ভদ্রলোকের টুপিটা নষ্ট করে দেওয়া আমার উচিত হয়নি। কিন্তু উনি কেন পালিয়ে গেলেন? উনি থাকলে আমি ক্ষমা চাইতাম, যদিও ক্ষমা চাওয়ার মন আমার নেই। মঁসিয়ে জেভার্ত, এবারকার মতো আমাকে ছেড়ে দিন। আমার মনে হয় আপনি জানেন না জেলখানার খাটুনির জন্য প্রতিদিন মাত্র সাত স্যু করে দেওয়া হয়। আমার একশো ফ্রাঁ ধার আছে এবং তা না দিতে পারার জন্য আমার বাচ্চা মেয়েকে পথে বার করে দেওয়া হবে। অবশ্য

সাত স্যু করে দেওয়াটা সরকারের দোষ তা বলছি না। তবে আমার এই অবস্থা। ঈশ্বর আমায় দয়া করুন। আমার মেয়েকে আমি এখন কাছে রাখতে পারি না। আমি যে ধরনের জীবন যাপন করি তাতে তাকে কাছে রাখা যায় না। আমার সন্তানের কি হবে? হোটেলমালিক থেনার্দিয়েররা ভাল লোক নয়, ওদের দয়ামায়া বা কোনও যুক্তিবোধ নেই, ওরা শুধু টাকা চায়। আমাকে জেলখানায় পাঠাবেন না। এই শীতে ওরা আমার সন্তানকে তাড়িয়ে দেবে। একটু ভেবে দেখবেন মঁসিয়ে জেভার্ত। ও যদি বড় হত তাহলে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জন করতে পারত। কিন্তু ওর বয়স এত কম যে তা পারবে না। আমি সত্যি সত্যিই খারাপ নই। অবশ্য লোভ-লালসার জন্য আমার এ অবস্থা হয়নি। আমি অবশ্য মাদক বা নেশার পিল খাই, কিন্তু দুঃখের চাপে পড়েই তা খাই, কারণ তা আমার মনের দুশ্চিন্তাটা কাটিয়ে দেয়। আমি যে সব পোশাক পরতাম তা দেখলে আপনি বুঝতে পারতেন আমি হালকা প্রকৃতির মেয়ে ছিলাম না বা উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করতাম না। আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লিনেনের তৈরি ভদ্র পোশাক পরতাম। আমাকে দয়া করুন মঁসিয়ে জেভার্ত।

আধখোলা বুকের উপর হাত দুটো জড়ো করে নতজানু হয়ে কথা বলছিল ফাঁতিনে আর মাঝে মাঝে কাশছিল। তার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। চরম দুঃখ থেকে এমন এক জ্যোতি নির্গত হয় যা যে কোনও মানুষের অসহায় ও শোচনীয় অবস্থাকেও কিছুটা রূপান্তরিত করে তোলে। ফাঁতিনে যখন সামনের দিকে ঝুঁকে জেভার্তের কোটের প্রান্তভাগটাকে তার ঠোঁটের উপর ঠেকিয়ে কথা বলছিল তখন তাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার মর্মবিদারক কথা শুনে যে কোনও পাথরের অন্তর গলে যেত, কিন্তু কাঠের অন্তর কখনো গলে না।

জেভার্ত বলল, আমি তোমার সব কথা শুনেছি। আর কিছু তোমার বলার আছে? এবার তুমি যেতে পার। তোমাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতেই হবে। স্বয়ং পরম পিতা ঈশ্বরও এ দণ্ড মকুব করতে পারবেন না।

পরম পিতার নাম শুনে ফাঁতিনে বুঝল জেভার্তের দেওয়া দণ্ড চূড়ান্ত। সে মেঝের উপর পড়ে গেল। তার মুখ থেকে শুধু একটা কথা বেরিয়ে এল, দয়া, দয়া করো।

জেভার্ত তার দিকে পিছন ফিরল এবং দু'জন পুলিশ ফাঁতিনেকে নিয়ে যাবার জন্য ধরল।

কয়েক মিনিট আগে একজন লোক সকলের অলক্ষ্যে ঘরে ঢুকে নীরবে দাঁড়িয়ে ফাঁতিনের দুঃখের কথা শুনছিল। ফাঁতিনের কাতর আবেদনের সব কথা শুনেছিল সে। পুলিশরা যখন ফাঁতিনেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে এগিয়ে এল। সে জেভার্তকে লক্ষ্য করে বলল, একমুহূর্ত একটু অপেক্ষা করবেন?

জেভার্ত মুখ ফিরিয়ে দেখল, মঁসিয়ে ম্যাদলেন কথা বলছে। সে টুপিটা খুলে একটু নত হয়ে বলল, মাপ করবেন মঁসিয়ে মেয়র।

ম্যাদলেনের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল ফাঁতিনে। সে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাদলেনের সামনে এসে বলল, তুমিই মেয়র?

পাগলের মতো হাসতে হাসতে ম্যাদলেনের মুখের উপর থুতু ফেলল।

ম্যাদলেন তার মুখ থেকে থুতুটা মুছে বলল, ইনস্পেকটার জেভার্ত, এই মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে হবে। কথাটা শুনে জেভার্তের মনে হলো সে পাগল হয়ে যাবে। এমন সব ভয়ঙ্কর আবেগের আঘাতে তার অন্তর আন্দোলিত হতে লাগল যা এর আগে কখনো সে অনুভব করেনি। শহরের একটা সামান্য মেয়ে মুখের উপর থুতু ফেলবে এটা তার কল্পনাতীত। এটা সে ভাবতেই পারে না। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা হলো হয়ত এই মেয়েটির সঙ্গে মেয়রের একটা অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং মেয়র নিজেই প্রকটিত করে তুললেন সেই গোপন সম্পর্কটা। কিন্তু যখন সে দেখল মেয়র শান্তভাবে মুখ থেকে থুতু মুছে মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে বলল তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

ফাঁতিনেও কম আশ্চর্য হয়নি। সে গলার স্বরটাকে নিচু করে বলতে লাগল, আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে? ছয় মাস জেলভোগ করতে হবে না? কিন্তু কথাটা কে বলল? একথা কেউ বলতে পারে না। আমি নিশ্চয় ভুল শুনেছি। একথা নিশ্চয় ঐ দানব মেয়র বলেনি। হে সদাশয় মঁসিয়ে জেভার্ত, আপনিই কি বললেন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি সব কথা বলব, তাহলে আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন। এই সব কিছু ঐ শয়তান মেয়রটার জন্যই হয়েছে। কয়েকজন মেয়ের কথা শুনে ও আমায় চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেয়। এক সৎ মেয়ে-শ্রমিককে অকারণে বরখাস্ত করাটা কি এক ঘৃণ্য কাজ নয়? চাকরি না থাকার জন্য আমি কিছু রোজগার করতে পারতাম না এবং তার থেকেই যত বিপত্তির উৎপত্তি হয়! তবে পুলিশেরও কিছু করার আছে। জেলখানার কন্ট্রাকটাররা কম টাকায় বাইরের গরীব মেয়েদের বেশি খাটিয়ে অবিচার করে তাদের প্রতি। এটা পুলিশ বন্ধ করতে পারে। আগে আমরা জামা সেলাই করে দিনে বারো স্যু করে পেতাম। পরে ওরা তা কমিয়ে নয় স্যু করে। আমার মেয়ে কসেত্তের কথা আমায় ভাবতে হত, তাই আমাকে কুপথে নামতে হয়। তাহলে এবার দেখতে পাচ্ছেন মেয়রই এই সব কিছুর মূলে? ঘটনাক্রমে আমি ঐ কাফের বাইরে ভদ্রলোকের টুপিটা ঘুষি মেরে খারাপ করে দিই, কারণ আমার ঘাড়ে বরফ চাপিয়ে দিয়েছিল। আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই কারো ক্ষতি করতে চাইনি। আমার থেকে কত খারাপ মেয়ে ভাল অবস্থার মধ্যে আছে। আপনি সবাইকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমার বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন আমি নিয়মিত ভাড়া দিয়ে যাই। আমি সৎ।

মঁসিয়ে ম্যাদলেন এতক্ষণ ফাঁতিনের সব কথা মন দিয়ে শুনছিল। ফাঁতিনে যখন কথা বলছিল তখন সে তার পকেট থেকে টাকার ব্যাগটা বার করে। কিন্তু দেখে ব্যাগটা খালি। পকেটের মধ্যে ব্যাগটা রেখে সে ফাঁতিনেকে বলল, কত টাকা তোমার দেনা আছে বললে?

ফাঁতিনে এতক্ষণ জেভার্তকে লক্ষ্য করে কথা বলছিল। সে এবার মুখ ফিরিয়ে ম্যাদলেনকে বলল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি?

ফাঁতিনে এবার জেভার্তকে বলল, আপনি দেখলেন আমি ওর মুখের উপর থুতু ফেলেছি।

এবার ম্যাদলেনের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি অসভ্য, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছ। কিন্তু তোমার ভয়ে আমি ভীত নই। আমি শুধু মঁসিয়ে জেভার্তকে ভয় করি।

ফাঁতিনে এবার জেভার্তকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করাই উচিত। আমি জানি, আপনি ভাল লোক। আসলে ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। একটা লোক একটি মেয়ের ঘাড়ে বরফ দেয় আর তা নিয়ে অফিসাররা হাসাহাসি করে। মেয়েদের এসব সহ্য করতে হয়। তার পর আপনি এলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই আপনাদের কর্তব্য। আমি গোলমাল করায় আপনি আমাকে ধরে নিয়ে এলেন। তারপর আমার কাতর আবেদন শুনে আমার মেয়ের কথা ভেবে আমার উপর দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিলেন। আপনি আমাকে বলতে পারেন, এ কাজ আর কখনো করো না। আমি বলছি এ কাজ আর কখনো আমি করব না। শুধু এবারকার মতো আমাকে ক্ষমা করুন। আচমকা বরফটা দেওয়ায় আমার মেজাজটা গরম হয়ে ওঠে। আমার শরীরটা ভাল নেই। আমার কাশি হচ্ছে। ভিতরটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখতে পারেন।

আর কাঁদছিল না ফাঁতিনে। তার চোখে জল ছিল না। তার কণ্ঠটা শান্ত ও নরম ছিল। সে জেভার্তের রুক্ষ হাতটা টেনে নিয়ে তার গলার উপর রাখল। তারপর আলুথালু পোশাকটা ঠিক করে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পুলিশদের বলল, ইনস্পেকটার আমাকে যেতে বলেছেন।

দরজার খিলটা খুলতেই একটা শব্দ হলো।

জেভার্ত এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে মেঝের উপর দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়েছিল অন্য মনে। তার কোনও কিছু খেয়াল ছিল না। খিল খোলার শব্দে তার চমক ভাঙল। হিংস্র জন্তুর মতো সে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে চোখ তুলে তাকাল ফাঁতিনের দিকে।

জেভার্ত পুলিশদের বলল, সার্জেন্ট, দেখছ না মেয়েটা পালাচ্ছে? কে তাকে যেতে বলেছে?

ম্যাদলেন বলল, আমি বলেছি।

জেভার্তের কথা শুনে ফাঁতিনে দরজার খিল ছেড়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল। যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

ম্যাদলেনের কথা শুনে সে এবার তার পানে তাকাল। তার বিস্মিত ব্যথাহত চোখের দৃষ্টি পালাক্রমে জেভার্ত আর ম্যাদলেনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

জেভার্ত যখন সার্জেন্টকে কড়া গলায় হুকুম দিয়েছিল তখন সে কি মেয়রের উপস্থিতির কথা জানত না? অথবা সে কি মনে ভেবেছিল এ ধরনের কথা মেয়রের মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলতে পারেন না এবং যেন ভুল করে একথা বলে ফেলেছেন? সে কি ভেবেছিল এই মুহূর্তে সমস্ত নীতি, ন্যায়বিচার, সরকার, আইন, সমাজ সব মূর্ত হয়ে উঠেছে শুধ তারই মধ্যে?

সে যাই হোক, মঁসিয়ে ম্যাদলেনের কথা শুনে জেভার্ত এবার তার দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ঠোঁটটা নীল হয়ে উঠেছিল। এক মৃদু কম্পনে শরীরটা কাঁপছিল তার। চোখ দুটো নামিয়ে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সে বলল, মঁসিয়ে মেয়র, তা তো হতে পারে না।

মঁসিয়ে ম্যাদলেন বলল, কেন হতে পারে না ?

জেভার্ত বলল, কারণ এক নারী একজন বিশিষ্ট নাগরিককে অপমান করেছে।

ম্যাদলেন শান্ত কণ্ঠে বলল, শুনুন ইনস্‌পেকটার জেভার্ত, আমি জানি আপনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি, ব্যাপারটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। আসল ঘটনাটা হলো এই। আপনি যখন একে ধরে আনছিলেন আমি তখন রাস্তা পার হচ্ছিলাম। তখন সেখানে কিছু লোক দাঁড়িয়েছিল। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি কি হয়েছে। আমি সব কথা শুনেছি। যে নাগরিককে এ অপমান করেছে দোষটা তার। আইন অনুসারে তাকেই গ্রেপ্তার করা উচিত।

জেভার্ত জোর দিয়ে বলল, কিন্তু এই শহরের মেয়র আপনাকেও অপমান করেছে।

ম্যাদলেন বলল, সেটা আমার অপমান, আমার এক ধরনের সম্পত্তি। আমি তা নিয়ে যা খুশি করতে পারি।

জেভার্ত বলল, মাপ করবেন মঁসিয়ে মেয়র। অপমান শুধু আপনাকে নয়, ন্যায়বিচারকেই ও অপমানিত করেছে।

বিবেকই সবচেয়ে বড় বিচারক মঁসিয়ে জেভার্ত। আমি মেয়েটির সব কথা শুনেছি এবং আমি কি করেছি আমি তা জানি।

আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না মঁসিয়ে মেয়র।

তাহলে আমার কথামতো কাজ করুন।

আমাকে আমার কর্তব্য করতে হবে। আমার কর্তব্য হলো ওকে ছয় মাসের জন্য জেলে পাঠানো।

ম্যাদলেন তবু শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। ও একদিনের জন্যও জেলে যাবে না।

ম্যাদলেনের কথাগুলোতে জেভার্ত আরও সাহস পেয়ে গেল। সে শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্যাদলেনের পানে তাকিয়ে বলতে লাগল, মেয়রের সঙ্গে এ ব্যাপারে তর্ক করতে আমার বড় খারাপ লাগছে। এ ধরনের ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। কিন্তু আমি মঁসিয়ে মেয়রকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি আমার ক্ষমতা অনুসারেই কাজ করছি। নাগরিকদের স্বার্থ দেখাই আমাদের কাজ। আমি সেখানে ছিলাম। মেয়েটি মঁসিয়ে বামাতাবয়কে মারধোর করেছে। মঁসিয়ে বামাতাবয় একজন নাগরিক, নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকায় তাঁর নাম আছে, এক তিনতলা বাড়ির মালিক। এ ব্যাপারটা পুলিশ আইনের আওতায় পড়ে। আমি তাই ফাঁতিনেকে ধরেছি।

এ কথায় মঁসিয়ে ম্যাদলেন হাত দুটো জড়ো করে এমন গলায় কথা বলতে লাগল যা এর আগে কেউ কখনো শোনেনি। সে বলল, আপনি যে আইনের কথা বললেন

সেটা মিউনিসিপ্যাল পুলিশের আইন এবং সেটা হলো অপরাধবিধির নয়, এগার, পনের আর ছেষট্টি ধারা এবং তার উপর আমার পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। আমি সেই ধারাবলে মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে বলছি।

জেভার্ত একবার শেষ চেষ্টা করে দেখল। বলল, কিন্তু মঁসিয়ে মেয়র—

ম্যাদলেন বলল, আমি আপনাকে ১৭৯৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর পাশ করা আইনের একাশি ধারার কথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যাতে কাউকে আটক রাখা যায়।

আমার কথা শুনুন মঁসিয়ে মেয়র।

খুব হয়েছে। এটাই যথেষ্ট বলে মনে করি।

কিন্তু—

আপনি দয়া করে এখান থেকে চলে যান।

জেভার্ত একজন কর্তব্যরত রুশ সৈনিকের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মাথাটা একবার নুইয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফাঁতিনে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল আর শুনছিল। সে আশ্চর্য হয়ে জেভার্তের যাবার পথ করে দিল।

তার অন্তরেও তখন জোর আলোড়ন চলছিল। সে দেখেছে তাকে নিয়ে দু'জন পদস্থ লোকের কত তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এই দু'জন লোকের উপর তার স্বাধীনতা, তার মেয়ের জীবন নির্ভর করছিল। একজন তাকে গভীরতর অন্ধকারে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল আর একজন তাকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে চাইছিল। সে ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করছিল এই দু'জন শক্তিশালী পুরুষ দৈত্যের মতো বাকযুদ্ধ করছিল—একজন দৈত্যের মতো কথা বলছিল আর একজন দেবদূতের মতো কথা বলছিল। অবশেষে দেবদূতই জয়লাভ করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, যে দেবদূত তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে সে হলো তার চোখে সেই ঘৃণ্য মেয়র যাকে সে তার সকল দুঃখকষ্টের মূল কারণ হিসাবে ভেবে এসেছে। সে অপমান করা সত্ত্বেও সেই মেয়রই তাকে উদ্ধার করল। তবে সে কি অন্যায় করেছে? তবে কি তার অন্তরের পরিবর্তন করতে হবে? সে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল আর ম্যাদলেনের পানে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। ক্রমে ম্যাদলেনের প্রতি তার ঘৃণার পাথরটা গলে যেতে লাগল। তার পরিবর্তে এক শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের অনুভূতি জাগতে লাগল।

জেভার্ত চলে গেলে ম্যাদলেন এবার ফাঁতিনের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, তুমি যা বলেছ আমি সব শুনেছি। আমাকে এ সব কথা জানানো হয়নি। তবু আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। আমি জানতামই না তুমি কাজ ছেড়ে দিয়েছ। তুমি আমার কাছে গিয়ে আবেদন করনি কেন? যাই হোক, আমি তোমার ঋণ শোধ করে দেব এবং তোমার মেয়েকে আনার অথবা তার কাছে তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। তুমি এখানে থাকবে অথবা প্যারিসে ইচ্ছা করলে যেতে পারবে। তুমি না চাইলে তোমাকে কাজ করতে হবে না, তোমার যা টাকা লাগবে আমি দেব। তুমি আবার সৎভাবে জীবন যাপন করে সুখী হতে পারবে। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি হয় এবং তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই—তাহলে তুমি ঈশ্বরের চোখে সৎ এবং খাঁটি।

ফাঁতিনে আর সহ্য করতে পারছিল না। সে কসেত্তেকে ফিরে পাবে। বর্তমানের এই ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি পাবে। সে স্বাধীনভাবে কসেত্তেকে নিয়ে সুখে জীবন যাপন করতে পারবে। তার দুঃখের অন্ধকারে এই স্বর্গসুখের সম্ভাবনা সহ্য করতে পারছিল না সে। সে শুধু অবাক হয়ে ম্যাদলেনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার পা দুটো কাঁপছিল। সে কোনওরকমে নতজানু হয়ে ম্যাদলেনের একটা হাত টেনে নিয়ে তার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল।

তারপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল ফাঁতিনে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

মঁসিয়ে ম্যাদলেন ফাঁতিনেকে কারখানার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে নার্সদের দেখাশোনা করতে বলল। তার গায়ে তখন দারুণ জ্বর এবং রাত্রিতে প্রলাপ বকতে লাগল জ্বরের ঘোরে। পরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন দুপুরে তার ঘুম ভাঙলে সে বুঝতে পারল তার বিছানার পাশে কার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মশারিটা একটু তুলে দেখল মঁসিয়ে ম্যাদলেন তার মাথার দিকের দেওয়ালের উপর একটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির তলায় দাঁড়িয়ে বেদনার্ত দৃষ্টিতে সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে।

এখন ফাঁতিনের চোখে মঁসিয়ে ম্যাদলেন একেবারে বদলে গেছে। তার মনে হচ্ছিল ম্যাদলেনের গোটা চেহারাটা এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। ফাঁতিনে কোনও বাধা সৃষ্টি না করে ম্যাদলেনের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। অবশেষে সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি করছেন?

ম্যাদলেন সেইখানে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েছিল। ফাঁতিনের ঘুম ভাঙার জন্য অপেক্ষা করছিল সে। ফাঁতিনের ঘুম ভেঙেছে দেখে তার হাতটা ধরে নাড়ী টিপে বলল, এখন কেমন আছ?

ফাঁতিনে বলল, এখন ভাল বোধ করছি। আমার ঘুম ভাল হয়েছে। আমার মনে হয় আমি ভাল হয়ে গেছি। মারাত্মক কিছু হয়নি।

ম্যাদলেন এবার ফাঁতিনের প্রশ্নটার জবাব দিয়ে বলল, আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করছিলাম।

গতকাল রাত থেকে আজকের সারা সকাল ফাঁতিনে সম্বন্ধে সব খবরাখবর সংগ্রহ করেছে। তার সকরুণ জীবনকাহিনীর সব জেনেছে। সে বলল, তুমি বড় কষ্ট ভোগ করেছ মেয়ে। তবে আর কোনও কষ্ট তোমার থাকবে না। সব ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে। এইভাবে যে দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে মানুষ সেন্ট হয় তার জন্য অপরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। যে নরকযন্ত্রণা তুমি ভোগ করেছ সে নরকই স্বর্গের দ্বারপথ। সেই নরকের মধ্য দিয়ে তোমাকে স্বর্গে যেতে হবে।

ম্যাদলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ফাঁতিনে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

গতরাত্রিতেই জেভার্ত একটা চিঠি নিয়ে সকাল হতেই ডাকঘরে যায় চিঠিটা ফেলতে। চিঠিটা প্যারিসের পুলিশ বিভাগের সচিবের কাছে লেখা। পুলিশ ফাঁড়িতে গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে তা শহরে জানাজানি হয়ে যায়। তাই সে ডাকঘরে চিঠি ফেলতে গেলে ডাকঘরের লোকরা ভাবল সে পদত্যাগপত্র পাঠাচ্ছে।

মঁসিয়ে ম্যাদলেন থেনার্দিয়েরকে একখানি চিঠি দিল। সে তিনশো ফ্রাঁ পাঠিয়েছে। চিঠিতে লিখে দিল একশো ফ্রাঁ ঋণের টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকায় সে ফাঁতিনের মেয়েকে দিয়ে যাবে মন্ত্রিউলে।

সে চিঠি পেয়ে থেনার্দিয়ের আশ্চর্য হয়ে গেল। সে বলল, হা ভগবান! মেয়েটাকে এখন পাঠানো চলবে না। এ যে দেখছি সোনার খনি। বুঝতে পেরেছি কি হয়েছে। মনে হয় কোনও ধনী লোক ওর মার প্রেমে পড়েছে।

থেনার্দিয়ের চিঠির জবাবে মোট পাঁচশো ফ্রাঁ দাবি জানাল। লিখল ডাক্তার দেখাতে ও তার রোগ সারাতে অনেক খরচ হয়েছে। আসলে ওর মেয়েদের ডাক্তার খরচের সব বিলগুলোর কথা উল্লেখ করল। শেষে তিনশো ফ্রাঁ পেয়েছে সেটাও জানাল।

ম্যাদলেন আরও তিনশো ফ্রাঁ পাঠিয়ে কসেত্তেকে তাড়াতাড়ি পাঠাতে লিখে দিল।

থেনার্দিয়ের তা পেয়ে বলল, বয়ে গেছে আমাদের পাঠাতে।

এদিকে ফাঁতিনে তখনো হাসপাতালেই ছিল। তার রোগ সারেনি। হাসপাতালের নার্সরা প্রথমে ঘৃণার চোখে দেখত ফাঁতিনেকে। এই সব অধঃপতিত মেয়েদের তারা ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু ফাঁতিনের নম্র স্বভাব এবং ভদ্র আচরণ দেখে নার্সরা সন্তুষ্ট হলো। তাছাড়া তারা যখন দেখল ফাঁতিনে এক সন্তানের জননী তখন তাদের মমতা হলো তার উপর। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার সময় ফাঁতিনে একবার বলে, আমি পাপ করেছি ঠিক, কিন্তু আমার সন্তান আমার কাছে এলে বুঝব ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছে। আমি নোংরা জীবন যাপন করার জন্যই তাকে কাছে রাখতে পারিনি। আমি তার জন্যই, তার ব্যয়ভার বহনের জন্যই কুপথে নেমেছি। সে এখানে এলে বুঝব ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। তার নিষ্পাপ মুখ দেখে আমি জোর পাব মনে। আমার জীবনে কি ঘটেছে না ঘটেছে তার কিছুই জানে না সে। দেবদূতের মতো সরল নিষ্পাপ সে। তার বয়সে আমাদেরও দেবদূতের মতো পাখা ছিল।

দিনে দু'বার করে ম্যাদলেন হাসপাতালে এসে দেখা করত ফাঁতিনের সঙ্গে। সে দেখতে এলেই ফাঁতিনে জিজ্ঞাসা করত, কসেত্তে কখন আসবে?

ম্যাদলেন বলত, সম্ভবত কাল। যে কোনও সময়েই সে এসে পড়তে পারে।

একথা শুনে ফাঁতিনের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

কিন্তু ফাঁতিনের অবস্থা মোটেই ভালর দিকে যাচ্ছিল না। বরং দু' এক সপ্তা যেতেই তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। তার ঘাড়ের উপর লাগানো একমুঠো বরফের হিম তার অস্থিমজ্জার ভিতরে ঢুকে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত পুরনো সব রোগ ঠেলে এনেছে। অধ্যাপক লেনেক অনেক করে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করতে লাগলেন।

রোগ পরীক্ষা হলে ম্যাদলেন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলেন?

ডাক্তার বলল, তার কি কোনও সন্তান আছে?

ম্যাদলেন বলল, তার একটি কন্যা সন্তান আছে।

তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারেন তাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করুন।

ম্যাদলেন ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু ফাঁতিনে তাকে ডাক্তার কি বলল তা জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, ডাক্তার জোর করে হেসে বলল তোমার মেয়ে তোমার কাছে এলেই রোগ সেরে যাবে।

ফাঁতিনে বলল, ডাক্তার ঠিকই বলেছেন। থেনার্দিয়েররা কেন এখনো কসেত্তেকে রেখে দিয়েছে? কবে সে ঠিক এসে যাবে? তাহলে আমি খুব সুখী হব।

কিন্তু থেনার্দিয়েররা যত সব আজেবাজে কারণ দেখিয়ে আটকে রেখে দিয়েছিল কসেত্তেকে। তারা লিখল, এখনো ছোটখাটো অনেক দেনা আছে, তার হিসাব তারা তৈরি করছে। তাছাড়া অসুখের পর সে এখন পথ হাঁটতে পারবে না এই শীতকালে।

ম্যাদলেন আবার একটা চিঠি লিখল ফাঁতিনের কথামতো। তারপর চিঠিটার শেষে ফাঁতিনের সইটা করিয়ে নিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। আমরা আমাদের জীবনের রহস্যময় উপাদানগুলোকে নাড়াচাড়া করে জীবনকে যেভাবেই গড়ে তুলতে চাই না কেন, ভাগ্যের কুটিল বিধান সব ওলটপালট করে দেয়।

২

সেদিন সকালে তার অফিসে বসে কতকগুলো জরুরি কাজ সেরে নিচ্ছিল ম্যাদলেন। যদি তাকে মঁতফারমেলে যেতে হয় তার জন্য কাজগুলো সেরে রাখছিল। এমন সময় তাকে জানানো হলো ইনস্পেকটার জেভার্ত তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। জেভার্তের নামটা তার ভাল লাগল না। সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে জেভার্তের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। জেভার্তও তাকে এড়িয়ে চলে।

ম্যাদলেন বলল, তাকে নিয়ে এস এখানে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে জেভার্ত ঢুকে পড়ল ঘরে।

ম্যাদলেন তার টেবিলে বসে রইল হাতে কলম নিয়ে। কতকগুলো আইনভঙ্গের রিপোর্ট পড়ছিল সে। সে নীরসভাবে বসতে বলল জেভার্তকে।

জেভার্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্যাদলেনকে নমস্কার জানিয়ে ম্যাদলেনের সামনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

জেভার্তকে আগে যারা দেখেছে, যারা তার চরিত্রের কথা জানে তারা এখন তাকে দেখলে অবাক হয়ে যাবে অপার বিস্ময়ে। ম্যাদলেনের প্রতি তার সেই দীর্ঘসঞ্চিত গোপন বিতৃষ্ণা আর নেই। জেভার্তের কঠোর, নিষ্ঠুর, অনমনীয় স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত যে কোনও লোক তাকে এখন দেখলে বুঝতে পারবে সে একটা বড় রকমের আত্মিক সংকটে ভুগছে। এখন যেন তার গোটা আত্মাটাই ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। সব আবেগপ্রবণ লোকদের মতো জেভার্তেরও খুব তাড়াতাড়ি মনের ভাবের পরিবর্তন

হয়। তখন তার আচরণটা সত্যিই রহস্যময় মনে হচ্ছিল। সে এমনভাবে ম্যাদলেনকে অভিবাদন জানাল যে ভাবের মধ্যে বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা বিতৃষ্ণা ছিল না। সে ম্যাদলেনের সামনে থেকে কয়েক পা দূরে সামরিক কায়দায় ধৈর্য ধরে সম্ভ্রমভরে দাঁড়িয়ে রইল। টুপিটা হাতে নিয়ে নম্রনীরব আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একজন সৈনিক তার উর্ধ্বতন অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আবার একই সঙ্গে মনে হচ্ছিল কোনও অপরাধী আসামী যেন দাঁড়িয়ে আছে তার বিচারকের সামনে। কখন দয়া করে মেয়র তার দিকে তাকাবে তার জন্য নীরবে অপেক্ষা করছে সে। তার পাথরের মতো কঠিন মুখখানায় একমাত্র এক ব্যাপ্ত বিষাদ ছাড়া অতীতের আর কোনও আবেগানুভূতির চিহ্নমাত্র নেই। তার সমস্ত চেহারাটার মধ্যে তখন ফুটে উঠেছিল এক উদ্ধত আনুগত্য আর পরাভূত বীরত্বের এক মিশ্রিত ভাব।

অবশেষে হাত থেকে কলমটা নামিয়ে ম্যাদলেন প্রশ্ন করল, কি বলবে জেভার্ত?

জেভার্ত একমুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে বলল, এক দারুণ শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটে গেছে মঁসিয়ে।

কি ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গ?

নিম্নপদস্থ এক সরকারী কর্মচারী একজন ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি দারুণ অশ্রদ্ধার ভাব দেখিয়েছে এবং তাকে অপমান করেছে। আমি কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে জানাতে এসেছি।

ম্যাদলেন প্রশ্ন করল, দোষী কে?

জেভার্ত বলল, আমি নিজে।

তুমি?

হ্যাঁ।

সেই ম্যাজিস্ট্রেট কে যার প্রতি অসদাচরণ করা হযেছে?

আপনিই সেই ম্যাজিস্ট্রেট মঁসিয়ে মেয়র।

চমকে উঠল ম্যাদলেন। চোখ দুটো নামিয়ে বলে চলল জেভার্ত, আমি আপনার কাছে অনুরোধ জানাতে এসেছি আপনি কর্তৃপক্ষের কাছে আমাকে বরখাস্ত করার জন্য সুপারিশ করুন।

ম্যাদলেন মুখ তুলে কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু জেভার্ত তাকে বলার সুযোগ না দিয়েই বলতে লাগল, আপনি হয়ত বলতে পারেন আমি তো পদত্যাগ করতে পারি। কিন্তু সেটা যথেষ্ট হবে না। পদত্যাগ করাটা সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু অপরাধ করেছি এবং তার জন্য আমার শাস্তি পাওয়া উচিত। আমাকে বরখাস্ত করা উচিত।

একটু থেমে আবার বলতে লাগল জেভার্ত, মঁসিয়ে মেয়র, দিনকতক আগে আপনি আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছিলেন। এবার ন্যায়সঙ্গত আচরণ করুন।

ম্যাদলেন বলল, কিন্তু কি বলছ তুমি আমি তো বুঝতেই পারছি না। তুমি কিভাবে আমাকে অপমান করেছ? কি অপরাধ করেছ তুমি? আমার কি ক্ষতি করেছ? তুমি বলছ তুমি চাকরি থেকে—

জেভার্ত বলল, হ্যাঁ বরখাস্ত।

ঠিক আছে বরখাস্ত, কিন্তু কেন?

আমি বুঝিয়ে বলছি।

জেভার্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবেগহীন কণ্ঠে বলতে লাগল, আমি সেই মেয়েটির ব্যাপারে আপনার উপর এমন প্রচণ্ডভাবে রেগে গিয়েছিলাম যে ছয় সপ্তা আগে আমি আপনার নামে নিন্দাবাদ করেছি।

তুমি আমার নামে নিন্দা করেছ?

হ্যাঁ, প্যারিসে পুলিশ বিভাগের প্রধান সচিবের কাছে।

মঁসিয়ে ম্যাদলেন জেভার্তের মতো হাসত না। কিন্তু এবার সে জেভার্তের কথা শুনে হো হো শব্দে হেসে উঠল।

একজন মেয়র একজন পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করেছে, এই নিন্দা করেছ?

না, আপনি একজন ভূতপূর্ব কয়েদী এই বলে।

ম্যাদলেনের মুখের ভাবটা সহসা বদলে গেল। জেভার্ত তখন মাটির দিকে তাকিয়ে বলে চলল, আমি তাই বিশ্বাস করতাম। এ ধারণা আমার অনেক দিন ধরে ছিল। আপনার সঙ্গে মুখের কিছু মিল, ফেবারোলে আপনি যে খোঁজখবর নিয়েছিলেন তার ব্যাপারটা, ফকেলেভেন্তের গাড়ি তোলার সময় আপনি যে দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন সেটা, আপনার অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদ, কিছুটা খোঁড়ানোর ভাব...এগুলো এমন কিছু না। তবু আমি সন্দেহ করতাম আপনিই জঁ ভলজাঁ।

কি নাম বললে?

জঁ ভলজাঁ। আজ হতে কুড়ি বছর আগে আমি যখন তুলঁর জেলে এক প্রহরীর কাজ করতাম তখন সে সেই জেলের কয়েদী ছিল। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর সে এক বিশপের বাড়িতে চুরি করে এবং রাস্তার উপর একটি ছোট্ট ছেলের টাকা চুরি করে। তাকে আবার ধরার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সে পালিয়ে যায়। তারপর আট বছর তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমি বিশ্বাস করেছিলাম...যাই হোক, রাগের মাথায় আমি প্যারিসে কর্তৃপক্ষের কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি।

ম্যাদলেন টেবিলের উপর কাগজগুলো আবার দেখতে লাগল। তারপর বলল, তারা কি বলল?

জেভার্ত বলল, তারা বলল, আমি পাগল।

আর কি বলল?

বলল, তারা ঠিক।

তুমি এটা বুঝতে পেরেছ জেনে খুশি হলাম।

তারাই ঠিক কারণ আসল জঁ ভলজাঁ ধরা পড়েছে।

ম্যাদলেনের হাত থেকে একটা কাগজ পড়ে গেল। সে জেভার্তের দিকে কড়াভাবে তাকিয়ে বলল, তা বটে।

জেভার্ত বলল, ব্যাপারটা হলো এই। এইলি—লে—হত—ক্লোশে গাঁয়ে

শ্যাম্পম্যাথিউ নামে একটা লোক ছিল। সে ছিল এক গরীব নিরাশ্রয়। সে এত গরীব ছিল যে কিভাবে জীবন ধারণ করত সেটা ছিল সকলের বিস্ময়ের বস্তু। গত শরৎকালে সে একবার কিছু আপেল চুরি করার জন্য গ্রেপ্তার হয়। তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সে পাঁচিলে উঠে গাছের কিছু ডাল ভাঙে। কিছু আপেলও তার হাতে পাওয়া যায়। তাকে জেল-হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। সামান্য একটা ঘটনা বলে সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু ঘটনাটা সহসা এক অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়। সে যে জেলে হাজতবাস করছিল সেটা তখন মেরামৎ হওয়ার জন্য তাকে অ্যারাসের জেলে পাঠানো হয়। সেই জেলে একজন পুরনো কয়েদী ছিল। তার নাম ছিল ব্রিভেত। সে খুব বিশ্বাসী ছিল, কারণ তার আচরণ ভাল ছিল। সে শ্যাম্পম্যাথিউকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, আমি ওকে চিনি। ও হচ্ছে এক পুরনো কয়েদী। তুলঁ জেলে আমরা একসঙ্গে কুড়ি বছর ছিলাম। ওর নাম হচ্ছে জাঁ ভলজাঁ।

শ্যাম্পম্যাথিউ অবশ্য একথা অস্বীকার করে। সে বলে জাঁ ভলজাঁর নাম সে কখনো শোনেনি। কিন্তু এ ব্যাপারে তদন্ত করা হয়। তদন্ত করে দেখা যায় তিরিশ বছর আগে শ্যাম্পম্যাথিউ বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ফেবারোল গাঁয়ে গাছ কাটার কাজ করে বেড়াত। মাঝখানে ছিল অনেকদিনের ফাঁক। কিন্তু পরে এই অভার্নে ও প্যারিসে খোঁজখবর নেওয়া হয়। ম্যাথিউ বলে, ও চাকা মেরামত আর চাকা তৈরির কাজ করত। আর ওর একটা মেয়ে ছিল যে বেড়ার কাজ করত। পরে সে ঘুরতে ঘুরতে ফেবারোলে চলে আসে। কিন্তু চুরির দায়ে জেলে যাওয়ার আগে জাঁ ভলজাঁ কি করত? সে ফেবারোলে গাছ কাটার কাজ করত। কিন্তু এইটাই সব নয়। ভলজাঁর খৃস্টীয় নাম ছিল জাঁ আর তার মার কুমারীজীবনের নাম ছিল ম্যাথিউ। মনে হয় সে জেল থেকে বেরিয়ে এসে তার আসল নামটা গোপন করে তার নিজের ও মার নাম দুটো মিলিয়ে নিজেকে জাঁ ম্যাথিউ নামে চালাতে থাকে। আর এটাই স্বাভাবিক। অভার্নে অঞ্চলে জাঁকে শাঁ বলে আর তাই থেকে লোকের মুখে মুখে শ্যাম্প হয়। এইভাবে তার নাম শ্যাম্পম্যাথিউ হয়ে দাঁড়ায়। আমার কথাটা আশাকরি বুঝতে পেরেছেন? ফেবারোলে আরও তদন্ত করা হয়। কিন্তু সেখানে জাঁ ভলজাঁদের পরিবারের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এই ধরনের পরিবারের লোকরা এক জায়গায় কখনো থাকে না। তিরিশ বছর তার ফেবারোল গাঁয়ের কোনও লোক জাঁ ভলজাঁদের কথা স্মরণ করতে পারল না। তারপর তুলঁতে তদন্ত করা হয়। সেখানে আরও দু'জন কয়েদী পাওয়া যায় যারা তাকে চিনত। এই দু'জন কয়েদীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তারা হলো কোশেপেত আর শেনিলদিউ। তাদের দু'জনকেই অ্যারাস জেলে আনা হয় এবং তারা দু'জনেই ব্রিভেতের কথাকে সমর্থন করে এবং বলে তথাকথিত শ্যাম্পম্যাথিউই হলো জাঁ ভলজাঁ। দু'জনেরই বয়স চুয়ান্ন, এক বয়স, এক চেহারা, দেহের গঠন এক, এক কথায় সেই মানুষ। ঘটনাটা ঘটে সেদিন যেদিন আমি আপনার বিরুদ্ধে চিঠিটা পাঠাই। তারা আমাকে চিঠির উত্তরে জানায় আসল জাঁ ভলজাঁ অ্যারাসে জেলে ভরা আছে। এইটাতেই আমি আরও আঘাত

পাই। অ্যারাসে গিয়ে ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে আসার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় আমাকে।

ম্যাদলেন বলল, তারপর?

জেভার্ত তেমনি গম্ভীরভাবে বলল, সত্য সত্য মঁসিয়ে মেয়র। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি সেই শ্যাম্পম্যাথিউ নামে লোকটাই আসল জাঁ ভলজাঁ। আমিও লোকটাকে চিনতে পারি।

ম্যাদলেন নিচু গলায় বলল, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?

জেভার্ত তার কথার নিশ্চয়তা বোঝাবার জন্য এক নীরস হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ, এ বিষয়ে নিশ্চিত আমি। জাঁ ভলজাঁকে দেখার পর আমিও এই কথা ভাবছি যে আমি কি করে এত বড় একটা ভুল ধারণাকে পোষণ করলাম এতদিন। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি মঁসিয়ে মেয়র। আমাকে মার্জনা করুন।

মাত্র কয়েক সপ্তা আগে যে তাকে তার নিম্নতন কর্মচারিদের সামনে অপমান করেছে, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে তার মধ্যে একই সঙ্গে সরলতা আর আত্মমর্যাদাবোধের মিশ্রণে এক ভাব ফুটে ওঠে তার চোখে-মুখে।

ম্যাদলেন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, কিন্তু লোকটা কি বলে?

জেভার্ত বলল, দেখুন মঁসিয়ে মেয়র, অপরাধটা ওর পক্ষে সত্যিই গুরুতর যদি সত্যিই ভলজাঁ হয়। কারণ ও একজন জেল-ফেরৎ কয়েদী। পাঁচিল ডিঙিয়ে আপেল চুরি করা কোনও ছেলে বা প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পক্ষে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ নয়, কিন্তু কোনও এক জেল-ফেরৎ কয়েদীর পক্ষে একটা গুরুতর অপরাধ। পাঁচিল ডিঙিয়ে চুরি করতে যাওয়ার অপরাধ, তাতে আবার জেল-ফেরৎ কয়েদী—এর বিচার ম্যাজিস্ট্রেট করবে না, করবে বিশেষ একদল বিচারক এবং এর শাস্তি কয়েকদিনের জেল নয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তার উপর আছে একটি ছেলের টাকাচুরির অভিযোগ, অবশ্য ছেলেটাকে যদি পাওয়া যায়। লোকটা যদি ভলজাঁ হয় তা হলে তার অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। কিন্তু লোকটা এমন চতুর যে তাতে আমার আরও সন্দেহ হয়। ভলজাঁর নামটা শুনে সে এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন সে কিছুই জানে না। সে বলল, আমার নাম শ্যাম্পম্যাথিউ, এ ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না। লোকটা সত্যিই চালাক। কিন্তু চালাকি করে কিছু হবে না। জোর সাক্ষী আছে। চার-চারজন সাক্ষী তাকে চেনে। অ্যারাসে তার বিচার হবে এবং আমাকেও সাক্ষ্য দিতে হবে।

ম্যাদলেন টেবিলের উপর রাখা কাগজগুলো আবার দেখতে লাগল। দেখে মনে হচ্ছিল তার মনে অনেক চিন্তা আছে। সে ইনস্‌পেকটারের দিকে তাকিয়ে বলল, ধন্যবাদ জেভার্ত। এত সব খুঁটিনাটি শোনার আমার কোনও আগ্রহ নেই। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকেরই আপন আপন কাজ আছে। বুলোপিয়েদ নামে এক মহিলা গাড়িচালক পীয়ের শেষনেলভের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে, তাকে আর তার মেয়েকে আর একটু হলে চাপা দিত। চালক হিসাবে লোকটা হটকারী, তাকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আরও অনেক অভিযোগ আছে। সেগুলো তদন্ত করে দেখতে

হবে। এগুলো সব পুলিশ আইন ভঙ্গ করার ব্যাপার। তোমাকে আমি অনেক কাজ দেব। তবে তুমি তো অ্যারাসে যাবে। বোধ হয় এক সপ্তা থাকবে না।

জেভার্ত বলল, তার আগেই চলে আসব আমি। আমি আজ রাতের গাড়িতেই যাচ্ছি।

ম্যাদলেন বলল, সেখানে ক'দিন লাগবে?

একদিনের বেশি নয়। আগামী কালই সন্ধের মধ্যে রায় বার হবে। তবে আমাকে এতক্ষণ থাকতে হবে না। আমি সাক্ষ্য দিয়েই চলে আসব।

ম্যাদলেন বলল, ঠিক আছে।

এরপর ইশারায় তাকে যেতে বলল। কিন্তু তবু গেল না জেভার্ত। সে বলল, মাপ করবেন, একটা জিনিস আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই মঁসিয়ে মেযর।

কিসের কথা?

আমাকে বরখাস্ত করতে হবে।

ম্যাদলেন উঠে দাঁড়াল। সে বলল, জেভার্ত, তুমি একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তুমি তোমার অপরাধটাকে বাড়িযে বলছ। অপরাধের ব্যাপারটা আমার সঙ্গে জড়িত। তোমাকে উপরে উঠতে হবে জেভার্ত, নিচে নামতে হবে না। আমি চাই তুমি এই পদে যেমন আছ তেমনি বহাল থাক।

জেভার্ত স্থির স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ম্যাদলেনের দিকে তাকাল। তার সেই দৃষ্টির স্বচ্ছতার মধ্যে যে একটুখানি সংকীর্ণ বিবেক ফুটে উঠেছিল তা একই সঙ্গে ঋজু এবং কঠোর বলে মনে হচ্ছিল। সে শান্ত কণ্ঠে বলল, মঁসিয়ে মেযর, আমি আপনার একথা মেনে নিতে পারলাম না।

ম্যাদলেন বলল, আমি আবার বলছি, তোমার এ অপরাধের ব্যাপারটা আমার সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু জেভার্ত নিজস্ব চিন্তার ধারাটাকে আঁকড়ে ধরে থেকে বলে যেতে লাগল, আপনি যে বাড়িয়ে বলার কথা বললেন সেটা ঠিক নয়, আমি কিছুই বাড়িয়ে বলিনি। কিন্তু ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন। আমি আপনাকে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করেছি, এটা এমন কিছু অন্যায় নয়, যদিও আমাদের ঊর্ধ্বতন অফিসারদের বিরুদ্ধে এই ধরনের সন্দেহ পোষণ করার কথাটা ভেবে দেখা উচিত। কিন্তু আপনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, মেয়র, ম্যাজিস্ট্রেট। প্রচণ্ড ক্রোধ এবং প্রতিশোধবাসনার বশবর্তী হয়ে আমি আপনাকে জেলফেরৎ কয়েদী হিসাবে বিনা প্রমাণে অভিযুক্ত করেছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি নিজে একজন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হয়ে আপনার মতো একজন সরকারের পদস্থ প্রতিনিধিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি। আমার অধীনস্থ কোনও কর্মচারি যদি আমার প্রতি এমন অন্যায় আচরণ করত তাহলে আমি বলতাম সে তার পদের অযোগ্য এবং তাকে আমি অবশ্যই বরখাস্ত করতাম। আর একটা কথা মঁসিয়ে মেয়র। আমি খুব রুক্ষ ও রূঢ় প্রকৃতির লোক ছিলাম। আমি অপরের প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। তখন হয়ত তার প্রয়োজন

ছিল। কিন্তু এখন যখন আমি নিজে অন্যায় করেছি, এখন আমার নিজের উপর আমার অবশ্যই কঠোর ও রূঢ় হওয়া উচিত। তা না হলে আমার অতীতের সব কাজ, সব আচরণ ঘোরতর অন্যায় হিসাবে বিবেচিত হবে। আমি যেমন এর আগে আর পাঁচজন অন্যায়কারীকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দিইনি তেমনি আজ আমাকে নিজেকেও শাস্তি হতে অব্যাহতি দেওয়া কখনই উচিত নয়। তাহলে সেটা এক জঘন্য অপরাধ হবে এবং যারা আমাকে শুয়োর বলে গালাগালি করে তাদের আচরণ ন্যায়সঙ্গত হিসাবে গণ্য হবে। আপনি অনেককে মার্জনা করেছেন এবং তা দেখে আমার খুব রাগ হয়েছে। কিন্তু আপনার মার্জনা আমি চাই না। আমার মতে যে নারী শহরের একজন বিশিষ্ট শ্রদ্ধাভাজন নাগরিককে অপমানিত করেছিল সবার সামনে তাকে মার্জনা করা যেমন অন্যায়, তেমনি যে পুলিশ অফিসার মেয়রকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল তাকে মার্জনা করাটাও অন্যায়। এই ধরনের মার্জনা সমাজের নৈতিক মানকে অবনত করে। দয়ালু হওয়া সহজ, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ হওয়া কঠিন। আমি যা সন্দেহ করেছিলাম আপনি যদি তাই হতেন তাহলে আমি আপনার প্রতি কোনও দয়া দেখাতাম না মঁসিয়ে মেয়র। অপরের প্রতি আমি যে ব্যবহার করি, নিজের প্রতিও আমার সেই ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু আমি অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি, আমাকে বরখাস্ত ও কর্মচ্যুত করা উচিত। আমার হাত-পা আছে, আমি মাঠে চাষের কাজ পারি এবং সেটা আমার পক্ষে খুব একটা কষ্টকর হবে না। সরকারী কর্মের ক্ষেত্রে আমি এক আদর্শ সৃষ্টি করতে চাই মঁসিয়ে মেয়র। আমার অনুরোধ, আপনি ইনস্‌পেকটার জেভার্তকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করুন।

জেভার্ত তার কথাগুলো এমন এক উচ্চস্তরের নম্রতা আর উগ্র আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল যে তার অন্তর্নিহিত সততা বাইরে প্রকটিত হয়ে এক অদ্ভুত মহত্ত্বে পরিণত হলো।

ম্যাদলেন বলল, ঠিক আছে। ব্যাপারটা পরে ভেবে দেখতে হ.ব।

এই বলে সে করমর্দনের জন্য জেভার্তের দিকে হাতটা বাড়াতেই পিছিয়ে গেল জেভার্ত। কড়াভাবে বলল, এ হতেই পারে না। একজন ম্যাজিস্ট্রেট কখনো একজন পুলিশের লোকের সঙ্গে করমর্দন করে না। আমি পুলিশ অফিসারের ক্ষমতা ও পদমর্যাদাকে কলুষিত করেছি। আমাকে আর অফিসার বলা উচিত নয়।

মাথাটা নত করে অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে জেভার্ত বলল, ঠিক আছে মঁসিয়ে মেয়র, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমি কাজ করে যাব।

জেভার্ত চলে গেল। মঁসিয়ে ম্যাদলেন চিন্তান্বিতভাবে দাঁড়িয়ে বারান্দার উপর তার দৃঢ় পদক্ষেপের ক্রমবিলীয়মান শব্দগুলো শুনতে লাগল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

এরপর মন্ত্রিউল-সুর-মের শহরে যা ঘটেছিল তা সব জানতে পারেনি শহরের

লোক। তবে দু' একটা যে সংক্ষিপ্ত খবর ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তা অবশ্যই যথাযথভাবে বর্ণনা করা উচিত। তার মধ্যে দু' একটি ঘটনাকে পাঠকদের অসম্ভব বলেও মনে হতে পারে।

যেদিন সকালে জেভার্তের সঙ্গে ম্যাদলেনের দেখা হয় সেদিন বিকালে যথারীতি হাসপাতালে ফাঁতিনেকে দেখতে যায় ম্যাদলেন। ফাঁতিনের কাছে যাবার আগে যে দু'জন নার্স তার হাসপাতালে কাজ করত, সিস্টার সিম্‌প্লিস নামে তাদের মধ্যে একজন নার্সকে ডেকে দেখা করল তার সঙ্গে। অপর একজন নার্সের নাম ছিল সিস্টার পার্পেচুয়া।

সিস্টার পার্পেচুয়া ছিল এক সরল সাদাসিধে গ্রাম্য মহিলা। সে অন্য কোনও কাজ না পেয়েই কুমারী অবস্থায় নার্সের কাজে যোগদান করে। এই ধরনের মেয়ে এমন কিছু বিরল নয়। ধর্মীয় প্রেরণাসিক্ত এক সেবার ব্রত তার চরিত্রের মূল ধাতুকে কোনওভাবে পরিবর্তিত করতে পারেনি। কোনও এক গ্রাম্য মেয়ের চার্চের কাজে যোগদান করা এবং সন্ন্যাসিনী হওয়াটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। গ্রাম্য চাষী মেয়ে আর গ্রাম্য চার্চের সন্ন্যাসিনীর একটা সাধারণ ভিত্তিভূমি থাকে এবং সেটা হলো অজ্ঞতা। সিস্টার পার্পেচুয়া খুব কড়া প্রকৃতির মেয়ে এবং খিটখিটে মেজাজের। সে যখন হাসপাতালে নার্সের কাজ করত তখন রোগীরা তাকে মোটেই দেখতে পারত না। সে রুগ্ন আর মুমূর্ষুদের কারণে-অকারণে যখন-তখন তিরস্কার করত, ঈশ্বরকে যেন তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারত। মৃত্যুর পদধ্বনির সঙ্গে তার প্রার্থনার সুরকে মিশিয়ে দিত। তার বাড়ি ছিল পানতয়।

ভিনসেন্ট দ্য পল কল্পিত সিস্টার অফ মার্সিকে কয়েকটি কথায় মূর্ত করে তোলেন। সিস্টার সিমপ্লিস-এর সঙ্গে পার্পেচুয়ার অনেক তফাৎ। সিস্টার অফ মার্সি অর্থাৎ যিনি দয়ার প্রতিমূর্তি তাঁর মধ্যে স্বাধীনতা আর সেবাপরায়ণতা একই সঙ্গে দুটোরই প্রাধান্য ছিল। যারা সিস্টার অফ মার্সির মতো হতে চায় অথবা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে চায় তাদের সেবাই হবে জীবনের ধর্ম, আনুগত্যই তাদের জীবনের শৃঙ্খলা, রোগীদের ঘরই তাদের ধর্মস্থান, ঈশ্বরের ভয়ই তাদের একমাত্র আশ্রয় এবং শালীনতাই তাদের অবগুণ্ঠন। সিস্টার সিমপ্লিসের কাছে আদর্শই ছিল এক জীবন্ত বাস্তব। কেউ তার বয়স কত তা জানত না, তাকে দেখে মনে হয় তার জীবনে কখনো যৌবন ছিল না এবং মনে হয় সে কখনো বুড়ো হবে না। সে খুব শান্ত এবং কঠোর প্রকৃতির মহিলা। আমরা তাকে নারী বলতেই পারি না, নারীসুলভ কমনীয়তা তার মধ্যে ছিল না। সে কাছে থাকলেও মনে হয় যেন কত দূরে আছে। সে জীবনে কখনো মিথ্যে কথা বলেনি। সে এত শান্ত ছিল যে তাকে দুর্বল প্রকৃতির মনে হত। কিন্তু গায়ে তার প্রচুর শক্তি ছিল। সে যখন তার সুন্দর সরু সরু ও বিশুদ্ধ আঙুলগুলো রোগীদের উপর রাখত তখন তারা যন্ত্রণার মাঝেও আরাম ও আনন্দ অনুভব করত। তার কথার মধ্যে যেন এক আশ্চর্য নীরবতা ছিল। সে একটাও অনাবশ্যক কথা বলত না। তার কণ্ঠস্বর শুনে যে কেউ আনন্দ পেত। মোটা সার্জের গাউনের সঙ্গে তার চোখমুখের

সূক্ষ্ম ও কমনীয় ভাবটা একরকম খাপ খেয়ে গিয়েছিল। তার ঐ গাউনটা যেন তাকে সবসময় ঈশ্বরের কথা মনে করিয়ে দিত। সে জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলত না, বিনা কারণে কোনও কথা বলত না, এমন কোনও কথা বলত না যা সত্য নয়—সেইটাই তার চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল। তার অকম্পিত সত্যবাদিতা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে তাকে বিখ্যাত করে তোলে এবং আবেবেসিকর্দ সে কথা একটি চিঠিতে মূকবধির ম্যাথিউকে জানান। আমরা যতই সৎ আর নীতিপরায়ণ হই না কেন, আমাদের সরলতা ও সত্যবাদিতার মধ্যেও কিছু না কিছু নির্দোষ মিথ্যা থেকে যায়। কিন্তু সিস্টার সিমপ্লিসের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। তার কাছে মিথ্যা মিথ্যা, সাদা বা নির্দোষ মিথ্যা বলে কোনও কিছু নেই। যে মিথ্যা কথা বলে সে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাই বলে। মিথ্যা মানেই শয়তানের মুখ। যে শয়তান সেই অসত্য। সিস্টার সিমপ্লিস এটা বিশ্বাস করত এবং এই বিশ্বাসমতো কাজ করত। যে পবিত্রতার জ্যোতি তার দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হত, তার চোখে-মুখে ঝরে পড়ত, সেই বিশ্বাসই ছিল তার শক্তির উৎস। তার হাসি আর চোখের দৃষ্টি দুটোই ছিল পবিত্র। তার বিবেকের স্বচ্ছ দর্পণে কোনও ধূলিকণার বিন্দুমাত্র ম্লানিমা বা কোনও ছলনার কুটিল জাল ছিল না। সে নাকি সিমপ্লিস নামটা নিয়েছিল সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য পল থেকে।

সে যখন সেন্ট ভিনসেন্ট-এর দলে যোগদান করে তখন তার দুটো বাতিক ছিল। সে বেশি মিষ্টি খেতে ভালবাসত আর চিঠি পেতে চাইত। পরে এই দুর্বলতাকে অপসারিত করে তার জীবন থেকে। বড় বড় অক্ষরে লাতিন ভাষায় লেখা একখানি প্রার্থনাপুস্তকই ছিল তার একমাত্র প্রিয় গ্রন্থ। সে লাতিন ভাষা না জানলেও সেই বইটা পড়ে বুঝতে পারত। ফাঁতিনের মধ্যে কিছু অন্তর্নিহিত গুণ থাকা সত্ত্বেও কোনও স্নেহমমতা ছিল না তার প্রতি। ফাঁতিনের দেখাশোনার সব ভার নিজের উপরেই চাপিয়ে নেয়।

মঁসিয়ে ম্যাদলেন সিস্টার সিমপ্লিসকে একটু আড়ালে ডেকে এমনভাবে তার উপর ফাঁতিনের ভার দেয় যে সেকথা পরে সে কোনওদিন ভুলতে পারেনি। তারপর ম্যাদলেন ফাঁতিনেকে দেখতে যায়।

কোনও শীতার্ত ব্যক্তি যেমন উষ্ণতা আর আরাম চায় তেমনি ফাঁতিনে ম্যাদলেনের আসার জন্য পরম আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষায় থাকত। সে নার্সদের বলত, মেয়র যতক্ষণ আমার কাছে থাকেন ততক্ষণ যেন আমার দেহে প্রাণ থাকে।

সেদিন ফাঁতিনের জ্বর খুব বেড়েছিল। ম্যাদলেন তার কাছে যেতে সে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, কসেত্তের কি হলো?

ম্যাদলেন বলল, খুব শীঘ্রই সে এসে পড়বে।

সেদিন ম্যাদলেন আধ ঘণ্টার পরিবর্তে এক ঘণ্টা রইল। অন্য দিনকার মতোই সে কথাবার্তা বলতে লাগল। সে নার্সদের বলে দিল, ফাঁতিনের সেবা-শুশ্রূষার যেন কোনও ত্রুটি না হয়। ওষুধপত্র বা পথ্যের যেন অভাব না হয়। একসময় ম্যাদলেনের মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। ডাক্তার তাকে একসময় বলল, ফাঁতিনের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। অনেকে ভাবল ডাক্তারের কথা শুনেই মুখটা ভার হয়ে পড়ে ম্যাদলেনের।

হাসপাতাল থেকে সোজা মেয়রের অফিসে চলে যায় সে। অফিসের কেরানি দেখল, ম্যাদলেন অফিসঘরে টাঙানো ফ্রান্সের বিভিন্ন রাস্তার একটা মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখছে। তা দেখতে দেখতে একটা কাগজের উপর কি লিখল সে।

২

মেয়রের অফিস থেকে বেরিয়ে ম্যাদলেন শহরের একটা রাস্তা দিয়ে তার চার্চের কুরে শফেয়ারের কাছে চলে গেল। শফেয়ার ঘোড়া আর গাড়ি ভাড়া দিত।

ম্যাদলেন দেখল শফেয়ার ঘোড়ার গাড়ির কি একটা জিনিস মেরামৎ করছিল। সে তাকে বলল, মাস্টার শফেয়ার, একটা ভাল ঘোড়া দিতে পারেন?

শফেয়ার ফ্ল্যান্ডার্সের অধিবাসী ছিল বলে তাকে ফ্লেমিংও বলা হত। ফ্লেমিং বলল, আমার সব ঘোড়াই ভাল মঁসিয়ে মেয়র। আপনি কি চাইছেন?

ম্যাদলেন বলল, আমি এমন একটা ঘোড়া চাই যে দিনে কুড়ি লীগ অর্থাৎ চল্লিশ মাইল পথ যাওয়া-আসা করতে পারে।

ফ্লেমিং বলল, কুড়ি লীগ!

হ্যাঁ।

সারাদিন হাঁটার পর কতক্ষণ বিশ্রাম করতে পাবে?

পরদিন আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে।

সেই একই দূরত্ব?

হ্যাঁ।

তাহলে পুরো চল্লিশ মাইল?

ম্যাদলেন একটা কাগজ বার করে দেখিয়ে বলল, জায়গাটার দূরত্ব ঠিক সাড়ে উনিশ মাইল।

ফ্লেমিং বলল, ঠিক আছে মঁসিয়ে মেয়র, আপনি যা চাইছেন সেই রকম ঘোড়াই আমার আছে। ঘোড়াটা বাস বুলোনাই থেকে আনা। একটা অদ্ভুত জানোয়ার। আগে ঘোড়াটাকে কেউ বশ করতে পারত না। তার পিঠে কেউ চাপলেই সে তাকে ফেলে দিত। তারপর আমি তাকে কিনে এনে বশ করি। এখন সে মেঘের মতো আর বাতাসের মতো গতিশীল। আপনি যা চাইছেন এই ঘোড়াই তা পারবে। তবে এর পিঠে চাপতে পাবেন না। এ গাড়ি টানতে পারে, কিন্তু পিঠে কাউকে বহন করে না। এটাই হলো এর রীতি।

ম্যাদলেন বলল, পুরো পথটা যেতে পারবে তো?

ফ্লেমিং বলল, চল্লিশ মাইল তো? স্বচ্ছন্দে আট ঘণ্টার মধ্যে চলে যাবে। তবে একটা কথা আছে।

কি কথা?

কথাটা হলো এই যে, অর্ধেক পথ যাওয়ার পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম দিতে হবে। আর কোনও পান্থশালায় ওকে খাওয়াবার সময় দেখতে হবে হোটেলের চাকররা যেন ওর খাবারের থেকে কিছু যথারীতি চুরি করে না নেয়।

আমি তা অবশ্যই দেখব।

আর একটা কথা। আমি শুধু এই গাড়ি আর ঘোড়া দিচ্ছি আপনার খাতিরে মঁসিয়ে মেয়র। আপনি গাড়ি চালাতে জানেন তো ?

অবশ্যই জানি।

এর ভাড়া হচ্ছে দিনে তিরিশ ফ্রাঁ। ঘোড়ার খাওয়ার খরচ আপনার।

মঁসিয়ে ম্যাদলেন তিনটে স্বর্ণমুদ্রা বার করে টেবিলের উপর রেখে বলল, দু'দিনের অগ্রীম দেওয়া রইল।

ফ্লেমিং বলল, আর একটা কথা। বড গাড়ি নিয়ে এত দূর পথ যাওয়া ঠিক হবে না। আপনি বরং আমার দু' চাকার হালকা গাড়িটা নিয়ে যান।

খুব ভাল কথা।

তবে দেখুন, গাড়িটা একেবারে ফাঁকা।

তাতে কিছু যায় আসে না।

তবে একটা জিনিস দেখেছেন মঁসিয়ে মেয়র। এখন শীতকাল, দারুণ ঠাণ্ডা। তাছাড়া বৃষ্টি হতে পারে।

ম্যাদলেন বলল, আমি চাই ঘোডা আর গাড়ি আমার বাড়ির সামনে রাত সাড়ে চারটের সময় হাজির করতে হবে।

ফ্লেমিং বলল, ঠিক আছে।

এরপর সে টেবিলের উপর তার নখ দিয়ে একটা আঁচড় কেটে বলল, এখনো কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন তা জানতে পারলাম না।

এই কথাটা ফ্লেমিং প্রথম থেকেই ভাবছিল, কিন্তু মেয়রকে এতক্ষণ জিজ্ঞাসা কবতে পারছিল না।

ম্যাদলেন সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, ঘোড়াটার সামনের পা দুটো শক্ত তো ?

হ্যাঁ, তবে ঢালুতে নামার সময় সাবধানে গাড়ি চালাবেন। আপনার পথে হয়ত অনেক ঢাল আছে।

ম্যাদলেন বলল, ঠিক রাত সাড়ে চারটের সময় যেন ঘোড়া আর গাড়িটা আমার বাড়ির সামনে নিয়ে আসা হয়।

এই কথা বলে বিস্ময়াভিভূত ফ্লেমিংকে ছেড়ে সেখান থেকে চলে গেল ম্যাদলেন।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল সে। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল মনটা তার তখনো এক দুর্বোধ্য চিন্তায় মগ্ন ছিল।

ম্যাদলেন বলল, মঁসিয়ে শফেয়ার, গাড়ি আর ঘোড়ার জন্য মোট কত দাম চান ?

ফ্লেমিং বলল, আপনি কি সত্যিই এ দুটো কিনতে চাইছেন ?

ম্যাদলেন বলল, না, তবে এগুলোর যদি কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয় তার জন্য কিছু টাকা জমা রাখছি। আমি গাড়ি ও ঘোড়া ফিরিয়ে দিলে আপনি টাকাটা ফেরৎ দেবেন। কত টাকা জমা দেব ?

পাঁচশো ফ্রাঁ।

এই নিন।

মঁসিয়ে ম্যাদলেন টেবিলের উপর একটা ব্যাঙ্কনোট রেখে চলে গেল। এবার আর ফিরে এল না। ফ্লেমিং ভাবতে লাগল এক হাজার ফ্রাঁর কথা বললে ভাল হত। কেন এক হাজারের কথা বলেনি তার জন্য অনুশোচনা করতে লাগল সে। আসলে কিন্তু ঐ ঘোড়া আর গাড়ির দাম একশো ফ্রাঁর বেশি হবে না।

ফ্লেমিং তার স্ত্রীকে ডেকে সব কথা বলল। মেয়র কোন্ চুলোয় যাচ্ছে? এই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল তারা। স্ত্রী বলল, উনি নিশ্চয় প্যারিস যাচ্ছেন।

স্বামী বলল, না।

ম্যাদলেন একটুকরো কাগজ ফেলে রেখে গিয়েছিল। ফ্লেমিং সেটা তুলে নিয়ে দেখল তাতে পরপর কয়েকটা জায়গার নাম আর তাদের দূরত্ব লেখা রয়েছে। অবশেষে রয়েছে অ্যারাসের নাম যার মোট দূরত্ব সাড়ে উনিশ মাইল। এটা দেখে বুঝল, মেয়র অ্যারাস যাচ্ছে।

পুরনো চার্চটার ভিতর না ঢুকে অন্য পথ দিয়ে ম্যাদলেন সোজা বাড়ি চলে গেল। সে তার শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। প্রায় দিনই সে রাত্রিবেলায় তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। তাই এটা তেমন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। সেদিন তখন মাত্র সাড়ে আটটা বাজে। যে মেয়েটি একই সঙ্গে কারখানা আর ম্যাদলেনের বাড়িতে কাজ করত সেই মেয়েটি নিচের তলায় ক্যাশিয়ার আসতেই তাকে বলল, মেয়রের শরীর কি খারাপ? তার মুখখানা কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

ক্যাশিয়ার নিচের তলায় একটা ঘরে শুত। সে মেয়েটির কথায় কান না দিতে শুতে চলে গেল। কিন্তু দুপুর রাতে ঘুম ভেঙে গেল তার। দোতলায় যে ঘরে ম্যাদলেন থাকে সে ঘরে পায়চারির পদশব্দ শুনে সে বুঝতে পারল ম্যাদলেনই পায়চারি করছে। ব্যাপারটাতে আশ্চর্য হয়ে গেল ক্যাশিয়ার। কারণ ম্যাদলেন সাধারণত সকাল হবার আগে ওঠে না এবং তার আগে কোনও শব্দ শোনা যায় না তার ঘরে।

ক্যাশিয়ার শুনতে পেল উপরে ম্যাদলেনের আলমারি খোলার ও আসবাবপত্র সরানোর শব্দ আসছে। সে জানালার কাছে গিয়ে জানালা খুলে দেখল উপরতলায় এই শীতেও ম্যাদলেনের ঘরের জানালা খোলা আছে। কারণ আলোর ছটা আসছিল খোলা জানালাটা দিয়ে। তখনো উপরে পায়চারির শব্দ হচ্ছিল।

মঁসিয়ে ম্যাদলেনের ঘরে তখন আসলে কি হচ্ছিল তার কথা এবার বর্ণনা করব আমরা।

৩

পাঠকরা হয়ত বুঝতে পেরেছেন এই মঁসিয়ে ম্যাদলেনই হলো জাঁ ভলজাঁ। আমরা এর আগেই তার বিবেকের গভীরে উঁকি মেরে দেখেছি একবার। আবার সেখানে উঁকি মেরে দেখতে গেলে ভয়ে কাঁপতে থাকব আমরা। এই ধরনের চিন্তার থেকে

ভয়াবহ আর কিছু হতে পারে না। মানুষের আত্মার চোখে মানুষের মতো দুর্বোধ্যতায় অন্ধকার, আবার স্পষ্টতায় উজ্জ্বল আর কিছু হতে পারে না; সব জীবের মধ্যে মানুষই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে রহস্যময় এবং গভীরতায় অন্তহীন।

মানুষের বিবেকের উপর যদি একটা কবিতা লিখতে হয় তাহলে তা এমনই এক মহাকাব্য হবে যা অন্য সব মহাকাব্যকে ছাড়িয়ে যাবে। তার গভীরতায় পৃথিবীর সকল মহাকাব্য তলিয়ে যাবে। মানুষের বিবেক হচ্ছে এক মায়াময় গোলকধাঁধা, অভিলাষ আর অনুসন্ধানের লীলাক্ষেত্র, স্বপ্নের জ্বলন্ত চুল্লী। যেসব চিন্তার কথা আমরা ভাবতেও লজ্জা পাই সেইসব গোপন লজ্জাজনক চিন্তার এক অন্ধকারাবৃত ভাণ্ডার। সেখানে প্রতিনিয়ত চলে আত্মাভিমানের তাণ্ডব আর অরাজকতা, বিচিত্র আবেগানুভূতির দ্বন্দ্ব। কোনও মানুষ যখন চিন্তা করে তখন যদি আমরা সেই মুহূর্তে তার নীরব নিস্তব্ধ বহিরঙ্গের অন্তরালে অন্তরের অন্তঃস্থলে কি আলোড়ন চলছে তা একবার উঁকি মেরে দেখি তাহলে দেখতে পাব হোমার বর্ণিত এক তুমুল মহাযুদ্ধের মতো যুদ্ধ চলছে সেখানে। কত সব ড্রাগন আর হায়েড্রা, মিল্টন ও দান্তে বর্ণিত কত সব অলৌকিক ও অতিলৌকিক চরিত্রের বিরাট লড়াই চলছে যেন সে অন্তরের মধ্যে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে অনন্ত এক মহাশূন্যতা যেখান থেকে সে তার আত্মার গতিবিধির সঙ্গে তার জীবনের কার্যাবলীর বিচার করে হতাশ হয় এবং সেই শূন্যতার গভীরে ডুবে যায়।

দান্তে এলিঘিরি একদিন একটি ভাগ্যনির্দিষ্ট দরজার সামনে এসে ঢুকতে ইতস্তত করতে থাকেন। আমরাও এই ধরনের দ্বারপথের সামনে এসে ইতস্তত করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঢুকে পড়ি তার মধ্যে। পেতিত গার্ভে নামে সেই ছেলেটার সঙ্গে জাঁ ভলজাঁর জীবনে যা যা ঘটে তা বলার আর কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ তা পাঠকরা জানেন। তার পর থেকে তার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। বিশপ যা চেয়েছিলেন, সে তা-ই হয়েছিল। এটা শুধু এক পরিবর্তন নয়, এ এক আশ্চর্য রূপান্তর।

সে প্রথমে বিশপের রুপোর জিনিসপত্রগুলো বিক্রি করে শুধু রুপোর বাতিদান দুটো স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করে। ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াতে থাকে সে। অবশেষে মন্ত্রিউল-সুর-মের শহরে এসে পড়ে। এখানে এসে কিভাবে সে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে তা আমরা আগেই দেখেছি। এখানে সে নানারকম জনকল্যাণমূলক কাজে মত্ত হয়ে থাকলেও ব্যক্তিজীবনে সে ছিল একেবারে নিঃসঙ্গ আর দূরধিগম্য। তার অবাঞ্ছিত অতীত জীবনের এক দুর্মর স্মৃতি ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার বিবেকবুদ্ধিকে। তবু সে তার বর্তমান জীবনের উদার ও মহৎ কার্যাবলীর দ্বারা অতীতের জীবনের সব কলঙ্করেখাকে মুছে দিচ্ছে একে একে। এই ধরনের এক সান্ত্বনা থেকে শান্তি পেত সে। তার মনে তখন মাত্র দুটো উদ্দেশ্য ছিল—তার নাম ও আসল পরিচয়কে গোপন রাখা আর মানুষের কাছ থেকে ক্রমে দূরে চলে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়া।

এই দুটো উদ্দেশ্য একে অন্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়ে এমন এক শক্তিশালী নীতিতে পরিণত হয় যা তার জীবনের সব কর্ম ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। তার দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আচরণ এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে থাকে। তার দুটি উদ্দেশ্য তাকে একই পথে চালিত করে, তাকে মানুষের কাছ থেকে ক্রমশই দূরে নিয়ে যায় আর পরোপকারী ও সরল প্রকৃতির করে তোলে। তবে এই দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাধে তখন সে তার প্রথম উদ্দেশ্যকে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কাছে বলি দেয়? তার নৈতিক জীবনের শুচিতা এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্যই কি দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কাছে বলি দেয়। তার নৈতিক জীবনের শুচিতা এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্য বেশি সচেষ্ট হয়ে ওঠে সে। তার যথেষ্ট পরিণামদর্শিতা থাকলেও বিশপের রুপোর বাতিদান দুটি রেখে দেয় সে, বিশপের মৃত্যুসংবাদ শুনে সে শোকসূচক পোশাক পরে শোক পালন করে। শহরে কোনও ভবঘুরে ছেলে এলেই সে খোঁজখবর নিত, অর্থাৎ পেতিত গার্ভেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করত। ফেবারোলেও লোক পাঠিয়ে সে খোঁজ নেয়, জেভার্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও সে ফকেলেভেন্তকে গাড়ির তলা থেকে উদ্ধার করে। মোট কথা সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো সে কেবল মনে করত তার নিজের প্রতি কোনও কর্তব্য নেই।

কিন্তু এখনকার মতো এমন সমস্যামূলক পরিস্থিতির আর কখনো উদ্ভব হয়নি আগে। যে দুটি উদ্দেশ্য মিলে মিশে এই হতভাগ্য মানুষের জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করে চলত, তারা এমন দ্বন্দ্বে মেতে ওঠেনি কখনো। সেদিন তার অফিসে জেভার্ত ঢুকেই যে কথাগুলো বলে সে কথা শুনেই এই দ্বন্দ্বের কথা বুঝতে পারে সে। প্রথমে অস্পষ্টভাবে, তারপর গভীরভাবে। যে নামটাকে মনের মধ্যে গোপনতার অনেকগুলি স্তরের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জেভার্তের কণ্ঠে তা উচ্চারিত হতে দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে সে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে সে। ঝড়ের আঘাতে অবনতমুখী ওকগাছের মতো নুয়ে পড়ে, শত্রুর আক্রমণে পরাভূত সৈনিকের মতো ভেঙে পড়ে সে। বুঝতে পারে তার অন্তরের মধ্যে যে কম্পন, যে আলোড়ন শুরু হয়েছে তা এক প্রবল ঝড়েরই পূর্বাভাস মাত্র। সে বুঝতে পারে বজ্রগর্ভ মেঘমালার সঞ্চার হচ্ছে তার মাথার উপরে। জেভার্তের কথা শুনে যে চিন্তা মাথা তুলে ওঠে তার মনের মাঝে তা হলো শ্যাম্পম্যাথিউ নামে লোকটাকে কারামুক্ত করে তার জায়গায় নিজেকে কারারুদ্ধ করা। এ চিন্তা ধারাল ছুরির ফলার মতোই মর্মভেদী ও বেদনাদায়ক। তবু সে নিজেকে বারবার বলতে লাগল, ধৈর্য ধরো, শক্ত হও। কিন্তু প্রথমে তার এই উদার আবেগকে অবদমিত করে রাখে।

জাঁ ভলজাঁ যদি বিশপের উপদেশ মেনে চলত শেষ পর্যন্ত, যেভাবে অনুশোচনা আর আত্মনিগ্রহের পথ ধরে তার আত্মার পুনর্বাসনের কাজে এগিয়ে চলেছিল সে, সেই ভাবটা যদি বজায় রেখে চলতে পারত শেষ পর্যন্ত, কোনও ভয়ঙ্কর উভয়সংকটের মধ্যে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে অন্তরের যে বিরাট শূন্যতার মাঝে আত্মার

পরম মুক্তি নিহিত আছে সেই শূন্যতার পথেই অদম্য গতিতে এগিয়ে চলত তাহলে তার পক্ষে খুবই ভাল হত। ভাল হত, কিন্তু তা হয়নি। তার আত্মার মধ্যে কি ঘটছিল তার একটা বিবরণ দেব আমরা। প্রথমে তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি জয়ী হয় তার মধ্যে। সে তার এলোমেলো চিন্তাগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, তার আবেগগুলোকে সংযত করে, জেভার্তের বিপজ্জনক নৈকট্য সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে ওঠে। এক আশংকার বশবর্তী হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটাকে স্থগিত রাখে। কি করতে হবে সে বিষয়ে তার চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করে, ঢাল ফিরে পাওয়া যোদ্ধার মতো সে তার প্রশান্তিটাকে আবার ফিরে পায়।

বাকি দিনটা ভলজাঁর এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটে। তার আপাত প্রশান্তির অন্তরালে এক তুমুল আলোড়ন চলতে থাকে তার অন্তরে। সে যেন এক নিরাপত্তামূলক সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। তার মনের মধ্যে সব কিছু ওলটপালট হযে গিয়েছিল, সে কোনও কিছুই স্পষ্ট করে দেখতে বা ভাবতে পারছিল না। তবে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিল, সে এমন একটা জোর আঘাত পেয়েছে যা তাকে অভিভূত করে দেয় এবং যা তার অন্তরের এত সব আলোড়ন আন্দোলনের মূল কারণ।

সে যথারীতি ফাঁতিনেকে দেখতে গেল এবং অনেক বেশি সময় সেখানে কাটাল। তার অনুপস্থিতিকালে যাতে ফাতিনের কোনও অসুবিধা না হয়, তার দেখাশোনা যাতে ঠিকমতো হয় তার জন্য নাসকে বলে দিল। সে অস্পষ্টভাবে ভাবল তার একবার অ্যারাস যাওয়া উচিত। কিন্তু কি করবে না করবে সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হলো না। সেখানে কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। ব্যাপারটা কি তা শুধু দেখে আসবে সে। সেইজন্যই ঘোড়া আর গাড়ির ব্যবস্থা করল।

সে ভালভাবেই সে রাতে খেল। খাওয়ার পর শোবার ঘরে এসে আবার ভাবতে শুরু করল।

ব্যাপারটা সে নতুন করে ভেবে দেখল এবং ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলো তার। সে একসময় চেয়ার থেকে উঠে দরজায় খিল দিয়ে এল। তার ভয় হতে লাগল বাইরে থেকে কেউ এসে পড়তে পারে।

বাড়ির আলোটায় বিরক্তবোধ করছিল সে। তাই সে নিবিয়ে দিল বাতিটা। কারণ কেউ দেখে ফেলতে পারে।

কিন্তু কে?

যাকে সে এড়িয়ে যেতে চাইছে, ঘরে ঢুকতে দিতে চাইছে না, যার কণ্ঠ চিরতরে রোধ করে দিতে চাইছে, সে কিন্তু ঘরেই আছে। সে তার বিবেক।

তার বিবেক, তার মানেই ঈশ্বর।

কিছুক্ষণের জন্য একটা নিরাপত্তা বোধ করল সে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়ায় কেউ সে ঘরে ঢুকতে পারবে না, কেউ তার ইচ্ছার উপর হাত দিতে পারবে না। ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়ায় কেউ তাকে দেখতে পাবে না। অন্ধকারে চেয়ারে বসে টেবিলের উপর কনুই রেখে তার উপর মাথা দিয়ে ভাবতে লাগল।

সে ভাবল, আমি কোথায় আছি? এটা কি একটা স্বপ্ন? আমি কি সত্যি সত্যিই জেভার্তকে দেখেছি এবং সে আমাকে এই সব কথা বলেছে? শ্যাম্পম্যাথিউ নামে লোকটা কি সত্যিই আমার মতো দেখতে? এটা কি এক অকল্পনীয় ব্যাপার নয়? গতকাল সকালেও আমি কত নিরাপদ আর এক সংশয়াতীত সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলাম। আমি তখন কি করছিলাম? এই সব কিছুর মানে কি? এখন আমাকে কি করতে হবে?

এই সমস্ত প্রশ্নের দ্বারা আলোড়িত হচ্ছিল তার মনটা। যে সব চিন্তার দুর্বার তরঙ্গমালা একের পর এক করে তার মস্তিষ্কের ভিতরটাতে আঘাত হানছিল, সে সব চিন্তার গতিরোধ করতে না পেরে সে মাথাটাকে ধরল। সে এক তুমুল অন্তর্দ্বন্দ্ব যা তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি আর যুক্তিবোধকে নিষ্পেষিত ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সে দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে উঠে আসে শুধু এক প্রবল অন্তর্বেদনা। কোনও কিছু ভাল করে বুঝতে না পারা বা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারার এক নিষ্ফল বেদনা।

তার মাথার ভিতরটা যেন জ্বলছিল। সে উঠে পড়ে জানালাটা খুলে দিল। আকাশে কোনও তারা ছিল না। সে আবার ফিরে এসে চেয়ারটাতে বসল।

রাত্রির প্রথম প্রহর কেটে গেল এইভাবে।

ক্রমে ক্রমে ঘোলাটে অস্পষ্ট চিন্তাগুলো স্বচ্ছ হয়ে উঠতে লাগল তার মনের মধ্যে। আসল অবস্থাটা সে পুরোপুরি না হলেও কিছু কিছু করে বুঝতে পারল। সে দেখল অবস্থাটা খুবই অস্বাভাবিক এবং সংকটজনক হলেও সে অবস্থাকে সে আয়ত্তে আনতে পেরেছে।

কিন্তু এতে অবস্থার জটিলতাটা গভীর হয়ে উঠল আরও।

তার সব কাজের অন্তরালে এক অন্তর্নিহিত ধর্মীয় অভিলাষ থাকলেও সেদিন পর্যন্ত সে যা কিছু করেছে সে সব কাজের মধ্য দিয়ে সে শুধু তার আসল পরিচয়টাকে কবর দেবার জন্য একটা গর্ত খুঁড়ে এসেছে। স্মৃতিচারণের কোনও নীরব নির্জন মুহূর্তে অথবা জাগ্রত রাত্রিযাপনের দীর্ঘ অবকাশে যে ভয় সবচেয়ে বেশি করে এসেছে তা হলো ঐ নাম কারো মুখে উচ্চারিত হবার ভয। নিজেকে সে বারবার বলে এসেছে ঐ নামটার পুনর্জন্ম মানেই তার সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়া, যে নতুন জীবন সে কত চেষ্টায় কত কষ্টে গড়ে তুলেছে, সে জীবনের নিঃশেষিত বিলোপ। যে আত্মার সে জন্ম দিয়েছে সে আত্মার মৃত্যু। শুধু এই নামের পুনরুজ্জীবনের চিন্তা আর সম্ভাবনাটাই তার সর্বাঙ্গ শিহরিত করে তুলেছে। কেউ কি তাকে বলেছে যে এমন একদিন আসবে যেদিন তার নাম অর্থাৎ জাঁ ভলজাঁর ভয়ঙ্কর নামটা অকস্মাৎ তার কানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে বজ্রধ্বনির মতো। যে রহস্যের ছদ্ম আবরণ দিয়ে সে নিজেকে ঢেকে রেখেছে এতদিন, সহসা অন্ধকারের গর্ত থেকে এক তীব্র আলোর ছটা এসে সে রহস্যের আবরণটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে? একথা তাকে কেউ কি বলেছে যে সে আলোর ভয়ঙ্কর ছটা সে না চাইলে তার কোনও ক্ষতিই করতে পারবে

না, বরং সে আলো তার ছদ্ম আবরণটাকে আরও গভীর, আরও দুশ্ছেদ্য করে তুলবে এবং সেই জাঁ ভলজাঁর সঙ্গে মঁসিয়ে ম্যাদলেনের দ্বন্দ্ব বাধলে সে দ্বন্দ্ব থেকে মঁসিয়ে ম্যাদলেন বিজয়ী বীরের মতো বেরিয়ে এসে আরও বেশি সম্মানে ভূষিত হবে, তার মর্যাদার আসনে আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হবে সে। একথা কেউ কি তাকে বলেছে যে সে নাম কারো মুখে উচ্চারিত শুনে সে শুধু বিস্ময়ে বিহুল হয়ে তাকিয়ে থাকবে তার মুখপানে, তার কথাটাকে উন্মাদের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেবে? তবু এটাই ঘটেছে, একদিন যা ছিল অসম্ভব সেই সব অসম্ভবই পুঞ্জীভূত হয়েছে দিনে দিনে, ঈশ্বরের বিধানে যা ছিল কল্পনা তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

তার মনটা যতই পরিষ্কার হয়ে উঠল ততই সে তার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। যেন সে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে দেখে একই সঙ্গে এক আশ্চর্য দৃঢ়তা আর কম্পিত বিহুলতার সঙ্গে অন্ধকারের অতল গহ্বরের মাঝে নেমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সেই গহ্বরের খাড়াই পাড়টাকে ধরে সেই পতনের প্রতিরোধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে সে। সেই প্রতিরোধকালে ভাগ্যপ্রেরিত এক অপরিচিত ব্যক্তির মূর্তিকে সে দেখেছে যে ব্যক্তি জোর করে সেই গহ্বরটাতে নামাবার জন্য তাকে নির্মমভাবে ঠেলছে। কিন্তু সে অথবা সেই অপরিচিত ব্যক্তি—দু'জনের একজনকে সে গহ্বরে নামতেই হবে। তা না হলে সে গহ্বরের আগ্রাসী মুখটা বন্ধ হবে না কখনো।

দুর্বার ঘটনাপ্রবাহকে তার নিজস্ব গতিপথে বয়ে যেতে দেওয়া ছাড়া আব কোনও গত্যন্তর [illegible]তার।

ঘটনাটা হলো এই: পেতিত গার্ভে নামে একটা ছেলের পয়সা চুরি করার জন্য যে কারাগারে সে একদিন ছিল সেই কারাগারে তার শূন্য স্থানটা আবার তাকে ফিরে পেতে চাইছে। সে সেখানে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সেই শূন্য স্থানটা তার প্রতীক্ষায় থাকবে, তাকে ফিরে পাওয়ার দাবিতে অটল অনমনীয় হয়ে থাকবে এবং এটাই হলো ভাগ্যের অখণ্ডনীয় নির্মম বিধান। এখন তার মনে হলো তার এক বিকল্পকে সে খুঁজে পেয়েছে, সে বিকল্প হলো হতভাগ্য শ্যাম্পম্যাথিউ। সে যদি চায তাহলে সে একই সঙ্গে নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে দু' জায়গায় অবস্থান করতে পারে—কারাগারে শ্যাম্পম্যাথিউরূপে অবস্থান করতে পারে, আবার সেই সঙ্গে ম্যাদলেন নাম সভ্যসমাজের এক সম্মানিত সদস্যরূপে তার হাতে গড়া এই স্বরাজ্যে স্বরাট হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তাহলে অবশ্য তার কলঙ্কের বোঝাটাকে শ্যাম্পম্যাথিউর মাথায় চাপিয়ে দিতে হবে, সমাধিস্তম্ভের মতো যে কলঙ্কের পুঞ্জীভূত বোঝাটা একবার কারো উপর চাপিযে দিলে আর নামানো যাবে না।

এই ধরনের বিস্ময়কর বিক্ষোভ মানুষ সারাজীবনের মধ্যে মাত্র দু' তিনবার অনুভব করে অন্তরে। এ বিক্ষোভ আত্মার বিরুদ্ধে আত্মার বিক্ষোভ। একই আত্মা যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একে অন্যের সঙ্গে মেতে ওঠে এক আমরণ দ্বন্দ্বে। অংশীভূত একটি আত্মা অপরের শোচনীয় পতন দেখে বিজয়গর্বে এক শ্লেষাত্মক বিদ্রূপে ফেটে পড়ে।

হঠাৎ বাতিটা আবার জ্বালল সে।

সে ভাবল, আমি কিসের ভয় করেছি? কেন আমি এখানে বসে এত সব ভাবছি? এখন তো আমি নিরাপদ। যে একটিমাত্র দরজার মধ্য দিয়ে তার অবাঞ্ছিত অতীত প্রবেশ করে তার বর্তমান জীবনে এক বিরাট বিপর্যয় ঘটাতে পারত, সে দরজা তো রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সে দরজার সামনে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গেঁথে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কে সে যে আসল সত্যটাকে অনুমান করেছিল, প্রায় ধবতে পেরেছিল?—সে হলো জেভার্ত। রক্তপিপাসু যে শিকাবী কুকুরটা একদিন তার গন্ধ শুঁকে শুঁকে তার পিছু পিছু ঘুবে বেড়াচ্ছিল, সে কুকুরটা এখন সেই গন্ধসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে একেবারে। সে তার জাঁ ভলজাঁকে খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং আর তাকে বিরক্ত করবে না। খুব সম্ভবত সে শহর ছেড়ে অন্য কোথাও পালাবে। আমার আর কিছু করাব নেই, আমার এতে কোনও ভূমিকা নেই। সুতবাং অন্যায়টা আমার? আমার দোষটা কোথায়? কিন্তু এখন কেউ যদি আমায দেখে তাহলে ভাববে বড রকমের এক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি আমি। কিন্তু কেউ যদি বিপদে পড়ে তাহলে সেটা আমার দোষ না। ঈশ্বরের বিধানেই সে এই বিপদেব মধ্যে পড়েছে। ঐশ্বরিক বিধানসৃষ্ট সে বিপদের মুখে আমি মাছির মতো উড়ে গিয়ে ধনা দিতে পাব না। আর আমি কি চাইতে পারি? এই ক'টি বছর ধরে ঈশ্বরের কাছে যে আশীর্বাদ আমি চেয়ে এসেছি, অসংখ্য রাতের স্বপ্নে বা জাগরণে ঈশ্ববের কাছে যে প্রার্থনা আমি করে এসেছি তা সার্থক হয়েছে এতদিনে অর্থাৎ আমি লাভ করেছি পবিপূর্ণ নিবাপত্তা। ঈশ্বরের যে ইচ্ছায এটা ঘটেছে সে ইচ্ছার বিবোধিতা কবা আমাব কাজ নয়। কিন্তু ঈশ্বর এটা চেয়েছেন? চেয়েছেন যাতে এইভাবে সকলের কাছে এক আদর্শ সৃষ্টি করতে পারি, যাতে আমি দেখাতে পারি ধর্ম ও অনুতাপেব পথ সুখশান্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমি এখন বুঝতে পারছি না কেন আমি চার্চে গিয়ে কুবব কাছে স্বীকারোক্তি করে তাঁর পরামর্শ চাইলাম না। চাইলে তো তিনি আমাকে এই কথাই বলতেন, যা কিছু হবার তা হয়ে গেছে, যা ঘটে ঘটতে দাও, ঈশ্বরেব ইচ্ছামতো যা কিছু ঘটার তা ঘটুক।

আপন বিবেকের গভীরে নেমে গিয়ে এই সব কথা ভাবতে লাগল সে। আপন ব্যক্তি-সত্তার শূন্যতার গভীরে আপনিই আটকে গেছে যেন সে। সে চেয়ার থেকে উঠে আবার পায়চারি করতে লাগল। সে আপন মনে বলে উঠল, এ বিষযে আর কিছু চিন্তা করার নেই, আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

তবু কিন্তু শান্তি পেল না মনে। কূলের দিকে নিয়ত ধাবমান তরঙ্গমালাকে আমরা যেমন প্রতিহত করতে পারি না কোনওক্রমে তেমনি কোনও অবাধ্য চিন্তা যদি বারবার ফিরে আসে মনের মধ্যে তাহলে তারও প্রতিরোধ করতে পারি না! নাবিক এই তরঙ্গমালাকে জোয়ার বলে, বিপন্ন বিব্রত বিবেকের কাছে এ চিন্তা হলো অনুতাপ বা অনুশোচনা। ঈশ্বর যেমন সমুদ্রে তরঙ্গমালাকে উত্তাল ও উদ্বেল করে তোলেন তেমনি চিন্তার তরঙ্গাঘাতে আত্মাকে করে তোলেন বিচলিত।

কিছুক্ষণ পবে নিজেব মধ্যে আবাব সেই সংলাপ শুরু করল। সে সংলাপে সে নিজেই একাধারে বক্তা এবং শ্রোতা। বক্তা হিসাবে সে এমন সব কথা বলতে লাগল যা সে বলতে চায়নি, আবাব শ্রোতা হিসাবে এমন সব কথা শুনতে লাগল যা সে শুনতে চায়নি। সেই সংলাপেব বক্তা এবং শ্রোতা এমন এক বহস্যময় শক্তিব কাছে আত্মসমর্পন কবল যে তাদেব শুধু বলল, চিন্তা কবো, ভাব। যেমন দু' হাজাব বছব আগে সেই শক্তি আব এক দণ্ডিত মানুষকে বলেছিল, ক্রশটা তুলে নাও।

অথবা অনেক সময় নিজেব সঙ্গে কথা বলি আমবা। সব চিন্তাশীল লোকবাই তা কবে থাকে। কোনও কথা যখন মানুষেব মনে এক আশ্চর্য গতিশীলতায চিন্তা থেকে বিবেক আব বিবেক থেকে চিন্তায যাওয়া-আসা কবে তখন তা এক চমৎকাব বহস্যে পবিণত হয। আমবা তখন নীববতা ভঙ্গ না কবে নিজেব সঙ্গে কথা বলি, আব তখন আমাদেব মুখ ছাড়া প্রতিটি অনুচ্চাবিত চিন্তা ভাবনাই মুখব হযে কথা বলতে থাকে। আত্মা অদৃশ্য এবং অদৃশ্য হলেও তাব একটা বাস্তবতা আছে।

সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন কবল, কোথায সে দাডিযে আছে, কোন সিদ্ধান্তে সে উপনীত হযেছে। সে নিজেব কাছে নিজেই স্বীকাব কবল সে সংকল্প কবেছে ঘটনাব গতি যেদিকে যে পথে চলতে দেবে, ঘটনাব গতিব উপবে ঈশ্ববেব বিধানেব উপর সে হস্তক্ষেপ কববে না কোনওভাবে। কিন্তু এ সংকল্পটাকে অন্যায বলে মনে হলো তাব। ভাগ্য আব মানুষ যে ভুল কবেছে সেই ভুল সে এক নীবব অপ্রতিবাদে মেনে নেবে, তাতে প্রতিবোধেব কোনও চেষ্টা কববে না —এটা ঠিক নয। এক্ষেত্রে কিছু না কবাটাই সব কিছু কবা, এক অপবাধমূলক ভণ্ডামি আব কাপুরুষতাব গভীবে নেমে যাওয়া।

গত আট বছবেব মধ্যে সে প্রথম এক অশুভ চিন্তা আব অশুভ কর্মেব তিক্ত আস্বাদ বোধ কবল।

বিতৃষ্ণায নিজেব মুখেব উপব থুতু ফেলতে ইচ্ছা কবল।

সে যখন মনে মনে বলল, আমাব উদ্দেশ্য সাধিত হযেছে তখন সে আবার নিজেকে প্রশ্ন কবে যেতে লাগল। তাব জীবনেব নিশ্চয একটা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্যেব অর্থ কি নিজেকে গোপন বাখা, পুলিশেব চোখে ধুলো দিযে ঘুরে বেড়ানো? সে যা কিছু কবে এসেছে এতদিন তাব পিছনে অন্য কোনও বড যুক্তি বা বড উদ্দেশ্য নেই? নিজেব জীবন নয, আত্মাকে বক্ষা কবাব এক বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিল না? বিশপেব কথামতো সৎ, সম্মানিত ও এক দৃঢচেতা লোক হবাব সংকল্প ছিল না কি তার? এইটাই কি তাব হৃদযেব গোপন গভীব অভিলাষ ছিল না? আজ যদি সে অতীতের দরজাটা চিবতরে বন্ধ করে দেয তাহলে কি এক জঘন্যতম কাজের দবজা খোলা হবে না? সে কাজ চুবিব থেকেও অনেক বেশি ঘৃণ্য কাজ। সে কাজ হলো একটি লোককে তাব জীবন, সুখশান্তি, পৃথিবীব আলো থেকে বঞ্চিত করা। জেলখানাব কযেদী হিসাবে একটি লোককে জীবন্ত মৃত্যুব দিকে ঠেলে দেওযা মানে তাকে ঠাণ্ডা মাথায হত্যা কবা। কিন্তু সে যদি তার ভুল সংশোধন করে লোকটিকে

উদ্ধার করে, যদি নিজেকে জাঁ ভলজাঁ হিসাবে ঘোষণা করে তাহলে তাতে হবে তার প্রকৃত পুনরভ্যুত্থান, আসল পুনরুজ্জীবন, তাহলে যে নরকের দরজা থেকে সে পালিয়ে যেতে চাইছে সে দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। সশরীরে সেই নরকে ফিরে যাওয়া মানেই বাস্তবে তার থেকে মুক্তি পাওয়া। আজ তাকে এটাই করতে হবে। এ কাজ না করলে এতদিন সে যা কিছু করেছে তা সব পণ্ড হয়ে যাবে। তার গোটা জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে। অর্থহীন হয়ে উঠবে তার সব অনুশোচনা। আমি কোনও কিছুর পরোয়া করি না। তখন একথা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। বিশপের উপস্থিতিকে সে আজ জীবনে অনুভব করল, তার মনে হলো বিশপ তার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আজ সে বুঝল মেয়র মঁসিয়ে ম্যাদলেন তার সকল সৎকর্ম সত্ত্বেও বিশপের চোখে ঘৃণ্য দেখাচ্ছে। অথচ ঘৃণ্য জাঁ ভলজাঁ পবিত্র ও প্রশংসনীয় হয়ে উঠবে। অন্যান্য লোক যেখানে শুধু মুখোশটা দেখবে, বিশপ সেখানে দেখবে আসল মুখটা। অন্যান্যরা যেখানে জীবনটাকে দেখবে, বিশপ সেখানে আত্মাকে দেখবে। সুতরাং এখন অ্যারাসে গিয়ে নকল জাঁ ভলজাঁকে মুক্ত করে আসল জাঁ ভলজাঁকে ঘোষণা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সেটা হবে সবচেয়ে মর্মন্তুদ, সবচেয়ে মর্মস্পর্শী জয়, এক চূড়ান্ত ও অপ্রত্যাবর্তনীয় পদক্ষেপ। কিন্তু তবু তাকে করতেই হবে সে কাজ। এটা তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক পরিণতি যে, মানুষের চোখে অধঃপতনের শেষ প্রান্তে নেমে গিয়েই ঈশ্বরের চোখে সে শুচিতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারবে।

অবশেষে সে বলল, ঠিক আছে, এ বিষয়ে এক স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাক তাহলে। আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও, লোকটিকে উদ্ধার করতে দাও।

এবার তার হিসাবের খাতাপত্রগুলো দেখল সে। অর্থকষ্টে পড়া যে সব ব্যবসায়ীর কিছু বন্ধকী কাগজ ছিল তার কাছে সে সব কাগজগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিল। ব্যাঙ্কমালিক মঁসিয়ে লাফিত্তেকে একটা চিঠি লিখল সে। টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কাগজে জড়ানো ব্যাঙ্ক থেকে তোলা একতাড়া নোট আর ভোটের সময় ব্যবহৃত তার পরিচয়পত্রটা তুলে নিল।

এই অবস্থায় কেউ যদি তাকে দেখত তাহলে সে কিন্তু তার মনের মধ্যে চিন্তার সকল বোঝাভারগুলোর কথা কিছুই বুঝতে পারত না। শুধু দেখতে পেত তার ঠোঁট দুটো মাঝে মাঝে নড়ছে আর মাঝে মাঝে সে ঘরের মধ্যে কোনও একটা জিনিসের দিকে তার অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে বোকার মতো।

মঁসিয়ে লাফিত্তেকে চিঠিটা লেখা হয়ে গেলে চিঠিটা আর কাগজ জড়ানো নোটের তাড়াটাকে কোটে ঢোকাল। তারপর আবার পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যে।

তার চিন্তার ধারাটা কিন্তু পাল্টাল না। যেদিকেই সে তাকাতে লাগল সেইদিকেই দেখল কর্তব্যের দাবি তার পানে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে জ্বলন্ত আগুনের অক্ষরে কয়েকটা কথা তার সামনে লিখে দিল, উঠে দাঁড়াও এবং তোমার আসল নাম বল।

ক্রমেই এই কথাগুলো এক স্পষ্ট রূপ লাভ করে দুটো পৃথক নীতিতে বিভক্ত

হয়ে তার জীবনকে অনুশাসিত করার চেষ্টা করতে লাগল। একটা নীতি তাকে তার নামটা গোপন রাখতে বলল, আর একটা নীতি আত্মাকে বিশুদ্ধ করে তুলতে বলল। জীবনে প্রথম এই দুটো নীতির মধ্যে একটা পার্থক্য দেখতে পেল। সে দেখল এদের মধ্যে একটা নীতি ভাল এবং একটা নীতি খারাপ। একটা নীতি যখন আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করছে, অন্য নীতি তখন স্বার্থপর হতে শেখাচ্ছে। একটা নীতি বেরিয়ে এসেছে আলোর সুউচ্চ স্তম্ভ থেকে, আর একটা নীতি বেরিয়ে এসেছে অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে।

ক্রমে সে দেখল এই দুটো নীতি এক চরম দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়ে উঠল তার মনে আর সেই দ্বন্দ্বের ছবিটা যতই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তার সামনে ততই সেই পরস্পরবিরুদ্ধ দুটো নীতি বিরাট আকার ধারণ করতে লাগল। তার মনে হলো সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার মধ্যে অন্তহীন আলো আর ছায়ার মধ্যে এক দেবী ও দানবী মত্ত হয়ে উঠেছে এক প্রাণপণ সংগ্রামে। সে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তবু তার মনে হলো, যা কিছু শুভ যা কিছু ভাল তারই জয় হয়েছে।

সে আরও বুঝল বিশপই প্রথমে তার ভাগ্য আর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম মোড় ঘুরিয়ে দেয় আর তারপর আর একজন দ্বিতীয়বার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, সে হলো শ্যাম্পম্যাথিউ। এটাই হলো তার জীবনের সবচেয়ে বড় সংকট, তার সহিষ্ণুতার শেষ বিচার।

তার উত্তপ্ত মানসিক অবস্থাটা কিছুক্ষণের জন্য শান্ত শীতল হলেও আবার সেটা বেড়ে যেতে লাগল। অজস্র চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হতে লাগল তার মনটা। কিন্তু তার সেই মূল সংকল্পটা এক রয়ে গেল।

একসময় সে তার মনকে বোঝাল হয়ত সে ব্যাপারটাকে অহেতুক বড় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। শ্যাম্পম্যাথিউ নামে লোকটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, আসলে লোকটা একটা চোর। তখন তার মতোই উত্তর করল, লোকটা যদি শুধু কগুলো আপেল চুরি করে থাকে তাহলে তার বড় জোর এক মাসের জেল হত, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হত না কখনো। তাছাড়া সে যে সত্যি সত্যিই আপেল চুরি করেছে সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কাবণ জাঁ ভলজাঁর নামটাই যথেষ্ট, অন্য কোনও প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না।

সরকার পক্ষের উকিল হযত একসময় বলেছিল, লোকটা যখন বলে সকলেই তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বিশ্বাস করে নিচ্ছে। এবং আবার সে ভাবল, হয়ত সে আত্মসমর্পণ করলে অর্থাৎ তার আসল পরিচয় ঘোষণা করলে এই সাত বছরের মধ্যে যে সব মহৎ কাজ করেছে, যে সম্মানজনক জীবন যাপন করেছে তার কথা বিবেচনা করে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু তাডাতাডি তার মন থেকে এ ভাবনাটা দূর করে দিল। সে ভাবল, পেতিত গার্ভের পয়সা চুরির কথাটা পর্যালোচনা করে তাকে দাগী অপরাধী হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দান করা হবে।

সমস্ত মোহ আর মিথ্যা আশা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে জাগতিক সকল বিষয় থেকে মনটা বিচ্ছিন্ন করে অপার্থিব এক উৎস হতে এক মানসিক শক্তি আর সান্ত্বনা খুঁজে পাবার চেষ্টা করতে লাগল সে। সে নিজেকে বোঝাল সে যদি যথাকর্তব্য পালন করে তাহলে যে শান্তির আস্বাদ সে লাভ করবে, সে কর্তব্য এড়িয়ে গিয়ে সে যদি মঁসিয়ে ম্যাদলেন হিসাবে বর্তমান জীবনের মর্যাদা, সম্মান, সম্পদ এবং জনপ্রিয়তা ভোগ করে যায় তাহলে এক গোপন অপরাধচেতনাজনিত লজ্জার গ্লানি তাকে সে শান্তির আস্বাদ লাভ করতে কিছুতেই দেবে না। অন্য দিকে সে যদি এই সব কিছু ত্যাগ করে তাহলে সে সত্যিকারের মুক্তি লাভ করবে—কারাদণ্ডের কঠোরতা, কষ্টভোগ, অন্তহীন আমরণ শ্রম আর অপমান সত্ত্বেও মনে মনে এক নিবিড় স্বর্গসুখের আস্বাদ অনুভব করবে।

অবশেষে সে মনে মনে বলল, এই কর্তব্য অপরিহার্য এবং এটাই তার নিয়তি, নিয়তির এ বিধান, বিধিনির্দিষ্ট এ কর্তব্য সে পরিবর্তন করতে পারে না, সে তা এড়িয়ে যেতে পারে না। একদিকে বাইরের আপাত শূন্যময় জীবন আর অন্তরের দিক থেকে এক গোপন অপমানের গ্লানি; একদিকে বাইরের আপাত অধঃপতনের লজ্জা আর অন্তরের শুচিতা—এই দুটোর একটাকে তাকে বেছে নিতেই হবে।

এই সব চিন্তার বিষাদময় প্রভাব তার মনের শক্তিকে হ্রাস করতে পারল না কিছুমাত্র, শুধু তার মস্তিষ্ককে অবসন্ন করে তুলল। সে এলোমেলোভাবে অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের কথা ভাবতে লাগল। অশান্তভাবে সে পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভিতরে। তার শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুত আর উত্তাল হয়ে উঠল। চার্চ আর টাউন হলের ঘণ্টাধ্বনি রাত্রির দ্বিপ্রহর ঘোষণা করল। ঘণ্টার ধ্বনিগুলো সে মনে মনে গুণে চলল। দিনকতক আগে একটা পুরনো ঘড়ির দোকানে দেখা একটা বড় ঘড়ির কথা তার মনে পড়ল। তার শীত করছিল। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালল সে, অথচ জানালাটা বন্ধ করল না।

ক্রমে এক ঔদাসিন্যের ভাব আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। রাত্রি দুপুর হবার আগে সে যে সব কথা ভেবেছিল সে সব কথা একবার স্মরণ করল। অবশেষে সে নিজেকে বলল, হ্যাঁ, আমি স্থির করে ফেলেছি আমি আত্মসমর্পণ করবই।

হঠাৎ ফাঁতিনের কথাটা মনে পড়ে গেল। আপন মনে বলে উঠল, হায় হতভাগ্য নারী!

এই আকস্মিক স্মৃতি বিদ্যুৎ চমকের মতো এক ঝলক নতুন আলো ফেলল তার অবস্থার উপর। সে নিজের মনকে বলল, কিন্তু—আমি শুধু নিজের কথা ভাবছি। হয় আমাকে চুপচাপ থেকে যেতে হবে অথবা নিজেকে আইনের হাতে সঁপে দিতে হবে, হয় আমাকে আগের মতো আত্মগোপন করে থাকতে হবে অথবা আত্মাকে বাঁচাতে হবে, হয় আমাকে সম্মানিত অথচ ঘৃণ্য মেয়র হিসাবে থেকে যেতে হবে অথবা জেলখানায় ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। এই সব কিছুই আত্মাভিমানের ব্যাপার। কিন্তু আর পাঁচজনের কথা তো ভাবছি না, কোথায় আমার খৃস্টীয় কর্তব্যবোধ?

এবার সে শহর থেকে চলে গেলে কি অবস্থার উদ্ভব হবে সেই কথা ভাবতে লাগল। তাতে শুধু এই শহর নয়, এই সমগ্র অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে শিল্প সে গড়ে তুলেছে, সে শিল্প তার অবর্তমানে নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার ফলে সে শিল্পের সঙ্গে জড়িত ও কর্মরত অসংখ্য নরনারী, বৃদ্ধ অসহায় যারা তার থেকে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সমস্ত কর্মচঞ্চলতার স্রোতে ভাঁটা পড়বে। তার অভাবে সমগ্র অঞ্চলের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। তাছাড়া যে ফাঁতিনের দুঃখভোগের জন্য সে কতকাংশে দায়ী তার প্রতি কি তার কোনও কর্তব্য নেই? সে তাকে কথা দিয়েছে যে তার সন্তানকে এনে দেবে। যদি সে তা না পারে তাহলে সে অবশ্যই মারা যাবে, তাহলে তার সন্তানের কি যে অবস্থা হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন; সে নিজেকে ধরা দিলে এই সব অশুভ ঘটনা ঘটবে। আর যদি সে ধরা না দেয় তাহলে কি হবে?

একটি লোক চুরি করার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করবে। তাকে বাঁচাতে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে আমি এখানেই থাকব যেমন আছি। ফাঁতিনে তার সন্তানকে মানুষ করবে। দশ বছরের মধ্যে আমি এক কোটি টাকা সঞ্চয় করব এবং তাতে সমগ্র অঞ্চলটা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। এ টাকার আমার কাছে কোনও দাম নেই। তাতে এ অঞ্চলের অধিবাসীরাই উপকৃত হবে—তাতে সমৃদ্ধি আরও বাড়বে, নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠবে, আরও অনেক লোক কাজ পাবে। এখন শহরের আশেপাশে যে সব জায়গায় অনুন্নত খামার আর পতিত জমি পড়ে আছে সে সব জায়গায় কত গ্রাম ও জনবসতি গড়ে উঠবে। তাতে মানুষের অভাব চলে যাবে এবং সেইসঙ্গে অনেক অপরাধ ও পাপকাজের উচ্ছেদ হবে। গড়ে উঠবে এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ। কিন্তু শুধু তার ব্যক্তিগত আত্মতৃপ্তির জন্য, শুধু তার আত্মিক সুখের জন্য, অতি নাটকীয় এক বীরত্বপূর্ণ কা ও মহানুভবতার জন্য এই সব কিছুকে বিসর্জন দিতে হবে। আর তার ফলে একটি নারী হাসপাতালে অসহায়ভাবে মারা যাবে আর তার সন্তান পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। এক বিরাট অঞ্চলের অধিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, শুধু একটি লোককে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যে শাস্তির পরিমাণ বেশি নাও হতে পারে। আর আমার বিব্রত বিবেককে শান্ত করার জন্য। কিন্তু এটা এক উন্মাদের কাজ ছাড়া আর কিছুই না। কোনও বোঝাভারে আমার বিবেক যদি বিপন্ন হয় সেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু তার জন্য অপরের প্রতি, সমাজের প্রতি তার যে কর্তব্য আছে তাতে জলাঞ্জলি দিতে পারে না।

উঠে সে আবার ঘরের ভিতর পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। তার মনে হলো এতক্ষণে তার বিবেক শান্ত হয়েছে। মাটির অন্ধকার গর্তেই হীরক পাওয়া যায়, তেমনি মনের অন্ধকারেই পাওয়া যায় শুভ্রোজ্জ্বল সত্য। মনের সেই অন্ধকার গহ্বরে নেমে গিয়ে সেখানে অনেকক্ষণ ধরে হাতড়ে বেড়িয়ে সত্যের যে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড খুঁজে পেয়েছে, সে হীরক এখনো জ্বলজ্বল করছে তার উপর।

সে ভাবল, এইটাই ঠিক পথ। ঠিক পথ দেখাবার জন্য সব মানুষেরই একটা নীতি থাকা দরকার। আমার এখন মনস্থির হয়ে গেছে। অবস্থা যেমন আছে থাক, ঘটনার স্রোত যেভাবে যে পথে বয়ে যায় যাক, আমি আর কোনও কিছু ভাবব না, আমার মধ্যে আর কোনও দ্বিধা বা দৌর্বল্যচিত্ততা থাকবে না। আমি যেমন মঁসিয়ে ম্যাদলেন আছি তেমনিই তা থেকে যাব। যে লোকটা ভলজাঁ নামে চলে যাচ্ছে, তাতে তার যা হয় হবে। আমি আর ভলজাঁ নই। আমি তাকে চিনি না, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তার উপর যদি অন্য লোকের নাম চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা বুঝতে হবে দৈবক্রমে সেটা ঘটে গেছে এবং দৈবই তার জন্য দায়ী। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে একবার নিজের চেহারাটার পানে তাকাল। বলল, ওঃ, স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারার কি একটা আরাম! আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এক নতুন মানুষ।

আবার সে পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভিতরে। একবার থেমে ভাবল, সে যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তখন তার সম্ভাব্য পরিণামের কথাকে ভয় করলে চলবে না। এই ঘরের মধ্যে এমন অনেক জিনিস এখনো আছে যা ভলজাঁ নামের সঙ্গে জড়িত এবং সেগুলো নষ্ট না করলে বা সরিয়ে না দিলে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে তা গণ্য হতে পারে। সে একটা চাবি বার করে দেওয়ালের গায়ের একটা আলমারির তালা খুলে একটা পুরনো নীল রঙের জামা, একটা কম্বল, একজোড়া পায়জামা, একটা পিঠের উপর ঝোলানো ব্যাগ আর একটা লাঠি বার করল। ১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসে দিগনের পথে-ঘাটে কেউ যদি জাঁ ভলজাঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখে থাকে তাহলে সে এই সব জিনিসগুলো দেখে অবশ্যই চিনতে পারবে।

বিশপের দেওয়া দুটো রুপোর বাতিদানসহ এই জিনিসগুলো সে যত্ন করে রেখে দিয়েছে, কারণ যেদিন থেকে সে নতুন জীবন শুরু করে সেদিনকার অর্থাৎ জীবনের সেই সন্ধিক্ষণের এক স্মারক চিহ্ন হিসাবে কাজ করবে জিনিসগুলো। কিন্তু জেলখানার ব্যবহৃত পোশাক ও জিনিসগুলো সে লুকিয়ে রাখলেও বিশপের বাতিদান দুটো সে প্রকাশ্যে রেখে দিয়েছে।

সে একবার চকিতে দরজার দিকে তাকাল। খিল দেওয়া থাকলেও হঠাৎ দরজাটা খুলে যাবে বলে ভয় হচ্ছিল তার। তারপর সে তার অতীত জীবনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে দেওয়া সব জিনিসগুলো আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। তার সেই ব্যাগ লাঠি যত কিছু। আলমারিটা একেবারে খালি হলেও সেটায় আবার তালাবন্ধ করে দিল। একটা কাঠের জিনিস টেনে এনে আলমারির সামনে রেখে সেটাকে আড়াল করে রেখে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সব পুরনো জিনিসের বান্ডিলটাতে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুনের শিখাটা বেড়ে যাওয়ায় সমস্ত ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল। লাঠিটা পোড়ার সময় তার থেকে ফটফট করে আওয়াজ হচ্ছিল।

তার পিঠের ব্যাগটা যখন পুড়ছিল তখন তার ভিতরকার সব কিছু পুড়ে গেলেও

একটা জিনিস পুড়ল না। সেটা চকচক করছিল। একটু কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যেত সেটা হলো সেই পেতিত গার্ভের চল্লিশ স্যুর মুদ্রাটা। তার কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। সে তখন সমানে পায়চারি করে যাচ্ছিল।

সেই আগুনের আভায় রুপোর যে বাতিদান দুটো চকচক করতে থাকে সেদিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল তার। সে ভাবল, জাঁ ভলজাঁর আর একটা স্মৃতিচিহ্ন আর এটা একটা অভ্রান্ত প্রমাণ। ওগুলোকেও সরিয়ে ফেলতে হবে।

এই ভেবে সেগুলোকে নামিয়ে আনল সে।

আগুনটা তখনো বেশ জোর ছিল। তাতে ও দুটো ফেলে দিলে সেগুলো গলে গিয়ে একতাল ধাতুতে পরিণত হবে। আগুনের ধারে বসে রইল সে কিছুক্ষণ। বেশ একটা আরাম বোধ হচ্ছিল। ভাবল তাপটা বেশ আরামদায়ক। একটা বাতিদান দিয়ে আগুনের কাঠগুলোকে ঘাঁটতে লাগল। আর এক মিনিট পরেই ও দুটোকে ফেলে দেবে আগুনে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তার ভিতরকার এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল তার কানে, জাঁ ভলজাঁ, জাঁ ভলজাঁ!

তা শুনে ভয় পেয়ে গেল ভলজাঁ। তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

সেই কণ্ঠস্বর আবার বলে চলল, তাই হোক। যা আরম্ভ করেছ, তোমার সেই আরব্ধ কাজ শেষ করে ফেল। বাতিদান দুটো ধ্বংস করে ফেল। সব স্মৃতি মুছে ফেল, বিশপকে ভুলে যাও। সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধু নিজের ভালটার কথা ভাব। তোমার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেছে। একটা বুড়ো লোক যে কি ঘটেছে না ঘটেছে তার কিছুই জানে না, যার উপর তোমার নামটা চাপিযে দেওয়াই তার একমাত্র অপরাধ, তোমার জায়গায় সে জেলে যাবে, বাকি জীবনটা তার জেলেই দাসত্বের মধ্য দিয়ে কেটে যাবে। আর তুমি হবে এক বিশিষ্ট নাগরিক, সর্বজনশ্রদ্ধেয় সম্মানিত মঁসিয়ে লে মেয়র। তুমি এই নগরকে সমৃদ্ধশালী করে তুলবে, গরীব-দুঃখীদের মুখে অন্ন যোগাবে, অনাথ শিশুদের রক্ষা করবে, অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে এক সুখী জীবন যাপন করবে আর তখন অন্য একজন হতভাগ্য লোক তোমার নাম ধারণ করে হাতে হাতকড়া আর গায়ে নীল জামা পরে পতনের শেষ প্রান্তে চলে যাবে। ঘটনাগুলো কিভাবে তোমার ভাগ্যের অনুকূল হয়ে উঠেছে দেখ।

তার কপালে ভ্রূ যুগলের উপরে ঘাম দিতে শুরু করেছিল। সে আগুনের দিকে একবার তাকাল। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সেই অদৃশ্য বক্তার কণ্ঠস্বর তখনো একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। তার কথা তখনো শেষ হয়নি।

সে কণ্ঠস্বর আবার বলতে লাগল, অনেকে তোমার প্রশংসা করবে, অনেকে তোমায় আশীর্বাদ করবে। কিন্তু একজন সে সব প্রশংসা বা আশীর্বাদের কথা কিছুই শুনবে না। সে শুধু তার চারপাশে ঘিরে থাকা অন্তহীন অন্ধকারের ভিতর থেকে সারাজীবন ধরে অভিশাপ দিয়ে যাবে তোমায়। এটা কিন্তু মনে রেখো, মানুষ যা

কিছু আশীর্বাদ পায় জীবনে তা স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারে না, শুধু অভিশাপগুলোই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছয়।

কণ্ঠস্বরটা আত্মার গভীর থেকে আসছিল বলে প্রথমে ক্ষীণ ছিল, কিন্তু ক্রমশ সেটা জোরাল হয়ে তার কানে এমনভাবে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল যে তার মনে হলো ঘরের ভিতর থেকে কথা বলছে। শেষের কথাটা এত জোর শোনাল যে সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল, কেউ আছে এখানে ?

তারপর নিজের প্রশ্নে নিজেই হাসতে হাসতে জবাব দিয়ে বলল, আমি একটা বোকা, এখানে কেউ নেই।

একজন অ·াশ্য ছিল, কিন্তু তাকে চোখে দেখা যায না।

বাতিদান দুটো আগুনের কাছ থেকে তুলে নিয়ে যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিল। তার ক্রমাগত বিষণ্ন পায়চারির শব্দে নিচেরতলায় একটি ঘুমন্ত লোকের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটছিল।

এই ক্রমাগত পায়চারি আর ঘোরাফেরার কাজটা একই সঙ্গে তাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিচ্ছিল আর উত্তেজিত করে তুলছিল। অনেক সংকটজনক মুহূর্তে আমরা ইতস্তত ঘোরাফেরা করে কিছুটা স্বস্তি পাই। আমাদের চোখে দেখা বিভিন্ন বস্তু থেকে আমরা পরামর্শ বা সান্ত্বনা পেতে চাই। কিন্তু ভলজাঁ এখন যতই ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে লাগল ঘরের ভিতর ততই তার বর্তমানের জটিল অবস্থার প্রতি সচেতনতাটা বেড়ে যেতে লাগল। শ্যাম্পম্যাথিউ নামে লোকটাকে জাঁ ভলজাঁ মনে করে হয়ত ভুল করা হয়েছে এবং যে ঘটনাটা ঈশ্বরের বিধানে তার আত্মিক মুক্তির জন্য দৈবাৎ ঘটে গেছে, সে ঘটনা তার পায়ের তলা থেকে সব মাটি কেড়ে নিচ্ছে। সে পর পর দুটো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, কিন্তু এখন সে সিদ্ধান্তকেই অসম্ভব ভেবে বাতিল করে দিল।

এই চরম হতাশার মুহূর্তে নিজেকে ধরা দেওয়ার সব সম্ভাব্য পরিণামগুলোকে খুঁটিয়ে ভেবে দেখতে লাগল। ভেবে দেখতে লাগল তাতে সে কি হারাবে আর কি পাবে। যদি সে ধরা দেয় তাহলে তার এই বর্তমানের সুখী নির্দোষ জীবন, স্বাধীনতা, মানসম্মান, জনপ্রিয়তা সব কিছুকে বিদায় জানাতে হবে চিরদিনের জন্য। সে তাহলে আর মাঠে-ঘাটে স্বাধীনভাবে বেড়াতে পাবে না, পাখির গান শুনতে পাবে না, দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের পয়সা দিতে পারবে না, সাদর অভ্যর্থনা বা কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে কেউ তার পানে তাকাবে না। যে বাড়ি সে গড়ে তুলেছে, যে ছোট্ট ঘরটায় সে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করে সে বাড়িঘর তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার যে একমাত্র বৃদ্ধা ভৃত্য সকাল হতেই প্রতিদিন তাকে কফি করে এনে দেয়, আর সে তাকে কফি এনে দেবে না। এইসব আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। তার পরিবর্তে জেলখানার ভিতর শৃঙ্খলিত অবস্থায় লাল জামা পরে খেটে যেতে হবে, জেলখানার ছোট ঘরের মধ্যে কাঠের তক্তায় শুতে হবে এবং আর যে সব ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তাকে কাটাতে হবে তা তার সব জানা আছে। এই বয়সে এবং এত

কিছু সুখশান্তির পর! যদি সে যুবক থাকত বয়সে তাহলেও বা হত। কিন্তু এখন তার বয়স হয়েছে; এই বয়সে পায়ে লোহার বেড়ী পরে কত অপমান, কত গালাগালি সহ্য করতে হবে। প্রতিদিন জেলখানার প্রহরীকে সকাল-সন্ধ্যায় দু'বার করে লোহার বেড়ীপরা পাগুলো দেখাতে হবে। যে সব বাইরের লোক জেল পরিদর্শন করতে আসবে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। জেল কর্তৃপক্ষ তার সম্বন্ধে পরিদর্শককে বলবে, এই সেই বিখ্যাত জাঁ ভলজাঁ যে একদিন মস্ত্রিউল-সুর-মের শহরের মেয়র ছিল।...ভাগ্য, ভাগ্য মানুষের বুদ্ধির মতোই কুটিল, মানুষের মতোই নির্মম নিষ্ঠুর।

যতই সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগল ততই সে দেখল দুটো পথ খোলা আছে তার সামনে—হয় তাকে এই সুখের স্বর্গকে আঁকড়ে ধরে থেকে তাকে শয়তান হতে হবে অথবা নরকে ফিরে গিয়ে তাকে সাধু হতে হবে। কি সে করবে? কোনদিকে যাবে?

যে সব অন্তর্বেদনাকে কিছু আগে অতিকষ্টে মন থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিল সেগুলো আবার ফিরে এল তার মধ্যে, আবার তারা আচ্ছন্ন করে ফেলল তার মনটাকে, আবার তার চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে জটিল হয়ে উঠল। হতাশাজনিত একটা উদাসীন ভাব পেয়ে বসল তাকে। হঠাৎ তার স্মৃতিতে 'রোমানভিলে' এই নামটা ভেসে উঠল আর সেই সঙ্গে বহু দিন আগে শোনা একটা গানের দুটো ছত্র মনে পড়ল। বোমানভিলে প্যারিসের নিকটবর্তী এক বনের নাম যেখানে বসন্তকালে তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকারা লিলাক ফুল তুলতে যায়। সে যেন দেহে-মনে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পডছিল, চলৎশক্তি রহিত হযে পড়ছিল। শিশুর প্রথম হাঁটতে শেখার মতো টলছিল।

এই অবসাদ আর অনীহার সঙ্গে লডাই করতে কবতে সে তাব চিন্তার মধ্যে শৃঙ্খলা আনাব চেষ্টা করতে লাগল। যে উভযসংকট তার মনের স' শক্তিকে ক্ষয় করে দিয়েছে তার সম্মুখীন হয়ে এক স্থির সংকল্পে উপনীত হবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল সে। সে ধরা দেবে না চুপ করে থাকবে? কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বুঝতে পারল না সে। যে সব অস্পষ্ট ধারণাগুলো ভেসে বেড়াচ্ছিল তার মনের মধ্যে, সেগুলো কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠল সহসা, ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারল সে, যেদিকেই সে যাবে, যে পথই ধরবে, তাকে একটা জিনিস হারাতেই হবে। সে বাঁ দিকে বা ডান দিকে যেদিকেই যাবে, তার জীবনের সুখ অথবা ধর্মকে হারাতে হবে। একে একে আবার সব অনিশ্চয়তাগুলো ফিরে এল তার মনে। এত চিন্তার পরেও যেখান থেকে সে শুরু করেছিল সেখান থেকে এক পাও এগোতে পারল না।

এইভাবে এক দুঃসহ বেদনার মধ্য দিয়ে মনে মনে সংগ্রাম করে যেতে লাগল সে, যেমন আর একজন মানুষ তার আগে আঠারোশো' বছর ধরে সংগ্রাম করে গেছেন। সে এক রহস্যময় মানুষ যাঁর মধ্যে মানবজগতের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত সততা ও মহানুভবতা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে তাঁর চারদিকে যখন

অলিভ গাছের পাতাগুলো কাঁপছিল এবং যখন বারবার ভয়ঙ্কর এক পেয়ালা করে অন্ধকার পান করতে দেওয়া হয় তাঁকে তখন তিনি অন্ধকারের সে পেয়ালা প্রত্যাখ্যান করেন।

৪

ঘড়িতে রাত্রি তিনটে বাজল। পাঁচ ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত পায়চারি করছে সে ঘরে। একটুও থামেনি। অবশেষে সে চেয়ারটায় বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল।

অন্য সব স্বপ্নের মতো এ স্বপ্নও তার বর্তমান মর্মান্তিক অবস্থাকে নিয়েই গড়ে ওঠে। তবু স্বপ্নটা তার মনের উপর এমনভাবে রেখাপাত করে যে পরে সেকথা লিখে রাখে সে। তার মৃত্যুর পর যে সব দরকারী কাগজপত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে এই স্বপ্নের বিবরণটা পাওয়া যায়। এ স্বপ্ন হলো একটি রুগ্ন আত্মা হতে উদ্ভূত এক কল্পনা।

একটা খামের ভিতর স্বপ্নের বিবরণটা ভরা ছিল। তার উপর লেখা ছিল, 'সে রাতে আমি যা স্বপ্নে দেখি।'

আমি তখন এমন এক বিশাল বন্ধ্যা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ছিলাম যেখানে রাত-দিন বলে কিছু ছিল না। আমি তখন আমার ভাই-এর সঙ্গে পথ হাঁটছিলাম যে ভাই-এর কথা আমি আর ভাবি না এবং যার কথা আমি ভুলে গিয়েছি।

আমরা দু'জনে কথা বলতে বলতে পথ হাঁটছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে কত লোক চলে যাচ্ছিল। আমরা এমন একটি মহিলার কথা বলছিলাম যে মহিলাটি আমাদের প্রতিবেশিনী ছিল। যখন সে আমাদের পাড়ায় থাকত তখন সে সর্বক্ষণ তার ঘরের জানালা খোলা রেখে কাজ করত। কথা বলতে বলতেই আমরা যেন সেই খোলা জানালা দিয়ে আসা কনকনে ঠাণ্ডাটা অনুভব করছিলাম।

কোথাও কোনও গাছপালা ছিল না।

একটা লোক আমাদের খুব কাছ দিয়ে চলে গেল। সে ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন, তার গায়ের রংটা ছিল ধূসর। সে একটা ঘোড়ার উপর চড়ে যাচ্ছিল আর তার ঘোড়ার রংটা ছিল মাটির মতো। তার মাথায় চুল ছিল না। তার ন্যাড়া মাথায় শিরাগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। তার হাতে একটা যাদুকাঠি ছিল। যাদুকাঠিটা আঙুর গাছের ডালের মতো নরম হলেও লোহার মতো ভারী। সে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

আমার ভাই বলল, ঐ নিচু রাস্তাটা দিয়ে চল। কিন্তু সে পথে কোনও কাঁটাগাছ বা কোনও শ্যাওলা ছিল না। চারদিকে কোনও গাছপালা, ঘরবাড়ি কিছুই নেই, শুধু মাটি আর মাটি। আকাশটাও ছিল মাটি রঙের। আমি যেতে যেতে কি একটা কথা বললাম। কিন্তু কোনও উত্তর পেলাম না, দেখলাম আমার ভাই চলে গেছে। এরপর আমি একটা গাঁয়ে চলে গেলাম। গাঁটা দেখে বুঝলাম গাঁটার নাম রোমানভিলে।

যে রাস্তা দিয়ে আমি গাঁটাতে ঢুকলাম সেটা একেবারে জনশূন্য ছিল। আমি অন্য একটা পথ ধরে এগোতে লাগলাম। সে রাস্তাটার এক কোণে একজন লোক গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ জায়গাটার নাম কি, আমি এখন কোথায়?' কিন্তু সে কোনও উত্তর দিল না। আমি তখন একটা বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

সেই বাড়ির ভিতরে প্রথম যে ঘরটা পেলাম তার মধ্যে কোনও লোক ছিল না। আমি অন্য একটা ঘরে গেলাম। সে ঘরের পিছন দিকের দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কার বাড়ি? জায়গাটার নাম কি?' কিন্তু কোনও উত্তর দিল না সে। সেই বাড়ির পিছনে একটা বাগান ছিল।

আমি সেই বাগানে চলে গেলাম। বাগানে কোনও লোক ছিল না। কিন্তু ভিতরে এগিয়ে যেতেই দেখলাম একটা গাছের পিছনে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ বাগানটা কিসের বাগান? আমি কোথায়?' সে কোনও উত্তর দিল না।

আমি গাঁয়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। দেখলাম, সেটা একটা শহর। কিন্তু পথে কোনও লোক নেই। সমস্ত বাড়ির দরজা খোলা, কোনও লোক নেই। কোনও বাড়ি বা রাস্তায় একটা জ্যান্ত লোককেও দেখতে পেলাম না। কিন্তু প্রতিটি রাস্তার শেষ প্রান্তে, প্রতিটি ঘরের পিছনের দেওয়ালে, বাগানের প্রতিটি গাছের পিছনে একটা করে লোক দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের মুখে কোনও কথা নেই। কিন্তু একসঙ্গে একটার বেশি লোক কোথাও দেখিনি আমি। আমি চলে যাচ্ছিলাম। তারা আমার পানে তাকিয়ে ছিল।

আমি শহর ছেড়ে মাঠে চলে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম এক বিরাট জনতা আমার পিছু পিছু আসছে। শহরে যে সব লোককে আমি দেখেছিলাম সেই জনতার ভিড়ের মধ্যে তাদের দেখতে পেলাম। কোনও ব্যস্ততা না দেখিয়েও তারা আমার থেকে জোরে হাঁটছিল। তারা পথ হাঁটার সময় মুখে কোনও শব্দ করছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আমাকে ঘিরে ফেলল। তাদের মুখগুলো মাটি রঙের।

শহরে ঢুকেই আমি প্রথমে যাকে প্রশ্ন করেছিলাম সেই লোকটা আমাকে বলল, কোথায় যাচ্ছ তুমি? তুমি কি জান না তুমি অনেক আগেই মরে গেছ?

আমি উত্তর দেবার জন্য মুখ খুলতেই দেখি সেখানে কেউ নেই।

স্বপ্নটা ভেঙে যেতেই উঠে পড়ল সে। তার খুব ঠাণ্ডা লাগছিল। তখনো ভোর হয়নি, তবু ভোরের মতোই উতল ঠাণ্ডা বাতাসের আঘাতে জানালার কপাটগুলো থেকে শব্দ হচ্ছিল। আগুনটা নিবে গেছে। বাতিটা জ্বলতে জ্বলতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাত্রি তখনো শেষ হয়নি।

ঘুম থেকে উঠেই জানালার ধারে গেল সে। দেখল আকাশে তখন কোনও তারা

ছিল না। খোলা জানালা দিয়ে সে বাড়ির উঠোন আর রাস্তা দেখতে পাচ্ছিল। পথ থেকে একটা শব্দ কানে আসছিল তার। শব্দটা শুনে নিচে তাকাল সে। দেখল দুটো লাল তারা যেন বড় রাস্তাটার ওধার থেকে এগিয়ে আসছে তার বাড়ির দিকে। যতই এগিয়ে আসছে ততই সেগুলো বড় হয়ে উঠছে আকারে। পরে সে বুঝতে পারল ওটা এক ছোট্ট ঘোড়ার গাড়ি। ছোট ধরনের একটা সাদা ঘোড়া টেনে আনছে গাড়িটাকে। পথের উপর ঐ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনেই চমকে উঠেছিল সে।

সে ভাবল, এ সব গাড়ি কেন? এ সময় কে গাড়ি ডেকেছিল?

এমন সময় তার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল এবং প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, কে ডাকে?

আমি, মঁসিয়ে মেয়র।

সে বুঝতে পারল যে বুড়ি মেয়েটি তার বাড়িতে কাজ করে এ তার কণ্ঠস্বর। তখন সে বলল, ঠিক আছে, কি ব্যাপার?

একটু পরেই পাঁচটা বাজবে মঁসিয়ে।

ঠিক আছে।

গাড়ি এসে গেছে।

কি গাড়ি?

ঘোড়ার গাড়ি।

কেন?

মঁসিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেননি?

সে বলল, না।

ড্রাইভার বলছে সে আপনার জন্যই গাড়িটা এনেছে।

কোন ড্রাইভার?

মাস্টার শফেয়ারের ড্রাইভার।

হঠাৎ সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সব কিছু মনে পড়ে গেল তার। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাস্টার শফেয়ার।

ঠিক এই সময় তার মুখের উপর এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যে বুড়ি মেয়েটি তা দেখলে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ত।

এরপর ভলজাঁ চুপ করে রইল। বাতিটার দিকে তাকিয়ে কিছুটা মোম নিয়ে সে গোল করে পাকিয়ে আঙুলের মধ্যে ধরে রইল।

এবার বুড়ি মেয়েটি অসহিষ্ণু হয়ে বলল, মঁসিয়ে, ওকে কি বলব?

ওকে বল, আমি যাচ্ছি।

৫

সে কালে অ্যারাস আর মন্ত্রিউল-সুর-মের শহরের মধ্যে যে সব ডাকগাড়ি যাতায়াত করত সে সব গাড়িগুলো দু'চাকার এবং ছোট। তাতে মাত্র দুটো সীট থাকত—তার

একটাতে ড্রাইভার আর একটাতে একজন যাত্রী বসত। একটা বড় কালো ডাকবাক্স গাড়ির পিছনে চাপানো থাকত।

সেদিন সাতটার সময় অ্যারাস থেকে একটা ডাকগাড়ি ছেড়ে প্যারিস মেলের ডাক নিয়ে মন্ত্রিউল শহরে যখন পৌঁছল তখন ভোর পাঁচটা বাজতে কিছু বাকি। গাড়িটা শহরে ঢোকার আগে সেদিন পাহাড় থেকে নামার সময় একটা ঢালের উপর একটা সাদা ঘোড়ায় টানা একটা দ্রুতগতি ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে ডাকগাড়িটার। ডাকপিওন উল্টোদিক থেকে আসা গাড়িটার চালককে গাড়ি থামাতে বলে, কিন্তু একটা বড় কোট পরে যে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছিল সে গাড়ি না থামিয়ে জোরে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

ডাকপিওন বলল, লোকটা শয়তানের মতো গাড়ি চালাচ্ছে।

কিন্তু ডাকপিওন যদি জানত যে ঐভাবে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে কে এবং কেনই বা এত কষ্ট করে এই সময়ে গাড়ি চালিয়ে কোথায় যাচ্ছে তাহলে অনুকম্পা জাগত তার মনে। তাহলে সে কখনই এ কথা বলতই না। আসলে কোথায় যাচ্ছে লোকটা নিজেই তা জানে না। সে অ্যারাসের দিকেই যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে একথা বুঝতে পারায় সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠছিল তার।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে। তার মনে হচ্ছিল নরকের অন্ধকার গর্ভে নেমে যাচ্ছে সে। এক অদৃশ্য শক্তি তাকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল আর একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে টানছিল পিছন থেকে। তার মনের অবস্থাটা তখন এমনই ছিল যে সেকথা সকলেই বুঝতে পারলেও কেউ তা ভাষায় ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারবে না। এমন কেউ কি আছে যে এই ধরনের এক কৃষ্ণকুটিল অনশ্চিয়তাকে জীবনে অন্তত একবার অনুভব করেছে? সে কোনও কিছুই সংকল্প করেনি, কোনও কিছুই সিদ্ধান্ত করেনি, সে কিছুই ঠিক করেনি। বেদনার যে জটিল আবর্তে তার বিবেক আবর্তিত হচ্ছিল সে আবর্ত থেকে কোনও সংকল্প বা সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসতে পারল না। এত চিন্তাভাবনার পরেও যেখান থেকে সে রওনা হয়েছিল সেখানেই ফিরে এসেছে সে।

কিন্তু অ্যারাসে কেন সে যাচ্ছে?

যে যুক্তি সে গাড়ি ও ঘোড়া ভাড়া করার সময় দেখিয়েছিল সেই যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করল সে।

পরিণামে যাই হোক, নিজের চোখে সব কিছু দেখে সিদ্ধান্ত নিলে তাতে কোনও ক্ষতি হবে না। কি ঘটেছে তা নিজে গিয়ে জানা হবে বিজ্ঞজনোচিত কাজ। নিজে ভাল করে না দেখে বা ভাল করে খুঁটিয়ে সব বিচার না করে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে না। দূর থেকে উইঢিবিকেও পর্বত বলে মনে হয়। শ্যাম্পম্যাথিউকে ভাল করে দেখে যদি বোঝে সে নিঃসন্দেহে এক অপদার্থ ব্যক্তি তাহলে তার বিবেকই তাকে বলে দেবে সে তার জায়গায় জেলখানায় যাক। অবশ্য জেভার্ত থাকবে, গ্রিভেত, শিনেলদো, কোশেপেন নামে যে সব পুরনো কয়েদীরা তাকে চিনত তারাও থাকবে

সেখানে, কিন্তু তারা কেউ বর্তমানের ম্যাদলেন নামধারী ভলজাঁকে চিনতে পারবে না কিছুতেই। কোনওক্রমে তাদের পক্ষে তাকে চেনা সম্ভব নয়। এমন কি জেভার্তও ভুল করেছে। সমস্ত সন্দেহ এবং অনুমান কেন্দ্রীভূত হয়েছে শ্যাম্পম্যাথিউর উপর।

সুতরাং তার কোনও বিপদ নেই। তবু এটা তার জীবনে সবচেয়ে অন্ধকারময় মুহূর্ত। কিন্তু এ জীবন তাকে যাপন করতেই হবে। তার ভাগ্য যত খারাপই হোক তার হাতের মুঠোর মধ্যে আছে। এখন সে নিজেই তার ভাগ্য গড়ে তুলবে। সে এই চিন্তাটাকেই আঁকড়ে ধরে রইল।

অ্যারাসে যাবার কোনও আন্তরিক ইচ্ছা তার ছিল না।

যাই হোক, সে যেখানে যাচ্ছে ঘণ্টায় সাত-আট ঘণ্টা বেগে ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে চালাচ্ছে তার দিকে।

সকাল হতেই গাড়িটা একটা ফাঁকা প্রান্তরে গিয়ে পড়ল। সে দেখল মন্ত্রিউল শহর অনেক পিছনে পড়ে গেছে। সে দেখল সামনে দূর দিগন্তে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। শীতের সকালের ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বইছিল। সন্ধ্যাবেলার মতো সকালবেলাতেও অনেক বস্তুকে প্রেতের মত্যে দেখায়। গাছপালা ও পাহাড়ের মাথাগুলো ছায়া-ছায়া অন্ধকারে ভূতের মতো দেখাচ্ছিল। তবে সে সব কালো মূর্তি দেখে চিনতে পারছিল বস্তুগুলোকে।

পথের ধারে একটা বিচ্ছিন্ন বাড়ি দেখতে পেল ভলজাঁ। বাড়িটার লোকজন তখনো ঘুমিয়ে আছে। সে ভাবল, এখনো ঘুমোচ্ছে লোকগুলো? আমরা যখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে থাকি তখন ঘোড়ার ক্ষুর, গাড়ির চাকা প্রভৃতির শব্দ আমাদের ভাল লাগে, কিন্তু বিষণ্ন অবস্থায় থাকলে এই সব শব্দকে ভাল লাগে না।

এই সব বস্তুকে সে ভালভাবে না দেখলেও তাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিল এবং তাদের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন উপস্থিতি তার মনের উত্তেজিত অবস্থাটাকে বিষাদে ভরিয়ে দিচ্ছিল।

ভলজাঁ যখন হেদসিনে পৌঁছল তখন রোদ উঠে গেছে। তার নিজের বিশ্রাম আর ঘোড়াটাকে খাওয়াবার জন্য একটা হোটেলে গিয়ে উঠল।

শফেয়ার ঠিকই বলেছিল ঘোড়াটা ছিল বুলোনাই জাতীয়। তার মাথাটা আর পেটটা মোটা। ঘাড়টা ছোট। তবে বুকটা চওড়া, পাগুলো দড়ির মতো সরু সরু। কিন্তু পায়ের ক্ষুরগুলো খুব শক্ত। পাগুলো তীব্র গতিসম্পন্ন। ঘোড়াটাকে দেখতে কদাকার, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ। ঘোড়াটা দু'ঘণ্টায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করেছে, অথচ একটু ঘাম ঝরেনি তার দেহে।

গাড়ি থেকে নামেনি ভলজাঁ। হোটেলের একটা ছেলে এসে ঘোড়াটাকে খাবার দিল। সে গাড়ির বাঁদিকের চাকাটা দেখে বলল, আপনি কি এই গাড়ি নিয়ে অনেক দূরে যাচ্ছেন?

কেন?

আপনি কি অনেক দূর থেকে আসছেন?

প্রায় দশ মাইল।

তাই নাকি?

তার মানে?

ছেলেটা আর একবার গাড়ির চাকাটার দিকে তাকাল এবং দাঁড়িয়ে রইল। বলল, দশ মাইল পথ এসেছে বটে, কিন্তু আর এক মাইলও যেতে পারবে না।

ভলজাঁ গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। কি বলছ তুমি?

ছেলেটি বলল, এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে আপনি দশ মাইল পথ এসেছেন, অথচ গাড়িটা কোনও গর্তে পড়েনি। আপনি চাকাটা নিজে দেখতে পারেন।

চাকাটা সত্যিই ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পথে ডাকগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগায় তার দুটো নাভিদণ্ড ভেঙে যায় এবং তার মুহুড়িটা আলগা হয়ে যায়।

ম্যাদলেন ছেলেটাকে বলল, চাকা মেরামতের একজন লোক পাওয়া যাবে?

হ্যাঁ যাবে।

তুমি তাকে নিয়ে আসবে?

সে পাশেই থাকে, বুরগেলার্দ।

বুরগেলার্দ কাছেই ছিল। সে এসে চাকাটা দেখে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ম্যাদলেন বলল, তুমি কি চাকাটা এখন মেরামৎ করে দিতে পারবে?

হ্যাঁ মঁসিয়ে।

তাহলে কখন আমি গাড়ি নিয়ে রওনা হতে পারব?

আগামী কাল।

আগামী কাল!

একদিনের কাজ। মঁসিয়ের কি খুব তাড়াতাড়ি আছে?

হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি। আমাকে খুব জোর এক ঘণ্টা পরেই বার হতে হবে।

মঁসিয়ে, তা অসম্ভব।

তুমি যা টাকা চাও তাই দেব।

তাহলেও পারব না।

দু'ঘণ্টা সময় যদি দেওয়া হয়?

তবুও হবে না। আমাকে দুটো নাভিদণ্ড আর একটা মুহুড়ি তৈরি করতে হবে। আপনি আগামী কালের আগে যেতে পারবেন না।

আমার কাজ আজকেই সারতে হবে। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলবে না। মেরামৎ তাড়াতাড়ি না হলে অন্য একটা চাকা লাগিয়ে দিতে পার?

তার মানে?

তুমি চাকা মেরামৎ করো। তুমি একটা চাকা আমাকে বিক্রি করতে পার। তাহলে আমি এখনি যেতে পারি।

একটা চাকা? অন্য চাকা তো এতে লাগবে না। চাকা সব সময় জোড়া জোড়া বিক্রি হয়।

তাহলে একটা জোড়াই বিক্রি করো।

কিন্তু সে চাকা তো এ গাড়িতে লাগবে না।

তাহলে একটা গাড়ি ভাড়া করে দিতে পার?

বিক্রি করার মতো গাড়ি আমার নেই।

হালকা ধরনের কোনও গাড়ি নেই?

আমাদের গাঁটা ছোট। তবে আমার দোকানে একটা গাড়ি পড়ে আছে। এক ভদ্রলোক গাড়িটা মাঝে একবার করে ব্যবহার করেন। আমি গাড়িটা দিতে পারি, তবে মালিককে জানালে চলবে না। কিন্তু গাড়িটাকে দুটো ঘোড়ায় টানতে হবে।

আবার ডাকগাড়ির ঘোড়া ভাড়া করতে হবে।

আপনি কোথায় যাবেন?

আমি অ্যারাসে যাব।

আপনি আজকেই যেতে চান?

হ্যাঁ আজকেই যেতে হবে।

আপনার পরিচয়পত্র আছে?

হ্যাঁ।

কিন্তু তা হলেও আপনি আগে পৌঁছতে পারবেন না। পথে অনেক পাহারা। তাছাড়া এখন চাষীদের মাঠে চাষ দেওয়ার সময়। এক একটা জায়গায় দেরি হবে।

ম্যাদলেন বলল, তাহলে আমাকে গাড়ি ছেড়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে। আমাকে একটা জিন কিনে দিতে পার?

হ্যাঁ। কিন্তু এটা চড়ার ঘোড়া?

ও, তাও তো বটে। তুমি মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছ। এ তো পিঠে জিন লাগাতে দেবে না।

তাহলে?

তাহলে এ গাঁ থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করে দাও।

কিন্তু আপনি তো এখানে কোনও ভাড়া পাবেন না আর কিনতেও পাবেন না।

তাহলে আমি কি করব?

আমার পরামর্শ যদি নিতে চান তাহলে বলব আমাকে চাকাটা মেরামত করতে দিন এবং আগামী কাল আপনি যাবেন।

ম্যাদলেন বলল, অ্যারাস যাবার ডাকগাড়ি কখন আসবে?

চাকা মেরামতকারী মিস্ত্রী বলল, আজ রাত্রিতে আসবে, তার আগে নয়।

কিন্তু চাকাটা মেরামত করতে সারাদিন লাগবে?

হ্যাঁ, দুটো লোক লাগালেও সারাদিন লাগবে। দশজন লাগালেও তার আগে হবে না।

এ গাঁয়ে কোনও গাড়ি পাওয়া যাবে না?

না।

আর কোনও চাকা মেরামতের লোক নেই?

হোটেলের সেই ছেলেটা আর বুরগেলার্দ একসঙ্গে দু'জনে ঘাড় নাড়ল।

এটা নিশ্চয় ঈশ্বরের বিধান। ম্যাদলেন একটা পরম স্বস্তি অনুভব করল। দৈবক্রমে তার গাড়ির চাকাটা ভেঙে গেছে। যে দৈব বিধানকে সে অবহেলা করেছিল এটা হলো সেই দৈব বিধানের নির্দেশ। অ্যারাসে যাবার জন্য সে যথাশক্তি চেষ্টা করেছে। সমস্ত সম্ভাবনা সে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে। দারুণ শীত, পথক্লান্তি বা খরচ কোনও দিক দিয়েই সে দমে যায়নি। কোনও দিক দিয়ে নিজেকে নিজের গাফিলতির জন্য তিরস্কার করার কিছু নেই। যদি সে আর যেতে না পারে তাহলে তাতে তার কোনও দোষ, তার কিছু করার নেই। তার জন্য ঐশ্বরিক বিধানই দায়ী।

জেভার্তের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার পর থেকে এই প্রথম একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ম্যাদলেন। যে লোহার একটা হাত কুড়ি ঘণ্টা ধরে তার বুকের ভিতরটা শক্ত করে রেখেছিল সে হাতটা সহসা আলগা হয়ে গেল। তার সহায় এবং তিনি সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন। নিজেকে সে বলল, সে যা কিছু করার করেছে এবং এখন সে তার বিবেককে সহজেই শান্ত করতে পারবে।

এতক্ষণ ধ'ে তাদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হচ্ছিল সে সব কথাবার্তা যদি হোটেলের ভিতরে হত এবং তা বাইরের কেউ না শুনত তাহলে ব্যাপারটার এখানেই অবসান ঘটত, তাহলে এরপর আর কোনও ঘটনা ঘটত না। কিন্তু গাঁয়ে কোনও নবাগত এলে এবং সেই সঙ্গে কোনও বিষযে কোনও কথাবার্তা হলে সাধারণত তা আর পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ম্যাদলেন যখন হোটেলেব ছেলেটা আর বুরগেলার্দের সঙ্গে তার গাডির চাকা নিযে কথা বলছিল তখন তাদের কাছে ছোটখাটো একটা ভিড জমে যায়।

এমন সময ভিডের মধ্য থেকে একটা ছেলে বেরিযে ছুটে গিযে গাঁযের এক বুডিকে ডেকে আনে।

ম্যাদলেন যখন এ বিষযে একেবারে মনস্থির করে ফেলেছিল ॰খন সেই বুডি তার সামনে এসে বলল, মঁসিযে, আপনি কি একটা ছোট গাডি ভাডা করতে চান?

সরলভাবে উচ্চাবিত এই সামান্য নির্দোষ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘাম দেখা দিল ম্যাদলেনের শরীরে। যে লোহার হাতটা আগে তার গলাটা ধরে রেখেছিল সে হাতটা আবার অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তার গলাটা ধরার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

ম্যাদলেন বলল, হ্যাঁ ম্যাদাম একটা গাড়ি ভাডা করতে চাই, কিন্তু কোনও গাডি পাওয়া যাচ্ছে না।

বুড়ি বলল, কিন্তু গাড়ি আছে।

কোথায়?

আমার বাড়ির উঠোনে।

ম্যাদলেন আবার ভযে কাঁপতে লাগল। সেই লোহার অদৃশ্য হাতটা আবার তার গলাটা টিপে ধরল।

বুড়িটার বাড়ির উঠোনে সত্যিই একটা গাড়ি পড়ে ছিল। হোটেলের ছেলেটা আর বুরগেলার্দ একজন খরিদ্দারকে হারাতে হবে ভেবে হতাশ হয়ে গাড়িটার নিন্দা করতে লাগল। বলল, গাড়িটা খারাপ, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে চাকাগুলোতে মরচে পড়ে গেছে। এই চাকাভাঙা গাড়িটা ভাড়া করা মোটেই ভাল হবে না। সে গাড়ি নিয়ে এত পথ যাওয়া উচিত হবে না এবং সেটার উপর নির্ভর করা বাতুলতার কাজ হবে।

কথাটা সত্যি এবং গাড়িটা পুরনো হলেও গাড়িটার দুটো চাকা ছিল। ম্যাদলেন তার গাড়িটা মেরামত করতে দিয়ে বুড়িকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভাড়াটে গাড়িটাতে ঘোড়াটাকে জুড়ে অ্যারাসের পথে তখনি রওনা হয়ে পড়ল।

সে নিজের মনে মনে স্বীকার করল, কিছুক্ষণ আগে তাকে আর যেতে হবে না ভেবে আনন্দ অনুভব করছিল। এখন সেই আনন্দের কথা ভেবে রেগে গেল সে। সে আনন্দকে অবান্তর মনে হলো তার। মোটের উপব সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতেই অ্যারাস যাচ্ছে। কেউ যেতে বাধ্য করেনি তাকে। সে নিজে অন্য মত না করলে সে যাওয়া বন্ধ হবে না।

হেদসিন গাঁটা ছেড়ে আসতেই একটা ছেলের গলা শুনতে পেল ম্যাদলেন। যে ছেলেটা বুড়িকে ডেকে দেয় সেই ছেলেটা তাকে গাড়ি থামাতে বলছিল চিৎকার করে। সে ছুটতে ছুটতে আসছিল গাড়ির পিছু পিছু।

ম্যাদলেন বলল, কি চাই?

ছেলেটা বলল, আমিই আপনার গাড়িভাড়ার ব্যবস্থা করে দিই, আমাকে কিছু দিলেন না।

ম্যাদলেন সাধারণত দানশীল হলেও সে দেখল ভাডা হিসাবে বুডিকে সে যথেষ্ট দিয়েছে। সুতরাং এ দাবি অতিরিক্ত। তাই সে বলল, তুমি আর কিছু পাবে না।

এই বলে ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে গাড়িটা চালিযে দিল।

পনের মাইল পথ যাওয়ার পর সেন্ট পল নামে একটা জায়গায় এসে একটা হোটেলে উঠল ম্যাদলেন।

হোটেল মালিকের স্ত্রী এসে বলল, মঁসিয়ে, কিছু খাবেন?

ম্যাদলেন বলল, হ্যাঁ, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

মহিলাটির মুখখানা বেশ হাসিখুশিতে ভরা। ম্যাদলেন তার পিছু পিছু হোটেলের ভিতর নিচু ছাদওয়ালা একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। টেবিলের উপর অয়েলক্লথ পাতা ছিল।

ম্যাদলেন বলল, তাড়াতাড়ি করো, আমার সময় নেই।

এতক্ষণে তার মনে পড়ল তার প্রাতরাশ খাওয়া হয়নি।

তাকে খাবার দেওয়া হলে ম্যাদলেন একটা রুটি কামড়ে খেয়ে আর খেতে পারল না। পাশের একজন লোককে জিজ্ঞাসা করল, এখানকার রুটি তেঁতো কেন?

যাই হোক, এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার রওনা হয়ে পড়ল ম্যাদলেন। এরপর সে গিয়ে থামবে তিনকেতে। অ্যারাস থেকে তিনকে বারো মাইলের পথ।

অ্যারাস যাবার পথে কি ভাবছিল সে? সকালের মতোই পথের ধারে ধারে গাছপালা, খড়ের ঘর, চষা মাঠ প্রভৃতি দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে যেতে লাগল সে। এই সব দৃশ্যমান বস্তুগুলো এক একটা চিন্তার আকার ধারণ করতে লাগল। প্রথম এবং শেষবারের মতো অসংখ্য বস্তু দেখার মতো দুঃখজনক এবং মর্মান্তিক আর কিছুই হতে পারে না। কোনও দূর পথে ভ্রমণ করতে যাওয়া মানেই জীবন-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অজস্র রূপান্তর লাভ করা। আমাদের মনের মধ্যে অনেক সময় আমাদের জীবন আর বহির্জগতের চলমান দৃশ্যাবলী সমান্তরালভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলে। আলো-অন্ধকারে মিলে মিশে জীবনের সব উপাদানগুলো আমাদের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যেতে চায়। আমরা তখন দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে যাই তাদের। এইভাবে পথে যেতে যেতেই আমরা হঠাৎ বৃদ্ধ হয়ে পড়ি। অজস্র অভিজ্ঞতা আর চিন্তার মধ্য দিয়ে আমাদের বয়স বেড়ে যায়। ঘনায়মান অন্ধকারে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। আমাদের সামনে দেখি একটা কালো দরজা, আমাদের জীবনকে মনে হয় এক পলাতক অশ্বের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট এক অসহায় সওয়ার। সেই কালো দরজাটার ওপারের ছায়ান্ধকারে অবগুণ্ঠিত এক অচেনা মানুষ সেই সওয়ারকে নামাবার জন্য প্রতীক্ষায় থাকে।

ম্যাদলেন যখন তিনকেতে পৌঁছল তখন গোধূলি হয়ে আসছিল। ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তারা দেখল একটা ঘোড়ার গাড়ি করে একজন পথিক ঢুকল শহরে। ম্যাদলেন তিনকেতে থামল না। শীতের দিনে তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে যায়। শহর থেকে ম্যাদলেন যখন গাড়ি চালিয়ে বেবিয়ে যাচ্ছিল তখন একটা লোক রাস্তা মেরামত করতে করতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আপনি কি অ্যারাসে যাচ্ছেন?

ম্যাদলেন বলল, হ্যাঁ।

কিন্তু সেখানে যেতে আপনার অনেক সময় লাগবে।

ম্যাদলেন তার ঘোড়ার লাগাম ধরে বলল, অ্যারাস এখান থে' কতদূর?

পুরো চৌদ্দ মাইল।

সেকি! ভাবের লোক বলছে দশ মাইলের কিছু বেশি।

কিন্তু রাস্তা মেরামত হচ্ছে। আপনাকে ঘুরে যেতে হবে।

অন্ধকার হয়ে আসছে, পথ হারিয়ে ফেলব।

আপনি এ অঞ্চলের লোক নন?

না।

আপনি তিনকের একটা ভাল হোটেলে রাতটা কাটান। আপনার ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হোটেলের ছেলেটাকে বলে একট .ঘাড়া ভাড়া করার ব্যবস্থা করুন।

লোকটার পরামর্শমতো ম্যাদলেন তিনকের সেই হোটেলে গেল। আধঘণ্টার মধ্যে একটা বাড়তি ঘোড়া ভাড়া করে গাড়িটাতে জুড়ল। হোটেলের ছেলেটাকে পথ দেখাবার জন্য সঙ্গে নিল। ম্যাদলেন তাকে বলল, ঠিক পথে গাড়ি চালাও। আমি তোমাকে ডবল মজুরি দেব।

পথের সামনে একটা গাছের ডাল পড়ে ছিল। ছেলেটা বলল, এই পথটা অন্ধকারে দুর্গম হয়ে ওঠে। আমরা ভোর হওয়ার আগে অ্যারাসে পৌঁছতে পারব না।

ম্যাদলেন বলল, একটা দড়ি আর ছুরি আছে তোমার কাছে?

ছেলেটা বলল, আছে।

ম্যাদলেন ছুরি দিয়ে ডালটা কেটে পরিষ্কার করল। তাতে কুড়ি মিনিট কেটে গেল। তারপর গাড়িটা চলতে লাগল ঠিকমতো।

এরপর ওরা একটা ফাঁকা মাঠ পেল। ধোঁয়ার মতো কুয়াশায় মাঠটা আর পাহাড়ের মাথাগুলো ঢেকে ছিল। আকাশে মেঘ ছিল। সমুদ্র থেকে ছুটে আসা বাতাসের গর্জন শোনা যাচ্ছিল। শীতের রাতের কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপছিল ম্যাদলেন।

শীতের হাওয়া ম্যাদলেনের হাড় ভেদ করে কাঁপুনি ধরাচ্ছিল। গতকাল রাত থেকে সে কিছু খায়নি। অতীতের আর এক রাতের কথা মনে পড়ল তার। সে রাতে দিগনের প্রান্তে ফাঁকা মাঠটায় একা একা পথ হাঁটছিল সে। সেটা আট বছর আগের কথা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কালকের কথা।

চার্চের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল।

ছেলেটা বলল, অ্যারাস এখান থেকে মাত্র ছ' মাইল। আমরা আটটার সময় পৌঁছে যাব।

এবার ম্যাদলেনের প্রথম মনে হলো যে কাজের জন্য সে এত চেষ্টা করে এল অ্যারাসে সেই কাজই পণ্ড হয়ে গেল। তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। সে জানে না মামলাটা কখন হবে। আগে সময়টা জেনে নেওয়া উচিত ছিল। সে সময়ে যেতে পারবে কি না তা না জেনে এত তাড়াহুড়ো করে এখানে আসা উচিত হয়নি। সে এখন হিসেব করে দেখতে লাগল। সাধারণত কোর্টের অধিবেশন বসে সকাল ন'টায়। এ মামলা বেশিক্ষণ চলবে না। আপেল চুরির মামলা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। তারপর আছে সনাক্তকরণের ব্যাপারটা। কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। উকিলদের বলার কিছু নেই। সে অ্যারাসে পৌঁছবার আগেই হয়ত সব শেষ হয়ে যাবে।

ছেলেটা ঘোড়াটাকে চাবুক মারল। ওরা নদী পার হয়ে মঁ সেন্ট এলয় পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল।

তখন রাত্রির অন্ধকার আরও ঘন হয়ে উঠল।

৬

এদিকে ঠিক সেই রাতে ফাঁতিনের একেবারে ঘুম হয়নি। সারারাত কেশেছে, প্রবল জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকেছে। কুস্বপ্ন দেখেছে। পরদিন সকালে ডাক্তার এসে দেখল সে তখনো প্রলাপ বকছে। ডাক্তার বিচলিত হয়ে পড়ল এবং বলল, মঁসিয়ে ম্যাদলেন ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

সারা সকাল ফাঁতিনে কেমন উদাসীন হয়ে রইল। সে বিছানার চাদরটা হাতের মুঠোয় ধরে রইল। নিজের মনে দূরত্ব গণনা করতে লাগল। তার চোখদুটো কোটরে

ঢুকে গিয়েছিল। চোখের দৃষ্টিটা শূন্য এবং নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছিল, কিন্তু এক এক সময় আকাশের তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর আলো ছেড়ে অনেক অন্ধকার পার হয়ে স্বর্গের আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সিস্টার সিমপ্লিস যতবার ফাঁতিনেকে সে কেমন আছে তা জিজ্ঞাসা করেছে ততবারই সে বলেছে, খুব ভাল, আমি শুধু মঁসিয়ে ম্যাদলেনকে দেখতে চাই।

কয়েক মাস আগে ফাঁতিনে যখন সব লজ্জা ও শালীনতা ঝেড়ে ফেলে এক ঘৃণ্য ও অবাঞ্ছিত জীবন যাপন করতে শুরু করে তখন তাকে দেখে মনে হয় আগেকার সেই সুন্দরী ফাঁতিনের সে যেন ছায়ামাত্র। এখন আবার রোগে ভুগে ভুগে তার চেহারা আরও খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাকে তারই প্রেতাত্মার মতো মনে হচ্ছিল। তার দৈহিক রুগ্নতা আত্মিক রুগ্নতাকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। মাত্র পঁচিশ বছরের এক যুবতী বলে তাকে চেনাই যাবে না। তার কপালে কুঞ্চন দেখা দিয়েছে, ঘাড়ের হাড় বেরিয়ে গেছে। মুখে সব দাঁত নেই, গালে মাংস নেই। রুগ্ন চুলগুলোতে জট পাকিয়ে গেছে। রোগ মানুষের বয়সকে অনেক বাড়িয়ে দেয় অল্প দিনের মধ্যে।

ডাক্তার আবার দুপুরের দিকে এল। নার্সদের কিছু নির্দেশ দিল। ম্যাদলেন এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করল।

মঁসিয়ে ম্যাদলেন রোজ বেলা তিনটের সময় দেখতে আসত ফাঁতিনেকে। এ বিষয়ে তার নিয়মানুবর্তিতার অভাব হত না। সেদিন বেলা আড়াইটে বাজতেই অধৈর্য হয়ে উঠল ফাঁতিনে। সে প্রায়ই ক'টা বাজে তা ঘন ঘন জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

ঘড়িতে তিনটে বাজতেই বিছানায় উঠে বসল ফাঁতিনে। অথচ তার নড়াচড়ার ক্ষমতা ছিল না। তার হলুদ হয়ে যাওয়া শীর্ণ হাত দুটো জড়ো করা ছিল। দরজার দিকে তাকিয়ে ফাঁতিনে এমনভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যাতে মনে হলো তার বুকের উপর থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেছে।

কিন্তু কেউ দরজা খুলে ঘরে ঢুকল না।

এইভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে পনের মিনিটকাল বসে রইল ফাঁতিনে। মনে হচ্ছিল তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে। ভয়ে কথা বলতে পারছিল না নার্স। ঘড়িতে সওয়া চারটের একটা ঘণ্টা বাজতেই হতাশ হয়ে সে বালিশের উপর ঢলে পড়ল। সে কোনও কথা বলল না। শুধু বিছানার চাদরের আঁচলটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রইল।

এইভাবে আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দ হতেই আগ্রহভরে উঠে বসল সে। দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু দর: খুলে কেউ না আসায় আবার হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল।

তার মনের মধ্যে কি ছিল তা সবাই জানত। সে নিজে কিন্তু কোনও কথা বলত না, কারো বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করত না। সে শুধু কাশত। মর্মবিদারক তার সে কাশি দেখে মনে হত তার হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে যাবে। একটা বিরাট ছায়া

ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তার গোটা দেহটাকে। তার গালদুটো বিবর্ণ ও ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে আর ঠোঁট দুটো নীল দেখাচ্ছে।

অবশেষে পাঁচটা বাজলে ফাঁতিনেকে ক্ষীণ কণ্ঠে এক অনুযোগ করতে শোনা গেল, কাল আমি চলে যাচ্ছি, অথচ আজ তিনি এখনো এলেন না।

মঁসিয়ে ম্যাদলেন এখনো এল না দেখে সিস্টার সিমপ্লিস নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল ফাঁতিনে। সে যেন কি স্মরণ করার চেষ্টা করছিল। খুব নিচু গলায় একটা ঘুমপাড়ানি গান গাইতে শুরু করল সে। যখন তার মেয়ে খুব ছোট ছিল তখন এই গানটা গেয়ে ঘুম পাড়াত তাকে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এ গানের কথা একবারও মনে পড়েনি তার। গানটা ছিল বড় করুণ ও মধুর। তার সুরের মধ্যে ছিল সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, লাভ-ক্ষতির একটা মিশ্রিত অনুভূতি। ফাঁতিনে গানটা এমন হৃদয়গ্রাহী করে গাইল যে তা শুনে হাসপাতালের নার্সরা পর্যন্ত কেঁদে ফেলল। সিস্টার সিমপ্লিসের মতো নিষ্ঠুর প্রকৃতির মেয়ের চোখেও জল এল।

ঘড়িতে ছ'টা বাজল। কিন্তু সেদিকে আর কোনও খেয়াল করল না ফাঁতিনে। সে তার চারপাশের কোনও কিছুর দিকে একবার তাকালও না।

সিস্টার সিমপ্লিস একসময় হাসপাতালের একজন ঝিকে ম্যাদলেনের কারখানায় পাঠাল। মেয়র ফিরেছে কি না সে দেখে এসে খবর দেবে। মেয়েটি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। ফাঁতিনে তখন স্তব্ধ হয়ে শুয়ে কি ভাবছিল।

মেয়েটি ফিরে এসে সিস্টারকে চুপি চুপি জানাল, মঁসিয়ে ম্যাদলেন আজ সকাল হতেই একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন আজ রাতে নাও ফিরতে পারেন। কেউ কেউ বলছে তাঁকে নাকি অ্যারাসের কোনও এক রাস্তায় দেখা গেছে।

সিস্টার সিমপ্লিস যখন মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছিল চুপি চুপি তখন তা দেখে হঠাৎ বিছানার উপর উঠে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফাঁতিনে। তার হাতের মধ্যে বিছানার চাদরের আঁচলটা ধরা ছিল।

ফাঁতিনে হঠাৎ বলে উঠল, তোমরা মঁসিয়ে ম্যাদলেনের কথা বলছ। কিন্তু চুপি চুপি বলছ কেন? তিনি কি করছেন এখন? কেন তিনি আসেননি?

তার গলার স্বর পুরুষের কণ্ঠস্বরের মতো মোটা শোনাচ্ছিল। সে আবার তাদের বলল, উত্তর দাও আমার কথার।

সিস্টার সিমপ্লিস বলল, তাঁর ভৃত্য বলেছে তিনি আজ আসতে পারবেন না। শুয়ে পড় বাছা। শান্ত হও। তা না হলে রোগ আরও বেড়ে যাবে।

সে কথায় কান না দিয়ে ফাঁতিনে জোরে চিৎকার করে বলল, আসতে পারবেন না? কিন্তু কেন পারবেন না? তোমরা তার কারণ জান। তোমরা সেকথা বলাবলি করছিলে। আমি তা জানতে চাই।

হাসপাতালের সেই ঝি সিস্টারকে বলল, বল তিনি মিটিং-এ গেছেন।

সিস্টার সিমপ্লিসের মুখখানা অপ্রতিভ হয়ে উঠল। তাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে। আবার ভাবল সে যদি সত্যি কথা বলে তাহলে তার এই বর্তমান অবস্থায় সেকথার পরিণাম হবে মারাত্মক। যাই হোক, সব কুণ্ঠা সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সে ফাঁতিনের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, শহরের বাইরে গেছেন।

ফাঁতিনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তার পায়ের উপর ভর দিয়ে বসল। এক অনির্বচনীয় সুখের ভাব ফুটে উঠেছিল তার মুখের উপর। সে বলল, তিনি কসেত্তেকে আনতে গেছেন।

তার মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। এক নীরব নিরুচ্চার প্রার্থনায় ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। একটু থেমে সে আবার বলতে লাগল, আমি এবার শুয়ে পড়ব। আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব। কিছুক্ষণ আগে আমি খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। তোমাদের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলেছি। আমি জানি সেটা অন্যায়। আশা করি তোমরা আমায় ক্ষমা করবে। আমি এখন সুখী। ঈশ্বর বড় দয়ালু। মঁসিয়ে ম্যাদলেনও আমার প্রতি বড় দয়ালু। তিনি আমার কসেত্তেকে আনতে গেছেন মঁতফারমেল হতে।

সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল শান্তভাবে। সিস্টার বালিশটা ঠিক করে দিল। নার্স তাকে একটা রুপোর ক্রস দিয়েছিল। তার গলায় সেটা ঝুলছিল। সে সেটাকে চুম্বন করল।

সিস্টার সিমপ্লিস বলল, চুপ করে শুয়ে থাক। তোমার আর কথা বলা উচিত নয়।

ফাঁতিনে তার একটা উত্তপ্ত হাত বাড়িয়ে দিল। তার গায়ে তখনো প্রবল জ্বর ছিল দেখে সিস্টার ব্যথা পেল।

ফাঁতিনে তবু বলে যেতে লাগল, তিনি প্যারিসের দিকে গেছেন। কিন্তু তাঁকে অতদূর যেতে হবে না। মঁতফারমেল হলো প্যাবিসের বাঁ দিকে স্বল্প কিছু দূরে। গতকাল আমি যখন তাঁকে কসেত্তের কথা বলেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন, 'শিগ্গির এসে যাবে।' সেকথা মনে আছে তোমাদের? তিনি আমাকে চমক লাগিয়ে দিতে চান। তিনি থেনার্দিয়েরদের একটা চিঠি লিখে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। সব টাকা মিটিয়ে দিলে তারা আমার মেয়েকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। সব টাকা মিটিয়ে দিয়ে কেউ কখনো কারো ছেলেকে ধরে রেখে দিতে পারে? দয়া করে আমাকে কথা বলতে নিষেধ করবে না সিস্টার। আমার এখন খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি এখন সুস্থ। আমি কসেত্তেকে দেখতে পাব। আমার এখন খিদে পেয়ে গেছে। পাঁচ বছর তাকে আমি দেখিনি। মার উপর সন্তানের প্রভাব কতখানি তা জান না তোমরা। তোমরা দেখবে মেয়েটা দেবদূতের মতো। শৈশবে তার হাতের আঙুলগুলো সরু সরু আর গোলাপী ছিল। তার হাতদুটো খুব সুন্দর হবে। এখন তার বয়স সাত। এখন অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে। আমি তাকে কসেত্তে বলে ডাকি। তার আসল নাম হলো ইউফ্রেসি। আজ সকালেই আমার মনে হয়েছিল আমি তাকে শীঘ্রই দেখতে পাব। নিজের সন্তানকে বছরের পর বছর না দেখে থাকা যায় না।

সেটা উচিতও নয়। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী ; চিরকাল কেউ বাঁচে না। মঁসিয়ে ম্যাদলেন তাকে আনতে গিয়ে খুব ভাল কাজ করেছেন। আজ খুব ঠাণ্ডা ছিল, তাই নয় কি ? আমার মনে হয় তাঁর একটা খুব গরম ওভারকোট আছে এবং তাঁরা আগামী কালই এসে যাবেন। কাল শুভ দিন। কাল ফিতেওয়ালা জামাটা পরার কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবে তো! মঁতফারমেল এখান থেকে অনেক দূর। আমি একদিন সেখান থেকে সমস্ত পথ হেঁটে এসেছি। কত কষ্ট! কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি খুব তাড়াতাড়ি যায়। তারা কালই এসে পড়বে। মঁতফারমেল এখান থেকে কত দূর ?

দূরত্ব সম্বন্ধে সিস্টারের কোনও ধারণা ছিল না। সে বলল, তিনি আগামী কালই নিশ্চয় এসে পড়বেন।

ফাঁতিনে বলল, কাল আমি কসেত্তেকে দেখব। কাল। কাল। হে আমার প্রিয় সিস্টার, আমার কোনও রোগ নেই। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছি। তোমরা আমাকে বললে আমি এখন নাচতেও পারব।

যারা তাকে মাত্র পনের মিনিট আগে দেখেছে তারা এখন তাকে দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে আপন মনে কি বলছিল। সন্তান গর্বে গরবিনী মাতার আনন্দে আনন্দিত শিশুর মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সিস্টার বলল, ঠিক আছে, এখন তুমি যখন খুশি, তাহলে আমাদের কথা শোনা উচিত তোমার। তুমি আর কথা বলবে না।

ফাঁতিনে শান্ত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, আমি যখন আমার সন্তানকে ফিরে পাচ্ছি তখন আমি ভাল হয়ে উঠব।

এই কথা বলে সে নীরবে শুয়ে পড়ল। শুধু বিস্ফারিত চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল।

সে এবার ঘুমিয়ে পড়বে ভেবে সিস্টার মশারিটা মেলে দিল।

সন্ধে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে ডাক্তার এল। কোনও শব্দ না করে ডাক্তার মশারিটা তুলে দেখল ফাঁতিনে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

ফাঁতিনে বলল, আমার মেয়েটার জন্য আমার পাশে একটা ছোট বিছানা পাততে হবে। ঘরেতে জায়গা আছে।

ডাক্তার ভাবল ফাঁতিনে ভুল বকছে। সে সিস্টার সিমপ্লিসকে জনান্তিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কথা বলল। সিস্টার সিমপ্লিস বলল, মঁসিয়ে ম্যাদলেন দু' একদিনের জন্য বাইরে গেছেন। কিন্তু রোগিণী ফাঁতিনে ভেবেছে তিনি তার মেয়েকে আনার জন্য মঁতফারমেলে গেছেন। কিন্তু সে তার ভুল ভাঙেনি এবং তাকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছে যে তিনি মঁতফারমেলে গেছেন। ডাক্তার তা সমর্থন করে আবার ফাঁতিনের বিছানার পাশে গেল।

ফাঁতিনে বলল, সারারাত আমি তার শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পাব। আমার ভাল ঘুম হয় না রাতে। সকালে সে জেগে উঠলেই আমি তাকে সুপ্রভাত জানাতে পারব।

ডাক্তার বলল, তোমার হাত দাও।

ফাঁতিনে তার হাতটা বাড়িয়ে হেসে উঠল। বলল, দেখুন আমি অনেকটা ভাল আছি। আগামী কাল কসেত্তে এখানে এসে যাবে।

রোগীর অবস্থা এখন ভাল দেখে ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে গেল। রোগীর হাতের নাড়ীর স্পন্দন আগের থেকে অনেক বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার মনের সেই চঞ্চল অবস্থাটা আর নেই। এক নতুন জীবনের ঢেউ যেন তার অবসন্ন দেহটাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছে।

ফাঁতিনে বলল, সিস্টার আপনাকে বলেনি ? মেয়র নিজে আমার মেয়েকে আনতে গেছেন।

ডাক্তার তাকে চুপ করতে বলল। গোলমাল করতে নার্সদের নিষেধ করল। সে কুইনাইন আর একটা হালকা ধরনের ওষুধের পিলের ব্যবস্থা করল। যদি রাতে জ্বর বাড়ে তাহলে তাকে খাওয়াতে হবে। সে যাবার সময় সিস্টারকে বলল, রোগীর অবস্থার সত্যিই উন্নতি হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে মেয়র যদি সত্যিই তার মেয়েকে নিয়ে আসেন তাহলে ভাল হয়। এ ধরনের কত আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। বড় রকমের সুখ বা আনন্দ অনেক সময় আশ্চর্যভাবে রোগ সারিয়ে তোলে। রোগটা ভিতরে ভিতরে বেড়ে গেছে ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়। হয়ত তাকে আমরা সারিয়ে তুলতে পারব। হয়ত সে এ যাত্রা বেঁচে যাবে।

৭

রাত্রি আটটার সময় ম্যাদলেনের গাড়িটা অ্যারাসের হোটেল দ্য লা পোস্তের গেটের মধ্যে ঢুকল। গাড়িটা দেখেই হোটেলের ভৃত্যরা অভ্যর্থনা জানাতে এল নবাগতকে। ম্যাদলেন গাড়ি থেকে নেমে অন্যমনস্কভাবে স্বল্প কথায় তাদের অভ্যর্থনার উত্তর দিল। তারপর বাড়তি ভাড়াটে ঘোড়াটা সেই ছেলেটার মারফৎ পাঠিয়ে দিয়ে তার ঘোড়াটা আস্তাবলে নিয়ে গেল। এর পর সে নিচের তলায় বিলিয়ার্ড খেলার ঘরটা খুলে একটা টেবিলের ধারে চেয়ারে বসল। সে একটানা চৌদ্দ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে এসেছে। তার আসার কথা ছিল ছ'টার মধ্যে। কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য সে দায়ী নয়। সুতরাং এ বিষয়ে কোনও ক্ষোভ বা আক্ষেপ ছিল না তার অন্তরে।

হোটেল মালিকের স্ত্রী ঘরে ঢুকে বলল, মঁসিয়ে রাত্রিতে থাকবেন তো ? আপনার খাবার লাগবে ?

ম্যাদলেন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

হোটেলওয়ালী বলল, শুনছি আপনার ঘোড়াটা খুব ক্লান্ত। তার দু'দিন বিশ্রাম দরকার।

ম্যাদলেন বলল, এখানে ডাকঘর আছে ?

হোটেলওয়ালী বলল, হ্যাঁ মঁসিয়ে।

সে ম্যাদলেনকে ডাকঘরে নিয়ে গেল। সেখানে সে জানতে পারল মন্ত্রিউল-সুর-মের

যাবার জন্য যে ডাকগাড়ি ছাড়বে রাতে তাতে ডাকপিওনের পাশে একটা সীট আছে। টাকা দিয়ে সেই সীটটা সংরক্ষণ করে রাখল ম্যাদলেন। কেরানি তাকে সতর্ক করে দিল গাড়ি ছাড়বে রাত ঠিক একটার সময়।

ম্যাদলেন হোটেল থেকে বেরিয়ে শহরে গেল। শহরের রাস্তাগুলো অন্ধকার। অ্যারাসে সে কখনো আসেনি এর আগে। এখানকার পথঘাট তার অচেনা। কিন্তু কাউকে পথ নির্দেশের জন্য কোনও কথা বলল না। ক্রিনশান নদী পার হয়ে সে একটা সরু গলিপথ ধরল। একটা লোক লণ্ঠনের আলো হাতে আসছিল।

ম্যাদলেন তাকে জিজ্ঞাসা করল, মঁসিয়ে, আমাকে আদালতে যাবার পথটা বলে দিতে পারেন ?

লোকটি ছিল বয়োপ্রবীণ। সে বলল, আপনি বোধ হয় এ শহরে নতুন ? আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। কারণ আমি সেখানেই যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি পুলিশ অফিসে। কোর্টঘর এখন মেরামত করার জন্য পুলিশ অফিসেই কোর্ট বসে।

দাগী আসামীদের জটিল মামলার বিচার সেখানেই হয় ?

হ্যাঁ। বিপ্লবের আগে বর্তমানের এই পুলিশ অফিস ছিল বিশপের বাড়িতে। বিশপের নাম ছিল মঁসিয়ে কলদো। তিনি বিরাশি বছর বয়সেও বিশপের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একটা বড় হলঘর নির্মাণ করেন। এখানেই এখন মামলার শুনানি হয়।

ওরা দু'জনে একসঙ্গে পথ চলতে লাগল। বয়স্ক লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কোনও বিচার দেখার জন্য এসেছেন ? কিন্তু আপনার দেরি হয়ে গেছে। ছ'টাতে কোর্ট বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু ওরা কোর্টঘরের কাছাকাছি গিয়ে দেখল একটা বড় বাড়ির বড় বড় চারটে খোলা জানালা দিয়ে আলোর ছটা আসছে।

লোকটি বলল, আপনার ভাগ্য ভাল। হয়ত কোন বিচারে বেশি সময় লাগার জন্য এখনো শেষ হয়নি কোর্টের কাজ। নিশ্চয় কোনও ফৌজদারি মামলা। আপনি কি সাক্ষ্য দিতে এসেছেন ?

ম্যাদলেন বলল, না। আমি কোনও বিশেষ মামলার জন্য আসিনি। আমি একজন অ্যাটর্নীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ভদ্রলোক বলল, তাহলে আপনি সোজা ঐ সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে যান। দারোয়ান আছে ওখানে।

ম্যাদলেন মিনিটকতকের মধ্যেই একটা বড় ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরটাতে তখন অনেক মানুষের ভিড় ছিল। এক একজন উকিল জটলা পাকিয়ে নিচু গলায় কথা বলছিল। আদালতের মাঝখানে কালো পোশাকপরা এই সব উকিলদের ঘোরাফেরা করতে দেখে ভয় লাগে। তাদের কথাবার্তা থেকে কোনও দয়া বা করুণার আভাস পাওয়া যায় না। কবে কার বিরুদ্ধে হাকিম কি রায় দেবে তা বোঝা যায় না। অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানো এক ঝাঁক পোকার মতো দেখায় তাদের।

হলঘরের পাশে আর একটা বড় ঘর ছিল। একটামাত্র বাতির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল ঘরটা। ঘরের দুটো দরজাই বন্ধ ছিল।

প্রথমে সামনে যে উকিলটাকে দেখতে পেল তাকে ম্যাদলেন বলল, মামলাটা কতক্ষণ চলছে স্যার?

মামলা হয়ে গেছে।

হয়ে গেছে?

ম্যাদলেনের গলার স্বর শুনে উকিল তার পানে তাকাল। বলল, আপনি আসামী পক্ষের কোনও আত্মীয়?

না। এখানে আমি কাউকে চিনি না। একটা রায় বেরোবার কথা ছিল।

হ্যাঁ। কোনও কিছু করার ছিল না।

কি রায় বার হলো?

যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।

ম্যাদলেন এরপর খুব নিচু গলায় অস্পষ্টভাবে বলল, সনাক্তকরণের ব্যাপারটা?

সনাক্তকরণ? সনাক্তকরণের তো কোনও প্রশ্নই ছিল না। এ তো সোজা সরল ঘটনা। মহিলাটি তার সন্তানকে খুন করে। শিশুহত্যা প্রমাণিত হয়। জুরীরা শুধু পূর্বপরিকল্পিত এই কথাটা বাতিল করে দিয়েছেন। মহিলাটির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

ম্যাদলেন আশ্চর্য হয়ে বলল, মহিলা!

হ্যাঁ। লিমোসিন তার নাম। আপনি কি ভেবেছিলেন?

সে যাই হোক, কোর্টের কাজ সব হয়ে গেলেও এখনো আলো জ্বলছে কেন?

আর একটি মামলার বিচার চলছে। কয়েক ঘণ্টা আগে মামলার কাজ শুরু হয়।

মামলাটা কি?

এটাও সোজা ব্যাপার। একজন ভূতপূর্ব কয়েদী, চুরির অপরাধে অপরাধী। নামটা ভুলে গেছি। দেখে বোঝা যায় লোকটা একটা পাকা বদমায়েস। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই জেলে পাঠাতে ইচ্ছা করে।

আচ্ছা মঁসিয়ে, অফিস ঘরে আমি একবার ঢুকতে পারি?

এটা কিন্তু খুবই মুস্কিল। কোনও আসন খালি নেই। এখন বিরাত চলছে। তবে আবার কাজ শুরু হলে দু'একজন উঠে যেতে পারে।

উকিল চলে গেলে ম্যাদলেন ভাবতে লাগল। উকিলের কথাগুলো বরফের সূচের মতো তার গায়ে যেন বিঁধছিল। উকিল যখন বলল, মামলাটা এখনো শেষ হয়নি তখন তা শুনে সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কিন্তু সে শ্বাস স্বস্তি না বেদনার তা সে নিজেই বলতে পারবে না।

ম্যাদলেন ভাবতে ভাবতে ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। কোর্টের হাতে অনেক মামলা থাকায় বিচারপতি একই দিনে দুটো মামলার নিষ্পত্তি করে ফেলার হুকুম দিয়েছেন। প্রথমে শিশুহত্যা এবং পরে জেলফেরৎ কয়েদীর মামলাটা ওঠে। তার বিরুদ্ধে আপেল চুরির অভিযোগটা প্রমাণিত হয়নি। সে তুলঁর জেলখানায় অনেকদিন ছিল, এটাই তার বিরুদ্ধে এখন সবচেয়ে বড় আপত্তি। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণের কাজ সব হয়ে গেছে।

কিন্তু সরকারপক্ষের উকিল আর আসামীপক্ষের অ্যাটর্নীর মধ্যে বিতর্ক হওয়ার জন্য মামলাটা রাত পর্যন্ত চলবে। সরকারপক্ষের উকিলের বেশ নামডাক ছিল। তিনি কোনও মামলায় হারতেন না। তিনি বেশ মার্জিত রুচির লোক ছিলেন। তিনি কবিতা লিখতেন।

বিচারপতি যে ঘরে দরজা বন্ধ করে ছিলেন সেই ঘরের দরজায় একজন ঘোষক দাঁড়িয়ে ছিল। ম্যাদলেন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ঘরের দরজা এখন খোলা হবে না?

ঘোষক বলল, না, খোলা হবে না।

কোর্টের কাজ আবার শুরু হলেও খোলা হবে না?

কোর্টের কাজ আবার শুরু হয়েছে। হলঘর ভরে গেছে। এখন খোলা হবে না।

তার মানে একেবারেই কোনও বসার জায়গা নেই?

ঘোষক বলল, বিচারপতির পিছনে দু'-একটা সীট আছে। কিন্তু সে সীট পদস্থ সরকারী কর্মচারিদের জন্য।

এই বলে সে পিছন ফিরল।

গতকাল সন্ধ্যা থেকে ম্যাদলেনের মনে যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল সে দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি। তার উপর আরও অনেক চিন্তা এসে ভিড় করল তার মনে। সে সিঁড়ির দিকে সরে গিয়ে তার বড় কোটের পকেট থেকে একটা নোটবই আর পেন্সিল বার করে লিখল, মঁসিয়ে ম্যাদলেন, মন্ত্রিউল-সুর-মের-এর মেয়র। তারপর সেই কাগজটা ঘোষকের হাতে দিয়ে বলল, এইটা বিচারপতির হাতে দাও।

৮

ম্যাদলেন জানত না মন্ত্রিউল-সুর-মের-এর মেয়র হিসাবে সে এক বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। তার নাম-যশ মন্ত্রিউল অঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তরোত্তর বাডতে বাড়তে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমগ্র অঞ্চলের ব্যবসা ও কাজকারবারের উন্নতিতে তার অবদান সাড়া মন্ত্রিউল জেলার অন্তর্গত ১৪১ টা কমিউনের মধ্যে এমন কোনও কমিউন ছিল না যার অধিবাসীরা কোনওভাবে উপকৃত হয়নি তার দ্বারা। বুলোনের কাঁচের কারখানা ছাড়াও ফ্রিভেন্ত ও বুবার-সুর-কার্শের সুতোর কারখানাগুলো তারই আর্থিক সাহায্যে উন্নতি করেছিল। ম্যাদলেনের নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা জাগত সবার মনে। অ্যারাস, দুয়াই প্রভৃতি শহরগুলো মন্ত্রিউল শহরের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষা অনুভব করত।

দুয়াই-এর রাজ-আদালতের কাউন্সিলার যিনি অ্যারাসের বিচারপতি হিসাবে কাজ করছিলেন তিনি ম্যাদলেনের নামটার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ঘোষক যখন বিচারপতির হাতে কাগজটা দিয়ে তাঁর কানের কাছে ঝুঁকে বলল, মেয়র মঁসিয়ে ম্যাদলেন এই মামলার শুনানি শুনতে চান, তখন বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে ম্যাদলেনকে নিয়ে আসতে বললেন। তিনি ম্যাদলেনের কাগজটার তলায় একটা লাইন লিখে দিলেন।

এদিকে ম্যাদলেন ঘোষকের হাতে কাগজটা দিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঘোষক ফিরে এসে তার সামনে নত হয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলল, দয়া করে হুজুর আমার সঙ্গে আসতে পারেন।

এই বলে সেই কাগজটা সে ম্যাদলেনের হাতে দিল। ম্যাদলেন দেখল তাতে লেখা আছে, 'বিচারপতি মঁসিয়ে ম্যাদলেনকে যথাযোগ্য সম্মান জানাচ্ছে।' কাগজটা মুড়ে গুটিয়ে ঘোষকের সঙ্গে ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। বিচারপতির লেখা কথাগুলো তার মুখে তিক্ত একটা জিনিস ফেলে দিয়েছে।

যে ঘরটায় ম্যাদলেনকে রেখে ঘোষক চলে গেল সে ঘরটার মাঝখানে সবুজ কাপডপাতা একটা টেবিলের উপর দুটো বাতি জ্বলছিল। ম্যাদলেন তখন এমন একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে পডেছিল যে অবস্থায় বাইরের বেদনার্ত পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের চিন্তাভাবনা সব সংগতি সব সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলল। ম্যাদলেন ভাবল এই সেই ঘর যে ঘরে বিচারকরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে আলোচনা করেন নিজেদের মধ্যে, এই ঘরে বসে তাঁরা এমন সব বিচারের রায় লেখেন যাতে কত জীবন নষ্ট হয়ে যায়, যে ঘরে তারও নাম উচ্চাবিত হবে এবং তার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। ভাবতে ভাবতে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকাল সে। এই ঘরে সে এসে দাঁড়িয়ে আছে ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে কিছু খায়নি। গাডির ঝাঁকুনিতে তার সর্বাঙ্গ ব্যথাহত হয়েছে। তবু এই মুহূর্তে ক্ষুধা বা ব্যথার কোনও অনুভূতিই ছিল না তার।

ম্যাদলেন দেখল সামনের দেওযালে জাঁ নিকোলাস পাশের লেখা একটা চিঠি কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় ছবির মতো ঝুলছিল। পাশে ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের আমলে প্যারিসের মেয়র। তিনিই ছিলেন 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু' এই বৈপ্লবিক ধ্বনির রচযিতা। এর পাশেই রাজতন্ত্রের যগের মন্ত্রী ও ডেপুটিদের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই সব মন্ত্রী ও ডেপুটদের আপন আপন ব. ৬তে অন্তরীন করে রাখা হয়েছিল। যে মনোযোগের সঙ্গে ম্যাদলেন সেই চিঠিটা পড়ছিল তাতে মনে হচ্ছিল এ বিষয়ে যেন তার একটা বিশেষ আগ্রহ আছে। আসলে কিন্তু চিঠিটার প্রতি তার কোনও সচেতনতাই ছিল না। সে শুধু সেই চিঠিটার দিকে তাকিয়ে ফাঁতিনে আর তার মেয়ের কথা ভাবছিল।

সহসা কোর্টের হলঘরে যাবার দরজার দিকে নজর পডল তার। পিতলের হাতলওয়ালা সেই দরজাটার কথা মনেই ছিল না তার। এতক্ষণে সেদিকে তার নজর পডতেই ভয় পেয়ে গেল সে। তার কপালে ও গালে কিছু কিছু ঘাম ফুটে উঠল।

হঠাৎ তার মধ্যে যেন একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। কে যেন তার ভিতর থেকে বলল, কে বলছে তোমাকে এই সব করতে? ঘর থেকে বেরিয়ে যে পথে এসেছিল সেই পথে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। মনে হলো সে যেন কার তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কেউ তাকে সামনে বা পিছন থেকে ডাকছে কিনা তা কান খাড়া করে শুনতে লাগল। কিন্তু কোনও শব্দই শুনতে পেল না। সে দেওয়াল ধরে একবার

দাঁড়াল। দারুণ ঠাণ্ডাতেও তার কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল সে। সে যেন কি ভাবছিল। গতকাল সারারাত এবং সারাদিন সে ভেবে এসেছে। অশ্রুত কণ্ঠে কে যেন তার ভিতর থেকে বলে উঠল, হায়!

এইভাবে পনের মিনিট কেটে গেল। অবশেষে গভীর বেদনায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথাটা নত করে ফিরে গেল সে। সে ধীর পায়ে আবার কোর্টঘরের দিকে হেঁটে চলল। সে পালিয়ে যাচ্ছিল। কে যেন তাকে আবার ধরে নিয়ে চলল।

কোর্টঘরে যেতেই প্রথমেই তার দরজায় পিতলের চকচকে হাতলটার উপর নজর পড়ল। সেটা যেন তারার মতো জ্বলজ্বল করছিল। সেইদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল দরজার দিকে। পাশের ঘর থেকে কিছু লোকের চাপা গুঞ্জনধ্বনি আসছিল। কিন্তু সে সব কিছুই শুনল না সে।

হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল। সে কিছু বুঝতে পারল না। সে দরজার হাতল ধরে দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকে পড়ল।

৯

তার পিছনে দরজাটা বন্ধ করে সামনে তাকাল। সমবেত জনতার সামনে যে ঘরে অপরাধীর বিচার চলছিল সে ঘরটা বেশ প্রশস্ত আর আলোকিত। ঘরটার একপ্রান্তে একদল পোশাকপরা ম্যাজিস্ট্রেট বসে ছিল। ঘরটার মধ্যে এক একসময় অনেকগুলো মানুষের কলগুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল আর এক একসময় সবাই চুপ করে যাওয়ায় ঘরটা স্তব্ধ হয়ে উঠছিল। দেওয়ালে কতকগুলি বাতি ঝুলছিল আর টেবিলের উপর পিতলের বাতিদানে বাতি জ্বলছিল। আলো-ছায়ায় ভরা সমস্ত ঘরখানায় এক বিষাদময় কঠোরতা বিরাজ করছিল। মানুষের জগতে যাকে বলে আইন আর ঈশ্বরের জগতে যাকে বলে ন্যায়বিচার তার নির্মম রথচক্র যেন অশ্রুত ধ্বনিতে সমস্ত ঘরখানার সব কিছুকে পিষ্ট করে চলে বেড়াচ্ছিল।

ম্যাদলেনের দিকে কেউ তাকাল না। সকলের দৃষ্টি তখন একদিকে নিবদ্ধ ছিল। দেওয়ালের গায়ে একটা বেঞ্চ পাতা ছিল। তার উপর একটা বাতি জ্বলছিল। সেই বেঞ্চের উপর একটা লোক বসে ছিল। তার দু'দিকে দু'জন পুলিশ তাকে পাহারা দিচ্ছিল।

এই সেই লোক।

তাকে খুঁজে নিতে হলো না ম্যাদলেনকে। তার চোখ আপনা থেকে সেদিকে চলে গেল। তার বুঝতে দেরি হলো না এই হলো সেই আসামী। ম্যাদলেন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল দু'জনের চেহারা একেবারে এক নয়। তবে সে যখন উনিশ বছর কারাবাসের পর এলোমেলো রুক্ষ চুল, অশান্ত দৃষ্টি আর নীল রঙের আলখাল্লা পরে দিগনের পথে পথে ঘুরে বেড়াত তখন তাকেও ঐ লোকটার মতো দেখাত।

সে মনে মনে একটা কথা ভেবে কেঁপে উঠল। মনে মনে বলল, হে ভগবান, আমাকেও ঐ রকম হতে হবে।

আসামীর বয়স অন্তত ষাট হবে। তার মুখ-চোখ দেখে তাকে বোকা বোকা দেখাচ্ছিল। তার চেহারার মধ্যে একটা রুক্ষ ভাব ছিল।

ম্যাদলেন ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে সরে গিয়ে তার জন্য পথ করে দিল। বিচারপতি তাকে দেখেই বুঝতে পারলেন এই লোকই মন্ত্রিউল শহরের মেয়র। তাকে দেখে মাথা নত করে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। অ্যাডভোকেট জেনারেল অফিসের কাজে কয়েকবার মন্ত্রিউল শহরে গিয়েছিলেন এর আগে। তাই তিনিও ম্যাদলেনকে দেখেই চিনতে পারলেন। তিনিও অভ্যর্থনা জানালেন।

এই সব সৌজন্য বা অভ্যর্থনায় ম্যাদলেনের কোনও খেয়াল ছিল না। সে হতবুদ্ধি হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল।

সে আগে এই সব কিছুই দেখেছে। কোর্টঘরের এই বিচারের দৃশ্য সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা আছে—এই বিচারপতি, উকিল, মুহুরি, পুলিশ, কৌতূহলী জনতা আজ হতে সাতাশ বছর আগে দেখেছে সে। আজ আবার দেখছে। এগুলো আজ আর কোনও দুঃস্বপ্নে দেখা অলীক বস্তু নয়, এগুলো সব জীবন্ত সত্য। অতীতে যে ভয়ঙ্কর সত্যের অন্ধকার অতল গহ্বরটা তাকে গ্রাস করেছিল, আজ আবার সেই গহ্বরটা তার সামনে গ্রাস করতে আসছে তাকে। ভয়ে চোখ বন্ধ করল সে। তবে আত্মার গভীরে কে যেন চিৎকার করে উঠল কাতরভাবে, না না, কখনো না।

যে মর্মান্তিক ঘটনা এই অবস্থার মধ্যে ফেলেছে তাকে সে ঘটনা তাকে যেন হতবুদ্ধি করে দিয়েছে একেবারে। তার মনে হলো সে যেন পাগল হযে যাবে। তার মনে হলো আজ হতে সাতাশ বছর আগে যে এক বিচারসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আজকের এই বিচারসভার সঙ্গে কোনও দিক দিয়েই কোনও অমিল নেই। সেই বিচারক, উকিল, পুলিশ—সেদিনও ছিল এমনি এক সন্ধ্যা। কোনও কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। শুধু সেদিনকার বিচারসভায় বিচারপতির মাথার উপরে কোনও ক্রস ছিল না। আজ কিন্তু বিচারপতির মাথার উপর একটা ক্রস আছে দেওয়া । আর আজ তার জায়গায় অন্য একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে যাকে লোকে জাঁ ভলজাঁ বলেই জানে। সেদিন ঈশ্বরের অনুপস্থিতিতেই বিচার হয় তার।

বিচারপতির পিছনে একটা খালি চেয়ার ছিল। ম্যাদলেন বসল তার উপর। তার কেবলি ভয় হচ্ছিল একজন হয়ত তাকে লক্ষ্য করছে। টেবিলের উপর একরাশ ফাইল থাকায় ওপাশের লোকরা তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। অথচ সে সব কিছু দেখতে পাচ্ছিল। ক্রমে তার বুদ্ধি ফিরে আসতে লাগল। বাস্তব অবস্থার প্রতি সচেতন হয়ে উঠল সে। সব কথাবার্তা কান পেতে শোনার চেষ্টা করতে লাগল সে।

জুরীদের মধ্যে মঁসিয়ে বামাতাবয় ছিল। ম্যাদলেন চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে জেভার্তের খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু তাকে দেখতে পেল না। সাক্ষীদের বেঞ্চির পাশে কেরানিদের টেবিল থাকায় সে ঠিক চিনতে পাচ্ছিল না। তাছাড়া ঘরের আলোর তেমন জোর ছিল না।

ম্যাদলেন যখন কোর্টঘরে ঢোকে তখন আসামীপক্ষের উকিল তার বক্তৃতা শেষ

করছিল। উপস্থিত সকলেই তার কথা মন দিয়ে শুনছিল। তিন ঘণ্টা ধরে শুনানি চলছিল। তিন ঘণ্টা ধরে সকলে একটা লোককে দেখে এসেছে। লোকটি এ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অপরিচিত। লোকটি হয়ত একেবারে বোকা, অথবা খুব বেশি চালাক—ভয়ঙ্কর এক বিপদের শঙ্কা আর সম্ভাবনার বোঝাভারে সে মূক অসহায় এক প্রাণীর মতো নিষ্পেষিত হচ্ছে অহোরহ। তার সম্বন্ধে কে কতটুকুই বা জানে?

সাক্ষীরা সাক্ষী দেবার সময় সকলেই একমত হয় তার পরিচয় সম্বন্ধে। বিচারের সময় আগে কিছু ঘটনার কথা জানা যায়। সরকারপক্ষের উকিল আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলে, আসামী শুধু এক পাকা চোরই নয়, সে শুধু ফল চুরিই করেনি, সে এক ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জেলফেরৎ কয়েদী। সে অনেকবার জেল ভেঙে পালিয়ে যায়। তার নাম জাঁ ভলজাঁ, এক দাগী অপরাধী পুলিশ যাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছে। তুলঁর জেল থেকে ছাড়া পাবার পরই সে বড় রাস্তায় পেতিত গার্ভে নামে একটি ছেলের কাছ থেকে বলপ্রেয়োগ করে পয়সা চুরি করে। এই অপরাধের জন্য অপরাধবিধির ৩৮৩ ধারামতে তার বৈধ পরিচয় প্রমাণিত হলে তাকে আমরা শাস্তি দিতে পারব। সে আরও একটা চুরি করেছে। এই শেষের চুরির জন্য আগে তাকে শাস্তি দিন। আগের চুরির বিচার পরে হবে। অভিযোগের বহর আর সাক্ষীদের কথা শুনে আসামী শুধু যারপরনাই বিস্মিত হয়। সে অঙ্গভঙ্গির দ্বারা সব অভিযোগ অস্বীকার করে। তাকে যে সব প্রশ্ন করা হয় তার সে বোকার মতো উত্তর দেয। তার মূল মনোভাব হলো সব কিছুকে অস্বীকার করা। এতগুলি বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকের আক্রমণের সামনে সে ছিল অসহায় এবং নির্বোধ। যে সমাজের কবলে সে ঘটনাক্রমে পড়ে গেছে তার কাছে সে বিদেশী। তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগই সম্প্রমাণিত হতে চলেছে। ত্যর বিরুদ্ধে মামলাটা জোরাল হয়ে উঠছে ক্রমশ এবং বিচারে তার কারাদণ্ডের সম্ভাবনাও বেড়ে চলেছে ক্রমশ। তার থেকে দর্শকরা যেন বেশি শঙ্কিত হয়ে উঠছে। এমন কি তার পরিচয় সাব্যস্ত হলে পেতিত গার্ভের পযসা চুরির জন্য তার মৃত্যুদণ্ড হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কি ধরনের লোক সে? তার এই আপাত ঔদাসিন্যের কারণ কি? সে কি খুব বেশি বোঝে না কিছুই বোঝে না? দর্শকদের মনে এই প্রশ্নই জাগে বারবার এবং জুরীরাও এই কথাই ভাবতে থাকে। ব্যাপারটা কেমন যেন কুৎসিত, যেন দুর্বোধ্য রহস্যে ভরা এক নাটক।

প্রচলিত রীতি অনুসারে আসামীপক্ষের উকিল জোরালো ভাষায় বক্তৃতা কবলেও তা তত ফলপ্রসূ হয়নি। তিনি প্রথমে আপেল চুরির অভিযোগটার কথা তুলে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি বলেন, এই চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। সে পাঁচিল ডিঙিয়ে গাছের ডাল ভেঙে আপেল চুরি করেছে কেউ তা চাক্ষুষ দেখেনি। তার হাতে শুধু গাছের ডাল পাওয়্য যায়। কিন্তু সে সেটা পথে যেতে যেতে কুড়িয়ে পায়। কিন্তু চুরির প্রমাণ কোথায়? কেউ একজন নিশ্চয় পাঁচিল ডিঙিয়ে ডাল ভেঙে আপেল চুরি করেছে। কিন্তু আমার মক্কেল শ্যাম্পম্যাথিউই যে সেই চোর তার প্রমাণ কোথায়? তার সম্বন্ধে শুধু একটা কথাই বলা যেতে পারে যে সে জেলফেরৎ কয়েদী,

কারণ সেটা প্রমাণিত সত্য। সে আগে ফেবারোলে বাস করত। সে গাছকাটার কাজ করত এবং তার আসল নাম ছিল জাঁ ম্যাথিউ। চারজন সাক্ষী শ্যাম্পম্যাথিউকে জাঁ ভলজাঁ হিসাবে সনাক্ত করেছে। আসামীর অস্বীকার ছাড়া এই সনাক্তকরণের ব্যাপারে তার পক্ষের উকিলের কিছু বলার নেই। কিন্তু সে জেলফেরৎ কয়েদী হলেও এর থেকে কি এই কথাই প্রমাণ হয় যে সে-ই আপেল চুরি করেছে? এটা শুধু অনুমান মাত্র।

আসলে আসামী ভুল নীতি অবলম্বন করে। সে তার বিরুদ্ধে নানা সব অভিযোগই অস্বীকার করে। সে শুধু আপেল চুরির ব্যাপারটাই অস্বীকার করেনি, সে যে জেলে এতদিন ছিল সে কথাও অস্বীকার করে সে। সে যদি অন্তত জেলে যাওয়ার কথাটা স্বীকার করত তাহলে বিচারপতির মন অনেকটা নরম হত এবং তার শাস্তি লঘু হত। তাকে কি এ কথাটা বলার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, না কি সে সে-পরামর্শ মানেনি? সে ভেবেছিল সব কথা সব অভিযোগ অস্বীকার করলে সে বেঁচে যাবে। এটা ছিল এক মস্ত ভুল এবং এর জন্য তার বুদ্ধিহীনতা আর বোকামিই দায়ী। দীর্ঘ কারাবাস এবং জেল থেকে বেরিয়ে সে ভবঘুরে জীবন যাপন করেছিল তাতে তার সব বুদ্ধি লোপ পায়। কিন্তু এর জন্যই সে দণ্ডিত হবে? পেতিত গার্ভের ব্যাপারটা এ মামলার মধ্যে না আসায় তার উকিল এ অভিযোগের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। সরকারপক্ষের উকিল বিচারপতি ও জুরীদের এই কথাই বোঝাল যে আসামী যদি জাঁ ভলজাঁ হয় তাহলে জেল থেকে বেরিয়ে চুরি করার জন্য তাকে শাস্তি পেতেই হবে। সরকারপক্ষের উকিল জোরাল ভাষায় স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতার সঙ্গে তার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করে।

আসামীপক্ষের উকিলও এ কথা মেনে নেয় যে এই আসামীই জাঁ ভলজাঁ।

সরকারপক্ষের উকিল ওজস্বিনী ভাষায় আবেগের সঙ্গে বলতে থাকে, দীর্ঘ কারাদণ্ড এই আসামীর জীবনে কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি। জেল থেকে বেরিয়েও সে ভবঘুরের মতো বেড়াতে বেড়াতে একের পর এক অপরাধ করে যেতে থাকে। সে প্রকাশ্য রাজপথের উপর পেতিত গার্ভে নামে একটি ছেলেকে আক্রমণ করে। অথচ চুরি, অনধিকার প্রবেশ, নাম গোপন প্রভৃতি সব অপরাধ সে অস্বীকার করে। এই সব অপরাধের সপক্ষে প্রাপ্ত প্রমাণাদি ছাড়াও চারজন সাক্ষী তাকে সনাক্ত করে। এই সব সাক্ষীরা হলো সৎ ও নীতিপরায়ণ। পুলিশ ইন্সপেক্টার জেভার্ত আর ব্রিভেত, শিনেলদো ও কোশেপেন নামে তিনজন ভূতপূর্ব কয়েদী। কিন্তু আসামী তবু সব কিছু অস্বীকার করে। সুতরাং জুরী মহোদয়গণ ন্যায়বিচারের নামে আসামীকে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করুন।

আসামী ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে হাঁ করে সব কিছু দেখল। সরকারী পক্ষের উকিলের বক্তৃতা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় সে। কোনও মানুষ এত তাড়াতাড়ি এমনভাবে বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে তার কোনও ধারণাই ছিল না। সরকারপক্ষের উকিল যখন আবেগের সঙ্গে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিল আসামী তখন শুধু তার ঘাড়টা নেড়ে

সব সময় এক বিষাদঘন প্রতিবাদ জানায়। দর্শকদের মধ্যে অনেকে শুনতে পায় আসামী মাঝে মাঝে শুধু একটা কথাই বলে, মঁসিয়ে বালুপকে জিজ্ঞাসা না করার জন্যই এইরকম হয়েছে।

সরকারপক্ষের উকিল আসামীর ক্রুদ্ধ হাবভাবের প্রতি বিচারক ও জুরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে বলে এর থেকে বোঝা যায় আসামী মোটেই বোকা নয়। এ কাজ তার সুপরিকল্পিত এবং সে খুব ধূর্ত। সে চালাকি করে আইনের বিচারকে এড়িয়ে যেতে চায়। তার এই ভাব এবং অঙ্গভঙ্গি তার বিকৃত প্রবৃত্তি এবং স্বভাবের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। পেতিত গার্ভের মামলাটা বাদ দিলেও আইন অনুযায়ী এই আসামীর যোগ্য শাস্তি হলো যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।

আসামীপক্ষের উকিল তার শেষ কথাটা জানাবার জন্য একবার উঠে দাঁড়াল। কিন্তু প্রথমেই সরকারপক্ষের উকিলের বাগ্মিতার প্রশংসা করল। তার যুক্তি তেমন জোরাল হলো না। আসল কথা কিছু বলতে পারল না। কারণ সে বুঝল তার পায়ের তলার মাটি আগেই সরে গেছে।

১০

এবার মামলাটার নিষ্পত্তি করতে হবে। আসামীকে উঠে দাঁড়াতে বলে বিচারপতি তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার আছে?

আসামী উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা মাথা থেকে খুলে হাতে নিয়ে এমন একটা ভাব দেখাল যাতে মনে হবে সে শুনতে পায়নি। বিচারপতি আবার সেই একই প্রশ্ন করলেন।

এবার লোকটা শুনতে পেয়েছে মনে হলো। এমনভাবে সে তাকাতে লাগল যাতে মনে হচ্ছিল সে যেন এখনি ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। সে দর্শক, জুরী, পুলিশ, অ্যাটর্নী, উকিল সকলের পানে তাকিয়েছিল। অবশেষে সে সরকারপক্ষের উকিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কথা বলতে শুরু করল। উত্তপ্ত অসংলগ্ন অজস্র কথার বন্যা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো বেরিয়ে আসতে লাগল তার মুখ থেকে।

সে বলল, আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই। আমি প্যারিসে মঁসিয়ে বালুপের অধীনে চাকা মেরামতের কাজ করতাম। খুবই কষ্টের কাজ। কারণ জানেন তো, চাকা মেরামতকারীকে এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে বা একটা ফাঁকা জায়গায় চালার তলায় কাজ করতে হয়। তার কাজের কোনও নির্দিষ্ট ঘর নেই। শীতে তাদের গরম জামাকাপড়ও নেই। তাকে এমন সব ধাতু নিয়ে কাজ করতে হয় যেগুলোর উপর বরফ পড়ে এবং তা করতে গিয়ে দেহে রোগ ধরে। শরীরটা ক্ষয় হয়ে যায় ধীরে ধীরে। অকালে তাকে বুড়ো হয়ে যেতে হয়। চল্লিশেই তার জীবনীশক্তি স্তিমিত হয়ে আসে। আমার বয়স ছিল তিপ্পান্ন এবং আমাকে সবাই বুড়ো বলে উপহাস করত। সারাদিন খেটে আমি পেতাম মাত্র তিরিশ স্যু, আমি বুড়ো বলে আসল বেতন থেকে অনেক কম দেওয়া হত আমাকে। আমার মেয়ে নদীর ধারে কাপড় কাচত। সে

ধোপার কাজ করেও অল্প কিছু রোজগার করত। এইভাবে আমাদের দু'জনের চলে যেত কোনওরকমে। তার কাজটাও বেশ কঠিন ছিল। জলের টবের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কোমর পর্যন্ত ভিজিয়ে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস আর বৃষ্টি সহ্য করে সারাদিন ধরে কাপড় কেচে যেতে হত তাকে। শীতে জমে গেলেও তাকে কাপড় কেচে যেতে হবে, তা না হলে খরিদ্দার থাকবে না, অনেকেরই বেশি জামাকাপড় নেই। সে আবার এলফাঁত-রোগ নামে একটা লন্ড্রীতেও কাজ করে। সে কাজ ঘরের মধ্যে হলেও গরম জলের ভাপ চোখে লাগে অনবরত। সে রোজ সন্ধে সাতটায় বাড়ি ফিরে ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ত। তার স্বামী তাকে মারত। এখন আর সে নেই। মরে গিয়ে সে যেন বেঁচেছে। কারণ আমরা মোটেই সুখে ছিলাম না। অথচ মেয়েটা খুব ভাল ছিল। এই ছিল আমার জীবন। আমি সব সত্য কথা বলছি। প্যারিস শহরে কে কার খবর রাখে? শ্যাম্পম্যাথিউর কথা কেই বা শুনেছে? তবে মঁসিয়ে বালুপকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। আর আমি কি-ই বা বলব।

এবার সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে মোটা কর্কশ গলায় এক ক্রুদ্ধ বিক্ষুব্ধ সরলতার সঙ্গে সব কথা বলে শেষ করেছে; বলতে বলতে একবার সে দর্শকদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়েছিল। কথা বলতে বলতে সে প্রায়ই তার হাতটা নাড়ছিল ঠিক যেমন কোনও মানুষ কাঠ কাটার সময় তার হাত দুটো সঞ্চালিত করে। তার কথা শেষ হয়ে গেলে সমবেত জনতা হেসে ওঠে। তাদের হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে সেও হেসে ওঠে।

এবার বিচারপতি সব কিছু শুনে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি প্রথমে জুরীদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, একসময় প্যারিসে মঁসিয়ে বালুপের চাকা মেরামতের একটা দোকান ছিল। তাকে সাক্ষী হিসাবে আনার জন্য তার খোঁজ করা হয়। কিন্তু তার দোকান উঠে যাওয়ায় তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এরপর বিচারপতি আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মন দিয়ে শোন। তুমি তোমার অবস্থাটা ভাল করে ভেবে বুঝে দেখ। তুমি এখন এক গভীর সন্দেহের বস্তু। তোমার স্বার্থেই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি কতকগুলি প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবে। তুমি কি পিয়েরনের বাগানের পাঁচিলে উঠে গাছের ডাল ভেঙে আপেল চুরি করেছিলে না করনি? অর্থাৎ অবৈধ অনধিকার প্রবেশের মাধ্যমে চুরির অপরাধে তুমি কি অপরাধী নও? দ্বিতীয়ত তুমি কি জেলফেরৎ কয়েদী জাঁ ভলজাঁ না কি তা নও?

প্রথমত কথাটা বলে থেমে গেল শ্যাম্পম্যাথিউ। সে তার টুপি আর ছাদের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

সরকারপক্ষের উকিল তখন কড়াভাবে বলল, শোন, তুমি প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছ না এবং এই না চাওয়ার জন্যই শাস্তি হবে তোমার। এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তুমি শ্যাম্পম্যাথিউ নও, তুমিই জেলফেরৎ কয়েদী জাঁ ভলজাঁ, একদিন যার নাম ছিল জাঁ ম্যাথিউ। তোমার জন্ম হয় ফেবারোলে, কাঠ কাটার কাজ করতে। তুমিই পিয়েরনের বাগান থেকে আপেল চুরি করো। জুরীরা এই সিদ্ধান্তে এখন উপনীত হয়েছেন।

আসামী এতক্ষণ বসে ছিল। সে এবার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, তোমরা হচ্ছ দুষ্ট প্রকৃতির। আমি তখন এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ভাষাটা খুঁজে পাইনি। আমার তখন রোজ খাওয়া জুটত না। আমি পায়ে হেঁটে এইলি থেকে চলে যাচ্ছিলাম। তখন ঐ অঞ্চলটা খালের জলে ডুবে যায়। চারদিকে শুধু জল আর কাদা। পথ হাঁটতে হাঁটতে পথের উপর আপেল ফল সমেত একটা গাছের ডাল পড়ে থাকতে দেখে আমি তা কুড়িয়ে নিই। আমি কারো কোনও ক্ষতি করতে চাইনি। অথচ এই জন্য আমাকে তিন মাস জেল খাটতে হয়। আর এই জন্যই তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আমাকে তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য করছ আর আমাব পাশের এই সব পুলিশরা আমাকে গুঁতো দিয়ে বলছে, উত্তর দাও। কিন্তু আমি জানি না, কিভাবে তোমাদের কথার জবাব দেব। আমি লেখাপড়া শিখিনি। আমি গরীব ঘরের ছেলে। তাই তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছ না। আমি কখনো কিছু চুরি করিনি, শুধু পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। তোমরা জাঁ ভলজাঁর কথা বলছ, জাঁ ম্যাথিউর কথা বলছ। কিন্তু আমি তাদের কাউকেই চিনি না। ওরা হচ্ছে গাঁয়ের লোক আর আমি প্যারিসে বাজারের কাছে মঁসিয়ে বালুপের দোকানে কাজ করতাম। তোমরা চালাকি করে আমার জন্মস্থানের কথা বলেছ। কিন্তু আমি জানি না আমার কোথায় জন্ম হয়েছে। আমার বাবা-মা মনে হয় ভবঘুরে ছিল। আমি যখন ছোট ছিলাম তারা আমাকে শ্যাম্পম্যাথিউ বলে ডাকত। এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি। তোমরা যা খুশি বলতে পার। আমি অভার্নে গেছি, ফেবারোলেও গেছি। কিন্তু কয়েদী ছাড়া আর কোনও লোককে কি কোথাও যেতে নেই? আমি কখনো কিছু চুরি করিনি। তোমরা প্রশ্ন করে করে আমাকে বিরক্ত করেঁ তুলছ।

সরকারপক্ষের উকিল এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে বিচারপতির দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করল। মঁসিয়ে প্রেসিডেন্ট, আসামী সুচতুরভাবে সব অভিযোগ অস্বীকার করে নিজেকে যতই বোকা বলে চালাতে চাক না কেন সে তাতে সফল হবে না। আমি ব্রিভেত, কোশেপেন, শিনেলদো আর ইনস্‌পেকটার জেভার্তের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য মহামান্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করছি। তারা যাতে এই আসামীই যে ভূতপূর্ব কয়েদী জাঁ ভলজাঁ তা তাদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত করতে পারে।

বিচারপতি বললেন, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ইনস্‌পেক্টার জেভার্ত এখন আদালতে নেই। তিনি আদালত, সরকারপক্ষ ও আসামীপক্ষের উকিলদের অনুমতি নিয়ে তাঁর কাজের জায়গায় মন্ত্রিউল চলে গেছেন।

সরকারপক্ষের উকিল তখন বলল, ইনস্‌পেকটারের অনুপস্থিতিতে তিনি একটু আগে যে বিবৃতি দিয়ে গেছেন আমি জুরীদের তা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। জেভার্ত একজন কর্তব্যপরায়ণ ও সম্মানিত ব্যক্তি। জেভার্ত যে বিবৃতি দিয়েছেন তা হলো এইরূপ: 'আসামী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করতে গিয়ে যে সব বাস্তব তথ্যাদির কথা বলেছে তার উপর নির্ভর করার কোনও প্রয়োজন অনুভব করি না আমি। আমি ভালভাবে তাকে চিনি। সে শ্যাম্পম্যাথিউ নয়, সে হচ্ছে বিপজ্জনক

জেলফেরৎ কয়েদী জাঁ ভলজাঁ। কারাদণ্ড শেষ হলে সে জেল থেকে মুক্তি পায় যে মুক্তি সে আসলে পেতে চায়নি। চুরি-ডাকাতি ও বলপ্রয়োগের অপরাধে উনিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় তাকে। সে পাঁচ-ছ'বার জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করে। পেতিত গার্ভের পয়সা ও পিয়েরনের ফলচুরি ছাড়াও দিগনের বিশপের ঘরে চুরি করে বলে আমার ধারণা। আমি তুলঁর জেলখানায় চাকরি করার সময় তাকে প্রায়ই দেখেছি এবং আমি আবার বলছি আমি তাকে চিনি।'

এই জোরাল স্বীকারোক্তি দর্শক ও জুরীদের মনের উপর বেশই রেখাপাত করে। জেভার্তের অনুপস্থিতির জন্য সরকারপক্ষের উকিল সাক্ষীদের ডেকে ডেকে আবার জেরা করার দাবি জানাল। বিচারপতি আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিশের সাক্ষী ব্রিভেত সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

ব্রিভেত কালো পোশাক পরেছিল। তার গায়ে ছিল জেলখানার কয়েদীদের নীল আলখাল্লা। তার বয়স প্রায় ষাট। তাকে দেখে মনে হয় সে বেশ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন অথচ দুষ্ট প্রকৃতির। জেলকর্তৃপক্ষ তাকে বিশ্বাস করত এবং বলত, লোকটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। তার যে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মে মতিগতি আছে সেকথা জেলপ্রহরী কর্তৃপক্ষকে বলে।

বিচারপতি বললেন, ব্রিভেত, তুমি এক লজ্জাজনক কারাদণ্ডে দণ্ডিত যার জন্য তুমি শপথ করে কিছু বলতে পারবে না।

ব্রিভেত মাথা নত করল। বিচারপতি বললেন, যাই হোক, কোনও মানুষ আইনের বিচারে যতই অধঃপতিত হোক না কেন, ঈশ্বরের কৃপায় তার মধ্যে কিছুটা সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা থাকে। আমার আবেদন তোমার সেই সততা আর ন্যায়পরায়ণতার কাছে। যদি তা অবশিষ্ট থাকে তোমার মধ্যে, এবং আমার বিশ্বাস তা আছে, তাহলে উত্তর দেবার আগে তা ভাল করে ভেবে দেখ। তোমাকে ভেবে দেখতে হবে, একদিকে তোমার প্রদত্ত উত্তর একটি লোকের জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে, আবার অন্য দিকে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করতে পারে। তুমি হয়ত ভুলও করতে পার। আসামী এখনি উঠে দাঁড়াবে...ব্রিভেত, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো লোকটিকে ভাল করে দেখ, এবং তোমার বিবেক-বুদ্ধি সহকারে মহামান্য আদালতকে বল এই ব্যক্তি তোমার জেলখানার পুরনো সাথী কি না।

ব্রিভেত বলল, হ্যাঁ মঁসিয়ে প্রেসিডেন্ট। আমিই তাকে প্রথমে চিনি এবং এখনো এ বিষয়ে নিশ্চিত। এই হলো জাঁ ভলজাঁ যে ১৭৯৬ সালে তুলঁর জেলখানায় প্রবেশ করে এবং ১৮১৫ সালে মুক্তি পায়। আমি তার এক বছর পরে ছাড়া পাই। এখন তাকে বোকা বোকা দেখাচ্ছে, কিন্তু সেটা বয়সের জন্য। আগে কিন্তু তাকে বেশ চালাক দেখাত জেলখানায়। আমি তাকে ভালভাবেই চিনি।

বিচারক বললেন, ঠিক আছে তুমি বস। আসামী দাঁড়িয়ে থাকবে।

এরপর শিনেলদোকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আনা হলো। সে ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। তুলঁর জেলখানা থেকে সাক্ষ্য দেবার জন্য তাকে আনা হয়েছে। তার পরনে

ছিল লাল জামা আর মাথায় সবুজ টুপি। তার চেহারাটা ছিল বেঁটেখাটো এবং বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তার চেহারা দেখে বোঝা যায় তার মধ্যে একটা স্নায়বিক দুর্বলতা আছে। অথচ তার দৃষ্টির মধ্যে প্রচুর ইচ্ছাশক্তির আভাস পাওয়া যায়। জেলখানার অন্যান্য কয়েদীরা তাকে 'ঈশ্বরহীন নাস্তিক' বলে উপহাস করত।

বিচারপতি ব্রিভেতকে যে কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, শিনেলদোকেও সেই কথা বললেন। কারাদণ্ডের জন্য সেও শপথগ্রহণের অধিকার হতে বঞ্চিত। একথা তাকে বলা হতে সে দর্শকদের দিকে লজ্জায় তাকাল। তাকে যখন সে আসামীকে চেনে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলো তখন সে জোরে হেসে উঠল। বলল, সেকি, তাকে না চিনে পারি কখনো ? আমরা পাঁচ বছর ছিলাম একসঙ্গে। কি সাথী, কেমন আছ ? তুমি যে একেবারে ভেঙে পড়েছ ?

বিচারপতি তাকে বললেন, বস।

তারপর আনা হলো কোশেপেনকে। সেও ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। প্রথম জীবনে লর্দে অঞ্চলের এক চাষী, পরে সে পীরেনীজে গিয়ে ডাকাতি করতে থাকে। পীরেনীজের পার্বত্য অঞ্চলে সে প্রথমে ভেড়া চরাত, তারপর ডাকাত হয়ে যায়। তার চেহারা দেখে তাকে দুর্বৃত্ত বলে মনে হয়, তবে আসামীর থেকে তাকে বেশি মাথামোটা বলে মনে হচ্ছিল। প্রকৃতি যেন তার চেহারাটাকে হিংস্র পশুর মতো করে তুলেছে। হিংস্র জন্তুর পরিবর্তে সে হযে উঠেছে জেল কয়েদী।

বিচারক প্রথমে তাকেও সেই একই কথা বললেন ভূমিকাস্বরূপ।

কোশেপেন তখন বলল, হ্যাঁ, এই সেই জাঁ ভলজাঁ। তার গায়ে খুব জোর ছিল বলে আমরা তাকে 'ক্রোবার' বলতাম।

এই তিনজন সাক্ষী এমন স্পষ্ট আর পরিষ্কারভাবে তাদের বক্তব্য জানাল যে তা শুনে দর্শকরা সকলেই আসামীর উপর রেগে গেল এবং তাদের মধ্য থেকে একটা চাপা কলগুঞ্জন ধ্বনিত হয়ে উঠল। আসামী নিজেও তাদের কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। বাদীপক্ষের মতে এই বিস্ময়ই হলো তার প্রতিরক্ষার একমাত্র অস্ত্র। আসামীর পাশে যে সব পুলিশ দাঁড়িযেছিল তারা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্যদান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামীর মুখে তিনটে কথা উচ্চারিত হতে শোনে। প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষ হলে 'ঠিক আছে, একটা হলো।' দ্বিতীয় সাক্ষীর সাক্ষ্যশেষে সে আরও জোরে বলে উঠে 'চমৎকার।' আর তৃতীয় সাক্ষীর সাক্ষ্যশেষে বলে, 'বিখ্যাত।'

বিচারক এবার তাকালেন আসামীর দিকে। তিনি বললেন, কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হে আসামী, এই সব সাক্ষ্যের কথা তুমি শুনেছ। তোমার কিছু বলার আছে ?

আসামী বলল, আমি শুধু বলছি এটা বিখ্যাত।

একথা শুনে দর্শকরা একযোগে হাসিতে ফেটে পড়ল। জুরীরাও সে হাসিতে যোগ দিলেন। আসামীর আর কোনও আশা নেই।

বিচারপতি ঘোষককে সবাইকে চুপ করতে বলার জন্য আদেশ দিলেন। বললেন, আমি এবার রায় দেব।

এমন সময় পিছন থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সেই কণ্ঠস্বর বলল, ব্রিভেত, শিনেলদো ও কোশেপেন, আমার দিকে একবার তাকাও তো।

এই কণ্ঠস্বরের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। সেই কণ্ঠস্বর একই সঙ্গে এমনই বিষাদময় ও সকরুণ এবং ভয়ঙ্কর যে সে কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলের অন্তর হিমশীতল হয়ে গেল। বিচারপতির পিছনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সীটে বসে থাকা এক ভদ্রলোক এবার উঠে দাঁড়াল। সে ধীরে ধীরে কোর্টঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতি, সরকারপক্ষের উকিল, জুরীদের অন্যতম মঁসিয়ে বামাতাবয় ও আরও কুড়িজন চিনতে পেরে একবাক্যে বলে উঠল, মঁসিয়ে ম্যাদলেন!

১১

হ্যাঁ, সে ছিল সত্যিই মঁসিয়ে ম্যাদলেন। কেরানিদের টেবিলের উপর জ্বলতে থাকা বাতির আলোটা তার মুখের উপর পড়ল। তার হাতে টুপিটা ধরা ছিল। তার পোশাকটা ছিল বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার বড় কোটটার সব বোতামগুলো দেওয়া ছিল। তার মুখখানি ছিল ম্লান এবং সে কিছুটা কাঁপছিল। তার যে চুলগুলো সে অ্যারাসে আসার সঙ্গে সঙ্গে ধূসর হয়ে যায়, সেগুলো এখন যেন একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

তার আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলে হতবুদ্ধি আর স্তব্ধ হয়ে যায়। তার বেদনার্ত কণ্ঠস্বর আর তার বহিরঙ্গের প্রশান্ত ভাবের মধ্যে এমন একটা বৈপরীত্য ছিল যে সে-ই একথা বলেছে তা বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না। বিচারপতি বা সরকারপক্ষের উকিল কোনও কথা বলার আগে অথবা পুলিশরা নড়াচড়ার আগেই ম্যাদলেন সাক্ষী তিনজনের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, তোমরা আমাকে চিনতে পারছ না?

সাক্ষীরা তার দিকে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়ল। কোশেপেন সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানাল তাকে। ম্যাদলেন এবার জুরীদের দিকে মুখ তুলে বলল, জুরী মহোদয়গণ, আপনারা আসামীকে ছেড়ে দিন। আমি মহামান্য আদালতের কাছে প্রার্থনা করছি, আমাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিন। আপনারা যাকে খুঁজছেন আমিই হচ্ছি সেই লোক। আমিই হচ্ছি জাঁ ভলজাঁ।

সকলেই এমনভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে কেউ একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছাড়ল না। সমস্ত হলঘরের মধ্যে মৃত্যুশীতল এক স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। কোনও অস্বাভাবিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটলে যেমন উপস্থিত জনতাকে এক ধর্মীয় ভীতি আচ্ছন্ন করে ফেলে, কোর্টঘরের জনতারও সেই দশা হলো। শুধু বিচারপতির মুখের উপর একটা বিষাদ আর সহানুভূতির ভাব ফুটে উঠল। তিনি সরকারপক্ষের উকিল ও তাঁর পাশের জুরীদের সঙ্গে নিচু গলায় কি বললেন। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখানে কোনও ডাক্তার আছে?

সরকারপক্ষের উকিল এবার কথা বলতে শুরু করল, জুরী মহোদয়গণ, এই আশ্চর্যজনক ঘটনা আমাদের এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি করেছে যা ভাষায় প্রকাশ

করা যায় না। আমরা সকলেই মন্ত্রিউল-সুর-মের-এর মেয়ব পরম শ্রদ্ধেয় মঁসিয়ে ম্যাদলেনকে চিনি। তাঁর নাম ও যশের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এখানে যদি কোনও ডাক্তার উপস্থিত থাকেন তাহলে আমি তাঁকে অনুরোধ করছি তিনি যেন এই ভদ্রলোককে একবার দেখে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেন।

তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ম্যাদলেন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলতে শুরু করে। সে যা বলেছিল তা সঙ্গে সঙ্গে লিখে নথিবদ্ধ করে রাখা হয় এবং যাবা নিজের কানে সে কথা শুনেছিল তারা চল্লিশ বছর পরেও সে কথা মনে রাখে।

ম্যাদলেন বল্‌তে থাকে, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল। কিন্তু আমি পাগল নই। আপনারা মস্ত বড একটা ভুল করতে চলেছেন আর আমি আমার এক সাধারণ কর্তব্য পালন করছি। এই লোকটিকে অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে। আমিই সেই হতভাগ্য কযেদী! এখন আমি যা আপনাদের বলব সেটাই হলো প্রকৃত সত্য। ঈশ্বর হচ্ছেন একমাত্র আমার সাক্ষী। এই আমি দাঁডিয়ে আছি—আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। আমি আমার নাম পাল্টে অনেক কিছু করেছিলাম, আমি ধনী হয়ে উঠেছিলাম, মেযর হযেছিলাম। আমি একজন সৎ লোক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেযেছিলাম। কিন্তু সেটা হবার নয়, আমার ভাগ্যে তা হয়ত নেই। অবশ্য আমার সমগ্র জীবনকাহিনী আপনাদের বলার কোনও প্রয়োজন নেই। যথাসমযে তা জানতে পারবেন। তবে একথা সত্য যে আমি দিগনের বিশপের জিনিস আর পেতিত গার্ভের পয়সা চুরি করেছিলাম। আপনারা ঠিকই অনুমান করেছিলেন জাঁ ভলজাঁ একজন দুর্বৃত্ত, যদিও সব দোষ তার ঠিক নয। আমার মতো একজন সামান্য নিচুস্তরের লোক ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না অথবা সমাজকে উপদেশ দিতে পারে না। কিন্তু যে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি পালাতে চেযেছিলাম তা সত্যিই সমাজের পক্ষে কলঙ্কজনক ব্যাপার। জেলখানার অবস্থাই জেলপলাতকদের সৃষ্টি করে একথা আপনাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত। জেলে যাবার আগে আমি ছিলাম একটা বোকা গ্রাম্য চাষী। কিন্তু জেলখানায গিয়েই আমার পরিবর্তন হলো স্বভাবের। আমার মধ্যে কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠল। যেন একটা ধূমায়িত কাঠ সহসা জ্বলে উঠল। পশুপ্রবৃত্তি যখন আমার আত্মাকে প্রায ধ্বংস করে ফেলেছিল তখন একটি মানুষের সততা এবং অনুকম্পা আমার আত্মাকে রক্ষা করল। কিন্তু এসব কথা আপনাদের বুঝে কোনও লাভ নেই। আমি পেতিত গার্ভের কাছ থেকে যে চল্লিশ স্যু চুরি করেছিলাম সেই মুদ্রাটা আমি যেখানে থাকি সেই ঘরের মধ্যে এখনো দেখতে পাবেন। আমার আর কিছু বলার নেই। আপনারা শুধু আমাকে গ্রেপ্তার করুন। কিন্তু অ্যাডভোকেট জেনারেল মাথা নাডছেন। আপনারা হয়ত আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, পাগল ভাবছেন। ওতে আমার আরও কষ্ট হচ্ছে। একটি নির্দোষ মানুষের যেন কারাদণ্ড না হয়। এটা দুঃখের বিষয় যে জেভার্ত এখানে নেই, সে আমাকে চেনে। সাক্ষীরা বলছে তারা আমাকে চিনতে পারছে না।

তার কণ্ঠস্বরে যে বিষাদ আর একটা প্রশান্ত ভাব ফুটে উঠেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এবার সে সাক্ষী তিনজনের দিকে ঘুরে বলল, আমি তোমাকে চিনি ব্রিভেত। তোমার মনে আছে, তুমি একটা চেকওয়ালা জামা পরতে?

ব্রিভেত আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে রইল।

ম্যাদলেন তখন শিনেলদোকে সম্বোধন করে বলতে লাগল, আর তুমি শিনেলদো, ওরা তোমাকে নিরীশ্বর বলত। তুমি নিজেকেও তাই বলতে। তোমার বাঁ কাঁধে একটা ক্ষতের দাগ আছে। তাতে টি, ই, পি, এই তিনটে অক্ষর খোদাই করা আছে।

শিনেলদো বলল, হ্যাঁ, কথাটা সত্যি।

এবার সে কোশেপেনকে বলল, কোশেপেন, তোমার বাঁ হাতে সম্রাট যেদিন চেলস্-এ অবতরণ করেন সেই তারিখটি অর্থাৎ ১৮১৫ সালের ১লা মার্চ উল্কিতে লেখা আছে, তোমার জামার আস্তিনটা গোটাও।

কোশেপেন আস্তিনটা গোটাতেই একজন পুলিশ লণ্ঠনের আলো নিয়ে দেখল সত্যিই তারিখটা তার হাতে উল্কির মধ্যে খোদাই করা আছে।

এবার মুখে ক্ষীণ একটু হাসি নিয়ে ম্যাদলেন বিচারপতির দিকে তাকাল। এক জয়ের গর্ব আর হতাশার বেদনায় ভরা সে হাসি যে দেখেছে তার অন্তর ব্যথায় মোচড দিয়ে উঠল। ম্যাদলেন বলল, এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো আমিই জাঁ ভলজাঁ?

কোর্টঘরের মধ্যে তখন যেন বিচারক, উকিল, পুলিশ বলে কেউ ছিল না, শুধু কতকগুলি কৌতূহলী চোখ আর ব্যথিত অন্তর ছাড়া সে ঘরে যেন আর কেউ ছিল না। কার কি কাজ তা যেন কেউ জানত না। সবাই তাদের আপন আপন কর্তব্য যেন ভুলে গিয়েছিল। সরকারপক্ষের উকিল ভুলে গিযেছিল তাকে আসামীর অভিযোগ প্রমাণিত করতে হবে। বিচারপতি রায় দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আসামীপক্ষের উকিল আত্মপক্ষ সমর্থনের কথাও ভুলে গিযেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি, কেউ আইনের কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেনি। যেন কোনও ভীতিপ্রদ ঘটনা উপস্থিত সকলের অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল নিবিড়ভাবে। সেখানে উপস্থিত কেউ সে কি অনুভব করছে তা বুঝতে পারেনি, তার অনুভূতির কথা সে নিজেই ধরতে পারেনি। অকস্মাৎ এক বিরাট আলোর ছটায় সকলের চোখ যেন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সে আলোর মূর্তিটাকে কেউ স্থিরভাবে দেখতে পারেনি। বুঝতে পারেনি।

মঁসিয়ে ম্যাদলেনই যে জাঁ ভলজাঁ তাতে কারো কোনও আর সন্দেহ ছিল না। সে সত্য এখন স্বরূপে প্রকটিত। যে কথা কয়েক মিনিট আগেও দুর্বোধ্য ছিল সকলের কাছে, ম্যাদলেনের সকরুণ চেহারাটাই এখন সে কথা সব প্রকাশ করে দিচ্ছে। যে মানুষটি অন্য একটি লোক তার জায়গায় বৃথা দুঃখ ভোগ করবে বলে নিজে থেকে আত্মসমর্পণ করতে এসেছে, তার মহত্ত্বের কথাটা উপস্থিত সকলে কারো কোনও সাহায্য ছাড়াই সরলভাবে বুঝতে পারল। এই সরল সত্য ঘটনাটার সামনে অন্য সব প্রশ্ন তাদের সব গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল। এই মহান পুরুষটির প্রতি এক দুর্বার শ্রদ্ধা আর করুণার আবেগে বিগলিত হয়ে উঠেছিল যেন সকলের অন্তর।

জাঁ ভলজাঁ বলল, আমি আর মাননীয় আদালতকে বিরক্ত করব না। এখন যদি আমাকে গ্রেপ্তার করা না হয় তাহলে চলে যাব আমি। আমার কাজ আছে। আদালত জানেন আমি কে এবং কোথায় আমি যাচ্ছি। আদালত ইচ্ছা করলেই আমাকে ডেকে পাঠাতে পারেন।

ভলজাঁ এই কথা বলেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কেউ তাকে বাধা দিল না, হাত বাড়িয়ে কেউ তাকে ধরল না। সবাই তার যাবার জন্য পথ করে দিল। সেই মুহূর্তে সে এমন এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল যা দেখে উপস্থিত জনতা তাকে শ্রদ্ধা না করে পারছিল না।

ভলজাঁ ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দরজার দিকে। দরজাটা খোলাই ছিল। কাউকে খুলতে হলো না। যাবার আগে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ভলজাঁ সরকারপক্ষের উকিলকে বলল, মঁসিয়ে, আমি আপনারই হাতে।

এরপর ঘরের সবাইকে লক্ষ্য করে সে বলল, আপনারা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁদের কাছে আমি এখন করুণার পাত্র, তাই নয় কি? যখন আমি ভাবি এ সব কাজ কেন করেছি তখন আমার মনে হয় এসব না করলেই ভাল হত।

ঘর থেকে বেরিয়ে তার পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল ভলজাঁ।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে জুরীরা একমত হয়ে শ্যাম্পম্যাথিউকে মুক্তি দান করল। সব অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে চলে গেল এক মুহূর্তে। কি করে কি ঘটে গেল তার কিছুই বুঝতে পারল না সে। তার মনে হলো সব লোকগুলোই পাগল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

তখন ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটে উঠছিল। সারারাত ঘুম হয়নি ফাঁতিনের। শেষ রাতের দিকে এক মধুর কল্পনার বশবর্তী হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। এই সুযোগে সিস্টার সিমপ্লিস তার কাছ থেকে ওষুধের শিশি থেকে এক দাগ কুইনাইন আনার জন্য গেল। জানালা দিয়ে আসা ভোরের আলোয় ওষুধের শিশিগুলোকে খুঁটিয়ে দেখছিল সে।

সহসা মুখ ঘুরিয়ে দেখেই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। দেখল মঁসিয়ে ম্যাদলেন নীরবে ঘরে ঢুকছে। সে বলল, মঁসিয়ে লে মেয়র?

ম্যাদলেন নিচু গলায় বলল, সে কেমন আছে?

সিস্টার সিমপ্লিস বলল, এখন কিছুটা ভাল আছে বটে, কিন্তু তার জন্য গতকাল আমরা সব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম।

এরপর সে ম্যাদলেনকে বলল, গতকাল ফাঁতিনের অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যায়। তারপর সে যখন বিশ্বাস করে আপনি তার মেয়েকে আনার জন্য মঁতফারমেলে গেছেন তখন সে হঠাৎ ভাল হয়ে ওঠে। মেয়র কোথায় গিয়েছিল তা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না। কিন্তু সে মেয়রের মুখের হাবভাব দেখে বুঝল মেয়র সেখানে যায়নি।

ম্যাদলেন বলল, আমি খুশি। তোমরা তার ভুল না ভেঙে ঠিকই করেছ।

সিস্টার বলল, তা হয়ত ঠিক। কিন্তু আপনি তার মেয়েকে আনেননি, এখন তাকে কি বলব?

ম্যাদলেন দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। তারপর বলল, ঈশ্বর আমাকে পথ বলে দেবেন।

তখন দিনের আলো স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সে আলোয় তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সে মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল সিস্টার সিমপ্লিস, হা ভগবান! মঁসিয়ে মেয়র, কি হয়েছে আপনার? আপনার মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে।

সাদা!

তার কোনও আয়না ছিল না। মৃত রোগীরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য ডাক্তাররা একরকম ছোট আয়না ব্যবহার করত। সেই আয়নাটা নিয়ে ম্যাদলেন নিজের মাথাটা দেখল। সে অন্য কথা ভাবতে ভাবতে আনমনে বলল, তাই তো।

এক অজানিত আশঙ্কায় হিম হয়ে গেল সিস্টারের অন্তরটা।

ম্যাদলেন বলল, আমি একবার তাকে দেখতে পারি?

সিস্টার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, মঁসিয়ে কি তার মেয়েকে আনতে যাচ্ছেন না?

ম্যাদলেন উত্তর করল, হ্যাঁ যাব। কিন্তু দু'-তিন দিন দেরি হবে।

সিস্টার বলল, তার মেয়েকে না আনা পর্যন্ত সে আপনাকে দেখতে না পেলে ভাববে আপনি এখনো ফেরেননি সেখান থেকে। তাহলে আমরা তাকে সহজেই শান্ত করতে পারব। তারপর ওর মেয়ে এসে পড়লে ও ভাববে আপনিই তাকে নিয়ে এসেছেন। তাহলে আর আমাদের মিথ্যা কথা বলতে হবে না।

ম্যাদলেন আবার ভাবতে লাগল। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, না সিস্টার, এখনি তার সঙ্গে দেখা করতে হবে আমায়। হয়ত আমি খুব কম সময় পাব।

সিস্টার হয়ত কথাটার উপর গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে লাগল। এ কথাটা যেন সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও রহস্যময় করে তুলল। সে মুখ নামিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল, তাহলে সে এখন ঘুমিয়ে থাকলেও ভিতরে যেতে পারেন।

ফাঁতিনের ঘরের দরজাটা খোলা বা বন্ধ করার সময় জোর শব্দ হয়। ম্যাদলেন ঘরের ভিতর ঢুকে গিয়ে তার বিছানার মশারিটা তুলল। সে তখন ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মুমূর্ষু সন্তানকে দেখে মার যেমন অন্তরটা বিদীর্ণ হয়ে যায় ম্যাদলেনেরও তাই হচ্ছিল। ফাঁতিনের মুখ ও গালের ম্লান ফ্যাকাশে ভাবটা এক শান্ত শুভ্রতায় পরিণত হয়ে উঠেছিল। তার নিষ্পাপ যৌবন জীবনের একমাত্র অবশিষ্ট সৌন্দর্য টানা টানা চোখ দুটো মুদ্রিত থাকলেও সে চোখের পাতাগুলো অল্প অল্প কাঁপছিল। অদৃশ্য পাখা মেলে ঊর্ধ্বলোকে উড়ে চলার এক অপ্রাকৃত প্রস্তুতি হিসাবে তার গোটা অচেতন দেহটা যেন অশান্ত হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থায় কেউ তাকে

দেখে ভাবতে পারবে না এক দুরারোগ্য রোগ তার দেহটাকে ভিতরে ভিতরে জীর্ণ করে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে তাকে। তাকে দেখে শুধু এই কথাই মনে হবে যে সে মরছে না, ঊর্ধ্বে উৎক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তার প্রাণের পাখিটা।

যখন আমরা কোনও ফুল তুলতে যাই তখন সে ফুলের বৃন্তটা কেঁপে ওঠে। দেখে মনে হয় একই সঙ্গে আত্মদানে সংকুচিত এবং আগ্রহান্বিত হচ্ছে সে বৃন্ত। তেমনি মৃত্যুর রহস্যময় হাতটা যখন দেহের বৃন্ত থেকে আত্মাটাকে ছিন্ন করে নিতে আসে তখন আমাদের দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে এমনি করে।

ফাঁতিনের বিছানার পাশে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ম্যাদলেন। একবার ফাঁতিনের দিকে আর একবার তার মাথার উপর ক্রশটার দিকে তাকাতে লাগল সে। আজ হতে দু' মাস আগে প্রথম যেদিন সে তাকে দেখতে আসে সেদিনও সে এমনি করে ক্রশটাকে দেখেছিল। সেদিনও এমনি করে ঘুমিয়েছিল ফাঁতিনে। আজ ফাঁতিনের চুলটা ধূসর আর তার চুলটা সাদা হয়ে গেছে একেবারে।

সিস্টার ম্যাদলেনের সঙ্গে ঘরে ঢোকেনি। ম্যাদলেন তার ঠোঁটে একটা আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরে যেন অন্য কোনও লোক আছে এবং তাকে চুপ করতে বলছে। এমন সময় চোখ খুলল ফাঁতিনে। চোখ মেলে তাকাল সে। সে হাসিমুখে শান্তভাবে বলল, কসেত্তে কোথায়?

২

বিস্ময় বা আনন্দের আবেগ ছিল না তার কণ্ঠে। সে কোনও অঙ্গভঙ্গি করল না। সে নিজেই ছিল যেন আনন্দের এক প্রতিমূর্তি। এমন এক নিরুদ্বেগ নিশ্চয়তা আর আশ্বাসের সঙ্গে এই প্রশ্নটা উচ্চারিত হলো তার কণ্ঠে যে তা শুনে অবাক হয়ে গেল ম্যাদলেন।

ফাঁতিনে বলতে লাগল, আমি জানতাম আপনি এসে গেছেন। আমি ঘুমের মধ্যেও আপনাকে দেখছিলাম, আমি সারারাত ধরে আপনাকে দেখেছি। মনে হচ্ছিল আপনি যেন এক জ্যোতির মূর্তি এবং কত দেবদূত আপনাকে ঘিরে ছিল।

দেওয়ালের উপর ঝোলানো ক্রশটার পানে তাকিয়ে রইল ম্যাদলেন।

ফাঁতিনে বলল, কসেত্তে কোথায়? তাকে কেন আমার বিছানায় বসিয়ে দিলেন না? তাহলে আমি জেগে উঠেই তাকে দেখতে পেতাম।

ম্যাদলেন অস্পষ্ট স্বরে কি বলল তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। এমন সময় ডাক্তার এসে ঘরে ঢুকল। তাকে ডাকা হয়েছিল। ম্যাদলেনের মনে হলো ডাক্তার যেন তাকে উদ্ধার করতে এসেছে।

ডাক্তার বলল, তুমি শান্ত হও বাছা। তোমার মেয়ে এসে গেছে।

ফাঁতিনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং সেই উজ্জ্বলতা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মুখখানায়। আবেগের সঙ্গে সে তার দুটো হাত দিয়ে কি একটা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল।

সে বলল, কেউ তাকে ঘরে নিয়ে আসবে না?

সে ভাবছিল কসেত্তে যেন তখনো কোলের সেই ছোট্ট শিশুটি আছে।

ডাক্তার বলল, এখন নয়। এখনো তোমার গায়ে জ্বর আছে। কোনওরকম উত্তেজনা ক্ষতিকর হবে তোমার পক্ষে। আগে সেরে ওঠ।

ফাঁতিনে বলল, কিন্তু আমি এখন ভাল হয়ে গেছি। আমি ভাল আছি। আপনি এত বোকা হলেন কি করে? আমি আমার মেয়েকে দেখতে চাই।

ডাক্তার বলল, কত তাড়াতাড়ি তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছ। এ অবস্থায় তাকে আমি আনতে পারি না। তাকে শুধু দেখলেই হবে না। তার জন্যই তোমাকে বাঁচতে হবে। তুমি একটু শান্ত হলেই তাকে নিয়ে আসব আমি নিজে।

মাথাটা নাড়িয়ে ফাঁতিনে বলল, আমাকে মাপ করবেন মঁসিয়ে ডাক্তার, আমি ভাল থাকলে এত কথা বলতাম না। কিন্তু এখন কি বলছি ভুল হয়ে যাচ্ছে; মনে রাখতে পারছি না। অবশ্য আমি বুঝি আপনারা আমাকে উত্তেজিত হতে দিতে চান না। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি আমার মেয়েকে দেখে আমি উত্তেজিত হব না। আমি তার সঙ্গে খুব আস্তে কথা বলব। আমি সারারাত ধরে তার হাসি-হাসি উজ্জ্বল মুখখানা দেখেছি। এখন আর আমার কোনও রোগ নেই। ঠিক আছে, আমি চুপ করে শান্ত হয়ে থাকব। তাহলে ওরা আমার মেয়েকে নিয়ে আসবে।

ফাঁতিনের বিছানার পাশেই একটা চেয়ারে বসে ছিল ম্যাদলেন। ফাঁতিনে জোর করে নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে রইল, যাতে ওরা তার মেয়েকে নিয়ে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত করতে পারল না। একসঙ্গে পরপর অনেকগুলো প্রশ্ন করে বসল ম্যাদলেনকে।

সে বলল, আপনার অসীম দয়া মঁসিয়ে মেয়র। যেতে কোনও কষ্ট হয়নি তো? আমার মেয়ে আছে? আসতে তার খুব কষ্ট হয়নি তো? সে হয়ত এখন আমাকে চিনতে পারবে না। এখন হযত ভুলে গেছে। কতদিন আগে দেখেছে। ওরা পাখির মতো ক্ষীণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন। তার পোশাক-আশাক ঠিক ছিল তো? থেনার্দিয়েররা তাকে খেতে দিত? তার যত্ন নিত? আমি যখন কপর্দকহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলাম থেনার্দিয়েররা আমায় দারুণ পীড়ন করতে থাকে টাকার জন্য। যাক, এখন সব কিছু মিটে গেছে। আমি এখন সুখী। মঁসিয়ে মেয়র, কসেত্তে দেখতে সুন্দরী তো? তাকে আপনি একবার আনতে পারেন না? আমার জন্য এইটুকু অন্তত করুন।

ফাঁতিনের একটি হাত টেনে নিয়ে ম্যাদলেন বলল, কসেত্তে সত্যিই সুন্দরী। সে ভাল আছে। তুমি শীঘ্রই দেখতে পাবে তাকে। তুমি কিন্তু খুব বেশি কথা বলছ। তোমার হাত দুটো চাদরের বাইরে বার করলেই কাশি হচ্ছে।

প্রায়ই কাশিতে তার কথাগুলো বাধা পাচ্ছিল। ফাঁতিনে কোনও প্রতিবাদ করল না। বুঝতে পারল তারই ভুল। বেশি কথা বলে ওদের বিশ্বাস হারাচ্ছে। তবু সে শান্তভাবে আবার বলতে লাগল, মঁতফারমেল জায়গাটা খুব সুন্দর, তাই নয় কি? গ্রীষ্মকালে সেখানে অনেক দর্শক যায়। থেনার্দিয়েররা ভাল আছে? জায়গাটার লোকবসতি ঘন নয়। ওদের হোটেলটা খুবই ছোট।

ম্যাদলেন তার হাতটা ধরে ছিল তখনো। ফাঁতিনের দিকে তাকিয়ে ছিল সে একদৃষ্টিতে। একটা কথা বলার ছিল তাকে। কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারছিল না। ডাক্তার চলে গেছে, শুধু সিস্টার সিমপ্লিস ঘরে ছিল তখনো।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চিৎকার করে উঠল ফাঁতিনে, আমি তার কথা শুনতে পাচ্ছি। তার কথা শুনতে পাচ্ছি।

হাসপাতালের উঠোনে একটি বাচ্চা মেয়ে খেলা করছিল। হাসপাতালের কোনও মেয়ে কর্মীর সন্তান। মেয়েটি ছোটাছুটি করছিল। নাটকে কল্পিত দুটি সাজানো দৃশ্যের মতো অনেক সময় বিচ্ছিন্ন ঘটনা পরস্পরের কাছে কেমন অদ্ভুতভাবে মিলে যায়।

ফাঁতিনে বলল, আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ কসেত্তের কণ্ঠস্বর।

মেয়েটি ছুটতে ছুটতে সেদিকে একবার এসে আবার চলে গেল। তার কণ্ঠস্বরটা ক্রমে মিলিয়ে গেল দূরে। যতদূর পারল সে কণ্ঠস্বর শুনতে লাগল ফাঁতিনে। কণ্ঠস্বর আর শুনতে না পাওয়ার ফলে তার মুখটা কালো হয়ে উঠল। সে বলল, ডাক্তারটা কি নিষ্ঠুর! একবার মেয়েটাকে দেখতে দিল না আমায়। ওর মুখটা দেখলেই নিষ্ঠুর মনে হয়।

কিন্তু অন্য এক বড় আশায় উদ্দীপিত হয়ে সে বালিশে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে নিজের মনে কথা বলে যেতে লাগল। আমরা সত্যিই খুব সুখী হব। আমাদের একটা ছোটখাটো বাগান থাকবে। মঁসিয়ে ম্যাদলেন কথা দিয়েছেন সেখানে কসেত্তে খেলা করে বেড়াবে। এতদিনে তার হয়ত অক্ষর পরিচয় হয়ে গেছে। আমি তাকে এবার থেকে বানান শেখাব। সে যখন ঘাসের উপর দিয়ে প্রজাপতি ধরে বেড়াবে আমি তখন তার পানে তাকিয়ে থাকব। এখন তার বয়স সাত। বারো বছর বয়সে তার প্রথম কমিউনিয়ন হবে। তার মাথায় থাকবে সাদা ঘোমটা।....ও সিস্টার, আমি কত স্বার্থপর! আমি আমার মেয়ের কমিউনিয়নের কথা ভাবছি।

এই বলে হাসতে লাগল সে।

ম্যাদলেন এবার ফাঁতিনের হাতট ছেড়ে দিল। অতল চিন্তার গভীরে ডুব দিয়ে ফাঁতিনের কথা শুনতে শুনতে তার মনে হচ্ছিল সে যেন কোনও বৃক্ষশাখায় প্রবাহিত বনমর্মরের ধ্বনি শুনছে।

কিন্তু কথা বলতে বলতে সহসা থেমে গেল ফাঁতিনে। সে থেমে যেতেই তার পানে তাকাল ম্যাদলেন। ফাঁতিনের চোখমুখ কেমন যেন ভয়াবহ হয়ে উঠল। সে কনুই-এর উপর ভর দিয়ে বসে ফ্যাকাশে মুখে ভয়ে চোখদুটো বিস্ফারিত করে ঘরের প্রান্তে তাকিয়ে কি দেখছিল।

ম্যাদলেন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, কি হলো ফাঁতিনে? কি ব্যাপার?

ফাঁতিনে কোনও কথা বলল না। ম্যাদলেনের হাতটা ধরে দরজার কাছে কি দেখাল।

মুখ ঘুরিয়ে ম্যাদলেন দেখল জেভার্ত দাঁড়িয়ে।

৩

সত্যিই তাই।

সেদিন রাতে সাড়ে বারোটা বাজতেই ম্যাদলেন অ্যারাসের কোর্ট ছেড়ে হোটেলে চলে গেল। কারণ মন্ত্রিউলগামী ডাক গাড়িতে একটা সীট সংরক্ষণ করে রেখেছিল। সেই গাড়িতেই সে ফিরে যাবে। মন্ত্রিউল-সুর-মেরে পৌঁছেই সে প্রথমে লাফিত্তেকে লেখা চিঠিটা পাঠিয়ে দেবে। তারপর সে হাসপাতালে ফাঁতিনেকে দেখতে যাবে।

এদিকে ম্যাদলেন কোর্ট-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সরকারপক্ষের উকিল উঠে দাঁড়িয়ে মন্ত্রিউল সুর-মের-এর মেয়রের এই হটকারিতার সমালোচনা করে বলল, উনি হঠাৎ কি করে ধরে নিলেন শ্যাম্পম্যাথিউর জায়গায় উনিই কারাদণ্ড ভোগ করবেন এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে ? তবে অবশ্য উনিই যে জাঁ ভলজাঁ সেবিষযে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আরও অনেক কিছু প্রমাণ করার আছে।

কিন্তু বিচাবপতি ও জুরীরা একমত হতে পারলেন না সরকারপক্ষের উকিলের সঙ্গে।

আসামীপক্ষের উকিল বলল, মঁসিয়ে ম্যাদলেন যে প্রমাণ দিযে গেছেন তাতে শ্যাম্পম্যাথিউ-এর বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ খণ্ডিত হয়ে গেছে। সুতবাং তাকে মুক্তি না দেওয়াব কোনও কারণ থাকতে পারে না। বিচারপতি তার কথা সমর্থন করলেন। ফলে কযেক মিনিটের মধ্যেই মুক্তি পেল শ্যাম্পম্যাথিউ। যদি সে জাঁ ভলজাঁ না হয় তাহলে কে সেই ভলজাঁ ? তাহলে ম্যাদলেনই হবে সেই জাঁ ভলজাঁ।

কোর্টের কাজ সেদিনকার মতো বন্ধ করে বিচাবপতি তাঁর খাস কামরায় সরকারপক্ষেব উকিলকে নিযে আলোচনা করতে লাগলেন। মন্ত্রিউলের মেয়রকে অবিলম্বে গ্রেপ্তাব করার ব্যাপারে তাঁবা দু'জনেই একমত হলেন। বিচাবপতি নিজের হাতে গ্রেপ্তারী পবোযানা লিখলেন। আইন তার নিজের পথে চলবে। বিচারপতি একজন বুদ্ধিমান, যুক্তিপ্রবণ ও সহৃদয ব্যক্তি হলেও আইন ও ন্যাযবিচাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন কঠোর প্রকৃতিব এবং আপোসহীন রাজতন্ত্রী। মেয়র ম্যাদলেন যখন সম্রাটেব চেলস-এ অবতরণের কথা বলাব সময় বোনাপার্ট না বলে সম্রাট বলে তখন তি তা শুনে ব্যথিত হন।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ম্যাদলেনকে গ্রেপ্তার করার জন্য এক পরোযানা লিখে এক বিশেষ দূতকে সে পরোয়ানা দিয়ে মন্ত্রিউলে পাঠিযে দেন যাতে ইনস্পেকটাব জেভার্ত ম্যাদলেনকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে পারে।

জেভার্ত অ্যারাসে সাক্ষ্য দিযেই মন্ত্রিউলে চলে আসে। সে সকালে ঘুম থেকে উঠেই পরোয়ানা পায। দূত ছিল একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার। সে অ্যারাসের কোর্টে যা যা গতকাল সন্ধ্যায় ঘটে তা জেভার্তকে বলে। জেভার্তের প্রতি বিচাবপতির নির্দেশ ছিল, মন্ত্রিউলের মেযর ম্যাদলেনকে জেল-ফেরৎ কয়েদী জাঁ ভলজাঁ হিসাবে সনাক্ত করা হয। জেভার্ত যেন তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হেফাজতে রাখে।

জেভার্তকে যারা ভাল করে চেনে না তারা সে যখন হাসপাতালে ম্যাদলেনের খোঁজে যায় তখন তার মনের মধ্যে কি ধরনের চিন্তা বা অনুভূতির খেলা চলছিল তা ঠিক বুঝতে পারবে না। তার বাইরেব ভাবটা ছিল শান্ত ও আত্মস্থ এবং তার

ধূসর চুলগুলো ছিল ভালভাবে আঁচড়ানো। যারা তাকে চিনত তারা তখন তাকে ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেত।

জেভার্ত ছিল শৃঙ্খলাপরায়ণ লোক। তার চেহারা ও পোশাক-আশাক সব সময় গুছোন থাকত। তার কোটের বোতাম সব সময় দেওয়া থাকত। কখনো যদি তার সরকারী পোশাকের কিছুটা অগোছালো থাকত তাহলে বুঝতে হবে তার মনের ভিতর কোনও কারণে ঝড় বইছে।

জেভার্ত হাসপাতালে ম্যাদলেনকে গ্রেপ্তার করতে যাবার সময় চার-পাঁচজন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে যায়। তাদের হাসপাতালের উঠোনে রেখে সে সোজা ফাঁতিনের ঘরে চলে যায়। সে মেয়রের কাছে যেতে চাইলে দারোয়ান তাকে নিয়ে যায় বিনা বাধায়। জেভার্ত ফাঁতিনের ঘরে ঢুকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার কাছে।

জেভার্তের টুপিটা তার মাথার উপরেই ছিল। তার বাঁ হাতটা ছিল তার কোটের বোতামের উপর। তার বগলের মধ্যে ছিল ধাতব হাতলওয়ালা ছড়িটা। তাকে প্রথমে কেউ দেখতে পায়নি। তার উপর প্রথমে ফাঁতিনের চোখ পড়তেই সে চিৎকার করে ওঠে ভয়ে।

ম্যাদলেন তার দিকে তাকাতেই জেভার্তের চেহারাটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তার আনন্দের চাপা আবেগটা ভয়ঙ্কর হয়ে ফুটে ওঠে মুখের উপর। তার মুখটা এমন এক শয়তানের মতো হয়ে ওঠে যেন তার হারানো শিকার খুঁজে পেয়েছে হঠাৎ।

সে যে অবশেষে জাঁ ভলজাঁকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছে এই চিন্তার সুতো ধরে তার আন্দোলিত আত্মাটা গভীর হয়ে চোখ-মুখের উপরে উঠে এল। মাঝখানে সে সন্ধানের সুতোটা হারিয়ে ফেলে শ্যাম্পম্যাথিউ নামে লোকটাকে ভলজাঁ বলে ধরে নেওয়ায় যে অপমানের কবলে পড়েছিল, সে অপমান জয়ের গর্বে ও আনন্দের আবেগের স্রোতে কোথায় ভেসে গেল। সে বুঝতে পারল তার চোখ কখনো ভুল করে না। এক কুৎসিত জয়ের আত্মম্ভরী আনন্দ আর গভীর পরিতৃপ্তি যেন তার উদ্ধত চেহারাটার উপর ঢেউ খেলে যাচ্ছিল।

জেভার্ত তখন যেন স্বর্গসুখ অনুভব করছিল তার মনে। সে তার গুরুত্ব খুব বেশি করে অনুভব করছিল। সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল সে যেন ন্যায়বিচার, আলো আর সত্যের মূর্ত ও জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। সে মূর্তি যত সব অশুভ অন্ধকার শক্তিকে পদদলিত করার মহান কার্যে নিরত। সে যেন বাস্তব জগতে নেই, এক মহাশূন্যে ভাসছে আর তার চারদিকে আইনের অবিসম্বাদিত কর্তৃত্ব, বিচারের অমোঘ রায়, জনগণের ধিক্কার নৈশ আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মতো কিরণ দিচ্ছে। সে যেন তখন আইন-শৃঙ্খলার অভিভাবক, ন্যায়বিচারের বিদ্যুতালোক, সমাজের প্রতিশোধ এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধিরূপে এক অনাস্বাদিতপূর্ব গৌরবের আলোকবন্যায় অভিস্নাত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার উদ্ধত আত্মম্ভরী চেহারাটা এক অতিপ্রাকৃত শক্তিলীলায় প্রমত্ত ধ্বংসোন্মাদ এক দেবদূতের মতো নীলনির্মল আকাশে বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল যেন। তার হাতের বজ্রমুষ্টিটা হয়ে উঠেছিল যেন এক আতপ্ত

তরবারি। এক নিবিড়তম তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে সে যেন সমাজ ও সংসারের যত রকমের পাপ, অপরাধ, বিদ্রোহ ও নরকের উপর ঘৃণা ও দর্পভরে হেঁটে চলেছিল সব কিছু মাড়িয়ে দিয়ে।

তবুও এই উদ্ধত আত্মম্ভরী চেহারাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা মহত্ত্ব ছিল। সে ভয়ঙ্কর হলেও তাকে ঘৃণ্য বলা যায় না। দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, সততা, আত্মপ্রত্যয়, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি গুণগুলো কুপথে চালিত হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেও তাদের মধ্যে কিছুটা মহত্ত্ব অবশিষ্ট থেকে যায়। সেই ভয়াবহতার মাঝেও মানবিক বিবেকরূপী এক মহত্ত্ব থেকে যায় তার মধ্যে। যে কারণ এই সব গুণগুলোকে ভুল পথে চালিত করে ভয়ঙ্কর করে তোলে তা হলো এক ভ্রান্ত ধারণা। তাছাড়া আব কোনও কারণ নেই। কোনও অত্যুৎসাহী ব্যক্তি সততার সঙ্গে কোনও নিষ্ঠুর কাজ করে এক নির্মম আনন্দ লাভ কবলেও সে আমাদের এক বিষাদগ্রস্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। জেভার্ত না জানলেও তার ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর আনন্দ এক ধরনের অনুকম্পা লাভ করে আমাদের কাছ থেকে। এক নিষ্ঠুর কঠোরতার সঙ্গে সম্পন্ন যে কোনও শুভ কর্ম ও চিন্তার মধ্যে যে সব অশুভ শক্তি লীলাচঞ্চল হয়ে ওঠে, সেই সব অশুভ শক্তিগুলি একযোগে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল জেভার্তেব মুখের উপর। তার মুখের সে দৃশ্য সত্যিই মর্মবিদারক।

৪

যেদিন জেভার্তের হাত থেকে ফাঁতিনেকে উদ্ধার করে ম্যাদলেন সেদিন থেকে জেভার্তের দিকে কখনো চোখ ফেবাযনি ফাঁতিনে। তাব রুগ্ন মন জেভার্তের আসার কারণ কিছু বুঝতে না পারলেও জেভার্ত যে তারই জন্য এই হাসপাতালে এসেছে সেবিষযে কোনও সন্দেহ রইল না তার মনে। তাকে চোখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর এক পূর্বাস্বাদ অনুভব করল যেন সে। সে দু'হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে উঠল কাতরভাবে, মঁসিযে ম্যাদলেন, আমাকে বাঁচাও।

জাঁ ভলজাঁ (ম্যাদলেনকে এবার থেকে আমরা এই নামেই ডাকব) উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, ভয় পেও না, ও তোমার জন্য আসেনি।

এবার জেভার্তের দিকে তাকিযে ভলজাঁ বলল, তুমি কি জন্য এখানে এসেছ আমি তা জানি।

জেভার্ত বলল, তাহলে তাড়াতাড়ি করো।

কথাগুলো সে এমন নির্মমভাবে এবং এত তাড়াতাড়ি বলল যে মনে হলো যেন কোনও মানুষ কথা বলছে না, একটা পশু গর্জন করছে। প্রথাগত কোনও রীতিনীতি মেনে চলল না সে। সে গ্রেপ্তারের কথাটা সরকারীভাবে ঘোষণা করল না অথবা পরোয়ানাটা দেখাল না। তার কাছে জাঁ ভলজাঁ ছিল যেন তাব বিরামহীন দুশ্চিন্তার এক রহস্যময় বস্তু, এক ছায়াশত্রু যার সঙ্গে পাঁচ বছর ধরে লড়াই করে এসে আজ তাকে ধরাশায়ী করতে পেরেছে। এই গ্রেপ্তার যেন সেই লড়াই-এর শেষ পরিণতি, কোনও ঘটনার সূচনা নয়। য তীক্ষ্ণদৃষ্টির শলাকা দিয়ে আজ হতে দু'মাস আগে

ফাঁতিনের দেহটাকে ভেদ করে তার অস্থিমজ্জাকে বিদ্ধ করেছিল, সেই দৃষ্টিশলাকা দিয়ে আজ আবার জাঁ ভলজাঁকে বিদ্ধ করল সে। 'নাও তাড়াতাড়ি করো' নির্মমভাবে এই কথাগুলো ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

জেভার্তের কড়া কথাগুলো ফাঁতিনের কানে যেতেই সে আবার চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু মেয়র কাছে থাকায় মনে সাহস পেল সে।

জেভার্ত ঘরের ভিতর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলল, তাহলে তুমি আসছ?

ফাঁতিনে হতবুদ্ধি হয়ে তার চারদিকে তাকাল। ঘরের মধ্যে তখন সে ছাড়া শুধু ছিল সিস্টার সিমপ্লিস আর মেয়র। তাহলে ফাঁতিনে ছাড়া আর কাকে সেকথা বলবে জেভার্ত? সহসা এমন এক অবিশ্বাস্য ও অবাঞ্ছিত ঘটনা সে নিজের চোখে দেখল যা সে রোগের ঘোরেও কল্পনা করতে পারেনি কোনওদিন, যা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে কাঁপন ধরে গেল তার। সে দেখল পুলিশ ইনস্‌পেকটার জেভার্ত মেয়র মঁসিয়ে ম্যাদলেনের জামার কলার ধরেছে আর মেযর তা নতশিরে মেনে নিযেছে।

ফাঁতিনে বলে উঠল, মঁসিযে মেয়র!

সব দাঁতগুলো বার করে এক কুটিল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল জেভার্ত। বলল, সে আর মেয়র নেই।

জাঁ ভলজাঁ জেভার্তের হাত থেকে তার ঘাড়টা ছাড়াবাব কোনও চেষ্টা কবল না। সে শুধু মুখে বলল, জেভার্ত—

জেভার্ত বলল, বল ইনস্‌পেকটার।

ঠিক আছে ইনস্‌পেকটার, আমি গোপনে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

জেভার্ত বলল, যা কিছু বলার আছে বলে ফেল। আমাব সঙ্গে কেউ চুপি চুপি কথা বলে না।

জাঁ ভলজাঁ চাপা গলায় বলল, আমি একটা বিযযে তোমাব অনুগ্রহ চাই।

আমি বলছি বলে ফেল।

কিন্তু সেটা শুধু তোমাকেই একান্তভাবে বলতে চাই।

আমি সেকথা শুনতে চাই না।

জাঁ ভলজাঁ জেভার্তের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, আমাকে মাত্র তিন দিনের সময় দাও। এই হতভাগিনী মহিলার মেয়েটিকে আনার জন্য তিন দিনের সময় দাও। এর জন্য তোমাকে আমি যে কোনও পরিমাণ টাকা দেব। ইচ্ছা করলে তুমি আমার সঙ্গেও যেতে পার।

জেভার্ত বলল, তুমি কি ঠাট্টা করছ? তুমি কি বোকা! তিন দিন বাইরে থাকবে এই মেয়েটার মেয়েকে আনার জন্য? চমৎকার!

ফাঁতিনে কাঁপতে লাগল। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমার মেয়েকে আনতে হবে? সে তাহলে আসেনি? সিস্টার, আমার কথার জবাব দাও,—কসেত্তে কোথায়? আমি তাকে দেখতে চাই। মঁসিয়ে ম্যাদলেন- -

জেভার্ত মেঝের উপর পা-টা ঠুকল। বলল, চুপ কর ব্যভিচারিণী কোথাকার!

এ বেশ রাজত্ব হয়েছে, যেখানে জেলমুক্ত কয়েদীরা ম্যাজিস্ট্রেট হয় আর বারবনিতারা কাউন্টপত্নীদের মতো সেবা-শুশ্রূষা পায়। কিন্তু আমরা এ সব কিছুর অবসান ঘটাতে চলেছি এবং তার সময় এসেছে।

ভলজাঁর জামার কলারটা আরও জোরে ধরে জেভার্ত ফাঁতিনেকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। এখানে মঁসিয়ে ম্যাদলেন বা মেয়র বলে কেউ নেই। এখানে আছে শুধু এক দাগী অপরাধী, এক কয়েদী, যার নাম জাঁ ভলজাঁ এবং যাকে আমি ধরে আছি।

ফাঁতিনে তার হাতে ভর দিয়ে বিছানার উপর খাড়া হয়ে বসল। তার দৃষ্টি জেভার্ত থেকে ভলজাঁ, আর ভলজাঁ থেকে সিস্টারের দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে কি বলতে গেল, কিন্তু পারল না, শুধু একটা গোঙানির মতো কাতর শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। তার দাঁতগুলো কড়মড় করতে লাগল। জলে ডুবে যাবার সময় কোনও লোক যেমন কিছু একটা ধরার চেষ্টা করে তেমনি করে সে দু'হাত বাড়িয়ে কি করতে গেল। তারপর বালিশের উপর ঢলে পড়ল। মাথাটা গুঁজে পড়ল তার। চোখদুটো বড় বড় করে বন্ধ করল সে আর মুখটা হাঁ করে রইল।

ফাঁতিনের দেহটা নিস্প্রাণ হয়ে গেল।

ভলজাঁ এবার জোর করে ভেজার্তের হাতটা সরিয়ে দিয়ে অনায়াসে তার ঘাড়টা মুক্ত করল। তারপর জেভার্তকে বলল, তুমি এই মেয়েটিকে হত্যা করেছ।

জেভার্ত প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে বলল, ঠিক হয়েছে। আমি এখানে তর্ক করতে আসিনি। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। নিচে পুলিশ পাহারা আছে। তুমি যাবে নাকি তোমার হাতে হাতকড়া লাগাব?

ঘরের কোণে অব্যবহৃত একটা লোহার খাট ছিল। ভলজাঁ সেখানে গিয়ে তার থেকে একটা লোহার রড টেনে বার করে সেটা হাতে নিয়ে জেভার্তের সামনে এসে দাঁড়াল। জেভার্ত ভয়ে দরজার কাছে পিছিয়ে গেল।

ভলজাঁ সেই লোহার রডটা হাতে নিয়ে ফাঁতিনের বিছানাটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে জেভার্তকে বলল, এই মুহূর্তে তুমি আমার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।

ভয়ে কাঁপতে লাগল জেভার্ত। সে একবার ভাবল নিচে গিয়ে পুলিশদের ডেকে আনবে। কিন্তু আবার ভাবল সে বাইরে যেতে গেলে ভলজাঁ দরজায় খিল দিয়ে তাকে আটকে দিতে পারে। তাই সে দরজার কাছে নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ভলজাঁ কি করে।

খাটের মাথার উপর লোহার রডে কনুই রেখে হাতের তালুতে মুখ রেখে ফাঁতিনের নিথর নিস্পন্দ দেহটার দিকে তাকিয়ে নীরবে কি ভাবতে লাগল ভলজাঁ। ফাঁতিনের মৃত্যুর কথাটাই তখন তার সমস্ত মন জুড়ে বিরাজ করছিল। এক অনির্বচনীয় করুণা ফুটে উঠেছিল তার মুখের উপর। কিছুক্ষণ পরে সে ফাঁতিনের মৃতদেহটার উপর ঝুঁকে পড়ে খুব নিচু গলায় কি বলতে লাগল।

সে তাকে কি বলল? একজন মৃত মহিলাকে একজন দণ্ডিত ব্যক্তি কি বলতে

পারে ? কোনও জীবন্ত মানুষ তার যে কথা শুনতে পেল না সে কথা কি মৃতজন শুনতে পেল ? অনেক সময় এমন সব অপ্রাকৃত অবাস্তর ঘটনা ঘটে যা এক মহান বাস্তবতা হিসাবে শ্রদ্ধা পায় মানুষের কাছ থেকে। সিস্টার সিমপ্লিস সেই দৃশ্যের একমাত্র সাক্ষী হয়ে পরে বলেছিল ভলজাঁ যখন ফাঁতিনের কানে কানে অশ্রুত শব্দে কি সব বলছিল, তখন ফাঁতিনের ফ্যাকাশে সাদা ঠোঁট দুটোয় আর তার শূন্য চোখে এক মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। মৃত্যুর মাঝেও তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

ফাঁতিনের মাথাটা দু'হাতে ধরে মৃত্যুশোকাহত মাতার মতো পরম যত্নে বালিশের উপর রেখে দিল ভলজাঁ। তার নাইট গাউনের ফিতেটা বেঁধে দিল। তার মাথার চুলগুলো ঠিক করে গুছিয়ে দিয়ে তার উপর টুপিটা লাগিয়ে দিল। শেষে তার চোখের পাতাগুলো বন্ধ করে দিল।

ফাঁতিনের একটা হাত বিছানার পাশে ঝুলছিল। ভলজাঁ সেই হাতটা নিয়ে চুম্বন করল।

এরপর সে জেভার্তের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এবার কি করতে হবে বল।

৫

জাঁ ভলজাঁকে গ্রেপ্তার করে মন্ত্রিউল থানার হাজত-ঘরে বন্ধ করে রাখল জেভার্ত।

মঁসিয়ে ম্যাদলেনের গ্রেপ্তারের ঘটনা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করল সারা শহরে। সে একজন ভূতপূর্ব কয়েদী এ কথা শুনে সকলেই ঘৃণায় পরিত্যাগ করল তাকে। সে যেসব ভাল কাজ করেছিল এতদিন ধরে সে সব কাজের কথা ভুলে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। অবশ্য অ্যারাসে কি ঘটনা ঘটেছিল তা শহরের কেউ জানত না।

শহরের নানা জায়গায় এক-দল করে লোক জটলা পাকিয়ে তার কথা বলাবলি করতে লাগল। কেউ বলল, শুনেছ, লোকটা জেলফেরৎ কয়েদী ?

আর একজন বলল, কে মঁসিয়ে ম্যাদলেন ? অসম্ভব !

কিন্তু একথা সত্যি। তার নাম ম্যাদলেন নয়, বজাঁ না কি। তাকে গ্রেপ্তার করে শহরের থানায় রাখা হয়েছে। পরে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে। কয়েক বছর আগের এক ডাকাতির ঘটনার অভিযোগে অ্যারাসের আদালতে তার বিচার হবে।

আর একজন বলল, আমি কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হইনি এ ঘটনায়। আমার প্রায়ই মনে হত লোকটা এত ভাল কাজ কেন করছে। আমার মনে সন্দেহ ছিল। সে নিজে কোনও সাজপোশাক করত না। শুধু অকাতরে দান করত। কোনও একটা রহস্য আছে এর মধ্যে এই কথাই শুধু আমার মনে হত।

শহরের অনেক অভিজাত লোকের বাড়ির বৈঠকখানাতেও তার কথা আলোচিত হলো। একদিন এক বৃদ্ধা বলল, ভালই হলো। বোনাপার্টপন্থীদের শিক্ষা হওয়া উচিত।

এইভাবে ম্যাদলেনের প্রেতাত্মাটা মন্ত্রিউল শহর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেবল তিন-চারজন লোক বিশ্বস্ত রয়ে গেল তার স্মৃতির প্রতি। তাদের মধ্যে ছিল সেই বুড়ি মেয়েটি যে ম্যাদলেনের বাড়িতে থেকে তার দেখাশোনা করত।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়িটি দারোয়ানের ঘরের কাছে বসে ভাবতে লাগল। আজ সারাদিন কারখানা বন্ধ ছিল। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। হাসপাতালে ফাঁতিনের মৃত্যুশয্যার পাশে শুধু সিস্টার সিমপ্লিস আর সিস্টার পার্পেচুয়া বসে ছিল।

ম্যাদলেন বাড়ি ফিরে আসবে এই আশায় সেদিনও বসে ছিল সে। ম্যাদলেন বাড়ি ফিরলে সে তার ঘর থেকে চাবি বার করে দিত। তার বাতি জ্বেলে দিত। তারপর ম্যাদলেন তার নিজের ঘরে চলে যেত।

এমন সময় তার ছোট জানালাটা খুলে কে একটা হাত ঢুকিয়ে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে চাবিটা বার করে নিল।

ভয়ে ও বিস্ময়ে কোনও কথা বলতে পারল না বুড়িটি। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন মঁসিয়ে মেয়র। আমি ভেবেছিলাম আপনি—

ম্যাদলেন বলল, তুমি ভেবেছিলে আমি জেলে গেছি। হ্যাঁ, আমি জেলেই গিয়েছিলাম। হাজতে ছিলাম। জানালার একটা রড ভেঙে আমি এখানে এসেছি। আমি উপরতলায় আমার ঘরে যাচ্ছি। একবার সিস্টার সিমপ্লিসকে ডেকে দেবে? সে বোধ হয় হাসপাতালেই আছে।

বুড়ি মেয়েটি চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ভলজাঁ জানত সে বড় বিশ্বস্ত এবং সে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

ভলজাঁ উপরতলায় গিয়ে নিজের ঘরের দরজাটা খুলল। তারপর বাতি জ্বালল। জানালার শার্সিগুলো বন্ধই রেখে দিল সতর্কতা হিসাবে। কারণ জানালাগুলো বড় রাস্তা থেকে দেখা যায়। আলো দেখলে লোকে সন্দেহ করবে।

এবার ভলজাঁ ঘরের খাট, চেয়ার, আসবাবপত্রগুলো দেখতে লাগল। বিছানাটাতে সে তিন রাত শোয়নি। সেদিন রাতে সে যেসব আসবাবগুলো সরিয়ে ঘরটা ওলোটপালট করেছিল, চাকরে আবার সেগুলো সব গুছিয়ে ঠিক করে রেখেছে। ঘরে আর আগুন জ্বালানো হয়নি। আগুনের জায়গাটায় ছাই-এর গাদায় তার আগের লাঠিটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পেতিত গার্ভের মুদ্রাটা আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

ভলজাঁ একটা কাগজ বার করে তার উপর লিখল, এইখানে আমার আগের পোড়া লাঠিটা আর পেতিত গার্ভের কাছ থেকে চুরি করা মুদ্রাটা রইল। এই মুদ্রার কথাটা আমি আদালতে বলেছিলাম। লেখার পর কাগজটা আর মুদ্রাটা ঘরের এমন এক জায়গায় রাখল যাতে কেউ ঘরে ঢুকলেই সেগুলো তার নজরে পড়ে। এরপর ড্রয়ার থেকে একটা পুরনো শার্ট বার করে সেটা ছিঁড়ে বিশপের দেওয়া রুপোর বাতিদান দুটো জড়িয়ে নিল। জেল থেকে দেওয়া যে কালো রুটিটা এতদিন ধরে সে রেখে দিয়েছিল সেটা সে টুকরো টুকরো করে ফেলল। পরে যখন পুলিশ এসে ঘরটা তছনছ করে তখন সেই টুকরোগুলো পায়।

দরজায় মৃদু একটা করাঘাত হলো এবং সিস্টার সিমপ্লিস ঘরে ঢুকল। তার মুখটা ম্লান এবং চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছিল। তার হাতে একটা বাতি ছিল এবং হাতটা কাঁপছিল। আমরা যতই আত্মস্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হই না কেন, দুর্ভাগ্যের

নির্মম কশাঘাত এমনি করে আমাদের বিচলিত করে, এমনি আমাদের আসল স্বরূপটা টেনে বার করে বাইরে। সেদিনের ঘটনা যা তার সামনে ঘটে গেছে তাতে সন্ন্যাসিনীর মাঝে সুপ্ত নারীসত্তা আবার জেগে উঠেছে। সে সারাদিন কেঁদেছে। তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে।

ভলজাঁ এর মধ্যে একটা চিঠি লেখে। চিঠিটা সে সিস্টারের হাতে দিয়ে বলল, এটা কুরেকে দেবে সিস্টার। তুমি এটা পড়ে দেখতে পার।

সিস্টার চিঠিটা পড়ল। তাতে লেখা ছিল, আমি মঁসিয়ে লে কুরেকে আমি যে টাকা রেখে যাচ্ছি তার সব ভার নেবার জন্য অনুরোধ করছি। সেই টাকা তিনি আমার মামলার খরচ চালাবেন এবং যে মেয়েটি হাসপাতালে মারা গেছে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য যা লাগবে তা দিয়ে দেবেন। বাকি যা থাকবে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেবেন।

সিস্টার কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারল না। শেষে সে জিজ্ঞাসা করল ভলজাঁ শেষবারের মতো মৃত ফাঁতিনেকে দেখবে কি না।

ভলজাঁ বলল, না, ওরা আমাকে খুঁজছে। মৃত্যুশয্যার পাশে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করলে তার শান্তি বিঘ্নিত হবে।

তার কথা শেষ হতেই নিচে কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে শোনা গেল নিচে সেই বুড়ি মেয়েটি প্রতিবাদের সুরে জোর গলায় কি বলছে। সে বলছে, আমি সারাদিন এখানে বসে আছি। কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেখিনি।

একজন লোক বলল, কিন্তু উপরকার ঘরে আলো জ্বলছে।

ভলজাঁ বুঝতে পারল নিচে জেভার্ত কথা বলছে।

ঘরের মধ্যে একটা জায়গা ছিল যেখানে কেউ থাকলে ঘরে কেউ ঢুকলে তাকে দেখতে পাবে না। জাঁ ভলজাঁ বাতির আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সেইখানে লুকিয়ে পড়ল। সিস্টার সিমপ্লিস টেবিলের পাশে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল।

এমন সময় দরজা খুলে জেভার্ত ঘরে ঢুকল। বারান্দায় কয়েকজন লোকের গলা শুনতে পাওয়া গেল। বুড়ি তখনো তাদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করছে। ঘরের মধ্যে একটা বাতি মিটমিট করে জ্বলছিল।

সিস্টারকে প্রার্থনা করতে দেখে জেভার্ত লজ্জা পেয়ে গেল।

জেভার্তের প্রকৃতিটা যত কঠোরই হোক না কেন ধর্মের প্রভুত্বের প্রতি তার একটা শ্রদ্ধা ছিল। তার মতে একজন যাজক বা সন্ন্যাসিনী কোনও ভুল করতে পারে না, কোনও পাপকাজ করতে পারে না। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে সে ছিল একেবারে গোঁড়া। ধর্মের প্রভুত্ব সম্পর্কে তার মনে কোনও সংশয় বা প্রশ্ন ছিল না। তাঁর মতে যাজক বা সন্ন্যাসিনীদের আত্মা আর বাস্তব জগতের মধ্যে ছিল এমন এক প্রাচীরের ব্যবধান যার মধ্যে যাতায়াতের কেবল একটা মাত্রই দরজা ছিল। সে দরজা হলো সত্যের দরজা।

সিস্টার সিমপ্লিসকে প্রার্থনা করতে দেখে জেভার্তের চলে যেতে ইচ্ছা হলো।

কিন্তু তার একটা কর্তব্য আছে। যে কর্তব্য পালন করার জন্য সে এখানে এসেছে। সে কর্তব্য সে অস্বীকার করতে পারে না।

জেভার্ত জানত সিস্টার সিমপ্লিস জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি। তাই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

জেভার্ত এবার সিস্টারকে বলল, সিস্টার, আপনি কি এ ঘরে একা আছেন?

সিস্টার সিমপ্লিস এক কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ল। সেই বুড়ি মেয়েটি ভয়ে কাঁপতে লাগল। তার মনে হলো সিস্টার মূর্ছিত হয়ে পড়বে।

সিস্টার সিমপ্লিস মুখ তুলে জেভার্তকে বলল, হ্যাঁ।

জেভার্ত বলল, মাপ করবেন। আজ সন্ধ্যায় আপনি জাঁ ভলজাঁ নামে একজন লোককে দেখেছেন? আজ সে হাজত থেকে পালিয়ে এসেছে। আমরা তাকে খুঁজছি। আপনি তাকে দেখেছেন?

সিস্টার বলল, না।

দ্বিতীয়বার মিথ্যা কথা বলল সিস্টার সিমপ্লিস। এ মিথ্যা তার আত্মত্যাগেরই সমতুল।

জেভার্ত বলল, আমি ক্ষমা চাইছি।

এই বলে ঘর থেকে চলে গেল সে।

যে সিমপ্লিস সংসার ত্যাগ করে দীর্ঘকাল ধর্মের কাজে যোগদান করেছে তার কথা সত্য বলে ধরে নিল। সে লক্ষ্য করল না একটা বাতি টেবিলের উপর নেভানো ছিল।

এক ঘণ্টা পরে একটি লোককে কুয়াশার মধ্য দিয়ে প্যারিসের পথে একা দেখা যায়। সে লোক হলো জাঁ ভলজাঁ। দু'-একজন গাড়ির চালক গাড়ি চালিয়ে সে পথে যাবার সময় দেখে একটা লোক আলখাল্লা পরে আর হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে প্যারিসের পথে হেঁটে চলেছে। সে আলখাল্লাটা কোথায় পেয়েছে ভলজাঁ তা কেউ জানে না।

যে পৃথিবীর মাটি আমাদের সকলের মাতা, আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল সেই পৃথিবীর মাটিতে চির বিশ্রাম লাভ করে ফাঁতিনে।

জাঁ ভলজাঁ যে টাকা রেখে গিয়েছিল, কুরে সে টাকার বেশির ভাগ গরীব-দুঃখীদের জন্য রেখে দিয়ে তার থেকে খুব অল্প টাকাই ফাঁতিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য খরচ করে। কবরখানার এক প্রান্তে দীন-দরিদ্রদের জন্য সংরক্ষিত এক জায়গায় তাকে অতি সাধারণভাবে কবর দেওয়া হয়। তার কবরটাও ছিল তার বিছানার মতোই দীন হীন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

গত বছর অর্থাৎ ১৮৬১ সালের মে মাসের কোনও এক সকালে এই কাহিনীর

লেখক একজন পথিকের মতো লিভেলের থেকে লা হুলপের পথে এগিয়ে চলেছিল। সারবন্দী গাছে ঘেরা গ্রামাঞ্চলের একটা পথ ধরে ক্রমাগত হাঁটছিল সে। সে অঞ্চল জুড়ে ছিল সমুদ্রের নিশ্চল ঢেউয়ের মতো অসংখ্য পাহাড়। লীলয় আর বয়-সেনোর পার হয়ে পশ্চিম দিকে ব্রেন লালিউদের চার্চের বড় ঘণ্টাটা দেখতে পেল। বাঁ দিকে পাহাড়ের ধারে একটা বন দেখতে পেল। এরপর কিছুটা গিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে একটা কাঠের প্লেটে '৪ নম্বর গেট' লেখা ছিল। তার পাশেই ছিল একটা প্রাইভেট কাফে।

আরও কিছুটা গিয়ে সে একটা উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছয়। উপত্যকাটার মাঝখান দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। নদীর উপরে ছিল ছোট্ট একটা সেতু। উপত্যকার একদিকে ছিল ঢালা-ঢালা পাতাওয়ালা অনেক গাছে ভরা এক বন আর তার অন্য দিকে ছিল আবাদযোগ্য জমিতে ভরা এক প্রকাণ্ড মাঠ।

ডান দিকে পথের ধারে একটা হোটেল দেখতে পেল। চার-চাকার একটা ওয়াগন দাঁড়িয়েছিল হোটেলটার সামনে। দরজার সামনে একটা লাঙল, এক-গাদা কাঠ আর একটা মই ছিল। পাশে ছিল একটা শস্যভাণ্ডার।

হোটেলটার পাশে যে জমি ছিল তাতে একটা মেয়ে কাজ কবছিল। মাঠের ধারে এক জায়গায় হলুদ রঙের একটা বড় পোস্টার বাতাসে উডছিল। তাতে এক আসন্ন গ্রাম্য মেলার কথা লেখা ছিল। হোটেলটার ওপাশে পায়ে-চলা একটা এবড়ো-খেবড়ো পথ একটা পুকুরের পাশ দিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পথিক সেই পথটা ধরল।

পথটা ধরে সে একশো গজ যেতেই সামনে একটা বড পাঁচিল দেখতে পেল। হয়ত সেটা পঞ্চদশ শতকে নির্মিত হয়েছে। সেই পাঁচিলের গায়ে একটা দরজা ছিল। তার দু'পাশে ছিল চতুর্দশ লুই-এর আমলের কতকগুলো চারকোণা স্তম্ভ। দরজার সামনে বুনো ফুলে ভরা একটা পতিত জায়গা ছিল। দরজাটা বন্ধ ছিল। তার কড়ায় মরচে ধরেছিল।

দরজার পাশে স্তম্ভগুলোর একটা গায়ে একটা বড গর্ত দেখে আশ্চর্য হযে তাকিয়ে ছিল পথিক। এমন সময় দরজা খুলে এক গ্রাম্য মহিলা বেরিযে এসে পথিকের মনের ভাব বুঝে বলল, ফরাসী কামানের গোলায় ঐ গর্তটা হয় স্তম্ভের গায়ে। ঐ দরজার গায়েও বুলেটের আঘাতে একটা গর্ত হয়।

পথিক সেই মহিলাটিকে বলল, এ জায়গাটার নাম কি?

মহিলা বলল, হুগোমঁত।

পথিক আরও কিছুদূর গিয়ে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের উপর সিংহের একটা মূর্তি দেখতে পেল। আসলে সে ওয়াটারলু যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়েছে।

২

হুগোমঁত। বড় গুরুত্বপূর্ণ এক ভাগ্য নির্ধারক স্থান। এক বিপুল বিপর্যয়ের প্রারম্ভিক

ক্ষেত্র। যে নেপোলিয়ন এক ধ্বংসাত্মক কুঠার হাতে ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় বড় বনস্পতিগুলিকে একে একে ছেদন করে অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে চলেছিলেন সে নেপোলিয়ন এখানেই প্রথম বাধা পান। এখানেই প্রথম প্রতিহত হয় তাঁর গতিবেগ, তাঁর সর্বধ্বংসী কুঠারটিকে কেড়ে নেওয়া হয় এখানেই।

আগে হুগোমঁত ছিল এক সামন্তের বাসভবন, এখন সে বাসভবন আর নেই। এখন এটি শুধু খামারবাড়ি। আসল নাম হলো হুগোঁমত। সমারেলের জমিদার হুগো এখানে এক প্রাসাদ নির্মাণ করেন বলে এখানকার নাম হয় হুগোঁমত, পরে এ নাম হয়ে দাঁড়ায় হুগোমঁত।

পথিক সদর দরজা ঠেলে ভিতরকার উঠোনটায় চলে গেল। যে জিনিসটা তার প্রথম চোখে পড়ল সেটা হলো ষোড়শ শতাব্দীর তোরণের মতো এক দরজা। সে দরজার আশপাশের শান বাঁধানো কাজগুলো ভেঙে গেছে আর ভেঙে যাওয়ার জন্যই তার গুরুত্ব বেড়ে যায় যেন। যে কোনও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষই স্মৃতিস্তম্ভের এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। সামনে আবার একটা দেওয়াল দেখা গেল। সেই দেওয়ালের মাঝখানে একটা তোরণের মতো দরজা ছিল। তার মধ্যে দিয়ে অনেক গাছপালায় ঘেরা এক বাগান দেখা যাচ্ছিল। উঠোনের প্রশস্ত জায়গাটায় গোবরের স্তূপ, অনেক কোদাল, বেলচা প্রভৃতি পড়ে ছিল। দু'-একটা গাড়ি আর একটা ঘোড়ার ছোট্ট বাচ্চা ছিল। একটা ছোটখাটো গীর্জাও ছিল। তার উপর একটা ঘণ্টা ছিল। সেই গীর্জার জানালার পাশে ন্যাসপাতি গাছে ফুল ফুটেছিল। বর্তমান খামারবাড়ির এই উঠোনটাই নেপোলিয়ন জয় করতে চেয়েছিলেন। এই জমিটুকু জয় করতে পারলেই যেন তিনি গোটা পৃথিবীটাকে জয় করতে পারতেন। কতকগুলো মুরগী মাটিতে আঁচড় কাটছিল। একটা বড় কুকুর দাঁত বার করে গর্জন করছিল, যেন সে ওয়াটারলুর যুদ্ধে ইংরেজদের প্রতিনিধিত্ব করছিল। সাত ঘণ্টা ধরে কুকের অধীনে ইংরেজ সৈন্যদের চারটি দল ফরাসীদের একটি সেনাদলের প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করে।

মানচিত্রে দেখলে হুগোমঁত জায়গাটাকে এমন এক আয়তক্ষেত্রাকার বলে মনে হয় যার কোণটা ছাঁটা পড়ে গেছে। হুগোমঁতের দু'দিকে দুটো গেট আছে। আগেকার জমিদার বাড়িতে ঢোকার জন্য দক্ষিণ দিকে একটা গেট আছে আর উত্তর দিকের গেট দিয়ে খামার বাড়িতে ঢোকা যায়। নেপোলিয়ন তাঁর ভাই-এর উপর দিয়েছিলেন এই আক্রমণের ভার। গিলেসিনেত্তে, ফর ও বেশনুর সেনাদলগুলি হুগোমঁতে সমবেত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইংরেজ সেনাবাহিনী ছিল দক্ষিণ দিকে। ফরাসী সেনাদলগুলি ছিল উত্তর দিকে।

খামারের বাড়িগুলি ছিল দক্ষিণ দিকে। উত্তর দিকের গেটটা ফরাসী বাহিনীর দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। উত্তর দিকের গেট সংলগ্ন প্রাচীরটির নিচের দিকটা পাথর দিয়ে তৈরি এবং তার উপর দিকটা ইঁট দিয়ে তৈরি। এখানে যুদ্ধ খুব ঘোরতর হয়। এই প্রাচীরে অনেকদিন রক্তের দাগ ছিল। এই যুদ্ধেই বদিন নিহত হন। অতীতের জীবন-মৃত্যুর এক যুদ্ধের বিভীষিকা ও প্রবলতা আজও যেন প্রাচীরগাত্রে খোদাই করা আছে।

ভগ্ন প্রাচীরের অংশগুলো অসংখ্য ক্ষতমুখের মতো বেদনায় হাঁ করে আছে যেন আজও। এখানকার প্রাচীরগুলো ১৮১৫ সালে নির্মিত হয়।

ইংরেজ বাহিনী এই হুগোর্মতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফরাসী বাহিনী সে অবরোধ ভেঙে ফেলে। কিন্তু দাঁড়াতে পারেনি সেখানে। গীর্জার পাশে জমিদারদের প্রাচীন বাসভবনটির ধ্বংসাবশেষটি আজও সেই যুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করছে। ফরাসী বাহিনী চারদিকে সেই প্রাচীন প্রাসাদটিকে আক্রমণ করে। অবশেষে কাঠ এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের জ্বলন্ত শিখা দিয়ে শত্রুদের বন্দুকের গুলির মোকাবিলা করা হয়।

প্রাসাদটির রুদ্ধ জানালাগুলোর মধ্য দিয়ে তার ভিতরকার ঘরগুলো দেখা যায়। বাড়িটা ছিল দোতলা। ইংরেজ বাহিনী উপরতলায় আশ্রয় নেয়। বাইরের দিকে যে সিঁড়িটা নিচের তলা থেকে উপরতলায় উঠে গেছে তার পাশে দুটো গাছ ছিল। একটা গাছ একেবারে মৃত আর একটার নিচের দিকটা বিধ্বস্ত, তবু প্রতি বছর বসন্তকালে তাতে নতুন পাতা গজায়।

সেদিনকার যুদ্ধে হুগোর্মতের ছোট্ট গীর্জাটা হয়ে উঠেছিল এক বিরাট হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যস্থল। তার নীরব নির্জন অভ্যন্তরভাগটা আজও অক্ষত অবস্থায় স্তব্ধ হয়ে আছে আশ্চর্যভাবে। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের দেওয়ালের গায়ে কাঠের যে বেদীটাতে সেই যুদ্ধের পর থেকে কোনও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়নি সে বেদীটা আজও ঠিক আছে। চারদিকের দেওয়ালগুলো চুনকাম করা আছে। বেদীর উল্টো দিকে একটা দরজার উপরে আছে বড় কাঠের ক্রস। দু'দিকে দুটো জানালা। বেদীর কাছে সেন্ট অ্যানীর একটা কাঠের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মেরীর কোলে শিশু যীশুর মাথাটা বুলেটের আঘাতে উড়ে গেছে। ফরাসীরা গীর্জাটার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নেওয়ার পর শত্রুদের চাপে পালিয়ে যাবার সময় গীর্জাটায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে যায়। সমস্ত গীর্জাটা এক জ্বলন্ত চুল্লীর আকার ধারণ করে। তার ছাদ খসে পড়ে। দরজা আগুনে পুড়ে যায়। কিন্তু যীশুর কাঠের মূর্তিটি পোড়েনি। জ্বলন্ত আগুনের শিখাগুলি মূর্তিটির পাগুলিকে গ্রাস করে। পায়ে এখনো পোড়ার দাগ আছে। কিন্তু আর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। কোন্ এক ঐন্দ্রজালিক কারণে মূর্তিটি পুড়ে যায় তা কেউ বলতে পারে না। লোকে বলে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তবয়স্ক যীশুর কাঠের মূর্তির থেকে যীশুর ভাগ্য অনেক খারাপ।

গীর্জার দেওয়ালগুলোতে অনেক ছবি খোদাই করা ছিল। যীশুর মূর্তির পায়ের তলায় কতকগুলো ফরাসী নাম লেখা ছিল। সে নামগুলো হলো হেঙ্গুইনেজ, কন্দে দ্য রিওমেয়র, মার্কোয়েসা দ্য আনমাদরো। ১৮৪৯ সালে দেওয়ালগুলো আবার রং করা হয়। এই গীর্জারই দরজার কাছে আহত সাব লেফটন্যান্ট নেগ্রস যখন কুঠার হাতে হাঁপাচ্ছিল তখন তাকে তুলে আনা হয়।

গীর্জার বাঁ দিকে দুই-একটা কুয়ো আছে। কিন্তু কোনও বালতি নেই। কেউ জল তোলে না সেই কুয়ো থেকে। কারণ সেই কুয়ো গরমকালে ভর্তি থাকে। যে লোক

এই কুয়ো থেকে শেষবারেব মতো জল তোলে তার নাম হলো গিলম ভন কিনসম। সে ছিল হুগোমঁতের এক চাষী, বাগানে মালীর কাজ করত। ১৮১৫ সালের ১৪ই জুন তারিখে তার পরিবারের লোকজন সব বনে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ভিলিয়েরের গীর্জার পাশে যে বন ছিল সেই বনে কয়েকদিন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভীত সন্ত্রস্ত লোকরা আশ্রয় নেয়। তারা বনের মধ্যে যেখানে অস্থায়ী শিবির স্থাপন করে রান্নাবাড়া করত সেখানকার গাছগুলো আজও আধপোড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

ইংরেজরা হুগোমঁত আক্রমণ করলে গিলম ভন কিনসম মাটির তলায় একটা ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেয়। ইংরেজরা তাকে সেখান থেকে ধরে এনে ছোরা আর বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারতে থাকে এবং জোর করে তাদের কাজ করতে বাধ্য করে। ইংরেজ সৈন্যরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লে গিলম কুয়ো থেকে জল তুলে খেতে দেয়। শোনা যায় সেই জল খেয়ে নাকি অনেক ইংরেজসেনার মৃত্যু হয়। অনেকের মৃত্যু ঘটবার পর সেই কুয়োটারও মৃত্যু হয়। সেটা একেবারে অকেজো ও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

যুদ্ধে বহু লোক মারা যাওয়ায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহগুলোর সৎকার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইংরেজরা যুদ্ধে জয়লাভ করলেও জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহামারীর আক্রমণ শুরু হয়। ফরাসীদের হারিয়ে দিলেও মহামারীর আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারল না তারা। মৃত্যুর কালো হাত ম্লান করে দিল বিজয়গৌরবের সব উজ্জ্বলতাকে। টাইফাস রোগের এক বিশাল করাল ছায়া আচ্ছন্ন করে ফেলল জয়ের সব আনন্দকে। এ রোগেও অনেক সৈনিকের মৃত্যু হয়। অত মৃত লোকের জন্য কবর খোঁড়া সম্ভব নয়। তিনশো মৃতদেহ সেই গভীর কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওযা হয। কিন্তু সেগুলো কি সব মৃতদেহই ছিল? পরে শোনা যায় কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়া মৃতদেহগুলোর মধ্যে অনেক জীবন্ত মানুষও ছিল। অনেক মুমূর্ষু ও মৃতপ্রায় লোককেও ফেলে দেওয়া হয়। শোনা যায় যেদিন মৃতদেহগুলো ফেলে দেওয়া হয় সেইদিন রাতে কুয়োর ভিতর থেকে সাহায্যের জন্য অনেক কণ্ঠের [illegible]র আর্তনাদ ভেসে আসে।

কুয়োটার তিন দিক ঘেরা, তার মাথায় ছাদ। একদিক খোলা। সেই দিকে যাতায়াত হত। সেখানে যাবার কোনও বাঁধানো পথ ছিল না।

বিধ্বস্ত বাড়িগুলোর মাঝে একটা বাড়িতে আজও কিছু লোক থাকে। এই বাড়ির সদর দরজাটা উঠোনের দিকে খোলা। এই দরজাটা বাইরে থেকে টানার জন্য একটা চামচে ধরনের হাতল আছে। যুদ্ধের কালে একজন হ্যানোভারবংশীয় লেফটন্যান্ট সেই বাড়িতে ঢোকার জন্য এই দরজার হাতলটা ধরতেই একজন ফরাসী সেনা কুড়ুল দিয়ে তার মাথাটা কেটে ফেলে।

বাগানের মালী গিলম বহুদিন আগেই মারা গেছে। তবে আজকের এই খামার বাড়িতে তারই পৌত্র ও বংশধরেরা বাস করে। সেই বাড়িতে আজ পাকা চুলওয়ালা এক বুড়িকে যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করলেই সে বলবে, আমি তখন এখানেই ছিলাম। আমার বয়স তখন মাত্র তিন। আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। আমার বোন ছিল

আমার থেকে বড়। সে তখন খুব কাঁদছিল। আমি ছিলাম আমার মার কোলে। আমরা ভয়ে বনে পালিয়ে গিয়েছিলাম। মাটিতে কান পেতে আমরা কামানের গোলার শব্দ শুনতে পেতাম। আমরা সেই শব্দ নকল করে মুখে কেবল বুম্, বুম্, শব্দ করতাম।

উঠোনের শেষ প্রান্তে পাঁচিলের গায়ে একটা গেট আছে। সেই গেটটার ওপারে একটা বাগান। সে বাগানের নামটা ফুলবাগান হলেও তার তিনটে অংশ আছে। প্রথম অংশে আমবাগান, দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ফুলবাগান আর শেষ অংশে আছে ঝোপঝাড়। গোটা বাগানটার বাঁ দিকে ঝোপঝাড় আর ডান দিকে খামার আর ঘরবাড়ি। গোটা বাগানটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাগানটা ঢালু হয়ে যেখানে নিচে নেমে গেছে সেখানে অনেক ফলের গাছ লাগানো হয়। গাছগুলোর আশেপাশে এখন আগাছা গজিয়ে উঠেছে। এই বাগানটা ছিল এক ফরাসী জমিদারের। এখন আগাছা আর কাঁটাগাছে ভর্তি। পাথরের অনেক স্তম্ভ বাগান বাড়ির ছাদটাকে ধরে ছিল। অনেক স্তম্ভ যুদ্ধের সময় ভেঙে গেলেও এখনো তেতাল্লিশটা স্তম্ভ অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

যুদ্ধের সময় এই বাগানেই একদিন এক ফরাসী পদাতিক বাহিনীর দু'জন সৈনিক দুটি ইংরেজ সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। গর্তে অবরুদ্ধ ভালুকের মতো দু'জন ফরাসী সৈনিক আটকা পড়ে গিয়েছিল আর ছাদের উপর থেকে ইংরেজ সৈন্যরা গুলিবর্ষণ করছিল। দু'জন বীর পুরুষ দু'শোজন সৈনিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে মাত্র পনের মিনিটের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে।

বাগানের প্রথম অংশ থেকে কয়েক পা এগোলেই যে ফুলবাগান পাওয়া যায় সেই ফুলবাগানে যুদ্ধ চলাকালে এক ঘণ্টার মধ্যে পনেরশো বীর সৈনিক প্রাণ দেয়। একদিকের পাঁচিলের গায়ে এখনো আটত্রিশটা ছিদ্র দেখা যায়। মনে হয় আজও যেন ছিদ্রগুলো যুদ্ধের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকা ফরাসী সেনারা জানত না পাঁচিলের কাছে এক পরিখার ভিতরে ইংরেজ বাহিনীর সেনারা লুকিয়ে ছিল। তারা ঝোপ থেকে এগিয়ে এলেই ইংরেজ সেনারা গুলি বর্ষণ করতে থাকে অতর্কিতে। পাঁচিলের কাছে দুটো পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তা হলো দু'জন মৃত ইংরেজ সেনাপতির স্মৃতিস্তম্ভ। এইভাবে সূচনা হয় ওয়াটারলু যুদ্ধের।

তবু ফরাসী সেনারা বাগানটায় ঢুকে পড়ে। কোনও মই না পেলেও তারা হাত-পা দিয়ে গুড়ি মেরে পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানের ভিতর পড়ে গাছের তলায় হাতাহাতি লড়াই করতে থাকে ইংরেজদের সঙ্গে। বাগানের সব ঘাস রক্তে ভিজে যায়। লাসাউ বাহিনীর সাতশো সৈনিক একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।

অন্যান্য বাগানের মতো হুগোমঁতের এই ফুলবাগানটাও বসন্তের আগমনে চঞ্চল হয়ে ওঠে। উতল বাতাসে গাছপালার শাখাগুলি আন্দোলিত হয়। ঘাসের সবুজ বিছানাটা ঘন হয়ে ওঠে। খামারের ঘোড়াগুলো সেখানে চরতে থাকে। শ্যাওলাধরা একটা গাছের গুঁড়ি অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। এর পাশে একদিন মেজর ব্ল্যাকম্যান মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে ছিল। কাছেই আর একটা গাছের তলায় জার্মান সেনাপতি জেনারেল

দুপ্লাতের মৃত্যু হয়। পন্তের আদেশ বাতিল হবার সঙ্গে সঙ্গে এক ফরাসী পরিবার নির্বাসিত হয়। এর পাশেই ছিল একটা রুগ্ন আপেল গাছ যেটাকে এখন খড মাটি দিয়ে বেঁধে কোনওরকমে খাড়া করিয়ে রাখা হয়েছে। এখানকার সব আপেল গাছগুলোরই প্রচুর বয়স হয়েছে। ওগুলো অনেক দিনের পুরনো। তার উপর এমন একটা গাছও নেই যার গায়ে গুলির দাগ নেই। অনেক মরা গাছের কঙ্কাল আছে ফুলবাগানে। কঙ্কালসার সেই গাছগুলোর শাখা-প্রশাখায় কাক উড়ে বেডাচ্ছে। তার ওপাশেই আবার একটা গাছে কত ভায়োলেট ফুল ফুটে রয়েছে।

সেই ভযঙ্কর যুদ্ধে বদিন মারা যায়, ফর মারা যায়, ইংরেজ, জার্মান ও ফরাসী সৈন্যদের রক্তের স্রোত বয়ে যায়। একটি গভীর কুয়ো মৃতদেহে ভরে যায়। হুগোমঁতের খামারবাড়িতে বুলেট, বেয়নেট, আগুন আর তরবারির আঘাতে লাসাউ আর ব্রানসউইক বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। তেতাল্লিশ হাজার সৈন্যসমম্বিত কতকগুলি ফরাসী বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অগণ্য মানুষের রক্তপাতে কলঙ্কিত এই হলো ওয়াটারলু যুদ্ধের কাহিনী। কোনও পথিক হুগোমঁতে গেলেই মাত্র তিন ফ্রাঁ দিলেই প্রদর্শক বলবে, মঁসিয়ে, আমি ওযাটারলু যুদ্ধের সব কথা ও কাহিনী আপনাকে বলব।

৩

এই যুদ্ধের কাহিনীর সুতো ধরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত ঘটনাগুলির কিছু আগে ১৮১৫ সালের সেই বিভীষিকাময় বছরটিতে।

১৮১৫ সালের ১৭ই থেকে ১৮ই জুনের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হত তাহলে ইউরোপের ভবিষ্যৎ অন্য রকম হত। মাত্র কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জল নেপোলিয়নের ভাগ্য নির্ধারণ করে। নিয়তির বিধানে একপশলা বৃষ্টির সহায়তায় ওয়াটারলুর যুদ্ধ অস্টারলিৎস-এর যুদ্ধের প্রত্যুত্তর দেয়। অকালে ঘনিয়ে আসা এক আকাশ মেঘ একটি জগতের ধ্বংসকে ডেকে আনে।

বৃষ্টির জলে মাটি ভিজে থাকার জন্য ওয়াটারলুর যুদ্ধ সাড়ে এগারটার আগে শুরু হতে পারেনি। ভিজে মাটি একটু না শুকোলে অস্ত্রবাহিনীর গাড়িগুলি চলতে পারবে না।

নেপোলিয়ন নিজে একদিন অস্ত্রবাহিনীর অফিসার থাকায একথা ভালভাবে জানতেন। তাঁর সামরিক অভিযান পরিকল্পনার মূল কথা ছিল তাঁর বিপুল অস্ত্রসম্ভার ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। যে কোনও যুদ্ধ জয়ের এটাই ছিল মূলমন্ত্র। কোনও দুর্গ আক্রমণের মতো শত্রুপক্ষের সেনানায়কদের প্রতিরক্ষাগত কৌশলগুলিকে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত করে দিতেন। কামানের গোলা দিয়ে তিনি শুধু শত্রুপক্ষের দুর্বল জায়গাগুলিকে আঘাত করতেন। কামান থেকে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করে শত্রুবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে গিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়াই ছিল তাঁর সাফল্যের মূলমন্ত্র। তাঁর লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। এই ভয়ঙ্কর পদ্ধতি পনের বছর ধরে অনুসরণ করে এক বিরল প্রতিভার পরিচয় দিয়ে যুদ্ধে অজেয় হয়ে ওঠেন তিনি।

১৮১৫ সালের জুন মাসের যুদ্ধেও তিনি তাঁর অস্ত্রসম্ভারের উপরেই জোর দেন বেশি। কারণ তাঁর সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিল। ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের যেখানে ছিল ১৫৯টি কামান, নেপোলিয়নের ছিল ২৪০টি কামান।

যুদ্ধক্ষেত্রের মাটি শুকনো থাকলে এবং অস্ত্রবাহিনীর গাড়িগুলি ঠিকমতো চলতে পারলে যুদ্ধ সকাল ছ'টায় শুরু হতে পারত এবং বেলা দুটোর মধ্যেই তা শেষ হয়ে যেত। প্রুশীয় বাহিনী এসে যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেবার তিন ঘণ্টা আগেই ফরাসীরা জয়লাভ করতে পারত।

এই পরাজয়ের জন্য নেপোলিয়নকে কতখানি দায়ী করা চলে? জাহাজডুবির জন্য নাবিক কি সত্যিই দায়ী?

এই সময় নেপোলিয়নের যে শারীরিক অবক্ষয় ঘটে সেই অবক্ষয়ের ফলেই কি তাঁর মানসিক শক্তি দুর্বল হয়ে ওঠে? কুড়ি বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ করে করে তাঁর শরীর আর মন কি একই সঙ্গে ভেঙে পড়ে? সৈন্য পরিচালনা বা যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর এই অবক্ষয় কি প্রকটিত হয়ে ওঠে? অনেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে নেপোলিয়নের সমরপ্রতিভা এই সময় ম্লান হয়ে আসছিল এবং তিনি উন্মাদের মতো তাঁর এই প্রতিভার সামগ্রিক অবক্ষয়ের ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করছিলেন। এই ধারণা কি সত্যি? সামরিক ব্যর্থতার আঘাতে তিনি কি দোদুল্যচিত্ত হয়ে ওঠেন—যে দোদুল্যচিত্ততা একজন সেনাপতির পক্ষে এক বিরাট ত্রুটি? অথবা তিনি বিপদ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন? যাঁরা কর্মবীর এবং কর্মক্ষমতায় দানবিক ক্ষমতার অধিকারী, তাঁদের জীবনে কি এই ধরনের একটা সময় আসে যখন তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি কোনও কারণে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে এইভাবে? অসাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন মহান পুরুষদের ক্ষেত্রে বয়সের চাপ কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। যে বার্ধক্য দান্তে ও মিকালাঞ্জেলোর জীবনে প্রকৃত গতিশক্তি দান করে, সে বার্ধক্য কি হ্যানিবল ও বোনাপার্টের শক্তিকে দমিয়ে দেয়? জয়ের উদ্যম বা উৎসাহ কি হারিয়ে ফেলেন নেপোলিয়ন? তিনি কি চলার পথে তাঁর সামনে কোথায় গর্ত আছে, কোথায় ফাঁদ পাতা আছে, কোথায় খাদের পাড়ের মাটি ধসে যাচ্ছে তা দেখতে পাননি? বিপদকে এড়িয়ে যাবার প্রবৃত্তি কি হারিয়ে ফেলেন তিনি? যিনি তাঁর আগ্নেয় রথের উপর থেকে এক অপরাজেয় বীরের মতো অঙুলি সঞ্চালন করে কত জয়ের পথ দেখিয়েছেন আজ কি তিনি তাঁর বিশাল বাহিনীকে ভুল পথে চালিত করে এক অতল খাদের মধ্যে ফেলে দেন? ছেচল্লিশ বছর বয়সেই তিনি কি শেষে উন্মাদ হয়ে যান? যিনি ছিলেন এক বিরাট মহাদেশের অবিসম্বাদিত ভাগ্যবিধাতা, তিনি কি শেষে ঘাড়ভাঙা এক সামান্য গাড়িচালকে পরিণত হন?

আমরা এটা বিশ্বাস করতে পারি না।

তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনা যে অপূর্ব ও অসাধারণ ছিল একথা সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, মিত্রবাহিনীর মধ্যে যে ফাঁক ছিল তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে শত্রুপক্ষকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া, বৃটিশ বাহিনীকে হালের দিকে আর প্রুশীয় বাহিনী

তংগ্রেসের দিকে ঠেলে দেওয়া। তাঁর ইচ্ছা ছিল ব্রাসেল দখল করে জার্মানদের রাইন নদীতে আর ইংরেজদের সমুদ্রে ফেলে দেবেন তিনি। এইভাবে এ যুদ্ধে এক বিরল কৃতিত্ব লাভ করতে চেয়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন তারপর তাঁর অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখবেন তিনি।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমরা ওয়াটারলুর যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ লিখতে বসিনি। আমাদের কাহিনীর এক সংকটজনক কাল এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হলেও এ যুদ্ধের পূর্ণ ইতিবৃত্ত বর্ণনার কোনও প্রযোজন নেই। এ যুদ্ধের কাহিনী নেপোলিযন নিজেই ভাল বর্ণনা করেছেন এবং অনেক ঐতিহাসিকও তা বর্ণনা করেছেন।

যুদ্ধ বর্ণনার ভার উপযুক্ত ঐতিহাসিকদের উপর দিয়ে আমরা শুধু পর্যবেক্ষক ও পথিক রূপে নররক্তে রঞ্জিত যুদ্ধক্ষেত্রটিকে খুঁটিয়ে দেখছি আর আপাতদৃষ্ট বস্তুগুলিকে সত্য বলে ভাবছি। যে সব তথ্যপুঞ্জ আমরা পাচ্ছি সেগুলি থেকে আসল সত্যকে নিষ্কাশিত করার মতো পাণ্ডিত্য আমাদের নেই। সে তথ্যের মধ্যে হয়ত অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। সেগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করার মতো আমাদের সামরিক জ্ঞান নেই। যে সব বিপর্যয ওযাটাবলুব যুদ্ধের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলি আমরা সরলমনা সাধারণ মানুষের মতোই বিচার করে দেখি।

৪

ওযাটারলু যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ঠিকমতো এক পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে হলে ইংরেজি ভাষায প্রথম 'A' আঁকতে হবে। এ অক্ষরের বাঁ দিকের রেখাটিকে লিভেলে থেকে বেরিযে আসা রাস্তাটাকে ধরে নিতে হবে আর তার ডান দিকের রাস্তাটিকে গেলাপ্পে থেকে বেরোনো রাস্তাটিকে ধরে নিতে হবে। মাঝখানের যে সংযোগ রেখাটিকে দু'দিকের দুটি রেখাকে যুক্ত করেছে সেই সংযোগ রেখাটিকে ওহেন থেকে ব্রেন লালিউদগামী রাস্তাটিকে ধরে নিতে হবে। মাথার যে শীর্ষবিন্দু থেকে দুটি রেখা বেরিযেছে সে বিন্দু হলো মঁ সেন্ট জাঁ যেখানে বিয়েন জেরোম আর বোনাপার্ট অবস্থান করছিলেন। ডানদিকের বেখার পাযের তলায লা বেল এলায়েন্স ছিল নেপোলিযনের সদর অফিস। যে সংযোগরেখাটা বাঁ দিক থেকে ডানদিকের রেখার সঙ্গে মিলিত হযেছে তার কিছু নিচে লা হায়াসেন্তে নামে একটা জায়গা আছে। এই সংযোগরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলেই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণীত হয়। এই জায়গাতেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও বীরত্বের প্রতীক হিসাবে একটি পাথরের সিংহকে স্থাপন করা হয়েছে। শীর্ষবিন্দু থেকে সংযোগরেখা পর্যন্ত ত্রিভুজাকার যে ক্ষেত্র আছে তা হলো মঁ সেন্ট জাঁর মালভূমি। এই মালভূমি অঞ্চল দখলের সংগ্রামই হলো ওয়াটারলু যুদ্ধের মূল কথা।

গেলাপ্পে থেকে লিভেলের দিকে যে রাস্তা চলে গেছে তার দু'দিকে দুটি বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়। দার্লন পিকটনের আর রেইলি হিলের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মঁ সেন্ট জাঁ মালভূমির শীর্ষদেশের ওপারেই শুরু হয়েছে সয়নের বনভূমি।

সমগ্র মালভূমিটা ক্রমশ ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে বনভূমির উপান্তে গিয়ে মিলে গেছে।

যে কোনও যুদ্ধে দুই পক্ষের বাহিনী যেকোনওভাবে পরস্পরকে পরাভূত করার চেষ্টা করে। সেই যুদ্ধক্ষেত্রের ভূ-প্রকৃতির অন্তর্গত সব কিছুরই একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। সামান্য একটা বন বা ঝোপ বা পাঁচিলের একটা কোণ পশ্চাদপসরণরত বাহিনীকে আশ্রয় দিতে পারে। আবার এই ধরনের কোনও আশ্রয় না পেলে কোনও বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আবার পলায়নরত সেনাবাহিনীর পথে যদি বন বা খাদ, খাল, বিল বা নদী থাকে তাহলে তাদের গতি ব্যাহত হয়। আবার পালাবার পথে পলাতকবাহিনী যদি দেখে দু'দিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে তাহলেও তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এইজন্যই বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতিদের পারিপার্শ্বিক ভূ-প্রকৃতির অন্তর্গত সব বস্তুও খুঁটিয়ে দেখতে হয়।

ইংরেজ ও ফরাসী দু'পক্ষেরই সেনাপতিরা যুদ্ধের আগে মঁ জাঁর মালভূমিটাকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে নেয়। এইটাকে বলা হয় ওয়াটারলুর সমভূমি। ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের এক প্রশংসনীয় দূরদৃষ্টি ছিল বলেই যুদ্ধের এক বছর আগে ঘোড়ায় চড়ে জায়গাটা ঘুরে দেখে নেন, এক বিশাল রণক্ষেত্র হবার এক বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পান তিনি এ জায়গাটার মধ্যে। যুদ্ধের সময় বৃটিশবাহিনী ফরাসীদের থেকে আরও উঁচু জায়গায় ছিল বলে যুদ্ধের অবস্থা তাদের অনুকূলেই বেশি যায়।

১৮ই জুন সকালবেলায় নেপোলিয়ন যখন তাঁর ঘোড়ার উপরে বসে রসোম পাহাড়ের উপর থেকে ফীল্ডগ্লাস হাতে সামনের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়েছিলেন তখনকার সেই চিত্রটা নতুন করে আঁকার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ এ চিত্রটা প্রায় সকলেরই পরিচিত। বাঁকানো টুপিব নিচে তাঁর মুখের প্রশান্ত ভাব, তাঁর সবুজ টিউনিক, ধূসর রঙের কোট, সূচীশিল্পের কাজকরা 'এন' অক্ষর ঈগল আঁকা নীলচে মখমলের কাপড়ের জিন দিয়ে সাজানো সাদা ঘোড়া, তাঁর পায়ে সিল্কের মোজার উপর ক্যাভালরি বুট, রুপোর লাগাম, ম্যারঙ্গো তরবারি—এ যেন শেষ সীজারের চিত্র যা সকল মানুষের মনেই জেগে আছে, যে চিত্র অনেকের দ্বারা বন্দিত হয় এবং অনেকের দ্বারা নিন্দিত হয়।

অন্যান্য মহান পুরুষদের মতো নেপোলিয়নের এই মূর্তিটি রূপকথা আর জনশ্রুতির কুয়াশা ভেদ করে এক আশ্চর্য আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সে মূর্তির আড়ালে আসল সত্যটা লুকিয়ে থাকে। আজ যেন ইতিহাস আর উজ্জ্বল দিবালোক এক হয়ে গেছে।

ইতিহাসের দিবালোক বড় নির্মম। সে আলোর মধ্যে আলোকের উপাদান থাকলেও তার মধ্যে এমন একটি ঐন্দ্রজালিক অশুভ শক্তি থাকে যা ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তির সব উজ্জ্বলতার উপর এক ছায়া বিস্তারের দ্বারা সে ব্যক্তির পরস্পর-বিরুদ্ধ দুটি মূর্তিকে তুলে ধরে। এইভাবে দেখা যায় কোনও স্বৈরাচারী শাসকের অন্ধকারাচ্ছন্ন মূর্তির ঊর্ধ্বে নেতৃত্বসুলভ এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব বড় হয়ে ওঠে। এইভাবে সব ঐতিহাসিক ব্যক্তির

দুটি মূর্তি দেখে এক সংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় আমাদের। বিধ্বস্ত বেবিলন আলেকজান্ডারের মহত্ত্বকে খর্ব করে, পরাধীন রোম সীজারের ভাবমূর্তিকে ম্লান করে, লুণ্ঠিত জেরুজালেম টিটাসকে হীন করে তোলে। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে সব মানুষই তার উজ্জ্বল মূর্তিটার পিছনে মৃত্যুর পর একটা ছায়া রেখে যায়।

৫

ওয়াটারলুর যুদ্ধের প্রথম স্তরের কথা সকলেই জানে। এক ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। সে অনিশ্চয়তা উভয় দলের পক্ষেই ছিল বিপজ্জনক। ফরাসীদের থেকে ইংরেজদের পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা ছিল বেশি।

আগের দিন সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জলে কাদা হযে যায। চারদিকে জল জমে যায়। পাপেলোত্তের চারদিকে ছোট্ট উপত্যকাটায় মাঠ থেকে সব গমের শুকনো গাছগুলো এনে কাদার উপর বিছিয়ে দিয়ে অস্ত্রবোঝাই গাডিগুলোকে নিয়ে যাওযা হয।

যুদ্ধ শুরু হতে দেরি হয়। নেপোলিয়ন সব যুদ্ধে অস্ত্র বাহিনী তাঁর নেতৃত্বাধীনে রাখতেন। এক বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখে ধরে থাকা এক পিস্তলের মতো তাঁর অস্ত্র বাহিনী যুদ্ধের এক বিশেষ মুহূর্তে প্রয়োগ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত হযে থাকতেন তিনি। ঠিকমতো অস্ত্র প্রয়োগের জন্য সূর্য ওঠার এবং মাঠটা শুকনো হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু মেঘ কেটে সূর্য বেরিযে এল না। এটা অস্টার-লিৎস-এর যুদ্ধ নয়। ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হতে দেরি হলো। ওয়াটারলু যুদ্ধে যখন প্রথম কামানের গোলা বর্ষিত হয তখন জেনারেল কলভিল ঘড়ি দেখে বললেন বেলা সাডে এগারটা বাজে।

ফরাসীদের পক্ষ থেকে জোর আক্রমণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ হয। হুগোমঁতে অবস্থানরত ফরাসী বাহিনীর বাঁ দিকের সেনারা প্রথমে এমন জোরে আক্রমণ করে যে সম্রাট নিজেও তা ভাবতে পারেননি। নেপোলিয়ন নিজে ফরাসী বাহিনীর মাঝখানে থেকে আক্রমণ করেন। তিনি ইংরেজদের লা হাই সেন্তের বাহিনীর বিরুদ্ধে কুযোত বাহিনীকে ঝাঁপিয়ে পডার হুকুম দেন। জেনারেল লে পাপেলোত্তে দখল করে থাকা বাঁ দিকের ইংরেজ বাহিনীকে ডান দিক থেকে এক ফরাসী বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেন।

হুগোমঁতে ফরাসীদের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের সেনাপতি ওয়েলিংটনকে টেনে আনা। ফরাসীদের এই উদ্দেশ্য এবং এই পরিকল্পনা সার্থক হত যদি ইংরেজ বাহিনীর চারটি দল এবং পাপনিশারের এক বেলজিয়ান বাহিনী ঠিকমতো ফরাসী আক্রমণকে প্রতিহত করার জোর চেষ্টা চালিযে যেত আব ওয়েলিংটন ব্রানসউইক থেকে আসা আরও চারটি সেনাদল নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।

পাপোলেত্তে অবস্থানরত ইংরেজ বাহিনীকে ডান দিক থেকে ফরাসীদের আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্য ছিল বাঁ দিকের ইংরেজ বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে ব্রাসেলস্ যাবার পথটা পরিষ্কার করা যাতে প্রুশীয় বাহিনী সে পথে আসতে না পারে, যাতে ওয়েলিংটন

প্রথমে হুগোমঁত ও পরে ব্রেন লালিউদ এবং হলে অভিযান চালাতে বাধ্য হন। এই পরিকল্পনাটা ছিল বেশ পরিষ্কার এবং সেটা অনেকখানি সফল হয় এবং পাপোলেত্তে ও লা হাই সেন্ত দখল হয়।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। ইংরেজদের পদাতিক বাহিনী বিশেষ করে কেম্পতের বাহিনীতে অনেক নতুন সৈন্য নেওয়া হয়েছিল। এই নতুন সৈন্যদের যুদ্ধের বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা না থাকলেও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। তারা নতুন এবং অনভিজ্ঞ হলেও তাদের মধ্যে এক দুর্ধর্ষ হটকারিতা ছিল। ফরাসীদের মতোই যে কোনও যুদ্ধে যে কোনও অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়ার এক প্রবণতা ছিল। ওয়েলিংটন এটা পছন্দ করতেন না।

লা হাই সেন্তের পতনের পর থেকে ইংরেজদের অবস্থা ভাগ্যের দাঁড়িপাল্লায় ঝুলতে থাকে। দুপুর থেকে বেলা চারটে পর্যন্ত যে যুদ্ধ চলতে থাকে তার গতিপ্রকৃতি এক রহস্যের কুয়াশায় আচ্ছন্ন ও দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। তুমুল গোলমাল আর হট্টগোলের মধ্যে পরিষ্কার করে কিছুই বোঝা যায় না। ইংরেজ পক্ষে ছিল ব্রানসউইক বাহিনী, হ্যালোভার বাহিনী আর স্কট সেনাবাহিনী। ব্রানসউইক বাহিনীর সৈন্যদের টিউনিকগুলো ছিল কালো, ইংরেজ সেনাদের টিউনিক ছিল ঘোর লাল। হ্যানোভারের অশ্বারোহীদলের শিরস্ত্রাণের উপরে ছিল লাল পালক, স্কট বাহিনীর পায়ে কোনও পদবন্ধনী ছিল না আর ফরাসী বাহিনীর পদবন্ধনী ছিল সাদা। এ যেন শুধু রঙের খেলা যা চিত্রকরদের পক্ষে ফুটিয়ে তোলা সহজ। এ যুদ্ধের পদ্ধতি ছিল সেকেলে।

যেকোনও সশস্ত্র যুদ্ধে সেনাপতি বা সেনানায়করা যতই পরিকল্পনা করে যুদ্ধ পরিচালনা করুক না কেন, তার ফল কি হবে তা কেউ বলতে পারে না। যুদ্ধের প্রতিটি ক্রিয়ার প্রতিটি প্রতিক্রিয়াই সাধারণত হয়ে থাকে অপ্রত্যাশিত এবং অকল্পনীয়। একজন সেনাপতির পরিকল্পনা অপর পক্ষের সেনাপতির পরিকল্পনাকে কখনো সার্থক আবার কখনো ব্যর্থ করে দেয় অপ্রত্যাশিতভাবে। অববাহিকার ভূমি প্রকৃতি অনুসারে যেমন জলধারা কমবেশি প্রবাহিত হয় তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে এক-একজন যোদ্ধা শত্রুপক্ষের বেশি সৈন্য নিধন করে অল্প সময়ের মধ্যে। এক-এক জায়গায় বেশি সৈন্য পাঠাতে হয়। এইভাবে আগের পরিকল্পনা ওলোটপালোট হয়ে যায়। বাতাসে উড়তে থাকা সুতোর মতো সৈন্যদের সারি ভেঙে যায়, এলোমেলো হয়ে যায়। রক্তস্রোত যখন প্রবাহিত হয় তখন তা কোনও যুক্তি মেনে চলে না। সৈন্যবাহিনী সমুদ্রতরঙ্গের মতোই লীলাচঞ্চল। সমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন বেলাভূমির দিকে এগিয়ে আসে, আর চলে যায় তেমনি সেনাবাহিনীর মধ্যেও তরঙ্গলীলা চলে। সৈন্যবাহিনী অপসৃয়মান বালুকারাশির মতোই অস্থায়ী। যেখানে যা থাকার কথা সেখানে তা থাকে না। যেখানে পদাতিক থাকে, সেখানে অস্ত্রবাহিনী এসে যায়। আবার যেখানে অস্ত্রবাহিনী থাকার কথা সেখানে অশ্বারোহী বাহিনী এসে যায়। সৈন্যবাহিনী ধোঁয়ার মতো বিলীয়মান। অসংখ্য লোক চারদিকে ছোটাছুটি করে। একটা জায়গায় এইমাত্র একটা জিনিস দেখলে, কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখবে অন্য একটা জিনিস। আঙ্কিক নিয়মে খাড়া করা কোনও

পরিকল্পনা অথবা জ্যামিতিক নিয়মে আকা কোনও ছক যুদ্ধক্ষেত্রে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। যুদ্ধের মতিগতির সঙ্গে একমাত্র ঝড়েরই তুলনা চলে। কোনও সাদা কাগজে এলোমেলোভাবে তুলির আঁচড় কাটলেই যুদ্ধের ছবি হয়ে যায়। সেদিক থেকে ভঁদার মূলেঁর থেকে রেমব্রাঁ যুদ্ধের ছবি আঁকার ব্যাপারে বেশি সিদ্ধহস্ত। যুদ্ধের জয়-পরাজয় সম্বন্ধে যে নিশ্চয়তা বেলা বারোটার সময় দেখা দেয়, সে নিশ্চয়তা বেলা তিনটে বাজতেই অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষের ব্যবধান লুপ্ত হয়ে যায়; দুই পক্ষের সৈন্যরা আগ্নেয়াস্ত্র ছেড়ে হাতাহাতি, জনে জনে লড়াই করতে থাকে। সে যুদ্ধের বর্ণনা করা কোনও ঐতিহাসিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এজন্য নেপোলিয়ন নিজে বলতেন, কোনও ইতিহাস নয়, যুদ্ধের আসল বিবরণ সেনাবাহিনীর লোকেরাই দিতে পারে ঠিকমতো। ঐতিহাসিক শুধু কোনও যুদ্ধের মোটামুটি একটা বিবরণ দিতে পারেন। নিয়ত গতিপরিবর্তনশীল যুদ্ধের ভাসমান কুৎসিত মেঘের প্রকৃত রূপরেখা কেউ ঠিকমতো আঁকতে পারে না।

ওয়াটারলু যুদ্ধ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। তবু বিকালের দিকে সে যুদ্ধটা এমন এক জায়গায় এসে স্থিত হয় যেখানে তার চেহারা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৬

বিকাল প্রায় চারটে নাগাদ ওয়েলিংটনের বাহিনী দারুণ মুস্কিলে পড়ে। প্রিন্স অফ অরেঞ্জ সেনাবাহিনীর মধ্যভাগে থেকে সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। বাঁ দিকে ছিলেন হিল আর ডান দিকে ছিলেন পিক্টন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে প্রিন্স অফ অরেঞ্জ সহসা হতাশ হয়ে লাসাউ আর ব্রানসউইক-এর বাহিনীদের তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে বলেন। ইংরেজরা যখন ফরাসীদের ১০৫তম বাহিনীকে পরাস্ত করে তখন মাথায় গুলি লেগে পিক্টন মারা যান। ফলে হিলের [illegible] দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তিনি ওয়েলিংটনের কাছে চলে আসেন সাহায্যের আশায়। ওয়েলিংটনের সামনে তখন ছিল দুটো সমস্যা—হুগোমঁত আর লা হাই সেন্ত। কিন্তু হুগোমঁত তখন জ্বলছে আর হাই সেন্তের আগেই পতন ঘটেছে। সেখানকার খামারবাড়িতে যুদ্ধ হবার সময় তাঁদের পক্ষের তিন হাজার সৈন্য নিহত হয়েছে। যে জার্মান বাহিনী প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল সেই বাহিনীর মধ্যে মাত্র পাঁচজন অফিসার আর বিয়াল্লিশ জন সৈন্য বেঁচে আছে। বারোশো অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে প্রায় অর্ধেক মারা যায়। যখন সেখানে কাছ থেকে দু'পক্ষে হাতাহাতি যুদ্ধ চলে তখন ফরাসীদের বর্শা আর দা-এর আঘাতে স্কট বাহিনীর অনেক অফিসার নিহত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পদাতিক বাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত হয়।

হুগোমঁত আর হাই সেন্তের পতন ঘটায় ওয়েলিংটনের সামনে শুধু একটা ভরসাই ছিল। তিনি মধ্যভাগটা রক্ষা করে যাবেন। তাই হিল আর চেসিকে আনিয়ে দলটাকে ভারী করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটাকে জোরদার করে তুললেন আগের থেকে।

যুদ্ধাঞ্চলের যে মধ্যভাগটায় ওয়েলিংটনের বাহিনী ছিল সে জায়গাটার কতকগুলো

সুবিধা ছিল। জায়গাটা ছিল মঁ সেন্ত জাঁ মালভূমিতে যার পিছনে বিস্তৃত ছিল একটা গাঁ আর সামনে ছিল একটা ঢাল। ঢালটা সামনের দিকে নেমে গেছে এক নিম্ন উপত্যকায়। পিছন দিকে প্রথমেই ছিল একটা পুরনো আমলের পাথরের প্রাসাদ। বাড়িটা এখন নিভেলের সরকারী দখলে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাড়িটা পাথর দিয়ে এমন মজবুত করে গাঁথা হয় যে বন্দুক-রাইফেলের গুলি তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। মালভূমির শেষ প্রান্তে গাঁয়ের দিকে যে বন ছিল সেই বনের কিছু গাছপালা ছেঁটে ইংরেজরা তাদের অনেক কামান ও অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখে যাতে বাইরে থেকে কেউ তাদের অস্ত্রসম্ভার সম্বন্ধে কোনও ধারণা করতে না পারে। ফলে নেপোলিয়ন একবার হ্যাক্সোকে ইংরেজদের অস্ত্রসম্ভার ও সামরিক শক্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে পাঠালে হ্যাক্সো ইংরেজদের বনে লুকিয়ে রাখা অনেক অস্ত্রই দেখতে পায়নি। হ্যাক্সো ফিরে এসে জানাল প্রতিরক্ষার তেমন কোনও ব্যবস্থাই নেই। শুধু নিভেলে আর গেলাপ্পে যাবার পথটা অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। বছরের সেই সময়টা ফসল বাড়ার সময়। মাঠে মাঠে সব ফসল তখন পুরোমাত্রায় বেড়ে উঠেছে। কেম্পতের বাহিনী কার্বাইন হাতে খাড়া হয়ে থাকা মাঠের ফসলের গাছগুলোর আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

আসল কথা হলো গোলন্দাজ বাহিনীর কেন্দ্রস্থলটা ছিল শক্তিশালী ঘাঁটি। তবে সেখানকার একমাত্র বিপদ ছিল সামনের নিকটবর্তী বনভূমি। সামনের দিকে এই বিশাল বনভূমিটার মাঝে মাঝে ছিল জলাভূমি আর বিল। সেদিক দিয়ে কোনও সেনাবাহিনী যাতায়াত করলে সেই জলাভূমিতে বেকায়দায় পড়ে ডুবে যেত অনেক সৈন্য। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত দল থেকে। সে পথে পশ্চাদপসরণ করা সত্যিই কঠিন ছিল। ওয়েলিংটন ডান দিক থেকে চেসি আর বাঁ দিক থেকে উইঙ্ক আর ক্লিন্টনের বাহিনীকে আনিয়ে তাঁর কেন্দ্রীয় বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুললেন। একে একে ব্রানসউইক, লাসাউ, হ্যানোভার, জার্মান প্রভৃতি বাহিনীগুলিকেও তাঁর সাহায্যে আনালেন। এই ভাবে ওয়েলিংটনের নেতৃত্বাধীনে ছিল ছাব্বিশটি বাহিনী। সামনের সারির সেনারা সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে, তাদের সারিটা ডান দিক থেকে ঘুরে পিছনে চলে যায়। এ ছাড়া ওয়েলিংটনের হাতে ছিল সমারসেটের ড্রেগন গার্ড বা দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী বাহিনী। লা হাই সেন্তের যুদ্ধে পমসনতির অধীনস্থ অশ্বারোহী বাহিনী নিশ্চিহ্ন হলেও সমারসেটের বাহিনীটি ঠিক ছিল।

তাড়াহুড়োর জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঠিকমতো হয়ে ওঠেনি। অস্ত্রসম্ভার ঠিকমতো গুছিয়ে রাখা হয়নি। শুধু এক জায়গায় অনেক বালির বস্তার স্তূপের আড়ালে গোলন্দাজ বাহিনী কামান দাগছিল।

মঁ সেন্ট জাঁ গাঁয়ের একটা মিলের সামনে এক জায়গায় একটা ঘোড়ার পিঠের উপর সারাদিন বসে কাটান ওয়েলিংটন। তিনি ছিলেন একটা এলম গাছের তলায়। সেই গাছটা পরে একজন ইংরেজ দুশো ফ্রাঁ দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। সেদিন ওয়েলিংটনের মূর্তিটা ছিল হিমশীতল এক পাথরের মতো স্তব্ধ এবং অবিচল। কত বুলেট সোঁ সোঁ করে তাঁর পাশ দিয়ে চলে যায়। তাঁর এক সহকারী গর্ডন তাঁর পাশেই নিহত

হয়। হিল তাঁকে বলেন, 'আপনি নিজেই যদি মারা যান তাহলে আপনার হুকুমের দাম কি?' ওয়েলিংটন তখন উত্তর করেন, 'আমি যা করছি তাই করো।' এরপর তিনি ক্লিনটনকে কড়াভাবে বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত একটা লোকও থাকবে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাবে।' যখন অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যায় তখন তিনি তালাভেরা, ভিতোরিয়া আর সালামানকার সেনাদলের লোকদের বলেন, এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না। ইংলন্ডের কথা মনে ভাববে।

কিন্তু বেলা প্রায় চারটে বাজতেই ইংরেজ বাহিনীও অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। সামনের মালভূমির দিকে মুখ তুলে তারা দেখল সামনে শুধু কামান আর গোলন্দাজ বাহিনীর লোকজন। ইংরেজদের পদাতিক বাহিনী ফরাসীদের সেই কামানের গোলার সামনে দাঁড়াতে পারল না। তাই তারা গাঁয়ের পিছনে খামারে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। ওয়েলিংটনের সেনাবাহিনীর সারি ভেঙে গেল। পিছু হটার প্রবণতা দেখা গেল।

তা লক্ষ্য করে নেপোলিয়ন বলে উঠলেন, এই পশ্চাদপসরণ শুরু হলো।

৭

নেপোলিয়ন ত২ন অসুস্থ ছিলেন। দেহের একটা বিশেষ অঙ্গের ব্যথার জন্য ঘোড়ায় চাপতে অসুবিধা হচ্ছিল তাঁর। তবু সেদিনকার মতো এতখানি উৎফুল্ল আর কখনো দেখা যায়নি তাঁকে। সেদিন সকাল থেকেই এক দুর্বোধ্য রহস্যে ভরা তাঁর মুখখানিতে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। মর্মর প্রস্তরের মূর্তির মতো যে মানুষটি এক গভীর স্তব্ধতায় জমাট বেঁধে থাকতেন সব সময়, ১৮১৫ সালের ১৮ই জুন তারিখে এক অকারণ আনন্দের আবেগে উজ্জ্বল হযে ওঠেন সহসা। অস্টারলিৎস-এর সেই ভ্রূকুটিকুটিল বিষণ্ন মানুষটি ওয়াটারলু বণক্ষেত্রে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠেন আশ্চর্যভাবে। নিয়তি এইভাবেই পরিহাস করে আমাদের সঙ্গে। আমাদের সব আনন্দ, হাসির সব আলো ছায়ার মতোই বস্তুহীন।

লাতিন ভাষায় একটি কথা আছে, সীজার যদি হাসে, পম্পে তাহলে কাঁদবে। জয়-পরাজয়েব খেলায় কেউ হারবে, কেউ জিতবে। এ ক্ষেত্রে পম্পে কাঁদেনি, কিন্তু সীজার হেসেছিল।

দুপুর রাতের পর নেপোলিয়ন বার্ট্রান্ডকে নিয়ে ঘোড়ায় করে বজ্র এবং বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে রসোমি পাহাড়ের উপর থেকে ইংরেজদের শিবিরগুলো দেখে তাদের শক্তির পরিমাপ করতে থাকেন। সেই সব শিবিরে যে সব অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল তাদের ছটায় দিগন্তটা পর্যন্ত উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছিল। ফ্রিশের্মঁত থেকে ব্রেন লালিউদ পর্যন্ত সে শিবির বিস্তৃত ছিল। তাঁর মনে হলো পরের দিন ওয়াটারলুর যুদ্ধে কি হবে তা যেন নিয়তি আগে হতেই সব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। নিয়তির সঙ্গে তাঁর যেন অজ্ঞাত চুক্তি হয়ে গেছে। লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে থামিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপেই তিনি বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে বজ্রের ধ্বনি শুনতে লাগলেন। তিনি ছিলেন নিয়তিবাদী। তাঁর মুখ থেকে তখন একটা কথাই বেরিয়ে আসে, 'নিয়তি আর আমি দু'জনেই

একমত।' কিন্তু ভুল করেছিলেন নেপোলিয়ন। নিয়তির মনের সঙ্গে তাঁর মনের আর কোনও মিল ছিল না।

সে রাতে একবারও ঘুমোননি নেপোলিয়ন। সে রাতের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি ছোটখাটো ঘটনার মধ্যে খুঁজে পান কিছু না কিছু তৃপ্তির কারণ। সেনাদলের পিকেট লাইনগুলো নিজে ঘুরে ঘুরে দেখেন। দু'-একজন সৈনিকের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলেন। রাত্রি আড়াইটার সময় হুগোমঁতের বনের কাছে সৈন্যদের মার্চ করে কোথায় যাওয়ার শব্দ শুনে তিনি ভাবলেন ইংরেজ বাহিনী পিছু হটে পালিয়ে যাচ্ছে। নেপোলিয়ন বার্ট্রাণ্ডকে বললেন, 'অস্টেন্ডে যে বৃটিশ বাহিনী এইমাত্র অবতরণ করেছে তাদের মধ্যে ছয় হাজার সৈন্যকে বন্দী করব আমি।' সেই রাত্রিতেই তিনি ওয়েলিংটনের উদ্দেশ্যে ঠাট্টা করে বলেন, 'ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকের শিক্ষা হওয়া উচিত।' নেপোলিয়ন যখন এইসব কথা বলছিলেন তখন বৃষ্টির বেগ আরও বেড়ে উঠল, তখন মুহুর্মুহু বজ্রগর্জন হতে লাগল।

রাত সাড়ে তিনটেব সময় কয়েকজন অফিসার গিয়ে দেখে এসে খবর দিল শত্রুবাহিনীর মধ্যে কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারা নড়ছে-চড়ছে না। শিবিরের সব আগুন নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়েলিংটনের সব বাহিনী ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত চারটের সময় একজন চাষীকে ডেকে আনা হলো। এই চাষী একজন ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্যকে বাঁ প্রান্তের ওহেন নামে গ্রামে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। সে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিল। পাঁচটার সময় দু'জন দলত্যাগী বেলজিয়ান সৈন্যকে ডেকে আনা হলো। তারা বলল ইংরেজ বাহিনী যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। সব শুনে নেপোলিয়ন বললেন, আমি ওদের বেকায়দায় ফেলব, পিছু হটতে দেব না, বা তাড়িয়ে দেব না।

ভোর হতেই নেপোলিয়ন প্ল্যানসেনয়েত থেকে আসা এক রাস্তার মোড়ে ঘোড়া থেকে কাদামাখা ঘাসের উপর নামলেন। তিনি রসোমির খামার থেকে রান্নাঘরের একটা টেবিল আর চেয়ার আনিয়ে তাতে বসলেন। টেবিলের উপর যুদ্ধক্ষেত্রের একটা ম্যাপ খুলে তা দেখতে দেখতে বললেন, এটা যেন এক দাবার ছক।

বৃষ্টির জলে পথঘাট ভিজে যাওয়ায় এবং সব কাদায় ভরে যাওযায় রসদবাহিনী আসতে পারেনি। সৈন্যদের খাবার এসে পৌঁছয়নি। সৈন্যরা ঘুমোতে পারেনি। তারা ঠিকমতো খেতে পায়নি। তারা ক্ষুধার্ত হয়ে ছিল। তবু তাতে দমে যাননি নেপোলিয়ন। তিনি উৎফুল্ল হয়ে জেনারেল লেকে বললেন, আমাদের জয়ের সম্ভাবনা একশো ভাগের মধ্যে নব্বই ভাগ। সকাল আটটার সময় নেপোলিয়নকে প্রাতরাশ খেতে দেওয়া হলো। তিনি বেশ্ কয়েকজন সেনাপতিকে তাঁর সঙ্গে প্রাতরাশ খাবার জন্য আহ্বান করলেন। প্রাতরাশ খাবার সময় তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, দু'রাত আগে ওয়েলিংটন ব্রাসেলস্-এ রিচমন্ডের ডাচেস বা ডিউকপত্নী প্রদত্ত এক ভোজসভায় যোগদান করেন। সে ভোজসভায় বলনাচের আসর হয়। কিন্তু আসল বলনাচ হবে আজ। লে একসময় বলল, 'ওয়েলিংটন বোকার মতো আপনার জন্য অপেক্ষা করবে না।' নেপোলিয়ন তখন তার কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেন।

এইভাবে কথাচ্ছলে হাসি-তামাশা উপভোগ করতেন নেপোলিয়ন। গুরগাঁদ বলতেন, 'নেপোলিয়নের স্বভাবের মধ্যে এক প্রাণবন্ত পরিহাস-রসিকতা ছিল।' বেলজামিন কনস্ট্যান্ট বলতেন, 'তাঁর হাসিঠাট্টার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি অপেক্ষা স্থূল হাস্যরস বেশি থাকত।' তাঁর মতো এক মহান পুরুষের চরিত্রের এ দিকটা সত্যিই উল্লেখযোগ্য এবং দেখার মতো। অনেক সময় তিনি রসিকতার ছলে তাঁর হাতবোমা বাহিনীর সেনাদের কান মলে অথবা মোচ টেনে দিতেন। একবার এলবা থেকে ফরাসী যুদ্ধজাহাজে করে ফেরার পর ইনকনস্ট্যান্ট নামে জাহাজে লুকিয়ে ছিলেন। সবাই নেমে গেলেও তিনি নামেননি। জাহাজ থেকে সৈন্যরা নামার সময় যখন অনেকে সম্রাটের কুশল জিজ্ঞাসা করছিল তখন নেপোলিয়ন নিজেই জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে উত্তর দেন, সম্রাট খুব ভাল আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য খুবই ভাল। যে লোক এমন প্রাণ খুলে হাসতে পারেন তিনি যে যেকোনও অবস্থা বা ঘটনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবেন নিজেকে—এটা স্বাভাবিক কথা। ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে সেদিন প্রাতরাশ খাওয়ার সময় নেপোলিয়ন বেশ কয়েকবার জোর হাসিতে ফেটে পড়েন। খাওয়া শেষ হলে পনের মিনিট চুপ করে থাকেন তিনি। তারপর দু'জন সেনাপতি তাঁর সামনে বসে তাদের হাঁটুর উপর প্যাড রেখে লেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। নেপোলিযন তখন তাদের যুদ্ধের জন্য তাঁর হুকুমনামা বলে যান আর তারা তা লিখে যায়।

বেলা ন'টা বাজতেই ফরাসী বাহিনী যখন দুটি সারিতে পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মাঝখানে অস্ত্রবাহিনী আর সামনে ব্যান্ডপার্টি যুদ্ধের জয়ঢাক বাজাতে থাকে, যখন অসংখ্য শিরস্ত্রাণ আর বেয়নেট সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো উত্তাল হযে ওঠে দিগন্তের পটে তখন নেপোলিয়ন তা দেখে নিজেই বলে ওঠেন আবেগের সঙ্গে, চমৎকার! চমৎকার!

এক অবিশ্বাস্য দ্রুত আর তৎপরতার সঙ্গে ফরাসী বাহিনী ছযটি সারিতে ছয়টি ভি চিহ্নের মতো নিজেদের সুসংবদ্ধ করে তোলে। কামানগুলিকে ঠিক মতো সাজানো হলে নেপোলিয়ন প্রথমে মঁ সেন্ট জাঁ ঘাঁটির দিকে গোলাবর্ষণ করে আক্রমণ শুরু করতে হুকুম দেন। ঘাঁটিটা ছিল নিভেলে আর গেলাপ্পের রাস্তাদুটোর সংযোগস্থলের মুখে।

যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিত আত্মবিশ্বাস ছিল নেপোলিযনের। তিনি সৈন্যদের হুকুম দিয়েছিলেন, মঁ সেন্ট ঘাঁটি দখল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা যেন পরিখার মধ্যে ঢুকে পড়ে। তিনি হাসিমুখে সৈন্যদের উৎসাহ দিতে থাকেন। সম্রাটের বাঁ দিকে আজ যেখানে একটা কবরখানা আছে সেদিন সেখানে একদল স্কট অশ্বারোহীকে দেখে দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি। বলেন, আহা বেচারী!

তারপর নেপোলিয়ন ঘোড়ায় চড়ে রসোমি পাহাড়ের দিকে কিছুটা এগিয়ে যান। গেলাপ্পে থেকে ব্রাসেলস্-এর পথে যে রাস্তাটা চলে গেছে তার পাশে ঘাসে ঢাকা একখণ্ড জায়গা থেকে তিনি প্রায়ই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করতেন। সন্ধে সাতটার সময় তিনি আর একটা জায়গা থেকে যুদ্ধের অবস্থা দেখতে যান। সে জায়গা হলো

লা-বেল অ্যাবারেঞ্জা আর লা হাই সেন্তের মাঝখানে। জায়গাটার চারদিক একেবারে খোলা। নেপোলিয়নের ঘোড়াটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার চারদিকে গুলির ছড়রা আর বোমার টুকরো এসে পড়ছিল। কয়েক বছর পরে সেখানকার মাটির তলায় একটা বোমার খোল পাওয়া যায়। এইখানেই নেপোলিয়ন এক চাষী পথপ্রদর্শক ভয়ে ঘোড়ার আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করলে তাকে বলেন, বোকা কোথাকার। লুকোবার চেষ্টা করছে কেন? তোমার পিঠেও তো গুলি লাগতে পারে। নেপোলিয়ন নিজে নির্ভীকভাবে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। গুলি, গোলা, বোমা—কোনও কিছুরই ভয় ছিল না তাঁর।

সেদিন ওয়াটারলুর বনপ্রান্তরে মালভূমির যেখানে নেপোলিযন আর ওয়েলিংটন দুই পক্ষের দুই নেতারূপে পরস্পরের সামনে আসেন, আজ সেখানে সেদিনকার সেই অবস্থা আর নেই। সেখানে বীর সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতে গিযে তার স্বাভাবিক অবস্থাটাকে বিকৃত করে দেওযা হয়। এইভাবে ইতিহাস অনেক সময় নিজেকেই চিনতে পারে না। দুই বছর পরে ওয়েলিংটন ওয়াটারলুব রণক্ষেত্রটা দেখতে এসে বলেন, ওরা দেখছি জায়গাটা একেবারে বদলে দিয়েছে। এখন সেখানে পিরামিডের মতো একটা জয়স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে এবং যে পিরামিডের মাথায একটা সিংহ বসে আছে আগে সেখানে এক গ্রস্ত উপত্যকা ছিল এবং সেটা লিভেলে যাবার রাস্তাটার দিকে ঢালু হয়ে নেমে গিযেছিল। সেখানে এখন ফরাসীদেব স্মৃতিস্তম্ভ নেই। ফরাসীদের কাছে সমস্ত জায়গাটা এক বিশাল কবরখানা। ১৫০ ফুট উঁচু পিরামিডটা আধ মাইল জাযগাটা জুড়ে গডে উঠেছে। যুদ্ধের সময জাযগাটা খুব খাডা আর উঁচু ছিল।

ব্রেন লালিউদ আর ওহেন্ হলো দুটি বেলজিয়ান গাঁ। দুটি গাঁযের মাঝখানে চার মাইলের ব্যবধান। দুটি গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে একটি রাস্তা দু'ধারে পাহাডের ভিতর দিয়ে চলে গিয়ে দুটি গাঁকে যুক্ত করেছিল। ১৮১৫ সালে রাস্তাটা মঁ সেন্ট জাঁ মালভূমির উপর দিয়ে চলে যায়। তখন রাস্তাটা সরু ছিল, কিন্তু এখন রাস্তাটা অনেক চওড়া হয়ে চারপাশের প্রান্তরের সমান হযে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার জন্য দু'দিকে বাঁধের মতো উঁচু জাযগাগুলোকে কেটে উড়িযে দেওয়া হয়েছে। আগে দু'দিকে বাঁধওয়ালা রাস্তাটা এত সংকীর্ণ ছিল যে ১৬৩৭ সালে মঁসিযে বার্নার্দ দেব্রে নামে একজন ব্যবসায়ী একটা মালবোঝাই গাডি চাপা পড়ে। তার স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত একটা পাথরের ক্রসে এই ঘটনার বিবরণ লেখা আছে। ঘটনাটা ঘটে ব্রেন লালিউদের মুখে। মঁ সেন্ট জাঁর কাছে রাস্তাটা এত নিচু ছিল যে ১৭৮৩ সালে ম্যাথিউ নিকাসে নামে একজন চাষী সে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ধস চাপা পডে মারা যায়। কিন্তু তার স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর ছাড়া আর কোনও চিহ্ন বর্তমানে নেই।

৮

যাই হোক, সেদিন সকালবেলায় ওয়াটারলুর বনপ্রান্তরে নেপোলিয়ন সন্তুষ্ট ছিলেন।

তাঁর এই আত্মপ্রসাদের যথেষ্ট কারণও ছিল। তাঁর যুদ্ধের পরিকল্পনাটা সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল। সেদিনকার কোনও ক্ষয়ক্ষতিই ভীত করতে পারেনি তাঁকে। ইংরেজদের দ্বারা হুগোমঁত দখল, লা হাই সেন্তে প্রবল প্রতিরোধ, বদিনের মৃত্যু, ফরের আহত হওয়া, অনেক বারুদ ভিজে যাওয়া, পনেরটি অশ্বারোহী দলের পতন, কাদা জলে অনেক বিস্ফোরক দ্রব্যের অকেজো হয়ে যাওয়া, চারটি সেনাদল নিয়ে জেনারেল লের একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ফলে প্রায় দুশো ফরাসী সৈনিকের শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণরত কামানের সামনে পড়ে যাওয়া, শক্তিমান লেফটন্যান্ট ভোর একটা কুকুর নিয়ে লা হাই সেন্তের গেট ভাঙার সময় ইংরেজদের গুলিতে আহত হওয়া, হুগোমঁতের বাগানে কম সময়ে পনেরেশো সৈনিকের নিহত হওয়া, লা হাই সেন্তে আরও কম সময়ের মধ্যে আঠারোশো লোকের মৃত্যু—যুদ্ধক্ষেত্রের এই সব রহস্যজনক ঘটনা নেপোলিয়নের চোখের সামনে একে একে ঘটে গেলেও তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। অথবা জয় সম্বন্ধে তাঁব রাজকীয় অটল নিশ্চয়তাবোধকে টলাতে পারেনি। তিনি সমগ্রভাবে যুদ্ধের পরিণামের কথাটা ভাবতেন, চূড়ান্ত জয়-পরাজয়ের আগে কোনও ছোটখাটো লাভ-ক্ষতিকে কখনই বড় করে দেখতেন না। যুদ্ধেব প্রথম দিকের ক্ষতি বা পরাজয় তাঁর হৃদয়কে কম্পিত করতে পারত না। তাঁর ধৈর্য স্থৈর্য ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন নিয়তির সমান শক্তিমান। বেরেসিনা, লিপজিগ আর ফঁতেনেব্লোর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেননি। তা যদি করতেন তাহলে তিনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করতেন। সংশয়হীন এই বিশ্বাসের আতিশয্যই তাঁকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। আপাতশান্ত আকাশের কোন গভীব অন্তরালে নিয়তির কোন বহস্যময় ভ্রূকুটি লুকিয়ে ছিল তা কে জানে?

ওয়েলিংটনের যুদ্ধবিরতি দেখার সঙ্গে সঙ্গে পুলকের রোমাঞ্চ জাগে নেপোলিয়নেব মধ্যে। তিনি মঁ সেন্ট জাঁর মালভূমির দিকে তাকিয়ে দেখলেন ইংরেজ বাহিনীর সেনারা খুব তাড়াতাড়ি করে শিবির ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকাশ্যে মার্চ করে যাচ্ছে না, গোপনে গা-ঢাকা দিয়ে যাচ্ছে। সম্রাটের চোখ দুটি তখনো জয়ের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। তাঁর মনে হলো ওয়েলিংটন সয়নেব বনের মধ্যে ঢুকে পালিয়ে যাবার সময় সদলবলে ধ্বংস হয়ে যাবে। ক্রেসি, পলিতিয়ের, মালপাকেত আর র‍্যামিনিযের মৃত্যুব প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

এই কথা ভেবে তিনি শেষবারের মতো যুদ্ধক্ষেত্রটা একবার দেখে নিলেন। তাঁর দেহরক্ষী তাঁর পিছনের ঢালু জায়গাটা থেকে এক ধর্মীয় ভীতির সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগল। তিনি ঢালু উপত্যকা, গাছপালা, যবের ক্ষেত, ঘাসে ঢাকা পথ সব খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। বিশেষ করে তিনি ইংরেজরা লা হাই সেন্তে আর লিভেলেব পথে গাছের গুঁড়ি ফেলে যে বাধার সৃষ্টি করে তা দেখতে লাগলেন। ব্রেন লালিউদেব শিখর মোড়ে সেন্ট নিকোলাস গীর্জাটা দেখা যাচ্ছিল। সেখানে ওলন্দাজ বেযনটধারী সেনাদলকে দেখা যাচ্ছিল। নেপোলিয়ন তাঁর পথপ্রদর্শক লোকাস্তেকে কি জিজ্ঞাসা করলে সে মাথা নেড়ে কি জানাল হয়ত। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভুল বলল।

তিনি এবার ঘোড়ায় চেপে স্থির হয়ে বসে রইলেন। ওয়েলিংটন চলে গেছে। একজন অশ্বারোহীকে দিয়ে তিনি প্যারিসে খবর পাঠালেন, যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন। তারপর বর্মধারী ফরাসী সেনাবাহিনীকে মঁ সেন্ট জাঁ মালভূমি দখল করতে বললেন।

৯

বর্মধারী ফরাসী অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। তারা ছাব্বিশটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থান করছিল মিলহদের নেতৃত্বে। তাদের পিছনে তাদের সাহায্যকারী হিসাবে ছিল লেফেব ভ্রে দেশনুত্তের এক বাছাইকরা সেনাদল। তাদের মাথায় ছিল পালকহীন শিরস্ত্রাণ আর ধাতুর বক্ষবন্ধনী। এই বাহিনী যখন সকাল ন'টার সময় গেলাপ্পে আর ফ্রিশেমঁতের মাঝখানে গিয়ে অস্ত্রসম্ভারসহ দাঁড়াল তখন তা দেখে মূল সেনাদলের সবাই অবাক হয়ে গেল। তাদের বাঁ দিকে রইল কেলারম্যানের বর্ম বাহিনী আর ডান দিকে রইল মিলহদের অশ্বারোহী বাহিনী।

সম্রাটের দেহরক্ষী বার্ট্রন্ড সব ঠিক করে সাজিয়ে দিল। জেনারেল লে তার তরবারি বার করে তুলে ধরে সমগ্র বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ শুরু করার হুকুম দিল।

সে দৃশ্য সত্যিই ভয়াবহ।

সেই বিরাট অশ্বারোহী বাহিনী দুটি সারিতে বিভক্ত হয়ে বেল অ্যালায়েন্সের ঢালু উপত্যকার উপর দিয়ে ক্রমশ নিচে নেমে যেতে লাগল। এরপর তারা মঁ সেন্ট জাঁর মালভূমির ঢাল বেয়ে উঠে যাবে। তারা এমন সুসংবদ্ধভাবে যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল দুটিমাত্র মানুষ পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে। অথবা দুটি ঝকঝকে ইস্পাতের সাপ এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে।

ওয়েলিংটনের পদাতিক বাহিনী তেরটি দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণের অপেক্ষায় মুহূর্ত গণনা করছিল। তারা বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা কিন্তু আক্রমণকারীদের দেখতে পাচ্ছিল না আর আক্রমণকারীরাও তাদের দেখতে পাচ্ছিল না। চারদিকে এক মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ করে অসংখ্য অস্ত্রধারী লোক হাত তুলে চিৎকার করে উঠল ফরাসী ভাষায়। 'সম্রাট দীর্ঘজীবি হোন।' মনে হলো যেন এক বিরাট ভূমিকম্পের মতো এক ভয়ঙ্কর শব্দে এগিয়ে আসছে।

এমন সময় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল।

ফরাসী বাহিনীর ডান দিকে এবং ইংরেজ বাহিনীর বাঁ দিকে চলমান অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে এক অবর্ণনীয় গোলমাল দেখা দিল। এই বাহিনী ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করতে যাবার পথে হঠাৎ একটা খাল দেখতে পায়। খালটা পনের ফুট গভীর এবং এতটা চওড়া যে ঘোড়াগুলো লাফ দিয়ে পার হতে পারবে না। আসলে খালটা হলো ওহেন যাবার পথ।

আগের দিকে যে সব অশ্বারোহী সৈন্য ছিল তারা এমন সময়ে খালটা দেখতে পায় যে তখন রাশ টেনে ঘোড়াগুলোকে সংযত করা বা থামানোর উপায় ছিল না।

তার উপর অগ্রসরমান পিছনকার সৈন্যদের প্রবল চাপ। ফলে অসংখ্য সৈন্য ঘোড়া সমতে সেই চাপে পরস্পরের ঘাড়ের উপর পড়ে গেল। খালে এইভাবে পড়ে যাওয়া সৈন্যদের তালগোল পাকানো মৃতদেহগুলোর দ্বারা ভরে গেলে তার উপর দিয়ে বাকি সৈন্যরা চলে গেল।

এই দুর্ঘটনায় মোট দু'হাজার ঘোড়া আর পনেরশো অশ্বারোহী সৈন্য মারা যায়।

এই অভিযানের হুকুম দেওয়ার আগে নেপোলিয়ন নিজে সতর্কতার সঙ্গে এ অঞ্চলের ভূমিপ্রকৃতি খুঁটিয়ে দেখেন এবং এ বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। কিন্তু মালভূমিটাই শুধু তাঁর চোখে পড়েছিল। তার মাঝখানে এই খালটা নজরে পড়েনি। লিভেলে রোডের মোড়ে একটা গীর্জা দেখে নেপোলিয়ন লোকাস্তেকে জিজ্ঞাসা করেন পথে কোনও বাধা আছে কি না। কিন্তু লোকাস্তে ঘাড় নেড়ে মিথ্যা করে জানায় কোনও বাধা নেই। একটি চাষীর ঘাড় নাড়াই নেপোলিয়নের পতনের কারণ।

পরাজয়ের এই হলো শুরু।

যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয় এ যুদ্ধে নেপোলিয়নের পক্ষে জয়লাভ করা কি সম্ভব ছিল? তাহলে আমাদের উত্তর হবে, না। কিন্তু আবার যদি প্রশ্ন করা হয় কেন? ওয়েলিংটনের জন্য অথবা ব্লুচারের জন্য? আমরা তাহলে উত্তরে বলব, না। বলব, ঈশ্বরের জন্য।

ওয়াটারলু যুদ্ধে যদি নেপোলিয়ন জয়ী হতেন তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ ঘটনাস্রোতকে বিপরীত মুখে চালনা করতে হত। আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল যাতে তাঁর কোনও হাত ছিল না এবং সেই সব ঘটনার প্রতিকূলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে।

নেপোলিয়নের মতো এক মহান পুরুষের পতনের সময় উপস্থিত হয়েছিল।

তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব মানবজাতিকে ছাড়িয়ে ক্রমশই উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছিল। সারা বিশ্বে মানবিক ঘটনাগুলির উপর তাঁর অপরিহার্য প্রভাবের অতিরিক্ত গুরুভার মানব জগতের মধ্যে সব ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছিল। একটি মানুষের মধ্যে এমন অমিত প্রাণশক্তির পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীকরণ, একটি মানুষের মনের মধ্যে এমন এক বিশাল জগতের অবধারণ সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। সুতরাং পরম বিচারক ঈশ্বরের এখন সব কিছু বিচার করে দেখতে হবে। মানবজাতির পক্ষে কোনটা শুভ বা কোনটা অশুভ হবে তা ঈশ্বরকেই ঠিক করতে হবে এবং তার সময় এসে গেছে। যে সব নীতির উপর মানবজগতের পার্থিব-অপার্থিব সব ঘটনা নির্ভর করে সেই নীতিভঙ্গের অভিযোগেই অভিযুক্ত হলো নেপোলিয়ন। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, রক্তস্রোত, অসংখ্য মায়ের অশ্রুধারা সে অভিযোগের সপক্ষে প্রবল সবচেয়ে বড় যুক্তি। সমগ্র পৃথিবী যখন পীড়ন আর অত্যাচারজনিত যন্ত্রণায় ভরে যায় তখন ঊর্ধ্বে আকাশের ছায়াতলে এক অশ্রুত বিলাপের ধ্বনি তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে।

স্বর্গলোকে দেবতাদের বিচার সভাতেই অভিযুক্ত হন নেপোলিয়ন। সেখানেই তিনি দণ্ডিত হন। কারণ দেবতাদের কাছে ক্রমশই বিরক্তিকর হয়ে উঠছিলেন তিনি।

ওয়াটারলু শুধু এক সাধারণ যুদ্ধ নয়, জগতের গুরুত্বপূর্ণ এক গতি পরিবর্তন।

১০

খালটাতে দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজপক্ষ আক্রমণ করল ফরাসী বাহিনীকে। তেরটি দল একযোগে গুলিবর্ষণ করতে লাগল। দুর্ঘটনায় জেনারেল ওরাদিয়েরের সেনাদলই ধ্বংস হয়। জেলর্দের দলের কোনও ক্ষতি হয়নি। ইংরেজদের গোলাবর্ষণের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে লাগল জেলর্দ। এই আকস্মিক বিপর্যয় কিছুমাত্র দমিয়ে দিতে পারেনি তাদের। তাদের সৈন্যসংখ্যা যে পরিমাণে কমে যায় সেই পরিমাণে বেড়ে যায় তাদের অন্তরের সাহস আর উদ্যম।

লে বিপদের আভাস পেয়ে জেলর্দের বাহিনীকে বাঁ দিকে কিছুটা ঘুরিয়ে দেন। তাই সে বাহিনীর কোনও ক্ষতি হয়নি। ফরাসীদের বর্ম বাহিনীও জোর আক্রমণ শুরু করল।

যুদ্ধকালে এমন এক একটা সময় আসে যখন যুদ্ধরত সৈন্যদের দেহের মাংসগুলো পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। মরীয়া হয়ে ওঠা ফরাসী বাহিনীর নারকীয় আক্রমণের সামনে ইংরেজরা অবিচলিত এবং অতিকম্পিতভাবে যুদ্ধ করে যেতে লাগল। তাদের সৈন্যরা নতজানু হয়ে বেয়নেট ধরে ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনীর ঢেউকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে যেতে লাগল। তাদের পিছনের সৈন্যরা বন্দুক থেকে গুলি বর্ষণ করে যেতে লাগল। দ্বিতীয় সারির পিছনে থাকা অস্ত্র বাহিনীর লোকেরা বন্দুকে গুলি ভরে যেতে লাগল। বর্মধারী ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনী সমগ্রভাবে ইংরেজ বাহিনীকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। তাদের ঘোড়াগুলো বেয়নেটধারী ইংরেজ সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সারবদ্ধ মানুষের পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে গিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে চাইল।

উভয় পক্ষের সুসংবদ্ধ সেনাদলের মধ্যে ফাঁক ছিল। অনেক ইংরেজ সৈন্য মারা যাওয়ায় তাদের প্রতিরোধব্যূহ ফাঁকা হয়ে গেল। তবু তারা সমানে গুলি করে যেতে লাগল। ক্রমে যুদ্ধ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল। গোলা ও গুলিবর্ষণরত ইংরেজ বাহিনী যেন অগ্নুদ্গাররত এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখের আকার ধারণ করল আর ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনী এক মত্ত প্রভঞ্জনের রূপ পরিগ্রহ করল। ধোঁয়ার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল চারদিক।

ইংরেজ বাহিনীর বাঁ দিকের সেনাদল ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং প্রথম আক্রমণের আঘাতেই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তারা। এই সেনাদল ছিল ৭৫তম স্কট বাহিনী। একজন যাজক হত্যার সব তাণ্ডবকে উপেক্ষা করে একটি ড্রামের উপর বসে বাঁশিতে সামরিক গান বাজিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক তরবারির আঘাতে তার গান থেমে যায়।

দুর্ঘটনার জন্য বর্মধারী অশ্বারোহীদের সংখ্যা অনেক কমে যায়। তার উপর তাদের ওয়েলিংটনের সমগ্র বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করতে হচ্ছিল। কিন্তু তাদের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। এক একজন সৈনিক দশজন সৈনিকের বল ধরে। ইংরেজ বাহিনীর

অন্তর্গত হ্যানোভারের সেনাদল কিছুটা দুর্বলতার পরিচয় দিলে ওয়েলিংটন তাঁর নিজস্ব অশ্বারোহী বাহিনীকে খবর দিয়ে আনান। নেপোলিয়নও যদি এই সময় তাঁর পদাতিক বাহিনীকে সেখানে আনাতেন তাহলে এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারতেন তিনি। দূরদৃষ্টির এই অভাব এক মারাত্মক ভুল হয়ে দাঁড়ায় তাঁর পক্ষে।

এমন সময় ফরাসী বর্মধারী অশ্বারোহী বাহিনী দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়। একদিকে এক পদাতিক বাহিনী আর একদিকে সমারসেটের নেতৃত্বে চৌদ্দশো অশ্বারোহী সৈনিকের এক বাহিনী। সমারসেটের ডান দিকে ছিল ভনবার্গের অধীনে এক অশ্বারোহী দল আর বাঁ দিকে ছিল ট্রিপের অধীনে এক বেলজিয়ান অশ্বারোহী দল। এই বেলজিয়ান দলই ছিল সংখ্যায় বেশি। এবার তাই ফরাসী বর্মধাবী বাহিনী চারদিক থেকে আক্রান্ত হলো। কিন্তু তারা ঘূর্ণি বায়ুর মতো ঘুরে ঘুরে যুদ্ধ করে যেতে লাগল। তাদের সাহস ও বীরত্বের সীমা-পরিসীমা ছিল না।

মনে হলো এ যেন কোনও মানুষের যুদ্ধ নয। সারা যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে শুধু প্রচণ্ড ক্রোধ আর সাহসের ঝড বয়ে যাচ্ছে, অসংখ্য উৎক্ষিপ্ত উজ্জ্বল তরবারির বিদ্যুৎ ঝলকের ঢেউ [illegible]। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমারসেটের চৌদ্দশো অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে দুশো সৈন্য মারা গেল, লেফটন্যান্ট কর্নেল ফুলার নিহত হলো। জেনারেল লেফেবভ্রের বর্ম বাহিনী আনাল। মঁ সেন্ট জাঁ একবার দখল করার পর আবার একবার হাতছাড়া হয়ে গেল। এইভাবে বারবার দখল-বেদখলের খেলা চলতে লাগল। ইংরেজরা বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত হয়েও যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। একটার পর একটা করে লের চারটে ঘোড়া মারা গেল। ফরাসী বর্মধারী অশ্বারোহী বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য নিহত হলো। যুদ্ধ চলল পুরো ছয় ঘণ্টা ধরে।

ইংবেজ বাহিনী বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা প্রবল ঘা [illegible]ল। তাদের এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না যে খালের দুর্ঘটনায ফরাসী অশ্বা[illegible] বাহিনীর এত সৈন্য যদি মারা না যেত এবং তাদের এত ক্ষতি না হত তাহলে আজকের এই যুদ্ধে তারা অবশ্যই জয়লাভ করত। ক্লিন্টন ফরাসী অশ্বারোহীদের বীরত্ব দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। ওয়েলিংটন নিজে অর্ধপরাজিত অবস্থায ফরাসীদের লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, চমৎকার!

ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনী ইংরেজ বাহিনীর সাতটি দলকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। তাদের ষাটটি কামান দখল করে নিল। তাদের দুটি পতাকাও হস্তগত কবল। সম্রাটকে সেই পতাকাগুলো দেওয়া হয়। তিনি তখন ছিলেন বেল অ্যানায়েন্সের খামারে।

ওয়েলিংটনের অবস্থা সত্যিই অনেকটা খারাপ হযে [illegible]য। মালভূমিতে তখনো যুদ্ধ চলতে থাকে।

ওয়েলিংটন বুঝতে পারেন, তাঁর বিপদ ঘনিযে এসেছে। অবশ্য ফরাসী বাহিনী তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারেনি। তারা ইংরেজ বাহিনীর মধ্যভাগে পৌঁছতে পারেনি বা সেখানে ঢুকে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পারেনি। উভয় পক্ষই মালভূমিতে আছে। তবে ইংরেজ পক্ষের দখলে আছে মালভূমির বেশির ভাগ জায়গা। গোটা গাঁ আর

তার চারপাশের অঞ্চলটা এখনো তাদের অধিকারে আছে। অন্য দিকে জেনারেল লে শুধু উপত্যকাদেশ আর তার ঢালু অংশটা অধিকার করে আছেন।

তবে ইংরেজদের ক্ষতিই বেশি। সে ক্ষতি প্রতিকারের অতীত। বাঁ দিক থেকে কেম্পট্ সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল। আরও সৈন্য পাঠাতে বলছিল। কিন্তু ওয়েলিংটন তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আর সৈন্য পাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত তাদের লড়াই করে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

আর ঠিক সেই সময়ে জেনারেল লেও নেপোলিয়নের কাছে আরও একটা পদাতিক বাহিনী পাঠাবার জন্য আবেদন জানাচ্ছিলেন। দুটি ঘটনার মধ্যে কী আশ্চর্য মিল। এর দ্বারা বোঝা যায় দু'পক্ষেরই সৈন্যসংখ্যা কত হ্রাস পায়। লের আবেদনের উত্তরে নেপোলিয়ন বলে ওঠেন, আর সৈন্য আমি কোথায় পাব? আমি কি সৈন্য নিজের হাতে গড়ব?

ওয়েলিংটনের অবস্থা আরও খারাপ। ফরাসী বর্মধারী অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণে তাঁর পদাতিক বাহিনী এমনভাবে ছত্রভঙ্গ ও বিধ্বস্ত হয় যে বিশাল বাহিনীর মধ্যে অল্পসংখ্যক সৈন্যের কয়েকটি দল মাত্র অবশিষ্ট থাকে। বড় বড় সেনাপতিরা যুদ্ধে নিহত হওয়ায় ক্যাপ্টেন আর লেফট্‌ন্যান্টের মতো কয়েকজন নিম্নতন অফিসার সেসব দলের নেতৃত্ব করতে থাকেন। তার উপর কাম্বারল্যান্ডের নেতৃত্বে হ্যানোভারের সেনাদল সয়নের বনের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যায়। এর জন্য কর্নেল হ্যাককে সামরিক বিচারে কোর্ট মার্শাল করা হয়। হ্যানোভারের পলাতক সেনাদল ব্রাসেলস-এ গিয়ে প্রচার করে যুদ্ধে ইংরেজদের অবস্থা খুব খারাপ। ওলন্দাজরাও ভীত হয়ে ওঠে। ফরাসী বাহিনীকে ক্রমশই এগিয়ে আসতে দেখে ইংরেজদের মিত্রপক্ষের অনেক সেনাদল গাড়িতে করে আহত ও মৃতদের চাপিয়ে অস্ত্রবাহিনীসহ পালিয়ে যায়। বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হতে জানা যায় পলাতক বাহিনীগুলি সারবন্দীভাবে ব্রাসেলস-এর দিকে চলে যায়। চারদিকে ব্যাপক সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল। এই সন্ত্রাসের কথাটা মালিনেতে প্রিন্স দ্য কঁদের কানে গেল এবং কেন্টে রাজা অষ্টাদশ লুইও শুনলেন। মঁ সেন্ট জ্যাঁতে যুদ্ধের জন্য নির্মিত হাসপাতালের পিছনে কিছু বাড়তি সংরক্ষিত সৈন্য এবং ভিভিয়ান ও ভাঁদেলিউ-এর সেনাদল ছাড়া ওয়েলিংটনের হাতে কোনও অশ্বারোহীদল ছিল না। তার উপর তাঁর অনেক কামান অকেজো হয়ে পড়ে। এই বিবরণ দান করে সাইবোর্ল আর প্রিঙ্গল। এই বিবরণের মধ্যে কিছুটা অবশ্য অত্যুক্তি থাকতে পারে। তারা বলে ইংরেজ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা তখন কমে বত্রিশ হাজারে দাঁড়ায়। ডিউক অফ ওয়েলিংটন তবু শান্তভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তবে তাঁর ঠোঁট দুটো সাদা আর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ইংরেজদের সদর দপ্তরে অষ্ট্রিয়া ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতরা সবকিছু শুনে মনে মনে ভাবতে থাকে সেদিনকার যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী হেরে গেছে। বিকাল পাঁচটার সময় ওয়েলিংটন তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তাঁর মুখ থেকে শুধু একটা কথা বেরিয়ে এল—ব্লুশার অথবা অন্ধকার।

ঠিক এমন সময়ে দূরে ফ্রেশোমঁতের কাছে সারবন্দী বহু বেয়নেট একসঙ্গে বেলা শেষের আলোয় ঝলসে উঠল।

১১

নেপোলিয়নের মর্মান্তিক ভ্রান্তির সব কথা সকলেই জানে। তিনি গ্রোশির খোঁজ করছিলেন। কিন্তু তার জায়গায় এল ব্লুশার। জীবনের পরিবর্তে এল মৃত্যু। এইভাবে তাঁর নিয়তি এক ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। বিশ্বজয়ের এক উদ্ধত স্বপ্নে বিভোর তাঁর চোখ দুটি সারা পৃথিবীর সিংহাসনের দিকে নিবদ্ধ থাকলেও সে চোখের দৃষ্টি সেন্ট হেলেনার করাল ছায়াকেই ডেকে আনে।

ব্লুশারের সহকারী যে চাষী বালকটি বুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সে যদি তাকে প্ল্যানশেনয়েতের নিচের দিক দিয়ে নিয়ে না গিয়ে ফ্রিশের্মতের উপর দিক দিয়ে নিয়ে যেত তাহলে ঊনবিংশ শতাব্দীর গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করত। নেপোলিয়ন তাহলে ওয়াটারলু যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। প্ল্যানশেনয়েতের নিচের দিকে না গিয়ে অন্য যে কোনও পথ ধরলে প্রুশীয় বাহিনী সেই দুর্গম খালটাতে এসে পড়ত এবং তাহলে তাদের অস্ত্রবাহী গাড়িগুলি সে খাল পার হতে পারত না এবং তাহলে বুলোও ঠিক সময়ে আসতে পারত না। প্রুশীয় সেনাপতি মাফিং বলেন, আর একঘণ্টা দেরি হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যেত।

অবশ্য দেরি এমনিতেই কিছুটা হয়ে যায়। বুলো দিঁও লে মঁতে রাত্রি যাপন করে সকালে রওনা হয় এবং রাস্তা খারাপ থাকাব জন্য পথে দেরি হয়ে যায় তার। তাছাড়া ওয়েভারে সরু পুলটা দিয়ে ডাইল নদী পার হতে হয়েছিল তাকে। সেই পুলে যাবার গ্রাম্য পথের দু'ধারের বাড়িগুলোতে ফরাসী সেনারা আগুন লাগিয়ে দেয়। অস্ত্রশস্ত্রবাহী গাডিগুলো দু'ধারের জ্বলন্ত বাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে এগোতে পারছিল না। তাই আগুন নেভা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হয়। বুলোর অগ্রবর্তী বাহিনী দুপুরের আগে সেন্ট ল্যাম্বার্ত চ্যাপেলে পৌঁছতে পারেনি।

যুদ্ধটা যদি দু'ঘণ্টা আগে শুরু হত তাহলে বেলা চারটের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যেত। তাহলে ব্লুশার অসময়ে এসে নেপোলিয়নের হাতে ধরা পড়ত। একেই বলে নিষ্ঠুর নিয়তির অকল্পনীয় বিধান।

সম্রাটই প্রথম চোখের উপর ফীল্ডগ্লাসটা নিয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কি একটা দেখে সেদিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি বললেন, মেঘের মতো কি একটা জিনিস মনে হচ্ছে। আমার তো মনে হচ্ছে সৈন্যবাহিনী। তিনি ডিউক অফ ভালমাতিয়াকে বললেন, সুলত্, চ্যাপেল সেন্ট ল্যাম্বার্তের চারদিকে কিছু দেখতে পাচ্ছ?

মার্শাল ভালমাতিয়া তার নিজের ফীল্ডগ্লাস দিয়ে দেখে বলল, চার থেকে পাঁচ হাজার লোক মহারাজ, নিশ্চয় গ্রোশির সেনাদল। আপাতস্থির সেই মেঘটার দিকে তখন সব সেনাপতিরা তাকিয়ে দেখতে লাগল। কয়েকজন অফিসার ভাবল সেটা সারিবদ্ধ মানুষের এক বিরাট দল। কিন্তু আবার অনেকে ভাবল অসংখ্য গাছের এক জটলা। সম্রাট তৎক্ষণাৎ সোমনের অধীনস্থ এক হালকা অশ্বারোহী দলকে ব্যাপারটা কি তা দেখার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা এই যে তার অগ্রবর্তী বাহিনী দুর্বল থাকায় বুলো এগোয়নি। সে এই

হুকুম দিয়েছিল যে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আগেই প্রধান দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। ব্লুশার হয়ত আরও দেরি করে আসত। কিন্তু পাঁচটা বাজতেই ওয়েলিংটনের শোচনীয় অবস্থা দেখে নিজেই বুলোকে আক্রমণ করার হুকুম দিল। বলল, ইংরেজদের অন্তত কিছুটা বিশ্রাম দিতে হবে।

এর কিছু পরেই লসথিন, হিলার, হ্যাক ও রিসেল লোবাউ-এর বাহিনীর আগে সৈন্য সমাবেশ করতে লাগল। এই সব সৈন্য বয় দ্য প্যারিস থেকে আনা। প্ল্যানশেনয়েতে তখনো আগুন জ্বলছিল। তবু তাদের অস্ত্রবাহিনী তাদের কামান থেকে যে গোলা বর্ষণ করছিল তা নেপোলিয়নের পিছনের রক্ষী বাহিনীর কাছ পর্যন্ত যাচ্ছিল।

১২

এর পরের ঘটনা আমাদের সব জানা। এক তৃতীয় দলের আকস্মিক আবির্ভাব যুদ্ধের গতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ছত্রিশটা কামান একযোগে বজ্রের মতো গর্জন করে উঠল। ব্লুশার নিজে তার অশ্বারোহীদল নিয়ে এগিয়ে এল। ইংরেজ ও প্রুশীয় বাহিনীর মিলিত আক্রমণের চাপে ফরাসী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সামনে এবং দু'পাশে, বিপদের মুখে ফরাসী বাহিনী প্রাণপণ লড়াই করে যেতে লাগল। তাদের মৃত্যু অনিবার্য জেনে 'সম্রাট দীর্ঘজীবি হোন' বলে ধ্বনি দিতে লাগল তারা।

সারাদিন আকাশে মেঘ ছিল। কিন্তু সন্ধে আটটার সময় সব মেঘ কেটে গেল। আকাশে লাল আলো দেখা গেল। সে আলোয় এলম্ গাছে ঘেরা লিভেলে যাবার পথটা দেখা যাচ্ছিল। যে সূর্য অস্টারলিৎস যুদ্ধে উদিত হয় সে সূর্য একটু আগেই অস্ত গেছে।

এই শেষ যুদ্ধে এক-এ্কজন সেনাপতি এক-একদল সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। ফ্রিয়াত, মাইকেল, রোগেত, হার্লেত, পোর্লেত দ্য মর্ভাঁ প্রভৃতি সব সেনাপতিরাই সেখানে ছিল। ঈগলের ব্যাজ দ্বারা সজ্জিত লম্বা লম্বা শিরস্ত্রাণ পরিহিত বোমারু বাহিনী যখন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল তখন ফ্রান্সের সামরিক ঐশ্বর্য দেখে বিজেতা বাহিনীর লোকেরাও ইতস্তত করতে লাগল। ওয়েলিংটন তখন চিৎকার করে উঠলেন, সামনের রক্ষীবাহিনীর দিকে সোজা গুলি চালাও। তখন ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে-থাকা লাল কোটপরা ইংরেজ সৈন্যরা বেরিয়ে এসে ফরাসী বাহিনীকে আক্রমণ করল একযোগে। দু'পক্ষই উন্মত্ত হয়ে উঠল যুদ্ধে। শুরু হলো হত্যার ব্যাপক তাণ্ডব।

সম্রাটের রক্ষী বাহিনী দারুণ বিপর্যয়ের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়েও নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও এগোতে লাগল। প্রতি পদক্ষেপেই তাদের মৃত্যু ঘটতে লাগল। তবু কোনও সৈনিক একবারও কোনও কুণ্ঠাবোধ করল না। প্রতিটি সৈনিকই তাদের আপন আপন দলের সেনাপতিদের মতোই সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করতে লাগল। আত্মহত্যার সেই ভয়ঙ্কর পথ হতে কেউ বিচ্যুত হলো না।

সমস্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন জেনারেল লে। তাঁর পর পর পাঁচটি ঘোড়া নিহত হলো। তাঁর হাতের তরবারির আধখানা ভেঙে

যায়। একটি বুলেটের আঘাত তাঁর ঈগল ব্যাজ বিদ্ধ করে তাঁর কাঁধে লাগে। প্রচুর রক্ত ঝরতে থাকে। তাঁর সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছিল। তাঁর মুখে ফেনা ভাঙছিল। তিনি তবু তাঁর আধভাঙা তরবারিটা উত্তোলিত করে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, এইভাবে ফ্রান্সের এক মার্শাল মৃত্যুবরণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে।

কিন্তু তাঁর তখন মৃত্যু হয়নি। তিনি উন্মাদের মতো দ্রুয়েত দার্নলকে ডেকে বললেন, কেন তুমি এখনো মরনি?

তারপর তিনি নিজের সম্বন্ধে বললেন, একটা বুলেটও কি আমার মৃত্যু ঘটাতে পারে না? আমি শত্রুপক্ষের বুলেট আমার পেটের মধ্যে ধারণ করতে চাই।

কিন্তু তিনি যাই বলুন, তাঁর মৃত্যু ফরাসীদের হাতে সংরক্ষিত ছিল। পরে ১৮১৫ সালের ৭ই অক্টোবর ফরাসী চেম্বার বা আইনসভা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

১৩

ফরাসী রক্ষী বাহিনীর সামনের দিকে বিরাট গোলমাল দেখা দেয়।

হুগোমঁত, লা হাই সেন্ত, পানোলোত্তে, প্ল্যানশেনয়েত—সব জায়গাতেই ফরাসী সেনাবাহিনীর [illegible] ঘটছিল। ছত্রভঙ্গ ছিন্নভিন্ন সেনাবাহিনী বিগলিত হিমবাহের মতোই পতনশীল। তাদের কোনও কাণ্ডজ্ঞান বা যুক্তিবোধ থাকে না। তাদের মনের সব আবেগ-অনুভূতি ভারসাম্য হারিয়ে বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

জেনারেল আর একটা ঘোড়া যোগাড় করে টুপিহীন মাথায় ও নিরস্ত্র অবস্থায় ব্রাসেলস রোডের মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পলায়মান ফরাসী সৈনিকদের তিনি আটকাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তারা থামল না, শুধু 'মার্শাল লে দীর্ঘজীবি হোন' এই ধ্বনি দিতে দিতে পালিয়ে গেল। তিনি তাদের কাছে অনেক কাতর আবেদন জানালেন, অনেক অপমান করলেন। কিন্তু তারা শুনল না তাঁর কথা। দ্রুয়েত্তের অধীনস্থ দুটি সেনাদল একদিকে উলহা[illegible] তরবারি আর অন্যদিকে ওয়েলিংটনের বন্দুকের গুলির মাঝখানে পড়ে এদিক-ওদিক ঘুরছিল। ধ্বংসের মুখে সেনাবাহিনী একবার ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে তাদের আর বুদ্ধিবিবেচনা থাকে না। তারা তখন পালিয়ে যাবার পথ করে নেবার জন্য একে অন্যকে আঘাত করে। নেপোলিয়ন নিজে ঘোড়ায় চেপে পলায়মান সৈনিকদের আটকে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন, অনেক ভয় দেখালেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো তাঁর।

বাঁদিকে লোবাউ আর ডান দিকে রিলে আক্রমণের ঢেউয়ে ভেসে গেল। গোলন্দাজ বাহিনী অস্ত্রবাহী গাড়িগুলো থেকে ঘোড়াগুলোকে খুলে তাড়িয়ে দিল। ওল্টানো কামান আর মালবাহী ওয়াগনগুলো রাস্তা আটকে থাকায় পালাতে না পেরে আরও অনেক লোক মারা গেল। যে সব ফরাসী সৈন্য তাদের অফিসারদের আদেশ অমান্য করে অস্ত্র ফেলে গাঁয়ের রাস্তা ও অলিগলি, মাঠ ও পাহাড় দিয়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল, জিতেনের প্রুশীয় অশ্বারোহী আসার সঙ্গে সঙ্গে হত্যার তাণ্ডব চালাতে লাগল তাদের উপর। চল্লিশ হাজার ফরাসী সৈন্য যারা একদিন সিংহের বিক্রমে যুদ্ধ করে, তারা আজ জিতেনের হাতে বধ্য ভেড়ায় পরিণত হলো।

গেনাপ্লেতে লোবাউ তিনশো সৈন্যকে কোনওরকমে জড়ো করে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখল। গাঁয়ে ঢোকার রাস্তাটা বন্ধ করে দিল লোবাউ। প্রুশীয় সেনাবাহিনী গুলি চালিয়ে আবার যুদ্ধ শুরু করল নতুনভাবে। গাঁয়ে ঢোকার মুখে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির ইটের খাঁজে খাঁজে সে আক্রমণের চিহ্ন আজও দেখা যায়। ব্লুশার তার সেনাবাহিনীকে হুকুম দিল গাঁয়ে ঢোকার মুখে অবরুদ্ধ ফরাসী সৈন্যদের একজনকেও যেন ছেড়ে না দেয়। রোগেত ঘোষণা করল ফরাসীদের যে কেউ প্রুশীয় সৈন্যকে বন্দী করবে তাকে গুলি করে মারা হবে। ফরাসী সেনাপতি দুশমে গেলাপ্লে গাঁয়ের এক হোটেলের সামনে ধরা পড়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তার তরবারিটা একজন প্রুশীয় সামরিক অফিসারকে দিল। অফিসার সে তরবারি গ্রহণ করেই তাকে হত্যা করল। শুধু গেলাপ্লে নয়, কোয়াত্রে ব্রাস, গসেলি, ফ্রাসনে, শার্লেরা প্রভৃতি গাঁয়ের মধ্যেও আশ্রয়গ্রহণরত ফরাসীদের ধরে ধরে হত্যা করা হলো।

কিন্তু যে বীর সেনাবাহিনীর বিরল বীরত্ব একদিন সারা জগৎকে স্তম্ভিত করে, তাদের এই সর্বাত্মক ধ্বংসের কি কোনও কারণ ছিল না ? হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল। অপ্রাকৃত অতিলৌকিক ন্যায়বিচারের এক বিরাট ছায়া ব্যাপ্ত করে ছিল ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রকে। এটি হলো মানবজাতির থেকে বেশি শক্তিধর এক পুরুষের চরম ভাগ্যবিপর্যয়ের দিন। সেই কারণেই এতগুলি ভীত সন্ত্রস্ত মানুষকে মাথা নত করতে হয়, এতগুলি বীর সৈনিককে আত্মসমর্পণ করতে হয়। সেদিন মানবজাতির গতি এক নতুন দিকে মোড ফেরে। ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে এক নতুন শতাব্দী। যাতে এক বিরাট শতাব্দী জন্ম নিতে পারে তার জন্য এক বিরাট প্রতিভাধর পুরুষকে নিঃশব্দে বিদায় নিতে হয় বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে। যিনি সকল কারণের কারণ, যাঁর ন্যায়বিচার অবিসম্বাদিত, সেই ঈশ্বরই নিজের হাতে তুলে নেন ওয়াটারলুর যুদ্ধের ভার। তিনি শুধু তাঁর অমোঘ অপ্রাকৃত ন্যায়বিচারের ছায়াপাত করেননি ওয়াটারলুর উপর, সর্বধ্বংসী এক বজ্রপাতের দ্বারা বিজিতদের দান করেন এক শোচনীয় মর্মান্তিক পরিণতি।

রাত্রির অন্ধকারে গেলাপ্লেতে বার্ট্রান্ড আর বার্নার্দ নামে দু'জন ফরাসী অফিসার কোটরাগত ম্লান চক্ষুবিশিষ্ট একজনকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। সে লোকটি যেন পরাজয়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এইখানে এসে ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে একা ওয়াটারলুর পথে হেঁটে যায়। এই লোকটিই হলো নেপোলিয়ন। তিনি যেন শূন্য রণপ্রান্তরের উপর দিয়ে তখনো এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। স্বপ্নভঙ্গ আশাহত এক মানুষ যেন তাঁর নিবিড় নিদ্রার মধ্যেই লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন এক অজানার পথে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কোথায় এগিয়ে চলেছিলেন তা তিনি নিজেই জানেন না।

১৪

ক্রমাগত তরঙ্গাঘাতে অবিচল এক পাহাড়ের মতো ফরাসী বাহিনীর কয়েকটি দল রাত্রি পর্যন্ত তখনো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রাত্রির আগমন মানেই সাক্ষাৎ মৃত্যুর

আগমন। তবু তারা অবিকম্পিত চিত্তে রাত্রি আর মৃত্যুর দ্বৈত অন্ধকারের করাল গ্রাসের দ্বারা অভিগ্রস্ত হবার জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করছিল। প্রতিটি ছোট ছোট সেনাদল মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে একে একে। কোনও দল রসোমির পাহাড় অঞ্চলে আবার কোনও দল মঁ সেন্ট জাঁর মালভূমিতে শেষ মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করার জন্য অপেক্ষা করছিল। পরাভূত ও পরিত্যক্ত হলেও তাদের দৃঢ়তা তখনো অটুট ছিল। এইভাবে উলস্, ওয়াগ্রাম, জেনা আর ফ্রেদন্যাত্তের মৃত্যু হয়।

রাত্রি ন'টার সময় মঁ সেন্ট জাঁর মালভূমির নিচের দিকের ঢালুতে একটিমাত্র ফরাসী সেনাদল বিজেতা সৈন্যদের গুলিবর্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লডাই করে যাচ্ছিল। কামব্রোনে নামে এক অখ্যাত অফিসার ছিল এ দলের নেতা। সেই দুর্মর সেনাদলের প্রতিটি সৈনিক একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পডছিল। তবু তারা বিজেতা সৈন্যদের রাইফেল থেকে বর্ষিত গুলির প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল গুলিবর্ষণ করে। পলায়মান ফরাসী সেনারা পথে যেতে যেতে স্তিমিতপ্রায় বজ্রধ্বনির মতো শেষ যুদ্ধের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

শেষে যখন দেখা যায় মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ফরাসী সৈন্য অবশিষ্ট আছে, যখন দেখা গেল জীবিতদের চেয়ে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি এবং অসংখ্য মৃতদেহের স্তূপ উঁচু হযে উঠেছে তখন ইংরেজ বাহিনী আপনা থেকে বন্ধ করল গুলিবর্ষণ। বিজিতদের জীবিত সৈন্যরা দেখল গুলিবর্ষণ থেমে গেল। তবু তাদের মনে হলো শত্রুপক্ষের কতকগুলো ছায়ামূর্তি নীরবে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। তারা যেন যুদ্ধক্ষেত্রের ভূত। চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ থাকা সত্ত্বেও তাদের মনে হচ্ছিল কারা যেন গুলিবর্ষণ করছে, মনে হচ্ছিল বিশাল আকারের অসংখ্য কামান দিগন্তকে স্পর্শ করছে। বিজেতাদের লণ্ঠনের আলোগুলো অন্ধকার রণভূমিতে জ্বলতে থাকা বাঘের চোখের মতো দেখাচ্ছিল।

বিজেতারা অবশিষ্ট ফরাসী সৈন্যদের এই দলটিকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। তাদের সাহস, বীরত্ব ও দৃঢ়তার তুলনা হয না। ইংরেজ বাহিনীর কনভিল, মেটল্যান্ড প্রমুখ অফিসাররা তাই ফরাসী সেনাদের প্রশ্ন করল, হে বীর ফরাসী সৈনিক, তোমরা আত্মসমর্পণ করবে না?

কামব্রোনে উত্তর করল, না মরব।

১৫

একথাটা ইতিহাসের বইয়ে লেখা হয়নি। অথচ এত বড কথা আর কোনও ফরাসীর মুখে উচ্চারিত হয়নি। এই রকম অনেক বড় কথাই নথিভুক্ত হয় না। কিন্তু আমাদের মতে সেদিনকার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীরদের মধ্যে সবচেয়ে বড বীর হলো কামব্রোনে।

নির্ভয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া মানেই মরা। কোনও লোক যদি মৃত্যুকে বরণ করতে গিয়েও আহত হয়ে বেঁচে থাকে তাহলে তার কোনও দোষ নেই। ওয়াটারলুর যুদ্ধের প্রকৃত বিজেতা পরাভূত নেপোলিয়ন বা ওয়েলিংটন নন। পরাজিত হতে হতে

কোনওরকমে জয়লাভ করেন ওয়েলিংটন। আবার ব্লুশারকে প্রকৃত বিজেতা বলা যায় না। এ যুদ্ধের প্রকৃত বিজেতা হলো কামব্রোনে। বজ্র ও বিদ্যুতের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের অগ্রাহ্য করাই হলো প্রকৃত জয়লাভ করা।

এইভাবে যারা সব বিপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে, যারা সমাধি-গহ্বরের মুখে এসে মৃত্যুকে উপহাস করতে পারে, যারা অস্ত্রাঘাতে ভূপাতিত হয়েও খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে নিজের চেষ্টায়, যারা পরাভূত হয়েও ফ্রান্সের সমস্ত বীরত্ব ও সামরিক শক্তিকে মূর্ত করে তুলতে পারে নিজেদের অনমনীয় পরাক্রমের মধ্যে, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করতে না পারলেও ইতিহাসে এক বিরল খ্যাতি লাভ করে।

তখন বিজেতা ইংরেজ বাহিনীই যেন সারা ইউরোপের রাজা। সে বাহিনীর বিজয়ী সেনানায়করা হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ফরাসী রক্ষী বাহিনীকে পদদলিত করে দর্পভরে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে সারা রণক্ষেত্র জুড়ে। তারা যেন নেপোলিয়নের সব গর্ব চূর্ণ করে তাঁর মাথার উপর পা রেখে ব্যর্থ করে দিয়েছে তাঁর অতীত জয়ের সমস্ত গৌরবকে। ফরাসীদের সব গেছে, আছে শুধু কামব্রোনে যে আত্মসমর্পণের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে ইংরেজদের বিজয়গৌরবকে উপহাস করেছে। আসলে এই অপরাজেয় কামব্রোনেই প্রকৃত বিজেতা। সে ইংরেজদের প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে যে দানবিক ঘৃণার কথাটা ছুঁড়ে দেয় তা দিয়ে সে যেন সম্রাটের প্রতিভূ হিসাবে সমগ্র ইউরোপের বিজেতা পক্ষের উপর এক চরম আঘাত হানতে চায়। আসলে সে যেন যুদ্ধোন্মাদ সব রাজশক্তিকেই হেয়জ্ঞান করছিল। সে যেন বিপ্লবের প্রতীক। অতীত ফরাসী বিপ্লবের নেতা দাঁতন যেন কথা বলছিল তার মুখ দিয়ে।

ইংরেজ বাহিনীর এক নেতা হুকুম দিতেই আবার কতকগুলি আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। পাহাড়ের ধারগুলো কেঁপে উঠল। প্রথমে এক ঘন ধোঁয়ার মেঘে সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে থাকায় কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে ধোঁয়াটা কেটে যেতে চাঁদের আলোয় দেখা গেল কামব্রোনের নেতৃত্বে যে কয়জন মুষ্টিমেয় অবশিষ্ট ফরাসী সৈন্য মৃত্যুপণ লড়াই করে যাচ্ছিল, যারা আপন আপন ক্ষেত্র ছেড়ে এক পাও সরে যায়নি অথবা পালাবার কোনও চেষ্টা করেনি, তারা সবাই লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। তাদের কেউ আর জীবিত নেই। চারদিকে শুধু মৃতদেহগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাজা রক্তে ভিজে গেছে মঁ সেন্ট জাঁর মাটি।

আজ এই জায়গাটার পাশ দিয়ে মাঠের ধার ঘেঁষে চলে যাওয়া রাস্তাটা লিভেলের পথে রোজ ভোর চারটের সময় একটা গাড়ি চলে যায়। অতীতের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর এই বিরাট প্রান্তর জোড়া নরহত্যার ব্যাপক তাণ্ডবের কোনও কথা মনে না করেই ডাকপিওন জোশেপ মনের আনন্দে ঘোড়াটাকে চাবুক মারতে মারতে ডাক গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

১৬

ওয়াটারলুর যুদ্ধ এমনই এক যুদ্ধ যা বিজিত এবং বিজেতা উভয় পক্ষের কাছে

এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ভরা। নেপোলিয়নের কাছে এ যুদ্ধ ছিল এক সন্ত্রাসের বস্তু। ব্লুশারের কাছে এটা ছিল শুধু আগ্নেয়াস্ত্রের খেলা আর ওয়েলিংটন এ যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কিছু বুঝতেই পারেননি।

এ যুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা এবার পরস্পরবিরুদ্ধ কয়েকটি বিবরণ তুলে ধরতে পারি। ফরাসী জেনারেল জোমিনী এ যুদ্ধের চারটি সংকটজনক মুহূর্তকে তুলে ধরে তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। জার্মান সেনাপতি মাফিং এ যুদ্ধকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। লেফটন্যান্ট কর্নেল চারসই একমাত্র এ যুদ্ধের প্রকৃতি ও পরিণতির ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন ঐশ্বরিক বিধানের কাছে ব্যর্থ বিমূঢ় মানবাত্মার পরাজয়েই পরিসমাপ্তি লাভ করে এ যুদ্ধ। অন্য সব ঐতিহাসিকরা এ যুদ্ধের ব্যাপারে হতবুদ্ধি হয়ে আপন আপন বিহ্বলতার অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে দেখা যায়, এ যুদ্ধে জঙ্গী যুদ্ধোন্মাদ এক রাজতন্ত্রের পতন ঘটে, এ যুদ্ধের ফলে অনেক রাজ্যের ভাঙা-গড়া চলতে থাকে। কিন্তু আসলে এ যুদ্ধ হলো ঐশ্বরিক বিধানের খেলা, এতে মানুষের ভূমিকা খুবই কম।

এ যুদ্ধে ওয়েলিংটন বা ব্লুশারের কোনও কৃতিত্ব যদি স্বীকার না করি তাহলে কি ইংলন্ড ও জার্মানির মহত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারি? না, পারি না। ওয়াটারলুর যুদ্ধে যাই ঘটুক না কেন, তাতে এই দুটি দেশের মহত্ত্ব খর্ব হয় না কোনওক্রমে। অস্ত্রের খেলা বা কারসাজি যে যতই দেখাক না কেন, মানুষ বা কোনও দেশের জনগণ তার থেকে অনেক বড়। ইংলন্ড, জার্মানি বা ফ্রান্সের জাতিগত সব কৃতিত্ব, সব মহত্ত্ব কখনো শুধু অস্ত্রশক্তির মধ্যে নিহিত থাকতে পারে না। ওয়াটারলুর রণপ্রান্তরে ব্লুশার যখন উজ্জ্বল উন্মত্ত তরবারির খেলা খেলছিল তখন তার সব কৃতিত্বকে আচ্ছন্ন ও ম্লান করে দিয়ে জার্মানির গ্যেটে এক বিরাট গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বিরাজ করছিলেন। ওযেলিংটনের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়ে ইংলন্ডে বিরাজ করছিলেন বায়রন। আমাদের এই শতাব্দীর নতুন প্রভাতে এক নতুন ভাবাদর্শের যে বিরাট আলোকবন্যা আসে তাতে ইংলন্ড ও জার্মান আপন আপন আলোর ঐশ্বর্য দান করে। ঐ সব দেশের লোকেরা চিন্তাশীল, তারা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবে বলেই তারা মহান। যে সব মহৎ গুণের দ্বারা মানব সভ্যতাকে মহত্ত্ব দান করে তারা, সে সব গুণ তাদের নিজস্ব, তাদের অন্তর থেকে উদ্ভূত, বাইরের কোনও ঘটনাসঞ্জাত নয়। উনিশ শতকে তাদের ক্রমবর্ধমান মহত্ত্বের জন্য ওয়াটারলু যুদ্ধ কোনওক্রমেই দায়ী নয়। আকস্মিক বৃষ্টিপাতের প্রবলতার দ্বারা পুষ্ট কোনও শীর্ণ বিশুষ্ক নদীর মতো একমাত্র বর্বরজাতীয় লোকেরাই যুদ্ধজয়ের গৌরবে স্ফীতবক্ষ হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগে কোনও সভ্য জাতির ভাগ্যের উন্নতি বা অবনতি কখনো কোনও সামরিক নেতার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের উপর নির্ভর করে না। মানবজাতির ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ গুরুত্ব যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া অন্য কোনও ঘটনার ফলশ্রুতি। তাদের সম্মান, মর্যাদা, তাদের বিচ্ছুরিত প্রতিভার আলো কখনো কয়েকজন বীর বিজেতা সেনানায়কের দ্বারা সংগৃহীত সৈন্যসংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ভাগ্যের খেলার মতোই

অনিশ্চিত যুদ্ধের জয়-পরাজয়। অনেক সময় দেখা যায় যুদ্ধে পরাজিত কোনও দেশ বা জাতি এক অভাবনীয় উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করেছে। যেখানে যুদ্ধের জয়ঢাক স্তব্ধ হয় সেখানেই জ্ঞান ও যুক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ওয়াটারলু যুদ্ধের দুটো দিকই আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এ যুদ্ধে লব্ধ জয় যেন পাশাখেলার এক দান যা দৈবক্রমে একটি পক্ষকে জিতিয়ে দেয়।

এ যুদ্ধে একা ফ্রান্সের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে আর সমগ্র ইউরোপ জয়লাভ করে। আর জয়ের প্রতীক স্বরূপ এক সিংহের মর্মরমূর্তি স্থাপন করা হয় ওয়াটারলুর রণপ্রান্তরে।

এ যুদ্ধে যেন দুটি বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ অবতীর্ণ হয়েছে এক আপোসহীন সংগ্রামে। নেপোলিয়ন আর ওয়েলিংটন যেন পরস্পরের শত্রু নয়, তাঁরা যেন পরস্পরবিরুদ্ধ দুটি ভাবধারা। দুটি পক্ষের মধ্যে এমন বৈপরীত্য এর আগে কখনো দেখা যায়নি। একদিকে ছিল দূরদর্শিতা, যাথার্থ্য কূটনৈতিক বিচার-বিবেচনা, শান্তশীতল নিষ্ঠা, সঠিক সামরিক জ্ঞান। একদিকে অনেক বাড়তি সৈন্য আগে হতে সংরক্ষিত করে রাখা হয়, পশ্চাদপসরণের পথ আগেই পরিষ্কার করে রাখা হয়, চারপাশের ভূ-প্রকৃতির যথাসম্ভব সুযোগ লাভ করার চেষ্টা করা হয়,—অর্থাৎ সব কিছুই এক বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ছকবাঁধা পরিকল্পনা অনুসারে করা হয়। কোনও কিছুই দৈবের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ছিল শুধু অন্তর্দৃষ্টি দৈবনির্ভরতা, সামরিক হটকারিতা, বিদ্যুতের থেকে ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন একজোড়া ঈগলচক্ষু সমরকৌশলের সঙ্গে মিশ্রিত প্রবল আবেগপ্রবণতা, নিয়তিবাদ, এক দুর্জ্ঞেয় মানব প্রকৃতির যত সব দুর্বোধ্য রহস্য। সামরিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত এক ভাগ্যবিশ্বাস যা একই সঙ্গে যুদ্ধের কাজকে গৌরবদান করে এবং সে গৌরবকে খর্ব করে। মাঠ, বন, পাহাড়, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকেও কাজে লাগাবার চেষ্টা, এক স্বৈরাচারী অত্যাচারী শাসকের দর্পিত আস্ফালন। ওয়েলিংটন ছিলেন যুদ্ধের চিত্রকর মাইকেল অ্যাঞ্জেলো। এইভাবে প্রতিভার পরাভব ঘটে বিজ্ঞানের শাসন ও আঙ্কিক নিয়মের কাছে।

দেখা যায়, যুদ্ধের যিনি কারিগর তিনিই ঠিকমতো সব গণনা করেন। দু' পক্ষই দু'জনের আগমন প্রত্যাশা করে। নেপোলিয়ন গ্রোশির জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু গ্রোশি আসেনি। ওয়েলিংটন ব্লুশারের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, ব্লুশার এসেছিল।

ওয়েলিংটন প্রাচীন যুদ্ধরীতির প্রতিনিধিত্ব করেন। নেপোলিয়ন তাঁর সামরিক জীবনের প্রথম দিকে ইতালিতে এই যুদ্ধনীতির সম্মুখীন হন এবং তাতে জয়ী হন। এক প্রবীণ পেঁচা এক যুবক শিকারী পাখির কাছ থেকে পালিয়ে যায়। সে যুদ্ধরীতির নায়করা শুধু ছত্রভঙ্গ ও পরাভূত হয়নি, সেই সঙ্গে বিক্ষুব্ধও হয়। কে এই ছাব্বিশ বছরের কর্সিকান যুবক, বিরাট শক্তিধর অথচ অশুভ যার সব থেকেও কিছুই ছিল না। রসদ সরবরাহ, অস্ত্রশস্ত্র, কামান, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য কোনও কিছুরই যার ঠিক ছিল না, যে মুষ্টিমেয় একদল অজ্ঞ অপদার্থ ও হটকারী সৈন্য নিয়ে ইউরোপের সম্মিলিত সেনাবাহিনীকে আক্রমণ ও বিপর্যস্ত করে অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করে

অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে? এক উন্মাদ ঘূর্ণিবায়ুর মতো কোথা থেকে ঝড়ের বেগে এসে এক হাঁপে সামান্য একটি বাহিনী নিয়ে একের পর এক করে অস্ট্রিয়ায় সম্রাটের পাঁচটি সেনাদলকে পরাজিত করে? বোলোকে আলভিনিৎসের উপর, ওয়ার্থসারকে বোলোর উপর, মেলাকে ওয়ার্থসারের উপর এবং ম্যাককে মেলার উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়? এক ভুইফোঁড় কাকের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে এক বজ্রদণ্ড হাতে আবির্ভূত হয়ে সব কিছু ওলোটপালোট করে দেয়? প্রচলিত আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা তার যুদ্ধরীতিকে সমর্থন না করলেও তার কাছে সব ব্যর্থ হয়। প্রাচীন প্রথাগত সীজারীয় যুদ্ধরীতি এই প্রতিভাধর পুরুষের কাছে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হওয়ায় সীজারপন্থী বীর সেনানায়কদের মনে এই পুরুষের বিরুদ্ধে এক প্রবল ঘৃণার উদ্রেক হয়। ১৮১৫ সালের ১৮ই জুন এই ঘৃণা শেষ কথা বলে দেয়. লোদি, মাণ্ডুয়া, ম্যারেঙ্গো ও আর্কোলায় লব্ধ জয়ের সব গৌরবকে মুছে দিয়ে তার উপর ওয়াটারলুর বিরাট পরাজয়ের কথাকে জ্বলন্ত অক্ষরে উৎকীর্ণ কবে রাখে। এ যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে এক প্রতিভাধর পুরুষের পরাজয়। এটা হলো নিয়তির বিরাট পরিহাস।

ওয়াটারলু যদ্ধে এক দ্বিতীয় শ্রেণীর সেনাপতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এ যুদ্ধে যা আমাদের সবচেয়ে আকষণ করে তা হলো ইংলন্ড, ইংরেজদের একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর সংকল্পের দৃঢ়তা, ইংরেজ রক্ত। ইংরেজ জাতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিস হচ্ছে এই যে তাদেব শক্তির উৎস হলো কোনও সেনাপতি নয়, সে শক্তির উৎস হলো জনগণ। অকৃতজ্ঞ ওয়েলিংটন তাঁর বন্ধু রামরাস্টকে লিখেছিলেন, ১৮১৫ সালের ১৮ই জুন ওযাটারলুর যুদ্ধে তাঁর যে সেনাদল যুদ্ধ করে তারা ছিল অযোগ্য এবং অপদার্থ। কিন্তু ওয়াটারলুর বনপ্রান্তরে যে সব দেহাস্থি পড়ে আছে তাদের কথা একবার ভেবে দেখ।

ইংলন্ড কিন্তু ওয়েলিংটনকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা কবে. নিজেকে খর্ব করে ওয়েলিংটনকে বড করে তাঁকে মহৎ করে তুলেছে। তিনি যেমন বীর ছিলেন তেমনি তাঁর অধীনস্থ সৈন্যরাও বীর ছিল। একাগ্রতা ছিল তাঁর একটা বড গুণ। আমরা তা অস্বীকার করছি না, কিন্তু তাঁর অধীনে যে সব পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকরা যুদ্ধ করে তারাও তাঁর মতোই একাগ্র ও নিষ্ঠাবান ছিল। আমরা ইংলন্ডের জনগণ ও সেনাবাহিনীর প্রশংসা না করে পারছি না। পুরস্কার যদি দিতে হয় তাহলে সে পুরস্কার তাদের প্রাপ্য। লন্ডনে যে ওয়াটারলুর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে তা যদি কোনও ব্যক্তিবিশেষের না হয়ে একটি জাতির ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরত তাহলে ভাল হত।

কিন্তু ইংরেজদের এসব কথা ভাল লাগবে না। তাদের ১৬৮৮ খৃস্টাব্দের এবং আমাদের ১৭৮৯ সালের বিপ্লব সত্ত্বেও তারা সামন্তবাদী ব্যক্তিপূজার ভাবধারাকেই পোষণ করে অন্তরে। তারা উত্তরাধিকার এবং ব্যক্তিত্বের মহত্ত্বে বিশ্বাস করে। তারা অতুলনীয় শক্তি ও গৌরবের অধিকারী, কিন্তু তারা নিজেদের সাধারণ জনগণ হিসাবে না দেখে জাতি হিসাবে দেখে। তাদের জনগণ একজন লর্ডকে তাদের নেতা হিসাবে মেনে নেয়। শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় সব ঘৃণা ও অবজ্ঞা মেনে নেয়, সৈনিকরা স্বেচ্ছায়

প্রহৃত হয়। ইন্নারম্যানের যুদ্ধের একজন সামান্য সার্জেন্ট একটি গোটা সেনাদলকে বাঁচায়। কিন্তু যুদ্ধের নেতা লর্ড রাগলাত তাঁর বিবরণে সে সার্জেন্টের নাম উল্লেখ করেননি, কারণ ইংলন্ডের সামরিক কর্তৃপক্ষ সামরিক বিবরণে কোনও পদস্থ অফিসার ছাড়া কোনও সৈনিকের নাম উল্লেখ করতে দেন না। তার কোনও রীতি নেই।

ওয়াটারলু যুদ্ধে সবচেয়ে আশ্চর্যের বস্তু হলো দৈবের আনুকূল্য—বৃষ্টিভেজা মাঠ, কাদায় ভরা পথঘাট, গ্রোশির অনুপস্থিতি, নেপোলিয়নকে ভুলপথে এবং ব্লুশারকে ঠিকপথে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি অনুকূল ঘটনাগুলি এ যুদ্ধে এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

ওয়াটারলু রণক্ষেত্র আসলে এক ব্যাপক নরহত্যার লীলাক্ষেত্র। এ যুদ্ধে যে পরিমাণ সৈন্য যুদ্ধ করে সে পরিমাণ জায়গা ছিল না। খুব কম জায়গার মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়নের সামনে জায়গা ছিল মাত্র তিন মাইল আর ওয়েলিংটনের ছিল মাত্র দু' মাইল জায়গা। অথচ দু' পক্ষে বাহাত্তর হাজার করে মোট এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার করে সৈন্যসংখ্যা ছিল। ফরাসীপক্ষে মৃত সৈন্যের সংখ্যা শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ আর ইংরেজ পক্ষে সম্মিলীত বাহিনীর মধ্যে শতকরা একত্রিশ ভাগ সৈনিক নিহত হয়।

দু'পক্ষে মোট ষাট হাজার সৈন্য নিহত হয়।

আজ ওয়াটারলুর বিশাল প্রান্তর দেশের অন্যান্য শূন্য প্রান্তরের মতোই এক অবাধ অখণ্ড স্তব্ধতায় প্রসারিত হয়ে আছে। কিন্তু রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রান্তরের মাটি থেকে এক রহস্যময় কুয়াশা বেরিয়ে এসে সমস্ত প্রান্তরটাকে ছেয়ে ফেলে। ফিলিপ্পির প্রান্তরে স্বপ্নাহত ভাবাবিষ্ট ভার্জিলের মতো কোনও পথিক যদি ওয়াটারলুর নৈশ প্রান্তরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাহলে সে এক বিরাট যুদ্ধের ধ্বংসোন্মত্ত প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে। তখন সেই উঁচু পাথরের উপর বসানো সিংহের মর্মরমূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং যুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো একে একে মনে পড়বে তার। সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রটা তার অতীতের সেই বাস্তবতাটা যেন ফিরে পাবে একে একে—সেই সারিবদ্ধ পদাতিক বাহিনীর ক্ষিপ্র পদসঞ্চার। দু'দলের প্রচণ্ড আক্রমণের বিপরীতমুখী দুটি তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতিঘাত, উৎক্ষিপ্ত বেয়নেট ও তরবারির উজ্জ্বলতা, কামানের অগ্ন্যুদ্গার ও বজ্রনিনাদ—সব জীবন্ত হয়ে উঠবে ধীরে ধীরে। সমাধিগহ্বর থেকে উৎসারিত এক ভৌতিক আর্তনাদের মতো পথিক শুনতে পাবে এক অদৃশ্য যুদ্ধের অশ্রুত ধ্বনি, দেখতে পাবে অসংখ্য বর্মধারী ও বোমারু সৈনিকের ছায়ামূর্তি। দেখবে ওদিকে নেপোলিয়ন, এদিকে ওয়েলিংটন—দুই নেতা দু'দিকে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। সব কিছু শেষ হয়ে গেলেও অফুরান অসমাপ্ত সংগ্রামে আজও মত্ত হয়ে আছেন তাঁরা। সে সংগ্রামের তীব্রতা আর বিভীষিকা প্রকট হয়ে উঠেছে যেন চারদিকের প্রকৃতির মধ্যে। চারদিকের মাঠে-ঘাটে ও খালগুলোতে রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে, চারদিকের গাছপালাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। কর্ণবিদারক এক প্রচণ্ড ধ্বনিতরঙ্গ আকাশকে স্পর্শ করছে আর মঁ সেন্ট জাঁ, হুগোমঁত, পাপোলোত্তে ও

প্ল্যানশেনয়েতের পাহাড়ের চূড়াগুলিতে গর্জনশীল নির্জন বাতাসের মতো অসংখ্য সৈনিকের প্রেতমূর্তি এক আত্মঘাতী ঘাত-প্রতিঘাতে মেতে উঠেছে।

১৭

উদারনৈতিক ভাবধারাবিশিষ্ট এমন একদল শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আছেন যাঁরা ওয়াটারলু যুদ্ধের মধ্যে কারো কোনও দোষের কিছু দেখতে পান না। আমরা কিন্তু তাঁদের দলে নই। আমাদের মনে হয় এই যুদ্ধে স্বাধীনতার ব্যাপারটাকেই গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। এমন একটি ডিম থেকে এ ধরনের এক পাখিকে কিভাবে তা দিয়ে বার করা হলো সেটাই হলো আশ্চর্যের কথা।

ওয়াটারলু যুদ্ধের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো এই যে এ যুদ্ধে সূচিত হয়েছে বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের জয়। এ যুদ্ধ প্যারিসের বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপের যুদ্ধ, প্যারিসের বিরুদ্ধে সেন্ট পিটার্সবার্গ, বার্লিন ও ভিয়েনার যুদ্ধ, নতুনের বিরুদ্ধে প্রাচীনের যুদ্ধ। এ যেন ১৭৮৯ সালের ১৫ই জুলাই-এর বিরুদ্ধে ১৮১৫ সালের ২০শে মার্চের আক্রমণ। ফ্রান্সের যে গণশক্তি ছাব্বিশ বছর ধরে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করেছে সেই গণশক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও সম্মিলিত রাজশক্তির এক বিরাট আগ্নেয় অভ্যুত্থান। ওয়াটারলু যুদ্ধের এটাই ছিল যেন আসল লক্ষ্য। ব্রানসউইক, লাসাউ, রোমানফ, হোয়েনজোলার্স, হ্যাপসবার্গ ও বুর্বনের রাজবংশগুলি সব বিবাদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে শুধু এই লক্ষ্য সাধনের জন্য। ওয়াটারলু রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে। সম্রাট নেপোলিয়ন স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে স্বাভাবিকভাবেই রাজতন্ত্রীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ওয়াটারলু যুদ্ধে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হলেও ধ্বংস হয়নি একেবারে। সে বিপ্লব একক সম্রাট নেপোলিয়নের রূপ ধরে আবির্ভূত হয় ওয়াটারলুতে এবং এ যুদ্ধের পরেও সে বিপ্লব সেন্ট কোঁয়েতে মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদানরত অষ্টাদশ লুই-এর মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। নেপোলিয়ন নেপলস-এর সিংহাসনে একজন হোটেলমালিকের ছেলেকে বসিয়ে এবং সুইজারল্যান্ডের সিংহাসনে একজন ভূতপূর্ব সার্জেন্টকে বসিয়ে অসাম্যের মধ্য দিয়ে সাম্যের জয় ঘোষণা করেন। বিপ্লবের প্রকৃতি বুঝতে হলে তাকে প্রগতি অ্যাখ্যা দিতে হবে। আর প্রগতি মানে আগামীকাল। এই আগামীকাল এবং গতকাল অদ্ভুতভাবে তাদের আপন আপন কাজ করে যায়। এই আগামী কাল বা প্রগতির প্ররোচনাতেই ওয়েলিংটন ফর নামে এক সাধারণ সৈনিককে এক বাগ্মীতে পরিণত করেন। হুগোমঁতে যে আহত হয়ে পড়ে যায় সে আবার পার্লামেন্টে বক্তারূপে উঠে আসে। এটাই হলো প্রগতির রীতি। তরবারির দ্বারা ইউরোপের রাজশক্তিগুলির উচ্ছেদের যে তাণ্ডবলীলা চলে, ওয়াটারলু যুদ্ধ সেই তাণ্ডবের অবসান ঘটায়। তবে এর ফলে আবার বিপ্লব অন্য রূপে ঘুরে আসে। এখন তরবারির যুগ চলে গেছে, এখন এসেছে চিন্তাশীলদের যুগ। এখনকার যুদ্ধ বুদ্ধির যুদ্ধ। ওয়াটারলু শতাব্দীর স্রোতোধারাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে, তার জয় স্বাধীনতার ছদ্মবেশী বিপ্লবের দ্বারা পরাজিত হয়।

মোট কথা, ওয়াটারলু যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষই হলো প্রতিবিপ্লবী। সে শক্তি ওয়েলিংটনের পিছনে ইউরোপের বহু রাষ্ট্রশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত করে, পুঞ্জীভূত নরকঙ্কালের উপর এক বিজয়ী সিংহের মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। যে শক্তি মঁ সেন্ট জাঁর মালভূমির উপর থেকে এক শিকারী পাখির মতো ফ্রান্সের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে শক্তি নিঃসন্দেহে এক প্রতিবিপ্লবী শক্তি। এই শক্তিই সম্রাটের সব শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে প্যারিসে এসে দেখে তাদের পায়ের তলায় এক আগ্নেয়গিরির গহ্বর মুখ ব্যাদান করে আছে। প্রতিবিপ্লবী শক্তি তখন আপন বিপদের কথা বুঝতে পেরে তার নীতির পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় এবং এক অধিকারের সনদ দিয়ে বিতর্ক শুরু করে দেয়।

ওয়াটারলুর আসল প্রকৃতিকে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। তার যা মূল্য তার বেশি মূল্য দিলে চলবে না। স্বাধীনতা দানের কোনও উদ্দেশ্য তার ছিল না। প্রতিবিপ্লবীরা যুদ্ধের পরেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও উদারনৈতিক হয়ে ওঠে, নেপোলিয়ন যেমন অনুরূপ অবস্থার চাপে অনিচ্ছায় বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। ১৮১৫ সালের ১৮ই জুন তারিখে বিপ্লবের নায়ক রোবোসপীয়ারের ভূমিকায় অবতীর্ণ অশ্বারোহী নেপোলিয়ন আসনচ্যুত হন।

১৮

স্বৈরতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল।

নেপোলিয়নের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক ব্যাপক অন্ধকার নেমে এল যে অন্ধকার একদিন নেমে এসেছিল রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর। বর্বর যুগের মতো বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কিন্তু ১৮১৫ সালের বর্বরতার নাম হলো প্রতিবিপ্লব। এ প্রতিবিপ্লব অবশ্য উপযুক্ত প্রাণশক্তির অভাবে ক্ষণস্থায়ী হয়।

বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যের জন্য অনেক বীর অবশ্য অশ্রুপাত করতে থাকে। তরবারির শক্তি আর সামরিক গৌরব যদি রাজদণ্ডের গৌরব হয় তাহলে সাম্রাজ্য অবশ্যই হবে গৌরবের মূর্ত প্রতীক। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য থেকে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় তা ছিল আসলে অত্যাচারের আগুন থেকে বিচ্ছুরিত এক অন্ধ আলো। আসলে তা ছিল চোখ ধাঁধানো এক অন্ধকার। সুতরাং সাম্রাজ্যের পতন মানেই গ্রহণজনিত অন্ধকারের নিঃশেষিত অবসান।

অষ্টাদশ লুই বিজয়গর্বে ফিরে এলেন প্যারিসে। ৮ই জুলাই তারিখে প্যারিসের রাজপথে যে নৃত্য-উৎসব চলতে থাকে তা ২০শে মার্চের উদ্যম উল্লাসের সব স্মৃতিকে মুছে দেয়। নির্বাসিত রাজা আবার ফিরে এসে অধিষ্ঠিত হন সিংহাসনে। স্বরাজ্যে স্বরাট হয়ে বসেন। ম্যাদলেনের যে কবরখানা ১৭৯৩ সালে সাধারণের কবরখানায় পরিণত হয়, যে কবরখানায় রাজা ষোড়শ লুই আর রানী মেরী আঁতানোতকে সমাহিত করা হয়, যার মধ্যে তখনো তাঁদের দেহাস্থি শায়িত হয়ে ছিল, সেই কবরখানাটিকে মর্মরপ্রস্তর দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়' তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত

হয় সেখানে। পোপ সপ্তম পায়াস যিনি একদিন নেপোলিয়নের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করান, সেই পোপ সপ্তম পায়াসই অষ্টাদশ লুই-এর অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন তেমনি প্রশান্তভাবে। এইভাবে ইউরোপের নির্বাসিত সিংহাসনচ্যুত রাজারা আবার ফিরে এসে আপন আপন সিংহাসনে বসেন। অথচ সমগ্র ইউরোপের অধিপতি রাজাধিরাজ পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো কারারুদ্ধ হন। এইভাবে অন্ধকারের জায়গায় আলো আর আলোর জায়গায় অন্ধকার আসন গ্রহণ করে। এই সব কিছুর একমাত্র কারণ হলো এই যে এক রাখাল বালক বনের মধ্যে একদিন এক প্রুশীয় সেনাপতিকে পথ দেখিয়ে বলে, 'আপনি এ পথে না গিয়ে ঐ পথে যান।'

১৮১৫ সালের শরৎ আসে বিষণ্ণ বসন্তের রূপ ধরে। পুরনো বিযাক্ত বাস্তব অবস্থাগুলি শুধু তাদের বাইরের রূপটার পরিবর্তন করে। এক ব্যাপক মিথ্যাচার, কল্পিত সত্যের ধারণা বৈধ সত্যের আসন গ্রহণ করে। মানবাধিকারের সনদের অন্তরালে রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকার লুকিযে থাকে। মনুষ্যবিদ্বেষ, কুসংস্কার এবং নৈতিক সততার অভাব এক উজ্জ্বল উদারনীতিবাদের রূপ ধারণ করে। সব পুরনো সাপগুলো খোলস ছাড়ে। নেপোলিয়ন একই সঙ্গে মানবজাতির গৌরব বাড়িয়ে তোলেন এবং খর্ব করেন। চাকচিক্যময় জৌলুসধারী এক জড়বাদকে আদর্শবাদ হিসাবে চালাবার চেষ্টা করে এক বিরাট ভুল করেন তিনি। ভবিষ্যৎকে উপহাস করেন এইভাবে।

কিন্তু নেপোলিয়ন কোথায় এবং কি করছেন? যুদ্ধবাজ লোকরা তাদের প্রিয় গোলন্দাজকে খুঁজে বেড়াতে লাগল সর্বত্র। ওয়াটারলু যুদ্ধ ফেরৎ এক পঙ্গু সৈনিককে একদিন একটি লোক বলল, নেপোলিয়ন মারা গেছেন।

সৈনিক আশ্চর্য হয়ে বলল, মারা গেছেন! তিনি?

এটাই হলো নেপোলিয়নেব আসল পরিচয়। সেই স্বৈরাচারীর তখনকার দিনে কোনও লোক কল্পনাও করতে পারত না। ওয়াটারলু যুদ্ধের অনেক পরে নেপোলিয়নের অভাবজনিত এক বিশাল শূন্যতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সমগ্র ইউরোপের অন্তর।

ইউরোপের রাজারা সে শূন্যতা পূরণ করার চেষ্টা করতে লাগল। ইউরোপ তার নিজের পুনর্গঠনে মন দিল। ওয়াটারলু যুদ্ধের আগে ঐক্যবদ্ধ মিত্রশক্তি 'হলি অ্যালায়েন্স'-এ পরিণত হলো।

প্রাচীন ইউরোপ যখন নিজেকে পুনর্গঠিত করতে লাগল, তখন তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক নতুন ফ্রান্স। যে ভবিষ্যৎকে একদিন উপহাস করে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করেছিলেন সম্রাট নেপোলিয়ন, সে ভবিষ্যৎ তার ললাটে স্বাধীনতার এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা নিয়ে আবির্ভূত হলো। যুবকরা পরম আগ্রহভরে সে ধ্রুবতারার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু এক আশ্চর্য বৈপরীত্য দেখা দিল সেই যুবশক্তির মনে। তারা একই সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যৎকে ভালবাসতে লাগল। স্বাধীনতার রূপ ধরে আসা ভবিষ্যৎকে যেমন সাদরে বরণ না করে নিয়ে পারল না, তেমনি অতীত শক্তির ঐশ্বর্যের প্রতীক নেপোলিয়নকেও তারা বর্জন করতে পারল না।

পরাজয়ের মধ্যেও পরাজিত নেপোলিয়নের গুরুত্ব বেড়ে গেল। বন্দী নেপোলিয়নের

উপর কড়া নজর রাখার জন্য ইংলন্ড ভার দেয় হাডস্টনের উপর এবং ফ্রান্স এ কাজের ভার দেয় মশেনুর উপর। তাঁর জোড়বদ্ধ হাত দুটি সব রাজাদের কাছে ছিল সন্ত্রাসের বস্তু। অনেক রাজা বলত, উনি আমার বিনিদ্র রাত্রি। বিপ্লবের যে শক্তি তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল সেই বিপ্লবের জন্যই ভয় করত তাঁকে সবাই। মৃত্যুর পরেও নেপোলিয়নের আত্মা সারা জগৎকে কাঁপিয়ে তুলত এবং রাজারা ভয়ে ভয়ে রাজত্ব করত। তারা সব সময় দিগন্তে সেন্ট হেলেনা দ্বীপের পাহাড়টাকে দেখত।

এই হলো ওয়াটারলু।

কিন্তু অনন্তকালের পরিপ্রেক্ষিতে এ যুদ্ধের তাৎপর্য কি ? প্রথমে সারা আকাশটাকে আচ্ছন্ন করে মেঘ নেমে এল। মেঘ থেকে বিরাট ঝড় উঠল। যুদ্ধ হলো। যুদ্ধের পর এল শান্তি। এত সব বিপর্যয় ও জয়-পরাজয় এক মুহূর্তের জন্যও সেই সর্বদর্শী দুটি বিশাল চক্ষুর সর্বব্যাপী দৃষ্টিকে বিচলিত করতে পারেনি। যে দৃষ্টির সামনে এক তৃণখণ্ড থেকে অন্য তৃণখণ্ডে উড়ে বেড়ানো সামান্য এক ফড়িং আর উড়ন্ত ঈগল সমান।

১৯

আমাদের বাহিনীর পক্ষে এবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাওয়া দরকার।

১৮১৫ সালের ১৮ই জুন ছিল পূর্ণিমা। যে রাতে ব্লুশারের বর্বর বাহিনী পলায়নরত ফরাসী সৈনিকদের অনুসরণ করছিল তখন আকাশ থেকে ঝরে-পড়া পূর্ণ চাঁদের আলো তাকে পথ দেখায়। পালিয়ে যাবার সব পথ উদ্‌ঘাটিত করে দেয় শত্রুদের চোখের সামনে। ভীত সন্ত্রস্ত পলায়মান ফরাসী সৈনিকদের হিংস্র প্রুশীয় অশ্বারোহী বাহিনীর দয়ার উপর ঠেলে দেয়। এইভাবে সেদিনের সেই পূর্ণিমার চাঁদ নরহত্যার তাণ্ডবে সহায়তা করে। এইভাবে অনেক চন্দ্রালোকিত রাত্রি মানুষের অনেক দুঃখে বিপদে মুখ বার করে হাসতে থাকে।

মঁ সেন্ট জাঁর প্রান্তরে গুলিবর্ষণ থেমে গেলেই সে প্রান্তর একেবারে জনহীন হয়ে পড়ে। ফরাসী বাহিনী পালিয়ে গেলেই তাদের শিবিরে ঢুকে পড়ল ইংরেজ বাহিনীর বিজেতা সৈন্যরা। কারণ তখন একটা রীতি ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে বিজেতা সৈন্যদের বিজিত সৈন্যদের শিবিরে গিয়ে তাদের বিছানায় শুতে হত।

প্রুশীয় অশ্বারোহীরা পলাতক শত্রুদের পশ্চাদ অনুসরণ করতে লাগল। ওয়েলিংটন গাঁয়ের মধ্যে নিশ্চিন্তে এক জায়গায় বসে যুদ্ধের বিবরণ লিখতে লাগলেন। মঁ সেন্ট জাঁর উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। হুগোমঁত, পাপোলোত্তে আর প্ল্যানশোনয়েতে আগুন লাগানো হয়। লা হাই সেন্ত আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়। লা বেল অ্যালায়েন্সে বিজেতা বাহিনীর সব দলগুলি মিলিত হয়। কিন্তু এই সব জায়গার কথা স্মরণ করা হয় না, তাদের নাম করা হয় না। যে ওয়াটারলুর যুদ্ধে তেমন কোনও ভূমিকাই নেই সেই ওয়াটারলুই সব গৌরব লাভ করে।

যারা যুদ্ধের জয়গান গায় আমরা তাদের দলে নেই। প্রয়োজন হলে আমরা যুদ্ধ

সম্পর্কে সত্য কথাই বলি। সব যুদ্ধেরই বিষাদময় এক সকরুণ ঐশ্বর্য আছে, সেটা আমরা অস্বীকার করিনি। কিন্তু তার সঙ্গে এর কতকগুলো আবার নোংরা দিকও আছে। তার মধ্যে একটা হলো মৃতদেহগুলোর সব কিছু লুণ্ঠন। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব সৈনিক নিহত হয় তাদের মৃতদেহ থেকে সব কিছু লুণ্ঠন করে নেওয়া হয়। যুদ্ধের পরদিন সব মৃতদেহগুলো নগ্ন হয়ে পড়ে থাকে।

কিন্তু কারা এই অপহারক ? যারা কোনও যুদ্ধজয়েব পরমুহূর্তেই বিজয় গৌরবের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে গৌরবকে কলঙ্কিত করে, তারা কারা ? ভলতেয়ারের মতো কিছু দার্শনিক মনে করেন, যারা এ গৌরব অর্জন করে তারাই এ গৌরবকে খর্ব করে। সেই একই লোক। জীবিতরা মৃতদের উপর লুণ্ঠন চালায। দিনের বেলাকার বীর সৈনিক রাত্রির অন্ধকারে এক নোংরা নক্কারজনক কাজে লিপ্ত হযে পড়ে। অনেকের মতে অবশ্যই এ কাজে অধিকার আছে তার, কারণ তাদেরই অস্ত্রাঘাতে ও সমরকুশলতার জন্যই মৃত্যু ঘটেছে সেই সব লুণ্ঠিত ব্যক্তিদের।

আমরা কিন্তু এটা বিশ্বাস করি না। যে হাত গৌরবের লরেল অর্জন করে নেয় সেই হাত কখনো এক মৃত সৈনিকের পা থেকে জুতো খুলে নিতে পারে না। বিশেষ করে বর্তমান যুগের কোনও সৈনিকের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আমরা করতে পারি না।

সব যুদ্ধক্ষেত্রেই সৈন্যশিবিরের আশেপাশে ও আনাচে-কানাচে কিছু আধা-ভৃত্য ও আধা-দুর্বৃত্ত, আধা-পঙ্গু লোক থাকে। তারা শিবিরের কাছে থেকে সৈন্যদের ফাই-ফরমাস খাটতে থাকে। অনেক ভিখিরিও অনেক সময় সৈন্যদের পথপ্রদর্শকের কাজ করে। এই সব লোক সৈনিকদের খুশি করে তাদের কাছ থেকে পুরনো ছেঁড়া পোশাক চেযে নিযে পরতে থাকে। আগের যুগে এই সব ভবঘুরে ধরনের কিছু লোক সব সৈন্যদলেব সঙ্গেই যাওযা-আসা করত। এদের কোনও দেশ বা জাতিগত কোনও পরিচয ছিল না। তারা ইতালি ভাষা মুখে বলত অথচ র্মান সৈন্যদের পিছু পিছু যেত। ফরাসী ভাষা মুখে বলে ইংরেজদের অনুসরণ করত। শুধু এই সব ভবঘুরেরা লুণ্ঠন করত না, অনেক বড বড় সেনাপতিও লুণ্ঠন সমর্থন করতেন। 'শত্রুদের যা পাও তা সব কেড়ে নাও, তা ভোগ কর।' এই ছিল তখনকার দিনের নীতি উপদেশ। সেনাপতি তুরেনকে তাঁর বাহিনীর লোকরা বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করত, কারণ তিনি তাদের লুণ্ঠন সমর্থন করেন। একটি সেনাবাহিনীতে কত জন সৈনিক এই লুণ্ঠনের কাজে জড়িত ছিল সেটা নির্ভর করত সেনাপতির কঠোরতা আর শৃঙ্খলাবিধানের ক্ষমতার উপর। সেনাপতি হোশে আর মার্কোর সেনাদলের মধ্যে এই ধরনের কোনও লুণ্ঠনকারী ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, ওয়েলিংটনের বাহিনীতেও এই ধরনের লোক খুব কমই ছিল।

সে যাই হোক, ১৮ই থেকে ২৮শে জুনের মধ্যে ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে বিজিত পক্ষের মৃতদেহগুলি লুণ্ঠিত হয়। ওয়েলিংটন এ ব্যাপারে কঠোর অনমনীয় এক মনোভাব পোষণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন কোনও লোককে যদি দেখা যায় কোনও মৃতদেহ

থেকে কিছু লুণ্ঠন করছে তাহলে তাকে দেখা মাত্র গুলি করা হবে। কিন্তু এত সব কড়াকড়ি সত্ত্বেও অফিসারদের চোখে ধুলো দিয়ে মৃত সৈনিকদের দেহ থেকে যা কিছু পাচ্ছিল তা লুট করে নিচ্ছিল একদল লোক। ওয়েলিংটন যেদিকে দাঁড়িয়েছিলেন তার উল্টো দিকে অন্যপ্রান্তে লুণ্ঠন চলছিল।

সেই সময় চাঁদের আলোয় প্লাবিত হয়ে ছিল সমস্ত রণভূমি।

রাত্রি প্রায় দুপুরের সময় ওহেনের রাস্তার কাছে একটি মানুষকে ভবঘুরের বেশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তাকে দেখে সে ফরাসী অথবা ইংরেজ, চাষী অথবা সৈনিক তার কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। মৃতদেহের গন্ধই যেন তাকে টেনে এনেছে সেখানে। তার গায়ে আস্তিনহীন একটা কোট। সে খুব সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছিল। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে প্রায়ই পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল লোকটা দিনের বেলার থেকে রাত্রিকালেই ঘোরাফেরা করে বেশি। তার সঙ্গে কোনও ব্যাগ ছিল না। কিন্তু তার কোটের পকেটগুলো বড় বড় ছিল। পায়ের তলায় এক একটা মৃতদেহ দেখে এক একবার থামছিল সে এবং নত হয়ে ঝুঁকে কি সব বিড বিড় করে আপন মনে বলছিল অনুচ্চ স্বরে। তার সতর্কিত অঙ্গভঙ্গি এবং রহস্যময় গতিবিধি দেখে তাকে নর্ম্যান রূপকথায় বর্ণিত ধ্বংসাবশেষের কাছে ঘুরে বেড়ানো প্রেতমূর্তির মতো মনে হচ্ছিল। সে যেন জলাশয় সন্নিহিত কোনও স্থানের রাতচোরা এক পাখি।

কেউ যদি সেই লোকটার দিকে তাকাত সেই সময় তাহলে সে তার থেকে আগে কিছু দূরে দেখতে পেত মঁ সেন্ট জাঁ আর ব্রেন লালিউদের মাঝখানে লিভেলে রোডের ধারে একটি বাড়ির পিছনের দিকে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটা দেখে মনে হচ্ছিল পেট ভরে না খেতে পেয়ে সেটা রোগা হয়ে গেছে। গাড়িটার ভিতর একগাদা বাক্স-পেটরা আর পুঁটলির উপর একটি নারীমূর্তি বসে ছিল। সেই গাড়িটা আর এই ভবঘুরের মধ্যে হয়ত কোনও সম্পর্ক ছিল।

আকাশে কোনও মেঘ ছিল না। রাত্রির আবহাওয়াটা ছিল খুবই শান্ত। চারপাশের যে সব গাছের ডালগুলো গুলিবর্ষণের ফলে ভেঙে গিয়ে গাছের সঙ্গে লেগে থেকে ঝুলছিল, সেই সব ডালাপালাগুলো শান্ত বাতাসে দুলছিল। দীর্ঘশ্বাসের মতো মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। এক মৃদু কম্পনে ঘাসগুলো শিহরিত হচ্ছিল।

ইংরেজ সৈন্যরা গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। দূর থেকে তাদের শব্দ আসছিল। হুগোমঁত আর লা হাই সেন্ত গাঁ দুটো তখনো জ্বলছিল। সেই আগুন থেকে একটা আলোর আভা বেরিয়ে ইংরেজদের শিবিরের আগুনের আভার সঙ্গে মিশে গিয়ে আলোর একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করেছিল।

খালের মতো সেই নিচু গ্রাম্য পথটাতে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার কথা বলা হয়েছে। সেই খাল ও রাস্তাটায় মানুষ আর ঘোড়ার মৃতদেহে ভরে ছিল। সে জায়গাটা একেবারে শান্ত। পথটার দু'দিকে দুটো পারের উপরের ফাঁকা জায়গাতেও মৃতদেহ পড়েছিল। তখনো রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল।

সেই নৈশ ভবঘুরে এই পথেই রক্ত মাখা পায়ে যেতে যেতে মৃতদেহগুলোর মাঝে কি খুঁজছিল। কোন অবর্ণনীয় দৃশ্যের সন্ধানে তার নীরব নিঃশব্দ অভিযান সে চালিয়ে যাচ্ছিল তা কে জানে!

লোকটা হঠাৎ এক জায়গায় থামল। কিছু দূরে মৃতদেহের স্তূপটা যেখানে সবচেয়ে উঁচু আর ঘন হয়ে উঠেছিল সেখানে একগাদা মানুষ আর ঘোড়ার মৃতদেহের মাঝখানে একটা মৃতদেহের একটা লম্বা হাত বেরিয়ে ছিল। চাঁদের আলোয় সেই হাতটার একটা আঙুলে একটা আংটি চকচক করছিল। ভবঘুরে লোকটি নতজানু হয়ে বসে আংটিটা আঙুল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার উঠে পড়ল। চারদিকে সাবধানে সে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই।

কিন্তু সে যেমনি সেখান থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল অমনি যে হাত থেকে সে আংটি চুরি করেছিল সেই হাতটা পিছন থেকে তার কোটের কোণটা টেনে ধরল। কোনও সৎ লোক হলে এই ঘটনায় ভয় পেয়ে যেত রীতিমতো, কিন্তু ভবঘুরে লোকটি হাসতে লাগল। আপন মনে বলল, ভূত, সৈন্য নয়।

যে হাতটা তার কোটটার কোণটা ধরেছিল সে হাতের মধ্যে কোনও জোর ছিল না। তাই লোকটি জোর করে চলে যেতেই হাতটা ঢলে পড়ল।

লোকটি তখন কি মনে হতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলল, তবে কি লোকটা এখনো বেঁচে আছে? দেখা যাক।

এই বলে ভবঘুরে যার হাতের আঙুল থেকে সে আংটিটা ছিনিয়ে নিয়েছিল তার অচেতন দেহটাকে মৃতদেহের স্তূপ থেকে বার করল। দেখে বোঝা যাচ্ছিল লোকটি ফরাসী বর্মধারী বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ অফিসার। তার মাথায় কোনও শিরস্ত্রাণ ছিল না। তরবারির আঘাতে তার গোটা মুখখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল। মুখের উপর রক্ত জমাট বেঁধে ছিল। কিন্তু তার দেহের কোনও হাড় ভাঙেনি। কারণ তার চারদিকে মৃতদেহ ছড়িয়ে থাকায় তার দেহটা পিষ্ট বা দলিত হয়নি কোনওভাবে। তার বুকের বর্মের উপর একটা ক্রস ঝোলানো ছিল। ভবঘুরেটি সেই ক্রসটা খুলে নিজের কোটের ভিতর পকেটে ভরে নিল। তার পকেট হাতড়ে একটা হাতঘড়ি আর একটা মানিব্যাগ বার করে নিয়ে নিল।

এমন সময় দেহটা নাড়াচাড়া হওয়ায় অচেতন মানুষটি চোখ খুলল। সে তখনো মরেনি। গুরুতর আহত হয়েছিল শুধু। সে চোখ খুলেই ভবঘুরেকে বলল, ধন্যবাদ।

ভবঘুরে তখন হঠাৎ শুনতে পেল দূরে টহলধারী সৈন্যরা আসছে। সে তাই চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। মুমূর্ষু অফিসারটি তাকে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, যুদ্ধে কারা জিতেছে?

ভবঘুরে বলল, ইংরেজরা।

অফিসার বলল, আমার পকেটে একটা হাতঘড়ি আর টাকার ব্যাগ পাবে।

ভবঘুরে তার আগেই সে দুটো নিয়ে নিয়েছে। তবু সে অফিসারকে দেখিয়ে তার পকেটগুলো হাতড়ে বলল, না নেই।

অফিসার তখন বলল, তাহলে কে চুরি করে নিয়েছে। আমি সেগুলো তোমাকেই দিতে চেয়েছিলাম।

ভবঘুরে বলল, কারা আসছে। আমি যাচ্ছি।

সে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে দিল।

অফিসার তাকে বলল, তুমি আমাকে মৃতের স্তূপ থেকে উদ্ধার করেছ। কে তুমি?

আমিও ফরাসী বাহিনীতেই যুদ্ধ করছিলাম তোমার মতোই।

কোন পদে ছিলে তুমি?

সার্জেন্ট।

তোমার নাম কি?

থেনার্দিয়ের।

অফিসার বলল, আমি তোমার নাম কখনো ভুলব না। আমার নামটাও তুমি মনে রাখবে। আমার নাম হলো পঁতমার্সি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

জাঁ ভলজাঁ আবার ধরা পড়ে।

এই বেদনাদায়ক ঘটনার খুঁটিনাটির মধ্যে যাব না আমরা। আমরা শুধু মন্ত্রিউল-সুর-মের-এ সংঘটিত ঘটনাবলীর মাস কয়েক পরে দুটি সংবাদপত্রে যে দুটি সংবাদ প্রকাশিত হয় তা তুলে ধরব। এ বিষয়ে প্রথম সংবাদটি প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে। এই সংবাদে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তা হলো এই:

পাশ দ্য ক্যালে জেলায় সম্প্রতি এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ম্যাদলেন নামে এক নবাগত ব্যক্তি এই অঞ্চলে এসে কয়েক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ এক নতুন পদ্ধতিতে এই অঞ্চলের এক পুরনো ও ক্ষয়িষ্ণু শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। এ শিল্প হলো জপের মালা আর কাঁচ তৈরির কারখানা। এই শিল্পের প্রকৃত উন্নতি সাধন করে সে প্রচুর ধন সঞ্চয় করে এবং এই আঞ্চলিক শিল্পের উন্নয়নে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা তাকে মেয়র নির্বাচিত করে। সম্প্রতি পুলিশ আবিষ্কার করে মঁসিয়ে ম্যাদলেন নামধারী এই লোকটি একজন জেল-ফেরৎ কয়েদী এবং ১৭৯৬ সালে চুরির অপরাধে সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার আসল নাম হলো জাঁ ভলজাঁ। সে পুনরায় কারারুদ্ধ হয়। এবার গ্রেপ্তার হবার আগে সে মঁসিয়ে লাফিত্তের ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ তোলবার চেষ্টা করে এবং এই টাকা সে ব্যবসায় বৈধভাবে অর্জন করে ঐ ব্যাঙ্কে জমা রাখে। তুলঁর কারাগারে দ্বিতীয়বার যাবার আগে জাঁ ভলজাঁ তার সব টাকা কোথায় রাখে তা জানা যায়নি।

ঐ একই দিনে জার্নাল দ্য প্যারিসে আর একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। এ বিবরণটি আরও বিস্তৃত। তাতে বলা হয়, সম্প্রতি জাঁ ভলজাঁ নামে একজন জেলমুক্ত আসামীর

ফৌজদারী আদালতে বিচার হয়। এই দুর্বৃত্ত পুলিশের প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়। সে তার নাম পাল্টে এই প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের ছোট্ট শহরটাতে এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং সেই শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়। ঘটনাক্রমে পুলিশ কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত উদ্যমের ফলে তার আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার এক রক্ষিতা ছিল। রক্ষিতাটি ঐ শহরেরই একটি মেয়ে এবং তার গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে যে আঘাত পায় সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে সে মারা যায়। পুলিশ গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও এই শয়তানটি তার হার্কিউলেসসুলভ শক্তির জোরে পুলিশ হাজত থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সে যখন তিন-চার দিন আগে প্যারিস থেকে মঁতফারমেলের দিকে যাচ্ছিল তখন পুলিশ তাকে আবার ধরে। মনে হয়, যে সময়টা সে বাইরে ছাড়া ছিল সেই সময়ের মধ্যে একটা বড় ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ছয়-সাত লক্ষ ফ্রাঁর মতো তার জমানো টাকা তুলে নেয়। মামলার বিবরণে দেখা যায় এই টাকাটা সে কোথায় রেখেছে তা সে নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না এবং পুলিশ তা আবিষ্কার করতে পারেনি। যাই হোক, জাঁ ভলজাঁ বিচারে আজ হতে আট বছর আগে বড় সড়কে এক সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয় এবং সে অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয় সে। এমন কতকগুলি নির্দোষ ছেলের উপর সে এই ডাকাতি করে যারা ঘুরে ঘুরে শহরেব নর্দমা ও নানা জঞ্জাল পরিষ্কার করে।

অপরাধী আসামী তার পক্ষে কোনও উকিল দেয়নি। অভিযোগকারী সরকারী অ্যাটর্নী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতার দ্বারা প্রমাণ করেন যে আসামী একজন পাকা চোর এবং সে মেদি অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাতদলের একজন সদস্য ছিল। এইভাবে সে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে সে কোনও আবেদন করেনি। কিন্তু রাজা তার করুণার বশবর্তী হয়ে মৃত্যুদণ্ড মুকুব করে তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দান করেন। জাঁ ভলজাঁকে তুলঁর কারাগারে পাঠানো হয়।

জেলখানায় যাওয়ার পর জাঁ ভলজাঁকে এক নতুন নম্বর দেওয়া হয়। এক নতুন কয়েদী হিসাবে তার নম্বর হয় ৯৪৩।

মঁসিয়ে ম্যাদলেন মন্ত্রিউল অঞ্চল থেকে যাওয়ার পর ঐ অঞ্চলের সমৃদ্ধিও চলে যায়। ধরা দেবার আগে জাঁ ভলজাঁ যা ভেবেছিল তাই ঘটে। তার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের কর্মোদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। একটা চালু কারখানা, একটা উন্নত শিল্প প্রতিষ্ঠান ভেঙে যায় ধীরে ধীরে। ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা ঘটে মাঝে মাঝে। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরও এমনি ঘটেছিল গ্রীসে। শুরু হয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নিম্নপদের সেনানায়করা রাজা হয়ে বসে। কারখা·'ব ফোরম্যানরা মালিক হয়ে বসে। শুরু হয় ঈর্ষান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ম্যাদলেনের বিরাট কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। তার গড়া বাড়িগুলি একে একে ধ্বংস হয়ে যায় এবং কারখানার শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অনেকে শহর ছেড়ে চলে যায়, অনেকে নতুন কাজ পায়। তখন শহরে বড় শিল্পের কাজ সব বন্ধ হয়ে যায়। ছোট ছোট শিল্পের কিছু কাজ অবশ্য হয়। কিন্তু

স্বার্থ আর লাভের দিকটাই দেখা হয়। নিঃস্বার্থ জনকল্যাণের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ম্যাদলেন সব কাজ-কারবারের কেন্দ্রস্থলে থেকে সব কিছু দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করত। সকলকে কাজে অনুপ্রাণিত করত। তার অবর্তমানে সব জায়গায় শুরু হয় শুধু দ্বন্দ্ব আর প্রতিযোগিতা, কে কাকে ঠকাতে পারে, কে কত বেশি স্বার্থ পূরণ করতে পারে, কে কার গলা কাটতে পারে সর্বত্র তারই চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যে শক্তি দিয়ে ম্যাদলেন তার বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্মকেন্দ্রগুলিকে বেঁধে রেখেছিল সে সুতো ছিঁড়ে যায়। ফলে সবকিছু শিথিল ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। উৎপাদনের মান নিম্নস্তরে নেমে যায়। ক্রেতারা আস্থা হারিয়ে ফেলে। অর্ডার আসা বন্ধ হয়ে যায়। আয় কমে যাওয়ায় শ্রমিকের বেতনের হার কমে যায়, অনেক শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। ফলে কোম্পানি দেউলে হয়ে পড়ে। গরীব বেকারদের কর্মসংস্থানের উপায় বিলুপ্ত হয়ে যায় একে একে।

ক্রমে সরকারও বুঝতে পারে কিছুর একটা অভাব ঘটেছে। আদালতের যে রায়ে ম্যাদলেন জাঁ ভলজাঁয় পরিণত হয় সেই রায় বার হবার চার বছরের মধ্যেই মন্ত্রিউল-সুর-মের অঞ্চলে কর আদায়ের খরচ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। মঁসিয়ে দ্য ভিলেলে ১৮২৭ সালে আইনসভায় এ বিষয়ে সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২

এ বিষয়ে আরও কিছু বলার আগে একটি বিশেষ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দান করা উচিত। ঘটনাটি মঁতফারমেলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সেই সময়ই ঘটে। এই ঘটনা থেকে সেকালের দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের মনোভাব সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

সেকালে মঁতফারমেল অঞ্চলে এক প্রাচীন কুসংস্কার ছিল। অন্যান্য আর পাঁচটা কুসংস্কারের মতোই যেমন অদ্ভুত তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত যা বিরল যা অদ্ভুত তার প্রতি আমাদের একটা শ্রদ্ধা আছে। মঁতফারমেলের কুসংস্কারটিও এই ধরনের এক কুসংস্কার।

ও অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশ্বাস করত শয়তান আবহমান কাল থেকে তার সঞ্চিত সব ধনসম্পদ কোনও এক গভীর বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। স্থানীয় অনেক গৃহবধূ বলত, মাঝে মাঝে এক-একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বনের প্রান্তদেশে কশাই বা গাড়িচালকের মতো দেখতে হাতে বোনা কাপড়ের তৈরি মোটা পোশাকপরা কালো রঙের একটা অদ্ভুতদর্শন লোককে দেখেছে তারা। সে লোকের মাথায় টুপির বদলে থাকত দুটো শিং।

তারা বলত সেই অস্বাভাবিক অপ্রাকৃত লোকটার সঙ্গে যাদেরই দেখা হত তাদেরই মৃত্যু ঘটত। কিন্তু তাকে যারা দেখতে পেত তাদের দেখা হওয়ার ধরন অনুসারে তিনভাবে মৃত্যু ঘটত। সেই অনুসারে মৃত্যুকালেরও তারতম্য দেখা যেত। লোকটার সঙ্গে যখনি কারো দেখা হত তখনি দেখা যেত সে হয় গরুর জন্য ঘাস কাটছে

অথবা একটা গর্ত খুঁড়ছে। যদি কোনও লোক তাকে ঘাস কাটতে দেখে তার কাছে যেত তাহলে তার বাড়ি ফেরার পর এক সপ্তার মধ্যে তার মৃত্যু ঘটত। আর যদি কোনও লোক সেই লোকটাকে মাটি খুঁড়তে দেখত এবং গর্ত খুঁড়ে গর্তটা বুজিয়ে সে চলে যাবার পর সেই গর্ত থেকে তার গুপ্তধন তুলে আনত তাহলে তার এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হত। আর যদি কোনও লোক তাকে দেখে আগ্রহ না দেখিয়ে চলে যেত অন্য দিকে অথবা ছুটে পালিয়ে যেত তাহলে তার এক বছরের মধ্যে মৃত্যু ঘটত।

ফলে ওখানকার জনগণ যখন দেখল লোকটাকে চোখে দেখলে মৃত্যু হবেই দু'দিন আগে বা পরে তখন তার গুপ্তধনটা নিয়ে মরাই ভাল। এই ভেবে অনেকেই সেই শয়তানটাকে চোখে দেখতে পেলেই সেই জায়গায় গিয়ে মাটি খুঁড়ে তার গুপ্তধন চুরি করে আনার চেষ্টা করত। সে ধন এক মাসের বেশি ভোগ করতে না পারলেও তারা তা ছাড়ত না।

জাঁ ভলজাঁ মন্ত্রিউল থেকে যখন গ্রেপ্তার হয় এবং গ্রেপ্তার হবার পর পুলিশ হাজত থেকে পালিয়ে এসে দিনকতক মুক্ত থাকে, তখন সে মঁতফারমেলে যায়। তখন দেখা যায় সেই গাঁয়ের বুলাত্রিউল নামে একজন লোক গাঁয়ের পাশে একটা বনের মাঝে বিশেষ এক আগ্রহের সঙ্গে যাওয়া-আসা করছে। বনের প্রতি তার এই অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখে অনেকের মনে সন্দেহ জাগে। লোকটা রাস্তা মেরামতের কাজ করত। সে একবার জেল খেটেছিল। পুলিশ তার উপর কড়া নজর রাখত। ফলে সে কোনও কাজকর্ম পেল না। স্থানীয় পৌরসভার কর্তৃপক্ষ তাই লোকটাকে দিয়ে কম বেতনে রাস্তা মেরামতের কাজ করাত।

স্থানীয় অধিবাসীরা বুলাত্রিউলকে ভাল চোখে দেখত না। সে ছিল অতিমাত্রায় বিনয়ী। তার এই বিনয়ের আতিশয্যটাও ছিল সন্দেহজনক। যে সব দস্যু অন্ধকারে পথে রাহাজানি করত তাদের সঙ্গে তার নাকি যোগাযোগ ছিল। সে অতিমাত্রায় মদ খেত।

কিছুদিন থেকে বুলাত্রিউল সকালের দিকে রাস্তা মেরামতের কাজ ফেলে রেখে বনের মাঝে গিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। এটা অনেকেরই চোখে পড়ল। সন্ধের দিকে এক-একদিন বনের গভীরে গিয়ে কোনও একফালি ফাঁকা জায়গায় মাটি গাঁইতি দিয়ে খুঁড়ে কিসের খোঁজ করত। গাঁয়ের যে সব মেয়েরা সেই সময় সেই বনপথ দিয়ে যাওয়া-আসা করত তারা তাকে দেখে শয়তান বীলজীবাব ভাবত। তারপর তারা দেখত বুলাত্রিউলকে। অবশ্য বুলাত্রিউলও কম ভয়াবহ নয়। বুলাত্রিউলও মেয়েদের দেখে ঘাবড়ে যেত। সে দমে গিয়ে তার কাজটাকে লুকোবার চেষ্টা করত। তার আচরণ ও কাজকর্ম সত্যিই রহস্যজনক ছিল গাঁয়ের লোকদের কাছে।

গাঁয়ের মেয়েরা বলাবলি করত, নিশ্চয় শয়তান এসে যে গুপ্তধন পুঁতে রেখে যায় তা বুলাত্রিউল দেখেছে। তাই সেই গুপ্তধনের খোঁজ করছে সে। দার্শনিক ভলতেয়ারের শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'বুলাত্রিউল শয়তানকে ধরবে না শয়তান বুলাত্রিউলকে ধরবে।'

একথা শুনে গাঁয়ের বৃদ্ধারা তাদের বুকের উপর ক্রসচিহ্ন আঁকল।

ক্রমে বুলাত্রিউল বনে ঘোরাঘুরি করা বা খোঁজাখুঁজি করার কাজটা বন্ধ করে তার দৈনন্দিন কাজে মন দেয়। ফলে ব্যাপারটার সেখানেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

তবু কিছু লোকের আগ্রহ রয়ে যায়। তারা ভাবতে থাকে বনের মাঝে শয়তানের কোনও অতিপ্রাকৃত গুপ্তধন না থাকলেও বুলাত্রিউলের এই কাজের পিছনে নিশ্চয় কোনও রহস্য আছে। আর সে রহস্যের কথা বুলাত্রিউল জানে। যে সব লোক এ ব্যাপারে দুর্মর আগ্রহ দেখায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখায় একজন স্কুলমাস্টার আর হোটেল মালিক থেনার্দিয়ের। এই থেনার্দিয়েরের সঙ্গে সবার ভাব ছিল এবং বুলাত্রিউলের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

থেনার্দিয়ের একদিন একজনকে বলল, ও তো জেলে গিয়েছিল। কে জেলে যাচ্ছে সেটা আমাদের জানার কথা নয়।

থেনার্দিয়ের আর একদিন সন্ধেবেলায় বলে, বুলাত্রিউল বনের মাঝে যে সব রহস্যময় কাজ করেছে সে বিষয়ে আইন নিশ্চয় অনুসন্ধান চালায় এবং দরকার হলে শারীরিক পীড়নের মাধ্যমে তার কাছ থেকে সব কথা বার করে নেবে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় যদি দলের পদ্ধতিমূলক পীড়ন চালানো হয় তাহলে বেশিক্ষণ কথাটা সে চেপে রাখতে পারবে না।

থেনার্দিয়ের বলল, ঠিক আছে, ওকে মদ খাইয়ে প্রশ্ন করে কথা বার করে নিতে হবে।

সুতরাং তারা এক ভোজসভার আয়োজন করল এবং বুলাত্রিউলকে খুব মদ খাওয়াল। বুলাত্রিউল খুব বেশি করে মদ খেল, খুব কথা বলল। প্রচুর মদ খেয়েও সে তার বিচারবুদ্ধি ঠিক রেখেছিল। অবশেষে সেই স্কুলমাস্টার আর থেনার্দিয়ের ব্যর্থ হয়ে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

একদিন খুব সকালে বুলাত্রিউল যখন বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তখন একটা ঝোপের মাঝে একটা গাঁইতি আর শাবল পড়ে থাকতে দেখে। তার মনে হলো সে যেন ঝোপের মধ্যে ওগুলো লুকিয়ে রেখে গেছে। তার মনে হলো জলবাহক পীয়ের সিক্স থোরস্ রেখে গেছে এগুলো। তখন সে আর এ নিয়ে বেশি কিছু ভাবল না।

কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলায় কি মনে হতে বুলাত্রিউল বনে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। সে ভাবল যে ঐগুলো রেখে গেছে সে নিশ্চয় সন্ধের সময় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করবে। কিছুক্ষণ থাকার পর সে দেখল একটা লোক রাস্তা থেকে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সে দেখল লোকটা এ অঞ্চলের বাসিন্দা নয়। তবে সে লোকটাকে চিনত। পরে থেনার্দিয়ের কথাটা ব্যাখ্যা করে বলে, বুলাত্রিউল লোকটাকে নিশ্চয় জেলে থাকাকালে দেখেছে। তার মানে লোকটাও একদিন জেলের কয়েদী ছিল। বুলাত্রিউল কিন্তু লোকটার নাম বলতে চায়নি এবং এ বিষয়ে বেশ একটা জেদ ধরেছিল। বুলাত্রিউল সেদিন সন্ধ্যায় দেখল লোকটা বাক্স বা সিন্দুকের মতো চারকোণা একটা জিনিস নিয়ে আসছে।

প্রথমে ব্যাপারটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল বুলাত্রিউল। বিস্ময়ের ঘোরে প্রথমে লোকটাকে অনুসরণ করার কথাটা মনেই হয়নি তার। যখন কথাটা মনে হলো তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। লোকটা বনের মধ্যে ঢুকে গেল। আকাশে চাঁদ ছিল। দু'-এক ঘন্টা পরে লোকটাকে আবার দেখা গেল। তখন তার হাতে গাঁইতি আর শাবল ছিল, কিন্তু চারকোণা বাক্সটা ছিল না। বুলাত্রিউল ভয়ে তার কাছে গেল না। লোকটা তার থেকে তিনগুণ বলবান। তার উপর তার হাতে একটা লোহার রড আর একটা গাঁইতি আছে। সে যদি বুঝতে পারে বুলাত্রিউল তাকে লক্ষ্য করছে তাহলে সম্ভবত তাকে খুন করত তাকে চিনে ফেলেছে বলে। তবে তার হাতে শাবল আর গাঁইতি দেখে সে বুঝতে পারে ব্যাপারটা কি। সে সকালে ঝোপের মাঝে ঐ শাবল আর গাঁইতি পড়ে থাকতে দেখে। সে বুঝতে পারে লোকটা নিশ্চয় কিছু পুঁতে রাখছিল। বাক্সটা ছোট বলে তাতে কোনও মৃতদেহ রাখা সম্ভব নয়, তাই নিশ্চয় কোনও টাকাকড়ি বা ধনরত্ন ছিল।

এই ভেবেই সে বনের মধ্যে যেখানেই কোনও ফাঁকা জায়গাতে কোনও খোঁড়া মাটি দেখতে পেয়েছে সেখানেই মাটিগুলো সরিয়ে দেখেছে তার ভিতরে কিছু আছে কি না। কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সে কিছুই পায়নি।

ক্রমে মঁতফারমেলের লোকেরা এ ব্যাপারে সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। গাঁয়ের সব মেয়েরা বলাবলি করতে থাকে, রাস্তা মেরামতকারী লোকটা শুধু শুধু হৈচৈ করে বসল। কিন্তু কিছুই পেল না। নিশ্চয় শয়তানটা এখনো আসা-যাওয়া করে।

৩

১৮২৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ওরিয়ন নামে একটা জাহাজ তুলঁর ডকে মেরামতের জন্য এসে লাগে। জাহাজটা ভূমধ্যসাগরের নৌ-বাহিনীর অন্তর্গত একটা জাহাজ। জাহাজটা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৮২৩ সালটা রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বছর এবং এই বছরেই ফ্রান্সের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ চলছিল। আসলে ফ্রান্সের জনগণের বিপ্লব ব্যর্থ করে সেখানকার রাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করতে চায়। ফরাসী বিপ্লবের যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ছিল, সে ভাবধারার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছিল রাজতন্ত্রী ফ্রান্স। তবে এ যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী স্পেনের বিপ্লবী সেনাদলের উপর যে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার পরিচয় দেয় তা ভয়াবহ বলেও ফরাসী সৈন্যদের তাতে সায় ছিল না। বরং তারা সামরিক শৃঙ্খলার খাতিরে অবস্থার চাপে বাধ্য হয়েই তা করে।

অথচ ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের সৈন্যদের এই শৃঙ্খলাবোধকেই ফরাসী জাতির স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি বলে ধরে নেয়। ফরাসী রাজতন্ত্র ভেবেছিল স্পেনের রাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার পর তারা নিজেদের দেশের রাজতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলবে।

এবার ওরিয়ন জাহাজটির কথায় আসা যাক।

ওরিয়ন নামে যুদ্ধজাহাজটি ছিল ফরাসী নৌবাহিনীর একটি অঙ্গ। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তার কাজ ছিল ভূমধ্যসাগরে পাহারা দিয়ে বেড়ানো। ঘটনাক্রমে ঝড়ের আঘাতে তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তুলঁর বন্দরে মেরামতের জন্য আসে। বন্দরে কোনও যুদ্ধজাহাজ এলেই তা স্থানীয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার উপর ওরিয়ন জাহাজটা ছিল আকারে বেশ বড়। যে কোনও বড় বস্তুর প্রতি জনগণের একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে।

যে কোনও যুদ্ধজাহাজ প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের জয় ঘোষণার এক যন্ত্রবিশেষ। সবচেয়ে হালকা জিনিস দিয়ে তৈরি সবচেয়ে ভারী এই জিনিসটি কঠিন তরল ও বায়বীয় এই তিন রকমের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সঙ্গে কখনো ভিন্ন ভিন্নভাবে, আবার কখনো বা একই সঙ্গে কাজ করে যেতে হয়। ওরিয়নের তলায় ছিল এগারটা লোহার চাকা যা দিয়ে সে সমুদ্রের জল কেটে যেত এবং বাতাস কাটাবার জন্য সাধারণ জাহাজের থেকে অনেক বেশিসংখ্যক পাখনা ছিল। এর মধ্যে ছিল একশো কুড়িটি কামান। সব কামান যখন গর্জন করত তখন তা বজ্রগর্জনকেও হার মানাত। এর লণ্ঠনের আলোগুলো অন্ধকার রাতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের রূপ ধারণ করত। ওরিয়নের কামানগুলো যখন গর্জন করত তখন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য, তার ধ্বংসাত্মক অস্তিত্বটা প্রকটিত করার জন্য উত্তাল তরঙ্গমালার সৃষ্টি করত। ওরিয়নের আর একটা শক্তি ছিল। সেটা হলো তার কম্পাস বা দিকনির্ণয় যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে সে এর আগে ক্রমাগত উত্তর দিকে যেতে থাকে। সুতরাং ওরিয়ন ছিল ঝড়ো হাওয়ার কাছে রজ্জুবদ্ধ বস্তুর দৃঢ়তায় অটল, জলের কাছে ছিল কাঠের মতো শক্ত, পাথরের কাছে লোহা বা তামা, অন্ধকারে আলো আর ঘনত্বের কাছে ছিল সূর্যের মতো।

একটি যুদ্ধজাহাজ কি কি উপাদানে গড়া এবং তাতে কি কি থাকে তা দেখতে হলে তুলঁ বন্দরের ডকইয়ার্ডে একবার যেতে হয়। সেখানে যখন জাহাজ তৈরির কাজ চলে তখন তা দেখতে হয়। একটি ইংরেজ যুদ্ধজাহাজের প্রধান মাস্তুলটা সমুদ্রের জলতল থেকে দুশো সত্তর ফুট উঁচু। একটা যুদ্ধজাহাজ তৈরি করতে এত কাঠ লাগে যে সে জাহাজকে একটা ভাসমান বন বলা যেতে পারে। আজকের যুগের যুদ্ধজাহাজ দাঁড় টেনে চালানো হয় না। তা চলে পঁচিশ হাজার অশ্বশক্তিসম্পন্ন এক বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের দ্বারা। তবু প্রাচীন যুগের জাহাজগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ক্রিস্টোফার কলম্বাস। তিনি যে জাহাজটি ব্যবহার করেন সে জাহাজটি সত্যিই এক আশ্চর্যের বস্তু। সে জাহাজ ছিল মানুষের এক অপূর্ব সৃষ্টি। যে সব বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার মধ্য দিয়ে তাকে পথ করে যেতে হত, সেই সব তরঙ্গমালার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তার ছিল অপরাজেয় অফুরন্ত শক্তি।

তথাপি একথা সত্য যে একটি বিরাট যুদ্ধজাহাজের উত্তুঙ্গ মাস্তুল বড়রকমের ঝড়ের কবলে পড়লে তা ছিন্নভিন্ন বৃক্ষশাখার মতো ভেঙেচুরে উড়ে যেতে পারে। তার

নোঙরের বড় বড় শিকলগুলোও মুচড়ে ভেঙে যেতে পারে, তার বড় বড় কামানগুলোর গর্জন প্রবল ঝড় ও সমুদ্রগর্জনের শব্দের মধ্যে ডুবে যেতে পারে : একটি যুদ্ধজাহাজের বিপুল ধ্বংসাত্মক শক্তির সমস্ত প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য বৃহত্তর এক প্রাকৃতিক শক্তির কাছে বাধ্য হয় হার মানতে। এতবড় শক্তি কিভাবে ব্যর্থ ও নস্যাৎ হয়ে যায় তা দেখাটা জনগণের কাছে এক ভীতিপ্রদ ব্যাপার। এই জন্যই সব সমুদ্র বন্দরের ডকে এমন কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে। তুলঁর ডকে ও জেটিতেও তাই প্রতিদিন দর্শকদের ভিড় জমছিল ওরিয়নকে দেখার জন্য।

ঝড়ের আঘাতে আহত হয়ে ওরিয়ন তাই তুলঁতে আসে তার রোগ সারাতে।

একদিন সকালবেলায় দর্শকদের এক জনতা এক দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

সেদিন সকালে একজন নাবিক যখন জাহাজের মাথায় পালগুলো সরাচ্ছিল তখন হঠাৎ সে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। হঠাৎ জনতার মধ্য থেকে এক ভীতিবিহ্বল চিৎকার উঠল। তারা দেখল নাবিকটি দড়ির উপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ পা ফস্‌কে পড়ে গিয়ে পাশের দড়িটা হাত দিয়ে ধরে ঝুলতে লাগল। তার তলায় ভয়ঙ্কর সমুদ্র যেন তাকে গ্রাস করার জন্য উদ্যত হয়ে আছে।

তার চাপে ভয়ঙ্করভাবে দুলতে লাগল দড়িটা। সে যতই উপরে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে ততই দড়িটা ভীষণভাবে দুলতে থাকে। স্থানীয় জেলেদের থেকে নেওয়া নাবিকদের কেউ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তার সাহায্যে এগিয়ে যেতে সাহস করল না। সে ক্রমশই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। হাত দুটো দড়ি থেকে একবার খসে পড়লেই সে সমুদ্রে পড়ে যাবে। তার মুখখানা ভয় আর বেদনায় বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। জনতা গভীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিল। তারা জানত কেউ তাকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসবে না। সুতরাং তারা শুধু সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল যখন সে দড়িটা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের জলে পড়ে যাবে। দড়িটা একটা বৃন্ত আর লোকটা যেন একটা পাকা ফল অথবা শুকনো পাতা।

হঠাৎ দেখা গেল একজন শ্রমিক কাজ করতে করতে এক বনবিড়ালের মতো জাহাজের উপরে উঠে গেল। তারপর যে দড়িটা ধরে সেই বিপন্ন নাবিকটি ঝুলছিল সে দড়িটার একটা প্রান্ত টেনে সেটা শক্ত করে বেঁধে দিল। তারপর সে ক্ষিপ্রগতিতে বিপন্ন নাবিকের কাছে তার কোমর ধরে তাকে দড়ি ছেড়ে দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে বলল। লোকটা তাই করলে সে এবার দড়িটা দু'হাত দিয়ে ধরে তার প্রান্তে গিয়ে জাহাজটাতে উঠে পড়ল। আর এক মুহূর্ত দেরি হলে বিপন্ন নাবিকটি দড়ি ছেড়ে পড়ে যেত।

উদ্ধারকারী লোকটি ছিল এক জেল-কয়েদী। তুলঁর জেলখানা থেকে কিছু কয়েদীকে সরকারী জাহাজ মেরামতের কাজের জন্য আনা হয়েছিল। তার মাথার টুপিটা হাওয়ায় উড়ে যাওয়ায় তার মাথার সাদা চুলগুলো দেখা যাচ্ছিল। লোকটি ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। সে বয়সে যুবক না হলেও তার গায়ে ছিল প্রচুর শক্তি। বিপন্ন নাবিককে কেউ উদ্ধার করতে না যাওয়ায় সে এগিয়ে যায়। সে তাদের অফিসারের

কাছে গিয়ে এজন্য অনুমতি চায় এবং অফিসার অনুমতি দিলে সে হাতুড়ির ঘা দিয়ে তার পায়ের শিকলটাকে ভেঙে ফেলে। অবশেষে সে বিপন্ন লোকটিকে ধরে নিয়ে জাহাজের উপরতলা থেকে নিচের তলায় ডেকের উপর নিয়ে আসে।

জনতা এক বিপুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ে। এমন কি জেলখানার কড়া অফিসারদের চোখেও জল আসে। ডকে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরা আনন্দে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল। জনতা একবাক্যে চিৎকার করে ধ্বনি দিতে লাগল, এই কয়েদীকে মুক্তি দিতে হবে।

উদ্ধারকারী কয়েদী লোকটি তখন তার কাজের জায়গায় আবার ফিরে যেতে লাগল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ধারের কাজ করতে গিয়ে তার হাত-পা অবসন্ন হয়ে পড়ে। সে মাতালের মতো টলছিল। একসময় তাড়াতাড়ি করে যেতে গিয়ে সে টলতে টলতে হঠাৎ জলে পড়ে যায়। জনতার দৃষ্টি এতক্ষণ তার উপর নিবদ্ধ ছিল। সে পড়ে যেতে জনতা আবার চিৎকার করে ওঠে।

যেখানে সে পড়ে গেল সে জায়গাটা বিপজ্জনক। কারণ আর একটা যুদ্ধজাহাজ ওরিয়নের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দুটো জাহাজের মাঝখানে সে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্ধারের জন্য নৌকো নামানো হলো জাহাজ থেকে। কিন্তু কয়েদী লোকটির কোনও দেখা পাওয়া গেল না। মনে হলো সে যেন দুটো জাহাজের মাঝখান দিয়ে ডুবে ডুবে দূর সমুদ্রে চলে গেছে।

রাত্রি পর্যন্ত ডুবন্ত লোকটির উদ্ধারের কাজ চলতে লাগল। কিন্তু তার দেহটিকে কোথাও দেখা গেল না।

পরদিন স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হলো।

১৭ই নভেম্বর, ১৮২৩ সাল। গতকাল এক কয়েদী ওরিয়ন জাহাজের উপর কাজ করার সময় একটি বিপন্ন নাবিককে উদ্ধার করার পর সমুদ্রের জলে পড়ে গিয়ে ডুবে যায়। তার দেহটিকে পাওয়া যায়নি। মনে হয় আর্থেনালের জেটির তলায় আবর্জনার মধ্যে তার দেহটা আটকে পড়েছে। লোকটির জেলখানার রেজিস্ট্রির নম্বর হলো ৯৪৩০ এবং তার নাম হলো জাঁ ভলজাঁ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

মঁতফারমেল শহরটা লিভরি আর শোলেসের মাঝখানে অবস্থিত। জায়গাটা হলো উর্ক নদী আর মার্নের মাঝখানে উঁচু মালভূমিটার দক্ষিণ দিকের ঢালটার উপরে। একালে মঁতফারমেল শহরটার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে আগের থেকে। অনেক বড বাড়ি গড়ে উঠেছে সেখানে আর রাস্তাঘাটেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সেকালে এ শহর ছিল একটা গণ্ডগাঁয়ের মতো। সেকালে ঘরবাড়ির সংখ্যা ছিল খুবই কম। গাঁয়ের ভিতরটা ছিল যেমন শান্ত তেমনি ফাঁকা ফাঁকা। পরে এই শান্ত সুন্দর গাঁটায় লিনেন ব্যবসায়ী আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা ভিড় জমাতে থাকে। গাঁটা খুবই

শান্ত এবং সুন্দর। একমাত্র সমস্যা ছিল জলের। কারণ গাঁটা ছিল এক উঁচু মালভূমির উপরে অবস্থিত।

জল আনতে হত অনেক দূর থেকে। গাঁয়ের যেদিকটা দিয়ে গ্যাগনির পথটা চলে গেছে সেই দিকের বাসিন্দারা গ্রামপ্রান্তের এক বনের ভিতর যে সব জলাশয় ছিল সেখান থেকে জল আনত। গাঁয়ের যে প্রান্ত দিয়ে শেলেনের রাস্তাটা চলে গেছে সেই প্রান্তের লোকেরা শেলেন রোডের ধারে পাহাড়ের ঢালের নিচু দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা ঝর্ণা থেকে জল আনত।

সুতরাং গাঁয়ের সাধারণ অধিবাসীদের জলের জন্য দারুণ কষ্ট পেতে হত। গাঁয়ের মধ্যে যারা ছিল অভিজাত শ্রেণীর লোক আর থেনার্দিয়েরদের মতো হোটেল মালিক তারা কিছু টাকা খরচ করে জল বয়ে আনাত। জলবাহকও এইভাবে জল বয়ে দিয়ে প্রায় আট স্যু করে রোজগার করত। শীতকালে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত আর গ্রীষ্মকালে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত জল বয়ে আনার কাজ করত। এরপর কারো কোনও দরকার পড়লে আর এক বিন্দুও জল কিনতে পাওয়া যেত না। তখন কারো জলের দরকার পড়লে তাকে নিজে আনতে যেতে হত।

এই জল আনার ব্যাপারটাই ছোট মেয়ে কসেত্তের কাছে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। ফাঁতিনের মেয়ে কসেত্তে পাঠকদের কাছে আগে থেকেই পরিচিত। পাঠকদের হয়ত মনে থাকতে পারে দুটো কারণে থেনার্দিয়েররা তাকে ছাড়তে চাইত না। তার একটা কারণ ছিল তার মার কাছ থেকে বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে টাকা আদায় করা এবং আর একটা কারণ ছিল তাকে দিয়ে ঘর-সংসারের কাজ করিয়ে নেওয়া। তাকে দিয়ে গাধার মতো খাটিয়ে নেওয়ার জন্য তার মা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেও তাকে ছেড়ে দেয়নি তারা। এক অবৈতনিক ভৃত্য হিসাবে থেনার্দিয়েরদের বাড়িতে এক বিশেষ প্রয়োজন ছিল তার। তাকেই জল আনতে পাঠাত থেনার্দিয়েররা। পাছে সন্ধের পর তাকে জল আনতে পাঠায় এজন্য কসেত্তে দিনের বেলাতেই বেশি করে জল বয়ে আনত। সন্ধের পর জল যাতে ফুরিয়ে না যায় এজন্য তার আগেই ব্যবস্থা করে রাখত। সন্ধের পর জল আনতে যেতে বড় ভয় করত তার।

১৮২৩ সালে মঁতফারমেলে খৃস্টোৎসবটা বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। সেবার প্রথম শীত পড়ার সময় বরফ পড়েনি। এই খৃস্টোৎসব উপলক্ষে সেবার প্যারিস থেকে এক ভবঘুরে নাট্যদল এসে মেয়রের অনুমতি নিয়ে মঁতফারমেলের মধ্যে থেনার্দিয়েরদের হোটেলটার কাছাকাছি এক জায়গায় পথের ধারে ডেরা পাতে। মেয়রের অনুমতি পেয়ে কতকগুলো ফেরিওয়ালাও দোকান পাতে সেখানে। ফলে জায়গাটা জমজমাট হয়ে ওঠে মানুষের ভিড়ে। থেনার্দিয়েরদের হোটেলেও খরিদ্দারের বেশ ভিড় হতে থাকে।

এই সময় সেই জায়গায় একদল লোক কোথা থেকে জীবজন্তুর খেলা দেখাতে আসে। তারা কোথা থেকে আসে তা কেউ জানে না। তাদের সঙ্গে যে সব জীবজন্তু ছিল তাদের মধ্যে ব্রাজিলের একটা লাল রঙের শকুনি ছিল। শকুনিটাকে দেখতে

ভয়ঙ্কর রকমের ছিল। ১৮৪৫ সালের আগে মিউজিয়মে এই ধরনের কোনও শকুনিকে রাখা হয়নি। নেপোলিয়নের অনেক নামকরা অফিসার শকুনিটাকে দেখতে আসে। দলের লোকেরা বলত, ঈশ্বর যেন তাদের সুবিধার জন্য শকুনির ডানাগুলোকে লাল করেছেন।

সেদিন খৃস্টোৎসব উপলক্ষে একদল লোক থেনার্দিয়েরদের হোটেলের একটা বড় ঘরে বসে মদ পান করছিল। লোকগুলো ছিল মালবাহী গাড়ির চালক। চার-পাঁচটা বাতির আলোয় ঘরটা আলোকিত ছিল। লোকগুলো মদ পান করতে করতে গোলমাল করছিল। থেনার্দিয়ের মদ পান করতে করতে তার খরিদ্দারদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিল আর মাদাম থেনার্দিয়ের আগুনের ধারে হাত সেঁকছিল।

রাজনীতির বিষয়টা স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ। তবে যুদ্ধ ছাড়াও আর একটা বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করছিল। এ বিষয়টা গাঁয়ের সবাই তখন আলোচনা করত।

ওরা বলাবলি করছিল, এবার নানতারে আর সুরেসনের চারপাশের অঞ্চলে খুব ভাল আঙুর হয়েছে। আঙুরগুলো পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। বসন্তকাল শুরু হতেই কাঁচা আঙুরগুলো পেড়ে গাঁজাতে দিতে হবে। তাহলে বেশ ভাল হালকা মদ হবে তার থেকে। আমাদের এখানকার মদের থেকে হালকা।

ময়দা কলের একজন শ্রমিক বলছিল, ময়দার বস্তার মধ্যে যদি বাজে ময়দা থাকে তাহলে আমরা কি করব বলত? যেমন গম হবে তেমনিই তো ময়দা হবে। বিশেষ করে ব্রেতোর গমগুলো খুব খারাপ। গমের সঙ্গে হাড়, এক ধরনের হলুদ ফুলওয়ালা চারাগাছ, শন, খেঁকশেয়ালের লেজ প্রভৃতি যত সব বাজে জিনিস মেশানো থাকে আর সেগুলো মেশিনে পেশাই হয়ে গুঁড়ো হয়ে যায়। ময়দা নিয়ে লোকে নানারকম অভিযোগ করে। কিন্তু কি করব বল?

জানালার ধারে বসে একজন দিনমজুর আর একজন চাষী দিনমজুরি নিয়ে আলোচনা করছিল। আগামী বসন্তকালে ফসল কাটার সময় মজুরি কি হবে তাই নিয়ে কথা বলছিল তারা। শ্রমিকটা চাষীকে বলছিল, তোমার ঘাস কাটা শক্ত মঁসিয়ে কারণ ও ঘাস এত নরম যে কাস্তে দিয়ে কাটতেই চায় না।

এইভাবে হোটেলের খাবার ঘরে নানা লোক যখন নানা রকমের আলোচনা করছিল তখন কসেত্তে রান্নাঘরের টেবিলের তলায় উনোনের পাশে একটা কাঠের উপর বসে ছিল। একটা কম্বলে গাটা জড়ানো ছিল তার। পায়ে ছিল কাঠের জুতো। কিন্তু কোনও মোজা ছিল না। সে থেনার্দিয়েরদের ছেলেমেয়েদের জন্য পশম দিয়ে মোজা বুনছিল। পাশের ঘরে দুটো বাচ্চা মেয়ের হাসি আর কথাবার্তার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। এই মেয়ে দুটি হলো এপোনিনে আর অ্যাজেলমা। দেওয়ালের উপর গাঁথা একটা পেরেক থেকে চামড়ার একটা ফিতে ঝুলছিল। মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে কোনখান থেকে একটা শিশুর কান্নার শব্দ আসছিল। এই শিশুটি থেনার্দিয়েরদের শেষ সন্তান—তিন বছর বয়স। সে খুব দুষ্টুমি করায় তার মা তাকে বাইরে ছেড়ে দিয়েছিল।

তাই সে কাঁদছিল। তার কান্না আর চিৎকারের শব্দ যখন হোটেলের খাবার ঘরে খুব বেশি করে আসতে লাগল তখন থেনার্দিয়ের তার স্ত্রীকে বলল, তোমার ছেলে চেঁচাচ্ছে, দেখ কি চায়।

কিন্তু তার স্ত্রী মাদাম থেনার্দিযের কথাটার কোনও গুরুত্ব না দিয়ে নিতান্ত সহজভাবে বলল, ছেলেটা বাজে।

মা না ধরায় ছেলেটা গোটা বাড়িময় কেঁদে বেড়াচ্ছিল।

২

এ পর্যন্ত থেনার্দিয়ের দম্পতির যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা তাদের একটি রেখাচিত্র মাত্র। এবার আমরা তার আরও কাছে যাব খুব ঘনিষ্ঠভাবে।

বর্তমানে হোটেল মালিক থেনার্দিযেরের বয়স ছিল পঞ্চাশ আর মাদাম থেনার্দিয়েরের বয়স ছিল চল্লিশ। মেয়েদের চল্লিশ বছর বয়স পঞ্চাশের সমান। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর বয়স প্রায় এক ছিল বলা যায়। পাঠকদের হয়ত স্মরণ থাকতে পারে মাদাম থেনার্দিয়েরের চেহারার একটা বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। তার চেহারাটা ছিল লম্বা, মাথায় ছিল ভাল চুলের রাশি, মুখখানা লাল, মাংসল দেহ, চওড়া কাঁধ, স্বাস্থ্যটা খুবই সুগঠিত। আবার সে ছিল তেমনি কর্মঠ। তাকে প্রায়ই খাটতে দেখে মনে হত সে যেন কোনও রূপকথার রাক্ষসীদের কথা মনে পড়িয়ে দেয় যারা তাদের মাথার চুল থেকে ঝোলানো দু'পাশে থান ইটগুলো নিয়ে মাটির উপর দিয়ে মার্চ করে যেত। সে সংসারের যাবতীয় কাজ সব করত—বিছানা পাতা, ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, রান্না করা—সব করত সে একা। সে-ই ছিল হোটেলের প্রাণ। সে ছিল এক আস্ত শয়তান আর কসেত্তে ছিল একমাত্র সহকারিণী। ঠিক যেন কোনও হাতির সেবাকার্যে নিযুক্ত এক নেংটি ইঁদুর। তার গলার স্বর শুনে শুধু জানালার কাঁচের সারসি আর ঘরের আসবাবপত্রগুলো কাঁপত না, হোটেলে যারা খেতে আসত সেই সব খরিদ্দারেরাও কাঁপত ভয়ে। তার মুখখানা ছিল ব্রণতে ভর্তি এবং তার মুখে সামান্য একটু দাড়ি ছিল। তাকে দেখে মনে হত যেন বাজারের এক মালবাহী কুলী নারীর বেশ ধারণ করে আছে। সে জোর গলায় বড়াই করে বলত সে একটা ঘুষি মেরে একটা নারকেল ফাটিয়ে দিতে পারে। সে পুলিশের মতো কথাবার্তা বলত, গারোয়ানের মতো মদ খেত এবং কসেত্তের সঙ্গে একজন জেলারের মতো ব্যবহার করত। একটা দাঁত মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে থাকত।

থেনার্দিয়ের সব সময় হাসত এবং সব খরিদ্দারের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করত। এমন কি যে ভিখারিকে সে বাড়ি থেকে কিছু না দিয়ে তাড়িয়ে দিত তাকেও মিষ্টি কথা বলত। বেজী আর উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকের মতো তার দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। আব্বে দেলাইনের ছবিতে ঠিক যেমনটি দেখা যায়। সে তার খরিদ্দারদের সঙ্গে মদ খেতে ভালবাসত। কিন্তু তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে তুলতে পারত না কখনো। সে একটা বড় পাইপে চুরুট খেত এবং একটা কালো জ্যাকেটের উপর ঢোলা আলখাল্লা

পরত। সে উচ্চশিক্ষার ভান করত এবং বলত সে বস্তুবাদী দর্শনের সমর্থক। তার যুক্তির সমর্থনে সে ভলতেয়ার, রেনল, পার্নে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা সেন্ট অগাস্টাইনের নাম করত। সে বলত তার একটা নিজস্ব মতবাদ আছে। এ ছাড়া সে ছিল কুটিল প্রকৃতির, এক সাধু শয়তান। এই ধরনের লোকের অবশ্য অভাব নেই। সে একদিন সেনাবিভাগে কাজ করেছিল বলে দাবি করত। সে বলত ওয়াটারলু যুদ্ধে সে একজন সার্জেন্ট হিসাবে শত্রুপক্ষের এক দুর্ধর্ষ সেনাদলের সঙ্গে একা লড়াই করে এবং ভয়ঙ্করভাবে আহত এক সেনাপতিকে সে রক্ষা করে। এজন্য তার হোটেলটাকে স্থানীয় লোকেরা ওয়াটারলুর সার্জেন্টের হোটেল বলে। সে ছিল একই সঙ্গে উদারনীতিবাদী, রক্ষণশীল এবং বোনাপার্টবাদী। যে সব উদারনীতিবাদী ও বোনাপার্টবাদী টেকসাসের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয় সেখানে সে কিছু দান করে। গাঁয়ের লোকেরা বলত পৌরোহিত্য কাজের জন্যও সে পড়াশুনো করে।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সে হল্যান্ডে হোটেল চালাবার জন্য প্রশিক্ষণ লাভ করে। আসলে সে ছিল বিভিন্ন জাতির রক্তগত সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক অদ্ভুত বর্ণসংকর। সে ছিল ক্ল্যাভার্সে ক্লেমিশ, প্যারিসে ফরাসী, ব্রাসেলস্-এ বেলজিয়ান। যখন যেখানে যেমন দরকার সেই ধরনের পোশাক পরত সে। আমরা জানি ওয়াটারলুতে কি ঘটেছিল। আমরা জানি সে যুদ্ধে তার ভূমিকা সম্বন্ধে আগে কিছু বাড়িয়ে বলেছে সে। জোয়ার-ভাঁটার বিপরীতমুখী তরঙ্গাভিঘাতে দোলায়মান কুণ্ঠাহীন দ্বিধাহীন এক জীবন সব সময় নিজের প্রধান স্বার্থপূরণের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ভেসে চলেছে। এইভাবে সে সাঁতার কেটে চলে। ১৮১৫ সালের জুন মাসে যুদ্ধকালে দারুণ গোলমালের সময় শিবিরে শিবিরে ঘুরে বেড়ায়। তার কিছুটা বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। আমরা জানি সে একটা চাকা দেওয়া ঘোড়ার গাড়িতে করে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। এক জায়গায় একটা জিনিস চুরি করে অন্য জায়গায় তা বিক্রি করেছে, সব সময় বিজেতা পক্ষের দলে ভেড়ার চেষ্টা করেছে। ওয়াটারলু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে কিছু স্বার্থ ও সুখ-সুবিধা ত্যাগ করে আবার সে মঁতফারমেলে এসে তার হোটেল ব্যবসায় মন দিয়েছে। তার মানে যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহগুলোর থেকে যে সব হাতঘড়ি, টাকা-পয়সা, সোনার আংটি প্রভৃতি সে চুরি করে তাতে সে খুব একটা বেশি লাভ করতে পারেনি। সে বেশি দূর এগোতে পারেনি।

প্রার্থনা সভায় যাবার সময় থেনার্দিয়েরের গতিভঙ্গির মধ্যে এক নীরস গাম্ভীর্য ও কঠোরতার ভাব ছিল। সে খুব মোলায়েমভাবে কথা বলতে পারত এবং একজন গণ্যমান্য পণ্ডিত লোকের খ্যাতি পেতে চাইত। কিন্তু গাঁয়ের স্কুলমাস্টার লক্ষ্য করেছিল তার হোটেলের বাসিন্দাদের যে সব বিল দিত সে সব বিলে তার হাতের লেখাটা ভাল হলেও তাতে বানান ভুল থাকত। সে ছিল ধূর্ত, চোর, কুঁড়ে এবং কুটিল। নারীভৃত্যদের প্রতি সে মোটেই উদাসীন ছিল না অর্থাৎ তাদের প্রতি তার একটা জারজ লালসা এবং আগ্রহ ছিল আর সেই কারণেই তার স্ত্রী হোটেলে কোনও নারীভৃত্য

রাখত না। মাদাম থেনার্দিয়ের ছিল এক ঈর্ষাপরায়ণ দানবী। তার হলদেমুখো, বেঁটে-খাটো স্বামীটার প্রতি তার আসক্তির অন্ত ছিল না। এর উপর থেনার্দিয়ের ছিল সদাসতর্ক, সংযতমনা, আত্মস্থ এক ঠাণ্ডামাথা জুয়োচোর যার গোটা মনটা ছিল ভাঁড়ামিতে গড়া।

তার মানে এই নয় যে সে কখনো কোনও অবস্থাতেই রাগত না। বরং মাঝে মাঝে সে তার স্ত্রীর মতোই রেগে যেত। অবশ্য তার রাগটা খুব কমই হত। সে তখন এক গোঁড়া মনুষ্যবিদ্বেষীর মতো সমগ্রভাবে মানবজাতির প্রতি ঘৃণার গরল উদ্গার করত। সে এমনই এক লোক ছিল যে তার নিজের দুর্ভাগ্যের বা হতাশার জন্য পরকে বা বাইরের কোনও না কোনও ঘটনাকে দায়ী করত। তার মুখ থেকে তখন ফেনা ভাঙত। চোখ দুটো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। তখন যারা তার সেই কোপের কবলে পড়ত তাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

এ ছাড়া থেনার্দিয়েরের পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল খুব উচ্চ ধরনের। অবস্থা অনুসারে সে কখনো নীরব, নিরুচ্চার অথবা কখনো বা বাচালের মতো সোচ্চার হয়ে উঠত। কাঁচের মধ্য দিয়ে দূর দিগন্তে তাকিয়ে থাকা নাবিকদের মতো তার দৃষ্টি ছিল শক্তিসম্পন্ন। এককথায় এক ধুবন্ধর রাজনীতিবিদ।

হোটেলে কোনও নতুন লোক এলে মাদাম থেনার্দিয়েরকেই হোটেলের আসল মালিক মনে করত। কিন্তু সেটা তার ভুল। আসলে মাদাম থেনার্দিয়ের কর্ত্রী ছিল না। থেনার্দিয়েরই ছিল একই সঙ্গে হোটেলের কর্তা এবং কর্ত্রী। মাদাম থেনার্দিয়ের খাটত ঠিক, সব পরিকল্পনা তার স্বামীই করত। সব কিছু নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করত সে। থেনার্দিয়েরের সামান্য একটা মুখের কথায় বা একটা অঙ্গুলি হেলনে সাক্ষাৎ দানবীর মতো এই মহিলাটি কেঁচো হয়ে যেত। অকুণ্ঠভাবে তার স্বামীর আদেশ মেনে চলত। কোনও কিছু না ভেবেই মাদাম থেনার্দিয়ের তার স্বামীকে তার থেকে সব দিক দিয়ে বড় বলে মেনে নিত। নীতিগত কোনও বিষয়ে তার স্বামীর মতের বিরুদ্ধে যেত না। প্রকাশ্যে কোনও বিষয়ে স্বামীর কোনও কথা বা কাজের প্রতিবাদ করত না। যদিও তাদের দু'জনের মিলনে বিশেষ কোনও সুফল ফলেনি, তবু স্বামীর প্রতি আত্মসমর্পণের ব্যাপারে এক তুরীয় ও বিরল মনের পরিচয় দেয় মাদাম থেনার্দিয়ের। স্বৈরাচারী স্বামীর সামান্য অঙ্গুলি হেলনের সঙ্গে সঙ্গে মেদবহুল সেই অচল অটল পাহাড় টলতে শুরু করে। যে বৈশ্বিক নিয়মের বশে আত্মার দ্বারা বস্তুজগৎ অনুশাসিত হয় মাদাম থেনার্দিয়েবের জীবনে সেই নিয়মেরই প্রকাশ ঘটে। অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের মধ্যে যেমন এক শান্ত সৌন্দর্য আছে তেমনি তার মধ্যে কতকগুলো কুৎসিত রূপও আছে। তবে একথা ঠিক যে থেনার্দিয়েরের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যার জন্য সে তার স্ত্রীর উপব আধিপত্য করতে পারত। এক-এক সময় তার মনে হত তার স্বামী এক প্রদীপের আলো, আবার এক-এক সময় তাকে শাঁখের করাত বলে মনে হত।

মাদাম থেনার্দিয়ের নামে এই ভয়ঙ্কর মহিলাটি তার ছেলেমেয়েদের ছাড়া আর কাউকে ভালবাসত না। একমাত্র স্বামী ছাড়া জগতে আর কাউকে ভয় করত না।

তবে তার মাতৃস্নেহ শুধু তার মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে স্নেহ তার পুত্রসন্তানের প্রতি প্রসারিত ছিল না। থেনার্দিয়েরের স্নেহ-ভালবাসা বলে কোনও কিছু ছিল না। জীবনে কি করে ধনী হওয়া যায় এটাই ছিল তার একমাত্র চিন্তা। অর্থের প্রতিই ছিল তার একমাত্র আগ্রহ।

কিন্তু এই অর্থোপার্জনের ব্যাপারে ব্যর্থ হয় সে। তার প্রভূত প্রতিভার উপযুক্ত কোনও কর্মসংস্থানের সুযোগ কোনওদিন আসেনি তার জীবনে। মঁতফারমেলের এই হোটেল ব্যবসায় সে নিজেকে ক্ষয় করে চলেছিল তিলে তিলে। সুইজারল্যান্ড অথবা পীরেনীজে থাকলে সে অনেক সম্পদ অর্জন করতে পারত। তবে হোটেল মালিককে কোথায় কখন ব্যবসার খাতিরে থাকতে হয় তা তো বলা যায় না। ১৮২৩ সালে বেশ কিছু ঋণ ছিল থেনার্দিয়েরের এবং যে সব ঋণ অবিলম্বে পরিশোধ কবা দরকার এমন ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫০০ ফ্রাঁ এবং এজন্য সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

থেনার্দিয়ের সব কিছু বুঝত এবং তার আতিথেয়তা ছিল। এছাড়া সে ভাল মাছ ধরতে পারত এবং লক্ষ্যভেদেও তার দক্ষতা ছিল। তার শান্তশীতল হাসিটা কিন্তু বড় কুটিল ছিল।

হোটেল চালানো সম্বন্ধে তার যে নীতি ছিল তা সে নিজেই প্রয়োগ করতে পারত না। তবু সে তার স্ত্রীর সুবিধার জন্য তাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিত। সে একবার চাপা গলায় প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে তার স্ত্রীকে বলেছিল, হোটেল মালিকের কাজ হলো সব নবাগতকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানানো, তাদের খাদ্য, আলো, জল, তাপ, বিছানার চাদর, নারীভৃত্য এবং সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। তাদের জন্য চেয়ার-টেবিল, আর্মচেয়ার, তোষক, আয়না প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। এমন কি তাদের কুকুরের খাওয়ার জন্য ভাল ব্যবস্থা করা।

তাদের দাম্পত্য সম্পর্কটা কিন্তু মোটেই মধুর ছিল না। সে সম্পর্ক ছিল চাতুর্য আর রাগারাগিতে ভরা। থেনার্দিয়ের শুধু টাকার হিসাব করত, লাভের অঙ্ক কষত, নানারকম ফন্দি আঁটত আর কলা-কৌশল উদ্ভাবন করত। মাদাম থেনার্দিয়ের কিন্তু পাওনাদারদের তাগাদা সম্বন্ধে কোনও কিছু ভাবত না। অতীত বা ভবিষ্যতের পানে তাকাত না। সে শুধু একান্তভাবে বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।

তাদের দু'জনেব মাঝখানে ছিল কসেত্তে। দু'দিক থেকেই চাপ পেত সে। তার একদিকে ছিল এক জাঁতাকল আর একদিকে ছিল সাঁড়াশি। বেশির ভাগ আঘাত আর পীড়নটা আসত মাদাম থেনার্দিয়েরের কাছ থেকে। পোশাক-আশাকের দিক থেকে কষ্ট দিত থেনার্দিয়ের নিজে। তার জন্যই তাকে খালি পায়ে চলতে হত। সে সব সময় উপর-নিচে করত, ঘর মোছা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, পালিশ করা, ভারী বোঝা বহন করা প্রভৃতি অনেক কাজ তাকে নিদারুণ পরিশ্রম সহকারে করতে হত। কর্তা বা গিন্নী কারো কাছ থেকেই সে কোনও দয়ামায়া পেত না। সারা হোটেল ছিল যেন এক বিরাট ফাঁদ। সে ফাঁদের মধ্যে যে দাসত্বের জীবন সে যাপন করত সে জীবন ছিল নির্মম পীড়ন আর যন্ত্রণায় ভরা। এক বিরাট মাকড়সার বিষাক্ত জালের মধ্যে অসহায় এক মাছির মতো ছটফট করত সে।

মুখে কোনও কথা বলত না মেয়েটা। কিন্তু মুখে কোনও কথা না বললেও তার শিশুমনের মধ্যে মানুষের জগৎ সম্বন্ধে কি চিন্তার উদয় হত, কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিত তা কে জানে?

৩

চারজন নতুন পথিক এল হোটেলে। তার জন্য দুশ্চিন্তার শেষ নেই কসেত্তের মনে। তার বয়স মাত্র আট হলেও তার জীবনটা ছিল এমনই দুঃখকষ্টের যে সে যেন এক বৃদ্ধার চোখ দিয়ে জগৎটাকে দেখত। একবার মাদাম থেনার্দিয়েরের একটা ঘুষিতে তাব মুখে দাগ হয়ে যায়। তাতে মাদাম থেনার্দিয়েরই বলে, দেখ দেখ, ওব মুখটা কেমন দেখাচ্ছে।

টেবিলের তলায় বসে সে ভাবছিল। ভাবছিল অন্ধকার রাত্রি। অথচ হোটেলে আসা নতুন লোকদের জন্য জল চাই। তাদের খাবার ঘরে জলের যে সব জগ আর কলসী আছে সেগুলো ভরতে হবে। অবশ্য এটাও ঠিক যে হোটেলে যারা আসে তারা বেশি জল খায না। জলের বদলে মদের পিপাসাই তাদের বেশি। তবু ভয়ে কাঁপতে লাগল কসেত্তে। মাদাম থেনার্দিযের স্টোভের উপব চাপানো রান্নার একটা পাত্র তুলে কি দেখল। তারপর একপাত্র জল আনতে গেল। গিযে দেখল জল নেই। সে বলল, জল ফুরিযে গেছে।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। কসেত্তে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বসে রইল।

থেনার্দিযের আধগ্লাস জল দেখে বলল, ভাবনার কিছু নেই, এতেই হবে।

কসেত্তে তার কাজ করতে গেল। কিন্তু তার বুকেব ভিতরটা লাফাচ্ছিল। কখন সকাল হবে তার জন্য মুহূর্ত গণনা করতে লাগল সে। মাঝে মাঝে হোটেলেব এক একজন বাসিন্দা জানালা দিযে মুখ বাড়িয়ে বলতে লাগল, রাস্তাটা পীচের মতো অন্ধকার। লণ্ঠন না নিযে কোনও বিডাল ছাড়া কেউ বাইরে যেতে পারবে না।

একজন ফেরিওযালা তার একটা ঘোড়া নিযে সে রাতে হোটেলে এসে উঠেছিল। সে তার ঘর থেকে বাইরে এসে রাগের সঙ্গে বলল, আমাব ঘোড়াকে জল দেওযা হয়নি।

মাদাম থেনার্দিযের বলল, নিশ্চয় হয়েছে।

ফেরিওযালা লোকটা বলল, আমি বলছি হয়নি মাদাম।

টেবিলের তলা থেকে কসেত্তে বেরিয়ে এসে বলল, আমি নিজে এক বালতি জল তাকে খাইয়েছি।

কথাটা সত্যি নয, কসেত্তে মিথ্যা কথা বলছিল।

ফেরিওয়ালা বলল, হাঁটুর বয়সী মেয়েটা বড় মানুষের মতো মিথ্যা কথা বলছে। আমি বলছি মেয়ে, তাকে জল খাওয়ানো হয়নি।

কসেত্তে অশ্রুতপ্রায নিচু গলায় বলল, যাই হোক, তাকে জল দেওয়া হয়েছে।

ফেরিওয়ালা বলল, ঠিক আছে, ঘোড়াকে জল দেওয়া তো আর একটা বিরাট ব্যাপার নয়। এখন জল এনে দাও না কেন?

কসেত্তে আবার টেবিলের তলায় ঢুকে গেল।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, তা অবশ্য ঠিক। ঘোড়াকে জল দেওয়া না হলে অবশ্যই তা এখন দিতে হবে। মেয়েটা গেল কোথায়?

টেবিলের তলায় উঁকি মেরে দেখে মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, বেরিয়ে আয়।

কসেত্তে আবার বেরিয়ে এল।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, মিস অপদার্থ, এবার জল এনে ঘোড়াটাকে দাও।

ক্ষীণ স্বরে কসেত্তে বলল, মাদাম, জল তো নেই।

তার উত্তরে মাদাম থেনার্দিয়ের রাস্তার দিকে সদর দরজাটা খুলে বলল, তাহলে জল নিয়ে এস

অগত্যা কসেত্তে রান্নাঘর হতে একটা খালি বালতি বার করে নিয়ে এল। বালতিটা তার থেকে বড়। তার ভিতর তার বসা চলে। মাদাম থেনার্দিয়ের একটা কাঠের হাতা নিয়ে রান্নায় মন দিল। রান্নার কাজ করতে করতে বলল, ঝর্ণায় প্রচুর জল আছে। এতে আর কষ্ট কি আছে। এটা তো আগেই করে রাখতে পারতে।

মাদাম থেনার্দিয়ের একটা ড্রয়ার থেকে পনের স্যুর একটা মুদ্রা বার করে এনে কসেত্তের হাতে দিয়ে বলল, এই নাও মিস ব্যাড্, এটা রেখে দাও। এটা দিয়ে রুটির দোকান থেকে একটা বড় পাঁউরুটি কিনে আনবে।

কসেত্তে মুদ্রাটা হাত পেতে নিয়ে তার জামার পকেটের ভিতর রেখে দিল। তারপর বালতিটা নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল।

মাদাম থেনার্দিয়ের চিৎকার করে উঠল, চলে যাও।

কসেত্তে বেরিয়ে গেল। সদর দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

৪

মেলা উপলক্ষে পথের ধারে খোলা জায়গায় যে দোকানগুলো পাতা হয়েছিল সেগুলো চার্চ থেকে শুরু করে থেনার্দিয়েরের হোটেল পর্যন্ত চলে এসেছিল। মধ্য রাত্রিতে চার্চে উপাসনা করতে যাবার সময় গাঁয়ের লোকেরা যাতে সবকিছু দেখতে পায় তার জন্য দোকানগুলোতে উজ্জ্বল আলো জ্বেলে রাখা হয়েছিল। মঁতফারমেলের স্কুলমাস্টার তখন হোটেলে বসে ছিল। সে দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে তখন বলেছিল 'অসংখ্য কাগজের লণ্ঠনগুলো চমৎকার দেখাচ্ছে।' কিন্তু আকাশে কোনও তারা ছিল না।

হোটেলের উল্টো দিকে যে দোকানটা ছিল তাতে চকচকে কাঁচ আর অনেক ধাতুর জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছিল। দোকানটার সামনে দু'ফুট উঁচু একটা পুতুল সাজানো ছিল। পুতুলটার পরনে ছিল গোলাপী রঙের ক্রেপের জামা, মাথায় সত্যিকারের কালো চুল আর এলোমেলো চোখ। পুতুলটা সারাদিন দোকানের সামনে ঐভাবে সাজানো ছিল। সারাদিন অসংখ্য শিশুর লুব্ধ দৃষ্টির শরে বিদ্ধ হয়েছে পুতুলটা। কিন্তু মঁতফারমেলের গাঁয়ের কোনও শিশুর মায়ের পুতুলটা কেনার মতো পয়সা জোটেনি। এপোনিনে

আর অ্যাজেলমা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পুতুলটার পানে সারাদিন কতবার তাকিয়ে থেকেছে। কসেত্তেও মাঝে মাঝে দেখেছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কসেত্তে একবার সেই দোকানটার সামনে দিয়ে যাবার লোভ সামলাতে পারল না। ধীর পায়ে দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে লাগল। তার মনে হলো দোকানটা যেন সামান্য একটা দোকান নয়, সুসজ্জিত এক প্রাসাদ এবং পুতুলটা যেন সামান্য একটা পুতুল নয়, যেন জীবন্ত এক মেয়ে। পুতুলটাকে এত কাছে থেকে এর আগে দেখেনি সে। দেখতে দেখতে তাব মনে হচ্ছিল এক অফুরন্ত সুখ-সম্পদ আর ঐশ্বর্যের আলোকবন্যা অপরিসীম দুঃখকষ্ট আর অবজ্ঞার অন্ধকারভরা তার ছোট্ট জগৎটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কোথায় যেন। কসেত্তে এবার তার থেকে পুতুলটার আসল দূরত্ব বা ব্যবধানটা কতখানি তা বোঝার চেষ্টা করছিল। সে বেশ বুঝতে পারল, রানী বা রাজকন্যা না হলে কেউ কখনো এত সুন্দর একটা জিনিসকে কিনতে পারে না। ঘরে রাখতে পাবে না। পুতুলের পোশাক, চুল আর চোখ দেখে সে ভাবল পুতুলটা কত সুখী! দোকান থেকে একটা পাও নড়াতে পারছিল না সে। সে সরে যেতে পারছিল না। যতই সে দেখছিল ততই সে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। সব মিলিয়ে গোটা দোকানটা স্বর্গ মনে হচ্ছিল, বড় পুতুলটা আর তার পিছনে আরও যে সব পুতুল ছিল সেগুলো যেন এক একটা দেবদূত আর দোকানের মধ্যে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে থাকা দোকানমালিক স্বর্গের পরম পিতা।

সে এতখানি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে জল আনতে যাবার কথাটা সে ভুলেই গিয়েছিল। সহসা এক কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল তার।

মাদাম থেনার্দিয়ের একবার হোটেল থেকে রাস্তার পানে তাকাতেই কসেত্তেকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে, হতভাগী পাজী বদমা. কোথাকাব, এ ... যাসনি? ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস? দাঁড়া, যাচ্ছি, গিয়ে মজা দেখাচ্ছি।

বালতিটা হাতে নিয়ে ছুটতে লাগল কসেত্তে।

৫

থেনার্দিয়েরদেব হোটেলটা ছিল গাঁয়ের এক প্রান্তে চার্চের কাছাকাছি। কসেত্তেকে তাই শেলেসের দিকে বনভূমির ভিতর যে ঝর্ণা ছিল সেখানে যেতে হবে জল আনতে। চার্চের কাছাকাছি দোকানগুলোর আলোয় কিছুটা পথ আলোকি. হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছু পরেই সে আলো আর দেখতে পেল না। সে অন্ধকারে পড়ে গেল। সে বালতিটা দিয়ে ঝনঝন শব্দ করে তার স্নাযবিক ভ..টাকে কাটাবার চেষ্টা করল। যতক্ষণ পথের দু'ধারে দু'-একটা বাড়ি ছিল এবং সেই সব বাড়ি থেকে দু'-একটা বাতির আলোর ছটা বেরিয়ে আসছিল ততক্ষণ বেশ সাহসের সঙ্গে পথ চলতে লাগল কসেত্তে। পথে তখন কোনও লোক চলাচল ছিল না। একজন মহিলা এক জায়গায় তাকে বলল, 'মেয়েটা এ সময় যাচ্ছে কোথায়? ভূত নাকি?' তারপর তাকে চিনতে

পারল। কিন্তু যখন পথের ধারে আর একটা বাড়িও দেখা গেল না, একটা আলোর ছটাও কোথাও থেকে বেরিয়ে এল না তখন আপনা থেকেই থেমে গেল কসেত্তের পা দুটো। তার চলার গতি কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল। দোকানের আলোগুলো ছেড়ে অন্ধকারে আসতে তার কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু শহরের বাড়িগুলো ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে পড়ে পথ চলা অসম্ভব হয়ে উঠল তার পক্ষে। বালতিটা নামিয়ে রেখে সে ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেমেয়েদের মতো মাথা চুলকাতে লাগল। শহর ছাড়িয়ে সে অন্ধকার ঘেরা মাঠের মধ্যে এসে পড়েছে। সেই অন্ধকারে মাঠে শুধু জীবজন্তু নয়, প্রেতাত্মাও থাকতে পারে। সে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে জীবজন্তুর ডাক শুনতে লাগল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন ভূত-প্রেতগুলোর আকার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। সে আবার বালতিটা তুলে নিল। ভয়ের আঘাতে মনে মনে শক্ত হয়ে উঠল সে। সে ভাবল, ঠিক আছে, আমি গিয়ে বলব ঝর্ণায় আর জল নেই। আমি ফিরে যাব।

এই ভেবে ফিরে যাবার জন্য গাঁয়ের দিকে পা বাড়াল।

কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর আবার থেমে দাঁড়াল। আবার মাথা চুলকাতে লাগল। এবার সে বাড়ির গিন্নীর কথা ভাবতে লাগল। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল বিশালবপু সেই ভয়ঙ্কর মহিলার চোখ থেকে আগুন ঝরছে। তার চারদিকে হতাশভাবে একবার তাকাল সে। কিন্তু কি করবে? তার সামনে এক ভয়ঙ্কর মূর্তি আর তার পিছনে জমাট অন্ধকার আর বনভূমি। দুটোর মধ্যে মাদাম থেনার্দিয়ের সত্যিকারের বেশি ভয়ের বস্তু।

আবার সে ঝর্ণায় যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। এবার সে চোখ বন্ধ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল, কোনও শব্দ শুনল না। মাঝে মাঝে শুধু নিঃশ্বাস নেবার জন্য থামতে লাগল এবং আবার ছুটতে লাগল। অবশেষে সে বনেব মধ্যে এসে পড়ল।

তার চারদিকের গাছগুলোর পাতা নড়ার সমবেত শব্দে দারুণ ভয় হচ্ছিল তার। তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে যেমন ভাল করে কিছু দেখতে পারছিল না তেমনি সে কিছু ভাবতেও পারছিল না। তার মতো ছোট্ট একটি প্রাণীর উপর চারদিক থেকে রাত্রির অনন্ত অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছিল।

বনের প্রান্ত থেকে ঝর্ণা কয়েক মিনিটের পথ। কসেত্তে সে পথ চেনে, কারণ দিনের বেলায় সে পথে যাওয়া-আসা করে। সুতরাং অভ্যাসবশে সে ঠিক পথেই চলতে লাগল। ভয়ে ডাইনে-বাঁয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে চলতে চলতে অবশেষে সে ঝর্ণার ধারে এসে পড়ল। সে ভাবছিল কোনওদিকে তাকালেই ভৌতিক কিছু না কিছু দেখতে পাবে।

ঝর্ণা মানে দু' ফুট গভীর এক স্রোতোধারা, স্রোতের বেগে মাটি আর পাথরের মধ্যে পথ করে বয়ে চলেছে। তার দু'পাশে শ্যাওলা আর আগাছা গজিয়ে উঠেছে। তার দু' পাশের গায়ে অনেক পাথরখণ্ড জমে আছে। ঝর্ণাটা কোনও শব্দ না করে শান্তভাবে বয়ে চলেছিল।

একবারও না থেমে অন্ধকারে কসেত্তে ছোট ওকগাছটার খোঁজ করতে লাগল।

গাছটা ঝর্ণার ধার ঘেঁষে গজিয়ে উঠেছে। দিনের বেলায় কসেত্তে যখন বালতি করে ঝর্ণার উপর ঝুঁকে জল ভরে তখন হাত বাড়িয়ে ওকগাছের একটা ডাল ধরে থাকে। এবারও সে গাছটার ডাল ধরে জল ভরে বালতিটা ঘাসের উপর নামিয়ে রাখল। স্নায়বিক উদ্বেগের জন্য গায়ে যেন তার দ্বিগুণ শক্তি এসে গিয়েছিল। কিন্তু কোনও দিকে তার খেয়াল না থাকায় তার জামার পকেট থেকে পনের স্যুর মুদ্রাটা পড়ে গেল জলের মধ্যে।

জল তোলার পর কসেত্তে দেখল সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেক চেষ্টা করে বালতিতে জল ভরতে গিয়ে তার হাত-পা যেন অবশ হযে যায়। সে এমনি ফিরে যেতে পারলে খুশি হত। কিন্তু তখন তার পথ চলার শক্তি ছিল না। তাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে। সে তাই ঘাসের উপর বসে পডল।

চোখ দুটো বন্ধ করে আবার সে চোখ খুলল, কেন তা সে জানে না। মনে হলো কে যেন বাধ্য করছে তাকে চোখ খুলতে। আকাশটা ধোঁয়াব মতো কালো মেঘে ভরা ছিল। মনে হলো অন্ধকার রাত্রি যেন কালো মেঘের মুখোশ পরে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

আনমনে আকাশটার পানে তাকাতে দেখল দিগন্তে একটা নক্ষত্র বয়েছে। কিন্তু সে জানত না ওটা বৃহস্পতি গ্রহ। দিগন্তে ঘন কুয়াশার মাঝে কিসের একটা লাল আভা দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কার যেন বিশাল এক রক্তাক্ত ক্ষত।

বনভূমির উপর দিযে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইছিল। গাছে কোনও পাতা নডছিল না। কোথাও কোনও আলো দেখা যাচ্ছিল না। গ্রীষ্মকালে নৈশ বনভূমির অন্ধকারের মাঝে জোনাকির উডন্ত আলোর কিছু খেলা দেখা যায়। কিন্তু এখন সে আলোর কোনও খেলা দেখতে পাওয়া গেল না কোথাও। কসেত্তের মাথার উপর বড় বড় গাছের ডালগুলো এক অতিপ্রাকৃত ভয়াবহতায বিবাট জন্তুর মতো হাত বাড়িয়ে যেন শিকার ধরার চেষ্টা করছে। বনভূমির লম্বা লম্বা ঘাসগুলো বাতাসে মাছের মতো কিলবিল করছিল। অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গাগুলোতে আকারহীন ঝোপগুলো অন্ধকারে তালগোল পাকিয়ে চাপ বেঁধে ছিল। শুকনো খড বা তৃণখণ্ডগুলো বাতাসে উড়ে বেডাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তারা যেন কার ভয়ে উড়ে পালাচ্ছে। শৈত্য আর বিষাদ যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছিল চারদিকে।

অন্ধকার সব সময় চাপ সৃষ্টি করে মানুষের আত্মার উপর। মানুষ তাই আলো চায। দিনের আলো থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হলেই তার অন্তরাত্মাটা সংকুচিত হয়ে পডে কেমন যেন। মানুষের চোখ যখন অন্ধকার দেখে তখন অন্তর ভয় দেখে। এইজন্য গ্রহণের সময়, নিশীথ রাত্রিতে, বজ্র-বিদ্যুতের সময় সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষের অন্তরেও শঙ্কা জাগে। রাত্রিকালে কোনও বনভূমির উপর দিয়ে একা যেতে গিয়ে কোনও মানুষ ভয়ে না কেঁপে পারে না। শুধু ছায়া আর গাছ এই দুটো জিনিসের মধ্যেই রাত্রির রহস্যকুটিল বাস্তবতা প্রকটিত হয়ে ওঠে আমাদের সামনে। অকল্পনীয় অনেক ছায়ামূর্তি অশরীরী অথচ দৃশ্যমান অবস্থায় আমাদের হাতের কাছে এসে পড়ে

যেন। ঘুমন্ত ফুলের স্বপ্নের মতো সেই সব অবয়বহীন ছায়ামূর্তিগুলো বাতাসে ভাসতে থাকে। আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে সেগুলো এসে পড়লেও আমরা ধরতে পারি না তাদের। দূরে তাকালেই মনে হয় যত সব বন্য প্রাণী বা ভৌতিক মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে নিঃশ্বাস আমরা নিই, সে নিঃশ্বাস এক অন্ধকার শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পিছনে তাকাতে ইচ্ছা হয়, অথচ তাকালেই ভয় হয়। শূন্যগর্ভ রাত্রির সমাধিগহ্বরসুলভ মৃত্যুশীতল নীরবতার অনন্ত অবকাশে অনেক অদৃশ্য মূর্তির উপস্থিতির আভাস পাওয়া যায়। নগ্ন বৃক্ষকাণ্ড, ঝুলন্ত শাখাপ্রশাখা, লম্বা লম্বা কম্পিত ঘাস—এই সব কিছুই ভয়াবহ হয়ে ওঠে রাত্রিকালে এবং এগুলোর সামনে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে না পেয়ে অসহায়বোধ করি আমরা। কোনও মানুষই রাত্রিকালে বনের মধ্যে নির্ভীক, অকম্পিত ও অবিচলিত অবস্থায় যাবার মতো সাহস খুঁজে পায় না। এ ক্ষেত্রে কোনও মানুষই কোনও কাজ করতে পারে না। যেন তার গোটা আত্মাটাই অন্ধকারে মিশে গেছে, একক হয়ে গেছে। কোনও শিশুর কাছে এই সব প্রাকৃত বস্তু অতিপ্রাকৃতের রূপ ধরে অনির্বচনীয়ভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। রাত্রিকালে অন্ধকার বনে শিশুদের আত্মারা এক ভয়ার্ত বেদনায় বৃক্ষশাখাগুলোকে ধরে যেন ঝুলতে থাকে।

কি ঘটছে, কোথায় কি আছে তা জানতে পারল না কসেত্তে। প্রকৃতি জগতের বিশালতার মধ্যে সে যেন হারিয়ে গেল। ভয়ের থেকে বেশি ভয়ঙ্কর এক চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। সে কাঁপতে লাগল। সেই মুহূর্তে যে ভয়ে তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায় তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার কেবলি মনে হতে লাগল কাল হয়ত এই সময়ে আবার তাকে আসতে হবে এখানে।

মনের এই অবস্থাটা কাটাবার জন্য সহজাত প্রবৃত্তির বশে সে এক, দুই করে দশ পর্যন্ত জোরে গুণতে লাগল। এইভাবে সে তার বর্তমান বাস্তব অবস্থাটার প্রতি সচেতন হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল যে হাত দুটো জলভরা বালতিটা ধরে আছে সে হাত দুটো ঠাণ্ডায় হিম হয়ে গেছে। সে উঠে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। এবার স্বাভাবিক এক ভয়ের তাড়নায় সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন ও মাঠ পার হয়ে শহরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। বালতিটা নিয়ে যেতে কষ্ট হলেও তার মালিকপত্নীর ভয়ে সেটাকে সে ছেড়ে যেতে পারবে না। সে তাই জলভরা বালতিটা দু'হাত দিয়ে তুলে নিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

কিন্তু বালতিটা এত ভারী যে সে কয়েক পা গিয়েই দাঁড়াল। হাঁটতে পারছিল না। বালতিটা নামিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাঁপ ছেড়ে আবার বালতি নিয়ে যেতে লাগল। বালতির ভারে সে কুঁজো হয়ে পথ হাঁটছিল। এবার সে অনেকটা গেল। বালতির ঠাণ্ডা হাতলটা তার হাতটাকে যেন কামড় দিচ্ছিল। কিন্তু একটানা সে বেশিদূর যেতে পারছিল না। মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছিল তাকে। আর বালতিটা নামাতে হচ্ছিল। যতবার বালতিটা নামাচ্ছিল কিছুটা করে জল পড়ে যাচ্ছিল। কোনও এক শীতের রাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে আট বছরের একটি শীতার্ত মেয়ের জীবনে এই সব ঘটেছিল। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া এ ঘটনার আর কোনও সাক্ষী ছিল না। আর একজন

সাক্ষী হয়ত ছিল—সে হলো তার মার আত্মা। সংসারে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা হয়ত মৃতদেরও জাগিয়ে তোলে কবর থেকে।

সে হাঁপাচ্ছিল। চাপা গলায় ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সে। মাদাম থেনার্দিয়েরকে সে এতখানি ভয় করত যে তার কাছ থেকে সে তখন অনেক দূরে থাকলেও জোরে কাঁদতে পারছিল না।

কোনওখানে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াচ্ছিল না এবং যাওয়ার জন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করছিল। তবু তার চলার গতিটা বাড়াতে পারছিল না। সে হিসেব করে দেখল এইভাবে সে যেতে থাকলে মাদাম থেনার্দিয়ের তাকে বাড়ি গেলেই মারবে। এই দুশ্চিন্তাটা রাত্রির অন্ধকার আর নির্জনতাজনিত মনোকষ্টকে আরও বাড়িয়ে দিল। তার সব শক্তি যেন ফুরিয়ে এসেছিল। আর সে ভারী বালতিটাকে বইতে পারছিল না। তবু সে তখনো বনটা পার হয়ে মাঠে পড়তে পারেনি। তার অতি পরিচিত একটা বাদাম গাছের তলায় এসে আবার থামল সে। কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করল। কিন্তু হতাশা আর দুঃসহ কষ্টের তীব্রতায় আপন মনে সে চিৎকার করে বলতে লাগল হে ঈশ্বর, দয়া করে আমাকে সাহায্য করো।

সহসা সে দেখল কোথা হতে একটা লম্বা হাত এসে বালতিটা তুলে নিল। কসেত্তে অন্ধকারের মধ্যেই দেখতে পেল তার পাশে এক জীবন্ত মানুষের মূর্তি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা তার পিছু পিছু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসছিল এতক্ষণ। সে তা দেখতে পায়নি বা তার কোনও শব্দ শুনতে পায়নি। এবার সে তার পাশ থেকে কোনও কথা না বলে বালতিটা তুলে নিল।

অবস্থা যত ভয়ঙ্করই হোক, অনেক সময় একজন মানুষের প্রবৃত্তি অন্য কোনও মানুষের শুভেচ্ছার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে না। কসেত্তে বযসে ছোট হলেও অচেনা মানুষটিকে ভয় করল না তখন কিছুমাত্র।

৬

১৮২৩ সালের সেই খৃস্টোৎসবের দিন প্যারিসের বুলভার্দ দ্য হোপিতাল নামে এক নির্জন এলাকায় কিছুক্ষণ ধরে ঘুরে বেডাচ্ছিল একটা লোক। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে একটা থাকার জায়গা খুঁজছে এবং ফবুর্গ সেন্ট মার্কোর প্রান্তভাগে ছোটখাটো একটা কুঁড়ে মতো ঘর চায়। পরে আমরা দেখতে পাব সে ঐ অঞ্চলে একটা ঘর ভাড়া করে।

তার পোশাক-আশাক আর চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছিল লোকটা এক সম্ভ্রান্ত ভিখারি। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে রুচিশীল পরিচ্ছন্নতাবোধের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল তার মধ্যে। অভাব আর আত্মমর্যাদাবোধের এই মিশ্রণের জন্য এই ধরনের ভিখারিদের প্রতি মানুষের দ্বিগুণ শ্রদ্ধা জাগে। তার মাথায় ছিল একটা পুরনো লম্বা টুপি, মোটা হলদে সুতোয় বোনা একটা লম্বা কোট যার পকেটগুলো ছিল চারকোণা বর্গক্ষেত্রের মতো এবং সে কোটটার দু' এক জায়গায় ছেঁড়া ছিল। তার পায়ে ছিল কালো পশমের

মোজা আর বিশ্রী ধরনের এক জুতো। বহিরাগত বাস্তুত্যাগী এই লোকটি হয়ত একদিন এক স্কুলমাস্টার ছিল এবং ভাল বংশের লোক। তার মাথার সাদা চুল, রেখাঙ্কিত কপাল, ম্লান বিস্ফারিত ঠোঁট, বার্ধক্যপীড়িত অবসন্ন মুখমণ্ডল থেকে বোঝা যায় তার বয়স ষাটের উপর। কিন্তু তার ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ এবং চলার ভঙ্গিমা দেখে মনে হয় তার বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে না। তার কপালের রেখাগুলোকে কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলে লোকটাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হবে। তার উপরকার ঠোঁটটার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত ভাঁজ ছিল যা দেখে মনে হবে সে একই সঙ্গে কঠোর এবং নম্র প্রকৃতির। তার দৃষ্টির মধ্যে ছিল এক শান্ত বিষাদ। তার বাঁ হাতে ছিল কাপড়ে-বাঁধা একটা পুঁটলি আর ডান হাতে ছিল গাছের ডাল কেটে বানানো একটা লাঠি। লাঠিটার গাঁটগুলো ঘষে মেজে পালিশ করা হয়েছে। তার মাথায় লাল মোম দিয়ে তৈরি গোলমতো একটা হাতল করা হয়েছিল। লাঠিটাতে ভয়ের কিছু নেই, সেটাকে বেড়াবার ছড়িও বলা যেতে পারে।

বিশেষ করে শীতকালে ঐ এলাকার পথ দিয়ে বেশি লোক চলাচল করে না। লোকটিও মানুষদের এড়িয়ে যেতে চাইছিল যদিও তার এই মনোভাবটা সে প্রকাশ করতে চাইছিল না।

সেকালে রাজা অষ্টাদশ লুই রোজ ঐ পথ দিয়ে গাড়িতে করে একবার করে বেড়াতে যেতেন। ও অঞ্চলটা তাঁর প্রিয় জায়গা ছিল। রোজ বেলা ঠিক দুটোর সময় বুলভার্দ দ্য হোপিতাল এলাকার পথে রাজার গাড়িটাকে তাঁর অনুচরবৃন্দসহ দেখা যেত। গাড়িটা নিয়মিত ঠিক বাঁধা সময়ের মধ্যে যেত বলে স্থানীয় লোকেরা গাড়িটা দেখেই বলে দিত দুটো বাজে; রাজা তুলিয়েরে ফিরে যাচ্ছেন।

অনেকে রাজাকে দেখার জন্য রাস্তার ধারে ছুটে যেত। অনেকে আবার রাস্তার ধারে সারবন্দীভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। মোট কথা, রাজার যাওয়া-আসায় স্থানীয় জনগণ বেশ আগ্রহ দেখাত। রাজা দুর্বল এবং নিজে হাঁটতে পারতেন না বলে গাড়িটাকে জোরে চালাতে বলতেন। হাঁটতে পারতেন না বলেই হয়ত ছুটতে চাইতেন। এ যেন চলৎ-শক্তিহীন পঙ্গুর বিদ্যুৎগতিতে চলার শখ। আকস্মিক কোনও গোলমালের সম্মুখীন হবার জন্য রাজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে অনুচর ও প্রহরীরা উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে থাকত। বিরাট গাড়িটার দ্রুতগতি চাকাগুলো পাথরের উপর ঘর্ষণ করতে করতে ছুটে যেত। এত জোরে যেত যে রাজার মুখটা শুধু একবার কোনওরকমে দেখা যেত। গাড়িটার ডান দিকের কোণে সাদা শাটিনের আসনের উপর বসে থাকা রাজার বড় গম্ভীর মুখখানা শুধু দেখা যেত। তাঁর চোখের দৃষ্টিটা ছিল গর্বিত ও তীক্ষ্ণ। তাঁর বুর্জোয়া ফ্রককোটের উপর দুটো বড় পালক ছিল আর ছিল সোনালী পশম। সেন্ট লুই-এর ক্রস, লিজিয়ন দ্য অনার হলি স্পিরিটের রুপোর মেডেল, এবং তাঁর মোটা পেটটার উপর নীলরঙের একটা চওড়া স্কার্ফ জড়ানো ছিল। প্যারিস শহরের বাইরে গেলেই তিনি তাঁর সাদা পালকওয়ালা টুপিটা মাথা থেকে খুলে হাঁটুর উপর রেখে দিতেন। আবার শহরে ঢোকার সময় সেটা মাথায় পরতেন। এক হিমশীতল

ঔদাসিন্যের সঙ্গে জনগণের পানে তাকাতেন তিনি এবং জনগণও অনুরূপ ঔদাসিন্য দেখিয়ে তার প্রতিদান দিত। একদিন সেন্ট মার্কো দিয়ে রাজা যখন গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন তখন দর্শকদের মধ্যে একজন মন্তব্য করে, তাহলে ঐ মোটা লোকটাই হচ্ছে দেশের সরকার।

এ অঞ্চলের লোকদের কাছে রাজার এই সমালোচনার ব্যাপারটা এক সহজ সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু হলুদ কোটপরা লোকটি এ অঞ্চলের বাসিন্দা নয় বলে সে এ সবের কিছুই জানত না। যখন বেলা দুটোর সময় সালপেত্রিয়ের ঘুরে বুলভার্দ অঞ্চলে এসে পড়ল রাজার গাড়িটা তখন জমকালো পোশাকপরা রাজার প্রহরীদের দেখে লোকটি চমকে উঠল এবং কিছুটা শঙ্কিত হয়েও পড়ল। ফুটপাথের উপর তখন সে ছাড়া আর কেউ ছিল না। সে তাড়াতাড়ি একটা বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল। কিন্তু রাজার গাড়ির মধ্যে থেকে প্রহরীদের প্রধান তাকে দেখে ফেলল এবং বলল, ঐ কুৎসিত ভবঘুরেটা কে দেখ তো। সে কর্তব্যরত একজন পুলিশ অফিসারকে তার অনুসরণ করতে বলল। কিন্তু ভবঘুরে লোকটি পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ায় পুলিশ অফিসার দেখতে পেল না তাকে। তখন গোধূলির ছায়া ঘন হয়ে উঠছিল।

ভবঘুরে লোকটি পিছন ফিরে যখন দেখল তাকে আর কেউ অনুসরণ করছে না তখন সে আবার তার চলার পথে ফিরে এল। তখন সওয়া চারটে বাজে এবং তখনি প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছিল। পোর্তে সেন্ট থিয়েটারে একটা নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। থিয়েটারের বাইরে আলোকিত বিজ্ঞাপন দেখে সে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর একটা গলিপথ ধরে একটা হোটেলে চলে গেল। সেখান থেকে সাড়ে চারটের সময় একটা গাড়ি ছাড়বে। যাত্রীরা তখন গাড়িতে উঠছিল।

ভবঘুরে গারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, একটা আসন খালি আছে?

গারোযান বলল, আমার পাশেই একটা আসন আছে।

আমি ওটা নেব।

তাহলে উঠে পড়।

কিন্তু ভবঘুরের পোশক-আশাক দেখে সে ভাড়াটা আগেই চাইল। সে বলল, তুমি কি সোজা ল্যাগনে যাবে?

ভবঘুরে বলল, হ্যাঁ।

এই বলে সে পুরো ভাড়াটা মিটিয়ে দিল।

অবশেষে গাড়িটা ছেড়ে দিল। গারোয়ান ভবঘুরের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ভবঘুরে 'হ্যাঁ', 'না,' ছাড়া আর কিছুই বলছিল না। গারোয়ান ঘোড়া চালানোর কাজে মন দিল।

গাড়িটা স্তর্নে এবং নেলি সুর মার্নের মধ্য দিয়ে সন্ধে ছ'টার সময় শেলেসে পৌঁছল। এইখানে গাড়ি থামিয়ে ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হলো। একটা হোটেলের সামনে গাড়িটা দাঁড়াল।

ভবঘুরে বলল, আমি এইখানে নেমে যাব।

এই বলে সে তার পুঁটলি আর লাঠিটা হাতে করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে হোটেলে উঠল না।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর গাড়িটা আবার চলতে লাগল। কিন্তু ভবঘুরে আর এল না। তাকে বড় রাস্তার কোথাও দেখা গেল না। গারোয়ান গাড়ির যাত্রীদের বলল, লোকটাকে আমি চিনি না। ও এ অঞ্চলের লোক নয়। লোকটাকে দেখে মনে হয় একটা পয়সাও নেই, কিন্তু ওর কাছে টাকা আছে এবং ভাড়াটা আগেই দিয়ে দিল এককথায়। ল্যাগনের ভাড়া দেয়, কিন্তু শেলেসেই নেমে পড়ে। অন্ধকার রাত, সব বাড়ির দরজা বন্ধ, অথচ ও হোটেলেও ওঠেনি। লোকটা কোথায় গেল কে জানে?

লোকটা একটা অন্ধকার রাস্তা দিয়ে শহরের চার্চের কাছে গিয়ে মঁতফারমেলে যাবার জন্য একটা পথ ধরল। মনে হলো সে এখানকার পথঘাট চেনে। সে খুব দ্রুত পথ হাঁটছিল। কার পায়ের শব্দ শুনে সে পিছন ফিবে তাকাল। খালের মধ্যে বসে পড়ল। তারপর পায়ের শব্দটা মিলিয়ে গেলে সে আবার বেরিযে এল। তার ভয়ের অবশ্য কিছু ছিল না, কারণ ডিসেম্বরের শীতের রাতে মেঘ আর আকাশ মাথায় করে কোনও লোক পথে বার হয় না কখনো। এইখান থেকেই পাহাড়ের ঢালটা শুরু। কিন্তু ভবঘুরে পথিক মঁতফারমেলের পথে না গিয়ে মাঠ পার হয়ে বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

বনের মধ্যে গিয়ে সে তার চলার গতিটা কমিয়ে দিল। মনে হলো গাছপালার মধ্য দিয়ে সে একটা চেনা পথ খুঁজছে। এবার মনে হলো সে যেন পথটা হারিয়ে ফেলেছে। অবশেষে কিছুটা. পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। সেখানে কতকগুলো সাদা পাথর জড়ো করা ছিল। সেখানে অন্ধকারে সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ধরে কি ভাবল। কয়েক হাত দূরে একটা বড গাছ ছিল। গাছটা লতায় জড়ানো ছিল। সে ঝুঁকে পড়ে সেই লতার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি গুণতে লাগল। কাছেই একটা বাদাম গাছ ছিল। সেই বাদাম গাছ আর পাথরখণ্ডগুলোর মাঝখানের মাটিটা সম্প্রতি খোঁড়া হয়েছে কিনা তা দেখতে লাগল। তারপর সে বনের মধ্যে চলে গেল।

এই লোকটির সঙ্গেই বনের প্রান্তে দেখা হয়ে যায় কসেত্তের।

বনের মধ্যে দিয়ে মঁতফারমেলের পথে যেতে যেতে সে দেখে তার সামনে অদূরে একটি ছায়ামূর্তি একটা ভারী বোঝার সঙ্গে যেন লড়াই করছে। বোঝাটা বইতে তার কষ্ট হচ্ছিল বলে সে বারবার নামাচ্ছিল সেটা। কাছে গিয়ে সে দেখল ছায়ামূর্তি একটি ছোট মেয়ে। তার হাতে একটা বড় জলভরা বালতি ছিল। লোকটি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নীরবে সেই বালতিটা নিজের হাতে তুলে নিল।

৭

কসেত্তে কোনও ভয় পেল না।

লোকটি চাপা অথচ গম্ভীর গলায় বলল, শোন মেয়ে, এত ভারী জিনিসটা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তোমার পক্ষে।

কসেত্তে বলল, হ্যাঁ মঁসিয়ে।

আমাকে দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

কসেত্তে তাই করল। তারা দু'জনে পাশাপাশি পথ চলতে লাগল।

লোকটি বলল, সত্যিই এটা খুব ভারী। তোমার বয়স কত?

আমার বয়স আট মঁসিয়ে।

কতদূর থেকে এটা বয়ে নিয়ে আসছ?

ঝর্ণা থেকে এখান পর্যন্ত।

কত দূর যেতে হবে তোমাকে?

এখান থেকে পনের মিনিটের পথ।

লোকটি কিছুক্ষণ কি ভাবার পর বলল, তোমার মা নেই?

কসেত্তে বলল, আমি জানি না। অন্য সব ছেলেমেয়েদের মা আছে, আমার মা নেই। হয়ত কখনো ছিল না।

লোকটি হঠাৎ থেমে গেল। বালতিটা নামিযে রেখে সে কসেত্তের কাঁধের উপব হাত রেখে তার চেহারাটা ভাল করে দেখার চেষ্টা কবল। তাব শীর্ণ ম্লান মুখখানাব কিছুটা দেখতে পেল।

অবশেষে সে বলল, তোমার নাম কি?

কসেত্তে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভযঙ্করভাবে চমকে উঠল লোকটি। কিছুক্ষণ কসেত্তের মুখপানে তাকিযে রইল। তারপর তার কাঁধ থেকে হাত দুটো সবিযে নিযে বালতিটা তুলে নিযে পথ হাঁটতে লাগল আবার।

যেতে যেতে সে বলল, কোথায় থাক তুমি?

মঁতফারমেলে। তুমি জায়গাটা চেন কি?

আমরা কি সেখানেই যাচ্ছি?

হ্যাঁ মঁসিযে।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইল। পরে লোকটি বলল, কিন্তু এত বাতে কে তোমাকে জল আনতে পাঠিয়েছে?

মাদাম থেনার্দিযের।

কাঁপা কাঁপা গলায় লোকটি বলল, সে কি করে?

সে আমার মালিকপত্নী। সে একটা হোটেল চালায়।

হোটেল? আমি তো আজ রাতে সেখানেই থাকব। আমাকে পথটা দেখিয়ে দেবে?

কসেত্তে বলল, আমিও তো সেখানেই যাচ্ছি।

লোকটি বালতিটা নিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি পথ হাঁটছিল। কিন্তু হাতে বোঝা না থাকায় কসেত্তে তার সঙ্গে সমানে হেঁটে চলেছিল। তার আর ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল

না। মাঝে মাঝে এক আশ্চর্য বিশ্বাস আর আশ্বাসের সঙ্গে লোকটির মুখপানে তাকাচ্ছিল। কেউ তাকে কখনো ঈশ্বরের কথা বলেনি, তাকে কখনো প্রার্থনা করতে শেখায়নি। কিন্তু সেইমুহূর্তে এক অদ্ভুত আশা আর সুখের অনুভূতি তাকে ঈশ্বরের কথা ভাবিয়ে তুলল।

মিনিটকতক পরে লোকটি বলল, মাদাম থেনার্দিয়েরের কোনও চাকর নেই?

না মঁসিয়ে।

তুমি তাহলে একাই সব কাজ করো?

হ্যাঁ। তবে তার দুটো মেয়ে আছে।

কি নাম তাদের? কত বড়?

তাদের নাম এপোনিনে আর অ্যাজেলমা। তারা দু'জনেই ছোট।

তারা কি করে?

তাদের অনেক পুতুল আর পয়সা রাখার বাক্স আছে। তারা অনেক কিছু কিনতে পারে এবং ইচ্ছামতো খেলা করতে পারে।

সারাদিন?

হ্যাঁ।

আর তুমি কি করো?

আমি কাজ করি।

সারাদিন?

হ্যাঁ, সারাদিন।

জলভরা চোখ তুলে কসেত্তে তাকাল লোকটির পানে। কিন্তু অন্ধকারে সে জল দেখা গেল না।

কসেত্তে আবার বলল, হ্যাঁ মঁসিয়ে। তবে সব কাজ শেষ করে তারা বললে অল্প কিছুক্ষণ আমি খেলা করি।

কি খেলা করো তুমি?

যা হোক কিছু। আমার কোনও খেলনা নেই। এপোনিনে আর অ্যাজেলমা তাদের পুতুল নিয়ে আমার সঙ্গে খেলে না। আমি একাই খেলি। আমার একটা ছোট ভোঁতা ছুরি আছে।

কিন্তু সেটা দিয়ে কিছু কাটা যায় না।

হ্যাঁ যায়। লেটুস পাতা আর মাছিদের মাথা।

এবার ওরা গাঁয়ের মধ্যে এসে পড়ল। কসেত্তে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। লোকটি চুপ করে ছিল। কিন্তু চার্চের কাছে আলোঝলমল সারবন্দী দোকানগুলো দেখে বলল, এখানে কি কোনও খেলা হচ্ছে?

না, খৃস্টের জন্মদিনের জন্য উৎসব চলছে।

হোটেলের কাছটায় এসে কসেত্তে লোকটির গায়ে হাত দিয়ে বলল, দয়া করে শোন মঁসিয়ে।

লোকটি বলল, আমরা তো এসে গেছি।

হ্যাঁ। এবার বালতিটা দয়া করে দাও আমার হাতে।

কিন্তু কেন ?

কেউ বালতিটা বয়ে এনেছে দেখলে ওরা আমাকে মারবে।

লোকটি বালতিটা কসেত্তের হাতে দিয়ে দিল। এরপর ওরা দু'জনেই হোটেলের মধ্যে ঢুকল।

৮

হোটেলের দরজার সামনে আসার সময় রাস্তার ওপারের সেই দোকানটায় সাজানো বড় পুতুলটাকে একবার দেখতে ভোলেনি কসেত্তে। কিন্তু তার পনের স্যুর কথাটা ভুলে গিয়েছিল। সেটা কখন পড়ে গেছে সে বিষয়ে কোনও খেয়াল নেই তার। রুটির দোকান থেকে পাঁউরুটি কেনাও হয়নি।

দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। মাদাম থেনার্দিয়ের একটা বাতি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। কসেত্তেকে দেখেই সে বলল, তাহলে এতক্ষণে তুমি এলে অপদার্থ কোথাকার ? কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

ভয়ে কাঁপছিল কসেত্তে। সে বলল, মাদাম, এই ভদ্রলোক থাকবে এখানে। একটা ঘর চায়।

হোটেল মালিকদের মতো স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় মাদাম থেনার্দিয়ের অতিথির পানে তাকিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। সে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অতিথিকে। পরে বলল, এই ভদ্রলোক ?

লোকটি তার মাথার টুপিতে একটা হাত রেখে বলল, হ্যাঁ মাদাম।

সঙ্গতিসম্পন্ন পথিকরা সাধারণত এত ভদ্র ও মোলায়েম হয় না। লো · টর ভাবভঙ্গি আর পোশাক-আশাক ও পুঁটলি দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাদাম থেনার্দিয়েরের মুখ থেকে সব হাসি মিলিয়ে গেল। সে নীরসভাবে পথিককে বলল, ভিতরে আসুন।

লোকটি ভিতরে গেলে মাদাম থেনার্দিয়ের আবার তাকে খুঁটিয়ে দেখল। তার কোট, টুপি, তার পুঁটলি প্রভৃতি দেখে সে তার স্বামীর পানে তাকাল। তাকে খরিদ্দার হিসাবে নেওয়া যাবে কি না তার জন্য জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল। থেনার্দিয়ের তখন হোটেলের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছিল, সেও নবাগত পথিককে ভাল করে দেখে ঠোঁট কামড়ে বলল, না, নেওয়া চলবে না।

মাদাম থেনার্দিয়ের তখন বলল, আমি দুঃখিত। হো টেলের সব ঘর ভর্তি।

লোকটি বলল, যেখানে হোক আমাকে একটু থাকতে জায়গা দিতে পারেন ? আমি তার জন্য একটা ঘরের যা ভাড়া তা দেব।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, একটা ঘরের ভাড়া চল্লিশ স্যু।

ঠিক আছে, চল্লিশ স্যুই দেব।

মাদাম থেনার্দিয়ের তখন বলল, আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।

একজন খরিদ্দার বলল, একটা ঘরের ভাড়া তো কুড়ি স্যু।

মাদাম থেনার্দিয়ের চাপা গলায় বলল, ওই ধরনের লোকের জন্য চল্লিশ।

থেনার্দিয়ের বলল, হ্যাঁ ঠিক তাই। বাজে লোক রেখে হোটেলের কোনও লাভ হয় না।

লোকটি ততক্ষণে একটা বেঞ্চের উপর তার পুঁটলি আর লাঠিটা রেখে টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসল।

কসেত্তে তাড়াতাড়ি এক বোতল মদ আর একটা গ্লাস এনে তার সামনে রাখল। হোটেলের যে খরিদ্দার তার ঘোড়ার জন্য জল চেয়েছিল সে তার ঘোড়ার কাছে গেল। কসেত্তে সেই টেবিলের তলায় গিয়ে উল বুনতে লাগল। লোকটি মদপান করার পর আগ্রহ সহকারে কসেত্তে কি করে না করে দেখতে লাগল।

কসেত্তে খুব সাদাসিধে পোশাক পরে সব সময় বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকে। সে যদি সুখে-শান্তিতে থাকত তাহলে তাকে সুন্দরী দেখাত। তার চেহারাটা এত রোগা এবং ম্লান যে তার বয়স আট হলেও ছ'-এর বেশি মনে হয় না। তার বড় বড় চোখ দুটো ক্রমাগত জল ফেলে ফেলে সব উজ্জ্বলতা হারিয়ে কালো হয়ে গেছে। ক্রমাগত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে করে তার ঠোঁট দুটো কোনও দুরারোগ্য রোগে ভুগতে থাকা মানুষের মতো শুকনো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার রোগা-রোগা হাত দুটোতে কালি পড়ে গেছে। সে সব সময় শীতে কাঁপতে থাকা হাঁটু দুটো জড়ো করে থাকত। তার পোশাক বলতে কতকগুলো সুতীর ছেঁড়া জামা ছিল, তাতে কোনও পশম ছিল না। তার ছেঁড়া জামার ফাঁকে ফাঁকে তার গায়ের কিছু কিছু অংশ দেখা যায় এবং কিছু ক্ষতচিহ্নও দেখা যায়। তার পাগুলো খসখসে আর নীল। তাতে কোনও মোজা বা জুতো নেই। তার ঘাড়ের কাছটা কাঁপা কাঁপা ভাব, তার সাদা সংকুচিত চেহারা, তার কুণ্ঠিত কথাবার্তা, তার নীরবতা ও তার প্রতিটি গতিভঙ্গিতে একটা ভয়ের আবেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এক দারুণ ভয় কসেত্তের দেহমন দুটোকেই যেন গ্রাস করেছিল। সে যেন ভাল করে হাঁপ ছাড়তে পারত না, ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে পারত না। তার চোখের কোণে কোণে ভয়ের ছায়া মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তার মুখখানা দেখে তাকে বোকা-বোকা দেখাত। তাকে কেউ কখনো প্রার্থনা করতে শেখায়নি। সে কখনো কোনও চার্চে পা দেয়নি। চার্চে যাবার কথা বললে মাদাম থেনার্দিয়ের বলত, সময় কোথায়?

হলুদ কোট পরা নবাগত লোকটি কসেত্তেকে খুঁটিয়ে দেখছিল। এমন সময় মাদাম থেনার্দিয়ের চেঁচিয়ে বলল, এতক্ষণে মনে পড়েছে, পাঁউরুটি কোথায়?

গিন্নীর গলার আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এল কসেত্তে। সে পাঁউরুটির কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু শাস্তির ভয়ে সব ছেলেমেয়েরাই যেমন মিথ্যা কথা বলে তেমনি কসেত্তেও মিথ্যা কথা বলল। সে বলল, রুটির দোকান বন্ধ ছিল মাদাম।

তুমি কড়া নেড়ে দোকানীকে জাগাতে পারতে।

কসেত্তে বলল, আমি তাকে ডেকেছিলাম। কিন্তু দোকান খুলল না।

ঠিক আছে, কাল আমি দেখব তাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার কথা সত্যি কি না। সত্যি না হলে মজা দেখবে। যাই হোক, পনের স্যুর মুদ্রাটা আমাকে দাও।

কসেত্তে তার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখল মুদ্রাটা নেই। পয়সাটা কোথায় গেল সেবিষয়ে তার কোনও খেয়াল ছিল না। সে কোনও কথা না বলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মাদাম থেনার্দিয়ের আবার বলল, কি, কথা কানে যাচ্ছে না? আমি দাঁড়িয়ে আছি।

কসেত্তে আবার একবার তার পকেট হাতড়াল। কিন্তু সেটা পেল না।

মাদাম থেনার্দিয়ের এবার গর্জন করে উঠল, তুইই সেটা হারিয়েছিস অথবা চুরি করেছিস।

এই বলে দেওয়ালে ঝোলানো বেতটা নেবার জন্য এগিয়ে গেল সে।

কসেত্তে তা দেখে ক্ষমা প্রার্থনা করল। বলল, দয়া করুন মাদাম। দয়া করুন।

যখন এই সব ঘটছিল তখন হল্‌দ কোটধারী লোকটি তার পকেট হাতড়ে দেখছিল, আনমনে কি দেখতে লাগল। হোটেলের অন্য বাসিন্দারা মদ খেয়ে তাস খেলছিল আবার কেউ কেউ গল্পগুজব করছিল। তারা এ সব কিছু দেখছিল না।

কসেত্তে ঘরের কোণে লুকোবার চেষ্টা করছিল। পকেটের ভিতর হাত দুটো ঢুকিয়ে তা বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। বেতটা হাতে নিয়ে মাদাম থেনার্দিয়ের হাত তুলল কসেত্তেকে মারার জন্য।

নবাগত লোকটি বলল, মাপ করবেন মাদাম, কিছুক্ষণ আগে আমি দেখলাম ঘরের মেঝের উপর একটা মুদ্রা গড়িয়ে পড়ল। মনে হয় মেয়েটির পকেট থেকেই এটা পড়েছে। দেখি সেটা খুঁজে দিচ্ছি।

এই বলে সে নত হয়ে খোঁজার ভান করে একটা মুদ্রা মাদাম থেনার্দিয়েরের হাতে দিল।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, হ্যাঁ, এইটাই।

অথচ আসলে সেটা নয়, কারণ সেটা কুড়ি স্যুর মুদ্রা। হারানো মুদ্রাটা ছিল পনের স্যুর। মুদ্রাটা পকেটে ভরে রেখে মাদাম থিনার্দিয়ের কসেত্তের পানে একবার তাকিয়ে বলল, আর যেন কখনো এমন না হয়।

কসেত্তে তার বড় বড় চোখ দুটো তুলে অচেনা লোকটির পানে তাকাল। তার সে চোখের দৃষ্টিতে এক সরল নির্দোষ বিস্ময়ের সঙ্গে এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের একটা ভাব ছিল।

মাদাম থেনার্দিয়ের এবার নবাগতকে বলল, আপনাকে কি রাতের খাবার দেওয়া হবে?

লোকটি চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিল বলে কথাটার উত্তর দিল না।

নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল মাদাম থেনার্দিয়ের, কে এই শয়তান

লোকটা? রাতের খাবার কেনার মতোও কি পয়সা নেই? ও এত গরীব? সে কি ঘরভাড়া দিতে পারবে? তবু ভাল যে পয়সাটা ঘরের মেঝের উপর দেখতে পেয়েও চুরি করেনি।

এমন সময় ঘরের দরজা খুলে এপোনিনে আর অ্যাজেলমা এসে ঘরে ঢুকল।

মেয়ে দুটি দেখতে বেশ সুন্দর। তাদের মধ্যে শহুরে ভাবটাই বেশি। একজনের চুল বাদামী আর চকচকে, আর একজনের চুলগুলো কালো আর পিঠের উপর ছড়ানো। দু'জনকেই বেশ গোলগাল আর প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল। তারা দু'জনেই বেশ গরম আর ঝকঝকে পরিষ্কার পোশাক পরেছিল। তাদের চোখের চাউনি, মুখের ভাব, তাদের চঞ্চলতা, গোলমাল সব কিছুর মধ্যে এক সবুজ আনন্দ ঝরে পড়ছিল। তাদের দেখে তাদের মা এক কপট তিরস্কার আর প্রভূত আদরের সুরে বলল, এবার তাহলে এলে!

মাদাম থেনার্দিয়ের তার মেয়েদের কোলের উপর বসিয়ে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, বলল, কি নোংরা তোরা!

মেয়েরা মার কোল থেকে নেমে ছুটে ঘরের কোণে গিয়ে একটা পুতুল নিয়ে খেলা করতে লাগল। পুতুলটাতে তাদের দু'জনেরই সমান ভাগ ছিল। টেবিলের তলা থেকে কসেত্তেও পুতুলটার পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

এপোনিনে আর অ্যাজেলমা কসেত্তের পানে কোনও নজর দিল না। তার প্রতি তাদের কোনও আগ্রহ নেই। তাদের কাছে ও একটা কুকুর ছাড়া আর কিছুই নয়। একদিকে কসেত্তে আর একদিকে এপোনিনে ও অ্যাজেলমা এই তিনটি মেয়ে মানবসমাজের দুটি দিকের যেন মূর্ত প্রতীক, সমাজের নিদারুণ নিষ্করুণ অবহেলা, অবজ্ঞা আর ঔদাসিন্য যেন স্তূপাকৃত হয়ে উঠেছে কসেত্তের উপর। দুই বোনে যে পুতুলটি নিয়ে খেলা করছিল সেটি পুরনো। তবু কসেত্তের কাছে সেটা এক আশ্চর্যের বস্তু, কারণ তার নিজের কোনও পুতুল ছিল না।

হঠাৎ কসেত্তের উপর মাদাম থেনার্দিয়েরের চোখ পড়ল। সে দেখল কসেত্তে চুপচাপ বসে তার মেয়েদের খেলা দেখছে। সে বলে উঠল, তোমার কাজে মন দাও। তোমাকে বেত না মারলে কি তুমি কাজ করবে না?

চেয়ার ছেড়ে না উঠেই নবাগত বলল, ওর উপর খুব বেশি কঠোর হবেন না মাদাম। কিছুক্ষণের জন্য ওকে খেলতে দিন।

হোটেলের যে সব সংগতিসম্পন্ন বাসিন্দারা মাংসের প্লেট আর বোতলের পর বোতল মদ খেয়ে যায় তাদের মধ্যে কেউ একথা বললে মাদাম থেনার্দিয়ের তা শুনত। নিঃস্ব গরীবদের মতো এই ধরনের কোট আর টুপিপরা একটা লোকের মুখ থেকে বলা একথা সহ্য করতে পারল না সে।

মাদাম থেনার্দিয়ের তার কড়াভাবে প্রত্যুত্তর করল, মেয়েটি খায়। খায় যখন তখন তাকে অবশ্যই কাজ করতে হবে। তাকে তো বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারি না।

শান্ত কণ্ঠে নবাগত আবার প্রশ্ন করল, আসলে কি সে বুনছে?

তার গলার স্বর এবং কথা বলার ভঙ্গিমাটা তার ভিক্ষুকসুলভ বেশভূষার সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, মোজা। আমার মেয়েদের জন্য মোজা বুনছে ও। তাদের মোজা নেই। শিগগির এটা তৈরি না হলে ওদের খালি পায়ে চলতে হবে।

নবাগত কসেত্তের অনাবৃত লাল পা দুটোর পানে তাকাল। সে বলল, মোজা বোনার কাজ শেষ হতে কতদিন লাগবে?

মেয়েটা কুঁড়ে বলে তিন-চার দিন লাগবে।

মোজাগুলো বোনা শেষ হলে তার দাম কত হবে?

মাদাম থেনার্দিয়ের লোকটির পানে বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে বলল, অন্তত তিরিশ স্যু।

পাঁচ ফ্রাঁ নিয়ে মোজাগুলো আমায় বিক্রি করবেন?

হোটেলের এক বাসিন্দা কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠল। আশ্চর্য হয়ে বলল, পাঁচ ফ্রাঁ! একজোড়া মোজার দাম পাঁচ ফ্রাঁ!

থেনার্দিয়ের নিজেও এবার এদিকে নজর দিল। সে বলল, মঁসিয়ে হয়ত ঠাট্টা করে বলছেন পাঁচ ফ্রাঁ দিয়ে মোজাগুলো কিনবেন।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, তাহলে নগদ টাকা দিন।

নবাগত তার পকেট থেকে পাঁচ ফ্রাঁ বার করে টেবিলের উপর রেখে বলল, আমি ওগুলো কিনবই। এই নিন টাকা।

এবার সে কসেত্তের পানে তাকিয়ে বলল, তুমি এখন আমার কাজ করছ মেয়ে। আমি বলছি এখন তুমি যাও, খেলগে এবং বিশ্রাম নাওগে।

হোটেলের সেই বাসিন্দা ব্যাপারটা দেখে এতদূর আশ্চর্য হয়ে পড়েছিল যে উঠে এসে পাঁচ ফ্রাঁর মুদ্রাটা আসল কি না নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল। পরে বলল, হ্যাঁ, এটা আসল। এরপর থেনার্দিয়ের উঠে এসে মুদ্রাটা পকেটে ভরে নিল। মাদাম থেনার্দিয়ের হতবাক হয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে দাঁড়িয়ে রইল। কসেত্তে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, মাদাম, আমি তাহলে খেলা করতে যেতে পারি?

মাদাম থেনার্দিয়ের গর্জন করে উঠল, হ্যাঁ, ঈশ্বরের নামে বলছি, খেলা করতে পার।

কসেত্তে বলল, ধন্যবাদ মাদাম।

কিন্তু আসলে সে ধন্যবাদ দিতে চাইছিল সেই নবাগত লোকটিকে যার দয়ার অন্ত নেই। তার সমস্ত অন্তর তার প্রতি কৃতজ্ঞতার আবেগে ফেটে পড়ছিল।

থেনার্দিয়ের তার চেয়ারে গিয়ে বসল। মাদাম থেনার্দিয়ের তার কানে কানে বলল, লোকটা কে?

থেনার্দিয়ের জোর গলায় বলল, আমি অনেক লক্ষপতিকে চিনি যারা ঐ ধরনের ছেঁড়া কোট পরে থাকে।

কসেত্তে উলবোনার কাজ বন্ধ করলেও সেই জায়গাটা ছাড়েনি। তার কাছে

যে একটা বাক্স ছিল সেটা খুলে কিছু টুকরো কাপড় আর সীসের ছোট্ট ছুরিটা বার করল।

এপোনিনে আর অ্যাজেলমা তখন তাদের খেলা নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিল যে তারা ঘরের মধ্যে কি হচ্ছিল তা মোটেই দেখেনি। বড় বোন এপোনিনে তখন পুতুলটাকে পোশাক পরিয়ে সাজাচ্ছিল এবং তার বোনকে কি সব বোঝাচ্ছিল। শিশুদের কণ্ঠস্বর ও ভাষার মধ্যে প্রজাপতির রঙিন পাখনার সৌন্দর্যের মতো এমন এক পলায়মান সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য থাকে যা আমাদের মুগ্ধ করে কিন্তু যাকে আমরা ধরতে পারি না।

এপোনিনে বলছিল, এটা অন্য সব পুতুলের মতো নয়, কারণ এটা হাঁটতে পারে এবং তখন ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়। ওটাকে আমি সাজাচ্ছি। এর একটা মোচ আর একটা লেজ করে দেব। তুই তখন তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলবি, হা ভগবান! আমি তখন বলব, এটা আমার মেয়ে মাদাম এবং এই ভাবেই এর জন্ম হয়। আজকালকার সব মেয়েই এই রকম।

অ্যাজেলমা বিস্ময়ে অবাক হয়ে শুনছিল।

এতক্ষণ ধরে যারা মদ খাচ্ছিল তারা এবার গান গাইতে শুরু করল।

থেনার্দিয়ের চিৎকার ও হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহ দিতে লাগল।

পাখিরা খড়কুটো বা কোনও জিনিস পেলেই যেমন বাসা তৈরি করতে শুরু করে তেমনি শিশুরা পুতুল হাতে পেলেই নানাভাবে খেলা করতে থাকে। এপোনিনে আর অ্যাজেলমা যখন তাদের পুতুলটাকে সাজাতে লাগল কসেত্তে তখন তার সেই সীসের ছুরিটাকে সাজাতে লাগল। তারপর শুইয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে লাগল।

শিশু মেয়েদের কাছে পুতুল যেন অত্যাবশ্যক একটা বস্তু। এ বস্তুর প্রতি তাদের যেন একটা সহজাত আসক্তি আছে। পুতুলের প্রতি তাদের স্নেহ ও ভালবাসার শেষ নেই। তাকে সাজানো, খাওয়ানো, তাকে উপদেশ দেওয়া, তিরস্কার করা, বিছানায় শোয়ানো, গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো প্রভৃতি সব কিছু পরম নিষ্ঠার সঙ্গে করে তারা—পুতুলটা যেন এক জীবন্ত শিশু। তাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন এর মধ্যে ছোট আকারে বিরাজ করে। এইভাবে শিশুরা পুতুলদের লালন-পালন করতে করতে শৈশব থেকে বাল্যে পদার্পণ করে, বালিকা থেকে পরে নারীত্ব লাভ করে। নারীত্ব লাভ করার পর তারা স্ত্রী হয় এবং তাদের প্রথম সন্তান যেন তাদের শেষ পুতুলের অধিকারী। কোনও ছোট মেয়ে পুতুল থেকে বঞ্চিত হলে সন্তানহীনা নারীর মতোই এক অস্বাভাবিক ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ে। তাই কসেত্তে পুতুল না পেয়ে একটা ছুরিকে পুতুলের মতো করে সাজায়।

মাদাম থেনার্দিয়ের এবার হলুদ কোটপরা নবাগতের দিকে মন দিল। সে তার কাছে ফিরে গেল। সে ভাবল তার স্বামীর কথাই হয়ত ঠিক। হয়ত লোকটা ধনী হতেও পারে। ধনীদের অদ্ভুত অনেক খেয়াল থাকে।

সে নরম সুরে বলল, দেখুন মঁসিয়ে,—

এই সম্মানজনক সম্বোধনে নবাগত আশ্চর্য হয়ে মুখ তুলে তাকাল। এর আগে সে তাকে এভাবে মঁসিয়ে বলে সম্বোধন করেনি।

টেবিলের উপর কনুই দুটো রেখে বসল মাদাম থেনার্দিয়ের। সে বলল, দেখুন মঁসিয়ে, আপনার উদারতা দেখে মেয়েটাকে একবার খেতে দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তাকে তো কাজ করতে হবে। কারণ তার কেউ নেই।

নবাগত বলল, ও আপনার মেয়ে নয়?

না না, একেবারে নিঃস্ব, আমরা দয়া করে রেখেছি ওকে এবং রেখে ভুল করেছি। আপনি ওর মাথার আকারটা একবার দেখুন। ওর চেহারাটাও বাড়ছে না। আমরা ওর জন্য অনেক কিছু করি। কিন্তু আমরা তো আর ধনী নই। আমরা ওর মাকে চিঠি লিখি, কিন্তু ছয় মাস ধরে কোনও উত্তর পাইনি। মনে হয়, ওর মা মারা গেছে।

নবাগত বলল, হয়ত তাই। এই বলে সে ভাবতে লাগল।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, ওর মা থাকলেও অবশ্য কোনও লাভ ছিল না। সে তার মেয়েকে পরিত্যাগ করে।

কসেত্তের চোখের দৃষ্টি তার মালিকপত্নীর উপর নিবদ্ধ ছিল। তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে এই হিসাবে সতর্ক করে দেয় মাদাম থেনার্দিয়ের আর নবাগতের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হচ্ছে সে-ই তার বিষয়বস্তু। যাই হোক, কসেত্তের উদ্বেগের অবসান হলো যখন মাদাম থেনার্দিয়ের নবাগতকে কিছু খাবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল।

সে নবাগতকে বলল, আপনি কি খাবেন মঁসিয়ে?

নবাগত বলল, রুটি আর মাখন।

মাদাম থেনার্দিয়ের তা শুনে ভাবল, লোকটা তাহলে সত্যিই গরীব।

যারা গান গাইছিল তারা মাঝখানে কিছুক্ষণ থামার পর আবার নতুন উদ্যমে গান শুরু করল। তাদের গানের বিষয়বস্তু ছিল কুমারী মেরী আর শিশু যীশু। মাদাম থেনার্দিয়ের নবাগতকে রুটি আর মাখন এনে দিয়ে গান শুনতে গেল। সেও তাদের হাসি আর হৈ-হুল্লোড়ে যোগদান করল। কসেত্তে তার নকল পুতুলটাকে নিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে 'আমার মা মরে গেছে,' এই কথাটা বারবার গানের সুরে গাইছিল।

সহসা তার গানটা থেমে গেল। থেনার্দিয়েরদের মেয়েরা তাদের পুতুলটাকে মেঝের উপর ফেলে রেখে বিড়ালছানা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাত্র দু'-এক গজ দূরে পড়ে আছে পুতুলটা। তার নকল পুতুলটা নামিয়ে রেখে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল সে। দেখল মাদাম থেনার্দিয়ের নিচু গলায় তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলছে। হোটেলের বাসিন্দারা মদপান করছে আর গান গাইছে। এপোনিনে ও অ্যাজেলমা দু'জনেই বিড়ালছানা নিয়ে খেলা করছে। কেউ তাকে দেখছে না। চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি ছড়িয়ে সে হাতে-পায়ে হেঁটে এসে পুতুলটাকে তুলে নিয়েই টেবিলের তলায় সেইখানে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আগুনের দিকে পিছন ফিরে এমনভাবে বসে রইল সে যাতে পুতুলটা তার হাতে থাকলেও তা দেখা যায় না। সত্যিকারের একটা পুতুল পাওয়া তার কাছে ভাগ্যের কথা এবং আনন্দে আত্মহারা হবার কথা। একমাত্র নবাগত এ ব্যাপারে কিছুটা দেখেছিল।

কিন্তু কসেত্তের সে আনন্দ স্থায়ী হলো না বেশিক্ষণ। তার সতর্কতা সত্ত্বেও সে বুঝতে পারেনি, পুতুলের একটা পা এমনভাবে বেরিয়ে আছে যাতে সেটা পিছন

থেকে দেখা যায়। জ্বলন্ত আগুনের ছটায় অ্যাজেলমা পুতুলের সেই গোলাপী পা-টা প্রথমে দেখতে পায়। সে তার দিদিকে দেখাল এবং তখন দুই বোনে এক ক্ষুব্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে পিছন থেকে কসেত্তেকে দেখতে লাগল, ভাবল কসেত্তের এত বড় সাহস হলো যে সে তাদের পুতুলে হাত দেয়!

এপোনিনে বিড়ালছানাটা ধরেই তার মাকে ডেকে নিয়ে এল।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, কি হয়েছে?

এপোনিনে হাত বাড়িয়ে কসেত্তেকে দেখিয়ে বলল, দেখ দেখ।

পুতুল পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে সব কিছু ভুলে গিয়েছিল যেন।

মাদাম থেনার্দিয়েরের মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। আহত অভিমান তার ক্রোধের আবেগকে শতগুণে বাড়িয়ে দিল। সব ছাড়িয়ে গেছে কসেত্তে। সে তার মালিকের মেয়েদের পুতুলে হাত দিয়েছে! এতদূর স্পর্ধা তার! রাশিয়ার সম্রাট জারের পত্নী কোনও গরীব কৃষককে তার রাজকুমারের নীল কোমরবন্ধনীতে সজ্জিত দেখলেও হয়ত এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত না।

প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে কড়া গলায় মাদাম থেনার্দিয়ের ডাকল কসেত্তেকে, কসেত্তে!

কসেত্তে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পিছন ফিরল। তার মনে হলো তার পায়ের তলার সব মাটি কাঁপছে।

মাদাম থেনার্দিয়ের আবার জোর গলায় ডাকল, কসেত্তে!

কসেত্তে এবার তার হাত থেকে পুতুলটা নামিয়ে রেখে তার হাত দুটো জড়ো করে মোচড়াতে লাগল। তারপর সে এমন একটা কাজ করল, আজ সারাদিনের এত সব প্রতিকূল ঘটনার নির্মমতা যা তাকে করাতে পারেনি। অন্ধকার বনের মধ্যে ঝর্ণা থেকে জল আনতে যাওয়া, ভারী বালতি বওয়ার কষ্ট, পয়সা হারানো, বেত মারার উপক্রম, মাদাম থেনার্দিয়েরের মুখ থেকে তার মার মৃত্যুসংবাদ শোনা প্রভৃতি কোনও ঘটনাই তাকে কাঁদাতে পারেনি। কিন্তু এবার জোরে কেঁদে উঠল কসেত্তে।

নবাগত খেতে খেতে উঠে দাঁড়াল। সে মাদাম থেনার্দিয়েরকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

পুতুলটার দিকে হাত বাড়িয়ে মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, দেখতে পাচ্ছেন না?

নবাগত বলল, আমি বুঝতে পারছি না।

ঐ মেয়েটা বেয়াদবি করে আমার মেয়েদের পুতুল নিয়েছে।

নবাগত সহজভাবে বলল, তাতে কি হয়েছে? পুতুলটা নিয়ে সে-ই বা কেন খেলবে না?

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, সে তার নোংরা হাত দিয়ে পুতুলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

নবাগত হঠাৎ রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল। তার আকস্মিক অন্তর্ধানের সুযোগ নিয়ে কসেত্তেকে একটা লাথি মারল মাদাম থেনার্দিয়ের। তাতে আরও জোরে কাঁদতে লাগল কসেত্তে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল নবাগত। তার হাতে ছিল সেই সুন্দর বড় পুতুলটা যেটা সারাদিন ধরে গাঁয়ের সব ছেলেমেয়ে পাবার জন্য লোভ করেছে। লুব্ধ দৃষ্টিতে বারবার তাকিয়ে থেকেছে সেটার দিকে।

পুতুলটা কসেত্তের সামনে রেখে নবাগত বলল, এই নাও, এটা তোমার।

হোটেলে এসে ওঠার পর থেকে জানালা দিয়ে রাস্তার ওপারের আলো ঝলমল দোকানগুলোর পানে মাঝে মাঝে তাকিয়েছে সে। আসার পথেও দেখেছে দোকানগুলো।

অন্ধকারাচ্ছন্ন দু'চোখের দৃষ্টির সামনে হঠাৎ একঝলক সূর্যরশ্মি এসে পড়লে মানুষ যেমন অভিভূত হয়ে যায় তেমনি পুতুলটার পানে একবার তাকিয়েই অভিভূত হয়ে পড়ল কসেত্তে। 'এই পুতুলটা তোমার' এই অবিশ্বাস্য কথাগুলো শুনে সে একবার নবাগতের পানে আর একবার পুতুলটার পানে তাকায়। তারপরই সে আবার টেবিলের তলায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে ভয়ে স্থির ও জড়োসড়ো হয়ে থাকে।

মাদাম থেনার্দিয়ের, এপোনিনে আর অ্যাজেলমা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। যারা গান গাইছিল আর হৈ-হুল্লোড় করছিল তারাও থেমে গেল। এক গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল সারা বাড়িটার মধ্যে।

বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল মাদাম থেনার্দিয়ের। আবার ধারণা আর অনুমানের খেলা চলতে লাগল তার মনে। লোকটা গরীব না ক্রোড়পতি? অথবা দুই-এরই মিশ্রণে গড়া এক অপরাধী আসামী?

কোনও প্রবল আবেগ মানুষকে হঠাৎ আচ্ছন্ন করে ফেললে যেমন তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে এক আর্ত নিবিড়তা তেমনি তার স্বামী থেনার্দিয়েরের মুখে-চোখে তাই ফুটে উঠেছিল। একবার পুতুল আর একবার নবাগত পথিকের পানে তাকিয়ে তার আসল পরিচয়টা অনুমান করার চেষ্টা করল, যেমন কোনও গুপ্তধনখ্যাত জায়গায় গিয়ে মানুষ গুপ্তধনের সন্ধান করতে থাকে।

কিন্তু তার দ্বিধাভাবটা স্থায়ী হলো না বেশিক্ষণ। সে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলল, ঐ পুতুলটার দাম অন্তত তিরিশ ফ্রাঁ। বোকার মতো কাজ করো না, লোকটার কাছে যাও।

স্থূলতা আর নির্দোষিতা যে এক বস্তু নয় তা বুঝতে পারল না থেনার্দিয়ের। এ দুটোর মধ্যে কোনও পার্থক্য সে বুঝতে পারত না।

নরম সুরে মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, আচ্ছা কসেত্তে, তুমি তোমার পুতুলটা নেবে না?

তার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এল কসেত্তে।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, ভদ্রলোক তোমাকে একটা পুতুল দিয়েছেন। এটা তোমার। এটা নিয়ে তুমি খেলা করবে।

সেই ঐন্দ্রজালিক পুতুলটার দিকে ভয়ের সঙ্গে তাকাল কসেত্তে। তার মুখখানা তখনো ভিজে ছিল কান্নার জলে। কিন্তু তার চোখ দুটো সকালবেলার মেঘমুক্ত আকাশের মতো এক নতুন আলোর আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। যে আনন্দের অনুভূতিতে

সে মাতোয়ারা হয়ে উঠল, কেউ যদি হঠাৎ স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাকে বলত, 'হে শিশু, তুমি ফ্রান্সের রানী' তাহলেও এ আনন্দ থেকে বেশি আনন্দ সে পেত না। তথাপি সে ভয়ে পুতুলটাকে স্পর্শ করতে পারল না পাছে তার থেকে অকস্মাৎ বজ্রপাত হয়, কারণ সে তার মালিকপত্নীর রাগের কথা জানত। তবু পুতুলটার প্রতি তার আসক্তি এমনই প্রবল ছিল যে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি সত্যি সত্যিই এটা নিতে পারি ?

একই সঙ্গে বেদনা আর আনন্দের আবেগ আর কোনও কথার উপর এমনভাবে ঝরে পড়েনি কখনো।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, নিশ্চয়, এটা তোমার। ভদ্রলোক তোমায় দিয়েছেন।

কসেত্তে আবার বলল, এটা কি সত্যি মঁসিয়ে ? পুতুলটা আমার ?

নবাগতের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে তাই কথা বলতে পারছিল না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল এবং পুতুলটা কসেত্তের হাতের মধ্যে দিল।

কসেত্তে হাতটা পুতুল থেকে সরিয়ে নিল যেন পুতুলটার স্পর্শে তার হাত পুড়ে গেছে।

অবশেষে সে মেঝের দিকে তাকিয়ে পুতুলটা নিয়ে বলল, আমি এর নাম দেব ক্যাথারিন।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মেয়েটির ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকের পটভূমিকায় পুতুলটার গোলাপী চকচকে রংটা বেমানান লাগছিল।

কসেত্তে বলল, পুতুলটাকে চেয়ারের উপর বসাতে পারি মাদাম ?

এপোনিনে আর অ্যাজেলমা ঈর্ষান্বিতভাবে তাকিয়ে রইল পুতুলটার পানে। কসেত্তে পুতুলটাকে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

নবাগত বলল, পুতুলটা নিয়ে খেলা করো কসেত্তে।

আমি তো খেলা করছি।

সেই সময় মাদাম থেনার্দিয়ের সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র নবাগত ছাড়া আর কাউকে এত বেশি ঘৃণা করত না। নবাগত যেন অন্য এক জগৎ থেকে হঠাৎ কসেত্তের জীবনে নেমে এসেছে। মাদাম থেনার্দিয়ের যদিও সব কাজে তার স্বামীর কথামতো চলার চেষ্টা করে অথবা তার ভান করে তথাপি এই মুহূর্তে নবাগতের প্রতি তার নবজাগ্রত ঘৃণার অনুভূতিটাকে দমন করতে পারল না। সে তাড়াতাড়ি তার মেয়েদের বিছানায় শুতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে নবাগতের কাছে গিয়ে কসেত্তেকে শুতে পাঠাবার অনুমতি চাইল। মাতৃসুলভ আগ্রহের সঙ্গে বলল, সারাদিন মেয়েটা কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কসেত্তে পুতুলটা হাতে নিয়ে চলে গেল।

মাদাম থেনার্দিয়ের তার স্বামী যেখানে বসেছিল সেইখানে গিয়ে কথার বন্যা ছুটিয়ে তার অবদমিত আবেগকে মুক্ত করল। কথাগুলো চাপা গলায় বলতে হচ্ছিল বলে সেগুলো আরও তীক্ষ্ণ ও আরও বিষাক্ত হয়ে উঠল।

সে বলল, ঐ বুড়ো পাগলটা কোথা থেকে এসে সব ওলটপালট করে দিল, মেয়েটাকে অনবরত খেলা করতে বলছে, তাকে চল্লিশ ফ্রাঁ দিয়ে একটা পুতুল কিনে দিল। অথচ আমরা চল্লিশ স্যু দিয়েও ও পুতুল কিনতাম না। এরপর সে মেয়েটাকে 'মহারানী' বলে ডাকবে। লোকটা কি পাগল ?

থেনার্দিয়ের বলল, মেয়েটাকে খেলতে দেখে সে যদি মজা পায় তো পাক না। তুমি যেমন ওকে কাজ করিয়ে আনন্দ পাও, ও তেমনি মেয়েটাকে খেলতে দেখে আনন্দ পায়। খরিদ্দার যদি আমাদের হোটেলখরচ মিটিয়ে দেয় তাহলে যা খুশি সে করতে পারে। সে পরোপকারী বা অপদার্থ যাই হোক না কেন তাতে তোমার কি আসে যায় ? তার নিশ্চয় অনেক টাকা আছে।

নবাগত আবার টেবিলের উপর কনুই রেখে ভাবতে শুরু করল। যারা গান করছিল তারা গান থামিয়ে দিয়ে বসেছিল। তারা সবাই ভয় মেশানো শ্রদ্ধার সঙ্গে নবাগতকে দেখছিল। যে মানুষটা এমন গরীবের মতো পোশাক পরে আছে সে কি করে একটা ছোট মেয়ের পিছনে একটা স্বর্ণমুদ্রা খরচ করে ? এটা সত্যিই দেখার মতো জিনিস।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। দুপুর রাতের সমবেত প্রার্থনা শেষ হয়ে গেল। হৈ-হুল্লোড থামিয়ে সবাই শুতে চলে গেছে। তখন ঘর একেবারে ফাঁকা। আগুনটা জ্বলতে জ্বলতে স্তিমিত হয়ে এসেছে। নবাগত কিন্তু যেখানে বসেছিল সেখানেই একা বসে রইল। কসেত্তে চলে যাওয়ার পর সে একটা কথাও বলেনি।

থেনার্দিযেররা পাশেব ঘর থেকে দেখতে পেল নবাগতকে। তারা বলাবলি করতে লাগল, ও কি এইভাবেই রাত কাটাবে ?

কিন্তু রাত দুটো বাজতেই মাদাম থেনার্দিযেরের ঘুম এসে পড়ল। সে আর বসে থাকতে পারল না। বলল, তোমার যা খুশি করতে পার।

থেনার্দিয়ের টেবিলের এক কোণে বসে একটা খবরের কাগজ পডতে লাগল। গোটা কাগজটা তার পডা হযে গেল, কিন্তু নবাগত তবু একটুও ন[illegible] না। যেমন বসে ছিল তেমনিই বসে বসে ভাবতে লাগল।

থেনার্দিযের কেশে, চেযারটা সরিয়ে কিছু শব্দ করে নবাগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। সে ভাবল, লোকটা কি বসে বসেই ঘুমোচ্ছে ?

কিন্তু লোকটা সত্যি সত্যিই ঘুমোচ্ছিল না। কিন্তু কিছুতেই সে উঠছিল না বা কোনও দিকে তাকাচ্ছিল না। অবশেষে থেনার্দিয়ের তার মাথা থেকে টুপিটা খুলে নবাগতের কাছে গিয়ে সাহস করে বলল, মঁসিয়ে, বিশ্রাম করতে যাবেন না ?

কথাটা সাবধানে কায়দা করে বলল থেনার্দিয়ের। 'শুতে যা[illegible]র থেকে 'বিশ্রাম করতে যাওয়া'র কথাটা আরও শোভন ও সম্মানজনক। এ কথার গুণে আগামী কাল অনেক বেশি টাকার বিল করা যাবে। সাধা[illegible] একটা শোবার ঘরের ভাড়া হলো কুড়ি স্যু, কিন্তু একটা বিশ্রামাগারের ভাড়া হলো কুডি ফ্রাঁ।

নবাগত বলল, অবশ্যই। আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনাদের আস্তাবলটা কোথায় ?

থেনার্দিয়ের মৃদু হেসে বলল, মঁসিয়ে চাইলে আমিই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

নবাগত তার লাঠি আর পুঁটলিটা তুলে নিল। বাতি হাতে থেনার্দিয়ের নবাগতকে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গেল। মেহগনি কাঠের আসবাব আর লাল পর্দা দেওয়া ঘরটা এক অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্যে ভরা।

নবাগত বলল, এ কি?

থেনার্দিয়ের বলল, এটা আমাদের বিয়ের বাসরঘর। আমি আর আমার স্ত্রী এখন অন্য ঘরে শুই। বছরে মাত্র তিন-চারবার এই ঘরটা খোলা এবং ব্যবহার করা হয়।

নবাগত বলল, আস্তাবল হলেই আমার চলে যেত।

থেনার্দিয়ের যেন শুনেও শুনল না। সে দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে আলমারির উপর রেখে দিল। উনোনে আগুন জ্বলছিল। একটা বড় কাঁচের জারের মধ্যে মেয়েদের মাথায় পরার একটা পোশাক ছিল। একটা রুপোর তার দিয়ে সেটা বাঁধা ছিল।

নবাগত বলল, ওটা কি?

থেনার্দিয়ের বলল, এটা আমার স্ত্রীর বিয়ের বনেট।

আসলে কিন্তু সেটা বিয়ের বনেট নয়। ওটা পুরনো, এক জায়গা থেকে কেনা। থেনার্দিয়ের মিথ্যা কথা বলছিল। শুধু তার স্ত্রীকে খাতির করত এই কথা বলে।

হঠাৎ নবাগত মুখ ঘুরিয়ে দেখল সে ঘরের মধ্যে একা। থেনার্দিয়ের কখন একসময় ঘর থেকে নিঃশব্দে চলে গেছে তাকে 'শুভরাত্রি' না জানিয়েই। কারণ সে জানে পরদিন যার নামে মোটা বিল করে টাকা আদায় করবে তার সঙ্গে বেশি বন্ধুত্ব করা ভাল নয়।

থেনার্দিয়ের তার শোবার ঘরে গিয়ে দেখল তার স্ত্রী বিছানায় শুয়ে আছে, কিন্তু ঘুমোয়নি তখনো।

মাদাম থেনার্দিয়ের তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলল, আমি ভাবছি কসেত্তেকে কাল ছেড়ে দেব।

থেনার্দিয়ের বলল, তুমি সব ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো করতে চাও।

আর কেউ কোনও কথা বলল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

নবাগত তার ছড়ি আর পুঁটলিটা এক জায়গায় রেখে একটা আর্ম চেয়ারে বসে ভাবতে লাগল। সে একসময় পায়ের জুতো জোড়াটা খুলল। তারপর বাতিটা নিবিয়ে দিল। সে দরজাটা খুলে কসেত্তে যে ঘরে শুয়ে আছে সেই ঘরে যাবার পথটা খুঁজতে লাগল। সে বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেল। এমন সময় একটা ঘরে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়ে সেই শব্দ অনুসরণ করে সে সিঁড়ির তলায় দেখল তিনকোণা দরজাহীন ঘরের মতো একটা জায়গায় কতকগুলি ভাঙা ঝুড়ি, বাক্স, ধুলো আর মাকড়শার জালের মধ্যে একটা ছেঁড়া তোষক পাতা রয়েছে মেঝের উপর আর কসেত্তে তার উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

নবাগত অদূরে দাঁড়িয়ে তা দেখতে লাগল।

কসেত্তে শীতের ভয়ে জামা-প্যান্ট পরেই ঘুমোচ্ছে। পুতুলটা তার হাতেই ধরা

আছে। মাঝে মাঝে সে একটা করে জোর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল যেন এখনি জেগে উঠবে। কিন্তু সে ঘুমের ঘোরেই পুতুলটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরছিল। একটা কাঠের জুতো তার পায়ে ছিল আর একটা জুতো তোষকের পাশে পড়ে ছিল। কসেত্তে যেখানে ঘুমোচ্ছিল তার কাছেই একটা ঘর ছিল। অন্ধকারে ঘরটা দেখা যাচ্ছিল না। নবাগত সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটা দেখতে লাগল। সে দেখল ঘরটার একপ্রান্তে সাদা ধবধবে চাদর পাতা দুটো বিছানায় এপোনিনে আর অ্যাজেলমা ঘুমোচ্ছিল। তাদের বিছানার পাশে একটা দোলনায় একটি শিশুপুত্র ঘুমোচ্ছিল। নবাগত বুঝতে পারছিল সারা সন্ধে ধরে এই ছেলেটির কান্না তারা শুনে এসেছে।

নবাগত বুঝল এই ঘরটার পাশেই একটা ঘর আছে এবং সেখানে থেনার্দিয়েরের দম্পতি ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ দেখল থেনার্দিয়ের মেয়েরা যে ঘরে ঘুমোচ্ছিল সেই ঘরে আগুন জ্বালার জায়গাটার কাছে একটা করে জুতো পড়ে আছে। নবাগত বুঝতে পারল এটাই হলো রীতি। ছেলেমেয়েরা আগুনের চুল্লীর কাছে একপাটি করে জুতো রেখে যায়। তাহলে সকালে উঠে তারা দেখবে সেই জুতোর মধ্যে এক সদাশয় পরী কখন এসে একটা করে উপহার দিয়ে গেছে। নবাগত দেখল, পরীর পক্ষ থেকে তাদের মা-ই সেই জুতো দুটোর মধ্যে একটা করে দশ স্যুর মুদ্রা রেখে দিয়ে গেছে।

নবাগত এবার চলে যাচ্ছিল সেখান থেকে। কিন্তু যেতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল সেই জুতোর পাটি দুটোর থেকে কিছু দূরে একপাটি কাঠের কুৎসিত জুতো পড়ে রয়েছে। কিন্তু কোনও মুদ্রার উপহার নেই তার মধ্যে। মার রূপ ধরে কোনও সদাশয় পরী কোনও উপহার দিযে যায়নি তাতে।

নবাগত তার পকেট থেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা বার করে সেই জুতোটার মধ্যে ফেলে দিল। তারপর সে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

৯

পরদিন সকাল হবার দু' ঘণ্টা আগেই বড় বসার ঘরটাতে টেবিলের ধারে বসে থেনার্দিয়ের কলম হাতে নবাগতের জন্য হোটেলখরচের বিল তৈরি করতে লাগল। সকালের আলো তখন ফুটে না ওঠায় বাতি জ্বেলে কাজ করছিল সে। তার স্ত্রী তার পাশে তার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তা দেখছিল। কেউ কোনও কথা বলছিল না। তাদের একজন খুঁটিয়ে হিসাব করে যাচ্ছিল একমনে আর একজন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির শক্তি কতখানি হতে পারে এবং কিভাবে তার প্রকাশ ঘটতে পারে তা এক ভীতিবিহ্বল শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে যাচ্ছিল। সিঁড়িতে কিসের শব্দ হচ্ছিল। তারা বুঝল কসেত্তে উঠে সিঁড়ি ঝাঁট দিচ্ছে।

পনের মিনিট ধরে চেষ্টা করার পর অবশেষে বিলটা তৈরি করে ফেলল থেনার্দিয়ের। বিলটা হলো এই রকম: রাতের খাওয়া ৩ ফ্রাঁ, ঘরভাড়া ১০ ফ্রাঁ, বাতিখরচ ৫ ফ্রাঁ, আগুন ৪ ফ্রাঁ, ভৃত্যখরচ ১ ফ্রাঁ—সব মিলিয়ে মোট ২৩ ফ্রাঁ। ভৃত্যখরচের জায়গায় বানানটা ভুল করল।

মাদাম থেনার্দিয়ের ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, তেইশ ফ্রাঁ!

বড় বড় শিল্পীদের মতো নিজের কাজে নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারল না থেনার্দিয়ের। বলল, বাঃ, এ তো কিছুই হলো না।

তার মেয়েদের সামনে লোকটা একটা দামী পুতুল কিনে দিয়েছে এজন্য নবাগতের উপর রাগ ছিল মাদাম থেনার্দিয়েরের। তাই সে কথা মনে করে বলল, ঠিক করেছ প্রিয়তম। ঠিক হয়েছে। তবে বিলটা বেশি হয়েছে। এত টাকা দেবে কি?

একটুখানি হেসে তার স্বামী বলল, হ্যাঁ, দেবে।

তার হাসিটার মধ্যে এক পরিপূর্ণ আশ্বাস আর একটা প্রভুত্বের ভাব ছিল। তার স্ত্রী আর এ নিয়ে কোনও কথা বলল না। সে ঘর পরিষ্কার করার কাজে মন দিল। থেনার্দিয়ের ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে একসময় বলল, আমি পনেরশো ফ্রাঁ পাই।

এই বলে সে আগুনের কাছে বসে ভাবতে লাগল।

তার স্ত্রী বলল, পুতুলটার কথা ভাবলেই আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। তুমি নিশ্চয় ভোলনি, আমি আজ কসেত্তেকে বার করে দিচ্ছি। আর এক মিনিটও তাকে আমি সহ্য করতে পারব না।

থেনার্দিয়ের তার পাইপটা ধরাচ্ছিল। পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে বলল, বিলটা তাকে দিয়ে দেবে।

এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই নবাগত এসে ঘরে ঢুকল। তার হাতে সেই লাঠি আর পুঁটলিটা ছিল। থেনার্দিয়ের আবার ফিরে এল। মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন! আপনি কি এখনি চলে যাবেন?

কথা বলার সময় বিলটা তার হাতে মোচড়ানো অবস্থায় ধরা ছিল। তার মুখের উপর একটা নিবিড় কুণ্ঠা ফুটে উঠেছিল। যে লোকটাকে বেশভূষায় এতখানি গরীব দেখায় তাকে কি করে সে এত টাকার বিল দেবে তা খুঁজে পাচ্ছিল না।

নবাগত আনমনে বলল, হ্যাঁ যাচ্ছি।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, মঁতফারমেলে মঁসিয়ের কোনও কাজ নেই?

নবাগত বলল, না, আমি এমনি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম এক জায়গায়। আমার কত হয়েছে মাদাম?

কোনও কথা না বলে তার হাতে বিলটা ধরিয়ে দিল মাদাম থেনার্দিয়ের। নবাগত একবার সেটা দেখল। কিন্তু কিছু বলল না। তার মনটা অন্য চিন্তায় নিবিষ্ট ছিল।

কিছু পরে নবাগত বলল, মঁতফারমেলে আপনাদের কারবার কেমন চলছে মাদাম?

বিলটা দেখে নবাগত রাগে ফেটে পড়ল না বা তার মধ্যে কোনও বিরূপ বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। সে উৎসাহিত হয়ে বলল, খুব ভাল।

তারপর একটু ভেবে করুণ সুরে বলল, দিনকাল বড় খারাপ যাচ্ছে মঁসিয়ে।

আজকাল খরিদ্দার খুব কম আসে। গরীব দেশ। আপনার মতো কিছু ধনী খরিদ্দার মাঝে মাঝে না এলে আমরা চালাতেই পারতাম না। কত খরচ আমাদের। তার উপর মেয়েটার ব্যয়ভার। আপনি জানেন না ওর পিছনে কত খরচ!

নবাগত বলল, কোন মেয়েটার কথা বলছেন?

কেন, যাকে আপনি গতকাল রাতে দেখেছেন, কসেত্তে। বখাটে চাষীগুলো আবার একে লার্ক পাখি বলে। আমরা কারো কাছে কোনও দান চাইতে পারি না বা দিতে পারি না। আজকাল আমাদের রোজগার খুব কম হয়, তার উপর দেনা শোধ দিতে হয়। এমন সরকার হয়েছে, আমাদের লাইসেন্স, কর ইত্যাদির ব্যাপারে কত টাকা চলে যায়। তার উপর আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়ে আছে। তাদের দেখতে হয়। পরের মেয়ে মানুষ করার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই।

কিছুটা ইতস্তত করার পর কাঁপা কাঁপা কুণ্ঠিত গলায় বলল, মনে করুন আমি মেয়েটাকে আপনাদের কাছ থেকে যদি নিয়ে যাই?

কে—কসেত্তেকে?

হ্যাঁ।

মাদাম থেনার্দিয়েরের লাল ম্লান মুখখানা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, হ্যাঁ মঁসিয়ে, ওকে নিয়ে যান। আপনি ওকে নিয়ে যান। ওর ভার নিন। কুমারীমাতা মেরী আপনার মঙ্গল করবেন। স্বর্গের সাধুরা আপনাকে আশীর্বাদ কববেন।

ঠিক আছে, আমি ওকে নিয়ে যাব।

সত্যিই কি আপনি ওকে নিয়ে যাবেন?

হ্যাঁ।

এখনি?

নিশ্চয। তাকে এখানে নিয়ে আসুন।

মাদাম থেনার্দিয়ের ডাক দিল, কসেত্তে!

নবাগত বলল, ইতিমধ্যে আমি আপনাদের টাকাটা দিয়ে দিই। কত হয়েছে বললেন?

এবার সে বিলটার দিকে তাকিয়ে কিছুটা চমকে উঠে বলল, তেইশ ফ্রাঁ!

এই বলে সে মাদাম থেনার্দিযেরের পানে তাকাল। তার দৃষ্টিব মধ্যে কিছুটা বিস্ময়ের একটা প্রশ্ন মেশানো ছিল।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, হ্যাঁ, মঁসিযে, তেইশ ফ্রাঁ।

নবাগত টেবিলের উপর পাঁচ ফ্রাঁ করে পাঁচটা মুদ্রা রাখল। তারপর বলল, ঠিক আছে। মেয়েটাকে নিয়ে আসুন।

এমন সময় থেনার্দিযের এসে ঘরে ঢুকে বলল, সিয়ের কাছে আমরা ছাব্বিশ স্যু পাব।

মাদাম থেনার্দিয়ের বলল, কেন?

থেনার্দিয়ের বলল, কুড়ি স্যু ঘরের জন্য আব ছয় স্যু রাতের খাওয়ার জন্য। আর কসেত্তের ব্যাপারে মঁসিযের সঙ্গে কথা বলছি। তুমি একটু বাইরে যাও তো।

মাদাম থেনার্দিয়ের ব্যাপারটা একমুহূর্তে বুঝে নিল। যখন প্রধান অভিনেতা মঞ্চের উপর এসে হাজির হয়েছে তখন সে নিজে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এসব ব্যাপার এক লহমায় বোঝার মতো তার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল।

থেনার্দিয়ের এবার নবাগতকে বসতে বলে নিজে দাঁড়িয়ে রইল। এবার তার মুখের উপর এক কৃত্রিম সরলতা আর একটা শান্ত ভাব ছিল।

থেনার্দিয়ের বলল, মঁসিয়ে, আমি মেয়েটাকে ভালবাসি।

কোন মেয়ে?

থেনার্দিয়ের বলল, আসক্তি জিনিসটা সত্যিই আশ্চর্যের। এখানে টাকার কথাটা বড় নয়। আমি টাকা চাই না, আমি মেয়েটাকে রেখে দিতে চাই।

কোন মেয়ের কথা বলছেন আপনি?

কেন, আমাদের কসেত্তের কথা। আপনি মেয়েটাকে নিয়ে যেতে চাইছেন না? ভদ্রলোকের মতো আমরা খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। আমি তাকে যেতে দিতে পারি না। সে চলে গেলে তার অভাবটা আমায় খুব বেশি অনুভব করতে হবে। আমি তাকে ছোট থেকে দেখে আসছি। একথা সত্যি যে তার জন্য খরচ হয় এবং তার দোষত্রুটিও আছে। এটাও ঠিক যে আমরা ধনী নই এবং একবার তার অসুখের জন্য আমাকে চারশো ফ্রাঁ খরচ করতে হয়। কিন্তু এই সব কিছুই আমরা ঈশ্বরের সেবা এবং পবিত্র কর্তব্য হিসাবে করে যাই। তার বাবা-মা কেউ নেই। আমি শৈশব থেকে লালন-পালন করছি তাকে। তাকে খাওয়াবার মতো সামর্থ্য আমার আছে। তাকে ছাড়া আমার চলবে না। স্নেহ কি বিষম বস্তু তা জানেন না। আমি নির্বোধ, আমার কোনও যুক্তিবোধ নেই। তাই বোকার মতো তাকে ভালবেসে যাই আর আমার স্ত্রীও তাকে ভালবাসে যদিও সে মাঝে মাঝে দোষ করলে কিছু শক্ত কথা বলে। তিরস্কার করে। ও আমাদের নিজের সন্তানের মতোই হয়ে গেছে। আমি চাই ও আমাদের বাড়িতে খেলে ও ছোটাছুটি করে বেড়াক।

নবাগত নীরবে তার মুখপানে তাকিয়ে রইল।

থেনার্দিয়ের আবার বলতে শুরু করল, মাপ করবেন মঁসিয়ে। কেউ কখনও কোনও পথিকের হাতে তার ছেলেকে তুলে দেয় না। আমি কি ঠিক বলছি না? অবশ্য যদিও আপনি পথিক হলেও ধনী এবং সৎ বলেই মনে হচ্ছে। আমি তার ভালর জন্যই একথা বললাম। আমি আশা করি আপনি তা বুঝতে পারবেন। মনে করুন, আমি তাকে যেতে দিলাম তার প্রতি আমার সব অনুভূতিকে দমন করে। কিন্তু তাই বলে তাকে চিরদিনের মতো চোখের আড়াল করতে পারি না। আমার জানা উচিত সে কোথায় থাকবে, যাতে আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতে পারি, যাতে সেও বুঝতে পারে তার পালকপিতা তার উপর লক্ষ্য রাখে। আমি আপনার নাম-ধাম কিছুই জানি না। আপনি যদি তাকে নিয়ে যান তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে আমার মনে, কসেত্তে কোথায় গেল? কি ঘটল তার জীবনে? আপনার পাসপোর্ট বা বাসস্থান সম্বন্ধে অন্তত একটুকরো কাগজ দেখান।

নবাগত থেনার্দিয়েরের উপর থেকে তার তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, মঁসিয়ে থেনার্দিয়ের, প্যারিস থেকে পাঁচ-দশ মাইলের মধ্যে কোথাও গেলে কখনো পাসপোর্টের দরকার হয় না। আমি যদি কসেত্তেকে নিয়ে যাই তাহলে ব্যাপারটার এইখানেই নিস্পত্তি ঘটবে চিরদিনের জন্য। আমার নাম বা বাসস্থানের কথা কিছুই বলা হবে না আপনাকে। আমার ইচ্ছা সে আর কখনো চোখ জুড়বে না আপনার সঙ্গে। তার এই বর্তমান জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই আমি। বলুন আপনি রাজী আছেন ?

দানবরা যেমন উচ্চস্তরের দেবতার উপস্থিতির কথা কোনও না কোনও লক্ষণ দ্বারা বুঝতে পারে থেনার্দিয়েরও তেমনি বুঝতে পারল প্রভূত নৈতিক শক্তিসম্পন্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে এবার তাকে লড়াই করতে হবে। এটুকু বোঝার মতো অন্তর্দৃষ্টি তার ছিল। গতকাল সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত সে হৈ-হুল্লোড় ও গান-বাজনায় মত্ত থাকলেও সে বারবার তার তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে নবাগতকে বারবার নিরীক্ষণ করেছে। এক নীতিগত কর্তব্যবোধ ও কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই এ কাজ করেছে সে। ফলে হলুদ কোটপরা নবাগতের কোনও অঙ্গভঙ্গি বা কথাবার্তাই দৃষ্টি এড়ায়নি তার। কসেত্তের প্রতি নবাগত কোনও আগ্রহ বা মমতা দেখাবার আগে সে এটা অনুমান করেছিল। সে বারবার কসেত্তের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছে তাকে। কসেত্তের প্রতি তার এই আগ্রহের কারণ কি ? তার কাছে থলেভরা টাকা থাকা সত্ত্বেও সে কেন এমন দীনহীনের মতো পোশাক পরে থাকে ? সারারাত ভেবেও এই সব বিভ্রান্তিকর বিরক্তিকর প্রশ্নের কোনও সংগত উত্তর খুঁজে পায়নি থেনার্দিয়ের। লোকটা কখনই কসেত্তের পিতা হতে পারে না। তবে কি সে তার পিতামহ ? কিন্তু তাহলে কেন সে দাবি জানাচ্ছে না কসেত্তের উপর ? তবে কে সে ? থেনার্দিয়েরের মাথাটা খারাপ হয়ে যেতে লাগল। সে অনেক কিছু অনুমান করল, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। তবু যখন সে বুঝল নবাগতের জীবনে কিছু একটা গোপন ব্যাপার আছে যা সে গোপন রাখতে চায় তখন সে তার নিজের দিকটাকে জোরালো ভাবল। আবার যখন দেখল নবাগত কোনওক্রমেই তার রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে চায় না, বরং চাপ দেওয়া সত্ত্বেও সে রহস্যের আবরণটা আরও জোর করে জড়িয়ে নিতে চায় তখন সে হতাশ না হয়ে পারল না। সে তখন ঠিক করল এইভাবে পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি না করে তার আসল কথাটা খোলাখুলিভাবে সোজাসুজি বলা উচিত। অভিজ্ঞ সেনানায়কের মতো একনজরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে থেনার্দিয়েরের।

সে বলল, মঁসিয়ে, আমি পনেরশো ফ্রাঁ চাই।

নবাগত সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চামড়ার প্যাকেট থেকে পাঁচশো ফ্রাঁর তিনটে ব্যাঙ্কনোট বার করে টেবিলের উপর রাখল। তারপর বলল, নিয়ে আসুন কসেত্তেকে।

এদিকে কসেত্তে সেদিন সকালে জেগে উঠেই তার সেই একপাটি কাঠের কদাকার

জুতোটার মধ্যে একটা স্বর্ণমুদ্রা পেল। মুদ্রাটা কুড়ি ফ্রাঁর। মুদ্রাটা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর বেরিয়েছে। যদিও এ মুদ্রা সে কখনো দেখেনি এর আগে এবং কত দাম তা সে জানে না, তবু সে এটা পেয়ে খুশি হয়ে সে তার জামার পকেটে রাখল। কোথা হতে সে মুদ্রাটা এসেছে এটাও বুঝতে পারল সে। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হচ্ছিল তার। আনন্দের থেকে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল বেশি। এই সব অকাতর দান, এত সুন্দর সুন্দর উপহার দেখে সে সত্যিই ভীত হয়ে পড়েছিল। এই দামী পুতুল আর এই স্বর্ণমুদ্রার মতো ঐশ্বর্যের জৌলুসভরা জিনিস দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকে সে। তবে অবশ্য এই সব জিনিস যে তাকে দিয়েছে সেই নবাগতকে দেখে কিন্তু তার ভয় করে না, বরং এক পরম আশ্বাস খুঁজে পায় তার জীবনে। গতকাল সন্ধে থেকে এক পরম বিস্ময়ের সঙ্গে সর্বক্ষণ এই অচেনা অজানা লোকটির কথা ভেবেছে। ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নে তাকে দেখেছে। লোকটিকে দেখে গরীব, বৃদ্ধ ও বিষণ্ন মনে হলেও সে ধনী এবং দয়ালু। গত সন্ধ্যায় সেই অন্ধকার বনভূমিতে লোকটির সঙ্গে দেখার পর থেকে কসেত্তের গোটা জীবনটার মধ্যেই যেন এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। বনের পক্ষীশাবকদের মতো সে তার মায়ের ডানার তলায় কোনওদিন কোনও নিশ্চিন্ত আশ্রয় পায়নি। যখন থেকে সে তার জীবনের কথা মনে করতে পারছে সেই পাঁচ বছর থেকে আজ পর্যন্ত সে শুধু ভয়ে কেঁপে এসেছে। সহায়-সম্বলহীন একটি নিঃসঙ্গ আত্মা ক্রমাগত বয়ে যাওয়া চরম দুর্ভাগ্যের হিমশীতল এক প্রচণ্ড ঝড়ের সামনে সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে নীরব নিরুচ্চার এক বেদনায় কাঁপতে থেকেছে। এখন মনে হলো তার, তার সে আত্মা আর অনাবৃত নেই। সে আর নিঃসঙ্গ বা অসহায় নয়। এখন আর সে তার মালিকপত্নীর ভয়ে ভীত নয় আগের মতো। এখন একজন তার পাশে আছে। প্রতিরক্ষাগত এক উত্তপ্ত আশ্বাসে তার অসহায় নিঃসঙ্গতার যত সব হিমশীতল বেদনা কোথায় উবে গেছে।

এই সব চিন্তা-ভাবনা নিয়ে তার সকালের কাজে যথারীতি মন দেয় কসেত্তে। সে প্রথমে সিঁড়িগুলোতে ঝাঁট দিতে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে কাজ ফেলে, কাজের কথা ভুলে থমকে দাঁড়িয়ে তার পকেটের ভিতর চকচকে স্বর্ণমুদ্রাটাকে দেখতে থাকে।

এমন সময় মাদাম থেনার্দিয়ের এসে শান্ত কণ্ঠে তাকে বলে, তোমাকে এখনি আসতে হবে।

কসেত্তে নিচের তলায় নেমে এলে নবাগত তার পুঁটলি খুলে আট বছরের এক মেয়ের উপযুক্ত দামী পশমী পোশাক, মোজা আর জুতো বার করে দিল। তার সঙ্গে একটা শালও আছে। সব পোশাকের রংগুলো কালো।

নবাগত বলল, এইগুলো সব তোমার। যত তাড়াতাড়ি পার, পরে নাও।

সেই মঁতফারমেলে সকাল হতেই বাড়ির সদর দরজা খুলতে শহরের অনেকেই দেখল দীনহীনের মতো পোশাকপরা একটি লোকের সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে দামী পোশাক পরে একটা বড় পুতুল হাতে রু দ্য প্যারিসের পথে হেঁটে চলেছে। ওরা

যাচ্ছে লিভরির পথে। লোকটি কে তা শহরের কেউ চিনতে পারল না। ভাল পোশাক পরে থাকায় কসেত্তেকেও চিনতে পারল না তারা।

কোথায় কার সঙ্গে যাচ্ছে তা কসেত্তে নিজেও জানত না। সে শুধু জানত চিরদিনের মতো থেনার্দিয়েরদের বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে সে। কেউ তাকে বিদায় দেয়নি সে বাড়ি থেকে, সেও বিদায় জানায়নি কাউকে। সে যেমন এতদিন ধরে এক তীব্র ঘৃণা পেয়ে এসেছে তাদের কাছ থেকে তেমনি তাদের প্রতিও এক তীব্র ঘৃণা নিয়েই সে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এতদিন সে তার কোনও সহজাত অনুভূতিকেই প্রকাশ করতে পারেনি।

গম্ভীরভাবে পথ হেঁটে চলেছিল কসেত্তে। মাঝে মাঝে বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছিল মুক্তনীল আকাশের পানে। জীবনে আজ প্রথম মুক্তির আনন্দ অনুভব করল সে। তার উপর স্বর্ণমুদ্রা আর পুতুল। স্বর্ণমুদ্রাটাকে তার নতুন অ্যাপ্রনের পকেটে রেখেছিল আর মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখছিল। এক একবার সে নিঃশব্দে পথ চলতে থাকা তার পাশের লোকটিকেও দেখছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন ঈশ্বরের অনেক কাছে চলে এসেছে।

১০

মাদাম থেনার্দিযের তার অভ্যাসমতো বড কিছু প্রাপ্তির আশায স্বামীকে নবাগতের কাছে ছেড়ে দিযে অন্যত্র চলে গেল। নবাগত কসেত্তেকে নিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে যাবার মিনিট পনের পর থেনার্দিয়ের তার স্ত্রীকে ডেকে পনেরশো ফ্রাঁ দেখাল।

কিন্তু মাদাম থেনার্দিযের তাতে রুষ্ট হযে বলল, শুধু এই পেলে ?

গুরুত্বপূর্ণ সব কাজে স্বামীকে বরাবর সমর্থন করে আসছে মাদাম থেনার্দিয়ের। একমাত্র এই ব্যাপারেই জীবনে আজ প্রথম প্রতিবাদ কবল সে তাব স্বামীর কাজের।

কথাটার আঘাতে হুঁশ হলো তার স্বামীর।

থেনার্দিয়ের বলল, ঠিক বলেছ, আমিই বোকা। আমার টুপিটা কোথায় ?

এই বলে সে নোটগুলো পকেটে ভবে রেখে বেরিযে গেল বাড়ি থেকে। কিন্তু সে বাঁ দিকে না গিয়ে ডান দিকের পথ ধরল। তারপর যখন পথে একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানল একটা ভবঘুরের মতো লোক একটা মেযেকে সঙ্গে করে উল্টো দিকে গেছে তখন সে ঘুরে আবার ঠিক পথ ধবল। সে লিভরির পথে জোরে ছুটতে লাগল।

পথে ভাবতে লাগল থেনার্দিযের, হলুদ কোটপরা লোকটা নিশ্চয় লক্ষপতি আব আমি বোকা। প্রথমে সে কুড়ি স্যু দেয তারপর পাঁচ ফ্রাঁ। তারপর পঁচিশ আর তারপর পনেরশো ফ্রাঁ। এত সব দেয় প্রতিবাদের একটা কোনও না তুলে। তাকে জোর করে চেপে ধরলে সে নিশ্চয় পনের হাজার ফ্রাঁ দিত। যাই হোক, আমি তাকে ধরে ফেলব।

তাছাড়া তার সেই পুঁটলিটাতে মেয়েটার সব পোশাক আগে হতেই নিযে এসেছিল। এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক ব্যাপাব। ও কি করে কসেত্তেকে চিনল, তার জন্য পোশাকই

বা আনল কি করে? ধনীদের রহস্য কে জানে? তাদের কাছ থেকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় কিভাবে করতে হয় তা জানতে হয়। তাই সে বারবার ভাবতে লাগল, 'আমি বোকা'।

মঁতফারমেল গাঁটাকে পিছনে ফেলে লিভরি যাবার পথের মোড়ে এলেই দেখা যায় সামনে এক বিরাট প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে পথটা চলে গেছে। থেনার্দিয়ের ভাবল এইখানে সে লোকটার দেখা পাবে। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে সে কিছুই দেখতে পেল না। এইখানে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করতে হলো। কিছুটা সময় নষ্ট হলো। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানল, তারা গ্যাগনির দিকে একটা বনের মধ্যে দিয়ে গেছে।

এ অঞ্চলের সব পথঘাট চেনা ছিল থেনার্দিয়েরের। সে তাড়াতাড়ি সেইদিকে চলে গেল। মেয়েটা নিশ্চয় বেশি জোরে হাঁটতে পারবে না।

হঠাৎ থেমে কপালে একটা হাত দিয়ে কি দেখতে লাগল থেনার্দিয়ের। সে নিজের মনে মনে বলল, আমার বন্দুকটা আনা উচিত ছিল।

উপর থেকে দেখলে মনে হবে থেনার্দিয়ের একজন সৎ ব্যবসায়ী। একজন শান্ত নিরীহ নাগরিক। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে স্বার্থপূরণের উপযুক্ত সুযোগ পেলে সে এক পুরো শয়তান হয়ে উঠতে পারে। সে ব্যবসায়ী হলেও আসলে সে একটা রাক্ষস।

কিছুক্ষণ ভেবে সে ঠিক করল তাদের সন্ধানে এখন কালবিলম্ব না করে এগিয়ে যাবে। এখন ফিরে গিয়ে বন্দুক আনতে গেলে তারা তার নাগালের বাইরে চলে যাবে। শিকারের গন্ধে উন্মত্ত খেঁকশিয়ালের মতো সে ছুটতে লাগল। অবশেষে বড় প্রান্তরটা পার হয়ে একটা পাহাড়ের ধারে একটা বনের প্রান্তে একটা টুপি দেখতে পেল। থেনার্দিয়েরের মনে হলো ওরা এক জায়গায় বসে আছে। মেয়েটার পুতুলের মাথাটা দেখা যাচ্ছে।

সে ঠিকই ভেবেছিল। কসেত্তের বিশ্রামের জন্য লোকটা কিছুক্ষণ বসেছিল সেখানে।

থেনার্দিয়ের তাদের সামনে গিয়ে সরাসরি বলল, মাপ করবেন মঁসিয়ে, আমি আপনার পনেরশো ফ্রাঁ ফিরিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে সে তিনটে ব্যাঙ্কনোট দেবার জন্য তুলে ধরল।

নবাগত তার মুখপানে তাকিয়ে বলল, এর মানে?

থেনার্দিয়ের গম্ভীরভাবে বলল, এর মানে মঁসিয়ে আমি কসেত্তেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

কসেত্তে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে লোকটিকে জড়িয়ে ধরল।

নবাগত থেনার্দিয়েরের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনি কসেত্তেকে নিয়ে যাবেন?

থেনার্দিয়ের বলল, হ্যাঁ মঁসিয়ে। আমি অনেক ভেবেছি। তাকে আপনার হাতে তুলে দেবার আমার কোনও অধিকার নেই। আমার একটা সম্মান আছে। মেয়েটা আমার নয়, ওর মা আমার কাছে ওকে রেখে গেছে। সুতরাং তার মায়ের হাতেই আমাকে তুলে দিতে হবে তাকে। আপনি হয়ত বলবেন তার মা-বাবা মারা গেছে।

কিন্তু সে ক্ষেত্রে যে লোক তার মায়ের সই করা কোনও চিঠি দেখাবে তারই হাতে তুলে দিতে হবে মেয়েটাকে। এই চিঠি খুবই আবশ্যক।

নবাগত তার পকেট থেকে আবার সেই চামড়ার প্যাকেটটা বার করল। তাতে অনেক ব্যাঙ্কনোট ছিল।

থেনার্দিয়ের ভাবল লোকটা তাকে আবার টাকার ঘুষ দিতে আসছে। এই সময় তার বন্দুকটা থাকলে ভাল হত।

নবাগত প্যাকেটটা বার করার আগে তার চারদিকে একবার তাকাল। জায়গাটা একেবারে নির্জন। কেউ কোথাও নেই। প্যাকেটটা খুলে নোটের পরিবর্তে সে একটা কাগজ বার করল। কাগজটা ভাঁজ করে সে থেনার্দিয়েরের হাতে তুলে দিল।

নবাগত বলল, আপনি এটা চেয়ে ঠিকই করেছেন। দয়া করে পড়ে দেখুন। থেনার্দিয়ের দেখল একটা ছোট্ট চিঠি। সে পড়তে লাগল,

মন্ত্রিউল-সুর-মের
২৫শে মার্চ, ১৮২৩ সাল

মঁসিয়ে থেনার্দিয়ের,

আপনি পত্রবাহকের হাতে কসেত্তেকে দিয়ে দেবেন। আপনার পাওনা টাকা সব শোধ করে দেবেন উনি। আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

ফাঁতিনে

নবাগত বলল, আপনি স্বাক্ষরটা বুঝতে পারছেন?

থেনার্দিয়ের বুঝতে পারল, হাতের লেখাটা যে ফাঁতিনের সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কোনও উত্তর খুঁজে পেল না থেনার্দিয়ের। দু'দিক থেকে রাগ হতে লাগল। নবাগতের কাছ থেকে আর কোনও টাকা পাওয়ার কোনও অবকাশ বা উপায় রইল না। তার উপর তাকে হার মানতে হলো।

নবাগত বলল, আপনি চিঠিটা প্রমাণ হিসাবে রেখে দিতে পারেন।

থেনার্দিয়ের একবার শেষ চেষ্টা করে বলল, সইটা ভালভাবেই জাল করা হয়েছে। তবু যাই হোক, আপনি যখন চিঠিটা এনেছেন আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। তবে লেখা আছে আমার সব পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সে তো অনেক টাকা হবে।

নবাগত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মঁসিয়ে থেনার্দিয়ের, কসেত্তের মা গত জানুয়ারি মাসে বলেছিল তার কাছ থেকে আপনি একশো কুড়ি ফ্রাঁ পাবেন। ফেব্রুয়ারি মাসে আপনি পাঁচশো ফ্রাঁর এক বিল পাঠান। আপনি ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে তিনশো ফ্রাঁ আর মার্চের শেষে তিনশো ফ্রাঁ পান। তারপর ন' মাস কেটে গেছে। মাসে পনের ফ্রাঁ করে দেবার কথা হয়েছে। তাহলে এই ন'মাসের জন্য আপনার পাওনা হয় একশো পঁয়ত্রিশ ফ্রাঁ। আপনাকে প্রথমেই একশো ফ্রাঁ অগ্রীম দেওয়া হয়েছিল। তাহলে আপনি সব বাদ দিয়ে মাত্র পঁয়ত্রিশ ফ্রাঁ পাবেন। অথচ আপনাকে আমি পনেরশো ফ্রাঁ দিয়েছি।

থেনার্দিয়েরের মনে হলো সে ফাঁদেপড়া এক নেকড়ে। সে ভাবতে লাগল, কে এই শয়তান?

থেনার্দিয়ের তখন সব ভদ্রতা ঝেড়ে ফেলে বলল, হে নাম-না-জানা ভদ্র মহাশয়, আপনাকে আরও এক হাজার ফ্রাঁ দিতে হবে। তা না হলে আমি কসেত্তেকে নিয়ে যাব।

নবাগত শান্ত কণ্ঠে ডাক দিল, এস কসেত্তে।

সে বাঁ হাত দিয়ে কসেত্তেকে তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে তার ছড়িটা তুলে নিল মাটি থেকে। থেনার্দিয়ের ভাবল ছড়িটা লাঠির মতো, মাথায় গোল হাতল আছে। তার উপর জায়গাটা নির্জন। আর কোনও কথা না বলে নবাগত কসেত্তের হাত ধরে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। থেনার্দিয়ের সেখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বজ্রাহতের মতো। সে নবাগতের চওড়া কাঁধ আর হাতের মুঠোগুলোর সঙ্গে তার নিজের রোগা রোগা চেহারাটার তুলনা করে ভয় পেয়ে গেল। সে নিজের মনে বলতে লাগল, আমি কি বোকা, সঙ্গে বন্দুকটা শিকার করতে যাচ্ছি বলে আনতে পারতাম।

তবু সে আশা ছাড়ল না। সে ভাবল, ওরা কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে তা অন্তত দেখব।

এই ভেবে সে ওদের অনুসরণ করতে লাগল। এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল যে ফাঁতিনের সই করা একটা চিঠি হাতে পেয়েছে। তাতে অবশ্য তার কোনও লাভ হবে না। কিন্তু পনেরশো ফ্রাঁ সে পেয়েছে।

নবাগত কসেত্তেকে সঙ্গে নিয়ে লিভরির দিকে এগিয়ে চলেছিল। এক বিষণ্ন চিন্তায় মাথাটা নত করে পথ হাঁটছিল সে। শীতের মরশুমে সব গাছের পাতা ঝরে যাওয়ায় বনের ফাঁকে ফাঁকে তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। এরপর লোকটা কসেত্তেকে নিয়ে কতকগুলো গাছের জটলার আড়ালে চলে গেল। থেনার্দিয়ের আর তাদের দেখতে পেল না। 'একটা আস্ত শয়তান' এই বলে সে তাদের ধরার জন্য ছুটতে লাগল।

বনটা সেখানে ঘন থাকায় উভয় পক্ষের পথ চলায় অসুবিধা হচ্ছিল। থেনার্দিয়ের যথাসম্ভব গাছের আড়ালে আড়ালে অনুসরণ করলেও নবাগত একসময় পিছন ফিরে তাকে দেখতে পেল। সে মাথা নেড়ে আবার পথ চলতে লাগল। থেনার্দিয়ের তবু অনুসরণ করতে থাকায় নবাগত আবার পিছন ফিরেই তাকে দেখতে পেল। কিন্তু এবার সে থেনার্দিয়েরের পানে এমন ভয়ঙ্করভাবে তাকাল যে থেনার্দিয়ের বুঝল আর অনুসরণ করা উচিত নয় তার পক্ষে। তাই সে ঘুরে বাড়ির পথে রওনা হলো।

১১

সমুদ্রে পড়ে গিয়ে জাঁ ভলজাঁর মৃত্যু হয়নি। আমরা জানি সে যখন জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে পড়ে যায় অথবা নিজে থেকেই ঝাঁপ দেয় তখন তার পায়ে শিকল ছিল না। সে জলের মধ্যে দিয়ে সাঁতার কেটে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা জাহাজের পাশে একটা নৌকোয় গিয়ে ওঠে এবং রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত সেই নৌকোর মধ্যে

লুকিয়ে থাকে। অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার পর সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে ক্যাপ ব্রান থেকে কিছু দূরে কূলের উপর একটা জায়গায় ওঠে। তার কাছে টাকা থাকায় তাই দিয়ে জামা-প্যান্ট কিনে নেয়। তারপর সে বানাগিয়েরের কাছে একটা মদের দোকানে গিয়ে ওঠে। সেই দোকানে পলাতক কয়েদীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হত। এরপর জাঁ ভলজাঁ অন্যান্য পলাতক কয়েদীদের মতো অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পথ চলতে থাকে এক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। সে প্রথমে বোসেতের কাছে লে পার্দো নামে এক জায়গায় আশ্রয় পায়। সেখান থেকে হতেস আল্পস-এর অন্তর্গত ব্রিয়াক নামে একটা গাঁয়ে যায়। এইভাবে ছুঁচোর মতো লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে সেখানে বেড়াত। পরে সে পীরেনীজের অন্তর্গত একটা গাঁযে এবং তাব কাছাকাছি পেরিগো নামে আর একটা গাঁয়ে যায়। সেখান থেকে কালক্রমে প্যারিস এবং পরে প্যারিস থেকে যায় মঁতফারমেলে।

প্যারিসে গিয়ে সে প্রথমে একটা ঘর ভাড়া করে এবং তারপর আট বছরের মেয়ের জন্য শোকসূচক কালো পোশাক কেনে। পরে পুলিশ জানতে পারে মন্ত্রিউল-সুর-মেরের পুলিশ হাজত থেকে পালাবার পর ভলজাঁ একবার মঁতফারমেল ও তার পাশাপাশি এলাকায় যায়। কিন্তু জেলের কয়েদী হিসাবে কাজ করতে করতে একটা লোককে বাঁচাবার পর সমুদ্রের জলে যখন সে পড়ে যায় তখন সবাই ভাবে সে মারা গেছে। পুলিশের এখনো ধারণা সে আর জীবিত নেই। ভলজাঁ নিজেও খবরের কাগজে প্রকাশিত তার মৃত্যুর খবরটা দেখে আশ্বস্ত হয়। তার মনে হয় সে সত্যিই মারা গেছে।

মঁতফারমেল থেকে কসেত্তেকে উদ্ধার করার পর ভলজাঁ তাকে প্যারিসে নিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর প্যারিসে পৌঁছবার পর একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে এসপ্লানেদ দ্য অবজারভেটোরির কাছে গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে কসেত্তের হাত ধরে নির্জন গলিপথ দিয়ে বুলভার্দ দ্য হপিতালে গিয়ে ওঠে।

একটা দিনের মধ্যে কসেত্তের জীবনে কত আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়। পথে কখনো পায়ে হেঁটে কখনো গাড়িতে আসে তারা। পথের ধারে যেসব দোকান পায় তার থেকে রুটি আর মাখন কিনে বনের মধ্যে বসে দু'জনে খায়। পথ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কসেত্তে। তবু সে তার ক্লান্তির কথা বলেনি। একসময় ভলজাঁ তার ক্লান্তির কথা বুঝতে পেরে তাকে পিঠের উপর চাপিয়ে পথ হাঁটতে থাকে। কসেত্তে হাতের পুতুলটা ধরে তার ঘাড়ে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

আজ হতে চল্লিশ বছর আগে কেউ যদি ঘুরতে ঘুরতে সালপেত্রিয়ের পার হয়ে বুলভার্দ দ্য হপিতালে আসত এবং সেখান থেকে ব্যারিয়ের দ্য ইতালির পথে এগিয়ে যেত তাহলে তার মনে হত এটা হচ্ছে এমনই এক অঞ্চল যেখান থেকে প্যারিস

শহরটা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। সে বেশ বুঝতে পারত এটা কোনও অরণ্য নয়, কারণ সেখানে মানুষ বাস করে। এটা কোনও গ্রাম বা গ্রামাঞ্চল নয়, কারণ সেখানে বড় বড় চওড়া রাস্তা এবং বড় বড় পাকা বাড়ি আছে যা সাধারণত গাঁয়ে নেই। আবার ঠিক খাঁটি শহরও বলা যায় না, কারণ সেখানকার রাস্তাগুলো কাঁচা এবং তাতে ঘাস গজিয়ে উঠেছে। তবে জায়গাটা কি ? এটা প্যারিসেরই এক রাস্তা, যে রাস্তা রাত্রিবেলায় অরণ্যের থেকেও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে আর দিনের বেলায় সমাধিভূমির থেকেও নির্জন আর বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এ অঞ্চলটা আগে ছিল ঘোড়ার হাট যার নাম ছিল মার্শে-অ-শেভো।

বাজারের ভাঙা দেওয়ালগুলোর বাইরে র‍্যু দ্য পেতিত ব্যাঙ্কিয়েরের ওধারে দেওয়ালঘেরা একটা জায়গা আছে। কেউ যদি সেদিকে এগিয়ে যায় তাহলে দু'দিকে দুটো বাগানবাড়ির মাঝখানে একটা কারখানার কাছে পুরনো আমলের একটা কটেজ ধরনের বাড়ি দেখতে পাবে। বাড়িটা কটেজ ধরনের দেখতে একতলা হলেও সামনে থেকে যতটা ছোট মনে হয় আসলে তা নয়। আসলে বাড়িটা এক বড় গীর্জার মতোই বড়। সামনে থেকে শুধু বাড়িটার একটা মাত্র জানালা দেখা যায়। জায়গাটার নাম ভিগনে সেন্ট মাইকেল।

বাড়িটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে কারণে আশ্চর্য লাগে সেটা হলো এই যে বাড়িটার দরজাগুলো কটেজ ধরনের বাড়িটার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেলেও তার জানালাগুলো অট্টালিকা ধরনের এক বাড়ির উপযুক্ত। তাছাড়া দরজাগুলো কেনা ছিল না; এখান-সেখান থেকে কাঠ যোগাড় করে তৈরি করা হয়। সামনের দরজাটা খুললেই সামনেই চওড়া সিঁড়ি পাওয়া যায়। বাইরে থেকে মনে হয় একটা যেন বড় মই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। দরজার মাথার উপর একটা তিনকোণা ঘুলঘুলি আছে যাতে দরজা বন্ধ থাকলে তার মধ্যে দিয়ে আলো-বাতাস ঢুকতে পারে। দরজার ভিতরে কপাটের উপর ৫২ আর কপাটের উপর ৫০ লেখা আছে। একটা ময়লা কম্বল পর্দার মতো ঘুলঘুলির ফাঁকটা ঢেকে আছে। অতীতে এখানে এক হত্যাকাণ্ড ঘটে যার রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। এই হত্যাকাণ্ড ফতেনব্লো হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত। এর কিছুদূর আগে ক্রোলগর্বে নামে একটা জায়গা আছে যেখানে উলবাক নামে একটা লোক এক ছাগলওয়ালীকে কোনও এক ঝড়ের রাতে হত্যা করে। কতকগুলো এলম গাছ জটলা পাকিয়ে হত্যাকাণ্ডের জায়গাটাকে লোকচক্ষু থেকে আড়াল করে আছে।

সাঁইত্রিশ বছর আগে ৫০-৫২ নম্বর এই বাড়িটা এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জায়গা ছিল। ভাল ও ভদ্র বাসিন্দাদের বাড়িগুলো তৈরি হতে শুরু হয় তার পঁচিশ বছর পরে। বধ্যভূমি ছাড়াও এ জায়গায় মেয়েদের একটা পাগলাগারদও ছিল। এ অঞ্চলে এলে পর যে দিকেই দৃষ্টি যাবে দেখা যাবে শুধু কশাইখানার মতো বাড়িগুলো এক একটি হত্যাকাণ্ডের ভয়ঙ্কর সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও জায়গা দেখে যদি ভয়ঙ্কর এক নারকীয় যন্ত্রণার কথা, হত্যা আর মারাত্মক পীড়নের কথা মনে পড়ে যায় তাহলে বুলভার্দ দ্য হপিতাল হলো তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়।

কিন্তু বিশেষ করে শীতকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সব আলো নিভে যায়, যখন সারাদিন ধরে এলম গাছের পাতাগুলো ঝরবার কাজ করে হিমেল বাতাসে স্তব্ধ হয়ে যায়, যখন কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে কোনও তারা দেখা যায় না, যখন বাতাসের সাহায্যে মেঘের এক একটা অংশ কিছুটা কাটিয়ে দিয়ে চাঁদের আলো বেরিয়ে আসে তখন ঐ বুলভার্দ অঞ্চলটা হয়ে ওঠে আরও ভয়ঙ্কব। এ অঞ্চলের সীমারেখাগুলো অন্তহীন এক ঘন কালো ছায়ার মধ্যে ডুবে যায়। এক ভয়াবহ্ নির্জনতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বহু হত্যাকাণ্ডের আধারভূমি এই জায়গাটা পথচারীর মনে কত অশুভ দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করে। ঝোপঝাড় আর গাছগুলোর মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গাগুলোকে এক একটা মৃত্যুর ফাঁদ বলে সন্দেহ হয়। ছায়াঘন প্রতিটি জায়গাকেই মৃত্যুকুটিল এক একটা সমাধিগহ্বর বলে সন্দেহ হয। দিনের বেলায় জায়গাটা কুৎসিত দেখায়, সন্ধ্যার সময় বিষণ্ন দেখায়, আর রাত্রিবেলায় ভয়ঙ্কর দেখায়।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় গাছগুলোর তলায় অনেক বৃদ্ধা বৃষ্টির জলে-ভেজা আধপচা কাঠের রেকে বসে থাকে ভিক্ষাপাত্র হাতে।

এ ছাড়া বুলভার্দের বাকি অঞ্চলটায় দিনে দিনে কত পরিবর্তন ঘটেছে। ফবুর্গের পাশ দিয়ে প্যারিস থেকে অর্লিয়ান্সের পথে যে রেলপথ চলে গেছে সেই রেলপথের দৌলতেই এ অঞ্চলের যতকিছু উন্নতি। এই অঞ্চলেই বিপ্লবের ঢেউটা বেশি জোরে আছাড় খেয়ে পড়ে, গণ-অভ্যুত্থান তীব্রতর হয়ে ওঠে। মনে হয় সভ্যতার বেগবান ঘোড়াটা কয়লা আর আগুনের শিখা গ্রাস করতে করতে এগিয়ে যায়, কলুষিত পৃথিবীর মাটি মানুষের মতো সব প্রাচীন আবাসগুলোকে যেন খেয়ে ফেলে আর সেই সব জায়গায় গড়ে ওঠে নতুন আবাস। প্যারিস-অর্লিয়ান্স লাইনের প্রান্তভাগে সালপেত্রিয়ের অঞ্চলের সরু রাস্তাটার দু'পাশের পুরনো বাড়িগুলো যানবাহনের ক্রমবর্ধমান চাপে বিলুপ্ত হয়ে যায় একে একে। এইভাবে ধীরে ধীরে এক নতুন শহর গড়ে ওঠে। এক নতুন জীবনের স্পন্দন দেখা দেয় সমস্ত অঞ্চল জুড়ে। যত সব নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা আর অখণ্ড নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যানবাহন আর লোকজনের চাপে। অবশেষে ১৮৪৫ সালের জুলাই মাসের কোনও এক সকালে সভ্যতার ছুটন্ত ঘোড়াটা রু্য লোসিনে পর্যন্ত এগিয়ে আসে আর প্যারিস শহরটা নিজেকে প্রসারিত করে ফবুর্গ সেন্ট মার্কোর দিকে চলে আসে।

২

গোর্বোতে একটা বাড়ির সামনে এসে থেমে যায় জাঁ ভলজাঁ। কোনও শিকারী পাখির মতো বাসা বাঁধার জন্য দূরতম কোনও নির্জন প্রদেশের খোঁজ করছিল সে। কসেত্তেকে তখনো সে বয়ে বেড়াচ্ছিল পিঠের উপর। তার কোটের পকেটে যে চাবিটা ছিল সেটা বার করে একটা ঘরের দরজা খুলে তার মধ্যে ঢুকে পড়েই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সিঁড়ির উপর দিয়ে উঠে গেল উপরে।

দোতলার বারান্দায় উঠে আর একটা চাবি বার করে আর একটা ঘরের দরজা

খুলল সে। সে ঘরের মধ্যে ঢুকেও দরজাটা বন্ধ করে দিল। রাস্তার ধারে যে একটা ল্যাম্প পোস্ট ছিল তার আলোয় ঘরের ভিতরের অনেকখানি দেখা যাচ্ছিল। ঘরখানার আয়তনটা ছিল মাঝারি ধরনের। মেঝের উপর একটা তোষক পাতা ছিল। একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার ছিল এক জায়গায়। ঘরের এক কোণে একটা স্টোভ জ্বলছিল। ঘরের পিছন দিকে তার গায়ে আর একটা ছোট ঘর ছিল। সে ঘরে একটা ছোট বিছানা পাতা ছিল। জাঁ ভলজাঁ সেখানে গিয়ে কসেত্তেকে সেই ছোট বিছানাটায় শুইয়ে দিল। তাকে জাগাল না।

টেবিলে একটা বাতি প্রস্তুত হয়ে ছিল। কাছেই চকমকি আর লোহা ছিল। ভলজাঁ চকমকির সাহায্যে আগুন জ্বেলে বাতিটা জ্বালাল। যে নিবিড় মমতা মানুষের আত্মাকে এক সমুন্নতির স্তরে নিয়ে যায় সেই মমতার সঙ্গে গতকালকের মতো কসেত্তের মুখপানে তাকিয়ে রইল জাঁ ভলজাঁ। যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস মানুষের মনে দারুণ জোর নিয়ে আসে অথবা সে মনকে একটা স্বেচ্ছাকৃত দুর্বলতার স্রোতে ভাসিয়ে দেয় সেই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে সে কোথায় কার কাছে আছে তা জেনেই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। নত হয়ে কসেত্তের একটা হাত টেনে নিয়ে চুম্বন করল সে। আজ হতে নয় মাস আগে তার মাও এমনি করে ঘুমিয়ে পড়লে তার হাত চুম্বন করে সে। সেদিনকার মতোই আজও এক ধর্মীয় অনুভূতি অপরিসীম বেদনা আর অপার করুণায় বিগলিত হয়ে তার মর্মকে ভেদ করল। নতজানু হয়ে সেদিনকার মতো প্রার্থনা করতে লাগল সে।

পরদিন সকালবেলায় দেখা গেল কসেত্তে তখনো ঘুমোচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে শীতের ম্লান রোদ এসে ঘরের কড়িকাঠগুলো ধরে যেন ঝুলছিল। কম্পিত আলোছায়ার খেলা চলছিল ঘরখানার মধ্যে। হঠাৎ রাস্তার উপর একটা বড় মালবোঝাই গাড়ির চাকার ঘর্ঘর আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ঘুমের ঘোরেই বলে উঠল, যাচ্ছি মাদাম। আমার ঝাঁটাটা কোথায় ?

এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজা খুঁজতে লাগল সে। এমন সময় জাঁ ভলজাঁর হাসিমাখা মুখখানা দেখেই বলল, সুপ্রভাত মঁসিয়ে। তাহলে দেখছি সব সত্যি।

আনন্দ আর উল্লাস যেন বাচ্চাদের এক সহজাত অনুভূতি, তাদের মনের এক স্বাভাবিক অঙ্গ। তাই যেকোনও অবস্থাতেই তারা অতি সহজেই আনন্দে মেতে উঠতে পারে, এক সরল সুখানুভূতিতে গা ঢেলে দিতে পারে। বিছানার তলার দিকে ক্যাথারিন নামে তার পুতুলটাকে পড়ে থাকতে দেখে সেটাকে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। তারপর জাঁ ভলজাঁকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল, আমরা এখন কোথায় আছি ? প্যারিস কি খুব একটা বিরাট শহর ? মাদাম থেনার্দিয়ের কি অনেক দূরে আছে ? সে কি তাদের কাছে আসবে ?

সহসা বলে উঠল, জায়গাটা কত সুন্দর !

তাদের ঘরটা ছিল ছাদের ঘর। কসেত্তে নিজেকে মুক্ত এবং নিরাপদ ভাবল।

কসেত্তে আবার জিজ্ঞাসা করল ভলজাঁকে, তুমি আমাকে দিয়ে ঘর ঝাঁট দেওয়াবে না তো ?

জাঁ ভলজাঁ বলল, না, তুমি শুধু আনন্দ করে বেড়াবে।

এইভাবে দিনটা কেটে গেল। কি ঘটেছে না ঘটেছে, কি কারণে সে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এল তা জানতে চাইল না সে। শুধু তার ত্রাণকর্তা আর পুতুলটাকে নিয়ে এক অনির্বচনীয় সুখের অনুভূতিতে আত্মহারা হয়ে রইল।

৩

পরদিনও সকাল হতেই কসেত্তের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল জাঁ ভলজাঁ। সে জেগে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা কবতে লাগল নীরবে।

সম্পূর্ণ নতুন একটা ভাব যেন ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠছিল তার অন্তরেব মধ্যে।

জীবনে সে কখনো কাউকে ভালবাসেনি। পঁচিশ বছব ধরে সে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে এসেছে। কারো সঙ্গে তার কোনও আত্মীয় সম্পর্ক নেই, সে কারো পিতা নয়, কারো প্রেমিক নয়, স্বামী নয়, বন্ধু নয়। জেলখানায় সে সব সময় নিরানন্দ, বিষণ্ন ও মনে মনে হিংস্র হয়ে থাকত। সেখানে কোনও কিছুই এই কয়েদীর অন্তরকে স্পর্শ করতে পারত না। তার বোন ও বোনের ছেলেমেয়েদের জন্য তার মনে যে চিন্তা ছিল তা ক্রমে দূরে সরে যেতে যেতে বিলীন হয়ে যায় অবশেষে। সে তাদের খুঁজে বার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু না পেয়ে ব্যর্থ হযে মন থেকে তাদের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেয়। মানবমনের এই হলো ধর্ম। তাব যৌবনের অন্যান্য স্মৃতিগুলোও কোথায় হারিয়ে গেল একে একে।

কিন্তু কসেত্তেকে দেখা এবং তাকে তার দাসত্ব থেকে মুক্ত ক ব আনার পর থেকে এক অনুভূতির অবতারণা হয় তার মধ্যে। ভালবাসাব সব অনুভূতিগুলো একসঙ্গে সজাগ হয়ে উঠে কসেত্তের পানে একটিমাত্র ধারায় পরিণত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। কসেত্তের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িযে ঘুমন্ত অবস্থায় তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিযে থাকা মানে এক রোমাঞ্চকর আনন্দের আবেগে বিকম্পিত হওযা। মাতৃসুলভ এক বেদনার্ত মমতার অনুভূতি জাগল তার মধ্যে, কিন্তু সে অনুভূতিব স্বরূপটাকে সে বুঝে উঠতে পারল না। অকস্মাৎ এক নবজাগ্রত ভালবাসার আবেগে অভিভত অন্তরের মতো গভীরতর ও মধুরতর আব কিছু হতে পারে না। সে আবেগের স্পর্শে বিষণ্ন বয়োপ্রবীণ অন্তরও নতুন হয়ে ওঠে সহসা।

যেহেতু জাঁ ভলজাঁর বযস তখন পঞ্চান্ন এবং কসেত্তেব বয়স আট, ভলজাঁর সমস্ত ভালবাসার ঐশ্বর্য শুধু স্নেহে ঘনীভূত হয়ে উঠল। বিশপ ভলজাঁকে একদিন গুণশীলতার কথা শেখান। আজ কসেত্তে তাকে ভালবাসা কি জিনিস তা শেখাল। প্রথম দু'-একটা দিন এই সব চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে কেটে গেল।

কসেত্তের মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা দিল। অথচ সে তা বুঝতে পারল না।

আর মা যখন তাকে হোটেলে রেখে চলে যায় তখন সে এত ছোট যে সে কথা তার মনে নেই। সকল অনাথ শিশুই আঙুরগাছের লতার মতো একটা শক্ত জিনিসকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠতে চায়। এই অবলম্বনের জন্য ভালবাসার এক সুদৃঢ় বনস্পতিকে খুঁজে পেতে চায়। কিন্তু তা পায়নি সে। ভালবাসার পরিবর্তে পেয়েছে শুধু ঘৃণা। থেনার্দিয়ের আর তাদের ছেলেমেয়েরা তাকে বরাবর ঘৃণা করে এসেছে। সে যেন তাদের বাড়িতে কুকুরের মতো ছিল। পৃথিবীতে কেউ তাকে চায়নি কোনওদিন। কেউ তাকে ভালবাসেনি। তার ফলে মাত্র আট বছর বয়সেই তার শিশু অন্তর ভালবাসার অভাবে নীরস হয়ে ওঠে, ভালবাসার সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তারপর জাঁ ভলজাঁকে কাছে পাওয়ার পর থেকে ভলজাঁই তার সকল চিন্তা ও অনুভূতির বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। আত্মোদ্ঘাটনের যে রহস্য আগে কখনো কোনওদিন অনুভব করেনি সে, সে রহস্য আজ প্রথম অনুভব করল।

ভলজাঁকে গরীব বা বৃদ্ধ বলে মনে হলো না কসেত্তের। বরং সে দেখতে সুন্দর বলেই মনে হলো। ঘৃণার মাঝে ভালবাসা, দুঃখের মাঝে সুখের স্পর্শ পেয়ে নতুন জায়গায় এসে নতুন জীবন শুরু করে মনটা যেন একেবারে নতুন হয়ে ওঠে কসেত্তের।

জাঁ ভলজাঁ আর কসেত্তের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের যে প্রকৃতিদত্ত ব্যবধান ছিল, নতুন পরিস্থিতি এক সেতুবন্ধনের দ্বারা সে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিল। নিয়তির অপ্রাকৃত শক্তি বয়সের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন দুটি প্রাণসত্তাকে এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিল। পরস্পরের সাহচর্য পরস্পরের নিঃসঙ্গতার সব বেদনাকে দূরীভূত করে দেয়। পিতার প্রতি এক সহজাত অভাববোধ ছিল কসেত্তের আর সন্তানের জন্য এক সহজাত অভাববোধ ছিল জাঁ ভলজাঁর। তাদের দু'জনের দেখা হওয়ার পর থেকে দু'জনের প্রয়োজনের পরিব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। একজন অন্যজনকে দেখেই তার অভাব ও প্রয়োজনীয়তার কথা জানতে পারে এবং সে অভাব পূরণ করতে থাকে। বিপত্নীক-এর মতো এক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করত জাঁ ভলজাঁ আর কসেত্তে ছিল পিতামাতাহীন এক অনাথা শিশু। অনাথা কসেত্তের পিতা হয়ে উঠল ভলজাঁ। সেদিন রাত্রিকালে বনভূমিতে ভলজাঁর উপর যে আস্থা স্থাপন করে কসেত্তে, সে আস্থা মিথ্যা হয়নি। তার জীবনে ভলজাঁর আবির্ভাব যেন স্বয়ং ঈশ্বরের আবির্ভাব।

তার আশ্রয় নির্বাচনের ব্যাপারে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করে ভলজাঁ। যে বাসা ভাড়া করে সে বাসার মধ্যে সে নিরাপদ বোধ করতে থাকে। তারা ছাদের উপর যে দুটো ঘর নিয়ে থাকত সেই ঘর দুটোর মধ্যে একটা মাত্র জানালা ছিল আর সে জানালাটা ছিল বাজারের দিকে। সেদিকে কোনও বাড়ি ছিল না। ফলে আশপাশের বাড়ির কোনও লোক তাদের জীবনযাত্রার কোনও কিছু দেখতে পেত না।

বাড়িটার নম্বর হলো ৫০-৫২। এর নিচের তলাটা বাজারের লোকেরা ভাড়া নিয়ে ঘরগুলোতে তাদের পণ্যদ্রব্যগুলো মজুত করে রাখত। নিচের তলায় কোনও লোক বাস করত না। উপরতলাতেও অনেকগুলো ঘর ছিল। সেইসব ঘরের একটাতে এক গরীব বুড়ি বাস করত। সেই বুড়িই জাঁ ভলজাঁর ঘরের সব কাজকর্ম করত। উপরতলার বাকি ঘরগুলো খালি পড়ে থাকত।

এই বৃদ্ধাই বাড়িটার দেখাশোনা করত। লোকে তাকে অবশ্য প্রধান ভাড়াটে বলে জানত। এই বছরেই খৃস্টের জন্মদিনে এই বৃদ্ধাই ঘরভাড়া দেয় জাঁ ভলজাঁকে। ভলজাঁ তাকে বলে সে কোথাও চাকরি করে না, তার সঞ্চিত টাকা থেকে তার খরচ চলে। একবার এক স্পেনদেশীয় লোককে টাকা ধার দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। আরও বলে সে তার নাতনিকে নিয়ে এখানে বাস করবে। সে একসঙ্গে প্রথমেই দু'মাসের ভাড়া অগ্রীম দিয়ে দেয়। ভলজাঁ ঘরভাড়া করেই বাইরে চলে যায়। যাবার সময় বৃদ্ধাকে বলে যায় সে যেন ঘরগুলো পরিষ্কার করে স্টোভটা জ্বালিয়ে রাখে। বৃদ্ধা তাদের আসার আগেই সব ঠিক করে রেখেছিল।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। দু'জনে সেই বাসাটার মধ্যেই বাস করতে লাগল। সকাল হলেই পাখির মতো শিশুরাও গান করে। কসেত্তে মনের সুখে সারাদিন হাসত, কথা বলত, গান করত। জাঁ ভলজাঁ মাঝে মাঝে তার ছোট লাল একটা হাত টেনে নিয়ে স্নেহভবে চুম্বন করত। যে কসেত্তে বরাবর মার খেয়ে এসেছে সে ভলজাঁর এই চুম্বনের অর্থ বুঝতে পারত না, কেমন যেন বিব্রত বোধ করত। এক-এক সময় সে তার কালো পোশাকটার কথা ভাবত। এখন তাকে আর ছেঁড়া পোশাক পরতে হয় না, কিন্তু শোকসূচক এই পোশাকের অর্থ সে বুঝতে পারল না।

ভলজাঁ কসেত্তেকে পড়তে-লিখতে শেখাল। সে জেলে থাকাকালে যতটুকু লেখাপড়া শেখে, কসেত্তেকে তাই শেখাতে থাকে। তার অর্জিত জ্ঞানবিদ্যা কসেত্তেকে দান করতে পারার সুযোগ পেয়ে খুশি হয় সে। কসেত্তেকে লেখাপড়া শিখিয়ে তাকে জীবনে সুখী করে তোলাই জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে ওঠে তার। তাকে পড়াতে পড়াতে মুখে হাসি ফুটে উঠত তার। তার মনে হত সে যেন এক অদৃশ্য মহান শক্তির ইচ্ছা পালন করছে। জীবনের এক মহান কর্তব্য সে করে যাচ্ছে। এক-এক সময় কসেত্তেকে তার মার কথা বলত ভলজাঁ। তার মার প্রার্থনার কথাগুলো তাকে বলতে শেখাত। কসেত্তে ভলজাঁকে 'বাবা' বলে ডাকত।

কসেত্তেকে দেখে, তার কথা শুনে ও তার পুতুল খেলা দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারত ভলজাঁ। কসেত্তে যখন তার পুতুলটাকে পোশাক পরাত ও সাজাত তখন একদৃষ্টিতে দেখত সে। বাঁচার এক নতুন আগ্রহ খুঁজে পেল ভলজাঁ। জীবন হয়ে উঠল অর্থময়, জগৎটাকে ভাল মনে হতে লাগল যা আগে কখনো মনে হয়নি। কারো প্রতি তার আর কোনও ক্ষোভ নেই, কোনও অভিযোগ নেই। এখন কসেত্তে তাকে ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে। এখন তাকে দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে। কসেত্তের সুমধুর সাহচর্যে আলোকিত এক ভবিষ্যতের ছবি ফুটে উঠত তার চোখের সামনে।

এটা আমাদের ব্যক্তিগত মত হলেও একথা বলতে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই যে জাঁ ভলজাঁ কসেত্তেকে ভালবাসতে শুরু করলেও সে যে সারাজীবন নীতি ও ধর্মের পথ ধরে চলবে সেবিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। এজন্য এক নৈতিক অবলম্বন দরকার। মন্ত্রিউল-সুর-মেরে নতুন জীবন শুরু করার পরও মানুষের হিংসা-দ্বেষ ও

সমাজের নিষ্ঠুরতার দিকগুলোর সম্মুখীন হয়েছে সে। সত্যের শুধু একটা দিকই দেখেছে। ফাঁতিনের মধ্যে সে দেখেছে নারীজাতির চরম দুর্ভাগ্য আর বিড়ম্বনা, জেভার্তের মধ্যে দেখেছে শাসন কর্তৃপক্ষের নির্মম প্রভুত্ব। দ্বিতীয়বার সে জেলে যায়, এবার কিন্তু এক মহৎ কারণেই স্বেচ্ছায় কারাদণ্ড তুলে নেয় নিজের মাথায়। কিন্তু আগের বারের মতো এবারেও শ্রমজনিত এক নিবিড় ক্লান্তি, দুর্বিষহ অবসাদ, আর সমাজের প্রতি অদম্য ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর তিক্ততা তার মনটাকে এমন প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে বিশপের পবিত্র স্মৃতিটাও মাঝে মাঝে মুছে যায় মন থেকে। পরে অবশ্য সে স্মৃতি গ্রহণমুক্ত চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে এলেও তার উজ্জ্বলতা অনেক কমে যায় আগের থেকে। ভলজাঁ যে হতাশ ও হতোদ্যম হয়ে তার নৈতিক সংগ্রাম ত্যাগ করেনি একথা জোর করে কে বলতে পারে? জীবনে একজনকে ভালবাসতে পেরে সে অবশ্য মনের মধ্যে শক্তি খুঁজে পায়। তবু কিন্তু মনের দিক থেকে কসেত্তের থেকে কম দুর্বল ছিল না। কসেত্তেকে সবদিক দিয়ে রক্ষা করে চলত আর কসেত্তে মার মতো তার প্রাণশক্তিটাকে লালন করে চলত। তার জন্যই কসেত্তে জীবনে এগিয়ে যেতে পারত। ভলজাঁ ছিল কসেত্তের একমাত্র অবলম্বন আর কসেত্তে ছিল তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। নিয়তির এক মহান ভারসাম্য দুটি জীবনকে ধরে রেখেছিল।

৪

সদাসতর্ক হয়ে থাকত জাঁ ভলজাঁ। সতর্কতা হিসাবে সে দিনের বেলায় বাসা ছেড়ে কোথাও যেত না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে দু'-এক ঘণ্টার জন্য বেড়াতে যেত বাইরে। কোনওদিন একা একা, আবার কোনওদিন বা কসেত্তেকে সঙ্গে নিয়ে শহরের নির্জন রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসত। রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলে কোনও কোনওদিন চার্চে যেত। সবচেয়ে কাছে ছিল সেন্ট মেদার্দ নামে একটা চার্চ। ভলজাঁ সেখানেই যেত।

কসেত্তে যেদিন ভলজাঁর সঙ্গে যেত না সেদিন সে বাসাতে বৃদ্ধার কাছে থাকত। তাকেই সবাই বাড়িওয়ালী বলত। তবে বাসায় সেই বুড়ির কাছে থাকার থেকে ভলজাঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েই সবচেয়ে আনন্দ পেত কসেত্তে। তারা বাইরে বেড়াতে গিয়ে দু'জনে হাত ধরাধরি করে পথ হাঁটত, দু'জনে কথা বলত। কসেত্তের আনন্দোচ্ছল ভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত ভলজাঁ।

বুড়ি তাদের বাসার ঘর পরিষ্কার করত, রান্না করে দিত, তাদের দোকান-বাজার করত। তারা খুব হিসেব করে চলত, গরীব লোকদের মতো যথাসম্ভব কম টাকায় সংসার চালাত। ভলজাঁ ঘর সাজাবার জন্য কোনও আসবাবপত্রই কেনেনি। শুধু কসেত্তের ছোট ঘরটার কাঁচের দরজাটা পাল্টে একটা কাঠের দরজা লাগিয়ে দেয়।

সেই হলুদ কোটটা তখনো পরত ভলজাঁ। তাতে কয়েকটা ফুটো ছিল। তার মাথার টুপিটা মোচড়ানো ছিল। পাড়ার লোকেরা তাকে গরীব ভাবত এবং মাঝে মাঝে কোনও কোনও বাড়ির কোনও দয়াবতী গৃহিণী তাকে দু'-একটা স্যু দিত। জাঁ ভলজাঁ তা

নিত। পরে আবাব কোনও ভিখাবি তাব কাছে পযসা চাইলে সে তাকে তা দিয়ে দিত। কখনো কখনো ভিখাবিকে এক-আধটা রুপোব মুদ্রাও দিত। এজন্য পাড়াব লোকেবা তাব সম্বন্ধে বলাবলি কবত সে এমনই ভিখাবি যে সে অন্য ভিখাবিকে ভিক্ষা দেয।

বাড়িওযালী বুড়িব একটা ঈর্ষান্বিত কৌতূহল ছিল তাব প্রতিবেশীদেব প্রতি। জাঁ ভলজাঁব প্রতি এক বিবাট অদম্য কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল তাব। কিন্তু তাব এই আগ্রহেব কথাটা ভলজাঁকে বুঝতে দিত না সে। সে কানে কম শুনত। উপবে ও নিচে তাব মাত্র দুটি দাঁত ছিল। সে খুব বেশি কথা বলত এবং কসেত্তেকে একা পেলেই নানাবকমেব অজস্র প্রশ্ন কবত। কসেত্তে বলত সে কিছু জানে না, সে শুধু এইটুকু জানে যে তাবা মঁতফাবমেল থেকে এসেছে।

একদিন বুড়ি দেখল বাবান্দাব ধাবে যেসব খালি ঘবগুলো আছে তাব একটাতে হঠাৎ ভলজাঁ ঢুকে পড়ল। বুড়িব সন্দেহ হওযায সে আড়াল থেকে দেখতে লাগল। ভলজা কি কবে তা দেখতে চায সে। সতর্কতাব জন্য দবজাব দিকে পিছন ফিবে ছিল ভলজা। বিড়ালেব মতো গুড়ি মেবে এক জাযগায একটা ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল বুড়িটা। সে দেখল ভলজা পকেট থেকে কাঁচি বাব কবে তাব কোটেব ভিতবেব দিকেব এক জাযগায কাঁচি দিয়ে সেলাই কেটে ভিতব থেকে ভাজ কবা একটা হলুদ কাগজ বাব কবল। তাব ভাজটা খুললে বুড়ি আশ্চর্য হযে দেখল, সেটা এক হাজাব ফ্রাব একটা নোট। এই নিয়ে হাজাব ফ্রাঁব নোট জীবনে মাত্র দু তিনবাব দেখল সে।

কিছুক্ষণ পব ভলজা বাইবে এসে বুড়িকে নোটটা ভাঙিযে আনতে বলল। সে বলল, গতকাল সে তাব তিন মাসেব আযস্বরূপ টাকাটা তুলে এনেছে ব্যাঙ্ক থেকে। কিন্তু কোথা থেকে আনল সে? বুড়ি ভেবে দেখল গতকাল সে সন্ধে ছ'টাব আগে সাবা দিনেব মধ্যে কোথাও যাযনি বাসা থেকে। তাহলে ব্যাঙ্ক থেকে কি কবে তুলল টাকাটা? ভাবতে ভাবতে আশ্চর্য হযে গেল বুড়িটা। সে নোটটা নিয়ে ভাঙাতে চলে গিয়ে পাড়াব সবাইকে বলে দিল। কোটেব মধ্যে সেলাই কবা হাজাব টাকাব নোট। রু্য দ্য ভিগনে সেন্ট মার্শেলেব অনেক বাড়িব গিন্নীবা উত্তেজিতভাবে আলোচনা কবতে লাগল কথাটা।

দিনকতক পবে একদিন ভলজা বাবান্দায আগুনেব জন্য কাঠ চেবাই কবছিল বসে বসে। কসেত্তেও তাব কাছে বসে ছিল। বুড়িটা ঘব পবিষ্কাব কবছিল। ঘবেতে সে একা ছিল। ভলজাব হলুদ কোটটা দেওযালেব একটা পেবেকে টাঙানো ছিল। বুড়ি কোটটা নেড়ে চেড়ে পবীক্ষা কবে দেখতে লাগল। সে দেখল যেখান থেকে সেদিন হাজাব ফ্রাব নোটটা বাব কবেছিল সে জাযগাটা আবাব সেলাই কবে দিয়েছে ভাল কবে। সে হাত দিয়ে টিপে বুঝল আবও ভাজকবা কাগজ আছে তাব মধ্যে। তাব মনে হলো আবও অনেক হাজাব ফ্রাব নোট আছে। এ ছাড়া সে দেখল কোটেব বিভিন্ন পকেটে কাঁচি, সূচ, সুতো, ছুবি প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস বযেছে। তাছাড়া আছে

চামড়ার একটা মোটা প্যাকেট আর হাতলওয়ালা একটা বড় ছোরা। প্রতিটি পকেটে কিছু না কিছু দরকারী একটা জিনিস আছে।

তখন শীত শেষ হয়ে আসছিল।

৫

সেন্ট মেদার্দ চার্চের কাছে একটা পুরনো সরকারী কূপের ধারে একটা ভিখারি বসত। ভলর্জা তাকে প্রায়ই ভিক্ষা দিত। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় কয়েকটা স্যু তার হাতে না দিয়ে সে যেত না। মাঝে মাঝে ভিখারিটার সঙ্গে কথা বলত সে। স্থানীয় অনেক লোকে বলত ভিখারিটা পুলিশের লোক, সংবাদদাতার কাজ করে। অতীতে এ্কসময় সে গানের দলে থেকে সমবেত কণ্ঠে গাইত, প্রার্থনার স্তোত্রগুলোতে সুর দিত। তার বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর।

একদিন সন্ধেবেলায় ভলর্জা একা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ভিখারিটা পথের ধারে সেই একই জায়গায় বসে ছিল। সে তার দেহটাকে সামনে বাঁকিয়ে ঝুঁকে প্রার্থনা করছিল। ভলর্জা তাকে অন্য দিনকার মতো পয়সা দিল। কিন্তু আজ ভিখারি মুখ তুলে ভলর্জার মুখপানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সে যেন কার খোঁজ করছে। কিছুক্ষণ এইভাবে দেখার পর মাথাটা নামিয়ে নিল। রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের আলোয় ভিখারির মুখের কিছুটা ভলর্জাও দেখতে পেল। ভলর্জা দেখল সে মুখ কোনও ভক্তিভাবে অবনত কোনও ভিখারির মুখ নয়, তার চোখের দৃষ্টি কোনও ভবঘুরের শূন্য দৃষ্টি নয। সে মুখ তার যেন অতি পরিচিত এক মুখ। অন্ধকারে যেন ক্ষুধিত বাঘের একজোড়া জ্বলন্ত চোখ দেখতে পেল ভলর্জা। ভযে রক্ত হিম হযে উঠল তার। সে কয়েক পা পিছিয়ে এল। সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না ছুটে পালাবে তা বুঝতে পারল না। কিছু বলবে না চুপ করে থাকবে তাও বুঝতে পারল না।

সে দেখল ভিখারিটাও মাথা নত করে কি ভাবছে। সে যেন তার অস্তিত্বটা ভুলেই গেছে। ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে ভিখারিটা সেইখানে বসে রইল যেখানে সে বসে ছিল।

ভলর্জা একবার ভাবল, আমি ভুল করছি, আমি পাগল। আসলে ও একটা ভিখারি। তবু আত্মরক্ষার তাগিদে সহজাত এক প্রবৃত্তির তাডনায় সে কোনও কথা না বলে ভালই করল। সে রাতে মনে এক দারুণ অশান্তি নিযে বাসায ফিরল। সে যেন নিজের মনের কাছেও একথা স্বীকার করতে পারল না যে ভিখারির মধ্যে সে জেভার্তের মুখ দেখতে পেয়েছে।

তবু একথাটা বিশ্বাস করতে পারল না কিছুতেই। ভাবল, গতকাল কোনও কথা না বলে চলে এসে ভুল করেছে। ভিখারিকে তার মুখটা নামিয়ে নিযে বসে থাকার সময় তার মুখটা তোলার জন্য তাকে বলা উচিত ছিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় সাহসে ভর করে আবার গেল ভিখারির কাছে। আবার সে পয়সা দিল, ভিখারি তাকে ধন্যবাদ দিল। ভলর্জা নতুন করে আশ্বস্ত হলো। নিজেকে নিজে উপহাস করতে লাগল। সে তাকে জেভার্ত মনে করে ভুল করেছে। সে আর এ নিয়ে কিছু ভাবল না।

কয়েকদিন পর একদিন সন্ধে আটটার সময় ভলর্জা কসেত্তেকে পড়াচ্ছিল। সে শুনতে পেল রাস্তার দিকের সদর দরজাটা হঠাৎ কে খুলে আবার বন্ধ করল। এটা অস্বাভাবিক। এসময় কেউ বাড়ি থেকে যায় না বা কেউ বাইরে থেকে আসে না। এ বাড়ির আর একমাত্র বাসিন্দা সেই বুড়িটা বাতি খরচের ভয়ে সন্ধে হতেই শুয়ে পড়ে। জাঁ ভলজাঁ ইশারায় কসেত্তেকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিল। তার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ভলর্জা। সিঁড়ি বেয়ে নিশ্চয় কেউ উপরে আসছে। মনে হলো ভারী জুতো পরে কোনও পুরুষ মানুষ আসছে। এ পদশব্দ নিশ্চয় কোনও মেয়েমানুষের নয়, জ্বলন্ত বাতিটা নিবিয়ে দিল ভলর্জা।

কসেত্তেকে চুম্বন করে পাঠিয়ে দিয়ে বিছানা থেকে উঠে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে একটা চেয়ারে বসে রইল শ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ে। কিছুক্ষণ পর সে নিঃশব্দে উঠে দরজার একটা ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, বাতি হাতে কে একজন লোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মিনিট পরে ভলর্জা দেখল বাতির আলোটা বারান্দায় দেখা যাচ্ছে না। আর জুতোর শব্দও হচ্ছে না। সে বুঝতে পারল লোকটা জুতো খুলে নিঃশব্দে দরজার কাছে কান পেতে তাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছে।

ভলর্জা পোশাক পরেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। সারা রাত্রি একবারও চোখে-পাতায় করতে পারল না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ বাইরে সদর দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ভলর্জার। সিঁড়িতে আবার কাদের পদশব্দ শুনতে পেল। তার মনে হলো গতকাল রাতে যারা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেছিল তারাই আবার উঠছে। ভলর্জা বন্ধ দরজার স্বল্প ফাঁক দিয়ে দেখল একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ভলর্জার সামনে না থেমে বারান্দা দিয়ে চলে গেল। ভাল করে গোটা লোকটাকে দেখল ভলর্জা পিছন থেকে। টেলকোট পরা লম্বা চেহারার একজন লোক বগলে একটা ছোট লাঠি নিয়ে ভারী জুতো পরে বারান্দার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে হেঁটে যাচ্ছে। সে পিছনটা দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল লোকটা জেভার্ত।

ভলর্জা বুঝতে পারল কারো কাছ থেকে নিশ্চয় চাবি নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছে জেভার্ত। নিশ্চয় সে কারো কাছ থেকে সন্ধান পেয়ে তার খোঁজে এসেছে। কিন্তু কে তাকে চাবিটা দিয়েছে? কে তাকে তার খবরাখবর দিয়েছে? ভলর্জা কিছুই বুঝতে পারল না।

জেভার্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকে চলে গেলে সেদিকের জানালাটা খুলে তাকে ভাল করে দেখার ইচ্ছা হলো ভলর্জার। কিন্তু ভয়ে জানালাটা খুলতে পারল না সে।

সকাল সাতটার সময় বুড়ি তার কাজে এল। ভলর্জা তার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তার মনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। কিন্তু কোনও কথা বা প্রশ্ন করল না তাকে। বুড়িটার হাবভাব ঠিক আগের মতোই আছে। সে ঘর ঝাঁট দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল, গতরাতে কারো আসার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন মঁসিয়ে?

সে বোঝাতে চাইল তার মতো বয়সের বৃদ্ধার কাছে রাত্রি আটটা দুপুর রাতের সমান।

ভলজাঁ বলল, হ্যাঁ, শুনেছিলাম। কিন্তু কে এসেছিল ?

বুড়ি বলল, নতুন ভাড়াটে। ঘর ভাড়া নিয়েছে।

তার নাম কি ?

ঠিক মনে করতে পারছি না। হয় মঁসিয়ে দুমত অথবা দমত। ঐ ধরনের একটা কিছু হবে।

কি কাজ করেন মঁসিয়ে দুমত ?

খেঁক শেয়ালের মতো ধূর্ত চোখদুটো তুলে বুড়ি বলল, আপনার মতোই টাকা ধার দিয়ে বেড়ায়।

ভলজাঁর মনে হলো বুড়ির এ কথার একটা মানে আছে।

বুড়ি চলে গেলে ড্রয়ার থেকে একশো ফ্রাঁর মুদ্রাগুলো ধীরে ধীরে পকেটের মধ্যে ভরে নিল। যাতে কোনও শব্দ না হয় সেদিকে নজর রেখে সাবধানে সে মুদ্রাগুলো তুলে নিলেও একটা পাঁচ ফ্রাঁ মুদ্রা মেঝের উপর সশব্দে পড়ে গেল।

সন্ধ্যা হতে সে একবার নিচে রাস্তায় নেমে গিয়ে চারদিকে সাবধানে তাকাতে লাগল। সে দেখল রাস্তাটা তখন নির্জন। তবে গাছের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে কি না তা বুঝতে পারল না।

ভলজাঁ উপরতলায় উঠে গিয়ে কসেত্তেকে বলল, চলে এস।

কসেত্তের হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল সে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

এই কাহিনীতে এরপর যেসব ঘটনা সংযোজিত হবে সেই সব ঘটনার সঙ্গে পাঠকরা যাতে সহজে পরিচিত হতে পারেন তার জন্য আগে থেকে কিছু বলে রাখা প্রয়োজন। এই বইয়ের রচয়িতা কিছুকালের জন্য প্যারিস থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই অনুপস্থিতিকালে প্যারিস শহরের এক পরিবর্তন ঘটে। এখন এমন এক শহরের উদ্ভব ঘটেছে যে শহর তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। যে প্যারিস শহরকে সে জন্মাবধি ভালবেসে এসেছে, যে প্যারিস ছিল তার আধ্যাত্মিক আবাসভূমি, যার স্মৃতি আজও জেগে আছে তার অন্তরে। ভাঙচুর আর পুনর্গঠনের সময় সে প্যারিস অদৃশ্য হয়ে যায়। অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং গ্রন্থকার যে প্যারিস শহরের কথা বলতেন সে প্যারিস হলো অতীতের সেই শহর যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। তিনি যেসব রাস্তা বা বাড়ির উল্লেখ করবেন বর্তমানে তার খোঁজ করলে হয়ত পাওয়া যাবে না। অথচ গ্রন্থকারের ধারণা পুরনো শহরটার সব কিছু হয়ত বদলে যায়নি একেবারে। আমরা যখন আমাদের জন্মভূমি ও স্বদেশ ছেড়ে দূরে চলে যাই তখন তার প্রতি আমাদের ভালবাসার টানটা বুঝতে পারি। তখন মনে হয় সেখানকার

পথঘাট, ঘরবাড়ি, গাছপালা সবকিছুর মধ্যে আমাদের অন্তরের একটা অংশ ফেলে রেখে এসেছি। আমাদের অনুপস্থিতিকালে আমাদের অন্তরের স্পর্শে সেই সমগ্র জন্মভূমি যেন মায়াময় এক অপরূপ বস্তু হয়ে ওঠে। আমরা যখন আবার দূর প্রবাস থেকে সেই জন্মভূমিতে ফিরে আসি তখন আমাদের আগের দেখা সেই জন্মভূমির অবিকৃত রূপকে দেখতে চাই। সেই গাছপালা, ঘরবাড়ি, পথঘাট যেখানে যা কিছু দেখে গিয়েছিলাম সেখানেই সব কিছু দেখতে চাই।

পাঠকদের কাছে অতীতের সেই প্যারিস শহরকে বর্তমানে চালিয়ে দেবার অনুমতি চেয়ে আবার কাহিনী শুরু করছেন তিনি।

জাঁ ভলজাঁ বাজার এলাকাটা ছেড়ে দিয়ে গলিপথ ধরে প্রায়ই পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে শিকারীর তাড়া খাওয়া হরিণের মতো জোর পায়ে হাঁটতে লাগল কসেত্তেকে নিয়ে। সে প্রায়ই দিক পরিবর্তন করে এক পথ থেকে ভিন্ন পথ ধরতে লাগল।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত্রি। চাঁদটা তখনো দিগন্তেই ছিল। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল রাস্তার উপর। ভলজাঁ রাস্তার কোল ঘেঁষে ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে আলোর দিকে চোখ রেখে পথ হাঁটছিল। নির্জন রাস্তাটায় বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সে অন্তত বুঝতে পারল কেউ তাদের অনুসরণ করছে না।

কসেত্তে কোনও প্রশ্ন না করেই ভলজাঁর পাশে পাশে পথ হাঁটতে লাগল। ক্রমাগত ছয় বছর ধরে সে যে কষ্ট জীবনে পেয়েছে তাতে এক নীরব সহনশীলতা আপনা থেকে শিখে ফেলেছে। তাছাড়া এই ক'দিনের মধ্যেই ভলজাঁর কতকগুলো ব্যতিক্রমের ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। অপ্রত্যাশিত কোনও ঘটনাই আর বিস্মিত করতে পারে না তাকে। ভলজাঁর কাছে থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে সে।

কসেত্তের মতো ভলজাঁ নিজেও জানত না সে কোথায় যাচ্ছে। ভলজাঁর উপর কসেত্তের যেমন অকুণ্ঠ বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বরের উপর ভলজাঁর তেমনি ছিল অকুণ্ঠ অবিচল বিশ্বাস। তার মনে হলো এক অদৃশ্য বৃহত্তর শক্তি তার হাত ধরে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে কি করবে বা কোথায় যাবে সে বিষয়ে কোনও ধারণা বা নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা ছিল না। সে যে জেভার্তকে ঠিক দেখেছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারল না সে। আর সে যদি জেভার্তকে দেখেও থাকে তাহলে তার মানে এই নয় যে জেভার্ত তাকে জাঁ ভলজাঁ বলে চিনতে পেরেছে। কারণ সে এমনভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে যাতে তাকে ভলজাঁ বলে কেউ চিনতে না পারে। সবাই জানে ভলজাঁ মারা গেছে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে সব ঘটনা ঘটে গেছে সে সব ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারে না সে। তবে সে মনে মনে সংকল্প করল গর্বোর সেই বাড়িটাতে আর ফিরে যাবে না কখনো। আপন গুহা থেকে বিতাড়িত এক জন্তুর মতো এক অস্থায়ী অথচ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

অনেক পথ ঘুরে ঘুরে রু্য মুফেতার্দ অঞ্চলে এসে দেখল সমস্ত অঞ্চলটা এরই মধ্যে মধ্যযুগীয় এক গ্রামের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। যেন সান্ধ্য আইন জারি আছে গোটা এলাকাটায়। রু্য সেন্সিয়েরে, র্যু কোপো, সেন্ট ভিক্টর, র্যু দু পুইত, লার্মিতে

প্রভৃতি নামে কতকগুলো রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কতকগুলো হোটেল দেখতে পেল ভলজাঁ। কিন্তু হোটেল পছন্দ হলো না তার। কারণ তাকে যে কেউ অনুসরণ করছে না এবং সে অনুসরণকারীদের নাগালের বাইরে চলে এসেছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারল না তখনো।

সেন্ট এতিয়েনে চার্চে এগারোটা বাজল। রাস্তার অন্ধকার দিকটায় রুা পস্তয় নামে একটা পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। ভলজাঁ একবার পিছন ফিরে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখল ফাঁড়ির সামনে লণ্ঠন জ্বালিয়ে তিনটে পুলিশ বসে আছে। তাদের দলের নেতার সন্দেহ হওয়ায় সে কসেত্তেকে নিয়ে রুা পস্তয় ছেড়ে অন্য পথ ধরল।

রুা দে পোস্তের কাছে এসে একটা বড় ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল ভলজাঁ। গোটা জায়গাটা জুড়ে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছিল। ভলজাঁ কাছাকাছি একটা বাড়ির সদর দরজার আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল তাকে কেউ অনুসরণ করছে কি না। সে ভাবল, এতক্ষণ ছায়ায় ভাল করে লক্ষ্য করতে পারেনি। এবার কেউ যদি সত্যিই তাদের পিছু পিছু আসে তাহলে তাকে ঐ ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে আসতে হবে আর তাহলে চাঁদের আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে।

ভলজাঁ যা ভেবেছিল ঠিক তাই হলো। মিনিট তিনেকের মধ্যেই চারজন লোক সেই চাঁদের আলোঝরা ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তারা চারজনই ছিল পুলিশ। লম্বা চেহারা, গায়ের রং বাদামী, মাথায় গোল টুপি আর হাতে লাঠি। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারছিল না কোনদিকে যাবে। তাদের মধ্যে একজন ভলজাঁ যেদিকে এসেছিল সেইদিকে আসছিল। কিন্তু অন্যরা-উল্টো দিকের পথ ধরল। তখন সে ভলজাঁর দিকে আসছিল। সে মুখটা ঘোরাতেই চাঁদের আলোটা তার মুখের উপর পড়ল। ভলজাঁ দেখল লোকটা জেভার্ত।

২

এতক্ষণে অস্বস্তিকর যে অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত যাপন করছিল ভলজাঁ তা অন্তত দূর হলো। তার অনুসরণকারীরা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করায় এবং দেরি করে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ভলজাঁ লাভবান হয়। সেই অবকাশে ভলজাঁ দরজার সেই আশ্রয়টা ছেড়ে রুা দে পোস্তের দিয়ে জার্দিল দে প্ল্যান্তের দিকে চলে গেল। কসেত্তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ভলজাঁ তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পথ চলতে লাগল। রাস্তায় কোনও লোক ছিল না। চাঁদের আলো থাকায় রাস্তার লাইট পোস্টের আলো জ্বালা হয়নি।

ভলজাঁ তার চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে ফতেন সেন্ট ভিক্টর পার হয়ে জার্দিল দে প্ল্যান্তের চারদিকে ঘুরে অবশেষে নদীর ধারের বাঁধের উপর এসে উঠল। বাঁধের উপর কোনও লোক না থাকায় সে এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এবার সে সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের বর্তমান অবস্থাটা খতিয়ে দেখতে লাগল।

বাঁধটা ধরে কিছুদূর গিয়ে নদীর সেতুটা পেল। সেতুটা পার হতে হয় পয়সা দিয়ে।

একজন আদায়কারী সামনে বসে ছিল। ভলজাঁ তার কাছে গিয়ে একটা স্যু দিল। কিন্তু লোকটা বলল, দুটো স্যু লাগবে। তোমার সঙ্গে একটা মেয়ে আছে। সে হাঁটতে পারে, তাই তোমাকে দু'জনের ভাড়া দিতে হবে।

ভলজাঁ তাই দিয়ে হাঁটতে লাগল। একটা মালবোঝাই গাড়ি ধীর গতিতে পুলের উপর দিয়ে আসছিল, ভলজাঁ সেই গাড়িটার পাশে পাশে আড়ালে পথ চলতে লাগল। অর্ধেকটা যাওয়ার পর কসেত্তে বলল, সে এবার হেঁটে যেতে পারবে।

সেতুর উপর দিয়ে নদীটা পার হয়ে ওপারে গিয়ে ডানদিকে কতকগুলো কাঠের গুদাম দেখতে পেল ভলজাঁ। সেইদিকে যাবার ঠিক করল সে। একটা ফাঁকা জায়গা পার হয়ে তবে সেখানে যেতে হবে। কোনও দ্বিধা না করেই সে সেটা পার হয়ে কাঠগোলার কাছে গিয়ে হাজির হলো। পাশাপাশি অনেকগুলো গোলার মাঝে মাঝে এক-একটা সরু অন্ধকার গলি আছে। এমনি একটা গলির ভিতর ঢোকার আগে ভলজাঁ একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে লাগল তাদের পিছু পিছু কেউ আসছে কি না।

ভলজাঁ ভাল করে দেখল সেতুটার ওপারে জার্দিল দে প্ল্যান্তের কাছে সেই চারটে ছায়ামূর্তি ধীর গতিতে আসছে। তবে ভলজাঁ দেখল এখনো আশা আছে। ওরা তাকে সেতু পার হতে দেখেনি, এখনো এখানে আসতে ওদের দেরি আছে। সে ভাবল নীরব নির্জন ছায়ান্ধকার গলিপথ তার পক্ষে অনেক নিরাপদ, এই ভেবে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

৩

গলির ভিতরে ভিতরে তিনশো গজ যাবার পর ভলজাঁ দু'দিকে দুটো পথ দেখতে পেল তার সামনে। কোনও দ্বিধা না করেই ডানদিকের পথটা ধরল সে। কারণ সে দেখল বাঁ দিকের পথটা সোজা শহরের মাঝখানে চলে গেছে। কিন্তু ডান দিকের পথটা গেছে গ্রামাঞ্চলের পথে।

কসেত্তের জন্য সে তাড়াতাড়ি যেতে পারছিল না। কসেত্তে হাঁটতে পারছিল না বলে তাকে আবার তুলে নিল পিঠের উপর। কসেত্তে তার কাঁধের উপর মাথা রেখে ঘুমিযে পড়ল। গলিপথে তাড়াতাড়ি যেতে যেতে প্রায়ই পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল ভলজাঁ।

প্রথমে দু'-তিনবার তাকিয়েও পিছনে কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু পরে একবার তাকাতেই সে দেখল কারা যেন ছায়ার মধ্যে কথা বলতে বলতে আসছে। ভলজাঁ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যেতে লাগল। ভাবল আবার সে একটা দোমাথা রাস্তার সামনে গিয়ে পড়বে এবং একটা পথ ধরে তার অনুসরণকারীদের ধোঁকা দেবে।

এইভাবে গলিপথটা পার হয়ে সামনে একটা বিরাট প্রাচীর দেখতে পেল। দেখল গলিপথটার সেখানেই শেষ এবং আবার দু'দিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে। আবার তাকে ঠিক করতে হবে সে বাঁ অথবা ডান কোনদিকে যাবে।

এবারও ডানদিকের পথ ধরল ভলজাঁ। সেটাও একটা গলিপথ। পথটার দু'ধারে কতকগুলো বড় বড় পাকা বাড়ি রয়েছে। সেগুলো বসতবাড়ি নয়। দোকান অথবা

মাল রাখার গুদাম। সেই গলিপথটাও একটা বড় সাদা প্রাচীরের সামনে এসে শেষ হয়ে গেছে। এখানেও আবার দু'দিকে দুটো পথ চলে গেছে।

ভলজাঁ দেখল বাঁ দিকে একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। জায়গাটা পার হলেই একটা বড় রাস্তা পাওয়া যাবে। সে ঠিক করল বাঁ দিকের পথটায় যাবে সে।

কিন্তু বাঁ দিকে যাবার জন্য ঘুরতেই ভলজাঁ দেখল গলিপথটা যেখানে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে তার মুখে একটা লোক স্তব্ধ প্রতিমূর্তির মতো ছায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো তারই পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সে।

প্যারিসের যে অংশে ভলজাঁ তখন উপনীত হয়েছিল সে অংশ ফবুর্গ সেন্ট আঁতয়নে আর ল' রেনীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বর্তমানে সে জায়গাটা একেবারে বদলে গেছে। সে জায়গার এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। অনেকের মতে সেটা দেখতে খারাপ হয়েছে, আবার অনেকের মতে জায়গাটা উন্নত হয়েছে আগের থেকে। এখন সেখানে অনেক বাজার, কাঠগোলা, বড় বড় বাড়ির পরিবর্তে বড় বড় রাস্তা, থিয়েটার হল, রেলস্টেশন আর কারখানা গড়ে উঠেছে।

অর্ধশতাব্দী আগে প্যারিসের এই অঞ্চলটাকে বলা হত লে পেতিত পিকপাস। পুরনো প্যারিসের পোর্তে সেন্ট জ্যাক, পোর্তে প্যারিস, ব্যভিয়ের দে সার্জেন্ট, লা গ্যালিওত, লা পেতিত প্রোলোতানে প্রভৃতি নামগুলো আজও চলে আসছে।

তখন লে পেতিত পিকপাস অঞ্চলের চেহারাটা ছিল কোনও স্প্যানিশ শহরের মতো হতশ্রী। তার রাস্তাঘাটগুলো ছিল খারাপ, এবড়ো-খেবড়ো, বাড়িগুলো ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। দু'-তিনটে বড় চওড়া রাস্তা ছাড়া চারদিকে ছিল শুধু বড় বড় প্রাচীর আর একটা করে ফাঁকা জায়গা। এমনি একটা বড় প্রাচীরের গায়ে কতকগুলো বাগান আর একতলা বাড়ি, কাঠগোলা আর দোকান গড়ে উঠেছিল।

আজ হতে প্রায় তিরিশ বছর আগে পেতিত পিকপাস নামে অঞ্চলটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আজ তার কোনও চিহ্নই নেই। এ যুগের কোনও মানচিত্রে তার কোনও উল্লেখ নেই। শেষ ১৭৭২ সালের প্রকাশিত এক সরকারী মানচিত্রে লে পেতিত পিকপাসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সেদিন রাত্রিতে এই লে পেতিত পিকপাস অঞ্চলেই এসে পড়ে ভলজাঁ।

র‍্যু দ্রয়েত মুর আর র‍্যু পিকপাসের মাঝখানে এক কোণে একটি অন্ধকার মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পিছিয়ে গেল ভলজাঁ। যে লোকটার মূর্তি সে দেখতে পেয়েছে সে লোকটা নিশ্চয় তার উপর নজর রাখতে এসেছে।

এখন কি সে করবে? কিছুক্ষণ আগে পিছন ফিরে দেখেছে তিন-চারজন লোক তার পিছু পিছু আসছে অর্থাৎ তাকে অনুসরণ করছে তারা। তার মানে পিছন দিকে পালাবার পথ তার বন্ধ। মনে হয় জেভার্ত তার দলবল নিয়ে সেখানে পাহারায় আছে। তাকে ধরার জন্য তৈরি হয়ে আছে। আর জেভার্তই হয়ত একজনকে সামনের দিকে পথটা রুদ্ধ করে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। এই সব অনুমান নিশ্চয়তার রূপ ধরে দমকা বাতাসের আঘাতে ঝরে পড়া ধুলোর মতো তার মনের উপর ঝরে পড়তে লাগল।

জাঁ ভলজাঁ র‍্যু পিকপাসের দিকটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। ফুটপাথের উপর অন্ধকারে যে প্রহরীর মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে পালাতে গেলে তার হাতে ধরা পড়তে হবে। আবার পিছন দিকে পালাতে গেলে জেভার্তের হাতে ধরা পড়তে হবে। ভলজাঁর মনে হলো এমন একটা জালের মধ্যে সে ধরা পড়েছে যে জালটা ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠছে। এক নিবিড় হতাশায় আকাশের পানে মুখ তুলে তাকাল ভলজাঁ।

৪

ব্যাপারটা অর্থাৎ ভলজাঁর তখনকার অবস্থাটা ঠিকমতো বুঝতে হলে র‍্যু দ্রয়েত মুর-এর আসল ছবিটা দেখা দরকার। র‍্যু পোলেনসোর দিক থেকে গলিপথটাতে ঢুকে একটা মোড় ফিরলেই র‍্যু দ্রয়েত মুরে গিয়ে পড়তে হবে। র‍্যু দ্রয়েত মুর জায়গাটা ডানদিকে কতকগুলো যত সব বিশ্রী রকমের বাড়ি দিয়ে ঘেরা আর তার বাঁ দিকে আছে এমন একটা বিরাট বড় বাড়ি যার র‍্যু পিকপাসের দিকে মাথাটা ক্রমশই উঁচু হয়ে উঠছিল, কিন্তু র‍্যু পোলোনসোর দিকে তার মাথাটা খুব‍ই নিচু ছিল। বাড়ি বলতে শুধু দু'দিকে দুটো বড় দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে আর তার ভিতরকার ঘরগুলো ভেঙে গেছে।

ভলজাঁ তার এই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়ে ভাবতে লাগল সে একবার যদি জোড়া বাড়িটির মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারে তাহলে সে নিরাপদ। তাহলে আর কোনও ভয় নেই তার। বাড়িটার আপাত নির্জনতা আর নীরবতার একটা আকর্ষণ ছিল তার কাছে। ভলজাঁ দেখল বাড়িটার প্রতিটি ঘরের জানালার নিচে একটা করে পাইপ আছে। সেইসব পাইপগুলো একটা বড় পাইপে গিয়ে মিশেছে। ভলজাঁ ভাবল পাইপ বেয়ে কসেত্তেকে নিয়েই সে বাড়িটার উপরে উঠে যাবে। পাইপগুলো একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত যুক্ত আছে। তবে জানালাগুলো সব বন্ধ। তাছাড়া বাড়িটার সামনের দিকটা চাঁদের আলোয় ভাসতে থাকায় সেখানে আশ্রয় নিতে গেলেই তাকে দেখতে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাইপগুলো বহুকালের পুরনো হওয়ায় পচে গেছে। তিনতলা বাড়িটার উপরে কসেত্তেকে পিঠে নিয়ে পাইপ বেয়ে ওঠা সম্ভবও নয়।

সে আশা ত্যাগ করে ছায়ান্ধকার জায়গাটায় এসে দাঁড়াল ভলজাঁ। ভাবল এখানে দাঁড়ালে অন্তত তাকে দেখা যাবে না এবং দরজাটা খোলার চেষ্টা করবে। লাইম গাছের শাখাগুলোকে অবলম্বন করে আইভি লতাগুলো দেওয়ালে উঠে গেছে। মনে হলো দরজা আর দেওয়ালের ওপারে একটা বাগান আছে। সে বাগানে একবার গিয়ে পড়তে পারলে বাকি রাতটা তারা লুকিয়ে থাকতে পারবে।

সময় কেটে যাচ্ছে। যা কিছু করতে হবে তাড়াতাড়ি করতে হবে। সে সদর দরজাটা চাপ দিয়ে খোলার চেষ্টা করল। মনে হলো দরজার কাঠটা পুরনো আর পচা। যে লোহা দিয়ে কাঠগুলো আটকানো আছে তাতে মরচে পড়েছে। কিন্তু সে পরীক্ষা করে দেখল আসলে সেটা দরজাই নয়। তাতে কোনও কপাট নেই। লোহার পাত আর কাঠ দিয়ে সেটা ঢাকা। তার ওপারে দেওয়াল। সে দরজা কোনওমতেই খোলা যাবে না।

৫

এমন সময় দূর থেকে কতকগুলো লোকের পথচলার শব্দ আসতে লাগল। সে সেই ছায়ান্ধকার থেকে দূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেখল সাত-আটজন সৈনিক দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে মার্চ করে তার দিকেই আসছে। তাদের বন্দুকের বেয়নেটগুলো চকচক করছিল।

সে আরও দেখল সেই সৈনিকদলের সামনে জেভার্তের লম্বা মূর্তিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে ধীরগতিতে সতর্কতার সঙ্গে পথ হাঁটছিল। সে মাঝে মাঝে থেমে পথের দু'ধারের প্রতিটি অলিগলি এবং বাড়ির দরজাগুলো খুঁটিয়ে দেখে কার খোঁজ করছিল। সে বুঝতে পারল জেভার্ত তার দু'জন পুলিশ নিয়ে তার সন্ধান করার সময় প্রহরারত এক সৈনিকদল দেখতে পেয়ে তার কাজে লাগায়। তারা একযোগে মার্চ করে তার দিকে আসছিল।

তাদের চলার গতি দেখে ভলজাঁ বুঝতে পারল সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তাদের এসে পৌঁছতে এখনো পনের মিনিট সময় লাগবে। এই নিয়ে তৃতীয়বার সে এক বিরাট শূন্য খাদে পড়তে চলেছে। আবার তাকে সেই দুর্বিষহ কারাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। যে বিরাট শূন্য খাদটা তার জীবনকে গ্রাস করার জন্য মুখ ব্যাদান করে তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, সেই খাদ আর তার মাঝখানে মাত্র পনের মিনিটের ব্যবধান। সেই খাদের করাল গ্রাসে পড়ে যাওয়া মানেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নরকের অন্ধকারে প্রবেশ করা। কিন্তু এবার সে কারাজীবন আগের থেকে আরও ভয়ঙ্কর। কারণ এবার কারাজীবনে প্রবেশ করার মানেই চিরদিনের মতো কসেত্তেকে হারানো আর তার মানেই এক জীবন্ত মৃত্যু।

এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা মাত্রই উপায় আছে।

জাঁ ভলজাঁর জীবনে দুটো প্রবৃত্তি কাজ করে যেত সব সময়। ক্ষেত্রবিশেষে দরকার মতো এই দুটো প্রবৃত্তির একটাকে কার্যে রূপায়িত করার জন্য কাজ করার এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল তার। সে যেমন সাধু হবার এক উচ্চাভিলাষের তাড়নায় অনেক বড় কাজ করতে পারত তেমনি একজন পাকা স্বভাবসিদ্ধ অপরাধীর মতো অনেক হীন কাজও করতে পারত।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে এর আগে সে তুলঁ জেল থেকে বার বার পালাবার সময় কয়েকটা কৌশল আয়ত্ত করে। এই সব কৌশলের একটা হলো বাইরের কোনও কৃত্রিম সাহায্য ছাড়াই শুধু হাতের পেশীর শক্তি ও কলাকৌশল অবলম্বন করে এবং পিঠ, কাঁধ আর হাঁটু প্রয়োগ করে যেকোনও উঁচু খাড়া দেওয়াল বা প্রাচীরের উপর অবলীলাক্রমে উঠে যাওয়া। কোনও পাইপ ধরে বা শুধু পায়ের বুড়ো আঙুল বা হাতের আঙুলে ভর করে সে ছয়তলা কোনও দেওয়াল বা প্রাচীরের উপর উঠে যেতে পারত। এই কৌশল অবলম্বন করেই ব্যাটলমোত নামে এক দণ্ডিত অপরাধী প্যারিসের আদালত-প্রাঙ্গণের এক উঁচু পাঁচিল পার হয়ে পালিয়ে গিয়ে খ্যাতি লাভ করে।

কিন্তু একমাত্র সমস্যা হলো কসেত্তেকে নিয়ে। তাকে সে ছাড়তে পারে না। কিন্তু কসেত্তেকে ঐ দেওয়ালের উপর বয়ে নিয়ে যাওয়াও এক অসম্ভব ব্যাপার। সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এই দেওয়ালের উপর উঠে যেতে পারে। কিন্তু তার পিঠে বা কাঁধে কোনও বোঝা থাকলে সে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ে যাবে।

তার একটা দড়ি দরকার। কিন্তু রুা পোলোনমোর এই জনমানবহীন জায়গায় দুপুর রাতে দড়ি কোথায় পাওয়া যাবে? জাঁ ভলজাঁর হাতে যদি একটা রাজ্য থাকত তাহলে সামান্য একটা দড়ির জন্য সেই গোটা রাজ্যটা দিয়ে দিতে পারত।

অবস্থার প্রবল চাপে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে। তখন যেকোনও বস্তু দিয়ে প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করে সে। সেকালে প্যারিসের রাস্তায় গ্যাস লাইটগুলো একটা মোটা দড়ি দিয়ে ঝোলানো থাকত। গ্যাসের আলোটা থাকত একটা লোহার বাক্সের মধ্যে। আর মোটা দড়িটা একটা ধাতব হাতলের সঙ্গে বাঁধা থাকত।

ভলজাঁ মরিয়া হয়ে ক্ষিপ্র গতিতে তার ছুরি দিয়ে সেই মোটা দড়িটা কেটে নিয়ে কসেত্তেকে বেঁধে ফেলল। দড়িটা বেশ লম্বা ছিল।

আমরা আগেই বলেছি সে রাতে পূর্ণ চাঁদের আলো থাকায় রাস্তায় কোনও আলো জ্বালানো হয়নি। ছায়ান্ধকারভরা নির্জন নৈশ পরিবেশ, পলাতক ভলজাঁর বিভিন্ন আচরণ বিব্রত করে তোলে কসেত্তেকে। অন্য কোনও শিশু হলে এই অবস্থায় কেঁদে ফেলত সে। কিন্তু কসেত্তে বিব্রত ও বিপন্নবোধ করলেই শুধু ভলজাঁর কোটের আঁচলটা টানত।

এবার জেভার্তের সেনাদলের মার্চ করে এগিয়ে আসার শব্দটা আরও জোর হয়ে উঠল।

সে শব্দ শুনে কসেত্তে বলল, আমার ভয় করছে। কে আসছে বাবা?

ভলজাঁ বলল, চুপ। মাদাম থেনার্দিয়ের আসছে।

ভয়ে কাঁপতে লাগল কসেত্তে। ভলজাঁ বিব্রত হয়ে বলতে লাগল, কথা বলো না। আমার উপর সবকিছু ছেড়ে দাও। তুমি কথা বললেই মাদাম থেনার্দিয়ের শুনতে পাবে। সে তোমাকে নিয়ে যেতে আসছে।

এরপর ভলজাঁ আর দেরি করল না। কারণ সে বুঝল জেভার্ত তার দলবল নিয়ে এখনি এসে পড়বে। সে তার দড়ির একটা প্রান্ত কসেত্তের বগলের তলা দিয়ে বেঁধে দেওয়ালের উপর উঠে গেল। তার জুতো-মোজাটা ওপারে ছুঁড়ে দিল। কসেত্তে নিচে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল। সে তখন মাদাম থেনার্দিযেরের কথা ভাবতে লাগল।

ভলজাঁ তাকে চুপি চুপি ডাক দিল, কসেত্তে, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে চুপ করে দাঁড়াও। কোনও শব্দ করো না। ভয় করো না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কসেত্তেকে টেনে পাঁচিলের উপর তুলে নিল ভলজাঁ। কসেত্তে কিছু বুঝতেই পারল না। কসেত্তে পাঁচিলের মাথায় দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে পিঠের উপর চাপিয়ে নিল ভলজাঁ। সে দেখল পাঁচিলের সঙ্গে লাগোয়া একটা ছাদ রয়েছে।

ছাদটা নিচু হয়ে ওদিকে নেমে গেছে। সেখান থেকে বাগানের মাটিটা অনেক কাছে। লাইম গাছের ডালগুলো ছাদের উপর এসে পড়েছে।

ভলজাঁ ছাদে গিয়ে সেখান থেকে গাছের ডাল ধরে মাটিতে নেমে পড়ল। এমন সময় জেভার্তের গলা শুনতে পেল। জেভার্ত তার লোকদের হুকুম করছে, এই জায়গাটা খোঁজ করো। আমি জোর গলায় বলতে পারি, ও এখানেই লুকিয়ে আছে।

সৈনিক ও পুলিশরা ভলজাঁ আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই ফাঁকা জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল।

বাগানের মাটিতে নেমে ভয় বা সাহস যে কোনও কারণেই হোক কসেত্তে একটা কথাও বলল না, বা কোনও শব্দ করল না।

৬

ভলজাঁ দেখল এ এক অদ্ভুত বাগান। মনে হলো এ বাগানে কোনও মানুষ আসে না। এখানে-সেখানে কিছু পপলার গাছের জটলা। কোণে কোণে কাঁটাগাছগুলো লম্বা হয়ে উঠেছে। বাগানের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা আছে। মাঝে মাঝে এক একটা পথ আছে। কিন্তু পথগুলো ঘাসে ঢেকে গেছে। দু'-একটা পাথরের বেঞ্চ আছে। কিন্তু সেগুলো ব্যবহার না করার জন্য শ্যাওলায় ভরে গেছে।

ভলজাঁ দেখল যে বাড়ির ছাদ থেকে সে বাগানে নেমেছে সে বাড়িতে অনেকগুলো ঘর রয়েছে। কিন্তু কোনও ঘরে মানুষ নেই। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে বাড়িটার সামনে একটা পাথরের প্রতিমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু মূর্তিটার মুখটা একেবারে ভেঙে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। গোটা বাড়িটা একেবারে ভাঙা এবং বসবাসের অযোগ্য। ভাঙা বাড়িটা অনেকখানি লম্বা—রু্য দ্রয়েত মুর থেকে পোতিত রু্য পিকপাস পর্যন্ত বিস্তৃত। বাড়িটার সামনেই বাগান। বাড়িটার অবস্থা রাস্তার দিক থেকে ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছিল না। বাড়িটা দোতলা। কিন্তু দুটো তলার সব ঘরের জানালাগুলোই বন্ধ ছিল।

বাগানটার শেষ প্রান্তটা অন্ধকার আর কুয়াশায় ঢাকা থাকায় তা দেখতে পাচ্ছিল না ভলজাঁ। বাগানটার চারদিকেই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার মনে হলো বাগানটা যেখানে শেষ হয়েছে তার পাঁচিলঘেরা সীমানার ওপারে আবাদী জমি আছে। দু' একটা বাড়ির নিচু ছাদ দেখা যাচ্ছিল।

এর থেকে নির্জন এবং পরিত্যক্ত জায়গা আর হতে পারে না। শীতের রাতে এই জনহীন পরিত্যক্ত বাগানটায় কেউ আসতে পারে না এটা ভলজাঁ বেশ বুঝল। কিন্তু তার মনে হলো শুধু রাত্রিবেলায় নয়, দিনের বেলাতেও এদিকে কোনও মানুষ আসে না।

বাড়িটার একদিকে মাল রাখার চালাঘর ছিল। ভলজাঁ প্রথমে ওধার থেকে ফেলে দেওয়া জুতো ও মোজাজোড়াটা খুঁজে বার করে কসেত্তেকে নিয়ে সেই চালাঘরটায় গেল। কোনও পলাতকের মতো কখনই কোনও জায়গাকে একেবারে নিরাপদ বোধ করে না। এত নির্জন এবং পরিত্যক্ত জায়গাটাতে এসেও মাদাম থেনার্দিয়েরের ভয়ে বুকটা কাঁপছিল কসেত্তের। সে তখন লুকোতে চাইছিল।

রাস্তার দিকে অর্থাৎ বাড়িটার পিছনে পাঁচিলের এপার থেকে তখন জেভার্তের গলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তার লোকজন এখনো পাথরের পাঁচিলের গায়ে বেয়নেট ঠুকে ঠুকে কার খোঁজ করে চলেছিল। জেভার্ত তখনো ভলজাঁকে না পেয়ে চিৎকার করছিল। তার সব কথা বোঝা যাচ্ছিল না এধার থেকে।

ক্রমে সময় যত কেটে যেতে লাগল তত অনুসন্ধানকারী দলের কথাবার্তার শব্দ স্তিমিত হয়ে আসছিল। ভয়ে ভলজাঁ তখনো নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলেনি। শ্বাসরুদ্ধভাবে সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কসেত্তের মুখের উপর একটা হাত দিয়ে রেখেছিল। রাস্তার দিকে পাঁচিলটার ওধারে যখন সৈনিকদের ভারী পায়ের শব্দ আর চেঁচামিচির জোর শব্দ হচ্ছিল তখন এপারে নির্জন বাগানটা অদ্ভুতভাবে শান্ত ও নিস্তব্ধ হয়ে ছিল।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সেই সুগভীর নৈশ নির্জন প্রশান্তির মাঝে এক সুন্দর স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর ককিয়ে উঠল। নিশীথ রাতের নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশের মাঝে সেই কণ্ঠস্বর রহস্যময় মনে হচ্ছিল ভলজাঁর। তার মনে হলো সেই নির্জন পরিত্যক্ত অন্ধকার বাড়িটার মধ্যে কারা যেন সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা করছে। কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল একজন কুমারী মেয়ে আর শিশু প্রার্থনার গান করছে। মনে হচ্ছিল এ স্বর যাদের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে তারা এই মর্ত্যের মানুষ নয়। কোনও মৃতপ্রায় ব্যক্তির কর্ণকুহরে কোনও নবজাত শিশুর কণ্ঠস্বর প্রবেশ করলে তার যেমন মনে হয় সেই সমবেত প্রার্থনার কণ্ঠস্বর শুনে ভলজাঁর তাই মনে হচ্ছিল।

প্রার্থনার গানের শব্দটা আসছিল বাগানের ধারের ঘরগুলোর একটা থেকে। ভলজাঁর মনে হচ্ছিল দানবের গর্জন দূরে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দেবদূতদের সমবেত কণ্ঠস্বর এক স্বর্গীয় সুষমায় নৈশ নিস্তব্ধ বাতাসে ভেসে উঠতে শুরু করেছে।

কসেত্তে আর জাঁ ভলজাঁ দু'জনেই হঠাৎ নতজানু হলো। তারা কোথায় আছে এবং এই প্রার্থনা কারা করছে তার কিছু না জানতে পারলেও তারা সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় একটা জিনিস বুঝতে পারল যে তাদের নতজানু হওয়া উচিত। তার মনে হলো এই সমবেত প্রার্থনার গান নির্জন পরিত্যক্ত বাড়িটার প্রশান্তিকে ক্ষুন্ন করেনি কিছুমাত্র। বরং তার মনে হলো এ গান কোনও মানুষ গাইছে না, এক অতিপ্রাকৃত কণ্ঠনিঃসৃত এই গান যেন শূন্য নির্জন বাড়িটার মধ্যে ঐন্দ্রজালিকভাবে গীত হচ্ছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রার্থনার গান চলতে লাগল ততক্ষণ ভলজাঁর মনটা একেবারে শূন্য হয়ে রইল। কোনও কিছুই ভাবতে পারল না সে। কোনও দিকে তাকিয়ে কোনও কিছু দেখতে পারল না। সে কেবল তার চোখের সামনে অনন্ত প্রসারিত এক নীল আকাশ দেখতে লাগল আর তার সমগ্র অন্তরাত্মা পাখা মেলে সেই গোটা আকাশটাকে এক নীরব নিবিড় স্বাচ্ছন্দ্যে পরিক্রমা করে বেড়াতে লাগল। যখন সে প্রার্থনার গান শেষ হয়ে গেল, তখন ভলজাঁ বুঝতে পারল না এ গান কতক্ষণ চলেছে। গান যতক্ষণ চলেছে ততক্ষণ সময় সম্বন্ধে তার কোনও খেয়াল ছিল না, পার্থিব কোনও বিষয়েই তার কোনও চেতনা ছিল না।

এবার সব চুপচাপ। ওদিকের রাস্তায় অথবা এদিকের বাগানবাড়িতে কোথাও বিন্দুমাত্র

শব্দ নেই। কোনও ভয় বা আশ্বাসের কোনও আভাস নেই কোথাও। শুধু নিশীথ রাতের অলস বাতাসের আঘাতে কম্পিত ও মৃদু শিহরিত ঘাসগুলোর থেকে এক বিষণ্ন শব্দের ঢেউ বয়ে আসছিল।

৭

একটা দমকা বাতাস থেকে ভলজাঁ বুঝতে পারল রাত্রি তখন একটা থেকে দুটোর মধ্যে হবে। কসেত্তে চুপ করে ছিল। সে ভলজাঁর কাঁধের উপর মাথা রেখে বসেছিল বলে ভলজাঁ ভেবেছিল সে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু তার মুখপানে তাকিয়ে দেখল তার চোখ দুটো খোলা রয়েছে। সে ভয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত রেখে তাকিয়ে আছে। তার অবস্থা দেখে ভলজাঁর দুঃখ হলো।

ভলজাঁ বলল, তুমি ঘুমোওনি?

কসেত্তে বলল, আমার শীত লাগছে।

কিছুক্ষণ পর সে আবার বলল, এখনো সে আছে?

কে?

মাদাম থেনার্দিয়ের।

ভলজাঁ কসেত্তেকে চুপ করে থাকার জন্য মাদাম থেনার্দিয়েরের নাম করেছিল, সে কথাটা ভুলে গিয়েছিল, সে বলল, সে চলে গেছে। আর তোমার ভয়ের কিছু নেই।

কসেত্তে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল, যেন একটা বড় বোঝা তার বুক থেকে নেমে গেছে।

যে চালাঘরটার মেঝের উপর তারা বসেছিল সেটা স্যাতসেঁতে ছিল। চালাঘরটার চারদিকে কোনও দেওয়াল ছিল না। ভলজাঁ তার কোটটা খুলে কসেত্তের গায়ে জড়িয়ে দিল। বলল, এটা ভাল হলো তো?

কসেত্তে বলল, হ্যাঁ বাবা।

শুয়ে পড়। আমি এখনি ফিরে আসছি।

চালাঘরটা ছেড়ে ভলজাঁ বাগানবাড়ির বাইরের দিকটা খুঁজে দেখতে লাগল এর থেকে কোনও ভাল আশ্রয়ের আশায়। সে বাড়িটার নিচের তলায় প্রতিটা ঘরের সামনে গিয়ে দেখল সব ঘরের দরজাই বন্ধ। নিচের তলার সব ঘরের জানালাগুলো বন্ধ। ঘুরতে ঘুরতে সে দেখল আর একটা দিকের কতকগুলো ঘরের সারিবদ্ধ জানালাগুলোর একটা হতে একটা ক্ষীণ আলোর রশ্মি বেরিয়ে আসছে। সে তখন পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকাল। সেই আধখোলা জানালাটা দিয়ে সে দেখল ঘরটা বড়, তার মেঝেটা পাথরের। প্রশস্ত ঘরখানার মধ্যে অনেকগুলি স্তম্ভ রয়েছে। ঘরের এককোণে একটা আলো জ্বলছে। আলোটা ক্ষীণ বলে ঘরের মধ্যে জমে থাকা ছায়াগুলোকে অপসারিত করতে পারছিল না। ঘরটা একেবারে নির্জন; কোনও মানুষ

দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে দেখল ঘরের মেঝের উপর একজন মানুষ শুয়ে রয়েছে; তার গোটা গা-মুখে একটা কাপড় ঢাকা। মনে হলো লোকটা উপুড় হয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে মড়ার মতো শুয়ে আছে। মনে হলো তার ঘাড়ে একটা দড়ি জড়ানো আছে। মৃদু আলোকিত ঘরখানার ছায়া-ছায়া অন্ধকার দৃশ্যটাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল।

জাঁ ভলজাঁ পরে বলেছিল জীবনে অনেক ভয়ের বস্তু সে দেখলেও গায়ের রক্ত হিম করে দেওয়া এমন রহস্যময় ও ভয়াবহ বস্তু সে কখনো দেখেনি। লোকটা মৃত বলে একটা ভয়ের ব্যাপার ঠিক, কিন্তু জীবিত থাকলে সেটা আরও ভয়ের ব্যাপার।

সাহস করে ভলজাঁ জানালার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জানালার গরাদের উপর মুখ রেখে দেখতে লাগল শায়িত লোকটার মধ্যে জীবনের কোনও লক্ষণ আছে কি না। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেও সেই শায়িত মূর্তির মধ্যে কোনও জীবনের লক্ষণ দেখতে পেল না। একবারও নড়াচড়া করল না মূর্তিটা। এক অনির্বচনীয় ভয়ের আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ভলজাঁর মনটা এবং সে পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করে দিল। যেখানে সে কসেত্তেকে রেখে এসেছিল সেই চালাঘরটার দিকে ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখতে লাগল জীবিত বা মৃত সেই রহস্যময়ভাবে শায়িত লোকটা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে আসছে কি না। সে যখন এইভাবে ছুটতে ছুটতে চালাটায় পৌঁছল তখন সে হাঁপাচ্ছিল। তার গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল। তার হাঁটু দুটো অবশ হয়ে আসছিল।

এখন সে কোথায়? কে কল্পনা করতে পারে প্যারিস শহরের মধ্যে এই ধরনের এক সমাধিভূমি থাকতে পারে! এক নৈশ রহস্যে মণ্ডিত এ কোন স্থান যেখানে দেবদূতদের আলোকিত কণ্ঠস্বর শুনে কেউ এগিয়ে গেলে এমন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে যে দৃশ্যের মধ্যে স্বর্গীয় দ্যুতির মহিমার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি প্রকটিত হয়ে উঠেছে সমাধিগহ্বরের এক মৃত্যুনিবিড় নরকান্ধকার। অথচ এটা কোনও স্বপ্ন নয়। রাস্তার ধারে একটা আস্ত বাড়ি। সে হাত দিয়ে বাড়িটার পাথরগুলি স্পর্শ করে দেখতে লাগল। নিশীথ রাতের এই শৈত্যনিবিড় স্তব্ধতা, আশ্রয়হীন অসহায়তা, মনের নিরন্তর উদ্বেগ অসুস্থ করে তুলেছিল তার দেহটাকে। সে জ্বর-জ্বর অনুভব করছিল। সে কসেত্তের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখল কসেত্তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

৮

একটা পাথরের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে কসেত্তে। ভলজাঁ তার পানে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে শান্ত হয়ে ভাবতে লাগল।

সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারল কসেত্তেই তার জীবনের একমাত্র কেন্দ্রীয় সত্য যাকে ঘিরে সে আবর্তিত করে চলেছে নিজেকে। সে যতক্ষণ তার কাছে থাকবে ততক্ষণ একমাত্র কসেত্তের প্রয়োজন ছাড়া তার নিজের কোনও প্রয়োজন নেই। এখন যদি সে কোনও কিছুকে ভয় করে তাহলে কসেত্তের জন্যই করবে। এমন

কি এই দারুণ শীতে তার গায়ের কোটটা কসেত্তেকে খুলে দিলেও সে কোনও শীত অনুভব করছিল না।

সে বসে বসে ভাবতে লাগল। ক্রমে আবার একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল কানে। সে স্পষ্ট শুনতে পেল বাগানের ভিতর থেকে নৈশ মাঠে চরে বেড়ানো ভেড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টার ধ্বনির মতো এক ঘণ্টাধ্বনি শান্ত হিমেল বাতাসে ভেসে আসছিল। সেই ধ্বনি শুনে মুখ ফিরিয়ে লক্ষ্য করে দেখল ভলজাঁ বাগানের ভিতর একটা ছায়ামূর্তি কি করছে। সে আরও ভাল করে দেখল মানুষের মতো একটা মূর্তি বাগানের মাঝখানে তরমুজের ক্ষেতের উপর ঝুঁকে বীজ ছড়াচ্ছে।

জাঁ ভলজাঁ পিছিয়ে এল। ক্রমাগত তাড়া খেয়ে খেয়ে ধরা পড়ার ভয়ে এমনই বিব্রত হয়ে পড়েছিল যে সব মানুষকেই সে তার শত্রু আর সন্দেহজনক ভাবছিল। সব তাড়া খাওয়া পলাতক ব্যক্তিরাই তাই করে। তারা দিনের আলোকে ভয়ের চোখে দেখে, কারণ সবাই তাদের দেখে ফেলবে। হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় রাতের অন্ধকারকেও তারা ভয় করে। বাগানবাড়ির নির্জনতায় সে ভয়ে শিউরে উঠেছিল ঠিক, কিন্তু সেই নৈশ নির্জন বাগানের মধ্যে একটা লোক দেখে এখন সে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

এবার সে কাল্পনিক ভয় থেকে বাস্তব ভয়ের সম্মুখীন হলো। সে ভাবল, জেভার্ত তার সহকারীদের নিয়ে এই এলাকাতেই আছে এখনো। ওপারের বড় রাস্তায় সে হয়ত একদল লোককে পাহারায় রেখে গেছে। বাগানের ঐ লোকটা তাকে দেখে চিৎকার করে উঠলে সেই প্রহরী ছুটে আসবে। সে তাই ঘুমন্ত কসেত্তেকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে চালাঘরটার এক প্রান্তে যেখানে একরাশ পুরনো ভাঙা আসবাব জড়ো করা ছিল তার আড়ালে গিয়ে লুকোল। সে তবু সেখানে থেকে তরমুজ ক্ষেতের সেই লোকটার দিকে নজর রাখল।

সে দেখল লোকটা যতবার নড়াচড়া করছে ততবারই ঘণ্টার শব্দ হচ্ছে। সে যখন থেমে থাকছে ঘণ্টাটাও স্তব্ধ হয়ে থাকছে। মনে হয় তার দেহের কোনও না কোনও অঙ্গের সঙ্গে একটা ঘণ্টা বাঁধা আছে। কিন্তু এর মানে কি? যে ঘণ্টা কোনও গরু বা পশুর গলায় বাঁধা থাকে তা মানুষের দেহে কেন?

ভলজাঁ যখন এই সব কথা ভাবছিল তখন হঠাৎ কসেত্তের একটা হাত তার গায়ে লাগল। সে দেখল হাতটা বরফের মতো ঠাণ্ডা।

সে নিচু গলায় বলে উঠল, হা ভগবান!

সে নিচু গলায় এবার কসেত্তেকে ডাকতে লাগল, কসেত্তে, কসেত্তে!

কিন্তু চোখ খুলল না কসেত্তে। সে জাগল না।

ভলজাঁ এবার কসেত্তের ঘুমন্ত দেহটাকে জোরে নাড়া দিতে লাগল। তবু সে জাগল না।

তবে কি সে মারা গেছে?

সহসা এই কথা ভেবে সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তার আপাদমস্তক কাঁপতে লাগল।

কত সব অশুভ চিন্তার ঢেউ বয়ে যেতে লাগল তার মনের মধ্যে। অনেক সময় কতকগুলো ভয় একসঙ্গে এক প্রচণ্ড সেনাদলের মতো আমাদের মস্তিষ্ককে আঘাত করতে থাকে ক্রমাগত। যে ভয়ের সঙ্গে আমাদের কোনও প্রিয়জন জড়িয়ে থাকে সে ভয়ের তখন সীমা-পরিসীমা থাকে না। সে ভেবে দেখল শীতের রাত্রিতে খোলা বাতাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়াটা অনেক সময় মারাত্মক হয়ে ওঠে।

তার পায়ের কাছে কসেত্তের অচেতন দেহটা স্তব্ধ হয়ে পড়ে ছিল। সে তার উপর ঝুঁকে তার বুকের স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করল। কিন্তু তার সে হৃৎস্পন্দন এতই ক্ষীণ যে, মনে হলো যেকোনও মুহূর্তে সে স্পন্দন থেমে যেতে পারে একেবারে।

কি করে সে কসেত্তের এই হিমশীতল দেহটাকে গরম করে তুলবে? কি করে তার হারানো চেতনাকে ফিরিয়ে আনবে? এ ছাড়া আর কোনও চিন্তা ছিল না তার মনে।

সে তখন মরিয়া হয়ে চালা থেকে বেরিয়ে পাগলের মতো ছুটতে লাগল। যাই ঘটুক না মিনিট পনেরর মধ্যে কসেত্তেকে কোনও এক গরম জায়গায় একটা বিছানার মধ্যে শোয়াতে হবে।

৯

ভলর্জা সোজা তরমুজ ক্ষেতে কাজ করতে থাকা লোকটার কাছে চলে গেল। কোটের পকেট থেকে কতকগুলো মুদ্রা বার করে হাতে ধরল সে। লোকটা নত হয়ে কি করছিল বলে ভলর্জাকে দেখতে পায়নি সে।

ভলর্জা তার কাছে গিয়ে কোনও ভূমিকা না করে সরাসরি বলল, একশো ফ্রাঁ!

লোকটা চমকে উঠে তার পানে তাকাল মুখ তুলে।

ভলর্জা আবার বলল, যদি তুমি রাত্রির মতো আমাকে একটু আশ্রয় দিতে পার তাহলে তোমাকে একশো ফ্রাঁ দেব।

চাঁদের আলো তার সমস্ত মুখখানার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল।

লোকটা আশ্চর্য হয়ে বলল, পীয়ের ম্যাদলেন আপনি!

সেই গভীর রাত্রিতে সেই নির্জন বাগানবাড়িতে একজন অপরিচিত লোকের কণ্ঠে তার নাম উচ্চারিত হতে শুনে চমকে উঠল ভলর্জা চরম বিস্ময়ে। এটা সে কোনওমতেই আশা করতে পারেনি। যে তার নাম ধরে ডেকেছিল সে লোকটি একটু কুঁজো আর খোঁড়া ছিল। সে মাঠে কাজকরা চাষীদের পোশাক পরেছিল। চামড়ার নরম আবরণী দিয়ে তার বাঁ পায়ের হাঁটুটা ঢাকা ছিল। তাতে একটা ঘণ্টা বাঁধা ছিল। তার মুখের উপর একটা গাছের ছায়া পড়ায় মুখটা ঠিকমতো দেখা যাচ্ছিল না।

লোকটা তার মাথা থেকে টুপি খুলে বলে যেতে লাগল, ঈশ্বরের নামে বলছি, আপনি এখানে কি করে এলেন? কি করে আপনি এ বাগানে ঢুকলেন? মনে হলো আপনি যেন আকাশ থেকে এখানে পড়েছেন। কিন্তু আপনি কি পোশাক পরে আছেন? আপনার মাথায় টুপি নেই, গলায় নেকটাই নেই, ওভারকোট নেই। আমি

আপনাকে অতি কষ্টে চিনতে পেরেছি। কিন্তু এ সবের মানে কি? আপনি কি করে এলেন এখানে? আজকাল কি ভাল লোকরা সব পাগল হয়ে গেছে?

কিন্তু তার এই সব কথাগুলোর মধ্যে ভয়ের কিছু ছিল না। এক নিরীহ নির্দোষ গ্রাম্য চাষীর মতো কথাগুলো সে সরলভাবে বলে ফেলল।

জাঁ ভলজাঁ বলল, তুমি কে? এটা কোন জায়গা?

লোকটা বলল, এই হলো ধনীদের ব্যাপার। আপনিই তো আমাকে এই জায়গায় কাজে লাগান। আর আপনি বলছেন আপনি আমাকে চেনেন না।

না, আমি তোমায় চিনতে পারছি না, তুমি আমাকে কিভাবে চিনতে পারলে তাও বুঝতে পারছি না।

লোকটা বলল, আপনিই তো আমাকে বাঁচিয়েছিলেন।

এবার লোকটার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়ায় ভলজাঁ তাকে চিনতে পারল।

লোকটা হলো ফশেলেভেন্ত যে একদিন গাড়ির তলায় চাপা পড়ে।

ভলজাঁ বলল, হ্যাঁ, এবার আমি তোমায় চিনতে পেরেছি।

তাই আমি ভেবেছিলাম।

কিন্তু এত রাত্রিতে এখানে তুমি কি করছ?

আমি তরমুজের উপর চাপা বা ঢাকনা দিচ্ছি।

তার হাতে তখনো খড়ের তৈরি মাদুরের মতো একটা জিনিস ছিল এবং সেটা একটু আগে তরমুজের উপর চাপিয়ে দিচ্ছিল সে। ভলজাঁ যখন তাকে প্রথম দেখে তখন সে এই কাজই করছিল।

ফশেলেভেন্ত হাসতে হাসতে বলল, আমি ভাবলাম জ্যোৎস্না রাত, একটু পরেই বরফ পড়বে। তাই তরমুজগুলোর গায়ে জামা পরিয়ে দিই। আমার জায়গায় আপনি থাকলে আপনিও তাই করতেন।

লোকটা তাকে ম্যাদলেন নামে চিনে ফেলেছে। ভলজাঁ তাই সাবধানে কথা বলতে লাগল। সে তাকে প্রশ্ন করল, তোমার হাঁটুতে ঘণ্টা বাঁধা কেন?

ফশেলেভেন্ত বলল, ও, এই ঘণ্টাটা? এটা লোকদের সাবধান করে দেবার জন্য।

কিন্তু লোকদের কেন সাবধান করে দিতে হবে?

বৃদ্ধ ফশেলেভেন্তের মুখে মৃদু হাসি ছড়িয়ে বলল, জানেন না? এখানে শুধু মেয়েরা ছাড়া কোনও পুরুষ থাকে না। এখানে আমিই একমাত্র পুরুষ। তাই ঘণ্টার শব্দ শুনে আমার উপস্থিতির কথা জানতে পারবে তারা। তাহলে আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে তারা।

কিন্তু এটা কোন জায়গা?

আপনার তো তা জানা উচিত।

আমি বলছি আমি জানি না।

কিন্তু আপনিই তো এই বাগানের মালীর কাজ দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন এখানে।

এখনো আমি বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। তুমি আমাকে সব খুলে বল।

কেন, এইটাই তো পেত্তিত পিকপাসের কনভেন্ট।

এবার মনে পড়ল ভলজাঁর। দৈবযোগে ঈশ্বরের বিধানেই সে সেন্ট আঁতোনের সেই কনভেন্টে এসে পড়ে যেখানে সে ফশেলেভেন্ত গাড়ি চাপা পড়ে খোঁড়া হয়ে যাবার পর তাকে বাগানের মালীর কাজ দিয়ে পাঠায়। সে আজ থেকে দু'বছর আগের কথা। ভলজাঁ আপন মনে কথাটার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল, পেত্তিত পিকপাসের কনভেন্ট।

ফশেলেভেন্ত এবার বলল, সব তো শুনলেন। এবার বলুন তো মঁসিয়ে ম্যাদলেন, কিভাবে আপনি এলেন এখানে। আপনি একজন সাধু ব্যক্তি হলেও তো পুরুষ মানুষ। এখানে কোনও পুরুষকে ঢুকতে দেওয়া হয় না কখনো।

কিন্তু তুমি তো রয়েছ।

আমিই এখানে একমাত্র পুরুষ আছি।

ভলজাঁ বলল, যাই হোক, এখানে আমাকে আসতে হলো।

ফশেলেভেন্ত বলল, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।

ভলজাঁ তার খুব কাছে গিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, পীয়ের ফশেলেভেন্ত, আমি একদিন তোমার জীবন রক্ষা করেছিলাম।

সে কথা তো আমি আপনাকে একটু আগেই মনে করিয়ে দিয়েছি।

ঠিক আছে, এখন তুমিও আমার জন্য কিছু করতে পার।

হঠাৎ ফশেলেভেন্ত ভলজাঁর হাত দুটো ধরে টেনে নিয়ে আবেগে এমনভাবে বিচলিত হয়ে উঠল সে যে কোনও কথা বলতে পারল না। তারপর সে আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে, যদি আমি এখন আপনার জন্য কিছু করে আপনার ঋণ কিছুটা শোধ করতে পারি তাহলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব আমি। এখন দরকার হলে আপনার জীবন আমি রক্ষা করব। আমি আপনার দাস। আপনি যা বলবেন তাই করব আমি।

তার মুখটা যেন সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার মুখ থেকে যেন একটা জ্যোতি বার হচ্ছিল। সে বলল, এখন আমাকে কি করতে বলছেন .

আমি বলছি কি, তোমার থাকার ঘর আছে এখানে ?

এই কনভেন্টের যে দিকটা ভেঙে গেছে সেই ভগ্নস্তূপের কাছে আমার একটা বাসা আছে। তাতে তিনখানা ঘর আছে। সেদিকে কেউ যায় না।

সত্যিই, সে বাসাটা এমন জায়গায় আছে যে ভলজাঁ আগে দেখতে পায়নি তা।

ভলজাঁ বলল, আমার দুটো কথা তোমায় রাখতে হবে। প্রথমত, তুমি আমার সম্বন্ধে যা জান কাউকে তা বলবে না। আর দ্বিতীয়ত, আমার সম্বন্ধে এর থেকে বেশি কিছু জানতে চাইবে না।

ফশেলেভেন্ত বলল, ঠিক আছে, আপনি যা বলছেন তাই হবে। আপনার মতো ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভক্তিমান মানুষ কখনো কোনও অন্যায় বা অপমানজনক কোনও কাজ করতে পারে না। আপনিই আমাকে এ কাজে নিযুক্ত করেন। আপনার আদেশ মেনে চলাই আমার কর্তব্য। আপনি কি করেন না করেন তা দেখা আমার কাজ নয়।

ধন্যবাদ, এখন আমার সঙ্গে এস। একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে আসতে হবে।

আর কোনও কথা না বলে অনুগত কুকুরের মতো ভলজাঁকে অনুসরণ করতে লাগল ফশেলেভেন্ত।

ফশেলেভেন্ত বলল, একটা শিশু আছে নাকি ?

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কসেত্তেকে মালীর বাসায় নিয়ে গিয়ে আগুন জ্বালা এক গরম ঘরের মধ্যে একটি বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। ভলজাঁ তার কোট আর টুপিটা পরল। ফশেলেভেন্ত তার হাঁটুর উপর থেকে সেই চামড়ার আবরণী আর ঘণ্টাটা খুলে রাখল।

এবপর তারা দু'জনে এক টেবিলে পাশাপাশি বসল। টেবিলের উপর মাখন, রুটি, এক বোতল মদ আর দুটো গ্লাস রাখল ফশেলেভেন্ত। তারপর ভলজাঁর একটা হাঁটুতে হাত রেখে সে বলল, পীয়ের ম্যাদলেন, আমাকে তাহলে আপনি চিনতেই পারলেন না। আপনি যাদের জীবন বাঁচান পরে তাদের ভুলে যান। কিন্তু তারা আপনাকে ভোলে না। আপনি কিন্তু এদিক দিয়ে অকৃতজ্ঞ পীয়ের ম্যাদলেন।

১০

যে সব ঘটনাগুলো আমরা ঘটতে দেখলাম সে সব ঘটনা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই ঘটে যায়।

জাঁ ভলজাঁ যেদিন দ্বিতীয়বার জেভার্তের হাতে গ্রেপ্তার হয় এবং যেদিন সন্ধ্যাবেলায় মঁতফারমেলের জেল হাজত থেকে পালিয়ে যায় সেদিন সেখানকার পুলিশমহল ভেবেছিল সে প্যারিসে পালিয়ে যাবে। প্যারিস শহর এমনই এক বিরাট ঘূর্ণ্যাবর্ত যেখানে যে কোনও ব্যক্তিই বিশাল জনারণ্যে সহজেই হারিয়ে যেতে পারে, যেখানে বিশাল সমুদ্রে ভাসমান ভগ্ন জাহাজের মতো যে কোনও মানুষ সহজেই ডুবে যেতে পারে। সব পলাতক আসামীরা একথা ভালভাবেই জানে যে প্যারিসের জনবহুল পথেঘাটে যেভাবে কোনও লোক গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে তেমনটি কোনও গভীর অরণ্যেও থাকা যায় না। পুলিশমহলও একথা ভালভাবেই জানে বলে যে কোনও পলাতক আসামীর জন্য প্যারিস শহরকে তারা তন্ন তন্ন করে খোঁজে। ভলজাঁকে ধরার জন্য প্যারিসে পুলিশের পক্ষ থেকে অনুসন্ধানকার্য চালানো হয়, তাতে সাহায্য করার জন্য জেভার্তকে ডেকে পাঠানো হয় এবং জেভার্তও তাতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে জেভার্তের উদ্যম এবং তৎপরতা পুলিশ বিভাগের সেক্রেটারি মঁসিয়ে শ্যাপুলেতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জেভার্তের কাজকর্ম দেখে তার প্রতি আগে হতেই আগ্রহান্বিত হন শ্যাপুলেত এবং তাই তিনি জেভার্তকে মন্ত্রিউল-সুর-মের থেকে বদলি করে প্যারিসে নিয়ে আসেন। তার উপর যে কাজের ভার দেওয়া হয় সেই কার্য সম্পাদনে জেভার্তও বিশেষ সম্মানজনক দক্ষতার পরিচয় দান করে।

১৮২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কোনও একদিন একটা খবরের কাগজে জাঁ ভলজাঁর নাম না দেখা পর্যন্ত তার কথা একবারও মনে করেনি জেভার্ত। নিয়মিত খবরের

কাগজ পড়ত না জেভার্ত। কিন্তু একজন গোঁড়া রাজতন্ত্রী হিসাবে সে বেয়নে যুবরাজের আগমন সম্বন্ধে তার কৌতূহল ছিল বলে সে একদিন খবরের কাগজটা পড়তে থাকে। যুবরাজের আসার ব্যাপারটার পর গোটা কাগজটার উপর চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ কাগজের একটা পাতার তলার দিকে একটা খবর তার চোখে পড়ে। তাতে কয়েদী জাঁ ভলজাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছিল। ঘটনার বিবরণটা এমন নিখুঁত ছিল যে তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না। ফলে সে ভাবল এতে ভালই হলো। ক্রমে সে ভলজাঁর ব্যাপারটাকে মন থেকে মুছে ফেলে একেবারে।

প্যারিসে বদলি হয়ে আসার পর জেভার্ত পুলিশ বিভাগের আসা একটা অভিযোগের বিবরণ থেকে জানতে পারে মঁতফারমেলের একটা হোটেল থেকে একটি শিশুকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই অপহরণকার্য রহস্যময়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শিশুটি একটি মেয়েছেলে এবং তার বয়স সাত অথবা আট। তার মা এক হোটেল মালিকের উপর তার সব ভার দিয়ে যায়। মেয়েটির নাম কসেত্তে এবং তার মার নাম ফাঁতিনে যে কোনও এক হাসপাতালে মারা যায়। পুলিশের কাছে এ বিষয়ে যে অভিযোগ পাওয়া যায় তাতে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া না গেলেও সে অভিযোগ জেভার্তকে ভাবিয়ে তোলে।

ফাঁতিনেকে ভোলেনি জেভার্ত। আর সে একথাও ভোলেনি যে ভলজাঁকে গ্রেপ্তার করার সময় সে তিন দিনের সময় চেয়েছিল যাতে সে মঁতফারমেলে গিয়ে ফাঁতিনের মেয়েকে নিয়ে আসতে পারে। এ কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়েছিল জেভার্ত। তার একথাও মনে পড়ে গেল যে মঁতফারমেলের গাড়িতে চাপার সময়েই ভলজাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাছাড়া এর আগের দিনও সে মঁতফারমেল অঞ্চলে একবার গিয়েছিল যদিও সে গাঁয়ের মধ্যে তাকে দেখা যায়নি। মঁতফারমেলে কেন গিয়েছিল ভলজাঁ একথা অন্য কেউ না জানলেও জেভার্তের সে কারণ বুঝতে বাকি নেই। সে সেখানে গিয়েছিল ফাঁতিনের সন্তানের জন্য এবং সেই সন্তানকে এক জন বিদেশী অপরিচিত ব্যক্তি অপহরণ করে নিয়ে যায়। তবে ভলজাঁই সেই ব্যক্তি। কিন্তু ভলজাঁ মারা গেছে বলে খবর বেরিয়েছে। যাই হোক, এ বিষয়ে কাউকে কোনও কথা না বলে একদিন মঁতফারমেল যাবার গাড়ি ধরে জেভার্ত।

ঘটনাটা জানার জন্য সেখানে যায় জেভার্ত। সেখানে গিয়ে দেখে ঘটনাটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। তাতে আরও জট পাকিয়ে গেছে।

কসেত্তেকে নিয়ে যাবার পর প্রথম প্রথম হতাশ হয়ে পড়ে থেনার্দিয়েরেরা এবং সেই হতাশার আঘাতে কথাটা বলে বেড়াতে থাকে সারা গাঁয়ে। কসেত্তের অপহরণ নিয়ে গাঁয়ের নানা লোকে নানা কথা বলতে থাকে। এ বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনী প্রচারিত হতে থাকে। পুলিশ রিপোর্টের মধ্যে তাই অসংলগ্নতা দেখা দেয়। দুঃখ আর হতাশার প্রথম আঘাতের ব্যথাটা কাটলে পর থেনার্দিয়ের তার সাবধানী বুদ্ধির সাহায্যে একটা কথা বুঝতে পারে এ বিষয়ে অভিযোগ করে সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত হবে না। সে যদি বিধিমতো এই অপহরণ সম্বন্ধে অভিযোগ করে সরকারী

কর্তৃপক্ষের কাছে তাহলে তার ও তার নানারকমের সন্দেহজনক কাজ-কারবারের উপর আইনের ঈগল দৃষ্টি পড়বে। পেঁচা কখনো কোনও বাতির আলোয় নিজেকে দেখা দিতে চায় না। সে যে পনেরশো ফ্রাঁ নিয়েছে সে কথা কি করে চাপা দেবে সে? সে তাড়াতাড়ি সুর পাল্টে ফেলে এই সব ভেবে। তার স্ত্রীর কণ্ঠরোধ করে দেয় এবং গাঁয়ের কোনও লোক চুরির কথাটা তুললেই চরম বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকে যেন মেয়েটা আসলে অপহৃত হয়নি। আসল কথা অকস্মাৎ কসেত্তেকে তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় বলে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কসেত্তের প্রতি স্নেহবশত সে চেয়েছিল কসেত্তেকে কিছুদিন পরে তার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। সে ভাবতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে যাবে কেউ। জেভার্ত যখন মঁতফারমেলে তদন্ত করতে এসেছিল তখন থেনার্দিয়ের বলেছিল, যে ভদ্রলোক কসেত্তেকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিল সে তার পিতামহ। থেনার্দিয়ের এইভাবে জাঁ ভলজাঁকে কসেত্তের পিতামহ হিসাবে চালিয়ে খুশি হয়।

তবু জেভার্ত এ কাহিনীর সত্যতা নির্ণয়ের জন্য কয়েকটা প্রশ্ন করে। কসেত্তের এই পিতামহ লোকটা কে? তার নামই বা কি? থেনার্দিয়ের সরলভাবে উত্তর করে, সে একজন ধনী জমিদার। সে বলে, আমার মনে হয় লোকটার নাম মঁসিয়ে গিলম ল্যাম্বার্ত।

ল্যাম্বার্ত নামটা সম্মানজনক। জেভার্ত প্যারিসে চলে যায়। সে আপন মনে বলে, ভলজাঁ মারা গেছে। আমি একটা গাধা।

জেভার্ত ব্যাপারটা ভুলে যেতে বসেছিল। তারপর ১৮২৪ সালের মার্চ মাসে একটা ঘটনার কথা জানতে পারে। প্যারিসের মফঃস্বল অঞ্চলে সেন্ট মেদার্দে একজন বাস করে। সে নিজে ভিখারি হয়েও ভিক্ষা দেয়। লোকটা তার ব্যক্তিগত আয়ের উপর স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে এবং একটা ছোট মেয়ে তার কাছে থাকে। মেয়েটা শুধু জানে সে মঁতফারমেল থেকে এসেছে। এ ছাড়া তার বর্তমান অবস্থার কথা সে কিছুই জানে না। জেভার্ত তখন কান খাড়া করে তৎপর হয়ে ওঠে।

একজন প্রবীণ ভিখারি যে আগে অপরাধীদের সম্বন্ধে পুলিশকে খবরাখবর দিত সে জেভার্তকে সেন্ট মেদার্দের বসবাসকারী লোকটা সম্বন্ধে আরও কিছু খবর দেয়। সে জেভার্তকে বলে, লোকটা অদ্ভুত ধরনের। সে একমাত্র গরীবদের সঙ্গে ছাড়া কারো সঙ্গে কোনও কথা বলে না। সে সব সময় একটি হলুদ রঙের কোট পরে যার দাম লক্ষ লক্ষ টাকা কারণ তাতে অনেক ব্যাঙ্কনোট সেলাই করা আছে। ...এ সব কথা শুনে জেভার্তের কৌতূহল বেড়ে যায়। সেই লোকটাকে একবার নিজের চোখে দেখার জন্য সে সেই ভিখারির বহিরঙ্গের পোশাকগুলো ধার নিয়ে তাই পরে রোজ সন্ধেবেলায় সেন্ট মেদার্দ অঞ্চলে পথের ধারে এক জায়গায় বসে প্রার্থনার স্তোত্র আওড়াত। আর চোখ দুটো খুলে তাকিয়ে থাকত লোকটা পথ চেয়ে।

সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তি সন্ধের সময় নিয়মিত আসত এবং ছদ্মবেশী ভিখারিকে পয়সা দিত। সে ভিখারিবেশী জেভার্তের দিকে তাকালে জেভার্তও তার দিকে তাকাত

ভিখারিবেশী জেভার্তকে চিনতে পেয়ে ভলজাঁ যে বিস্ময়ের চমক অনুভব করে, জেভার্তও ভলজাঁকে চিনতে পেরে অনুরূপ চমক অনুভব করে। সেই সঙ্গে জেভার্ত বুঝতে পারে অন্ধকারে তার ভুল হতে পারে। সরকারী খবরে জানা যায় ভলজাঁ মারা গেছে। এ বিষয়ে সন্দেহের প্রচুর অবকাশ আছে। জেভার্তও দ্বিধাবশত এ বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে তার উপর হাত দেয়নি।

লোকটাকে অনুসরণ করে জেভার্ত একদিন তার বাসায় যায়। গার্বোর সেই বাড়িটাতে গিয়ে বাড়িওয়ালী মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে। মেয়েটা বলে লোকটার হলুদ ওভার কোটটায় লক্ষ লক্ষ টাকা আছে সেলাই করা। সে নিজে একদিন এক হাজার ফ্রাঁর একটা নোট ভাঙিয়ে আনে। একথা শুনে সেদিন সন্ধ্যার সময় জেভার্তও সেই বাড়িটার মধ্যে একটা ঘর ভাড়া করে। সে ভলজাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শোনার জন্য কান পেতে থাকে। কিন্তু ভলজাঁ বারান্দায় তার ঘরের সামনে বাতির আলো দেখে চুপ করে থাকে। ফলে জেভার্তের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

পরের দিন ভলজাঁ পালিয়ে যায় বাড়ি ছেড়ে। বেরোবার সময় ভলজাঁর হাত থেকে পাঁচ ফ্রাঁ একটা মুদ্রা পড়ে যায়। তার শব্দ শুনে বাড়িওয়ালী বুঝতে পারে ভলজাঁ চলে যাচ্ছে। সে জেভার্তকে সাবধান করে দেয়। ভলজাঁ তখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে জেভার্ত দু'জন লোক নিয়ে বুলভার্দের রাস্তায় গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে।

জেভার্ত পুলিশ বিভাগের বড় কর্তাদের কাছে এ বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা চেয়ে আবেদন করে কিন্তু কাকে সে গ্রেপ্তার করতে চায় তা সে জানায়নি। তিনটে কারণে সে একথা জানায়নি। প্রথম কারণ হলো, হঠাৎ কিছু করে বসলে ভলজাঁ সাবধান হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত সরকারী নথিপত্রে ভয়ঙ্করজনকভাবে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত উল্লিখিত এক জেল-পলাতক কয়েদীকে ধরতে পারাটা তার মতো এক অফিসারের পক্ষে এক বিরাট গৌরব এবং প্যারিসের পুলিশ বিভাগ এটা জানতে পারলে এই কৃতিত্ব ও গৌরব যাতে সে লাভ করতে না পারে হিংসাবশত তার জন্য তারা চেষ্টা করবে। সুতরাং কাজটা ভাবনা-চিন্তা করে স্থির করতে হবে। তৃতীয়ত জেভার্তের মনের মধ্যে একটা শিল্পীসুলভ ভাব ছিল বলে এক নারকীয় আকস্মিকতার প্রতি একটা মোহ ছিল তার। এতবড় কাজের কথা আগে থেকে ঘোষণা করে ফেললে সে কাজ সম্পাদনের মধ্যে কোনও জয়ের গৌরব থাকবে না পরিশেষে। কাজটা তাই সে অকস্মাৎ করে ফেলে তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল সকলকে।

জেভার্ত তাই ভলজাঁকে সেদিন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিটি বৃক্ষান্তরালে ও পরে মাঠে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছিল। এমন কি ভলজাঁ যখন তাকে দেখতে পায়নি, যখন সে নিজেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভেবেছিল তখনও তার উপর কড়া নজর রেখেছিল জেভার্ত।

তবু সে কেন তাকে গ্রেপ্তার করেনি এত কাছে এসেও? তার শুধু একটাই কারণ—তার মনে তখনো সন্দেহ ছিল। সে তখনো নিশ্চিত হতে পারেনি।

একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, এ বিষয়ে তখনকার দিনে প্যারিসের পুলিশ

মহল সাংবাদিকদের জ্বালায় বড় বিব্রত বোধ করছিল। ভাল করে নিশ্চিত না হয়ে উপযুক্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ না করেই পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করে বসলে খবরের কাগজে পুলিশের নামে নিন্দাবাদ প্রকাশিত হত। পুলিশকে ধিক্কার জানাত সাংবাদিকরা। ফলে পার্লামেন্টে কথাটা উঠত এবং সদস্যদের কাছ থেকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত মন্ত্রীদের। পুলিশ বিভাগ তখন স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত হয়ে উঠত এবং এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ত। কোনও নির্দোষ লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করাটা এক গুরুতর অন্যায়। কোনও পুলিশ এই ধরনের বড় রকমের এক ভুল করে বসলে তার চাকরি থেকে সে বরখাস্ত হত।

এই ধরনের এক সংবাদ সেকালে একদিন প্রায় কুড়িটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদটা এই: গতকাল প্রবীণ পক্ককেশ এক পিতামহ, এক বাড়ির মালিক, করদাতা এবং সমাজের একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি তাঁর আট বছরের পৌত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলে তাঁকে পুলিশ এক পলাতক কয়েদী হিসাবে গ্রেপ্তার করে পুলিশের সদর দপ্তরে নিয়ে যায়।

এই সব সংবাদ পুলিশের পক্ষে সত্যিই অপমানজনক।

তাছাড়া আমরা জানি জেভার্তের একটা নীতি আছে। সে পুলিশ হলেও তার বিবেক বলে একটা জিনিস আছে। তার মনে তখনো সন্দেহ ছিল। ভলজাঁ যখন তার সামনে দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় সে তখন তার শুধু পিঠটা দেখতে পায়। তাছাড়া তখন তার মুখ দেখেও চেনার উপায় ছিল না। সে নতুন করে এক ঘোরতর বিপদে পড়ায় কসেত্তের জন্য উদ্বেগ তার দারুণ বেড়ে যায়, সে পাগলের মতো যেখানে-সেখানে আশ্রয়ের সন্ধান করতে থাকে। এই সব উদ্বেগ, অশান্তি আর চরম দুরবস্থা হঠাৎ যেন তার বয়সটা বাড়িয়ে দেয়, তার চোখ-মুখ বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে ওঠে এমনভাবে যে তাকে তখন তার মুখ ও চেহারা দেখে চিনতে পারাটা কোনও ধুরন্ধর পুলিশের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তখন তার পোশাকটা অদ্ভুত ধরনের ছিল। দেখে মনে হত যেন কোনও প্রবীণ স্কুলমাস্টার। তার উপর থেনার্দিয়ের জেভার্তকে বলেছিল যে কসেত্তেকে তার কাছ থেকে নিয়ে গেছে সে তার পিতামহ; আবার সরকারী সূত্রে জানা যায় সে মারা গেছে। এই সব কিছু মিলে জেভার্তের মনের মধ্যে অনিশ্চয়তার ভাবটা বাড়িয়ে দেয়।

জেভার্ত একবার ভাবে সে সরাসরি লোকটার কাছে গিয়ে তার পরিচয় সম্বন্ধে কাগজপত্র চাইবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে লোকটা যদি ভলজাঁ না হয়, আবার কোনও নির্দোষ ভদ্রলোকও না হয়, যদি সে প্যারিসের এক দাগী অপরাধী বা ডাকাতদলের সর্দার হয় তাহলে তাকে ঘিরে, যে গোপন চক্রজাল বিস্তৃত হয়েছে সে জাল ছিন্ন করতে হলে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হবে তাকে। তাকে অনেক তদন্ত ও অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে এবং তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে আসল ভলজাঁকে ধরতে পারার চরম গৌরব অর্জন করার ব্যাপারটা সোনার ডিমের লোভে হাঁসের পেট কাটার মতো হাস্যাস্পদ ও অবান্তর হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং অপেক্ষা করায় ক্ষতি কি? জেভার্তের দৃঢ় বিশ্বাস ভলজাঁ কিছুতেই তার জাল থেকে পালাবে না।

জেভার্ত তাই ভলজাঁকে রু্য পন্তয়ের একটা হোটেল পর্যন্ত অনুসরণ করে চলল। হোটেল থেকে যে আলো বেরিয়ে আসছিল তাতে সে ভলজাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেল। সে বুঝতে পারল সে-ই হচ্ছে ভলজাঁ। কোনও মা তার হারানো সন্তানকে ফিরে পেলে অথবা কোনও বাঘ তার হারানো শিকারকে ফিরে পেলে যেমন হয় তখন জেভার্তের মনেও এই ধরনের এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে তার ভয়ও লাগছিল। সে যখন বুঝতে পারল পলাতক লোকটা জাঁ ভলজাঁ এবং তাকে ধরার জন্য তার হাতে মাত্র দু'জন পুলিশ আছে তখন সে রু্য পন্তয়ের পুলিশ ফাঁড়িতে সাহায্য চাইল। আমরা কাঁটাওয়ালা ছড়ি ধরার সময় কাঁটার ভয় করি।

পুলিশের সাহায্য নিতে কিছুটা দেরি হলো জেভার্তের। রোলাঁর চৌরাস্তার কাছে তার লোকদের সঙ্গে কিছুটা কথা বলতেও দেরি হলো। ফলে পলাতক আসামী তার চোখের আড়ালে চলে গেল। জেভার্ত বুঝতে পারল নদীর পুলটা পার হয়ে অনুসরণকারীদের চোখে ধুলো দিয়ে সে পালিয়ে যাবে। তাই সে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে শিকারী কুকুরের মতো শিকারের সন্ধানে দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল পুলটার মুখের কাছে। যে লোকটা পুল পার হবার পয়সা আদায় করে তার সঙ্গে কথা বলে জানল ভলজাঁ এই পুল পার হয়েই পালিয়েছে। পয়সা আদায়কারী লোকটা বলল, আট বছরের মেয়ের সঙ্গে একটা লোককে দেখেছি। আমি তার কাছ থেকে দুই স্যু চেয়েছিলাম।

জেভার্ত ঠিক সময়েই পুলটার মুখে এসে চাঁদের আলোয় দেখতে পেল কসেত্তেকে নিয়ে ভলজাঁ পুলটা পার হয়ে যাচ্ছে। সে দেখল ভলজাঁ কুল-দ্য-সাক জেনরতের দিকে যাচ্ছে। তার মনে হলো সে যাবে রু্য দ্রয়েত মুরের দিকে। সেখান থেকে বেরোবার একমাত্র পথ হলো পেতিত রু্য পিকপাস। সেই পথে যাতে সে পালাতে না পারে তার জন্য একটা লোককে পেতিত পিকপাসের সামনে পাঠিয়ে দিল জেভার্ত। তারপর সে তার দল নিয়ে আর্সেনালের পিছন দিকে এগিয়ে গেল। তার মনে হলো এটা যেন এক ধরনের শিকার। একটা বন্য শূকরকে ধরতে হলে একদিকে যেমন শিকারীর বুদ্ধি আর চাতুর্য দরকার তেমনি দরকার একদল শিকারী কুকুরের। এইভাবে সব ব্যবস্থা করে সে দেখল ডান দিকে বাঁ দিকে ভলজাঁর পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলা হলো চমৎকারভাবে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে এক টিপ নস্যি নিল জেভার্ত।

এইভাবে ভলজাঁর মুক্তির শেষ আশা ও সম্ভাবনাটুকু নিঃশেষে মুছে দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করতে লাগল সে। মাকড়শার জালের মধ্যে মাছি পড়লে সে মাছির ব্যর্থ সংগ্রাম দেখে মাকড়শা যে আনন্দ পায়, খাবার মধ্যে কোনও ইঁদুর পড়ে বাঁচার জন্য আঁকপাক করতে থাকলে বিড়াল যেমন তা দেখে যে আনন্দ পায় তেমনি ভলজাঁর কল্পিত সংগ্রামের ব্যর্থতার কথা মনে ভেবে আনন্দ পেতে লাগল জেভার্ত। সে যে কুটিল জাল বিস্তার করেছে সে জাল ইচ্ছামতো গুটিয়ে নিতে পারে সে। ভলজাঁ যত বেপরোয়া বা বিপজ্জনকই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিকূল শক্তির প্রতিরোধ করতে কোনও মতেই পারবে না সে।

সুতরাং বাঁ দিকে ডান দিকে পথের ধারে সব জায়গাগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগল জেভার্ত। এইভাবে দেখতে দেখতে সে যখন তার পাতা জালের মাঝখানে গিয়ে হাজির হলো তখন দেখল মাছি পালিয়ে গেছে। যেখানে ভলজাঁর থাকার কথা সে জায়গা শূন্য। যে লোককে পাহারায় নিযুক্ত করেছিল সে দেখতে পায়নি ভলজাঁকে।

জেভার্তের ক্রোধের প্রচণ্ডতা সহজেই অনুমেয়। কখনো কখনো এমনিই হয়। অনেক সময় চারদিকে শিকারী কুকুরের দল ঘিরে থাকলেও তার মধ্যে থেকে একটা হরিণ ঐন্দ্রজালিকভাবে পালিয়ে যায়। তখন মনে হয় হরিণ নয়, যেন এক সুদক্ষ যাদুকর। জেভার্তেরও এ ক্ষেত্রে তাই মনে হচ্ছিল। তাই বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে নেপোলিয়ন রুশ অভিযানে ভুল করেছিলেন, আলেকজান্ডার ভুল করেছিলেন ভারত অভিযানে, সীজার ভুল করেছিলেন আফ্রিকা অভিযানে, সাইরাস স্কাইথিয়ায়, ভলজাঁর বিরুদ্ধে অভিযানে জেভার্তও ভুল করেছিল। ভলজাঁকে চিনতে তার দেরি হয়েছিল, তাকে এক নজরে দেখেই তাকে চিনতে পারা উচিত ছিল—এটাই ছিল তার প্রথম ভুল। তার পরেও যে ভুল করেছিল গার্বোর বাড়িতে যে তাকে চিনতে পেরেও সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করেনি। আবার র‍্য পন্তয়ে যে তাকে নিশ্চিতরূপে চিনতে পেরেও গ্রেপ্তার করেনি; রোঁলার চৌরাস্তার মাথায় চাঁদের আলোয় তাকে দেখতে পেয়েও তাকে গ্রেপ্তার করেনি সে। ভাবনা-চিন্তা করে কোনও কিছু করা বিজ্ঞজনোচিত কাজ, কিন্তু কোনও নেকড়ে বা পলাতক কয়েদীর মতো সদাসতর্ক কোনও জীবকে ধরার সময় শিকারী বা পুলিশ অনেক বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। সে নিজেকে বেশি শক্তিশালী ভেবেছিল। সিংহকে ইঁদুর ভেবে খেলা করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে। আবার নিজের শক্তিকে অহেতুক কম ভেবে পুলিশের সাহায্য চাইতে গিয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করাটাও অন্যায় হয় তার। একজন কূট প্রকৃতির সুদক্ষ ডিটেকটিভ হয়েও এই সব ভুল করে বসে সে। একজন অভিজ্ঞ শিকারী কুকুর হয়েও ভুল করে বসে শিকার ধরতে গিয়ে।

কিন্তু ভুল কে করে না আমাদের মধ্যে ? সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষাগত কৌশলের মধ্যেও অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। যে কোনও বড় ভুল হচ্ছে মোটা দড়ির মতো। সরু সরু অনেক সুতোর সমন্বয়ে যেমন এক-একটা মোটা দড়ি গড়ে ওঠে, তেমনি ছোটখাটো ভুলের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে এক-একটা বড় রকমের ভুল। পূর্বে মার্সিয়াঁ আর পশ্চিমে ভ্যালেন্তিলিয়াঁর মাঝখানে অহেতুক ইতস্তত করে ভুল করেছিলেন হ্যানিবল, কাপুয়াতে অকারণে দেরি করেছিলেন। দাঁতন আর্সি-সুর-আবেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

ভুল করলেও জেভার্ত যখন দেখল ভলজাঁ পালিয়ে গেছে তখন সে মাথা গরম করল না বা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল না। সে বুঝল তার শিকার হাতছাড়া হয়ে গেলেও বেশি দূর যেতে পারেনি। সে তাই আশেপাশে কয়েকটি জায়গায় পাহারায় নিযুক্ত করে রাখল কয়েকজনকে। পাহারাদারেরা লুকিয়ে ওৎ পেতে রইল। হঠাৎ একসময়

জেভার্ত দেখল রাস্তার লাইট পোস্টের মধ্যে একটা বড় দড়ি নেই। এটা এক মূল্যবান হদিশ হলেও জেভার্ত ভাবল ভলজাঁ জেলরতের দিকে গেছে। সে তাই সেখানে খুঁজতে গেল। ওদিকের পথটা বাগানের একটা পাঁচিলের গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাগানটার ওপারে আছে কিছু আবাদযোগ্য জমি। সে ভাবল ভলজাঁ এই পথেই গেছে। যদি সে সে-পথে যেত তাহলে তার আর অব্যাহতি ছিল না। জেভার্ত বাগানটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল ঠিক যেন খড়ের গাদায় একটা সূচ হারিয়ে গেছে।

সকাল হলে সে দু'জন যোগ্য লোককে পাহারায় নিযুক্ত করে নিজে মুরগির দ্বারা বোকা বানানো এক খেঁকশেয়ালের মতো লজ্জাভরা মুখ নিয়ে পুলিশের সদর দপ্তরে গিয়ে পৌঁছল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

আজ হতে অর্ধ শতাব্দী আগে ৬২ পেতিত র‍্যু পিকপাস অতি সাধারণ এক বাগানবাড়ি ছিল। এর সদর দরজাটা সব সময় আধখোলা অবস্থায় থেকে পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দুটো জিনিস নজরে পড়ত। প্রথমেই নজরে পড়ত আঙুরলতায় ঢাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক উঠোন আর এক অলস দারোয়ানের মুখ। প্রাচীরের বাইরে কতকগুলো গাছের মাথা দেখা যেত। যখন সূর্যের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ত বাগানবাড়ির উঠোনটায় এবং মদপানের ফলে দারোয়ান সজীব হয়ে উঠত তখন কোনও পথিক তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেদিকে একবার তাকিয়ে আনন্দ অনুভব না করে পারত না। কিন্তু তার বহিরঙ্গের এই হাস্যোজ্জ্বল ভাব সত্ত্বেও বাড়ির ভিতরটায় একটা বিষাদ জমে থাকত সব সময়। কারা যেন তার মধ্যে সব সময় প্রার্থনা করত আর কাঁদত।

কেউ যদি ভিতরে একবার ঢুকত তাহলে একটা সরু সিঁড়ি পেত যাতে দু'জন লোক পাশাপাশি উঠতে পারত না। সেই সিঁড়ি দিয়ে একটা বারান্দায় উঠে গিয়ে দেখত বারান্দাটা অন্ধকার এবং দুটো জানালা দিয়ে তাতে বাইরে থেকে কিছুটা আলো আসত। সেই বারান্দা দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলে একটা ছোট ঘরের দরজা দেখতে পেত। সে দরজায় কখনো তালাচাবি থাকত না। দরজাটা ঠেলে খুলে দু' ফুট বর্গাকার একটা ঘরে ঢুকে দেখত ঘরটা একেবারে নির্জন এবং ঠাণ্ডা। দেওয়ালগুলো সাদা ধবধবে। একটামাত্র জানালা দিয়ে দিনের আলো ঘরে আসত। ঘরের মধ্যে কোনও কিছু দেখতে পাওয়া যেত না বা কোনও পদশব্দ শোনা যেত না। ঘরের মধ্যে কোনও আসবাবপত্র ছিল না। একটা চেয়ার পর্যন্ত ছিল না। দেওয়ালগুলোও ছিল একেবারে ফাঁকা। ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখত সামনের দেওয়ালে সবুজ ফুল আঁকা একটা কাগজ চিটোন ছিল। ঘরের মধ্যে যে একটামাত্র জানালা ছিল তাতে ঘন করে লোহার গ্রিল দেওয়া ছিল যার মধ্যে কোনও মানুষ ঢুকতে পারত না। তার ডান দিকে একটা দড়িতে একটা ঘণ্টা ঝোলানো ছিল।

ঘরখানায় কেউ সাহস করে ঢুকে পড়লে ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে এক নারীকণ্ঠ তাকে প্রশ্ন করত, কে ওখানে?

সে নারীকণ্ঠ ছিল বিষাদে ভরা। কিন্তু কোনও নারীকে চোখে দেখা যেত না। মনে হত সমস্ত ঘরখানা এক সমাধিগহ্বর। চারদিকের স্তব্ধ অন্ধকার দেওয়ালগুলোর বাইরে কোনও জগৎ নেই। নারীকণ্ঠ তখন আবার বলত, আলোর দিকে ফের।

দরজার উল্টোদিকের দেওয়ালে ভাল করে দেখলে একটা কাঁচের সার্সিওয়ালা দরজা পাওয়া যেত। সেই দরজা ঠেলে ভিতরে গেলে থিয়েটারের বক্সের মতো একটা ছোট ঘর পাওয়া যেত। তার মধ্যে দুটো চেয়ার আর একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা থাকত।

আর এক নারীকণ্ঠ আবার বলত, আমি এখানে আছি। আপনি কি চান?

মানুষের কণ্ঠ শোনা গেলেও কোনও মানুষ দেখা যেত না। এমন কি কারো শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যেত না। মনে হত সমাধির ভিতর থেকে কোনও প্রেতাত্মা কথা বলছে।

আগন্তুক যদি ঠিকমতো সেকথার উত্তর দিত তাহলে ঘরখানার সামনের দিকে বন্ধ একটা জানালার কিছুটা খোলা হত। আর সেই আধখোলা জানালাপথে কালো অবগুণ্ঠনে ঢাকা একটা শুধু মাথা দেখা যেত। কালো অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে শুধু মুখ আর চিবুক ছাড়া আর কোনও অঙ্গ দেখা যেত না। আগন্তুক অন্ধকারে বসে থাকত আর সেই অবগুণ্ঠিত অশরীরী মুখটা শুধু কথা বলত, কিন্তু সে মুখ আগন্তুকের মুখপানে একবারও তাকাত না।

আগন্তুক অনেক চেষ্টা করেও সেই রহস্যময় মূর্তির কিছু দেখতে পেত না। শুধু শীতের কুয়াশায় ঢাকা সমাধিগহ্বরের ছায়া আর অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেত না। এক ভয়ঙ্কর প্রশান্ত স্তব্ধতা আচ্ছন্ন করে রাখত জায়গাটাকে। কোনও প্রেতমূর্তি পর্যন্ত দেখা যেত না। কোনও দীর্ঘশ্বাস পর্যন্ত শোনা যেত না।

এমনি করে সমস্ত কনভেন্টটা এক সুকঠোর স্তব্ধতা আর বিষাদে জমাট বেঁধে থাকত সব সময়। এই হলো বার্নাদিনে কনভেন্ট। আগন্তুক যেখানে গিয়ে বসত, সেটা হলো বড় বৈঠকখানা। যে নারীকণ্ঠ কথা বলত তার সঙ্গে সে এক সিস্টার। ভিতরের ঘরের একটামাত্র জানালার কাঁচের সার্সি দিয়ে বাইরের পৃথিবীর সামান্য কিছু আলো আসত। এই পবিত্র স্থানে বাইরের কেউ আসতে পারত না। কেউ কিছু দেখতে পেত না।

কিন্তু সেই ছায়া আর অন্ধকারের ওপারে জীবন আর আলোর এক বিষণ্ন নীরব সমারোহ ছিল। কিন্তু সে আলো জীবন-মৃত্যুর মতোই হিমশীতল আর প্রাণচঞ্চলতাহীন। তার ভিতরে কি হত না হত তা বাইরের জগতের কেউ দেখতে বা জানতে পারত না। কেউ কোথাও তা বর্ণনা করেনি।

২

১৮২৪ সালে পেতিত র‍্যু পিকপাসে যে কনভেন্ট ছিল সেখানে বার্নাদিনে সম্প্রদায়ের

কিছুসংখ্যক সন্ন্যাসিনী মার্তিন ভার্গার নিয়ম-কানুন মেনে চলত। কিন্তু যারা ক্লেয়ারভয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা ছিল বেনেডিক্টাইনদের মতো সিটো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। তারা ছিল সেন্ট বার্নার্দ নয়, সেন্ট বেনেডিক্টের অধীন। ১৪২৫ সালে মার্তিন ভার্গা বেনেডিক্টাইন বার্নাদিনে সম্প্রদায়ের মিলনে এক যুগ্ম ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন যার সদর দপ্তর ছিল সালামাঙ্কাতে এবং আলকালাতে তার এক সহ-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

এই ধর্মসভার কতকগুলি শাখা ইউরোপের ক্যাথলিক দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সব শাখাগুলি রোমের মতো চার্চের নির্দেশ মেনে চলত।

বার্নাদিনে বেনেডিক্টাইন দলের সন্ন্যাসীরা মার্তিন ভার্গার অধীনে বেনেডিক্টাইনদের মতো অক্ষয় ভক্তির প্রার্থনা করে চলে। একমাত্র ভক্তিমূলক প্রার্থনা করে চলে। একমাত্র ভক্তিমূলক প্রার্থনা ছাড়া পেতিত পিকপাসের কনভেন্টের সন্ন্যাসিনীগণ অন্যান্য বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশেষ করে তাদের পোশাক ছিল আলাদা। অন্যান্য দলের মেয়েরা সাদা পোশাক পরত, পেতিত পিকপাসের মেয়েরা পরত কালো পোশাক। ভক্তিমূলক উপাসনা এবং প্রার্থনাই ছিল দুটি সম্প্রদায়ের একমাত্র যোগসূত্র। যীশু ও খ্রীস্টের বাল্যজীবন, পরবর্তী জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধেও দুই দলের ধারণা একই রকমের ছিল।

মার্তিন ভার্গার নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি বড় কঠোর ছিল।

এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনীরা সারা বছর কঠোর আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করত। তারা লেন্ট ও অন্যান্য তিথি উপলক্ষে উপবাস করত। তারা রাত্রি একটার সময় ঘুম থেকে উঠত। তারপর তাদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুনের বই পড়ত এবং রাত তিনটে পর্যন্ত প্রার্থনা গান করত। তারা খড়ের তোষকের উপর মোটা খসখসে চাদর পেতে তার উপর শুত। তারা একেবারেই স্নান করত না। শীতে আগুন জ্বালাত না। প্রতি শুক্রবার নিজেদের চাবুক মারত। একমাত্র আমোদ-প্রমোদের সময় ছাড়া তারা কোনও কথা বলত না। সব সময় মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকত। আমোদ-প্রমোদের সময়কাল খুবই অল্প ছিল। বছরের ছয় মাস চুল দিয়ে তৈরি এক রকমের জামা পরতে হত তাদের। ১৪ই সেপ্টেম্বর হতে ঈস্টারের দিন পর্যন্ত। আগে সারা বছরই এই জামা পরার নিয়ম ছিল। গরমকালে এই জামা পরা অসম্ভব এবং অসহ্য হত বলে পরে এই নিয়মের পরিবর্তন করে ছয় মাস করা হয়। কিন্তু ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে এই জামা পরতে শুরু করলেই কয়েক দিন যাবৎ সন্ন্যাসিনীদের দারুণ কষ্ট হত। অনেকের জ্বর হত। আনুগত্য, দারিদ্র্য, সতীত্ব, সারাজীবন চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা প্রভৃতি নিয়মগুলি শপথ করে তাদের পালন করতে হত।

যে সব সন্ন্যাসিনী মাদার উপাধি লাভ করেছে তাদের মধ্যে থেকে একদলকে কনভেন্টের প্রধানা নির্বাচিত করা হত তিন বছরের জন্য। এই মাদারদেরই একমাত্র কথা বলার অধিকার ছিল। তাই এদের লাতিন ভাষায় বলা হত 'মেরে ভোকালে'

বা সোচ্চার মাতা। কথা বলার অধিকারসম্পন্ন প্রধানাই পিকপাসের কনভেন্টে কোনও আগন্তুক এলে কথা বলত তার সঙ্গে। এই প্রধানা জীবনে মাত্র পর পর দু'বার নির্বাচিত হতে পারত। অর্থাৎ তার কার্যকাল নয় বছরের বেশি হতে পারবে না।

কনভেন্টের ভারপ্রাপ্ত যাজককে কোনও সন্ন্যাসিনী চোখে দেখতে পেত না। এই যাজক যে চ্যাপেলে বাস করত সেই চ্যাপেল আর কনভেন্টের মাঝখানে সাত ফুট উঁচু এক দেওয়ালের বাধা ছিল। যাজক যখন বক্তৃতা মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিত, সন্ন্যাসিনীরা তখন মুখের উপর অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে বক্তৃতা শুনত। তারা খুব নিচু সুরে কথা বলত পরস্পরের সঙ্গে। তারা সব সময় মাথা নিচু করে পথ হাঁটত। একমাত্র একজনেরই প্রবেশাধিকার ছিল কনভেন্টে, তিনি হলেন স্থানীয় ধর্মীয় অঞ্চলের আর্কবিশপ।

আর একজন পুরুষ ছিল কনভেন্টে। সে হলো বাগানের মালী। সে ছিল বয়সে বুড়ো। তার উপস্থিতি সম্পর্কে সন্ন্যাসিনীরা যাতে সতর্ক হয়ে উঠতে পারে তার জন্য তার হাঁটুতে একটা ঘণ্টা বাঁধা থাকত।

প্রধানার নির্দেশমতো সব নিয়মকানুন অকুণ্ঠভাবে মেনে চলতে হত সন্ন্যাসিনীদের। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। এক দ্বিধাহীন ধর্মগত আত্মসমর্পণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হত নিজেদের। তারা তাদের প্রধানার অনুমতি ছাড়া কোনও কিছু পড়তে বা লিখতে পারত না। এ বিষয়ে তাদের আনুগত্য ছিল অন্ধ। কেউ কোনও প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করতে পারত না কখনো।

সন্ন্যাসিনীদের প্রত্যেককে পালাক্রমে একে একে প্রায়শ্চিত্ত ব্রত সাধন করতে হত। পৃথিবীতে যেখানে যত ভুল, আইন ও নীতিভঙ্গ, শৃঙ্খলাভঙ্গ, অসাম্য, অন্যায়, অবিচার প্রভৃতি পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়—এ প্রায়শ্চিত্ত হলো সেই সব পাপ আর অন্যায়ের জন্য। বিকাল চারটে থেকে রাত চারটে পর্যন্ত একটানা বারো ঘণ্টা ধরে প্রায়শ্চিত্তকারিণী সিস্টারকে প্রধান বেদীর সামনে পাথরের মেঝের উপর নতজানু হয়ে বসে থাকতে হত। তার হাত দুটি জোড়া থাকত এবং তার ঘাড়ে একটা দড়ি বাঁধা থাকত। যখন সে খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ত, যখন সে ক্লান্তি ও অবসাদ দুঃসহ হয়ে উঠত তার কাছে তখন সে শুধু সেইখানে হাত দুটো আড়াআড়িভাবে ক্রসের মতো করে উপুড় হয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে পারত। এইভাবে তাকে পৃথিবীর সমস্ত পাপীর জন্য প্রার্থনা করতে হত। এ কাজ নিঃসন্দেহে মহত্ত্বের পরিচায়ক।

যেখানে প্রায়শ্চিত্ত ব্রত পালিত হয় তার সামনে একটি স্তম্ভের উপর সব সময় একটি বাতি থাকত।

প্রধান বেদীর সামনে সব সময় একজন না একজন সিস্টার নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনায় স্তব্ধ হয়ে থাকে। একেই বলে 'পার্পেচুয়াল অ্যাডোরেশান' বা চিরস্থায়ী প্রার্থনার প্রতিষ্ঠান।

মাদার উপাধিধারিণী সিস্টারদের নাম সেন্ট বা শহীদদের নাম অনুসারে রাখা হত না, তাদের নাম রাখা হত যীশু অথবা মাতা মেরীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর এক-একটিকে ভিত্তি করে, যেমন মাদার নেটিভিটি, মাদার কনসেপশান, মাদার

অ্যানানসিয়েশান, মাদার প্যাশান প্রভৃতি। সেন্টদের নাম অনুযায়ী নাম রাখার কোনও বিধি নেই।

সন্ন্যাসিনী সিস্টারদের শুধু মুখগহ্বরটুকু ছাড়া দেখতে পাবে না কেউ। মুখ খুললেই তাদের হলুদ দাঁতগুলো দেখতে পাওয়া যাবে। কারণ দাঁত মাজার ব্রাশ কনভেন্টে ঢুকতে দেওয়া হয় না। সাধনার ঊর্ধ্বস্তরে উন্নীত একমাত্র বয়োপ্রবীণা সিস্টাররাই দাঁত মাজার অধিকার লাভ করে।

সিস্টাররা যে সব জিনিস দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে সেই সব জিনিস কখনো 'আমার' একথা বলতে পায় না বলে সব সময় 'আমাদের' বলতে হয় তাদের। যেমন আমাদের অবগুণ্ঠনবস্ত্র, আমাদের জামা প্রভৃতি। কখনো কখনো তারা কোনও বই, কোনও প্রাচীন বস্তু বা মেডেলের প্রতি অতি মাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পার্থিব কোনও বস্তুর প্রতি কোনও আসক্তি তাদের পক্ষে অন্যায়। তাই এই আসক্তির কথা তারা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে আসক্তি সেন্ট থেরেসার কথা স্মরণ করে ত্যাগ করে। একবার এক মহিলা সেন্ট থেরেসার কনভেন্টে যোগদান করার সময় তাঁকে বলে, হে শ্রদ্ধেয়া মাতা, আমাকে একখানি পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ দয়া করে দেবেন, কারণ এ গ্রন্থ আমি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি।

একথা শুনে সেন্ট থেরেসা উত্তর করেন, হায়, তাহলে কোনও এক বস্তুর প্রতি অন্তরে তোমার একটা আসক্তি আছে। তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা তোমার চলবে না।

কোনও সিস্টার একটা ঘরে একা থাকতে পেত না। অথবা ঘর বন্ধ করে বিশ্রাম করতে পেত না।

খোলা চালার মধ্যে সকলে মিলে থাকতে হত তাদের। যখন তারা দু'জনে কখনো মিলিত হত তখন একজন আর একজনকে বলত, বেদীর উপর যে দেবতা রয়েছে তার গুণগান ও প্রার্থনা করো।

তখন অন্যজন তার উত্তরে বলত, 'চিরদিন'। কেউ কারো ঘরের দরজার সামনে গেলেও ঐ কথা বলত এবং ঘরের ভিতর যে থাকত সেও তার উত্তরে বলত, 'চিরদিন'।

অনেক সময় প্রথম কথা বলতে না বলতেই অন্যজন 'চিরদিন' কথাটা তাড়াতাড়ি বলে ফেলত। এই কথা বলাটা তাদের এক যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অনেক সময় কোনও আগন্তুক এসেই বলত, 'মেরীর গুণগান করো।'

তখন অন্যজন বলত, তিনি মহিমাময়ী।

এইভাবে তারা পরস্পরকে 'শুভদিন' জানাত, পরস্পরকে অভ্যর্থনা করত।

দিনের বেলায় যখনই গীর্জার ঘণ্টা প্রতিটি প্রহর ঘোষণা করত যেমন পাঁচটা, আটটা অর্থাৎ ঘড়িতে যটাই বাজত তখনই তারা পরস্পরে বলাবলি করত, শুধু এখন নয়, সব সময় সব প্রহরে বেদীর দেবতা উপাসিত ও প্রশংসিত হন।

ঘণ্টায় প্রহর ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে যা করত অর্থাৎ কিছু কথা বলত,

কিছু করত বা চিন্তা করত—সব কাজ থামিয়ে দিয়ে উপাসনা ও প্রার্থনার কথা বলত। এইভাবে প্রতিটি প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি তাদের চিন্তার প্রবাহকে থামিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবিত করত। এই রীতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। শুধু তাদের ছিল ভিন্ন। যেমন শিশু যীশুর উপাসকগণ প্রহরের ঘণ্টা শুনে বলত, শুধু এখন এই মুহূর্তে নয়, সব সময় যীশু খৃস্টের প্রেম আমার অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

মার্তিন ভার্গার অধীনস্থ বেনেডিক্টেনে বার্নাদিনে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনীরা আজ হতে পঞ্চাশ বছর আগে পেতিত পিকপাসে সমবেত হয়। তারা শুধু প্রার্থনা করে করে সমস্ত কনভেন্টটাকে সমাধিভূমির মতো বিষাদময় করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে তারা প্রার্থনা থামিয়ে নিচু গলায় বলে উঠত, 'যীশু-মেরী-জোশেফ।'

কথাটা তারা এত নিচু গলায় বলত যে তা শোনাই যেত না।

পেতিত পিকপাসের কর্তৃপক্ষ প্রধান বেদীর নিচে মাটি খুঁড়ে একটা গহ্বর তৈরি করে তার মধ্যে সব মৃতদেহকে সমাহিত করত। কিন্তু সরকার এইভাবে এক জায়গায় সব মৃতদেহ সমাহিত করার অনুমতি দিত না। সরকার হুকুম দিয়েছিল মৃতদেহকে কনভেন্টের বাইরে সমাধিভূমিতে নিয়ে যেতে হবে। এ হুকুম কনভেন্টের রীতির উপর এক অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হিসাবে গণ্য হয়। তবে তাদের সান্ত্বনা এই যে তারা ভগিয়ার্দের কবরখানার এক কোণে একটা বিশেষ জায়গায় এক বিশেষ সময়ে মৃতদেহকে সমাহিত করার অনুমতি লাভ করে। এই কবরখানা বেনেডিক্টেনে—বার্নাদিনে সম্প্রদায়ের অধিকারে ছিল।

প্রতি বৃহস্পতিবার রবিবারের মতো দিনের বেলায় এবং সন্ধ্যাবেলায় সমবেত প্রার্থনায় যোগদান করত সবাই। তারা এমন সব উৎসব ও তিথির দিন পালন করত যার কথা বাইরের জগতের লোক জানত না। তাদের প্রার্থনা, প্রার্থনাকালের সংখ্যা এবং দৈর্ঘ্য এত বেশি ছিল যে তারা নিজেরাই তাতে বিরক্তবোধ করত।

সপ্তায় একদিন করে স্বীকারোক্তি অনুষ্ঠান হত। সারা সপ্তা ধরে প্রতিটি সিস্টার যে সব দোষ ও পাপ করত, তারা পালাক্রমে নতজানু হয়ে প্রধানা সিস্টাররা সামনে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করত। প্রতিটি স্বীকারোক্তি পর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাদার উপাধিধারী সিস্টারের আলোচনা করে স্বীকারোক্তিকারিণীর দ্বারা কৃত ও স্বীকৃত পাপের জন্য শাস্তির বিধান দান করত।

তবে স্বীকারোক্তির ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনও পাপ বা অন্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। এ ছাড়া লা কুলপে নামে এক ধরনের অনুষ্ঠান হত। যদি কোনও সিস্টার বুঝত সে কোনও পাপ বা অন্যায় করেছে তখন সে প্রধানা মাদারের সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে রেখে শুয়ে থাকত। প্রধানা যে কাঠের উপর বসত সেই কাঠের গায়ে তিনবার টোকা না দিলে শায়িত সিস্টার কিছুতেই উঠত না। কতকগুলি ছোটখাটো অন্যায় বা নিয়মভঙ্গের জন্য অনুশোচনার ব্যবস্থা ছিল। গ্লাসভাঙা, ঘোমটার কাপড় ছেঁড়া, অপরিচ্ছন্নতা ও প্রার্থনাগানের লাইন ভুলে যাওয়া

বা সুর ভুল করা প্রভৃতি ছোটখাটো ভুলগুলির ক্ষেত্রে ভুলকারিণী সিস্টার নিজেই নিজের বিচার করে অনুতাপ বা অনুশোচনা করত।

বসার ঘরে প্রধানা কোনও সিস্টার ডেকে পাঠালে প্রধানা নিজে অন্যান্য সিস্টারদের মতো মাথার ঘোমটাটা মুখের উপর টেনে দিয়ে শুধু মুখগহ্বরের কাছটা সামান্য একটু খুলে রাখতেন। যেমন বাইরে থেকে কোনও আগন্তুক এলে করা হতো। একমাত্র প্রধানাই বাইরে থেকে কোনও আগন্তুক এলে কথা বলতে যেত তার সঙ্গে। অন্যান্য সিস্টারেরা শুধু তাদের বাড়ির আত্মীয়স্বজন ছাড়া আর কোনও বাইরের লোকের সামনে বেরোতে বা দেখা করতে পেত না। তবে আত্মীয়স্বজনদের দেখা করার অনুমতি খুব কমই মিলত। অতীতে কোনও সিস্টারকে ভালবাসত এমন কোনও পুরুষ যদি কনভেন্টে এসে দেখা করার অনুমতি চাইত তাহলে সে অনুমতি দেওয়া হত না। সিস্টারের অতীতের কোনও বান্ধবী এই ধরনের অনুমতি পেতেন।

সেন্ট বেনেডিক্টের এই সমস্ত নিয়মকানুনগুলি মার্তিন ভার্গা আরও কঠোর করে তোলেন।

৩

কনভেন্টের শিক্ষাকাল হলো দু' বছরের। এই কালের মধ্যে শিক্ষার্থিনী না পারলে আরও চার বছর শিক্ষাকাল বেড়ে যায়। তবে শিক্ষার্থীকে তেইশ-চব্বিশ বছবের মধ্যে শিক্ষাকাল শেষ করে শপথ গ্রহণ করতে হয়। কোনও বিধবাকে কনভেন্টে গ্রহণ করা হয না। শপথ গ্রহণেব পর শিক্ষার্থিনীকে নির্জন ঘরের মধ্যে আত্মনিগ্রহের জন্য এমন সব সাধনা করতে হয যেগুলি গুহ্য এবং যার কথা তারা বলে না।

যেদিন শিক্ষাকাল শেষ করে শিক্ষার্থিনী শপথ গ্রহণ করে সেদিন ভাল জমকালো পোশাক পরে মাটিতে উপুড হযে শুয়ে পড়ে। তার দেহেব উপর একটা কালো চাদর ঢাকা দেওয়া হয়। অন্যান্য সিস্টারেরা দুটি সারিতে বিভক্ত হযে তার দু'পাশে দাঁড়ায়। তারা মৃত্যুকালীন প্রার্থনার গান গায়। তারপর একজন সকরুণ সুরে বলে, আমাদের সিস্টার মারা গেছে।

আর একজন তখন বলে, খৃস্টের মধ্যে সে নবজীবন লাভ করেছে।

সেকালে এই কনভেন্টে একটি স্কুল ছিল এবং ছাত্রীদের এক আবাস ছিল। সেখানে ধনীদের মেয়েরা থেকে পডাশুনো করত। সেই সময় এক ইংরেজ বালিকা ছিল সেখানে। ক্যাথলিক তালস্তের নাম সে ধারণ কবেছিল। সন্ন্যাসিনী সিস্টারদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে ও প্রাচীরঘেরা এক বাড়িতে সব সময় বাস করে বাইরের জগৎ, জীবন ও বর্তমান যুগকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে তারা। এই কনভেন্টে একটি মেয়ে একবার এই গ্রন্থের লেখককে বলে, রাস্তার পাথর দেখলেই মাথা থেকে গা পর্যন্ত আমার কাঁপতে থাকে। তারা নীল রঙের জামা-প্যান্ট আর সাদা টুপি পরত। ব্রোঞ্জ অথবা এনামেলের ক্রস গাঁথা থাকত তাদের বুকে। কতকগুলি উৎসবের দিন বিশেষ করে সেন্ট মার্থার জন্মদিনে ছাত্রীরা সিস্টারদের পোশাক পরে সারাদিন আনুষ্ঠানিক

ক্রিয়াকর্ম করার এক বিশেষ অনুমতি পেত। প্রথম প্রথম সিস্টারেরা ছাত্রীদের ঐ দিনে তাদের কালো পোশাক পরতে দিত। কিন্তু এটা প্রায় অধর্মচরণের সামিল বলে কনভেন্টের প্রধানা অধিকর্ত্রী তা নিষিদ্ধ করে দেন। আসল কথা, কনভেন্টের কর্তৃপক্ষ এই অনুমতি দান করলে ছাত্রীরা সিস্টারদের পোশাক পরে ধর্মীয় জীবন যাপনের এক পূর্বাস্বাদ লাভ করে তারা সত্যিকারের একটা আনন্দ লাভ করত। এটা তাদের ছাত্রজীবনে একটা নতুনত্ব আর পরিবর্তন নিয়ে আসত। নির্দোষ নিরীহ্ সরলপ্রাণ শিশুদের কাছে এ এক পরম আনন্দের ব্যাপার।

কয়েকটি চরম আচরণ ছাড়া কনভেন্টের জীবনযাত্রা ও প্রথাগত সব আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছাত্রীবা একরকম অভ্যস্ত হয়ে পড়ত। তাদের জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ত একে একে সব কিছু। একজন ছাত্রী কনভেন্ট যাবার পর বিয়ে করে সংসার জীবনে প্রবেশ করেও কনভেন্টের কথা ভুলতে পারেনি। কোনও অতিথি তাদের বাড়িতে এলেই দরজা খুলে পুরনো অভ্যাসের বশে বলে উঠত, 'চিরদিন'। সিস্টারদের মতো সেও তাদের আত্মীয়স্বজনদের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়েই কথাবার্তা বলত, বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেত না। কনভেন্টের ছাত্রীরা কনভেন্ট ছেড়ে বাড়িতে আসার পর তাদের মাকেও তাদের আলিঙ্গন করতে দিত না। কনভেন্টের অভ্যাস এবং জীবনচর্যার কথা ভুলতে পারত না তারা সারা জীবনের মধ্যে। কনভেন্টের মধ্যে এত কড়াকড়ি ছিল যে ছাত্রীদের মায়েরা গিয়ে তাদের মেয়েকে চুম্বন করার অনুমতি পেত না। একবার এক ছাত্রীর মা তার তিন বছরের এক মেয়েকে নিযে কনভেন্টে তার মেয়েকে দেখতে যায়। কিন্তু সেই ছাত্রীর তিন বছরের বোনকেও তার দিদিকে চুম্বন করতে দেওয়া হয়নি। এমন কি জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে সেই ছোট মেয়েকে তার হাতটা ঢুকিয়ে তার দিদিকে স্পর্শ করার অনুমতিও দেওয়া হয়নি।

৪

সে যাই হোক, এই ছাত্রীরাই সমস্ত বিষাদাচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠানটার মধ্যে এক ঝলক আলোর উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছিল।

আমোদ-প্রমোদের জন্য ঘণ্টা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাগানে যাবার দরজাটা খুলে যেত আর বাগানের পাখিরা যেন মেয়েদের আহ্বান করে বলত, এখানে এস মেয়েরা। উদ্দাম তারুণ্যের এক বিরাট বন্যা বয়ে যেত যেন সারা বাগানময়। শিশুদের হাসিখুশিভরা উজ্জ্বল মুখ আর কপালগুলো বাগানের সব ছায়ান্ধকার দূর করে এক নতুন প্রভাতের আলো নিয়ে আসত যেন। অফিসের কাজকর্ম ও প্রার্থনার গান শেষ হয়ে গেলেই শিশু ও মেয়েদের কলকণ্ঠ শোনা যেত। সে কণ্ঠস্বর ছিল মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনির থেকেও মধুর।

পাখির মতো এক-একটা ঝাঁক বেঁধে খেলা করত মেয়েরা। তারা পরস্পরকে ডাকাডাকি করত। ছোটাছুটি করত। তারা যখন হাসত তখন তাদের সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখা যেত। তাদের এই সব হাসি, খেলা কিছুটা দূর থেকে অবগুণ্ঠিত

সন্ন্যাসিনীরা আগ্রহভরে লক্ষ্য করত। মনে হত কতকগুলো ছায়ামূর্তি যেন সূর্যালোকের পানে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? তাতে তাদের সেই হাসির উজ্জ্বলতা ম্লান হত না কিছুমাত্র। যে সুখকে কনভেন্টের সন্ন্যাসিনীরা ঘৃণার চোখে দেখত সেই সুখের আলোর এক আশ্চর্য প্রতিফলনে এখানকার বিষাদময় প্রাচীরগুলো এক মায়াময় আনন্দের আবেগে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠত। যেন মনে হত শোকাচ্ছন্ন এক পরিবেশের উপর কে যেন একরাশ গোলাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সন্ন্যাসিনীদের চোখের সামনেই শিশুরা আনন্দে চঞ্চল হয়ে ছোটাছুটি করত। তাদের নির্দোষ সরলতা সন্ন্যাসিনীর দৃষ্টির আঘাতে বিচলিত হয় না কিছুমাত্র। ছোট ছোট মেয়েরা লাফাত ঝাঁপাত আর বড বড় মেয়েরা নাচত। এইভাবে কনভেন্টের সুকঠোর নিয়মনিষ্ঠা শিশুদের আন্তরিক সরলতার দ্বারা মেদুর হয়ে উঠত অনেকখানি। এইভাবে খেলাধূলার চঞ্চলতা আর ধর্মাচরণের স্তব্ধতা মিশে যেত একসঙ্গে। শিশুদের প্রাণচঞ্চল পাখনার হাওয়ায় এখানকার জমাট স্তব্ধতার অনেকখানি যেন কেটে যেত। হোমার যেন পেরালতের সঙ্গে এই শিশুদের এই প্রাণখোলা হাসিতে যোগদান করতে পারতেন। এমন সুন্দর ও মহৎ দৃশ্য আর হতে পারে না। এই ছায়াচ্ছন্ন বাগানবাড়িতে যে তারুণ্যের উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, [illegible] হিল্লোল আর আনন্দের উত্তেজনা উত্তাল হয়ে উঠত মাঝে মাঝে তা সুদূর মহাকাব্যিক বা রূপকথার যুগের পিতামহীসুলভ সন্ন্যাসিনীদের কুঞ্চিত মুখের যুগান্তসঞ্চিত বিষাদগুলোকে বিদূরিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মাঝে মাঝে শিশুদের এক-একটা কথা শুনে একই সঙ্গে হাসি ফুটে উঠত বড়দের মুখে আর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত তাদের বুক থেকে। একবার পাঁচ বছরের একটি মেয়ে একজন সন্ন্যাসিনীকে বলেছিল, আচ্ছা মাদার, একটা বড় মেয়ে আমাকে বলল, আমি নাকি এখানে আর নয় বছর দশ মাস থাকব। কত মজা! কী সুন্দর কথা!

আর একবার এক মাদার একটি ছয় বছরের মেয়েকে বলেছিল, তুমি কাঁদছ কেন মেয়ে?

মেয়েটি তখন উত্তর করেছিল, আমি অ্যালিক্সকে বলেছিলাম ফরাসী দেশের ইতিহাস আমি জানি। কিন্তু সে বলল আমি জানি না।

নয় বছরের এক অ্যালিক্স তখন বলেছিল, না, ও জানে না।

মাদার বলেছিল, ব্যাপারটা কি? আসলে কি হয়েছিল?

অ্যালিক্স তখন বলেছিল, ও আমাকে ইতিহাস বইটা খুলে আমাকে তার থেকে যে কোনও প্রশ্ন ধরতে বলল। আমি তাই করেছিলাম। কিন্তু ও উত্তর দিতে পারেনি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। ও উত্তর দিতে পারেনি।

কিন্তু কি প্রশ্ন তুমি ওকে ধরেছিলে?

ও বলেছিল বইটার যে কোনও পাতা খুলে আমি প্রথমেই যে প্রশ্ন পাব সামনে তাই ধরব।

কিন্তু প্রশ্নটা কি?

প্রশ্নটা হলো এই যে, তারপর কি ঘটেছিল ?

একবার এক বাইরের লোক যে টাকা দিয়ে কনভেন্টে খেত সে একদিন এক শিশু ছাত্রীর খাওয়া দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। মেয়েটিকে খুব তাড়াতাড়ি গোগ্রাসে খেতে দেখে সে বলল, দেখ দেখ, বাচ্চা মেয়েটা একজন বয়স্কা মহিলার মতো খাচ্ছে।

কনভেন্টে যে সব স্বীকারোক্তির অনুষ্ঠান হত তা দেখে ছাত্রীরাও এখানে-সেখানে তাদের স্বীকারোক্তি লিখত বড়দের মতো। একবার সাত বছরের একটি মেয়ে মেঝের উপর তার স্বীকারোক্তি লিখে রাখে। সে লেখে, ফাদার, আমি স্বীকার করছি আমার অর্থলোভ আছে। আমি স্বীকার করছি আমি ব্যভিচার করেছি। আমি স্বীকার করছি আমি ভদ্রলোকদের পানে তাকিয়েছি।

এই কাহিনীটি একবার ছয় বছরের একটি মেয়ে কোনও এক নদীর ধারে ঘাসে ঢাকা তীরের উপর বলেছিল। কোনও একটা ফুলে ভরা ঝোপে তিনটে মোরগ বাস করত। তারা প্রথমে অনেক ফুল তুলে পকেটে ভরল। তারপর পাতাগুলো খেলনার মধ্যে ভরল। সে দেশের বনের মধ্যে একটা নেকড়ে ছিল। সেই নেকড়েটা সেই মোরগ তিনটেকে খেয়ে ফেলল।

পিতামাতার দ্বারা পরিত্যক্ত একটি শিশুকে কনভেন্ট লালন-পালন করত। সে একদিন এক মর্মবিদারক কথা বলে। সে বলে, আমার যখন জন্ম হয় আমার মা তখন ছিল না।

একজন মোটা চেহারার সিস্টার সব ঘরের চাবি রাখত। তার নাম ছিল আগাথা। মেয়েরা তাকে আগামোকলশ্ বলত—অর্থাৎ চাবির আগাথা।

বাগানের দিকে আয়তক্ষেত্রাকার একটা বড় ঘর ছিল। সে ঘরের প্রতিটি কোণের মেয়েরা এক-একটা নাঁম দিয়েছিল। যেমন মাকড়সার কোণ, আরশুলার কোণ, কাঠপোকার কোণ এবং ঝিঁঝি পোকার কোণ। তবে ঝিঁঝি পোকার কোণটা রান্নাঘরের কাছে থাকার জন্য গরম বলে সেটাকে অনেকে পছন্দ করত। ছাত্রীরা যে যে কোণে বসত সেই নামে অভিহিত হত তারা।

একবার আর্কবিশপ পরিদর্শন করতে এসে এক কোণে সুন্দর চুলওয়ালা একটি সুন্দরী বাচ্চা মেয়েকে দেখে বলেন, মেয়েটি কে ?

তখন মেয়েরা বলে, ও হচ্ছে মাকড়সা।

আর্কবিশপ বলেন, তাই নাকি ? ঐ কোণের ওই মেয়েটি কে ?

ও হচ্ছে ঝিঁঝিঁ পোকা।

আর ও ?

ও হচ্ছে আরশুলা।

বাঃ, আর তোমার নাম ?

আমার নাম কাঠপোকা।

তখনকার দিনে এই সব প্রতিষ্ঠানে অনেক অনাথা শিশুমেয়েকে রেখে প্রতিপালন

করা হত। উৎসবের দিনে এই সব মেয়েরা খুব আনন্দ পেত। কোনও এক উৎসবের দিন কুমারীরা যখন ফুল নিয়ে বড় বেদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন একটি সাত বছরের মেয়ে ষোল বছরের একটি মেয়েকে বলে, তুমি তো কুমারী, কিন্তু আমি কুমারী নই।

৫

কনভেন্টের খাবার ঘরের দরজার সামনে বড় বড় কালো অক্ষরে একটি শিশুর প্রার্থনা লেখা আছে। এই প্রার্থনার নাম হোয়াইট পেটার নস্টার। এই প্রার্থনার কথা কেউ পড়লে সরাসরি স্বর্গে চলে যাবে। লেখা আছে, হে ক্ষুদ্র হোয়াইট পেটার নস্টার, যাকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর যার সঙ্গে কথা বলেন, যাকে ঈশ্বর স্বর্গে স্থান দিয়েছেন, রাত্রিতে বিছানায় শুতে গিয়ে আমার বিছানায় তিনটি দেবদূতকে দেখতে পাই। একজন দেবদূত আমার পায়ের দিকে, একজন আমার মাথার দিকে, আর একজন কুমারী মাতা মেরী। আমার পা আর মাথার মধ্যভাগে এসে দাঁড়ান। তিনি আমাকে কোনও কিছুকে ভয় না করে শান্তভাবে শুয়ে থাকতে বলেন। ঈশ্বর আমার পি[illegible], কুমারী মাতা আমার মা, তিনজন ঈশ্বর প্রেরিত ধর্মপ্রচারক আমার তিন ভাই আর তিনজন কুমারী আমার তিন বোন। ঈশ্বর জন্মগ্রহণকালে যে পোশাক পরেছিলেন সে পোশাকে আবৃত আছে আমার দেহ। সেন্ট মার্গারেটের ক্রস আঁকা আছে আমার বুকে। কুমারী মাতা মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সেন্ট জনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়। তিনি সেন্ট জনকে জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে আপনি আসছেন মঁসিয়ে সেন্ট জন?

সেন্ট জন উত্তর করেন, আমি আসছি আভে সেলাস থেকে।

তুমি কি ঈশ্বরকে দেখেছ? কোথায় তিনি?

তিনি আছেন ক্রসের কাঠের উপর। তাঁর পাদুটো ঝুলছে তাঁর হাত দুটোতে পেরেক পেটানো আছে। তাঁর মাথায় আছে কাঁটার টুপি।

যে এই কথাটা রাত্রিকালে আর সকালবেলায় তিনবার করে উচ্চারণ করে সে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করে।

১৮২৭ সালে দেওয়ালের উপর চুনকাম করার সময় এই প্রার্থনার কথাগুলি মুছে যায়। এ প্রার্থনার কথা কনভেন্টের পুরনো ছাত্রীদের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে একেবারে। সেদিনের সেই শিশু মেয়েরা আজ হয়ত বুড়ি হয়ে গেছে।

খাবার ঘরের সামনের দেওয়ালে একটি বড় ক্রস টাঙিয়ে ঘরের শোভাবর্ধন করা হয়েছে। ঘরের একটা মাত্র দরজা বাগানের দিকে খোলা। দুটো সরু টেবিল ঘরের মধ্যে সমান্তরালভাবে পাশাপাশি রাখা আছে। ঘরের দেওয়ালগুলো সাদা এবং টেবিলগুলো কালো। শোকসূচক বিষাদের পটভূমিকায় এই একটা মাত্র রঙের বৈপরীত্যকে মেনে নেওয়া হয়েছে কনভেন্টে। ছাত্রীদের খাবারও খুব সাদাসিধে ছিল। প্রত্যেককে এক ডিশ করে মাংস অথবা নোনা মাছ আর কিছু সবজী দেওয়া হত।

ছাত্রীরা নীরবে খেত এবং একজন মাদার তাদের দেখাশোনা করত। এই নীরবতা ভঙ্গ করে যদি একটা মাছি গুন গুন করে উড়ে আসত তাহলে সেও আর না উড়ে একটা কাঠের মই-এর উপর বসে পড়ত। কেউ কোনও কথা বলত না। শুধু ঘরখানার জমাটবাঁধা নিস্তব্ধতার মাঝে ক্রসের নিচে দাঁড়িয়ে একটি বড মেয়ে সেন্টদের জীবনী পাঠ করে যেত। প্রতিটি বড় মেয়েকে এক সপ্তা করে কাজ করতে হত। একটা টেবিলের উপর কতকগুলো জলভরা মাটির পাত্র সাজানো থাকত। খাওয়ার পর মেয়েরা তাদের ডিশগুলো ধুত। যদি তাতে কোনও অভুক্ত খাবারের টুকরো পড়ে থাকত তাহলে তার জন্য শাস্তি পেতে হত তাদের।

যদি কোনও মেয়ে কথা বলে কখনো নীরবতা ভঙ্গ করত তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হত। তাহলে তাকে পাথরের মেঝের উপর জিব দিয়ে ক্রস আঁকতে হত। যে ধূলিকণা সব মানুষের আনন্দময় জীবনের পরিণতি, ছোট্ট জিব দিয়ে সেই ধূলিকণা চেটে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে শিখতে হত। এইভাবে নিয়মভঙ্গকারী উদ্ধত জিবকে শাস্তি দেওয়া হত।

কনভেন্টে একটা বিরল বই ছিল। এ বই একখানা মাত্র ছাপা ছিল এবং সে বই পড়া নিষিদ্ধ ছিল। বইটাতে ছিল সেন্ট বেনেডিক্টের নিয়মকানুন। কোনও অধর্মাচারীর অপবিত্র দৃষ্টি যেন সে বইয়ের ভিতর প্রবেশ করতে না পারে। ছাত্রীরা অনেক সময় বইটা কোনওরকমে হাতে নিয়ে গোপনে পড়ত। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে তারা সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত পড়ার সময়। তবে সেই বই পডে বিশেষ কোনও আনন্দ পেত না তারা। ছেলেদের পাপকর্ম সম্বন্ধে লেখা কতকগুলো পাতা শুধু তারা দেখত। সে লেখাগুলো এমনই দুর্বোধ্য ছিল যে তারা ভাল করে বুঝতেই পারত না।

বাগানবাড়ির একটা পথের দু'ধারে কতকগুলো ফলের গাছ ছিল। কড়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কখনো কখনো মেয়েরা একটা কাঁচা আপেল, একটা পচা আতা অথবা পোকা খাওয়া নাসপাতি ফল পেড়ে নিত গাছ থেকে। এ বিষয়ে একখানি চিঠি আমার সামনে আছে। কনভেন্টের এক ভূতপূর্ব ছাত্রী বর্তমানে একজন ডিউকপত্নী এবং প্যারিস শহরের একজন অতি সম্ভ্রান্ত মহিলা। তার চিঠিখানিতে লেখা আছে, বাগানে কোনও ছাত্রী কোনও ফল পাড়লে তাকে সেটা লুকিয়ে রাখতে হত। সেই ফল বিছানায় শুতে গিয়ে সেখানে খেতে হত। এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার।

আর একবার আর্কবিশপ কনভেন্ট পরিদর্শনে আসেন। ম্যাদময়জেল বুশার্দ নামে একটি সাহসী ছাত্রী আর্কবিশপের কাছে একদিনের ছুটির জন্য আবেদন করে। এ প্রতিষ্ঠানে কড়া নিয়ম-কানুনের মধ্যে এই ধরনের আবেদন প্রথাবিরুদ্ধ এবং ভয়ঙ্কর। তবু সে আবেদন মঞ্জুর করেন আর্কবিশপ। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা এটা বিশ্বাস করতেই পারেনি। শুধু একদিন নয়, তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর হয়। মেয়েরা যখন সারবন্দীভাবে দাঁড়িয়েছিল এবং আর্কবিশপ যখন তাদের দেখতে দেখতে তাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন বেশ লম্বা চেহারার সুন্দরী বুশার্দ সাহস করে এগিয়ে গিয়ে আর্কবিশপের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, মঁসিয়ে, আমি একদিনের ছুটি প্রার্থনা করছি।

আর্কবিশপ মঁসিয়ে দ্য কেলেন মৃদু হেসে বললেন, মাত্র একদিনের? এটা মোটেই যথেষ্ট হবে না মেয়ে। আমি তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করছি।

মহামান্য আর্কবিশপ যখন কথা দিয়ে ফেলেছেন তখন কনভেন্টের প্রধানা কর্ত্রীর কোনও ক্ষমতা ছিল না তার উপর। এটা কনভেন্টের নিয়মকানুনের উপর এক বিরাট হস্তক্ষেপ, কিন্তু ছাত্রীদের পক্ষে এক বিরাট জয় এবং আনন্দের ব্যাপার।

যে সব উঁচু প্রাচীর দিয়ে কনভেন্ট ঘেরা ছিল সে সব প্রাচীর কিন্তু একেবারে দুর্ভেদ্য ছিল না। বাইরের জগতের কথা, অনেক নাটক ও অনেক প্রেমের কাহিনী প্রতিধ্বনিত হত সে প্রাচীর ভেদ করে।

এমন একটি ঘটনার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো যে ঘটনাটার সঙ্গে আমাদের মূল কাহিনীর কোনও সম্পর্ক না থাকলেও তার দ্বারা কনভেন্টের একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যাবে।

সেই সময় মাদাম আলবার্তিনে নামে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা একবার কনভেন্টে বেড়াতে আসে। তাকে সবাই শ্রদ্ধা করত। তার সম্বন্ধে খুব একটা বেশি কিছু জানা যায়নি। শুধু জানা গিয়েছিল তার মাথাটার ঠিক ছিল না এবং অনেকের ধারণা সে নাকি মারা গেছে। বিরাট অভিজাত ঘরে তার বিয়ে হলেও বিয়ের যৌতুকের ব্যাপারে যে অশান্তির উদ্ভব হয় তাতে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

মহিলাটির বয়স তিরিশের বেশি হবে না। তার মাথার চুল কালো এবং মুখখানা খুবই সুন্দর ছিল। তার চোখদুটোও বেশ কালো আর আয়ত ছিল। সে প্রায়ই কালো কালো চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দূরে কি দেখত। কিন্তু আসলে সে কি কিছু দেখত? সে এত ধীর শ্লথ গতিতে হাঁটত যে সে চলছে বলে মনেই হত না। সে কখনো কারো সঙ্গে কথা বলত না। মনে হত তার নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে না। তার হাত দুটো ছিল বরফের মতো ঠাণ্ডা। সে যেখানেই যেত তার স্তব্ধ ও হিমশীতল সৌন্দর্যের এক বিষণ্ন প্রভাব ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে। একদিন সেই মহিলার পাশ দিয়ে যাবার সময় একজন সিস্টার আর একজনকে বলল, উনি যেন মৃত।

মাদাম আলবার্তিনেকে ঘিরে অনেকে অনেক গল্প করত। সে ছিল সবার কাছে অনন্ত কৌতূহলের এক অফুরন্ত উৎস। চ্যাপেলের মধ্যে একটা স্টলের মতো খোলা জায়গা ছিল। সেখান থেকে সে প্রার্থনায় যোগদান করত এবং যাজকদের নীতি উপদেশ শুনাত।

একদিন উচ্চপদস্থ একজন যুবক যাজক নীতি উপদেশ দান করতে আসেন। তাঁর নাম ছিল রোহাঁ। ফ্রান্সের এক জমিদার বাড়ির সন্তান। পরে তিনি প্রিন্স দ্য লিঁয় উপাধিতে ভূষিত হয়ে সেনাবাহিনীর এক অফিসার নিযুক্ত হন এবং ১৮৩৩ সালে মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি বেসাকনের কার্ডিনাল ও আর্কবিশপ হন।

রোহাঁ এবার এই প্রথম এই কনভেন্টে নীতি উপদেশ প্রচারের কাজে আসেন। মাদাম আলবার্তিনে সাধারণত প্রার্থনার পর প্রচারিত নীতি উপদেশ ও ধর্মকথা শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে শুনত। সেদিন কিন্তু সে মঁসিয়ে দ্য রোহাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আসন

থেকে কিছুটা উঠে 'সেকি অগাস্তে!' বিস্ময়ের সঙ্গে এই কথা দুটো বলে ওঠে। চ্যাপেলের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত নীরবতার মাঝে তার এই বিস্ময়সূচক কণ্ঠস্বর শুনে ধর্মসভার সকলেই চমকে ওঠে এবং নীতি প্রচারক রোহাঁও মুখ তুলে তাকায় মাদাম আলবার্তিনের দিকে। কিন্তু মাদাম আলবার্তিনে কথাটা বলেই ততক্ষণে আবার তার আসনে স্থির হয়ে বসে পড়েছে। প্রাণচঞ্চলতার একটা দমকা হাওয়া, যৌবন জীবনের এক উদ্দাম আলোকরশ্মি অকস্মাৎ যেন বাইরে থেকে এসে মাদাম আলবার্তিনের মৃত্যুর মতো হিমশীতল মুখখানাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে আলো, সে হাওয়া চলে যেতেই এক সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে সেই মুখখানা।

কিন্তু মাদাম আলবার্তিনের এই সামান্য কথা দুটো প্রচুর জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করল কনভেন্টের মধ্যে। 'সেকি অগাস্তে!' এই কথা দুটোর মধ্যে যেন এক রহস্যময় অজানিত কাহিনী লুকিয়ে আছে। মঁসিয়ে দ্য রোহাঁর শৈশবের নাম অগাস্তে একথা ঠিক। আর এটাও সত্য কথা যে মাদাম আলবার্তিনে নিজে অভিজাত বংশের মেয়ে এবং উচ্চ অভিজাত সমাজে ঘোরাফেরা করত। তা না হলে রোহাঁর মতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে এমন ঘরোয়া নাম ধরে ডাকতে পারত না। নিশ্চয় তাহলে রোহাঁর সঙ্গে তার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। সেটা রক্তগত সম্পর্কও হতে পারে। তা না হলে তার ছেলেবেলার ঘরোয়া নামটা জানা সম্ভব হত না তার পক্ষে।

মেসদেম দ্য ক্লয়সিউল আর দ্য সেরেন্ত নামে দু'জন ডিউকপত্নী তাদের সামাজিক মর্যাদার জোরে কনভেন্টে প্রায়ই বেড়াতে আসত। কিন্তু তারা আসার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত কনভেন্টের সকলে। এই দু'জন মহিলা যখন ছাত্রীদের পাশ দিয়ে চলে যেত তখন তারা তাদের চোখ নামিয়ে ভয়ে কাঁপত।

কনভেন্টের ছাত্রীদের প্রতি মঁসিয়ে দ্য রোহাঁর আগ্রহটাও ক্রমশ বেড়ে ওঠে। অথচ তাঁর এই ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথাটাকে তিনি নিজেই তাঁর সচেতন মনের মধ্যে ধরতে পারতেন না। সম্প্রতি তিনি প্যারিসের আর্কবিশপের সহকারী হিসাবে গ্র্যান্ড ভিকার পদ লাভ করেন এবং পদোন্নতির পরবর্তী ধাপ বিশপের পদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। সম্প্রতি পেতিত পিকপাসের চ্যাপেলে আসাটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে রোহাঁর। পর্দানশীন যুবতী সন্ন্যাসিনীরা চোখে দেখতে পেত না তাঁকে। কিন্তু তাঁর নরম অথচ কিছুটা মোটা কণ্ঠস্বর তারা সবাই চিনত। আগে তিনি একজন সামরিক অফিসার ছিলেন। পোশাক-আশাকের ব্যাপারে তাঁর একটা খুঁতখুঁতে ভাব ছিল। তাঁর মাথার বাদামী চুলগুলো সুন্দরভাবে আঁচড়ানো থাকত সব সময়। তাঁর আলখাল্লাটা খুব সুন্দর ছিল এবং সিল্কের একটা কাপড়ে কোমরটা বাঁধা থাকত। ষোড়শী তরুণীদের কাছে তাঁর চেহারাটা সত্যিই খুব প্রিয় ছিল।

বাইরের জগৎ থেকে কোনও শব্দের ঢেউ এসে কখনো ঢুকত না কনভেন্টের প্রাচীরঘেরা সীমানার মধ্যে। কিন্তু গত এক বছর হলো একটা বাঁশির সুরলহরী কনভেন্টের মধ্যে ভেসে আসে। সে সুর প্রায়ই শোনা যায় কনভেন্টের মধ্যে। সেদিন যারা এ কনভেন্টের ছাত্রী ছিল তারা সবাই আজও মনে রেখেছে সে কথা। যে গানটা বাঁশির

সুরে ফুটে উঠত সে গানের প্রথম লাইনটা হলো, জেতালবে, এস, তুমি এসে রাজত্ব করো আমার অন্তরে। এই গানের সুর সে বাঁশিতে দিনে বেশ কয়েকবার ধ্বনিত হত। সে সুর শুনে স্কুলের মেয়েরা মোহিত হয়ে যেত, সন্ন্যাসিনী মাদাররা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত, ছাত্রীদের মনোযোগ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ত। ফলে শাস্তির বিধান করতে হত বারবার। এই ব্যাপারটা চলে কয়েকমাস ধরে এবং মেয়েরা সেই অদৃশ্য অজ্ঞাত বংশীবাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। প্রতিটি মেয়েই নিজেকে জেতালবে ভাবে।

বাঁশির সুরটা আসত রু্য দ্রয়েত মুরের দিক থেকে। এ সুর শুনতে শুনতে কনভেন্টের মেয়েরা এমনই মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল যে, যে অচেনা অদেখা যুবক এ বাঁশি বাজায় তাকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখার জন্য তারা তাদের জীবনের সব কিছু দিয়ে দিতে পারত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবসর সময়ে তিনতলার একটা ঘরে ঢুকে জানালা দিয়ে রু্য দ্রয়েত মুরের দিকে তাকিয়ে সেই বাঁশির বাদককে দেখার এক ব্যর্থ চেষ্টায় ফেটে পড়ত। কেউ কেউ জানালার ভিতর দিয়ে হাত বার করে একটা রুমাল ওড়াত। দু'জন মেয়ের সাহস সবচেয়ে বেশি ছিল। তারা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সব ভয় ঝেড়ে ফেলে একদিন ছাদের উপর উঠে সেই বাঁশি যে বাজায় তাকে দেখে। কিন্তু তারা যা ভেবেছিল তা নয়, সে বয়সে যুবক নয়, সে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। সে এখন অন্ধ এবং নিরাশ্রয়। হাতে কোনও কাজ না থাকায় সময় কাটাবার জন্য বাঁশি বাজায়।

৬

পেতিত পিকপাসের মাটিতে তিনটে পৃথক বাড়ি ছিল। একটাতে ছিল মূল কনভেন্ট, একটা বাড়িতে থাকত সন্ন্যাসিনীরা আর একটা বাড়ি ছিল বোর্ডিং-হাউস বা ছাত্রীদের আবাস। সেটাকে লিটল কনভেন্ট বলা হত। এই বোর্ডিং-এর সামনে একটা বাগান ছিল। এ বাড়িতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক প্রবীণা সন্ন্যাসিনীও থাকত। বিপ্লবের সময় যে সব কনভেন্ট ধ্বংস হয়ে যায় তারা আগে থাকত সেই সব কনভেন্টে। তারা কালো, ধূসর, সাদা প্রভৃতি নানারকমের পোশাক পরত।

সম্রাট এই সব বিধ্বস্ত কনভেন্টগুলির সিস্টার ও সন্ন্যাসিনীদের বেনেডিক্টিনে বার্নাদিনে সম্প্রদায়ের দ্বারা যৌথভাবে চালিত কনভেন্টে আশ্রয় নেবার অনুমতি দান করেন। সরকার তাদের জন্য কিছু করে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং পেতিত পিকপাসের কর্তৃপক্ষ তাদের সাদরে গ্রহণ করে। তারা আপন আপন মতে চলত। তারা মাঝে মাঝে স্কুলের মেয়েদের তাদের কাছে যেতে দিত। তাদের মধ্যে যাদের কথা ছাত্রীদের মনে রেখাপাত করে তারা হলো মেরে সেন্ত বেসিল, মেরে সেন্ত স্কলেশটিক আর মেরে জ্যাকব।

তাদের মধ্যে সেন্ত অয়ে সম্প্রদায়ের একজন প্রবীণা সিস্টার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পেতিত পিকপাসের একটা ঘরে এসে বাস করতে থাকে। এই সম্প্রদায়ের এই একজন মাত্র সিস্টারই বেঁচে থাকে। সে খুব গরীব ছিল এবং তার সম্প্রদায়ের

জন্য নির্দিষ্ট জমকালো পোশাক পরার তার আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। সে তাই একটা পুতুলকে সে পোশাক পরিয়ে রাখত। তার মৃত্যুকালে সে পুতুলটা কনভেন্টকে দিয়ে যায়। ১৮২৪ সাল পর্যন্ত সেই সিস্টার তার সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিভূ হিসাবে বেঁচে ছিল। আজ শুধু তার পুতুলটা পড়ে আছে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এই সব ভক্ত মাদার উপাধিধারিণী সিস্টারদের সঙ্গে মাদাম আলবার্তিনের মতো কিছু বয়স্ক মহিলা লিটল কনভেন্টের বোর্ডিং-এ থাকার অনুমতি লাভ করে। এ ছাড়া আর যে তিনজন এই অনুমতি পায় তারা হলো মাদাম দ্য বোফোর্ত, মাদাম দ্য হতপোল আর মাদাম লা মার্কুই দুফ্রেসনে। আর একজন মহিলা থাকত যে মাঝে মাঝে নাকি সুরে দারুণ গোলমাল আর হট্টগোল করত। স্কুলের মেয়েরা তার নাম দিয়েছিল ডাকারমিনি বা বজ্রপাত।

১৮২০ সালের কাছাকাছি মাদাম দ্য জেনলিস নামে একজন বাইরের মহিলা কনভেন্টে একদিন আবাসিক অতিথি হিসাবে থাকার অনুমতি চায়। সে 'লা ইসত্রেপিদে' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করত এবং রাজার ভাই দিউক দ্য অর্লিয়ান্স তাকে এখানে থাকতে দেবার জন্য সুপারিশ করেন। তাতে বিরক্তির এক গুঞ্জন জাগে কনভেন্টের মধ্যে এবং অজানা আশঙ্কার এক ছায়া নেমে আসে। এই মাদাম জেনলিস নাকি কয়েকটা উপন্যাস লেখে আগে। কিন্তু পরে উপন্যাস লেখা ছেড়ে পুরোপুরি ধর্মীয় জীবন যাপন করতে থাকে। কিন্তু কয়েকমাস বাস করার পরই কনভেন্ট ছেড়ে চলে যায় মাদাম জেনলিস। সে নাকি যাবার সময় বলে যায় এখানকার বাগানে যথেষ্ট ছায়া নেই। সে চলে গেলে সন্ন্যাসিনীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অবশ্য মাদাম জেনলিস মানুষ হিসাবে খারাপ ছিল না এবং বয়সে বৃদ্ধ হলেও সে বীণা বাজাতে পারত।

কনভেন্ট চ্যাপেল বা ছোট গীর্জাটা ছিল প্রধান কনভেন্ট এবং স্কুলবোর্ডিং-এর মাঝখানে। বড় রাস্তার দিকে এই চ্যাপেলের একটা দরজা ছিল এবং সেদিক দিয়ে বাইরের কিছু লোক আসত। কিন্তু কনভেন্টের সন্ন্যাসিনী বা সিস্টারেরা তাদের মুখ দেখতে পেত না। সাত ফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছায়া-ছায়া বিষাদের অন্ধকারে ভরা কনভেন্ট চ্যাপেলে সমবেত প্রার্থনার সময় কনভেন্টের সিস্টাররা বাঁ দিকে সার দিয়ে দাঁড়াত, ডান দিকে দাঁড়াত স্কুলের মেয়েরা আর আবাসিক অতিথিরা—পিছনের দিকে থাকত শিক্ষানবীশ সন্ন্যাসিনীরা। চ্যাপেলের জানালাগুলো ছিল বাগানের দিকে এবং সেই দিক থেকেই যা কিছু আলো আসত।

৭

১৮১৯ থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত পেতিত পিকপাসের প্রধানা কর্ত্রী ছিলেন ম্যাদময়জেল দ্য ব্লেমুর যাঁর সন্ন্যাসজীবনের নাম ছিল মেরে ইনোসেন্তে। যে মার্গারিতে দ্য ব্লেমুর গত শতাব্দীতে বেনেডিক্ট সম্প্রদায়ের সেন্টদের জীবন কাহিনী লেখেন সেই ব্লেমুরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ম্যাদময়জেল ব্লেমুরের বয়স ছিল প্রায় ষাট।

তাঁর চেহারাটা ছিল বেঁটে-খাটো আর মোটাসোটা। তাঁর গলার স্বর মোটেই ভাল ছিল না। যখন গান করতেন তখন তাঁর গলাটা ফাটা পাত্রের মতো কর্কশ শোনাত। তবু মানুষ হিসাবে তিনি খুব ভাল ছিলেন। তাঁদের দলের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে হাসিখুশিসম্পন্না মহিলা এবং তাঁকে সবাই সবচেয়ে বেশি ভালবাসত। তাঁর পূর্বপুরুষদের অনেক গুণই আয়ত্ত করেন তিনি। অনেক পড়াশুনো করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তিনি। ইতিহাসে গভীর জ্ঞান ছিল তাঁর। এ ছাড়া লাতিন, গ্রীক এবং হিব্রু ভাষাতেও পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর।

ম্যাদময়জেল ব্লেমুরের সহকারিণী ছিল স্পেনদেশীয় এক সন্ন্যাসিনী যাঁর নাম ছিল মেরে সিনে রেস। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল এবং চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। অন্যান্য সম্প্রদায় থেকেও কয়েকজন সিস্টার এসে যোগদান করে পেতিত পিকপাসের কনভেন্টে। কিন্তু তাদের কাছে এখানকার নিয়মকানুনের কঠোরতা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তাদের দু'-একজন পাগল হয়ে যায়। তাদের মধ্যে শেভালিয়ের রোজের বংশধর তেইশ বছরের এক সুন্দরী যুবতী ছিল যার সন্ন্যাসজীবনের নাম ছিল মেরে অ্যাজামশান।

উপাসনা পরিচালনার ভার ছিল মেরে সেন্ত মেশতিনদের উপর। উপাসনার সময় সেই সিস্টার ছাড়া সাত থেকে দশজনের মতো ষোল বছরের ছাত্রীকে নিত। মাথার উচ্চতা অনুসারে তাদের সার দিয়ে সাজানো হত। তাদের দাঁড়িয়ে গান করতে হত। দেখেশুনে মনে হত যেন দেবদূতরা বাঁশি বাজাচ্ছে। সিস্টার সুর সেন্ত মার্থে ও সুর সেন্ত মাইকেলকে মেয়েরা সবচেয়ে ভালবাসত। সেন্ত মাইকেলের লম্বা নাকটা দেখে ছাত্রীরা হাসত।

সিস্টাররা কঠোর সন্ন্যাসজীবন যাপন করলেও তাদের শাসনপাশ ছাত্রীদের প্রতি একটু শিথিল ছিল। সিস্টাররা তাদের ঘরে আগুন জ্বালাতে পারত না। কিন্তু ছাত্রীদের বোর্ডিং-এ আগুন জ্বালানো হত। তারা সবাই ছাত্রীদের স্নেহের চোখে দেখত। তবে কোনও মেয়ে যখন কোনও সিস্টারের পাশ দিয়ে যাবার সময় কোনও কথা বলত তখন সিস্টার উত্তর দিত না।

নীরবতার এই ব্যাপক অনুশাসনের মাঝে মানুষের কাছ থেকে সব বাকশক্তি কেড়ে নিয়ে যেন কয়েকটি নির্জীব বস্তুকে সে বাকশক্তি দান করা হয়। কখনো গীর্জার ঘণ্টা, কখনো বাগানের মালীর ঘণ্টার ধ্বনিগুলি যেন বারবার কথা বলে যেত। প্রহর ঘোষণা ছাড়াও দারোয়ানের ঘণ্টার ধ্বনিগুলি সকলকে তাদের আপন আপন কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। আবার যদি কাউকে অফিসঘরে বা বসার ঘরে ডাকা হত কোনও কারণে তাহলেও ঘণ্টা বাজানো হত। যেমন প্রধানা কর্ত্রী ও শিক্ষয়িত্রী কাউকে ডাকলে পর পর দু'বার ঘণ্টাধ্বনি করা হত আর তাঁর সহকারিণী ডাকলে একবার আর পরে দু'বার ঘণ্টাধ্বনি করা হত। ছ'টা পাঁচের ঘণ্টাধ্বনি ক্লাসে যোগদান করার জন্য ছাত্রীদের ডাকত। আবার চারটে চার মিনিটের ঘণ্টাধ্বনি ছিল প্রার্থনার জন্য মাদাম জেনলিসের ডাক। এ ঘণ্টাধ্বনি প্রায়ই শোনা যেত। অনেক ছাত্রী বিরক্ত হয়ে মাদাম জেনলিসকে বলত চারশিংওয়ালী এক শয়তান।

উনিশটি ঘণ্টাধ্বনি এক বড়রকমের ঘটনাকে সূচিত করত। তখন খুব ভারী ধাতু দিয়ে তৈরি সদর দরজাটা খুলে যেত। কিন্তু একমাত্র আর্কবিশপের আগমন ছাড়া সে দরজা খুলত না।

আর্কবিশপ আর বাগানের মালী ছাড়া আর কোনও পুরুষ ঢুকতে পেত না কনভেন্টে। তবে স্কুলের ছাত্রীরা আর দু'জন পুরুষকে দেখতে পেত। তারা হলো আব্বে বানে যার উপর ভার ছিল ভিখারিদের ভিক্ষা দান করার আর একজন হলো অঙ্কন শিক্ষক মঁসিয়ে আলসিয় যাকে অনেকে এক বুড়ো কুঁজো বলে বর্ণনা করত।

৮

কনভেন্টেব নৈতিক দিকটার একটা চিত্র তুলে ধরার পর তার বাস্তব বহিরঙ্গ সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। অবশ্য পাঠকবর্গ আগেই এ বিষয়ে কিছু কিছু জেনেছেন।

পেতিত পিকপাসে ও সেন্ট আঁতোনের কনভেন্টটা ছিল আয়তক্ষেত্রাকার এবং চতুর্ভুজবিশিষ্ট। তার চারদিকে ছিল চারটি রাস্তা। এই রাস্তা চারটি হলো র‍্য পলোনসো, র‍্য দ্রয়েত মুর, পেতিত র‍্য পিকপাস এবং অধুনালুপ্ত এক কানাগলি। আগের যুগের মানচিত্রে এই গলিটাকে র‍্য অমারাই নামে উল্লিখিত আছে। চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল গোটা কনভেন্টের সীমানাটা। তার মধ্যে অনেকগুলো বাড়ি আর একটা বাগান ছিল।

কনভেন্টের প্রধান বাড়ির আশেপাশে অনেকগুলো ছোটখাটো বাডি ছিল। এ বাড়ির মধ্যে থাকত সিস্টাররা, মাদাররা আর শিক্ষানবীশরা। স্কুলের ছাত্রীরা থাকত তাদের বোর্ডিং হাউসে। এই বোর্ডিং বাড়িটা পেতিত র‍্য পিকপাস আর র‍্য অমারাই-এর মাঝখানে বাইরে থেকে দেখা যেত। বাগানের মধ্যে একটা ছিল প্রধান পথ আর আটটা ছোট পথ তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পথগুলোর দৈর্ঘ্যের মধ্যে কোনও সমতা ছিল না। পথগুলোর দু'পাশে ছিল অনেক ফলের গাছ। প্রধান পথটার ধারে ফাঁকা জায়গায় ছিল একটা লম্বা পাইন গাছ। পপলার গাছে ঘেরা আজ যেখানে লিটল কনভেন্ট নামে মেয়েদের স্কুলটা আছে সেইখানেই ছিল আগেকার পুরনো কনভেন্টের ধ্বংসাবশেষ। আজ হতে পঁয়তাল্লিশ বছর আগেও এখানে এই পেতিত পিকপাসে বার্নাদিনে সম্প্রদায়ের এক কনভেন্ট ছিল।

কনভেন্টের চারদিকের যে রাস্তাগুলোর নাম বলা হলো, এ রাস্তাগুলো প্যারিসের সবচেয়ে পুরনো রাস্তা। র‍্য দ্রয়েত মুর ছিল আবার সবচেয়ে পুরনো আর দু'পাশে ছিল ফুলের গাছ। মনে হয় মানুষ পাথর দিয়ে পথগুলোকে গাঁথার অনেক আগেই ঈশ্বর ফুল তৈরি করেন।

৯

প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ এই কনভেন্টের রুদ্ধ দরজা পাঠকদের সামনে খুলে দিয়ে আমবা তার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম। এবার আমরা আরও এমন

একটা ঘটনার কথা বলার জন্য অনুমতি চাইছি পাঠকদের কাছে, যে কথার সঙ্গে আমাদের মূল কাহিনীর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে এই ঘটনা থেকে জানা যাবে আগে কনভেন্টে কি ধরনের চরিত্রের মহিলারা থাকত।

লিটল কনভেন্টে যেসব আবাসিক অতিথি থাকত তাদের মধ্যে প্রায় একশো বছরের এক বৃদ্ধা মহিলা থাকত। তার বাড়ি ছিল আব্বায়ে দ্য ফঁতেভ্রলতে। বিপ্লবের আগে এই মহিলা খুব সৌখীন রুচিসম্পন্না ছিল। কথায় কথায় সে প্রায়ই মঁসিয়ে দ্য মিরোমেলনিল আর কোনও এক মাদাম দুপ্লাতের কথা বলত। মঁসিয়ে মিরোমেলনিল ছিল ষোড়শ লুই-এর সীলমোহরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আর মাদাম দুপ্লাত ছিল এক বিচারপতির স্ত্রী। কথা প্রসঙ্গে সুযোগ পেলেই এই নামগুলোর সে উল্লেখ করত আর প্রায়ই বলত ফঁতেভ্রলত্ শহরের কথা, প্রাচীরঘেরা যে শহরটার মধ্যে ছিল অনেক ভাল ভাল রাস্তা।

এই বৃদ্ধা যখন ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে কথা বলত, বা গল্প বলত মেয়েরা তা মন দিয়ে শুনত। তার কথা বলার ধরন দেখে মুগ্ধ হত তারা। সে যাজকের কাছে শপথবাক্য পাঠ করার সময় বলত, এই শপথবাক্য প্রথম সেন্ট ফ্রান্সিস সেন্ট জুলিয়েনকে দিয়ে যান, তারপর সেন্ট জুলিয়েন আবার সেন্ট ইউসেবিয়াসকে দিয়ে যান, সেন্ট ইউসেবিয়াস আবার দিয়ে যান সেন্ট প্রবোপিয়াসকে—এইভাবে হে ধর্মপিতা, আমিও আপনাকে এ শপথ দিয়ে যাচ্ছি।

তার কথা শুনে মেয়েরা যখন খিলখিল করে হাসত তখন মাদাররা রেগে গিয়ে ভ্রূ কুঞ্চন করে তাকাত তাদের পানে।

বৃদ্ধা আরও অনেক গল্প শোনাত। সে বলত সে যখন বয়সে যুবতী ছিল তখন গীর্জার যাজকরা সৈন্যদের মতোই ছিল ব্যভিচারী। এমনি করে একটা শতাব্দী যেন তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠত। যে শতাব্দী হলো অষ্টাদশ শতাব্দী। সে চার ধরনের মদের কথা বলত। বিপ্লবের আগে যখন ফ্রান্সের মতো উঁচুদরের এক লর্ড শহরে একজন সম্মানিত অতিথি হিসাবে আসতেন তখন শহরের কাউন্সিল চারটে পানপাত্রে চার রকমের মদ দিত। চার রকমের মদে চার রকমের ফল পাওয়া যেত—আনন্দ, ঝগড়া-বিবাদ, হতবুদ্ধিভাব আর ঝিমুনিভাব।

বৃদ্ধা একটা ঘরের মধ্যে থাকার অনুমতি পেয়েছিল। একটা আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে কি একটা জিনিস সে ভরে রাখত। সে জিনিসের কথা কেউ জানত না। যখনই কোনও লোক তার ঘরের কাছে আসত সে তাড়াতাড়ি আলমারিটা তালাচাবি বন্ধ করে দিত। কেউ যদি তাকে সেই জিনিসের কথা বলত তাহলে সে চুপ করে থাকত। এমনিতে সে বেশি কথা বললেও এ বিষয়ে কোনও কথা বলত না। তার ফলে একটা বিরাট কৌতূহল সকলের মনে দানা বেঁধে উঠত।

এ নিয়ে কনভেন্টের অনেকে বলাবলি করত নিজেদের মধ্যে। ঐ একশো বছরের বৃদ্ধা কি এমন ধন লুকিয়ে রেখেছে আলমারির মধ্যে? কোনও ধর্মগ্রন্থ নিশ্চয়। অথবা কোনও প্রাচীন বস্তু। বৃদ্ধা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলমারি খুলে সেই রহস্যময়

বস্তুটা বার করা হয় তাড়াতাড়ি। দেখা গেল একটা লিনেনের কাপড় দিয়ে একটা ছবি বেঁধে রাখা হয়েছে। ছবিটা পুরনো কোনও দোকান থেকে কেনা। সে ছবিতে ছিল এক প্রেমিক আর এক প্রেমিকার ছবি। প্রেমিকের মুখে ছিল শয়তানের হাসি আর প্রেমিকার মুখ যন্ত্রণায় কাতর এবং বিকৃত। এই ছবি থেকে একটা নীতিশিক্ষাই পাওয়া যায়। যন্ত্রণার কাছে প্রেম পরাভূত।

বৃদ্ধা বাইরের কোনও অতিথির সঙ্গে দেখা করত না। কারণ সে বলত বসার ঘরটা খুব অন্ধকার।

১০

কনভেন্টের যে বৈঠকখানা ঘরের কথা আগেই বলা হয় সে ঘরটা ছিল সমাধিগহ্বরের মতোই অন্ধকার। সে ঘরের জানালা ও দরজায় ছিল কালো পর্দা। অন্যান্য কনভেন্টের বসার ঘরটা চমৎকারভাবে সাজানো থাকত। সে ঘরের জানালায় থাকত সিল্কের বাদামী রঙের পর্দা, আর দেওয়ালগুলোতে নানারকমের ছবি আঁকা। অন্যান্য কনভেন্টের নিয়ম-কানুন পেতিত পিকপাসের মতো এত কঠোর ছিল না। র‍্যু দু তেম্পল ছিল এই ধরনের এক কনভেন্ট। যে কনভেন্ট চালিত হত বেনেডিক্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা।

র‍্যু দু তেম্পল কনভেন্টের বাগানে এমন একটা বিরাট বাদাম গাছ ছিল যা সারা ফ্রান্সের মধ্যে ছিল সবচেয়ে পুরনো আর সবচেয়ে সুন্দর। অষ্টাদশ শতকের লোকরা বলত, এই বাদাম গাছটা ও রাজ্যের সব বাদাম গাছের পিতা।

আমরা আগেই বলেছি র‍্যু দু তেম্পল কনভেন্টটি চিরস্থায়ী ভক্তিপ্রচার সংস্থার বেনেডিক্টেনে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত হত। এরা ছিল সিটো সম্প্রদায়ের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ভক্তিপ্রচার সংস্থাটি আজ হতে দুশো বছর আগে স্থাপিত হয়। প্রচার সংস্থা স্থাপনের পিছনে এক ইতিহাস আছে। ১৬৪৯ সালে সেন্ট সালপিস আর সেন্ট জাঁ এনগ্রেভে নামে দুটি চার্চে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে পর পর দু'বার অধর্মাচরণের ঘটনা ঘটে। সেখানে নাকি মার্কুই দ্য বুস আর কাউন্টেস দ্য শ্যাতোভো নামে দু'জন মহিলার শালীনতা হানি করা হয়। এই অমার্জনীয় অধর্মাচরণ ও ধর্মস্থানের পবিত্রতাহানিরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেন্ট জার্মেন দে প্রেসের প্রধান ভিকার সমস্ত যাজকদের নিয়ে এক গুরুগম্ভীর ধর্মীয় শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করেন। এই ধরনের অধর্মাচরণের অপরাধ এর পরে আর অনুষ্ঠিত না হলেও এই পাপের কথাটা দেশের ধর্মজগতের কর্তৃপক্ষের মনে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ঐ দু'জন ক্ষুব্ধ মহিলা কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবলম্বিত ব্যবস্থায় তৃপ্ত হতে পারেননি। তাঁরা ভাবছিলেন আরও চরম প্রায়শ্চিত্তের কথা। তারা সকলে তখন ঠিক করল এই অধর্মাচরণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এক চিরস্থায়ী ভক্তি সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। ঠিক হলো সেটা হবে এমনই এক প্রতিষ্ঠান যেখানে হলি সেক্রামেন্টের সন্ন্যাসিনীরা নিরন্তর উপাসনা আর প্রার্থনার দ্বারা চিরকাল ধরে এর প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে। তখন ঐ দু'জন মহিলা মোটা টাকা দিয়ে র‍্যু কসেত্তে নামে এক জায়গায় মেয়েদের জন্য

এক কনভেন্ট স্থাপন করে। বেনেডিক্টে সম্প্রদায়ের অধীনস্থ সিস্টার ও মাদারদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে এই কনভেন্ট এবং এর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সেন্ট জার্মেনের অধ্যক্ষ মঁসিয়ে দ্য মেৎস অনুমতি দান করেন।

এই হলো বেনেডিক্টে সম্প্রদায়ের চিরস্থায়ী ভক্তিপ্রচার সংস্থার উদ্ভবের ইতিহাস। সিস্টার অফ চ্যারিটি সম্প্রদায় যেমন প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্ট লাজারাসের অধ্যক্ষের দ্বারা, অর্ডার অফ সেক্রেড হার্ট-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয় যেমন জেসুটদের দ্বারা, তেমনি বেনেডিক্টে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে সেন্ট জার্মেনের অধ্যক্ষের দ্বারা।

পেতি পিকপাসের বার্নাদিনে সম্প্রদায় থেকে বেনেডিক্টে সম্প্রদায় ছিল একেবারে পৃথক। ১৬৫৭ সালে পোপ আলেকজান্ডার সপ্তম এক বিশেষ হুকুমনামা জারি করে পেতিত পিকপাসের বার্নাদিনে সম্প্রদায়কে চিরস্থায়ী ভক্তিসংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী উপাসনা করে যাবার অনুমতি দান করেন। তবু তাদের সঙ্গে হলি সেক্রামেন্টের বেনেডিক্টেনে সম্প্রদায় অন্য সব দিক থেকে একটা পার্থক্য রয়ে যায়।

১১

পেতিত পিকপাসের কনভেন্টের অবক্ষয় বা পতন শুরু হয় রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির যে পতন শুরু হয় পেতিত পিকপাস কনভেন্টের পতন সেই পতনেরই এক অঙ্গ বিশেষ। আসলে বিপ্লব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথাগত ভিত্তিগুলির উপর চরম আঘাত হানে। ফরাসী বিপ্লব ধর্মের উচ্ছেদ সাধন না করলেও সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে বলে।

পেতিত পিকপাস ধর্মসম্প্রদায়ের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ১৮৪০ সালের মধ্যে তার অন্তর্গত লিটল কনভেন্ট ও স্কুলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। বয়োপ্রবীণ সিস্টারদের মৃত্যু ঘটে একে একে এবং ছাত্রীরা সব একে একে চলে যায়।

চিরস্থায়ী ভক্তিপ্রচার সংস্থার নিয়ম-কানুন এমনই কঠোর যে যারা এখানে একবার প্রবেশ করে তারা কিছুকালের মধ্যে বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং নতুন আর কেউ আসতে চায় না। ১৮৪৫ সালে কিছু সিস্টার ছিল স্কুলে পড়াবার জন্য, কিন্তু ধর্মে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কোনও সন্ন্যাসিনী ছিল না। চল্লিশ বছর আগে এই সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা ছিল একশো এবং পঞ্চাশ বছর আগে ছিল আটাশ। ১৮৪৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানা নির্বাচিত করা হয় চল্লিশের নিচের এক নারীকে। অথচ আগে সাধারণত এ পদে আরও বয়স্কা নারী ছাড়া বসতে পারত না। এর থেকে বোঝা যায় যোগ্য প্রার্থিনী না থাকায় বাধ্য হয়ে এই নির্বাচন করতে হয়েছিল কর্তৃপক্ষকে। সিস্টারদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় তাদের কাজের চাপ বেড়ে গিয়েছিল। প্রত্যেককে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। সিস্টারদের সংখ্যা কমে গেলেও নিয়ম-কানুনের কঠোরতা কমেনি কিছুমাত্র। মনে হয় সে সংখ্যা কমে গিয়ে ডজনে নেমে এলেও তাদের নিয়ম-কানুনের কঠোরতা ঠিকই মেনে চলতে হবে। এত কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে অবশিষ্ট সিস্টারদের মৃত্যু ঘটে। এই

গ্রন্থের লেখক যখন প্যারিসে অবস্থান করছিলেন তখন পঁচিশ ও তেইশ বছরের দু'জন সিস্টারের মৃত্যু ঘটে। এইভাবে সিস্টারদের একে একে মৃত্যু ঘটায় স্কুল তুলে দিতে হয়।

আমরা একমাত্র জাঁ ভলজাঁকে অনুসরণ করতে গিয়েই এই লুপ্তপ্রায় কনভেন্টের বাগানবাড়িতে প্রবেশ করি। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সুকঠোর নিয়ম-কানুন ও অদ্ভুত প্রথাগুলিকে বর্ণনা করেছি। কিন্তু তার অর্থ ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। তবে বুঝতে না পারলেও কোনও কিছুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিইনি। আমরা জোশেফ মেস্তারের হোসানা সম্প্রদায়ের কথাবার্তাও বুঝতে পারিনি, তারা যীশুর ঘাতককে সমর্থন করে, যেমন ভলতেয়ারের মতো জ্ঞানী লোক ক্রসকে উপহাস করেন। অতিমানবিক শক্তিসম্পন্ন যীশুকে যাঁরা অস্বীকার করেন তাঁদের কাছে এদের কি দাম আছে?

আজকের এই উনিশ শতকে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের এক জোর সংকট চলছে। অনেক জ্ঞানের বস্তু মানুষ এ যুগে মন থেকে সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু অন্য জ্ঞানের বস্তুকে গ্রহণ করতে পারেনি তারা। কিন্তু মানুষের অন্তরে এই ধরনের শূন্যতা থাকা উচিত নয়।

যেসব জিনিস চলে গেছে আমাদের সামনে থেকে সেগুলিকে খুঁটিয়ে বিচার করে ফেলতে হবে আমাদের। অনেক সময় অতীতের অনেক পুরনো জিনিস নাম পাল্টে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। সেসব জিনিসকে ভবিষ্যৎ বলে ভুল করা উচিত নয়। অতীতের প্রেতাত্মারা অনেক সময় ভবিষ্যতের মুখোশ পরে এসে বিভ্রান্ত করে আমাদের। সেই মৃত অতীতের মুখখানা হলো কুসংস্কারের মূর্ত প্রতীক আর ভণ্ডামিই হলো তার মুখোশ। সে মুখ আর মুখোশটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত আমাদের।

সাধারণভাবে সব কনভেন্ট সভ্যতা ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে। সভ্যতা তাদের ধিক্কার দেয় আর স্বাধীনতা তাদের রক্ষা করে চলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

পেতিত পিকপাসের এই কনভেন্টেই ঘটনাক্রমে এসে পড়ে জাঁ ভলজাঁ। ফশেলেভেন্ত তাকে বলে, সে যেন আকাশ থেকে পড়েছে সহসা।

কসেত্তেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ভলজাঁ ফশেলেভেন্তের সঙ্গে জ্বলন্ত আগুনের ধারে বসে তার খাওয়া সেরে নেয়। ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় কোনও বিছানা না থাকায় মেঝের উপর খড় বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়ে ভলজাঁ। ঘুমিয়ে পড়ার আগে সে বলে আমাকে এখানেই থাকতে হবে। কথাগুলো ফশেলেভেন্তের মনটাকে দারুণ ভাবিয়ে তোলে সে-রাতে।

সে-রাতে তাদের দু'জনের কেউই ঘুমোতে পারেনি। ভলজাঁ বুঝতে পারে জেভার্ত

তাকে খুঁজছে তখনো, ফলে শহরের কোথাও কোনওখানে সে কসেত্তেকে নিয়ে নিরাপদে লুকিয়ে থাকতে পারবে না। সে বুঝতে পারে এই বাগানবাড়িটা একই সঙ্গে খুবই বিপজ্জনক এবং খুবই নিরাপদ। বিপজ্জনক এইজন্য যে এখানে কেউ আসে না, এবং এখানে কেউ যদি এসে দেখে ফেলে তাকে তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে এবং তাকে জেলে যেতেই হবে। আর নিরাপদ এইজন্য যে এখানে কে তাকে খুঁজতে আসবে?

দারুণ চিন্তায় ফশেলেভেন্তের মাথাটা পীড়িত হচ্ছিল। তার তখন শুধু এই কথাই মনে হচ্ছিল যে সমস্ত ব্যাপারটাই তার বুদ্ধির অতীত। সে কোনওমতেই বুঝে উঠতে পারছিল না মঁসিয়ে ম্যাদলেন কি করে এত বড বিরাট উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে একটা বাচ্চা মেয়েকে সঙ্গে করে এখানে এল? এই মেয়েটাই বা কে? কোথা থেকে এল তারা? এই কনভেন্টে কাজ নিয়ে আসার পর থেকে ফশেলেভেন্ত মন্ত্রিউল-সুর-মের-এর কোনও খবরই পার্যান এবং এর মধ্যে কি ঘটেছে না ঘটেছে তারা কিছুই জানে না। বর্তমানে পীয়ের ম্যাদলেনের যা অবস্থা তাতে তাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। সেন্টকে কেউ কখনো কোনও প্রশ্ন করে না। কিন্তু অর ম:. ম্যাদলেনের মহত্ত্ব ম্লান হলো না বিন্দুমাত্র। ম্যাদলেনের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তার শুধু এই কথাই মনে হলো যে ম্যাদলেন হয়ত হঠাৎ ব্যবসায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে পাওনাদারদের জ্বালায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছে অথবা হয়ত কোনও রাজনৈতিক কারণে সে পালিযে বেডাচ্ছে। কারণটা যদি রাজনৈতিক হয় তাহলে তাতে অবশ্যই খুশি ফশেলেভেন্ত, কারণ উত্তরাঞ্চলের চাষীদের মতো সেও মনেপ্রাণে বোনাপার্টপন্থী। এই কনভেন্টটাকে এক নিবাপদ আশ্রয় ভেবে ম্যাদলেন যদি এখানে লুকিযে থাকতে চায় তাহলে সে সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু এই শিশুটি কোথা হতে এল এবং কেনই বা সে এখানে থাকবে তা সে কোনক্রমেই বুঝতে পারল না। শিশুটার ব্যাপার রহস্যময় রযে গেল তার কাছে, মনে মনে এই দুর্বোধ্য রহস্যের সন্ধান করতে করতে তার মধ্যে ডুবে গেল সে। বিভিন্ন অনুমান আর কল্পনার কাঁটাজালে জডিযে পডল। তবে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো সে। আজ নাই হোক, মেয়র মঁসিযে ম্যাদলেন একদিন তার জীবন রক্ষা করেছে, মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছে। সেদিন তিনি বৃথা সময় নষ্ট না করে সেই গাড়িটার তলায় ঢুকে পডে আমাকে উদ্ধার করেন। আজ তিনি যে কারণেই হোক আমার সাহায্যপ্রার্থী। আজ তিনি যদি চোর বা খুনীও হন তাহলেও তাঁকে আমি বাঁচাব। কারণ তিনি সাধু প্রকৃতির লোক।

কিন্তু কি করে তিনি কনভেন্টে থাকবেন? এখানে তো কোনও পুরুষ আসতে বা থাকতে পারে না। কিন্তু সমস্যা যত অলঙ্ঘনীয়ই হোক না কেন, একেবারে দমে গেল না ফশেলেভেন্ত। পিকার্দি অঞ্চলের সে একজন সামান্য চাষী। ভক্তি, সরলতা, শুভেচ্ছা আর কৃষকসুলভ এক চাতুর্য ছাড়া আর কোনও সম্বল নেই তার। সেই চাতুর্য প্রয়োগ করে কনভেন্টের কড়া নিয়ম-কানুনের সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম

করে তার জীবনদাতাকে সাহায্য করার উদার প্রবৃত্তিটিকে রক্ষা করে চলার এক দৃঢ় সংকল্প করে বসল সে মনে মনে। ফশেলেভেন্ত তার সারা জীবন ধরে আপন স্বার্থেরই সেবা করে এসেছে। সে ছিল পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু আজ সে বার্ধক্যে উপনীত, সে দুর্বল, পঙ্গু। জীবনে আজ আর আগের মতো আগ্রহ নেই। আজ তার কৃতজ্ঞতাবোধকে পরিতৃপ্ত করতে পারার এক বিরল আনন্দ অনুভব করছে সে। জীবনে আজ প্রথম একটা ভাল কাজ করতে পারার যে সুযোগ পেয়েছে, সে সুযোগকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সে। কোনও মুমূর্ষু ব্যক্তি অনাস্বাদিতপূর্ব একপাত্র ভাল মদ পেয়ে যেমন পুলকের এক রোমাঞ্চ অনুভব করে, ফশেলেভেন্তেরও আজ সেই অবস্থা হলো। তাছাড়া কয়েক বছর কনভেন্টের এই ধর্মীয় আবহাওয়ায় কাটানোর ফলে তার চরিত্রটা বদলে যায়। কোনও না কোনও একটা পুণ্যের কাজ করার আগ্রহ ক্রমশ প্রবল এবং অদম্য হয়ে ওঠে তার মনে।

ফশেলেভেন্ত তাই ম্যাদলেনকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠল।

তাকে আমরা পিকার্দি অঞ্চলের এক সামান্য চাষী বলে অভিহিত করেছি। কিন্তু এটা তার আংশিক পরিচয়, সম্পূর্ণ নয়। আমরা যদি পীয়ের ফশেলেভেন্তের জীবনটাকে আরও ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখি তাহলে দেখতে পাব সে চাষী হলেও মুহুরিগিরি এবং দলিল নকলের কাজ করত। এই কাজ করতে গিয়ে তার চাতুর্য এবং আইনের জ্ঞান বেড়ে যায়। তার স্বভাবসিদ্ধ সরলতার মাঝে এক দৃঢ়তা আসে। বিভিন্ন কারণে তার মুহুরিগিরি কাজ ভাল না চলায় সে গাড়িচালকের কাজে নামে। গাড়ি ভাড়া খাটার কাজ ছাড়াও মাঝে মাঝে দিনমজুরের কাজ করত। গাড়িচালনা এবং ঘোড়াচালনার কাজ সে করলেও তার মনে সেই মুহুরিগিরির দক্ষতা এবং চাতুর্যের কিছুটা রয়ে গিয়েছিল। তার বুদ্ধিবৃত্তি বেশ উন্নত ছিল এবং তার কথাবার্তা অন্যান্য চাষীদের মতো অমার্জিত ছিল না। সে অনেক সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করত যা সাধারণত গ্রামবাসীরা করে না। গাঁয়ের লোকেরা তাই তার সম্বন্ধে বলত, ও ভদ্রলোকের মতো কথা বলে। মোট কথা, ফশেলেভেন্ত ছিল একাধারে গ্রাম্য ও শহুরে। সমাজের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার না পেলেও গ্রাম্য এবং নাগরিকতার মিশ্র উপাদানে গড়া ফশেলেভেন্তের চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ ছিল যা তাকে খারাপ হতে বা নিচে নেমে যেতে দেয়নি কোনওদিন। তার মধ্যে দোষ-ক্রটি কিছু থাকলেও সেগুলি ছিল তার চরিত্রের বহিরঙ্গের ব্যাপার, তার গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। তার কপালে কুঞ্চিত রেখার মধ্যে কোনও হিংসা বা নির্বুদ্ধিতার ছাপ ছিল না।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সকাল হতেই চোখ খুলে দেখল পীয়ের ফশেলেভেন্ত, মঁসিয়ে ম্যাদলেন তার খড়ের বিছানার উপর বসে ঘুমন্ত কসেত্তের পানে তাকিয়ে আছে।

ফশেলেভেন্ত তার বিছানার উপর উঠে বসে বলল, এই যে আপনি উঠেছেন। এখন এখানে কিভাবে আপনার থাকার ব্যবস্থা করি বলুন তো।

এ প্রশ্নে চমক ভাঙল জাঁ ভলজাঁর। সে সজাগ ও সচেতন হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল ফশেলেভেন্তের সঙ্গে।

ফশেলেভেন্ত বলল, কথাটা হলো এই যে, আপনারা কেউ যেন এই কুঁড়েটার বাইরে এক পাও কোথাও যাবেন না। আপনাদের দু'জনের কাউকে একবার দেখে ফেললে আর রক্ষা থাকবে না। আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে।

ভলজাঁ বলল, তা বটে। কথাটা সত্যি।

ফশেলেভেন্ত বলল, বুঝলেন মঁসিয়ে ম্যাদলেন, আপনি যে সময়ে এখানে এসে পড়েছেন সেটা হয় খুব সুসময় অথবা খুব দুঃসময়। কনভেন্টের এক মহিলা এখন মৃত্যুশয্যায়, এখন অন্তিমকালীন যতসব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে। চল্লিশ ঘণ্টা ধরে প্রার্থনা চলছে। তাই এখানকার সবাই এখন এত ব্যস্ত আছে যে এদিকে কেউ তাকাবে না। একজন সেন্ট বিদায় নিচ্ছে পৃথিবী থেকে। একদিক দিয়ে আমরা সবাই সেন্ট। পার্থক্য এই যে আমরা থাকি সামান্য কুঁড়েঘরে। মৃত্যুর আগে ও পরে অনেক প্রার্থনা করতে হয়। এইভাবে আজকের দিনটা কেটে যাবে। কিন্তু কাল কি হবে বলতে পারি না।

জাঁ ভলজাঁ বলল, যাই হোক, এই ঘরটা ধ্বংসস্তূপের আড়ালে রয়েছে। তাছাড়া ঘরটা গাছে ঘেরা আছে। কনভেন্ট থেকে এ ঘরটা দেখতে পাওয়া যায় না নিশ্চয়।

সন্ন্যাসিনী বা সিস্টাররা এদিকে আসে না ঠিক, কিন্তু স্কুলের মেয়েরা আসে।

এমন সময় চার্চে একটা ঘণ্টাধ্বনি হতে তার কথাটা বাধা পেল। সে নিজে চুপ করে গিয়ে ভলজাঁকে ইশারায় চুপ করতে বলল। আবার একবার ঘণ্টাটা বাজল।

ফশেলেভেন্ত বলল, মহিলাটি মারা গেছে। এটা হচ্ছে মৃত্যুকালীন ঘণ্টার ধ্বনি। গীর্জা থেকে মৃতদেহ বার করে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে এক মিনিট পর পর এইভাবে ঘণ্টা বেজে চলবে। স্কুলের মেয়েরা বাগানে খেলা করে। একটা বল কোনওরকমে এদিকে আসার অপেক্ষা। তাহলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে এদিকে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে। এদিকে ওদের আসা নিষিদ্ধ হলেও ওরা তা মানে না। ওরা তো শিশু।

ভলজাঁ প্রশ্ন করল, কোন শিশুরা ?

ফশেলেভেন্ত বলে যেতে লাগল, ওরা অল্প সময়ের মধ্যেই আপনাকে দেখে ফেলবে। তারপর সব মেয়েগুলো একবাক্যে চিৎকার করে উঠবে, একটা লোক রয়েছে, লোক রয়েছে। তবে আজ আর সে বিপদ নেই। কারণ আজ সব খেলাধূলা নিষিদ্ধ। আজ শুধু সারাদিন প্রার্থনা। ঐ দেখুন। আবার ঘণ্টা বাজছে। আমি যা বলেছিলাম অর্থাৎ মিনিটে মিনিটে ঘণ্টা বেজে চলেছে।

ভলজাঁ বলল, এবার বুঝেছি। এখানে একটা বোর্ডিং স্কুল আছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে এসে গেল তার। এখানকার স্কুলে কসেত্তে লেখা-পড়া শিখতে পারে তো।

ফশেলেভেন্ত বলল, প্রায় একডজন বাচ্চা মেয়ে আছে। তারা শুধু চেঁচামিচি করতে

করতে ছুটে বেড়ায়। এখানে কোনও পুরুষমানুষ যেন প্লেগ রোগের জীবাণু। এই কারণেই আমার পায়ে একটা ঘণ্টা বাঁধা আছে। যেন আমি একটা বন্য জন্তু।

জাঁ ভলজাঁ আবার চিন্তার গভীরে ডুবে গেল। সে ভাবল হয়ত কনভেন্টই তাদের মুক্তির উপায় হয়ে উঠবে।

সে বলল, এখন এখানে থাকাটাই হলো সমস্যা।

ফশেলেভেন্ত বলল, না, সমস্যাটা হলো বেরিয়ে যাওয়াটা।

চমকে উঠল ভলজাঁ, বেরিয়ে যাওয়া ?

হ্যাঁ মঁসিয়ে, বাইরে থেকে এখানে যারা আসে তারা দরজা দিয়ে আসে। কিন্তু আপনি সেভাবে আসেননি। আমি আপনাকে চিনি তাই। কিন্তু আমারই তো মনে হচ্ছিল আপনি আকাশ থেকে পড়েছেন।

আবার একটা জোর ঘণ্টাধ্বনি হলো।

ফশেলেভেন্ত বলল, এই ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা মাদারদের প্রার্থনায় যোগদান করার জন্য ডাকা হচ্ছে। কেউ মারা গেলে তারা দিনরাত প্রার্থনা করে। কিন্তু আপনি চলে যাচ্ছেন না কেন এখান থেকে ? আমি অবশ্য প্রশ্ন করছি না। শুধু জানতে চাইছি আপনি কি করে ভিতরে ঢুকলেন ?

জাঁ ভলজাঁর মুখখানা মলিন হয়ে গেল। পুলিশপরিবৃত সেই ভয়ঙ্কর রাস্তায় ফিরে যাওয়ার কল্পনাটা সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তুলল তার। এ যেন ব্যাঘ্রাকীর্ণ কোনও জঙ্গল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার সেই জঙ্গলে ফিরে যাওয়া। মনে মনে কল্পনা করতে লাগল সে, গোটা রাস্তাটা ভরে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ আর প্রহরী। সবাই তার কলার ধরার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে আর জেভার্ত তাদের নেতা।

ভলজাঁ বলল, অসম্ভব। পীয়ের ফশেলেভেন্ত এই কথাই মনে করে যাক যে আমি আকাশ থেকে পড়েছি।

ফশেলেভেন্ত বলল, হ্যাঁ, আমি তাই বিশ্বাস করতে রাজী আছি। আমাকে আর কিছু বলার দরকার নেই। ঈশ্বর হয়ত আমি যাতে একবার আপনাকে দেখতে পাই তার জন্য এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার একটা ঘণ্টাধ্বনি হলো। এ ঘণ্টার অর্থ হলো মিউনিসিপ্যালিটিতে মৃত্যুর খবর দিয়ে পাঠানোর। খবর পেয়ে সেখান থেকে একজন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে দেখবে মৃত্যুর খবর ঠিক কি না। বাইরে থেকে ডাক্তার আসার ব্যাপারটা এখানকার কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু এবার খুব তাড়াতাড়ি লোক পাঠাচ্ছে কেন ? কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। আপনার এই বাচ্চা মেয়েটা এখনো ঘুমোচ্ছে। ওর নাম কি ?

কসেত্তে।

এ কি আপনার মেয়ে ? অবশ্য এ আপনার নাতনিও হতে পারে।

হ্যাঁ তাই।

মেয়েটাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যেতে কোনও কষ্ট হবে না। উঠোনের দিকে বাইরে যাবার একটা দরজা আছে। আমি তাতে করাঘাত করলেই দারোয়ান

সেটা খুলে দেয়। আমি বাগানের মালী, ঝুড়ি কাঁধে বেরিয়ে যাব আর ও ঝুড়ির মধ্যে চুপ করে বসে থাকবে। আমি ওকে আমার এক পুরনো বান্ধবীর কাছে রেখে আসব। রু্য দু শেমিন ভার্তে সেই বুডীটির একটা ফলের দোকান আছে। বুডীটা অবশ্য কানে কালা এবং আমাকে চিৎকার করে বলতে হবে মেয়েটি আমার ভাইঝি। কাল পর্যন্ত ওকে এখানে রাখতে হবে তোমার কাছে। তারপর ও নাহয় তো আপনার সঙ্গে আবার কাল এখানে আসবে। আপনার এখানে আসার কোনও একটা উপায় আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু এখান থেকে বার হবেন কি করে?

জাঁ ভলজাঁ মাথা নেড়ে বলল, শোন পীযের ফশেলেভেন্ত, আমাকে কেউ যেন দেখতে না পায়। সেইটাই সবচেয়ে বড কথা। তোমাকে একটা ঝুডি আর কিছু দড়ির ব্যবস্থা করতেই হবে।

ফশেলেভেন্ত তার বাঁ হাতের মাঝের আঙুল দিয়ে তার কানের গর্তটা নাড়া দিতে লাগল। এর মানে সে একটা বড় রকমের সমস্যায় পডেছে। সে চিন্তা করতে লাগল। এমন সময় আবার একটা ঘণ্টাধ্বনি হলো।

সে বলল, এর মানে ডাক্তার এসে গেছে। ডাক্তার দেখেই বলবে, রোগী আগেই মারা গেছে। ডাক্তার স্বর্গে যাবার ছাড়পত্রে সই করে দিলেই কফিনের জন্য লোক পাঠানো হবে। মৃত যদি মাদার হয় তাহলে মাদারেরাই মৃতকে কফিনে শোয়াবে। আর যদি সিস্টার মারা যায় তাহলে সিস্টারেরাই তাকে শোয়াবে কফিনে। তারপর আমাকে কফিনের মুখ বন্ধ করে পেরেক সাঁটতে হবে। মালী হিসাবে এটা আমার কর্তব্যের একটা অঙ্গ। মালীর কাজ অনেকটা কবর খোঁড়ার লোকের মতো। গীর্জার একটা ছোট ঘরে কফিনটা রাখা হবে। ঘরের রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে দেওয়া হবে। একমাত্র ডাক্তার ছাড়া বাইরের কোনও পুরুষ আসতে পারবে না। আমাকে তো পুরুষ বলে গণ্যই করা হয় না। এরপর মৃতদেহভরা কফিনটাকে নিয়ে যাওয়া হবে সমাধিভূমিতে। শবাধার বহনের জন্য পুরুষরা আসবে তাতে কোনও ক্ষতি নেই।

সূর্যের একটা রশ্মি কসেত্তের মুখের উপর পডতে ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল তার। মনে হলো সে যেন সূর্যালোক পান করছে। ভলজাঁ একদৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। সে কোনও কথা না শুনলেও ফশেলেভেন্ত নিজের মনে বলে যেতে লাগল।

কবরখানাটা হলো সিমেতেয়ার ভগিয়ার্দে। কিন্তু জায়গাটা নাকি এদের পছন্দ হচ্ছে না। কবরখননকারী পীয়ের মেস্তিয়েল আমার বন্ধু। এই কনভেন্টের কোনও মৃতদেহ ওখানে রাত্রিবেলাতেও নিয়ে গিয়ে সমাহিত করা চলে। পুলিশের কর্তারা হুকুম দিয়েছে। কিন্তু গতকাল থেকে আজকের মধ্যে কত কি ঘটে গেল। মাদার কুসিফিকসান মারা গেল আর পীয়ের ম্যাদলেন—

জাঁ ভলজাঁ মুখের উপর একফালি সকরুণ হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল, পীয়ের ম্যাদলেন হলো জীবন্ত সমাহিত।

হ্যাঁ, জীবন্ত সমাহিত আপনি হবেন যদি আপনি চিরদিন এখানে থাকেন।

আবার ঘন্টা বেজে উঠল। ফশেলেভেস্ত তার নিজের ঘণ্টাটা বার করে পায়ে বেঁধে নিল। সে বলল, এটা আমার জন্য। প্রধানা কর্ত্রী আমাকে ডাকছে। আমি না আসা পর্যন্ত আপনি এখানেই থাকবেন। কোথাও যাবেন না। রুটি, মাখন আর মদ আছে। ক্ষিদে পেলে খাবেন।

যেতে যেতে সে বলতে লাগল, আমি আসছি, এখনি আসছি।

সে যখন তার খোঁড়া পা নিয়ে বাগান পার হয়ে সবজী ক্ষেতের উপর দিয়ে যেতে লাগল, ভলজাঁ তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে গেটের কাছে গিয়ে দরজায় ঘা দিল। দারোয়ান দরজা খুলে বলল, চিরদিন, চিরদিন। তার মানে ভিতরে এস।

দরজা দিয়ে একটা ছোট ঘরে ঢুকল ফশেলেভেস্ত। ঘরের মধ্যে প্রধানা কর্ত্রী তার কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য।

২

সংকটের সময় একই সঙ্গে বিব্রত এবং সংযত হওয়া কতকগুলি চরিত্রের বিশেষ গুণ। বিশেষ করে যাজক ও ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে এই গুণটি বেশি পরিমাণে দেখা যায়। ফশেলেভেস্ত যখন কনভেন্টের বাইরের দিকের সেই ছোট ঘরটাতে গেট পার হয়ে ঢুকল তখন কনভেন্টের প্রধানা কর্ত্রী সুন্দরী, বিজ্ঞ ও হর্ষোৎফুল্ল ম্যাদলেন দ্য ব্লেমুর মেরে আর ইনোসেস্তের মধ্যে এই গুণদুটি একই সঙ্গে প্রকট হয়ে উঠেছিল তার চোখেমুখে।

মালী ফশেলেভেস্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।

প্রধানা কর্ত্রী মেরে ইনোসেস্ত তখন মালা জপ করছিলেন। মালা জপতে জপতে একসময় তিনি মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ও তুমি ফভেস্ত!

ফশেলেভেস্তকে কনভেন্টের সকলে সংক্ষেপে ফভেস্ত বলত।

ফশেলেভেস্ত তার কপালটা একবার হাত দিয়ে ছুঁয়ে বলল, আপনি আমায় ডেকেছেন শ্রদ্ধেয়া মাদার?

তোমাকে একটা কথা বলার আছে আমার।

আমারও আপনাকে একটা কথা বলার আছে।

নিজের সাহস দেখে নিজেই বিস্মিত হলো ফশেলেভেস্ত।

তোমার কিছু বলার আছে?

একটা অনুরোধ।

ঠিক আছে, বলে ফেল। শুনি কি অনুরোধ।

চাষী হয়েও যে একদিন মুহুরিগিরি করত সেই ফশেলেভেস্তের বাস্তব হিসেবী বুদ্ধি বেশই ছিল। তার মুখে-চোখে সব সময় যে একটা অজ্ঞতার ভাব ফুটে থাকত তা যেমন একদিকে সকলের মন থেকে তার প্রতি সব অবিশ্বাস ও সংশয়কে দূরীভূত করে দিত তেমনি তার প্রতি সকলের এক সহজ বিশ্বাসকেও আকর্ষণ করত। তার

এই অজ্ঞতার ভাবটা সরলতার প্রতীক হিসাবে গণ্য হত সকলের কাছে। সে প্রায় দু'বছরের বেশিদিন এই কনভেন্টে কাজ করছে। এর মধ্যে এই ধর্মসম্প্রদায়েরই একজন হয়ে উঠেছে সে যেন। সে ছিল সম্পূর্ণ একা, বাগানের কাজ নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকত। দেহটা তার কাজে ব্যস্ত থাকলেও তার সমগ্র মন জুড়ে বিরাজ করত এক বিরাট কৌতূহল। আজ দু' বছরের মধ্যেও কনভেন্টের আভ্যন্তরীণ জীবনের অনেক কথাই তার জানা হয়নি। সেখানকার সবকিছুই রহস্যময় তার কাছে। অবগুণ্ঠিত সন্ন্যাসিনীদের আসা-যাওয়া ও পদচারণা সে দূর থেকে দেখে। প্রথম প্রথম তাদের এক একটি ছায়ামূর্তি বলে মনে হত তার। এখন ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে তাদের সে রক্তমাংসের মানুষ বলেই ভাবে। বধির মানুষের দৃষ্টিশক্তি যেমন বেড়ে যায়, অন্ধ মানুযের যেমন শ্রবণশক্তি বেড়ে যায় তেমনি তারও বোধশক্তি থাকতে থাকতে বেড়ে যায় ক্রমে ক্রমে। সে প্রতিটি ঘণ্টাধ্বনি শুনে তাদের অর্থ বলে দিতে পারত। ক্রমে কনভেন্টের সব গোপন তথ্য ও জীবনযাত্রা প্রণালীর সব রহস্যই একে একে উদ্‌ঘাটিত হযে ওঠে তার বোধশক্তির কাছে। স্ফিঙ্কস যেন তার সব রহস্যের কথা বলে দিযেছে তার কানে কানে।

নি-ৼ ‍ানেককিছু জানলেও কোনও কথা কখনো কারো কাছে বলেনি, কোনও কিছু প্রকাশ করেনি ফশেলেভেন্ত। এখানেই ছিল তার বিশেষ দক্ষতা। কনভেন্টের সকলেই তাকে বোকা-বোকা ভাবত আর এই বোকা বোকা ভাবটা ধর্মসম্প্রদাযের পক্ষে একটা বড গুণ। কনভেন্টের মাদাবরা তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে কবত। তাছাডা সে নিযমিত কাজ করে যেত। একদিনের জন্যও কাজে সে অবহেলা করেনি, কোনওদিন অনুপস্থিত হযনি। একমাত্র বাগানের কাজ ছাডা সে বাইরে কোথাও যাযনি কখনো। মাত্র দুটি লোকের সঙ্গে তার একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। তারা হলো কনভেন্টের দারোযান আর কবর-খননকারী। তাদের কাছ থেকেও অনেক কথা জানতে পারত সে। সে যেন ব সময সন্ন্যাসিনীদের একই সঙ্গে জীবন এবং মৃত্যুর আলোকে বিচার করে দেখত। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে যাই ভাবুক না কেন, তাদের কোনওদিন তুচ্ছ বা হীন ভাবত না। ফলে সেও শ্রদ্ধা পেত সকলের কাছ থেকে। সে ছিল পঙ্গু, সরলস্বভাব, কানে কম শুনত, চোখে কম দেখত—পেতিত পিকপাসের কনভেন্টের পক্ষে সে ছিল সবচেযে যোগ্য পুরুষ। তার জাযগায় অন্য কাউকে বসানো সত্যিই এক কঠিন ব্যাপার।

প্রধানা কর্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি পেযে সে গ্রাম্য ভাষায় এবং ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করল। সে প্রথমে তার বার্ধক্য আর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কথা বলল। বলল বয়সের ভারে ক্রমশই নত হয়ে উঠছে সে। বাগানটা বড, একা তাকে অনেক কাজ করতে হয়। যেমন গতরাতে তাকে বাইরে গিয়ে বাইরে থেকে খড় এনে রাত্রিকালে চাঁদের আলোতে বরফ পড়ার ভয়ে তরমুজগুলো খড দিয়ে বাঁধতে হয়েছে।

এই সব বলার পর এবার আসল কথায় এল ফশেলেভেন্ত। তার এক ভাই আছে, এ কথায় প্রধানা কর্ত্রী চমকে উঠে তার মুখপানে তাকালেন। ফশেলেভেন্ত বলল,

তবে সে যুবক নয়, তার বেশ বয়স হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

ফশেলেভেন্ত আবার বলতে লাগল। সে বলল তাকে যদি অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে তার ভাই তার কাছে থেকে তাকে বাগানের কাজে সাহায্য করতে পারে। তার ভাই-এর এক নাতনি আছে। একটা বাচ্চা মেয়ে। তাকে যদি কনভেন্টের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় তাহলে কে বলতে পারে — ভবিষ্যতে সে একদিন এই কনভেন্টেরই এক সন্ন্যাসিনী বা সিস্টার হয়ে উঠতে পারে। সবশেষে সে বলল যদি তাকে এ অনুমতি দেওয়া না হয় তাহলে তার বয়স এবং কর্মগত যোগ্যতার অভাবের কথা ভেবে সে এ কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

তার কথা শেষ হলে প্রধানা কর্ত্রী মালা জপ করার কাজ থামিয়ে বললেন, আজকেব সন্ধ্যার মধ্যে একটা লোহার শাবল এনে দেওয়া সম্ভব হবে তোমার পক্ষে ?

ফশেলেভেন্ত বলল, হ্যাঁ, হবে শ্রদ্ধেয়া মাদার।

কথাটা বলে সে একা দাঁড়িয়ে রইল।

৩

এরপর প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। প্রধানা কর্ত্রী আবার ফিরে এলেন। দু'জনেই কি যেন ভাবছিল। এরপর দু'জনের মধ্যে যেসব কথা হয় তা তুলে দেওয়া হলো।

প্রধানা কর্ত্রী বললেন, পীযের ফশেলেভেন্ত ?

শ্রদ্ধেয়া মাদার ?

তুমি গীর্জার কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত ?

এ কাজের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমার কম। আমি সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে সময় পাই না। দূর থেকে তা শুনতে হয।

কখনো যোগ দিয়েছ ?

মাত্র দু' তিনবার।

আমি তোমাকে দিয়ে একটা পাথর সরাতে চাই।

পাথরটা কি খুব ভারী ?

বেদীর পাশে মেঝের একটা পাথর।

যে পাথর দিযে বেদীর পাশের গহ্বরটা ঢাকা আছে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু এটা তো দুটো লোকের কাজ।

মেরি অ্যাসেনশানের গায়ে পুরুষের মতো জোর আছে। সে তোমাকে সাহায্য করবে এ কাজে।

কিন্তু কোনও নারীর শক্তি পুরুষের সমান নয়।

এ ছাড়া আমাদের আর তো কোনও উপায় নেই। ডন মেবিলন আমাদের কাছে সেন্ট বার্নাদের চারশো সাতটি চিঠি পাঠিয়েছেন আর মার্লোনাস হবসন্তাস পাঠিয়েছেন তিনশো সাতষট্টিটি চিঠি। তাই বলে তো মার্লোনাসকে তুচ্ছ ভাবতে পারি না।

এখন আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এটা তো আর কারখানা নয়।

নারী আর পুরুষও কখনই এক হতে পারে না। আমার ভাই-এর গায়ে দারুণ শক্তি আছে।

তাছাড়া তোমার হাতে একটা লোহার শাবল থাকবে।

এইভাবেই পাথরটাকে তুলতে হবে।

পাথরটার মধ্যে একটা কড়া আছে।

আমি তার ভিতর দিয়ে শাবলটাকে ঢুকিয়ে দেব।

পাথরটা ঢাকনা চাপা আছে।

আমি সেটা তুলে গহ্বরের মুখটা খুলে দেব মাদার।

চারজন মাদার উপস্থিত থাকবেন।

গহ্বরের মুখটা খোলার পর কি হবে ?

আবার সে মুখটা বন্ধ করতে হবে।

শুধু এই কাজ ? আর কিছু নয় তো ?

না।

বলুন [illegible] কি করতে হবে আমায় ?

ফভেন্তু, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি।

আমি আপনার হুকুম তামিল করার জন্য প্রস্তুত।

এবং কাউকে কোনও কথা বলবে না।

না, বলব না।

গহ্বরের মুখটা খোলার পর—

আমাকে আবার তা বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু তার আগে আর একটা কথা আছে।

বলুন শ্রদ্ধেয়া মাদার।

সেই গহ্বরের মধ্যে কিছু একটা নামাতে হবে।

হঠাৎ চুপ করে গেল ফশেলেভেন্তু। দু'জনেই চুপচাপ। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রধানা কর্ত্রী নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়ে কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, তুমি জান ফভেন্তু আজ একজন মাদার মারা গেছেন ?

না।

তুমি ঘণ্টাধ্বনি শোননি ?

বাগানের শেষ প্রান্ত থেকে সব ঘণ্টা শোনা যায় না।

তাই নাকি ?

আমি শুধু আমার জন্য বাজানো ঘণ্টাটাই শুনতে পাই।

আজ সকালেই তিনি মারা গেছেন।

তাহলে তখন বাতাসটা আমার দিকে বইছিল না।

যিনি মারা গেছেন তিনি হলেন মাদার ক্রুসিফিকসিয়ন। স্মরণীয় মহিলা।

প্রধানা কর্ত্রী আবার নীরব হয়ে গেলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন, তিন বছর আগে জেসসেনীয়পন্থী মাদাম দ্য বেথুন মেরে ক্রুসিফিকসিয়নের ভক্তি আর উপাসনার নিবিড়তা দেখে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন।

এবার আমি বুঝতে পেরেছি মাদার। আমি ঘণ্টাধ্বনিও শুনতে পাচ্ছি।

তাঁর মৃতদেহ চ্যাপেলসন্নিহিত মৃতদেহ রাখার ঘরের মধ্যে রাখা হয়েছে।

আমি তা জানি।

তুমি ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের সে-ঘরে প্রবেশাধিকার নেই। কাউকে সে অধিকার দেওয়াও হবে না। সে ঘরে অন্য কোনও পুরুষ ঢুকলে কি হবে জান ?

যদি প্রায়ই ঢোকে।

তার মানে ?

তার মানে যদি প্রায়ই তাকে এ অনুমতি দেওয়া হয়।

কিন্তু আমি তো বলিনি।

আমি আপনাদের কথা সমর্থন করতেই চাই। শুধু বোঝাতে পারছি না।

আমিও বুঝতে পারছি না।

এমন সময় ন'টার ঘণ্টা বাজল।

প্রধানা কর্ত্রী তা শুনে বললেন, এই বেলা ন'টায় এবং প্রতিটি প্রহরে আমাদের ভক্তি এবং উপাসনা চলবে অব্যাহত গতিতে।

ফশেলেভেন্ত বলল, 'আমেন' অর্থাৎ তথাস্তু।

ঘণ্টাধ্বনিটা এক অপ্রীতিকর জটিল অবস্থার জাল থেকে তাদের দু'জনকেই উদ্ধার করল। তাদের চিন্তা অন্য দিকে চলে গেল। ফশেলেভেন্ত তার কপালে হাত দিল।

প্রধানা কর্ত্রী বললেন, মেরে ক্রুসিফিকসান তাঁর জীবদ্দশায় অনেককে ধর্মান্তরিত করেছেন। এখন মৃত্যুর পর তিনি অনেক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দেখাবেন।

একথার পুনরাবৃত্তি করে ফশেলেভেন্ত বলল, তিনি অনেক ঐন্দ্রজালিক কাজ দেখাবেন।

প্রধানা কর্ত্রী বলতে লাগলেন, মেরে ক্রুসিফিকসানকে পেয়ে আমাদের সম্প্রদায় অনেক ধন্য হয়েছে। কার্ডিনাল দ্য বেরুল যেমন প্রার্থনা করতে করতে মারা যান, তেমন ভাগ্য অবশ্য সবার হয় না। ক্রুসিফিকসানেরও এই সৌভাগ্য হয়নি। তবু কিন্তু তাঁর মৃত্যুটাও খুব সুন্দরভাবে হয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি আমাদের সঙ্গে ও দেবদূতদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি তাঁর শেষ উপদেশের কথাগুলো বলে যান আমাদের। পীয়ের ফভেন্ত, তোমার যদি একটু বিশ্বাস থাকে এবং তুমি যদি মৃত্যুকালে তাঁর পাশে থাকতে তাহলে তিনি তোমার খোঁড়া পা-টাকে স্পর্শ করে সারিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম, তিনি ঈশ্বরের মধ্যে নবজীবন লাভ করেছেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলাভ করেছেন তিনি।

ফশেলেভেন্ত বলল, আমেন।

এরপর সে নীরবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রধানা মালা জপ করতে লাগলেন। তারপর একসময় বললেন, শোন পীয়ের ফভেন্ত, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। এ বিষয়ে আমি অনেক ধর্মযাজকের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমি এমন সব ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছি যাঁরা ধর্মের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং তাতে পরম আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করেছেন।

ফশেলেভেন্ত বোকার মতো বলল, আপনি জানেন মাদার এখান থেকে চার্চের ঘণ্টা যেমন শোনা যায়, বাগান থেকে তেমন যায় না।

প্রধানা তাঁর আগেকার কথাটার জের টেনে বললেন, তাছাড়া তিনি সাধারণ মহিলা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সেন্ট।

ঠিক আপনার মতো শ্রদ্ধেয়া মাদার।

আমাদের পরম ধর্মীয় পিতা পোপ সপ্তম পায়াসের অনুমতি নিয়ে তিনি কুড়ি বছর কফিনের মধ্যে নিদ্রাভিভূত অবস্থায় ছিলেন।

যে পোপ বোনাপার্টের রাজ্যাভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

ফশেলেভেন্তের মতো একজন বোকা লোকের পক্ষে একথাটা বলা সত্যিই আশ্চর্যজনক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রধানা কর্ত্রী তখন অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলেন বলে তার কথাটা শুনতে পাননি।

প্রধানা কর্ত্রী আবার বলতে লাগলেন, কাপাদোসিয়ার আর্কবিশপ সেন্ট দিওদোর তাঁর সমাধিস্তম্ভের উপর শুধু একটা কথাই খোদাই করে রাখতে বলেছিলেন। সে কথা হলো 'আকারাস' অর্থাৎ মাটির পোকা এবং তাই করা হয়েছিল। এটা কি ঠিক নয়?

হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয়া মাদার।

অ্যাকুইনা গীর্জার অধ্যক্ষ মোজাকেল ফাঁসিকাঠের তলায় সমাহিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন এবং তাঁর তাই করা হয়েছিল।

হ্যাঁ, সত্যি কথা।

টাইবার নদীর মুখের কাছে যিনি বাস করতেন সেই অস্তিয়ার বিশপ সেন্ট তেরেন্স মৃত্যুর আগে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের উপর পিতৃহত্যার একটা প্রতীক খোদাই করা থাকবে যাতে পথিকরা তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় থুতু ফেলে তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে। তাই করা হয়েছিল। মৃতের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।

তা বটে।

ফ্রান্সে রোশে আবেলের কাছে বানর্দি গিদোলিস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন স্পেনের অন্তর্গত তু-এর বিশপ। তাঁর নির্দেশমতো এবং কাস্তিলের রাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ সমাহিত করার জন্য ডোমিনিকান চার্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে? প্লানতেভিচ দ্য লা ফসি এ ঘটনার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন।

তাহলে একথা সত্য হবেই মাদার।

আবার মালা জপ করতে লাগলেন প্রধানা।

একসময় তিনি বললেন, পীয়ের ফভেন্ত, মেরে ক্রুসিফিকসিয়ন যে কফিনে কুড়ি বছর ধরে নিদ্রাভিভূত ছিলেন সেই কফিনেই তাঁকে সমাহিত করা হবে।

ঠিক বলেছেন মাদার।

এই সমাধিই হবে তাঁর নিদ্রার প্রসারিত রূপ।

তাহলে সে কফিনেই আমাকে পেরেক আঁটতে হবে।

হ্যাঁ।

আর কে কে থাকবে?

চারজন মাদার তোমাকে সাহায্য করবেন।

কিন্তু কফিনে পেরেক আঁটতে তাঁদের দরকার হবে না আমার।

কিন্তু কফিনটাকে নামাতে দরকার হবে।

নামাতে হবে? কোথায়?

সেই গহ্বরটার ভিতরে।

ফশেলেভেন্ত চমকে উঠল। তারপর বলল, বেদীর তলায় সেই গহ্বরটায়? কিন্তু—

তোমাকে একটা শাবল দেওয়া হবে।

তা অবশ্য বটে! কিন্তু—

মৃতের ইচ্ছাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অবশ্যই পালন করতে হবে। এটাই ছিল মেরে ক্রুসিফিকসিয়নের অন্তিম কামনা। তিনি বলেছিলেন যে সমাধিভূমি অধর্মচারীদের দ্বারা কলুষিত সেখানে যেন তাঁকে সমাহিত করা না হয়। তাঁকে যেন সমাহিত করা হয় সেই বেদীর তলদেশে যেখানে কুড়ি বছর ধরে প্রার্থনা আর উপাসনা করে এসেছেন তিনি। তিনি আমাদের কাছে এই কামনাই প্রকাশ করেছিলেন এবং এ কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

কিন্তু এ কাজ তো নিষিদ্ধ মাদার।

মানুষের দ্বারা নিষিদ্ধ, কিন্তু ঈশ্বরের অনুমতিসিদ্ধ।

কিন্তু কথাটা যদি জানাজানি হয়ে যায়?

আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি।

আমাকে? আমি দেওয়ালের একটা পাথরের মতো। কিন্তু—

আমি প্রার্থনাসভায় সমবেত মাদারদের সঙ্গে আলোচনা করেছি এ নিয়ে। আমরা সকলে মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মেরে ক্রুসিফিকসিয়নকে তাঁর শেষ ইচ্ছানুসারেই সমাহিত করা হবে। একবার ভেবে দেখ ফভেন্ত, এর থেকে কত রহস্যময় সুফল লাভ করা যেতে পারে। এর দ্বারা আমাদের ধর্মসম্প্রদায় কত গৌরব অর্জন করতে পারে। যতসব ঐন্দ্রজালিক অতিপ্রাকৃত ঘটনা সমাধিস্তম্ভতেই ঘটে।

কিন্তু মাদার, স্বাস্থ্যদপ্তরের কমিশনার যদি—

এই সমাধির ব্যাপারে সেন্ট দ্বিতীয় বেনেডিক্ট কনস্তান্তিন পোগোলাতের আদেশ অমান্য করেছিলেন।

যদি পুলিশ কমিশনার—

কলোদেমেয়ার নামে একজন জার্মান রাজা যিনি কনস্তান্তিনের রাজত্বকালে গলদের পক্ষে যোগদান করেন তিনি একথা স্বীকার করেছিলেন যে ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের ধর্মস্থানেই সমাহিত হবার অধিকার আছে। তার মানেই বেদীর তলায়।

পুলিশ বিভাগের যদি কোনও ইন্‌সপেকটার—

ধর্মের কাছে পৃথিবীর কোনও দাম নেই। কার্থেজদের একাদশতম সেনাপতি মার্টিন একবার লাতিন ভাষায় বলেছিলেন, পৃথিবী চিরকাল ঘুরতে থাকবে, কিন্তু ক্রস এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

ফশেলেভেন্ত বলল, আমেন, লাতিন ভাষার বলা কথা যখন, তখন তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। আমার মনের সব সংশয় দূর হয়ে গেল।

কোনও মানুষ দীর্ঘকাল কথা না বলার পর যদি কোনও শ্রোতা পায় তাহলে কথা বলতে বলতে আর থামতে চায় না। জিমনাসতোরাস নামে একজন বাগ্মী কারাগার থেকে দীর্ঘদিন পর মুক্তি পেয়ে যেসব যুক্তি ও চিন্তা সঞ্চিত ছিল তা প্রকাশ করার কোনও লোক না পেয়ে একটা গাছকেই উদ্দেশ্য করে বোঝাতে থাকেন। কনভেন্টের প্রধানা কর্ত্রী তেমনি দীর্ঘদিন ধরে মনের মধ্যে স্তূপীকৃত কথার রাশি প্রকাশ করতে না পেরে এখন সুযোগ পেয়ে সে সব কথা ঢেলে দিতে লাগলেন। বাঁধভাঙা অবরুদ্ধ জলরাশি যেন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে ঝরে পড়তে লাগল অবাধে।

আমার ডান হাতে আছে বেনেডিক্ট আর বাঁ হাতে আছে বার্নার্দ। কে এই বার্নার্দ?

এই বার্নার্দ? তিনি ছিলেন ক্লেয়ারভয়ের চার্চের প্রথম অধ্যক্ষ। বার্গান্ডির ফতেনে ছিল তাঁর জন্মভূমি। তাঁর জন্মস্থান হিসাবে সে জায়গা ধন্য হয়ে আছে আজও। তাঁর পিতার নাম তেযসলিন এবং মার নাম অ্যাশীথিয়া। তিনি তাঁর ধর্মজীবন শুরু করেন সিটোতে আর সে জীবন শেষ করেন ক্লেয়ারভয়ে। তিনি সাতশো শিক্ষানবীশকে শিক্ষাদান করেন এবং একশো ষাটটি গির্জা ও ধর্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শ্যালনের বিশপ গিলম দ্য শ্যাম্পো তাঁকে অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করেন। ১১৪০ সালে রেইম-এর ধর্মসভায় তিনি সব ছদ্মবেশী কপট শয়তানদের পরাজিত করেন। তিনি রাজাদের মধ্যে সব মতভেদ দূর করেন। যুবক রাজা লুইকে সৎপথে চালিত করেন। পোপ তৃতীয় ইউসেনকে পরামর্শ দান করেন। এইভাবে তিনি একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনৈতিক জগতের মধ্যে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন। ক্রুসেডের সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আড়াইশো অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। একবার একদিনের মধ্যে এই ক্রিয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ঊনচল্লিশটি।

বেনেডিক্ট কে ছিলেন? তিনি ছিলেন মন্টি ক্যাসিনোর ফাদার। তিনি যে ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর সেই প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান এবং নির্দেশাবলী মান্য করে চল্লিশটি পোপের সৃষ্টি হয়েছে। তার থেকে বেরিয়ে এসেছে দুশোজন কার্ডিনাল, পঞ্চাশজন ফাদার, ষোলশো আর্কবিশপ, সাড়ে চার হাজার বিশপ, চারজন সম্রাট, বারোজন সাম্রাজ্ঞী, ছেচল্লিশজন রাজা, একচল্লিশজন রাণী, তিন হাজার ছশোজন সেন্ট এবং

তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ও নিয়মাবলী চৌদ্দশো বছর ধরে চলে আসছে। একদিকে আছেন বেনেডিক্ট আর একদিকে আছেন বার্নার্দ। আমাদের অন্য কোনও শাসকের প্রয়োজন নেই। আমাদের কথা রাজ্যের মানুষরা একবার ভেবে দেখে না। আমাদের দেহের মাটি ঈশ্বরকে দান করার অধিকারও আমাদের নেই। স্বাস্থ্যের কথাটা তুলেছে বিপ্লবীরা। এটা তাদের আবিষ্কার। ঈশ্বরকে এখন পুলিশ কমিশনারের অধীন করে তোলা হয়েছে। এই হলো আমাদের দেশ। কোনও কথা কাউকে বলবে না ফশেলেভেস্ত।

অস্বস্তিবোধ করতে লাগল ফশেলেভেন্ত।

প্রধানা আবার বলে যেতে লাগলেন, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের লোকদের ইচ্ছামতো সমাহিত হবার অধিকার একমাত্র কুপথে চালিত নিরীশ্বর ও নাস্তিক লোকরাই মানতে চায় না। আমরা এখন দারুণ গোলমালের মধ্যে জীবন যাপন করছি। এখানকার লোকেরা যেটা তাদের জানা উচিত তা জানে না আর যেটা জানা উচিত নয় সেইটা জানে। এখনকার সমাজের মানুষগুলো বড় স্থূল প্রকৃতির। তারা সবাই অসাধু। তারা এতদূর অধার্মিক যে তারা ষোড়শ লুই-এর বধ্যভূমিটাকে যীশু খৃস্টের ক্রসের সঙ্গে তুলনা করে। কিন্তু লুই ছিলেন শুধু একজন রাজা। আমাদের এখন ঈশ্বরের কথা ভাবতে হবে। ভলতেয়ারের কথা এখন সবাই জানে, কিন্তু সীজার দ্য বুসের কথা কেউ জানে না। অথচ সীজার দ্য বুস হলেন একজন ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য পুরুষ, আর ভলতেয়ার একজন অভিশপ্ত মানুষ। ভূতপূর্ব আর্কবিশপ কার্ডিনাল দ্য পেরিগর্দ জানতেন না যে শার্লস দ্য কলজেন বেরুলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি আবার ফ্রাঁসোয়া বুর্গয়েন কনদ্রেনের স্থলাভিষিক্ত হন। আবার সেন্ট মার্থের ফাদার বুর্গায়েনের স্থলাভিষিক্ত হন। এঁরা সবাই ভাল বাগ্মী। হুগোনত রাজা চতুর্থ হেনরি পীয়ের কটনের উপর এক নোংরা মন্তব্য করেন বলে তাঁর কথা সবাই জানে, কিন্তু তিনি যে এক ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তা কেউ জানে না। দু' একজন যাজক কখনো কোনও ভুল করে বসলেই সব যাজককে খারাপ ভাবতে হবে। মার্তিন দ্য তুর্গ ছিলেন এমনই এক সেন্ট যিনি তাঁর পোশাকের আধখানা অনেক সময় গরীবদের দান করতেন। সেন্টরা কত সহ্য করেন তা কেউ দেখতে পায় না। সত্যের প্রতি মানুষ চিরকালই অন্ধ। কেউ একবার স্বর্গ ও নরকের কথা ভাবে না। মানুষ কত দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে গেছে! রাজার নামে কোনও কথা বলা মানেই বিপ্লবের নামে কোনও কিছু বলা। রাজার কোথায় কি কর্তব্য, মৃতদের প্রতিই বা রাজার কর্তব্য কি তা কেউ জানে না। ধর্মপূতঃ পরিবেশে মরাটাও যেন নিষিদ্ধ, মৃতকে সমাহিত করার ব্যাপারটাও যেন একটা নাগরিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপার। এটা ঈশ্বরের প্রতি, ধর্মের প্রতি একটা বিদ্রোহ। দ্বিতীয় সেন লিয়ঁ পীয়ের নোতেয়ার আর ভিসিগথের রাজার কাছে দুটি চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তিনি মৃতকে সমাহিত করার ব্যাপারে সম্রাটের কর্তৃত্ব এবং অধিকারকে অস্বীকার করেন। তাঁর আদেশ অমান্য করেন। এবং এই একই ব্যাপারে শ্যালনের বিশপ গতিরের বার্গান্ডি ডিউক ওটোর আদেশও অমান্য করেন। অতীতে রাজনীতির উপর ধর্ম ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের একটা প্রভাব ছিল। আব্বে দ্য সিতো

বার্গাণ্ডির পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। আমরা বরাবর আমাদের বিবেচনা এবং ইচ্ছামতো মৃতদেহ সমাহিত করে এসেছি। সেন্ট বেনেডিক্ট নিজে ৫৪৩ সালে ইতালির মন্টি ক্যাসিনোতে মরদেহ ত্যাগ করলেও তাঁকে ফ্রান্সের আব্বায়ে দ্য ফ্লুরীতে সমাহিত করা হয়। যারা নাস্তিক, যারা অধার্মিক তাদের অবশ্যই আমি ঘৃণা করি ঠিক, কিন্তু যারা সমাধির ব্যাপারে চার্চের উপর হস্তক্ষেপ করতে চায়, চার্চের অধিকারকে অস্বীকার বা খর্ব করতে চায় তাদের আমি আরও বেশি ঘৃণা করি।

কথা বলা শেষ করে প্রধানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফশেলেভেন্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তাহলে রাজী আছ তো পীয়ের ফভেন্ত ?

হ্যাঁ, রাজী আছি শ্রদ্ধেয়া মাতা।

আমরা তাহলে নির্ভর করতে পারি তোমার উপর ?

আমি আপনাদের আদেশ পালন করে চলব, কারণ আমি কনভেন্টের সেবক।

ঠিক আছে। তুমি কফিনটাকে বন্ধ করে এঁটে দেবে আর সিস্টাররা সেটাকে গীর্জায় বয়ে নিয়ে যাবে। তারপর মৃতের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হবে। প্রার্থনা শেষ হলে রাত্রি এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে তুমি লোহার শাবল নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হবে। সবকিছুই বিশেষ গোপনে সম্পন্ন করতে হবে। শুধু চারজন মাদার আর তুমি থাকবে গীর্জায়।

ফশেলেভেন্ত বলল, গীর্জায় আর একজন থাকবেন। তিনি হলেন একজন সিস্টার যিনি প্রায়শ্চিত্তেব জন্য প্রার্থনা করতে থাকবেন।

সে তার ঘাড় ঘোরাবে না।

কিন্তু তিনি সেকথা শুনতে পাবেন।

সে শুনবে না। তাছাড়া সে তো কনভেন্টের লোক। কনভেন্টের কথা যেন বাইরে না যায়।

একটু চুপ করে থাকার পর প্রধানা আবার বললেন, আর তোমাকে আর ঘণ্টা পরতে হবে না। প্রায়শ্চিত্তকারিণী সিস্টারকে তোমার উপস্থিতি . কথা আর জানাতে হবে না।

আপনি যা বলছেন তাই হবে মাদার।

হ্যাঁ।

ডাক্তার এসেছিলেন ?

তাঁকে ডাকার জন্য ঘণ্টা বাজানো হয়েছিল। তিনি চারটের মধ্যেই এসে পড়বেন। কিন্তু তুমি আমার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাওনি ?

আমি শুধু আমাকে ডাকার ঘণ্টা শুনতে পাই।

তা ভাল।

একটা ছ' ফুট লম্বা শাবল আমার দরকার মাদার।

কোথায় সেটা পাবে তুমি ?

বাগানে অনেক লোহার রড পড়ে থাকে। তার থেকে একটা শাবল বেছে নেওয়া কষ্টকর হবে না।

রাত্রি বারোটা বাজার পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে তোমাকে আসতে হবে। ভুলো না যেন।

আর একটা কথা শ্রদ্ধেয়া মাদার।

বলে ফেল।

যদি এই ধরনের কাজ আপনার থাকে তাহলে বলতে পারেন। আমার ভাই খুবই বলিষ্ঠ।

কাজটা তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

কিন্তু আমি তো তাড়াতাড়ি কোনও কাজ করতে পারি না। আমার বয়স হয়েছে। তার উপর আমি খোঁড়া।

খোঁড়া হওয়াটা পাপ নয়। সম্রাট দ্বিতীয় হেনরি খোঁড়া ছিলেন। কেউ প্রতিবাদ করেনি। অষ্টম বেনেডিক্টকেও লোকে একই সঙ্গে সেন্ট আর খোঁড়া বলত।

একই সঙ্গে খোঁড়া আর সেন্ট হওয়া ভাল। আমি আবার কানেও কম শুনি।

তোমাকে পুরো এক ঘণ্টা সময় দেওয়া উচিত। এগারোটা বাজলেই তুমি শাবল নিয়ে চলে আসবে। দুপুর রাতে প্রার্থনা শুরু হবে। তার আগেই কাজ সারতে হবে। পুরো এক ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে।

আপনাদের ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি আমার ভক্তি কতখানি তা প্রমাণ করার জন্য আমি যথাশক্তি চেষ্টা করব। আমি সবকিছু বুঝে নিয়েছি এবং এগারোটা বাজলেই গীর্জায় চলে আসব। মেরে অ্যাসেনশান এবং মাদাররা থাকবেন। দু'জন পুরুষই যথেষ্ট এ ব্যাপারে। তবে আমি অবশ্যই একটা শাবল আনব। কফিনে পেরেক এঁটে আমি সমাধির মুখটা খুলব। তারপর কফিনটা সমাধিগহ্বরে নামিয়ে মুখটা আবার বন্ধ করে দেব। এমনভাবে মুখটা বন্ধ করে দেব যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। সরকার কোনও সন্দেহ করতে পারবে না। তাহলে সব কিছু ঠিক হযে গেল মাদার।

না, সব কিছু ঠিক হয়নি।

আবার কি বাকি আছে?

আর একটা খালি কফিন বাইরে থেকে আনা হবে। সেটা নিযে আমরা কি করব পীয়ের ফভেন্ত?

এবার দু'জনেই চুপচাপ ভাবতে লাগল।

তারপর ফশেলেভেন্ত বলল, সে কফিনটা বাইরের সমাধিভূমিতে নিযে গিয়ে কবর দেওয়া হবে।

কিন্তু খালি অবস্থায়?

আমি কফিনটাতে পেরেক এঁটে দিয়ে তার উপর চাদর ঢাকা দিয়ে দেব।

কিন্তু শববাহকরা সেটা বয়ে নিয়ে যাবার সময় এবং সমাধির ভিতর সেটা নামাবার সময় কফিনটা হালকা দেখে বুঝতে পারবে তার মধ্যে কিছু নেই।

ফশেলেভেন্ত কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কথাটা বলা ঠিক হবে না ভেবে তা বলল না। কি বলা ঠিক হবে তা খুঁজতে লাগল মনে মনে।

অবশেষে বলল, আমি কফিনটার মধ্যে মাটি ভরে দেব। এমনভাবে মাটি ভরে দেব যাতে মনে হবে একটা মৃতদেহ আছে তার মধ্যে।

হ্যাঁ, এটা করলে ঠিক হবে। মাটি আর মানুষের দেহের মাংস একই জিনিস। কাজটা ঠিকমতো করবে কিন্তু ফভেন্ত।

নিশ্চয়, অবশ্যই তা করব।

প্রধানা এবার গম্ভীর মুখে ফশেলেভেন্তের দিকে তাকিয়ে ইশারায় চলে যেতে বলল। ফশেলেভেন্ত যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াল। ঘর থেকে সে বার হতেই প্রধানা বললেন, আমি তোমার কাজে সন্তুষ্ট পীয়ের ফভেন্ত। সমাধির কাজ শেষ হয়ে গেলে আগামীকাল তোমার ভাইকে নিয়ে আসবে এবং তার নাতনিকে নিয়ে আসতে বলবে।

৪

খোঁড়া লোক কানা লোকের মতো সাবধানে পা ফেলে ধীর গতিতে যায়। কনভেন্টের অফিসঘর থেকে তার বাসায় ফিরে আসতে পনের মিনিট সময় লেগে গেল। বাসায় ফিরে সে দেখল কসেত্তে তখন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে এবং জাঁ ভলজাঁ আগুনের ধারে বসে আছে। আরও দেখল দেওয়ালের উপর টাঙানো মালীর ঝুড়িটা দেখিয়ে ভলজাঁ কসেত্তেকে বলছিল, আমার কথা শোন বাছা। এখন আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। তবে আবার আমরা এখানেই ফিরে আসব এবং সুখেই থাকব। মালী ঐ ঝুড়িতে তোমাকে চাপিয়ে পিঠে করে বাইরে বয়ে নিয়ে যাবে। একজন মহিলার কাছে সে নিয়ে যাবে তোমাকে। সে তোমার দেখাশোনা করবে। তারপর আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব। তুমি খুব শান্তভাবে থাকবে। কিন্তু কথা বলবে না। তাহলে মাদাম থেনার্দিয়ের তোমাকে ধরে ফেলবে।

কসেত্তে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল।

এবার ভলজাঁ ফশেলেভেন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, কি খবর, ভাল তো?

সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেল, আবার কিছুই হয়নি। আমাদের প্রধানা কর্ত্রীর কাছে তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য অনুমতি পেয়েছি। কিন্তু সেখানে তোমাদের নিয়ে যাবার আগে তোমাদের বেরিয়ে যেতে হবে যাতে বাইরে থেকে তোমাদের ডেকে আনতে পারি। বাচ্চা মেয়েটা অবশ্য যদি চুপ করে থাকে তাহলে তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়াটা কঠিন হবে না।

ভলজাঁ বলল, সেটা আমি দেখব।

ফশেলেভেন্ত বলল, কিন্তু পীয়ের ম্যাদলেন, আপনি যেপথে যেমন করে এখানে এসেছেন সেই পথে তেমনি করে বাইরে যেতে পারবেন না?

সে ভাবল এবার ম্যাদলেনের কাছ থেকে একটা সদুত্তর পাবে।

কিন্তু এবারেও ভলজাঁ আগের মতোই শুধু একটা কথা বলল 'অসম্ভব'।

ফশেলেভেন্ত তখন বলল, কিন্তু তাহলে তোমাকে বার করব কি করে এখান থেকে?

এরপর সে বিড়বিড় করে আপন মনে কি বলতে লাগল। এর উপর আবার একটা সমস্যা এসে দেখা দিল। কফিনটার গোটাটাতে যদি মাটি ভরে দিই তাহলে সেটা খুবই ভারী হবে। আবার যদি তাতে কম করে মাটি ভরা হয় তাহলে সেটাতে মাটিগুলো নড়বে। তাহলে তারা বুঝবে ভিতরে মানুষ নেই। তারা সন্দেহ করবে।

ভলজাঁ তার দিকে তাকিয়ে ছিল। ফশেলেভেন্ত আপন মনে বিড়বিড় করে যা বলে যাচ্ছিল তার কিছুই সে বুঝতে পারছিল না। ফশেলেভেন্ত তখন ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে বলল ভলজাঁকে। মৃত মাদারকে কোথায় কবর দিতে চায় তারা, খালি কফিনটা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যেটা পাঠানো হবে তাতে কি ভরা হবে, কিভাবে সে ভলজাঁকে তার ভাই বলে প্রধানার কাছে নিয়ে যাবার অনুমতি লাভ করেছে—এই সব কথা ভলজাঁকে খুলে বলল প্রথম থেকে। এখন খালি কফিনটা ভর্তি করাই হলো প্রধান সমস্যা।

ভলজাঁ বলল, কোন কফিনের কথা বলছ তুমি ?

মিউনিসিপ্যালিটির কফিন। ডাক্তার একজন সন্ন্যাসিনী মারা গেছে বলে রিপোর্ট দিয়েছে। তাই শুনে মিউনিসিপ্যালিটি একটা কফিন পাঠিয়েছে এবং আগামীকাল শববাহকরা এসে কফিনটা সমাধিভূমিতে নিয়ে যাবে। কিন্তু খালি কফিনটা তুললেই তারা বুঝবে তাতে কোনও মৃতদেহ নেই।

তাহলে তাতে তোমাকে কিছু ভরতে হবে।

অন্য কোনও মৃতদেহ ? পাব কোথায় ?

একটা জীবন্ত দেহ।

কি বলতে চাইছ তুমি ?

ভলজাঁ বলল, কেন, আমাকে।

ফশেলেভেন্ত তার চেয়ার থেকে এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠল যেন তার তলায় একটা বোমা ফেটেছে। আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি !

শীতের মেঘলা আকাশ থেকে মেঘ ভেঙে বেরিয়ে আসা একফালি বিরল সূর্যালোকের মতো একটুখানি হাসি ফুটে উঠল ভলজাঁর মুখে। সে বলল, তুমি যখন বলেছিলে মেরে ক্রুসিফিকসিয়ন মারা গেছে তখন আমি তোমাকে বলেছিলাম পীয়ের ম্যাদলেন জীবন্ত সমাহিত হবে। তাই হবে।

আপনি আসলে ঠাট্টা করছেন। এটা আপনার মনের কথা নয়।

হ্যাঁ, আমার মনের কথাই বলছি। এ বিষয়ে আমরা দু'জনেই একমত হয়েছিলাম যে আমাকে এখান থেকে অদৃশ্য অবস্থায় বেরিয়ে যেতে হবে। তার জন্য তোমাকে একটা ঝুড়ি আর দড়ির খোঁজ করতে বলেছিলাম। এখন তা পেয়ে গেলাম। ঝুড়ির বদলে কফিন পেলাম আর দড়ির বদলে কালো শবাচ্ছাদন।

কালো নয়, সেটা সাদা।

ঠিক আছে সাদা।

আপনি একজন সাধারণ লোক নন পীয়ের ম্যাদলেন।

ফশেলেভেন্ত জানত জেলের কয়েদীরা মরীয়া হয়ে এইভাবে কৌশলে পালায়; কিন্তু জেলখানার শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে থেকে কিভাবে এ কাজ সম্ভব হবে তা সে বুঝে উঠতে পারল না। তার মনে হলো যে র‍্যু সেন্ট ভেনিসের রাস্তার ধারে খালে একটা বককে মাছ ধরতে দেখেছে।

জাঁ ভলজাঁ বলল, আমাকে যেমন করে হোক অদৃশ্যভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এবং এটাই হলো একমাত্র উপায়। কিন্তু খালি কফিনটাকে কোথায় পাওয়া যাবে? কোথায় সেটা থাকবে?

গীর্জায় মৃতদেহ রাখার ঘরে যেটাকে মর্চুয়ারি চেম্বার বলা হয় তার উপর একটা শবাচ্ছাদন থাকবে।

সেটা কতটা লম্বা?

ছয় ফুট।

ঘরটা কোথায় তা বল।

বাগানের ধারে একটা বাড়ির একতলায় হলো ঘরটা। লোহার রড দিয়ে ঘেরা একটা জানালা আছে বাগানের দিকে আর দু'দিকে দুটো দরজা আছে—একটা রাস্তার দিকে আর একটা গীর্জার দিকে।

এই দুটো দরজার চাবি তোমার কাছে আছে?

না, শুধু গীর্জার দিকের দরজার চাবি আমার কাছে আছে। অন্য দরজার চাবি আছে দারোয়ানের কাছে।

সে চাবি কখন খোলে সে?

শুধু শববাহকরা বাইরে থেকে কফিন নিয়ে যাবার জন্য এলে দরজার তালা খোলে। তারা কফিন নিয়ে চলে যেতে আবার বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

কে পেরেক আঁটে কফিনে?

আমি।

আর তুমিই শবাচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে দাও কফিনটাকে?

হ্যাঁ।

তুমি একা থাকবে?

হ্যাঁ, পুলিশের লোক, ডাক্তার আর শববাহকরা ছাড়া বাইরের কোনও লোক ঢুকতে পারে না। দরজার উপর তা লেখা আছে।

রাত্রিতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তুমি ঘরটার মধ্যে একজনকে লুকিয়ে রাখতে পারবে?

ঘরটায় নয়, তার পাশে ছোট্ট একটা ঘর আছে যেখানে আমি আমার যন্ত্রপাতি রাখি। সে ঘরের চাবি আমার কাছে আছে।

আগামীকাল শববাহকরা বাতিদান নিয়ে কখন আসবে?

কাল বিকাল তিনটেয়। ভগিয়ার্দের কবরখানায় কফিনটা সমাহিত হবে সন্ধ্যার আগে। এখান থেকে কিছুদূরে জায়গাটা।

আমাকে তাহলে সারারাত এবং অর্ধেক দিন সেই ছোট্ট ঘরটার মাঝে থাকতে হবে। তাহলে আমার খাবার চাই।

আমি তোমাকে কিছু খাবার দেব।

তুমি কাল বেলা দুটোর সময় আমার কফিনে পেরেক এঁটে দেবে।

ভশেলেভেন্ত আবার চেয়ারে বসে পড়ে বলল, অসম্ভব।

বাজে। একটা কফিনে কতকগুলো পেরেক আঁটা কি এমন কঠিন কাজ?

ফশেলেভেন্তের কাছে যেটা অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল, ভলজাঁর কাছে সেটা একসঙ্গে সরল এবং সহজ ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। এর থেকে আরও অনেক খারাপ ঘটনার কথা জানে সে। যারা দীর্ঘদিন জেলে থাকে তারা পালাতে গিয়ে যে কোনও বস্তুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে। কয়েদীদের কাছে পালানোর ব্যাপারটা এক গুরুতর অসুখের মতো যা হয় সেরে যায় অথবা মানুষের মৃত্যু ঘটায়। এই রোগ সারাবার জন্যই কয়েক ঘণ্টা পেরেক আঁটা কফিনের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে। সে ক্ষমতা আছে ভলজাঁর। যাজক অস্টিন কাস্তিলেদো বলতেন সিংহাসনচ্যুতির পর পঞ্চম চার্লস লা প্লম্বেকে শেষবারের মতো দেখতে যান কফিনের মধ্যে শুয়ে। তাঁকে সেন্ট জন চার্চে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন।

ফশেলেভেন্তের এতক্ষণে হুঁশ হলো। বলল, কিন্তু কি করে তুমি নিঃশ্বাস নেবে? ভাবতেও ভয় লাগছে আমার।

আমার মুখের কাছে ঢাকনার উপর কয়েকটা ছিদ্র করে দেবে। আর ঢাকনাটা খুব বেশি আঁট করে বন্ধ করবে না।

ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যদি হাঁচ বা কাশ?

পলাতক কয়েদী কখনো হাঁচে-কাশে না। এসব ক্ষেত্রে আমাদের শক্ত হয়ে থাকতে হয়। হয় আমাকে এখানে ধরা পড়তে হবে অথবা ওখানে কফিনের ভিতর ঢুকে যেতে হবে।

কোনও বিড়াল যেমন খোলা দরজার ভিতর দিয়ে ঘরে ঢোকার আগে ইতস্তত করতে থাকে তেমনি অনেক সদা সতর্ক ব্যক্তি আছে যারা কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মুহূর্তে ভাবতে থাকে। এই সব ব্যক্তিরা সাহসী লোকদের থেকে বেশি বিপদের ঝুঁকি নেয়। ফশেলেভেন্ত ছিল এই ধরনের এক ব্যক্তি। কিন্তু ভলজাঁর অবিচলিতচিত্ততা তাকে বেশি ভাবিয়ে তুলল। সে বলল, আমিও তাই মনে করি। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ভলজাঁ বলল, আমি শুধু ভাবছি কবরখানায় কি হবে?

ফশেলেভেন্ত বলল, সেটা কোনও সমস্যা নয়। তুমি যদি কফিনের মধ্যে টিকে থাকতে পার তাহলে আমি তোমাকে কবর থেকে ঠিক বার করব। কবরখননকারী পীয়ের মেস্তিয়েন একজন বৃদ্ধ মাতাল লোক, সে আমার পরিচিত। তাকে সহজেই বশে আনা যাবে। সেখানে কি হবে আমি তোমাকে আগেই বলে দিতে পারি। আমরা সেখানে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছব অর্থাৎ কবরখানা বন্ধ হবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে। শববাহকরা তোমার কফিনটা বয়ে নিয়ে যাবে যখন, তখন আমি তাদের পিছু পিছু

যাব। আমার পকেটে কিছু যন্ত্রপাতি থাকবে। কফিনে দড়ি বেঁধে ওরা কফিনটাকে কবরের মধ্যে নামাবে। তারপর প্রার্থনা হবে, যাজক পবিত্র শান্তিজল ছিটোবে, ক্রস আঁকবে। তারপর ওরা সবাই চলে যাবে, থাকবে শুধু পীয়ের মেস্তিয়েন আর আমি। সে আমার বন্ধু, সেকথা আগেই বলেছি। সে হয় আগে থেকেই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকবে আর যদি তা না হয় তাহলে তাকে বলব একগ্লাস মদ পান করে নাও দোকান খোলা থাকতে। তাকে আমি ঠিক মাতাল করে তুলব, কারণ সে সব সময়ই অর্ধমাতাল হয়ে থাকে। তাকে আমি কবরখানার প্রতীক্ষাগারে টেবিলের তলায় শুইয়ে একা কবরে চলে যাব। সে মাতাল হয়ে উঠলে আমি তখন তাকে বলব, তুমি বাড়ি যাও। আমি তোমার সব কাজ করে দেব। তাহলে আমি কবরখানায় একা থাকব এবং তোমাকে কবর থেকে সহজেই বার করব।

জাঁ ভলজাঁ তার একটা হাত বাড়িয়ে দিল এবং ফশেলেভেন্ত তার কৃষকসুলভ নিষ্ঠার সঙ্গে সে হাতটা জড়িয়ে ধরল।

ভলজাঁ বলল, তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল ফশেলেভেন্ত। আমাদের কোনও বেগ পেতে হবে না।

ফশেলেভেন্ত চিন্তান্বিতভাবে বলল, যদি কোনও প্রতিকূল ঘটনা না ঘটে। হে ভগবান, ঠিকভাবে যেন সবকিছু ঘটে।

৫

পরদিন বিকাল বেলায় বুলভার্দ দু মইন অঞ্চলের পথচারীরা এক পুরনো ধরনের শবযাত্রা রাস্তা দিয়ে চলে যেতে দেখে তাদের টুপি খুলে শ্রদ্ধা জানায় মৃতের প্রতি। এক সাদা শবাচ্ছাদন দিয়ে কফিনটা ঢাকা ছিল। সেই চাদরটার উপর একটা কালো ক্রস আঁকা ছিল। শববাহকদের পিছনে একটা গাড়ি ছিল। সেই গাড়িতে একজন যাজক আর লাল টুপি মাথায় একজন প্রার্থনার গান গাওয়ার জন্য একটা ছেলে ছিল। কালো পোশাকপরা দু'জন শববাহক শবের দু'পাশে যাচ্ছিল। সকলের পিছনে একজন খোঁড়া বুড়ো লোক হাঁটছিল। তার কাছে ছিল একটা হাতুড়ি, একটা বাটালি আর একটা সাঁড়াশি।

শবযাত্রাটি ভগিয়ার্দের কবরখানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেকালে প্যারিসের অন্যান্য কবরখানা থেকে ভগিয়ার্দের কবরখানার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, কারণ তার কতকগুলো নিজস্ব রীতিনীতি ছিল। প্যারিসের সব কবরখানা সন্ধ্যার সময় বন্ধ হয়ে গেলেও ভগিয়ার্দের কবরখানাটা পেতিত পিকপাসের বার্নার্দ ও বেনেডিক্ট সম্প্রদায়ের অধিকারে ছিল বলে তাদের সম্প্রদায়ের লোকরা মৃত ব্যক্তিদের সন্ধ্যার পরেও সমাহিত করার এক বিশেষ অনুমতি পায়। ভগিয়ার্দের কবরখানায় দু'দিকে দুটো লোহার গেট ছিল। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে গেট দুটোয় তালা পড়ে যেত। তখনো যদি পেতিত পিকপাসের কনভেন্টের কোনও মৃত সন্ন্যাসিনীকে সমাহিত করার কাজ শেষ না হত, যদি কোনও কবরখননকারী রয়ে যেত ভিতরে তাহলে তার কাজ শেষ হলে সে

দারোয়ানের কাছে গিয়ে তার বিশেষ ছাড়পত্র দেখিয়ে তবে বার হতে পারত। অথবা ছাড়পত্র না থাকলে তার নাম বলত দারোয়ানকে। তখন দারোয়ান গেটের চাবি খুলে দিত।

আমরা যে সময়ের কথা লিখছি তখন ভগিয়ার্দের কবরখানার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। এখানে-সেখানে শ্যাওলা পড়ে। তার মাঝে কোথাও কোনও ফুল ফুটত না। সমাধিস্তম্ভগুলোর উপর ইউগাছ আর লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে উঠেছিল।

ভগিয়ার্দের কবরখানার গেটের কাছে এসে সেদিন যখন শবযাত্রাটা থামল তখন সূর্য অস্ত যায়নি। তাদের পিছনে ছিল ফশেলেভেন্ত। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পূর্বপরিকল্পনামতোই সব কিছু ঘটেছে। মেরে ক্রুসিফিকসিয়নকে বেদীর তলায় সেই গোপন সমাধিগহ্বরে যথাসময়ে সমাহিত করা হয়েছে। কসেত্তেকে সেইখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ম্যাদলেনকে খালি কফিনে শুইয়ে পেরেক এঁটে দিয়ে সেই কফিনটাকে এখানে আনা হয়েছে। একদিকে কনভেন্টের প্রধানা অন্যদিকে মঁসিয়ে ম্যাদলেন—দু'দিকে দুটি চক্রান্তের সঙ্গেই লিপ্ত হয়ে পড়েছে সে। যে চক্রান্ত এতক্ষণ পর্যন্ত বিনা বাধায় সম্পন্ন হয়েছে। ভলজাঁ শান্তভাবে কফিনের মধ্যে আছে দেখে তাদের চূড়ান্ত সাফল্য সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রইল না ফশেলেভেন্তের মনে। আর যাকিছু তার করার আছে তা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এর আগে প্রায় একডজনবার কবরখননকারী পীয়ের মেস্তিয়েনকে মদ খাইয়ে মাতাল করে তুলেছে। সে তার পকেটে। সে তাকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারবে। এ বিষয়ে তার কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই।

গেটে এসে সমাধি দেবার ছাড়পত্র দেখাতে হলো দারোয়ানকে। আসার পথে একজন অপরিচিত লোক অংশগ্রহণ করে শবযাত্রায়। সে ফশেলেভেন্তের পাশে পাশে পথ হাঁটছিল।

ফশেলেভেন্ত একসময় লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে?

লোকটা উত্তর করল, কবরখননকারী।

ফশেলেভেন্ত আশ্চর্য হয়ে বলল, পীয়ের মেস্তিয়েন তো কবরখননকারী।

লোকটা বলল, আগে তাই ছিল।

তার মানে কি বলতে চাইছ তুমি?

সে মারা গেছে।

এই দুঃসংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিল না ফশেলেভেন্ত।

সে এটা কোনওক্রমেই আশা করতে পারেনি। সে ভাবতেই পারেনি যে লোক সব মৃতদেহের জন্য কবর খোঁড়ে, সে মারা যাবে। তবু তার মৃত্যু ঘটেছে।

ফশেলেভেন্ত হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার যেন কথা বলার শক্তি নেই। তার মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে এল, অসম্ভব।

কিন্তু এটা সত্যি।

ফশেলেভেন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, কিন্তু পীয়ের মেস্তিয়েন চিরকাল কবর খুঁড়ে আসছে।

লোকটা বলল, আর খুঁড়বে না। নেপোলিয়নের পর যেমন অষ্টাদশ লুই, মেস্তিয়েনের পর তেমনি গ্রিবার। আমার নাম গ্রিবার।

ফশেলেভেন্ত গ্রিবারের দিকে তাকিয়ে রইল। গ্রিবারের চেহারাটা লম্বা আর রোগা। তার মুখটা গম্ভীর ধরনের। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন ডাক্তার হতে না পেরে কবরখননকারী হয়েছে। ফশেলেভেন্ত হাসতে লাগল। সে বলল, তাহলে বেচারা মেস্তিয়েন মারা গেল। কিন্তু পীয়ের লেনয়ের বেঁচে আছে। তাকে চেন? এক জগ ভাল লাল মদ নিয়ে সব সময় বসে আছে। পীয়ের মেস্তিয়েনের জন্য দুঃখ হয়। সে জীবনটাকে ভোগ করেছে। তুমিও বন্ধু জীবনকে ভোগ কর। চল দু'জনে কিছুক্ষণ মদ খাওয়া যাক।

লোকটা বলল, আমি লেখাপড়া শিখেছি, আমি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি। আমি মদ খাই না।

শোভাযাত্রা আবার এগিয়ে চলতে লাগল। কবরখানার বড় রাস্তাটা ধরল। ফশেলেভেন্ত পিছিয়ে পড়ল। দুর্বলতার সঙ্গে মানসিক উত্তেজনার জন্য হাঁটতে পারছিল না ঠিকমতো। সে আবার গ্রিবারের দিকে তাকাল। গ্রিবার লোকটা বয়সে যুবক হলেও তাকে বুড়োর মতো দেখাচ্ছে। তার চেহারাটা রোগা হলেও বেশ শক্ত।

ফশেলেভেন্ত বলল, বন্ধু, আমি হচ্ছি কনভেন্টের কবরখননকারী।

গ্রিবার বলল, তাহলে আমরা সহকর্মী।

লেখাপড়া না শিখলেও ফশেলেভেন্ত কূট বুদ্ধিসম্পন্ন। সে বুঝতে পারল তাকে ভয়ঙ্কর ধরনের এমন এক লোককে নিয়ে চলতে হবে যে ভাল কথা বলতে পারে, যার যুক্তিবোধ আছে। সে আপন মনে বলে উঠল, তাহলে মেস্তিয়েন মারা গেল।

গ্রিবার বলল, হ্যাঁ, ঈশ্বর তার খাতা খুলে দেখল তার দিন ফুরিয়ে গেছে। তার মৃত্যুর পালা এসে গেছে। তাই মারা গেল।

ফশেলেভেন্ত বলল, হা ভগবান!

গ্রিবার বলল, হা ভগবান! দার্শনিকরা বলে, চিরন্তন পরম পিতা। জ্যাকবিয়ানরা বলে, পরম সত্তা।

ফশেলেভেন্ত বলল, আমরা পরস্পরের পরিচিত।

গ্রিবার বলল, আমরা পরস্পরকে চিনি। তুমি একজন গ্রাম্য লোক আর আমি প্যারিস শহরের লোক।

ফশেলেভেন্ত বলল, একসঙ্গে দু'জনে মদপান না করলে পরস্পরকে চেনা যায় না। মদের গ্লাস পান করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ মনের কথা সব বলে। দু'জনে বসে আগে মদ খেতে হবে। এটা তুমি অস্বীকার করতে পার না।

আগে আমাদের কাজ সারতে হবে।

ফশেলেভেন্ত ভাবল, আমার দফা শেষ হয়ে গেল।

তারা সেই জায়গাটায় পৌঁছল যেখানে সন্ন্যাসিনীরা দাঁড়ায়। গ্রিবার ফশেলেভেন্তকে বলল, বন্ধু, সাতটা ছেলেকে আমার খাওয়াতে হয়। মদ খাব কি করে? তাদের ক্ষুধাই আমার মদের পিপাসার শত্রু।

শবযাত্রাটা এবার একটা সরু পথ ধরল। বৃষ্টির জলে পথটায় কাদা হয়ে গিয়েছিল।

ফশেলেভেন্ত গ্রিবারের কাছে সরে এল। সে বলল, আর্জেন্টিনার একটু ভাল মদ আছে।

গ্রিবার বলল, তুমি ব্যাপারটা বোঝ, কবরখননকারী হবার আমার কোনও অধিকারই নেই। আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করি। কিন্তু তিনি দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েন। কারবারে তাঁর সব টাকা খোয়া যায়। আমি পড়াশুনো ত্যাগ করতে বাধ্য হই। এখনো বাজারের বই লিখি।

ফশেলেভেন্ত তার জামার আস্তিনটা ধরে বলল, তার মানে তুমি একজন কবরখননকারী নও।

অবশ্য আমার কাছে সব কাজই সমান। আমি একজন বহুত্ববাদী।

গ্রিবারের শেষের কথাটা ফশেলেভেন্তের বোধগম্য হলো না কিছুতে। সে বলল, তোমাকে এখন কিছু মদ খেতে হবে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। সে মদ খাবার কথা বলেছে। এ বিষয়ে তার প্রচুর আগ্রহ ও উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও সে মদের দামটা কে দেবে সে বিষয়ে সে কিছুই বলেনি। এ ব্যাপারে মেস্তিয়েনের সঙ্গে তার বোঝাপড়া ছিল। সে তাকে মদ খাবার কথাটা বললেও মদের দামটা মেস্তিয়েনই দিত। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় মদের দাম দেবার প্রস্তাবটা তারই করা উচিত ছিল। এ বিষযে তার ভয় থাকা সত্ত্বেও সে দাম দিতে চায়নি।

গ্রিবার হাসতে লাগল। সে বলল, পেটে খেতে হবে সবাইকে। আমি পীয়ের মেস্তিয়েনের কাজের ভারটা নিতে নিজেই রাজী হয়েছিলাম। পডাশুনো শেষ হযে গেলেই যেকোনও লোক একদিক দিয়ে দার্শনিক হয়ে ওঠে। কলম দিয়ে লেখাব কাজ শেষ করে আমি হাতের কাজ শুরু করেছি। বাজারে রু দ্য বেভারেতে এখনো আমার একটা বই-এর দোকান আছে। তুমি জান কি না তা জানি না। ক্রয রোগ অঞ্চলের যে সব মেয়েরা রান্নাঘরে ঝি-এর কাজ করে, তারা আমার কাছে চিঠি লেখাতে আসে। আমি সারাদিন ধরে প্রেমের চিঠি লিখি আর বিকালবেলায় কবর খোঁড়ার কাজ করি। এই হচ্ছে আমার জীবন।

শবযাত্রা কবরখানার ভিতরে আসল জায়গার দিকে এগিয়ে চলল। দুশ্চিন্তায় ফশেলেভেন্তের কপালে ঘাম দেখা দিল।

গ্রিবার বলল, কিন্তু দুটো কাজ একসঙ্গে চলতে পারে না। হয় কলম না হয় কোদাল দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতেই হবে আমাকে। কোদাল ধরে ধরে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে।

একটা মুখখোলা কবরের সামনে এসে শবযাত্রাটা থেমে গেল।

৬

ভলজাঁ তার কফিনের মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল যাতে সে প্রয়োজন মতো নিঃশ্বাস নিতে পারে। দেহমনের স্বস্তি থেকে একটা আশ্চর্য নিরাপত্তাবোধ

জেগেছিল তার মধ্যে। তার পরিকল্পনা প্রথম থেকেই কার্যকরী হয়ে আসছিল। ফশেলেভেন্তের মতো সেও মেস্তিয়েনের উপর নির্ভর করেছিল অনেকখানি এবং পূর্বকল্পিত পরিণাম সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ ছিল না তার মনে। এতখানি সংকটজনক মুহূর্তে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এতখানি মানসিক প্রশান্তি কেউ কখনো দেখাতে পারেনি তার মতো।

কফিনের চার-দেওয়ালের মধ্যে সেই প্রশান্তি বিরাজ করছিল। সে তার ভিতর থেকে সেই নাটকের গতিবিধি বুঝতে পারছিল যে নাটকে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মৃত্যু। কফিনটাতে ফশেলেভেন্তে পেরেক এঁটে দেবার পরই সে অনুভব করে কফিনটাকে তোলা হয় একটা চাকাওয়ালা গাড়ির উপর। কফিনের গাড়িটা প্রথমে পাথরভরা এবড়ো-খেবড়ো পথের উপর দিয়ে যেতে থাকে এবং তার ফলে খুব ঝাঁকুনি হতে থাকে। তারপর বুলভার্দের মসৃণ পথের উপর দিয়ে চলতে থাকে। গাড়িটা যখন প্রথম থামে তখন ভলজাঁ বুঝতে পারে এরা কবরখানায় এসে গেছে। তারপর চলতে শুরু করে আবার যখন থেমে যায় তখন সে বুঝতে পারে এবার সমাধির জায়গায় এসে গেছে। এরপর কফিনটা একবার ঝাঁকুনি খেল। তাতে দড়ি বেঁধে স্নেটাকে কবরের মধ্যে নামানো হলো।

হঠাৎ ভলজাঁর মনে হলো সে মাথার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর কফিনটাকে শুইয়ে দেওযা হলো। সে বুঝতে পারল সে কবরের তলায় শুয়ে আছে। একটা শিরশিরে অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল তার মধ্যে। সে শুনতে পেল উপরে শান্ত ও গুরুগম্ভীর কণ্ঠে লাতিন ভাষায় কে মন্ত্রপাঠ করছে। একটা বালককণ্ঠ বলে উঠল, 'দে প্রোফান্দিস।' যে যাজক মন্ত্র পড়ছিলেন তিনি বললেন, হে প্রভু, চিরশান্তি দান করো তার আত্মাকে। এরপর কফিনের উপর পবিত্র জল ছিটানো হতে লাগল।

ভলজাঁ ভাবল, এরপর ওরা চলে যাবে আর ফশেলেভেন্ত মেস্তিয়েনকে মদ খেতে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে মুক্ত করবে। সে বেরিয়ে আসবে। সে সমাধির উপর কতকগুলো পদশব্দ শুনতে পেল। কিন্তু পরক্ষণেই তার কফিনের উপর মাটি পড়তে লাগল। একটা একটা করে মাটির চাপ পড়তে লাগল। ভলজাঁ আশ্চর্য হয়ে গেল। সমাধির গর্তটা বুজে যাচ্ছে ক্রমশ।

আর সহ্য করতে পারল না ভলজাঁ। তার শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। সে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

৭

এরপর সমাধিভূমিতে যা ঘটেছিল তা হলো এই।

শববাহকরা পুরোহিতকে নিয়ে চলে গেলে গ্রিবার কোদাল নিয়ে সমাধির গর্তটা বোজাতে গেল। ফশেলেভেন্তে তখন কবর আর গ্রিবারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চরম ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হাতজোড় করে বলল, আমি দাম দেব।

তার পানে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে গ্রিবার বলল, কিসের দাম দেবে?

আমি বলছি, আমি দাম দেব।

কিসের দাম?

মদের দাম। আর্জেন্টিনার ভাল মদ।

কোথায় পাওয়া যায় সেই মদ?

বন ফোয়িং-এ।

'জাহান্নামে যাও।'

এই বলে এককোদাল মাটি সমাধির ভিতর কফিনের উপর ফেলে দিল গ্রিবার।

ফশেলেভেন্তের পা দুটো জোর কাঁপতে লাগল। মনে হলো সে যেন নিজেই কবরের ভিতরে পড়ে যাবে। সে আকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, কিন্তু বন্ধু, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

সে কথা গ্রাহ্য না করে আবার মাটি কাটায় মন দিল গ্রিবার।

ফশেলেভেন্ত তার একটা হাত ধরে বলল, আমি দাম দেব। শোন বন্ধু, আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। এ কাজ সন্ধের পর করলেও চলবে। মদপান করার পর আমরা এ কাজ শেষ করব।

গ্রিবারকে সে ধরে রইল মরীয়া হয়ে। তার তখন শুধু এই ভাবনা হতে লাগল তাকে মদ খাওয়ালেও সে মাতাল হবে কি?

গ্রিবার বলল, ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে মদ খেতে পারি। কিন্তু কাজটা শেষ করার পর।

আবার কোদালের উপর ঝুঁকে পড়ল। ফশেলেভেন্ত তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করল। বলল, ছয় স্যুতে ভাল মদ।

গ্রিবার বলল, তুমি শুধু ঘণ্টার মতো একটানা বেজে চলেছ। এখন যাও।

এই বলে আবার এককোদাল মাটি ফেলে দিল গ্রিবার। ফশেলেভেন্তের মনের অবস্থাটা তখন এমনই হয়ে উঠল যে সে কি বলছে তা সে নিজেই জানে না। সে বলল, একটুখানি মদ খাব, আমি দাম দেব।

গ্রিবার আপন মনে বলে চলতে লাগল, আজ রাতে বড় ঠাণ্ডা পড়বে। বুড়ীটা মরে পড়ে আছে, আগে মাটি ঢাকা দিতে হবে। তা না হলে আমাদের তাড়া করবে।

গ্রিবার যখন চতুর্থবার এককোদাল মাটি দিতে যাচ্ছিল তখন তার পকেটে একটা জিনিস লক্ষ্য করল ফশেলেভেন্ত। গ্রিবারকে একমনে কাজ করতে দেখে সে তার একটা হাত দিয়ে পকেট থেকে সেই জিনিসটা তুলে নিল।

গ্রিবার এককোদাল মাটি ফেলে দিতেই ফশেলেভেন্ত বলল, আচ্ছা তোমার বেরিয়ে যাবার জন্য কার্ড আছে তো?

গ্রিবার তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, কি কার্ড?

এখন সন্ধে হয়ে আসছে। গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

তাহলে?

তোমার কার্ড আছে তো?

গ্রিবার তার পকেটে হাত দিয়ে দেখল। না পেয়ে তার পোশাকগুলোতে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু পেল না কার্ডটা। তখন বলল, তাহলে আমি ভুলে গেছি।

ফশেলেভেন্ত বলল, তাহলে পনের ফ্রাঁ জরিমানা লাগবে।

গ্রিবারের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পনের ফ্রাঁ জরিমানা!

তার মানে তিনশো স্যু গুণে দিতে হবে।

গ্রিবার কোদালটা নামিয়ে রাখল।

এবার সুযোগ বুঝে ফশেলেভেন্ত বলল, হতাশ হবার কারণ নেই। আত্মহত্যা করে কবর ভরিয়ে কাজ নেই। পনের ফ্রাঁ তুমি দিতে পারবে না। আমার বয়স হয়েছে। কিসে কি হয় আমার সব জানা আছে। কি করতে হবে না হবে পরে বলে দেব। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

তা ঠিক। এ কবরের খালটা বেশি। গেট বন্ধ হবার আগে কবর বোজাতে পারব না।

তা ঠিক। তবে এখনো সময় আছে, তুমি কোথায় থাক?

আমি থাকি ব্যারিনয়ারের কাছে, ৮৭ নম্বর রুা দ্য ভগিয়ার্দে। পনের মিনিটের পথ।

তুমি এখনি ছুটে চলে যাও। বাড়িতে কার্ডটা খুঁজে দেখগে। পেলে ফিরে আসবে। জরিমানা দিতে হবে না তোমাকে। আমি ততক্ষণ এখানে বসে পাহারা দেব।

খুব ভাল কথা।

তাহলে চলে যাও।

গ্রিবার ছুটতে শুরু করে দিল। সাইপ্রেস গাছের আড়ালে কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ফশেলেভেন্ত কবরের উপর ঝুঁকে ডাকল, পীয়ের ম্যাদলেন!

কোনও উত্তর নেই।

ভয়ে কাঁপতে লাগল ফশেলেভেন্ত। সে কবরের তলায় নেমে গিয়ে কফিনের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বলল, আপনি আছেন?

কোনও কথা নেই।

কাঁপতে কাঁপতে ফশেলেভেন্ত কফিনের উপর হতে মাটিগুলো সরিয়ে কফিনের ঢাকনাটা তুলল। তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। দেখল ম্যাদলেনের চোখ দুটো বন্ধ, মুখখানা অন্ধকারেও সাদা দেখাচ্ছে।

ফশেলেভেন্তের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। সে কফিনের উপর পড়ে যাচ্ছিল কাঁপতে কাঁপতে। ভলজাঁর নীরব নিস্তব্ধ শায়িত মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল সে হয়ত মারা গেছে। সে তার বুক চাপড়ে বলল, 'এইভাবে তাকে আমি উদ্ধার করলাম বিপদ থেকে!' সে কাঁদতে লাগল।

কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে লাগল, এই সবকিছু হলো শুধু পীয়ের মেস্তিয়েনের জন্য। যখন তার দরকার তখনি সে মারা গেল। পীয়ের ম্যাদলেন কবরেই মারা

গেল। সে মারা গেল। এখন মেয়েটার কি হবে, তাকে নিয়ে কি করব সেই কথাই ভাবছি। ফলের দোকানের মেয়েটাই বা কি বলবে। এর পরে ঈশ্বরে আর বিশ্বাস রাখা যায় না। পীয়ের ম্যাদলেন আমাকে গাড়ির ভিতর থেকে কত কষ্টে উদ্ধার করেছিলেন। বোধহয় শ্বাসরোধ হয়ে মারা গেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে ভালমানুষ চলে গেল। এ হলো ভাগ্যের চক্রান্ত। এরপর আর আমি কনভেন্টে ফিরে যাব না। আমরা দু'জন বুড়ো লোক কত ভাল থাকতাম একসঙ্গে। পীয়ের ম্যাদলেন। মঁসিয়ে লা মেয়র। আর তিনি শুনতে পাবেন না।

এবার সে তার মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। তারপর আবার ভলজাঁর উপর ঝুঁকে দেখতে লাগল। হঠাৎ চমকে উঠল সে। দেখল ভলজাঁ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল ফশেলেভেন্ত। ভলজাঁ বলল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ফশেলেভেন্ত আনন্দে চিৎকার করে উঠল, হে স্বর্গের মাতা, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।

ভলজাঁর মতোই নিজেকে আবেগের কবল থেকে সামলে নিতে দেরি হলো। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলতে লাগল, তাহলে তুমি মরনি! তোমার মনের জোর আছে তাহলে! আমি অনেক ডেকেছি তোমায়। তবে তোমার জ্ঞান ফিরেছে। যখন দেখলাম তোমার চোখ দুটো বন্ধ, তখন ভাবলাম তোমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমি পাগল হয়ে যেতে বসেছিলাম। তুমি মারা গেলে কি হত? কি করতাম আমি। বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়েই বা আমরা কি করতাম? তুমি তাহলে এতক্ষণ বেঁচেছিলে?

ভলজাঁ বলল, আমার খুব শীত লাগছে।

কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব অবস্থার প্রতি সচেতন হয়ে উঠল ফশেলেভেন্ত। দু'জনের মন তখন ঠিক হয়ে উঠলেও কবরখানার সান্ধ্য নির্জন পরিবেশ তাদের ভাল লাগছিল না।

ফশেলেভেন্ত বলল, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যেতে হবে। তার আগে এককোঁটা করে মদ গলায় ঢালতে হবে।

এই বলে তার পকেট থেকে মদের একটা ফ্লাস্ক বার করল। কিছুটা মদ পান করায় দেহে শক্তি ফিরে পেল ভলজাঁ। সে কফিন থেকে বেরিয়ে এল। ফশেলেভেন্ত পেরেক এঁটে দিল কফিনের ঢাকনাটাতে।

এতক্ষণে মনে মনে শান্ত এবং নিশ্চিন্ত হয়ে উঠল ফশেলেভেন্ত। এখন কবরখানা বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রিবারও তার কার্ড খুঁজতে বাড়ি চলে গেছে। কার্ড সে পাবে না, সুতরাং আর এখন ফিরে আসবে না। তার কার্ড এখন ফশেলেভেন্তের পকেটে। তাকে ভয়ের আর কিছু নেই এখন। ফশেলেভেন্ত কোদাল হাতে নিল এবং ভলজাঁ নিল গাঁইতিটা। মাটি দিয়ে কবরের খালটা বুজিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। যে পথে শবযাত্রা কবরখানায় ঢুকেছিল সেই পথ দিয়েই বেরিয়ে পড়ল ওরা। ভলজাঁর পাগুলো শক্ত কাঠ হয়ে ছিল। সে ঠিকমতো হাঁটতে পারছিল না। সে বলল, অল্প সময়ের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

গেট দিয়ে বার হবার সময় ফশেলেভেস্ত কার্ডটা চিঠির বাক্সে ফেলে দিতেই দারোয়ান দরজা খুলে দিল এবং ওরা তখন বেরিয়ে গেল।

ফশেলেভেস্ত বলল, সবকিছু কত ভালভাবে হয়ে গেল। তোমার পরিকল্পনাটা চমৎকার পীয়ের ম্যাদলেন।

ভগিয়ার্দে ব্যারিয়ার অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নিরাপদে ওরা চলে গেল। সমাধিভূমি অঞ্চলে কারো হাতে কোদাল গাঁইতি থাকলে সেটা তার ছাড়পত্রের কাজ করে। রু দ্য ভগিয়ার্দ অঞ্চলটা সন্ধ্যার সময় খুব নির্জন থাকে।

সামনের দিকের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ফশেলেভেস্ত বলল, আমার থেকে তোমার চোখের দৃষ্টি ভাল আছে। দেখ তো ৮৭ নম্বর বাড়ি কোনটা।

ভলজাঁ বলল, আমরা তো এসে গেছি।

ফশেলেভেস্ত বলল, আমার হাতেব গাঁইতি কোদালটা নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।

এরপর সে ৮৭ নম্বর বাড়িটার উপরতলায় চলে গিয়ে একটা রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করল।

গ্রিবার ভিতর থেকে তাকে যেতে বলল।

গ্রিবারের বাসাটা একটা ঘরের মধ্যে। ছোট ঘরখানা কফিনের মতোই অন্ধকার আর বুকচাপা! মেঝের উপর পাতা একটা মাদুর বিছানার কাজ করে। ঘরটার এককোণে একটা ছেঁড়া কার্পেটের উপর একটি রোগা মহিলা বসে আছে, তার চারপাশে একদল ছেলেমেয়ে। গোটা ঘরটা কে যেন ওলট-পালট করেছে। ঘরময় জিনিসপত্র সব ছড়ানো। মহিলাটি বসে বসে কাঁদছে। ছেলেগুলোও বোধ হয় মার খেয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কবরখননকারী গ্রিবার তার কার্ড না পেয়ে তার বাড়ির সবাইকে কার্ডটা হারানোর জন্য দায়ী করেছে। তার চোখ-মুখ দেখে বোঝা যায় সে হ[illegible] হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ফশেলেভেস্ত প্রথমে গ্রিবারকে কার্ড না দিয়ে কার্য সম্পাদনের খবর আগে দিতে চাইল। সে তার কোদাল গাঁইতিটা তাকে দিয়ে বলল, তোমার কাজ আমি করে দিয়েছি।

গ্রিবার আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি সব করে দিয়েছ?

ফশেলেভেস্ত বলল, গেটের দারোয়ানের কাছে তোমার কার্ড পাবে।

গ্রিবার বলল, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না আমি।

ব্যাপারটা খুবই সোজা। কার্ডটা হয়ত তোমার পকেট থেকে পড়ে যায়। তুমি চলে আসার পর আমি সেটা কুড়িয়ে পাই। তারপর আমি কবরের [illegible]তটা বুজিয়ে দিই। তোমার কাজ সব করে দিই। দারোয়ান তোমার কার্ড দিয়ে দেবে। তোমাকে আর পনের ফ্রাঁ দিতে হবে না।

গ্রিবার ফশেলেভেস্তের একটা হাত ধরে আনন্দের সঙ্গে বলল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ বন্ধু। এর পরের বার আমি মদের দাম দেব।

৮

এক ঘণ্টার পর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলে দু'জন লোক কসেত্তেকে নিয়ে পেতিত র‍্যু পিকপাসের ৬২ নম্বর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

র‍্যু দু শেমিন ভার্তের যে ফলের দোকানটায় গতকাল সন্ধ্যার সময় ফশেলেভেন্ত কসেত্তেকে নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছিল সেখান থেকে তারা নিয়ে এল তাকে। নিদারুণ এক ভীতিবিহ্বল অবস্থার মধ্য দিয়ে সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা কাটায় কসেত্তে। সে ভয়ে একবারও কাঁদেনি। কিছু খায়নি বা ঘুমোয়নি। ফলের দোকানের মালিক সেই মহিলাটি তাকে অনেক প্রশ্ন করে, তার কাছ থেকে অনেক কথা বার করবার চেষ্টা করে। কিন্তু কসেত্তে তার একটা কথারও জবাব দেয়নি। সে শুধু নীরবে তাকিয়ে থেকেছে তার পানে নিদারুণ দৃষ্টিতে। গত দু'দিনের মধ্যে সে যা দেখেছে বা শুনেছে সে তার কিছুই বলেনি। সে বুঝতে পেরেছে গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। তাই শান্ত হয়ে থাকার একটা প্রয়োজনীয়তার প্রতি গভীরভাবে সচেতন হয়ে উঠল সে। তাছাড়া তার কানে কানে একটা কথা বলে দেওয়া হয়েছিল, একটা কথাও বলবে না। চব্বিশ ঘণ্টা কাটাবার পর জাঁ ভলজাঁকে দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আকুল হয়ে এমনভাবে চিৎকার করে ওঠে কসেত্তে যাতে কেউ তাকে দেখলেই বুঝতে পারত তার মনের অবস্থা তখন কি ছিল।

এইভাবে দুটো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ভলজাঁকে কনভেন্ট থেকে বার করে আবার তার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। ফশেলেভেন্তের কথায় দারোয়ান দরজা খুলে দিল। ফশেলেভেন্ত আর ভলজাঁ কসেত্তেকে নিয়ে বাগানে ঢুকে বাগান পার হয়ে সেই বৈঠকখানা ঘরটায় ঢুকল যেখানে গতকাল ফশেলেভেন্ত কনভেন্টের প্রধানার সঙ্গে কথা বলেছিল।

প্রধানা তখন জপের মালা হাতে বসে ছিলেন সেই ঘরে। তাঁর পাশে একজন মাদার দাঁড়িয়ে ছিল। একটা বাতি জ্বলছিল ঘরের মধ্যে।

প্রধানা তাঁর নত চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ভলজাঁকে পরীক্ষা করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, তুমি ওর ভাই?

ফশেলেভেন্ত উত্তর দিল, হ্যাঁ শ্রদ্ধেয়া মাতা।

তোমার নাম কি?

এবারও ফশেলেভেন্তই উত্তর দিল, আলতিমে ফশেলেভেন্ত। এই নামে তার এক ভাই ছিল। সে মারা গেছে।

তোমার বাড়ি কোথায়?

ফশেলেভেন্ত উত্তর করল, অ্যামিয়েন্সের কাছে পিকিগনেতে।

তোমার বয়স কত?

পঞ্চাশ।

তোমার পেশা কি?

আমি মালীর কাজ করি।

তুমি কি একজন নিষ্ঠাবান খৃস্টান ?

আমাদের বাড়ির সবাই নিষ্ঠাবান খৃস্টান।

এই বাচ্চাটা তোমার ?

হ্যাঁ শ্রদ্ধেয়া মাতা।

তুমি তার বাবা ?

তার পিতামহ।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মাদার প্রধানাকে চুপি চুপি বলল, ও ভালই কথা বলে।

আসলে ভলজাঁ একটা কথাও বলেনি। তার হয়ে ফশেলেভেন্তই সব উত্তর দিয়েছে।

প্রধানা মনোযোগের সঙ্গে কসেত্তের দিকে তাকিয়ে বলল, মেয়েটাকে দেখে বেশ সাদামাটা মনে হচ্ছে।

প্রধানা আর মাদার দু'জনে কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা করল। তারপর প্রধানা ফশেলেভেন্তকে বলল, পীয়ের ফভেন্ত, এবার থেকে তোমাকে আর একটা ঘণ্টা বাঁধতে হবে।

পরদিন সকাল থেকে বাগানে দু'জন মালীর পায়ে দুটো ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। সে ঘণ্টার ধ্বনি শুনে সন্ন্যাসিনী ও সিস্টারেরা তাদের অবগুণ্ঠনের কিছুটা না তুলে পারত না। তারা ভলজাঁকে বাগানে গাছের তলায় ফশেলেভেন্তের পাশে কাজ করতে দেখে চুপি চুপি বলাবলি করত নিজেদের মধ্যে, একজন সহকারী মালী এসেছে। এ হচ্ছে পীয়ের ফভেন্তের ভাই।

জাঁ ভলজাঁর পাযেতে ঘণ্টা বাঁধা হলো। আলতিমে ফশেলেভেন্তও একজন কনভেন্টের লোক হয়ে গেল।

প্রধানা কসেত্তেকে দেখে সরল এবং সাদামাটা বলায় ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েটাকে তাঁর ভাল লেগে যায়। তিনি এক অনাথা ছাত্রী হিসাবে স্কুলে তার একটা স্থান করে দেন। 'সাদামাটা' কথাটার মধ্যে একটা তাৎপর্য ছিল। যেসব মেয়েরা সুন্দরী তারা কখনো ধার্মিক হতে চায় না। সৌন্দর্যের অহঙ্কার আর সন্ন্যাসিনীর কাজ পরস্পরবিরুদ্ধ ব্যাপার। তাই যারা দেখতে খুব সাদামাটা এই ধরনের ধর্মপ্রতিষ্ঠানে তাদের দাম বেশি।

এই ঘটনায় তিন দিক থেকে সাফল্য লাভ করল ফশেলেভেন্ত। সে জাঁ ভলজাঁকে উদ্ধার করে আশ্রয় দান করেছে; গ্রিবারকে জরিমানার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আর তারই সহায়তায় কনভেন্ট ধর্মের সেবায় সরকারী আইন ও শাসনকে অমান্য করতে পেরেছে। এখন পেতিত পিকপাসের বেদীর তলায় মৃতদেহভরা একটা কফিন আছে। আর ভগিয়ার্দের কবরখানায় একটা খালি কফিন পোঁতা আছে। তাতে হয়ত সরকার ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু ফশেলেভেন্তের প্রতি কনভেন্টের কৃতজ্ঞতা বেড়ে যায়। সে কনভেন্টের সবচেয়ে সেরা ভৃত্যরূপে পরিগণিত হয় এবং তার খাতির বেড়ে যায়। পরে আর্কবিশপ কনভেন্ট পরিদর্শন করতে এলে তাঁর কাছে তার কথা তোলা হয়। ফশেলেভেন্তের খ্যাতি রোমে পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। একদিন তৎকালীন পোপ

তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে বলেন, প্যারিসের এক কনভেন্টে ফঁভাঁ নামে চমৎকার এক মালী আছে। সে সাধু প্রকৃতির লোক।

৯

কনভেন্টে আসার পরেও মুখ খুলল না কসেত্তে। সে ভাবত সে জাঁ ভলজাঁর সন্তান। এর থেকে সে বেশি কিছু জানত না। তাই বলারও কিছু ছিল না তার। ক্রমাগত দুঃখভোগ তাকে ভীরু স্বভাবের করে তোলে। সে সব কিছুকেই ভয় করতে থাকে। এমন কি কথা বলতে এবং নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় করত তার। ভলজাঁর সঙ্গে থাকাকালে সে যে নিরাপত্তাবোধ লাভ করেছিল সে নিরাপত্তাবোধ স্থায়ী। কনভেন্টে আসার পর সে কনভেন্টের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় নিজেকে। তার শুধু একটা দুঃখ সে তার পুতুলটাকে আনতে পারেনি। কিন্তু সে কথা কাউকে বলেনি। শুধু ভলজাঁকে একবার বলেছিল, আমি যদি জানতাম এখানে আসব তাহলে ক্যাথারিনকে নিয়ে আসতাম আমার সঙ্গে।

ছাত্রী হিসাবে কসেত্তেকে স্কুলের পোশাক পরতে হত। যে সব পোশাক সে ছেড়ে দেয়, সেই সব কালো পোশাক, থেনার্দিয়েরদের দেওযা পোশাক, ভলজাঁ একটা ছোট বাক্স যোগাড় করে রেখে দেয তার মধ্যে। বাক্সটা সে তার বিছানার পাশে একটা চেয়ারের উপর রেখে দেয়। বাক্সের চাবিটা সে সব সময তার নিজের কাছে রেখে দেয়।

ফশেলেভেন্ত এই ঘটনায় তিন দিক থেকে লাভবান হয। সে যে ভাল ভাল কাজ করেছে তার পুরস্কার সে পায় তিন দিক থেকে। প্রথমত সে এ কাজ সুসম্পন্ন করতে পেরে মনের দিক থেকে তৃপ্তি পায। দ্বিতীয়ত এখন থেকে বাগানের কাজ তাকে কম করতে হয়। তৃতীয়ত সে তিনবার করে ধূমপান করতে পায এবং ভলজাঁই তার দাম দেয়। ভলজাঁকে ডাকার সময় সন্ন্যাসিনীরা আলতিমে কথাটা ব্যবহার করত না, বলত আর এক ফভেন্ত।

জেভার্তের মতো তীক্ষ্ণ ও সন্ধানী দৃষ্টি যদি সন্ন্যাসিনীদের থাকত তাহলে তারা একটা জিনিস লক্ষ্য করত, কনভেন্টের কোনও ফাইফরমাস খাটার সময় কোনও কাজে বাইরে যেতে হলে বা কোনও জিনিস বাইরে থেকে আনতে হলে ফশেলেভেন্তই যেত, ভলজাঁ কোনও সময় কোনও কারণেই বাইরে যেত না। যাদের মনপ্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত থাকে তারা বোধ হয় জাগতিক ছোট-বড় কোনও ব্যাপারে লক্ষ্য রাখে না। কোনও কিছু খেয়াল করে না।

এদিকে জাঁ ভলজাঁকে খোঁজার জন্য সারা জেলাটায় কড়া নজর রেখেছিল জেভার্ত। তাকে তন্ন তন্ন খুঁজে চলছিল। ভলজাঁ সেটা জানত বলেই সে ইচ্ছা করে নিজেকে আবদ্ধ রাখে কনভেন্টের মধ্যে। ভলজাঁর কাছে কনভেন্টটা ছিল যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্র দ্বারা পরিবৃত একটা ছোট দ্বীপ। এই দ্বীপে থেকে প্রাণভরে মাথার উপরে আকাশ দেখে আর কসেত্তেকে দেখে মনে যথেষ্ট শান্তি পায়। শান্তিপূর্ণ এক নতুন জীবন তার শুরু হলো এখানে।

ভলজাঁ ফশেলেভেন্তের সঙ্গে বাগানের এক প্রান্তে তিনটে ঘরওয়ালা রংচটা চুনখসা একটা ছোট একতলা বাড়িতে থাকত। সে না চাইলেও তিনটে ঘরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘরখানা তাকে দেওয়া হয়েছিল। ফশেলেভেন্তই জোর করে ঘরটা দেওয়া করায়। ঘরখানার মধ্যে আসবাবপত্র বলতে কিছুই ছিল না। শুধু দেওয়ালে গাঁথা দুটো পেরেকের উপর একটা ঝুড়ি আর একটা হাঁটু বাঁধার ফিতে ঝোলানো ছিল। এ ছাড়া ১৭৯৩ সালে রাজার নামে দশ লিভারের যে ব্যাঙ্কনোট বার হয় সেই নোট একটা দেওয়ালে গাঁথা ছিল। ফশেলেভেন্তের আগে কনভেন্টের বাগানে যে মালী কাজ করত সে-ই এই নোটটা রেখে দেয় এইভাবে।

মালীর কাজে বেশই পারদর্শিতা দেখাতে লাগল ভলজাঁ। প্রথম জীবনে সে গাছ কাটার কাজ করত, তাই মালীর কাজ করতে কোনও অসুবিধাই হলো না তার। এ দেশের সব গাছপালাই তার চেনা। এ বাগানে বিভিন্ন রকমের গাছ ছিল। সেই সব গাছ সময়মতো ছেঁটে ও তাদের যত্ন করে তাদের উন্নতি সাধন করল।

প্রতিদিন কসেত্তে এক ঘণ্টা করে ভলজাঁর কাছে থাকার অনুমতি পেয়েছিল। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে সে ছুটে আসত ভলজাঁর কাছে। ভলজাঁর সাহচর্য সবচেয়ে ভাল লাগত তার। আবার তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভলজাঁর মুখখানাও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। যে কোনও সুখের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, যে সুখ আমরা কোনওভাবে কাউকে দান করি সেই সুখ প্রতিফলনের মতো না কমে গিয়ে আমাদের কাছেই ফিরে আসে বর্ধিত আকারে। কসেত্তে যখন অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে খেলা করত তখন তাকে একটু দূর থেকে দেখত ভলজাঁ। তার হাসির শব্দ শুনে অন্যান্য মেয়েদের থেকে তাকে চিনে নিতে পারত সে।

কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে মুখে হাসি ফুটে ওঠে কসেত্তের। কসেত্তে যখন হাসত তখন তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। হাসির আলো মানুষের মুখ থেকে সব অন্ধকার দূর করে দেয়। কসেত্তেকে খুব একটা সুন্দরী না দেখালেও তার মুখটাকে হাসিখুশিতে উজ্জ্বল দেখাত। শিশুসুলভ মিষ্টি নরম গলায় অনেক কথা বলত সে। খেলার পর যখন তার নিজের ঘরে চলে যেত তখন ভলজাঁ তার ঘরের জানালাগুলোর পানে তাকিয়ে থাকত। রাত্রিতে মাঝে মাঝে উঠে সে কসেত্তের ঘরের জানালার পানে তাকাত।

কসেত্তেকে নিয়ে কনভেন্টে বাস করতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট পরিবর্তন আসে ভলজাঁর জীবনে। তবে একথাও ঠিক যে ধর্মের পথ অনেক সময় মানুষকে অহঙ্কাররূপ পাপের পথেও নিয়ে যায়। শয়তানই সেতুবন্ধন করে এই দুটো পথের মাঝখানে। ভলজাঁ যখন আপন মনে এই অহঙ্কাররূপ পাপের পথে এসেছিল তখনই পেতিত পিকপাসে এসে পড়ে সে। প্রথম প্রথম সে বিশপের সঙ্গে নিজের তুলনা করে অযোগ্য আর ছোট ভাবত নিজেকে। কিন্তু কালক্রমে আর পাঁচজনের সঙ্গে তুলনা করতে লাগল এবং গর্ববোধ করতে লাগল। সে যদি এই কনভেন্টে না আসত তাহলে গর্বের সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণা জাগত তার মনে।

কনভেন্টে আসার ফলে সে ঘৃণা আর জাগেনি। এটাও এক ধরনের কারাগার। কিন্তু জেল বা আসল কারাগারের মতো এ কারাগারের বিকৃত রূপ নেই, কয়েদীদের উপর আইনের তরফ থেকে অনুষ্ঠিত কোনও অপরাধের নামগন্ধ নেই এখানে। কারখানা থেকে কনভেন্ট। দুটো জীবনের সঙ্গে তুলনা করে দেখত সে।

জমিতে কাজ করার সময় মাঝে মাঝে চিন্তার অবরুদ্ধ স্রোতগুলোকে মুক্ত করে দিত সে। তার অতীতে কাটানো কারাজীবন আর সেখানকার সঙ্গীসাথীদের কথা ভাবত সে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি পরিমাণ পরিশ্রম তাকে করতে হত, কি পোশাক তাকে পরতে হত, কি নামে তাদের ডাকা হত সেই সব কথা মনে পড়ল একে একে। তাদের শুধু এক-একটা নম্বর ধরে ডাকা হত। তারা মদ খেতে পেত না। খুব বেশি পরিশ্রম করার সময়েই তাদের মাংস খেতে দেওয়া হত। তাদের চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা থাকত।

এখানে আসার পর থেকে ভলজাঁ কনভেন্টের সন্ন্যাসিনীদের দেখে তাদের কথা প্রায়ই ভাবত। তার মনে হত এটাও যেন একটা কারাগার। এখানে যে সব মেয়েরা থাকে তাদেরও চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। কয়েদীরা অপমানের বোঝাভারে মুখচোখ নামিয়ে থাকত, এরাও ধর্মজগতের নিষ্ঠুর অনুশাসনে নিপীড়িত। এদের কাঁধে ও গায়ে কোনও বেত্রাঘাতের চিহ্ন না থাকলেও কঠোর আত্মনিগ্রহের ছাপ তাদের চোখে-মুখে। তারাও ধর্মের খাতিরে তাদের নিজেদের নাম ত্যাগ করে অন্য নাম ধারণ করেছে। তারাও মদ-মাংস খায় না এবং প্রায়ই সারাদিন উপবাস করে সন্ধের সময় খায়। তারা পরে কালো পশমের পোশাক যা শীতের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয় এবং গ্রীষ্মকালে পীড়াদায়ক। তারা গ্রীষ্মকালে লিনেনের কোনও জামা বা শীতকালে পশমের পোশাক পরে না। আর ছ'মাস ধরে যে চুলের জামা পরতে হয় তাদের সে জামা পরে তাদের জ্বর আসে। তারা যে সব ঘরে বাস করে সেখানে কোনও আগুন জ্বলে না। তাদের শীতে কষ্ট পেতে হয়। তাদের শোবার কোনও তোষক নেই, খড়ের চাটাই বা মাদুরের উপর শুতে হয়। সারাদিনের খাটুনির পর তারা রাত্রিতে শান্তিতে ঘুমোতে পায় না। এক ঘুমের পরেই সব সন্ন্যাসিনীকে বিছানা থেকে উঠে শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রার্থনা করতে হয়। তার উপর এক সপ্তাহ অন্তর পালাক্রমে প্রত্যেক সন্ন্যাসিনীকে একবার করে প্রায়শ্চিত্ত ব্রত সাধন করতে হয়। এই সময় বারো ঘণ্টা ধরে একটানা বেদীর সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে যেতে হয়। আবার কখনো বা বুকের উপর হাত দুটো আড়াআড়ি করে রেখে উপুড় হয়ে সটান শুয়ে থাকতে হয়।

জেলখানার কয়েদীরা ছিল পুরুষ মানুষ, এরা হলো মহিলা। জেলখানার কয়েদীরা অপরাধী, চোর, ডাকাত, খুনী, প্রতারক, দুর্বৃত্ত। কিন্তু এই সব ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মেয়েরা কি অপরাধ করেছে? তারা তো কোনও অপরাধ করেনি!

একদিকে যত রকমের পাপ মানুষ তার জীবনে করতে পারে আর একদিকে যত রকমের পুণ্য, পবিত্রতা আর ধর্মের কাজ থাকতে পারে যে কাজ মর্ত্যলোককে পবিত্র

করে তুলে স্বর্গলোকের দিকে মানুষের মনকে নিয়ে যায়। একদিকে কৃত অপরাধের অস্বীকৃতি আর তা গোপন করার চেষ্টা আর একদিকে সব দোষ, সব অপরাধের অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি। একদিকে যত দুর্গন্ধ আর একদিকে পবিত্র সুগন্ধ। একদিকে নৈতিক অধঃপতনের মধ্য দিয়ে সেই আইনের বলি হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়ে কারাজীবন যাপন করা, আর একদিকে নির্জনবাসের মধ্যে থেকে আত্মার পরিশুদ্ধি সাধনের চেষ্টা করে যাওয়া। একদিকে নিবিড় অন্ধকার, আর একদিকে ছায়া। কিন্তু ছায়া হলেও সে ছায়ার মধ্যে আলো আছে, সে আলোর মধ্যে আছে আবার সূর্যকিরণের উজ্জ্বলতা।

দুটোই দাসত্বের জায়গা। একটাতে অবশ্য দাসত্বের শেষ আছে, মেয়াদ ফুরলেই মুক্তি। কিন্তু অন্য স্থানটিতে আছে শুধু যাবজ্জীবন দাসত্বের অক্ষয় বন্ধন। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসিনীদের মুক্তির একমাত্র আশা হলো মৃত্যু। জেলখানার কয়েদীরা ধাতব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে আর কনভেন্টের কয়েদীরা আবদ্ধ থাকে ধর্মবিশ্বাসের শৃঙ্খলে।

এই দুটি জায়গায় থেকে পরিণামে কি পায় তারা? একদিকে অর্থাৎ জেলখানায় কয়েদীরা লাভ করে শুধু অন্তহীন নিবিড় হতাশা আর সমগ্র মানবজাতির প্রতি অদম্য এক ঘৃণা আর ক্রোধ আর ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা আর বিদ্রূপ। অন্যদিকে এই ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসিনীরা লাভ করে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আর প্রেম। দুটো দু'রকমের জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ একই উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে। সে উদ্দেশ্য হলো প্রায়শ্চিত্ত এবং আত্মার মুক্তি।

জেলখানার কয়েদীদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারটা ভলর্জা বোঝে। ব্যক্তিগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু এখানে সন্ন্যাসিনীরা কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে? কোনও দোষ বা পাপ তো করেনি তারা। তবে কিসের প্রায়শ্চিত্ত? এ প্রশ্নের উত্তরে তার বিবেক উত্তর করল, ধর্মপ্রাণ মানুষেরা যত সব পাপী-তাপীদের পাপস্খালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে যায় সারা জীবন।

এতক্ষণ ধরে ভলর্জার মনে যে সব চিন্তা-ভাবনার ঢেউ খেলে যাচ্ছিল সেই সব চিন্তাগুলোকেই প্রকাশ করলাম আমরা। ভলর্জা এখানে এসে দেখেছে মানুষ কিভাবে চরম দুঃখভোগ ও আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে পুণ্যের সর্বাধিক শিখরে উঠে যেতে পারে, কিভাবে মানুষ মানুষের সব অপরাধ ক্ষমা করে সে অপরাধ স্খালনের জন্য, সে পাপ থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য নিজে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে পারে। নিজে কোনও পাপ না করেও মানুষ কি করে পাপীদের সব শাস্তির বোঝা নিজে বহন করে চলে তা সে নিজে দেখেছে.

এই সবকিছু এখন ভাবে ভলর্জাঁ। প্রায় দিনই রাত্রিতে ঘুম ভেঙে যায় তার। কত বাধা অতিক্রম করে, কত শাস্তি কত কষ্ট ভোগ করে অবশেষে সে এখানে এল সেকথাও ভাবে সে। তার মনে হলো এক কারাগার থেকে আর এক কারাগারে এসে পড়েছে সে। কিন্তু সে কারাগারের দেওয়ালগুলো কতকগুলো হিংস্র সিংহকে ঘিরে রেখেছে আর এখানে সে দেওয়ালগুলোর মাঝে ভরা আছে কতকগুলো শান্ত

মেষশাবক। এটা হলো প্রায়শ্চিত্তের এক পবিত্র স্থান, শাস্তি বা দণ্ডভোগের স্থান নয়। তবু তার মনে হলো এ স্থান, এ কারাগার আগের কারাগারের থেকে আরও নির্মম, আরও ভয়ঙ্কর। শীতের যে হিমশীতল বাতাস তার যৌবনের রক্তকে জমিয়ে দিয়েছে, যে বাতাস শকুনিদের বাসাগুলোর মধ্য দিয়ে বয়ে যায়, সেই বাতাস এখানে এসে যেন আরও তীক্ষ্ণ আরও কনকনে আর দুঃসহ হয়ে ওঠে।

কিন্তু কেন?

সে যখন এই সব কথা ভাবে তখন তার সমগ্র সত্তা ঈশ্বরের রহস্যময় বিধানের কাছে এক নিবিড় আত্মসমর্পণে ঢলে পড়ে। তার সব অহঙ্কার নিঃশেষে উধাও হয়ে যায়। তার নিজের দুর্বলতার কথা সে বুঝতে পারে। সে শিশুর মতো কাঁদতে থাকে। দু' মাস ধরে সে যত কষ্টই ভোগ করুক আজ সে ভালবাসার মধ্য দিয়ে কসেত্তেকে কাছে পেয়েছে, আর তার বিনয় ও নম্রতার দ্বারা কনভেন্টের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে।

কোনও কোনওদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গীর্জার বাইরে পথের উপর একটা জানালার তলায় নতজানু হয়ে সে প্রার্থনা করতে থাকে। গির্জার ভিতর ঐ জানালার বেদীর সামনে নতজানু হয়ে বসে এক সিস্টার প্রায়শ্চিত্ত ব্রত সাধন করতে থাকে আর ও যেন সিস্টারের কাছেই নতজানু হয়ে তার নির্দেশে প্রার্থনা করতে থাকে। সরাসরি ঈশ্বরের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করার সাহস যেন তার নেই।

এখন তার চারদিকে আছে শুধু বাগানের স্তব্ধ প্রশান্তি, ফুলের সুগন্ধ, শিশুদের আনন্দোচ্ছল হাসি, সন্ন্যাসিনীদের নিষ্পাপ গাম্ভীর্য আর সরলতা। এই সব জিনিসগুলো ধীরে ধীরে তার আত্মার গভীরে প্রবেশ করে তার জীবনের মধ্যেও এনে দিয়েছে যেন এক অনির্বচনীয় সুখ, সরলতা, আর স্তব্ধ নীরব এক গাম্ভীর্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। ভলজাঁর মনে হলো দুটো কারাগারই যেন ঈশ্বরের দুটো বাড়ি। তার জীবনের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে এই দুটো বাড়ি স্থান দেয় তাকে।

একবার সমস্ত সমাজ যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে, ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে দূরে ঠেলে দেয় তখন ঈশ্বরের বাড়িস্বরূপ একটি কারাগারই স্থান দেয় তাকে। আবার বর্তমানে যখন সমস্ত সমাজ শত্রু হয়ে উঠেছে তার, তখনও এই কারাগারের দ্বারগুলি উন্মুক্ত হয়েছে তার জন্য। প্রথম কারাগারে যদি সে তখন প্রবেশ না করত তাহলে সে একের পর এক করে অপরাধমূলক কাজ করে যেত। আবার এখন যদি এ কারাগারে সে প্রবেশ না করত তাহলে আরও অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করে যেতে হত তাকে।

এই সব ভাবতে গিয়ে তার সমস্ত অন্তর এক অপরিসীম কৃতজ্ঞতা আর এক মধুর ঈশ্বরপ্রেমে বিগলিত হয়ে উঠত।

এইভাবে বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল এবং শৈশব পার হয়ে বাল্যজীবনে প্রবেশ করল কসেত্তে।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

প্যারিসের রাস্তায় একটা দুষ্ট ছেলেকে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সব সময়ই তাকে প্রাণচঞ্চল দেখায়। তার মধ্যে আছে জ্বলন্ত চুল্লীর উত্তাপ আর নতুন প্রভাতের আলোর উজ্জ্বলতা।

ছোট্ট এক সুখী মানুষ। রোজ তার খাওয়া হয় না। কিন্তু রোজ সন্ধ্যায় সে খেলতে যায়। তার গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, মাথার উপর ছাদ বা কোনও আচ্ছাদন নেই। মাছির মতো সে যেন শুধু উড়ে বেড়ায়। তার বয়স হবে সাত থেকে তেরর মধ্যে। সব সময় দল বেঁধে থাকার চেষ্টা করে, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ফাঁকা জায়গায় শোয়, তার বাবার একজোড়া পুরনো পায়জামা পরে। সেই ঢিলে পায়জামাটা তার গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসে। তার মাথার টুপিটাও অন্য একটা বুড়ো লোকের কাছ থেকে পাওয়া এবং সেটা কানের উপর ঝুলে পড়ে। সে প্রায়ই খুব হৈ-চৈ করে বেড়ায়, চারদিকে চোখ চেয়ে থাকায়, সব জায়গায় যায়, প্রচুর সময় নষ্ট করে বাজে কাজে, কাফেগুলোর আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করে, শহরের প্রতিটি চোরকে চেনে এবং বাজে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, নোংরা গান গায়। তবু তার মনের ভিতরে খারাপ কিছু নেই। তার অন্তরের মধ্যে আছে এক সরল নির্দোষিতার মুক্তো। মুক্তো কখনো জলে-কাদায় গলে যায় না। মানুষ যতদিন শিশু থাকে, ঈশ্বর তাকে নির্দোষ নিষ্পাপ রাখেন।

প্যারিস শহরটাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কে এই ছোট্ট মানুষটা, কে এই বকাটে ছেলেটা ? তাহলে শহরটা উত্তর দেবে, ও হচ্ছে আমার ছেলে।

২

এই দুষ্ট বকাটে ছেলেটা হলো এক দানবীর গর্ভে জাত এক ক্ষুদ্রকায় বামন।

ছেলেটার কপালে মাঝে মাঝে এক-আধটা জামা জোটে! কিন্তু সে জামার মোট সংখ্যা একটাই। কখনো বা সে হয়ত একজোড়া বুট জুতো পেয়ে যায়, কিন্তু সে জুতোর তলায় চামড়া থাকে না। তার হয়ত একটা বাসা আছে। সে বাড়ির দিকে তেমন মন নেই তার। সে বাড়ির দরজার উপর তার মা তার পথপানে চেয়ে বসে থাকে বলেই সে মাঝে মাঝে বাড়ি যায়। কিন্তু পথটাই সে বেশি পছন্দ করে, কারণ সেখানেই সে বেশি স্বাধীনতা পায়। তার কতকগুলো নিজস্ব খেলাধূলা আছে। বুর্জোয়াদের ঘৃণাই তার একমাত্র শত্রু। তার কতকগুলো নিজস্ব কাজ আছে। সে পরের জন্য গাড়ি ভাড়া করে দেয়। সে বৃষ্টিতে কাদার মধ্য দিয়ে হেঁটে যায়। জনসাধারণের সুবিধার জন্য সে সরকারী ঘোষিত আইন-কানুনগুলো ঘোষণা করে। ফুটপাথের উপর

গজিয়ে ওঠা আগাছাগুলো তুলে ফেলে পথ পরিষ্কার করে। বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা লোহার টুকরোগুলো কুড়িয়ে এনে বিক্রি করে যে পয়সা পায় সেটাই তার একমাত্র আয়।

প্যারিসের বিভিন্ন জায়গায় পোকামাকড় ধরে সে আমোদ পায়। আরশোলা, বিছে, ব্যাঙ, প্রভৃতি কত সব পোকামাকড়। এক একসময় হঠাৎ তামাশা করে মানুষকে তাক লাগিয়ে দেবার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা ছিল ছেলেটার। হঠাৎ হাসি-পরিহাসের তুফান তুলে চমকে দিত সে আশপাশের দোকানদারদের। এদিক দিয়ে তালিবাঁদের মতোই তার প্রতিভা ছিল।

রাস্তা দিয়ে যখন কোনও শবযাত্রা যেত তখন সেই দুষ্ট ছেলেটা অমনি শববাহকদের লক্ষ্য করে বলে উঠত, কি হে, ডাক্তার, সমাধিভূমিতে কখন কি কাজ করবে?

এমন সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা চশমাপরা কোনও ভদ্রলোক হয়ত সেই দুষ্ট ছেলেটার দিকে ঘুরে প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে বলে ওঠে, পাজী বদমাস কোথাকার! তুই আমার স্ত্রীকে চিমটি কেটেছিস।

আমি মঁসিয়ে! দেখুন, এই তো আমি রয়েছি।

৩

যেদিন কিছু পয়সা পায় ছেলেটা সেদিন সন্ধ্যায় সে থিয়েটার দেখতে যায় এবং থিয়েটারের হলের মাঝে পা দিয়েই সে যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। শুককীটের কাছে যেমন প্রজাপতি তেমনি তার কাছে থিয়েটার। থিয়েটার হলটা যেন আমোদ-প্রমোদে ভর্তি একটা জাহাজ। সে সেখানে গেলেই আনন্দের জোয়ার এসে যায় তার জীবনে। আনন্দের আবেগে সে বারবার হাততালি দেয়, যেন কোনও পাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে। থিয়েটার তার কাছে স্বর্গ হয়ে ওঠে।

শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তার যে কোনও আগ্রহ থাকে না তা নয়। কিন্তু চিরায়ত শিল্প-সাহিত্যের দিকে তার কোনও ঝোঁক থাকে না। তার কোনও উন্নত রুচিবোধ থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ম্যাদময়জেল মাবস্ নামে কোনও অভিনেত্রীর নাম করলে সে তাকে ম্যাদময়সেল হিউশ বলে ডাকে।

কখনো আনন্দে ফেটে পড়ে সে, কখনো উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে, হৈ-হুল্লোড় করে হাততালি দেয়, ঝগড়া করে, সবজান্তা হয়ে ওঠে, ছেলের পোশাক পরে এক ক্ষুদে দার্শনিক হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে সে হয়ে ওঠে এক স্পার্টান আর পকেটমার। জ্ঞানে পাগল, গানে গল্পে আনন্দে উচ্ছল হয়ে সে কাদা মেখে অলিম্পাসে ঘুরে বেড়ায় যেন।

প্যারিসের রাস্তার যত সব বকাটে ছেলেরা সবাই যেন ছোটখাটো এক একটা রাবায়েত। তারা অল্পতেই বিস্মিত হয়, কিন্তু সে বিস্ময় রেখাপাত করে না তাদের মনে। তারা কুসংস্কারকে ঘৃণা করে, যে কোনও আতিশয্য বা অতিশয়োক্তিতে তাদের কোনও উৎসাহ নেই, কোনও অতিপ্রাকৃত বা রহস্যময় কোনও বস্তু বা ঘটনাতে

তাদের বিশ্বাস নেই। মহাকাব্যসুলভ কোনও ভাবসমুন্নতিকে তারা উপহাস করে উড়িয়ে দেয়। কাব্য বা মহাকাব্য যে একেবারে মানে না তা নয়। কিন্তু কাব্যের রস সম্বন্ধে তাদের বোধ থাকলেও তাদের অসম্মানজনক উক্তির দ্বারা যে কোনও কাব্যরসকে বিকৃত করে দেয় তারা। কোনও দৈত্যদানবের অভিনয় দেখে তারা মন্তব্য করে, 'সার্কাসের একটা ভাঁড়'।

৪

প্যারিস শহরে একই সঙ্গে কোনও পথচারী ভদ্রলোক আর রাস্তার বকাটে ছেলে দেখা যায় না। একই সঙ্গে সম্ভ্রমশীল ভদ্রতা আর নগ্ন বিশৃঙ্খলা কোনও শহরে দেখা যায় না পাশাপাশি। ভদ্র পথচারী যেমন রাজতন্ত্রের ধারক ও বাহক, তেমনি ভবঘুরে বকাটে ছেলেগুলো অরাজকতার প্রতীক।

প্যারিস শহরের এই সব রাস্তার ছেলেরা রাজপথের আনাচে-কানাচে আব অলিগলিতে জন্মায় আর বেড়ে ওঠে। সমাজজীবনের যত সব কঠোর বাস্তবতা আর দুঃখকষ্টেব মধ্যে তারা মানুষ হয়। তাকে দেখে মনে হয় সে কিছু জানে না বা বোঝে না। কিন্তু আসলে তা নয়। সে যেমন হাসতে পারে তেমনি আবার আরও অনেক কিছু করতে পারে। যারা অন্যায়, অবিচার, স্বৈরাচার প্রভৃতির প্রতীক তাদের বোঝা উচিত ঐ সব ছেলেরা বেড়ে উঠছে, তারা এই সবকিছু দেখছে।

সমাজের যে কদর্য মাটি থেকে এই সব পথসন্তানের জন্ম সেই মাটি থেকেই আদিমতম মানবসন্তান আদমেরও জন্ম। নির্মম নিয়তি তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তারা ক্ষুদ্রকায় আর নিরহঙ্কার, অমার্জিত, অসভ্য; কিন্তু পরিণত বয়সে কি হবে তারা? তাদের জীবনের পরিণতি কি? প্যারিসের যে আত্মা একই সঙ্গে ঐ সব ছেলেদের আর দেশের ভাগ্যবিধাতাদের সষ্টি করে, সেই আত্মা তাদের জীবনটাকে কিভাবে গডবে? কুমোরের চাকার মতো সৃষ্টির সেই নিষ্ঠুর চাকা কোন পথে ঘোরাবে?

৫

রাস্তার ঐ সব বকাটে বেয়ো বাউণ্ডুলে ছেলেরা জনবহুল শহরের পথঘাট যেমন ভালবাসে তেমনি ভালবাসে নির্জনতা। তারা একাধারে ফামকাসের মতো নগরপ্রেমিক, আবার ক্লাকাসের মতো পল্লীপ্রেমিক।

প্যারিস শহরের প্রান্তে মফস্বল অঞ্চলে কেউ যদি দার্শনিকের মতো ঘুরে বেড়ায় তাহলে একই সঙ্গে গ্রাম আর নগরের শোভা দেখে বিমোহিত হয়ে যাবে সে। এই মফস্বল অঞ্চল আপাত দৃষ্টিতে দেখতে শংসিত হলেও তার একটা নিজস্ব শোভা আছে। সেখানে দেখা যাবে লম্বা লম্বা গাছগুলোর জায়গায় কিভাবে সেখানে গড়ে উঠেছে বড় বড় বাড়ি। পথের দু'ধারে সবুজ ঘাসের উপর নির্মিত হয়েছে শানবাঁধানো ফুটপাথ, চষা জমিগুলোর উপর গড়ে উঠেছে কত সব বড় বড় রাজপথ আর দোকানঘর। এই সব দেখে শুনে চিন্তাশীল মানুষরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ভাবতে থাকে অনেক কিছু। গ্রাম্য প্রকৃতির এই রূপান্তর দেখে তারা বিষণ্ন না হয়ে পারে না।

এই কাহিনীর লেখকও একদিন এই সব অঞ্চলে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছেন।

আমাদের মতো যারা প্যারিস শহরের উপকণ্ঠে মফস্বল অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত নির্জন পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়েছে তারা নিশ্চয় কোনও পরিত্যক্ত জনহীন জায়গায় ছেঁড়া ময়লা পোশাকপরা নোংরা একদল ছেলেকে জটলা পাকিয়ে থাকতে দেখেছে। তারা হলো যত সব গরীব ঘরের পালিয়ে আসা ছেলে। যে সব নোংরা জায়গায় কেউ থাকে না সেই সব জায়গাই তাদের বাসস্থান। তারা চিরদিনের ভবঘুরে। তারা কোনও বিধিনিষেধের ধার ধারে না কখনো, মুখে তাদের যত সব নোংরা গান লেগেই আছে। তারা কোনওদিন স্নান করে না, নোংরা গা-হাত পরিষ্কার করে না। শুধু ঝোপে ঝাড়ে বনফুল তুলে বেড়ায়। এখানে-সেখানে মার্বেলের গুলি খেলে। একটা পয়সা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, ঝগড়া করে। তারা সমাজে অবজ্ঞাত অবহেলিত, তবু তারা সুখী। প্যারিস শহরের উপান্তবাসী এই সব গরীব হতভাগ্য ছেলেদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে একই সঙ্গে মন আনন্দে উৎফুল্ল হয় এবং দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

মাঝে মাঝে ঐ সব ছেলেদের দলের মধ্যে দু' চারটে মেয়েকেও দেখা যায়। এই সব মেয়েরা হয়ত ঐ সব ছেলেদেরই বোন। ঐ সব মেয়েদের মধ্যে দু' একটা বেশ বড় মেয়েও আছে। তাদের চেহারাগুলো রোগা, রোদেপোড়া তামাটে রং, মাথায় ঘাস বা লতাপাতার টুপি, খালি পা। প্রায়ই দেখা যায় তারা ঘাসেঢাকা বনপথে দাঁড়িয়ে চেরিফল খাচ্ছে। সন্ধের সময় তাদের হাসির শব্দ শোনা যায়। দুপুরের রোদে বা রাত্রির অন্ধকারে যখনি তারা কোনও পথিকের চোখে পড়ে তখনি তাদের কথা না ভেবে পারে না সে পথিক। সে পথিকের মনে অনেকদিন বেঁচে থাকে তারা।

ঐ সব ছেলেমেয়েদের কাছে প্যারিস শহরই হলো সারা জগতের কেন্দ্রস্থল। এই শহরের চারপাশই হলো সে জগতের পরিধি। মাছ যেমন জল ছেড়ে কোথাও যায় না তেমনি তারা এই প্যারিস শহর ছেড়ে কোথাও যায় না। তাদের মতে এই শহরের সীমানার বাইরে আর কোনও জগতের অস্তিত্ব নেই।

৬

এই কাহিনী যখন লেখা হয় তখন প্যারিসে ভবঘুরে ছেলেদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তখন প্রতি বছর ২৬০ জন করে নিরাশ্রয় ছেলেকে ধরা হত। যে সব নতুন বাড়ি নির্মাণ হত সেই সব জায়গায় অথবা কোনও পুলের তলায় তারা থাকত। যে কোনও অপরাধ ও কুকর্ম এদের থেকেই শুরু হয়।

তবু অন্যান্য শহরের বকাটে ছেলেদের থেকে প্যারিসের গৃহহারা বকাটে ছেলেদের একটা পার্থক্য ছিল। তারা অপরাধ এবং কুকর্ম করে বেড়ালেও তাদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন নীতিবোধ ছিল। তারা ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরে থাকলেও তাদের মধ্যে একটা আশ্চর্য সততা ছিল। যে কোনও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে তারা অংশগ্রহণ করত। সমুদ্রের জলে যেমন লবণ গলে থাকে তেমনি প্যারিসের দুর্নীতিমূলক বিষাক্ত আবহাওয়ার ভিতরেও একটা বিকৃত নীতিবোধ মিশে থাকত সব সময়।

তথাপি এই ধরনের কোনও বকাটে ছেলেকে পথে দেখলেই তাদের মধ্যে একটা ভগ্ন দুঃখী পরিবারের কথা মনে পড়ে যায়। আমাদের যে সভ্যতা আজও পরিণতি লাভ করতে পারেনি, সে সভ্যতায় এই ধরনের ছিন্নভিন্ন পরিবারের ঘটনা এমন কিছু আশ্চর্য নয় যে সব পরিবার থেকে তাদের ছেলেরা ছিটকে বেরিয়ে এসে পথে আশ্রয় নেয়। এক জটিল দুর্ভাগ্য তাদের যেন প্যারিসের পথের উপর আছাড় মেরে ফেলে দেয়। রাজতন্ত্রের যুগে এই সব পরিত্যক্ত ছেলেদের সহজভাবে এক স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়া হত। মিশর থেকে আসা ভবঘুরেদের নিয়ে অনেকে বই লিখত। তাদের লেখাপড়া শেখার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সবাই বলত অল্প লেখাপড়া শেখার থেকে না শেখা ভাল।

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই-এর আমলে এই সব ভবঘুরে ছেলেদের নৌকোর দাঁড় টানার জন্য দরকার হত। অনুকূল বাতাসের উপর নির্ভরশীল জাহাজগুলো যখন সমুদ্রের উপর নোঙর করে থাকত তখন সেই সব জাহাজে যাওয়া-আসা করার জন্য দাঁড়-টানা কতকগুলো নৌকোকে উপকূলের সঙ্গে জাহাজগুলোর যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হত। রাস্তায় পনের বছরের উর্ধ্বে কোনও ভবঘুরে ছেলে দেখলেই তাকে নৌকোর দাঁড় টানার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। জেলখানার কয়েদীদেরও অনেক সময় এ কাজে নিযুক্ত করা হত। নাবিক দাস।

কিন্তু রাজা পঞ্চদশ লুই-এর আমলে পুলিশ এই সব ছেলেদের পথে দেখলেই ধরে নিয়ে যেত। তার কারণ জানা যায়নি। তবে অনেক পরিবারের পিতামাতারা এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য চাপ দিত। কোনও ছেলের বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে পথে আশ্রয় নেওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

৭

প্যারিসের ভবঘুরে ছেলেদের দলে সবাই যোগদান করতে পারে না। তাদের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। ফরাসী ভাষায় তাদের গার্মি বলত।

এই ভবঘুরে ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন আবার এক একটা কাজের জন্য তাদের দলের ছেলেদের শ্রদ্ধা পায়। একবার একটা ভবঘুরে ছেলে নোতার দ্যাম গীর্জার উপর একজনকে পড়ে যেতে দেখে। তাদের মধ্যে আবার একজন বীর একটা সেবা প্রতিষ্ঠানের পিছনের দিকে কতকগুলো পাথরের প্রতিমূর্তি থেকে অনেকটা সীসে নিয়ে যায় চুরি করে। আর একজন একবার একটা ঘোড়ার গাড়িকে উল্টে যেতে দেখে। আর একজন এক সময় এক সৈনিককে একটা লোকের চোখে ঘুষি মারতে দেখে। যে গীর্জার উপর থেকে একটা লোককে পড়তে দেখে সে নিজের মনে বলতে থাকে, আমার কী দুর্ভাগ্য যে আমি পাঁচতলা থেকে একটা লোককে পড়তে দেখি।

কারো স্ত্রী যদি অসুখে মৃতপ্রায় হয়ে ওঠে তাহলে গাঁয়ের চাষীরা তাকে বলত, অসুখ হয়েছে তো ডাক্তার ডাকার দরকার কি মঁসিয়ে? গরীবরা নিজেদের অসুখে নিজেরাই ডাক্তার। একদিন এক ভবঘুরে ছেলে একটা ফাঁসির আসামীকে বধ্যভূমিতে

যাবার পথে একজন যাজকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে যাজকের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছিল, নোংরা লোকটা যেন এক বিমানচালকের সঙ্গে কথা বলছে।

এই সব ছেলেরা গিলোটিন দেখেও নানারকম অপ্রিয় মন্তব্য করে থাকে। শুধু পথে পথে বেড়ায় না, কখনো তারা কোনও পাঁচিলে বা বাড়ির ছাদে ওঠে পাইপ বেয়ে। কখনো গাছে চড়ে। গাছ এবং চিমনির মাথাগুলো তাদের কাছে জাহাজের নাবিকদের কাছে যেমন মাস্তুল। কখনো কখনো আবার বধ্যভূমিতে গিয়ে ফাঁসির কাঠ ধরে ঝোলে।

এক এক সময় তাদের কলাকৌশল দেখে তাদের প্রশংসা না করে পারা যায় না। একবার জঁভা নামে একজন দণ্ডিত আসামীকে সাহসের সঙ্গে গিলোটিনে ফাঁসি বরণ করতে দেখে একটা ভবঘুরে ছেলে বলে, ওকে দেখে হিংসা হচ্ছে। কারণ গিলোটিনে যারা ফাঁসি যায় তাদের কথা সবাই মনে রাখে যুগ যুগ ধরে।

তাদের মধ্যে কেউ কোনও দুর্ঘটনায় পড়লে অন্য সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাকে। তারা বলে, ওর এমন কেটে গেছে যে হাড় পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে। যে যত আহত হয় সে তত বেশি শ্রদ্ধা পায়। কারো স্বাস্থ্য বলিষ্ঠ হলে সে ঘুষি পাকিয়ে বড়াই করে বলে, আমি খুব শক্তিমান। তাদের মধ্যে কেউ যদি নেটা হয় অর্থাৎ বাঁ হাতে সব কাজ করে অথবা কেউ যদি টেরা হয় তাহলেও সে বেশি শ্রদ্ধা পায় আর পাঁচজনের কাছ থেকে। সবাই তাকে ঈর্ষা করে।

৮

গ্রীষ্মকালে তারা ব্যাঙের মতো হয়ে যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা কয়লা বোঝাই জাহাজ অথবা ধোবানীদের নৌকো থেকে সেন নদীর জলে ঝাঁপ দেয়। এমনি করে নির্লজ্জভাবে তারা তাদের শালীনতাবোধ বিসর্জন দিয়ে পুলিশ আইন ভঙ্গ করে। কিন্তু পুলিশ তাদের ধরে না। অনেক সময় তাদের এই কাজের ফলে এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হয় রাজপথে। অনেকে তাদের তাড়া করে।

কখনো কখনো দেখা যায় কোনও কোনও ভবঘুরে ছেলে লিখতে-পড়তে পারে। কেউ কেউ আবার ছবি আঁকতে পারে। একজন অন্যজনকে শেখায়। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে ভবঘুরে ছেলেরা তুর্কীদের ডাক নকল করে এবং ১৮৪৫ সালের মধ্যে তারা ছবি আঁকতে শেখে।

কোনও এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় রাজা লুই ফিলিপ যখন পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন তখন তিনি পথের ধারে দেখেন একটি বেঁটে-খাটো ভবঘুরে ছেলে একটা স্তম্ভের উপর এক সামন্তের মূর্তি আঁকছিল। রাজা লুই ফিলিপ তাঁর পিতার মতোই অমায়িক এবং মধুর স্বভাব ছিলেন। তিনি ছেলেটাকে তুলে ধরে ছবিটাকে শেষ করার সুযোগ করে দেন। তারপর আঁকার কাজ হয়ে গেলে তাকে একটা মুদ্রা পুরস্কারস্বরূপ দান করেন।

ভবঘুরে ছেলেরা যেকোনও বিশৃঙ্খলা আর গোলমাল ভালবাসে। যাজকদের তারা ঘৃণা করে। একবার ৬৯ নম্বর একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একটা ভবঘুরে ছেলে বিদ্রূপাত্মক অঙ্গভঙ্গি করে। যখন তাকে বলা হয় এ কাজ কেন সে করল তখন সে উত্তর করেছিল ওখানে ছোট গীর্জার এক যাজক থাকে। কিন্তু ভলতেয়ারের মতো ভবঘুরে ছেলেদের ধর্মে বিশ্বাস না থাকলেও তাদের কাউকে যদি 'কয়ের বয়' বা প্রার্থনার স্তোত্রগানের কাজ দেওয়া হত তাহলে সে কাজ সে সুষ্ঠুভাবে করত। ভবঘুরে ছেলেদের জীবনে দুটো উচ্চাভিলাষ কখনো পূরণ হয় না। তাদের একটা উচ্চাভিলাষ হলো সরকারের পতন ঘটানো আর একটা উচ্চাভিলাষ হলো তাদের ছেঁড়া পায়জামায় তালি লাগানো।

প্রতিটি ভবঘুরে ছেলেই প্যারিসের সব পুলিশকে চেনে। তাদের সবার নামও জানে। পুলিশদের জীবনের সব কথা তারা জানে। তাদের স্মৃতিগুলিকে ভবঘুরে ছেলেরা গেঁথে রাখে মনের মধ্যে। কোনও পুলিশ সম্বন্ধে কোনও ভবঘুরে ছেলেকে যদি কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে সে অকুণ্ঠভাবে বলবে, ঐ পুলিশটা হলো একটা ভণ্ড, প্রতারক,...ঐ পুলিশটা হলো একটা নোংরা শুয়োর...ঐ পুলিশটাকে দেখলে হাসি পায়।

৯

সার্কাসের ক্লাউন ভাঁড় পোকেলিনের মধ্যে ভবঘুরে ছেলেদের একটা ভাব দেখা যায়। পোকেলিনের জন্ম হয় লে হ্যানেতে। বোমারসাই-এর মধ্যেও এই ভাব দেখা যায়।

ভবঘুরেরা সাধারণত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, পরিহাসরসিক এবং দুর্বিনীত। তাদের দাঁতগুলো খারাপ, কারণ তারা কম খায়। তাদের চোখগুলো সুন্দর, কারণ তাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। জেহোভা যদি একবার হাতছানি দিয়ে ডাকে তাহলে তারা স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবে। তারা হাত-পা দিয়ে লড়াই করে। তারা যে কোনও দিকে যে কোনও কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে। তাবা কখনো রাস্তার ধারে খালে খেলা করে, আবার কখনো বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাদের ঔদ্ধত্য বা বিদ্রোহী ভাব বন্দুকের গুলির ভয় করে না। তারা খেলা করতে করতেই বীর হয়ে উঠতে পারে। খেলার ছলেই বীরত্ব দেখায়। থীবস্-এর ছেলেদের মতো সিংহের লেজ ধরে টানাটানি করে। জয়ঢাকের বাজনা শুনেই 'আহা' বলে চিৎকার করতে থাকে। মুহূর্তমধ্যে তারা সাধারণ ছেলে থেকে দৈত্য-দানবে পরিণত হয়।

এককথায় তারা অসুখী বলেই আমোদ প্রমোদের দিকে বেশি নজর দেয়।

১০

প্যারিসের বর্তমান ভবঘুরে ছেলেরা রোমের অধীনস্থ গ্রীক ছেলেদের মতো। তাদের ললাটে আছে প্রাচীন জগতের ছাপ। তারা একদিকে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক,

আবার একদিকে এক দুরারোগ্য ব্যাধি যে ব্যাধি অবশ্যই সারিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু কেমন করে? আলোর দ্বারা। যে আলো সমগ্রতা দান করে, যে আলো মনের অন্ধকার দূর করে, মনকে আলোকিত করে।

সমস্ত ফলপ্রসূ সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি জ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি থেকে জন্মলাভ করে। শিক্ষা আর প্রকৃত জ্ঞানের আলোই পূর্ণতা দান করে। আজ হোক কাল হোক, ব্যাপক লোকশিক্ষাই পূর্ণ সত্য প্রতিষ্ঠা করবে সারা দেশে। আজ যারা দেশের শাসনকর্তা তাদের ঠিক করতে হবে, প্যারিসের ছেলেরা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবে না পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। আজকের এই ভবঘুরে ছেলেরাই প্যারিসের ভবিষ্যৎ, আর প্যারিস হচ্ছে সারা দুনিয়ার ভবিষ্যৎ।

প্যারিস হচ্ছে মানবজাতির মাথার ছাদ। এই বিশাল জনবহুল শহর একাধারে প্রাচীন এবং বর্তমান জীবনযাত্রার জীবন্ত এবং শ্রেষ্ঠ প্রতীক। প্যারিসকে দেখা মানেই ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করা। জগতে কি এমন আছে যা প্যারিসে নেই? তার মধ্যে আছে ভবিষ্যদ্বক্তা এবং রাজার সৃষ্টিকর্তা, রাজনীতিবিদ আর যাদুকর। রোম একদিন একজন অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বারবণিতাকে সিংহাসনে বসিয়েছিল আর প্যারিসে তেমনি একদিন একজন সাধারণ নিম্নমানের মেয়েকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুই যদি ক্লডিয়াসের সমকক্ষ না হ'ন তাহলে মাদাম দু ব্যারি অবশ্যই মেসালিনার থেকে ভাল ছিলেন। যদিও প্লুটার্ক বলতেন অত্যাচারীরা বেশিদিন বাঁচে না তথাপি সুল্লা আর ডোমিসিয়ানের অধীনে রোমকে অত্যাচার ভোগ করতে হয়। কিন্তু রোমের মানুষ নরকের লেথি নদীর মতো টাইবার নদীতে স্নান করেই সব অত্যাচারের কথা ভুলে যেত। কিন্তু প্যারিসের লোকরা বিদ্রোহ করতে জানে।

জগতের কোথাও ভালমন্দ এমন কোনও দিক নেই যা প্যারিসে নেই। এখানকার হোটেলে রেস্তোরাঁয় যেমন প্রতীক্ষমানা বারবণিতা পাওয়া যায় তেমনি এই প্যারিসেরই কোনও হোটেলে একদিন ডেভিড দ্য অ্যাঙ্গার্স, বলজাক আর শার্লকের মতো প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা একসঙ্গে বসে থাকতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে তার প্রাধান্য সর্বাধিক। ওর প্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠে তার ছত্রছায়ায। এ শহরের একদিকে যেমন অ্যাডনিস তার দ্বাদশচক্রবিশিষ্ট বজ্রবিদ্যুতের রথে চড়ে চলে যায়, তেমনি তার অন্য দিক দিয়ে সাইলেনাস গাধার পিঠে চেপে চলে যায়।

প্যারিসই হলো সারা জগতের এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। জগতের দেখার মতো যত সব সভ্যতা ও বর্বরতা আছে সেই সব সভ্যতা ও বর্বরতার দ্বৈত উপাদানে গড়া যেন এই প্যারিস। তাই তার গিলোটিন না থাকাটাই অস্বাভাবিক হত তার পক্ষে। এথেন্স, রোম, সাইবারিস, জেরুজালেম, পাঁন্তিন প্রভৃতি সব নগরী প্যারিসের মধ্যেই আছে। প্লেস দ্য গ্রীভে যদি মাঝে মাঝে দু'একটা ফাঁসি না হত তাহলে অবিমিশ্র অবাধ একটানা আনন্দ-উৎসব ভাল লাগবে কেন? সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আবার আইন ভাল কাজই করেছে।

১১

প্যারিসে কোনও কিছুরই সীমা-পরিসীমা বলে কিছু নেই। যে পরিমাণ প্রভুত্ব সে করে এসেছে দীর্ঘকাল ধরে সে পরিমাণ প্রভুত্ব আর কোনও শহর করতে পারেনি কোনওদিন। আবার এখানকার লোকেরা বিজিতদের বিদ্রূপ করার ব্যাপারেও সিদ্ধহস্ত। আলেকজান্ডার একদিন এথেন্সের অধিবাসীদের বলেছিলেন, আমি শুধু তোমাদের সন্তুষ্ট করতে চাই। প্যারিস শুধু আইন প্রণয়ন করে না; সে নিত্য নতুন অনেক ফ্যাশানও সৃষ্টি করে। আবার শুধু ফ্যাশান নয়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারও জন্ম দেয় সে। প্যারিস যখন নির্বোধ হয়ে থাকে তখন সারা জগৎ নির্বোধ থাকে তার সঙ্গে। আবার প্যারিস যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং স্বীকার করে, 'আমি কত বোকা!' তখন সারা জগতের চোখ খুলে যায়। তখন সারা জগতের পানে তাকিয়ে হাসতে থাকে প্যারিস। কী আশ্চর্য এই শহর! তার আনন্দোচ্ছলতা বিদ্যুতের চমক; তার চঞ্চলতায় রাজার রাজদণ্ড কেঁপে ওঠে। তার মুখে মেঘ নেমে এলে ঝড়ের সৃষ্টি হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের মতো তার অট্টহাসিতে সমস্ত জগৎ কাঁপতে কাঁপতে ফেটে পড়ে। তার বিস্ফোরণ, বিক্ষোভ, তার সংকট, শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহ, তার কাব্য-মহাকাব্য সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে তার অশালীনতা ও অধর্মাচরণের কথাও সারা জগৎ জানতে পারে। সব দিক দিয়ে সে সত্যিই অপূর্ব। তার ১৪ই জুলাই-এর বিক্ষুব্ধ কর্মাকর্ম সারা জগৎকে মুক্ত করে। ৪ঠা আগস্ট এই শহরে যা ঘটে তাতে হাজার বছরের সামন্তবাদ মাত্র তিন ঘণ্টায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার যুক্তিবাদ দিয়ে বৈশ্বিক ইচ্ছার হাতকে শক্ত করে। সে নিজেকে এক মহৎ ভাবাদর্শে সমুন্নত করে সেই আদর্শের আলো দিয়ে ওয়াশিংটন, কোশিউস্কু, বলিভার, বায়রন আর গ্যারিবল্ডির আত্মাকে আলোকিত করে। পৃথিবীর যেখানেই নতুন যুগের প্রভাত হয়েছে, সেখানেই তার আত্মিক উপস্থিতির প্রভাব প্রত্যক্ষ করা গেছে। যেমন ১৭৭৯ সালে বোস্টনে, ১৮৪৮ সালে পেস্থে, ১৮৬১ সালে পালার্মোতে। আমেরিকায় বৃটিশবিরোধী উচ্ছেদবাদীদের কানে কানে স্বাধীনতার মন্ত্র প্যারিসই উচ্চারণ করে। জলের ধারে গাছের ছায়াবনে সমবেত আনকোনার দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের সেই প্রেরণা দান করে। প্যারিস থেকে যে স্বাধীনতার হাওয়া বয় সেই হাওয়াতেই মিসোলোঙ্ঘীদতে বায়রনের মৃত্যু ঘটায়। প্যারিসই ছিল সেই ভিত্তিভূমি যার উপর মিরাবো দাঁড়িয়েছিলেন, আবার প্যারিসই ছিল সেই গহ্বর যার করাল গ্রাসে রোবোস্পীয়ার পড়ে যান। তার বই, নাটক, এবং রঙ্গমঞ্চ, তার বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, দর্শন সমগ্র মানবজাতির কর্ম ও চিন্তার মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে—পাস্কেল, রেনার, কর্নেল, দেকার্তে, রুশো, ভলতেয়ার, মলিয়ের সকল যুগের মনীষী হিসাবে স্বীকৃত হন। তার ভাষা বিশ্বমানবের ভাষা হয়ে ওঠে, যে ভাষা বিশ্বের সকল জাতির মানুষের মনে স্বাধীনতা এবং প্রগতির ভাবধারা জাগায়। ১৭৮৯ সালের পর থেকে সকল দেশের বীরপুরুষেরা প্যারিসের কবি এবং চিন্তাশীলদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এত কিছু সত্ত্বেও প্যারিসের পথে পথে ভবঘুরে ছেলেরা খেলা করে বেড়ায়। যে প্যারিসের বিরাট প্রতিভা জগৎকে

পথ দেখায় সেই প্যারিসেরই ভবঘুরে ছেলেরা পোড়া কয়লা দিয়ে থিসিয়াসের মন্দিরের দেওয়ালে নানারকম মূর্তি এঁকে চলে।

এই হলো প্যারিস শহর। তার চিমনির ধোঁয়া জগতের চিন্তা যোগায়। কিছু কাঠ, কাদা মাটি আর পাথর দিয়ে গড়া সামান্য একটা শহর হলেও তার একটা নৈতিক সত্তা আছে। প্যারিস মহান থেকে মহত্তর; বিরাট সমৃদ্ধির অন্ত নেই তার। কিন্তু কেন? কারণ সে সব কিছুতে সাহস করে এগিয়ে যায়।

সাহসই হচ্ছে যে কোনও অগ্রগতির মূল ও ফলশ্রুতি। যে কোনও বড় রকমের জয়ই হলো সাহসের অল্পবিস্তর পুরস্কার। ফরাসী বিপ্লবের সংগঠনের জন্য মন্টেস্কুর ভবিষ্যদ্বাণীই যথেষ্ট ছিল না। দিদেরোর প্রচারের জন্য ফরাসী বিপ্লব ঘটেনি, বোমারসাই ঘোষণা করেছিলেন বলেও তা ঘটেনি, কন্দরসেতের পরিকল্পনার জন্যও তা ঘটেনি, আরুয়েৎ পথ পরিষ্কার করেছিলেন এবং রুশো তার স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেও তা ঘটেনি—এই ফরাসী বিপ্লব ঘটানোর জন্য দাঁতনের দরকার ছিল।

মানবজাতিকে যদি এগিয়ে যেতে হয় তাহলে তার সামনে সাহসিকতার গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকা দরকার। সাহসিকতার কাজই ইতিহাসের পাতাকে উজ্জ্বল করে তোলে, মানুষের আত্মাকে আলোকিত করে। যে কোনও সূর্যোদয় বা নতুন যুগের সূচনার পিছনেই আছে সাহসিকতা। যে কোনও কাজে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া, প্রতিকূল শক্তিকে অমান্য করা, অধ্যবসায়সহকারে কাজ করা, নিজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করা, যে কোনও বিপর্যয়ে নির্ভীক থাকা, যে কোনও অন্যায় ও অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, আদর্শে অবিচল থাকা—এই সব দৃষ্টান্ত এবং প্রেরণার অগ্নিস্ফুলিঙ্গই মানুষকে মহৎ কাজে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

প্রমিথিয়াসের মশাল এবং কাম্বোনের কর্কশ কণ্ঠ থেকে একই বিদ্যুৎ নির্গত হয়।

১২

প্যারিসের জনগণ সম্বন্ধে কোনও কথা বলতে গেলে বলতে হয় সেখানকার পূর্ণবয়স্ক যে কোনও ব্যক্তি আসলে যেন এক একটা ভবঘুরে ছেলে। সেখানকার ভবঘুরে ছেলেদের কথা বলা মানে শহরের কথা বলা। এই কারণেই আমরা একটা চড়ুই পাখির ছদ্মবেশে একটা ঈগলকে চিহ্নিত করেছি।

প্যারিসের আসল অধিবাসীদের পাওয়া যাবে রাজপথের পিছন দিকে সেই সব গলির অন্ধকারে যেখানে মানুষ কাজ করে আর নীরবে দুঃখভোগ করে। কাজ আর কষ্টভোগই হলো মানুষের জীবনের দুটো দিক। সামান্য সাধারণ মানুষের উইঢিবির মধ্যেই থাকে কত অদ্ভুত মানুষ। সিসারো এই সব মানুষদের বলতেন জনতা। বার্ক বলতেন, জনতা, গণশক্তি, জনসাধারণ...কথা সহজেই বলা যায়। কথায় কি যায় আসে? যদি এই জনগণ খালি পায়ে হাঁটে বা তারা পড়তে শিখতে না পারে তাহলে তাতে কিই বা যায় আসে? তাহলে কি সেই অজুহাতে তাদের ত্যাগ করবে এবং তাদের দুর্দশাকে কি অভিশাপ বলবে? কিন্তু আলো কি কোনওদিন জনগণের মধ্যে

প্রবেশ করতে পারে না? আলো আরও আলো...এবং কে জানে সেই আলোর প্রভাবেই একদিন অস্বচ্ছ বস্তু স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। যে কোনও বিপ্লব কি জনগণের রূপান্তর নয়? দার্শনিকরা যদি জনগণকে ঠিকমতো শিক্ষাদান করেন, যদি তাঁরা মার্শাই গাইতে গাইতে জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে সূর্যোদয়ের দিকে এগিয়ে যান, তাদের মধ্যে প্রভূত উদ্যম আর উদ্দীপনার অবতারণা করেন এবং জরাজীর্ণ গণজীবনের ভিতর থেকে সবুজ সজীব নতুন জীবনের ধারাকে উদ্‌গত করাতে পারেন তাহলে এই জনগণই একদিন এক মহতী শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠবে। তাদের নবজাগ্রত নীতিবোধ এবং গুণানুশীলনের জ্বলন্ত চুল্লী থেকে বেরিয়ে আসবে এক উজ্জ্বল অগ্নিশিখা। তাহলে তখন এই জনগণের অনাবৃত হাত-পা, ছেঁড়া ময়লা পোশাক, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং তাদের জীবনের অন্ধকার দিকগুলোকে আদর্শ পূরণের কাজে লাগানো যাবে সফলভাবে। জনগণের অন্তরের দিকে তাকালেই এই সত্য বোঝা যাবে। যে বালুকারাশির উপর দিয়ে আমরা হেঁটে যাই সেই বালুকারাশি চুল্লীর মধ্যে ফেলে তাকে গলিয়ে স্বচ্ছ কাঁচে পরিণত করা যেতে পারে, যে কাঁচের স্বচ্ছতার সহায়তায় গ্যালিলিও, নিউটন একদিন দূর আকাশে তাকিয়ে নক্ষত্রমণ্ডলকে নিরীক্ষণ করতেন।

১৩

দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা যে কাহিনী বর্ণনা করেছি সে কাহিনী ঘটার সাত-আট বছর পর ভুলভার্দ দ্য তেম্পল ও শ্যাতো দ্য ইয়তে এগার-বারো বছরের এক ভবঘুরে ছেলেকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এই ধরনের ভবঘুরে ছেলের কথা আমরা এর আগেই বলেছি। তফাৎ শুধু এই যে, হাসির আলোয় মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও অন্তরটা ছিল তার শূন্যতা আর অন্ধকারে ভরা। এই ছেলেটা যে পায়জামা পরত সেটা তার বাবার কাছ থেকে পায়নি সে, আবার মেয়েদের মতো যে ব্লাউজটা সে পরত সে ব্লাউজটাও তার মায়ের নয়। এই সব পোশাক লোকে তাকে দান করেছে। তবু তার বাবা-মা দু'জনই আছে। কিন্তু তার বাবা তাকে কখনো ভাবতে শেখায়নি এবং তার মা তাকে কখনো ভালবাসেনি। এই সব ছেলেদের সকরুণ অবস্থা দেখলে সত্যিই মায়া লাগে, কারণ তাদের বাবা-মা থাকলেও তারা অনাথ শিশুর মতোই অসহায়। বাড়ি থেকে পথেই সে বেশি সুখে থাকে। পথের পাথর তাদের মার অন্তরের থেকে বেশি কঠিন নয়।

যে ছেলেটার কথা আমরা বলছি সে ছেলেটার বয়স কম, তার মুখখানা ম্লান, সদাসতর্ক, নতুন, আবার একই সঙ্গে প্রাণচঞ্চল ও অবসাদগ্রস্ত। সে যেখানে-সেখানে ছুটে বেড়ায়, খেলা করে, পথের ধারের খালে সে দাপাদাপি করে। কেউ তাকে ভবঘুরে ছেলে বললে সে হেসে ওঠে। তার কোনও চালচুলো বা নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। তবু সে সুখী, কারণ সে স্বাধীন। বালক যখন পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হয় তখন তাবা সমাজব্যবস্থার চক্রের সঙ্গে বিঘূর্ণিত হতে থাকে, সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয় তাকে। কিন্তু যতদিন তারা ছোট থাকে, তারা সব দিক দিয়ে অব্যাহতি পায়।

বাবা-মার দ্বারা অবহেলিত ও পরিত্যক্তপ্রায় হলেও মাসের মধ্যে দু' তিন বার ছেলেটা আপন মনে বলে ওঠে, 'আমি মাকে দেখতে যাব।' এই বলে ছেলেটা বুলভার্দ অঞ্চল ছেড়ে পোর্তে সেন্ট মার্তিন পার হয়ে নদীর বাঁধের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর নদী পার হয়ে শ্রমিকবস্তির পাশ দিয়ে সালপেত্রিয়ের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু কোথায়? আর কোথাও নয়, ৫০-৫২ নম্বর সেই গর্বোর সেই ব্যারাক বাড়িটায় যায়। সেই সময় বাড়িটাতে কয়েকটা ঘর খালি ছিল এবং তার উপর 'বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে' এই মর্মে একটা নোটিশ লাগানো ছিল। বাড়িটাতে তখন এমন কতকগুলো পরিবার বাস করত যারা পরস্পরকে চিনত না।

ভলজাঁ যখন সেই বাড়িতে ছিল তখন 'প্রধান ভাড়াটে' নামে অভিহিত যে একটা বুড়ী বাড়িটা দেখাশোনা করত সে মারা যায়। তার জায়গায় যে বুড়ীটা তার কাজ করতে থাকে সেও ছিল ঠিক আগেকার বুড়ীটার মতো। নতুন যে বুড়ীটা আসে তার নাম ছিল মাদাম বুর্গন, তার জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।

গর্বোর বাড়িটাতে তখন যে সব ভাড়াটে ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে দৈন্যদশায় থাকত একটি পরিবার। সে পরিবারে ছিল চারটি প্রাণী—বাবা, মা, আর দুটি মেয়ে। মেয়ে দুটিই বড় ছিল। কিন্তু একটিমাত্র ছোট ঘরে একসঙ্গে থাকত তারা।

একমাত্র দুর্দশা ছাড়া ঐ পরিবারের উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ছিল না। এই পরিবারের কর্তা যখন এ বাড়িতে আসে তখন সে বলে তার নাম জনদ্রেত্তে। এই পরিবারেরই হলো সেই নগ্নপদ ভবঘুরে ছেলেটা। সে যেন সেখানে গিয়েছিল শুধু দারিদ্র্য আর দুরবস্থার দ্বারা সম্ভাষিত হবার জন্য। প্রায়ান্ধকার হিমশীতল ঘরখানার মতোই তার বাবা-মার মুখগুলো ছিল ম্লান আর হিমশীতল। সে মুখে কোনও হাসি ছিল না।

ছেলেটা বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা-মা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কোথা থেকে এলি?'

ছেলেটা উত্তর করে, 'পথ থেকে।' আবার ছেলেটা যখন বাড়ি থেকে রওনা হয় তখন আবার প্রশ্ন করে, 'কোথায় যাবি?' ছেলেটা তখন উত্তর করে, 'পথেই ফিরে যাচ্ছি।' সব শেষে তার মা বলে, 'কেন এসেছিলি?'

এ কথার উত্তর দেয়নি ছেলেটা। এই ধরনের স্নেহহীন, মমতাহীন পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠে ছেলেটা। কিন্তু তার প্রতি তার বাবা-মার এই ঔদাসিন্য এবং নির্মমতা তাকে নতুন করে বিচলিত করতে পারেনি কিছুমাত্র। সে কারো উপর কোনও দোষারোপ করত না এর জন্য। সন্তানের প্রতি পিতামাতার কি রকম ব্যবহার করা উচিত সে সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই ছিল না।

বুলভার্দ অঞ্চলে ছেলেটাকে গ্রাভ্রোশে বলে ডাকত।

তবে ছেলেটার মা তার মেয়েদের ভালবাসত। তার বাবা জনদ্রেত্তে যে ঘরটাতে থাকত তার পাশের ঘরেই একটা কপর্দকহীন গরীব যুবক থাকত। তার নাম ছিল মঁসিয়ে মেরিয়াস।

এখন এই মঁসিয়ে মেরিয়াস সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

র‍্যু বুশোরাত, র‍্যু দ্য নরমান্ডি আর র‍্যু দ্য সেতোনে অঞ্চলে এখনো এমন কিছু অধিবাসী আছে যারা মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ নামে এক ভদ্রলোককে আজও মনে রেখেছে এবং তাঁর কথা মনে করে আজও আনন্দ পায় তারা। এই সব অধিবাসীরা যখন বয়সে যুবক ছিল তখন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন।

১৮৩১ সালে গিলেনর্মাদ শুধু তাঁর বার্ধক্যের খাতিরে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তিনি ছিলেন বাতিকগ্রস্ত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যিনি ছিলেন প্রাচীন যুগের এক প্রতিভূ। তিনি উনিশ শতকের এক মধ্যবিত্ত হয়েও অষ্টাদশ শতকের সম্ভ্রমশালী এক বুর্জোযার ভাব দেখাতেন। তাঁর বয়স নব্বই-এর উপর হলেও তিনি খাড়া হয়ে হাঁটতে পারতেন, জোরে কথা বলতেন, স্পষ্ট দেখতে পেতেন, মদপান করতেন এবং নাক ডাকিয়ে ঘুমোতেন। তাঁর দু'পাটির বত্রিশটি দাঁতই ছিল এবং পড়ার সময় ছাড়া চশমা ব্যবহার করতেন না। প্রেমিক প্রকৃতির লোক হলেও তিনি বলতেন গত দশ বছর ধরে কোনও নারীর সঙ্গে কোনওরূপ সংস্পর্শ নেই তাঁর। তিনি সম্পূর্ণরূপে নারী সংসর্গ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বার্ধক্যের জন্য নারীদের সন্তুষ্ট করতে পারতেন না, একথা না বলে বলতেন তিনি খুব গরীব বলেই দারিদ্র্যবশত তাদের খুশি করতে পারেন না। তিনি বলতেন, আমার সর্বস্ব খোয়া না গেলে...বস্তুত তাঁর আয় বলতে ছিল পনের হাজার ফ্রাঁর এক বার্ষিক আয় এবং তিনি আশা করতেন তাঁর আয় এক লক্ষ ফ্রাঁ হলে তিনি একজন নারীকে রাখতে পারতেন। তিনি মঁসিয়ে দ্য ভলতেয়ারের মতো উন্মার্গগামী ছিলেন না যিনি জীবন্মৃত অবস্থায় ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে জীবন যাপন করতেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভালই ছিল। তিনি ছিলেন চঞ্চল ও চপল প্রকৃতির এবং সামান্য কারণে অযৌক্তিকভাবে রেগে যেতেন। কেউ তাঁর কোনও কথার প্রতিবাদ করলে লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর এক অবিবাহিতা কন্যা ছিল যার বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছিল। রেগে গেলে তাঁর মেয়ের সঙ্গে চেঁচামেচি করতেন, গালাগালি করতেন এবং তাকে চাবুক মারতেন, যেন সে সাত-আট বছরের এক বাচ্চা মেয়ে। তিনি তাঁর ভৃত্যদেরও পুরনো কায়দায় গালাগালি করতেন।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের অদ্ভুত কতকগুলো খেয়াল ছিল। তিনি এমন এক নাপিতের কাছে বরাবর চুলদাড়ি কামাতেন যে একবার পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং যে তার সুন্দরী ও চপল প্রকৃতির স্ত্রীর জন্য ঈর্ষাবশত তার সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করে। সব বিষয়েই নিজের মতামত ও বিচার-বুদ্ধির উপর উচ্চ ধারণা ছিল তাঁর এবং নিজেকে খুবই বিচক্ষণ ভাবতেন। তিনি বলতেন, তাঁর এমন এক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি আছে যার দ্বারা কোনও একটা মাছি তাঁকে কামড়ালে তিনি বলে দিতেন সেই মাছিটা কোন মহিলার গা থেকে উড়ে এসেছে। 'মার্জিত প্রকৃতির লোক' এই কথাটা প্রায়ই তিনি বলতেন। কিন্তু মার্জিত প্রকৃতির লোকের মতো তিনি কখনই ব্যবহার করতেন না। তাঁর মতে আমাদের সভ্যতার মধ্যে বৈচিত্র্যসাধন ও সভ্যতাকে পূর্ণতা দানের জন্য

প্রকৃতি আমাদের স্বভাবের মধ্যে বর্বরতার উপাদান রেখে দিয়েছে। তথাকথিত সভ্য ইউরোপীয়দের মধ্যে এশিয়া আফ্রিকার অধিবাসীদের অনেক গুণাগুণ আছে। বিড়াল হচ্ছে বাঘের এবং টিকটিকি গিরগিটি হচ্ছে কুমীরের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। রঙ্গশালার নাচিয়েরা এক একটা রং-মাখা নরখাদক। তারা মানুষ না খেলেও তাদের রক্ত সব শোষণ করে নেয়। এই হচ্ছে আমাদের জীবন। আমরা কাউকে গিলে খাই না, আমরা কামড়ে কামড়ে একটু একটু করে খাই। আমরা কাউকে হত্যা করি না, তার গাটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিই।

২

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ মেরিয়াস অঞ্চলে র‍্যু দ্য ফিলে দ্য কান্‌ভেয়ারে বাস করতেন। বাড়িটা ছিল তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি। অনেক দিনের পৈত্রিক পুরনো বাড়িটাকে অবশ্য নতুন করে আবার নির্মাণ করা হয় এবং আগের নম্বর পাল্টে নতুন নম্বরও দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে প্যারিসের অনেক রাস্তারও এইভাবে নম্বর পরিবর্তন করা হয়। তাঁর বাড়িটার একদিকে ছিল রাস্তা এবং আর একদিকে ছিল বাগান।

তিনি নিচের তলায একটা বড় ঘরে থাকতেন। সে ঘরের পর্দা আর কার্পেটে পল্লীপ্রকৃতির অনেক সুন্দর দৃশ্য আঁকা ছিল। তাঁর ঘরের জানালার নিচেই বাগান ছিল। বাড়ি থেকে বাগানে যেতে হলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে হত। গিলেনর্মাদ যুবকের মতো তরতর করে ওঠা-নামা করতেন সে সিঁড়িতে। তাঁর মায়ের পিতামহের কাছ থেকে এই স্বভাবটা পেয়েছিলেন। তাঁর মার সেই পিতামহ নাকি একশো বছর বেঁচেছিলেন এবং তাঁর দুটি স্ত্রী ছিল। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের ব্যবহারটা ছিল একজন সভাসদ আর একজন আইনজীবীর মাঝামাঝি। সভাসদ তিনি হতে পারেননি আর আইনজীবী বা উকিল হবার শখ ছিল তাঁর। যৌবনে তিনি ছিলেন এমনই একজন যারা তাদের স্ত্রীদের দ্বারা প্রতারিত হয়, কিন্তু তাদের প্রেমিকারা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করে না কোনওভাবে। এই সব লোকরা প্রেমিক হিসাবে যত ভাল হয়, স্বামী হিসাবে তত ভাল হতে পারে না। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ চিত্রশিল্পের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর শোবার ঘরে নামকরা শিল্পীদের আঁকা কিছু ছবি ছিল। এই বয়সেও তিনি নিজেকে যুবক ভাবতেন এবং পোশাক-আশাকের ধরন বদলাতেন। তিনি সব সময় কোটের পকেটের ভিতরে হাত রেখে চলতেন। তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ফরাসী বিপ্লব জনকতক কাপুরুষ লোকের পাপকর্মের ফল!

৩

কোনও এক রাতে একটা নাটক দেখতে গিয়ে ভলতেয়ার, লা কামারগো আর স্যানির পাশে দু'জন সুন্দরীকে গিলেনর্মাদ দেখতে পান। তখন তিনি তাদের দিকে না গিয়ে নাহেনরি নামে এক নাচিয়ে মেয়ের কাছে চলে যান। মেয়েটি ছিল প্রায় তাঁরই সমবয়সী এবং তার সঙ্গে তাঁর ভালবাসা ছিল। তিনি তখন তাকে দেখেই

আপন মনে মন্তব্য করেছিলেন, এর আগে যখন তাকে দেখেছিলাম তখন তাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার মুখে ছিল খুশির হাসি, মনে আশার সম্পদ, চোখে ছিল মোহপ্রসারী আবেদন। তিনি যৌবনে যে ওয়েস্টকোট পরতেন তার কথা আজও ভুলতে পারেননি তিনি। তাঁর বয়স যখন কুড়ি ছিল তখন মার্কুই দ্য বুফার্স তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি রোজ খবরের কাগজ পড়তেন। তখন যারা মন্ত্রী বা দেশের শাসনকর্তা ছিল তাদের তিনি দেখতে পারতেন না। তিনি হাসতে হাসতে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে প্রায়ই বলতেন, কর্বিয়ের, হুমাল, কাসিমির—এরা হলো কি না মন্ত্রী? মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ কেন মন্ত্রী হলেন না? কথাটা হাস্যাস্পদ হলেও যারা নির্বোধ তারা সে কথাকে বিশ্বাস করে। পাঁচজনের সঙ্গে তিনি যখন থাকতেন তখন কারো নামে কোনও শক্ত কথা বলতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করতেন না তিনি। এক আভিজাত্যসুলভ ঔদাসিন্যের সঙ্গে তিনি অম্লান বদনে নোংরা গালাগালি দিয়ে যেতেন। তাঁদের যুগে ধনীসমাজে এই ধরনের গালাগালি চলত। সে যুগের কাব্যে যেমন আবেগাতিশয্য ও অতিশয়োক্তির প্রাধান্য দেখা যেত, গদ্যসাহিত্য ছিল তেমনি স্থূল প্রকৃতির। তাঁর প্রথম জীবনে তাঁর গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে তাঁর ধর্মপিতা বলতেন, তিনি ভবিষ্যতে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি হবেন। তাই তাঁকে বলতেন, 'ভাগ্যবান।'

৪

তাঁর জন্মস্থান মৌলিন শহরের কলেজে তিনি পুরস্কার লাভ করেন এবং ডিউক দ্য নিভার্নে তাঁর গলায় লরেন্সের মালা পরিয়ে দেন। কনভেনশান বা শীর্ষ সম্মেলন, ষোড়শ লুই ও নেপোলিয়নের মৃত্যু, বুর্বনদের পুনরাগমন, প্রভৃতি এত সব ঘটনার মাঝে সে কথাটা ভোলেননি গিলেনর্মাদ। তাঁর মতে নিভার্নে ছিলেন সেই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লোক। তিনি আরও বলতেন রাশিয়ার ক্যাথারিন পোল্যান্ড ব্যবচ্ছেদের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিন হাজার রুবল দিয়ে বেস্তুসেফের কাছে গোপন সোনা কি নেবেন?

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বুর্বনদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং ১৭৮৯ সালকে ভয় করতেন। তিনি প্রায়ই গল্প করতেন কিভাবে শুধু তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে তিনি বেঁচে যান। তা না হলে তাঁর মাথা কাটা যেত। যদি কোনও যুবক প্রজাতন্ত্রের গুণগান করত তাঁর সামনে তাহলে তাঁর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, আমার বয়স নব্বই, আমার মনে হয় তিরানব্বই সাল আর দেখতে পাব না। আবার অন্য সময় তিনি বলতেন, তিনি একশো বছর বাঁচতে চাইছেন।

৫

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বিবাহিত লোকদের প্রেম সম্বন্ধে একটা নিজস্ব তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। তিনি বলতেন, কোনও লোক যদি তার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে ভালবাসতে

না পেরে অন্য মেয়েকে ভালবাসে তাহলে তার মনের শান্তি বজায় রেখে অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য একটামাত্র উপায় অবলম্বন করতে হবে। তার টাকার থলেটা তার স্ত্রীর হাতে দিয়ে দিতে হবে। তার স্ত্রীকে সব সময় ব্যস্ত রাখতে হবে হিসাবপত্রের কাজে। ব্যাঙ্কের নোট গুণতে গুণতে তার যেন হাতে কড়া পড়ে যায়। তার স্ত্রীকে তখন চাষের কাজ দেখাশোনা, বাড়ি মেরামৎ, করদান, মামলাপত্র দেখা প্রভৃতি সব কাজ করতে হবে। স্ত্রী তখন এই ভেবে মনে মনে সান্ত্বনা পাবে যে তার স্বামী তাকে ভাল না বাসলেও সে ইচ্ছা করলে স্বামীর সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারবে, স্বামীর সব কিছু এখন তারই হাতে। গিলেনর্মাদও তাঁর জীবনে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর অব্যবস্থার জন্য তাঁর বহু ক্ষতি হয়ে যায়। সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর অভাব দেখা যায়। তিনি দেখেন তাঁর আয় বলতে শুধু আছে বছরে পনের হাজার ফ্রাঁ। তিনি যে টাকা লগ্নী করেন তার মাত্র তিনের চার অংশ অবশিষ্ট আছে। তিনি ঠিক করেন যা আছে জীবনে সব খরচ করে যাবেন তিনি। কিছুই রেখে যাবেন না। তাছাড়া কোনও সম্পত্তি রেখে গেলে তা তাঁর মৃত্যুর পর জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে বাজেয়াপ্ত হয়ে যেতে পারে।

আমরা আগেই বলেছি রু্য দ্য ফিলের বাড়িটা তাঁর নিজের। তাঁর দু'জন ভৃত্যের মধ্যে একজন পুরুষ আর একজন নারী। পুরুষ ভৃত্যটি যখন তাঁর বাড়িতে আসে তখন তিনি তার নতুন নতুন নাম দেন। যেমন নিময়, কোঁতয়, পিকার্দ প্রভৃতি। তার বয়স ছিল প্রায় পঞ্চান্ন। সে বেশি জোরে হাঁটতে বা চলাফেরা করতে পারত না। সে বলত তার নাম বাস্ক। রান্না করার জন্য নারীভৃত্যটি যখন প্রথম তাঁর বাড়িতে কাজের জন্য আসে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কত মাইনে নেবে?

মেয়েটি তখন বলে, মাসে তিরিশ ফ্রাঁ।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তখন বলেন, আমি তোমাকে পঞ্চাশ ফ্রাঁ করে দেব। কিন্তু তোমার নাম হবে নিকোলেত্তে।

৬

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের দুঃখ মানেই রাগ। মনে কোনও কারণে দুঃখ পেলেই প্রচণ্ডভাবে রেগে যেতেন তিনি। তাঁর কতকগুলো কুসংস্কার ছিল এবং ইচ্ছা মতো অবাধে সেগুলো মেনে চলেছেন। প্রতিটি চালচলনে তিনি যে ভাব প্রকাশ করে যেতেন তা হলো চিরযুবক এক প্রেমিকের। তিনি বলতেন এই ভাব দেখিয়ে প্রচুর নাম-যশ পাওয়া যায় এবং এর থেকে অনেক উপহারও জুটে যায় তাঁর।

একবার একটা বড় ঝুড়িতে করে একটা জিনিস পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর বাড়িতে। ঝুড়িটা খুলে দেখা যায় একটি নবজাত শিশুপুত্র তার মধ্যে শোয়ানো আছে। এ নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে যায় তাঁর বাড়িতে। পরে খোঁজ-খবর করে জানা যায় মাস ছয়েক আগে তাঁর বাড়ির যে ঝিকে তিনি বরখাস্ত করেন এই ছেলেটি তার এবং সে নাকি বলে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদই হলেন এ শিশুর জনক। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বয়স তখন

আশি। তিনি এতে দারুণ রেগে যান। রেগে গিয়ে বলেন, কুলটা মেয়েটার কী দুঃসাহস! একথা কেউ বিশ্বাস করবে?

কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি ঠাণ্ডা হয়ে আর সবাইকে বোঝাতে থাকেন, তোমরা এতে ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? তোমরা জান না তাই। নবম চার্লস-এর অবৈধ সন্তান ডিউক অ্যাঙ্গুলিমের বয়স যখন পঁচাশি তখন পনের বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বোর্দোর আর্কবিশপের ভাই মার্কুই দ্য আলুয়ে তিরাশি বছর বয়সে এক পরিচারিকার গর্ভে পুত্রসন্তান উৎপাদন করেন। সেই অবৈধ সন্তান পরবর্তী জীবনে নাইট উপাধি লাভ করে এবং কাউন্সেলার হয়। এ যুগের বিশিষ্ট বিখ্যাত লোক আবে তারারদ ছিলেন সাতাশি বছরের এক বৃদ্ধের ঔরসজাত সন্তান। বাইবেল পড়লেই জানতে পারবে এসব ব্যাপার এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।

এত সব বলার পর তিনি ঘোষণা করেন, অবশ্য এই শিশুটি আমার সন্তান নয়। যাই হোক, দোষটা তো তার নয় এবং তার দেখাশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করেন তিনি। কিন্তু লা ম্যাগনন নামে যে কুলটা ঝি তার এই অবৈধ সন্তানকে পাঠিয়েছিল সে আবার এক বছর পর আর একটি নবজা৩ শিশুপুত্রকে এইভাবে ঝুড়িতে করে পাঠিয়ে দেয় মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বাড়িতে। এটা কিন্তু খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তখন দুটি শিশুকেই তাদের মা লা ম্যাগননের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তিনি তাকে বলে আসেন এদের ভরণপোষণের জন্য তিনি প্রতি মাসে আট ফ্রাঁ করে পাঠিয়ে দেবেন। তবে একটা শর্তে—সে যেন এ কাজ আর না করে। তিনি আরও বলেন, ছেলেদের যেন ঠিকমতো দেখাশোনা করা হয় এবং তিনি মাঝে মাঝে এসে তাদের দেখে যাবেন।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের এক ভাই ছিল। তিনি যাজক ছিলেন। অ্যাকাডেমি দ্য পয়তিয়েরের রেক্টার বা প্রধান হবার পর তিনি মারা যান ৭আশি বছর বয়সে। তাতে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বলেন, আমার ভাই খুবই অল্প বয়সে মারা গেছে। তাঁর এই ভাই খুবই কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। যাজক থাকাকালে ভিক্ষা দেওয়াটা তিনি এক ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। কিন্তু যত সব অচল মুদ্রা ভিক্ষা হিসাবে দিয়ে স্বর্গে যেতে গিয়ে নরকের পথ পরিষ্কার করেন। অথচ তাঁদের বাবা ভালভাবে সম্মানের সঙ্গে ভিক্ষা দিতেন। তিনি সত্যিই উদার প্রকৃতির ও পরোপকারী লোক ছিলেন। তিনি ধনী হলে তাঁর জীবনযাত্রা সত্যিই আরও অনেক ভাল হত। তিনি সব সময় কোনও কাজের পদ্ধতির উপর জোর দিতেন। পদ্ধতিটা যেন ভাল হয়। একবার একজন ব্যবসাদার তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে এক সম্পত্তির অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে। তখন তিনি মন্তব্য করেন, এভাবে আমাকে ঠকানো তার উচিত হয়নি। পদ্ধতিটা আরও ভাল ও ভদ্র হওয়া উচিত। বনপথের কোনও দস্যুর মতো ওরা আমার এ সম্পত্তি কেড়ে নিল।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের দু'বার বিয়ে হয়। দুটি স্ত্রীর গর্ভে দুটি কন্যাসন্তান হয়। বড় মেয়েটি বেঁচে আছে আর ছোট মেয়েটি তিরিশ বছর বয়সে মারা যায়। বড় মেয়েটি অবিবাহিতা রয়ে যায়, কিন্তু ছোট মেয়েটি মৃত্যুর আগে এক সামরিক অফিসারকে বিয়ে করে মারা যায়। অফিসারটি ওয়াটারলু যুদ্ধের সময় কর্নেল হয়েছিল। গিলেনর্মাদ এই বিয়েটা সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বলেন, 'এটা আমাদের পরিবারের পক্ষে অপমানজনক।' একটিপ নস্যি নিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কথাটা বলেন তিনি। ঈশ্বরে তাঁর কোনও বিশ্বাসই ছিল না।

৭

এই হলো মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের জীবনযাত্রা প্রণালী। তাঁর মাথার চুল একেবারেই ওঠেনি। সে চুল ছিল একেবারে সাদা এবং ভালভাবে আঁচড়ানো। তিনি ছিলেন সত্যিই একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মহত্ত্ব এবং চপলতা দুই-ই ছিল তাঁর মধ্যে।

১৮১৪ সালে যখন রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় তখন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর এবং তিনি ফবুর্গ সেন্ট জার্মেনে থাকতেন। আশি বছর বয়সে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে আসেন মেরিয়াসের বাড়িতে। তখন তিনি সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন একেবারে।

মেরিয়াসের বাড়িতে আসার পর কতকগুলো নিয়ম করেন গিলেনর্মাদ। তিনি সন্ধ্যার আগে বাড়িতে কোনও অতিথি বা আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করতেন না। তিনি ঠিক বিকাল পাঁচটার সময় নৈশভোজন শেষ করতেন। তার পর লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। যে কোনও কাজই থাক, দিনের বেলায় কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পেত না। এটাই ছিল সেই শতকের ভদ্রলোকদের রীতি এবং এই রীতিটাই তিনি মেনে চলতেন। তিনি বলতেন, যাঁরা শ্রেষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তাঁরা দিনের বেলায় ঘরে আবদ্ধ করে রাখেন নিজেদের। রাত্রিকালে আকাশে নক্ষত্রের আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধির আলোয় দেদীপ্যমান হয়ে ওঠেন তাঁরা। তিনি জনসমাজ থেকে দূরে থাকতেন। কারো সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। রাজারও খাতির করতেন না। এটাই ছিল তাঁদের যুগের রীতি।

৮

আমরা মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের মেয়েদের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই দুটি মেয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল দশ বছরের। যৌবনে তাদের দু'জনের চেহারা ও চরিত্রের মধ্যে কোনও মিল ছিল না। ছোট মেয়ে ছিল বরাবরই খুব আনন্দোচ্ছল। তার সব দিকেই ঝোঁক ছিল—ফুল, কবিতা, গান-বাজনা সবই ভালবাসত সে। একটি অতৃপ্ত অত্যুৎসাহী আত্মা ছোট থেকে অনন্ত আকাশে যেন উড়ে বেড়াত। বীরত্ব সম্পর্কে একটা রোমান্টিক ধারণা ছিল তার।

বড় মেয়েরও একটা দিবাস্বপ্ন ছিল। সে শুধু এক ধনী কনট্রাকটারকে স্বামী হিসাবে পাবার স্বপ্ন দেখত। সে হবে লক্ষপতি। অথবা তার স্বামী হবে এক বড় অফিসার। সে হবে সম্মানিত অফিসার পত্নী—কত দাসদাসী, বলনাচের আসর, কত সভা-সমিতি। দুই বোনের এইখানেই ছিল মিল।

দু'জনেরই একটা করে স্বপ্ন ছিল। দু'জনেরই দুটো পাখনা ছিল। কিন্তু একজনের পাখনা ছিল দেবদূতের আর অন্যজনের পাখনা ছিল রাজহাঁসের।

পৃথিবীতে কোনও উচ্চাশাই সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয় না। আমাদের এ যুগে মর্ত্য কখনো স্বর্গ হয়ে ওঠে না। ছোট বোন তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে বিয়ে করেছিল, এবং বিয়ের কিছুকাল পরে মারা যায়। কিন্তু বড় বোন বিয়ে করেনি জীবনে।

আমাদের কাহিনীর প্রয়োজনে যখন এই মেয়েটি প্রথম আসে তখন তাব বুদ্ধি না থাকলেও এক অটল দৃঢ়তার ভাব দেখায়। তার নাকটা ছিল তীক্ষ্ণ। সে বাড়ির বাইরে কোথাও যেত না। বাড়ির বাইরের কেউ তার আসল নাম জানত না। সবাই জানত, তার নাম ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ। সে তার সতীত্ব সম্বন্ধে খুব বেশি পরিমাণে সজাগ ও সতর্ক ছিল।

তার এই অস্বাভাবিক সতীত্ববোধ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। সে পোশাকটা এমনভাবে পরত যাতে তার দেহের কোনও অংশ দেখা না যায়। সতীত্ববোধ এমনই এক আশ্চর্য দুর্গ যে দুর্গে যত কম আক্রমণের ভয় থাকে তত বেশি তা সুরক্ষিত করা হয়। এই সতী মেয়ে জীবনে শুধু একবার এক সামরিক অফিসারের চুম্বন গ্রহণ করেছিল। থিওদুল নামে এই অফিসার সম্পর্কে তার এক ভাইপো ছিল। সতীত্ব বস্তুটা অর্ধেক গুণ আর অর্ধেক দোষ।

ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদের এই সতীত্ববোধের সঙ্গে ছিল এক গোঁড়া ধর্ম চেতনা। সে ছিল কনফ্রেরি দ্য লা তার্জ সম্প্রদায়ভুক্ত। কোনও ধর্মীয় উৎসব বা তিথির দিনে সে সাদা ঘোমটা দিত মাথায়। মাঝে মাঝে সে বিশেষভাবে প্রার্থনা করত। গীর্জায় জেসুরের বেদীর সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকত। মাঝে মাঝে তার আত্মাটা যেন মেঘেদের রাজ্য ও নীল বনরাশির মাথায় উড়ে যেত।

তার শুধু একজন বান্ধবী ছিল। তার নাম ছিল ম্যাদময়জেল ভবয়। সেও ছিল তারই মতো শুচিশুদ্ধ সতী কুমারী এবং ধর্মপ্রাণা।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ অনেক বেশি গুণশীলা হয়ে ওঠে। তার হিংসা বলে কোনও জিনিস ছিল না। এক দুর্বোধ্য বিষাদের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত তার মুখখানা। বিষাদের অর্থ সে নিজেই জানত না। তার চেহারাটা দেখে মনে হত তার জীবনটা শেষ হয়ে আসছে যে জীবন শুরুই হযনি কখনো।

বিশপ বিয়েনভেনুর বোন যেমন তার দাদার সংসার চালাত তেমনি ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ তার বাবার সংসারের সব কাজকর্ম দেখাশোনা করত। দু'জনে দু'জনকে অবলম্বন করে থাকত।

বাপ আর মেয়ে আর একজন থাকত সে সংসারে। সে হলো একটি ছোট ছেলে

যে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের কাছে আসত। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ সব সময় দাঁত খিঁচিয়ে কড়া ভাষায় কথা বলতেন তার সঙ্গে। বলতেন, এদিকে এস স্যার।

কখনো আবার তাঁর ছড়িটা তুলে ডাকতেন। বলতেন, এস, অপদার্থ কোথাকার!

আসল কথা, ছেলেটাকে তিনি ভালবাসতেন। ছেলেটা ছিল সম্পর্কে তাঁর নাতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ যখন র‍্যু সার্ভাদোনিতে থাকতেন তখন তিনি প্রায়ই কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের বাড়িতে যেতেন। তাঁকে অনেকে খাতির করত।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ যেতেন রাজতন্ত্রী অভিজাতদের বাড়িতে যেখানে তাঁর আত্মসম্মানে কোনও আঘাত লাগত না। তিনি বিশেষ করে যেতেন মঁসিয়ে দ্য রোনাল্ড আর মঁসিয়ে বেদি-পু-ভ্যালীর কাছে। সেখানে গিয়ে রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করতেন।

১৮১৭ সালে বা তার কাছাকাছি একসময় সপ্তায় দু'দিন বিকালে তিনি তাঁর এক নিকট প্রতিবেশী ব্যারনের বাড়িতে যেতেন। এই ব্যারনের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়। এই ব্যারন ষোড়শ লুই-এর অধীনে বার্লিনে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। পরে তিনি নির্বাসিত অবস্থায় সর্বস্বান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে কোনও বিষয় সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারেননি তিনি। শুধু তাঁর জীবনের স্মৃতিকথা সম্বলিত এক বিরাট পাণ্ডুলিপি রেখে যান যা ছিল দশ খণ্ডে সমাপ্ত। জীবদ্দশায় সম্মোহন বিদ্যায় তাঁর প্রচুর আগ্রহ ছিল এবং এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীর পক্ষে তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, কারণ সে আর্থিক সামর্থ্য তাঁর ছিল না। কোনও সন্তান না থাকায় অল্প যা কিছু আয় ছিল তাতে কোনওরকমে একা জীবনধারণ করতেন তিনি। অভিজাত সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একা একা থাকতেন তিনি। শুধু সপ্তায় দু'দিন বিকালে তাঁর কিছু বন্ধু তাঁর নির্জন বাড়িতে আসত। যারা আসত তারা সবাই ছিল রাজতন্ত্রবাদী। তারা সবাই চা খেয়ে সমকালীন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করত। সনদ, বোনাপার্টপন্থীদের অবস্থা, অষ্টাদশ লুই-এর জ্যাকবিনবাদ, অযোগ্য লোকদের হাতে 'কর্ডন মোর' ভার দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হত।

তারা অনেক সময় কবিতা আবৃত্তি করত। তারা ফরাসী বিপ্লবকে হীনভাবে দেখত এবং বিপ্লবের উপর যে গান রচিত হয় তার একটা বিকৃত প্রতিরূপ খাড়া করে সেটা গাইত।

১৮১৬ সালে ফুয়ালদেকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে তাতে তারা বাস্তিদে এবং জনগণের পক্ষে যোগদান করে, কারণ ফুয়ালদে ছিল বোনাপার্টপন্থী। উদার নীতিবাদীদের তারা 'ভাই ও বোন' বলত এবং এর থেকে আমাদের আর কিছু হতে পারে না।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ ছাড়া আর একজন ব্যারনপত্নীর বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতেন। তাঁর সম্বন্ধে লোকে বলাবলি করত, জান উনি কে ? উনি হচ্ছেন 'নেকলেস' ঘটনার সঙ্গে জড়িত ল্যামোথি। তখনকার দিনে বুর্জোয়ারা মানুষ হিসাবে অবাঞ্ছিত হলেও আত্মীয়তা সম্পর্কের খাতিরে বড় বড় লোকের বাড়িতে যাতায়াত করত। মাদাম পঁপারের ভাই মেরিগান প্রিন্স দ্য সুবিদের বাড়িতে যেতেন এবং গিলম দু ব্যারি মার্শাল দ্য রিচল্যুর বাড়িতে পেতেন সাদর অভ্যর্থনা।

১৮১৫ সালে কোঁত দ্য ল্যামোথি ভ্যালয়ের বয়স ছিল পঁচাত্তর। তাঁর চেহারাটা হিমশীতল হলেও তাঁর আচরণ ছিল নিখুঁত। তাঁর কোটের বোতামগুলো ঠিকমতো আঁটা থাকত। তাছাড়া তাঁর ভ্যালয় নামটার জন্যও তিনি খাতির পেতেন বেশি।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের জোরে খাতির পেতেন। তাঁর আচরণে কোনও আনন্দ ও চঞ্চলতার ভাব না থাকলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা শ্রদ্ধাজনক ভাব ফুটে ওঠে তাঁর চেহারার মধ্যে। তাছাড়া তাঁর মন্তব্যগুলোর একটা গুরুত্ব ছিল। অষ্টাদশ লুইকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পর প্রুশিয়ার রাজা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়নি। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ এ ব্যাপারে সমর্থন করে মন্তব্য করেন, ফ্রান্সের রাজা অন্য দেশের রাজার প্রতি এই ধরনের ব্যবহার করে ঠিকই করেছেন। যে দেশেরই রাজা হোক ফ্রান্সের রাজার কাছে তিনি এক সাধারণ ব্যক্তি।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ ব্যারনপত্নীর বাড়িতে যখনি যেতেন তখনি তিনি তাঁর বড় মেয়েকে সঙ্গে করে যেতেন। বড় মেয়ের বয়স তখন ছিল চল্লিশ। কিন্তু দেখে মনে হত পঞ্চাশ। তাঁদের সঙ্গে সাত বছরের একটি ছেলেও থাকত। ছেলেটির চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল এবং সুন্দর ছিল। ছেলেটি ব্যারনপত্নীর বাড়ির বৈঠকখানায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলে বলাবলি করত, 'আহা বেচারী, মা নেই, বাবা দেখে না।' এই ছেলেটি হলো মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের ছোট মেয়ের ছেলে। তার বাবা একজন সামরিক অফিসার ছিল। ১৮১৫ সালে প্যারিসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে লয়ের নদীর ওপারে কোথায় চলে যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে ছেলের কোনও খোঁজখবর রাখত না। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তাঁর এই জামাই সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন, আমাদের বংশের কলঙ্ক।

২

সেকালে ভার্নল শহর দিয়ে হেঁটে গিয়ে সেন নদীর উপর পাথরের পুলটা পার হয়েই পুলের উপর থেকে মাথায় টুপি, হাতে বোনা পায়জামা আর জ্যাকেট পরা প্রায় পঞ্চাশ বছরের একটি লোককে দেখতে পেত। লোকটির গায়ের রংটা রোদে কালো হয়ে গিয়েছিল। তার মাথার চুল ছিল একেবারে সাদা। আর কপালের উপর একটা ক্ষতের দাগ ছিল যে দাগটা তার গাল পর্যন্ত নেমে এসেছিল। নদীর ধারে পাঁচিল-ঘেরা একটা বাগানে কয়েক খণ্ড জমিতে সে একটা কোদাল হাতে নিয়ে

সারাদিন কাজ করত। বাগানটার সামনের দিকে ছিল নদী আর পিছনের দিকে ছিল একটা বাড়ি। বাগানটা ছিল নানারকম ফুলে ভর্তি।

পায়জামা আর জ্যাকেটপরা ঐ লোকটিই ছিল ঐ বাগান আর বাগান সংলগ্ন বাড়িটার বাসিন্দা। এই বাগানই ছিল তার একমাত্র সম্পত্তি। সে একা একাই থাকত সেখানে। তার আত্মীয়-বন্ধু বলতে কেউ ছিল না। শুধু ঘর-সংসারের কাজ করার জন্য এক মধ্যবয়সী মহিলা থাকত বাড়িতে।

মহিলাটিকে দেখে যুবতী না বৃদ্ধা, সুন্দরী না কুৎসিত তা কেউ বুঝতে পারত না। তবে বাগানটার ফুলের ঐশ্বর্যের জন্য শহরের সবাই প্রশংসা করত।

ফুলগাছগুলোতে জল দিয়ে গোড়া খুঁড়ে সারাদিন পরিশ্রম করে গাঁদা, ডালিয়া প্রভৃতি অনেক ফুলের চাষ করত সে বাগানে। চীন, আমেরিকা থেকে আনা অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছের চারা বসাত বাগানে। সে ছিল কল্পনাপ্রবণ। গ্রীষ্মকালে সকাল হতেই সে বাগানে গিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা, মাটি খোঁড়া, গাছে জল দেওয়া, পাতা বা ডাল ছাঁটা প্রভৃতি নানারকমের কাজ করত। রং-বেরঙের ফুলের মাঝখানে বসে এক প্রশান্ত বিষাদ মুখ নিয়ে নীরবে কাজ করে যেত সে। কখনো কখনো পুরো একটা ঘণ্টা বসে বসে কি ভাবত। স্তব্ধ হয়ে পাখির গান শুনত অথবা সকালের রোদের ছটা পেয়ে যে শিশির মুক্তোবিন্দুর মতো হযে উঠেছে সেই শিশিরবিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকত। সে মদের থেকে দুধ বেশি পান করত। বাড়িতে যে মেয়েটি থাকত সে প্রায়ই বকত লোকটিকে। মেয়েটি তাকে শিশুর মতো জ্ঞান করত।

লোকটি এমনই লাজুক প্রকৃতির ছিল যে লোকে তাকে অসামাজিক মনে করত। সে বাড়ি আর বাগানের বাইরে কোথাও যেত না। একমাত্র যে সব গরীব তার বাড়িতে সাহায্যের জন্য আসত বা উঁকিঝুঁকি মারত তারা ছাড়া আর কোনও মানুষের মুখ দেখতে পেত না সে। আর একজনকে সে মাঝে মাঝে দেখতে পেত তিনি হলেন স্থানীয় কুরে বা যাজক আবে মেথুব। তবে শহরের কোনও লোক বা বিদেশী কোনও পথিক যদি তার বাগানের ফুল দেখতে চাইত তাহলে সে হাসিমুখে তার বাগানটা ঘুরিয়ে দেখাতে তাকে। এই লোককেই বলা হত 'ব্রিগ্রান্ড অফ দি লযের' অর্থাৎ লয়ের নদীর দস্যু।

সে যুগের সামরিক ইতিহাসের কোনও ছাত্র যদি গ্রাঁদ আর্মি বা বিশাল সৈন্যদলের বুলেটিন বা ফ্রান্সের যুদ্ধের কোনও স্মৃতিকথা পড়ে তাহলে সে দেখতে পাবে জর্জ পঁতমার্সির নামটা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে তাতে। পঁতমার্সি যুবক বয়সে সেঁতোনে সেনাদলের অধীনে এক পদাতিক হিসাবে যোগদান করে। রাজতন্ত্রের যুগে এক একটি প্রদেশের নাম অনুসারেই এক একটি সেনাদলের নামকরণ হয়। স্পায়ার, ওয়ার্মম, তার্খেম প্রভৃতি বহু জায়গায় যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে পঁতমার্সি এবং যে বারোজন বীর সৈনিককে হেসির রাজার এক বিরাট সৈন্যদলের আক্রমণের প্রতিরোধ করতে হয়েছিল, পঁতমার্সি ছিল তাদের অন্যতম। যুদ্ধটা হয়েছিল আন্দারনাম দুর্গপ্রাকারের বাইরে। শত্রুপক্ষের জোর গোলাবর্ষণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে পিছিয়ে আসে

তারা। মঁত প্যালিসেলে ক্লেবারের অধীনে যুদ্ধ করার সময় তার হাতের এক জায়গা ভেঙে যায়। তারপর সে সহকারী লেফটন্যান্ট হয়। অস্টারলিৎস-এর যুদ্ধে যুদ্ধ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে পঁতমার্সি। রাশিয়ার রাজকীয় বাহিনী যখন ফরাসী চতুর্থ বাহিনীকে আক্রমণ করে, পঁতমার্সি তখন একদল সৈন্য নিয়ে সেই আক্রমণ প্রতিহত করে রুশবাহিনীকে তাড়িয়ে দেয়। সম্রাট তাকে একটা ক্রস উপহার দেন। পঁতমার্সি ওয়ামদারকে খাবুওয়ার মেনামকে আলেকজেন্দ্রিয়া এবং ম্যাককে উলথে বন্দী হতে দেখে সে গ্রাঁদ আর্মির অধীনে অষ্টম বাহিনীতে থাকার সময় মর্তিমারের অধীনে যুদ্ধ করে হামবুর্গ দখল করে। তারপর সে ৫৫ তম ফ্ল্যান্ডার্স বাহিনীতে স্থানান্তরিত হয়। এলয়-এর যুদ্ধে বীর ক্যাপ্টেন লুই হুগো যখন তিন ঘণ্টা ধরে শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করে রাখে তখন যে তিনজন জীবিত অবস্থায় সেই আক্রমণের কবল থেকে বেরিয়ে আসে পঁতমার্সি ছিল তাদের অন্যতম। সে ফ্রেডন্যান্ডে যুদ্ধ করে। যুদ্ধের জন্য যে সব জায়গায় তাকে যেতে হয় সেগুলি হলো মস্কো, লুৎজেন, বিরোসিনা, ড্রেসডেন, লিপজিগ, গেলেনহসেনের গিরিবর্ত্ম। এ ছাড়াও তাকে যেতে হয় মার্নের নদীর তীরে এক লাঁওর পরিখায়। আর্নে লে দাকের যুদ্ধে সে যখন একজন ক্যাপ্টেন ছিল তখন দশজন কশাককে তরবারির আঘাতে হত্যা করে তার উর্ধ্বতন অফিসারকে উদ্ধার করে। সেই যুদ্ধে সে আহত হয় এবং বোমার সাতাশটা টুকরো তার বাঁ হাতের উপর অংশ থেকে বার করা হয়। প্যারিসের পতনের আট দিন আগে সে অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগদান করে। সে একই সঙ্গে তরবারি ও বন্দুক চালনায় পারদর্শী ছিল। আবার সেনাদল পরিচালনাতেও সে ছিল সিদ্ধহস্ত। নেপোলিয়নের সঙ্গে স্পে এলবা যায় এবং ওয়াটারলু যুদ্ধে সে এক সেনাদল পরিচালনা করে। শত্রুপক্ষের নুলেবার্গ বাহিনীর পতাকা দখল করে সেটাতে রক্ত মাখিয়ে নেপোলিয়নের পায়ের তলায় ফেলে দেয়। তার মুখে তখন তরবারির আঘাত লাগে এবং ক্ষত হয় তাতে। নেপোলিয়ন তখন তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, এখন থেকে তুমি হলে কর্নেল, ব্যারন, লিজিয়ন দ্য অনারের একজন অফিসার।

পঁতমার্সি তখন সম্রাটকে উত্তর করে, আমি আমার বিধবা পত্নীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মহারাজ। তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে ওহেনের পথে পড়ে যায়। এই হচ্ছে পঁতমার্সির জীবনকাহিনী। পঁতমার্সিই হলো লয়েরের দস্যু।

এর পরের কাহিনীরও কিছুটা শুনেছি আমরা। থেনার্দিয়ের তাকে ওহেনের সেই পথ থেকে তোলে। পরে সে সেরে ওঠে। আবার সে ফরাসী বাহিনীতে যোগ দেয়। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তাকে অর্ধেক বেতন দিয়ে ভার্নল শহরে প্রহরাধীন অবস্থায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাজা অষ্টাদশ লুই সবকিছু বিবেচনা করে তার কর্নেল এবং লিজিয়ন দ্য অনারের পদ অস্বীকার করেন। তার পদোন্নতি মেনে নিলেন না তিনি। তবু পঁতমার্সি 'কর্নেল ব্যারন পঁতমার্সি' এই নামে স্বাক্ষর করত এবং তার নীল রঙের জ্যাকেটের উপর লিজিয়ন দ্য অনারের ব্যাজটা না লাগিয়ে কোথাও বেরোত না। এজন্য তাকে নোটিশ দেওয়া হয় সরকারের তরফ থেকে। তবু সে

আট দিন এই ব্যাজ পরে ঘুরে বেড়ায়, অথচ কেউ তার উপর হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেনি। এই সময় 'মেজর পঁতমার্সি' নামে তার কাছে সরকারী চিঠি এলে সে চিঠি সে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। স্যার হাডসন লো একসময় 'জেনারেল নেপোলিয়ন' এই নামে চিঠি দিলে নেপোলিয়নও এইভাবে ফেরৎ পাঠান পত্রপ্রেরকের কাছে।

মেজরের অর্ধেক বেতন নিয়ে ভার্নল শহরের একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হয় তাকে। নেপোলিয়নের অধীনে সেনাদলে থাকার সময়েই মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের ছোট মেয়েকে বিয়ে করে সে। এই বিয়েতে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ-এর মত না থাকলেও বাধ্য হয়ে মত দেন শেষে। মত দিয়ে প্রতিবাদের সুরে বলেন, অনেক বড় বড় অভিজাত পরিবারকেও এই সব ব্যাপার সহ্য করতে হয়। স্ত্রী হিসাবে ভালই ছিল মাদাম পঁতমার্সি। সে তার স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী ছিল। সে একটি পুত্রসন্তান রেখে অকালে মারা যায়। ছেলেটা কাছে থাকলে স্ত্রীবিয়োগজনিত নিঃসঙ্গতার মাঝেও সান্ত্বনা পেত পঁতমার্সি। কিন্তু মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তাঁর মেয়ের ছেলের উপর দাবি জানিয়ে তাকে কাছে রাখতে চান। বলেন, ছেলেকে এখন তাঁর কাছে না রাখলে তাঁর কোনও সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে না সে। পঁতমার্সি তখন বাধ্য হয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ফুলের চাষ নিয়ে মেতে থাকে।

এরপর পঁতমার্সি রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সব কিছু পরিত্যাগ করে। রাজ্যের কোনও ষড়যন্ত্র বা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি সে। সে শুধু তার অতীতের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে এক নির্দোষ নিরীহ জীবন যাপন করত।

জামাই-এর সঙ্গে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাঁর কাছে জামাই হলো এক দস্যু। আর জামাই-এর কাছে তার শ্বশুর ছিল এক নির্বোধ বৃদ্ধ। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তাঁর জামাই পঁতমার্সিকে কর্নেল বা ব্যারন বলে স্বীকার করতেন না। বরং তা নিয়ে উপহাস করতেন লোকের কাছে। তিনি জামাইকে আগেই বলে দিয়েছিলেন সে তার ছেলেকে দেখার জন্য কোনওদিন তার বাড়িতে আসতে পাবে না। যদি আসে তাহলে তার ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন। ছেলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই রাখতে পারবে না সে। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তাঁর নাতিকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

এই ধরনের শর্ত মেনে নেওয়া হয়ত উচিত হয়নি পঁতমার্সির। কিন্তু ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সবকিছু মেনে নেয় সে। সব দুঃখ সব অপমান নিজের মাথার উপর চাপিয়ে নেয় সে। অবশ্য মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের সম্পত্তির পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু তাঁর বড় মেয়ে তার মার তরফ থেকে মোটা রকমের এক সম্পত্তি পায়। সে অবিবাহিতা, সুতরাং তার মৃত্যুর পর তার সব সম্পত্তি তার বোনের ছেলেই পাবে।

ছেলেটির নাম ছিল মেরিয়াস। মেরিয়াস জানত তার মা নেই, কিন্তু বাবা জীবিত আছে। তবে শুধু কানে এই কথাটাই শুনেছে। এর বেশি কিছু জানতে পারেনি। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ যে সব জায়গায় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান সেখানকার লোকেরা

তার বাবার সম্বন্ধে যে সব উক্তি করে তাতে তার লজ্জা হয় বাবার কথা ভাবতে। তাকে দেখতে বা তার কথা জানতে আর ইচ্ছা হয় না।

এইভাবে বেড়ে ওঠে মেরিয়াস। দু-তিন মাস অন্তর একবার করে লুকিয়ে প্যারিসে যেত কর্নেল পঁতমার্সি। চোরের মতো লুকিয়ে নিজের ছেলেকে দেখতে যেত সে। সেন্ট আপ্রিসের চার্চে তার মাসির সঙ্গে যখন প্রার্থনাসভায় যেত মেরিয়াস তখন পঁতমার্সি চার্চের একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকত ছেলেটাকে একবার শুধু চোখের দেখা দেখার জন্য। ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ তাকে দেখে ফেলবে এই ভয়ে কাঁপত সে। যে জীবনে কত যুদ্ধ জয় করেছে, কত আঘাত কত আক্রমণের সামনে বুক পেতে দিয়েছে, সে আজ সামান্য এক নারীর ভয়ে ভীত।

এই অবস্থাতে ভার্নল শহরের ছোট গীর্জার কুরে বা প্রধান যাজক আবে মেবুফের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় পঁতমার্সির।

বন্ধুত্ব হওয়ার আগে মেবুফই প্রথম দেখেন পঁতমার্সিকে। সেন্ট সাপ্লিস চার্চের একজন কর্মচারী ছিল মেবুফের ভাই। সেই সূত্রে মাঝে মাঝে সেই চার্চে যেতেন মেবুফ। সেখানে তিনি একাধিকবার লক্ষ্য করেন চার্চের একটি থামের আড়াল থেকে একটি লোক কপালে এক ক্ষতচিহ্ন ও চোখে অশ্রুধারা নিয়ে একটি ছেলেকে লুকিয়ে দেখছে। মেবুফের ভাইও ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে যায়। বলিষ্ঠ চেহারার একজন পুরুষ কেন মেয়েদের মতো চোখের জল ফেলছে তা সে বুঝতে পারে না।

একদিন সেন্ট সাপ্লিস চার্চের সেই কর্মচারী ভার্নলে তার ভাই-এর কাছে বেড়াতে গিয়ে সেন নদীর পুল থেকে কর্নেল পঁতমার্সিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরে যায়। সে তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কর্নেল পঁতমার্সির বাড়িতে চলে যায়। পঁতমার্সি প্রথমে কিছু বলতে চায়নি। পরে সে তার জীবনের সব কথা খুলে বলে তাদের কাছে। তখন মেবুফরা জানতে পারেন কিভাবে পঁতমার্সি শুধু তার ছেলের ভবিষ্যতের জন্য জীবনের সব সুখ ত্যাগ করেছে। এই কারণেই কুরে মেবুফ কর্নেলকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে থাকে সেদিন থেকে এবং পঁতমার্সিও সে শ্রদ্ধার প্রতিদান দিত। এইভাবে দুটি সৎ লোক অর্থাৎ একজন বয়োপ্রবীণ যাজক এবং একজন বয়োপ্রবীণ সৈনিক এক বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দু'জনে দু'জনকে গভীরভাবে বুঝতে পারে। একজন এই মর্ত্যভূমিতে দেশের সেবা করেছে, আর একজন স্বর্গে দেশের সেবা করে, অর্থাৎ দেশের জন্য স্বর্গলোকে প্রার্থনা জানায়। সুতরাং কোনও পার্থক্য নেই দু'জনের মধ্যে।

শুধু সারা বছরের মধ্যে ছয় দিন মেরিয়াসকে তার বাবার কাছে দুটো চিঠি লেখার অনুমতি দেওয়া হত। একটা হলো নববর্ষের দিন আর একটা হলো সেন্ট জর্জের জন্মোৎসবের দিন। তার মাসি যা বলে দিত চিঠিতে তাই লিখত মেরিয়াস। সে চিঠির উত্তরে তার স্নেহ-ভালবাসা জানিয়ে অনেক বড় চিঠি লিখত পঁতমার্সি। কিন্তু সে চিঠি তার ছেলের হাতে পৌঁছত না। সে চিঠি দুমড়ে-মুচড়ে তাঁর পকেটের মধ্যে ভরে রেখে দিতেন মাঁসিয়ে গিলেনর্মাদ।

৩

একমাত্র ব্যারনপত্নীর বাড়ি ছাড়া জগতের আর কোনও কিছুই জানে না বা চেনে না মেরিয়াস। বাইরের জগৎ ও জীবনের যা কিছু এই বাড়িটার মধ্যে দিয়েই সে দেখে। কিন্তু কেমন এক হিমশীতল বিষাদে সব সময় যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে বাড়িটা। এখানে আনন্দের থেকে নিরানন্দ ভাবটাই বেশি, উষ্ণতার থেকে শীতলতা বেশি, আলোর থেকে অন্ধকার বেশি।

মেরিয়াস এ বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের সব হাসি, মনের সব খুশি মিলিয়ে যায়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে সেও বদলে যায়। সে বাড়িতে যত সব বর্ষীয়ান অভিজাত পুরুষ আর বর্ষীয়সী মহিলাদের দেখত আর তাদের যত সব বাতিকগ্রস্ত আচরণের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত মেরিয়াস। যে সব বর্ষীয়সী মহিলারা ব্যারনপত্নীর বাড়িতে আসত তারা হলো মাদাম নো, নেভি অব ক্যাম্বিস। তারা যে ঘরে আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসত সে ঘরটা এক সবুজ বাতির আলোর দ্বারা আলোকিত থাকত। উপস্থিত পুরুষ ও মহিলাদের মাথাভরা সাদা চুল, ঘরের মিটমিটে আলো, বিগত যুগের পোশাক, তাদের গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং দুর্বোধ্য কথাবার্তা এক অদ্ভুত ভাব জাগাত মেরিয়াসের মনে। তার মনে হত এরা যেন মহিলা নয়, প্রাচীন যুগের পিতামহী এবং ডাইনি। মনে হত তারা জীবন্ত মানুষ নয়, মানুষের প্রেতমূর্তি।

কিন্তু এই সব প্রেতমূর্তির মাঝে কিছুসংখ্যক যাজক ও সামন্তকে দেখা যেত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মার্কুই দ্য সাসেনে, বেরির ডিউকপত্নীর সেক্রেটারি, ভিকোঁতে দ্য ভ্যালেরয় যিনি চার্লস আঁতোনের ছদ্মনামে কিছু ছন্দোবদ্ধ প্রশস্তিমূলক কবিতা প্রকাশিত করেন, প্রিন্স দ্য বোফ্রেমঁত যাঁর চুলগুলো সাদা হয়ে উঠলেও শক্তিতে যুবক এবং যাঁর সুন্দরী স্ত্রী লাল মখমলের পোশাক পরে আসত, মার্কুই দ্য কোরিওলিস, কোঁত দ্য আমেন্দ্রে আর ছিলেন পোর্ত দ্য গী।

মঁসিয়ে পোর্ত দ্য গীকে সবচেয়ে বেশি বয়সের বলে মনে হত। তিনি শুধু ১৭৯৩ সালের স্মৃতিকথা বলতে ভালবাসতেন। ঐ বছর তিনি বিপ্লবীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার অভিযোগে ধরা পড়েন এবং তিনি কারারুদ্ধ হন। সেখানে গিয়ে দেখেন মিরেপয়ের অশীতিপর বৃদ্ধ বিশপকেও ধরে এনে আটক রাখা হয়েছে। সেটা হলো তুলঁর কারাগার। তাঁদের সেখানে কাজ ছিল ফাঁসির মঞ্চে সারাদিন গিলোটিনে যাদের মাথা কাটা যেত তাদের কাটা দেহ ও মুণ্ডুগুলো সন্ধ্যার পর সরিয়ে এক জায়গায় ফেলে দেওয়া। তারা পিঠে করে মৃতদেহগুলো বয়ে নিয়ে যেত। তাদের লাল জামাগুলোতে চাপ চাপ রক্ত লেগে যেত। রাত্রিতে যে জামাগুলো ভিজে যেত, সকাল হতেই সেগুলো শুকিয়ে যেত। এই ধরনের কাহিনী কথিত হত ব্যারনপত্নীর বাড়িতে।

যাজকদের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় আবে হানসার। এছাড়া ছিলেন পোপের লোক মাননীয় মাচি এবং দু'জন কার্ডিনাল—মঁসিয়ে দ্য লা লুজার্নে আর ক্লারমত ডনারে। কার্ডিনাল লুজার্নে পরে লেখক হিসাবে নাম করেছিলেন এবং লে

কনজারভেতিউর-এ নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। মঁসিয়ে ক্লারমত তুলুদের আর্কবিশপ ছিলেন, কিন্তু প্যারিসে নিয়মিত বেড়াতে আসতেন। তিনি লাল মোজা পরতেন এবং বিলিয়ার্ড খেলায় খুব ঝোঁক ছিল তাঁর। তাঁকে ব্যারনপত্নীর বাড়িতে প্রথম নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেনলিসের বিশপ মঁসিয়ে দ্য রোকেনর যাঁর চেহারাটা খুব লম্বা ছিল এবং যিনি একাডেমি ফ্রাঁসোয়ার সদস্য হিসাবে প্রচুর খাটতেন। এই সব যাজকরা চার্চের লোক হলেও আসলে ছিলেন কেতাদুরস্ত সভাসদ এবং তাঁদের উপস্থিতি ব্যারনপত্নীর বাড়ির আবহাওয়াটাকে একটা আভিজাত্য দান করত। এ ছাড়া ফ্রান্সের পাঁচজন পীয়ার বা লর্ড ছিলেন। তথাপি সে যুগে বিপ্লবের প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় সামন্তদের এই সভায় একজন মধ্যবিত্ত সমাজের লোক উপস্থিত থাকতেন। তিনি মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ।

ব্যারনপত্নীর বাড়িতে যারা আসত তারা ছিল প্যারিস সমাজের শ্বেত প্রতিক্রিয়াশীলদের সার অংশ। তবে সেকালের রাজতন্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত নামকরা লোকদের যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা হত। যেমন শ্যাতোব্রিয়াঁদ ব্যারনপত্নীর বাড়িতে ঢুকলে সবাই তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত। তা সত্ত্বেও যে সব রাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রকে মেনে নেন তাঁদের বাছাই করে এই সভায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কোঁতে বোগলৎ যিনি সম্রাটের আমলে উচ্চ পদে আসীন ছিলেন।

বর্তমানে অভিজাত বাড়িগুলোর সে চেহারা আর নেই। আজকের দিনে রাজতন্ত্রীরা গণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে।

ব্যারনপত্নীর কাছে বেশি বয়স বা কম বয়সের যে সব লোক আসত তারা সবাই মৃতবৎ। বাড়িটার মতোই নির্জীব। সেকেলে যেসব বৃদ্ধ এ বাড়ির সভায় আসত তাদের ভৃত্যগুলোও ছিল তাদের মতোই নির্জীব। তাদের দেখে মনে হত তারা যেন অনেক কাল আগে বেঁচে ছিল, এখন আর বেঁচে নেই এবং জোর করে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাদের সম্বন্ধে শুধু একটা কথাই খাটে, তারা রক্ষণশীল। প্রভুরা যেমন প্রাণহীন পাথর দিয়ে তৈরি মনে হত, তেমনি তাদের ভৃত্যরা যেন ছিল খড়ের মানুষ। একজন বয়স্ক মহিলা বিদেশে বেড়াতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে এসে একটার বেশি ভৃত্য রাখতে পারত না। কিন্তু বাইরে কথায় কথায় সে বলত আমার লোকরা।

১৮১৪ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত এই ছয় বছরের মধ্যে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা সব ঘটে যায়। এই অন্তবর্তীকালীন সময়টা অদ্ভুত ধরনের। এ সময়টা একদিকে প্রাণচঞ্চলতায় ভরা, আবার অন্যদিকে মৃত্যুর মতো হিমশীতল। একদিকে অন্ধকার, ছায়াচ্ছন্ন, আবার অন্য দিকে এক নতুন প্রভাতের আলোকরশ্মির দ্বারা উদ্ভাসিত। আলো-ছায়ায় মেশানো সে এক অদ্ভুত জগৎ, যা ছিল একই সঙ্গে নবীন এবং প্রাচীন, বিষণ্ন এবং হর্ষোৎফুল্ল, যৌবনসমৃদ্ধ এবং বার্ধক্যজর্জরিত। তারা রাগের সঙ্গে ফ্রান্সকে দেখত, অতীতের ফ্রান্সকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে দেখত। সে ফ্রান্সে মার্কুই এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা রাস্তায় ভূতের মতো ঘুরে বেড়ায়। যারা বিদেশ থেকে এসে রাজতন্ত্রের অবসান দেখে তারা হতাশ হয়ে চোখের জল ফেলতে থাকে। তারা দেখে পুরনো

জগতের সবকিছুই যেন এক বিরাট বন্যার সর্বগ্রাসী প্লাবনে ভেসে গেছে। এ বন্যা ভাবাদর্শের বন্যা। এই বন্যা কত তাড়াতাড়ি পুরনো সবকিছুকে ডুবিয়ে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আবার কত তাড়াতাড়ি নতুন অনেক কিছুকে সৃষ্টি করে।

ব্যারনপত্নীর বাড়িতে যারা আসত তারা এই সব কথা ভাবত। মঁসিয়ে মার্তেনভিলে ছিলেন ভলতেয়ারের থেকে রসিক এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। তারা রাজনীতি আর সাহিত্য দুটোই আলোচনা করত, যে সব লেখকদের নাম আজ লোকে ভুলে গেছে তারা তখন তাদের কথা আলোচনা করত। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উপরেও মন্তব্য করত! তারা বলত নেপোলিয়ন ছিলেন কর্সিকার এক নরখাদক, রাজার সেনাদলে লেফ্‌টন্যান্ট জেনাবেলের কাজ করতে করতে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করে বিরাট শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন।

কিন্তু ১৮১৮ সালের মধ্যে রাজতন্ত্রবাদীরা তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের শুচিতা কাটিয়ে ফেলে। অনেক তাত্ত্বিক এসে ঢুকে পড়ে তাদের দলে। তারা নীতিগতভাবে রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও মুখে তা স্বীকার করতে লজ্জা পেত। আবার গোঁড়া নীতিবাদীরা প্রকাশ্যে তাদের মতবাদের কথা ঘোষণা করত।

তারা বলত, রাজতন্ত্রের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এই রাজতন্ত্র আমাদের অনেক সেবা করেছে। এই রাজতন্ত্র আমাদের পুরনো প্রথা ও রাজনীতি, ধর্ম, শ্রদ্ধাভক্তি, আত্মসম্মান সবকিছুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছে নতুন করে। রাজতন্ত্র মানুষকে আনুগত্য, বীরত্ব, ভালবাসা, ভক্তি প্রভৃতি দান করে। রাজতন্ত্র রাজার মহত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির মহত্ত্বকে তুলে ধরে। তবে রাজতন্ত্রের একটা ভুল, তা বিপ্লবের তাৎপর্যকে বুঝতে ভুল করে! বিপ্লব নতুন যুগের যে নতুন ভাবধারা নিয়ে এক নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করে রাজতন্ত্র তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু রাজতন্ত্র যেমন বিপ্লবের উত্তরাধিকারী এবং যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী, সেই আমাদেরও আরও সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত ছিল রাজতন্ত্রের প্রতি। বোঝা উচিত ছিল, যে বিপ্লব রাজতন্ত্রের উপর আঘাত হানে সে বিপ্লব তার উদারনীতিবাদের পরিচয় দিতে পারেনি। একে যদি বিপ্লবীরা উদারনীতি বলে তাহলে সেটা হবে ধ্বংসাত্মক উদারনীতিবাদ। বিপ্লবী ফ্রান্স ঐতিহাসিক ফ্রান্সকে অশ্রদ্ধা করে অর্থাৎ সে যেন তার মাকেই অশ্রদ্ধা করে। আমরা যেমন আজ তাদের পতাকার মর্ম বুঝতে পারি না, বিপ্লবীরাও ঈগলচিহ্নিত পতাকার ধর্ম বুঝতে পারেনি।

এইভাবে রাজতন্ত্রবাদী তাত্ত্বিকের দল রাজতন্ত্রের সমালোচনা করত এবং একই সঙ্গে তার গুণগান করত।

ব্যারনপত্নীর বাড়িতে অভিজাত সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলাদের যে সভা বসত তার বর্ণনা প্রসঙ্গে অধুনালুপ্ত এক সমাজের ছবি তুলে ধরা হলো। এই বর্ণনায় কারো প্রতি তিক্ততা বা বিদ্রূপ প্রদর্শন করা হয়নি। ফ্রান্সের এক অতীত যুগ ও সমাজের প্রতিভূ ছিল যেন অভিজাতদের সেই সভাটা। তাদের আমরা ঠিক শ্রদ্ধা করতে না পারলেও ঘৃণা করা কোনও মতেই উচিত নয়।

পঁতমার্সির ছেলে মেরিয়াস প্রথমে স্কুল থেকে তার বাল্য শিক্ষা লাভ করে। প্রথম

প্রথম তার মাসি তাকে বাড়িতে পড়াত। পরে সে বড় হয়ে উঠলে তার দাদামশাই মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই গৃহশিক্ষকও ছিলেন চিরায়ত ভাবধারার মানুষ এবং নিজের জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে আত্মাভিমান ছিল তাঁর প্রচুর। এইভাবে এক গোঁড়া সতীনারীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে এক গোঁড়া পাণ্ডিত্যাভিমানীর কবলে পড়ে মেরিয়াস পঁতমার্সি। স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া পড়তে থাকে সে। পরে সে আইন পাশ করে। সেও হয়ে ওঠে এক গোঁড়া রাজতন্ত্রী। কিন্তু তার মা-বাবার প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ছিল না। চপলতা ও উন্নাসিক ভাব মোটেই ভাল লাগত না তার। সে ছিল একই সঙ্গে উদার, উচ্চমনা, অহঙ্কারী, ধর্মপ্রবণ, আবেগপ্রবণ, আপোসহীন ও একদিক দিয়ে মনুষ্যবিদ্বেষী ও অসামাজিক।

৪

মেরিয়াসের পড়াশুনো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ ফবুর্গ সেন্ট জার্মেনকে বিদায় জানিয়ে তাঁর রু্য দ্য ফিলের বাড়িতে চলে আসেন। তখন তাঁর কাছে দু'জন ভৃত্য ছিল—একজন নারী আর একজন পুরুষ ভৃত্য। নারীভৃত্যের নাম নিকোলেত্তে আর পুরুষ ভৃত্যের নাম বাস্ক।

১৮২৭ সালে মেরিয়াসের বয়স যখন ছিল সতের তখন একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে দেখে দাদামশাই একটা চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মেরিয়াস কাছে এলে তিনি তাকে বললেন, মেরিয়াস, তোমাকে কাল ভার্নলে যেতে হবে।

মেরিয়াসের দেহটা কিছুটা কেঁপে উঠল। মেরিয়াস বুঝতে পারল তার বাবার কাছে তাকে যেতেই হবে। এ কাজ তার কাছে শুধু অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর নয়, অস্বস্তিকরও বটে। এইভাবে তার বাবার সঙ্গে পুরনো বিচ্ছেদের অবসান ঘটবে এটা সে ভাবতেই পারেনি। মেরিয়াসের মনে বরাবর এই ধারণা দানা বেঁধেছিল যে তার প্রতি তার বাবার কোনও স্নেহ-মমতা নেই। তাই তার বাবার প্রতিও কোনও ভক্তি-ভালবাসা জাগেনি তার মনে। তার বাবা যদি প্রথম থেকে তাকে দেখত তাহলে কেন তাকে অপরের কাছে থাকতে হবে?

কথাটা শুনে বিস্ময়ে এত অভিভূত হয়ে পড়ল মেরিয়াস যে সে আর কোনও প্রশ্ন করল না মঁসিয়ে গিলেনর্মাদকে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, মনে হয় সে অসুস্থ। সে তোমাকে দেখতে চায়।

আবার দু'জনেই চুপচাপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, তোমাকে খুব সকালে উঠতে হবে। আমি জানি কুর দে ফঁতেন যাবার একটা গাড়ি ছাড়ে কাল ছটায় এবং সেখানে সন্ধ্যার সময় পৌঁছায়। তোমাকে সেই গাড়িটা ধরতে হবে। সে চিঠিতে লিখেছে, তোমাকে যেতেই হবে।

চিঠিটা মুচড়ে পকেটের মধ্যে রেখে দিলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ। মেরিয়াস ইচ্ছা করলে সেই রাতেই রওনা হয়ে পরদিন সকালে তার বাবার কাছে পৌঁছতে পারত।

কারণ সেই রাতেই একটা গাড়ি ছাড়ে এবং সেটা ভার্নল শহরের পাশ দিয়ে যায়। কিন্তু সে গাড়ি সম্বন্ধে সে বা মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ কোনও কথা বলল না। কোনও খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করল না।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ভার্নল শহরে পৌঁছল মেরিয়াস। গাড়ি থেকে নেমেই যাকে সামনে পেল মঁসিয়ে পঁতমার্সির বাড়িটা কোথায় তা জিজ্ঞাসা করল। তার বাবার নামের আগে কর্নেল বা ব্যারন কিছু বলল না।

বাড়িতে পৌঁছে দরজার ঘণ্টা বাজাতেই বাতি হাতে একজন মহিলা দরজা খুলে দিল।

মেরিয়াস তাকে বলল, এটা কি পঁতমার্সির বাড়ি?

কোনও কথা না বলে মহিলা মেরিয়াসের দিকে তাকাল।

মেরিয়াস আবার বলল, এখানে তিনি থাকেন?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল মহিলা।

মেরিয়াস বলল, আমি তাঁর পুত্র। আমার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি।

মহিলা বলল, আর অপেক্ষা করছেন না।

মেরিয়াস দেখল মহিলার চোখে জল।

মহিলা নীরবে একটা ঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল। মেরিয়াস সে ঘরে ঢুকে গেল। গিয়ে দেখল ঘরের মধ্যে তিনজন লোক রয়েছে। ঘরের মধ্যে একটা বাতি জ্বলছে। তিনজন লোকের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে আছে, একজন নতজানু হয়ে বসে আছে আর একজন মেঝের উপর শায়িত আছে। প্রথম দু'জন হলো ডাক্তার আর যাজক; তৃতীয় ব্যক্তি হলো কর্নেল পঁতমার্সি।

তিন দিন আগে মস্তিষ্কের জ্বরে আক্রান্ত হয় পঁতমার্সি। রোগের গুরুত্বের কথা বুঝতে পেরে সে তার ছেলেকে পাঠাবার জন্য মঁসিয়ে গিলেনর্মাদকে চিঠি লেখে। অবস্থা তার ক্রমশই খারাপের দিকে যেতে থাকে এবং আজ সন্ধ্যায় প্রলাপ বকতে বকতে হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে পড়ে। বাড়িতে যে মহিলাটি থাকত সে তাকে থামাতে বা আটকে রাখতে পারেনি। পঁতমার্সি শুধু বলছিল, আমার ছেলের আসতে দেরি হচ্ছে। আমাকে তার কাছে যেতে হবে।

যেতে গিয়ে পাশের ঘরে পড়ে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ডাক্তার আর যাজককে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু তাদের দু'জনেরই আসতে দেরি হয়। বাতির স্বল্প আলোয় পঁতমার্সির গালে চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জলের একটা রেখা দেখতে পাওয়া যায়। যে চোখ থেকে সে জল গড়িয়ে পড়ে সে চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। তার ছেলের আসতে দেরি হওয়ার জন্যই এ জল বেরিয়ে আসে তার চোখ থেকে। চোখ বন্ধ হলেও সে জল শুকোয়নি।

মেঝের উপর মৃত লোকটিকে জীবনে প্রথম এবং শেষবারের মতো দেখছে মেরিয়াস। গম্ভীর বীর পুরুষের মতো মুখ, মাথায় সাদা চুল, যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেহ। যে মুখের উপর ঈশ্বরদত্ত দয়ার ছাপ ফুটে আছে, সেই মুখেই বীরত্বের চিহ্নস্বরূপ এক ক্ষতের

দাগ। মেরিয়াস ভাবতে লাগল, এই ব্যক্তিই তার পিতা, এবং এখন সে মৃত। তবু সে বিচলিত হলো না কিছুমাত্র। অন্য যে কোনও মৃত ব্যক্তির জন্য যে দুঃখ সে অনুভব করে তার বেশি কোনও দুঃখ সে অনুভব করল না।

তথাপি শোকবিলাপের এক বেদনায় ভরে উঠল সমস্ত ঘরখানা। বাড়ির মহিলাটি ঘরের এক কোণে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। যাজক নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছিলেন মৃতের জন্য। ডাক্তারের চোখেও জল এসেছিল। তিনি চোখ মুছছিলেন। মৃতের চোখের জল তখনো শুকোয়নি।

ঘরের উপস্থিত সকলে মেরিয়াসের দিকে তাকাল। তারা কেউ তাকে চেনে না। নিজের মধ্যে কোনও শোকানুভূতি না জাগায় লজ্জাবোধ করছিল মেরিয়াস। তার টুপি হাতে ধরা ছিল। সেটা সে মেঝের উপর ফেলে দিল। যেন মনে হলো সেটা ধরে রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে শোকের চাপে। পরে সে তার জন্য নিজেকেই দোষ দিতে লাগল মনে মনে। ভাবল সে যদি তার বাবাকে ভাল না বাসতে পারে তাহলে সেটা কি তার দোষ?

কর্নেল পঁতমার্সি কিছুই রেখে যেতে পারেনি। বাড়িতে যা জিনিসপত্র আছে তা বিক্রি করে শুধু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ চলবে। পঁতমার্সি একটা কাগজে কি লিখে রেখে যায় মৃত্যুর আগে। কাগজটা মেরিয়াসের হাতে দেওয়া হলো। লেখাটা কর্নেল পঁতমার্সির নিজের হাতে। এটা সে তার ছেলের উদ্দেশ্যে লিখে যায়। তাতে লেখা ছিল :

আমার ছেলের জন্য। ওয়াটারলুব যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট আমাকে ব্যারন উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু যে উপাধি আমি দেহের রক্তের বিনিময়ে লাভ করি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র তা আমাকে দান করতে অস্বীকার করে। সে উপাধি আমার পুত্র ধারণ ও বহন করবে। আশাকরি সে তার যোগ্য হয়ে উঠবে।

ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হবার পর একজন সার্জেন্ট আমার জীবন রক্ষা করে। তার নাম ছিল থেনার্দিয়ের। আমার মনে হয় বর্তমানে সে প্যারিসের অদূরে শেলেস বা মঁতফারমেল গাঁয়ে একটা হোটেল চালায়। আমার ছেলে যদি তাকে কখনো খুঁজে পায় তাহলে যথাশক্তি সে সেবা করবে তার।

পিতার প্রতি কর্তব্যবোধের খাতিরে নয়, মৃতের শেষ ইচ্ছার প্রতি সাধারণ মানুষের এক অন্ধ শ্রদ্ধার বশবর্তী হয়ে কাগজটা রেখে দিল মেরিয়াস।

পঁতমার্সির মৃত্যুর পর তার কোনও কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। তার তরবারি আর সামরিক পোশাক পুরনো জিনিস কেনাবেচার এক দোকানে কম দরে বিক্রি করে দিলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ।

মেরিয়াস ভার্নলে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা ছিল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে প্যারিসে ফিরে আসে। তখন সে আইন পড়ছিল। সে আবার পড়াশুনোয় মন দিল। তার বাবার জীবদ্দশাতে যেমন সে তার কথা ভাবেনি তেমনি তার মৃত্যুর পরেও তার কথা কিছুই ভাবল না।

মেরিয়াস শুধু কিছুদিনের জন্য মাথার টুপির উপর একটা কালো ব্যান্ড এঁটে রাখল। এই হলো তার পিতার প্রতি শেষ কর্তব্য।

৫

মেরিয়াসের ধর্মীয় আচার-আচরণগুলো তার বাল্যকাল থেকেই গড়ে ওঠে। সে নিয়মিত সেন্ট সাপ্লিসের ছোট চার্চটায় সমবেত প্রার্থনাসভায় যোগদান করতে যেত। সাধারণত সে তার মাসির পাশে বসত। কিন্তু একদিন অন্যমনস্কতার জন্য একটা থামের পাশে বসে পড়ে। থামটার গায়ে একটা জায়গায় লেখা ছিল, মঁসিয়ে মেবুফ।

প্রার্থনাসভা শুরু হতে না হতেই একজন বৃদ্ধ এসে মেরিয়াসের কাছে এসে বলল, মঁসিয়ে, এটা আমার জায়গা।

মেরিয়াস সরে গেল তাড়াতাড়ি। বৃদ্ধ মেবুফ সেখানে বসল।

মেবুফ বলল, আপনার সময় নষ্ট ও বিরক্ত করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে। আপনি হয়ত আমাকে অভদ্র ভাববেন। অবশ্য এর কারণ আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলব।

মেরিয়াস বলল, তার দরকার হবে না।

মেবুফ বলল, হ্যাঁ, কারণ আছে। আমার সম্বন্ধে কারো মনে কোনও ভুল ধারণা থাকুক এটা আমি চাই না। আমি আপনাকে বলব কেন আমি এই বিশেষ জায়গাটাতে বসি। বেশ কয়েক বছর আগে দু' তিন মাস অন্তর এই জায়গাটাতে একজন বিষাদগ্রস্ত পিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম। সে ছেলেকে এখান থেকে লুকিয়ে দেখত, কারণ পারিবারিক বিরোধের কারণে এ ছাড়া তার ছেলেকে দেখার অন্য কোনও সুযোগ ছিল না। যখন তার ছেলে চার্চের প্রার্থনাসভায় যোগদান করতে আসত ঠিক সেই সময়ে আসত সে। ছেলেটি জানত না যে তার বাবা এত কাছে আছে তার। আসলে সে তার বাবাকে চিনতই না, বাবা এই থামের আড়ালে লুকিযে চোখে জল নিয়ে তার ছেলের পানে তাকিয়ে থাকত। সে তার ছেলেকে গভীরভাবে ভালবাসত। আমি সে দৃশ্য না দেখে পারতাম না। সেই থেকে এ জায়গাটা পবিত্র হযে আছে আমার কাছে। আমার বসার জন্য আলাদা বেঞ্চ থাকা সত্ত্বেও এই জাযগায় বসেই আমি প্রার্থনা শুনি।

আমি সেই বিষাদগ্রস্ত দুঃখী মানুষটির সঙ্গে পরে পরিচিত হই। তার শ্বশুর এবং ছেলেটির এক ধনী মাসি তাকে এই বলে সতর্ক করে দেয় যে, সে তার ছেলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখলে বা ছেলেকে দেখতে গেলে তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে ছেলেটিকে বঞ্চিত করবে তারা। এই কারণে অর্থাৎ ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই নিজে সব ব্যথা সব দুঃখ বরণ করে নিয়ে ছেলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে। রাজনীতিই হলো পারিবারিক বিচ্ছেদের কারণ। অবশ্য সব লোকেরই একটা করে রাজনৈতিক মতামত থাকবে। কিন্তু তা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। একটা লোক ওয়াটারলুর যুদ্ধে যোগদান করেছে বলেই সে রাক্ষস হয়ে গেল! একজন পিতাকে তার পুত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার এটা কখনো একটা সংগত কারণ হতে পারে না। ভদ্রলোক ছিলেন বোনাপার্টের অধীনস্থ এক কর্নেল। সম্প্রতি মারা গেছেন। তিনি ভার্নলে বাস করতেন। সেখানে আমার ভাই গীর্জার প্রধানের পদে

আছেন। তাঁর কপালে তরবারির আঘাতজনিত এক ক্ষতচিহ্ন ছিল। তাঁর নামটা আমি ভুলে গেছি। পঁতমেরি অথবা মতপারসি।

মেরিয়াসের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। সে বলল, তাঁর নাম হলো পঁতমার্সি।

হ্যাঁ, এটাই তাঁর নাম। তুমি কি তাঁকে চিনতে?

মেরিয়াস বলল, তিনিই আমার পিতা।

মেবুফ বলল, ওঃ, তুমিই তাহলে তাঁর ছেলে! এখন বড় হয়ে উঠেছ। তোমার বাবা সত্যিই তোমাকে বড় ভালবাসতেন।

সভাশেষে যাবার সময় মেবুফের হাত ধরে তার বাসা পর্যন্ত গেল মেরিয়াস। পরের দিন সে তার মাতামহের কাছে গিয়ে বলল, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমি শিকারে যাব ভাবছি। আপনি কি তিন দিনের জন্য সেখানে যাবার অনুমতি দেবেন?

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, তিন কেন চার দিনের জন্য যেতে পার। ভাল করে আনন্দ করো।

এরপর তাঁর বড় মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি জোর করে বলতে পারি, ও নিশ্চয় কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়েছে।

৬

মেরিয়াস কোথায় গিয়েছিল পরে আমরা জানতে পারব। তিন দিন পরে সে প্যারিসে ফিরে এসেই সোজা চলে যায় আইন কলেজের লাইব্রেরিতে। সেখানে সে মন্ত্রিউল পত্রিকার সংখ্যাগুলো একের পর এক পড়ে যেতে থাকে।

সেখানে মন্ত্রিউল-এর একটি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রজাতন্ত্র ও সম্রাট নেপোলিয়নের আমলের ফরাসী দেশের ইতিহাস পড়তে থাকে। তাতে ছিল সেন্ট হেলেনার স্মৃতিকথা, কিছু জীবনী, সংলাপ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা প্রভৃতি অনেক তথ্য। গ্রাঁদ আর্মি বুলেটিনের এক জায়গায় তার বাবার নাম দেখতে পেয়ে আবেগে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে। এই উত্তেজনাটা এক সপ্তা ধরে তার মনের মধ্যে ছিল। সে সেই সব সেনাপতিদের সঙ্গে একে একে দেখা করল, যাদের অধীনে তার বাবা সৈনিক হিসাবে কাজ করেছে। সে মেবুফের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলল এবং তার কাছ থেকে তার বাবার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারল। তার ফুলবাগানের কথা, নির্জন জীবনযাপনের কথা সব জেনে নিল। অবশেষে সে তার বাবার জীবন ও চরিত্রের একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি এঁকে ফেলল। বুঝল তার বাবা ছিল এমনই একটা আশ্চর্য মানুষ যার মধ্যে ছিল সিংহ আর মেষশাবকের এক অদ্ভুত সমন্বয়।

অবসর সময়ে মেরিয়াস যখন এই সব নিয়ে ব্যস্ত থাকত বেশ কিছু দিন ধরে তখন তার মাতামহ ও মাসির সঙ্গে প্রায় দেখাই হত না। সে শুধু খাবার সময় একবার করে বাড়িতে আসত। কিন্তু অন্য সময় তাকে দেখাই যেত না।

তার মাসি এতে দুঃখ পেত। কিন্তু মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বলতেন, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার এই হলো সময়। আমি বেশ বলতে পারি এইজন্যই ও আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে। বড় রকমের এক প্রেমে পড়েছে নিশ্চয়।

এ সত্যিই এক প্রেম।

মেরিয়াস তখন তার বাবাকে জীবনে প্রথম ভালবাসতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে তার আজন্মলালিত ভাবধারারও পরিবর্তন শুরু হলো।

বর্তমান কালের ইতিহাস পড়ে যে ভাব তার মনে জাগল তা হলো এক চরম বিস্ময়ের ভাব।

এতদিন পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র আর সাম্রাজ্যতন্ত্রের নাম শুনলে আঁতকে উঠত ভয়ে। ও দুটো নাম যেন আস্ত দুটো কুলক্ষণ। প্রজাতন্ত্র মানেই সন্ধ্যার গিলোটিন আর সম্রাট বা সাম্রাজ্য মানেই রাত্রির তরবারি। কিন্তু যখন এ দুটোর ইতিহাস ভালভাবে পড়ে দেখল তখন সে এক বিরাট বিস্ময়ের সঙ্গে বুঝতে পারল একদিন যাকে সে এক অশুঃ রাত্রির নিপাট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বলে জেনে এসেছে, সে রাত্রির অন্ধকারেও অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে।

যেমন মিরাবো ভাগনিয়াদ, সেন্ট জাস্ট, রোবোসপীয়ার, ক্যামিলে, দাঁতন এবং নেপোলিয়নের মতো সূর্যের উদয়। এই সব নক্ষত্রের উজ্জ্বলতায় নিজেকে ম্লান মনে করে পিছিয়ে আসে সে। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোরটা কাটলে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে সংহত করে এবং মন থেকে ঘৃণার ভাবটাকে অপসারিত করে ঘটনাগুলো সে যদি গভীরভাবে তলিয়ে দেখে, এই সব ঘটনার সঙ্গে সংজড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগের থেকে একটু কম ভয় করে তাহলে দেখতে পারে সব ঘটনাগুলি দুটি প্রধান ভুলে পরিণত হয়। প্রজাতন্ত্র হলো জনগণকে প্রদত্ত নাগরিক অধিকারের প্রতীক এবং সাম্রাজ্য হলো সমগ্র ইউরোপের উপর আরোপিত ফরাসী ভাবধারা, আদর্শ ও জাতীয় প্রভুত্বের প্রতীক। বিপ্লব থেকে বেরিয়ে আসে জনগণের এক উজ্জ্বল মূর্তি আর সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসে ফরাসী জাতীয় গৌরব।

এই উদ্ঘাটিত মন কিভাবে ধীরে ধীরে উন্নত হয় তা আমরা দেখাবার চেষ্টা করছি। উন্নতি কখনো রাতারাতি হয় না। মেরিযাস দেখল এতদিন সে যেমন তার বাবাকে বুঝতে পারেনি, তেমনি সে তার দেশকেও বুঝতে পারেনি। সে কাউকে চিনতে পারেনি, সে যেন ইচ্ছা করে চোখ বন্ধ করে বসেছিল। এখন তার চোখ খুলে গেছে এবং এখন সে তার দেশের গুণগান করছে এবং ভক্তিভরে তার বাবাকে বরণ করে নিচ্ছে।

আজ সে এই ভেবে দুঃখে অভিভূত হয়ে উঠল যে আজ তার মৃত বাবা ছাড়া তার মনের গভীর গোপন কথাগুলি বলার দ্বিতীয় কোনও লোক নেই। ঈশ্বর যদি দয়া করে কোনওক্রমে তার বাবাকে বাঁচিয়ে দেন তাহলে সে দারুণ আগ্রহের সঙ্গে তার কাছে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলত, 'বাবা আমি এসেছি, আমি তোমার সন্তান। তোমার চিন্তা আমার চিন্তা এক।' তার বাবাও তাহলে কত স্নেহভরে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করত। ছেলের ভালবাসা না পেয়েই এত কম বয়সে কেন মারা গেল তার বাবা? মেরিয়াস যখন প্রথম জীবনের গুরুত্ব বুঝতে পারল, যখন সে তার জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য খাড়া করে তুলল, যখন তার চিন্তাশক্তি দানা বেঁধে

উঠল এবং তার ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠল তখনি এক নিদারুণ দুঃখে তার অন্তরটা চমকে উঠতে লাগল। এক নতুন আলোয় প্লাবিত হয়ে উঠল তার সমগ্র মনোভূমি। এক নতুন সত্তা জেগে উঠতে লাগল যেন তার মধ্যে। তার পিতা এবং স্বদেশকে নতুন করে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন নবজন্ম লাভ করল।

যে সব বস্তু বা ব্যক্তিকে একদিন সে ঘৃণা করেছিল আজ তা যেন এক নতুন অর্থে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল তার কাছে। আজ সে ঐশ্বরিক ও মানবিক বিধানের অর্থ বুঝতে পারল এবং যে সব মহাপুরুষকে একদিন সে ঘৃণার চোখে দেখত এবং উপহাস করে উড়িয়ে দিত, তাঁদের গুরুত্ব সম্বন্ধে এক পরিষ্কার ধারণা লাভ করল।

তার বাবার সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নকেও নতুনভাবে দেখতে শুরু করল। কিন্তু তার মনের মধ্যে নেপোলিয়নের এই পুনর্বাসনের কাজটা কিন্তু সহজে হয়নি।

তার শৈশব ও বাল্যের চিন্তা ১৮১৪ সালে যারা তার চারপাশে ছিল তাদের দ্বারাই গড়ে ওঠে। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে ফ্রান্সের প্রায় সকলেই কথায় কথায় নেপোলিয়নের প্রতি এক তীব্র ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা প্রকাশ করত। সে যুগে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যেন ছিলেন রূপকথার এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস। অনেকে তাঁকে ভয় করত এবং অনেকে আবার উপহাস করত। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন ভয় আর উপহাসের বস্তু। বোনাপার্টের নাম উল্লেখ করে কেউ রাগে দাঁত কড়মড় করতে পারত আবার এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেও পারত। কিন্তু সে যাই করুক তার ভিত্তিমূলে ছিল ঘৃণা। নেপোলিযন সম্বন্ধে তার মনে সঠিক ধারণা না থাকায় আর পাঁচজনের দেখাদেখি মেরিযাসও ঘৃণা করতে থাকে তাকে।

কিন্তু সম্প্রতি দেশের সমকালীন ইতিহাস পড়ে এবং সামরিক নথিপত্র ঘেঁটে সে সঠিক জ্ঞান লাভ করল। দুর্বোধ্যতার যে কুয়াশা নেপোলিয়নকে ঢেকে রেখেছিল তার সামনে আজ সে কুয়াশা সরে যেতেই সে বেশ বুঝতে পারল নেপোলিয়নকে ভুল বুঝেছিল সে। তার চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্টতা ও পূর্ণতা লাভ করতে লাগল। ক্রমশঃ অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোর রাজ্যে উঠে গেল সে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় তার উপরতলার ঘরে জানালার ধারে বসে বাতিব আলোয় পড়ছিল। তার সামনে জানালাটা খোলা ছিল। পড়ছিল আর ভাবছিল সে। অনন্ত প্রসারিত অন্ধকার হতে অসংখ্য চিন্তা আকাশের অজস্র তারার মতোই ভিড় করে আসছিল তার মনে। সে তখন পড়ছিল গ্রাঁদ আর্মির বিবরণ।

যুদ্ধক্ষেত্রে লেখা সেই মহাকাব্যিক বিবরণে প্রায়ই সম্রাটের নামের সঙ্গে তার পিতার নামোল্লেখ দেখতে পায় সে। সহসা সাম্রাজ্যের সমস্ত গৌরব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যেন তার সামনে। এক ভাবের জোয়ার খেলে যায় যেন তার মধ্যে। মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছিল তার পিতার আত্মা যেন তার খুব কাছে এসে পড়েছে। সে তার পিতার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে কানে। সেই সঙ্গে সে যুদ্ধের বাদ্যধ্বনি, কামানের গর্জন, সৈনিকদের পদধ্বনি এবং অশ্বের ক্ষুরের শব্দ সব শুনতে পেল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে সে দেখল বিরাট নক্ষত্রমণ্ডল অন্ধকার অনন্ত আকাশের গভীরে

কিরণ দান করছে। আর তার সামনে খোলা বই-এর মধ্যে শব্দগুলো জীবন্ত ঘটনার রূপ ধারণ করেছে। তার অন্তরটা এক অব্যক্ত অনির্দেশ্য বেদনায় মোচড় হয়ে উঠল। এক নতুন সত্যের উপলব্ধিতে আত্মহারা এবং রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠল সে। সহসা কেন বা কোন প্রবৃত্তির তাড়নায় সে জানে না, উঠে দাঁড়িয়ে জানালায় ঝুঁকে হাত দুটো বাইরে প্রসারিত করে অনন্ত আকাশের পানে তাকিয়ে আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, সম্রাট দীর্ঘজীবি হোন!

সেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত থেকে কর্সিকার সেই নরখাদক রাক্ষস, সেই তথাকথিত অত্যাচারী নেপোলিয়ন অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তার জায়গায় মহান সীজারের এক মর্মরমূর্তি এক দূরধিগম্য উচ্চতায় অত্যুজ্জ্বল ভাস্বরতায় দীপ্যমান হয়ে উঠল। তার পিতার কাছে নেপোলিয়ন ছিলেন এক সাধারণ সেনানায়ক যার অধীনে সে সৈনিকের কাজ করত। কিন্তু মোরিয়াসের কাছে নেপোলিয়ন অনেক বড়। মেরিয়াসের নেপোলিয়ন হলেন সেই দুর্জয় ফরাসী শক্তির প্রতিষ্ঠাতা যে শক্তি ছিল অপ্রতিরোধ্য রোমক শক্তির সমতুল এবং সে শক্তি ছিল সমগ্র পৃথিবীর উপর এক অবিসম্বাদিত প্রভুত্ব বিস্তারে তৎপর। নেপোলিয়ন ছিলেন এক জাতীয় পতনের বিরাট রূপকার, তিনি ছিলেন একাদশ লুই, রিচলু, চতুর্দশ লুই, বিপ্লবী কমিটির উত্তরাধিকারী। যেহেতু তিনি ছিলেন রক্তমাংসের মানুষ সেইহেতু তাঁর কিছু দোষ, কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, কিছু অপরাধও হয়ত করেছিলেন ; তথাপি তিনি তাঁর পতনের মাঝেও ছিলেন রাজকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, ত্রুটি-বিচ্যুতির কালিমার মাঝেও মহত্ত্বে ভাস্বর এবং অপরাধের মাঝেও দুর্দমনীয়ভাবে শক্তিমান। তিনি ছিলেন এমনই এক ভাগ্যবিধাতা যিনি সব জাতিকে একটি জাতির প্রভুত্বকে মেনে নিতে বাধ্য করেন। তিনি ছিলেন গৌরবোজ্জ্বল ফ্রান্সের মূর্ত প্রতীক, যিনি তরবারির দ্বারা সমগ্র ইউরোপ এবং তার প্রতিভার বিচ্ছুরিত আলো দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে জয় করেন। মেরিয়াসের চোখে বোনাপার্ট হলেন প্রজাতন্ত্র হতে উদ্ভূত এক স্বৈরাচারী, বিপ্লবের মূর্তিমান সারাংশ। তার মনে নেপোলিয়ন একাধারে মানুষের মতো মানুষ এবং জনগণ, যীশু ছিলেন একই সঙ্গে মানব এবং দেবতা।

ধর্মান্তরিত মানুষ যেমন নতুন ধর্মগ্রহণের মত্ততায় অনেক দূর এগিযে যায় তেমনি মেরিয়াসও অনেক দূর এগিয়ে গেল। সে বুঝতে পারল নেপোলিয়নের প্রতিভার পুজো করতে গিয়ে প্রকারান্তরে সে শক্তিরই উপাসনা করে ফেলেছে। বুঝতে পারেনি সে তার উপাস্য ব্যক্তির দুটি দিক—দেবভাব ও পশুভাবের সঙ্গে জড়িত করে ফেলেছে নিজেকে। সে যেন সত্যের অনুসরণ করতে গিয়ে মিথ্যার গহ্বরে পড়ে গেছে। একদিন যে রাজতন্ত্রের পতনে অশ্রুপাত করেছিল আর পাঁচজনের সঙ্গে আজ সেই প্রজাতন্ত্রের পতনের মাঝে দেখল ফরাসী জাতির এক নতুন অভ্যুদয়। একদিন যাকে সূর্যাস্ত ভেবেছিল আজ বুঝল সেটা সূর্যোদয়।

তার মধ্যে যখন এত সব তীব্র আলোড়ন চলছিল, তখন তার বাড়ির লোক কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি এ বিষয়ে। সে যখন বুর্বন ও জ্যাকোবাইনদের প্রতি সব সমর্থন প্রত্যাহার করে, রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করে গণতন্ত্রবাদী

ও পুরোপুরিভাবে বিপ্লবী হয়ে ওঠে তখন একদিন কোয়ে দে অরফেভারে গিয়ে একশো কার্ড ছাপিয়ে আনে। সেই কার্ডের উপর 'লে ব্যারন মেরিয়াস পঁতমার্সি', এই নামটা মুদ্রিত ছিল। তার মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল, তার মৃত পিতার প্রতি আসক্তির ফলে যে মানসিক রূপান্তর এসেছিল তার মধ্যে এই কার্ড তারই ফলশ্রুতি। কিন্তু সে কার্ডগুলো সে নিজের পকেটের মধ্যেই রেখেছিল।

সে পিতার দিকে যতই ঝুঁকে পড়ছিল ততই সে তার মাতামহের কাছ থেকে দূরে সরে পড়ছিল। আমরা আগেই বলেছি তার প্রতি মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের মনোভাব ক্রমশই কঠোর হয়ে উঠেছিল। চিন্তাশীল এক যুবক এবং চপলমতি এক বৃদ্ধের মধ্যে ফারাকটা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। মেরিয়াস আর মাতামহ যেন একটি সেতুর উপর দাঁড়িয়েছিল দু'জনে। সেতুটা হঠাৎ ভেঙে যেতেই দু'জনে নদীর দু'পারে চলে যায়। অনতিক্রম্য হয়ে ওঠে দু'জনের ব্যবধান। তার মাতামহের প্রতি মেরিয়াসের রাগের কারণ হলো এই যে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ পিতাকে পুত্রের কাছ থেকে এবং পুত্রকে পিতার কাছ থেকে নির্মমভাবে ছিনিয়ে নিয়ে পৃথক করে রেখেছিলেন। পিতার প্রতি নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবশত সে বৃদ্ধ মাতামহকে ঘৃণা করতে শুরু করে।

কারো কাছে তার এই ঘৃণা প্রকাশ করেনি সে। সে শুধু কথা কম বলত, বাড়িতে কম থাকত। খাবার সময়েও বিশেষ কোনও কথা বলত না। তার মাসি একদিন যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করে তখন সে পড়া আর পরীক্ষার কথা বলে এড়িয়ে যায়।

তার মাতামহ সেই একই কথা বলে, ছেলেটা প্রেমে পড়েছে। তার উপসর্গ আমি বুঝতে পারছি।

তার মাসি বলত, কিন্তু কোথায় যায় ও?

এই সময় একদিন তার বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য মঁতফারমেলে গিয়ে থেনার্দিয়েরের খোঁজ করে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে হোটেলটি উঠে গেছে। হোটেল তুলে দিয়ে থেনার্দিয়ের কোথায় গেছে তা কেউ বলতে পারল না। যাই হোক, সেখানে খোঁজখবর নিতে চার দিন কেটে গেল মেরিয়াসের।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ সেই এক কথা বলতে লাগলেন, ছেলেটা এখন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

তাঁদের ধারণা মেরিয়াস তার বুকের মাঝে এমন একটা কথা লুকিয়ে রেখেছে যে কথা সে কারো কাছে প্রকাশ করতে পারছে না।

৭

একজন অশ্বারোহী বিভাগের অফিসারের কথা আগেই বলা হয়েছে। সে ছিল মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের ভাইপোর ছেলে। তার নাম ছিল লেফটন্যান্ট থিওদুল গিলেনর্মাদ। সে প্যারিসে খুব কমই আসত ; এত কম আসত যে মেরিয়াস তাকে কখনো দেখেনি। ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদও থিওদুলকে দেখেনি ভাল করে। কিন্তু ভাল করে না দেখলে বা তার কোনও কথা না শুনলেও তাকে সে ভালবাসত। তাকে আদর্শ পুরুষ বলে মনে করত।

একদিন সকালে ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ উত্তেজিত অবস্থায় তার নিজের ঘরে চলে গেল। মেরিয়াস আবার বাইরে যাবার জন্য অনুমতি চেয়েছে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের কাছ থেকে। তার কথা শুনে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, সে আগের থেকে আরও খারাপ হয়ে গেছে।

ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ সিঁড়িতে যেতে যেতে বলল, এটা কিন্তু সত্যিই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় যায় ও ?

সে ভেবেছিল মেরিয়াস নিশ্চয় কোনও অবৈধ প্রেমের নায়ক। সে ঠিক তার প্রেমিকার সঙ্গে কোনও গোপন সংকেতস্থানে দেখা করতে চলেছে।

যাই হোক, তার মন থেকে এই উত্তেজনাটা কমাবার জন্য সে তার সূচীশিল্পের কাজ নিয়ে বসল। সে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাজ করেছে এমন সময় হঠাৎ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল থিওদুল।

থিওদুলের মতো একজন বীরপুরুষকে তার ঘরের সামনে দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল সে। বলল, থিওদুল তুমি!

হ্যাঁ, আমি এসেছি পিসি। এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম।

ঠিক আছে, এখানে এসে আমাকে চুম্বন করো।

থিওদুল তাই করল।

ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ তার লেখার টেবিলের কাছে চলে গেল। বলল, অন্তত সপ্তাখানেক থাকবে তো ?

হায়, আমাকে আজ সন্ধ্যাতেই চলে যেতে হবে।

না না, তা কখনই হতে পারে না।

কোনও উপায় নেই।

আর একটু বেশি সময় থাক থিওদুল।

আমার অন্তর থাকতে চাইছে, কিন্তু কর্তব্য থাকতে দিচ্ছে না।

আমরা আসলে মেবুন থেকে ফাঁলোতে যাচ্ছিলাম। যাবার পথে প্যারিসে থামতে হলো। তাই ভাবলাম একবার পিসির সঙ্গে দেখা করে যাই।

এতে শুধু তোমার কষ্ট হলো।

এই বলে দশ লুই-এর একটা মুদ্রা তার হাতে গুঁজে দিল।

না কষ্ট নয়, আনন্দও পেলাম।

থিওদুল আবার চুম্বন করল তার পিসিকে।

তার সামরিক পোশাকের চাপে তার পিসির বুকটাতে যেন আঁচড় কেটে গেল। এতে তার পিসি আনন্দ অনুভব করছিল।

ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ বলল, তুমি কি অশ্বারোহী সেনাদলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলে ?

থিওদুল বলল, আমি আমার চাকরের কাছে ঘোড়াটাকে দিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘোড়ার গাড়িতে এসেছি এবং তাতেই ফিরে যাব। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করছি।

বল।

আমার মনে হয় মেরিয়াস পঁতমার্সিও ঐ একই গাড়িতে যাবে।

কৌতূহলী হয়ে ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ বলল, কি করে জানলে?

আমি আমার আসন সংরক্ষণ করতে গিয়ে দেখি তালিকায় তার নাম রয়েছে।

তার পিসি বলল, ছেলেটা বড় বদমায়েস। সে তোমার মতো ভদ্র নয়। তাহলে সে গাড়িতেই রাত কাটাবে?

আমাকেও তাই করতে হবে।

কিন্তু তোমাকে কর্তব্যের খাতিরে এটা করতে হবে আর সে উচ্ছৃংখল জীবনযাপনের জন্য এটা করবে।

থিওদুল বলল, হা ভগবান!

এমন সময় ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদের মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে গেল। সে বলল, আচ্ছা ও তো তোমায় চেনে না। তাই নয় কি?

আমি ওকে চিনি, কিন্তু ও বোধ হয় আমাকে চেনে না। আমার সঙ্গে কোনওদিন কথা বলেনি।

তোমরা দু'জনে একই গাড়িতে যাবে?

হ্যাঁ, সে গাড়ির উপরে বসবে আর আমি ভিতরে।

ও কোথায় যাবে?

আঁদেলিসে।

মেরিয়াস কি ওখানেই যাচ্ছে?

অবশ্য পথে মাঝখানে কোথাও নেমে পড়বে কি না জানি না। আমাকে ভার্নলে নেমে গাড়ি পাল্টাতে হবে। ওর গন্তব্যস্থল কোথায় তা আমি ঠিক জানি না।

মেরিয়াস নামটাই বাজে। তোমার নামটা কত ভাল, থিওদুল।

থিওদুল বলল, আমার নামটা আলফ্রেড হলে ভাল হত

যাই হোক, আমার একটা কথা শোন থিওদুল। বেশ মনে ়াগ দিয়ে শুনবে।

বল পিসি।

কথাটা হলো এই যে, মেরিয়াস বাড়ি থেকে প্রায়ই চলে যায়।

তাই নাকি?

সে কোথাও প্রায়ই যায়। এক একবার কয়েক রাত বাড়ি ফেরে না।

তাই নাকি?

আমরা জানতে চাই কি করছে ও, কোথায় যাচ্ছে।

অভিজ্ঞ সৈনিকের মতো শান্তভাবে বলল, উড়তে শিখেছে।

তারপর হাসতে হাসতে বলল, নিশ্চয় ে ানও মেয়ের পাল্লায় পড়েছে।

'মেয়ে' এই কথাটা শুনে ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদের মনে হলো তার বাবাই যেন কথাগুলো বলছে। এ কথায় তার মনের বিশ্বাসটাও দৃঢ় হয়ে উঠল। সে বলল, একটা কাজ তোমায় করতে হবে। মেরিয়াস কোথায় যায় তা দেখতে হবে তোমায়।

সে তোমাকে চেনে না; সুতরাং কোনও অসুবিধা হবে না। যদি কোনও মেয়েকে দেখ তাহলে তাকে ভাল করে দেখবে এবং আমাদের চিঠি দিয়ে জানাবে। আমরা এ ব্যাপারে খুব আগ্রহী।

এ ধরনের কাজে থিওদুলের কোনও মত ছিল না। কিন্তু তার পিসি তাকে দশ লুই-এর একটা মুদ্রা দেওয়ায় সে তৎপরতা দেখায় এ কাজে। এ ছাড়া আরও দিতে পারে পরে। সে বলল, ঠিক আছে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

তার পিসি তাকে আলিঙ্গন করল। তারপর বলল, তুমি কখনো এই বাড়ি থেকে পালাতে পার না যখন-তখন। তোমার শৃঙ্খলাবোধ ও কর্তব্যবোধ আছে। কোনও নির্লজ্জ কাজের জন্য তুমি যখন-তখন বাড়ি ছেড়ে যাবে না।

থিওদুল সততার হাসি হাসল।

সেদিন সন্ধ্যায় মেরিয়াস যখন ঘোড়ার গাড়িতে চেপে রওনা হলো তখন সে বুঝতে পারল না তাকে একজন লক্ষ্য করছে। এদিকে থিওদুল কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। পরদিন সকালে ভার্নলে গাড়ি থামতেই গার্ড থিওদুলকে গাড়ি পাল্টাবার কথা মনে করিয়ে দিল। ভার্নলে নামার পর থিওদুলের মনে পড়ে গেল মেরিয়াসের কথাটা। কিন্তু কথাটা মনে করতে হাসি পেল তার।

তার মনে হলো মেরিয়াস অনেক আগেই নেমে গেছে। কি ছাইপাঁস চিঠি দিয়ে জানাব ?

এমন সময় সে দেখল গাড়ির উপর থেকে কালো পায়জামা পরে মেরিয়াস নামছে।

এক চাষী মেয়ে একঝুড়ি ফুল বিক্রি করছিল। মেরিয়াস বড় একগোছা ফুল কিনল।

থিওদুল ভাবল মেরিয়াস যে মেয়েটার প্রেমে পড়েছে সে নিশ্চয় খুব সুন্দরী। মেয়েটাকে একবার দেখতে হবে আমায়।

তার পিসিকে দেওযা প্রতিশ্রুতির জন্য নয়, কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই এ কথা ভাবল সে।

মেরিয়াস একবার থিওদুলের দিকে তাকালও না। দু' তিনজন সুন্দরী সুসজ্জিতা মেয়ে নামল গাড়ি থেকে। সেদিকেও তাকাল না মেরিয়াস। কোনও দিকে খেয়াল নেই তার।

থিওদুল ভাবল, ও নিশ্চয় প্রেমে পড়েছে।

মেরিয়াস ভার্নল শহরের চার্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

থিওদুল ভাবল, ভাল কথা। চার্চই হলো আজকাল প্রেম করার জাযগা।

সে দেখল মেরিয়াস চার্চের ভিতরে না গিয়ে উঠোনের ঘাসে ঢাকা একটা দিকে এগিয়ে চলল। তারপর ঘাসের উপর কালো কাঠের একটা ক্রসের সামনে নতজানু হয়ে বসে হাতের ফুলের গোছাটা নামিয়ে রাখল। হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে প্রার্থনা করতে লাগল সে।

থিওদুল দেখল সেই কালো ক্রসের উপর সাদা অক্ষরে লেখা আছে কর্নেল ব্যারন পঁতমার্সি।

তাহলে ওর প্রেমিকা হলো একটা কবর।

৮

এই কবরের কাছেই প্যারিস থেকে বারবার আসে মেরিয়াস। আর তার মাতামহ বলে সে যাচ্ছে তার প্রেমিকার কাছে।

ব্যাপারটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল লেফটন্যান্ট থিওদুল। একজন মৃত ব্যক্তি আর একজন মৃত কর্নেলের প্রতি তার দ্বিগুণীকৃত শ্রদ্ধার এক অনুভূতি সে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারবে না।

থিওদুল সেখান থেকে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে চলে গেল। সে ঠিক করল কোনও কথাই সে তার পিসিকে জানাবে না চিঠিতে।

এদিকে তিন দিন পর একদিন সকালে বাড়ি ফিরল মেরিয়াস। দুটো রাত গাড়িতে যাওয়া-আসা করায় ঘুম হয়নি তার। সে সোজা তার নিজের ঘরে গিয়ে তার উপরকার কোট আর জামার উপর যে ফিতেটা ব্যবহার করত সেটা খুলে স্নান করতে চলে গেল।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদও সেদিন খুব সকালেই উঠেছিলেন। তিনি মেরিযাসের আসার শব্দ পেয়ে সোজা তার ঘরে চলে যান। ভাবলেন, তিনি তাকে আলিঙ্গন করে কিছু প্রশ্ন করে কিছু কথা বার করে নেবেন। কিন্তু মেরিয়াসের ঘরে গিয়ে তিনি দেখলেন মেরিয়াস আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। দেখলেন বিছানার উপর তার কোট আর ফিতেটা নামানো রয়েছে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, তবু ভাল।

সেই কোট আর ফিতেটা নিয়ে সোজা বসার ঘরে চলে গেলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ। যেখানে তাঁর মেয়ে সূচীশিল্পের কাজ করছিল। তিনি মেয়েকে বললেন, জয় আমাদের হবেই। এবার আমরা রহস্য ভেদ করবই। ওর সব চতুরালি ধরে ফেলব। মেয়েটার ছবি আছে এই ফিতেটার সঙ্গে।

ফিতেটার সঙ্গে মেডেলের মতো দেখতে ছবি রাখার একটা খাপ ছিল। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, এর মধ্যে নিশ্চয় কোনও মেয়ের ছবি আছে। ছেলের রুচিটা খুব খারাপ হয়ে গেছে।

ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ বললেন, খোল বাবা। খুলে দেখ কি আছে।

খাপটা খুলে দেখা গেল তার মধ্যে একটা ভাঁজকরা কাগজ রয়েছে। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, সেই পুরনো কাহিনী, নিশ্চয় এটা একটা প্রেমপত্র।

কিন্তু কাগজটা খুলে দেখা গেল কর্নেল পঁতমার্সির লেখা একটি চিঠি যাতে সে তার ছেলেকে তার শেষ কথা জানায়।

চিঠিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে কোনও মৃত লোকের পাশে থাকাকালে কোনও মানুষ যেমন এক হিমশীতল অনুভূতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, ওদের অবস্থাও তেমনি হলো। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বলে উঠলেন, এটা হচ্ছে সেই ডাকাতটার হাতের লেখা।

ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ সেই কাগজটা আবার ভাঁজ করে প্যাকেটটার মধ্যে রেখে দিল। এমন সময় মেরিয়াসের কোটের পকেট থেকে কতকগুলো ছাপা কার্ড পড়ে গেল। ওরা পড়ে দেখল, তাতে লেখা আছে, লে ব্যারন মেরিয়াস পঁতমার্সি।

বৃদ্ধ গিলেনর্মাদ ঘণ্টা বাজিয়ে নিকোলেত্তেকে ডাকলেন। সে এলে বললেন, এইগুলো রেখে দিয়ে এস।

অবশেষে ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ বলল, চমৎকার।

মেরিয়াস স্নান সেরে ঘরে এসে ঢুকতেই মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললেন, বেশ বেশ। তাহলে তুমি হচ্ছ একজন ব্যারন। আমি কি জানতে পারি এর মানে কি ?

মেরিয়াস কিছুটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে বলল, এর মানে এই যে আমি আমার পিতার পুত্র।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের মুখ থেকে সব হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি কড়া কর্কশ গলায় বললেন, আমি তোমার পিতা।

মেরিয়াস মুখটা নামিয়ে বলল, আমার পিতা একজন সামান্য সৈনিক হলেও তিনি বীরত্বের সঙ্গে প্রজাতন্ত্র ও ফ্রান্সের সেবা করেন এবং দেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে গৌরবের সঙ্গে উল্লিখিত আছেন। তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বৃষ্টিতে, বরফে, কাদায়, জলে, কামানের সামনে বুক পেতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি শত্রুপক্ষের দুটো পতাকা দখল করেন, কুড়িবার আহত হন, অথচ সম্পূর্ণ বিস্মৃত ও অবহেলিত অবস্থায় মারা যান। তাঁর শুধু একটামাত্র দোষ ছিল। দেশ আর আমি—এই দুই অকৃতজ্ঞকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। অন্তর উজাড় করে সব কিছু বিলিযে দেন তাদের জন্য।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ আর সহ্য করতে পারছিলেন না। 'প্রজাতন্ত্র' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বসে থাকতে থাকতে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি লাফিয়ে উঠলেন। মেরিয়াসের প্রতিটি কথার আঘাতে ব্যথাহত হয়ে উঠছিলেন। তাঁর মুখের রংটা ধূসর থেকে গোলাপী এবং ক্রমে গোলাপী থেকে আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল। তিনি গর্জন করে উঠলেন, ঘৃণ্য অর্বাচীন কোথাকার। আমি তোমার পিতার কথা কিছু জানি না আর জানতে চাইও না। তবে এইটুকু জানি যে ঐ ধরনের লোকরা সব শয়তান. দস্যু, ডাকাত, খুনী। তাদের সবাই তাই। কোনও ব্যতিক্রম নেই। তুমি যদি ব্যারন হও তাহলে আমার চটি জোড়াটার থেকে তার দাম বেশি নয়। যে সব লোক রোবোসপীয়ারের সেবা করে তারা ছিল শয়তান আর যে সব লোক বোনাপার্টের সেবা করে তারা ছিল জুয়োচোর। যারা তাদের বৈধ রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যারা ওয়াটারলু যুদ্ধ থেকে ইংরেজ ও প্রুশীয়দের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল তারা কাপুরুষ, তারা দুর্বৃত্ত। আমি শুধু এইটুকু জানি। তোমার পিতা যদি তাদেরই একজন হয় তাহলে খুবই দুঃখের ব্যাপার। তাহলে আমার করার কিছু নেই।

মেরিয়াস রাগে কাঁপতে থাকে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়চেতনা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল।

কোনও যাজক যদি দেখে তার উপাস্যবস্তুকে কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে অথবা কোনও সন্ন্যাসী যদি দেখে তার বিগ্রহ মূর্তির উপর কেউ থুতু ফেলেছে তাহলে তার যেমন অবস্থা হয় তেমনি মেরিয়াসেরও হলো। এটা সহ্য করতে পারা যায় না। কিন্তু সে কি করবে? তার পিতা অপমানিত হয়েছে তার সামনে, কিন্তু এক্ষেত্রে অপমানকারী হচ্ছে তার মাতামহ। সে তার মাতামহকে অপমান করে যেমন প্রতিশোধ নিতে পারে না তেমনি পিতার উপর চাপিয়ে দেওয়া এই অপমানের বোঝাও সে সহ্য করতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে চিৎকার করে বলে উঠল, বুর্বনদের সঙ্গে মোটা শুয়োর অষ্টাদশ লুই নিপাত যাক!

অষ্টাদশ লুই চার বছর আগেই মারা গেছে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ উঠে ঘরের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দর্পিত পদভরে পায়চারি করতে লাগলেন। যেন মনে হলো পাথরের এক ভারী মূর্তি হেঁটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর মেয়ের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, এই ভদ্রলোকের মতো একজন ব্যারন এবং আমার মতো একজন বুর্জোয়া কখনই এক বাড়িতে থাকতে পারে না।

তারপর প্রচণ্ড রাগের চাপে কপালটাকে ফুলিয়ে মেরিয়াসের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, বেরিয়ে যাও।

মেরিয়াস সেইদিনই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

পরদিন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তাঁর মেয়েকে বললেন, ছয় মাস অন্তর কিছু করে ঐ রক্তচোষাটাকে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু আমার কাছে তার নাম কখনো করবে না।

মেডেলের মতো যে খাপটাতে কর্নেলের নিজের হাতে লেখা চিঠিটা ছিল সেই খাপটা নিকোলেত্তের হাত থেকে কোথায় পড়ে যায়। সে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের হুকুমে মেরিয়াসের মালপত্র সব গুছিয়ে দিচ্ছিল। মেরিয়াস সেটা না পেয়ে ভাবল তার মাতামহ ইচ্ছা করে তার বাবার হাতের লেখা চিঠিটা নষ্ট করে দিয়েছে

মেরিয়াস বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় সে কোথায় যাচ্ছে তা বলে গেল না। সে কোথায় যাচ্ছে তা সে নিজেই জানে না। তার কাছে তখন শুধু তিরিশ ফ্রাঁ, একটা হাতঘড়ি আর কিছু পোশাক ছিল। একটা ব্যাগে ভরে এই সব কিছু নিয়ে সে চলে গেল। সে একটা গাড়ি ভাড়া করে ড্রাইভারকে লাতিন কোয়ার্টারের দিকে যেতে বলল।

এরপর মেরিয়াসের কি হবে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

আপাতশান্ত আপাত উদাসীন যুগটার অন্তরালে একটা ক্ষীণ বিপ্লবের হাওয়া বইছিল। যেন অতীত ’৮৯ ও ’৯২ সালের ভিতর থেকে একটা করে দমকা হাওয়া উঠে এসে নিস্তরঙ্গ বাতাসটাতে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের

ভাবধারার পরিবর্তন হচ্ছিল। সবাই এগিয়ে যেতে চাইছিল, অগ্রগতির মোহে মেতে উঠছিল সবাই। রাজতন্ত্রীরা উদারনীতিবাদী হয়ে উঠছিল। আবার উদারনীতিবাদীরা গণতন্ত্রবাদী হয়ে উঠছিল।

নেপোলিয়নের নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার জয়গান গাইছিল সবাই। ইতিহাসের এমনই একটা যুগের কথা বলছি আমরা, যে যুগ যেন একটা মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছিল। ভলতেয়ারপন্থী রাজতন্ত্র আর বোনাপার্টপন্থী উদারনীতিবাদ মিলে মিশে যেন এক হয়ে গিয়েছিল।

এছাড়া আরও কিছু মতবাদ ছিল। একদল লোক মৌল নীতির খোঁজ করত আর একদল চাইত আইনের অনুশাসন। তবে বেশির ভাগ লোক এমন এক সর্বাত্মক তত্ত্বে বিশ্বাস করত যে তত্ত্ব তাদের মনকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করবে। সে তত্ত্ব অলীক অবাস্তব হলেও তাতে কোনও ক্ষতি ছিল না, কারণ আজ যা অলীক এবং অবাস্তব, আগামী কাল তা-ই হয়ে উঠবে রক্তমাংসের মানুষের মতো জীবন্ত।

পরিবর্তনের যে প্রবল হাওয়া বইছিল তাতে পুরনো প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার ভিত্তি কেঁপে উঠছিল। সে ব্যবস্থায় কেউ আস্থা স্থাপন করতে পারছিল না। পরিবর্তনের হাওয়ায় ছিল বিপ্লবের পূর্বাভাস। জনগণের উচ্চাভিলাষের সঙ্গে রাষ্ট্রনেতাদের ক্ষমতাদ্বন্দ্বের এক অঘোষিত লড়াই চলছিল। জার্মানির তুগেনবাঁদ বা ইতালির কার্বোনারির মতো কোনও বড় প্রতিষ্ঠান তখন ফ্রান্সে ছিল না। এইতে তখন কুন্দর্দ এবং প্যারিসে এলিসি নামে এক সংস্থা গড়ে উঠছিল সবেমাত্র।

আপাতদৃষ্টিতে এলিসি সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল শিশু শিক্ষাব বিস্তার। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল জনগণের আত্মোন্নতি।

এলিসি অক্ষর তিনটি হলো 'এ্যবাইসী' এই ফরাসী শব্দের অপভ্রংশ যার অর্থ হলো সাধারণ জনগণ। সমাজে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে জনগণের প্রতিষ্ঠা চাই।

এলিসি প্রতিষ্ঠান হিসাবে খুব একটা বড় ছিল না, তার সদস্যসংখ্যা বেশি ছিল না। আসলে সেটা ছিল এক রাজনৈতিক চক্রান্তের গোপন সংস্থা। প্যারিসের মধ্যে দুটো জায়গায় তার সদস্যরা মিলিত হত। একটা ছিল লে হ্যানের কাছে কোরিনথের পানশালায় আর একটা জায়গা ছিল প্লে সেন্ট মাইকেল অঞ্চলে মুসেঁ নামে একটা ছোট কাফেতে। প্রথম জায়গাটাতে সংস্থার শ্রমিকসদস্যরা মিলিত হত আর দ্বিতীয়টাতে মিলিত হত ছাত্রেরা।

এলিসি সোসাইটির আলোচনাসভা বসত কাফে মুঁসের পিছন দিকের একটা ঘরে। আসল কাফে থেকে সেই ঘরটার মাঝখানে একটা রাস্তা ছিল। ঘরটার মধ্যে দুটো জানালা আর একটা দরজা ছিল। সেখানে সদস্যরা প্রায়ই এসে মদ খেত আর ধূমপান করত। তারা জোর হাসাহাসি করত এবং সাধারণ বিষয়ে জোর গলায় কথা বলত। কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় কোনও বিষয়ে নিচু গলায় কথা বলত। একদিকের দেওয়ালে প্রজাতন্ত্রের আমলের ফ্রান্সের একটা মানচিত্র টাঙানো ছিল।

এলিসি সংস্থার বেশির ভ'গ সদস্য ছিল ছাত্র। এই সব ছাত্রদের সঙ্গে যেসব

শ্রমিকের যোগাযোগ ছিল সেইসব শ্রমিক এই সংস্থার সদস্য হত। পরে এই সব সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন ইতিহাসে স্থান পায়। এরা হলো এঁজোলরাস, কঁবেফারে, জাঁ প্রুভেয়ার, কুলি, কুরফেরাক, বাহোরেল, ল্যাগলে, জলি আর গ্রান্তেয়ার। এরা সবাই ছিল বয়সে যুবক। এরা সবাই মিলে যেন একটি পরিবার গঠন করে। তারা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ল্যাগলে ছাড়া তারা সবাই মিদি থেকে আসে।

আমরা প্রথমেই তো এঁজোলরাসের নাম করেছি। তার একটা কারণও আছে। সে ছিল ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি অন্যদিকে ত্রাসের বস্তু। একাধারে ভীষণ সুন্দর এই ছেলেটি ছিল যেন দুর্ধর্ষ অ্যান্টিনোয়াস। তার মুখখানাকে সব সময় চিন্তায় গম্ভীর দেখাত। তাকে দেখে মনে হত সে যেন বিপ্লবে অনেক পরিশ্রম করেছে। মনে হত সে যেন বিপ্লবের প্রতিটি ঘটনার কথা জানে। সেই বিরাট বিপ্লবের সব ঢেউগুলি যেন তার রক্তের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। সে ছিল সত্যিই এক অদ্ভুত যুবক যাকে দেখে একই সঙ্গে চিন্তাশীল পণ্ডিত ও বীর যোদ্ধা বলে মনে হত। একাধারে সে ছিল যেন গণতন্ত্রের সৈনিক আর ধর্মের যাজক যিনি সমকালীন সব আন্দোলন প্রতি-আন্দোলনের ঊর্ধ্বে। তার ছিল দুটো বড় বড় চোখ, নিজের ঠোঁটটা থাকত সব সময় ঘৃণায় কুঞ্চিত, আর ছিল প্রশস্ত ললাট যা ছিল দিগন্তের উপর শোভিত উদার আকাশের মতোই প্রশস্ত। সে ছিল এমনই একজন যুবক যার গায়ের চামড়া আর মুখখানা মেয়েদের মতো ম্লান হলেও মনে-প্রাণে সে ছিল অত্যুৎসাহী আর অতিপ্রাণচঞ্চল। তার বয়স বাইশ হলেও তাকে সতের বছরের এক কিশোর বলে মনে হত। নারী সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই কঠোর এবং পৃথিবীতে কোনও নারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কোনও চেতনাই ছিল না। তার একমাত্র আসক্তি ছিল শুধু ন্যায়পরায়ণতার প্রতি, যতসব বাধা-বিপত্তিকে জয় করাই ছিল তার একমাত্র চিন্তা। সে কোনও গোলাপ দেখত না, কোনও পাখির গান শুনত না, বসন্তের কোনও মদির মোহময় আবেদনে সাড়া দিত না। পরমাসুন্দরী পরী ইভাদনের উন্নত অনাবৃত বক্ষস্থলও কোনওভাবে বিচলিত করতে পারত না তাকে। হর্মোদিয়াসের মতো ফুলের বনে শুধু তরবারি লুকিয়ে রাখা ছাড়া ফুলের অন্য কোনও প্রয়োজন ছিল না তার কাছে। এমন কি আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রেও সে ছিল কঠোর এবং নীতিবাগীশ। প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কোনও বস্তু বা ঘটনার প্রতি কোনও নজর বা আগ্রহ ছিল না তার। সে ছিল যেন কোনও স্বাধীনতা প্রেমিকের প্রাণহীন মর্মরমূর্তি। তার কথাগুলো কড়া হলেও কণ্ঠে ছিল গীতিময়তার সুর যা ক্রমশ বাগ্মিতার উচ্চস্তরে উঠে যেত ধীরে ধীরে। কোনও মেয়ের পক্ষে তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলা বড় শক্ত ছিল। প্লেস কামব্রাই বা র‍্যু সেন্ট জাঁ দ্য বোভাইয়ের কোনও সুন্দরী যুবতী যদি তার তরুণ বালকের মতো সুন্দর মুখ, নীল চোখের সুন্দর পাতা, হাওয়ায় উড়তে থাকা রেশমী চুলের রাশ, ঝকঝকে দাঁতের উপর লাল ঠোঁট প্রভৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ তার দেহসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে এগিয়ে যেত তাহলে তীক্ষ্ণ নীরস দৃষ্টির শরে বিদ্ধ হয়ে পিছিয়ে আসতে হত, যেন এক অনতিক্রম্য দুর্লঙ্ঘ্য খাদের অন্তহীন বিশালতার

সম্মুখীন হতে হত যে খাদ তাকে এই শিক্ষাই দিত যে সে যেন এজেকাইলের শেরুবিসের সঙ্গে বোমারশাই-এর শেরুবিলিকে গুলিয়ে না ফেলে।

যে এঁজোলরাস ফরাসী বিপ্লবের যুক্তিতর্কের দিকটির প্রতিনিধিত্ব করত সেই এঁজোলরাসের পাশে ছিল কমবেফারে যে দর্শনের দিকটির প্রতিনিধিত্ব করত। যুক্তি বা তর্কবিদ্যা আর দর্শনের সঙ্গে তফাৎ এই যে যুক্তিতর্ক যখন সব সমস্যার যুদ্ধের দ্বারা সমাধান করতে চায়, দর্শন সে সমস্যার সমাধান করতে চায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে। কমবেফারে ছিল যেন এঁজোলরাসের সম্পূরক। এঁজোলরাস কোনও বিষয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাকে সংহত করত কমবেফারে। কমবেফারে এঁজোলরাসের মতো অতটা উন্নত না হলেও তার মনের প্রসারতা ছিল। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সে সভ্যতার কথাটাও বলত। রুক্ষকঠিন পাহাড়ের মতো যে কোনও নীতি ও তত্ত্বকথার চারদিকে সে এনে দিত উদার উন্মুক্ত দিগন্তের প্রসারতা। এঁজোলরাস চেয়েছিল ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার আর কমবেফারে চেয়েছিল বৈধ অধিকার। প্রথম জন রোবোসপীয়ারের সঙ্গে মিলে মিশে চলত আর দ্বিতীয় জন ছিল কনডরমেতের ভক্ত। এঁজোলরাসের থেকে অনেক বেশি বাস্তবজীবন সম্বন্ধে সচেতন ছিল কমবেফারে। একজন ছিল নীতি আর একজন জ্ঞানের উপাসক। এঁজোলরাস ছিল পুরুষোচিত শক্তি ও বীর্যবত্তার উপাসক, কমবেফারে ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞান আর মানবতাবাদের উপাসক। সে 'নাগরিক' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষ' এ কথাটাও বলত। সে সব কিছু পড়ত, আর পাঁচজনের কথা শুনত, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত ছিল। সে কুসংস্কারে বিশ্বাস না করলেও কোনও কিছু উড়িয়ে দিত না। এমন কি ভূতপ্রেতের অস্তিত্বকে স্বীকার না করলেও অস্বীকার করত না। সে বলত দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে স্কুল মাস্টারদের উপর। আবার দেশের শিক্ষা সমস্যা নিয়েও চিন্তা করত, আলোচনা করত। সে বিশ্বাস করত সমাজের কাজ হলো বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে সকল মানুষের নৈতিক ও বুদ্ধিগত মানকে উন্নত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাওয়া। বিজ্ঞানের সব রকম সাহায্য নিয়ে দেশের ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলায় সে ছিল বিশেষ আগ্রহী। মানবজাতির অগ্রগতির পথে কুসংস্কার, স্বৈরাচার প্রভৃতি কোনও বাধা-বিপত্তিকে স্বীকার বা ভয় করত না সে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পরিশেষে জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে সব কিছুর উপর। এঁজোলরাস ছিল যেন সেনাপতি আর কমবেফারে ছিল পথপ্রদর্শক। এঁজোলরাস সব পেতে চাইত লড়াই করে, সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে। কমবেফারে লড়াই যে চাইত না তা নয়। অগ্রগতির পথে কোনও প্রত্যক্ষ বাধা অপসারিত করার জন্য বলপ্রয়োগ ও সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিল। তবে পারতপক্ষে যতদূর সম্ভব মানুষকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে মানুষের মনকে উন্নত করে কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেত সে। আগুন আর আলোর মধ্যে আলোটাকেই বেছে নিয়েছিল কমবেফারে। আগুনের কৃত্রিম আভায় অন্ধকার কাটে ঠিক, কিন্তু সব অন্ধকারের পরিপূর্ণ অপসারণের জন্য সূর্যোদয়ের জন্য কেন অপেক্ষা করব না আমরা ? যা কিছু মহান তাব ভয়ঙ্কর ঐশ্বর্যের চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতার থেকে যা

কিছু শুভ তার শান্ত শুভ্র জ্যোতিকে বেশি পছন্দ করব। যে ১৭৯৩ সালে সত্যের সন্ধানে সমগ্র জাতি বিপ্লবের গভীরে ঝাঁপ দেয়, যে ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে পড়ে, কমবেফারে তাকে ভয় করত। সে স্থবিরতা বা স্থিতিশীলতা চাইত না, আবার অস্বাভাবিক দ্রুত বা গতির মত্ততাকেও চাইত না। তার বন্ধুরা যখন বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্যোন্নতির কথা বলত, সে বলত মানুষের প্রগতি হবে বুদ্ধিবিবেচনা প্রসূত যার মধ্যে কোনও মত্ততা বা অপরিণামদর্শিতা থাকবে না, সে বলত প্রগতি তাব নিজের পথ আপনিই বেছে নেবে। সে প্রগতি এক শান্ত শুভ পদ্ধতির পথ ধরে এগিযে যাবে। কমবেফারে মানবজাতির এমন এক ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করত যে ভবিষ্যৎ হবে শুভ শক্তি আর সরলতার মূর্ত প্রতীক যা মানবজাতির বিরাট বিবর্তনধারাটিকে ক্ষুণ্ন করবে না কিছুমাত্র। সে প্রায়ই বলত যা কিছু তা হবে নির্দোষ, সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত। সে বলত এক ধ্বংসাত্মক শক্তির ভয়ঙ্কর ঐশ্বর্যে দীপ্তিমান এক ঈগলের মতো যে বিপ্লব চোখে আগুন আর ঠোঁটে বক্ত নিযে এক অন্ধ আদর্শের লক্ষ্যাভিমুখে এগিযে যায সে বিপ্লবের মধ্যে প্রগতি বা অগ্রগতির কোনও সৌন্দর্য থাকতে পারে না। হাঁসের ডানাওয়ালা দেবদূত আর ঈগলের ডানাওয়ালা দেবদূতের মধ্যে যা পার্থক্য ওয়াশিংটন আর দাঁতনের মধ্যেও সেই পার্থক্য।

জাঁ প্রুভেয়ার ছিল কমবেফারের থেকে আরও নরম চিত্তের মানুষ। যে কল্পনা এবং আবেগ সেকালের যুবমানসের বৈশিষ্ট্য সেটা পূর্ণমাত্রায় ছিল তার মধ্যে। আসলে জাঁ প্রুভেয়ার ছিল প্রেমিক। সে ফুল ভালবাসত, বাঁশি বাজাত, কবিতা লিখত, মানুষকে ভালবাসত, নারী ও শিশুদের দুঃখে সমবেদনা জানাত ও কাঁদত। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। আঁদ্রে শেনিয়েরের গলাকাটার জন্য সে বিপ্লবকে ভর্ৎসনা করত। সে ছিল খুবই দয়ালু। তার কণ্ঠস্বর নরম হলেও মাঝে মাঝে তা গুরুগম্ভীর ও প্রভুত্বমূলক হয়ে উঠত। সে খুব পড়াশুনো করত। সে ইতালি, লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু—এই চারটি ভাষা জানত এবং এই চারটি ভাষার সাহায্যে দান্তে, জুভেলাস, এসকাইলাস আর ইগাইয়ার রচিত কাব্য পডত। ফরাসী সাহিত্যে সে রেসিনের থেকে কর্নেল আর কর্নেলের থেকে অ্যাগ্রিপ্পা দ্যবিগ্নের লেখা পছন্দ করত। ফুলগাছে ঘেরা পথে বা প্রান্তরের উপর দিয়ে পথ চলতে ভালবাসত সে। আকাশে মেঘেদের গতিভঙ্গির প্রতি তার যেমন কোনও খেয়াল ছিল না তেমনি সামাজিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতির দিকেও কোনও খেয়াল ছিল না তার। তার মনের ছিল দুটো দিক—একদিকে ছিল মানুষ আর একদিকে দেবতা। মানুষের জন্য সে পডাশুনো করত আর ঈশ্বরের জন্য সে ধ্যান করত, উপাসনা করত। সারাদিন ধরে বেতন, মূলধন, ধর্ম, বিবাহ, চিন্তা ও প্রেমের স্বাধীনতা, শিক্ষা, শাস্তিব্যবস্থা, দারিদ্র্য, সম্পত্তি, উৎপাদন, বণ্টন, সমাজের নিচের তলার মানুষদের আবিষ্কার ও জীবনযাত্রা প্রভৃতির নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাত সে। কিন্তু রাত্রিতে সে শুধু ভাবত অনন্ত আকাশের কথা। এঁজোলবাসের মতো প্রুভেয়ারও ছিল ধনীঘরের একমাত্র ছেলে। সে ছিল লাজুক প্রকৃতির, খুব শান্ত ও নরম সুরে কথা বলত, যখন-তখন লজ্জায় রাঙা হত। আবার মাঝে মাঝে সে হয়ে উঠত নির্ভীক।

পিতৃমাতৃহীন কুলি ছিল একজন পাখা প্রস্তুতকারক মিস্ত্রী। তার দৈনিক রোজগার ছিল মাত্র তিন ফ্রাঁ। তার একমাত্র চিন্তা ছিল জগতের মানুষকে মুক্ত করা। তার আর একটা চিন্তা ছিল লেখাপড়া শেখার। সে বলত একমাত্র শিক্ষাই মানুষের আত্মাকে মুক্ত করতে পারে। সে নির্জনে নিজের চেষ্টায় পড়তে-লিখতে শেখে। তার অন্তর ছিল স্নেহমমতায় উত্তপ্ত। সে পিতামাতাকে হারিয়ে তার দেশকে মা আর সমগ্র মানবজাতিকে তার পিতা ভাবত। জাতীয়তার ভাবধারা গভীরভাবে অন্তরে পোষণ করত সে। তার প্রতিবাদ যাতে সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ় হয় তার জন্য ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করত। সেকালে যে যুবশক্তি শুধু ফ্রান্সের কথা, দেশের কথা ভাবত, সে ছিল তাদের থেকে স্বতন্ত্র, কারণ সে তখন ভাবত বিরাট বিশ্বের কথা যে বিশ্বে ফ্রান্সের সঙ্গে সঙ্গে ছিল গ্রীস, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া আর ইতালি। স্বাধিকারবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বন্ধে তার চেতনা ছিল প্রবল। তুর্কীর দ্বারা ক্রীট ও থেসালি দখল, রাশিয়ার দ্বারা পোল্যান্ড দখল, অস্ট্রীয়ার দ্বারা ভেনিস দখল প্রভৃতি ঘটনাগুলি প্রচণ্ড ক্রোধ জাগায় তার মনে। ঘৃণা আর আত্মপ্রত্যয় ও সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা যে বাগ্মিতা সঞ্জাত সেই বাগ্মিতাই ছিল একমাত্র শক্তি। সে শুধু অক্লান্তভাবে বলত সেই সব বীর মহান জাতিদের কথা যারা বিশ্বাসঘাতক, অন্য কোনও অত্যাচারী আগ্রাসী জাতির দ্বারা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, যারা এক বিরাট ফাঁদের শিকার, জন্মমুহূর্তে যে সব জাতির গলা টিপে তাদের হত্যা করা হয়। কপর্দকহীন নিঃস্ব এক শ্রমিক নিজেকে ন্যায়পরায়ণতার অভিভাবক ভাবতে থাকে এইভাবে। শুধু মানবজাতির সহজাত অবিনশ্বর অধিকারের দাবি জানিয়ে মহত্ত্ব অর্জন করে সে। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী রাজারা অহেতুক রাজ্য জয় করে তাদের উদ্যম, শক্তি আর সম্মানের অপচয় করে থাকে। কোনও বিজিত জাতিকে বেশিদিন বশীভূত রাখা যায় না। আজ হোক কাল হোক পদানত জাতি একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবেই। গ্রীস আজও গ্রীসই আছে, ইতালি ইতালিই আছে। পরাজয় দখল পরস্বাপহরণের মতোই ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। কোনও একটা জাতিকে কখনো রুমালের মতো পকেটে ঢুকিয়ে রাখা যায় না।

কুরফেরাক ছিল এক সম্মানিত ব্যক্তির ছেলে লোকে যাঁকে মঁসিয়ে দ্য কুরফেরাক বলে ডাকত। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা আপন আপন উপাধির প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন ছিল। কিন্তু কুরফেরাক নিজের নামের সঙ্গে কোনও সম্মানসূচক উপাধি জুড়ে না দিয়ে নিজেকে শুধু কুরফেরাক বলত।

যে থোলোমায়েস একদিন ফাঁতিনের প্রেমিক ছিল সেই থোলোমায়েসের লেখা পড়ত কুরফেরাক। সে ছিল এমনই এক যৌবনসুলভ উদ্যমের অধিকারী যে উদ্যমের মাঝে ছিল আত্মার এক নারকীয় সৌন্দর্য। কিন্তু সে সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতা বেশি দিন থাকে না, তা সহজেই ম্লান হয়ে যায়। ১৮১৭ সালে থোলোমায়েসের মুখে যে কথা শোনা গেছে, ১৮২৮ সালে যে কেউ কুরফেরাকের মুখেও সেই কথা শুনতে পেত। কিন্তু দু'জনের মধ্যে পার্থক্যও ছিল প্রচুর। থোলোমায়েস অন্তরের দিক থেকে

ছিল এক অবৈধ প্রেমের নায়ক আর কুরফেরাক অন্তরের দিক থেকে ছিল এক বীরপুরুষ।

এঁজোলরাস ছিল নেতা, কমবেফারে ছিল পথপ্রদর্শক আর কুরফেরাক ছিল কেন্দ্র। কেন্দ্রোচিত গুণ তার ছিল। কেন্দ্রে অবস্থান করে যে তাপ সে বিকীরণ করত সেই তাপ থেকেই আলো জ্বালাত এবং আলোক বিকীরণ করত অন্যরা।

উদারনীতিবাদীদের এক বিক্ষোভ মিছিলে লালীমাঁদ নামে যে ছাত্র মারা যায় এবং যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ১৮২২ সালে এক রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামা হয়, বাহোরেল তাতে এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। বাহোরেলের উদ্দেশ্য ভালই ছিল। কিন্তু সে ছিল এক উদ্ধত এবং আপোসহীন বিপ্লবী, সাহসী, অমিতব্যয়ী, উদার এবং বাগ্মী। সে ছিল যেন জন্মবিক্ষুব্ধ এবং উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। ঝগড়ার থেকে বিদ্রোহে এবং বিদ্রোহের থেকে বিপ্লবে মজা পেত সে বেশি। একাদশ বর্ষের এক সামান্য ছাত্র হয়েও জানালার কাঁচের শার্সি ভাঙার মতো সহজে এক সরকারের উচ্ছেদ ঘটাতে পারত সে। সে স্কুলে পড়ার সময়েও যখন-তখন গান গাইত এবং শিক্ষকদের বিদ্রূপ করত। হাতখরচ হিসাবে বাড়ি থেকে তিন হাজার ফ্রাঁর মতো যে মোটা টাকা পেত তা সে বাজে খরচ করে উড়িয়ে দিত। সে ছিল এক বড় চাষীর ছেলে। কিভাবে ছেলেকে সম্মান দিয়ে চলতে হয় তা সে তার বাপমাকে শেখাত। সে তার বাবা-মা সম্বন্ধে বলত, ওরা চাষী, বুর্জোয়া নয়, তাই তাদের কিছুটা বোধশক্তি আছে।

বাহোরেল ছিল খেয়ালী। সে প্রায়ই বিভিন্ন কাফেতে ঘুরে বেড়াত। পথে পথে পায়চারি করে বেড়াত। ভুল করাই যেমন মানুষের কাজ তেমনি পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই হলো প্যারিসবাসীর কাজ। তবু তার মধ্যে ছিল এক চিন্তাশীল মন এবং এলিসি সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত।

যুবকদের এই সঙ্ঘের মধ্যে মাথায় টাকওয়ালা এক যুবক ছিল। তার নাম ছিল বোসেত। বোসেতের বাবার নাম ছিল মার্কুই দ্য আভারে। অ": শ লুই যেদিন বিদেশ থেকে ফ্রান্সে ফিরে এসে ক্যালে বন্দরে নামেন সেদিন তাঁর জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করে দেন বোসেতের বাবা ল্যাগলে। এজন্য খুশি হয়ে রাজা তাকে ডিউক উপাধি দান করেন। ল্যাগলে রাতারাতি হয়ে ওঠে মার্কুই দ্য আভারে।

বোসেত স্বভাবের দিক থেকে আনন্দোৎফুল্ল হয়ে থাকলেও তার ভাগ্যটা ছিল খারাপ। সে জীবনে কোনও কিছুই লাভ করতে পারেনি। কোনও কিছুতে সফল হতে পারেনি। সে সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দিত। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তার মাথায় টাক পড়ে। তার বাবার মৃত্যুকালে একটা বাড়ি আর কিছু জমি দিয়ে যায়। কিন্তু ভুল পরিকল্পনায় ব্যবসা করতে গিয়ে সে সব খুইয়ে ফেলে। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তির কিছুই অবশিষ্ট রইল না তার। তার বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানবুদ্ধি ছিল; কিন্তু তা সব ভুল পথে চালিত হয়। তাই সব দিকেই ব্যর্থ হয় সে। কাঠ কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলত সে। সব বিষয়ে সে ছিল ব্যর্থতার শিকার, তবু সব ব্যর্থতাকে, ভাগ্যের সব পরিহাসকে হেসে উড়িয়ে দিত সে। নিজের দুর্ভাগ্যকে নিজেই

উপহাস করত। সব দুর্ভাগ্যকে, জীবনের যত সব অবাঞ্ছিত ঘটনাকে সহজ বলে মেনে নিত। সে ছিল নিঃস্ব, দরিদ্র, কিন্তু তার মধ্যে ছিল হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার। তার পকেটে পয়সা ফুরিয়ে গেলেও মুখ থেকে হাসি ফুরোত না কখনো। যে কোনও দুঃখ-বিপদের ঘটনাকে এক পুরনো বন্ধুর মতো বরণ করে নিত, তার পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিত। হাতে কোনওভাবে কোনও টাকা পেলেই উদারভাবে খরচ করে ফেলত সে। কোনও এক রাতে রাস্তার একটা অচেনা লোকের সঙ্গে কোনও এক হোটেলে নৈশ ভোজন করতে গিয়ে একশো ফ্রাঁ খরচ করে ফেলে।

বাহোরেলের মতো আইন পড়ে ওকালতি করার পথে এগিয়ে যায় বোসেত। তার কোনও নির্দিষ্ট থাকার জায়গা ছিল না। একজন বন্ধুর কাছে থাকত। তবে জলি নামে এক ডাক্তারি ছাত্রের কাছেই সে বেশি থাকত। জলি ছিল তার থেকে দু' বছরের ছোট।

জলির বয়স ছিল তেইশ। চিকিৎসাশাস্ত্রের যেটুকু সে শিখেছিল তাতে নিজেকে সে ডাক্তারের থেকে রোগী করে তোলে বেশি। এই যুবক বয়সেই নিজেকে এক দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হিসাবে ভাবত। নিজেকে রুগ্ন ভাবত সব সময় এবং আয়নার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে নিজের জিবটাকে পরীক্ষা করত। কোনও দুর্যোগের দিন সে নিজের হাতের নাড়ী টিপে দেখত। তার মধ্যে যৌবনসুলভ কিছু অসঙ্গতি এবং অপ্রকৃতিস্থতা থাকলেও সেও আনন্দে প্রায়ই উৎফুল্ল হয়ে থাকত। তাই তার বন্ধু তাকে 'জলি' বলে ডাকত যার অর্থ হচ্ছে উৎফুল্ল। তার ছড়িব গোল বাঁট দিয়ে নিজের নাকটাকে ঘষার একটা বাতিক ছিল। এটা নাকি বিচক্ষণ মনের লক্ষণ।

বিভিন্ন প্রকৃতির এই যুবকদের মধ্যে একটা কিন্তু সাধারণ ধর্ম ছিল এবং সে ধর্মের নাম ছিল প্রগতি। এরা সবাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ বংশধর। ১৭৮৯ সালের নাম উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই সবচেয়ে চপলমতি যুবকও গম্ভীর হয়ে উঠত। অথচ তাদের পিতারা সবাই ছিল রাজতন্ত্রী। কিন্তু তাতে তাদের কিছু যেত আসত না। এক শুচিশুদ্ধ নীতি ও আদর্শের স্রোত বয়ে যেত যেন তাদের দেহের প্রতিটি শিরায়। অতীত যুগের কোনও বৈপরীত্য বা বৈষম্য কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারত না তাদের সামনে।

কিন্তু এই সব গোঁড়া বিশ্বাসী আদর্শে আস্থাবান বন্ধুদের মধ্যে একজন সংশয়বাদী এসে জোটে। এই সংশয়বাদীর উপর তাদের আকস্মিক আকর্ষণ, বৈপরীত্যের প্রতি আমাদের সহজাত আকর্ষণেরই সামিল। এই সংশয়বাদী যুবকের নাম ছিল গ্রান্তেয়ার। গ্রান্তেয়ারও ছিল প্যারিসের এক ছাত্র। তার ধারণা ছিল প্যারিস শহরে না থাকলে পড়াশুনো হয় না। পড়াশুনো শেখার সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের বিখ্যাত জায়গাগুলোর নামও শিখে ফেলে সে। সে জানত সবচেয়ে ভাল কফি পাওয়া যায় নেম্বলিন কাফেতে, সবচেয়ে ভাল বিলিয়ার্ড খেলার ঘর আছে কাফে ভলতেয়ারে। সবচেয়ে ভাল নাচিয়ে এবং সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যায় বুলভার্দ দু মেইনে, সবচেয়ে ভাল চিকেন পাওয়া যায় মেরে সাগেতে, আর সবচেয়ে ভাল সাদা মদ পাওয়া যায় ব্যারিয়ের দু কমবাতে।

একাধারে সে ছিল বক্সিং খেলায় পারদর্শী, ভাল ব্যায়ামবিদ এবং নাচিয়ে। সে খুব মদ খেতে পারত এবং অনেক বাজী রেখে মদ খেত। সে দেখতে দারুণ কুৎসিত ছিল। তার চোখ-মুখ দেখে বুটপালিশকরা একটা লোক একবার মন্তব্য করেছিল, মানুষ এমন কুৎসিত হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। তবু তাতে কিছুমাত্র দমে যেত না গ্রান্তেয়ার। সে মেয়েদের দিকে স্থির ও লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাত এবং মনে মনে ভাবত আমি ইচ্ছা করলেই ওদের পেতে পারি। সে বন্ধুদের কাছে বলে বেড়াত অনেক সুন্দরী মেয়ে তার পিছু নিয়েছে। তাকে ভীষণভাবে চাইছে।

জনগণের অধিকাব, মানুষেব অধিকার, সামাজিক চুক্তি, ফরাসী বিপ্লব, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, মানবতা, সভ্যতা, ধর্ম, প্রগতি প্রভৃতি শব্দ বা শব্দের কোনও অর্থ ছিল না সংশযবাদী গ্রান্তেযারের কাছে। সংশয়বাদ তার মাথার মধ্যে কোনও বিশ্বাসকেই দাঁড়াতে দিত না। তাব বুদ্ধিকে করে তুলেছিল একেবারে শুষ্ক নীরস। সে সবকিছুকে উপহাস করে উড়িয়ে দিত। একগ্লাস মদই ছিল তার একমাত্র বিশ্বাসেব বস্তু। কোনও আদর্শে বিশ্বাস তার কাছে ছিল চরম উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু। সে খৃস্টিয় ক্রসকে একধরনের ফাঁসিকাঠ বলে অভিহিত করত। সে ছিল নারীলোলুপ, মাতাল এবং অমিতব্যয়ী এবং সে তার আশাবাদী বন্ধুদের কাছে শুধু রাজা চতুর্থ হেনরির গুণগান করে বিরক্ত করে তুলত তাদেব যে হেনরি ছিলেন তারই মতো নারীলোলুপ এবং পাপাসক্ত।

সংশযবাদী হলেও একজনের প্রতি অদ্ভুত একটা আসক্তি ছিল গ্রান্তেযারেব। কোনও আদর্শ, ধর্ম, কলা বা বিজ্ঞানের প্রতি তার কোনও আসক্তি ছিল না। একমাত্র আসক্তি তার এঁজোলবাসেব প্রতি। গ্রান্তেযার এঁজোলরাসকে সত্যিই খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। যে সব বিশ্বাসকেই সংশয়াত্মক প্রশ্নের ছুরি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিত সে সবচেয়ে একজন গোঁড়া বিশ্বাসীরই ভক্ত হযে ওঠে। এঁজোলরাস কিন্তু কোনও যুক্তিতর্কের দ্বারা তার মন জয় করেনি, তার চরিত্রই তার প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত করে তোলে গ্রান্তেয়ারকে। এটা অবশ্য এমন কিছু দুর্লভ ঘটনা নয়। আমাদের মধ্যে যা নেই আমরা তার দিকেই ছুটে চলি, সেটার প্রতি আসক্ত হই। কোলাব্যাঙ যেমন উড্ডীয়মান পাখির দিকে তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ চোখে, তেমনি ধর্মবিশ্বাসের আকাশে উড্ডীয়মান এজোলরাসের পানে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসত সংশযের মাটিতে আবদ্ধ গ্রান্তেয়ার। এঁজোলরাসকে দরকার ছিল তার। সে তার অজানিতে এবং তার কোনও কারণ না জেনেই সৎ, সরলপ্রকৃতির, ন্যায়পরায়ণ ও আদর্শনিষ্ঠ এজোলরাসের দ্বারা মুগ্ধ হয় ; আসক্ত হয়ে ওঠে তার প্রতি। আসলে সে বিপরীত প্রকৃতির প্রতিই যেন আকৃষ্ট হয়। তার অসংলগ্ন আকারহীন চিন্তা এঁজোলরাসকে যেন মেরুদণ্ড হিসাবে অবলম্বন করতে চায়। আসলে কতকগুলো অসংবদ্ধ, অসংগত ও পরস্পরবিরুদ্ধ উপাদানে গড়া ছিল যেন তার প্রকৃতি। সে ছিল একই সঙ্গে বন্ধুদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক এবং অন্তরঙ্গ, উদাসীন এবং স্নেহমমতাশীল। সে জানত না স্নেহমমতা মাত্রই একটা বিশ্বাস। আসলে সে জানত না, মানুষের মন বিশ্বাস ছাড়া চলতে পারে না, কিন্তু হৃদয়

বিশ্বাস বা বন্ধুত্ব ছাড়া চলতে পারে না। এই দ্বিধাবিভক্ত মনোভাব নিয়েই যেন অনেকে জন্মগ্রহণ করে। তারা জোড়া ছাড়া বাঁচতে পারে না। বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারত না গ্রান্তেয়ার। আর এই যুবকরাও তার পরিহাসরসিকতার জন্য সহ্য করে যেত তাকে।

এঁজোলরাস কিন্তু গ্রান্তেয়ারকে মোটেই ভালবাসতে পারত না। সে তার সংশয়মন্যতা আর পাপাসক্তি দুটোকেই অপছন্দ করত। ঘৃণা করত। এক করুণামিশ্রিত ঘৃণার সঙ্গে গ্রান্তেয়ারকে দেখত এঁজোলরাস। কিন্তু এঁজোলরাসের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হযেও এবং তার কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়েও বারবার সে ফিরে আসত তার কাছে। এসে বলত, কি চমৎকার এক প্রতিমূর্তি!

২

কোনও এক বিকালে কাফে মঁসের দরজার কাছে দাঁড়িযেছিল বোসেত। তাব দৃষ্টি ছিল প্লেস সেন্ট মাইকেলের উপর নিবদ্ধ। তার আর এক নাম ছিল ল্যাগলে দ্য মিউ। সে তখন দু'দিন আগে স্কুল অফ ল বা আইন বিদ্যালয়ের ক্লাসে ঘটে যাওযা একটা তুচ্ছ ঘটনার কথা ভাবছিল। কিন্তু ঘটনাটা তুচ্ছ হলেও তার ভবিষ্যতের পরিকল্পনাটা ওলোটপালোট হযে যায়।

তার সেই দিবাস্বপ্নের মধ্যেও বোসেত দেখতে পেল দু'চাকাওযালা একটা ঘোডার গাডি প্লেস সেন্ট মাইকেলের চারপাশে কি একটা জায়গা খোঁজ কবে বেডাচ্ছে। গাডির ভিতর যুবক একটা মোটা ব্যাগ হাতে বসে আছে। তার ব্যাগের উপব ঝোলানো একটা ছাপা কার্ডে লেখা আছে মেরিয়াস পঁতমার্সি।

এই নামটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল বোসেত, মঁসিযে মেরিযাস পঁতমার্সি?

গাড়িটা থেমে গেল। গাড়ির ভিতর বসা যুবকটিও তখন ছিল চিন্তায মগ্ন। সে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল। বলল, হ্যাঁ আমি।

তুমিই তো মেরিয়াস পঁতমার্সি?

অবশ্যই।

আমি তোমারই খোঁজ করছি।

মেরিয়াস বলল, তার মানে কি বলতে চাইছ তুমি?

মেরিয়াস কিছু আগে তার মাতামহের বাড়ি ছেড়ে আসে। কিন্তু এখানে যে তার নাম ধরে ডাকছে এবং যে তার খোঁজ করছে তাকে সে চেনে না। সে তাই আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি তো তোমাকে চিনি না।

আমিও তোমাকে চিনি না।

মেরিয়াসের মনে হলো যুবকটি ঠাট্টা করছে, কৌতুক করছে। কিন্তু ঠাট্টা-কৌতুক করার মতো মন তখন তার ছিল না।

কিন্তু এতে বোসেতের মন দমে গেল না। সে বলল, গত পরশু তুমি আইন স্কুলে ছিলে না?

সম্ভবত।

হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই ছিলে।

মেরিয়াস জিজ্ঞাসা করল, তুমি একজন ছাত্র?

হ্যাঁ মঁসিয়ে, আমিও তোমার মতোই এক ছাত্র। গত পরশু আমি স্কুলে হঠাৎ গিয়ে পড়ি। এটা আমার খেয়াল। অধ্যাপক তখন নাম ডাকছিলেন। তুমি জান এই সময় তাঁরা বড় বিরক্তিকর হয়ে ওঠেন। তিনবার নাম ডাকার পরও তুমি যদি উত্তর না দাও তাহলে ওঁরা তোমার নামের পাশে অনুপস্থিত লিখবেন। আর তার মানে ষাট ফ্রাঁ জলে যাবে।

মেরিয়াস আগ্রহসহকারে শুনতে লাগল। বোসেত ওরফে ল্যাগলে বলে যেতে লাগল।

অধ্যাপকের নাম ব্লঁদো। টিকোল নাক আর স্বভাবটা বড় বাজে। সে ছাত্রদের অনুপস্থিত করে আনন্দ পায়। সে শুরু করে নামের আদি অক্ষর পি দিয়ে। ওটা আমার নামের আদি অক্ষর নয় বলে আমি তখন অন্যমনস্ক ছিলাম। যাদের নাম ডাকছিল তারা সবাই উপস্থিত ছিল। বেশই চলছিল। এমন সময় সে মেরিয়াস পঁতমার্সির নাম ডাকল। কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। এবার আরও জোরে নামটা ডাকল। কিন্তু তবু কোনও উত্তর না পেয়ে কলমটা হাতে তুলে নিল। তখন আমার করুণা হলো। আমি ভাবলাম, সময়মতো পৌঁছতে না পারার জন্য একটা ভাল ছেলে অনুপস্থিত হিসাবে চিহ্নিত হবে। ভাবলাম তুমি একজন ভাল ছেলে, জ্ঞানবিদ্যা ও নানারকম শাস্ত্র পাঠে তোমার ঝোঁক আছে। তোমার নাম বাদ যাবে এটা হতে পারে না। অন্যদিকে আমি হচ্ছি একটা বকাটে ছেলে, একটা মস্ত কুঁড়ে। মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াই, তাদের পিছনে ঘুরে বেড়াই। এমন কি এই মুহূর্তে আমি আমার প্রেমিকার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পারি। সুতরাং তোমাকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। ব্লঁদো চুলোয় যাক। ব্লঁদো তাই তিনবারের বার তোমার নামটা ডাকতেই আমি বলে উঠলাম, মেরিয়াস পঁতমার্সি উপস্থিত। তার ফলে তুমি উপস্থিত চিহ্নিত হলে।

মেরিয়াস আমতা আমতা করে বলল, মঁসিয়ে আমি—

ল্যাগলে বলল, কিন্তু আমি—

মেরিয়াস বলল, কিন্তু কেন?

ল্যাগলে বলল, তার পরের ব্যাপারটা হলো এই। আমি তোমার নামটা বলেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। এমন সময় আমার নাম ডাকল এবং তখন এক শয়তানি চাতুর্যের সঙ্গে আমার দিকে তাকাল ব্লঁদো। আমার নাম হলো ল্যাগলে।

মেরিয়াস বলল, তার মানে লা ঈগল। কি চমৎকার নাম।

যাই হোক, ব্লঁদো আমার এই চমৎকার নামটা ডাকল এবং আমি 'উপস্থিত' এই বলে উত্তর দিলাম। সে তখন ব্যাঘ্রসুলভ তৃপ্তির সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু তুমি যদি মেরিয়াস পঁতমার্সি হও তাহলে তুমি ল্যাগলে হতে পার না। এই মন্তব্য তোমার কাছে অপমানকার ঠেকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ভয়ঙ্করভাবে বিপজ্জনক। সে সঙ্গে সঙ্গে আমার নামটা কেটে দিল।

মেরিয়াস বলল, আমি মর্মাহত।

ল্যাগলে বলে যেতে লাগল, ভাবলাম বেরিয়ে যাবার আগে ব্লঁদোর উপর কতকগুলো শক্ত কথার ঢিল ছুঁড়ে যাই। আমি মনে করব ব্লঁদো মারা গেছে। অবশ্য তার বাঁচা-মরার মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। তার চর্মসার দেহ, ম্লান মুখ, তার গায়ের গন্ধ—সব মিলিয়ে তাকে মৃতই মনে হয়। ব্লঁদো হচ্ছে নিয়মশৃঙ্খলার দাস, নাকসর্বস্ব বলদ, নামডাকার ধ্বংসাত্মক দেবদূত। একই সঙ্গে সৎ, অনমনীয় এবং ভয়ঙ্কর। সে যেমন আমার নাম কেটে দিয়েছে, ঈশ্বর তেমনি তার নাম সরিয়ে দেবে পৃথিবী থেকে।

মেরিয়াস বলল, আমি খুব বিব্রত বোধ করছি।

ল্যাগলে বলল, হে যুবক, সাবধান হও, ভবিষ্যতে সময়মতো আসবে।

তোমার কাছে হাজারবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

নিজের নাম কেটে পরের উপকার করতে যেও না।

আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।

আমি কিন্তু খুশি। আমার উকিল হবার ভয় ছিল। এই ঘটনা আমাকে সে ভয় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমাকে আর কোনও বিধবাকে বাঁচাতে হবে না বা কোনও অনাথ শিশুকে বিপদে ফেলতে হবে না। কোনও গাউন পরতে হবে না। এই সবকিছুর জন্য মঁসিয়ে পঁতমার্সি, আমি তোমার কাছে ঋণী। তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমি তোমার বাড়ি যাব। কোথায় থাক তুমি?

এই বাড়িতে।

তাহলে বলতে হবে তুমি ধনী। আমি তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি এমন একটা বাসায় থাক যার দাম বছরে নয় হাজার ফ্রাঁ।

এমন সময় কুরফেরাক কাফে থেকে বেরিয়ে এল। মেরিয়াসের মুখে করুণ একফালি হাসি ফুটে উঠল।

মেরিয়াস বলল, গাড়িটা আমি দু' ঘণ্টার জন্য ভাড়া করেছি। এখন বেরিয়ে এসেছি। আসল কথা আমার থাকার কোনও জায়গা নেই।

কুরফেরাক বলল, মঁসিয়ে আমাদের বাসায় চলে এস।

ল্যাগলে ওরফে বোসেত বলল, আমারও থাকার জায়গা নেই, তা না হলে আমার কাছেই থাকতে।

কুরফেরাক বলল, চলে এস বোসেত।

মেরিয়াস বলল, তোমার নাম তো ল্যাগলে।

ল্যাগলে বলল, আমাকে বোসেত বলেই সবাই ডাকে।

কুরফেরাক ঘোড়ার গাড়িটাতে উঠে ড্রাইভারকে হোটেল দ্য লা সেন্ট জাঁকে নিয়ে যেতে বলল। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় মেরিয়াস সেই হোটেলে কুরফেরাকের পাশের একটা ঘরে উঠল।

৩

কয়েকদিনের মধ্যেই মেরিয়াস আর কুরফেরাক দু'জনে বন্ধু হয়ে উঠল। যৌবনে

মানুষের মনের আঘাত বা ক্ষত শীঘ্রই সেরে যায়। কুরফেরাকের সাহচর্যে স্বস্তি অনুভব করল মেরিয়াস। কুরফেরাক কোনও প্রশ্ন করত না মেরিয়াসকে। কোনও কিছু জানতে চাইত না। এই বয়সে মানুষের মুখ দেখেই অনেক কিছু জানা যায়। কথার কোনও দরকার হয় না।

একদিন সকালবেলায় কুরফেরাক মেরিয়াসকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার রাজনৈতিক মতামত আছে?

অবশ্যই আছে।

তাহলে তুমি কোন দলের?

আমি হচ্ছি বোনাপার্টপন্থীর গণতন্ত্রবাদী।

কুরফেরাক বলল, ঠিক আছে।

পরদিন সে মেরিয়াসকে কাফে মুঁসেতে নিয়ে গেল। হাসিমুখে বলল, আমি তোমাকে বিপ্লবীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব।

এই বলে সে কাফের পিছন দিকে এলিসি সংস্থার কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে তার বন্ধুদের সামনে উপস্থিত করল। বলল, একজন নতুন লোক।

মেরিয়াস যেন এক ভীমরুলের চাকে গিয়ে পড়ল। সে চাক ছিল কতকগুলি জীবন্ত মনের গুঞ্জনে মুখরিত। সে ধীর স্থির মেজাজের এবং গম্ভীর প্রকৃতির হলেও তার হুলও কম ছিল না। অবস্থার বিপাকে সে একা পড়ে যাওয়ায় একসঙ্গে অনেকগুলি যুবকের হৈ-চৈ ও আক্রমণে ভীত হয়ে উঠল। তারা ভয়ঙ্কর স্পষ্টতার সঙ্গে অসংযত উচ্ছ্বাসে যে সব চিন্তা-ভাবনার কথা প্রকাশ করছিল সে সব চিন্তা-ভাবনা তার নিজের চিন্তা-ভাবনার থেকে এত পৃথক ছিল যে সে তার কিছুই বুঝতে পারছিল না। তারা যে সব দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস ও ধর্মের কথা আলোচনা করছিল, তা তার কাছে নতুন। তার সামনে যেন এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। কিন্তু কথাগুলো সে সব বুঝতে না পারায় সেগুলো অসংলগ্ন আর গোলমেলে মনে হচ্ছিল। সে যখন তার মাতামহের মতবাদ ত্যাগ করে তার পিতার নীতি গ্রহণ করে, তখন সে ভেবেছিল আর কোনও সমস্যা নেই তার মনে। সে তার আকাঙ্ক্ষিত আদর্শকে পেয়ে গেছে। কিন্তু এখন দেখল এক তুমুল আলোড়ন চলছে তার মনে; তার দৃষ্টিভঙ্গির আবার পরিবর্তন ঘটছে। তার পুরনো ধারণা ও ভাবধারা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগছে তার মনে। তবে তার মনে হলো তার নতুন বন্ধুদের আলোচনার বিষয়বস্তু যাই হোক, তাদের কথাবার্তার মধ্যে গ্রহণযোগ্য কোনও যুক্তি নেই।

এরপর থিয়েটারের এক পোস্টার নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। এক নতুন নাটকের প্রচার সম্বন্ধে বাহোরেল বলল, এই সব বুর্জোয়া ট্রাজেডি জাহান্নামে যাক।

এ কথা শুনে কমবেফারে উত্তর করল, তুমি ভুল করছ বাহোরেল। বুর্জোয়ারা ট্রাজেডি ভালবাসে এবং তাদের তা ভালবাসতে দেওয়া উচিত। আমি এসকাইলাসের লেখা পছন্দ করি। সহাবস্থানের অধিকারে বিশ্বাস করি। পোলট্রিতে বানানো কৃত্রিম মুরগীর পাশাপাশি যদি সত্যিকারের পাখি থাকতে পারে তাহলে অন্য সব নাটকের পাশাপাশি ক্লাসিক ট্রাজেডি থাকবে না কেন?

একদিন মেরিয়াস এঁজোলরাস আর কমবেফারের সঙ্গে রু্য জা জ্যাক রুশোর অঞ্চলের এক রাস্তা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। কমবেফারে একসময় মেরিয়াসের একটা হাত ধরে বলল, তুমি জান কোথায় আমরা এসেছি? আগে এ অঞ্চলের নাম ছিল রু্য প্ল্যাত্রিয়ের। এখন এটার নাম রু্য জাঁ জ্যাক রুশো। ষাট বছর আগে এখানকার পরিবারের নামে এ অঞ্চলের এই নাম হয়। সে পরিবারে জাঁ জ্যাক আর থেরেসে বাস করত। তাদের কতকগুলি সন্তান হয়। থেরেসে যে সব সন্তান প্রসব করে জাঁ জ্যাক তাদের তাড়িয়ে দেয়।

এঁজোলরাস কড়াভাবে তার প্রতিবাদ করে বলল, জাঁ জ্যাকের বিরুদ্ধে কোনও কথা আমি সহ্য করব না। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। যদিও তিনি তাঁর সন্তানদের পিতৃত্ব অস্বীকার করেন, তিনি জনগণের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন।

এই সব যুবকরা কেউ সম্রাট এই শব্দটা ব্যবহার করত না। জাঁ প্রুভেয়ার মাঝে মাঝে সম্রাটের পরিবর্তে নেপোলিয়ন বলত। অন্যান্যরা বলত বোনাপার্ট। এঁজোলরাস কথাটা 'বুনাপার্ত' বলে উচ্চারণ করত।

৪

তার নতুন বন্ধুদের যে সব আলোচনা মন দিয়ে শুনত মেরিয়াস এবং তাতে মাঝে মাঝে যোগদান করত তা তার মনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

এই সব আলোচনা হত কাফে মুঁসের পিছন দিকের ঘরটায় যখন কোনও সন্ধ্যায় এলিসি সংস্থার প্রায় সব সদস্যরা উপস্থিত হত। ঘরের মধ্যে বড় বাতিটা জ্বালানো হত। তারা কোনও উত্তেজনা বা চেঁচামেচি না করে এটা-সেটা আলোচনা করত। তাতে এঁজোলরাস আর মেরিয়াস খুবই কম যোগদান করত। কখনো কখনো একই সঙ্গে সদস্যরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করত।

সে ঘরে নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কেবল কাফের রান্নাঘরে লুসোঁ নামে যে মেয়েটি কাজ করত সে মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকতে পেত। রান্নাঘরটাকে ওরা বলত ল্যাবরেটারি।

গ্রান্তেয়ার খুব বেশি মদ খেত। মদ খেয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে সে তর্কবিতর্ক করত। একদিন সে চিৎকার করে বলে উঠল, আমার পিপাসা এখনো যায়নি। আমি আরও মদপান করতে চাই। আমি জীবনটাকে ভুলে যেতে চাই। জানি না কে এই জীবনটাকে সৃষ্টি করেছে। জীবনে কোনও কিছুই সত্য নেই, তবু আমরা বেঁচে থাকার জন্য ঝগড়া মারামারি করি। সুখ হলো জীবনের উপর আঁকা একটা পুরনো প্রাণহীন পট। যাজকদের মতো আমিও বলি, সব কিছুই অভিমান আর অহঙ্কার। একটা নগ্ন শূন্যতাকে অহঙ্কারের পোশাক পরিয়ে তাকে বড় বড় কথা বলে চালানো হয়। ফলে রান্নাঘরকে ল্যাবরেটারি বলে চালানো হয়, একটা নাচিয়েকে বলা হয় নৃত্যশিল্পের অধ্যাপক, ওষুধের দোকানদারকে বলা হয় কেমিস্ট, পরচুলাতৈরিকারীকে বলা হয় শিল্পী। অহঙ্কারের দুটি দিক আছে, বাইরের দিকটা কালো নিগ্রো আর

ভিতরের দিকটা ছদ্মবেশী দার্শনিক। একটার জন্য আমার চোখে জল পড়ে আর অন্যটার জন্য হাসি পায়। আমাদের তথাকথিত সম্মান আর মর্যাদা হচ্ছে অহঙ্কারেরই ছদ্মরূপ। মানুষের প্রকৃত যোগ্যতার মধ্যে প্রশংসনীয় কিছুই নেই। কোনও লোক কিভাবে তার প্রতিবেশীর প্রশংসা করে তা লক্ষ্য করবে। সাদা হচ্ছে সাদারই শত্রু। শ্বেত কপোত যদি কথা বলতে পারত এবং প্রাণীর মতো কাজ করতে পারত তাহলে শ্বেত কপোতের ডানাগুলো ছিঁড়ে দিত। কোনও গোঁড়া ধার্মিক যখন অন্য এক গোঁড়া ধার্মিকের সঙ্গে কথা বলে তখন সে বিষাক্ত সাপের মতোই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দুঃখের বিষয় আমি অনেক বিষয়েই অজ্ঞ। আমি জানলে আরও অসংখ্য বিষয়ের কথা বলতে পারতাম, অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারতাম। আমার বুদ্ধি ছিল, মাথা ছিল, কিন্তু যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন পড়ায় মন না দিয়ে আমি ফুলবাগানে গিয়ে ফুল চুরি করতাম। আমি তোমাদের মূল্য দিতে রাজী, কিন্তু তোমাদের পূর্ণতা বা সদগুণ সম্বন্ধে আমার কোনও আগ্রহ নেই। প্রতিটি গুণের অন্তরালে আছে একটা করে দোষ। মিতব্যয়িতা হচ্ছে কৃপণতার প্রতিবেশী, আবার উদারতা হলো অমিতব্যয়িতার প্রতিবেশী ; বীরত্ব হচ্ছে অত্যধিক সাহসিকতা বা বাহবা পাবার প্রবণতার প্রতিবেশী ; অতিরিক্ত ধর্মাচরণ হলো ধর্ম সম্বন্ধে বাতিকের প্রতিবেশী। ডাওজেনিসের পোশাকের অসংখ্য ছিদ্রের মতো প্রতিটি গুণের মধ্যে আছে অসংখ্য দোষের ছিদ্র। নিহত বা ঘাতক——কার প্রশংসা আমরা বেশি করি, সীজার অথবা ব্রুটাসের। আমরা ঘাতকের প্রশংসাই করে থাকি। তার মানে ব্রুটাসের। বলি, ব্রুটাস দীর্ঘজীবি হোন। এটাই তোমাদের গুণ। গুণ হযত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মত্ততাও। সব মহাপুরুষের মধ্যেই ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। যে ব্রুটাস সীজারের বুকে ছুরি মেরেছিলেন তিনিই গ্রীক ভাস্কর স্ট্রঙ্গিলিয়নের গড়া এক প্রতিমূর্তির প্রেমিক ছিলেন। এই স্ট্রঙ্গিলিয়ন আবার আমাজন নারী ইউকমেননের এক মূর্তি গড়েন যে মূর্তিটির প্রেমিক ছিলেন নীরো। এইভাবে ব্রুটাস ছিলেন নীরোরই সমগোত্রীয়। ইতিহাস হচ্ছে পুনরাবৃত্তির এক বিরাট পটভূমি। প্রতিটি যুগ তার আগের যুগের অনেক কিছুই অপহরণ করে। ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধ পিদনার যুদ্ধেরই নকল। তলরিয়াক যুদ্ধে ক্লোডিয়ার জয় অস্টারলিৎসে নেপোলিযনের কথাই মনে পড়িযে দেয়। দু'ফোঁটা রক্তের মতোই এ দুটি যুদ্ধজয়ের মধ্যে আছে এক অবিকল সাদৃশ্য। জয়ের মধ্যে আমার কোনও আগ্রহ নেই। জয়ের কোনও অর্থ নেই। আমরা সাফল্যলাভে সন্তুষ্ট হই। কিন্তু জয় মানেই দুঃখ। জয় মানেই অহঙ্কার আর বিশ্বাসঘাতকতা। সমগ্র মানবজাতিকেই আমি ঘৃণা করি। কোন জাতির প্রশংসা করব আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ? গ্রীকদের ? যে এথেন্সবাসীরা প্রাচীন জগতের মধ্যমণি ছিল তারাই ফোসিয়ানকে হত্যা করে এবং তার অত্যাচারীদের সঙ্গে আঁতাত করে। গ্রীসের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন বৈয়াকরণিক ফিলেতাস। কিন্তু তিনি এত রোগা ছিলেন যে তিনি যাতে বাতাসে উড়ে না যান তার জন্য জুতোর তলায় সীসে ভরে রাখতেন। কোরিনথের মেন স্কোয়ারে সাইলানিয়নের দ্বারা নির্মিত এপিসথেটসের এক প্রতিমূর্তি আছে। কিন্তু এই এপিসথেটস কে ছিলেন ? তিনি ছিলেন কুস্তিগির

যিনি ক্রস বাটক নামে একটা অস্ত্র আবিষ্কার করেন। এই হলো গ্রীস। আরও এগিয়ে যাও। এরপর ফ্রান্স বা ইংলন্ড কার প্রশংসা করব? ফ্রান্সের কেন প্রশংসা করব? প্যারিসের জন্য? এথেন্সের কথা আমি আগেই বলেছি। ইংলন্ডের প্রশংসা করব কেন? লন্ডনের জন্য? আমি কার্থেজকে ঘৃণা করি। তেমনি লন্ডনকেও ঘৃণা করি। লন্ডন হলো বিলাসিতার রাজধানী। চেয়ারিং ক্রস অঞ্চলে প্রতিবছর একশো করে লোক ক্ষুধায় মারা যায়। আমি এক ইংরেজ মহিলাকে একরাশ গোলাপ নিয়ে নীল চশমা পরে নাচতে দেখেছিলাম। ইংলন্ড জাহান্নামে যাক। জন বুলকে আমি যদি শ্রদ্ধা করতে না পারি তাহলে কি ব্রাদার জোনাথানকে শ্রদ্ধা করব? ক্রীতদাসের সেই মালিকের প্রতি আমার কোনও ভালবাসা নেই। সময়ানুবর্তিতা ছাড়া ইংলন্ডের আর কোনও সম্পদ নেই যেমন তুলো ছাড়া আমেরিকার সম্পদ নেই। জার্মানি হচ্ছে অলস, অকর্মণ্য, ইতালি হচ্ছে বিকৃতমনা। তাহলে কি আমরা রাশিয়ার প্রশংসা করব? ভলতেয়ার অবশ্য রাশিয়ার প্রশংসা করতেন এবং তিনি চীনেরও প্রশংসা করতেন। রাশিয়াতে অনেক সুন্দরী আছে ঠিক, কিন্তু স্বেচ্ছাচারীও আছে। তবে সেই সব অত্যাচারীদের জন্য দুঃখ হয় আমার। একজন অ্যালেক্সির মাথা কাটা যায়, একজন পীটার ছুরি খায়, একজন পলের ফাঁসি হয়, আর পায়ের তলায় নিষ্পেষিত হযে ভয়ে মারা যায়। অনেক ইভানস-এর মাথা কাটা যায় এবং অনেক নিকোলাসকে বিষ খাইয়ে মারা হয়। এর থেকে বোঝা যায় রাশিয়ার জারের প্রাসাদ বড অস্বাস্থ্যকর জায়গা। তোমরা হয়ত বলতে পার এশিয়ার থেকে ইউরোপ ভাল। আমি স্বীকার করি এশিয়ার সব কিছু হাস্যাস্পদ। তবে একথাও ঠিক যে তিব্বতের রাজা প্রধান লামাকে নিয়ে হাসাহাসি করার যুক্তি নেই। আমরা পশ্চিমের লোকরা রাজতন্ত্রের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলি গ্রহণ করেছি। রানী ইসাবেলার ময়লা শেমিজ আর রাজা ডফিনের ফুটো চেয়ার হলো আমাদের রাজতন্ত্রের প্রতীক। আমাদের ভদ্রলোকরা ব্রাসেলস্‌, স্টকহলম আর আমস্টারডমের ভাল মদ খায়, কনস্তান্তিনোপলের ভাল কফি খায় তারা। প্যারিস সেদিক থেকে সবচেয়ে ভাল। সভ্য জগৎ একটা জিনিসই ভাল শিখেছে, সেটা হলো যুদ্ধ, আর যুদ্ধ মানেই ডাকাতি, দস্যুগিরি। আমি প্যারিসের ভাল ভাল মদের দোকানগুলোকে সেলাম করি। আমি শেষ রিচার্ডে খাই। তবে আমার একটা পারস্যের কার্পেটের দরকার যার উপর নগ্ন ক্লিওপেট্রা পাবে। এই ক্লিওপেট্রা এসে গেছে। লুসোঁ তুমি কেমন আছ প্রিয়তমা?

এমন সময় গ্রান্তেয়ার প্রচুর মদ খেয়ে মদের ঝোঁকে লুসোঁর হাত ধরে ঘরটার যে কোণে সে ছিল সেখানে জোর করে নিয়ে গেল। বোসেত যখন হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিতে গেল তখন সে রেগে গিয়ে বলে উঠল, হাত সরিয়ে নাও ল্যাগলে। তুমি আমাকে শান্ত করতে পারবে না। আমি শান্ত হব না। আমার মন-মেজাজ ভাল নেই। মানুষের থেকে প্রজাপতি অনেক ভাল। মানবজাতি সব দিক থেকে ব্যর্থ। অতীতাশ্রয়ী এক বিষাদে আমি ভুগছি। আমার তাই রাগ হচ্ছে। ঈশ্বর জাহান্নামে যাক শয়তানের কাছে।

বোসেত তখন আইনের একটা বিষয় আলোচনা করছিল। সে বলল, ঠিক আছে, এখন চুপ করো। আমি এখনো উকিল হয়ে উঠতে পারিনি। তবু আমি জানি, নর্ম্যানদের মধ্যে একটা প্রথা আছে। সেটা হলো এই যে মাইকেলমাসের লর্ডের কাছে বছরে সম্পত্তির অধিকার বা উত্তরাধিকারের জন্য একটা টাকা দিতে হয়।

গ্রান্তেয়ারের কাছে টেবিলে দুটো মদের গ্লাসের মাঝখানে কিছু কাগজ, কালি আর কলম ছিল। দু'জন ঘন হয়ে সেখানে কি আলোচনা করছিল। একজন বলল, প্রথম কতকগুলো নাম যোগাড় করো। নামগুলো ঠিক করলেই জমি পাওয়া যাবে।

অন্যজন বলল, হ্যাঁ ঠিক বলেছ। তুমি বল, আমি লিখে নিচ্ছি।

মঁসিয়ে ডবিমনের নামটা কেমন হয়?

একটা ভাড়াটে?

অবশ্যই। তার সঙ্গে একটা মেয়ে আছে। মেয়েটাব নাম সেলেস্তিনে।

হ্যাঁ সেলেস্তিনে। তারপর?

কর্নেল সেঁতন।

'সেঁতন' নামটা চলবে না। তার থেকে বল ভ্যালসিন।

ও... র আরও দু'জন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। তিরিশ বছরের এক যুবক আঠারো বছরের একটি ছেলেকে এক ডুয়েলের কথা বলছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিষয় বর্ণনা করছিল। সে বলল, ডুয়েলের সময় সব সময় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সে খুব ভাল তরোয়াল চালাতে পারে। তাব কব্জির জোর আছে। সে আবার বাঁ হাতে সব কাজ করে।

গ্রান্তেয়ারের উল্টো দিকে এক কোণে জলি আর বাহোরেল তাদের প্রেমের ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিল।

জলি বলল, তুমি ভাগ্যবান, তোমার প্রেমিকা সব সময় হাসে।

বাহোরেল বলল, এটা তার ভুল। কোনও প্রেমিকার স- সময় হাসা উচিত নয়। হাসি থেকে অবিশ্বস্ততা আসে। অবশ্য সে খুশির মেজাজে থাকতে পারে। সেটা দেখতে ভাল লাগে। বরং বিষণ্ন হয়ে থাকলেই খারাপ দেখায়।

মেয়েরা আনন্দে থাকলেই তাদের আরও সুন্দর দেখায়। বল তুমি ঝগড়া করবে না।

না, কারণ আমরা দু'জনে একটা সন্ধি করে আমাদের সীমানা ঠিক করে নিয়েছি। কেউ কারো অধিকারের সীমানায় পা দেবে না।

জলি বলল, শান্তি। ভাল হজম থেকে শান্তি আসে।

বাহোরেল বলল, তোমার খবর কি জলি? সেই মেয়েটার সঙ্গে তোমার কেমন ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে? বুঝতে পারছ আমি কার কথা বলছি?

মেয়েটা একটা জেদের সঙ্গে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটা বড় নিষ্ঠুর।

তবু তোমার চেহারাটা বেশ রোগা রোগা আছে। কোনও মেয়ের হৃদয় গলাবার পক্ষে যথেষ্ট।

হায়! আমি যদি তুমি হতাম তাহলে তাকে ঠিক বশীভূত করে ফেলতাম।

কথাটা বলা সহজ।

করাও সহজ। তার নাম মুশিয়েত্তা। তাই নয় কি?

হ্যাঁ বাহোরেল, মেয়েটা সত্যিই বেশ সুন্দরী। ছোট ছোট শিল্পীসুলভ হাত-পা, ভাল সাজপোশাক পরা, ফর্সা রং, মুখে ব্রণ, চোখ দুটো জ্যোতিষীদের মতো তীক্ষ্ণ। আমি তার জন্য পাগল।

তাহলে তাকে তো প্রেম নিবেদন করা তোমার উচিত। বেশ ভাল পোশাক পরে এগিয়ে যাও। তুমি দর্জির কাছে গিয়ে হরিণের চামড়া দিয়ে একটা ভাল পায়জামা তৈরি করাও। ইলিউসন পাই রইনের নায়ক মঁসিয়ে দ্য রুবেমপ্রের মতো। তাতে তোমার কাজ হবে।

গ্রান্তেয়ার বলে উঠল, কিন্তু তার দাম কত জান?

এদিকে ঘরের আর এক কোণে কবিতা আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনা চলছিল পেগান পুরাণ আর খৃস্টীয় পুরাণ নিয়ে। জাঁ প্রুভেযার পেগান পুরাণের পীঠস্থান অলিম্পাসের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। সে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলে তার কথা থামতে চায় না। এক দুর্বার আবেগের স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হাস্যরস আর কাব্যরস মিলেমিশে এক হয়ে যায়। সে বলল, প্রাচীন পৌরাণিক দেবতাদেব অপমান করা উচিত নয়। এই সব দেবতাদের মাহাত্ম্য এখনো চলে যায়নি। জুপিটার নেই একথা আজও আমি ভাবতে পারি না। তোমরা হয়ত বলবে এসব স্বপ্নকথা; কিন্তু স্বপ্ন শেষ হয়ে গেলেও সেই সব পেগান পুরাণের প্রভাব শেষ হযে যায না। ভগলেমেনের মতো পাহাড় আজও এক বিরাট দুর্গের মতো সাইবেলের মুকুটের মতো তাকিয়ে থাকে আমাদের পানে। প্যান যে আজও রাত্রিতে বনের মাঝে এসে উইলো গাছের ফাঁপা গুঁড়ির মধ্যে ঢুকে বাতাসের সঙ্গে গাছগুলোকে নাড়া দেয় না একথা আমি ভাবতেই পারি না।

ঘরের আর এক কোণে রাজনীতির আলোচনা হচ্ছিল। কমবেফারে আর কুরফেরাকের সামনে অষ্টাদশ লুই-এর চার্টারের একটা কপি ছিল। কমবেফারে আর সলজটার সমর্থনে অনেক কথা বলছিল, কিন্তু কুরফেরাক যুক্তি দিয়ে সেটা নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করছিল। সে বলছিল, প্রথমত আমার মতে রাজাদের কোনও প্রয়োজনই নেই। শুধু অর্থনৈতিক কারণেই আমি তাদের উচ্ছেদ চাই। চতুর্দশ লুই-এর পরগাছা, তার কাজের মতো কাজ কিছুই নেই। কিন্তু তার পিছনে খরচ কত জান? চতুর্দশ লুই-এর মৃত্যুর পর আমাদের জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ছ' মিলিয়ার্ড, দু' হাজার মিলিয়ান। প্রথম ফ্রাসোঁফর মৃত্যুতে জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল তিরিশ হাজার লিভার। কমবেফারের মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও বলতে হয়, সনদের মাধ্যমে রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে রূপান্তরের পথটা বিপজ্জনক। সাংবিধানিক জটিলতায় সব নীতি হারিয়ে যায়। রাজারা কখনো জনগণকে কোনও সুযোগ-সুবিধা দেয় না, তাদের সঙ্গে কোনও আপোস করে না। সনদের চৌদ্দ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে প্রজাদের

কিছু সুযোগ-সুবিধা দান করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রে রাজারা এক দিকে দেয় আর অন্য দিকে নেয়। আমি সম্পূর্ণরূপে এই চার্টার বা সনদটাকে প্রত্যাখ্যান করছি। মিথ্যাকে ঢাকার এক ধোঁয়ার আবরণ ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। কোনও জাতি এটা গ্রহণ করলে তাকে সব অধিকার ছাড়তে হবে। অধিকার যদি আংশিক হয়, অধিকার যদি সমগ্র বা সার্বিক না হয় তাহলে তার কোনও অর্থ হয় না।

তখন শীতকাল বলে আগুনে দুটো কাঠ পুড়ছিল। সে লোভ সামলাতে না পেরে চার্টারের দলিলটা মুচড়ে আগুনের উপর ফেলে দিল। বলল, অষ্টাদশ লুই-এর মহান সনদটাকে আগুনে গ্রাস করে ফেলল।

এই হলো যুবকদের সভা। আর তার মানেই যত সব বক্রোক্তি, বিদ্রূপ আর ভাঁড়ামি। একেই ফরাসীরা বলে শ্লেষাত্মক বিদ্রূপ, আর ইংরেজরা বলে হাস্যরস। এর মধ্যে সুরুচি, কুরুচি, ভাল যুক্তি, মন্দ যুক্তি সব আছে। ঘরের এক কোণ থেকে সোচ্চার আলোচনার একটি ধ্বনি অন্য কোণে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে।

৫

যুবকদের মনের বিশেযত্ব এই যে তারা কোনও বিস্ফোরণের সঙ্গে যে সব স্ফুলিঙ্গ থাকে সেগুলো আগে হতে দেখতে পায় না বা তার কথা ভাবে না। বিস্ফোরণ কি ধরনের হবে তাও বুঝতে পারে না আগে থেকে। তাদের অন্তরের হালকা ভাবটা কিছুক্ষণের মধ্যেই এক প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ে, তারপর চরম আনন্দের উত্তেজনার মাঝে হঠাৎ তাদের ভাবটা গুরুগম্ভীর হযে ওঠে। এই সময় হঠাৎ বলা একটা কথা বা কোনও অলস দাযিত্বহীন উক্তি আলোচনার মোড়টা সম্পূর্ণ নতুন পথে ঘুরিয়ে দিতে পারে। অনেক অজানা বিযয এসে পড়ে কথায় কথায়।

সহসা কার একটা কথা ঘরের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল :াস্তেয়ার, বাহারোল, প্রুভেয়ার, বোসেত, কমবেফারে আর কুরফেরাক একযোগে কথাটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

কথাটা কে তুলেছে তা কেউ জানে না। গোলমালের ভিতর বোসেত কমবেফারেকে একটা তারিখের কথা বলল। বলল, ১৮১৫ সালের ১৮ই জুন—ওয়াটারলু।

মেরিয়াস এতক্ষণ টেবিলে কনুই-এর উপর মাথা রেখে বসেছিল। ওয়াটারলুর নাম শুনে সে তাদের মুখপানে তাকাল হঠাৎ।

কুরফেরাক বলল, আশ্চর্য! আমি দেখেছি ১৮ সংখ্যাটা বোনাপার্টের পক্ষে সব সময় মারাত্মক হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ লুই অ ˆ ১৮ ব্রুমেয়ার—এর দ্বারা বোনাপার্টের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে।

এঁজোলরাস এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে বলল, তোমাদের বলা উচিত যে অপরাধ তিনি করেছিলেন তার উপযুক্ত শাস্তি তিনি পেয়েছেন।

ওয়াটারলুর নাম শুনে মেরিয়াস আগেই উত্তেজিত হয়ে পডেছিল। তার উপর

অপরাধ কথাটা সহ্য করতে পারল না সে। সে উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে টাঙানো ফ্রান্সের মানচিত্রটার দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। আর একটা দিকে কর্সিকার একটা মানচিত্র ছিল। কর্সিকার মানচিত্রটার দিকে সে হাত বাড়িয়ে বলল, একটা ছোট দ্বীপ কর্সিকা ফ্রান্সকে বড় করেছে।

একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস যেন বয়ে গেল ঘরখানার মধ্যে। এঁজোলরাস তার নীল চোখের দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত করে—মেরিয়াসের দিকে না তাকিয়েই বলল, ফ্রান্সের বড় হওয়ার জন্য কর্সিকার দরকার ছিল না। ফ্রান্স বলেই সে বড়।

কিন্তু মেরিয়াস এ কথা অত সহজে মেনে নিতে পারল না। সে এঁজোলরাসের মুখোমুখি হয়ে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগল, ঈশ্বর করুন আমি ফ্রান্সকে যেন ছোট না করি। কিন্তু ফ্রান্সকে নেপোলিয়নের সঙ্গে জড়িয়ে দেখাটা তাকে ছোট করা নয়, তার গৌরবকে খর্ব করা নয়। বিষয়টা স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে তোলা ভাল। আমি তোমাদের কাছে নবাগত। তোমাদের কথাবার্তায় আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আমি। কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি? তোমরা কে এবং আমিই বা কে? সম্রাটের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই বা কি? আমি শুনেছি বোনাপার্টের বদলে তোমরা বুনাপার্ট উচ্চারণ করেছ। আমার মাতামহ আবার বোনাপার্তে উচ্চারণ করতেন। তোমরা বয়সে যুবক। কিন্তু কি চাও তোমরা? তোমরা যদি সম্রাটকে শ্রদ্ধা করতে না পার তাহলে কাকে শ্রদ্ধা করবে তার বদলে? তিনি যদি মহান না হন তাহলে কোন ব্যক্তিকে তোমরা মহান মনে কর তা বল। তাঁর সব কিছু গুণই ছিল। তিনি ছিলেন সমগ্র। মানুষের সব গুণ, সব বুদ্ধিবৃত্তিই তাঁর মস্তিষ্কে ছিল। তিনি জাস্টিনিয়ানের মতো আইন প্রণয়ন করতেন, তিনি ছিলেন সীজারের মতোই স্বৈরতন্ত্রী, তাঁর কথার মধ্যে ছিল পাসকেলের বিদ্যুৎ আর ট্যাসিফাসের বজ্র। তিনি এক নতুন ইতিহাস রচনা করেন, তাঁর প্রচারিত ইস্তাহার এক একটি মহাকাব্য। তিনি নিউটনের গণিতের সঙ্গে মহম্মদের উপমা অলঙ্কারের মিশ্রণ ঘটান। তিনি যে সব কথা বলে গেছেন সে সব কথার স্তূপ পিরামিডের মতোই উঁচু হবে। তিলসিতে তিনি সম্রাটদের দয়া কাকে বলে তা শেখান, অ্যাকাদেমি দে সায়েন্সে তিনি ল্যাপলেসের প্রশ্নের উত্তর দেন, স্টেট কাউন্সিলে তিনি মার্লিনের সমান মর্যাদা লাভ করেন। তিনি সব কিছুই দেখতেন এবং সব কিছুই জানতেন। তিনি তাঁর নবজাত পুত্রের দোলনার উপর একজন সরল সাধারণ লোকের মতো আনন্দ করতেন। সহসা সমগ্র ইউরোপ সন্ত্রস্ত হয়ে শুনেছে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের ধ্বনি, অস্ত্রবাহিনীর বজ্রগর্জন, অশ্বারোহী বাহিনীর দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ধূলির ঝড়ের শব্দ, আর যুদ্ধের তূর্যনিনাদ। আর তাতে বিভিন্ন দেশের সিংহাসনগুলো কেঁপে উঠেছে, বিভিন্ন দেশের সীমারেখাগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারা এক অতিমানবিক আশ্চর্য তরবারির খাপ থেকে বার করার শব্দ শুনেছে, তারা দেখেছে এক অতিমানব দিগন্তে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখে চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের আলো, তিনি গ্রাঁদ আর্মি আর ভিলে গার্দে নামে দুটো বিরাট ডানা মেলে বজ্র ও বিদ্যুতের মাঝে উড়ে যাচ্ছেন। সকলে জানত তিনি হচ্ছেন যুদ্ধের ঊর্ধ্বতন দেবদূত।

ঘরের উপস্থিত সকলে চুপ করে শুনতে লাগল। এঁজোলরাস মাথা নত করল। সব নীরবতার মধ্যেই সমর্থনের এক অনুচ্চারিত সুর থাকে। মেরিয়াস হাঁপ না ছেড়ে প্রবলতর আবেগের সঙ্গে আবার বলে যেতে লাগল, বন্ধুগণ, আমাদের সৌজন্যমূলক আচরণ করা উচিত। এই ধরনের এক সম্রাটের সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়ার থেকে কোনও জাতির পক্ষে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? সে জাতি হলো ফ্রান্স এবং তার প্রতিভা এক বিরাট পুরুষের প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হবে। এক রাজধানী থেকে অন্য রাজধানীতে বিজয়গর্বে এগিয়ে যাওয়া, কত রাজবংশের পতন ঘটানো, ইউরোপের মুখটাকে বদলে দেওয়া, তোমাদের হাতের তরবারিগুলোকে ঈশ্বরের তরবারির মতো করে তোল। একটি লোকের মধ্যে হ্যানিবল, সীজার এবং শার্লেমেনকে পাওয়া যায়। যে জাতির জীবনে প্রতিটি প্রভাত নব নব জয়ের সংবাদ এনে দেয় সে জাতির পক্ষে সেটা কি এক বিরল সৌভাগ্যের কথা নয়? ম্যারেঙ্গো, আর্কোল, অস্টারলিৎস, আয়েনা, ওয়াগরাম প্রভৃতি নামগুলো চির উজ্জ্বল হয়ে আছে ইতিহাসে। ফরাসী সাম্রাজ্যকে রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তোলা, পাহাড় থেকে যেমন ঈগলরা বিভিন্ন দিকে উড়ে যায় তেমনি গ্রাঁদ আর্মি গঠন করে পৃথিবীর চার প্রান্তে এক এক টি বিরাট সেনাদল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া; অস্ত্রশস্ত্র ও বুদ্ধির দ্বারা দু' দু'বার পৃথিবী জয় করার মতো এক উজ্জ্বলতম জাতীয় গৌরব অর্জন করা, যে কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়—এগুলো কি মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়? এর থেকে মহত্তর আর কি হতে পারে?

কমবেফারে বলল, স্বাধীন হতে পারা।

এবার মেরিয়াস মাথা নত করল। শান্তভাবে বলা শীতল কথাটা তার বাগ্মিতাতপ্ত বুকটাকে তরবারির মতো বিদ্ধ করল। তার মনে হলো সহসা সব উদ্যম উবে গেছে তার। মেরিয়াস মুখ তুলে দেখল কমবেফারে আর সেখানে নেই। কথাটা বলে ফল হয়েছে দেখে তৃপ্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কমবেফারে আর তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব বন্ধুরাও তার সঙ্গে চলে যায়। শুধু এঁজোলরাস আর মেরিয়াস ঘরের মধ্যে রয়ে যায়। মেরিয়াসকে গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখছিল এঁজোলরাস। এদিকে মেরিয়াসও ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। মনে মনে সে পরাজয় স্বীকার করল না কিছুমাত্র। আবেগের উত্তাপের তখনো বেশ কিছু অবশিষ্ট ছিল তার মধ্যে। সেই আবেগের সঙ্গে আরও অনেক কিছু সে শোনাত এঁজোলরাসকে। কিন্তু হঠাৎ একটা গান শুনে দমে গেল সে। সে শুনতে পেল কমবেফারে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পথটার উপর দাঁড়িয়ে একটা গান গাইছে। গানটার বাণীগুলো এই: সীজার যদি আমায় অনেক যুদ্ধজয়ের গৌরব আমার হাতে তুলে দিয়ে বলতেন, মার ভালবাসা ত্যাগ করো, তাহলে আমি তাঁকে বলতাম, তোমার রথ আ. রাজদণ্ড ফিরিয়ে নাও সীজার, সবকিছুর থেকে আমি আমার মাকে ভালবাসি। সবকিছুর থেকে ভালবাসি আমি আমার মাকে।

মিষ্টি করুণ সুরে গানটা এমনভাবে গাইছিল কমবেফারে যে গানটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। গানটা শুনতে শুনতে ঘরের ছাদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মেরিয়াস। আপন মনে অনুচ্চস্বরে অর্ধচেতনভাবে বলে উঠল, আমার মা?

এঁজোলরাস তখন তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, হে নাগরিক, দেশের প্রজাতন্ত্রই হচ্ছে আমার মা।

৬

সেদিনের সন্ধ্যাটা গভীরভাবে কাঁপিয়ে দেয় মেরিয়াসের মনটাকে। এক অব্যক্ত বিষাদের ভারে ভারী হয়ে ওঠে মনটা। মাঠে মাঠে যখন জমি কর্ষণ করে বীজ বপন করা হয় তখন ধরিত্রীর বুকেও এমনি একটা ব্যথা বাজে। বীজের অঙ্কুরোদগম, প্রাণচঞ্চলতা ও ফসলের আনন্দ অনেক পরে আসে।

বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে লাগল মেরিয়াস। সম্প্রতি যে বিশ্বাসের সম্পদ সে খুঁজে পেয়েছে সে সম্পদ কি ত্যাগ করবে সে? সে নিজেকে এই বলে বোঝাল যে তার সংশয়ের কোনও প্রয়োজন নেই। দুটি বিশ্বাসের ঘাত-প্রতিঘাতে এই ভাবে দুলতে থাকাটা সত্যিই অস্বস্তিকর। একটি বিশ্বাস বা মতবাদ যখন তাকে বর্জন করে যায়নি, আবার আর একটি বিশ্বাস যখন তাকে এখনো আলিঙ্গন করে বরণ করে নেয়নি, তখন আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মতো এক দুঃসহ অবস্থা হয় তার মনের মধ্যে। স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন মেরিয়াস চাইছিল সত্যিকারের এক আলো। অথচ এক সংশয়ের গোধূলির দ্বারা পীড়িত হচ্ছিল তার মনটা। তার পুরনো বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিটাতে দাঁড়িয়ে থাকার যতই ইচ্ছা হোক না কেন, অগ্রগতির পথে কে যেন নির্মমভাবে টানছিল তাকে। এগিয়ে যেতে সে বাধ্য। তাকে ভাবতে হবে এ নিয়ে, চিন্তা করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু এ চিন্তা কোথায় নিয়ে যাবে তাকে? তার একমাত্র ভয়, তার বাবার অনেক কাছে এসে পড়েও আবার সে দূরে সরে যেতে বাধ্য হবে। কারা তাকে যেন জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার বাবার কাছ থেকে। যতই ভাবতে লাগল সে এ বিষয়ে ততই আরও বেশি বিচলিত হয়ে পড়ল। একটা বিরাট বাধা ঘিরে ধরল তাকে। সে তার মাতামহের ও তার বন্ধুদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ল। দু'দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সে। প্রাচীন ও নবীন—কোনও দলেই যোগ দিতে পারল না সে। সে কাফে মুঁসেতে যাওয়া ছেড়ে দিল।

অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মনের অবস্থা খুব খারাপ থাকায় টাকা-পয়সার কথাটা ভেবে দেখেনি মেরিয়াস। হোটেল মালিক হোটেলের বিলটা তার কাছে এনে দিল। বলল, মঁসিয়ে কুরফেরাক আপনাকে নিয়ে এসেছে এখানে। তা-ই নয় কি?

হ্যাঁ।

কিন্তু বিলের টাকা চাই আমার।

দয়া করে কুরফেরাককে আমার কাছে কিছুক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দেবেন?

কুরফেরাক এসে দেখা করল তার সঙ্গে। মেরিয়াস তাকে এতদিন যে কথা বলেনি সেকথা বলল। বলল, সে এখন জগতে সম্পূর্ণ একা। তার বাবা-মা কেউ নেই।

কুরফেরাক বলল, তাহলে তোমার কি হবে?

মেরিয়াস বলল, জানি না।

তোমার কাছে কত টাকা আছে?

পনের ফ্রাঁ।

তুমি কি আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার চাও?

না, কখনই না।

তোমার কিছু পোশাক আছে?

যা আছে তা এই।

কিছু সোনারুপো আছে কাছে?

কেবল একটা হাতঘড়ি।

রুপোর?

সোনার, এই তো।

আমি একটা দোকানদারকে জানি যে তোমার পুরনো টেলকোট আর বাড়তি একজোড়া পায়জামা নেবে।

ভাল।

তাহলে তোমার পোশাকের মধ্যে শুধু থাকবে একজোড়া পায়জামা, একটা ওয়েস্ট কোট, টুপি আর জুতো।

এই সবই যথেষ্ট।

আমি ঘড়ি প্রস্তুতকারককে চিনি যে তোমার হাতঘড়িটা কিনে নেবে।

ভাল।

না, ভাল নয়। সব টাকা ফুরিয়ে গেলে কি করে চলবে তোমার?

যাই হোক, সৎভাবে চলতে হবে।

তুমি ইংরিজি জান?

না।

জার্মান?

না।

দুঃখের বিষয়।

কেন?

আমার এক পুস্তক বিক্রেতা বন্ধু একটা বিশ্বকোষ প্রকাশ করছে। ইংরিজি ও জার্মান ভাষা থেকে কিছু লেখা তুমি অনুবাদ করতে পারতে। পারিশ্রমিক খুবই কম, তবে কোনওরকমে চলে যেত।

তাহলে আমি ইংরিজি আর জার্মান ভাষা শিখে নেব।

ইতিমধ্যে চলবে কি করে?

পোশাক আর ঘড়ি বিক্রির টাকায় চলবে।

পোশাক বিক্রি করে কুড়ি ফ্রাঁ আর হাতঘড়ি বিক্রি করে পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঁ পাওয়া গেল।

হোটেলে ফিরে এসে মেরিয়াস বলল, আমার কাছে পনের ফ্রাঁ আগে হতেই ছিল। এখন সব মিলিয়ে আশি ফ্রাঁ হলো।

কুরফেরাক বলল, কিন্তু হোটেলের বিল ?

হা ভগবান, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

হোটেল বিল দেখা গেল সত্তর ফ্রাঁ হয়েছে।

কুরফেরাক বলল, কি মুস্কিলের কথা! মাত্র দশ ফ্রাঁতে তুমি কি করে ইংরিজি ও জার্মান শিখবে ?

এমন সময় মেরিয়াসের মাসি ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ কোনওরকমে তার ঠিকানা যোগাড় করে একটা চিঠি আর একটা প্যাকেটে করে কিছু টাকা পাঠায়। টাকার পরিমাণ ষাট পিস্তোল যা ভাঙালে দুশো ফ্রাঁ হবে। কিন্তু টাকাটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিল মেরিয়াস। সে একটা চিঠিতে তার মাসিকে জানাল সে তার জীবিকার ব্যবস্থা করেছে। তাতেই তার চলে যাবে। অথচ তার হাতে তখন ছিল মাত্র তিন ফ্রাঁ।

তার মাসি তার এই টাকা প্রত্যাখ্যানের কথা মঁসিয়ে গিলেনর্মাদকে জানাল না। কারণ তাতে তাঁর রাগ আরও বেড়ে যাবে। তাছাড়া তাঁর কাছে মেরিয়াসের নাম উল্লেখ করতেই তিনি নিষেধ করে দিয়েছিলেন তাকে।

মেরিয়াস পোর্তে সেন্ট জ্যাক হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আর ঋণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

এরপর দিন চালানো খুবই কঠিন হয়ে উঠল মেরিয়াসের পক্ষে। পোশাক গেছে, ঘড়ি গেছে। আর কোনও সংস্থান নেই। সারাদিন খাওয়া নেই। রাতে ঘুম নেই, আশ্রয় নেই। অন্ধকারে আলো নেই, ভবিষ্যতের আশা নেই। সে ভাড়া দিতে পারে না বলে আর কোনও ঘরভাড়া পায় না। যে বয়সে মানুষের সবচেয়ে শ্রদ্ধা-ভালবাসার দরকার হয় সেই বয়সে শুধু উপহাস আর বিদ্রূপ পাচ্ছে সবার কাছ থেকে। যুবকদের মন যে বয়সে আত্মবিশ্বাসে ভরে থাকে, তখন সে বয়সে ছেঁড়া জুতো ও ছেঁড়া পোশাক পরে নিঃসীম দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে তাকে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিধান কোথায় নিয়ে চলেছে তা কে জানে। হয়ত সে একটা অপদার্থ হয়ে উঠবে অথবা দেবতার কাছাকাছি চলে যাবে।

মানুষের এই দুরবস্থার মধ্যে ব্যাপক অবজ্ঞা ও অবহেলার মধ্যেও অনেক বড় কাজ হয়। এই সময় মানুষের মধ্যে এমন এক দুর্বার একগুঁয়ে সাহস থাকে যা বাইরের যে কোনও বাধা-বিপত্তি অশুভ প্রভাবের প্রতিরোধ করে। অভাব, দারিদ্র্য আর নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে অনেক সময় অনেক বলিষ্ঠ ও বিরল চরিত্রের মানুষ গড়ে ওঠে।

এই সময় ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড়ের জন্য দিনের বেলায় বেরোত না মেরিয়াস। সন্ধের পর বেরোত। তার মাসি ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ আবার সেই একই পরিমাণ টাকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু এবারও সে ফেরৎ পাঠায় সে টাকা। এবারও চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় তার টাকার প্রয়োজন নেই।

এত কষ্ট করেও সে আইন পড়া ছাড়ল না। সে নিয়মিত কলেজে যেত। কুরফেরাকের ঘরে অনেক আইনের বই ছিল। সেই সব বই সে পড়তে পেত। কুরফেরাকের ঠিকানাতেই তার চিঠিপত্র আসত।

আইন পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মঁসিয়ে গিলেনর্মাদকে একটা চিঠি দিয়ে জানায় মেরিয়াস। কর্তব্যগত শ্রদ্ধার সঙ্গেই লেখে চিঠিটা। মেরিয়াসের এই চিঠি পডতে গিয়ে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের হাত দুটো কাঁপতে থাকে। কিন্তু পড়া হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দেন বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে। চিঠিটার কথা তাঁর মেয়েকে বলেননি কিছু। কিছু না বললেও তিনি যখন নিজের ঘরে বসে আপন মনে বিড় বিড় করে কি বলছিলেন তখন তাঁর মেয়ে ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ শুনতে পায় তাঁর কথা। তিনি বলছিলেন, তুমি যদি একটা অপদার্থ ক্লীব না হতে তা হলে বুঝতে পারতে একই সঙ্গে কেউ কখনো ব্যারন আর অ্যাডভোকেট হতে পারে না।

২

অন্য সব কিছুর মতো দারিদ্র্যও সহনীয় হয়ে ওঠে কালক্রমে। নিদারুণ অভাবের মধ্যে হীনভাবে জীবন যাপন করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল মেরিয়াস।

[illegible] দুঃসময়টা সে পার হয়ে এসেছে। তার সামনে যে পথটা রয়েছে সে পথ অনেক মসৃণ ও মোলায়েম মনে হচ্ছে আগের তুলনায়। সাহস, সংকল্প আর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়সহকারে কাজ করে সে এখন বছরে সাতশো ফ্রাঁ রোজগার করতে পারে। সে এখন ইংরিজি ও জার্মান শিখেছে। কুরফেরাকের দৌলতে বিশ্বকোষের সেই কাজটা পেয়েছে। তাছাড়াও খবরের কাগজের জন্য কিছু লেখা লেখে। আরও কিছু নোটের কাজ ও জীবনীগ্রন্থ লেখার কাজ করে।

গর্বোর সেই ব্যারাক বাড়িটার মধ্যে বছরে তিরিশ ফ্রাঁ দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে সে। রাত্রিতে কুরফেরাকদের সেই হোটেলটায় গিয়ে ষোল স্যু দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে আসে। আসার সময় কাউন্টারে পয়সা দিতে [illegible] মাদাম রুশো একমুখ হেসে তাকে বিদায় দেয়। তার সব খরচ ধরে বছরে ৬৫০ ফ্রাঁর মধ্যেই হয়ে যায়। পঞ্চাশ ফ্রাঁ করে তার জমে। এই জমানো টাকা থেকে সে কুরফেরাককে একবার ষাট ফ্রাঁ ধার দেয়।

কয়েক বছর ধরে সংগ্রামের পর এই স্বচ্ছল অবস্থার মধ্যে আসতে পেরেছে সে। অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে দিন কাটলেও সে কারো কাছ থেকে একটা পয়সা ধার করেনি। তার মতে ধার থেকেই দাসত্বের শুরু। কারো অধীনে কাজ করা ভাল। উত্তমর্ণ বা ঋণদানকারী লোকের থেকে মালিক ভাল। মালিক শুধু শ্রমিকের উপস্থিতি চায়। কিন্তু ঋণদানকারী আমাদের মানসম্মান গ্রাস করতে চায়। সে কতদিন না খেয়ে থেকেছে, তবু কারো কাছে ধার করেনি।

দুঃখের দিনে এক গোপন আত্মশক্তিই তাকে সাহস যুগিয়ে এসেছে। আত্মাই দেহকে অনেক সময় সাহায্য করে এবং তাকে উপরে তোলে। পাখিই একমাত্র খাঁচাকে সহ্য করতে পারে।

তার বাবার সঙ্গে সঙ্গে আরও একজনের নাম মুদ্রিত হয়ে গেল মেরিয়াসের মনে। সে নাম হলো থেনার্দিয়েরের। যে থেনার্দিয়ের তার বাবাকে ওয়াটারলু যুদ্ধে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে তার সম্বন্ধে স্বভাবতই একটা উচ্চ ধারণা গড়ে ওঠে তার মনে। তার মনের মধ্যে দুটো বেদী করে তার বাবা আর থেনার্দিয়েরকে বসিয়ে এক ধর্মীয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে তাদের স্মৃতিকে লালন করতে থাকে। থেনার্দিয়েরকে মঁতফারমেলে না পেয়ে হতাশ হলেও সে তার আবার খোঁজ করতে থাকে। দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে স্থান ত্যাগ করতে সে বাধ্য হয় একথা ভেবে তার প্রতি তার কৌতূহল বেড়ে যায়। তিন বছর ধরে আশপাশের অঞ্চলের অনেক শহর ও গ্রামে খোঁজ করে সে এবং এর জন্য যথাসাধ্য সে অর্থব্যয় করে। সবাই বলছে থেনার্দিয়েররা পাওনাদারদের টাকা মেরে দিয়ে পালিয়ে গেছে। মেরিয়াসের মতো পাওনাদারেরাও খুঁজছে থেনার্দিয়েরকে। এই একটামাত্র ঋণ তার বাবা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে। মেরিয়াস ভাবল, আমার বাবা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়েছিল তখন এই থেনার্দিয়েরই পিঠে করে নিরাপদ স্থানে বয়ে নিয়ে যায়। যে আমার বাবার জন্য এত কিছু করেছে তাকে খুঁজে বার করে তার বিপদে না দেখে কি করে থাকি। তাকে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা আমার একান্ত কর্তব্য। তাকে অবশ্যই খুঁজে বার করতে হবে।

থেনার্দিয়েরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য মেরিয়াস তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিতে পারত, সে তার শেষ রক্তবিন্দু দান করতে পারত। তাকে খুঁজে বার করে তাকে সেবা দান করার জন্য বলতে ইচ্ছা করছিল, তুমি আমাকে চেন না, আমিও তোমাকে চিনি না। তবু আমি এসেছি। তুমি আমার কাছ থেকে কি চাও তা বল।

এইটাই এখন মেরিয়াসের একমাত্র স্বপ্ন।

৩

মেরিয়াসের বয়স এখন কুড়ি। আজ তিন বছর হলো সে তার মাতামহকে ছেড়ে চলে এসেছে। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের কোনও উন্নতি হয়নি।

তাদের মধ্যে আর দেখা হয়নি। তাদের পুনর্মিলনের জন্য কেউ কোনও চেষ্টা করেনি। অবশ্য দেখা হলেও কোনও ফল হত না। তবে ঝগড়াটা নতুন করে জোরালো হয়ে উঠত। কেউ মাথা নত করল না। মেরিয়াস এক দুর্বার চলমান শক্তি, আর বৃদ্ধ গিলেনর্মাদ অটল।

তবে একটা কথা ঠিক যে মেরিয়াস তার মাতামহকে ভুল বোঝে। কারণ তার ধারণা ছিল তার মাতামহ তাকে মোটেই ভালবাসে না, কখনো ভালবাসেনি। শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে আর তিরস্কার করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সে ভুল করেছে। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তাকে ভাল ঠিকই বাসতেন, এ ব্যাপারে তাঁর একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। তাকে যখন-তখন ভর্ৎসনাটা ছিল তাঁর ভালবাসারই এক বিশেষ ভঙ্গিমা। মেরিয়াস বাড়ি থেকে চলে গেলে এক অন্ধকার শূন্যতা আচ্ছন্ন করে ফেলে তাঁর সারা অন্তরটাকে।

তিনিই নিজে হুকুম দিয়েছিলেন, তার নাম যেন কেউ কখনো না করে তাঁর কাছে। কিন্তু তাঁর এ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্যও তিনি খুবই দুঃখিত হন। প্রথম প্রথম তিনি ভেবেছিলেন বোনাপার্টপন্থী জ্যাকোবিন বিদ্রোহী যুবক নিজে থেকেই ফিরে আসবে। কিন্তু সপ্তার পর সপ্তা, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেলেও সে ফিরে এল না দেখে দুঃখ বেড়ে গেল তাঁর। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলেন তিনি, সে ফিরে এসে ওকথা আবার যদি বলে তাহলে আবার কি তাকে তাড়িয়ে দেবেন তিনি? তাঁর অহঙ্কার বলল, হ্যাঁ, তাই কববেন তিনি। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক ভেবে বলল, না। মেরিয়াসের অভাব ক্রমশ বিষণ্ন কবে তুলতে থাকে তাঁকে। বৃদ্ধ বযসে মানুষ তপ্ত সূর্যালোকের মতোই ভালবাসার বস্তু এবং তার তপ্ত সাহচর্য চায়। তাঁর চরিত্রের ধাতুটা শক্ত হলেও মেরিযাসের অনুপস্থিতিতে সে ধাতু অনেকটা পরিবর্তিত হযে যায়। আগের মতো বাইরে হাসিখুশির উচ্ছলতা দেখালেও সে উচ্ছলতার মধ্যে একটা চাপা যন্ত্রণার আবেগ ফুটে উঠত। কোনও কারণে হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লে তারপর অনেকক্ষণ বিষণ্ন হযে থাকতেন। মাঝে মাঝে নিজের মনে বলতেন, ছোকরাটা একবার যদি ফিরে আসে তাহলে আমি তার কান মলে দেব।

তাঁর মেয়ে ম্যাদমযজেল গিলেনর্মাদের অন্তরটা এমনই অগভীর ছিল যে তাতে কোনও গভীর স্নেহ-ভালবাসা স্থান পেত না। মেরিয়াসেব স্মৃতিটা ক্রমশই অস্পষ্ট ও ছাযাচ্ছন্ন হযে উঠল তার মনে। যেন একটা পোষা বিড়াল পালিয়ে গেছে।

বৃদ্ধ মঁসিযে গিলেনর্মাদের দুঃখ আরও বেড়ে যাবার কারণ এই যে তিনি সে দুঃখের কথা বাইরে প্রকাশ করতেন না কারো কাছে। যে চুল্লী থেকে ধোঁয়া বার হয না সেই চুল্লীর মতো সব দুঃখের বাষ্প নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিতে হত তাঁকে। মাঝে মাঝে কখনো তাঁর কোনও পরিচিত ব্যক্তি তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করত, 'তোমার নাতি আজকাল কি করছে?' তখন তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষাদময়তার সঙ্গে উত্তর দিতেন, 'ব্যারন পঁতমার্সি আজকাল নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ে তুলছে।'

এদিকে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বুকটা যখন দুঃখে জ্বলে যাচ্ছিল, মেরিয়াস তখন নিজেকে সব বিপদ থেকে একে একে মুক্ত করে তুলতে পারার জন্য একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে অভিনন্দন জানাচ্ছিল নিজেকে। আজ আর তার মনে কোনও তিক্ততা নেই তার মাতামহের প্রতি। তবে একটা বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছে সে, তার যে মাতামহ তার বাবার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করে, তার কোনও সাহায্য বা দান আর সে নেবে না। বর্তমানে জীবনে সে যত দুঃখ-কষ্ট পায় ততই সে একদিক দিয়ে একটা আত্মতৃপ্তি লাভ করে। তার কেবলি মনে হয় এই শাস্তি এই অভিশাপের যোগ্য সে এবং এর একটা প্রয়োজন ছিল তার। আজ এই শাস্তি ভোগ না করলে তার পরবর্তী জীবনে কখনো না কখনো এই শাস্তি ভোগ করতেই হত। তা নাহলে তার বাবার প্রতি এক নিষ্ঠুর ঔদাসিন্য দেখিয়ে সে যে অপরাধ করেছে সে অপরাধ স্খালন হত না। তার বাবা জীবনে একা যে দুঃখের বোঝা বহন করেছে, তার কিছুটা দুঃখ ভোগ তার করা উচিত। তাছাড়া তার বাবার দুঃখের তুলনায় কতটুকু দুঃখই

বা সে ভোগ করছে। তার বাবা যেমন শত্রুপক্ষের কামান ও গোলাগুলির সামনে সাহসের সঙ্গে বুক পেতে দিয়েছিল তেমনি আজ সে যদি অনুরূপ সাহসের সঙ্গে সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য বুক পেতে সহ্য করতে পারে, একমাত্র তাহলে সে তার বাবার আদর্শের সার্থক উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারবে। তার বাবা তার শেষ চিঠিতে এই জন্যই লিখে গেছে, সে এই উপাধির যোগ্য হয়ে উঠবে। চিঠিখানি নষ্ট হয়ে গেলেও চিঠির এই কথাটা চিরদিন মনে রেখে দেবে সে।

তার মাতামহ যখন তাকে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে তখন বয়সে সে ছিল তরুণ যুবক। এখন সে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য অভিশাপের পরিবর্তে আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে তার জীবনে। যৌবনে দারিদ্র্যকে যদি সংযত রাখা যায় তাহলে সে দারিদ্র্য মানুষের ইচ্ছাশক্তিতে সংগ্রাম আর তার আত্মাকে আশার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে রাখে। বাস্তব জীবনের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করে এই দারিদ্র্য আদর্শ জীবনের প্রতি এক অনির্বচনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগায় মানুষের মধ্যে। ধনী যুবকরা হাতের কাছে ভোগের অনেক উপকরণ পায়—ঘোড়া, শিকার, জুয়া, ভাল খাবার, তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য। এই সব ভোগ উপভোগের ফলে তাদের মনটা নিচের দিকে যায়, উদার মানসিকতা ও সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা তাদের স্বভাবের মধ্যে পাওয়া যাবে না। গরীব যুবকরা বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে, খাওয়া-থাকার জন্য লড়াই করে এবং স্বপ্নই তার একমাত্র সান্ত্বনা। তার আমোদ-প্রমোদের উপকরণ কেবল কোনও কৃত্রিম রঙ্গমঞ্চে থাকে না, তা থাকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে। আকাশ, নক্ষত্র, ফুল, শিশু প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বরপ্রদত্ত আমোদের উপাদান থরে থরে সাজানো থাকে তার জন্য। এমন কি তার জীবনসংগ্রামের মধ্যেও সে আনন্দ পায় এক ধরনের। সে সাধারণ মানুষের এত কাছে থাকে যে মানবতার আত্মাকে সে দেখতে পায়, ঈশ্বরের সৃষ্টির এত কাছে থাকে যে সেই সৃষ্টির মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখে। সে তার আপন মহত্ত্বকে আপনি অনুভব করে। অপরের করুণার উপর তাকে নির্ভর করতে হয় বলে সব রকম আত্মম্ভরিতা হতে মুক্ত হয় সে। ফলে এক নিরহঙ্কার আত্মবিস্মৃতি আর পরদুঃখকাতরতা এই প্রশংসনীয় গুণদুটির জন্ম হয় তার মধ্যে। প্রকৃতির মধ্যে যে সব অজস্র আনন্দের বস্তু ছড়িয়ে আছে, মুক্ত মন নিয়ে সেই বস্তু উপভোগ করে আত্মার দিক থেকে নিজেকে সম্পদশালী মনে করে, এবং অর্থের দিক থেকে যারা সম্পদশালী তাদের জন্য দুঃখবোধ করে। সব ঘৃণা দূরীভূত হয়ে যায় তার মন থেকে। সত্যি সত্যিই কি সে সুখী? একজন বলিষ্ঠ যুবক যে কালো চুল, সাদা ঝকঝকে দাঁত, সজীব উজ্জ্বল গাল আর দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত উত্তপ্ত রক্তস্রোত নিয়ে আনন্দোচ্ছল ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে যায়, সে এক বৃদ্ধ সম্রাটের ঈর্ষার বস্তু। তারপর সে যুবক যখন রোজ সকালে উঠে জীবিকার জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে যায় তখন তার হাত দুটো কাজে ব্যস্ত থাকলেও তার মেরুদণ্ডটা গর্বে খাড়া হয়ে ওঠে এবং তার মনটা এক নতুন ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। সারাদিনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে এসে আনন্দের সঙ্গে চিন্তা করে। দুঃখ-কষ্টে ও হতাশার কাঁটাবন

ও কাদাজলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে পারে, কিন্তু তার মনটা থাকে আকাশের নক্ষত্রের দিকে। তার মন থাকে শান্ত স্থির, সদাসচেতন, অল্পে সন্তুষ্ট, পরোপকারী। সে তাদের এই স্বাধীনতা, এই দানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়।

মেরিয়াস তখন এই পথেই যেতে লাগল। সে এখন চিন্তার দিকে বেশি ঝুঁকল। যখন দেখল তার একটা জীবিকার সংস্থান হয়ে গেছে তখন বুঝল চিন্তায় বেশি সময় সে দিতে পারবে। এক একবার সারাদিন ধরে সে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত। জীবনের সব সমস্যা সে এইভাবে সমাধান করল। পার্থিব বিষয়ে যে কম কাজ করে অপার্থিব বিষয়ে সে বেশি সময় কাটাবেই। তার মানে কয়েক ঘণ্টা বাস্তব কাজকর্ম করে বাকি সময়টা অনন্তের কথা চিন্তা করবে। দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস আয়ত্ত করতে পারায় সে যেন অলস হয়ে পড়ছিল। মেরিয়াসের মতো উদ্যমশীল যুবকদের ক্ষেত্রে এমনিই হয়। কিন্তু জীবনের কোনও অপরিহার্য জটিলতার আঘাতে তাদের সাময়িক অলস কর্মহীন অবস্থাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

তার মাতামহ ভেবেছিল সে উকিল হওয়ার পর কোর্টে ওকালতি করবে। কিন্তু তা সে করল না। দিবাস্বপ্ন ওকালতির প্রতি একটা অনীহা ও বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছিল তার মধ্যে। অ্যাটর্নিদের সঙ্গে মেলামেশা, মামলার পিছনে ছুটে চলা অসম্ভব এবং একটা ঘৃণার ব্যাপার হয়ে উঠল তার কাছে। সে তার বর্তমান জীবনের কাঠামোকে বদলাবার কোনও কারণ খুঁজে পেল না। সে আগের মতোই প্রকাশকদের লেখালেখির কাজ করে যেতে লাগল এবং তাতেই তার খাওয়া-পরার প্রয়োজন মিটে যেতে লাগল।

মঁসিয়ে ম্যাগিমেল নামে এক পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক তাকে একটা স্থায়ী কাজ দিতে রাজী হলো। এই কাজের জন্য সে মেরিযাসকে একটা থাকার জায়গা, আর বছরে পনেরশো ফ্রাঁ মাইনে দিতে চাইল। চাকরিটা আকর্ষণীয় হলেও তাতে তার স্বাধীনতা থাকবে না। সে বেতনভোগী দাসে পরিণত হবে। মেরিয়াস চায় একই সঙ্গে ভাল এবং খারাপ হতে। সে চায় ছোটখাটো কিছু স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম। কিন্তু মান-মর্যাদার দিকে তার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। সে একটা চোখ হারিয়ে মাত্র একটা চোখ নিয়ে থাকতে চাইল। সে নতুন পাওয়া চাকরিটাকে প্রত্যাখ্যান করল।

তার জীবনটা রয়ে গেল নিঃসঙ্গ। সে যেমন কোনও বিষয়ে নিজেকে জড়াতে চাইল না, তেমনি এঁজোলরাসের দলেও যোগদান করতে চাইল না। অবশ্য তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা রয়ে গেল। দরকার পড়লে একে অন্যকে সাহায্য করত, এই পর্যন্ত। মেরিয়াসের মাত্র দু'জন বন্ধু ছিল। একজন যুবক আর একজন বৃদ্ধ। একজন হলো যুবক কুরফেরাক আর একজন হলো মঁসিয়ে মেবুফ, চার্চের কর্মচারী। তবে মঁসিয়ে মেবুফের প্রতি তার আসক্তিই ছিল বেশি। মেবুফের জন্যই তার জীবনে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। মেবুফ তার চোখ খুলে দিয়েছে।

কিন্তু মঁসিয়ে মেবুফ যা কিছু করেছে সচেতনভাবে করেনি। ভাগ্যের বিধানের এক যন্ত্র হিসাবে করেছে। মেরিয়াসের অন্তরের মধ্যে যে আলোড়ন চলছিল, যে রূপান্তর এসেছিল সে বিষয়ে সে কিছুই জানত না। সে এ বিষয়ে কিছুই বুঝত না।

৪

মেবুফ মেরিয়াসকে বলত, সব মানুষেরই একটা করে রাজনৈতিক মতামত থাকে। এটাতে ক্ষতির কিছু নেই। মেবুফের কাছে সব রাজনৈতিক মতামত সমান লাগত। অবসর সময়ে সে গাছপালা আর বই নিয়ে থাকত। তার কোনও রাজনৈতিক মতবাদ ছিল না। সে রাজতন্ত্রী বা বোনাপার্টপন্থী—কোনও পন্থীই ছিল না।

সে বুঝতে পারত না পৃথিবীতে এত ঘাস, শ্যাওলা, কাঁটাগাছ ও গাছপালা থাকতে মানুষ কেন সনদ, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি এত সব নিয়ে মাথা ঘামায়। অবসর সময়ে বইও সংগ্রহ করে বেড়ায়। কর্নেল পঁতমার্সি বাগানে ফুলের চাষ করত বলে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় মেবুফের। সে চার্চে উপাসনাসভায় যোগ দিত তার কর্তব্যের খাতিরে, ভক্তির নিবিড়তার সঙ্গে নয়। চার্চে সমবেত মানুষের মুখগুলো দেখতে ভাল লাগত তার। কিন্তু তাদের গোলমাল ভাল লাগত না। সমাজের মানুষ হিসাবে, দেশের নাগরিক হিসাবে কিছু একটা তাকে করতে হবে এইজন্যই সে চার্চের কাজে যোগদান করে। কোনও নারীর প্রতি কোনও আসক্তি ছিল না তার। তার বয়স ষাট পেরিয়ে গেলে একজন জিজ্ঞাসা করে তাকে, আপনি কি কখনো বিয়ে করেননি?

মেবুফ তাকে উত্তর করে, না, বিয়ে করতে ভুলে গিয়েছি।

তবে কেন সে বিয়ে করেনি, একথা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে সে বলত, 'আমি যদি ধনী হতাম তাহলে হয়ত বিয়ে করার কথাটা ভেবে দেখতাম।' কিন্তু ধনী হবার কথাটা মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের মতো কোনও ধনীকে দেখে অথবা কোনও সুন্দরী মেয়েকে দেখে জাগেনি তার মনে। একথা জেগেছে কোনও আকাঙ্ক্ষিত দামী বই কিনতে না পেরে।

সে এমন একটা বাড়িতে বাস করত যে বাড়িতে লোক বলতে বাড়ি দেখাশোনার জন্য এক বৃদ্ধা ছাড়া আর কেউ থাকত না। সে একটা বই প্রকাশ করেছিল। বইটা সুচিন্তিতভাবে লেখা। সে নিজেই বিক্রি করত। দিনে দু-তিনখানা করে সে বই বিক্রি হত এবং তাতে বছরে দু' হাজার ফ্রাঁ পেত। এটা তার মোট আয়ের বড একটা অংশ ছিল। কয়েক বছরের চেষ্টা আর আত্মনিগ্রহের ফলে বিভিন্ন রকমের বেশ কিছু বই সে সংগ্রহ করেছিল। সে বাড়ি থেকে বড একটা বার হত না। কিন্তু যখনি বার হত একটা বই থাকত তার বগলে। যে বাড়িটাতে সে থাকত তার সংলগ্ন একটা ছোট বাগান ছিল এবং তাতে চারখানা কামরা ছিল। তাতে শুধু বই আর ভাল শিল্পীদের আঁকা কিছু ছবি ছিল। তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শুধু এক ভাই ছিল। সে ছিল একটা ছোট গীর্জার যাজক। মাথায় পাকা চুল, মুখে দাঁত ছিল না। সে খুব শান্ত মেজাজের লোক ছিল। তার মুখে কোনও শক্ত বা তিক্ত কথা উচ্চারিত হত না। তাকে এক বৃদ্ধ ভেড়ার মতো শান্ত দেখাত সব সময়। এ ছাড়া কোনও বন্ধু বা আত্মীয় ছিল না তার। কারো বাড়ি যাবার ছিল না। শুধু পোর্তে সেন্ট জ্যাক অঞ্চলে রয়ল নামে এক পুস্তকবিক্রেতার কাছে মাঝে মাঝে যেত সে। পায়ে তার বাত ছিল। ঘুমোবার সময় কম্বলের তলায় শক্ত হয়ে উঠত পাগুলো। কোনও তরবারি বা বন্দুক দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিম হয়ে উঠত তার গায়ের রক্ত।

মঁসিয়ে মেবুফের বাড়ি দেখাশোনার কাজ করত যে বৃদ্ধা মহিলা সেও খুবই নিরীহ প্রকৃতির ছিল। সে ছিল চিরকুমারী এবং নিষ্ঠা ও শুচিতার সঙ্গে তার কৌমার্যব্রত পালন করে। একটা বিড়াল ছাড়া তার জীবনের সঙ্গী বলতে কেউ ছিল না। বাড়ি থেকে কোথাও যেত না সে। তার একমাত্র শখ ছিল লিনেনের কিছু পোশাক কেনা এবং সন্ধের দিকে একবার করে পোশাকগুলো বাক্স থেকে বার করে বিছানার উপর ছড়িয়ে রাখা। সে পোশাকগুলো সে কখনো ব্যবহার করত না। সেও কিছু পড়াশুনো করত। মঁসিয়ে মেবুফ তাকে ঠাট্টা করে বলত, মেরে প্লুতার্ক।

মেরিযাসের প্রতি একটা আসক্তি গড়ে উঠেছিল মঁসিয়ে মেবুফের, কারণ মেরিয়াস বয়সে যুবক হলেও শান্ত প্রকৃতির ছিল এবং তার সাহচর্যের উত্তাপ তার ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্যানুরাগে'র উপর হস্তক্ষেপ করত না বা আঘাত হানত না কোনওভাবে' কোনও বৃদ্ধের কাছে কোনও শান্ত প্রকৃতির যুবকের সাহচর্য বায়ুতরঙ্গহীন শান্ত অচঞ্চল সূর্যালোকের মতোই উপভোগ্য। মেরিয়াস যখন দেশের সামরিক ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করে যে সব বড় বড় যুদ্ধে তার বাবা অংশ গ্রহণ করেছে এবং আহত হযেছে সেই সব যুদ্ধের কথা পড়ত তখন সে মাঝে মাঝে মঁসিয়ে মেবুফের কাছে যেত। মেবুফ তখন শান্ত কণ্ঠে বড় বড় বীরপুরুষদের কথা এমনভাবে বলত যাতে মনে হত সেই সব বীরেরা যেন একগুচ্ছ ফুল।

কিন্তু ১৮২০ সালে মঁসিয়ে মেবুফের ভাই কুরে হঠাৎ মারা গেলে অন্ধকারে ডুবে গেল মেবুফ। যে অ্যাটর্নীর কাছে তাদের মূলধন ছিল এবং যে মূলধন থেকে তারা দুই ভাইয়ে বছরে দশ হাজার ফ্রাঁ করে পেত সেই অ্যাটর্নী দেউলিয়া হয়ে পড়লে তাদের সে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায় একেবারে। তার উপর জুলাই বিপ্লবের ফলে বই-এর ব্যবসা বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মঁসিয়ে তার যে বই বিক্রি করে বছরে দু' হাজার ফ্রাঁ করে পেত সে বই বিক্রিও বন্ধ হয়ে যায়। দরজায় ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনেই ভয়ে চমকে উঠত মেবুফ। মেরে প্লুতার্ক তখন তাকে বলত, জলবাহক মঁসিয়ে।

খরচ কমাবার জন্য মঁসিয়ে চার-কামরার বাড়িটা ছেড়ে য়ে বুলভার্দ মঁতপার্নেসী অঞ্চলে একটা ছোট বাড়িতে উঠে যায়। কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই সে আবার সে বাড়ি থেকে উঠে যায়। কারণ সে বাড়ির ভাড়া বছরে তিনশো ফ্রাঁ করে। কিন্তু মঁসিয়ে মেবুফের ক্ষমতা ছিল মাত্র দুশো ফ্রাঁ দেবার। তাছাড়া বাড়িটার কাছে বন্দুক শেখার একটা গ্যালারি ছিল যেখান থেকে প্রায়ই বন্দুকের গুলির আওয়াজ আসত।

এরপর অস্টারলিৎস গ্রামে সানপেত্রিয়ের অঞ্চলে একটা ছোট বাড়িতে উঠে গেল। সে বাড়িতেও তিনখানা কামরা ছিল এবং একটা ছোট বাগান ছিল। যেদিন সেই বাড়িতে উঠে যায় মেবুফ সেদিন সে নিজের হাতে তার ঘরে ছবিগুলো টাঙায় এবং বাগানে কাজ করতে থাকে। সে তার বেশির ভাগ আসবাবপত্র বিক্রি করে দেয়।

এই নতুন বাসায় মাত্র দু'জন লোক দেখা করতে আসে তার সঙ্গে। তার মধ্যে একজন হলো সেই সেন্ট জ্যাক অঞ্চলের পুস্তকবিক্রেতা আর একজন হলো মেরিয়াস। মেরিয়াসের নামটার মধ্যে একটা সামরিক গন্ধ থাকায় নামটা মোটেই ভাল লাগত না মেবুফের।

সাধারণত যারা জ্ঞানী অথবা নির্বোধ তারা কেউ দৈনন্দিন জীবনের কোনও ঘাত-প্রতিঘাত কখনও মানে না, ভাগ্যের খেলায় অর্থাৎ সৌভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে বিচলিত হয় না। তারা দেহগত অবক্ষয় বা অসুস্থতার মতোই লাভ-ক্ষতিতে উদাসীন থাকে।

এইভাবে দিনের পর দিন মেবুফের চারদিকে যতই ছায়া ঘনিয়ে উঠতে লাগল ততই সব আশাগুলো বিলীন হয়ে যেতে লাগল একে একে। কিন্তু সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও শিশুসুলভ অথচ এক গভীর ঔদাসিন্য সহকারে প্রশান্ত রয়ে গেল সে। তার আত্মার গতি অব্যাহত রয়ে গেল।

মাঝে মাঝে খুবই সহজ সরল ঘটনা থেকে বিনা খরচে আনন্দ পেত। একদিন মেরে প্লুতার্ক যখন একটা বই পড়ছিল তখন মঁসিয়ে তা শুনছিল। শুনতে শুনতে প্লুতার্ক দুটো শব্দ ভুল বলায় মেবুফ তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলল, শব্দ দুটো হলো বৃদ্ধ আর ড্রাগন।

তারপর সে বলতে লাগল, এই গল্পে এক ড্রাগনের কথা আছে যে ড্রাগন একটা গুহাতে বাস করত। সেই গুহা থেকে সে এমন আগুন ছড়াত যে সেই আগুনের আঁচে আকাশটা পর্যন্ত জ্বলে যায়, কতকগুলো নক্ষত্রও জ্বলে ওঠে। সেই ড্রাগনের আবার বাঘের মতো থাবা ছিল। বৃদ্ধ সাহসের সঙ্গে সেই গুহায় গিয়ে ড্রাগনের স্বভাবটাকে পাল্টে দেয়। তুমি ভাল বই-ই পড়ছ। এর থেকে ভাল রূপকথা আর হতে পারে না।

এক মধুর আত্মচিন্তার মধ্যে ডুবে গেল মঁসিয়ে মেবুফ।

৫

এই সরল প্রকৃতির মানুষটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত মেরিয়াস। সে দেখল এই ভাল লোকটি নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে অবস্থার জটিলতা বেড়ে গেলেও কোনও ভয় নেই মেবুফের। মেরিয়াস শুধু মাঝে মাঝে কুরফেরাক আর মেবুফের কাছে যেত। তবে মাসে দু-তিনবারের বেশি নয়। অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ দিয়ে দীর্ঘক্ষণ একটানা হেঁটে যেতে ভাল লাগত তার।

এমনি করে বড় রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেড়াতেই একদিন গর্বো অঞ্চলের সেই ব্যারাক বাড়িটাকে দেখতে পায় মেরিয়াস। বাড়িটার কম ভাড়া আর নির্জনতা দেখে পছন্দ হয়ে যায় তার। সেই বাড়িটার মধ্যেই একটা ঘর ভাড়া নেয় সে। সেখানকার লোকেরা তাকে মঁসিয়ে মেরিয়াস বলত।

কিছু অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার যারা অতীতে একদিন তার বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তারা তার পরিচয় পেয়ে তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানায় তাকে। তাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেনি মেরিয়াস। কারণ তাদের বাড়িতে গেলে তার বাবার কথা আরও অনেক জানতে পারবে সে। সেসব বাড়িতে নাচগানও হত। এই সব ক্ষেত্রে সে ভাল পোশাক পরে যেত এবং সে যেত রাত্রিকালে। তার পায়ের জুতোজোড়া চকচকে পালিশ করা থাকত।

১৮৩০ সালের বিপ্লবের ফলে মেরিয়াসের রাজনৈতিক মতবাদ এবং উত্তপ্ত আবেগ উদ্যম সব উবে যায়। সে শান্ত হয়ে ওঠে অনেকখানি। সেই একই যুবক, কিন্তু তার মধ্যে আর কোনও উত্তাপ নেই। তার রাজনৈতিক মত একটা আছে, কিন্তু সেটাতে আর সে জোর দেয় না। আসলে সে কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক নয়, শুধু কিছু কিছু সহানুভূতি আছে মাত্র। আসলে সে মানবতাবাদী। আবার সমস্ত মানবজাতির মধ্যে ফরাসী জাতিকে শ্রদ্ধা করে। আবার ফরাসী জাতির মধ্যে জনসাধারণকে সে ভালবাসে বেশি। আর সাধারণ জনগণের মধ্যে নারীদের প্রতি তার মমতা ও সহানুভূতি বেশি। সে ঘটনার থেকে বই পছন্দ করে বেশি এবং বীর যোদ্ধাদের থেকে কবিদের শ্রদ্ধা করে বেশি। এই কারণে ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধজয়ের ঘটনার থেকে 'জন' গ্রন্থখানি সে বেশি ভালবাসে। কোনওদিন চিন্তামগ্ন হযে কাটাবার পর সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে সে যখন গাছের ফাঁক দিয়ে অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে অজানা নক্ষত্রেব আলো আর এক রহস্যময় অন্ধকারের খেলা দেখেছে তখন তার মনে হয়েছে যে সব বস্তুর সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই, সেই সব বস্তুর কোনও গুরুত্ব নেই। তার মনে হত সে মানবজীবন এবং জীবনদর্শনের গভীরে প্রবেশ করেছে, অথচ আকাশ ছাড়া আর কোনও কিছুর দিকে তাকাচ্ছে না।

তবু তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক রকম পরিকল্পনা করত মেরিয়াস। সে কাজের থেকে স্বপ্ন দেখত বেশি। এই সময় কেউ তার অন্তরের দিকে তাকালে তার শুচিতায় মুগ্ধ হয়ে যেত। আমরা যদি কোনও মানুষের অন্তর বিচার করতে চাই তাহলে তার চিন্তা-ভাবনার থেকে তার স্বপ্নকে অবলম্বন করেই সে বিচার করা ভাল। স্বপ্নের মধ্যেই মানুষের স্বরূপটা খুব ভাল করে ধরা পড়ে। সব চিন্তার মধ্যেই ইচ্ছার একটা উপাদান থাকে, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে সে উপাদান থাকে না। স্বপ্নের মধ্যে আমাদের কল্পনা যখন ইচ্ছামতো অবাধে উড়ে চলে তখন আমাদের অচিন্তিত অসংযত উদ্দাম উচ্চাভিলাষগুলি আত্মার গভীর হতে উঠে আসে। নিয়তির সব পরিহাসকে ব্যর্থ করে দিয়ে তারা এক স্বকীয় ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্বপ্নের মধ্যে আমরা আমাদের এক অজানিত অসম্ভব পরিণতির কল্পনা করে থাকি আর এই কল্পনার মধ্যেই আমাদের স্বরূপটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য সাদৃশ্যময়তায়।

১৮৩১ সালের মাঝামাঝি যে বৃদ্ধা মেরিয়াসের ফাইফরমাস খাটত তার বাসায় সে একদিন তাকে বলল তার পাশের ঘরের এক ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

মেরিয়াস বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের কোনও খোঁজখবর রাখত না। সে তবু জিজ্ঞাসা করল, কেন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে?

বৃদ্ধা বলল, কারণ তাদের বাড়িভাড়া অনেক বাকি পড়েছে। দুই কোয়ার্টারের ভাড়া বাকি পড়েছে।

মেরিয়াস বলল, মোট কত টাকা বাকি আছে?

কুড়ি ফ্রাঁ।

একটা ড্রয়ারের মধ্যে মেরিয়াসের তিরিশ ফ্রাঁ জমানো ছিল। সে তার থেকে পঁচিশ

ফ্রাঁ বার করে বৃদ্ধার হাতে দিয়ে বলল, এর থেকে কুড়ি ফ্রাঁ ভাড়া দেবে আর পাঁচ ফ্রাঁ ওদের দেবে। ওরা বড গরীব। কিন্তু আমি টাকাটা দিয়েছি সে কথা বলবে না।

৬

ঘটনাক্রমে থিওদুল যে সেনাবাহিনীতে কাজ করত সে বাহিনী প্যারিসে স্থানান্তরিত হলো। এর ফলে এক নতুন মতলব খেলে গেল ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদের মাথায়। তার প্রথমদিকটা হলো থিওদুলকে দিয়ে সে মেরিয়াসের খোঁজ করাবে। মেরিয়াস এখন কোথায় আছে কি করছে সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়াবে থিওদুলকে দিয়ে। তার দ্বিতীয় মতলব হলো মেরিয়াসের পরিবর্তে থিওদুলকে তাদের বিষয় সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসাবে তাদের বাড়িতে রাখবে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ যদি একজন যুবকের মুখ দেখতে পেলেই ক্ষান্ত হন তাহলে মেরিয়াস আর থিওদুলের মধ্যে তফাৎ কি? তাছাড়া তাঁর ভাইপোর ছেলে মেয়ের ছেলের থেকে রক্তের দিক থেকে নিকটতর সম্পর্ক। এক উকিলের মতোই একজন সামরিক অফিসার গ্রহণীয়।

একদিন সকালবেলায় মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ যখন তাঁর ঘবে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন তখন তাঁর মেয়ে ঘরে ঢুকে নরম সুরে বলল, বাবা, আজ সকালে থিওদুল তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ অন্যমনস্কভাবে বললেন, কে থিওদুল?

তোমার ভাইপোর ছেলে।

আহা!

বৃদ্ধ গিলেনর্মাদ আবার কাগজ পডায় মন দিলেন। কাগজটা রাজতন্ত্রবাদী হলেও তাতে এমন একটা খবর ছিল যেটা পড়ে রাগে জ্বলে যাচ্ছিলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ। সে খবরে প্রকাশ হয় সেদিন বেলা দুটোর সময় প্লেস দ্য প্যান্থিয়নে আইন ও ডাক্তারি ছাত্ররা সমবেত হয়ে প্রকাশ্যে একটা বিষয় আলোচনা করবে। বিষয়টা ছিল এই যে লুভারের মিউজিয়াম প্রাঙ্গণে যে সব কামান ও অস্ত্রশস্ত্র রাখা হয়েছে তার বৈধতা নিয়ে সরকারের যুদ্ধদপ্তর আর অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে যে বিরোধের উদ্ভব হয়েছে সে বিরোধের ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ ভাবলেন, যেহেতু মেরিয়াস একজন আইনের ছাত্র সেও নিশ্চয় এ বিতর্কে যোগদান করবে। তাঁর মতে এই ধরনের ব্যাপার নিয়ে ছাত্রদের আলোচনা ও বিতর্ক করার কোনও অধিকারই নেই।

এমন সময় ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ থিওদুলকে সঙ্গে করে এনে ঘরের দরজার কাছে দিয়ে গেল। তার বাবাকে বলে গেল, থিওদুল এসে গেছে।

যাবার সময় থিওদুলকে চাপা গলায় বলে গেল, উনি যা বলবেন তা যেন সমর্থন করো।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ থিওদুলকে বললেন, তাহলে তুমি এসে গেছ। বস। কথাটা

বলেই তিনি চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে অশান্তভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। আর মাঝে মাঝে ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে হাতঘড়ি বার করে দেখতে লাগলেন। পায়চারি করতে করতে আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, গাল টিপলে নাক টিপলে দুধ বেরোয় এই ধরনের একজন যুবক প্লেস দ্য প্যান্থিয়নে আবার সভা করবে। দেশের অবস্থাটা হলো কি? অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী মানে কি? মানে যতসব আজেবাজে লোকের হাতে বন্দুক দেওয়া হয়েছে। তার মানে আমি জোর গলায় শপথ করে বলতে পারি যত সব জ্যাকোবিনপন্থী আর প্রজাতন্ত্রী—যত সব পলাতক আসামী আর জেল থেকে ছাড়া পাওয়া কয়েদী।

থিওদুল বলল, আপনি ঠিক বলেছেন।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তার দিকে একবার তাকালেন। তারপর আবার বলে যেতে লাগলেন, সেই হতভাগা পাজী ছোকরাটার এতদূর স্পর্ধা যে সে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছে। সে আমার বাড়ি কেন ছেড়ে গেছে? তার কারণ সে প্রজাতন্ত্রী হতে চায়। কিন্তু জনগণ তাদের প্রজাতন্ত্র চায় না। তাদের এটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে রাজা ছিল, রাজতন্ত্র ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে আর জনগণ জনগণই থাকবে; তারা এই সব নির্বোধ যুবকদের প্রজাতন্ত্রকে হেসে উড়িয়ে দেবে। এই যুবকদের মুখে থুতু দেবে আজকের জনসাধারণ। এই উনিশ শতক হচ্ছে বিষাক্ত যুগ। এ যুগের যুবকরা তাদের বাবা মা ছেড়ে বাড়ি থেকে চলে এসে মুখে ছাগলের দাড়ি গজিয়ে ভাবে তারাই দেশের সব। এটা যদি প্রজাতন্ত্র হয় তাহলে এটা রোমান্টিসিজম্। আর রোমান্টিসিজম্ মানেই পাগলামি।

থিওদুল আবার বলল, আপনি ঠিক বলেছেন।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বলতে লাগলেন আবার, মিউজিয়ামের উঠোনে কামানই বা রাখে কেন? তার কারণ কি বলতে পার? তারা কি অ্যাপোলো বা ভেনাসের মূর্তিগুলোকে কামান দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়? আজকের স যুবকরা বেনজামিন কনস্ট্যান্টের মতোই অপদার্থ। তাদের বেশভূষা ও পোশাক-আশাকের মধ্যে কোনও পারিপাট্য নেই। তারা নারীবিমুখ, লাজুক। তারা যেভাবে মেয়েদের কাছ থেকে পালিয়ে যায় তা দেখে মেয়েরা হাসিতে ফেটে পড়ে। তারা ভালবাসাকে ভয় পায়। তারা মূর্খ। তাদের পোশাকের মতোই তাদের কথাগুলোও অমার্জিত। তারা বলে তাদের আবার রাজনৈতিক মতবাদ আছে। তারা আবার নতুন তত্ত্ব ও পদ্ধতি আবিষ্কার করে সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে চায়। রাজতন্ত্র আর আইনের অনুশাসনের উচ্ছেদ চায়। বাইরের সব জিনিসকে ভিতরে আর ভিতরের সব জিনিসকে বাইরে এনে পৃথিবীর সব কিছু ওলটপালট করে দিতে চায়। হায় মেরিয়াস, মেরিয়াস, সেই হতভাগ্য যুবক আবার প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করবে। চরম বিশৃঙ্খলা আজ ছেলেমানুষিতে পরিণত হয়েছে। স্কুলের কতকগুলো ছেলে কিনা জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে। আবার ফ্রান্সেই এই সব যুবকদের জন্ম হয়েছে। ঠিক আছে হে যুবকবৃন্দ, তোমরা তর্ক করে যাও। এই সব খবরের কাগজগুলো যতদিন থাকবে ততদিন এই

সব ব্যাপার চলতে থাকবে। এর দাম মাত্র এক স্যু, কিন্তু এই কাগজ মানুষদের সব বুদ্ধি লোপ পাইয়ে দেয়। বাঃ, বেশ ছোকরা, মাতামহকে হতাশায় ডুবিয়ে দিয়ে বেশ গর্ব অনুভব করছ।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ একটু চুপ করতেই থিওদুল বলে উঠল, একমাত্র মন্ত্রিউল ছাড়া সব খবরের কাগজ নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। সৈন্যদের তালিকাগ্রন্থ ছাড়া সব বই নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ আবার বলে যেতে লাগলেন, যে সায়েস তার বাচ্চাকে হত্যা করে সে আবার পরে সিনেটার হয়। ওদের নীতিই হলো এই। ওরা প্রথমে সবাইকে নাগরিক বলে, পরে বলে মঁসিয়ে। একদিন যারা খুনী ছিল তারা আজ পেটমোটা কাউন্ট হয়েছে। সায়েস আবার দার্শনিক। আমি এই সব দার্শনিকদের ভাঁড়ের মতো জ্ঞান করি। আমি কয়েকজন সিনেটারকে দেখেছি। তাদের দেখে আমার মনে হয়েছে বাঘের চামড়াপরা বাঁদর। তারা কোয়ে মালাকোয়ের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। নীল মখমলের পোশাক পরা সেই সব সিনেটার! সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। হে নাগরিকবৃন্দ, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, তোমরা যাকে প্রগতি বলছ তা হলো উন্মত্ততা, তোমাদের মানবতা হচ্ছে স্বপ্ন, তোমাদের বিপ্লব হচ্ছে অপরাধ, তোমাদের প্রজাতন্ত্র হলো একটা রাক্ষস, তোমাদের যুবতী কুমারী ফ্রান্স এক বেশ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসেছে। তোমরা জননেতা, অর্থনীতিবিদ, আইনপ্রণেতা, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার উদ্‌গাতা, যাই হও না কেন, গিলোটিনের ক্ষুর ছাড়া আর কিছুই নও। এই হলো আমার বক্তব্য।

লেফটন্যান্ট থিওদুল বলল, চমৎকার! আপনার প্রতিটি কথাই সত্যি।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ ঘুরে দাঁড়িয়ে থিওদুলের মুখপানে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি একটা আস্ত বোকা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

ইতিমধ্যে এক সুদর্শন যুবকে পরিণত হয়েছে মেরিয়াস। তার মাথায় ঘন কালো চুল, উঁচু চওড়া কপাল, তার মুখের ভাব দেখে বোঝা যায় সে বুদ্ধিমান, উচ্চমনা এবং কুশলী। তাকে দেখলেই মনে হয় সে জাতিতে ফরাসী, কিন্তু তার শান্ত স্বভাবটা জার্মানদের মতো। সে তখন তার যৌবনজীবনের এমন একটা স্তবে এসে পড়েছিল যখন যুবকদের চিন্তার জগৎটা গভীরতা আর নির্দোষিতা এই দুই-এর মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকে। কোনও সংকটজনক অবস্থায় পড়লে অনেক সময় সে বোকার মতো আচরণ করত ঠিক, কিন্তু কোনও জরুরি অবস্থায় পড়লে সে যথেষ্ট মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে পারত। তার আচরণ ছিল শান্তশীতল, সৌজন্যমূলক, ধীর স্থির এবং সব রকমের হঠকারিতা থেকে মুক্ত। কিন্তু তার মুখখানা সুন্দর এবং ঠোঁট দুটো লাল আর দাঁতগুলো ঝকঝকে হওয়ার জন্য সে যখন হাসত তখন তার অন্তরের শুচিতা আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক তপ্ত আবেগের একটা বৈপরীত্য প্রকট হয়ে উঠত।

তার চরম দারিদ্র্যের সময়ে তার পাশ দিয়ে কোনও মেয়েকে যেতে দেখলে সে তাকে এড়িয়ে যেত, তার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। তার মনে হত মেয়েটা তার দীনহীন পোশাক দেখে তাকে উপহাস করছে। কিন্তু আসল কথা হলো মেয়েটি তার সুন্দর মুখ দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তার এই ভুল ধারণা তাকে আরও লাজুক করে তুলত। সে মেয়েদের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যেত বলে কোনও মেয়ের সঙ্গে কোনওদিন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি সে। ফলে সে একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করত।

কুরফেরাক তাকে প্রায়ই বলত, আমার একটা কথা শোন ছোকরা। শুধু বই-এর মধ্যে মুখ ডুবিয়ে থেকো না। মেয়েদের একটা সুযোগ দাও। তাতে তোমার অনেক উপকার হবে। তুমি যেভাবে লজ্জায় লাল হয়ে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাও তাতে তুমি ভবিষ্যতে একজন যাজক হয়ে উঠবে।

কুরফেরাক তাকে ঠাট্টা করে তাই 'মঁসিয়ে আবে' বলে ডাকত।

কুরফেরাকের কাছ থেকে এ কথা শোনার পর আগের থেকে আরও বেশি করে সব মেয়েদের এড়িয়ে চলত, এমন কি সে কুরফেরাককেও এড়িয়ে চলত।

মেয়েদের মধ্যে মাত্র দু'জনকে এড়িয়ে যেত না মেরিয়াস। তারা হলো একজন বৃদ্ধা যে তার ঘর পরিষ্কার করত, যাকে মেয়ে বলে ভাবতেই পারত না। আর একটি হলো এক বালিকা যাকে সে প্রায়ই দেখত, কিন্তু ভাল করে তাকে কখনো দেখত না।

গত এক বছর হতে মেরিয়াস লুক্সেমবুর্গ বাগানের একধারে একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে একটি বালিকাকে প্রায়ই দেখত। তারা বাগানের নির্জন দিকটায় পাশাপাশি বসে থাকত। মেরিয়াস তখন ভাবতে ভাবতে প্রায়ই চলে যেত সেদিকটায়। সেদিকে গিয়ে পড়লেই সে তাদের দেখতে পেত। লোকটার বয়স ষাট বছর হলেও তার চেহারাটা বলিষ্ঠ, মুখখানা গম্ভীর। তাকে দেখে মনে হত সে একদিন সৈনিক ছিল। সে সব সময় একটা নীল পায়জামা আর নীল টেলকোট আর একটা চওড়া টুপি পরত। তার মাথার চুলগুলো ছিল একেবারে সাদা।

একটা বেঞ্চের উপর সেই লোকটির পাশে তের-চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে বসে থাকত। মেয়েটির চোখ দুটো সুন্দর হলেও তার দেহটা ছিল রোগা এবং চর্মসার। তার পোশাকটা ছিল কনভেন্টের মেয়েদের মতো। তাদের দেখে মনে হত তারা হলো বাপ আব মেয়ে। মেরিয়াস তাদের দেখত। বাপ খুব বেশি বৃদ্ধ হয়নি আর মেয়েটি তখনো যুবতী হয়ে ওঠেনি। তাই সে মেয়েটিকে এড়িয়ে চলার কোনও কারণ দেখতে পেত না। তারাও মেরিয়াসকে ভাল করে লক্ষ্য করত না। তারা দু'জনে শান্তভাবে বসে থাকত। মেয়েটি আনন্দের সঙ্গে উচ্ছলভাবে কথা বলত আর তার বাবা পিতৃসুলভ স্নেহের সঙ্গে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে অল্প কথায় তার উত্তর দিত।

মেরিয়াস তাদের সামনে দিয়ে পায়চারি করতে করতে যাওয়া-আসা করত। কিন্তু কোনওদিন কোনও কথা বলেনি তাদের সঙ্গে। সেদিকে ছাত্ররাও মাঝে মাঝে গিয়ে

পড়ত। কুরফেরাকও তাদের দেখেছিল। কিন্তু মেয়েটির মধ্যে কোনও সৌন্দর্য না দেখে আকৃষ্ট হয়নি তার প্রতি। কুরফেরাক তাদের একটা করে নাম বার করেছিল। সে মেয়েটিকে বলত ম্যাদময়জেল লানয়ের আর লোকটিকে বলত মঁসিয়ে লেবলাঁ। এই নাম দুটোই ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে যায়।

মেরিয়াস রোজই একটা নির্দিষ্ট সময়ে সেই জায়গায় দেখত তাদের। লোকটির চোখের দৃষ্টিটা তার ভাল লাগত। কিন্তু মেয়েটির প্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না তার।

২

এক বছর এইভাবে কেটে যাবার পর দ্বিতীয় বছরে মেরিয়াস সেদিকে যাওয়া বন্ধ করেছিল। সে প্রায় ছ' মাস আর বাগানের সেদিকে যায়নি। তারপর গ্রীষ্মের কোনও এক আলোকোজ্জ্বল সকালে বাগানের সেদিকটায় হঠাৎ গিয়ে পড়ল। তখন পাখি ডাকছিল বাগানে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নীল উজ্জ্বল আকাশটাকে দেখা যাচ্ছিল।

বাগানের সেদিকটায় গিয়েই সে দেখতে পেল সেই বেঞ্চের উপর তারা বসে রয়েছে। দেখল বাপের চেহারাটা তেমনিই আছে। কিন্তু মেয়ের চেহারাটা একেবারে বদলে গেছে। মেয়েটি লম্বা এবং এক সুন্দরী যুবতীতে পরিণত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার মধ্যে সেই শিশুসুলভ সরলতাটা তখনো রযে গেছে। তার মাথায বাদামী চুলের গুচ্ছ সোনার মতো চকচক করছিল, কপালটা মর্মর প্রস্তরের মতো মসৃণ, গালদুটো গোলাপের পাপড়ির মতো সুন্দর, মোলায়েম গাযের ত্বক, তার সুন্দর মুখের হাসিটা সূর্যালোকের মতো ছিল উজ্জ্বল। তার মাথাটা রাফায়েলের নির্মিত ভার্জিনের মূর্তির উপর স্থাপন করতে পারতেন এবং গুঁজ তাঁর ভেনাসের মূর্তির উপর স্থাপন করতে পারতেন। তার খাড়া নাকটা খুব একটা সুন্দর না হলেও সেটা ছিল সূক্ষ্ম এবং সংবেদনশীল। তাতে চিত্রকরেরা কোনও শিল্পের উপাদান খুঁজে না পেলেও কবিদের কাছে সেটা ছিল আনন্দের বস্তু। মেয়েটির বয়স তখন পনের।

তার চোখের দিকে কখনো তাকায়নি মেরিয়াস। তার মনে হত চোখের ঘন পাতাগুলো দিয়ে তার চোখের তারাগুলো ঢাকা আছে। তার চোখের তারা না দেখলেও তার হাসিটা ছিল বড় সুন্দর। তার বাবার কথা শুনে সে যখন হাসত তখন তার সে হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত মেরিয়াস।

মেরিয়াসের প্রথমে মনে হয়েছিল এ মেয়ে আগের দেখা সেই মেয়েটি নয়, হয়ত তার বোন। এত তাড়াতাড়ি অর্থাৎ মাত্র ছ' মাসের মধ্যে এতখানি বেড়ে উঠবে তা সে ভাবতেই পারেনি। কিন্তু পরে খুঁটিয়ে দেখল, না, এ হলো সেই মেয়েটি। সে শুধু মাথায় বেড়ে ওঠেনি, তার চেহারাটা একেবারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যেন কোনও কুঁড়ি রাতারাতি পূর্ণ বিকশিত ফুলে পরিণত হয়েছে, যেন গতকালকার একটি বালিকা আজ হঠাৎ পূর্ণ যুবতীতে পরিণত হয়ে আমাদের মন ভুলিয়ে দিচ্ছে। এমনিই হয়। বসন্তের সামান্য দু-তিনটি দিন পাতাঝরা একটা শুকনো গাছকে কচি

কিশলয়ে ভরে দিতে পারে, কেবলমাত্র দুটি মাসের ব্যবধান মেয়েটির গোটা গাটাকে ভরে দিয়েছে নবোদ্ভিন্ন যৌবনের সুষমায়। মেয়েটির যৌবন এসে গেছে।

তার পোশাক দেখে মেরিয়াস বুঝল সে এখন আর স্কুলে পড়ে না। তবে তার হাতের দস্তানা আর পায়ের চটি দেখে বোঝা যায় তার হাত আর পাগুলো ছোট ছোট। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হয় নবযৌবনসমৃদ্ধ দেহ থেকে একটা সুগন্ধ বার হচ্ছে।

লোকটির অবশ্য কোনও পরিবর্তন হয়নি।

মেরিয়াস যখন সেদিন পর পর দু'বার তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল তখন চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। মেরিয়াস এতক্ষণে দেখল তার চোখ দুটো যেমন নীল তেমনি তার দৃষ্টি ছিল গভীর। কিন্তু মেয়েটি এমন উদ্দাম দৃষ্টিতে তাকাল যাতে মনে হলো সে একটা গাছের তলায় খেলতে থাকা এক শিশুকে দেখছে। মেরিয়াসও চিন্তান্বিতভাবে তাদের সামনে দিয়ে কয়েকবার যাওয়া-আসা করল। কিন্তু মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকাল না একবারও।

এরপর মেরিয়াস লুক্সেমবুর্গের সেই বাগানটায় যথারীতি যেত এবং সেই পিতা ও কন্যা... বেঞ্চের উপর আগের মতোই বসে থাকতে দেখত। কিন্তু তাদের প্রতি কোনও মনোযোগ দিত না সে। আগে সে যখন দেখতে খারাপ ছিল তখন যেমন তার প্রতি তার কোনও আগ্রহ ছিল না তেমনি আজ তার যৌবনসৌন্দর্য বা দেহলাবণ্যের প্রতিও তার কোনও আগ্রহ নেই। অভ্যাসের বশেই সে রোজ একবার করে যেত সেদিকে।

৩

সেদিনটা ছিল বেশ উজ্জ্বল আর তপ্ত। লুক্সেমবুর্গের বাগানে চলছিল আলোছায়ার খেলা। আকাশটা পরিষ্কার, যেন সকালে কোনও দেবদূত ...টাকে ঝকঝকে করে মেজে দিয়েছে। বাদামগাছে চড়ুই পাখিগুলো কিচমিচ শব্দ করছিল। তখন কোনও বিশেষ চিন্তা ছিল না মেরিয়াসের মনে। মেরিয়াস তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সহসা মেয়েটি তার মুখপানে তাকাল। মেরিয়াসও তার মুখপানে তাকাল। দু'জনের চোখের দৃষ্টি মিলিত হলো।

তার সে দৃষ্টিতে কি কথা ছিল মেরিয়াস তা বলতে পারল না। হয়ত কোনও কথাই ছিল না অথবা অনেক কথা ছিল। তবে দু'জনের দৃষ্টির মাধ্যমে একটা স্ফুলিঙ্গ খেলে গেল।

মেয়েটি একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। মেরিয়াস তার পথে চলে গেল। সে বুঝল আজ তার চোখে যে দৃষ্টি দেখেছে তা কোনও বালিকাসুলভ নিরীহ নিষ্কাম দৃষ্টি নয়। সে দৃষ্টির মধ্য দিয়ে আজ যেন তার মনের গভীরের একটি রুদ্ধ দরজা খুলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার তা বন্ধ হয়ে যায়। সব মেয়েরেই চোখে একদিন না একদিন এই ধরনের এক দৃষ্টির ফুল ফুটে ওঠে।

এইভাবে যে মেয়ে প্রথম তাকায় এবং তার দৃষ্টির মধ্যে তার আত্মার এক অকথিত বাণী ফুটে ওঠে যার অর্থ সে নিজেই জানে না, তার সে দৃষ্টি এমনই এক নবোদিত সূর্যরশ্মির মতো যা একই সঙ্গে আলোছায়ার এক জটিল দ্বন্দ্বে আকীর্ণ। সেই অপ্রত্যাশিত দৃষ্টির ভয়ঙ্কর সুন্দর আবেদনটিকে ভাষায় ঠিক প্রকাশ করা যায় না। সহসা নারীত্বে উপনীত এক তরুণী তার সেই দৃষ্টির মোহমেদুর আবেদনের মধ্য দিয়ে নিরীহ নির্দোষ হাতে যে ফাঁদ পাতে তাতে একটি হৃদয় ধরা পড়ে যায়, অথচ সে নিজেই জানে না, কেন সে এ ফাঁদ পাতল। কিন্তু যার জন্য এই দৃষ্টির ফাঁদ পাতা হয় সে কিন্তু খুব গভীরভাবে বিচলিত হয় না এ দৃষ্টির দ্বারা। কিন্তু এ দৃষ্টির মধ্যে একই সঙ্গে বর্তমানের এক নিরাবেগ নিস্পৃহতার সঙ্গে ভবিষ্যতের এক প্রেমাবেগ থাকে লুকিয়ে। এ দৃষ্টির মধ্যে এক পবিত্রতার সঙ্গে প্রাণাবেগ কেন্দ্রীভূত হয়ে তাকে এমনই করে তোলে যা কোনও চটুল প্রেমাভিনয়পটীয়সী নায়িকার দৃষ্টির থেকে অনেক বেশি শক্তিশালিনী এবং যা অন্য একটি অন্তরে এমন এক ফলগাছের চারা রোপণ করে যা একই সঙ্গে সুগন্ধ ও বিষের ভারে অবনত এবং যার নাম প্রেম।

সেদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরেই প্রথমে তার পোশাকের কথাটা চিন্তা করতে লাগল মেরিয়াস। জীবনে আজ এই প্রথম সচেতন হলো সে তার পোশাকের প্রতি। সে একটা নির্বোধ বলেই তোবড়ানো টুপি, ময়লা পায়জামা আর ছেঁড়া জ্যাকেট পরে লুক্সেমবুর্গের বাগানে গিয়েছিল।

৪

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে মেরিয়াস সম্পূর্ণ নতুন একপ্রস্থ পোশাক পরে লুক্সেমবুর্গ বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। নতুন জামা, নতুন পায়জামা, নতুন জুতো আর নতুন টুপি। সবশেষে হাতে তার দস্তানা ছিল যা তার কখনো থাকে না। পথে কুরফেরাককে দেখতে পেল সে। কিন্তু সে দেখেও দেখল না।

কুরফেরাক পরে তার বন্ধুদের বলেছিল, মেরিয়াসকে নতুন পোশাক পরে কোথায় যেতে দেখলাম। মনে হলো পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে।

লুক্সেমবুর্গ বাগানে যাওয়ার পর প্রথমে বাগানের পুকুরটার চারদিকে একবার ঘুরল। পুকুরে চরতে থাকা হাঁসগুলোর পানে একবার তাকাল। তারপর একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্তিকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখল। সে দেখল একজন ভদ্রলোক পাঁচ বছরের একটি ছেলেকে তার হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে তাকে উপদেশ দিচ্ছে, কখনো চরম পন্থা অবলম্বন করবে না। স্বৈরাচার আর স্বেচ্ছাচার—দুটোকেই সব সময় এড়িয়ে চলবে।

পুকুরটার চারদিকে আর একবার ঘোরার পর ধীর পায়ে অনিচ্ছার সঙ্গে বাগানের সেই বেঞ্চটার পানে এগিয়ে যেতে লাগল মেরিয়াস। একই সঙ্গে সে যাবার একটা আকর্ষণ আর বিকর্ষণ অনুভব করছিল। একই সঙ্গে কে তাকে যেন টানছিল এবং কে যেন তাকে বাধা দিচ্ছিল। একই সঙ্গে যেখানে যেতে আসক্তি আর বিরক্তি বোধ করছিল। সে ধীর পায়ে এমনভাবে যেতে লাগল যাতে মনে হচ্ছিল সে রোজ সেখানে যায় বলেই আজও যাচ্ছে।

সেই পক্ককেশ বৃদ্ধ তার মেয়েকে নিয়ে সেই বেঞ্চটায় আগের মতোই বসেছিল। আজ ভাল পোশাক পরে থাকার জন্য একটা গর্ববোধ করছিল মেরিয়াস। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল হ্যানিবল যেন রোম জয় করতে চলেছে। এ ছাড়া মোটামুটি সে শান্ত এবং সরল ছিল। অন্যদিনকার মতই সে অন্য সব চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পাঠ্য বই-এর কথা ভাবছিল, সেই সঙ্গে রেসিনের ট্রাজেডি আর মলিযারের কমেডির কথা ভাবছিল। এমন সময় একটা গানের শব্দ তার কানে গেল। সে তার পোশাকটা ঠিক করে নিয়ে এগিয়ে গেল বেঞ্চের দিকে। বেঞ্চের কিছুটা দূর থেকেই সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। তারপরই হঠাৎ সে পিছন ফিরে উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। মেয়েটি তার দিকে তাকায়নি, তাকে নতুন পোশাকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে তা সে দেখেনি। তবু একবার তাকে পিছন থেকে কেউ দেখছে কি না তা সে পিছন ফিরে দেখল।

হাঁটতে হাঁটতে বাগানটার এক প্রান্তে চলে গেল মেরিয়াস। তারপর আবার সেই বেঞ্চটার কাছে এসে পড়ল। তার মনে হলো মেয়েটি এবার তাকে দেখছে। কিন্তু সে জোর করে খাড়া হয়ে ডাইনে-বাঁয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল। বেঞ্চটার কাছ দিয়ে যাবার সময় তার অন্তরটা ভারী হয়ে উঠছিল। তার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। মেয়েটির পরনে ছিল সেই সিল্কের পোশাক, মাথায় সেই টুপি। মেয়েটির মিষ্টি কথার সুরটা তার কানে আসছিল। সে তার বাবার সঙ্গে মিষ্টি সুরে কথা বলছিল শান্তভাবে। সে দেখতে সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী। মেরিযাস সেটা বুঝতে পারল, কিন্তু সে ভাল করে তাকিয়ে দেখল না। সে ভাবতে লাগল, মেয়েটি যদি জানতে পারে মার্কো ওবরেগন দ্য লা বোন্ডার উপর যে বইটা বেরিয়েছে এবং যেটা ফ্রাঁসোয়া দ্য লোফশ্যাতো নিজের লেখা বই হিসাবে চালাচ্ছে সে বই-এর সে-ই রচয়িতা তাহলে হযত সে তাকে শ্রদ্ধা করবে।

মেরিযাস আবার বেঞ্চের কাছে গেল। মেয়েটির কাছে এসে এবার সত্যিই বিচলিত হলো। সে আবার বেঞ্চ আর মেযেটির কাছ থেকে দূরে চলে গেল। যাবার সময় যখন সে ভাবল মেযেটি তাকে পিছন থেকে দেখছে তখন সে শিউরে উঠল।

এবার সে এমন একটা কাজ করল যা সে আগে কখনো করেনি। সে আর মেয়েটির কাছে না গিয়ে কিছুটা দূরে অন্য একটা বেঞ্চে বসে মাঝে মাঝে তাদের পানে আড়চোখে তাকাতে লাগল। তার কেবলি মনে হতে লাগল যে ভদ্রলোক এমনিতেই ভাল পোশাক পরে এবং তার পোশাকের যে প্রশংসা করত সে কখনো তার এই নতুন পোশাকের জৌলুস দেখে মুগ্ধ হবে না।

এবার সে উঠে বেঞ্চটার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এইভাবে পনের মাস কেটে যাবার পর হঠাৎ সেদিন মনে হলো মেরিয়াসের, মেয়েটির সঙ্গে যে ভদ্রলোক আসে তার চোখে তার আচরণ হয়ত ভাল লাগেনি। তার আরও মনে হলো ভদ্রলোককে মঁসিয়ে লেবলাঁ নামে অভিহিত করা তার প্রতি অশ্রদ্ধারই পরিচায়ক।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে রওনা হলো সে। সেদিন রাত্রের খাওয়া খেতে ভুলে গেল। যখন তার খাওয়ার কথা মনে পড়ল তখন আর সময় নেই। রূ্য সেন্ট জ্যাক রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। সে রাতে একটুকরো রুটি চিবিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ল সে। বিছানায় শুতে যাবার আগে সে তার জামাটা ঝেড়ে এবং পায়জামাটা যত্নের সঙ্গে ভাঁজ করে রেখে দিল।

৫

পরদিন গর্বোর সেই বাড়িতে মাদাম বুগনল নামে যে বৃদ্ধা মেরিয়াসের ঘর পরিষ্কার ও দেখাশোনা করত, সে দেখল মেরিয়াস আবার তার ভাল পোশাক পরে বেরিয়ে গেছে। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

সেদিনও বিকালে লুক্সেমবুর্গ বাগানে গেল মেরিয়াস। মেয়েটি তার বাবার সঙ্গে যে বেঞ্চে বসত সেখানে গেল। সে আগের দিন একা যে বেঞ্চটায় বসেছিল সেই বেঞ্চটাতেই বসল। বাগানের গেট বন্ধ হবার সময় পর্যন্ত বসে রইল। তারপর বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখে গেল ভদ্রলোক তার মেয়েকে নিয়ে তখনো বসে আছে। হয়ত রূ্য লা কোয়েস্ট এর দিকের গেটটা দিয়ে তারা বেরিয়ে যাবে।

সেদিনও সে তার রাতের খাওয়া খেয়েছিল কি না তা তার মনে নেই।

পরদিন মাদাম বুগনল দেখল মেরিয়াস ভাল বেশভূষা করে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে।

মাদাম বুগনল আপন মনে বলে উঠল, এই নিয়ে তিন দিন এইরকম চলছে। সে মেরিয়াসের পিছু পিছু কিছুটা গেল। সে কোথায় যায় তা সে দেখতে চায়। কিন্তু এত দ্রুত পা ফেলে চলে গেল মেরিয়াস যে তাকে অনুসরণ করা সম্ভব হলো না তার পক্ষে। ফলে হাঁপাতে হাঁপাতে বাসায় ফিরে এল সে। সে আবার হাঁপানির রোগী, সে শুধু ভাবতে লাগল, এর মানে কি ? এত তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে কোথায় যাচ্ছে সে ?

মেরিয়াস আবার লুক্সেমবুর্গের বাগানেই গেল। সে দেখল মেয়েটি তার বাবার সঙ্গে সেইখানেই বসে আছে। মেরিয়াস সেখানে না গিয়ে সে সেই বেঞ্চটাতে আগের মতো বসে রইল। সে একটা বই পড়ার ভান করতে লাগল। চড়ুই পাখির নাচ দেখতে লাগল। তার কেবলি মনে হতে লাগল মেয়েটি তাকে উপহাস করছে।

এইভাবে একপক্ষকাল কেটে গেল। মেরিয়াস লুক্সেমবুর্গ বাগানে আর পায়চারি করত না। সে সেখানে গিয়ে সেই বেঞ্চটায় বসে থাকত। কিন্তু কেন বসে আছে সে প্রশ্ন সে নিজেকে করত না কখনো এবং প্রতিদিনই সে ভাল পোশাক পরে যেত।

মেয়েটি যে আশ্চর্যজনকভাবে সুন্দরী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তার সম্বন্ধে সমালোচনা করলে একটা কথাই মনে হত—তার চোখের বিষাদগ্রস্ত দৃষ্টি আর হাসির উজ্জ্বলতার মধ্যে কেমন যেন একটা বৈপরীত্য আছে। এটা হতবুদ্ধি করে দিত মেরিয়াসকে। তার সুন্দর মুখখানা আনন্দদায়ক হলেও রহস্যজনক মনে হত তার।

৬

দ্বিতীয় সপ্তার শেষের দিকে একদিন মেরিয়াস সেই বেঞ্চটায় তার হাঁটুর উপর একটা বই খুলে রেখে বসে ছিল। কিন্তু সে বই এর একটা পাতাও পড়েনি। সহসা সামনে তাকিয়ে সে শিউরে উঠল। সে দেখল বাপ আর মেয়ে তাদের বেঞ্চ থেকে উঠে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে এবং তার দিকেই আসছে। মেরিয়াস বইটা বন্ধ করে আবার খুলে পড়ার চেষ্টা করল। তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। সে ভাবতে লাগল ওরা যদি কাছে এসে পড়ে তাহলে সে কি করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি এসে পড়বে তার কাছে। তার মনে হলো ভদ্রলোক তার দিকে রাগান্বিতভাবে তাকাচ্ছে। সে কি কথা বলবে তার সঙ্গে ? মেয়েটিও তার দিকে এক বিষাদমেদুর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। তা দেখে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। মনে হলো মেয়েটির সে দৃষ্টি ভৎসনা করছে তাকে। সে যেন বলছে, এতদিন তুমি আমার কাছে আসনি, আজ আমি তোমার কাছে এসেছি। তার চোখে আলোছায়ার খেলা দেখে হতবাক হয়ে গেল মেরিয়াস।

তার মনে হলো তার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। সে অবশেষে তার কাছে এসেছে। এটা ভাবতেই আনন্দের আবেগে শিহরিত হয়ে উঠল সে। মেয়েটিকে আগের থেকে বেশি সুন্দর বলে মনে হলো তার। সে সৌন্দর্যের মধ্যে একই সঙ্গে এক নারীত্ব আর দেবদূতের একটা ভাব ছিল। তার মধ্যে সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ছিল যার আবেদন প্রেত্রার্ককে গীতিময় আর দান্তেকে নতজানু করে তোলে। সেই সঙ্গে তার জুতোজোড়াটা ময়লা এবং অপরিচ্ছিন্ন ছিল বলে তার মনটা দমে গেল। তার মনে হলো মেয়েটি তার জুতোটা দেখেছে।

মেরিয়াস মেয়েটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এদিকে মেয়েটি হাঁটতে হাঁটতে তার দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ধীরে ধীরে। এবার সে বাগানে পাগলের মতো পায়চারি করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে বাগান ছেড়ে পথে বেরিয়ে গেল। তার মনে হলো পথে সে মেয়েটির দেখা পাবে। কিন্তু পথে সে মেয়েটির দেখা না পেয়ে সোজা কুরফেরাকের কাছে চলে গেল। সে তাকে একসঙ্গে খাবার জন্য আহ্বান জানাল। তারা দু'জনে একসঙ্গে শেজ রুশোতে খেল। তাতে ছয় ফ্রাঁ লাগল আর ছয় স্যু পরিচারিকাকে উপহার হিসাবে দিল। মেরিয়াস ক্ষুধার্ত মানুষের মতো গোগ্রাসে খেল। তার মাথায় তখন অনেক কথা ভিড় করে আসছিল। সে কুরফেরাককে বলল, আজকের খবরের কাগজটা দেখেছ ? অত্রে দ্য পুরাভো একটা ভাল বক্তৃতা দিয়েছে'...সে আকণ্ঠ প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

খাওয়ার পর কুরফেরাককে নিয়ে থিয়েটার দেখতে গেল মেরিয়াস। থিয়েটারটার নাম পোর্তে সেন্ট মার্তিন। সে থিয়েটারে তখন রবার্ট ম্যাকেয়ারের আবেগপ্রধান নাটক লা অকার্দে দে আদ্রেস্ত অভিনীত হচ্ছিল। নাটক দেখে প্রচুর আনন্দ পেল মেরিয়াস। কিন্তু তার আচরণটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। কুরফেরাক যখন একটি দোকানের মেয়ের

দিকে তাকিয়ে বলল, মেয়েটাকে পেলে মন্দ হত না, তখন মেরিয়াস তার দিকে তাকালও না।

কুরফেরাক তাকে পরদিন দুপুরে তার সঙ্গে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। কাফে ভলতেয়ারে তারা দু'জনে একসঙ্গে খেল। গত সন্ধ্যার থেকে আরও বেশি খেল মেরিয়াস। একই সঙ্গে তাকে অন্যমনা, আরও আবেগে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। কথায় কথায় সে জোর হাসিতে ফেটে পড়ছিল। কুরফেরাক এক গ্রামের যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে সে তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরল। একদল ছাত্র এসে তাদের কাছে ভিড় করে দাঁড়াল। একথা-সেকথা আলোচনার পব তারা কুইশেরাতের অভিধান রচনায় ভুল-ভ্রান্তির কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

মেরিয়াস একসময় বলল, যাই বল লিজিয়ন দ্য অনারের ক্রস পাওয়াটা সত্যিই ভাগ্যের কথা।

কুরফেরাক প্রুভেযারকে বলল, তার পক্ষে এ পুরস্কারটা কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত।

প্রুভেযার বলল, না, মোটেই অদ্ভুত নয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ।

মেরিয়াসের কাছে তখন সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। সে তখন এক প্রবল প্রেমাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

কোনও নারীর চোখের দৃষ্টি আপাতত মনে হয় এক যান্ত্রিক ব্যাপার এবং নির্দোষ ; কিন্তু আসলে তা ভযঙ্কর। আমরা প্রতিদিন সে দৃষ্টির সম্মুখীন হই এবং তাকে কোনও গুরুত্ব দিই না। তার অস্তিত্বের কথা মোটেই ভাবি না। আমরা সে দৃষ্টির ফাঁদে ধরা না পড়া পর্যন্ত মোটেই বিচলিত হই না। পরে দেখি এমন এক শক্তির কবলে আমরা পড়ে গিযেছি যার থেকে মুক্ত হবার জন্য বৃথাই সংগ্রাম করি আমরা। একের পর এক দুঃখের পীড়নে যন্ত্রণায় জর্জরিত হই। আমরা বুঝতে পারি না সেই অজানা অচেনা শক্তি সৌভাগ্যের বা দুর্ভাগ্যের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। বুঝতে পারি না কোনও হীন হিংস্র জন্তু বা কোনও শান্তশ্রী অন্তরের কবলে তা ফেলে দেবে আমাদের ; ভেবে পাই না এক অপরিহার্য লজ্জার আঘাতে জর্জরিত ও ক্ষতবিক্ষত হবে অথবা প্রেমের অভিষেকে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে আমাদের অন্তর।

৭

নিঃসঙ্গতা এবং অনাসক্তি, অভিমান, স্বাধীনতাস্পৃহা, প্রকৃতিপ্রেম, কর্মহীন আলস্য প্রবণতা, জীবনের খাতিরেই জীবনযাপনের ইচ্ছা, নিজের সত্তা বা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য এক গোপন অন্তঃসলিলা সংগ্রাম, সমস্ত সৃষ্ট জীবনের প্রতি শুভেচ্ছার এক আবেগ—এই সব কিছু মেরিয়াসের জীবনে প্রেমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আসন পেতে বসল। তার পিতার প্রতি অনুরাগ বা আসক্তির অনুভূতিটা ক্রমে এক ধর্মানুভূতিতে পরিণত হলো এবং সকল ধর্মানুভূতির মতোই তা পশ্চাৎপটে সরে গেল। তার সামনের দিকের শূন্য ভূমিটা পূরণ করার জন্য কিছু একটার দরকার। সে শূন্যতা পূরণের জন্য তার জীবনে যা এল তা হলো প্রেম।

একটা মাস কেটে গেল। এই একমাসের মধ্যে রোজ একবার করে লুক্সেমবুর্গ বাগানে গেল মেরিয়াস। কোনও বাধা মানল না সে। মেয়েটি তাকে দেখেছে একথা মনে করতেই আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠল তার অন্তর।

ক্রমশ তার সাহস বেড়ে যাওয়ায় সে মেয়েটি যে বেঞ্চে বসত তার অনেকটা কাছাকাছি যেত, কিন্তু তাদের সামনে যেত না। কিছুটা লজ্জাবশত এবং কিছুটা প্রেমিকসুলভ সাধারণ সতর্কতাবশত সে মেয়েটির বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইত না। সে তাই মেকিয়াভেলিসুলভ চাতুর্যের সঙ্গে যথাসম্ভব গাছপালা আর বাগানের মূর্তিগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকত এমনভাবে যাতে মেয়েটি তাকে ভালভাবে দেখতে পায় অথচ তার বাবা তাকে কম দেখতে পায়। এক একসময় সে লুনিদাস অথবা স্পার্টাকাসের মর্মর মূর্তির আড়ালে প্রায় পুরো আধঘণ্টা একটা বই খুলে দাঁড়িয়ে থাকত আর মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে তাকাত আর মেয়েটিও তার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে ঠোঁটে ক্ষীণ একফালি হাসি নিয়ে তার পানে তাকাত মাঝে মাঝে। সে যখন শান্তভাবে তার বাবার সঙ্গে কথা বলত, সে তখন তার কুমারী হৃদয়ের এক তপ্ত আবেগের সঙ্গে মেরিয়াসের দিকে তাকাত আর তার কথা ভাবত। সৃষ্টির আদিকাল থেকে [illegible] বা নারীদেব অন্তরে যে কামনার কুঁড়িটি সুপ্ত হয়ে থাকে সে কুঁড়িটি ফুল হয়ে ফুটে উঠত তার দৃষ্টিতে। তার ঠোঁট দুটি যখন তার বাবার সঙ্গে কথা বলত, তার দু'চোখের দৃষ্টি কথা বলত অন্য একজনের সঙ্গে।

কিন্তু মঁসিয়ে লেবলাঁ অর্থাৎ মেয়েটির বাবার মনে সন্দেহ জাগল। সে তাই মেরিয়াস বাগানে আসার সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চ থেকে উঠে পায়চারি করত। মেরিয়াস ও তার মেয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে যে দৃষ্টি বিনিময় হত সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ জেগেছিল তার। সে তাই মাঝে মাঝে বেঞ্চটা পাল্টে অন্য বেঞ্চে গিয়ে বসত তার মেয়েকে নিয়ে। দেখত মেরিয়াস তাদের কাছে যায় কি না। মেরিযাস কিন্তু এই সন্দেহের কথাটা বুঝতে পারেনি। এরপর মঁসিয়ে লেবলাঁ নিয়মিত আস[illegible] বন্ধ করল এবং যেদিন আসত তার মেয়েকে সঙ্গে আনত না।

মেরিয়াস কিন্তু এই সব ঘটনার কথা কিছুই ভাবত না। প্রথম প্রথম সে সদা সতর্ক হয়ে থাকত, ক্রমে সে আবেগে অন্ধ হয়ে উঠল। তার প্রেমাবেগ ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। সে রাত্রিতেও মেয়েটির স্বপ্ন দেখত। তার উপর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা তার প্রজ্বলিত প্রেমাবেগের আগুনে তেল ঢেলে যেন তাতে ইন্ধন যুগিয়ে দিল। তার সামনে কুযাশা ঘেরা চিন্তার রাশ তাকে যেন আরও অন্ধ করে দিল। একদিন মেরিয়াস দেখল যে বেঞ্চটায় মেয়েটি তার বাবার সঙ্গে বসেছিল তারা উঠে চলে গেলে তার উপর একটা রুমাল পড়ে আছে। রুমালটা সাদা এবং তাতে কোনও সূচিশিল্পের কারুকার্য ছিল না; শুধু তার উপর ইউ আর এফ এই দুটো অক্ষর লেখা ছিল। রুমালটা থেকে একটা সুগন্ধ বার হচ্ছিল। তখনো পর্যন্ত মেরিয়াস মেয়েটির নাম-ধাম কিছুই জানত না। সে 'ইউ' অক্ষরটা দেখে ভাবল মেয়েটির নাম নিশ্চয় আরসুলা। কি সুন্দর নাম! সে রুমালটা চুম্বন করল, তার গন্ধ শুঁকল। রুমালটা

সে তার বুকের কাছে রেখে দিত আর রাত্রিতে বালিশের তলায় রেখে দিত। সে যখন বাগানে যেত তখন রুমালটা সঙ্গে নিয়ে যেত।

আসলে কিন্তু রুমালটা ছিল মেয়েটির বাবার এবং সেটা তার পকেট থেকে একসময় পড়ে যায়।

কিন্তু মেরিয়াস তা জানতে না পারায় ভাবত সেটা মেয়েটির রুমাল এবং সে তাই বাগানে গিয়ে রুমালটা তার বুকের উপর জড়িয়ে ধরত। মেয়েটি কিন্তু এর কোনও মানে বুঝতে পারত না। ফলে তার মুখে-চোখে কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত না। মেরিয়াস আপন মনে বলত, কি সম্ভ্রমবোধ!

৮

মেয়েটির প্রতি তার শত প্রেমাবেগ থাকা সত্ত্বেও একদিন একটি ঘটনায় তার আরসুলার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে মেরিয়াস। একদিন মঁসিয়ে লেবলাঁ তার মেয়ের সঙ্গে বেঞ্চ থেকে উঠে পায়চারি করছিল বাগানের পথে। তখন জোর বাতাস বইতে থাকায় গাছের মাথাগুলো নুইয়ে পড়ছিল। বাবা আর মেয়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে মেরিয়াসের বেঞ্চের কাছে এসে পড়ায় মেরিয়াস আবেগের বশে উঠে পড়ে তাদের দিকে তাকাতে থাকে।

সহসা একঝলক জোর দমকা বাতাস মেয়েটির পোশাকগুলোকে এলোমেলো করে দিল এবং মেয়েটি তখন ব্যস্ত হয়ে তার জামার উড়ন্ত আঁচলগুলোকে ঠিক করে নিতে লাগল। কেউ তখন তাকে না দেখলেও সে ভাবছিল কেউ তার অনাবৃত পাদুটোকে দেখেছে। তার অনাবৃত পায়ের লাবণ্য ঈর্ষার আগুন ধরিয়ে দিল যেন মেরিয়াসের মধ্যে। তার উপর তার প্রতি মেয়েটির ঔদাসিন্য আর অনাগ্রহ দেখে রাগ হচ্ছিল তার। প্রথমে তারা মেরিয়াসের বেঞ্চটার সামনে দিয়ে পথটার অন্য প্রান্তে চলে গেল। তারপর সেই পথেই আবার ফিরতে লাগল। ফেরার সময় তারা আবার মেরিয়াসের সামনে এসে পড়ল। মেয়েটি কাছে আসতেই তার মুখপানে এমন ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টিতে তাকাল যাতে কিছুটা চমকে উঠল মেয়েটি। তার চোখের পাতাগুলো এমন ভাবে কাঁপতে লাগল যাতে মনে হলো সে বলতে চাইছে, কি হলো তার?

এই যেন তাদের চোখে চোখে প্রথম ঝগড়া।

তাদের এই দৃষ্টি বিনিময়পর্ব শেষ হতে না হতেই সেখানে এক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিক পঞ্চদশ লুই-এর ধরনের পোশাক পরে বাগানের সেই পথটায় এসে হাজির হলো। যুদ্ধে একটা পা তার গেছে এবং সে পা-টা কাঠের তৈরি। মাথার চুল সব পাকা। সেন্ট লুই ক্রস পুরস্কারের ব্যাজ আছে জামার উপর। লোকটাকে দেখে মেরিয়াসের মনে হচ্ছিল সে যেন নিজের অবস্থায় তৃপ্ত এবং গর্বিত। কিন্তু তার এই তৃপ্তি বা গর্বের কারণটা কি তা বুঝতে পারল না মেরিয়াস। তার মনে হলো লোকটা কি তবে তাদের দৃষ্টি বিনিময়ের ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে! তার ঈর্ষাকাতর মনটা আরও বেশি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল।

কিন্তু কালক্রমে আরসুলার উপর রাগটা কমে গেল মেরিয়াসের। তাকে সে ক্ষমা করল মনে মনে। তবে এর জন্য তাকে চেষ্টা করতে হযেছিল এবং তিন দিন ধরে সে এই দুঃখটা মনে মনে লালন করে রেখেছিল।

এ সব সত্ত্বেও আবার অনেকটা এইজন্যই মেয়েটির প্রতি তার আসক্তিটা বেড়ে গেল।

৯

মেরিয়াসের মনে হলো মেয়েটির নাম সে জানতে পেরে গেছে এবং সে নাম হলো আরসুলা। কিন্তু নাম জানাটাই সব নয়, যথেষ্ট নয়। তার ভালবাসার ক্ষুধাটা বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে। এই নাম জানার তৃপ্তিটা কয়েক সপ্তার মধ্যে সব ক্ষয় হয়ে গেল এবং সে আরও কিছু জানতে চাইল। সে জানতে চাইল মেয়েটি কোথায় থাকে।

দুটো ভুল আগেই করেছিল মেরিয়াস। প্রথম ভুল হলো এই যে মঁসিয়ে লেবলাঁ তার মেযেকে নিয়ে আগের বেঞ্চ ছেড়ে অন্য বেঞ্চে গিযে বসলেও সে তাদের কাছে সরে গেছে। এর দ্বারা তার মনোভাব বুঝতে পেরে গেছে মঁসিযে লেবলাঁ। মেরিয়াসের দ্বিতীয় ভুল হলো এই যে মঁসিয়ে লেবলাঁ যেদিন একা আসত বাগানে অর্থাৎ তার মেয়েকে সঙ্গে আনত না সেদিন আসার সঙ্গে সঙ্গে বাগান থেকে চলে যেত মেরিযাস। এরপর মেয়েটি কোথায থাকে তা জানতে গিযে এক অসংযত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সে আর একটা ভুল করে বসেছে।

সে দেখল মেযেটি থাকে রু্য দ্য লা কোযেস্ট অঞ্চলে। বড রাস্তার শেষ প্রান্তে এক শান্ত পরিবেশে অবস্থিত তাদের বাড়িটা দেখতে সত্যিই সুন্দর। সে ভাবল তাদের বাডিটা আবিষ্কার করতে পারার ফলে তাকে দেখার আনন্দটা বেডে যাবে। বাগানে মেযেটিকে দেখার পরেও সে তাদের বাডির কাছে গিে তার পাশ থেকে তাকে দেখতে পারবে। তার নামের প্রথম পদটা সে জানতে পেরেছে। তার নামটা বড় সুন্দর। সে কোথায় থাকে তাও জানতে পেরেছে। এবার তাকে জানতে হবে সে কি করে, তার পরিচয় কি।

একদিন সন্ধ্যার সময় মেযেটির পিছু পিছু গিয়ে মেরিয়াস দেখল তারা পোর্তে কশেরে নামে একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। মেরিযাসও হোটেলে গিয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, যে ভদ্রলোক এইমাত্র ঢুকলেন তিনি কি দোতলায় থাকেন?

দারোয়ান বলল, না মঁসিযে। তিনি থাকেন চারতলায়।

চারতলার সামনের দিকে।

গোটা বাড়িটাই তো রাস্তার দিকে। সামনেই বড় রাস্তা।

তিনি কি ধরনের মানুষ?

ব্যক্তিগত আয়ের উপর তাঁর চলে। ভদ্রলোক সরল অন্তঃকরণের লোক। তিনি গরীবদের যথাসাধ্য সাহায্য করেন যদিও তিনি নিজে ধনী নন।

মেরিয়াস বলল, ভদ্রলোকের নাম কি ?

দারোয়ান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেরিয়াসের দিকে তাকাল। বলল, মঁসিয়ে কি পুলিশের লোক ?

এ কথায় চুপ করে গেল মেরিয়াস। তবু সে খুশি হয়ে ভদ্রলোক সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লাগল।

পরদিন অল্প কিছুক্ষণের জন্য লুক্সেমবুর্গ বাগানে এল মঁসিয়ে লেবলাঁ। তার মেয়েও সঙ্গে ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই চলে গেল। মেরিয়াস তাদের পিছু পিছু হোটেল পর্যন্ত গেল। কিন্তু মেয়েটিকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে মঁসিযে লেবলাঁ দরজা থেকে ফিরে অন্য: চলে গেল। যাবার সময় মেরিয়াসের দিকে একবার কড়াভাবে তাকাল।

পরদিন মঁসিয়ে লেবলাঁ তার মেয়েকে নিয়ে লুক্সেমবুর্গ বাগানে গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর হোটেলে চলে গেল মেরিয়াস। মেরিয়াস গিয়ে দেখল তাদের ঘরে আলো জ্বলছে। হোটেলের বাইরে পাযচারি করতে লাগল সে। মঁসিয়ে লেবলাঁর ঘরে আলোটা নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেরিযাস চলে গেল।

পরের দিনও বাগানে এল না মঁসিয়ে লেবলাঁ। মেরিয়াসও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর হোটেলে গিযে তেমনিভাবে পাযচারি করতে লাগল আর তাদের জানালাটার পানে তাকাতে লাগল। রাত্রি দশটার সময় আলোটা নিবে যেতেই মেরিয়াস চলে গেল। জ্বর যেমন রুগ্ন ব্যক্তিকে ছাডতে চায না তেমনি প্রেম একবার ধরলে প্রেমিককে ছাড়তে চায় না।

একটা সপ্তা কেটে গেল এইভাবে। লেবলাঁ আর তার মেয়ে আর লুক্সেমবুর্গ বাগানে আসত না। তারা কেন আর আসছে না তা নিযে বিষণ্নভাবে ভাবতে লাগল মেরিয়াস। নানারকম অনুমান করতে লাগল। কিন্তু দিনের বেলায় হোটেলের সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতে ভয় হলো তার। তাই সন্ধ্যার পর হোটেলের সামনে গিয়ে তাদের জানালার আলোটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত বাতিটার সামনে দিয়ে একটা ছায়া যাওয়া-আসা করছে।

এইভাবে সাত দিন কেটে যাবার পর আট দিনের দিন সন্ধের পর সে জানালায় আর কোনও আলো দেখতে পেল না মেরিয়াস। তাদের ঘর অন্ধকার। সে ভাবল ওরা হয়ত সন্ধের সময় বাইরে কোথাও আছে। শুধু রাত দশটা নয়, রাত দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করল মেরিয়াস। তবু আলো জ্বলল না সে ঘরে। অপরিসীম বিষাদ বুকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল মেরিয়াস।

একদিন পর আবার লুক্সেমবুর্গ বাগানে গেল মেরিয়াস। কিন্তু সেদিন মঁসিয়ে লেবলাঁদের দেখতে পেল না সে। সন্ধের পর সে হোটেলে গেল। কিন্তু সেদিনও তাদের ঘরের জানালায় আলো দেখতে পেল না। জানালাটার সার্সি বন্ধ।

মেরিয়াস হোটেলের দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, চারতলার ভদ্রলোক কোথায় ?

দারোয়ান বলল, তিনি চলে গেছেন।

মেরিয়াসের মাথাটা ঘুরতে লাগল। সে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কবে চলে গেছেন ?

গতকাল।

কোথায় গেছেন ?

আমি তা জানি না।

কোনও ঠিকানা রেখে গেছেন ?

না।

দারোয়ান এবার মেরিয়াসকে চিনতে পারল। ও আরও একদিন দারোয়ানকে ভদ্রলোকের কথা জিজ্ঞাসা করে। সে বলল, আপনি আবার এসেছেন, আপনি নিশ্চয় পুলিশের কোনও চর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

সব সমাজেরই নিচের তলায় একটা করে স্তর থাকে। সেই স্তরে ভাল ও মন্দ দিকে অনেক সুড়ঙ্গ থাকে। জটিল গোলকধাঁধার মতো কত সুড়ঙ্গপথ। ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিপ্লব—কত সব তত্ত্ব ও নীতির সুড়ঙ্গপথ দেশের বিভিন্ন দিক ও অঞ্চলে প্রসারিত থাকে। যত সব অবান্তর চিন্তার এই সব সুড়ঙ্গপথেই জন্ম হয় এবং ক্রমে তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সব চিন্তার প্রভাবে কত বৈপ্লবিক কাজকর্ম চলে সমাজের নিচের তলায়। আর সেই কাজের ফলে উপরতলাতে আসে এক পরিবর্তন।

উপরতলার সমাজ অনেক সময় তার নিচের তলায় কি সব কাজকর্ম হচ্ছে তার কথা জানতেই পারে না। রুশো ডায়োজেনেসের হাতে এক ধারালো কুঠার তুলে দেন, ডায়োজেনেস তার পরিবর্তে তুলে দেন লণ্ঠন। ক্যালভিন ইতালীয় নাস্তিক থোসিনের সঙ্গে ঝগড়া করেন। সমাজের নিচের তলায় গোপনে যে প্রবল আলোড়ন চলবে তার আঘাতে সমাজের উপরতলায় এক রূপান্তর সংঘটিত হয়। এই আলোড়ন সমাজের উপরতলাটাকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ না করলেও তলায় তলায় গোপনে সমাজের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়েখুঁড়ে দিতে থাকে।

সমাজস্তরের গভীরে কেউ যদি নেমে যায় তাহলে সেখানে দেখবে শুধু শ্রমিক। যে স্তরে সমাজদর্শন কাজ করে সে স্তরে কাজকর্ম ভালই হয়। কিন্তু তার নিচের স্তরে সব কিছুই সংশয়াত্মক, সব কিছুই ভয়ঙ্কর। সেই স্তরে সভ্যতার আলো প্রবেশ করতে পারে না। সেখানকার হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারে না মানুষ। সেখানে যতসব রাক্ষসের জন্ম হয়। যে মই দিয়ে নিচের তলার স্তরে নেমে যাওয়া হয় তার এক একটি আংটায় এক একটি দর্শন, এক একটি তত্ত্ব দাঁড়িয়ে থাকে। এক একটি তত্ত্ব অনুসারে এক একজন লোক কাজ করে। হুসের তলায় লুথার, লুথারের তলায় দেকার্তে, দেকার্তের তলায় ভলতেয়ার, ভলতেয়ারের তলায় কনভরসেত, কনভরসেতের তলায় রোবোসপীয়ার, রোবোসপীয়ারের তলায় মারাত, মারাতের তলায়

বাবুফ...এইভাবে উপর থেকে নিচে নেমে গেছে। তারপর আর কিছু দেখা যায় না। শুধু কতকগুলো ছায়াচ্ছন্ন প্রেতমূর্তি যাদের শুধু মনের চোখ দিয়ে দেখা যায় অস্পষ্টভাবে। তাদের মধ্যেই আছে ভবিষ্যতের প্রাণ। ভবিষ্যতের এক আকারহীন ভাবমূর্তি শুধু দার্শনিকদের কল্পনায় ভাসতে থাকে। সেই সব ভাবমূর্তির আকারগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যায়।

সেই নিচের তলায় বিভিন্ন গ্যালারিতে সেন্ট সাইমন, ওয়েন, ফুরিয়েরও আছেন। এক অদৃশ্য বন্ধনের দ্বারা তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে আছেন যে বন্ধনের কথা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। তাঁরা নিজেদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেন। একজনের আলো অন্যজনের আলোর সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়ে পরে মিশে যায়। তাঁদের জীবন ও কর্ম উন্নত হলেও তার পরিণতি ছিল বড় মর্মান্তিক। তাঁদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাক তাঁদের একটা মিল ছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন নিরাসক্ত। তবে তাঁদের শুধু একটাই লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্য হলো সত্যের সন্ধান। তাঁদের মধ্যে যারা বড় তাঁরা হয়ত স্বর্গ বা অনন্তলোকের সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু যাঁরা বড় হতে পারেননি, তাঁদের চোখে থাকে শুধু অস্পষ্ট এক আলো।

কিন্তু আবার একদল আছে সমাজের নিচের তলায় যাদের চোখে কোনও আলোই নেই। যারা চোখে কিছু দেখতে পায় না। তাদের প্রতিই আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। তাদের সামনে গিয়ে ভয়ে আমাদের কাঁপতে হয়। সব সমাজেরই নিচের তলায় এই ধরনের অনেক অন্ধ ছুঁচো আছে।

কিন্তু সমাজের নিচের তলার যত স্তরের কথা বলছি আমরা তাদের মধ্যে সবচেয়ে গভীর হচ্ছে তথাকথিত প্রগতি বা অবান্তর চিন্তাধারার গোপন সুড়ঙ্গপথ। মারাত, বাবুফ কেউ সে স্তরের তল খুঁজে পায় না। সমাজের সর্বনিম্ন সেই স্তর বা তলদেশই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। আসলে সেটা এক অন্ধকার গহ্বর যেখানে থাকে সেই সব মানুষ যারা মনের দিক থেকে একেবারে অন্ধ, যারা সত্যকে কোনওদিন দেখেনি এবং দেখতে চায়ও না।

২

সমাজের সেই সর্বনিম্ন অন্ধকার গহ্বরের তলদেশে বিরাজ করে এক অন্তহীন অরাজকতা। সেখানে যতসব অন্ধ রাক্ষসগুলো ঝগড়া-মারামারি করে আর গর্জন করে ভয়ঙ্করভাবে। বিশ্বের অগ্রগতি সম্বন্ধে কোনও খবর রাখে না তারা। এ বিষয়ে কোনও চিন্তা করে না বা কোনও কথা বলে না। নিজেদের কামনাপূরণ ছাড়া আর কিছুই জানে না তারা। তাদের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর শূন্যতা আছে তা তারা জানে না। তাদের দুটি মাতা আছে; তা হলো অজ্ঞতা আর দারিদ্র্য। তাদের জীবনে শুধু একটা নীতি আছে যার দ্বারা তারা সব সময় পরিচালিত হয়। সে নীতি হলো দেহগত প্রয়োজন পরিতৃপ্তি। বাঘের মতোই ভয়ঙ্কর তাদের ক্ষুধা। দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝে লালিত-পালিত শিশু অন্ধকার জগতের এক অমোঘ নিয়মানুসারে একদিন পরিণত

হয় এক পাকা অপরাধীতে। সমাজের সেই সর্বনিম্ন অন্ধকার স্তরে পরম সত্যের জন্য কোনও অনুসন্ধিৎসা নেই, আছে শুধু জড়বস্তুর প্রতি এক অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। মানুষ সেখানে পরিণত হয় পশুর শিকারে। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা কেন্দ্রচ্যুত করে নিয়ে বেড়ায় তাদের। শয়তান হওয়াই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই অন্ধকার গহ্বর হতেই একদিন কবি ও নরঘাতক লামেনেয়ারের উদ্ভব হয়।

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা সমাজের উপরতলার স্তরে রাজনীতি, বিপ্লব আর ছাত্রদের দার্শনিক জগতের কথা বলেছি। সেখানে যারা থাকে স্বভাবতই তারা উচ্চমনা। তারা ভুল করে, দোষ করে ঠিক, কিন্তু তবু তারা শ্রদ্ধার পাত্র, কারণ তাদের ভুলের মধ্যেও এক ধরনের বীরত্ব আছে। তাদের শুধু জীবনে একটাই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে এবং তা হলো প্রগতি। কিন্তু এই প্রগতির গভীরে একবার উঁকি মেরে আমরা দেখব কি ধরনের বিভীষিকা আছে সেখানে।

সমাজের এই স্তরে থাকে যত সব তথাকথিত বিপ্লবীরা। সেখানে বিরাজ করে এক অজ্ঞতার অন্ধকার। তারা নিজেদের দার্শনিক বললেও কোনও দর্শনচিন্তার ধার ধারে না, তারা নিজেদের বিপ্লবী বললেও তাদের ছুরি কোনওদিন একটা কলমও কাটেনি। তারা কোনও বই বা খবরের কাগজের পাতা খোলে না কোনওদিন। অভিজাত শোষকদের মতো তারা মানুষকে ভুল তত্ত্ব ও নীতির দ্বারা প্রভাবিত করে। তাদের জীবনের লক্ষ্য শুধু একটাই এবং তা হলো সব কিছু ধ্বংস করা।

তারা সব কিছুই ধ্বংস করতে চায়। তারা শুধু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সব কিছু ধ্বংস করতে চায় না, সব বিজ্ঞান, দর্শন, নিয়ম-কানুন, চিন্তা, আদর্শ, সভ্যতা, প্রগতি এবং বিপ্লবকেও ধ্বংস করে আর নবহত্যাই তাদের একমাত্র কাজ। অজ্ঞতার প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত সেই অন্ধকার জগতের মধ্যে তারা চায় শুধু বিশৃঙ্খলা। সমাজের অন্যান্য স্তরগুলি এই সব বিপ্লবীদের উচ্ছেদ করতে চায়। তাদের প্রগতির দর্শন, পরম সত্যের সন্ধান, সকল ভাবনাচিন্তা এবং প্রচেষ্টার এই লো ফলশ্রুতি। যে অজ্ঞতার অন্ধকার সমাজের প্রকৃত শত্রু সেই শত্রুকে নাশ করতে হবে।

সব মানুষই সমান। সব মানুষই একই মাটি হতে উদ্ভূত। একই ভাগ্যের শরিক সব মানুষ। একই শূন্যতা থেকে জন্মলাভ করি আমরা। আমাদের সকলের দেহে থাকে একই মাংস এবং মৃত্যুর পর একই ভস্মে পরিণত হই আমরা। কিন্তু যে অজ্ঞতার অন্ধকার দুরারোগ্য ব্যাধির মতো প্রতিটি আত্মাকে সংক্রামিত করে তা নিঃসন্দেহে এক অশুভ অভিশাপ।

৩

১৮৩০-৩৫ সাল পর্যন্ত চারটি শয়তান প্যারিসের সমাজ জীবনের নিচের তলায় প্রভুত্ব করত। তাদের নাম হলো ক্লাকেসাস, গুয়েলেমার, বাবেত আর মঁতপার্নেসী।

গুয়েলেমার ছিল আধুনিক হার্কিউলেস যে আর্কে মেরিয়ত আববনে বাস করত। তার চেহারাটা ছিল সাত ফুট লম্বা, হাতের পেশীগুলো ছিল ইস্পাতের মতো কঠিন,

প্রশস্ত বক্ষস্থল – দেখতে দৈত্যের মতো, কিন্তু মস্তিষ্কটা পাখির মতো হালকা। তাকে দেখলেই মনে হত সে যেন সুতীর পায়জামা আর মখমলের জ্যাকেটপরা এক আধুনিক যুগের হার্কিউলেস। তার বিশাল দেহের অমিত শক্তি দিয়ে সে যত সব মানুষরূপী দৈত্য-দানবদের জব্দ করতে পারত, কিন্তু তা না করে সে নিজেই একজন দানব হয়ে ওঠে এবং এইটাই হয়ত সহজ হয়ে ওঠে তার পক্ষে। বয়স তার চল্লিশের কিছু কমই হবে। মুখে ছিল অল্প একটু দাড়ি, মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা—তার চেহারাটা চিত্রিত করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তার হাতের পেশীগুলো কাজ চাইত, কিন্তু তার নির্বুদ্ধিতার জন্য সে কোনও কাজ করতে চাইত না। সে ছিল এক লক্ষ্যহীন কর্মহীন শক্তির মানুষ। মাঝে মাঝে সে মানুষ খুন করত। সে ছিল ক্রিওল উপজাতির লোক। ১৮৫৫ সালে সে মার্শাল ক্রুনের অধীনে অভিযানে শ্রমিকের কাজ করত। এরপর সে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে।

বাবেতের রোগা রোগা চেহারাটা বিশালবপু গুয়েলেমারের একেবারে বিপরীত। বাবেত ছিল যেমন শীর্ণদেহ তেমনি চতুর। তাকে দেখতে খুব সরলমনা মনে হলেও আসলে তার প্রকৃতিটা ছিল যেমন গম্ভীর তেমনি দুর্বোধ্য। তার শীর্ণদেহের হাড়গুলোতে যেন উজ্জ্বল দিবালোকের ঢেউ খেলে যেত, কিন্তু সে আলোর কিছুমাত্র দেখা যেত না তার চোখে। সে বলত সে একজন কেমিস্ট বা ওষুধ প্রস্তুতকারক। কিন্তু আসলে সে মদের দোকানে কাজ করেছে আগে এবং বথিনোর সার্কাসে ভাঁড়ের কাজ করে। সে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারত এবং কথায় মানুষকে বশ করতে পারত। সে অনেক সময় মেলায় সঙ্ দেখাত। সে আবার পথে পথে ঘুরে দাঁত তোলার কাজও করে। সে ঘুরে ঘুরে নিজের প্রচার নিজেই করে। তার গলার জোর খুব বেশি। তাছাড়া একটা গাড়ির উপর একটা প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে সে প্রচার করে বেড়ায়। সে প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'দন্তশিল্পী বাবেত ধাতু এবং ধাতুজাত দ্রব্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্যে রত আছেন। তিনি দাঁত তোলেন এবং আগে তোলা দাঁতের কোনও অবশিষ্টাংশ লেগে থাকলে সেটাও তুলে দেন। একটা দাঁত তোলার জন্য ১.৫০ ফ্রাঁ, দুটি দাঁত তোলার জন্য ২.০০ ফ্রাঁ এবং তিনটি দাঁত তোলার জন্য ২.৫০ ফ্রাঁ লাগবে। এই সুযোগ হারাবেন না (তার মানে যে যত পারেন দাঁত তুলে নিন)।' সে বিয়ে করেছিল এবং তার ছেলেপুলে ছিল। কিন্তু তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা কোথায় আছে তা সে জানে না। একটা রুমালের থেকে বেশি গুরুত্ব দেয়নি তাদের। একটা রুমাল যেমন মানুষ যেখানে-সেখানে ফেলে রেখে আসে তেমনি বাবেতও তার স্ত্রী ও সন্তানদের কোথায় ফেলে রাখে তা সে নিজেই জানে না। সে খবরের কাগজের যতসব আজেবাজে খবরের উপর জোর দিত। একবার মেসেঞ্জার নামে একটা সংবাদপত্রে সে একটা খবর পড়ে। কোথায় নাকি একজন মহিলা একটি গরুর বাছুরের মাথা প্রসব করেছে। খবরটা পড়ে সে বলে, এটা তো ভাগ্যের কথা। আমার স্ত্রীও এমনি এক সন্তান প্রসব করতে পারত। এরপর প্যারিসে চলে আসে বাবেত।

ক্লাকেসাস ছিল অন্ধকারের জীব। সে রাত্রির অন্ধকার নেমে না আসা পর্যন্ত

তার আস্তানায় অপেক্ষা করত এবং অন্ধকার হলেই আস্তানা থেকে বেরিয়ে যেত এবং দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই সে ফিরে আসত তার আস্তানায়। রাত্রিবেলায় সে কোথায় যেত, কোথায় থাকত বা কি করত এবং তার আস্তানাই বা কোথায় ছিল তা কেউ জানত না। তার নামটাই আসলে ক্লাকেসাস ছিল কিনা তারও কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। একজন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় সে রাগের সঙ্গে বলেছিল, আমার নাম যা-ই হোক তোমার কি? তুমি নিজের চরকায় তেল দাও। সে তার রাতের সহচরদেরও তার আসল নামটা কি তা বলত না। বাবেত বলত, ক্লাকেসাসের দু'রকম গলার স্বর আছে। কাউকে সে তার মুখটাও দেখাতে চাইত না। কেউ তার সামনে আলো নিয়ে এলে সে মুখোশ পরত সঙ্গে সঙ্গে। তার চালচলন সত্যিই বড় রহস্যময় ছিল। রহস্যময়ভাবে ঘুরে বেড়াত সে। সে কথাও বেশি বলত। কথা বলার থেকে খেত বেশি। সে ভূতের মতো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেত কোথায়, আবার হঠাৎ কোথা হতে এসে হাজির হত। মনে হত যেন সে মাটির ভিতর থেকে হঠাৎ উঠে এসেছে। বেচারা মঁতপার্নেসীর জন্য দুঃখ হয়। এদের সবার থেকে ছেলেমানুষ সে। তার বয়স কুড়িরও কম। সুন্দর মুখ। চেরী ফলের মতো লাল ঠোঁট, কালো চুল এবং চোখে ছিল বসন্তদিনের উজ্জ্বলতা। কিন্তু সব রকম পাপ কাজ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত সে। সে ছেলেবেলা থেকেই ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়াত এবং ক্রমে সে মরীয়া হয়ে ওঠে। চেহারাটা তার মেয়েলি ধরনের এবং সুন্দর হলেও বেশ বলিষ্ঠ ছিল। সে তার মাথায় টুপিটা বাঁ দিকে বাঁকিয়ে পরত বলে ডান দিকের চুলগুলো দেখা যেত। টেলকোটটা বেশ সুন্দর ছিল। সেও যখন-তখন মানুষ খুন করত এবং তার অপরাধের একমাত্র কারণ ছিল ভাল ভাল পোশাক পরার ইচ্ছা। যে মেয়ে প্রথম তার সুন্দর চোখের মোহে মুগ্ধ হয় সে-ই তার মধ্যে কামনার আগুন জ্বেলে দেয়। তার চেহারাটা সুন্দর বলে সে ভাল ভাল পোশাক পরে নিজেকে সাজাতে চাইত। কিন্তু রুজি-রোজগারের কোনও চেষ্টা ছিল না বলে টাকার জন্য তাকে অপরাধ করতে হত। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই কয়েকটা খুন করার কৃতিত্ব অর্জন করে। তার মাথায় ছিল ঢেউ খেলানো চুল, কোমরটা সরু, বুক এবং কাঁধ প্রুশিয়ার সামরিক অফিসারদের মতো। তার গলবন্ধনীটা সুন্দর করে লাগানো থাকত। কোটের বোতামে একটা ফুল লাগানো থাকত। মেয়েরা তার প্রশংসা করত। মঁতপার্নেসী ছিল যেন এক অন্ধকার জগতের ফোটা ফুল।

৪

এই চারজনে মিলে একটা দল করেছিল। তারা আইনকে ফাঁকি দিয়ে ছদ্মবেশে বনে-পাহাড়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াত। তারা যে কোনও সময়ে নিজেদের নামগুলো পাল্টে ফেলত এবং পোশাক পরিবর্তন করে পুলিশের চোখে ধুলো দিত। এক একসময় এক একরকম কৌশল অবলম্বন করত। তারা কখনো একা একা থাকত, আবার কখনো বা একসঙ্গে থাকত। যেন একই রাক্ষসের চারটে মুখ।

বাবেত, গুয়েলেমার, ক্লাকেসাস আর মঁতপার্নেসী এই চারজনে মিলে নানারকম অপরাধের এক প্রধান কার্যালয় গড়ে তুলেছিল। যারা তাদের মতো অপরাধ করে তাদের কুটিল উচ্চাভিলাষ পূরণ করে পারদর্শিতা দেখাত, তারাই ছিল তাদের কাছে আদর্শ মানুষ। তারা নানাভাবে মানুষকে ফাঁদে ফেলত অথবা পিছন থেকে ছুরি মারত। তারা একবার কোনও অপরাধের পরিকল্পনা করলে তা যেমন করে হোক কার্যকরী করে তুলত। কোনও কাজে কোনও বেশি লোকের দরকার হলে সে লোক যোগাড় করে ফেলত। কিছু বাড়তি লোক সব সময়ই তাদের হাতের কাছে থাকত।

রাত্রি হলে সালপেত্রিয়েরের একটা পোড়ো পতিত জমিতে চারজনে জড়ো হয়ে তারা কি করবে না করবে তা ঠিক করত। রাত্রিকালই ছিল তাদের কর্মকাল। দিন হলেই যেমন ভূতপ্রেত আর চোরেরা অদৃশ্য হয়ে যায় তেমনি তারাও অদৃশ্য হয়ে যেত দিনের বেলায়। এই চারজনের দলকে এককথায় বলা হত 'পেত্রনমিনেত্তে'। একবার জেলে অ্যাসাইজ কোর্টের প্রেসিডেন্ট লামেনেয়ারকে একটা অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করেন। লামেনেয়ার বলে, এ অপরাধ সে করেনি। তখন প্রেসিডেন্ট তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এ অপরাধ তাহলে কে করেছে? লামেনেয়ার তখন বলে, তাহলে পেত্রনমিনেত্তে করে থাকবে। তার এক কথা ম্যাজিস্ট্রেট বুঝতে না পারলেও পুলিশ বুঝতে পারে। কারণ পুলিশ জানত পেত্রনমিনেত্তে কি এবং তার সদস্য কারা। এই দলের লোকদের নামগুলো আজও পুলিশের খাতায় লেখা আছে। তারা সভ্যতার নিচের তলায় এক অন্ধকার জগতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠে। তাদের কারো কোনও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলে কিছু নেই। তারা সবাই মিলে একটা শ্রেণীকে গড়ে তুলেছে। তাই তাদের সকলের মধ্যে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকটিত দেখা যায়। সারারাত চুরি, জুয়োচুরি, খুন প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজে ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে সকাল থেকে প্রায় সারাদিন ঘুমোয় তারা, ফলে দিনের বেলায় পথে কেউ তাদের দেখতে পায় না। তারা প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন নাম নিয়ে। তারা আছে এবং যতদিন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন না হবে ততদিন তারা থাকবে। তাদের একটা দল চলে গেলে আর একটা দল আসবে তাদের জায়গায়। পকেট মারা ও গলা কাটার কাজে সমান দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের। কার কোন পকেটে টাকা আছে তা তারা আগে ঠিক করে নেয়। সোনা-রুপো থাকলে যেন তার গন্ধ পায় তারা। শহরের নিরীহ লোকদের দেখলেই তারা চিনতে পারে এবং তাদের পিছু নেয়। কোনও বিদেশী অথবা গ্রাম থেকে আসা কোনও লোক দেখলেই শিকার দর্শনে উল্লসিত মাকড়সার মতো কাঁপতে থাকে তারা।

যে সব লোক তাদের গভীর রাত্রিতে কোনও নির্জন জায়গায় দেখে তারা ভয় পেয়ে যায়। তারা সত্যিই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তারা যেন সত্যিকারের মানুষ নয়, অন্ধকারের জীব। ছায়াশরীর। অন্ধকার থেকে কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দানবিক জীবন যাপন করতে এসেছে।

এইসব অশুভ প্রেতাত্মাদের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার উপায় কি? এর

একমাত্র উপায় আলো, আরও আলো। কোনও বাদুড় কখনো সকালের আলোর সামনে দাঁড়াতে পারে না। সমাজের নিচের তলার সেই অন্ধকার স্তরগুলিকে এক বিরাট আলোকবন্যার দ্বারা আমরা প্লাবিত করে দিতে পারব যেদিন একমাত্র সেইদিন ঐ সব অন্ধকারের অবাঞ্ছিত জীবগুলো চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে নিঃশেষে ও নিশ্চিহ্নভাবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

দেখতে দেখতে গ্রীষ্ম ও শরৎ কেটে গিয়ে বসন্ত এল। কিন্তু মঁসিয়ে লেবলাঁ বা তার মেয়ে কেউ একটি দিনের জন্যও লুক্সেমবুর্গ বাগানে এল না। মেরিয়াসের মনে তখন শুধু একটা চিন্তাই ছিল। কখন এবং কি করে মেয়েটির সুন্দর মুখখানা আবার দেখতে পাবে। সে বহু জায়গায় খোঁজ করে, তার খোঁজে অনেক অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কোথাও খোঁজ পায়নি তাদের। ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করার মতো সাহস তার ছিল না, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার মতো যৌবনসুলভ শক্তিও ছিল না তার। তার মন শুধু আকাশকুসুম কল্পনা করাতেই নিরত ছিল সব সময়। হতাশমগ্ন পথকুকুরের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার জীবন হয়ে উঠল অর্থহীন। যে কোনও কাজ তার কাছে হয়ে উঠল বিতৃষ্ণাজনক, পথ হাঁটা হয়ে উঠল বিরক্তিকর। বিস্তৃত উদার দিগন্তসমন্বিত যে বিরাট প্রকৃতিজগৎ একদিন আলো ও অর্থে পরিপূর্ণ ছিল তার কাছে, আজ তা সব অর্থ হারিয়ে শূন্য হয়ে উঠল। জগৎ ও জীবনের সব কিছু থেকে যেন সব অর্থ উবে গেছে।

তবু সে ভাবত। নির্জন চিন্তায় মগ্ন হয়ে উঠত মাঝে মাঝে। কারণ না ভেবে পারত না। কিন্তু চিন্তা-ভাবনায় আর কোনও আনন্দ পেত না সে। কোনও চিন্তা বা পরিকল্পনা তার মনে এলেই শুধু তার মনে হত, কি হবে তাতে।

নিজেকে নিজে প্রায়ই ভৎসনা করত। মেয়েটিকে চোখে দেখেই যখন আনন্দ পেত তখন কেন তাকে অনুসরণ করতে গেল ? মেয়েটিও যখন তার দিকে তাকিয়েছিল তখন সেইটাই কি যথেষ্ট ছিল না ? তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সেও তাকে ভালবাসে, আবার কি চায় সে ? সে ভুল করেছে, নিজেকে সে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে। আজকের এ দুঃখ তারই সৃষ্টি। কুরফেরাককে সে কিছু না বললেও কুরফেরাক তার এই ব্যাপারটার কিছু জানতে পেরেছে অনুমানের মাধ্যমে। কারণ এ সব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে তার। প্রথমে কুরফেরাক এজন্য অভিনন্দন জানায় তাকে। তার প্রেমে পড়ার ব্যাপারে সে অবশ্য কিছুটা আশ্চর্য হয়ে যায়। পরে তার দুঃখ দেখে সে দমে যায়। সে বলে, তুমিও তো আমাদের মতো মানুষ। চল আমরা একবার শমিয়ের দিয়ে বেড়িয়ে আসি।

একবার কোনও এক শরতের উজ্জ্বল দিন দেখে সে বাল দ্য স্কিও দিয়ে কুরফেরাক বোসেত আর গ্রান্তেয়ারের সঙ্গে বেড়াতে যায়। তার প্রবল আশা ছিল সে হয়ত

সেখানে দেখতে পাবে মেয়েটিকে। গ্রান্তেয়ার একবার তার বন্ধুদের কাছে বলেছিল, ওখানে অনেক হারানো মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যায়।

সেখানে গিয়ে মেরিয়াস তার বন্ধুদের ছেড়ে দিয়ে পথের গাড়িঘোড়া আর মানুষের ভিড় এড়িয়ে গাছপালায় ঘেরা এক নির্জন জায়গায় চলে যায়। এইভাবে তার তপ্ত আবেগকে শীতল করতে চায় সে।

এরপর থেকে সে শুধু নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে নিজের দুঃখের কথাটাই ভাবতে লাগল। খাঁচাবন্দী নেকড়ের মতো দুঃখের প্রাচীরঘেরা একটা ঘরের মধ্যে যেন নিবিড় যন্ত্রণার আঘাতে মুচড়ে উঠতে লাগল। তবে মাঝে মাঝে সে তার আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদের খোঁজ করে বেড়াতে লাগল।

একদিন একটি ঘটনায় চমকে উঠল সে। বুলভার্দ দু লুক্সেমবুর্গ অঞ্চলে একদিন সে শ্রমিকের পোশাকপরা এক প্রৌঢ় লোককে দেখতে পেল। তার টুপির তলায় মাথার পাকা চুলগুলো বেরিয়েছিল। লোকটি ধীর পায়ে পথ হাঁটছিল। হযত সে কোনও বেদনার্ত চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিল। মেরিয়াসের মনে হলো লোকটি মঁসিয়ে লেবলাঁ। সেই চুল আর চেহারা ঠিকই আছে। শুধু মুখখানা আরও বিষণ্ন দেখাচ্ছে। কিন্তু শ্রমিকের পোশাক পরে আছে কেন? এটা কি ছদ্মবেশ? মেরিয়াস আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল। কিন্তু সে বুঝল এখন তাকে বিস্ময়ের সব ঘোর কাটিয়ে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ভদ্রলোকের পিছু পিছু গিয়ে সে কোথায় থাকে তা দেখতে হবে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সে দেখল মঁসিয়ে লেবলাঁ একটা পাশের গলিপথ দিয়ে চলে গেছে। কোনদিকে গেছে তা বুঝতে পারল না সে। এই ঘটনার কথাটা কয়েকদিন তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ছিল। তারপর সে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলল মন থেকে। ভাবল সে হয়ত ভুল দেখেছে।

২

মেরিয়াস তখনো গর্বো অঞ্চলের সেই বাড়িটাতেই ছিল। বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটের সম্বন্ধে তার কোনও খেয়াল বা হুঁশ ছিল না। সেই সময় গোটা বাড়িটার মধ্যে সে আর জনদ্রেত্তে ছাড়া আর কোনও ভাড়াটে ছিল না। জনদ্রেত্তে ছিল সেই দুস্থ পরিবারের কর্তা যে পরিবারে ছিল বাবা-মা আর দুটি মেয়ে, কিছুদিন আগে সে যে পরিবারকে বাড়ি ভাড়া মেটানোর জন্য তিরিশ ফ্রাঁ দিয়ে সাহায্য করেছিল এবং যে পরিবারের লোকদের সঙ্গে সে কোনওদিন কথা বলেনি। বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা ভাড়া না দিতে পারার জন্য বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র উঠে গেছে।

তখন ছিল শীতকাল। ফেব্রুয়ারির একটি দিন। সেদিন সকাল থেকে সূর্য লুকোচুরি খেলছিল আকাশে। সূর্যের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছিল এর পর কয়েক সপ্তা ধরে আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা থাকবে। সেদিন ছিল প্রাচীন ক্যান্ডলমাস উৎসবের দিন।

সন্ধে হতেই বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল মেরিয়াস। আর কোনও কাজ না থাকায় সন্ধে হলেই হোটেলে রাতের খাওয়াটা সারতে যায় সে। যাবার সময় মাদাম বুগনল

ঘর ঝাঁট দিতে দিতে তাকে বলল, আজকালকার দিনে একটা জিনিসই সস্তা পাওয়া যায়। সেটা হলো মানুষের শ্রম আর দুঃখকষ্ট। এটা তুমি বিনা পয়সাতেই পেতে পার।

মেরিয়াস ধীর পায়ে ব্যারিয়ের অঞ্চলে অবস্থিত র‍্যু সেন্ট জাক হোটেলের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। বিষণ্ন চিন্তার ভারে মাথাটা নত ছিল তার। হঠাৎ কুয়াশার মধ্যে দুটি মেয়ে তাড়াহুড়ো করে এসে তাকে দেখতে না পেয়ে ছুটে এসে তার উপর পড়ল। তার গায়ে ধাক্কা লাগল। মনে হলো কিছু একটার ভয়ে মেয়ে দুটি ত্রস্ত হয়ে ছুটে আসছিল। তাদের পোশাক-আশাক বড মলিন ছিল। তাদের মধ্যে একটি লম্বা রোগা এবং আর একটি মেয়ে তাব থেকে ছোট। তাদের দিকে তাকিয়ে মেরিয়াস দেখল, তাদের মুখগুলো ম্লান, চুলগুলো আলুথালু, জামাগুলো ছেঁড়া এবং বোতাম খোলা, পায়ে জুতো নেই। তাদের কথাবার্তার কিছু শুনতে পেল সে।

বড মেয়েটি বলছিল, ওরা আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছিল। আর একটু হলেই ধরে ফেলত।

ছোট মেয়েটি বলল, আমি তো দেখতেই পাইনি এবং মোটেই ছুটিনি।

তাদের কথা থেকে মেরিয়াস বুঝল পুলিশ তাদেব ধরতে এসেছিল এবং তারা কোনওক্রমে পালিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁডিয়ে মেয়ে দুটির চলে যাওয়ার পথপানে তাকিয়ে রইল। তারপর সেখান থেকে তার পথে চলে যাবার জন্য পা বাডাতেই একটা কাগজের মোডক পথের উপর দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিল। তার মনে হলো তার মধ্যে কাগজ আছে।

দুটি মেয়ের মধ্যে একজনের হাত থেকে পডে গেছে কাগজটা। মেরিয়াস তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাদের ডাকতে ডাকতে ছুটে গেল। কিন্তু তারা শুনতে পেল না। তখন সে কাগজের মোডকটা তার পকেটে রেখে রাখল। কিছুদূর গিয়ে সে দেখল একটি শিশুর মৃতদেহভরা একটি কফিন তিনটি চেয়ারের উপর পথের ধারে নামানো রয়েছে। পাশে একটা বাতি জ্বলছে। এ দশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মেয়ে দুটির কথা মনে পড়ল।

সে ভাবল, হায় দুঃখী মারা। যে মারা নিজের মৃত সন্তানকে এভাবে ফেলে রেখে চলে যায় তারা কত দুঃখী। তারা কি ভয়ঙ্কর জীবনই না যাপন করে।

এরপর সে এই সব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে এবং এই ঘটনার কথা আর না ভেবে নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল আবার। সে ভাবতে লাগল তার ছয় মাস ধরে চলতে থাকা প্রেমের ব্যাপারটার কথা। যে লুক্সেমবুর্গ বাগানে কত সূর্যালোকিত দিনে গাছের তলায় প্রেমের কত আনন্দোজ্জ্বল অনুভূতি সে উপভোগ করেছে তার কথা সে ভাবতে লাগল।

সে ভাবতে লাগল কত দুঃখময় হয়ে উঠেছে তার জীবন। আমি একদিন যুবতী মেয়েদের দেবদূত ভেবে ছুটে গিয়েছি। একদিন তাদের দেবদূত বলে ভাবতাম। কিন্তু আজ দেখছি তারা আসলে অন্ধকারের জীব।

৩

সেদিন রাত্রিতে বাসায় ফিরে পোশাক ছাড়তে গেলে তার জামার পকেটে সেই কাগজের মোড়কটাতে হাত পড়ল। মেয়েটার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। এবার ভাবল এই কাগজের মধ্যেই হয়ত মেয়েটির ঠিকানা লেখা আছে। এ কাগজ যদি তাদের না হয় তাহলে এর যে মালিক নিশ্চয় তার ঠিকানা আছে।

মোড়কটা আঁটা ছিল না বলে সে খুলে ফেলল সেটা। দেখল তার মধ্যে চারটে চিঠি রয়েছে এবং তাতে প্রাপকের ঠিকানা রয়েছে। চিঠিগুলোর থেকে কড়া সস্তা তামাকের গন্ধ আসছিল।

প্রথম চিঠিটা মাদাম লা মার্কুই প্রুশেরেকে লেখা। তার ঠিকানাটা হলো শাম্রে দে দেপুতের পিছন দিকে। চিঠিগুলোর মধ্যে সে যাদের খুঁজছে তাদের কোনও হদিশ পাওয়া যেতে পারে এই আশায় প্রথম চিঠিটা পড়তে লাগল সে।

মাদাম লা মার্কুই,

মমতা এবং করুণার বন্ধন হচ্ছে এমনই এক বন্ধন যা মানুষের সমাজকে বেঁধে রেখেছে। আমার অনুরোধ, আপনি আপনার মমতাসুন্দর খৃস্টীয় চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একবার এক হতভাগ্য স্পেনিয়ার্ডকে দেখুন, সে এক বৈধ আদর্শের প্রতি তার নিবিড় আসক্তি আর অনুরাগের খাতিরে দেহের বহু রক্তপাত করেছে এবং বহু অর্থ ব্যয় করে আজ নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নেই যে আপনার মহান আত্মা এমনই এক হতভাগ্য সৈনিকের অসহায় অসুখী জীবনকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবে যার যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা আছে এবং যে দেশের স্বার্থে অনেক আঘাত সহ্য করে সম্মান অর্জন করেছে। মাদাম লা মার্কুই তাঁর দেশবাসীর জন্য যে মানবতা ও সহানুভূতি অনুভব করেন এবং যার কথা সুবিদিত সারা দেশে, তার উপর এই সৈনিকের প্রভূত আস্থা আছে। তার একান্ত আশা তার এই আবেদন ব্যর্থ হবে না এবং মাদামের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত তাঁর স্মৃতি চিরদিন পোষণ করে যাবে তার অন্তরে।

আপনার প্রতি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি নিজে এ পত্রে স্বাক্ষর করলাম।

ডন আলভার্তেজ,

স্পেনীয় অশ্বারোহী বাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেন, দেশের স্বার্থে যে রাজতন্ত্রী শরণার্থী হিসাবে বর্তমানে ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, কিন্তু অর্থাভাবে সে আর বেশি অগ্রসর হতে পারছে না।

স্বাক্ষরের তলায় কোনও ঠিকানা নেই।

এবার দ্বিতীয় চিঠিখানি পড়তে লাগল মেরিয়াস। দ্বিতীয় চিঠিখানি মাদাম লা কোঁতেসী দ্য মঁতভানেতকে লেখা। প্রাপকের ঠিকানা হলো ৯, র‍্যু কাসেত্তে।

মাদাম লা কোঁতেসী,

আমি ছয়টি সন্তানের জননী। আমার শেষ সন্তানটির বয়স হলো মাত্র আট মাস। সে এখন অসুস্থ। পাঁচ মাস আগে আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করে চলে যায়।

বর্তমানে আমি ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছি, হাতে একটি পয়সাও নেই। মাদাম লা কোঁতেসীর বদান্যতার নিকট আমি কাতর আবেদন জানাচ্ছি।

প্রথম দুটি চিঠির মতো তৃতীয়টিও এক ভিক্ষাপত্র।

তৃতীয় চিঠিখানি মঁসিয়ে পাবুরগতকে লেখা। তার ঠিকানা রু্য সেন্ট ভেনিস। তাতে লেখা আছে—

আমি এমনই একজন সাহিত্যিকের পক্ষ থেকে আপনার নিকট এই আবেদনপত্র পাঠাচ্ছি যিনি থিয়েটার ফ্রাঁশোয়াতে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য উপস্থাপিত করেছেন। এই নাটকটি ঐতিহাসিক এবং এর ঘটনাস্থল হচ্ছে সম্রাটের শাসনাধীন অভার্নে। আমার মতে নাটকটির আঙ্গিক হচ্ছে বাস্তবানুগ এবং এর মধ্যে বস্তু আছে। নাটকের চারটি জায়গায় গান আছে। হাস্যরস, নাটকীয়তা এবং বিস্ময় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে মিশে আছে। পটভূমিকা ও আঙ্গিকের মধ্যে রোমান্টিকতার সুবাস আছে। কয়েকটি দৃশ্যে বিস্ময়ের চমক সৃষ্টি করে নাটকটি পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

যে সব কামনা বাসনা আপনাদের এই শতকের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে সেই কামনা[illegible] পরিতৃপ্ত করাই হলো আমার প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের যে সব রীতিনীতি যখন-তখন বদলায় সেই সতত পরিবর্তনশীল রীতিনীতিকে তুলে ধরতে চেয়েছি আমি। কিন্তু আমার নাটকে এই সব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও আমার ভয় হয় প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ঈর্ষা ও লোভের জন্য আমার নাটকটি প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। নবাগতদের সঙ্গে তারা কেমন ব্যবহার করে, তাদের কিভাবে দেখে তা আমার জানা আছে।

শিল্পকর্মের প্রতি আপনার অনুরাগের কথা জেনে আমি আমার মেয়েকে আপনার নিকট পাঠালাম। সে আমাদের দুরবস্থার কথা সব জানাবে। এই শীতে খাদ্য এবং তাপ নেই আমাদের। আমার প্রার্থনা আপনি আমাকে আমার এই নাটকটি আপনাকে উৎসর্গ করার অনুমতি দান করবেন। আমার অন্যান্য নাটক[illegible] আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবশত আপনার জন্যই রচনা করব। এর দ্বারা বোঝা যাবে আমি আ[illegible]র সাহায্যের কতখানি প্রত্যাশা করি এবং আমার লেখার সঙ্গে আপনার নামটিকেও অলঙ্কৃত করে রাখতে চাই। আপনি যদি আমাকে কিছু সাহায্য করেন তাহলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত আমি আপনার জন্য একটি প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করব। কবিতাটি নাটকের প্রথমেই সংযোজিত হবে এবং সেটি মঞ্চে আবৃত্তি হবে।

পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে

সাহিত্যিক জেনফ্লট

পুনশ্চ:—অন্তত চল্লিশ স্যু দয়া করে দেবেন।

আমি নিজে যেতে না পারার জন্য [illegible] করবেন। উপযুক্ত পোশাক না থাকার জন্য আমি যেতে না পেরে আমার মেয়েকে পাঠালাম।

চতুর্থ চিঠিখানি এক পরোপকারী ব্যক্তিকে লেখা।

পরোপকারী মহানুভব মহাশয়,

আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার মেয়ের সঙ্গে আসেন তাহলে এক বিপর্যস্ত জীবনের

চিত্র দেখতে পাবেন স্বচক্ষে। আমি আমার পরিচয়পত্র আপনাকে দেখাব। আমি জানি এই চিঠিখানি আপনার উদার আত্মাকে পরোপকারে অনুপ্রাণিত করবে। কারণ দার্শনিক প্রকৃতির মানুষরা সহজেই প্রবল আবেগে বিচলিত হন।

আপনি হয়ত এ বিষয়ে একমত হবেন যে নির্মম প্রয়োজনের খাতিরে মানুষকে দুঃখের সঙ্গে কোনও সদাশয় ব্যক্তির দয়ার প্রত্যাশী হতে হয়। আমাদের চরমতম দুরবস্থার কালে অপরের সাহায্য প্রত্যাশা না করে নির্দ্বিধায় অনাহারে মরতে পারি না। নিয়তি কারো প্রতি নিষ্ঠুর এবং কারো প্রতি সদয় —এইটাই দুনিয়ার নিয়ম।

আমি আপনার আগমন অথবা দানের প্রতীক্ষায় আছি। আপনি যদি দযা কবে আপনাব প্রতি নিবেদিত আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করেন তাহলে বিশেষ বাধিত হব।

আপনার একান্ত বিনযাবত ও অনুগত ভৃত্য
পি ফাবান্ত, নাট্যশিল্পী

চারটি চিঠি পডার পর মেরিযাস দেখল সে যা খুঁজছিল তা পেল না। এই চিঠিগুলির কোনওটিতে পত্রপ্রেরকদের ঠিকানা নেই। তবু বিভিন্ন দিক দিয়ে চিঠিগুলি আগ্রহজনক এবং কৌতূহলোদ্দীপক। যদিও চারটি চিঠি পৃথক পৃথক চারজন লোকের জবানীতে লেখা তবু হাতের লেখা এক এবং একই হলদে মোটা কাগজে লেখা। চারটে চিঠি হতেই তামাকের গন্ধ আসছিল। যদিও বিভিন্ন চিঠিতে বিভিন্ন লেখার ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হযেছে তথাপি সব চিঠিতে একই ধরনের বানান ভুল দেখা যায়। সব দেখে মনে হয় চিঠিগুলি একই লোকের লেখা।

মেরিয়াস দেখল এই সব চিঠির রহস্যটা তুচ্ছ এবং এ নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মন-মেজাজ এমনই বিষাদগ্রস্ত হযে ছিল যে প্যারিসের কোনও এক পথে কুড়িয়ে পাওয়া এই রসিকতায় যেন মন ভুলল না। গতকাল সন্ধ্যায় পথে যে মেযে দুটি ব্যস্ত হয়ে তার কাছে এসে পড়ে এই চিঠিগুলি যে তাদের তার কোনও প্রমাণ নেই। আসলে এই চিঠিগুলোর কোনও মূল্য বা তাৎপর্যই নেই। সে তাই চিঠিগুলো সেই মোড়কের মধ্যে ভরে রেখে ঘরের কোণে ফেলে রেখে বিছানায় শুতে চলে গেল।

পরদিন সকাল সাতটার সময় যখন সে পোশাক পরে প্রাতরাশ খেতে খেতে তার কাজের কথা ভাবছিল তখন হঠাৎ দরজায় বাইরে থেকে কে টোকা দিল। দরজায় খিল ছিল না। ঘরে কোনও দামী জিনিস বা বেশি টাকাকড়ি নেই বলে সে ঘরে খিল না দিয়েই শুত। এজন্য মাদাম বুগনল একবার প্রতিবাদ করে এবং তারপর তার এক জোড়া নতুন জুতো চুরি যায়।

দ্বিতীয়বার তার দরজায় টোকা পড়ল। মেরিয়াস ভাবল মাদাম বুগনল ডাকছে তাকে। সে তাই ঘরের ভিতর থেকে বলল, ভিতরে এস।

বাইরে থেকে এক নারীকণ্ঠ বলল, মাপ করবেন মঁসিয়ে।

মেরিয়াস বুঝল এ কণ্ঠস্বর মাদাম বুগনলের নয়। এ কণ্ঠস্বর যেন কোনও ব্রঙ্কাইটিসের রোগীর।

সে চোখ তুলে দেখল একটি মেয়ে তাকে ডাকছে।

৪

এক তরুণী দরজার উপর এসে দাঁড়িয়েছিল। দরজার উল্টোদিকের জানালা দিয়ে আসা একঝলক আলো এসে পড়েছিল তার মুখের উপর। তার চেহারাটা খুব রোগা। একটা শেমিজ আর স্কার্ট ছাড়া তার গায়ে আর কিছু ছিল না। সে শীতে কাঁপছিল। তার কোমরে একটা দড়ি বাঁধা ছিল; আর একটা দড়িতে তার মাথার চুলগুলো বাঁধা ছিল। শেমিজের ফাঁক দিয়ে তার কাঁধের হাড়গুলো দেখা যাচ্ছিল। তার হাতদুটো আলোর ছটায় লালচে দেখাচ্ছিল। তার মুখে কয়েকটা দাঁত ছিল না। চোখদুটো কোটরাগত আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বয়সে সে একজন বালিকা হলেও তার চোখদুটো ছিল বয়স্ক মহিলার মতো। পনের আর পঞ্চাশ বছরের সব পার্থক্য যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে। তার শীর্ণ চেহারাটা যে একবার দেখবে সেই কেঁপে উঠবে।

মেরিয়াস উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল মেয়েটি যেন স্বপ্নে দেখা অন্ধকারের এক প্রেতমূর্তি। মেয়েটি সম্বন্ধে সবচেয়ে মর্মান্তিক এই যে তাকে এমন কুৎসিত দেখালেও সে কুৎসিত হয়ে জন্মায়নি। শৈশবে সে হয়ত সুন্দরী ছিল। কিন্তু বর্তমানে নিঃসীম দারিদ্র্য আর দুরবস্থার ক্রমাগত আঘাতে তার চেহারাটা এখন অকালবৃদ্ধ ও কুৎসিত হয়ে উঠেছে। তার ষোল বছরের মুখখানায় অবশিষ্ট সৌন্দর্যের একটা ছাপ তখনো ফুটে ছিল যেমন কোনও শীতের সকালে মেঘের আড়ালে এক বিরল সূর্যরশ্মি উঁকি মারে।

মুখখানা চেনা চেনা মনে হলো মেরিয়াসের। আগে যেন কোথায় দেখেছে তাকে।

মেরিয়াস বলল, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি ম্যাদমযজেল?

মেয়েটি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আপনার জন্য একটা চিঠি আছে মঁসিয়ে।

তাহলে মেয়েটি তার নাম জানে। কিন্তু তাহলে কি করে তার নাম জানল?

কোনও আহ্বানের অপেক্ষা না করেই মেয়েটি ঘরে ঢুকে পড়ল। তার ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে হাঁটুটা দেখা যাচ্ছিল। শীতে কাঁপছিল সে।

তার হাত থেকে চিঠিটা নিল মেরিয়াস। তাতে লেখা ছিল,

আমার সদয় সহৃদয় প্রতিবেশী, পরম শ্রদ্ধেয় যুবক:

আজ থেকে ছয় মাস আগে আপনি আমার বাকি বাড়িভাড়া দয়া করে মিটিয়ে দিয়ে আমার যে উপকার করেছিলেন সেকথা আমি শুনেছি। এর জন্য আমি আপনাকে আশীর্বাদ করছি। আমার বড় মেয়ের মুখ থেকে শুনবেন আজ দু'দিন আমাদের খাওয়া হয়নি। আমার রুগ্ন স্ত্রীকে নিয়ে আমরা চারজন। মানবতার প্রতি বিশ্বাস করে আমি যদি কোনও ভুল না করে থাকি তাহলে ধরে নেব আপনার উদার অন্তঃকরণ

অবশ্যই আমাদের এই দুরবস্থার দ্বারা বিচলিত হবে এবং আপনি অবশ্যই আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।

আপনার মানবতাবোধে আমার বিশ্বাস জানিয়ে এইখানেই চিঠি শেষ করছি আমি।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত

জনদ্রেত্তে

পুনশ্চ: আমার কন্যা আপনার সেবাদানে সতত প্রস্তুত মঁসিয়ে।

যে সমস্যার দ্বারা বিব্রত হয়ে পড়েছিল মেরিয়াস এই ঘটনা সেই সমস্যার উপর আলোকপাত করল। এখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠল তার কাছে। এই চিঠিখানি অন্যান্য চিঠিগুলির উৎস—সেই এক হাতের লেখা, এক আবেদন, এক কাগজ, এক তামাকের গন্ধ। মোট পাঁচখানি চিঠি একই লোকেব লেখা। যে চারটি লোকের জবানীতে চারখানি চিঠি লেখা হয়েছিল সেই চারটি লোকই হলো জনদ্রেত্তে।

আমবা আগেই বলেছি মেরিয়াস তার বাসার আশেপাশের অন্যান্য ভাডাটেদের প্রতি কোনওদিন কোনও মনোযোগ দেয়নি। তার চিন্তা সব সময অন্যত্র কেন্দ্রীভূত ছিল। যদিও সে বারান্দায জনদ্রেত্তের পরিবারের মেযেদের এর আগে দেখেছে তথাপি সে তাদের কখনো ভাল করে দেখেনি। ফলে গত সন্ধ্যায তাদের রাস্তায় দেখে চিনতে পারেনি। আজও যখন একটি মেয়ে তার ঘবে এসে চিঠিটি দিল তখনো সে তাকে চিনতে পারল না।

এখন সে সবকিছু বুঝতে পারল। সে বুঝল জনদ্রেত্তেব কাজই হলো ধনী লোকদের ঠিকানা যোগাড কবে চিঠি লিখে তার মেয়েদের তাদেব কাছে পাঠানো। জীবনের সঙ্গে জুযাখেলায সে তার মেয়েদের এইভাবে ব্যবহাব করত। গতকাল সন্ধ্যায় তাব মেয়ে দুটি চিঠিগুলি নিযে যাচ্ছিল। আমাদের সমাজের মধ্যে এই দুটি দুস্থ মেযে গত সন্ধ্যায় সব স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হয়ে নারীসুলভ সব শালীনতা ও দাযিত্ববোধ হারিযে দুটি দানবীতে পরিণত হয় যাদের বালিকা বা পূর্ণবয়স্কা মহিলা, ভাল বা মন্দ, নির্দোষ বা দুষ্ট প্রকৃতির কোনওটাই বলা যায় না। তাদের আত্মাগুলি ফুলের মতো ফুটে উঠে একদিনের মধ্যেই পথের উপর ম্লান হযে ঝরে পড়ে।

ইতিমধ্যে মেরিযাস যখন মেয়েটিকে এক বেদনার্ত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল, মেযেটি তখন এক উদ্ধত প্রেতের মতো তার দীনহীন অবস্থাব কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হযে ঘরখানা খুঁটিযে দেখছিল। চেয়ারগুলো সরিয়ে মেরিয়াসের পোশাকগুলো আঙুল দিয়ে টিপে, ড্রয়ারের উপর রাখা প্রসাধনদ্রব্যগুলোয় চোখ বুলিযে কি সব দেখছিল। সে একসময় বলল, আমি দেখছি, আপনার একটা আয়না রযেছে।

বাজে গলায় সে বাজারের চলতি গানের দু' একটা লাইন গুনগুন করে গাইছিল। যেন সে সব ঘরখানার মধ্যে একা আছে। তার গলা মিষ্টি না হওয়ার জন্য সে গান ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছিল। কিন্তু তার এই নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের অন্তরালে একটা গোপন লজ্জা আর অস্বস্তি লুকিয়ে ছিল। তাছাড়া ঔদ্ধত্য একদিক দিয়ে লজ্জার বিকৃত অভিপ্রকাশমাত্র। মেয়েটি যগন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখে ধাঁধা-লাগা ভগ্নপক্ষ

এক পাখির মতো সমস্ত ঘরখানা জুড়ে সকরুণভাবে উড়ে বেড়াচ্ছিল তখন তাকে দেখতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল মেরিয়াসের। পরিবেশ যদি ভিন্ন হত এবং তার যদি শিক্ষাদীক্ষা কিছু থাকত তাহলে তার সহজ সরল আনন্দোচ্ছলতা সত্যিই বড মধুর এবং মনোহর হয়ে উঠত।

মেরিয়াস যখন বসে বসে এই সব ভাবছিল আর মেয়েটিকে দেখছিল সে তখন তার কাছে সরে এসে বলল, বই!

তার মেঘাচ্ছন্ন ম্লান চোখে যেন একটা আলোর তরঙ্গ খেলে গেল। সে কিছুটা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করল, আমি পডতে জানি।

টেবিলের উপর থেকে একটা বই তুলে নিয়ে সে সহজভাবে পডতে লাগল, 'ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত শ্যাতো দ্য হুগোমঁত বাহিনীব পাঁচটি দল নিয়ে শত্রুঘাঁটি আক্রমণ ও দখল করার জন্য জেনারেল বদিনকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল।'

হঠাৎ পডা থামিযে সে বলে উঠল, ওয়াটারলু! আমি জানি, এটা এক যুদ্ধের নাম। আমার বাবা সৈন্যদলে কাজ করতেন এবং ঐ যুদ্ধে ছিলেন। আমবা হচ্ছি আসল বোনাপার্টপন্থী। ওযাটারলুতে ফরাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

এবার সে বইটা নামিযে কলমটা তুলে নিযে বলল, আমি লিখতেও জানি। আপনি দেখবেন?

মেরিয়াস কিছু বলার আগেই সে লিখল, বাইরে তাকিয়ে দেখ, তোমার চারদিকে পুলিশবাহিনী রয়েছে।

এরপর কলমটা হাত থেকে নামিযে রেখে বলল, কোনও বানান ভুল নেই। আপনি দেখতে পারেন। আমি আর আমার বোন কিছুদিন স্কুলে পডাশুনো করেছি। এখনকার মতো আমরা ছিলাম না।

হঠাৎ সে থেমে গিযে মেরিযাসের দিকে তাকিযে জো হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, নরক। তার সে কণ্ঠে তীব্র বেদনার উর্ধ্বে এক তীব্র হতাশা ফুলে ফুলে উঠছিল।

মেয়েটি আবার বলতে লাগল, আপনি থিযেটারে যান মঁসিযে মেরিযাস? আমি যাই। আমার এক ছোট ভাই আছে। তার সঙ্গে দু'একজন অভিনেতার আলাপ পবিচয় আছে। সে আমাকে টিকিট এনে দেয়। আমার গ্যালারিতে বসতে মোটেই ভাল লাগে না। সেখানে লোকের বড ভিড। তাদের গা থেকে দর্গন্ধ বার হয়।

মেরিয়াসের দিকে লজ্জামদির দৃষ্টিতে তাকিযে বলল, জানেন মঁসিয়ে মেরিয়াস, আপনি খুব সুন্দর।

কথাটা বলে সে হাসতে লাগল আর মেরিয়াস লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে মেরিযাসের আরও কাছে সরে এসে তার কাঁধের উপর একটা হাত দিয়ে বলল, আপনি কখনো আমার দিকে তাকান না।

কিন্তু আমি আপনাকে সিঁডিতে উঠতে প্রায়ই দেখি। অস্টারলিৎস অঞ্চলে পীয়ের

মেবুফ নামে এক বৃদ্ধের সঙ্গে আপনাকে বেড়াতে দেখেছি। আপনার চুলটা অবিন্যস্ত ও অপরিচ্ছন্ন থাকলে আপনাকে ভাল দেখায়, এটা হয়ত আপনি জানেন!

সে তার গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব নরম করার চেষ্টা করলেও তার সব দাঁত না থাকার জন্য সব কথা শোনা যাচ্ছিল না।

এতক্ষণে কথা বলল মেরিয়াস। সে স্বাভাবিক নীরস গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, আমার কাছে তোমার একটা জিনিস আছে ম্যাদময়জেল। তুমি বললে সেটা দিতে পারি।

চারটে চিঠিওয়ালা সেই মোড়কটা মেয়েটির হাতে দিয়ে দিল মেরিয়াস। মেয়েটি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল, এটা আমরা কত খুঁজে বেড়িয়েছি।

মোড়কটা খুলতে খুলতে মেয়েটি বলতে লাগল, হা ভগবান, আমি আর আমার বোন এটা কত খুঁজেছি। আপনি তাহলে এটা বুলভার্দে পেয়েছেন। আমরা যখন ছুটছিলাম তখন আমার বোনের হাত থেকে এটা পড়ে যায়। বাড়িতে গিয়ে দেখি এটা নেই। আমরা মার খাবার ভয়ে বলেছি চিঠিগুলো আমরা দিয়ে দিয়েছি। এখন দেখছি চিঠিগুলো আপনার কাছে রয়েছে। আপনি কি করে জানলেন এগুলো আমাদের চিঠি? অবশ্য হাতের লেখা দেখে। গতকাল সন্ধ্যায় তাহলে আপনার সঙ্গেই আমাদের ধাক্কা লাগে। আমার বোনকে বলেছিলাম, একজন ভদ্রলোক না? আমার বোন বলল, আমারও তাই মনে হয়।

এবার মেয়েটি চিঠিগুলোর থেকে এক পরোপকারী ভদ্রলোককে লেখা চিঠিখানি বার করে বলল, এটি বৃদ্ধকে লেখা যিনি নিয়মিত সমবেত প্রার্থনায় যোগদান করতে যান। এখন সময় হয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরতে হবে। হয়ত তিনি আমাকে যা দেবেন তাতে আমাদের খাওয়া হয়ে যাবে। তার মানে কি আপনি জানেন? গতকাল ও আগের দিন আমাদের কিছুই খাওয়া হয়নি। গতকালকার প্রাতরাশ এবং দুপুরের খাওয়া সব হয়ে যাবে। তার মানে তিন দিনের মধ্যে আজ প্রথম খাব।

মেয়েটির এই কথায় হুঁশ হলো মেরিয়াসের। সে বুঝল মেয়েটি কেন এসেছে তার কাছে। মেয়েটি যখন সমানে কথা বলে যেতে লাগল মেরিয়াস তখন তার পকেটটা হাতড়াতে লাগল।

মেয়েটি বলে যেতে লাগল, এক একদিন রাত্রিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর আমি ফিরি না। গত বছর শীতকালে এ বাড়িতে আসার আগে আমরা একটা পুলের তলায় থাকতাম। শীতে এক জায়গায় জড়োসড়ো হয়ে থাকতাম। শীতে আমার বোন কাঁদতে থাকত। ঠাণ্ডা জল কত ভয়ঙ্কর। তাই নয় কি? এক একবার ভাবি জলে ডুবে মরব, কিন্তু ঠাণ্ডা জলের ভয়ে তা পারি না। যখন আমি রাত্রিকালে বুলভার্দ অঞ্চল দিয়ে হেঁটে যাই তখন দু'পাশের গাছগুলো সূঁচলো বর্শার মতো আমার দিকে যেন তাকিয়ে থাকে। দু'পাশের বাড়িগুলোকে নোতার দ্যাম গীর্জার মতো উঁচু দেখায়। তখন আকাশের তারাগুলো কুয়াশায় ধূমায়িত পথের আলোর মতো মিটমিট করে। এক একসময় মনে হয় লোকে যেন আমার উপর পাথর ছুঁড়ছে। মনে হয় একটা ঘোড়া যেন আমায় তাড়া করছে। আমি তখন ভয়ে ছুটে পালাতে থাকি।

তখন সবকিছু ঘুরতে থাকে আমার চারদিকে। খাবার কিছু না থাকলে সব কিছু বড অদ্ভুত লাগে।

এই বলে মেরিয়াসের দিকে তাকাল সে। মেরিযাস ততক্ষণে পকেট হাতড়ে পাঁচ ফ্রাঁ ষোল স্যু পেল। তখন তার কাছে এই টাকাটা ছিল। সে বুঝল আজকের খাওয়া তার এতেই হয়ে যাবে। কাল যা হয় হবে। সে তার থেকে মাত্র ষোল স্যু রেখে দিয়ে মেয়েটিকে পাঁচ ফ্রাঁ দিযে দিল।

টাকাটা নিযে মেযেটি বলল, অবশেষে সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে। এতেই আমাদের দু'দিনের খাওয়া হযে যাবে। আপনি সত্যিই মহান। এতেই দু'দিনের মতো সবকিছু কেনা হয়ে যাবে।

তার শেমিজটা ঠিক করে নিযে মেরিয়াসকে হাত নেড়ে গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানিয়ে সে চলে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিযে গেল। যাবার পথে ড্রয়ারের উপর একটুকরো বাসি রুটি দেখতে পেযে সে সেটা তুলে নিয়ে খেতে লাগল। এটা শক্ত হলেও চিবনো যাবে।

এই বলে সে চলে গেল।

৫

মেরিযাস পাঁচ বছর ধরে অর্থাভাবে দারুণ কষ্ট পেযেছে। কিন্তু এই মেযেটিকে দেখার আগে আসল দারিদ্র্য কাকে বলে তা সে জানতে পারেনি। শুধু মানুষের কষ্ট দেখলেই হবে না, নারীদের দুঃখকষ্ট সে স্বচক্ষে দেখল।

মানুষ যখন তীব্র প্রযোজন আর অভাবের শেষ প্রান্তে চলে যায়, যখন তারা সব দিক দিযে অসহায় হযে পড়ে তখন কাজ আর বেতন, খাদ্য আর তাপ, সাহস ও শুভেচ্ছা এই সব কিছুর কোনও অর্থ থাকে না তাদের কাছে। তখন তাদের কাছে দিনের আলো ছাযাচ্ছন্ন হযে ওঠে। সব সময একটা অন্ধকার গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে তাদের অন্তরকে। সেই অন্ধকারের মাঝে তারা সব বোধ হারিয়ে ফেলে। তখন তারা নারী ও শিশুদের জোর করে অপমানের পথে ঠেলে দেয। তখন তারা মরীয়া হযে যে কোনও পাপ ও অপরাধের আশ্রয় গ্রহণ করে।

স্বাস্থ্য, যৌবন, সম্মান, সতীত্ব, অন্তরের সততা, কুমারীত্ব প্রভৃতি যে সব গুণগুলি আত্মার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে সে সব গুণগুলিকে তারা অস্তিত্ব রক্ষার এক কৃষ্ণকুটিল সংগ্রামে নিয়োজিত করে। যে কোনও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে তারা। পিতা, মাতা, ভাই, বোন, সব সম্পর্ক, সব পাপ-পুণ্য ধাতুর সঙ্গে মেশানো খাদের মতো মিলে মিশে এক হয়ে যায়। তা তখন সকলে মিলে জড়োসড়ো হয়ে এক জায়গায় থাকে, একে অন্যের পানে ম্লান সকরুণ দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের দেহগুলো কত ম্লান কত হিমশীতল হয়ে ওঠে। সেইসব হতভাগ্যদের দেখে মনে হয় তারা যেন পৃথিবী ও সূর্য থেকে বহু দূরের এক গ্রহান্তরের জীব।

মেরিয়াসের মনে হলো যে মেয়েটি তার কাছে একটু আগে এসেছিল সে যেন

অন্ধকার জগতের এক দূত। সেই ভয়ঙ্কর জগতের একটা দিক উদ্‌ঘাটিত করে গেল তার কাছে। এতদিন সে প্রেমের ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে রেখে তার প্রতিবেশীদের পানে একবারও তাকায়নি। এজন্য তিরস্কার করতে লাগল নিজেকে। এর আগে সে তাদের বাড়িভাড়া মিটিয়ে দিয়েছে ঠিক, কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়, আবেগের বশে সে এটা করে ফেলেছে যান্ত্রিকভাবে, এটা যে কেউ করতে পারবে। তাদের জন্য তার আরও কিছু ভাল করা উচিত ছিল। তার পাশের ঘরেই তারা থাকে, মাঝখানে শুধু একটা ক্ষীণ আবরণ। সেই আবরণের অন্তরালে কয়েকটি অসহায় আত্মা সমগ্র জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকারে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে, তাদের সে সংগ্রামের কিছু কিছু শব্দ সে শুনেছে। তবু তাদের দিকে কোনও মনোযোগ দেয়নি। প্রতিদিন দেওয়ালের ওধার থেকে তাদের যাওয়া-আসার পদশব্দ শুনেছে, তাদের কথাবার্তার আওয়াজ তার কানে এসেছে, কিন্তু সে কথা শুনতে চায়নি। তাদের কথাবার্তার সঙ্গে একটা চাপা আর্তনাদ প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সে তাতে কান দেয়নি। এইসব মানুষগুলি তারই ধর্মভ্রাতা, তারা যখন এক নিবিড় যন্ত্রণায় অসহায়ভাবে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল, তার সব চিন্তা তখন প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিল। তার মনে হলো সে তাদের দুঃখ আর দুর্ভাগ্যকে কমানোর পরিবর্তে বাড়িয়ে দিয়েছে আরও। তার পরিবর্তে এখানে অন্য কোনও সহৃদয় প্রতিবেশী থাকলে সে তার স্বাভাবিক পরোপকার প্রবৃত্তির বশে আত্মচিন্তায় মগ্ন না হয়ে তাদের দুঃখকষ্টের দিকে নজর দিত এবং তাদের দুরবস্থার লক্ষণ দেখে এতদিনে হয়ত তার একটা প্রতিকার করে ফেলত। অবশ্য তাদের দেখে অসৎ এবং দুর্নীতিপরায়ণ মনে হয়, কিন্তু যারা পতনের শেষ সীমায় নেমে যায় তাদের কাছে নীতি-দুর্নীতির কোনও অর্থ থাকে কি? দুর্ভাগ্য আর দুর্নীতি এক হয়ে মিশে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র জগতে পরিণত হয়। যারা সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে নেমে গেছে, যারা পথের মানুষ তারা হয়ত এদের থেকে কম দুঃখী। এর জন্য দায়ী কে?

এই সব কথা যখন ভাবছিল মেরিয়াস, যখন নিজেকে এইভাবে বোঝাচ্ছিল তখন যে দেওয়ালটা জনদ্রেত্তের ঘর থেকে তার ঘরটাকে পৃথক করে রেখেছিল সেই দেওয়ালের দিকে তাকাল, যেন সে তার সহানুভূতিশীল দৃষ্টির উত্তাপ আর নিবিড়তা দিয়ে তাদের দুঃখে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল। ক'টা খুঁটির সঙ্গে ইট দিয়ে গাঁথা দেওয়ালটা পাতলা এবং ওপাশের সব গতিবিধি বোঝা যায় এবং সব কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যায়। মেরিয়াস স্বপ্নালু প্রকৃতির মানুষ বলেই এতদিন সে তা শোনেনি।

সহসা মেরিয়াস দাঁড়িয়ে দেখল মাঝখানের দেওয়ালটার উপর দিকে ছাদের কাছে তিনকোণা একটা ফুটো রয়েছে। সেখানটায় চুন-বালি খসে গেছে। ড্রয়ারের উপরে উঠে দাঁড়ালেই সেই ফুটো দিয়ে ওপাশের ঘরটার সব কিছু দেখা যাবে। কৌতূহল যেন করুণারই অংশবিশেষ। কারো দুঃখের প্রতিকার করতে হলে সে দুঃখ নিজের চোখে দেখা উচিত। ফুটোটা যেন জুডাসের জানালা। মেরিয়াস মনে মনে বলল, ওরা কি ধরনের লোক এবং কি ধরনের দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে তা দেখি একবার।

সে ড্রয়ারের উপর দাঁড়িয়ে ফুটোর কাছে চোখ রেখে ওপাশের ঘরটার দিকে তাকাল।

৬

অরণ্যে যেমন হিংস্র প্রাণীদের কতকগুলো গোপন জায়গা বা গুহা থাকে, নগরের তেমনি কিছু হিংস্র প্রকৃতির লোকদের থাকার জন্য কতকগুলো গোপন আস্তানা থাকে। অরণ্যের গুহাগুলো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে, কিন্তু নগরের ঐ সব আস্তানাগুলো যত সব নোংরা পরিবেশে অবস্থিত এবং দেখতে সেগুলো খুবই কুৎসিত। শহরের নোংরা বস্তির থেকে অরণ্যগুহা অনেক ভাল।

মেরিয়াস তখন ঐ বস্তিরই কথা ভাবছিল।

মেরিয়াস ছিল অবস্থার দিক থেকে গরীব এবং তার ঘরখানাও ভাল পরিবেশের মধ্যে ছিল না। কিন্তু তার দারিদ্র্যের মধ্যে যেমন একটা উদারতা আর সততা ছিল, তেমনি তার ঘরখানার পরিবেশ-প্রতিবেশ নোংরা হলেও সে ঘরখানা মোটের উপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকত।

মেরিয়াস জনদ্রেত্তের যে বাসা-ঘরটার দিকে তাকিয়েছিল, সে ঘরটা ছিল নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধময় এবং সব সময় গোলমালের শব্দে ভরা। সে ঘরে আসবাব বলতে ছিল একটা অশক্ত নড়বড়ে চেয়ার আর একটা টেবিল, কয়েকটা ফাটা ডিশ, দরজার উল্টো দিকে দুটো বিছানা। একটা মাত্র ছোট জানালার কাঁচের অস্বচ্ছ সার্সি দিয়ে যে আলো আসে তা এত অস্পষ্ট যে সে আলোয় কোনও মানুষের মুখটাকে ভূতের মতো দেখায়। চুনবালিখসা দেওয়ালগুলো আহত ও ক্ষতবিক্ষত মানুষের মুখের মতো দেখাচ্ছে। ক্ষত জায়গাগুলো স্যাঁতস্যাঁত করছে। তার উপর আবার কয়লা দিয়ে কে কতকগুলো অশ্লীল ছবি এঁকেছে। দেওয়ালগুলো কুষ্ঠরোগীর মতো ক্ষতবিক্ষত দেখাচ্ছিল।

মেরিয়াসের ঘরের মেঝেটায় টালিগুলোর রং চটে গিয়েছিল কিন্তু জনদ্রেত্তেদের ঘরটার কোনও টালিই ছিল না। উপরে টালি বা সিমেন্টের প্রলেপ না থাকায় মেঝেটায় এবড়ো-খেবড়ো ইটের কুচো দেখা যাচ্ছিল আর পায়ের ধুলোয় কালো হয়ে গিয়েছিল সেটা। ঘরখানায় কোনওদিন ঝাঁট দেওয়া হয় না। তার উপর এখানে-সেখানে ছেঁড়া অব্যবহৃত কিছু পোশাক পড়ে ছিল। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালার একটা জায়গা ছিল এবং তার জন্য বছরে চল্লিশ ফ্রাঁ বাড়তি দিতে হত। চুল্লীটাতে অল্প একটু আগুনে কিছু কাঠ দেওয়া ছিল এবং তার থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছিল। চুল্লীটার আশেপাশে একটা স্টোভ, একটা ঝোল রান্নার প্যান, কিছু কাঠ, একটা পাখির খাঁচা আর কিছু ছাই ছিল।

ঘরখানার আকার বড় হওয়ার জন্য আরও খারাপ লাগছিল। তার অন্ধকার কোণগুলোতে বড় বড় মাকড়শা আর আরশোলা বাসা বেঁধেছিল। আগুনের চুল্লীটার দু'পাশে দুটো বিছানা পাতা ছিল। মেরিয়াস দেখতে পেল একদিকের দেওয়ালে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো একটা রঙিন ছবি ছিল। তার তলায় 'স্বপ্ন' এই কথাটা লেখা ছিল।

ছবিটাতে একটি ঘুমন্ত নারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে যার কোলে একটি শিশু ঘুমোচ্ছে। তাদের মাথার উপরে একটা ঈগল তার ঠোঁটে করে একটা মুকুট নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। ঘুমের মধ্যেই নারীটি তার ছেলের মাথা থেকে মুকুটটা সরিয়ে দিচ্ছিল। ছবিটার পটভূমিতে নেপোলিয়নের এক উজ্জ্বল মূর্তি শোভা পাচ্ছিল। নেপোলিয়নের তলায় মেরিঙ্গো, অস্টারলিৎস, আয়েনা, ওয়াগ্রাম আর এলট এই কথাগুলি লেখা ছিল।

টেবিলের পাশের চেয়ারটাতে প্রায় ষাট বছরের একটি লোক বসেছিল। তার চেহারাটা ছিল বেঁটেখাটো আর রোগা। তার চোখ-মুখের উপর অশান্ত ও এক বিষাক্ত চাতুর্যের ভাব ফুটে উঠেছিল। লাভেতারের মতো কোনও শরীরতত্ত্ববিদ তার চেহারাটা দেখলে দেখত এক শকুনি আর এক অ্যাটর্নীর মিশ্রণ ঘটেছে তার মধ্যে। আইনগত ছলনার দিক থেকে তার শকুনির মতো শিকারী পাখিকেও হার মানাবার ক্ষমতা আছে তবে তার পরনে ছিল কাদামাখা একটা পায়জামা আর গায়ে ছিল একটা মেয়েদের শেমিজ। তার মুখে ছিল লম্বা পাকা দাড়ি। তার পায়ের ছেঁড়া জুতোর ফাঁক দিয়ে বুড়ো আঙুলগুলো দেখা যাচ্ছিল। টেবিলের উপরে তার সামনে কিছু কাগজ, একটা কলম আর কালি ছিল।

সে তখন পাইপ খাচ্ছিল (খাবার না জুটলেও তামাক ঠিক জোটে) এবং কি লিখছিল। নিশ্চয় সেই ধরনের কোনও আবেদনপত্র। টেবিলের উপর একটা লাইব্রেরির বই নামানো ছিল। বইটা কোনও জনপ্রিয় উপন্যাস। দুক্রে দুমিউলের লেখা।

লোকটি লিখতে লিখতে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছিল। সে বলছিল, সাম্য! তুমি মরে গেলেও সাম্য বলে কোনও বস্তুর দেখা পাবে না। যাদের টাকা আছে তারাই সব সময় সমাজের উপর তলায় থাকে। গরীবদের কবর দেখতে যেতে হলে হাঁটুভোর কাদা ভেঙে যেতে হবে। আমার মনে হয় আমি সবাইকে খেয়ে ফেলি।

একজন মহিলা আগুনের কাছে খালি পায়ে ঘোরাঘুরি করছিল। তার বয়স চল্লিশ বা একশোও হতে পারে। তার গায়েও একটা শেমিজ আর ছেঁড়া তালিলাগানো স্কার্ট ছিল, তার চেহারাটা তার স্বামীর তুলনায় খুব লম্বা ছিল। সে তার লম্বা লম্বা আঙুলওয়ালা ময়লা হাত দিয়ে তার মাথার লাল চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছিল। তার পাশে মেঝের উপর টেবিলের উপর রাখা বইটার মতো একটা বই খোলা অবস্থায় পড়ে ছিল।

একটা বিছানায় একটা শীর্ণ মেয়ে পা মেলে বসেছিল। যে মেয়েটি মেরিয়াসের ঘরে এসেছিল ঐ শিশুটি হয়ত তারই ছোট বোন। তাকে প্রথমে দেখেই দশ-বারো বছরের মনে হচ্ছিল। কিন্তু তার বয়স খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে পনেরর কম হবে না। ঐ মেয়েটিও গতকাল সন্ধ্যায় পথে তার দিদির সঙ্গে ছিল এবং সে বলেছিল, আমি মোটেই ছুটতে পারিনি। সে এমনই এক মেয়ে যে দারিদ্র্য আর অভাবের মধ্যে লালিত হতে হতে দেহের দিক থেকে অপরিণত এবং অপুষ্ট থেকে গেলেও মনের দিক থেকে পরিণত হয়ে ওঠে তাড়াতাড়ি। তারা বাল্য, কৈশোর বা যৌবনের মধ্যে কোনও পার্থক্যই বুঝতে পারে না। তাদের পনের বারো বছরের মতো দেখায়।

ষোল বছর বয়সে তাদের কুড়ি বছরের বলে মনে হয়। জীবনটাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলার জন্য তারা যেন উড়ে চলেছে।

মেরিয়াস ঘরটার মধ্যে এমন কোনও বস্তু দেখতে পেল না যার থেকে তারা কোনও না কোনও কাজ করছে। শুধু কতকগুলো ধাতববস্তু পড়ে রয়েছে মেঝের উপর। হতাশা থেকে যে অকর্মণ্যতা আর একধরনের ঔদাসিন্য ও নিস্পৃহতার উদ্ভব হয় এবং যা কালক্রমে মৃত্যুযন্ত্রণায় পরিণত হয় সেই মৃত্যুযন্ত্রণা বিরাজ করছিল যেন সারা ঘরখানায়। মেরিয়াসের মনে হলো ঘরখানা কবরখানার থেকেও ভয়ঙ্কর, কারণ সে ঘরে যেন একই সঙ্গে কয়েকটি জীবন এবং জীবন্ত মৃত্যু বাস করছে অর্থাৎ সেখানে জীবন্মৃত অবস্থায় বাস করছে কয়েকটি মানুষ। ঘরখানা কোনও সমাধিস্তম্ভ না হলেও সেটা যেন জীবনের প্রান্তঃসীমা এবং মৃত্যু-পুরীর প্রবেশপথ। ধনীরা যেমন তাদের প্রাসাদের প্রবেশপথে অনেক ঐশ্বর্যের উপকরণ সাজিয়ে রাখে, তেমনি মৃত্যু এখানে তার অনেক বিভীষিকা ছড়িয়ে রেখেছে।

লোকটি তখন চুপ করে ছিল। মহিলাটি একটিও কথা বলেনি। মেয়েরাও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ছিল। সমস্ত ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে ছিল। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কাগজের উপর লেখার শব্দ ক্ষীণভাবে কঁকিয়ে উঠছিল। হঠাৎ লোকটি লিখতে লিখতেই বলে উঠল, নোংরা, নোংরা, সবকিছু নোংরা।

মহিলাটি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

সে বলল, বিচলিত হয়ো না প্রিয়তম। তোমার জবানীতেই এই চিঠিগুলি লিখতে হবে।

তীব্র শীতে যেমন শীতার্ত মানুষরা একসঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে থাকে তেমনি নিবিড় দারিদ্র্যের মধ্যেও তারা পরস্পরে জড়াজড়ি করে থাকে। কিন্তু দেহগুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে খুব কাছাকাছি থাকলেও তাদের অন্তরগুলো দূরে চলে যায়। দেখে মনে হয় এই মহিলাটি একদিন তার অন্তরের সব ভালবাসা উজাড় ের ঢেলে দিয়েছে তার স্বামীর উপর। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের এই দুরবস্থা আর ঘৃণ্য পরিবেশের মধ্যে তার প্রেমের সব আগুন নিভে গেছে এবং শুধু ছাই পড়ে আছে তার জায়গায়। তবু সাধারণত যা হয়ে থাকে পুরনো প্রেমের বহিরঙ্গের আকারটা তখনো অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। তাই সে তার স্বামীকে প্রিয়তম বলে সম্বোধন করল। কিন্তু কথাটা শুধু তার মুখের কথা, অন্তর থেকে উৎসারিত নয়।

লোকটি অর্থাৎ জনদ্রেত্তে লিখে চলল।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে টেবিল থেকে নেমে আসছিল মেরিয়াস। হঠাৎ একটা শব্দে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল। দেখল হঠাৎ ঘরের দরজা ঠেলে ব্যস্ত হয়ে জনদ্রেত্তের বড় মেয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই তার পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, উনি আসছেন।

তার বাবা-মা দু'জনেই তার মুখপানে তাকিয়ে বলে উঠল, কে আসছেন?

মেয়েটি বলল, ঐ সেই বৃদ্ধ পরোপকারী ভদ্রলোক যিনি সেন্ট জ্যাক গীর্জায় প্রার্থনা করতে যান।

উনি কি সত্যিই আসছেন?

উনি আমার পিছু পিছু আসছেন।

তুই ঠিক বলছিস?

হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক বলছি। উনি একটা গাড়িতে করে আসছেন।

জনদ্রেত্তে উঠে দাঁড়াল। বলল, উনি যদি গাড়িতে করে আসেন তাহলে তুমি কি করে তাঁর আগেই এসে পড়লে? ওঁকে ঠিকভাবে ঠিকানাটা দেওয়া হয়েছে তো? বলে দিয়েছ তো বারান্দার শেষ প্রান্তে শেষের ঘরটা? উনি যেন ভুল না করেন। তুমি কি ওঁকে চার্চেই পেয়ে গিয়েছিলে? আমার চিঠিটা উনি পড়েছিলেন? উনি কি বললেন?

আমি ওঁকে চার্চের সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে পাই। আমি তাঁকে তোমার চিঠিটা দিই এবং তিনি চিঠিটা পড়ে বললেন, 'তুমি কোথায় থাক বাছা?' আমি বললাম, আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব মঁসিয়ে। উনি তখন বললেন, তাঁর মেয়ে কিছু কেনাকাটা করবে। তাঁকে আমাদের ঠিকানাটা দিলে তিনি একটা গাড়ি ভাড়া করে যথাসময়ে আসবেন। আমি ঠিকানাটা বললে তিনি কিছুটা বিস্মিত হলেন, তারপর বললেন, তিনি ঠিক আসবেন। আমি দেখলাম তিনি আর তাঁর মেয়ে চার্চ থেকে বেরিয়ে একটা গাড়িতে উঠলেন। আমি তাঁকে বলেছি বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরটা।

তার মানে এই নয় যে তিনি আসছেন।

আমি তাঁদের গাড়িটাকে রুয়ু দু পেতিত ব্যাঙ্কিযেরে দেখোছ। দেখেই আমি ছুটতে শুরু করেছি।

কি করে তুমি জানলে সেই গাড়িটা তাঁদেরই?

আমি তাঁদের গাড়ির নম্বরটা দেখে নিয়েছিলাম। নম্বরটা হলো ৪৪০।

ভাল, তুমি দেখছি বুদ্ধিমতী মেয়ে।

মেয়েটি তার বাবার দিকে উদ্ধতভাবে তাকিযে তার পাটা একবার দেখে নিযে বলল, আমি বুদ্ধিমতী হতে পারি, কিন্তু এই ছেঁড়া নোংরা জুতোটা পবে আর কোথাও যাব না। প্রতিটি পদক্ষেপে ছেঁড়া জুতোটা থেকে শব্দ হয়। এ জুতো পরার থেকে আমি খালি পায়ে যাব।

তার বাবা গলার স্বরটা নরম করে বলল, আমি তোমাকে এর জন্য কোনও দোষ দিচ্ছি না বাছা। কিন্তু জুতো পরে না গেলে চার্চে ঢুকতে দেবে না। গরীবদেরও জুতো পরতে হবেই। খালি পায়ে কেউ ঈশ্বরদর্শনে যেতে পারে না। কিন্তু উনি যে আসছেন এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?

উনি আমার পিছনেই আসছেন।

জনদ্রেত্তে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তার সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল,

কি আমার স্ত্রী, শুনতে পাচ্ছ? পরোপকারী ভদ্রলোক আসছেন। আগুন নিবিয়ে দাও।

তার স্ত্রী তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। এক পাও নড়ল না। জনদ্রেত্তে তাক থেকে জল নিয়ে চুল্লীর জ্বলন্ত আগুনে জল ঢেলে দিল। তারপর তার বড় মেয়েকে বলল, ঐ চেয়ারটাকে ছিঁড়ে ফেল।

তার মেয়েটি কথাটা বুঝতে পারল না। সে তখন নিজেই আলগা সিটটার উপর লাথি মেরে সেটা ভেঙে দিল।

এরপর সে তার বড় মেয়েকে বলল, বাইরে কি খুব ঠাণ্ডা?

খুব ঠাণ্ডা, বরফ পড়ছে।

এরপর জনদ্রেত্তে তার ছোট মেয়েকে বলল, একটু নড়াচড়া করো কুঁড়ে মেয়ে কোথাকার! তুমি কিছু করতে পার না? জানালার কাছে গিয়ে একটা কাঁচের সার্সি ভেঙে ফেল।

মেয়েটি বিছানায় বসে ছিল। সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জানালার ধারে গেল। বলল, জানালার কাঁচ ভাঙব?

আমি কি বললাম শুনতে পেলে না?

মেয়েটি বিছানার উপর উঠে দাঁড়াল। এক সন্ত্রস্ত আনুগত্যে সে তার হাতের একটা ঘুষি মেরে একটা কাঁচ ভেঙে দিল। কাঁচটা মেঝের উপর পড়ে গেল।

জনদ্রেত্তে বলল, ভাল। এই বলে সে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করারত এক সেনাপতির মতো সমস্ত ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার স্ত্রী এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। সে এবার বলল, এ সব কি হচ্ছে প্রিয়তম?

তার যেন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল।

জনদ্রেত্তে বলল, যাও বিছানায় শুয়ে পড়গে।

তার এই হুকুমের ভঙ্গিমা আর কণ্ঠস্বর শুনে প্রতিবা করার সাহস পেল না তার স্ত্রী। সে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এমন সময় কে ফুঁপয়ে কেঁদে উঠল।

জনদ্রেত্তে বলল, কে কাঁদছে?

ছোট মেয়েটি তার মার কাছে বিছানার এক কোণে শুয়ে তার রক্তাক্ত হাতটা দেখাল। সে কাঁদছিল।

তার মা তার বাবাকে বলল, এই দেখ, ও জানালার কাঁচ ভাঙতে গিয়ে হাতটা কেটে ফেলেছে।

তার বাবা বলল, ভাল। আমি আগেই ভেবেছিলাম ওর হাত কাটবে।

ভাল—তার মানে?

জনদ্রেত্তে বলল, চুপ করো। আমি সাংবাদিকদের স্বাধীনতা উচ্ছেদ করেছি।

এই বলে যে শেমিজটা সে পরে ছিল তার থেকে কিছুটা ছিঁড়ে তাই দিয়ে মেয়েটির কাটা হাতটা বেঁধে দিল। তারপর বলল, খুব ভাল হলো, আমার জামাটাও ছেঁড়া রইল।

কাঁচভাঙা সার্সিটা দিয়ে বাইরের হিমেল বাতাস আর একরাশ কুয়াশা এসে ঘরে ঢুকল। ওরা তার ভিতর দিয়ে দেখতে পেল বাইরে তখন বরফ পড়ছে।

ক্যান্ডলমাস উৎসবের আগে যে দারুণ ঠাণ্ডা পড়ে সেই ঠাণ্ডা এখন তাদের ঘরখানায় এসে তার বুক চেপে বসল। জনদ্রেত্তে ঘরখানার চারদিকে তাকিয়ে দেখল প্রস্তুতিব ব্যাপারে কোনও কিছু বাদ গেছে কিনা। এবার সে কিছু শুকনো ছাই নিয়ে ভিজে কাঠগুলোর উপর ছড়িয়ে দিল। এরপর সে নিভে যাওয়া চুল্লীর কাছে দাঁড়িয়ে বলল, এবার আমরা সেই পরোপকারী ভদ্রলোকের জন্য প্রস্তুত।

৮

বড় মেয়েটি তার একটা হাত তার বাবার দিকে বাড়িয়ে বলল, দেখ আমার গাটা কিরকম হিম হয়ে গেছে।

তার বাবা বলল, যত সব বাজে কথা। আমার গাটা আরও হিম।

তার স্ত্রী তখন বলল, সব দিক দিয়ে সবার থেকে তোমার অবস্থাটা খারাপ।

জনদ্রেত্তে ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো।

এই বলে এমনভাবে সে তাকাল যাতে তার স্ত্রী একেবারে চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। বড় মেয়েটি তার পোশাক থেকে ধুলো কাদাগুলো ঝাড়তে লাগল। ছোট মেয়েটি কেঁদে যেতে লাগল। তার মা তার মাথাটা ধরে তাকে চুম্বন করে বলল, কেঁদো না বাছা, তোমার বাবা রাগ করবে।

কিন্তু তার বাবা বলল, না, মোটেই রাগব না আমি। যত পার কেঁদে যাও।

এরপর সে তার বড মেয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, সব ঠিক আছে। কিন্তু মনে করো যদি উনি না আসেন। এখনো উনি এলেন না। অথচ আমি ঘরের আগুন নিবিয়ে দিয়েছি, জানালার কাঁচ ভেঙেছি, চেয়ার ফুটো করেছি, আমার জামা ছিঁড়েছি।

মা বলল, তাছাড়া তোমার মেয়ের হাত কেটেছে।

জনদ্রেত্তে বলে যেতে লাগল, ঘরটা বরফঘরের মতো ঠাণ্ডা। উনি যদি একেবারেই না আসেন। আমরা অপেক্ষা করে থাকলে তাঁর কিছু যায় আসে না। তিনি কিছু মনে করেন না, ভাবেন, ওরা অপেক্ষা করারই যোগ্য। হে ঈশ্বর, আমি ওদের কত ঘৃণা করি। ঐ সব ধনী, তথাকথিত দানশীল ধনী যারা প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাপন করে আর গীর্জায় প্রার্থনা করতে যায়। তাদের গলাটা টিপে যদি মারতে পারতাম। তারা মনে ভাবে তাবা আমাদের প্রভু, সর্বময় কর্তা, তারা আমাদের দুঃখে সহানুভূতি দেখাতে এসে কিছু ছাড়া পোশাক আর কিছু খাবারের টুকরো দিয়ে যায়। কিন্তু কোথা থেকে কি করে ধনী হয় তারা? যত সব চোরের দল। চোর না হলে তারা ধনী হতে পারত না। আমার ইচ্ছা হয় আমি সমাজের সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে সেই ভস্মস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে থাকি। বোধ হয় একদিন সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এবং সমাজের সব মানুষ সমান হয়ে যাবে।...কিন্তু তোমার পরোপকারী ভদ্রলোক কি করছেন? উনি কি আসছেন? বোধ হয় বৃদ্ধ অকর্মণ্য লোকটা আমাদের ঠিকানাটাই ভুলে গেছে।

এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল। জনদ্রেত্তে ছুটে খুলতে গেল দরজাটা। সে যেন মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছিল। সে বিনয়ের সঙ্গে বলল, হে আমার প্রিয় মহাশয়, আমার মহান উপকারী, দয়া করে আসুন।

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এবং একজন সুন্দরী তরুণী দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। মেরিয়াস সেই ফুটো দিয়ে তা দেখতে দেখতে বিস্মিত হয়ে গেল। সে বিস্ময় বর্ণনাতীত।

সেই তরুণীই তার সেই প্রেমাস্পদ। যে জীবনে একবার ভালবেসেছে সে প্রেমাস্পদ এই কথাটার কত বড় শক্তি তা জানে। যে উজ্জ্বল কুয়াশা সেই মুহূর্তে তার চোখের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে কুয়াশার ভিতর দিয়ে মেয়েটির চেহারাটাকে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিল না—তার যে চোখ, তার কপাল আর তার সুন্দর মুখ তার জীবনকে ছয় মাস ধরে আলোকিত করে সহসা তাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় সে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। আজ এই ঘৃণ্য পরিবেশে আবার সে আবির্ভূত হয়েছে।

মেরিয়াসের সারা শরীর কাঁপতে লাগল। তার হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে স্পন্দিত হতে লাগল যে তার চোখের দৃষ্টি ব্যাহত এবং তার চোখে জল আসার উপক্রম হলো। এতদিন ধরে যাকে খুঁজে চলেছিল তাকে আবার সে দেখতে পেল। তার মনে হলো তার হারানো আত্মাকে আবার সে খুঁজে পেয়েছে।

তার মুখখানাকে শুধু ম্লান দেখাচ্ছিল—এ ছাড়া তার চেহারাটা ঠিক ছিল। তার মাথায় ছিল নীলচে রঙের মখমলের একটা ওড়না। তার গায়ে ছিল কালো সাটিনের পোশাক যার নিচে তার হাঁটু দুটো দেখা যাচ্ছিল। এবারও তার একমাত্র সঙ্গী ছিল মঁসিয়ে লেবলাঁ। সে ঘরের ভিতর ঢুকে টেবিলের উপর একটা বড় প্যাকেট নামিয়ে রাখল।

জনদ্রেত্তের স্ত্রী মেয়েটির ওড়না, পোশাক আর সুন্দর মুখপানে অপলক দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

৯

বাইরে থেকে আগত কোনও আগন্তুকের কাছে ঘরখানা বেশি অন্ধকার দেখায়। মনে হয় তারা যেন কোনও গুহায় প্রবেশ করেছে। যারা বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে অনিশ্চয়তার সঙ্গে পা ফেলে তারা তাদের চারপাশের ঘরখানার মধ্যে কোথায় কি আছে তা দেখতে পায় না। অথচ ঘরের বাসিন্দারা তাদের স্পষ্ট দেখতে পায়, কারণ চোখের দৃষ্টি এ অন্ধকারে অভ্যস্ত।

মঁসিয়ে লেবলাঁ তার স্বভাবসুলভ বিষণ্ন ও করুণাভরা দৃষ্টিতে জনদ্রেত্তের পানে তাকিয়ে বলল, মঁসিয়ে আপনি এই প্যাকেটটার মধ্যে কিছু গরম মোজা, কম্বল আর এই ধরনের কিছু শীতবস্ত্র পাবেন।

জনদ্রেত্তে নত হয়ে বলল, হে উদারহৃদয় মহান, আপনার দয়া আমাকে অভিভূত করে দিচ্ছে।

কিন্তু আগন্তুকরা যখন ঘরের পরিবেশটাকে খুঁটিয়ে দেখায় ব্যস্ত ছিল জনদ্রেত্তে তখন আড়ালে তার বড় মেয়েকে বলল, আমি তোমাকে কি বলেছিলাম? শুধু এক পুঁটলি পোশাক, কোনও টাকা-পয়সা নেই। ওরা সবাই এক ধরনের। যাই হোক, যে চিঠিটি তুমি ওঁকে দিয়েছিলে তাতে কোনও নামের স্বাক্ষর ছিল?

ফাবান্তু।

তাহলে নাট্যাভিনেতা।

কথাটা সে ঠিক সময়েই জিজ্ঞাসা করেছিল তার মেয়েকে। কারণ ঠিক এই সময়েই মঁসিয়ে লেবলাঁ তার দিকে ঘুরে বলল, আপনি সত্যিই করুণার পাত্র মঁসিয়ে—

এই বলে সে থামল।

জনদ্রেত্তে তার অসম্পূর্ণ কথাটা বলে দিল—ফাবান্তু।

হ্যাঁ, মঁসিয়ে ফাবান্তু।

একজন অভিনেতা মঁসিয়ে যে একদিন বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছিল।

জনদ্রেত্তে যখন দেখল নিজেকে আগন্তুকের সামনে প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসেছে তখন সে একই সঙ্গে একজন সফল অভিনেতা আর পথের ভিখারীর ভাব নিয়ে কথা বলতে লাগল। সে বলল, স্বয়ং ভালমার শিষ্য মঁসিয়ে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছিল আমার উপর। কিন্তু আজ আমি দুর্ভাগ্যের দ্বারা প্রপীড়িত। আজ আমার খাদ্য নেই, ঘরে তাপ নেই। আমার হতভাগ্য সন্তানরা শীতে কাঁপছে। ঘরে একটা চেয়ারও নেই। জানালার কাঁচ ভাঙা। আর আমার স্ত্রী শয্যাগত।

মঁসিয়ে লেবলাঁ বলল, আহা বেচারী মহিলা।

জনদ্রেত্তে বলল, আর আমার ছোট মেয়ে আহত।

ছোট মেয়েটি আগন্তুকদের দেখে এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে তার কান্না থেমে গিয়েছিল।

জনদ্রেত্তে চাপা গলায় বলল, কি, দেখাতে পারছ না?

এই বলে সে তার হাতের ক্ষতটার উপর চাপ দিতেই সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল এবং তাতে মেরিয়াস একদিন যার নাম দিয়েছিল আরসুলা সেই মেয়েটি আবেগের সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, আহা বেচারী।

জনদ্রেত্তে বলল, আপনি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন তার হাত থেকে রক্ত বার হচ্ছে। ও যে কারখানায় ঘণ্টায় ছয় স্যু বেতনে কাজ করে সেখানে এক অ্যাকসিডেন্টে ওর হাতটা কেটে যায়। হয়ত ওর হাতটা বাদ দিতে হবে।

মঁসিয়ে লেবলাঁ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাই নাকি?

হাতটা কেটে বাদ দিতে হবে এই কথাটা সত্যি ভেবে ছোট মেয়েটি আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

জনদ্রেত্তে বলল, আমার তাই মনে হয়।

মঁসিয়ে লেবলাঁর পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে জনদ্রেত্তে কি দেখছিল। সে যেন কিছু একটা স্মরণ করার চেষ্টা করছিল। আগন্তুকরা যখন তার ছোট মেয়ের সঙ্গে

কথা বলছিল তখন সেই সুযোগে জনদ্রেত্তে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলল, লোকটিকে ভাল করে দেখ তো।

এবার সে মঁসিয়ে লেবলাঁর দিকে ঘুরে তার দুঃখের কাহিনী আবার শোনাতে লাগল। সে বলল, দেখুন মঁসিয়ে, এই দারুণ শীতে আমার একমাত্র পোশাক হলো আমার স্ত্রীর এই শেমিজটা। একটা কোটের অভাবে আমি বাইরে যেতে পারি না। একটা কোট থাকলে আমি একবার ম্যাদময়জেল মার্সের কাছে যেতাম। সে আমার পুরনো বন্ধু। সে কি এখনো রু্য দ্য লা দে দ্যাম অঞ্চলে বাস করছে? আমরা একসঙ্গে অভিনয় করেছিলাম এবং তার সাফল্যে আমার অবদান ছিল। সেলিমেনে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। মঁসিয়ে এলমিরা তার বেনিসারিসসকে ঠিক সাহায্য করবে। কিন্তু আমার এখন পরার কিছু নেই, ঘরে একটা স্যুও নেই। আমার স্ত্রী রুগ্ন এবং আমার মেয়ে আহত। তবু একটা পয়সা নেই। আমার স্ত্রী স্নায়ুদৌর্বল্যে ভুগছে। তার এবং মেয়ের এখন চিকিৎসা দরকার। কিন্তু কে ডাক্তার এবং ওযুধের টাকা দেবে? আজ আমি একটা পেনির জন্য নতজানু হতে পারি। জানেন মঁসিয়ে, আমি আমার মেয়েদের ধর্ম এবং নীতি শিক্ষা দিয়েছি বলে তাদের মঞ্চে পাঠাইনি। তারা খুব কড়া শাসনের মধ্যে মানুষ হয়েছে। কতবার আমি তাদের নীতি এবং গুণাবলী সম্বন্ধে কত বুঝিয়েছি। আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। মানুষের সঙ্গে কিভাবে ভদ্র ব্যবহার করতে হয় তা তারা জানে। তারা সেই সব হতভাগ্যদের মতো নয় যারা অভাবের তাড়নায় বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে যায়। ফাবান্তু পরিবারে এমন একজনকেও পাবেন না। তারা সদগুণ, সততা, ধর্ম, ঈশ্বর বিশ্বাস কাকে বলে তা শিখেছে। কিন্তু কাল আমাদের কি ঘটবে তা জানি না স্যার। কাল ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, বাড়িওয়ালা আমাদের আর থাকতে দেবে না। আজ সন্ধের মধ্যে যদি আমরা সব ভাড়া মিটিয়ে না দিই তাহলে আমাদের উঠে যেতে হবে। তাহলে আমার রুগ্ন স্ত্রী ও মেয়েদের হাত ধরে পথে বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে। বরফ আর বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার মতো কোনও আশ্রয়ই থাকবে না আমাদের। এই হলো আমাদের অবস্থা মঁসিয়ে। আমার বাড়ি ভাড়া বাকি আছে চার কোয়ার্টারের অর্থাৎ পুরো এক বছরের। তার মানে মোট যাট ফ্রাঁ।

কথাটা একেবারে মিথ্যা। প্রথমত তার এক বছরের বাড়িভাড়া হলো মোট চল্লিশ ফ্রাঁ, যাট ফ্রাঁ নয়। তাছাড়া মাস ছয় আগে মেরিয়াস দু' কোয়ার্টারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছে।

মঁসিয়ে লেবলাঁ তার পকেট হাতড়ে পাঁচ ফ্রাঁ বার করে টেবিলের উপর রাখল। তা দেখে জনদ্রেত্তে তার বড় মেয়ের কানে কানে বলল, দেখলে বুড়োর কাণ্ডটা? পাঁচ ফ্রাঁতে কি হবে? চেয়ার আর কাঁচের দামও হবে না।

মঁসিয়ে লেবলাঁ তখন তার বাদামী রঙের ওভারকোটটা খুলে চেয়ারের পিঠের উপর ঝুলিয়ে রেখে দিল। তারপর বলল, শুনুন মঁসিয়ে ফাবান্তু, আমার কাছে এখন আর টাকা নেই, যা ছিল দিলাম। তবে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি, সন্ধের সময় আবার আসব। আপনার তো আজকের সন্ধের মধ্যে ভাড়া দিতে হবে।

সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জনদ্রেত্তের মুখখানা। সে বলল, হ্যাঁ মঁসিয়ে। আপনি ঠিক বলেছেন। আমাকে বাড়িওয়ালার বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে আটটার সময়।

মঁসিয়ে লেবলাঁ বলল, ঠিক আছে, আমি দুটোর সময় এসে আপনাকে ষাট ফ্রাঁ দিয়ে যাব।

জনদ্রেত্তে বলল, সত্যিই আপনি মহান স্যার।

এরপর সে তার স্ত্রীকে আড়ালে চুপি চুপি বলল, লোকটাকে দেখছ?

মঁসিয়ে লেবলাঁ এবার তার মেয়ের হাত ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বলল, তাহলে সন্ধের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।

জনদ্রেত্তে বলল, সন্ধে ছটা।

হ্যাঁ ঠিক ছটায়।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বড় মেয়েটি তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে বলল, মঁসিয়ে, আপনি আপনার ওভারকোটটা ভুলে রেখে যাচ্ছেন।

জনদ্রেত্তে তার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে একবার তাকাল। মঁসিয়ে লেবলাঁ হাসিমুখে বলল, আমি ভুলে যাইনি; আমি ওটা ইচ্ছা করেই রেখে এসেছি।

জনদ্রেত্তে বলল, হে আমার রক্ষাকর্তা, আমার চোখে জল আসছে। দয়া করে আপনার গাড়ি পর্যন্ত আমাকে সঙ্গে যাবার অনুমতি দিন।

মঁসিয়ে লেবলাঁ বলল, তাহলে আপনি কোটটা পরুন। বড় ঠাণ্ডা।

জনদ্রেত্তেকে আর বলতে হলো না। সে সঙ্গে সঙ্গে কোটটা পরে নিল। সে আগন্তুকদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

১০

মেরিয়াস একটু আগে ঘরখানায় যা যা ঘটেছে তা সব দেখেছে। কিন্তু আবার একদিক দিয়ে কিছুই দেখেনি। মেয়েটি ঘরে প্রবেশ করার পরমুহূর্ত থেকে তার চোখ মেয়েটির উপর সর্বক্ষণ নিবদ্ধ ছিল। তারপর যতক্ষণ সে ঘরের মধ্যে ছিল ততক্ষণ এক গভীর আনন্দের আবেগ তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে ছিল। তার সমস্ত সত্তা সমস্ত মনোযোগ একটিমাত্র বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। সে যেন একটি মেয়েকে দেখছিল না, সাটিন পোশাকে আবৃত এক আলোর প্রতিমূর্তিকে দেখছিল। যদি কোনও দেবদূত এসে সেই ঘরে ঢুকত তাহলে সে এর থেকে বেশি বিস্ময়ে অভিভূত হত না।

মেয়েটি যখন কাপড়ের প্যাকেটটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে, সে যখন রুগ্ন মা ও আহত মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে তখন তার প্রতিটি কথা শোনে পরম আগ্রহের সঙ্গে। এর থেকে সে তার মুখচোখ ও প্রতিটি গতিভঙ্গি লক্ষ্য করেছে, কিন্তু কথা খুব কম শুনেছে। শুধু লুক্সেমবুর্গ বাগানে একদিন তাকে তার বাবার সঙ্গে কিছু কথা বলতে শুনেছে। তার কথা শোনা এবং তার কথার সুর অন্তরে বহন করার জন্য সারাজীবন সে অতিবাহিত করতে পারত।

কিন্তু জনদ্রেত্তের হৈচৈ ও গোলমাল করার জন্য তার কোনও কথা শুনতে পায়নি। সে শুধু তার ক্ষুধিত চোখের দৃষ্টি দিয়ে তার চেহারাটাকে গ্রাস করেছে, কিন্তু বুঝতে পারেনি তার মতো সুন্দরী মেয়ে অবর্ণনীয়ভাবে নোংরা পরিবেশ আর মানুষের মধ্যে কি করে এল।

মেয়েটি ঘর থেকে চলে যাবার পর তার খেয়াল হলো তাদের পিছু পিছু গিয়ে তারা কোথায় থাকে তা দেখে আসা উচিত। তা না হলে এতদিন পর আশ্চর্যভাবে অকস্মাৎ দেখতে পেয়েও আবার তাকে হারাতে হবে। টেবিল থেকে তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে নেমে সে তার মাথায় টুপিটা চাপিয়ে নিল। কিন্তু ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে ইতস্তত করতে লাগল। সে ভাবল তারা এখনো গাড়িতে চাপেনি এবং বাচাল জনদ্রেত্তে এখনো হয়ত কথা বলছে তাদের সঙ্গে। মঁসিয়ে লেবলাঁ যদি তাকে দেখে ফেলে তাহলে সে হয়ত ভয় পেয়ে যাবে এবং তাকে কৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

তাহলে কি করবে সে? সে কি অপেক্ষা করবে কিছুক্ষণ? কিন্তু তা যদি করে তাহলে দেরি হয়ে গেলে এবং তাদের গাড়িটা ছেড়ে দিলে তারা কোথায় যাবে তা আর দেখতে পাবে না। সুতরাং তাকে তারা দেখে ফেললেও তাকে যেতেই হবে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল মেরিযাস।

বারান্দাটা এবং সিঁড়িগুলো ফাঁকা। তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে সে বুলভার্দে গিয়ে দেখল একটি গাড়ি পেতিত ব্যাঙ্কিয়েরের দিকে প্যারিসের পথে এগিয়ে চলেছে। সে গাড়িটাকে লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। দেখল গাড়িটা মুফেতার্দের ঢালু পথটা বেয়ে নেমে যাচ্ছে। দেখল গাড়িটা অনেকদূর এগিযে গেছে। আর ধরা সম্ভব নয়। পায়ে হেঁটে বা ছুটে গিয়ে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। তাই অবিলম্বে একটা গাড়ি ভাড়া করে গাড়িটার অনুসরণ করা উচিত। তাছাড়া গাড়িটাকে লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলে গাড়ির আরোহীদের সন্দেহ হতে পারে। এমন সময় একটা খালি ঘোড়ার গাড়িকে আসতে দেখে মেরিয়াস সেটা ভাড়া করার জন্য গারোয়ানকে ডাকল। তার ময়লা ও কিছুটা ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক দেখে গারোয়ান আগাম ভাড়া চাইল।

ভাড়া কত?

চল্লিশ স্যু।

কিন্তু মেরিয়াসের কাছে তখন মাত্র ছিল ষোল স্যু। সে তাই বলল, তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনার পর তোমার ভাড়া দেব।

গাড়িচালক জোরে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

মেরিয়াস বিষণ্ন দৃষ্টিতে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাত্র চল্লিশ স্যুর অভাবে সে তার প্রেমাস্পদকে এবং তার জীবনের সুখ হারাতে বসেছে এবং তার ফলে সে আবার অন্ধকারে ডুবে যাবে। ক্ষণিকের জন্য একবার এক চকিত আলো দেখার পর আবার সে অন্ধ হয়ে উঠল। এই ভেবে সে অনুশোচনা করতে লাগল যে সে বোকার মতো পাঁচ ফ্রাঁ সেই দুঃস্থ মেয়েটিকে দিয়েছে। সেই পাঁচ ফ্রাঁ তাকে না দিলে এই হতাশা, লক্ষ্যহীনতা এবং নিঃসঙ্গতা হতে উদ্ধার করতে পারত নিজেকে।

তা না হয়ে তার সৌভাগ্যের হারানো সুতোটা আবার ছিঁড়ে গেল। আবার সেই হতাশার অন্ধকারটা বুকচেপে বসল তার। সে নিবিড় হতাশার সঙ্গে বাসায় ফিরে গেল।

একথা ভেবে সে কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারত যে মঁসিয়ে লেবলাঁ কথা দিয়ে গেছে সন্ধ্যার সময় সে আবার আসবে এবং তখন সে সাফল্যের সঙ্গে তাদের অনুসরণ করতে পারবে। কিন্তু সে এমনই বিষাদে মগ্ন হয়ে ছিল যে সেকথা তার মনেই এল না।

বাসাবাড়িতে ঢোকার মুখে সে দেখল জনদ্রেত্তে মঁসিয়ে লেবলাঁর দেওয়া কোটটা পরে বাইরে একজন নামকরা অপরাধীর সঙ্গে কথা বলছে। জনদ্রেত্তে এমনই একজন লোকের সাথে কথা বলছিল যার চোখ-মুখ দেখলে এবং যার কথা শুনলেই সন্দেহ জাগে, সে লোক সারাদিন ঘুমিয়ে রাতের বেলায় যতসব অপকর্ম করে বেড়ায়। তাদের দু'জনের এই নির্জন আলাপ এবং কথাবার্তা সমাজের আইনশৃঙ্খলার অভিভাবকের পক্ষে বিশেষ আগ্রহের বস্তু। কিন্তু মেরিয়াস তা লক্ষ্য করেও করল না।

বিষণ্ন চিন্তায় মেরিয়াসের মনটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও একটা কথা সে বেশ বুঝল জনদ্রেত্তে কথা বলছে পানশাদ ওরফে ব্রিগেনেলের মতো একজন কুখ্যাত লোকের সঙ্গে যাকে একদিন কুরফেরাক তাকে দেখিয়ে দেয় এবং সে একজন বিপজ্জনক রাতপাখি হিসাবে চিহ্নিত। তার নাম আগেই আমরা উল্লেখ করেছি এবং সে এর পরে কতকগুলো অপরাধে জড়িয়ে আদালতের বিচারাধীন আসামী হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করবে। বর্তমানে সে একজন অন্ধকার জগতের নায়ক এবং অপরাধীরা তাদের আড্ডায় ফিসফিস করে তার কথা প্রায়ই বলে। এমন কি লা ফোর্স নামক জেলখানাতেও তার নাম কয়েদীদের মধ্যে আলোচিত হয়। ১৮৪৩ সালে যে তিরিশজন কয়েদী জেলখানার এক প্রস্রাবাগারের পাইপ বেয়ে আশ্চর্যভাবে পালিয়ে যায় তার মধ্যে পানশাদও ছিল। অবশ্য ১৮৩২ সাল থেকে তার উপর নজর রাখতে থাকে পুলিশ। কিন্তু সে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

১১

সিঁড়িতে ওঠার সময় মেরিয়াস দেখল তার পিছু পিছু জনদ্রেত্তের বড় মেয়ে আসছে। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল তার। কারণ তাকে সে পাঁচ ফ্রাঁ আগেই দিয়ে দিয়েছে এবং তার জন্য তাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে। এখন আর পাঁচ ফ্রাঁ ফিরে চাওয়ার কোনও অর্থ হয় না। কারণ তাদের গাড়িটা এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাছাড়া এখন চাইলে সে তা ফিরিয়ে দিতেও পারবে না। মঁসিয়ে লেবলাঁদের ঠিকানাটা চেয়েও কোনও লাভ নেই। কারণ মেয়েটি তা জানে না। চিঠিটা দেওয়া হয়েছিল চার্চের ঠিকানায়। মেরিয়াস তার ঘরের মধ্যে ঢুকে তার পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কিন্তু বন্ধ হলো না দরজাটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে মেরিয়াস দেখল একটা হাত দরজার

একটা কপাট ধরে কে সেটা খুলে রেখেছে। দেখল, জনদ্রেত্তের বড় মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সে কড়াভাবে বলল, তুমি? আবার কি চাও তুমি?

মেয়েটি উত্তর দিল না এ কথার। সে মেরিয়াসকে লক্ষ্য করে কি ভাবতে লাগল। সে ঘরের ভিতর ঢোকেনি। বারান্দার আধো আলো আধো অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে আছে।

মেরিয়াস বলল, কি, কথার উত্তর দিতে পারছ না? কি চাও তুমি আমার কাছ থেকে?

মেয়েটি সকরুণ দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে রইল মেরিয়াসের দিকে। তার চোখে বিষাদের কালো ছায়ার মধ্যে একটা ক্ষীণ আলোও ছিল। সে বলল, মঁসিয়ে মেরিয়াস, আপনাকে বিচলিত দেখাচ্ছে। কি হয়েছে আপনার?

মেরিয়াস বলল, আমার?

হ্যাঁ।

আমার কিছুই হয়নি।

না, কিছু নিশ্চয় হয়েছে।

আমাকে একা থাকতে দাও।

এই বলে দরজাটা আবার বন্ধ করতে গেল মেরিয়াস। কিন্তু দরজার একটা কপাট ধরে মেয়েটি তবু দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি বলল, আপনি ভুল করছেন। আপনি ধনী নন। কিন্তু আজ সকালে আপনি যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। এখন সদয় ব্যবহার করুন। আপনি আমাকে আমাদের খাওয়ার জন্য টাকা দিয়েছেন। এখন আপনার সমস্যাটা কি তা বলুন। আমি দেখছি আপনি কোনও কারণে দুঃখী এবং আমি সেটা চাই না। আমি কি আপনার কিছুই করতে পারি না? আপনি শুধু আপনার দুঃখের কথাটা বলুন। আমি আপনার গোপন কথা জানতে চাই না, আমাকে আপনার সব কথা বলতে হবে না। তবে আমি আপনার কোনও না কোনও কাজে লাগতে পারি। আমি আমার বাবাকে সাহায্য করে থাকি, সুতরাং আপনাকেও সাহায্য করতে পারব। কারো হাতে চিঠি দেওয়া, কারো বাড়ি যাওয়া, কারো ঠিকানা যোগাড় করা এবং কারো অনুসরণ করা—এইগুলোই হলো আমার কাজ। এখন আপনি বলুন আপনি কি চান? দরকার হলে আমি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি। আপনি শুধু বলন কি আপনার দরকার।

মেরিয়াস এবার সরে গেল মেয়েটির কাছে। নিমজ্জমান ব্যক্তি একটা খড়কুটোকে জড়িয়ে ধরে বাঁচার জন্য। সে বলল, ঠিক আছে, একটা কথা শোন—

সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়েটির চোখ দুটো। সে মাঝপথে মেরিয়াসকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনি খুব সুন্দরভাবে কথা বলছেন। এটাই ভাল।

তুমি যে ভদ্রলোক আর তার মেয়েকে তোমাদের বাড়িতে এনেছিলে তাদের ঠিকানাটা জান?

না।

ঠিকানাটা যোগাড করে দিতে পার ?

মেয়েটির চোখ থেকে আলোটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মুছে গেল।

আপনি শুধু এইটাই চান ?

হ্যাঁ।

আপনি তাদের চেনেন ?

না।

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে এবং কিছুটা তিক্তভাবে বলল, তার মানে আপনি মেয়েটিকে চেনেন না এবং তার সঙ্গে পরিচিত হতে চান।

মেরিয়াস বলল, তুমি তার ঠিকানাটা যোগাড় করে দিতে পার ?

সুন্দরী মেয়েটির ঠিকানা যোগাড করে দেব।

তার কণ্ঠে দ্বেষের ভাব দেখে রেগে গেল মেরিয়াস। সে বলল, তার ঠিকানা সেটা বড় কথা নয়। ঠিকানাটা বাপ এবং মেয়ের দু'জনেরই। তাদের ঠিকানা।

মেয়েটি কড়াভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, কি দেবে তুমি ?

তুমি যা চাইবে তাই দেব।

যা চাইব ?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি যোগাড় করে দেব।

এই বলেই সে দরজা বন্ধ দিয়ে চলে গেল।

মেরিয়াস একটা চেয়ারে বসে দু'হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে যা সব ঘটে গেছে অর্থাৎ মেয়েটির আকস্মিক আবির্ভাব, জনদ্রেত্তের বড মেয়ের প্রতিশ্রুতি তাকে ভাবিয়ে তুলল। তবে এই প্রতিশ্রুতির মাঝে সে একটা আশার আলো দেখতে পেল।

এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরে জনদ্রেত্তের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল সে।

জনদ্রেত্তে বলছে, আমি তোমাকে বলছি তাকে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি।

মেরিয়াস ভাবল মঁসিয়ে লেবলাঁ ছাড়া আর কার কথা বলবে সে। তার এই ক্রুদ্ধ কর্কশ কথা বলার ভঙ্গির মধ্যেই কি পিতাকন্যার কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে ? আর কিছু না ভেবে সে লাফ দিয়ে আবার সেই টেবিলটার উপর উঠে সেই ফুটো দিয়ে ওদের মধ্যে তাব দৃষ্টি চালিয়ে দিল।

১২

মেরিয়াস দেখল, ঘরখানার মধ্যে যেখানে যা ছিল সেখানে সব ঠিকই আছে। শুধু জনদ্রেত্তের স্ত্রী আর দুই মেয়ে মঁসিয়ে লেবলাঁর দিয়ে যাওয়া গরম মোজাগুলো পরছিল। কম্বল দুটো বিছানায় নামানো আছে।

বাইরে থেকে জনদ্রেত্তে এসে ঠাণ্ডা লাগার জন্য হাঁপাচ্ছিল। মেয়ে দুটি আগুনের

ধারে বসে ছিল। বড় মেয়ে ছোট মেয়ের হাতের ক্ষত জায়গাটা বেঁধে যাচ্ছিল। তাদের মা একটা বিছানায় জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে ছিল। সে বিস্ময়ের সঙ্গে তার স্বামীর দিকে তাকিয়েছিল। তার স্বামী তখন চোখে এক অস্বাভাবিক আলো নিয়ে ঘরের ভিতর পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। তার কথা শুনে তার স্ত্রী হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, সত্যি বলছ? এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?

অবশ্যই আমি নিশ্চিত। আট বছর হয়ে গেল। তবু আমি তাকে একনজরেই চিনতে পেরেছি। তুমি কি বলছ, তুমি তাকে চিনতে পারনি?

না।

কিন্তু আমি তো তোমাকে বললাম লোকটাকে ভাল করে দেখ। তার চেহারা, তার মুখ আট বছরের মধ্যে মোটেই বদলায়নি। এক-ধরনের লোক আছে যাদের বয়স বেড়েছে বলে মনেই হয় না। কিভাবে যে ওরা দেহটাকে ঠিক রাখে তা আমি বুঝতে পারি না। ওর গলার কণ্ঠস্বরটা পর্যন্ত ঠিক আছে তবে ওর পোশাকটা এখন ভাল এই যা। কিন্তু ঈশ্বরের নামে বলছি, ওকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছি।

এরপর সে তার মেয়েদের বলল, তোমরা এখন বেরিয়ে যাও। তুমি তাকে চিনতে পারলে না দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

মেয়ে দুটি নীরবে উঠে পড়ল। তাদের মা মৃদু অনুযোগের সুরে বলল, ওর কাটা হাত নিয়ে বেরিয়ে যাবে?

জনদ্রেত্তে বলল, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভাল থাকবে। যাও, চলে যাও।

জনদ্রেত্তে এমনই লোক যার কথার কোনও প্রতিবাদ করা চলে না। মেয়েরা তার কথা পালন করল। তারা ঘরের দরজার কাছে যেতেই জনদ্রেত্তে বলল, তোমরা দু'জনেই ঠিক পাঁচটার সময় চলে আসবে। দরকার আছে।

মেরিয়াসের আগ্রহ বেড়ে গেল।

মেয়েরা চলে গেলে জনদ্রেত্তে আবার পায়চারি করে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে। হঠাৎ থেমে তার শেমিজটা তার কোমরের কাছে পায়জামার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে বলল, আর একটা কথা বলব তোমায়। ঐ মেয়েটা...

তার স্ত্রী বলল, মেয়েটা? কি ব্যাপার?

কাদের সম্বন্ধে তারা কথা বলছে একথা বুঝতে আর বাকি রইল না মেরিয়াসের। এক উত্তপ্ত প্রত্যাশায় তার সমস্ত সত্তা কানের মধ্যে এসে কেন্দ্রীভূত হলো। কিন্তু জনদ্রেত্তে এবার তার স্ত্রীর কানের কাছে মুখটা এনে চুপি চুপি কি বলতে লাগল। শেষে সে বলল, ও হচ্ছে সেই মেয়েটা।

স্ত্রী বলল, সেই মেয়েটা!

হ্যাঁ, সেই মেয়েটা।

এবার তার স্ত্রীর মধ্যে একই সঙ্গে বিস্ময়, ঘৃণা আর ক্রোধ ফুটে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। তার স্বামী তার কানে কানে যা বলল তাতে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তার মধ্যে। উদাসীন থেকে সে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

সে বলল, অসম্ভব! আমাদের মেয়েরা খালি পায়ে এবং তাদের গায়ে কোনও পোশাক নেই। অথচ ঐ মেয়েটার গায়ে দুশো ফ্রাঁর পোশাক এবং ওকে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার মতো দেখাচ্ছে। তোমার কথা ঠিক নয়। একটা কথা, সেই মেয়েটা তো দেখতে কুৎসিত ছিল, কিন্তু এই মেয়েটা তো দেখতে মোটেই খারাপ নয়। এ কখনো সেই মেয়ে নয়।

আমি বলছি সে-ই। পরে দেখবে তুমি।

জনদ্রেত্তের এই দৃঢ় আশ্বাসে তার স্ত্রী আরও হতবুদ্ধি হযে উঠল। সে বিহ্বলভাবে ছাদের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চওড়া মুখখানা বিকৃত হযে উঠল। মেরিয়াসের মনে হলো সে তার স্বামীর থেকে আরও ভযঙ্কব হযে উঠেছে। একটা শূকরী যেন বাঘিনীব মূর্তি ধারণ করেছে।

সে বলতে লাগল, সেই মেযেটা। এক সম্ভ্রান্ত মহিলার মতো পোশাক পবে এসে আমার মেযেদের সঙ্গে করুণার সঙ্গে কথা বলছে। আমার মনে হচ্ছে ওর পেটের উপর পা দিযে দাঁড়াই।

বিছানা থেকে উঠে সে স্তব্ধভাবে বসে বইল। মাথাব চুলগুলো আলুথালু হযে উঠেছে তার, নাসাবন্ধ্র দুটি কাঁপছে। মুখটা অর্ধ বিস্ফারিত। তার হাত দুটো ঘুষি পাকিয়ে উঠল। এই অবস্থায সে আবার বিছানায় শুযে পড়ল।

কিন্তু তার স্বামী তার এই অবস্থার দিকে না তাকিযে ঘবটার মধ্যে আবার নীরবে পায়চারি করতে শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, আর একটা কথা শুনবে?

কি কথা?

সে নিচু গলায় বলল, এতে আমাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে।

তার স্ত্রী তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যাতে মনে হলো সে ভাবছে তাব স্বামীর বোধশক্তি রহিত হয়ে পড়েছে।

তার স্বামী বলে যেতে লাগল, আমি অনেক বাজে কাজে ঘুরে বেড়িযেছি। ক্ষুধায খাদ্য চেয়ে উপবাস এবং অনশন পেযেছি। শীতের তাপ চেযে শীতে জমে গিযেছি। এইভাবে পথের কুকুরের মতো ঘুরে বেড়ানো আর আমার ভাল লাগে না। ঈশ্বরেব এক নিষ্ঠুর পরিহাস আর আমি পছন্দ করি না। আমি এখন যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয চাই। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে চাই। আমি চাই অনায়াসলব্ধ সচ্ছলতা। এবার আমার পালা। মরার আগে আমিও লক্ষপতির মতো জীবনকে উপভোগ করতে চাই।

সে আবার পায়চারি করতে করতে বলল, আমি এবং আরও কয়েকজন।

তার স্ত্রী বলল, কি বলতে চাইছ তুমি?

কি বলতে চাইছি? বলছি কি বলতে চাইছি—

তার স্ত্রী বলল, চুপ করো। আস্তে বল। তেমন কিছু হলে বাইরের কেউ যেন না শোনে।

বাইরের কে? পাশের ঘরের লোকটা? আমি কিছুক্ষণ আগে তাকে বেরিয়ে

যেতে দেখেছি। কাজেই সে শুনছে এটা ভেবো না। আমি বলছি আমি তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি।

জনদ্রেত্তে গলার স্বরটা নিচু করলেও তার কথা শুনতে অসুবিধা হচ্ছিল না মেরিয়াসের। তবে তার সব কথা শুনতে পাওয়ার আর একটা কারণ হলো তুষারপাত। বাইরে তুষারপাতের জন্য রাস্তার যানবাহনের কোনও শব্দ আসছিল না ঘরে।

জনদ্রেত্তে বলতে লাগল, শোন। ঐ পরোপকারী ভদ্রলোককে আমি পেয়ে গেছি। সে আমার থলের ভিতর ভরা আছে ধরে নিতে পার। আমি কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলেছি। সে ছটার সময় আসছে ষাট ফ্রাঁ নিয়ে। সব ঠিক হয়ে আছে। আমি তাকে বাড়ি ভাড়ার কথা কেমন বানিয়ে বলেছি। সে ছটার সময় যখন আসবে, পাশের ঘরের প্রতিবেশী তখন বাইরে খেতে যাবে হোটেলে এবং এগারোটার আগে আসবে না। বুড়ী বুগনল ঘর পরিষ্কারের কাজে যাবে। এখানে জনপ্রাণীও থাকবে না। মেয়েরা বাইরে পাহারা দেবে। তুমি সাহায্য করবে। সুতরাং সে ফাঁদে পড়বেই।

কিন্তু মনে করো সে যদি না আসে।

জনদ্রেত্তে বলল, আমরা জানি তখন কি করতে হবে।

মেরিয়াস আজ প্রথম হাসতে দেখল জনদ্রেত্তেকে। তার নিষ্ঠুর হিমশীতল হাসির শব্দে বুকটা কেঁপে উঠল তার। জনদ্রেত্তে আলমারি খুলে একটা টুপি বার করে পরল মাথায়। তারপর সে বলল, আমাকে এখন বাইরে যেতে হবে। আরও লোক আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এ এক বড় খেলা। আমি শিগগির ফিরে আসব। তুমি বাড়িতে থাক।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি ভেবে নিয়ে জনদ্রেত্তে আবার বলল, সে আমাকে চিনতে পারেনি এটা ভাগ্যের কথা। সে আমায় চিনতে পারলে আর আসত না। আমার এই দাড়িটাই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে।

সে আবার হাসতে লাগল। সে জানালার ধারে গিয়ে দেখল, বাইরে বরফ পড়ছে। তা দেখে বলল, কি বাজে আবহাওয়া।

এই বলে গরম কোটটা পরল। বলল, কোটটা বড় হচ্ছে। লোকটা কোটটা রেখে যাওয়ায় খুব ভাল হয়েছে। তা না হলে বেরোতে পারতাম না। তাহলে সব সুযোগ হারাতে হত। এক একসময় ঘটনার যোগাযোগটা ভালই হয়।

টুপিটা মুখের সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে পড়ল জনদ্রেত্তে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দরজা ঠেলে আবার সে ঘরে ঢুকল। সে বলল, একটা কথা বলছি। তোমার কয়লার আগুনটা জ্বেলে রাখতে হবে।

মঁসিয়ে লেবলাঁর দেওয়া পাঁচ ফ্রাঁ পকেট থেকে বার করে জনদ্রেত্তে তার স্ত্রীর হাতে দিল।

তার স্ত্রী বলল, কয়লার আগুন?

হ্যাঁ।

কত কয়লা চাই?

দু' কিলো মতো।

তাহলে তিরিশ স্যু লাগবে। বাকি পয়সাতে আমি রাতের খাবার ব্যবস্থা করব।

মোটেই না।

কেন নয় ?

এর থেকে আর কোনও খরচ করলে চলবে না। আমাকে একটা জিনিস কিনতে হবে।

কি জিনিস ?

কিছু একটা -এখানে কোনও কামারশাল আছে ?

রু। মুফেতার্দে আছে।

হ্যাঁ, জায়গাটা আমি জানি।

তোমার জিনিসটার দাম কত হবে ?

দু-তিন ফ্রাঁ।

তাহলে তো রাতের খাওয়া তাতে হবে না।

না হয় না খেয়ে থাকতে হবে। কারণ এর থেকে দরকারী একটা কিছুর কথা ভাবতে হচ্ছে আমায়।

ঠিক আছে প্রিয়তম।

দরজাটা পিছন থেকে বন্ধ করে এবার চলে গেল জনদ্রেত্তে। মেরিয়াস সিঁড়িতে তার দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেল।

সেন্ট মেদার্দ গীর্জার ঘড়িতে বেলা একটা বাজল।

১৩

দিবাস্বপ্নে প্রায়ই মত্ত হয়ে থাকলেও মেরিয়াস সময়মতো দৃঢ়তার সঙ্গে কোনও কাজে নেমে পড়তে পারত। সে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করার ফলে অলস হয়ে ওঠে এবং করুণা ও সহানুভূতি এই গুণ দুটি তার মধ্যে গড়ে ওঠে। পরোপকাব প্রবৃত্তির সঙ্গে তার মধ্যে বিচারকের এক কঠোরতা ছিল। সে যেমন এক ব্যাঙের উপর দয়া দেখাত, তেমনি বিষাক্ত সাপকে পা দিয়ে মাড়িযে দিতে পারত। সে যে ঘরের দিকে ফুটো দিয়ে তাকিয়ে ছিল সেটা সত্যিই এক বিষাক্ত সাপের গর্ত, রাক্ষসদের গুহা। সেখানে যেন কোনও মানুষ থাকে না।

নিজের মনে মেরিয়াস বলল, এই বদমাস দুর্বৃত্তগুলোকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

কিন্তু তাদের যে সব কথা সে শুনতে পেয়েছে সে কথায় কোনও রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তাতে শুধু রহস্যটা ঘোরালো হয়েছে আরও। সে লুক্সেমবুর্গের বাগানে দেখা সেই মেয়েটি আর তার পিতার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি। শুধু এইটুকু জেনেছে যে জনদ্রেত্তে তাদের চেনে। তাদের কথাবার্তা থেকে আর একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে। সেটা হচ্ছে এই যে মঁসিয়ে লেবলাঁদের জন্য একটা ফাঁদ পাতা হচ্ছে। এটা সত্যিই ভয়ের কারণ। জনদ্রেত্তের সব কৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে মাকড়শার জালের মতো এই চক্রান্তজাল ছিন্নভিন্ন করে দিতে হবে।

সে দেখল জনদ্রেত্তের স্ত্রী ঘরের কাজ করছে। সে খুব সাবধানে কোনও শব্দ না করে টেবিল থেকে নেমে পড়ল। জনদ্রেত্তে যে ফাঁদ পেতেছে তার জন্য তার মনে ভয় হলেও সেই সঙ্গে একটা খুশির আলোও উঁকি মারছিল সেই ভয়ের অন্ধকারে। সে তার প্রিয়তমার জন্য কিছু করবে, তাদের কোনও উপকারে লাগবে এই ভেবে আনন্দ জাগছিল তার মধ্যে।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? সে তো তাদের বাসার ঠিকানা জানে না যে আগে থেকে সতর্ক করে দেবে তাদের। তারা এখানে এসেই কিছুক্ষণের মধ্যে চলে গেছে। অবশ্য ছটার সময় পথে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের সাবধান করে দিতে পারে। কিন্তু জনদ্রেত্তে আর তার দলের লোকরা নিশ্চয় বাড়ির বাইরে পথে আগে হতেই দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন রাস্তা ফাঁকা থাকবে এবং তাতে তাকে দেখে চিনতে পারবে। তাহলে তারা হয়ত তাকে তাড়িয়ে দেবে সেখান থেকে অথবা তুলে নিয়ে যাবে।

তখন বেলা একটা বাজে। আর পাঁচ ঘণ্টা সময় হাতে আছে। তার মধ্যে কিছু না কিছু করতে হবে। একটা মাত্র উপায় আছে। সে তার ভাল পোশাকটা পরে মাথায় টুপি চাপিয়ে আর গলায় চাদর জড়িয়ে বাড়ি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল।

সে বুলভার্দ অঞ্চলটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে পেতিত ব্যাঙ্কিয়েরের কাছে চলে গেল। এ রাস্তাটা নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল দু'ধারে। পাঁচিলটা ডিঙিয়ে পার হওয়া যায়। পাঁচিলটার ওধারে কিছু পতিত জমি আছে। মেরিয়াস পাঁচিলটার ধার দিয়ে যাচ্ছিল। সহসা কয়েকজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। তখন বরফ পড়ছিল। বরফ পড়ার ফলে পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল তার। তার উপর চিন্তায় মাথাটা ভারী হয়ে ছিল তার; মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেও সে চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। উজ্জ্বল দিনের আলোয় সে কাউকে দেখতে না পেয়ে সে পথের ধারের পাঁচিলের ওপাশটা একবার দেখল।

দেখল দু'জন লোক ওধারে পাঁচিলটার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে কথা বলছে। তাদের কাউকে চেনে না সে। তাদের মধ্যে একজনের মুখে দাড়ি আর মাথায় টুপি ছিল এবং তার পরনে ছিল একটা আলখাল্লা। অন্যজনের পোশাকটা ছিল ছেঁড়াখোঁড়া আর তার একমাথা লম্বা লম্বা চুল ছিল। তার মাথায় টুপি ছিল না বলে তার মাথার চুলে বরফের কণাগুলো চকচক করছিল। পাঁচিলের উপর ঝুঁকে তাদের কথা শুনতে লাগল মেরিয়াস।

লম্বা চুলওয়ালা লোকটা বলল, পেত্রন মিনেত্তে যখন একসঙ্গে আছে তখন তা কিছুতেই ব্যর্থ হবে না।

দাড়িওয়ালা লোকটা বলল, তুমি তাই মনে করো?

হ্যাঁ, নিশ্চয়, পাঁচশো ফ্রাঁ করে প্রত্যেকেই পাবে। আর তাতে খারাপ কিছু যদি হয় তো পাঁচ বছরের জেল।

মাথায় গ্রীক টুপি পরা লোকটা টুপির নিচে মাথাটা চুলকে বলল, এ টাকা হাতছাড়া করা উচিত হবে না।

চুলওয়ালা লোকটা বলল, কাজটা ঠিক হবে। তবে মাস্টার হোয়াটসিটকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ওরা গতকাল থিয়েটারে দেখা এক নাটক নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে মেরিয়াস চলে গেল সেখান থেকে।

মেরিয়াসের মনে হলো যে কথাগুলো সে তাদের মুখ থেকে শুনল, জনদ্রেত্তের চক্রান্তের সঙ্গে তার নিশ্চয় একটা সম্পর্ক আছে। লোক দুটো এই তুষারপাতের মধ্যে সন্দেহজনকভাবে বসে এ বিষয়েই নিশ্চয় আলোচনা করছিল।

মেরিয়াস ফবুর্গ সেন্ট মার্সের পথে এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই যে দোকানটা পেল সেখানে সে জিজ্ঞাসা করল, এ অঞ্চলে সবচেয়ে কাছে যে থানা আছে তার ঠিকানাটা কি?

দোকানদার বলল, তার ঠিকানা হচ্ছে ১৪ নম্বর র‍্যু দ্য পঁতয়।

থানার দিকে যেতে যেতে মেরিয়াস ভাবল আজ রাতে তার খাওয়া হবে না। তাই সে একটা রুটির দোকান থেকে একটা পাঁউরুটি নিয়ে সেটা খেয়ে আবার পথ চলতে লাগল।

সে আরও ভাবল; ভাগ্যের বিধান ফলবেই। সে যদি জনদ্রেত্তের বড় মেয়েকে পাঁচ ফ্রাঁ না দিত এবং সেটা যদি তার কাছে থাকত তাহলে গাড়িভাড়া করে মঁসিয়ে লেবলাঁকে অনুসরণ করত তার ঠিকানা দেখার জন্য। তাহলে সে জনদ্রেত্তের চক্রান্তের কথা কিছুই জানতে পারত না। তাহলে মঁসিয়ে লেবলাঁ আর তার মেয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন হত।

১৪

থানায় পৌঁছে মেরিয়াস একতলায় অফিসে গিয়ে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

একজন কেরানি বলল, তিনি এখন নেই। একজন ইনস্পেকটার কাজ করছেন তাঁর জায়গায়। আপনার কি বিশেষ দরকার আছে?

হ্যাঁ।

কেরানি তাকে একটা ঘর দেখিয়ে দিল। মেরিয়াস সেই ঘরে গিয়ে দেখল, একজন লম্বা লোক একটা বড় কোট পরে দাঁড়িয়েছিল একটা বড় স্টোভের ধারে। তার মুখটা চওড়া, পাতলা ঠোঁট, ধূসর রঙের ঘন গালপাট্টা ছিল দু'গালে। তার চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ আর সন্ধানী। তবে জনদ্রেত্তের থেকে তাকে কম হিংস্র আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

ইনস্পেকটার কোনও ভণিতা না করে বলল, কি চান আপনি?

আপনিই কি পুলিশ কমিশনার?

তিনি বাইরে গেছেন। আমি তাঁর জায়গায় আছি।

বিশেষ গোপনীয় ব্যাপার।

বলুন আমাকে।

ব্যাপারটা জরুরিও বটে।

তাড়াতাড়ি বলুন।

তার হিমশীতল কঠোরতা একই সঙ্গে মানুষকে হতবুদ্ধি করে দেয় এবং আশ্বস্ত করে। সে মেরিয়াসের মনে ভীতি আর আস্থার সঞ্চার করছিল।

মেরিয়াস সব কথা খুলে বলল। বলার আগে প্রথমেই বলল তার নাম মেরিয়াস পঁতমার্সি, একজন উকিল। সে বলল, একজন ভদ্রলোককে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভদ্রলোক তার শুধু মুখচেনা। সে এই চক্রান্তের ব্যাপারটা সব শুনেছে, কারণ চক্রান্তকারী লোকটি তার পাশের ঘরে থাকে। চক্রান্তকারী শয়তানটার নাম হলো জনদ্রেত্তে। এ ব্যাপারে তার কিছু সহকারী আছে। এই সব সহকারীদের মধ্যে পানশাদ নামে একটা লোক আছে যে প্রিস্তানিয়ের ও বিগ্রেনেল নামেও পরিচিত। জনদ্রেত্তের স্ত্রী ও তার দুই মেয়েও এর সঙ্গে জড়িত আছে। সে পরোপকারী ভদ্রলোকের নাম জানে না বলে আগে হতে তাঁকে সাবধান করে দিতে পারেনি। ঘটনাটা ঘটবে সন্ধে ছটার সময়। জায়গাটা বুলভার্দ অঞ্চলের ৫০-৫২ নম্বর বাড়িটা।

বাড়িটার কথা শুনে ইনস্‌পেকটার মেরিয়াসের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, ওদের ঘরটা বারান্দার শেষ প্রান্তে?

মেরিয়াস আশ্চর্য হয়ে বলল, হ্যাঁ, আপনি বাড়িটা জানেন?

ইনস্‌পেকটাব কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবার পর বলল, মনে হয় জানি। মনে হচ্ছে পেট্রন মিনিত্তে এ ব্যাপারে জড়িত আছে।

কথাটায় চৈতন্য হলো মেরিয়াসের। সে বলল, এই নামটা কিছুক্ষণ আগে আমি শুনেছি।

এই বলে সে পথে আসতে আসতে দুটো লোকের মুখ থেকে যা যা শুনেছিল তা সব বলল।

ইনস্‌পেকটার বলল, চুলওয়ালা লোকটার নাম হয়ত ব্রুর্জ র দাড়িওয়ালা লোকটা হলো ডেনি লিয়ার্দ বা দিউ মিলিয়ার্দ। আপনি শুধু এই দু'জনকে দেখেছেন? আর কাউকে দেখেননি?

মেরিয়াস বলল, না।

ইনস্‌পেকটার বলল, ওদের সাধারণত দিনের বেলায় দেখা যায় না। আমি বাড়িটা চিনি।

কিছুক্ষণ আপন মনে বিড় বিড় করে কি বলার পর ইনস্‌পেকটার বলল, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো?

মেরিয়াস বলল, না, কি কথা?

মেরিয়াসকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে ইনস্‌পেকটার বলল, আপনি একজন সাহসী এবং সৎ লোকের মতো কথা বলছেন। সাহসীরা অপরাধীদের ভয় পায় না আর সৎ লোকেরা শাসন কর্তৃপক্ষকে ভয় পায় না।

মেরিয়াস সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঠিক আছে। আপনি কি বলতে চান ?

ইনস্‌পেকটার বলল, ঐ বাড়িতে যারা থাকে তাদের বাড়ি ঢোকার সদর দরজার চাবি একটা করে থাকে। আপনার কাছে সেই চাবিকাঠি আছে ?

মেরিয়াস বলল, হ্যাঁ আছে।

তাহলে আমাকে সেটা দিন।

মেরিয়াস পকেট থেকে চাবিকাঠিটা বার করে সেটা দিয়ে বলল, আমার কথা যদি শোনেন তাহলে সেখানে একা যাবেন না।

ইনস্‌পেকটার এমনভাবে মেরিয়াসের দিকে তাকাল যাতে সে বোঝাতে চাইল কোনও গ্রাম্য স্কুলমাস্টারের পক্ষে ভলতেয়ারের মতো লোককে কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে যাওয়া যেমন অবাস্তব ও হাস্যাস্পদ ব্যাপার তেমনি তার মতো একজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারকে তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে যাওয়াও অবান্তর ও এক হাস্যাস্পদ ব্যাপার। এবার সে তার বড় কোটটার পকেট থেকে দুটো পিস্তল বার করে বলল, এই দুটো রেখে দিন। এর মধ্যে দুটো করে গুলি ভরা আছে। এখন বাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকুন যাতে ওরা বুঝতে পারে আপনি বাইরে আছেন। সেই ফুটোটা দিয়ে ওদের ঘরটার ভিতর লক্ষ্য রাখবেন, তারা এলে ওরা যা করে করবে। ওদের করতে দেবেন। যখন দেখবেন বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ঘটনা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন পিস্তল থেকে একটা গুলি করবেন। তার পর আমি হস্তক্ষেপ করব। সব ভার নেব। ছাদের দিকে অথবা ঘরের যে কোনও জায়গায় গুলি করবেন। তবে দেখবেন তাড়াহুড়ো করে কিছু করবেন না। ওদের কিছু একটা করা চাই। কারণ সাক্ষ্যপ্রমাণের দরকার। আপনি একজন উকিল। আমি কি বলতে চাইছি তা আপনি জানেন।

মেরিয়াস পিস্তল দুটো নিয়ে তার জামার পাশপকেটে রাখল।

ইনস্‌পেকটার বলল, পকেট থেকে দেখা যাচ্ছে। আপনি ও দুটো কোমরে গুঁজে রাখুন।

মেরিয়াসকে যা বলা হলো তাই করল।

ইনস্‌পেকটার বলল, আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। এখন সময় কত ? আড়াইটা। ওরা কখন আসবে, সাতটায় না ?

না, ছটায়।

ঠিক আছে। আমি বেশকিছুটা সময় পেলাম। তবে আমি যা বললাম ভুলবেন না। একটা গুলি পিস্তল থেকে করবেন।

মেরিয়াস ঘর থেকে চলে যাবার উদ্যোগ করে বলল, আমি তা করব।

ইনস্‌পেকটার বলল, আর একটা কথা। তার আগে যদি আমাকে প্রয়োজন বোঝেন তাহলে আপনি চলে আসবেন অথবা কাউকে পাঠাবেন। আমার নাম জেভার্ত।

১৫

বেলা তিনটের সময় কুরফেরাক র‍্যু মুফেতার্দ অঞ্চলে বোসেতের সঙ্গে বেড়াচ্ছিল।

তখন বরফ পড়ছিল, বোসেত বলছিল, তুষারকণা দেখে মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য সাদা সাদা প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আমাদের ছেঁকে ধরছে।

হঠাৎ রাস্তায় মেরিয়াসকে ব্যারিয়েরের পথে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে যেতে দেখে কথা থামিয়ে দিল কুরফেরাক। বলল, মেরিয়াসকে দেখছি। এখন ওর সঙ্গে কথা বলা ঠিক হবে না।

বোসেত বলল, কেন বলা উচিত হবে না?

দেখছ না ও খুব ব্যস্ত?

কিন্তু ও কি করছে?

ওর চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ও কারো অনুসরণ করছে।

দেখে তা তো মনে হচ্ছে না। কিন্তু কাকে ও অনুসরণ করছে?

হয়ত কোনও মেয়েকে দেখে ওর ভাল লেগেছে।

কিন্তু কোনও মেয়েকে তো কোথাও দেখছি না।

কুরফেরাক মেরিয়াসের দিকে তাকিয়ে বলল, ও একটা লোককে অনুসরণ করছে।

ওরা দেখল যে লোকটাকে অনুসরণ করছিল মেরিয়াস সে মাথায় টুপি পরে মেরিয়াসের আগে আগে তার মাত্র কুড়ি পা দূরে যাচ্ছিল। ওরা শুধু লোকটার পিছনটা দেখতে [illegible]ছিল। তবে ওরা বেশ বুঝতে পারছিল লোকটার মুখে দাড়ি আছে। লোকটা একটা নতুন ওভারকোট আর একটা ছেঁড়াখোঁড়া কাদা-লাগা পায়জামা পরেছিল।

বোসেত হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, লোকটা কে?

কুরফেরাক বলল, নিশ্চয় কোনও কবি। একমাত্র কবিরাই ভবঘুরের মতো ছেঁড়া ময়লা পায়জামা আর লর্ডদের মতো ওভারকোট পরে।

বোসেত বলল, চল, ওদের পিছু নেওয়া যাক।

কুরফেরাক বলল, কি বোসেত, তুমি কি পাগল হয়েছ? একটা লোক একটা লোককে অনুসরণ করছে, তুমি আবার তার অনুসরণ করতে চাও?

ওরা দু'জনে অন্য পথ ধরে চলে গেল।

মেরিয়াস জনদ্রেত্তেকে মুফেতার্দে দেখতে পায়। সে কোথায় যায় বা কি করে তা দেখার জন্য সে তার পিছু নিল। তার কেউ পিছু নিয়েছে একথা মোটেই বুঝতে পারেনি জনদ্রেত্তে। সে নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে যাচ্ছিল। সে প্রথমে র‍্যু গ্রেসিউজে গিয়ে একটা বাড়িতে মিনিট পনের কাটাল। তারপর সে র‍্যু মুফেতার্দের একটা কামারশাল হতে কাঠের বাঁটওয়ালা একটা লোহার বাটালি নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর র‍্যু দ্য পেতিত ব্যাঙ্কিয়েরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। মেরিয়াস দেখল রাস্তাটা ফাঁকা এবং এমত অবস্থায় তাকে অনুসরণ করা ঠিক হবে না। মেরিয়াস দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। দেখল জনদ্রেত্তে রাস্তার ধারের সেই পাঁচিলটা পার হয়ে সেই পতিত জায়গাটায় চলে গেল।

মেরিয়াস ঠিক করল জনদ্রেত্তে বাসায় ফেরার আগেই সে ফিরে যাবে। সেইটাই ঠিক হবে। তাছাড়া মাদাম বুগনল কাজ করতে বেরিয়ে গেলে সদর দরজায় চাবি দিয়ে যাবে। তার কাছে যে বাড়তি চাবি ছিল তা সে ইনস্পেকটারকে দিয়ে দিয়েছে।

তখন অন্ধকার হয়ে আসছিল। আকাশে চাঁদ উঠছিল ধীরে ধীরে। সালপেত্রিয়ের চারদিকে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালিয়ে বাসার দিকে ফিরে যেতে লাগল মেরিয়াস। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দার দেওয়ালে পিঠ দিয়ে নিঃশব্দে তার ঘরটায় চলে গেল। সদর দরজাটা তখনো খোলা ছিল বলে বাড়িটাতে সহজেই ঢুকতে পারল। বারান্দার ধারের ঘরগুলোয় তখন কোনও ভাড়াটে ছিল না বলে মাদাম বুগনল খুলে রাখত। মেরিযাস একটা খোলা ঘরে চকিতে দৃষ্টি ফেলে দেখল চারজন লোক স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তাদের মাথাগুলো অল্প অল্প দেখা যাচ্ছিল। সে এর থেকে বেশি আর কিছু দেখতে চাইল না। তাকেও কেউ দেখতে পেল না। এইভাবে অদৃশ্য অবস্থায় সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঠিক সময়েই এসে পড়েছে সে। কারণ সে ঢোকার পরমুহূর্তেই মাদাম বুগনল সদর দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

১৬

মেরিয়াস তার বিছানার উপর বসে পড়ল। তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। আর মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে। তার দেহের শিরায় শিরায় রক্তচলাচলের গতিবেগ এত বেড়ে গিয়েছিল যে সে যেন তার রক্তস্রোতের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়ান্ধকারে অপরাধীরা যেন সমবেত হচ্ছে। অন্য দিকে অন্যায়ের হাতে ন্যায়ের নির্জিত হবার সময় এগিয়ে আসছে। সে ঠিক ভয় পায়নি। তবে একটু পরে কি ঘটবে তা ভাবতে গিয়ে বুকটা কেঁপে উঠছিল তার। আজ সারাদিন ধরে যা যা ঘটে গেছে তা সব একটা দুঃস্বপ্নের কতকগুলো অস্পষ্ট ছায়াদৃশ্য বলে মনে হচ্ছিল। শুধু তার কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তল দুটোয় হাত পড়তেই বাস্তবসচেতন হয়ে উঠল সে।

তখন তুষারপাত একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। কুয়াশা ভেদ করে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিকে পড়ে থাকা সাদা তুষারের উপর চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে যে এক শুভ্র-উজ্জ্বল আভার সৃষ্টি হয় সেই আভার একটা অংশ মেরিয়াসের ঘরে এসে পড়েছিল। জনদ্রেত্তের ঘরে একটা আলো জ্বলছিল। মেরিয়াস দেওয়ালের উপর দিকের সেই ফুটোটা দিয়ে দেখল নিস্তব্ধ ঘরখানার মধ্যে রক্তচক্ষুর মতো লাল আগুনের একটা ক্ষীণ শিখা দেখা যাচ্ছিল। ওটা কোনও বাতির আলো নয়, এক জ্বলন্ত আগুন। ঘরখানা এতদূর নিস্তব্ধ যে আগুনটা না থাকলে সেটাকে আস্ত সমাধিগহ্বর বলে মনে হত।

পায়ের জুতো খুলে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ছিল মেরিয়াস। এমন সময় সদর দরজাটা খোলার শব্দ হলো এবং তারপর জনদ্রেত্তে তার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। ঠিক সেই সময় বারান্দার ধারের একটা ঘরে যে চারজন লোককে অন্ধকারে সন্দেহজনকভাবে অপেক্ষা করতে দেখেছিল মেরিয়াস তারা এসে দেখা করল জনদ্রেত্তের সঙ্গে। নেকড়ে বাচ্চাগুলো যেন নেকড়েমাতা আসার সঙ্গে সঙ্গে সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠেছে।

ঘরে ঢুকেই জনদ্রেত্তে বলল, আমি এসে গেছি।

মেয়েরা বলল, শুভ সন্ধ্যা বাবা।

তার স্ত্রী বলল, এস।

জনদ্রেত্তে বলল, সব ভালভাবেই হয়ে গেছে। কিন্তু আমার পা দুটো শীতে জমে গেছে। আমি দেখছি তোমরা পোশাক পরেছ। ভাল।

মেয়েরা বলল, আমরা বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত।

আমি যা যা বলেছি তোমরা তা যেন ভুলবে না। ঠিক ঠিক সব করবে তো?

কিছু ভাববে না।

জনদ্রেত্তে এবার একটা ভারী জিনিস তার হাত থেকে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল। যে বাটালিটা সে কামারশাল থেকে কিনে এনেছিল সেইটা বোধ হয়।

সে তার স্ত্রীকে বলল, খাবার কিছু আছে?

তার স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, তিনটে বড় আলু ছিল, সিদ্ধ করে রেখেছি।

ভাল করেছ। আগামীকাল আমি তোমাদের খুব ভাল করে অনেক কিছু খাওয়াব। কাল তোমরা রাজরাজড়াদের মতো খাবে।

এরপর গলার স্বরটা অনেক নামিয়ে সে ফিসফিস করে বলল, আগুনে ওটা ফেলে দাও। এবার এখন ফাঁদ তৈরি, বিড়ালরা অপেক্ষা করছে। ইঁদুর এসে ফাঁদে পড়লেই হলো।

মেরিয়াস শুনতে পেল, কি একটা লোহাব জিনিস কয়লার আগুনে ফেলে দেওয়া হলো।

জনদ্রেত্তে বলল, দরজার কব্জায় তেল দিয়েছিলে যাতে শব্দ না হয়?

তার স্ত্রী বলল, হ্যাঁ।

এখন ক'টা বাজে?

ছ'টা বাজতে চলেছে। সেন্ট মেদার্দে সাড়ে পাঁচটার ঘণ্টা পড়ে গেছে।

জনদ্রেত্তে বলল, এবার মেয়েরা পাহারা দিতে চলে যাবে। শোন তোমরা, মাদাম বুগনল চলে গেছে?

তার স্ত্রী বলল, হ্যাঁ গেছে।

তোমরা জান পাশের ভদ্রলোক নেই?

উনি তো আজ সারাদিনই ছিলেন না। এখন আবার রাতের খাওয়ার সময়।

তোমরা ঠিক জান তো?

হ্যাঁ ঠিক।

ঠিক আছে। তবু একবার দেখে নেওয়ায় ক্ষতি কি?—এই নাও বাতিটা নিয়ে যাও।

মেরিয়াস সঙ্গে সঙ্গে টেবিল থেকে নেমে তার খাটের তলায় ঢুকে পড়ল গুড়ি মেরে। সে দেখল বড় মেয়েটি দরজা খুলে বাতি হাতে ঘরে ঢুকল। সে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বিছানার দিকে সরে এল। মেরিয়াস ভয় পেয়ে গেল। আসলে সে আসছিল

বিছানার উপর দেওয়ালে টাঙানো একটা বড় আয়নায় মুখটা দেখতে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজের মুখটা দেখতে লাগল। এমন সময় পাশের ঘর থেকে দুটো ধাতুর মধ্যে ঠোকাঠুকির শব্দ কানে এল।

মেয়েটি এক হাতে চুলটা আঁচড়াতে আঁচড়াতে মোটা গলায় গান গাইতে লাগল। গানের বাণীটি ছিল এই রকম : আমাদের প্রেম খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেছে। আমাদের সুখও সব এখন বিগত। মাত্র একটা সপ্তার জন্য পেয়েছিলাম আমার প্রেমিককে। কিন্তু প্রকৃত প্রেম চিরকালের। তা বেঁচে থাকে চিরকাল।

মেরিয়াস খাটের তলায় কাঁপতে লাগল ভয়ে। তার নিঃশ্বাসের শব্দ হয়ত শুনতে পাচ্ছে মেয়েটা।

মেয়েটা এবার জানালার ধারে গিয়ে আপন মনে বলল, মনে হচ্ছে সমস্ত প্যারিস শহরটা যেন একটা সাদা জামা পরেছে।

আবার সে আয়নার সামনে ফিরে এসে দাঁড়াল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল নিজেকে। তার বাবা হেঁকে বলল, কি করছিলি ?

মেয়েটি বলল, আমি ঘরটার সব জায়গা খুঁজে দেখছি। ঘরে কেউ নেই।

এই বলে সে তার মাথার চুলটা ঠিক করতে লাগল।

তাহলে চলে এস। নষ্ট করার মতো সময় নেই।

ঠিক আছে, আমি আসছি।

সে আবার গানটা গাইতে লাগল। তুমি আমাকে ফেলে তোমার গৌরবের পথে চলে গেছ। কিন্তু আমার অন্তর তুমি যেখানেই যাবে অনুসরণ করবে তোমাকে ছায়ার মতন।

এরপর শেষবারের মতো একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে চলে গেল মেয়েটি। মেরিয়াস শুনতে পেল দুই বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তাদের বাবার গলা শোনা গেল, মনে রাখবে একজন থাকবে ব্যাঙ্কিয়েরের দিকে, আর একজন থাকবে ব্যারিয়েরের দিকে। বাড়ির সদর দরজার উপর থেকে চোখ সরাবে না কখনো। কোনও কিছু দেখলে দু'জনে এসে খবর দেবে আমাকে।

বড় মেয়েটি বলল, খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড়িয়ে পাহারা দেওয়া খুব ভাল কাজ।

জনদ্রেত্তে বলল, কাল তোমরা খুব ভাল জুতো পাবে।

এবার তারা দু'জনেই বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

মেরিয়াস দেখল এখন গোটা বাড়িটার মধ্যে জনদ্রেত্তে, তার স্ত্রী আর সেই অচেনা লোকগুলো ছাড়া আর কেউ নেই।

১৭

সময় বুঝে মেরিয়াস আবার টেবিলের উপর উঠে গিয়ে ফুটোটার মধ্য দিয়ে দেখতে লাগল। ঘরখানার মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছে। এখন একটা বাতি জ্বলছে। সেই

বাতির আলোয় মেরিয়াস দেখল জ্বলন্ত চুল্লীর উপর একটা লোহার কড়াই-এর উপর একরাশ জ্বলন্ত কয়লা চাপানো আছে। কড়াইটাও গরমে লাল হয়ে উঠেছে। জ্বলন্ত কয়লাগুলোর উপর আগুনের একটা নীলচে শিখা দেখা যাচ্ছিল। কম্পিত শিখাটাকে দেখে মনে হচ্ছিল সেটা যেন নাচছে। সেই আগুনের আভায় দেখা গেল কাছেই জনদ্রেত্তের কিনে আনা সেই বাটালিটা পড়ে আছে। ঘরটার এককোণে একগাদা লোহার টুকরো আর বেশ কিছু দড়ি পড়ে আছে। বাইরে থেকে ওদের ঘরটাকে যেন নরকের দ্বারের পরিবর্তে কামারশালের মতো মনে হচ্ছিল। জনদ্রেত্তে তেমনি একজন কামারের বদলে একটা দানব বলে মনে হচ্ছিল।

তপ্ত কড়াই-এর আগুনটা এত জোর ছিল যে তার আঁচে অদূরবর্তী বাতির মোমগুলো গলে গলে পড়ছিল চুল্লীর আগুনে। ধোঁয়াটা অবশ্য চিমনি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। জানালাগুলোর কাঁচের সার্সি দিয়ে চাঁদের আলোর ছটা দেখে মেরিয়াসের কবি মনে এই ভাব জাগল যে স্বর্গ থেকে যেন এক আলোর ছটা এসে মর্ত্যের এক কুৎসিত পরিবেশের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। জনদ্রেত্তের ঘরটা যেকোনও অপরাধমূলক কাজকর্মের পক্ষে খুবই প্রশস্ত ছিল। প্রথমত বাড়িটা ছিল প্যারিসের শহরতলীর এক নির্জন পরিবেশে। বাড়িটা বুলভার্দে অবস্থিত হলেও তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না। বাড়িটার এক দিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ দেখা যায। তাছাড়া বাড়িটাও নির্জন এবং পরিত্যক্ত-প্রায়। দুটো ছাড়া সব ঘরই খালি।

ভাঙা চেয়ারটায বসে পাইপ খেতে লাগল জনদ্রেত্তে। তার সঙ্গে তার স্ত্রী নিচু গলায় কথা বলছিল। পরিহাসরসিক কুরফেরাক এ দৃশ্য দেখলে জোর হেসে উঠত। রাজা দশম চার্লস-এর অভিষেকের সময় তাঁর প্রহরীরা যে কালো টুপি পরেছিল সেই ধরনের একটা কালো টুপি ছিল জনদ্রেত্তের স্ত্রীর মাথায়। তার গায়ে ছিল একটা পশমী স্কার্ট আর একটা শাল। তার পায়ে পুরুষদের একজোড়া জুতো যে জুতোর বিরুদ্ধে আজই সকালে তার মেয়ে অভিযোগ করে। তার এই বেশভূষা তার স্বামীর সমর্থন লাভ করেছে এবং তার মতে তার স্ত্রীকে এই বেশভূষায় সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। জনদ্রেত্তে নিজে তখনো মঁসিয়ে লেবলাঁর দেওয়া সেই ওভারকোটটা পরেছিল। তার ময়লা কাদা লাগা পায়জামাটার সঙ্গে কোটটার কোনও সঙ্গতি ছিল না। তার পোশাকের এই গরমলিটাকেই কুরফেরাক কবিসুলভ এক বৈপরীত্য বলে অভিহিত করেছিল।

সহসা গলার স্বরটা উঁচু করে জনদ্রেত্তে বলে উঠল, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল আমার। এই সময় সে ঠিক এসে পড়বে। লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে সদর দরজার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করো। গাড়িটা কাছে এলেই দরজাটা খুলে দেবে। তার পর তাদের সিঁড়িতে আলো দেখিয়ে উপরে নিয়ে আসবে। এসেই আবার নিচে গিয়ে গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গাড়িটাকে ছেড়ে দেবে।

তার স্ত্রী বলল, কিন্তু টাকার কি হবে?

জনদ্রেত্তে তার পকেট থেকে পাঁচ ফ্রাঁ বার করে তার স্ত্রীর হাতে দিল।

তার স্ত্রী বলল, কোথায় পেলে টাকাটা?

জনদ্রেত্তে গম্ভীরভাবে উত্তর করল, আজ সকালে পাশের ঘরের ভদ্রলোকের কাছ থেকে। আর একটা কথা। আমাদের দুটো চেয়ার চাই।

তার স্ত্রী শান্ত কণ্ঠে বলল, পাশের ঘর থেকে নিয়ে আসব?

জনদ্রেত্তে বলল, বাতিটা নিয়ে যাও।

তার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বলে গেল, বাতি চাই না। চাঁদের আলো আছে।

ভয়ের একটা হিমশীতল শিহরন খেলে গেল মেরিয়াসের প্রতিটি রক্তশিরায়।

মেরিয়াস দেখল এখন টেবিল থেকে নেমে খাটের তলায় গিয়ে লুকোন কোনওমতেই সম্ভব নয়।

সে তাই শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মেরিয়াস দেখল তার ঘরের দরজা ঠেলে একটা হাত অন্ধকারে হাতড়ে চেয়ারের খোঁজ করছে। জনদ্রেত্তের স্ত্রী ঘরের মধ্যে চারদিকে তাকালেও দেওয়ালের কাছটায় অন্ধকার জমে থাকায় সে দেখতে পেল না মেরিয়াসকে।

চেয়ার দুটো নিয়ে বেরিয়ে গেল জনদ্রেত্তের স্ত্রী। সে বেরিয়ে যেতেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

পাশের ঘরে গিয়ে স্ত্রী বলল, এই নাও চেয়ার।

তার স্বামী বলল, এই নাও লণ্ঠন। লণ্ঠন নিয়ে চলে যাও এখনি।

জনদ্রেত্তে চেয়ার দুটো টেবিলের দু' ধারে রাখল। বাটালিটা আগুনে একবার পুড়িয়ে নিয়ে জ্বলন্ত কয়লা ভরা কড়াইটার সামনে একটা পুরনো পর্দা টাঙিয়ে দিল যাতে সেটা চোখে না পড়ে। এরপর দড়িটার উপর ঝুঁকে কি দেখল সে। দড়িটা জনদ্রেত্তে তুলতেই মেরিয়াস দেখল ওটা শুধু দড়ি নয়, দড়ির একটা মই। তাতে কাঠের আংটা আর দু'দিকে দুটো লোহার হুক লাগানো আছে। এই দড়ির মইটা বা টুকরো লোহার কোনও যন্ত্রপাতি আজ সকালে ঘরের মধ্যে ছিল না। মেরিয়াস বাইরে গেলে সে এগুলো কিনে আনে দোকান থেকে। এই সব যন্ত্রপাতি দিয়ে ঘরের দরজা ও তালা ভাঙা যায়। কোনও কিছু কাটার জন্য চোরেরা এই সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে।

কড়াই-এর কয়লার আগুনটা আর দেখতে না পাওয়ায় শুধু বাতির আলোয় আলোকিত হয়ে রইল ঘরটা। বিভিন্ন বস্তুর ছায়া জমে ছিল এখানে-সেখানে। ছায়াকালো এক ভয়ঙ্কর প্রশান্তি আর কুটিল নীরবতা বিরাজ করছিল ঘরখানায়।

জনদ্রেত্তে কি ভাবছিল। তার মুখের পাইপটা নিভে গিয়েছিল। বাতির স্বল্প মৃদু আলোয় তার মুখের কুটিল রেখাগুলো দেখা যাচ্ছিল না। তার ভ্রূ দুটো ওঠানামা করছিল। তার হাত দুটো বারবার মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছিল আর খুলে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সে নিজের অন্তরের সঙ্গে লড়াই করছিল। সেই নিঃশব্দ নিবিড় অন্তর্দ্বন্দ্ব আর স্বগতোক্তির মধ্যে হঠাৎ একসময় টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে তার ভিতর থেকে একটা ছুরি বার করে তার ধারটা পরীক্ষা করে আবার সেটা রেখে দিল জনদ্রেত্তে।

মেরিয়াস একটা পিস্তল বার করে তার ডান হাতে নিল। সেটা খুলে দেখল তার মধ্যে টোটা ভরা আছে কি না। বন্ধ করতে একটা শব্দ হতেই জনদ্রেত্তে চমকে উঠল। বলে উঠল, কে?

মেরিয়াস শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় স্তব্ধ হয়ে রইল।

তারপর নিজের মনেই জনদ্রেত্তে বলল, ও কিছু না, আমারই মনের ভুল। মেরিয়াস পিস্তলটা তার হাতে ধরে রাখল।

১৮

দূরে সেন্ট মেদার্দ গীর্জার ঘড়িতে ছটা বাজল। জানালার কাঁচগুলো যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল। ছটা ঘন্টাই গুণতে লাগল জনদ্রেত্তে। শেষ ঘন্টাটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে বাতিটা নিবিয়ে দিল। তারপর সারা ঘরময় পায়চারি করতে লাগল অশান্তভাবে। সে আপন মনে বলতে লাগল, এখনো সে এল না।

এই বলে সে চেয়ারে বসতে যেতে না যেতেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল।

জনদ্রেত্তে দেখল তার স্ত্রী ঘরের সামনে বারান্দায় রয়েছে। সে কাকে বলল, দয়া করে ভিতরে আসুন মঁসিয়ে।

জনদ্রেত্তে তাড়াতাড়ি উঠে বলল, হে মহান পরোপকারী, ঘরের ভিতরে আসুন।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল মঁসিয়ে লেবলাঁ। তার প্রশান্ত গাম্ভীর্য এক স্বতন্ত্র মহিমা দান করেছিল তার চেহারাটাকে। সে ঘরে ঢুকেই টেবিলের উপরে চারটে লুই রাখল। তারপর বলল, এইটা আপনার বাড়িভাডা আর কেনাকাটার জন্য রাখুন। আর কি দরকার তা পরে দেখা যাবে।

জনদ্রেত্তে বলল, হে উদারহৃদয় মহান, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

এই বলে সে তার স্ত্রীকে ইশারায় গাড়ির ভাড়া মেটা[illegible] পাঠিয়ে দিল।

তার স্ত্রী চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। ইতিমধ্যে জনদ্রেত্তে মঁসিয়ে লেবলাঁকে একটা চেয়ারে বসিয়ে টেবিলের ধারে অন্য একটা চেয়ারে বসল।

বরফের মতো ঠাণ্ডা রাত্রি। পথে-ঘাটে পড়া তুষারকণার উপর চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছিল। রাস্তার আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলছিল। তার মাঝে এলম গাছে ঘেরা বুলভার্দ অঞ্চলের নির্জন পথটা বিস্তৃত হয়ে ছিল। গর্বোর আশেপাশে প্রায় এক মাইলের মধ্যে কোনও জনমানব ছিল না। জনদ্রেত্তের ঘরের মধ্যে তখন একটা বাতি জ্বলছিল। একই টেবিলের দু'ধারে দুটো চেয়ারে দু'জন লোক বসেছিল। একজনকে প্রশান্ত আর একজনকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল এবং একজন মহিলা ক্ষুধিত নেকড়ের মতো তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। অ[illegible] এ ঘরে মেরিয়াস একা পিস্তল হাতে সেই টেবিলটার উপর দাঁড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধভাবে এক দুর্ঘটনার অপেক্ষায় স্তব্ধ হয়ে ছিল।

মেরিয়াসের মনে তখন ভয়ের পরিবর্তে ছিল শুধু অপরিসীম ঘৃণা। পিস্তলের বাটে হাত দিয়ে সে নিজেকে আশ্বস্ত করে আপন মনে বলল, পশুটা কোনও অঘটন ঘটাতে চাইলে আমি তাকে থামাতে পারি। সে ভাবল পুলিশ নিশ্চয় কোথাও আড়ালে

লুকিয়ে আছে। পিস্তলের গুলির একটা আওয়াজ পেলেই ছুটে আসবে। তাছাড়া তার আশা হচ্ছিল মঁসিয়ে লেবলাঁর সঙ্গে জনদ্রেত্তের সংঘর্ষ বাধলে সে হয়ত অনেক রহস্যময় কথা জানতে পারবে। যে রহস্যের কথা সে এতদিন জানতে পারেনি, এই ঘটনা হয়ত তার উপর আলোকপাত করবে।

১৯

মঁসিয়ে লেবলাঁ এবার ঘরের দুটো শূন্য বিছানার দিকে তাকিয়ে বলল, আহত মেয়েটি কেমন আছে?

মুখে এক বিষণ্ন কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটিয়ে জনদ্রেত্তে বলল, ভাল। এখনো যন্ত্রণা হচ্ছে। তার দিদি তাকে হাসপাতালে ক্ষতটা ধোবার জন্য নিয়ে গেছে। এখনি ফিরে আসবে।

মঁসিয়ে লেবলাঁ বলল, মাদাম ফাবান্ত সেরে উঠেছেন দেখছি।

সে দেখল জনদ্রেত্তের স্ত্রী দরজার কাছে পাহারা দেবার ভঙ্গিতে ভাল পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

জনদ্রেত্তে বলল, সে এখনো দারুণ অসুস্থ। কিন্তু কি করা যাবে বলুন। তার মনের জোর খুব বেশি। সে যেন এক নারী নয়—যেন একটা ষাঁড়।

এ কথায় তার স্ত্রী অনুযোগের সুরে বলল, তুমি সব সময় আমার প্রশংসা করো মঁসিয়ে জনদ্রেত্তে।

মঁসিয়ে লেবলাঁ বলল, জনদ্রেত্তে? আমি তো জানতাম আপনার নাম ফাবান্ত।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল জনদ্রেত্তে, দুটোই আমার নাম। মঞ্চে যখন অভিনয় করতাম তখন আমার নাম ছিল জনদ্রেত্তে।

তার স্ত্রীর দিকে কড়াভাবে তাকাল জনদ্রেত্তে। মঁসিয়ে লেবলাঁ তা দেখতে পেল না।

জনদ্রেত্তে অন্য একটা বিষয়ের অবতারণা করে বলতে লাগল, আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে কত সুখে জীবন যাপন করেছি একদিন। কিন্তু আমাদের ভাগ্য বড় খারাপ স্যার। আমাদের কাজ করার ইচ্ছা আছে, কিন্তু কাজ নেই। আমি জানি না দেশের সরকার কি করছে। জ্যাকবিনদের আমি কোনও ক্ষতি করতে না চাইলেও আমি নিজে কিন্তু গণতন্ত্রবাদীদের মতো জ্যাকবিন নই। আমি এখন বাধ্য হয়ে আমাদের মেয়েদের প্যাকিং-এর ব্যবসা শেখাতে চাই। আমাদের আগে যে অবস্থা ছিল তার তুলনায় এটা এক হীন ব্যবসা, কিন্তু যাই হোক, সৎভাবে জীবন যাপন করতে হবে তো। আগেকার সৌভাগ্য আর সমৃদ্ধি তো আর নেই আমাদের। আমি ছবি আঁকার কাজ খুব ভালবাসি। কিন্তু সে কাজ আমায় ছেড়ে দিতে হবে, কারণ খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে তো।

জনদ্রেত্তে যখন শান্তভাবে এইসব অসংলগ্ন কথাগুলো বলে চলেছিল মেরিয়াস

তখন দেখল ঘরের মধ্যে এমন একজন এসে ঢুকল এর আগে সে ছিল না ঘরের মধ্যে। লোকটা এমন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল যে দরজায় কোনও শব্দ হলো না। তার গায়ে কোনও জামা ছিল না। গায়ে ছিল শুধু একটা ছেঁড়া ওয়েস্টকোট আর পায়ে দড়ি বাঁধা একজোড়া চটি। তার অনাবৃত হাতে উল্কি ছিল এবং তার মুখটা ছিল কালিমাখা। সে একটা বিছানায় জনদ্রেত্তের স্ত্রীর পিছনে বসল।

এক সহজাত প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মঁসিয়ে লেবলাঁ সেদিকে তাকিয়ে লোকটাকে দেখে চমকে উঠল। জনদ্রেত্তে তা লক্ষ্য করল। সে বলল, আপনি বোধ হয় আপনার ওভারকোটটা দেখছেন। এটা আপনি ওবেলায় রেখে গিয়েছিলেন আমার জন্য। কোটটা সত্যিই চমৎকার। তাই নয় কি ?

মঁসিয়ে লেবলাঁ বলল, ঐ লোকটি কে ?

জনদ্রেত্তে বলল, ও ? ও হচ্ছে আমার প্রতিবেশী, ওর দিকে নজর দেবার দরকার নেই।

ব্যাপারটাকে সত্যিই সহজভাবে নিল মঁসিয়ে লেবলাঁ। কারণ ফবুর্গ সেন্ট মার্সো অঞ্চলে ওযুধের কারখানায় যে সব শ্রমিক কাজ করে তাদের মুখগুলো এমনি দেখায়।

নিজেকে সামলে নিয়ে মঁসিয়ে লেবলাঁ বলল, আপনি কি বলছিলেন মঁসিয়ে ফাবান্ত ?

জনদ্রেত্তে বলল, আমি বলছিলাম, আমার একটা ছবি বিক্রি করার আছে।

দরজার কাছে একটা মৃদু শব্দ হলো। আর একজন লোক বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে সেই বিছানায় বসল। প্রথম লোকটার মতো তার হাত দুটোও অনাবৃত ছিল এবং তার মুখেও কালি ছিল। সে নিঃশব্দে প্রবেশ করলেও মঁসিয়ে লেবলাঁর দৃষ্টি তার উপর পড়ল।

জনদ্রেত্তে বলল, চিন্তার কোনও কারণ নেই। ওরা এই বাড়িতেই থাকে। আমার ছবিটা দামী। আপনি যদি অনুমতি দেন সেটা দেখাই আপনাকে।

সে উঠে গিয়ে দেওয়ালের কাছ থেকে একটা ছবি তুলে আনল। বাতির আলোয় দেখা গেল সেটা সত্যিই একটা বড় ছবি। মেরিয়াস ছবিটাকে ভাল করে দেখতে পেল না। কারণ জনদ্রেত্তে তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। মেরিযাস দেখল একটা প্ল্যাকার্ডের মতো পিচবোর্ডের উপর রং দিয়ে আঁকা একটা ছবি।

মঁসিয়ে লেবলাঁ বলল, এটা কিসের ছবি ?

জনদ্রেত্তে বলল, ছবিটা দারুণ এবং খুব দামী। ছবিটাকে আমি এবং আমার মেয়েরা খুব ভালবাসি। কিন্তু অবস্থার বিপাকে এটা বিক্রি করতে হবে আমায়।

মঁসিয়ে লেবলাঁ একটা অস্বস্তি বোধ করায় ছবিটা দেখতে দেখতে ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগল। দেখল তখন ঘরে চারজন বাইরের লোক এসে ঢুকেছে। তিনজন বিছানায় বসেছে আর একজন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সবারই হাতগুলো অনাবৃত ছিল এবং মুখগুলো কালিমাখা ছিল। সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। বিছানার উপর যারা বসে ছিল তাদের একজন চোখ বন্ধ করে অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিল। তাকে মনে হচ্ছিল সে ঘুমোচ্ছে। তার মাথার চুলগুলো একেবারে সাদা ছিল। অন্য দু'জন বয়সে যুবক। তাদেব পায়ে জুতো বা চটি ছিল না।

মঁসিয়ে লেবলাঁ তাদের দেখছে দেখে জনদ্রেত্তে বলল, ওরা সবাই আমার বন্ধু এবং প্রতিবেশী। ওরা সবাই কারখানার ফার্নেসে কাজ করে বলে ওদের মুখগুলো ময়লা এবং কালিমাখা। ওদের কথা ভাববেন না স্যার। আমার ছবিটা আপনি কিনুন। আমার দুরবস্থায় করুণা করুন। আমি আপনাকে সস্তায় দেব। এর কত দাম হতে পারে? আপনার কি ধারণা?

মঁসিয়ে লেবলাঁ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনদ্রেত্তের পানে তাকিয়ে বলল, ছবিটা একটা হোটেলের সামনে রাখা ছিল। এর দাম হবে তিন ফ্রাঁ।

জনদ্রেত্তে নরম গলায় শান্তভাবে বলল, আপনার কাছে টাকার ব্যাগটা আছে? আমি এটার জন্য চাই এক হাজার ক্রাউন।

মঁসিয়ে লেবলাঁ এবার সতর্ক হয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল জনদ্রেত্তে তার বাঁ দিকে আর তার স্ত্রী আর চারজন লোক দরজার কাছে তার ডান দিকে আছে। জনদ্রেত্তে তখন এমন সকরুণভাবে কথা বলে যাচ্ছিল যে মঁসিয়ে লেবলাঁ ভাবল এক দুর্ভাগ্যপীড়িত একজন মানুষ খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছে; তার কথা ও কাজের মধ্যে কোনও মিল নেই।

জনদ্রেত্তে বলে যেতে লাগল, আপনি যদি ছবিটা না কেনেন তাহলে আমাকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরতে হবে। আমি আমার মেয়েদের প্যাকিং-এর ব্যবসা করতে বলেছিলাম। কিন্তু তার জন্য একটা টেবিল ও অনেক যন্ত্রপাতি কিনতে হবে। ঘরটা পরিষ্কার রাখতে হবে। অনেক খেটে চার ঘণ্টা কাজ করে মাত্র চার স্যু পাওয়া যাবে। তাতে কখনো চলে?

কথা বলার সময় মঁসিয়ে লেবলাঁর দিকে তাকাচ্ছিল ন্যু জনদ্রেত্তে। কিন্তু মঁসিয়ে লেবলাঁর দৃষ্টি তার উপর বরাবর নিবদ্ধ ছিল। জনদ্রেত্তে শুধু বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। মেরিয়াঁস তখন তাদের দু'জনকেই দেখছিল। মঁসিয়ে লেবলাঁ শুধু তখন একটা কথাই ভাবছিল, লোকটা কি পাগল হয়ে গেছে! জনদ্রেত্তে তখন একটা কথাই বারবার বলে যাচ্ছিল, নদীতে ডুবে মরা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই। একদিন আমি মরতে গিয়েছিলাম...

সহসা তার চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলে উঠল। তার চেহারাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে মঁসিয়ে লেবলাঁর সামনে এসে বলল, ও সব কথা এখন থাক। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?

২০

ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। বাইরে থেকে আরও তিনজন লোক এসে ঢুকল। তাদের পরনে ছিল কালো আলখাল্লা আর মুখে কাগজের মুখোশ। প্রথম লোকটার হাতে ছিল একটা ধারাল দা। দ্বিতীয় লোকটার হাতে ছিল একটা কুড়ুল আর তৃতীয় লোকটার হাতে ছিল একটা বড় চাবি।

জনদ্রেত্তে হয়ত এদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে লোকগুলোকে বলল, সব ঠিক আছে?

একটা রোগা মতো লোক বলল, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

কিন্তু মঁতপার্নেসী কোথায় ?

সে আপনার বড় মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে।

গাড়ি প্রস্তুত ?

হ্যাঁ।

দুটো ভাল ঘোড়া ?

হ্যাঁ, খুব ভাল।

জনদ্রেত্তে বলল, ঠিক আছে।

মঁসিয়ে লেবলাঁর মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। ভীত হওয়ার থেকে সে বিস্মিত হলো বেশি। সে শুধু লোকগুলোকে দেখতে লাগল। সামনে টেবিলটাকে সে একটা বাধা হিসাবে ব্যবহার করতে চাইল। ভয়ের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। যে কত ভাল ব্যবহার করছিল সে হঠাৎ একজন বলিষ্ঠ ব্যায়ামবিদের মতো ভয়ঙ্করভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠল। সে তার চেয়ারের পিছনটা শক্ত হাতে ধরে ছিল। বিপদের মুখে তার সাহস বেড়ে যেত। সদাশয়তার মতো তার সহিষ্ণুতাও ছিল অসাধারণ। তা দেখে তার প্রেমাস্পদের পিতা হিসাবে মঁসিয়ে লেবলাঁর জন্য গর্ববোধ করতে লাগল মেরিয়াস।

যে তিনজন লোক কারখানার ফার্নেসে কাজ করে বলে পরিচয় দিয়েছিল জনদ্রেত্তে তারা ঘরের কোণে যেখানে কতকগুলো লোহার যন্ত্রপাতি ছিল সেখানে গিয়ে সেখান থেকে হাতুড়ি প্রভৃতি লোহার কতকগুলো অস্ত্র তুলে এনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বিছানায় যে বুড়ো লোকটা ঘুমোচ্ছিল তার পাশে বসেছিল জনদ্রেত্তের স্ত্রী।

মেরিয়াস ভাবল এবার তার পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ার সময় এসে গেছে। এবার পুলিশকে আসার জন্য সঙ্কেত জানাতে হবে। এদিকে জনদ্রেত্তে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে মঁসিয়ে লেবলাঁর দিকে ফিরে এক নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল, আমাকে চিনতে পারছেন না ?

না।

জনদ্রেত্তে তার কাছে আরও এগিয়ে গিয়ে হিংস্র জন্তুর মতো মুখটা বাড়িয়ে বলল, আমার নাম মঁসিয়ে ফাবান্ত বা জনদ্রেত্তে নয়, আমি হচ্ছি মঁতফারমেলের হোটেলমালিক থেনার্দিয়ের। শুনতে পাচ্ছেন ? এবার আমাকে চিনতে পারছেন না ?

মৃদু কম্পনের একটা ছোট্ট ঢেউ খেলে গেল মঁসিয়ে লেবলাঁর মুখে। কিন্তু সে শান্তভাবে নরম সুরে বলল, না, চিনতে পারছি না।

কেউ যদি সেই মুহূর্তে মেরিয়াসের মুখপানে তাকাত তাহলে সে দেখতে পেত ভয়ে অভিভূত হয়ে উঠেছে সে মুখ। থেনার্দিয়েরের নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটা এমনভাবে কেঁপে ওঠে যে পার্টিশানের দেওয়াল ধরে না ফেললে পড়ে যেত সে। তার মনে হলো কে যেন একটা তীক্ষ্ণ তরবারি ঢুকিয়ে দিয়েছে তার বুকের ভিতর। তার যে হাত পিস্তলটা ধরে গুলি করার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছিল সে হাতটা আপনা থেকে ঢলে পড়ল। আর একটু হলে পিস্তলটা পড়ে যেত মেঝের

উপর। জনদ্রেত্তে তার আসল পরিচয়টা দিয়ে মঁসিয়ে লেবলাঁকে কাঁপাতে পারেনি, কিন্তু মেরিয়াসের অন্তরটাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিয়েছে। আমরা জানি এ পরিচয়ের মানে কি। মঁসিযে লেবলাঁ হযত এ নামের সঙ্গে পরিচিত না থাকতে পারে, কিন্তু মেরিয়াস এ নামের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত। তার বাবার কথাগুলো অন্তরে আজও গাঁথা আছে তার। তার বাবার একটা চিঠিতে লেখা ছিল, 'থেনার্দিয়ের নামে একটি লোক আমাকে বাঁচিযেছিল। আমার পুত্র কোনওদিন যদি তার দেখা পায় তাহলে সে তাকে সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।' মেরিয়াসের কাছে এ কথা যেন এক ধর্মীয় আইন এবং আদেশ। মঁতফারমেলের হোটেলমালিক যে থেনার্দিয়েরকে সে কত খুঁজছে, যে থেনার্দিয়ের তার পিতার রক্ষাকর্তা, সে আসলে একজন দস্যু, নরঘাতক এবং এই মুহূর্তে এক জঘন্য অপরাধ করতে চলেছে। অদৃষ্টের পরিহাস এর থেকে নির্মম কখনো হতে পারে না। চার বছর ধরে মেরিয়াস তার উপর চাপিয়ে চাপিযে ঋণের বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য যাকে কত খুঁজে আসছে আজ তাকেই হয়ত জেলে বা ফাঁসির মঞ্চে পাঠাতে হবে। আজ তার পিতার রক্ষাকর্তাকে তাকেই শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু তা না করে সে কি করে থাকবে? কি করে সে নীরবে ও নিষ্ক্রিয়ভাবে এই জঘন্য অপরাধ ও অপকর্ম নিজের চোখে দেখবে, কি করে এ কাজ ঘটতে দেবে সে? কি করে একই সঙ্গে অপরাধী এবং যার উপর অপরাধ করা হচ্ছে তাদের দু'জনকে রক্ষা করবে? এই ধরনের দুষ্ট প্রকৃতির লোকের কাছে কোনও ঋণ থাকলে সে ঋণ কি সঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে? কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারল না মেরিয়াস। তার সর্বাঙ্গ শুধু কাঁপতে লাগল। এখন তারই উপর নির্ভর করছে সব কিছু। যদি সে এখনি পিস্তল থেকে গুলি করে তাহলে মঁসিয়ে লেবলাঁ বেঁচে যাবে, কিন্তু থেনার্দিয়েরের ধ্বংস হবে। আর তা না হলে মঁসিয়ে লেবলাঁ মারা যাবে আর থেনার্দিয়ের পালিয়ে যাবে। কিন্তু মেরিয়াসকে কিছু একটা করতেই হবে। দু'জনের একজনকে বাঁচাতেই হবে। সে কি তার পিতার শেষ ইচ্ছা পূরণ করে তার শপথ পালন করে এই অপকর্ম ঘটতে দেবে, না কি পিতার আত্মার প্রতি প্রদত্ত শপথ ভঙ্গ করে মঁসিয়ে লেবলাঁকে বাঁচাবে? তার মনে হলো দুটো কণ্ঠস্বর তার কানে এসে বাজছে—একটি কণ্ঠস্বর হলো তার প্রেমাস্পদ সেই মেয়েটির যে তার পিতাকে বাঁচাবার জন্য কাতর মিনতি জানাচ্ছে তাকে আর একটি কণ্ঠস্বর হলো তার পিতার যে থেনার্দিয়েরকে বাঁচাতে বলছে। তার মনে হলো সে যেন ক্রমশই তার চেতনা ও সমস্ত বোধশক্তি হারিয়ে ফেলছে এবং তার হাঁটু দুটোর জোর কমে আসছে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না: তার চোখের সামনে যে নাটক অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, অবিলম্বে তার গতি রোধ না করলে আর কোনও উপায় থাকবে না। মনে হলো যেন এক প্রবল ঘূর্ণিবায়ু তাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে এখনি মূর্ছিত হয়ে পড়বে।

এদিকে থেনার্দিয়ের পাগলের মতো ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বাতিটা তাকের উপর জোরে নামিয়ে রেখে মঁসিয়ে লেবলাঁর কাছে এসে বলতে লাগল,

অবশেষে আমি তাহলে তোমাকে পেয়ে গেছি। আমি তোমাকে ঠিক চিনেছি, কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারনি। তুমিই কি একদিন খৃস্টোৎসবের সময় মঁতফারমেলে আমার হোটেলে এসে ফাঁতিনের মেয়েটাকে নিয়ে যাওনি? তোমার গায়ে তখন কি একটা হলুদ রঙের কোট আর হাতে জামাকাপড়ের পুঁটলি ছিল না? মনে হচ্ছে ওঁর যেন দান করার একটা বাতিক আছে, উনি সবাইকে জামাকাপড় বিলিয়ে বেড়ান। উদারহৃদয় লক্ষপতি, তুমি তাহলে আমাকে চিনতে পারলে না? তোমাকে এবার মজা দেখাচ্ছি। তুমি মনে করেছ হাসপাতালের কিছু পুরনো পোশাক আর একটা ওভারকোট দিয়ে পার হয়ে যাবে!

থেনার্দিয়ের একটু থামল। তার মনে হলো সে যেন তার ক্রোধের সব আবেগটুকু নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। তারপর সে হঠাৎ টেবিলের উপর একটা ঘুষি মেরে বলল, উনি যেন কিছু জানেন না। ওঁর মুখে যেন মাখন গলে না।

এরপর মঁসিয়ে লেবলাঁর মুখটা ঘুরিয়ে বলতে লাগল, একদিন তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়ে চলে যাও। তুমিই আমার সব দুঃখ-বিপর্যয়ের কারণ। মাত্র পনেরশো ফ্রাঁ দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে যাও তুমি। সে আমার কাছে থাকলে আমি অনেক টাকা পেতাম এবং তাতে আমার জীবনটা ভালভাবেই কেটে যেত। তার অনেক ধনী আত্মীয় ছিল। তার থেকে অনেক টাকা আমি পেয়েও ছিলাম। আমার হোটেল ভাল চলত না। যত সব বাজে খরিদ্দার মদ খেতে আসত প্রায় বিনা পয়সায়। দেনায় পড়ে গিয়েছিলাম আমি। সে থাকলে তার টাকায় আমি সব দেনা মিটিয়ে ফেলতাম একে একে। আমি কারবারের পুঁজিটাকেও খেয়ে ফেলতে বাধ্য হই। তুমি সেদিন আমাকে বনে খুব বোকা বানিয়ে যাও। বনে কোনও লোক ছিল না। তুমি আমার থেকে বেশি শক্তিশালী ছিলে। এবার আমার পালা। আমি তোমাকে বোকা বানাব। আমি বলেছিলাম আগামীকাল ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, বাড়িভাড়া মেটাতে হবে। কবে কোন তারিখ সেটাও তোমার জ্ঞান নেই। আর মাত্র ষাট ফ্রাঁ উনি ভিক্ষে দিতে এসেছেন। পুরো একশো ফ্রাঁও আনেননি। আজ এখন আমার বলতে ইচ্ছা করছে, সকালে তোমার পা চেটেছিলাম, রাত্রে তোমার হৃৎপিণ্ড কাটব।

শ্বাস নেবার জন্য থামল থেনার্দিয়ের। সে হাঁপাচ্ছিল। তার বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছিল। এক হীন জয়ের পৈশাচিক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ দুটো। তাতে তার কাপুরুষোচিত দুষ্ট প্রকৃতিটা ফুটে উঠল। এইভাবে সে যেন তার জয়ের বস্তুকে জয় করতে চায়। বামন হয়ে সে দৈত্যের বুকে পা দিয়ে দাঁড়াতে চায়। একটা শেয়াল যেন রুগ্ন ষাঁড়ের পাঁজরে কামড় দিতে চায়।

মঁসিয়ে লেবলাঁ বলল, আমি বুঝতে পারছি না তোমরা কি বলছ। তোমরা ভুল করছ। আমি একজন সামান্য গরীব লোক, লক্ষপতি তো দূরের কথা। আমি তোমাদের চিনি না। তোমরা হয়ত অন্য কারো সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছ।

থেনার্দিয়ের গর্জন করে উঠল, তুমি সেই এক কথা বলছ। তুমি স্মরণ করতে পারছ না? আমি কে সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই?

মঁসিয়ে লেবলাঁ শান্তভাবে বলল, না, মোটেই না। তবে, তোমার প্রকৃতিটা আমি বুঝতে পেরেছি। বুঝেছি কি ধরনের মানুষ তুমি। তুমি একটি কাপুরুষ।

এই অবস্থায় সে যেভাবে ঠাণ্ডা মাথায় কথাগুলো বলল তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

'কাপুরুষ' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে থেনার্দিয়েরপত্নী লাফিয়ে উঠল। থেনার্দিয়ের একটা চেয়ার ধরে গর্জন করে বলল, তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাক।

এরপর সে মঁসিয়ে লেবলাঁর দিকে ফিরে বলতে লাগল, কাপুরুষ, তাই না? তোমরা ধনীরা আমাদের মতো গরীবদের এই কথাই বলবে। আমি ব্যবসায় ব্যর্থ হয়েছি, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার পকেটে পয়সা নেই— আমি কাপুরুষই বটে। তোমরা দামী জুতো আর আর্কবিশপদের মতো দামী কোট পর। তোমরা ভাল বাড়িতে থাক যে বাড়িতে দারোয়ান থাকে। তোমরা খবরের কাগজে আবহাওয়ার সংবাদ পড়ে দামী থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখ। আর আমরা নিজেরাই থার্মোমিটার। আমাদের কোনও থার্মোমিটারের দরকার হয় না। ঠাণ্ডায় আমাদের দেহের রক্ত হিম হয়ে যায়। এবং আমরা তখন বলি, ঈশ্বর নেই। আর তোমরা আমাদের এই শুয়োরের খোঁয়াড়ে এসে আমাদের কাপুরুষ বল। কিন্তু আমরা যাই হই না কেন, তোমাদের চিবিয়ে খাব, তোমাদের গায়ের মাংস খাব। তবে শুনে রাখ পালকের পোশাকপরা লক্ষপতি, আমিও একদিন সৎভাবে ব্যবসা করতাম, আমি ছিলাম এক লাইসেন্সধারী হোটেলমালিক। আমার ভোট দেবার অধিকার ছিল, আমি ছিলাম এক সম্ভ্রান্ত নাগরিক।

এবার সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লোকগুলোকে লক্ষ্য করে বলল, উনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন আমি একজন পকেটমার।

থেনার্দিয়ের আবার মঁসিয়ে লেবলাঁর দিকে ঘুরে বলল, শুনে রাখ পরোপকারী বন্ধু, আমি যে-সে নই, চোরও নই। আমি ফ্রান্সের এক ভূতপূর্ব সৈনিক। আমার একটা মেডেল পাওয়া উচিত ছিল। আমি ওয়াটারলুতে যুদ্ধ করি এবং আমি একজন সেনাপতিকে বাঁচাই যিনি ছিলেন একজন কাউন্ট উপাধিধারী। তিনি তাঁর নাম বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা শুনতে পাইনি। তাঁর নাম আর ঠিকানাটা জানলে আমার উপকার হত। যে ছবিটা আমি দেখিয়েছি সেটা ডেভিডের আঁকা। শিল্পী আমাকে তাতে অমর করে রেখেছে। আমাকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে। আমি সেই জেনারেলকে পিঠে করে গোলাগুলির মধ্য দিয়ে নিরাপদ জায়গায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এই হলো আমার কাহিনী। অবশ্য সে জেনারেল আমার কোনও উপকার করেননি। তিনিও আপনাদের মতো। যাই হোক, আমার হাতে প্রমাণ আছে। আমি হচ্ছি ওয়াটারলু যুদ্ধের একজন নির্ভীক সৈনিক। যাই হোক, এখন আমি আমার পরিচয় দিলাম। এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমার এখন টাকা চাই।

মেরিয়াস তার আবেগানুভূতিকে সংযত করার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে। সে আবার কান পেতে পাশের ঘরের সব কথাবার্তা শুনতে লাগল। সে বুঝতে পারল এই লোকই হচ্ছে তার বাবার চিঠিতে উল্লিখিত থেনার্দিয়ের। এই থেনার্দিয়ের আবার তার বাবার অকৃতজ্ঞতার জন্য অভিযোগ করল। থেনার্দিয়েরের প্রতিটি আবেগে উচ্ছ্বাসে,

তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিতে, তার জ্বলন্ত চোখের উত্তাপে, দুঃখকষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তার পাপ প্রবৃত্তির নির্লজ্জ অভিব্যক্তিতে একই সঙ্গে এক ধ্বংসাত্মক জীবন আর তার সঙ্গে সঙ্গে এক মর্মস্পর্শী সত্যের আবেদন ছিল।

থেনার্দিয়ের যে ছবিটা দেখিয়ে মঁসিয়ে লেবলাঁকে কিনতে বলে, আসলে সে ছবিটা তার নিজেরই আঁকা। ছবিটা সে মঁতফারমেলের হোটেলের সামনে টাঙিয়ে রাখত। থেনার্দিয়ের তখন ছবিটার সামনে না থাকায় মেরিয়াস এবার ছবিটাকে ভাল করে দেখতে পেল। সে দেখল ছবিতে সত্যিই যুদ্ধক্ষেত্রের একটা দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। সে দৃশ্যে একজন বীর সার্জেন্ট একজন অফিসারকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছবিটাতে তার বাবা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মেরিয়াসের মনে হলো, সহসা অনাবৃত উন্মুক্তদ্বার এক সমাধিগহ্বর থেকে তার পিতার পুনরভ্যুত্থিত প্রেতমূর্তি উঠে এসেছে। সে যেন ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রের কামানের গর্জন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। মনে হলো মোটা হাতে স্থূলভাবে আঁকা তার পিতার রক্তাক্ত দেহটা সহসা জীবন্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

থেনার্দিয়ের তখন হাঁপ ছেড়ে কড়াভাবে মঁসিয়ে লেবলাঁকে বলল, আমরা আমাদের কাজ করার আগে তোমার কিছু বলার আছে?

মঁসিয়ে লেবলাঁ কোনও কথা বলল না।

তখন দরজার সামনে কুড়ুল হাতে একটা লোক মোটা গলায় বলল, যদি কোনও কাটাকাটি করার কাজ থাকে তো আমি আছি।

থেনার্দিয়ের বলল, তুমি তোমার মুখোশটা খুলে রেখেছ কেন?

মঁসিয়ে লেবলাঁ এতক্ষণ থেনার্দিয়েরের প্রতিটি গতিভঙ্গি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। সে দেখল ওদের দলে মোট নয়জন লোক রয়েছে। থেনার্দিয়ের তার দিকে পিছন ফিরে দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। এই সুযোগে মঁসিয়ে লেবলাঁ তার সামনের টেবিল আর চেয়ারটা উল্টে দিয়ে একমুহূর্তে জানালার ধারে চলে গেল। পালাবার জন্য জানালা দিয়ে উঁকি মেরে নিচে তাকাতে লাগল। কিন্তু দু'জন লোক তাদের শক্ত হাত দিয়ে ধরে ফেলল তাকে। তাদের মধ্যে তিনজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল মঁসিয়ে লেবলাঁর উপর। থেনার্দিয়েরের স্ত্রী তার মাথার চুলগুলোকে ধরে ফেলল।

হৈচৈ শুনে বারান্দায় অপেক্ষমাণ লোকগুলো ছুটে এল। যে বুড়ো লোকটা বিছানায় ঘুমোচ্ছিল সে একটা হাতুড়ি নিয়ে উঠে পড়ল। পানসাদ বা বিগ্রেনেল নামে লোকটা তার হাতের দাটাকে ঘোরাতে লাগল।

মেরিয়াস আর সহ্য করতে পারল না। সে মনে মনে বলল, আমাকে ক্ষমা করো পিতা, তোমার কথা আমি রাখতে পারব না।

এই বলে সে পিস্তলের ঘোড়ায় হাত দিল। এমন সময় থেনার্দিয়ের বলল, ওকে কোনওরূপ আঘাত করো না।

বন্দীর অবস্থা দেখে থেনার্দিয়েরের রাগের পরিবর্তে ধৈর্য বেড়ে গেল। তার মধ্যে

যেন দুটো মানুষ ছিল——একটা পশু আর একটা চতুর মানুষ। তার শিকার বা বন্দী মানুষটাকে বেকায়দায় ফেলে তাকে করায়ত্ত করার ব্যাপারে তার পাশবিক প্রবৃত্তিটা কাজ করছিল। কিন্তু যখন দেখল বন্দী লোকটা ঘুষি মেরে দু' তিনজনকে ঘায়েল করে ফেলে দিল তখন তার মধ্যে চতুর মানুষটা প্রাধান্য লাভ করল। সে আবার বলল, ওকে আঘাত করো না।

কেউ বন্দীকে আঘাত না করায় মেরিয়াস গুলি করতে গিয়েও করল না। সে দেখতে লাগল এরপর কি হয়। সে ভাবল হয়ত শেষ মুহূর্তে কিছু একটা ঘটবে যার ফলে তার প্রেমাস্পদের পিতার প্রাণনাশ হবে না, আর তার পিতার রক্ষাকর্তাকেও মারতে হবে না।

এদিকে মঁসিয়ে লেবলাঁ সেই বুড়ো লোকটাকে একটা ঘুষি মেরে ফেলে দিল এবং আরও দু'জনকে ফেলে দিল। কিন্তু বাকি চারজন লোক তার হাত আর ঘাড়টা ধরে রইল। অর্ধ বিজেতা আর অর্ধ বিজিত অবস্থায় মঁসিয়ে লেবলাঁ একদল শিকারী কুকুর পরিবৃত এক বনশুয়োরের মতো বসে রইল এক জায়গায়।

লোকগুলো বন্দীকে ধরে জানালার ধারে একটা বিছানায় বসাল। থেনার্দিয়েরের স্ত্রী তখনো মঁসিয়ে লেবলাঁর মাথার চুলগুলো ধরে ছিল।

থেনার্দিয়ের তার স্ত্রীকে বলল, তুমি ছেড়ে দাও, তোমার শাল ছিঁড়ে যাবে।

স্বামীর কথায় বন্দীর মাথাটা ছেড়ে দিল থেনার্দিয়েরের পত্নী।

থেনার্দিয়ের বলল, ওর পকেটগুলো খুঁজে দেখ কি আছে।

লোকগুলো বন্দীর সব পকেট খুঁজে মাত্র ছ' ফ্রাঁ আর রুমাল পেল। থেনার্দিয়ের বলল, টাকার কোনও প্যাকেট নেই?

একজন লোক বলল, হাতঘড়িও নেই।

মুখোশপরা লোকটা বলল, লোকটা চতুর এবং পুরনো পাপী।

থেনার্দিয়ের সেই দড়ির মইটা দিয়ে তার লোকদের বলল ওকে ভাল করে বেঁধে রাখ। খাটের পায়ার সঙ্গে ওর পাদুটোকে বেঁধে দাও।

যে বুড়ো লোকটা মঁসিয়ে লেবলাঁর ঘুষি খেয়ে মড়ার মতো পড়েছিল তার দিকে তাকিয়ে থেনার্দিয়ের বলল, বুনাক্রয়েল কি মরে গেছে?

বিগ্রেনেল বলল, না, মদ খেয়ে ও মাতাল হয়ে আছে।

থেনার্দিয়ের বলল, ওকে সরিয়ে দাও।

কয়েকজন লোক বুনাক্রয়েলকে ধরাধরি করে ঘরের এককোণে লোহার যন্ত্রপাতিগুলোর গাদায় শুইয়ে দিল। এরপর থেনার্দিয়ের বলল, শোন বাবেত, এত লোক এনেছ কেন? এত লোক তো আমাদের দরকার নেই।

বাবেত বলল, কি করব, ওরা ছাড়ল না, জোর করে এল।

এদিকে হাসপাতালের বিছানার মতো চারটে কাঠের খুঁটিওয়ালা যে বিছানাটায় মঁসিয়ে লেবলাঁকে বসানো হয়েছিল, থেনার্দিয়ের সেই বিছানাটার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অন্য লোকদের বলল, তোমরা একটু সরে যাও। আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

থেনার্দিয়েরের এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল মেরিয়াস। একটু আগে তার যে মুখখানায় প্রচণ্ড রাগে ফেনা ভাসছিল সে মুখে এখন এক শান্ত হাসি ফুটে উঠেছে। তার এই আশ্চর্য ভাবান্তর দেখে মেরিয়াসের মনে হলো একটা বাঘ যেন হঠাৎ অ্যাটর্নী হয়ে গেছে।

শান্ত কণ্ঠে বলল থেনার্দিয়ের, শুনুন মঁসিয়ে, আপনি জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পালাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাতে আপনার পা ভেঙে যেত। যাই হোক, এখন শান্তভাবে আমরা কিছু আলোচনা করতে পারি। তবে একটা কথা, তার আগে না বলে পারছি না। এত সব মারামারি আর গোলমালের মধ্যে আপনি একবারও চিৎকার করেননি।

কথাটা অস্বীকার করা যায় না। খুব বিচলিত হয়ে পড়লেও মেরিয়াস এটা লক্ষ্য করেছে। গোলমালের সময় মঁসিয়ে লেবলাঁ যে সব কথা বলেছে তা যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বলেছে। এমন কি সে যখন লোকগুলোর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে তখনো মুখে একটা কথাও বলেনি।

থেনার্দিয়ের বলল, আপনি সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে পারতেন। তা যদি করতেন আমরা তাহলে বিস্মিত হতাম না। আমরা আপনার গলা টিপে ধরিনি। কারণ আমরা জানি এ জায়গাটা এমনই যে এখানকার কোনও শব্দ বাইরে যায় না। এখান থেকে কেউ বোমা ছুঁড়লে বা গুলি করলে পুলিশরা ভাববে ওসব মাতালদের কাণ্ড। তবে কেন আপনি সাহায্যের জন্য চিৎকার করেননি তার কারণ আমি জানি। কারণ আপনি জোরে চিৎকার করলে হয়ত পুলিশ আসত আর পুলিশ মানেই আইন। সেই আইনকে আপনি ভয় পান ঠিক আমরা যেমন আইন আর পুলিশকে ভয় পাই। এটা আমি অনেক আগে থেকে সন্দেহ করেছিলাম যে আপনার জীবনে গোপনীয় একটা ব্যাপার আছে। আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা। সুতরাং আলোচনার মাধ্যমে একটা বোঝাপড়ায় আসা যাক।

এইভাবে কথা বলার সময় মঁসিয়ে লেবলাঁর পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল থেনার্দিয়ের। তার ভাষা এবং শয়তানসুলভ নৈপুণ্য, কথা বলার সুচতুর ভঙ্গিমা, তার উদ্ধত অথচ অবদমিত আত্মাভিমান—তখন যদি কেউ দেখত তাহলে ভাবত থেনার্দিয়ের সত্যিই একজন যাজক হতে পারত।

থেনার্দিয়েরের কথাগুলো মঁসিয়ে লেবলাঁ সম্বন্ধে রহস্যটা ঘন করে তুলল আরও মেরিয়াসের মনে। সাধারণত এই অবস্থায় মানুষ যা করে তা না করে বাদী যা করল তা সত্যিই অদ্ভুত। আবার থেনার্দিয়ের তার এই অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করল এক বিজ্ঞ কূটনীতিকের মতো, সে মন্তব্য মঁসিয়ে লেবলাঁ সম্বন্ধে এক রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠল। কিন্তু সে যাই হোক, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একদল খুনীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে মঁসিয়ে লেবলাঁ যে এক নিষ্ক্রিয় ঔদাসিন্যের সঙ্গে যেভাবে থেনার্দিয়েরের প্রচণ্ড ক্রোধাবেগের অভিব্যক্তি এবং শান্তশীতল বিষোদ্গার নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে তা তার মুখমণ্ডলকে এক বিষন্ন মহিমায় মণ্ডিত করে তুলেছে। এর থেকে বেশ বোঝা যায় তার আত্মা ভয় বা আতঙ্ক কাকে বলে তা জানে না। এক বিপজ্জনক পরিস্থিতিজনিত সব বিস্ময়কে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে সে। পরিস্থিতি যত

সংকটজনকই হোক না কেন, বিপদ যতই আসন্ন বা অপরিহার্য হোক না কেন, এক নির্ভীক নিরাসক্তির সঙ্গে তার সম্মুখীন হতে পারে সে।

সহসা উঠে পড়ল থেনার্দিয়ের। চুল্লীর উপর জ্বলন্ত কয়লাভরা কড়াইটাকে আড়াল করে যে পর্দাটা টাঙানো ছিল সেটা সরিয়ে দিতে সেই কড়াইয়ের উপর যে লোহার বাটালিটা বসানো ছিল সেটা চোখে পড়ল। তারপর সে মঁসিয়ে লেবলাঁর সামনের চেয়ারটাতে আবার বসল। সে বলল, এবার আমরা একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারি। আমি যে রেগে গিয়েছিলাম সেটা ঠিক হয়নি। আমার মাথার ঠিক ছিল না এবং আমি অনেক বাজে কথা বলেছি। যেমন আমি বলেছিলাম, যেহেতু আপনি লক্ষপতি সেইহেতু আমি অনেক টাকা চাই আপনার কাছ থেকে। কিন্তু সেটা কখনো যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। আপনি যত ধনীই হন না কেন, আপনারও খরচ আছে। আপনাকে নিঃস্ব করা উদ্দেশ্য নয় আমার। আমি রক্তচোষা নই। আমি সেই ধরনের লোক নই যারা কোনও মানুষকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে এমন দাবি করে বসে যা অযৌক্তিক ও হাস্যাস্পদ। আমি দু'দিকই বজায় রেখে চলতে চাই। আমি শুধু আপনার কাছ থেকে দু' লক্ষ ফ্রাঁ চাই।

মঁসিয়ে লেবলাঁ কোনও উত্তর দিল না। থেনার্দিয়ের বলে চলল, আমি আপনার প্রকৃত অবস্থার কথা জানি না। তবে জানি টাকা-পয়সার প্রতি আপনার কোনও মায়া নেই এবং আপনি গরীব-দুঃখীদের দান করার মতো অনেক ভাল কাজ করে থাকেন। সুতরাং আপনি এক দুঃস্থ পরিবারের পিতাকে দু' লক্ষ ফ্রাঁ অবশ্যই দান করতে পারেন। আপনি একজন যুক্তিবাদী লোক এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন এ ব্যাপারে কয়েকজন ভদ্রলোককে সাহায্যকারী হিসাবে আনতে হয়েছে। এঁরা এ বিষয়ে সকলেই একমত হবেন যে আমি যা চাইছি সেটা মোটেই বেশি নয়।

তাতে কোনওরকমে মোটা ভাত মোটা কাপড়সহ আমার বাকি জীবনটা কেটে যাবে। আমি শুধু চাই দু' লক্ষ ফ্রাঁ। আমি কথা দিচ্ছি, এই টাকা ছাড়া আর আমি কখনো কিছুই চাইব না আপনার কাছ থেকে, আপনার আর ভয়ের কিছু থাকবে না। আপনি হয়ত বলতে পারেন, এখন আপনার কাছে অত টাকা নেই। আমিও অত বোকা নই যে তা আশা করব। এখন আমি শুধু বলছি আপনি আমার কথামতো একটা চিঠি লিখুন।

এখানে থামল থেনার্দিয়ের। কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে জ্বলন্ত কয়লাভরা কড়াইটার দিকে একবার চাইল। তারপর বলল, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি আপনি লিখতে না জানার ভান করবেন না।

সে অদ্ভুত এক অর্থপূর্ণ হাসি হেসে টেবিলটা মঁসিয়ে লেবলাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে কাগজ-কলম বার করার জন্য ড্রয়ার খুলতেই তার মধ্যে একটা বড় ছুরি দেখা গেল। থেনার্দিয়ের একটা কাগজ মঁসিয়ে লেবলাঁর হাতে দিয়ে বলল, লিখুন।

বন্দী মঁসিয়ে লেবলাঁ এই প্রথম কথা বলল, আমার হাত বাঁধা থাকলে কি করে লিখব!

থেনার্দিয়ের বলল, তা বটে। মাপ করবেন।

সে বিগ্রেনেলকে বলল, ওঁর হাতের বাঁধন খুলে দাও।

মঁসিয়ে লেবলাঁর হাত দুটো মুক্ত হতে একটা কলম কালিতে ডুবিয়ে তার হাতে দিল থেনার্দিয়ের।

থেনার্দিয়ের বলল, শুনুন মঁসিয়ে, আপনি এখন সম্পূর্ণ আমাদের দয়ার উপর নির্ভরশীল। যদিও কোনও মানুষ আমাদের কবল থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে পারবে না তথাপি আপনাকে দিয়ে এক অপ্রিয় কাজ করিয়ে নিতে দুঃখ হচ্ছে আমার। আমি আপনার নাম-ঠিকানা জানি না। কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আপনি যে চিঠি লিখবেন সে চিঠি যে নিয়ে যাবে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনাকে বেঁধে রাখা হবে। এবার আমি যা বলছি লিখুন।

মঁসিয়ে লেবলাঁ কলমটা ধরল । থেনার্দিয়ের বলল, লিখুন, আমার প্রিয় কন্যা—তুমি পত্রপাঠ এখানে চলে আসবে।

তারপরই চিঠির কথা বন্ধ করে বলল, আপনি কি ওকে 'মেয়ে' না 'লার্ক' বলে সম্বোধন করেন ?

মঁসিয়ে লেবলাঁ বলল, আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

থেনার্দিয়ের বলল, ও কিছু মনে করবেন না। ঠিক আছে লিখুন,...তুমি এখনি চলে আসবে। তোমাকে আমার খুবই প্রয়োজন। পত্রবাহক তোমাকে এখানে নিয়ে আসবে। তোমার ভয়ের কিছু নেই।

এরপর হঠাৎ সে তার মতের পরিবর্তন করল। বলল, না, শেষের লাইনটা কেটে দিন। এতে তার মনে সন্দেহ জাগতে পারে। এবার সই করুন। আপনার নাম কি ?

মঁসিয়ে লেবলাঁ বলল, কার নামে চিঠিটা দেওয়া হবে ?

আপনার মেয়েকে। আমি তো আগেই বলেছি।

মঁসিয়ে লেবলাঁ মেয়ের কোনও নাম চিঠির উপর লিখল না।

থেনার্দিয়ের বলল, ঠিক আছে সই করুন। আপনার নাম কি যেন ?

আর্বেন ফেবার।

থেনার্দিয়ের বিড়ালসুলভ চাতুর্যের সঙ্গে তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে মঁসিয়ে লেবলাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া রুমালটা বার করে দেখল তাতে ইউ, এফ—নামের এই অক্ষর দুটো সেলাই করা আছে।

সেটা দেখে থেনার্দিয়ের বলল, ঠিক আছে। ইউ, এফ—মানে আর্বেন ফেবার। ঠিক আছে। সই করুন, ইউ, এফ।

বন্দী তাই করল।

থেনার্দিয়ের বলল, এবার চিঠিটা আমাকে দিন। আমি মুড়ে দেব।

চিঠিটা মুড়ে সে বলল, ঠিক আছে, খুব ভাল। এবার চিঠির উপরে লিখুন, ম্যাদময়জেল ফেবার। এবার আপনার ঠিকানাটা লিখুন। আশা করি আপনি আপনার নাম ভুল বলেননি, ঠিকানাটাও ভুল বলবেন না। আপনার বাসা নিশ্চয় খুব একটা দূরে হবে

না। কারণ সেন্ট জ্যাক চার্চে আপনারা প্রার্থনা করতে যান। তবে রাস্তার নামটা আমি জানি না।

বন্দী মঁসিয়ে লেবলাঁ কিছুক্ষণ ভেবে চিঠিটার উপরে লিখল, ম্যাদময়জেল ফেবার অফ আর্বেন ফেবার, ১৭ রূ্য সেন্ট ডোমিনিক দ্য এলফার।

এবার চিঠিটা মঁসিয়ে লেবলাঁর হাত থেকে কেড়ে নিল থেনার্দিয়ের এক উত্তপ্ত উত্তেজনার সঙ্গে। তারপর তার স্ত্রীকে বলল, এই নাও চিঠি। তোমাকে কি করতে হবে তা জান। নিচেতে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এখনি চলে যাও এবং যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে আসবে।

এবার কুড়ুলহাতে লোকটাকে সে বলল, তুমি তোমার মুখোশটাকে খুলে রেখেছ। তুমি গাড়িতে ওর সঙ্গে যাও। তুমি জান গাড়িটা কোথায় আছে।

তার স্ত্রী আর লোকটা ঘর থেকে তখনি বেরিয়ে গেল। থেনার্দিয়ের তার স্ত্রীকে আবার ডেকে বলল, চিঠিটা যেন হারিও না বা হাতছাড়া করো না কিছুতেই। মনে রাখবে এই চিঠিটার দাম ছয় লক্ষ ফ্রাঁ।

তার স্ত্রী বলল, ঠিক আছে। ভাবনার কোনও কারণ নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে বাড়ির নিচে গাড়ি ছাড়ার শব্দ পেল তারা। থেনার্দিয়ের বলল, খুব ভাল। ওরা সময় নষ্ট না করে রওনা হয়ে গেছে। তার মানে পৌনে একঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে। সে এবার আগুনের কাছে বসে পা দুটো সেঁকতে লাগল। বলল, আমার পা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! বন্দী আর থেনার্দিয়েরকে ধরে মোট পাঁচজন লোক ছিল ঘরের মধ্যে। যে লোকগুলো ছিল তাদের মুখগুলো কালিমাখা ছিল বলে তাদের দেখে কয়লাখনির শ্রমিক বা রাক্ষস বলে মনে হচ্ছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল অপরাধটাই তাদের পেশা। তাই এই পরিস্থিতিতে নির্বিকারভাবে এক জায়গায় জড়োসড়ো হযে বসে ছিল। বিরাট গোলমালের পর একেবারে শান্ত হয়ে পড়েছিল ঘরখানা। শুধু ঘুমন্ত মাতাল লোকটার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। বাতির কম্পিত আলোয় ঘরের লোকগুলোর ছায়া পড়েছিল দেওয়ালে।

কিন্তু ঘরখানার আপাতস্তব্ধ আবহাওয়াটা মেরিয়াসের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছিল। থেনার্দিয়েরের কথাবার্তা মঁসিয়ে লেবলাঁ ও তার মেয়ে সম্বন্ধে রহস্যটার সমাধান করার পরিবর্তে আরও নিবিড় করে তুলেছিল সেটাকে। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারল রুমালে সেলাই করা ইউ, এফ অক্ষর দুটোর অর্থ হলো আরসুলা নয়, আর্বেন ফেবার।

এক ভয়ঙ্কর কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মেরিয়াস সেখানে যেমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানে তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। সে নড়তে চড়তে বা কোনও কিছু ভাবতে পর্যন্ত পারছিল না। যে ঘটনা কিছু আগে সে ঘটতে দেখেছে সে ঘটনা যেন তার সর্বাঙ্গ অসার করে দিয়েছে। এরপর আবার কি হয় তা সে দেখতে চায়। সে এখন কি করবে তা সে স্থির করতে পারছিল না।

সে ভাবল মেয়েটি আসলে কে, সে তার সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রেমিকা কি না

তা একটু পরেই সে এলে দেখা যাবে। থেনার্দিয়েরের স্ত্রী তাকে নিয়ে আসবে। সে যদি এসে বিপদে পড়ে তাহলে আমি আমার জীবন দিয়েও তাকে রক্ষা করব। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না বা কোনও বাধা আমি মানব না।

আধঘণ্টা কেটে গেল। থেনার্দিয়ের তার কুটিল চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। বন্দী চুপচাপ বসে ছিল। হঠাৎ থেনার্দিয়ের বন্দীকে বলতে লাগল, আমার স্ত্রী ফিরে আসবে এখনি। আমাদের একটু শুধু অপেক্ষা করতে হবে। আমার মনে হয় লার্কই আপনার মেয়ে। আপনার মেয়ে আপনারই থাকবে। আমার স্ত্রী তাকে আপনার চিঠিটা দেবে। আমি তাকে বলে দিয়েছি আপনার মেয়েকে যেন ভালভাবে পোশাক পরার সময় দেয়। তাহলে সে কোনও সন্দেহ করবে না এবং সে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক আসবে। তাকে অন্য গাড়িতে তুলে দিয়ে ওরা এসে আমাকে খবর দেবে। আপনার মেয়ের কোনও ক্ষতি করা হবে না। তাকে এখানে আনার পর এক নিরাপদ জায়গায় রেখে দেওয়া হবে এবং আপনি আমাদের দু' লক্ষ ফ্রাঁ দিয়ে দিলেই তাকে আপনার হাতে তুলে দেওযা হবে। কিন্তু আপনি যদি আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা খারাপ হবে আপনার মেয়ের পক্ষে। বুঝতে পারলেন?

বন্দী কোনও কথা বলল না। থেনার্দিয়ের আবার বলল, তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ব্যাপারটা খুবই সহজ সরল। আপনি কিছু না করলে খারাপ বা কারো কোনও ক্ষতিই হবে না।

থেনার্দিয়ের একটু থেমে আবার বলল, আমার স্ত্রী এসে যেমনি খবর দেবে লার্ক আসছে অমনি আপনার সব বাঁধন খুলে দেওয়া হবে এবং আপনি ঐ বিছানায় ঘুমোতে পারবেন। সুতরাং দেখছেন, আমাদের কোনও কুমতলব নেই।

মেরিয়াসের মনটা এতদূর খারাপ হয়ে গেল যে তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। মেয়েটিকে তাহলে এখানে আনা বা রাখা হবে না, অন্য কোনও অজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। এখন সে বুঝতে পারল সব। এখন কি সে তাহলে পিস্তলের গুলি করে পুলিশের হাতে এই সব শয়তানদের ধরিয়ে দেবে? কিন্তু তাহলে যে লোকটা মেয়েটিকে আনতে যাবে সে মুক্ত রয়ে যাবে এবং সে মেয়েটির ক্ষতি করতে পারে। থেনার্দিয়ের সেই কথাই বলছে। এখন তার পিতার আদেশ নয়, তার প্রেমাস্পদের চিন্তাই তার ডান হাতটা যেন ধরে রাখল, তাকে গুলি করতে দিল না।

সময় কেটে যেতে লাগল। প্রতিটি মুহূর্তে তার সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। সে মরীয়া হয়ে এই সংকট থেকে মুক্তির কোনও সম্ভাবনা বা আশার আলো দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু তা না পাওয়ায় তার অন্তরের আলোড়ন বেড়ে যেতে লাগল। ঘরখানার সমাধিভূমিসুলভ নীরবতার মাঝে তার অন্তরের এই আলোড়ন বিপরীতক্রমে প্রকট হয়ে উঠছিল তার কাছে।

সহসা ঘরের দরজাটা খুলে গেল। থেনার্দিয়ের বলল, এসে গেছে।

পরমুহূর্তেই থেনার্দিয়েরের স্ত্রী তার জানুর উপর হাত চাপড়ে চিৎকার করে বলে উঠল, ভুল ঠিকানা। তার সঙ্গের লোকটা হাতের কুড়ুলটা তুলল।

থেনার্দিয়ের আশ্চর্য হয়ে বলল, ভুল ঠিকানা!

হ্যাঁ, ১৭ রু সেন্ট ডোমিনিকে মঁসিয়ে আর্বেন ফেবার বলে কেউ থাকে না। বাড়িটা বড় এবং অনেক লোক আছে। তারা ও নামে কাউকে চেনে না। বাড়ির দারোয়ান ও তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হলো। বুড়োটা তোমাকে বোকা বানিয়েছে মঁসিয়ে থেনার্দিয়ের। তুমি খুব ভাল লোক কি না। আমি হলে ওর মুখটা ছিঁড়েখুঁড়ে দিতাম। ওর মেয়ের আসল ঠিকানা না দেওয়া পর্যন্ত ওকে আগুনের ছেঁকা দিতাম। কি করে টাকা বের করতে হয় আমি জানি। কিন্তু তোমরা তো আমার বুদ্ধি নেবে না।

মেরিযাস হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মেয়েটির নাম লার্ক বা আরসুলা যাই হোক, সে তাহলে নিরাপদে আছে।

তার স্ত্রী যখন রাগে চেঁচামিচি করে বেড়াচ্ছিল থেনার্দিয়ের তখন টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসল। সে তার ডান পাটা নাড়তে নাড়তে জ্বলন্ত কয়লাভরা কড়াইটার পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর সে বন্দীর দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্করভাবে বলল, ভুল ঠিকানা। এতে তোমার কি লাভ হবে?

বন্দী বলল, সময় পাব।

এই বলে সে হাতের বাঁধনগুলো সরিযে দিল। সে বাঁধনগুলো আগে থেকে কাটা ছিল। তখন শুধু তার একটা পা বাঁধা ছিল বিছানার খাটের সঙ্গে।

হঠাৎ বন্দী বিছানা থেকে এক লাফে কড়াইটা থেকে উত্তপ্ত লাল বাটালিটার কাঠের বাঁট ধরে তাদের সামনে ভয়ঙ্করভাবে দাঁড়াল। থেনার্দিয়েরের স্ত্রী ও অন্যান্য লোকরা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

মঁসিয়ে লেবলাঁর পকেটে ছোট একটা করাত ছিল। জেলের কয়েদীরা পালাবার জন্য এই ধরনের করাত কাছে রাখে। পরে পুলিশ ঘরটার মধ্যে এটা পড়ে থাকতে দেখতে পায়। সেই করাত দিয়ে সে তার হাতের বাঁধন কেটে দেয়। কিন্তু পায়ের বাঁধনটা কাটতে পারেনি সে।

বিগ্রেনেল বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়ে ওঠার পর থেনার্দিয়েরকে বলল, চিন্তার কারণ নেই। ওর একটা পা এখনো বাঁধা আছে।

বন্দী এবার ওদের বলতে লাগল, তোমরা বোকা। আমার জীবন খুব একটা মূল্যবান নয়। আমাকে কিছু লেখানো বা বলানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না। আমি কিছু লিখব না বা বলব না। এই দেখ—এই বলে তপ্ত লাল বাটালির ধারাল দিকটা তার বাঁ হাতের উপর এক জাযগায় বসিয়ে দিল। তাতে হাতের কিছুটা চামড়া পুড়ে গেল। মেরিয়াস তা দেখে ভয়ে অভিভূত হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে যারা ছিল সেই দুর্বৃত্তগুলোও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তা দেখতে লাগল। কিন্তু বন্দীর মুখের শান্ত ভাবের কোনও পরিবর্তন হলো না। কোনও ঘৃণা বা বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠল না। মহান চরিত্রের লোকদের মধ্যে দেহগত যন্ত্রণা তাদের আত্মাকে উন্নত করে।

সে বলল, যত সব বোকা কোথাকার, আমাকে ভয় করার কিছু নেই। দেখলে

আমি তোমাদের ভয় করি না। সে এবার বাটালিটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর বলল, এবার তোমরা আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পার।

থেনার্দিয়ের তার লোকদের বলল, ওকে ধরে ফেল।

দুটো লোক সঙ্গে সঙ্গে বন্দীর দুটো কাঁধ ধরে ফেলল। মুখোশপরা লোকটা তার সামনে ঘুষি পাকিয়ে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে দরকার বুঝলে ঘুষি মেরে তার মুখটা ভেঙে দিতে পারবে।

মেরিয়াস দেখল ঘরের মধ্যে সকলে চুপি চুপি নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছে।

একজন বলল, একটা কাজ করতে হবে—-

ওর গলাটা কেটে দাও।

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

থেনার্দিয়ের তার স্ত্রীর সঙ্গে কি পরামর্শ করতে লাগল। তাবপর ধীর পায়ে টেবিলের ধারে গিয়ে ড্রয়ার থেকে সেই বড় ছুরিটা বার করল।

মেরিয়াসের হাতটা পিস্তলের বাটের উপর ছিল। তার উভয় সংকট চরমে উঠল। এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তার দ্বিধাবিভক্ত বিবেকেব দুটি কণ্ঠস্বর তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করছিল তার মধ্যে। একটি কণ্ঠস্বর তাকে তার পিতার ইচ্ছা পূরণ করতে বলছিল আর একটি কণ্ঠস্বর বন্দীকে বাঁচাতে বলছিল। দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ নীতির দ্বন্দ্বে তার অন্তর ক্ষতবিক্ষত ও বেদনায় অভিভূত হয়ে উঠছিল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল শেষ মুহূর্তে এমন কিছু একটা ঘটবে যাতে বিবদমান দুটি পক্ষের মধ্যে মিলন ঘটবে। কিন্তু আর অপেক্ষা করার মতো সময় নেই। কিছু একটা করতে হবে। থেনার্দিয়ের ছুরি হাতে বন্দীর সামনে কয়েক পা দূরে ইতস্তত করছিল।

হতাশ হয়ে সেদিকে তাকিয়েছিল মেরিয়াস। হঠাৎ তার ঘরের মধ্যে একবার চোখ ফেরাতেই চাঁদের আলোয় তার টেবিলের উপর একটা ক ’জ সে দেখতে পেল। এই কাগজের উপর আজ সকালে থেনার্দিয়েরের বড মেয়েটি একটা কথা লিখেছিল, বাইরে দেখ, পুলিশ এসে গেছে।

মুহূর্তমধ্যে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেল মেরিয়াস। তাকে এখন কি করতে হবে তা সে বুঝে নিল। সে এমন একটা কিছু করবে যাতে একই সঙ্গে হত্যার বলি আর হত্যাকারীকে বাঁচানো যাবে। মেরিয়াস কাগজটা কুডিয়ে নিয়ে একটা ছোট ঢেলা দিয়ে মুডিয়ে পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে পাশের ঘরে ফেলে দিল যাতে সেটা ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর পড়ল।

ঠিক সময়েই কাগজটা ফেলেছিল মেরিয়াস। থেনার্দিয়ের তখন তার সব উৎকণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে ছুরি হাতে বন্দীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় তার স্ত্রী তাকে বলল, কি একটা জিনিস পড়ল।

থেনার্দিয়ের বলল, কি বলছ তুমি ?

তার স্ত্রী কাগজটা কুড়িয়ে তার স্বামীর হাতে দিল।

থেনার্দিয়ের বলল, কি করে এল এটা?

জানালা দিয়ে নিশ্চয়।

বিগ্রেনেল বলল, হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি দেখেছি।

থেনার্দিয়ের তাড়াতাড়ি কাগজটা খুলে পড়ে ফেলল বাতির আলোয। পড়ার পর সে বলল, এটা এপোনিনের হাতের লেখা। হা ভগবান!

সে স্ত্রীকে ডেকে কাগজটা পড়ে শোনাতে লাগল। তাবপর বলল, জানালায় মইটা লাগাও। ইঁদুরটাকে ফাঁদে ফেলে রেখে আমাদের এখনি পালাতে হবে।

তার স্ত্রী বলল, ওর গলা না কেটেই?

সময় নেই।

বিগ্রেনেল বলল, কিন্তু কি করে পালাব আমরা?

থেনার্দিযের বলল, এপোনিনে যা লিখেছে তাতে বোঝা যায় বাড়ির পাশে জানালার নিচে কোনও পাহারা নেই।

মুখোশপরা লোকটা তার হাত দিয়ে তিনবার তালি দিল। এর দ্বারা সব লোকদের সতর্ক করে দিল। যারা তখন বন্দীকে ধরে ছিল তারা তাকে ছেড়ে দিল। একজন দড়ির মইটা খুলে জানালায লাগিয়ে দিল। থেনার্দিয়ের তার স্ত্রীকে ডেকে আগে মইয়ে উঠতে যেতেই বিগ্রেনেল তার জামার কলারটা ধরল। বলল, এত তাড়াতাড়ি আগে গেলে হবে না। আমরা আগে যাব।

অন্য সব লোকরা বলল, আমরা আগে যাব।

থেনার্দিয়ের তাদের বলল, কেন ছেলেমানুষি করে বৃথা সময় নষ্ট করছ?

তখন একজন বলল, তাহলে কে আগে যাবে তার জন্য লটারির ব্যবস্থা করা হোক।

থেনার্দিয়ের আবার বলল, পুলিশ দূরে নেই। আইন আমাদের তাড়া করছে। আর তোমরা লটারি করে সময় নষ্ট করবে?

এমন সময় দরজার কাছে এক গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তোমরা দেখছি আমার টুপিটা ধার করতে চাও।

সবাই সচকিত হয়ে দেখল, জেভার্ত দাঁড়িয়ে আছে। সে তার টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে হাসছিল।

২১

রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ইনস্‌পেকটার জেভার্ত তার লোকজন নিয়ে বাড়িটার সামনের দিকে গাছের আড়ালে লুকিয়ে সংকেতের অপেক্ষা করতে থাকে। থেনার্দিয়েরের দুই মেয়েকে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের ধরতে গিয়ে দেখে বড় মেয়েটা পালিয়ে গেছে। তাই সে ছোট মেয়ে আজেলমাকে ধরে। সে বাড়ির সামনে কয়েকবার ঘোড়ার গাড়ি যাতায়াত করতে দেখে। বাড়িতে যে সব লোক ঢোকে তাদের সে চিনত। তাতে তার সন্দেহ হয়। তারপর গুলির কোনও আওয়াজ না

পেয়ে মেরিয়াস তাকে সদর দরজার যে চাবিকাঠি দিয়েছিল তাই দিয়ে দরজা খুলে সে অবশেষে বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

পুলিশ দেখেই সাতজন ভয়ঙ্কর চেহারার লোক তাদের ফেলে দেওয়া অস্ত্রগুলো আপন আপন হাতে তুলে নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। তাদের হাতে কুড়ুল দা প্রভৃতি অস্ত্র ছিল। থেনার্দিয়ের তার ছুরিটা ঘোরাতে থাকে। তার স্ত্রী একটা পাথর কুড়িয়ে নেয়।

জেভার্ত আবার টুপিটা মাথায় দিয়ে ঘরের মধ্যে দু-পা এগিয়ে এসে শান্ত কণ্ঠে বলল, ব্যাপারটা বোঝ। তোমরা জানালা দিয়ে পালাতে পারবে না। বরং দরজা দিয়ে পালানোটা কম কষ্টকর হবে। তবে তোমরা সংখ্যায় সাতজন আর আমরা সংখ্যায় আছি পনেরজন। সুতরাং বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করাই ভাল।

বিগ্রেনেল তার পিস্তলটা বার করে থেনার্দিয়েরের হাতে দিয়ে চুপি চুপি বলল, আমি জেভার্তকে গুলি করতে পারি না। তুমি পারতো করো।

থেনার্দিয়ের বলল, আমি করব।

জেভার্ত তখন থেনার্দিয়েরের কাছ থেকে মাত্র তিন পা দূরে ছিল। সে জেভার্তকে লক্ষ্য করে পিস্তলটা তুলে ধরল।

জেভার্ত বলল, কোনও লাভ হবে না। ওতে গুলি নেই।

থেনার্দিয়ের পিস্তলের ঘোড়া টিপল, কিন্তু গুলি বার হলো না।

জেভার্ত বলল, আমি তো আগেই বলেছিলাম।

বিগ্রেনেল তার হাতের দা-টা ফেলে দিয়ে জেভার্তকে বলল, তুমি হচ্ছ শয়তানের রাজা। আমি আত্মসমর্পণ করলাম। তবে আমাকে জেলে রাখার সময় তামাক খাবার অনুমতি দিতে হবে।

জেভার্ত বলল, ঠিক আছে। তোমার দেখছি বুদ্ধি আছে। আর বাকি সবাই ?

বাকি সবাই ঘাড় নেড়ে আত্মসমর্পণ করতে চাইল।

এমন সময় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ঘরে ঢুকল। জেভার্ত তাদের হুকুম দিল, ওদের হাতে হাতকড়া লাগাও।

এদিকে থেনার্দিয়েরের স্ত্রী তখন জানালার ধারে একটা বড় পাথর হাতে দাঁড়িয়ে পুলিশদের বলল, কই এস দেখি।

থেনার্দিয়ের তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক দানবী একটা পাথর ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

পুলিশরা দরজার কাছে সরে গেল পাথরের ভয়ে। তাদের ভয় দেখে থেনার্দিয়েরের স্ত্রী বলল, কাপুরুষ শূকরী কোথাকার!

জেভার্ত কিন্তু নির্ভয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। থেনার্দিয়েরপত্নী তখন তার দিকে তাকিয়ে বলল, এক পাও এগোবে না। তাহলে তোমার মাথাটা গুঁড়ো করে দেব।

জেভার্ত বলল, একজন যোদ্ধা যেন। তুমি পুরুষের মতো ব্যবহার করছ। কিন্তু আমার আছে নারীদের থাবা আর নখ।

এই বলে সে এগিয়ে যেতে লাগল। থেনার্দিয়েরপত্নী পাথরটা ছুঁড়ে দিল। জেভার্ত কায়দা করে পাশ কাটিয়ে গেল। পাথরটা তার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। সেটা সামনের দেওয়ালে লাগায় কিছু চুনবালি খসে গেল। তখন থেনার্দিয়েরপত্নী কান্নায় ভেঙে পড়ল, আমার মেয়েরা।

জেভার্ত বলল, তাদের আগেই ধরেছি।

এই বলে সে একটা হাত থেনার্দিয়েরের মাথায় আর একটা হাত তার স্ত্রীর কাঁধের উপর দিয়ে তার লোকদের বলল, হাতকড়া লাগাও।

পুলিশরা সবার হাতে হাতকড়া লাগাবার পর ঘুমন্ত মাতাল লোকটাকে তুলল। সে বলল, কে জনদ্রেত্তে? সব ঠিক হয়ে গেছে?

জেভার্ত বলল, হ্যাঁ, সব কাজ হয়ে গেছে।

হাতকড়া লাগানো লোকগুলোর মধ্যে তিনজনের মুখে মুখোশ ছিল আর তিনজনের মুখে চুনকালি মাখা ছিল। তাদের ভূতের মতো দেখাচ্ছিল।

জেভার্ত বলল, সবাই মুখোশ খুলে ফেল।

তারা সবাই মুখোশ খুলে ফেললে জেভার্ত তাদের অভ্যর্থনা জানাল। বলল, সান্ধ্য নমস্কার বিগ্রেনেল,—ব্রুজোঁ, দিউ মিলিয়ার্দ। গুয়েলমার, বাবেত, আর ক্লাকেসাস,—তোমাদেরও নমস্কার জানাই। মুখোশ পরায় তোমাদের চমৎকার দেখাচ্ছিল।

এবার বন্দীর দিকে তাকিয়ে জেভার্ত বলল, ভদ্রলোকের বাঁধন খুলে দাও। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া কেউ যেন বাইরে না যায়।

বন্দী এতক্ষণ সব কিছু দেখে যাচ্ছিল নীরবে। একটা কথাও বলেনি।

এবার জেভার্ত টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসে তার রিপোর্ট লিখতে লাগল। লেখার পর সে বলল, এবার ভদ্রলোককে আমার কাছে আসতে বল।

পুলিশরা এবার ভদ্রলোকের খোঁজ করতে লাগল। জেভার্ত বলল, কোথায় সে? কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও তাকে দেখা গেল না।

বন্দী মঁসিয়ে লেবলাঁ বা আর্বেন ফেবার চলে গেছে। দরজার কাছে পাহারা ছিল। কিন্তু খোলা জানালার কাছে কোনও পাহারা ছিল না। মঁসিয়ে লেবলাঁর পায়ের বাঁধন খুলে দিলে সে ভিড়ের মধ্যে পুলিশদের কর্মব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে জানালার কাছটা অন্ধকার থাকায় সেই দিকে পালিয়ে যায়। দড়ির মইটা জানালায় তখনো লাগানো ছিল। একজন পুলিশ জানালার ধারে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। জেভার্ত বলল, লোকটা দেখছি সব থেকে পাকা শয়তান।

২২

এই ঘটনার পরের দিন সন্ধের সময় একটি ছেলে পন্ত দ্য অস্টারলিৎস থেকে গর্বোর ব্যারাক বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। মাদাম বুগনল সদর দরজার সামনে বসে ছিল। ছেলেটা তার কাছে এসে বলল, আমি ভেবেছিলাম একটা বড় কুকুর।

কুকুর বলায় বুড়ী বুগনল রেগে গিয়ে বলল, একটা ক্ষুদে রাক্ষস। আমি দাঁড়িয়ে থাকলে তোর বুকে পা দিতাম।

ছেলেটা বলল, আমি তাহলে ঠিকই ভেবেছি।

ছেলেটা এবার বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধ দেখে দরজায় লাথি মারতে লাগল। মাদাম বুগনল ব্যস্ত হয়ে বলল, একি করছিস রে ছোঁড়া? ভাল দরজাটা ভাঙবি নাকি?

এতক্ষণে রাস্তার আলোয় ছেলেটার মুখটা দেখতে পেয়ে বুগনল বলল, ও তুই? পাজী ছোঁড়া কোথাকার!

ছেলেটা বলল, তুমি বুড়ী? নমস্কার মাদাম বুগ—-আমি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

মাদাম বুগনল বলল, বাড়িতে কেউ নেই।

ছেলেটা বলল, আমার বাবা কোথায়?

জেলে।

আমার মা কোথায়?

সেন্ট [illegible]।

আমার দিদিরা?

ম্যাদেলোনেত্তেতে আছে।

ছেলেটা তখন শিস দিয়ে বলল, ঠিক আছে।

এই বলে সে গান করতে করতে এলম গাছে ঘেরা রাস্তা দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

জুলাই বিপ্লবের পর ১৮৩১ ও ১৮৩২ সাল দুটির এক বিশেষ তাৎপর্য আছে আমাদের ইতিহাসে। এই দুটি সাল যেন বিপ্লবের ফলাফলের দুটি দিককে উদ্‌ঘাটিত করে লোকচক্ষে। সে ফলাফলের একদিকে আছে এক বিরাট পাহাড় আর একদিকে আছে এক গভীর খাদ। নানারকম আবেগানুভূতি আর তত্ত্বকথার মেঘঝড়ের মাঝে সমাজের যে জনগণ সব সভ্যতার ভিত্তিভূমি সে জনগণের বারবার আনাগোনা ঘটেছে আন্দোলন আর প্রতিরোধের মাধ্যমে।

বুর্বন রাজবংশের প্রতিষ্ঠায় সারা দেশের মধ্যে একটা ঝিমুনির ভাব আসে। অনেক বিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহ, বীরত্ব, আর জাতীয় উচ্চাভিলাষের মত্ততার পর শান্তি চায় দেশের ক্লান্ত জনগণ। এই সময় রাষ্ট্রদর্শনের প্রবক্তারা এগিয়ে আসেন তৎপর হয়ে। কিন্তু

দেশের জনগণ অনাবিল শান্তি আর শৃঙ্খলা চায়। স্টুয়ার্ট যুগের ইংলন্ড যেমন একদিন লর্ড প্রোটেক্টারের অধীন প্রজাতন্ত্রের পর শান্তি চায় তেমনি ফরাসী জনগণ বিপ্লব ও সাম্রাজ্যশাসনের পর শান্তি চায়।

সম্রাট নেপোলিয়নের পতনের পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুর্বন রাজতন্ত্র জনগণের দাবির প্রতি ছিল উদাসীন। তারা তখন রাজ্যশাসনের ঐশ্বরিক অধিকারে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে রাজা অষ্টাদশ লুই-এর সনদে প্রজাদের অধিকার দানের যে প্রতিশ্রুতি ছিল সে অধিকার ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে নিতে পারেন রাজা। প্রজারা বুঝতে পেরেছিল তাদের ন্যায়সংগত অধিকার দানের ব্যাপারে রাজাদের বিতৃষ্ণার অন্ত নেই।

বুর্বন রাজারা ভাবত সম্রাটের পতনের পর তাদের হাত খুব শক্ত হয়েছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে শক্তি সম্রাটকে অপসারিত করে তাঁর পতন ঘটায় সে শক্তির হাতে তারা ক্রীড়নক মাত্র। তারা ভাবত যে অতীতে তাদের রাজশক্তির শিকড় গাড়া আছে সেই অতীত থেকেই তারা প্রাণরস আহরণ করে বেঁচে থাকবে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে অতীতের মধ্যে তাদের শিকড় গাঁথা আছে সে অতীত হলো ফরাসী আর ফরাসী জাতি। তারা বুঝতে পারেনি যে গভীর আর শক্তিশালী শিকডগুলো তাদের ধারণ করে রেখেছে সে শিকড় কোনও এক বিশেষ রাজবংশের অধিকার নয়, সে শিকড হলো সমস্ত ফরাসী জনগণের জাতীয় অধিকার।

বুর্বন রাজবংশ হলো ফ্রান্সের রক্তাক্ত ইতিহাসের মূল; কিন্তু ফ্রান্সের ভাগ্য বা রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে তার কোনও ভূমিকা ছিল না। কুড়ি বছর ধরে শাসনক্ষমতা হারিয়ে দেশ ও জাতির ভাগ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তারা। তারা এ কথাটা বুঝতে পারেনি। তারা বুঝতে পারেনি রাজা সপ্তদশ লুই-এর রাজত্বকালেই থার্মিভরের ঘটনা ঘটে এবং অষ্টাদশ লুই-এর আমলে ম্যারঙ্গোর ঘটনা ঘটে। ইতিহাসের আদিকাল থেকে আর কোনও রাজা কখনো দেশের ঘটনা সম্পর্কে এমন ঔদাসিন্য দেখায়নি। এর আগে আর কখনো রাজার অধিকার জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করেনি। ১৮১৪ সালের সনদে জনগণকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা অধিকার নয়, জনগণের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, সে অধিকার গ্রাস।

রাজারা যখন দেখল রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে বোনাপার্টের উপর রাজশক্তির জয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাদের অধিকারের প্রতি সচেতন হয়ে উঠল জনগণ। জুলাই-এর কোনও এক সকালে জনগণ তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার সম্বন্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে অকস্মাৎ। তাদের ধারণা ছিল, রাজা জাতি ও নাগরিকদের ন্যায়সংগত অধিকার দান করতে চাইছেন না।

সুতরাং যে উদ্দেশ্যে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা কার্যত ব্যর্থ হয়ে গেল।

তা সত্ত্বেও একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে এই রাজতন্ত্র অগ্রগতির পথে কোনও প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেনি। এই রাজতন্ত্রের আমলে অনেক ভাল কাজও হয়েছিল।

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের আমলে ফরাসী জাতি শান্তিপূর্ণ আলোচনায় অভ্যস্ত হয়ে

উঠেছিল যা প্রজাতন্ত্রের আমলে সম্ভব হয়নি। আবার সাম্রাজ্যবাদের যুগেও তা সম্ভব হয়নি। স্বাধীন ও শক্তিশালী ফ্রান্সের শান্তিপূর্ণ ভাবধারা ও জীবনভঙ্গিমা ইউরোপের অন্যান্য জাতিদের সামনে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ফরাসী বিপ্লব রোবোসপীয়ারের মুখ দিয়ে অনেক বিক্ষুব্ধ কথা বলেছিল আর বোনাপার্টের অধীনে কামানগর্জনে ফ্রান্স অনেক কথা বলেছিল। কিন্তু অষ্টাদশ লুই আর দশম চার্লস এর অধীনে দেশের বুদ্ধিজীবিরা কথা বলতে থাকে এবং সে কথা দেশের জনগণ শুনতে থাকে। ঝড় থেমে যাওয়ায় আবার সব আলো জ্বলে ওঠে। ঊর্ধ্বে আত্মার শান্ত আলোকে কাঁপতে দেখা যায়। তা দেখে আনন্দ পায় দেশের মানুষ। পনের বছর ধরে অনেক বড় বড় নীতি কাজ করতে থাকে, আগে রাজনীতিবিদরা যে নীতি কার্যকরী করতে পারেনি। আইনের আগে সাম্য, আত্মার স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, মত প্রচারের স্বাধীনতা, গুণী ব্যক্তিদের উপযুক্ত কাজ দান—

এই সব কিছু ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। ঈশ্বরের বিধানে বুর্বনরা সভ্যতার যন্ত্রস্বরূপ কাজ করতে থাকে।

জুলাই বিপ্লবের ফলে বুর্বন রাজবংশের পতনের মধ্যে যে একটি মহত্ত্ব ছিল সে মহত্ত্ব হলো ফরাসী জাতির। বুর্বন রাজারা নীরবে সিংহাসন ত্যাগ করে চলে যায়। রাজসৈন্যের সম্মুখীন হয়ে এবং সামরিক শক্তির চাপ পেয়েও জনগণ খুব বেশি বিক্ষুব্ধ হয়নি। তারা রাজপরিবারে কোনও রক্তপাত ঘটায়নি, রাজারা সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যান দেশ থেকে। এতে তারা শান্ত হয়ে ওঠে। জুলাই বিপ্লবের ফলে জনগণের যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেই অধিকারই ছিল ন্যায় আর সত্য। সে অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বলপ্রয়োগের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

২

রাজনীতিবিদদের মতে কোনও দেশে বিপ্লবের পর তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে যদি রাজতন্ত্র কায়েম থাকে তাহলে সে দেশে এক রাজবংশের শাসন দরকার হয়। বিপ্লবের পর শান্তি প্রতিষ্ঠার দরকার। কিন্তু রাজা খুঁজে পাওয়া আর রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করা এক নয়। কাউকে রাজা করা যত সহজ কোনও রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করা তত সহজ নয়। নেপোলিয়নকে হঠাৎ রাজা করা হয়, ১৮২১ সালে মেক্সিকোর এক সেনাপতি ইতুর্বিদেকে সম্রাট করা হয়, পরে অবশ্য ১৮২৩ সালে তিনি আবার সিংহাসনচ্যুত হন। কিন্তু নেপোলিয়ন বা ইতুর্বিদে কেউ একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি।

কিন্তু রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি দরকার? যে রাজা একই সঙ্গে বিপ্লবী, যিনি বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও বিপ্লবের ভাবাদর্শকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেন, আবার দেশের অতীত ইতিহাসের প্রতি সহানুভূতিশীল, যিনি দেশের ভবিষ্যতের কথাও ভাবেন সেই রাজাই এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন। বিপ্লবের পর ইংলন্ড ও ফ্রান্সের জনগণ একজন ক্রমওয়েল ও নেপোলিয়নের মতো একজন

শক্ত লোকের খোঁজ করেছিল। কিন্তু পরে তারা ব্যর্থ হয়ে আর এক বিপ্লবের পর একটি করে রাজবংশের খোঁজ করতে থাকে। ইংলন্ডের জনগণ ব্রানসউইক রাজবংশ এবং ফ্রান্সের জনগণ অর্লিয়ান্স রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। রাজবংশগুলি হচ্ছে ভারতীয় বটগাছের মতো যার ডালগুলো মাটিতে নুইয়ে পড়ে শিকড়ের মতো মাটিতে ঢুকে গিয়ে এক একটি গাছ হয়ে ওঠে। তেমনি এক একটি রাজা এক একটি রাজবংশ হয়ে উঠতে পারে যদি সে রাজা জনগণের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেন।

কিন্তু রাজশক্তিকে অপসারিত করার জন্য ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবও সফল হয়নি একেবারে। ১৮৩০ সালের সে বিপ্লবকে উপর থেকে সফল বলে মনে হলেও তা যেন মাঝপথে বাধা পেয়ে থেমে যায়। সে বাধা কে দিল? সে বাধা দান করে বুর্জোয়ারা।

কিন্তু কেন? কারণ ক্ষুধা থেকে অভাব থেকে সহসা প্রাচুর্যের মধ্যে পড়ে যায় তারা। গতকাল যেখানে ছিল কুণ্ঠার তাড়না, আজ সেখানে দেখা দেয় প্রাচুর্য, কাল আবার সেখানে দেখা দেবে উদ্বৃত্ত। নেপোলিয়ন ক্ষমতায় আসীন হবার পর ১৮১৪ সালে যা হয়েছিল দশম চার্লস-এর পর ফ্রান্সে আবার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে।

ভুল করে বুর্জোয়াদের তখন একটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু আসলে তারা ছিল জনগণেরই একটি পরিতৃপ্ত অংশ। তারা তখন আরাম কেদারায় বসে বিশ্রামে ব্যস্ত ছিল। তাদের দোষ এই যে তারা দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির দিকে না তাকিয়ে নিজেদের আরাম উপভোগে মত্ত হয়ে থাকত। তারা বুঝতে পারেনি দেশের কিছু লোক যদি ব্যস্ত ও অশান্ত হয়ে ওঠে তাহলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এটাই হলো বুর্জোয়াদের ব্যর্থতা। দেশের সবাই এগিয়ে যাবে আর কিছু লোক আত্মস্বার্থে মগ্ন হয়ে থাকবে এটা কখনো চলতে পারে না।

১৮৩০ সালের মত্ততার পর ফরাসী জাতির বুর্জোয়া নামে একটি অংশ বিশ্রামের জন্য থামতে চেয়েছিল। তারা ঘুমোয়নি, বা স্বপ্ন দেখেনি অথবা আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকেনি। তারা শুধু থামতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনও সামরিক অভিযানের সময় সৈনিকদেরও মাঝে মাঝে বিশ্রাম করার জন্য হুকুম দেওয়া হয় যাতে তারা বিশ্রামের পর দেহে নতুন শক্তি আর মনে উদ্যম পায়। কিন্তু থামা হলো গতকালকার যুদ্ধ আর আগামী কালের যুদ্ধের মাঝখানে এক সজাগ সতর্ক বিরতি এবং সে থামার হুকুম দেওয়ার জন্য থাকে এক সেনাপতি বা সেনানায়ক।

বুর্জোয়াদেরও থামার হুকুম দেওয়ার জন্য একজন নেতা বা নায়কের প্রয়োজন ছিল। অর্লিয়ান্সের লুই ফিলিপই হলো সেই লোক।

জাতীয় আইনসভার ২২১ জন ডেপুটির ভোটে লুই ফিলিপ রাজা নির্বাচিত হন। লাফায়েত্তে সে সভায় সভাপতিত্ব করার সময় প্রজাতন্ত্রের গুণগান করে। ১৮৩০-এর বিপ্লবের এটাই হলো কৃতিত্ব।

কিন্তু পরে এই জোড়াতালি দেওয়া সমাধানের মধ্যে একটা বিরাট দুর্বলতা ধরা পড়ে। এত করা সত্ত্বেও জনগণের মৌল অধিকারের প্রতি কোনও সম্মান দেখানো হয়নি।

৩

বিপ্লবের হাত যত শক্তিশালীই হোক, তার অস্ত্র যত জোরালই হোক, তার মধ্যে কতকগুলি ভুল-ত্রুটি থাকে। বিপ্লবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আমাদের বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। বিপ্লবেরও দোষ থাকতে পারে এবং ১৮৩০ সালের বিপ্লবও সে দোষ থেকে মুক্ত নয়।

১৮৩০ সালের বিপ্লব প্রথমে ঠিক পথেই চলতে শুরু করেছিল। রাজতন্ত্রের মধ্যে দোষগুণ যাই থাক রাজার একটা ব্যক্তিগত মূল্য আছে। লুই ফিলিপ সত্যিই একজন ভাল লোক ছিলেন। তাঁর পিতা যেমন নিন্দার পাত্র ছিলেন লুই ফিলিপ তেমনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র।

তাঁর অনেক ব্যক্তিগত গুণ ছিল। তিনি ছিলেন স্থিতধী, শান্তিপ্রিয়, ধৈর্যশীল, সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত। অথচ তাঁর বংশের পূর্বপুরুষরা অবৈধ নারীসংসর্গে অভ্যস্ত। আসলে তিনি যেন গুণানুশীলনের দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন ছিলেন। আবার রাজকীয় আত্মমর্যাদার দিক থেকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বংশমর্যাদার প্রতি সচেতন থাকলেও তাঁর সুমতি এবং যথেষ্ট বুদ্ধিবিবেচনা ছিল। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভাষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাও জানতেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে মিতবাক হয়েও প্রকাশ্য জনসভায় ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন। তিনি তাঁর বংশের ও তাঁর আমলের অন্য সব রাজাদের থেকে মানুষ হিসাবে খুব ভাল এবং বড় ছিলেন। তিনি নিজেকে বুর্বন না বলে অর্লিয়ান্স বলে অভিহিত করতেন। তিনি অনেক বই পড়তেন, কিন্তু সাহিত্যরস আস্বাদনে কোনও মতিগতি ছিল না। তিনি ছিলেন মোহমুক্ত এক রাজনীতিবিদ এবং কর্তব্যপরায়ণ। কোন কাজ আগে করতে হবে তা তিনি জানতেন। তিনি ছিলেন আত্মসম্প্রসারণশীল এবং প্রভুত্বপিয়াসী। তিনি সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে প্রতিকূল জনমতকে স্তব্ধ করতে পারতেন। তিনি দেশকে ভালবাসতেন ঠিক, কিন্তু দেশের থেকে তাঁর বংশগৌরবকে বেশি ভালবাসতেন। প্রভুত্বের থেকে আবার শাসনক্ষমতাকে বেশি ভালবাসতেন। আবার আত্মমর্যাদার থেকে প্রভুত্বকে বেশি পছন্দ করতেন। তিনি আনকোনাতে অস্ট্রীয়ার সঙ্গে এবং স্পেনে ইংলন্ডের সঙ্গে সাহসের সঙ্গে বোঝাপড়া করেন। তিনি বিশেষ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে 'মার্সাই' গান গাইতেন। কোনও কিছুতেই ভয় পেতেন না। সৌন্দর্য বা কোনও আদর্শবাদের প্রতি তাঁর কোনও অনুরাগ ছিল না। আবার যুক্তিহীন আবেগাত্মক উদারতা বা কোনওরূপ দিবাস্বপ্ন অথবা কোনও অলীক অবাস্তব ভাবধারার প্রতি তাঁর কোনও প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ, কিন্তু কোনও অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা, বাস্তব বুদ্ধি ও বাগ্মিতার দিক থেকে তিনি ছিলেন সীজার, আলেকজান্ডার আর নেপোলিয়নের সমতুল। তিনি ছিলেন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রবক্তা। সেই শতাব্দীর এক মহান লোক, এক ঐতিহাসিক শাসনকর্তা।

যৌবনে তিনি সুন্দর ছিলেন দেখতে। সমগ্র জাতি তাঁকে খুব একটা শ্রদ্ধা না

করলেও সাধারণ মানুষ তাঁকে ভালবাসত। তাঁর মাথার চুল সব পেকে গেলেও তাঁকে বৃদ্ধ বলে মনে হত না। অভিজাত আর বুর্জোয়ার সংমিশ্রণ ছিল তাঁর চরিত্রে। নতুন এবং পুরনো চিন্তাধারা সমন্বিত এক যুগসন্ধিক্ষণের প্রতিমূর্তি ছিলেন লুই ফিলিপ। দশম চার্লস-এর মতো তিনি গ্রাঁদ ন্যাশনালের পোশাক পরতেন এবং নেপোলিয়নের মতো লিজিয়ন দ্য অনার-এর ব্যাজ ধারণ করতেন।

তিনি কখনো গীর্জায় যেতেন না, শিকার করতে যেতেন না অথবা কোনও অপেরা বা নাচগানের আসরেও যেতেন না। বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য অন্য রাজারা তখন সাধারণত এই সব করত। কিন্তু লুই ফিলিপ ছিলেন স্বতন্ত্র। তিনি ছাতা হাতে অনেক সময় রাস্তায় বেড়াতেন।

ইতিহাসে রাজা লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে তিন রকমের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ অভিযোগ হলো তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং রাজ্যশাসনের বিরুদ্ধে। বাড়ি নির্মাণ, বাগানের কাজ আর ওষধি বিদ্যায় বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁর। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি হলো গণতান্ত্রিক অধিকারের কণ্ঠরোধ, দেশের জাতীয় অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি, গণবিক্ষোভের দমন এবং বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনীর নিযোগ এবং দেশে পুরোপুরিভাবে আইনের অনুশাসন প্রবর্তন না করা। তাছাড়া বেলজিয়ামকে প্রত্যাখ্যান এবং ইংরেজদের ভারত জয়ের মতো বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আলজিরিয়া জয় তাঁর রাজত্বকালের ত্রুটি। আসলে ফ্রান্সের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যুৎসাহী। এটাই তাঁর বড দোষ। তার সঙ্গে তাঁর রাজবংশের ভাবমূর্তিটাকেও অতিমাত্রায় উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি।

একদিকে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর অন্য দিকে বিপ্লব—এই দুই-এর মধ্যে যে বৈপরীত্য ছিল সে বৈপরীত্য যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর মধ্যে। ১৮৩০ সালে এই বৈপরীত্য থেকে লাভবান হয়েছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন সে যুগের উপযুক্ত এক রাজা। গায়ে রাজরক্ত থাকা সত্ত্বেও নির্বাসনে থাকাকালে বিদেশে দারুণ দুরবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হয় তাঁকে। এক বিরাট ধনী ও সমৃদ্ধিশালী দেশের রাজবংশের সন্তান হয়েও সুইজারল্যান্ডে নির্বাসনে থাকাকালে একদিন খাবারের টাকা যোগাড়ের জন্য একটি ঘোড়া বিক্রি করতে হয় তাঁকে। বিশেনতে যাবার সময় তিনি এক জায়গায় অঙ্ক শিখিয়ে কিছু রোজগার করেন এবং তাঁর বোন অ্যাদেলেজ সূচীশিল্পের কাজ করতেন। এই সব কারণে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন দেশে ফিরে আসার পর।

রাজা হবার পর তিনি সেন্ট মাইকেলে রক্ষিত বন্দীদের রাখার জন্য লোহার খাঁচাটি নিজের হাতে ধ্বংস করেন। এই খাঁচাটি রাজা একাদশ লুই-এর আদেশে নির্মিত হয় এবং পঞ্চদশ লুই-এর আদেশে ব্যবহৃত হয়। লুই ফিলিপের ব্যক্তি হিসাবে দোষের থেকে রাজা হিসাবে কর্তব্যচ্যুতির দোষই বেশি। তাঁর রাজকীয় কর্তব্যের থেকে তার পরিবারের কর্তব্যকেই বড় বলে মনে করতেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির মধ্যে এই অভিযোগটাই সবচেয়ে বড়।

তাঁর পুত্রকন্যাদের মনের মতো করে মানুষ করে তোলেন তিনি। তাঁর এক কন্যা

মেরি দ্য অর্লিয়াক্স শিল্পী হিসাবে নাম করেন এবং চার্লস দ্য অর্লিয়াক্স নামে এক পুত্র কবি হিসাবে নাম করেন। মেরি জোয়ান অফ আর্কের যে একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন তা তাঁর উন্নত মানের শিল্পীমানসের এক গৌরবময় কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। তাঁর আরও দুটি পুত্র গুণবান হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে মেটারনিক তাঁদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, যুবক হিসাবে তারা বিরল।

যৌবনে লুই ফিলিপ ছিলেন দুমোরিজের সহকর্মী এবং লাফায়েত্তের বন্ধু। তিনি ছিলেন জ্যাকোবিন ক্লাবের সদস্য। মিরাবো তাঁর কাঁধের উপর একটা চাপড় দেয় এবং দাঁতন তাঁকে 'যুবক' বলে সম্বোধন করে। ১৭৯৩ সালে কনভেনশানের পিছনের বেঞ্চে বসে ষোড়শ লুই-এর বিচার স্বচক্ষে দেখেন। এক অন্ধ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যে বিপ্লব রাজা এবং রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে, সে বিপ্লবের উগ্র ভাবধারার চাপে কিভাবে একটি মানুষ নিষ্পেষিত হয় তা লুই ফিলিপ দেখেন। কিন্তু লুই বুঝতে পারেন জনগণের আসল ক্ষোভ হলো রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং সে ক্ষোভ ন্যায়সঙ্গত, ঈশ্বরের বিধানের মতোই সে ক্ষোভের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব না করে পারেননি লুই ফিলিপ।

তাঁর মনের উপর বিপ্লবের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সেই বিপ্লবের কযেক বছরের সব ঘটনা এক জীবন্ত ছবির মতো তাঁর মনে জাগ্রত থাকে সব সময়।

রাজা হওযার পর জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন তিনি। তাঁর রাজত্বকালে মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রকাশ এবং প্রচারের ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা ছিল। আইন-আদালতের কাজে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না রাজা। নাগরিকরা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারত। জনগণ রাজার যেকোনও কাজের সমালোচনা করতে পারত স্বাধীনভাবে।

যে ইতিহাস সব রাজা ও রাজশক্তির বিচার করে, লুই ফিলিপ সম্বন্ধে সেই ইতিহাসের বিচারে কিছু ভুলভ্রান্তি আছে। তবে প্রখ্যাত কঠোরমনা ঐতিহাসিক লুই ব্লাঁ পরে লুই ফিলিপ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন করেন।

সিংহাসন ও রাজ্যশাসনের কথা ছেড়ে দিয়ে লুই ফিলিপকে যদি আমরা মানুষ হিসাবে দেখি তাহলে কি দেখব? মানুষের প্রতি তাঁর দযা এবং করুণা তাঁর অন্য সব মহত্ত্বকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তাঁর শত কাজ এবং চিন্তাভাবনার মাঝে এবং সারাদিন যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়ে ও সারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ফিরে তিনি সারারাত ধরে ফৌজদারী বিচারের সব কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখতেন। বিশেষ করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের প্রতি তাঁর দয়া ছিল অপরিসীম। কিভাবে তাদের বাঁচানো যায় তার জন্য বিশেষ নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে চেষ্টা করতেন। সরকারপক্ষের উকিল ও রাজকর্মচারীদের কাজে আস্থা রাখতে পারতেন না তিনি। গিলোটিনে ফাঁসি দেওয়া পছন্দ করতেন না তিনি। গিলোটিনের পরিবর্তে তিনি সাধারণ ফাঁসিমঞ্চের ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করেন। একবার তিনি সাতজন আসামীর মৃত্যুদণ্ড মকুব করেন।

৪

রাজসিংহাসনে বসার জন্য বলপ্রয়োগ করতে হয়নি লুই ফিলিপকে। রাজবংশের সন্তান হিসাবে সিংহাসনে অধিকার ছিল তাঁর। তার উপর তিনি জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা রাজা নির্বাচিত হন। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই নির্বাচন আইনসংগত এবং এই রাজপদ গ্রহণ করা তাঁর কর্তব্য। লুই ফিলিপ সরল বিশ্বাসে সিংহাসনে বসেন আর গণতন্ত্রও সরল বিশ্বাসে তাঁকে আক্রমণ করে। রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব যেন প্রকৃতির দুটি প্রধান বস্তুর মধ্যেই দ্বন্দ্ব। তাদের দ্বন্দ্ব দেখে মনে হয় জলের প্রতিনিধিরূপ সমুদ্র বাতাসের প্রতিনিধিরূপ ঝড়ের সঙ্গে এক দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছে।

১৮৩০ সালে রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গোলযোগ শুরু হয়, নানারকমের আন্দোলন আর বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়।

ইউরোপের অন্য সব দেশ জুলাই বিপ্লবকে ভাল চোখে দেখেনি এবং ফ্রান্সের মধ্যেও এই বিপ্লব সম্বন্ধে নানারকম ব্যাখ্যা করা হয়। অনেক রাজনৈতিক মত এবং দল গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে বিধান মূর্ত হয়ে ওঠে সে বিধানের কথা কেউ বুঝতে পারে না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শান্ত বিত্তের যে সব মানুষ শান্ত ও নিষ্ক্রিয়ভাবে সব কিছু প্রত্যক্ষ ও পর্যালোচনা করার পর কাজ শুরু করে তখন ঘটনার স্রোত অনেক দূর এগিয়ে যায়। অনেক কিছু ঘটে যায়। দেশের পুরনো রাজনৈতিক দলগুলি সব সময় বিপ্লবকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। তারা যেন স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার চেষ্টা করে। তাদের মতে রাজ্যশাসনে রাজার বংশগত অধিকার আছে, সুতরাং যে রাজদ্রোহিতা থেকে বিপ্লবের জন্ম সে বিদ্রোহ দমনের অধিকার রাজার আছে। সব বিদ্রোহের পিছনে থাকে এক অন্ধ ক্রোধ। কিন্তু সব বিপ্লবের মূলে থাকে এক আদর্শ, এক প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে সে বিপ্লবকে বাধা দেয়। বাধাদানকরীরা বলতে লাগল এ বিপ্লব রাজাকে সিংহাসনে বসাবার বিপ্লব। এ বিপ্লবের অর্থ হয় না। ১৮৩০ সালের বিপ্লব দেউলে হয়ে পড়ে সব দিক দিয়ে। প্রজাতন্ত্রীরা ও গণতন্ত্রবাদীরা একযোগে আক্রমণ করে তাকে। একদিকে ছিল যুগ-যুগান্তব্যাপী রাজতন্ত্র আর অন্যদিকে ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার। একদিকে অতীত, অন্য দিকে ভবিষ্যৎ। দু'দিকে চাপ পাচ্ছিল এই বিপ্লব। বৈদেশিক ব্যাপারে এ বিপ্লবের এক তাৎপর্য ছিল। কারণ এ বিপ্লবের ফলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি খুশি হয়। তারা সমর্থন করে এ বিপ্লব। আভ্যন্তরীণ দিক থেকেও এর একটি তাৎপর্য ছিল। এ বিপ্লব রাজতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেও সে রাজতন্ত্রকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায় না কোনওক্রমে। তাছাড়া ইউরোপীয় কায়দায় অন্যান্য দেশের মতো এখানেই রাজ্যশাসনে রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্য মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

ইতিমধ্যে অসংখ্য সমস্যা এসে দেখা দেয় রাজসরকারের সামনে। দারিদ্র্য, সর্বহারা, বেতনহার, শিক্ষা, শাস্তি, বেশ্যাবৃত্তি, নারীসমাজের অবস্থা, উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিময়, মুদ্রাব্যবস্থা, মূলধন ও শ্রমের অধিকার—এই সব সমস্যা একসঙ্গে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলির বাইরেও একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল। সে আন্দোলন হলো চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আন্দোলন। জনগণ যখন বিপ্লবের তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে দুলছিল, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তখন তাদের অনেক উর্ধ্বে তত্ত্বকথা চিন্তা করছিলেন। এঁরা রাজনৈতিক অধিকারের দাবির ব্যাপারটা পুরোপুরি রাজনৈতিক দলগুলির উপর ছেড়ে দিয়ে শুধু দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অধিকার এবং সুখশান্তির কথা চিন্তা করতে থাকেন। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করলেও এঁরা সবাই নিজেদের সমাজতন্ত্রবাদী বলে অভিহিত করতেন এবং এই নামেই তাঁরা পরিচিহ্নিত ছিলেন।

এই সব সমাজতন্ত্রবাদীরা যে দুটি সমস্যাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতেন সেগুলি হলো সংখ্যায় দুটি। প্রথম সমস্যা হলো উৎপাদন এবং দ্বিতীয় সমস্যা হলো বণ্টন। উৎপাদন সমস্যার মধ্যেই আছে শ্রম অর্থাৎ সম্পদ সৃষ্টিতে মানবিক শক্তি প্রয়োগের প্রশ্ন। বণ্টন সমস্যার মধ্যে আছে বেতনের প্রশ্ন এবং কিভাবে দেশের শ্রমজাত সম্পদ দেশের লোকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় তার কথা।

দেশের মানবিক শক্তি ও শ্রমের যথাযথ প্রয়োগ দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তোলে। আব সুষম বণ্টন দেশের মানুষের সুখশান্তি বৃদ্ধি করে। সুষম বণ্টন মানে অবশ্য সমবণ্টন নয়, সুষম বণ্টন মানে ন্যায়সংগত বণ্টন অর্থাৎ দেশের জাতীয় সম্পদ বণ্টনেব ব্যাপারে যেন অন্যায় অসাম্য না থাকে। দেশের সব মানুষ যেন খেতে পায়, ভালভাবে সুখে-শান্তিতে জীবন ধারণ করতে পারে। বণ্টনের এই সমতার নীতিই হলো সাম্যের মূল ভিত্তি।

এই দুটি সমস্যার সমাধান মানেই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়া এবং দেশের প্রতিটি মানুষের সুখসম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া। তার মানেই সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি, তার মানেই এক স্বাধীন সুখী জাতির উদ্ভব।

ইংলন্ড উৎপাদন সমস্যার সমাধান করেছে। জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধিতে দারুণ সফল হযেছে। কিন্তু তার বণ্টন ব্যবস্থা খুবই খারাপ। তার ফলে একদিকে বিরাট সম্পদ, আর একদিকে বিরাট দারিদ্র্য। দেশের যত সব সম্পদ মুষ্টিমেয় সামান্য কিছুসংখ্যক লোক ভোগ করে আর বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ ভোগ করে শুধু দুঃখ আর দারিদ্র্য। যে রাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয় সম্পদ ব্যক্তিগত অভাব এবং দারিদ্র্যের উপর নির্ভরশীল সে রাষ্ট্র সত্যিই বিপজ্জনক। এ নীতি যারা সমর্থন করে তারা নীতিহীন যুক্তিহীন এক জড়বাদেরই সমর্থক।

সাম্যবাদীরা ও কৃষিব্যবস্থার সংস্কারকরা বণ্টন সমস্যার সমাধান করে বলে প্রচার করে বেড়ায়। কিন্তু এটা তাদের ভুল ধারণা। তাদের উৎপাদন পদ্ধতির ত্রুটিই উৎপাদনকে ব্যাহত করে। সমবণ্টনের ব্যবস্থা কায়েম হলে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে শ্রমও উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হলে জাতীয় সম্পদ নষ্ট হয় আর জাতীয় সম্পদের উৎপাদন কমে গেলে তার সমবণ্টনের কোনও অর্থ হয় না। সাম্যবাদীরা যেন একধরনের কসাই যারা কোনও জিনিস সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিতে গিয়ে নিজেরাই গ্রাস করে ফেলে।

আসলে এ দুটি সমস্যাকে পৃথক করে দেখলে চলবে না। একই সমস্যার এ হলো দুটি দিক মাত্র। এ দুটি সমস্যার সমাধান একই সঙ্গে করতে হবে। সমাজতন্ত্রের কথা হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন এবং সমস্ত রকম শোষণের বিলোপসাধন। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্রের মানুষ শ্রেণী নির্বিশেষে দেশের সব সম্পত্তির মালিক। তারা সম্পদ উৎপাদন করবে এবং সে সম্পদ সমানভাবে ভাগ করে নেবে। এইভাবে পার্থিব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক উন্নতি সাধন করবে।

সমাজতন্ত্রবাদীরা এটাই চেয়েছিল এবং এই সমস্যাটাই সবচেয়ে বিব্রত করে তোলে লুই ফিলিপকে। দার্শনিকরা তখন এক আদর্শ গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন যে আদর্শ একই সঙ্গে প্রাচীন ভাবধারা এবং বৈপ্লবিক আদর্শের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে, যা সংসদ ব্যবস্থা এবং রাস্তার জনগণকে মিলিয়ে দেবে, সমস্ত দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটাবে।

লুই ফিলিপ দেখলেন তাঁর পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। দিগন্তে মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। জুলাই বিপ্লবের কুড়ি মাস যেতে না যেতেই চারদিক থেকে বিপদ ঘনীভূত হয়ে উঠল। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ফ্রান্সের দিকে। ফ্রান্স তখন অস্ট্রীয়া ও আনকোনার সঙ্গে পেরে উঠছিল না। মেটারনিক তখন ইতালিতে বলগোনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। জার নিকোলাসের উপর রুশ জনগণের ঘৃণা বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। স্পেন আর পর্তুগাল শত্রু হয়ে উঠেছিল ফ্রান্সের। তার উপর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল প্যারিসে।

৫

এপ্রিলের শেষের দিকে অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। ১৮৩০ সাল থেকে ছোটখাটো অনেক আন্দোলন এবং গোলমাল চলছিল এবং সে গোলমাল এবং আন্দোলন দমনও করা হচ্ছিল। তখন সমগ্র ফ্রান্স প্যারিসের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং প্যারিস তাকিয়ে ছিল ফবুর্গ সেন্ট আঁতোনের দিকে।

ফবুর্গ সেন্ট আঁতোনে তখন গরম আগুনের মতো হয়ে উঠেছে। রু দ্য শারোনের অবস্থা তখন ছিল একই সঙ্গে শান্ত এবং বিক্ষুব্ধ। বিভিন্ন হোটেলে তখন শ্রমিকরা শুধু বিপ্লবের কথা আলোচনা করত। প্রায় সব কলকারখানার শ্রমিকরা তখন আন্দোলনে নেমে পড়েছিল। একদিন একটা হোটেলে একজন শ্রমিক বলল, 'আমরা তিনশোজন শ্রমিক আছি। রোজ যদি দশ স্যু করে দিই তাহলে মোট দেড়শো ফ্রাঁ হবে এবং তাই নিয়ে গুলি আর বারুদ কেনা হবে।' আর একজন শ্রমিক বলে, 'আমাদের আর এখন ছ'মাস সময় চাই না! এমনি আমরা সংখ্যায় পঁচিশ হাজার হয়ে উঠেছি এবং আমরা সরকারের শক্তির সমান হয়েছি।' আর একজন শ্রমিক বলে, 'আমাদের অস্ত্র নেই।' তখন আর একজন উত্তর করে, 'কেন, সেনাবাহিনীর হাতে অস্ত্র আছে।'

এইভাবে তখন দারুণ উত্তেজনা চলছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। যেখনে-সেখানে শ্রমিকদের গোপন ও প্রকাশ্য সভা বসত। সেই সব সভায় তারা বিপ্লবের জন্য

শপথ করত। আবার এই উত্তপ্ত উত্তেজনাময় আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে অনেকে অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করে বসত। এক একদিন একটি লোক একটি কাফেতে ঢুকে মদ খেয়ে তার দাম না দিয়েই বেরিয়ে যাবার সময় বলত, বিপ্লব এই মদের দাম দেবে। বিভিন্ন কাফেতে সাধারণ জনগণের ভোটের মাধ্যমে বিপ্লবের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হত।

এই সময় মেয়েরাও বসে ছিল না চুপ করে। একদিন একটি মেয়ে বলে, আমরা বেশ কিছুদিন ধরে দারুণ পরিশ্রম করে কার্তুজ বানাচ্ছি। একদিন মার্শে লেনয়ের অঞ্চলের এক মদের দোকানের বাইরে সীমানা নির্ধারণসূচক একটা পাথরের স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে কালো দাড়িওয়ালা একটা লোক গোপন জায়গা থেকে আসা একটা কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিল একদল লোককে। একদল লোক তার সামনে জড়ো হয়ে ভিড় করে সেই পড়া শুনছিল। লোকটা কাগজের কথাগুলো পড়ে যাচ্ছিল, আমাদের নীতি চেপে দেওয়া হয় জোর করে, আমাদের প্রচারপত্র ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সম্প্রতি তুলাশিল্প বন্ধ হয়ে পড়লে অনেক নরমপন্থী চরমপন্থী হয়ে ওঠে। আমাদের গোপন আস্তানাগুলোতে জনগণের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে। আজ আমাদের দুটো পথের একটাকে বেছে নিতে হবে—হয় ক্রিয়া না হয় প্রতিক্রিয়া, বিপ্লব না হয় প্রতিবিপ্লব। এখন নিরপেক্ষতা বা নিষ্ক্রিয়তার কোনও স্থান নেই। এখন হয় জনগণের জন্য লড়াই করতে হবে অথবা জনগণের বিরুদ্ধে যেতে হবে। যদি আমরা তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে না পারি তাহলে আমাদের ধ্বংস করে ফেল, কিন্তু আজ আমাদের সাহায্য করো সর্বপ্রকারে।

এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটত। আর একদিন একটি লোক এসে পথের ধারে একটি স্তম্ভের উপর উঠে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, 'বামপন্থী বিরোধীপক্ষের লোকরা বিশ্বাসঘাতক। তারা একাধারে গণতন্ত্রবাদী ও রাজতন্ত্রবাদী সেজে আমাদের বোকা বানাতে চায়। তারা মার খাবার ভয়ে গণতন্ত্রবাদী সাজে। আবার লড়াই করতে হবে না বলে রাজতন্ত্রবাদী বলে নিজেদের প্রচার করে বেড়ায়। প্রজাতন্ত্রীরা হলো ভেড়ার চামড়া ঢাকা নেকড়ে। হে শ্রমিকবৃন্দ, তোমরা তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে ওঠ।' আর একজন তখন তার পিছন থেকে বলে ওঠে, 'থাম শ্রমিকদের চর কোথাকার।' সে কথায় চুপ করে যায় লোকটা। একদিন সন্ধেবেলায় একজন শ্রমিক মাঠের মাঝে একটা ক্যানেলের ধারে একজন ভাল পোশাকপরা লোককে দেখতে পায়। লোকটি তখন তাকে প্রশ্ন করে, 'কোথায় যাচ্ছ নাগরিক?' শ্রমিকটি তখন উত্তর করে, 'আমি আপনাকে চিনি না।' লোকটি তখন বলল, 'কিন্তু আমি তোমাকে চিনি।' শ্রমিকটি বলে, 'আমি হচ্ছি কমিটি এজেন্ট। তোমাকে বিশ্বাস করি না আমরা। আমাদের কোনও কথা যদি ফাঁস করে দাও, আমরা বাকি রেখে দেব না তোমায়। আমরা নজর রাখব তোমার উপর।'

একদিন একজন লোক বলে, আমাদের অভিযানের পরিকল্পনা সব প্রস্তুত।

আর একদিন একজন বলে, ভদ্রলোককে প্যারিসের রাস্তায় আর বেশিদিন বেড়াতে দেবে না। তার জন্য ওরা উঠে পড়ে লেগেছে এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কিন্তু ভদ্রলোকটি কে? এইটাই হচ্ছে রহস্যময় ব্যাপার।

পয়েন্ত সেন্ট ইউসত্রাশের কাছে এক কাফেতে বিপ্লবের নেতারা জড়ো হত। অগাস্তে নামে এক দর্জি শ্রমিক সংস্থার লোক ফবুর্গের শ্রমিকদের সঙ্গে নেতাদের যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। একজনকে বিচারের সময় আদালতে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমার নাম কি? কে তোমার নেতা?' সে তখন উত্তর করে, 'আমি আমার নেতাকে চিনি না।'

একদিন এক কাঠের মিস্ত্রী এক নতুন বাড়ির চারদিকে কাঠের বেড়া দেবার সময় একটা কাগজের চিরকুট পায়। তাতে লেখা ছিল, 'ফবুর্গ অঞ্চলে রু দ্য প্যাঁসনিয়েরের একটি বন্দুকের দোকানে পাঁচ-ছ' হাজার রাইফেল আছে, আমাদের অস্ত্রের বড় দরকার।' মিস্ত্রী লোকটি সঙ্গে সঙ্গে তার সহকর্মীদের সেটা দেখায়।

পুলিশ আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে অনেক বাড়ির গোপন জায়গা থেকে অনেকগুলি বন্দুক উদ্ধার করে। এদিকে বিপ্লবী শ্রমিকরাও অনেকগুলি বন্দুকের দোকান থেকে অনেক অস্ত্র চুরি করে আনে। ব্যারিয়ের সাবেস্তন কাফের বাইরে গলিপথে দাঁড়িয়ে প্রায় রোজ একজন শ্রমিক দিনের কাজ থেকে এসে আর একজন শ্রমিকের হাতে একটা করে পিস্তল তুলে দিত। এমনি করে ফবুর্গ অঞ্চলের বিপ্লবী শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে অস্ত্র সরবরাহ করা হতে থাকে। ন্যালে নামে একটি লোক বলে, তার কাছে ৭০০ কার্তুজ আছে।

একজন আসবাবপত্র বিক্রেতা অন্য একজন দোকানদারকে বলে, 'আমরা এবার কাথঁ আক্রমণ করব।' তখন অন্য দোকানদার বলে, 'তোমরা শীঘ্রই আক্রমণ শুরু করবে। গতমাসে তোমরা সংখ্যায় ছিলে পনের হাজার। এখন হয়েছ সংখ্যায় পঁচিশ হাজার।'

বিপ্লবের এই উত্তাপ এবং উত্তেজনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শুধু প্যারিস নয়, ফ্রান্সের কোনও অঞ্চল বাদ পড়েনি। বিপ্লবের এই প্রস্তুতির জন্য কতকগুলি সংস্থা গড়ে উঠেছিল—যেমন সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডস অফ দি পিপল আর দি রাইট অফ ম্যান। লীগ অফ দি রাইট অফ ম্যান আবার লীগ অফ অ্যাকশান নামে আর একটি দল গড়ে তোলে।

প্যারিসের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের এই উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। লেয়নস, নান্তে, লিলে, আর মার্শাই অঞ্চলে দি লীগ অফ দি রাইট অফ দি ম্যান-এর কাজকর্ম বেড়ে যায়। তবে প্যারিসের ফবুর্গ সেন্ট আঁতোনের থেকে ফবুর্গ সেন্ট মার্সোতে বিক্ষোভ বেড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুল-কলেজের ছাত্রাবাসগুলিতেও শ্রমিকদের অঞ্চলের মতোই বিপ্লবের উত্তপ্ত প্রস্তুতি চলতে থাকে।

সেনাবাহিনীর লোকেরাও এই গণবিপ্লবে যোগদান করতে থাকে। বেনকেতি, লুনেভিল ও এপিনালে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তাতে সেনাবাহিনীর অনেক লোকও ছিল। বিপ্লবীরা সেনাবাহিনীর সমর্থনের উপর অনেকখানি নির্ভর করত।

এই ছিল তখনকার বিপ্লবের অবস্থা। তবে এ বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বের কেন্দ্রস্থল

ছিল ফবুর্গ সেন্ট আঁতোনে। এই অঞ্চলের পরিশ্রমী, সাহসী ও মৌমাছির মতো স্পর্শকাতর শ্রমিকরা দলে দলে প্রস্তুত হয়ে উঠছিল বিপ্লবের জন্য। কিন্তু তারা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম বন্ধ করেনি। বিপদের সময়ে তাদের দারিদ্র্য আর বুদ্ধি দুটোই বেড়ে যায়।

ফবুর্গ সেন্ট আঁতোনেতে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার যে আতিশয্য আর উত্তাপের আধিক্য দেখা যায় তার কারণও ছিল যথেষ্ট। অর্থনৈতিক সংকট এই অঞ্চলেই চরমে ওঠে। অভাব, ধর্মঘট আর বেকারত্ব অশান্ত আর বিক্ষুব্ধ করে তোলে এ অঞ্চলের লোকদের। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, আত্মাভিমানী, পরিশ্রমী শ্রমিকরা দীর্ঘদিনের অবজ্ঞা ও অবহেলায় প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাদের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি সংহত ও সুসংবদ্ধ হয়ে ফেটে পড়তে থাকে। শুধু স্ফুলিঙ্গের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে থাকে তারা।

আমরা আগেই যে সব মদের দোকানগুলোর কথা উল্লেখ করেছি সেগুলো বৈপ্লবিক কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। এই সব দোকানগুলোতে যারা আসত তারা মদের থেকে উত্তেজনাময় কথায় মত্ত হয়ে উঠত বেশি।

বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবের যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে ওঠে তার মাঝে জনগণের সার্বভৌমত্ব উঁকি দিতে পারে। এই বিপ্লবী জনগণের আচরণ সব সময় ভাল না হতে পারে, তাদের কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। কিন্তু সেই সব ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও তাদের মহত্ত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। তারা কি চেয়েছিল ?

তারা চেয়েছিল সমস্ত অত্যাচার আর অবিচারের অবসান ঘটাতে। সব বেকার লোকের জন্য কাজ আর ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা চেয়েছিল। তাদের স্ত্রীদের জন্য চেয়েছিল নিরাপত্তা। চেয়েছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা এবং যথেষ্ট খাদ্য। তারা চেয়েছিল পৃথিবীকে স্বর্গ করে তুলতে। তারা চেয়েছিল প্রগতি, জাতীয় অগ্রগতি। তবে তাদের চাওয়ার ধরনটা ছিল ভয়ঙ্কর। তাদের মুখে ছিল উত্তপ্ত শপথ এবং হাতে ছিল অস্ত্র। তারা সভ্যতার জন্যই বর্বর হয়ে পড়েছিল।

৬

এঁজোলরাস এই সময় তার শিষ্যদের সংখ্যা আর মনের অবস্থাটা একবার যাচাই করে দেখতে চাইল। সেদিন কাফে মুসেঁতে আলোচনা চলছিল ওদের নিজেদের মধ্যে। সে উপমা অলঙ্কার সহযোগে তাদের বোঝাতে লাগল। সে বলল, এখন দেখ তো আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি। এমন সব সক্রিয় লোকদের আমাদের খুঁজে নিতে হবে যারা লড়াই করতে পারবে। এখন দেখতে হবে আমাদের দলে কত লোক আছে। এখন নষ্ট করার মতো সময় নেই। তাড়াতাড়ি সব কাজ সারতে হবে। আমরা কতখানি এগিয়েছি তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কুরফেরাক, তুমি পলিটেকনিক ছাত্রদের কাছে গিয়ে দেখ, আজ তাদের ছুটির দিন। আজ বুধবার। ফুলি, তুমি গ্রেসিয়ারের শ্রমিকদের কাছে যাও। কমবেফারে বলেছে সে পিকপাসে যাবে, সেখানে অনেক

ভাল লোক আছে। প্রুভেয়ার, তুমি রু দ্য গ্রেনেলে রাজমিস্ত্রীদের কাছে যাবে, তারা হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। জলি দুপুত্রেন হাসপাতালে গিয়ে মেডিকেল ছাত্রদের অবস্থাটা যাচাই করে দেখবে। বোসেত প্যানে দ্য জাস্টিনে গিয়ে আইনের ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করবে। আমি কুরবোর্গের ব্যাপারটা দেখব।

কুরফেরাক বলল, এরাই হলো আমাদের সব ?

না।

আর আমাদের দলের লোক কোথায় আছে ?

আছে।

কমবেফারে বলল, তারা কারা ?

এঁজোলরাস বলল, ব্যারিয়ের দু মেন।

কিছুক্ষণ নীরবে ভেবে নিয়ে সে আবার বলল, ব্যারিয়ের দু মেনে মর্মরপ্রস্তরের কাজ করে এমন কিছু শ্রমিক আছে। স্টুডিওতে কিছু শিল্পী ও শ্রমিকও আছে। সম্প্রতি তারা উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে। তারা শুধু ডোমিনো খেলে সময় কাটায়। তারা কাফে রিশেফুতে বেলা বারোটা থেকে একটার মধ্যে থাকে। আমাদের কেউ গিয়ে তাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলবে। নিভে আসা ঐ সব কাঠগুলোকে ফুঁ দিয়ে আবার জ্বালিয়ে দিতে হবে। সুতরাং সেখানে যাবার মতো একজন কাউকে চাই। সেখানে পাঠাবার মতো কোনও লোক পাচ্ছি না। ভাবুক মেরিযাস তো এখন এখানে আসেই না।

গ্রান্তেয়ার বলল, একজন আছে। সে হচ্ছে আমি।

তুমি ?

কেন নয় ?

তুমি প্রজাতন্ত্রের নীতিগুলো ব্যাখ্যা করে লোকদের জাগাবে।

কিন্তু কেন আমি ওখানে যাব না ?

তুমি গেলে কি ভাল হবে ?

গ্রান্তেয়ার বলল, চেষ্টা করে দেখতে চাই।

তুমি তো এসব কিছু বিশ্বাসই করো না।

তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে।

গ্রান্তেয়ার, তুমি কি সত্যিই আমার কিছু উপকার করতে চাও ?

তুমি যা বলবে আমি করব ; তোমার জুতোতে কালি পর্যন্ত দিয়ে দেব।

তাহলে আমাদের এ সব কাজ থেকে দূরে থাক।

এটা তোমার অকৃতজ্ঞতার পরিচয় এঁজোলরাস।

তুমি কি সত্যিই সত্যিই মনে করো ব্যারিয়ের দু মেনে যাবার উপযুক্ত লোক তুমি, তুমি এ কাজ করতে পারবে ?

আমি ভগিয়ার্দ, এসাস ও রুা দ্য মঁতপার্নেসী হয়ে কাফে রিশেফুতে যাব।

কাফে রিশেফুতে ওদের চিনতে পারবে ?

খুব ভাল একটা চিনি না, তবু কিছুটা বন্ধুভাব আছে।

কি বলবে তাদের ?

আমি তাদের রোবোসপীয়ার আর দাঁতনের নাম উল্লেখ করে বিপ্লবের কথা বলব।

তুমি তা পারবে ?

হ্যাঁ পারব। আমাকে কেউ বুঝতে পারে না। কোনও একটা কাজে গেলে আমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠি। আমি প্রুধোঁ ও লা সোস্যাল কনট্রাক্ট পড়েছি। আমি দ্বিতীয় বর্ষের সংবিধানও পড়েছি। যেখানে নাগরিকদের স্বাধীনতা শেষ হচ্ছে সেখানেই শুরু হচ্ছে নতুন নাগরিক। তুমি কি মনে করো আমি অজ্ঞ ? মানুষের অধিকার, জনগণের সার্বভৌমত্ব—আমি সব জানি। আমি কিছুটা হেবার্তিস্তও। দরকার হলে আমি ছ' ঘণ্টা একটানা বসে গভীরভাবে পড়াশুনো করতে পারি।

এঁজোলরাস বলল, গুরুত্ব দিয়ে কথা বল।

হ্যাঁ গুরুত্ব দিয়েই বলছি।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিযে এঁজোলরাস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলল। সে গম্ভীরভাবে বলল, ঠিক আছে গ্রান্তেয়ার। আমি তোমাকে পরীক্ষা করব। তুমি ব্যারিয়ের দু মেনে যাবে।

গ্রান্তেয়ার কাফে মুসেঁর কাছাকাছি একটা ভাল ঘরে থাকত। সে তার ঘরে চলে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রোবোসপীয়ার মার্কা একটা ওয়েস্টকোট পরে ফিরে এল। সে এঁজোলরাসের দিকে অপূর্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তাকাবার কোনও কারণ নেই।

এই বলে মাথায় টুপিটা চাপিয়ে ঘব থেকে বেরিয়ে গেল।

পনের মিনিটের মধ্যেই কাফে মুসেঁর পিছন দিকের ঘরটা খালি হয়ে গেল। এবিসি সংস্থার সব সদস্যরা তাদের আপন আপন কাজে বেরিয়ে গেল। সব শেষে গেল এঁজোলরাস।

প্লেস দ্য ইসির একটা পরিত্যক্ত ঘরে কুগোর্দের সদস্যরা বসত। পথে সব কিছু খুঁটিযে ভেবে দেখতে লাগল এঁজোলরাস। সমাজে যখন গে.ন্মাল দেখা দেয় এবং তার প্রতিকারের জন্য কিছু একটা কাজ শুরু করা হয় তখন সামান্য একটা জটিলতাকে এক বিরাট বাধা বলে মনে হয়। এখন বিস্ময়ের কাজ শুরু করা ঠিক হবে না। দিগন্তব্যাপী মেঘমালার ওপার থেকে এক নতুন উজ্জ্বল প্রভাত উঁকি মারছিল এঁজোলরাসের চোখের সামনে। সে ভাবতে লাগল, কে বলতে পারে, অচিরে এমন একদিন আসবে যখন বিপ্লবের বেগবান স্রোতোধারা সমগ্র ফ্রান্সকে পরিপ্লাবিত করে ফেলবে এবং জনগণ তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সে দেখল তার হাতে এমন একদল বন্ধু আছে যারা সারা ফ্রান্সে বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করে বেড়াচ্ছে। সেই সব বক্তৃতার মধ্যে আছে কমবেফারের গম্ভীর দার্শনিক বাগ্মিতা, ফুলির বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান, কুরফেরাকের অত্যুৎসাহিতা, বাহোরেলের হাস্যরস, জাঁ প্রুভেয়ারের বিষণ্ন গাম্ভীর্য, জলির পাণ্ডিত্য, বোসেতের শ্লেষাত্মক ভঙ্গি। তাদের এই সব গুণগুলি একযোগে প্রচারের সঙ্গে নিয়োজিত হচ্ছে। কাজ সব ঠিকই চলছে।

এবার হঠাৎ গ্রান্তেয়ারের কথা মনে পড়ে গেল তার। ব্যারিয়ের দু' মেন বা কাফে রিশেফু এখান থেকে বেশি দূরে নয়। কাফেতে এখন কারা কি করছে সেটা যদি এখন নিজে গিয়ে দেখে আসে তাহলে ক্ষতি কি?

এঁজোলরাস কাফে রিশেফুতে গিয়ে বাইরে থেকে দেখল ঘরের ভিতরে ডোমিনো খেলা চলছে। সমস্ত ঘরটা ধোঁয়ায় ভর্তি। গ্রান্তেয়ার একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। তাদের মাঝখানে একটা টেবিল ছিল।

এঁজোলরাস শুনতে পেল গ্রান্তেয়ার টেবিলের উপর একটা ঘুষি মেরে বলল, ছয় ডবল।

অন্য লোকটি বলল, চার।

গ্রান্তেয়ার ডোমিনো খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে একেবারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

গর্বোর বাড়ি থেকে জেভার্ত তার বন্দীদের নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর মেরিযাসও যখন তার ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিযে পড়ল তখন রাত্রি নটা। সে সোজা কুরফেরাকের কাছে চলে গেল। কুরফেরাক তখন আর লাতিন কোয়ার্টারে থাকত না। রাজনৈতিক কারণে সে তখন থাকত র‍্যু দ্য লা ভেরেরিতে। কারণ বিপ্লবীরা এই জায়গাটাকেই পছন্দ করত।

মেরিয়াস কুরফেরাকের কাছে গিয়ে বলল, আমি তোমার কাছে থাকার জন্য এসেছি।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুরফেরাক তার বিছানার তুলা থেকে দুটো তোষক বার করে মেঝের উপর বিছিয়ে দিয়ে বলল, তোমাকে স্বাগত জানাই।

পরদিন সকাল সাতটায় মেরিয়াস গর্বোর বাসায় গিয়ে সব ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তার সব জিনিসপত্র একটা ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এল। আসার সময় সে বর্তমান বাসার ঠিকানা দিয়ে এল না। পরে সেই দিনই জেভার্ত তাকে গতকালকার ঘটনা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এলে মাদাম বুগনল বলল, সে চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে।

মাদাম বুগনল ভাবল, অপরাধীদের সঙ্গে মেরিয়াসের কিছুটা যোগসাজস ছিল। সে নিজের মনে বলতে লাগল, কে ভাবতে পেরেছিল? ছেলেটাকে দেখে তো নবজাত শিশুর মতো নির্দোষ মনে হচ্ছিল।

এত তাড়াতাড়ি মেরিয়াসের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পিছনে দুটো কারণ ছিল। প্রথমত খুব কাছে তেকে গতরাতে যে সব ঘটনা ঘটতে দেখেছে তাতে সমস্ত বাড়িটা এক বিভীষিকার বস্তু হয়ে উঠেছে তার কাছে। সে বুঝতে পেরেছে দুর্বৃত্ত ধনীর থেকে দুর্বৃত্ত গরীব আরও ভয়ঙ্কর। দ্বিতীয়ত এই ঘটনা থেকে যে ফৌজদার মামলা শুরু হবে তার মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইছিল না সে। কারণ তাহলে তাকে থেনার্দিয়েরদের বিরুদ্ধে অবশ্যই সাক্ষ্য দিতে হবে।

গতরাতে মেরিয়াস পিস্তলের গুলি করে সময়মত তাকে সংকেত না দেওয়ায় জেভার্ত ভেবেছিল, যুবকটি হয়ত ভয়ে দরজায় খিল দিয়ে ঘরে ঢুকে আছে অথবা তখনো বাইরে থেকে ফেরেনি।

তবু পরের দিন একবার খোঁজ করল তার। কিন্তু পেল না।

দু'মাস কেটে গেল। মেরিযাস তখনো কুরফেবাকেব বাসাতেই ছিল। সে তাব কোর্টের এক বন্ধুব কাছ থেকে জানল, থেনার্দিযের জেলের এক নির্জন ঘরে বন্দী আছে। মেরিযাস তার পর থেকে প্রতি সোমবার জেলখানার কেরাণীর কাছে পাঁচ ফ্রাঁ কবে পাঠিযে দিত। মেরিযাসের কাছে বাডতি টাকা একেবারেই ছিল না। তাকে তাই কুবফেবাকেব কাছ থেকে প্রতি সপ্তায টাকাটা ধার করতে হত। কিন্তু এতে কুবফেবাক আব থেনার্দিযের দু'জনেই বিস্মিত হযে যায। কুরফেরাক ভাবে টাকাটা প্রতি সপ্তায যায কোথায আর থেনার্দিযেব ভাবে টাকাটা নিযমিত আসে কোথা থেকে।

মেবিযাস অত্যন্ত দুঃখিত হলো। যে রহস্যজাল তার মনটাকে শতপাকে জডিযে ধবেছে সে জাল থেকে মুক্ত হবাব কোনও পথ খুঁজে পেল না সে। যে মেযেটিকে সে [illegible] ভালবাসে সেই মেযেটি আর তাব পিতার যে ছাযাচ্ছন্ন মূর্তি দুটি ঘটনাক্রমে তাব খুব কাছে এসে পডেছিল, অকস্মাৎ এক প্রতিকূল বাতাসেব ফুৎকাব সেই মূর্তি দুটিবে ছাযাব মতো ছিন্নভিন্ন কবে দিল। যে আঘাত তাকে অভিভূত কবে দিযেছে সে আঘাতের জ্বালাময়ী উত্তাপ থেকে কোনও নিশ্চযতা বা সত্যের একটি স্ফুলিঙ্গও দেখা দিল না। সে মেযেটিব নামও জানতে পাবল না। শুধু জানল তার নাম আবসুলা নয। তাদেব ফেলে যাওযা রুমালে যে একটি নামের আদি অক্ষব দুটি লেখা ছিল তাব অর্থ হলো আর্বেন ফেবার। আর মেযেটির পিতা বলে যে লোকটিকে জানে সে ই বা কে? সে কি সত্যি সত্যিই পুলিশের ভযে গা ঢাকা দিযে বেডাচ্ছে? তার মনে পডে গেল এই লোকটিকেই একবা· ইনভ্যালিদেব কাছে শ্রমিকেব বেশে দেখে সে। তবে কি ছদ্মবেশ ধারণ করে বেডানোই তার কাজ? লোকটা সেই বিপদেব মধ্যে পডে সাহায্যেব জন্য চিৎকারই বা করল না কেন? লোকটাব আচরণ একই সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ এবং দু'মুখো অর্থাৎ ছলনাময। এই লোকটিকে কি সত্যি সত্যিই চেনে? ঐ ধরনের কযেকটি প্রশ্নগাঁথা একটি জটিল সুতো বিব্রত কবে তুলল তাকে। তবু লুক্সেমবুর্গের সেই বাগানে দেখা মেয়েটির সৌন্দর্যের মহিমা ম্লান হলো না কিছুমাত্র। এক গভীর হতাশার মধ্যে ডুবে গেল মেরিযাস। তার অন্তরে আগুন, চোখে অন্ধকাব। একমাত্র প্রেম ছাড়া আর সবই হারিয়ে গেছে তার জীবনে। সাধারণত অতৃপ্ত প্রেমের যে দাহ সঙ্গে ে স্বর্গীয় দ্যুতি নিয়ে আসে সে দ্যুতি দেখতে পেল না মেরিযাস। পরম অনিশ্চযতার এক দুর্ভেদ্য কুয়াশা ঘিরে রেখেছে তাকে। মেয়েটিকে দেখতে তার দারুণ ইচ্ছা করছে, কিন্তু তার কোনও আশা করতে পারল না।

বিপদের উপর বিপদ। এখন সে আবার দারুণ অভাবে পড়েছে। দারুণ দারিদ্র্যের

হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করতে লাগল সে। যত সব উদ্বেগ আর চিন্তাভাবনার চাপে পড়ে সব কাজ ছেড়ে দেয় সে। কাজ ছেড়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিন কাটানোর ফলে কাজের অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য দিবাস্বপ্নের কিছুটা উপকারও আছে; দিবাস্বপ্ন চিন্তার উত্তাপটাকে অনেক শীতল করে তোলে। এক ঝলক শীতল বাতাসের মতো দিবাস্বপ্নের স্নিগ্ধতা অতিচিন্তার সব উত্তাপ আর মনের সব জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। কিন্তু অতিরিক্ত দিবাস্বপ্ন আবার খুবই খারাপ, তা সব চিন্তাকে ডুবিয়ে দেয়। যারা দিবাস্বপ্নকে প্রশ্রয় দেয় বেশি মাত্রায় তারা ভাবে দিবাস্বপ্নের থেকে তারা ইচ্ছা করলেই চিন্তার মাঝে ফিরে আসতে পারবে। দুই-এর মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। কিন্তু এটা তাদের ভুল ধারণা। চিন্তা হলো বুদ্ধির ক্রিয়া; কিন্তু দিবাস্বপ্ন মানসিক আলস্য আর এক অর্থহীন নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মেরিয়াসের অবস্থাও তাই হয়েছিল। তার জীবনে প্রেম তাকে অলস অর্থহীন দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়ে সে এক বিক্ষুব্ধ শূন্যতার মাঝে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোনও জীবিকা বা রুজি-রোজগারের দিকে কোনও নজর দেয়নি। তার ফলে তার অভাব-অনটন বেড়ে যায়। বাস্তবজ্ঞান হারিয়ে ফেলায় খরচের দিকে অমিতব্যয়ী হয়ে ওঠে তার উপর। আত্মার মধ্যে শৈথিল্য দেখা দেওয়ায় জীবনের উপর সংযম হারিয়ে ফেলে। এই আত্মগত শৈথিল্যের মধ্যে কিছুটা উদারতা থাকলেও একজন দরিদ্র মানুষের কাছে সে উদারতার কোনও অর্থ থাকে না। তার নিঃস্বতা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভাব বেড়ে যায়।

জীবনের পথ যখন এইভাবে পিচ্ছিল আর ঢালু হয়ে যায় তখন অনেক দৃঢ়চেতা মানুষও দুর্বার বেগে পতনের শেষ ধাপে নেমে যায়। এ পথ মানুষকে অপরাধ অথবা আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যায়। এ পথে মেরিয়াসও নেমে যাচ্ছিল। তার আত্মার সেই অন্ধকার তলদেশে যাকে সে জীবনে দেখতে পাবে না কোনওদিন শুধু তারই মূর্তির উজ্জ্বল স্মৃতিটা আলোর মতো জ্বলজ্বল করছিল তার সামনে। তার মনের অন্ধকার দিগন্তে ধ্রুবতারার মতো সেটা জ্বলছিল। আর কিছু সে দেখতে পাচ্ছিল না। সে বেশ বুঝতে পারছিল তার পুরনো পোশাকগুলো অচল ও পরিধানের অযোগ্য হয়ে গেছে। নতুন পোশাকগুলোও পুরনো হয়ে গেছে। তার মনে হলো তার জীবনও ক্ষয় হয়ে আসছে, তার জীবনের দীপও নিবে আসছে। সে শুধু মনে মনে বলতে লাগল, মরার আগে একবার যদি তাকে দেখতে পেতাম!

এই দুঃসহ অবস্থার মাঝে তার মনে শুধু একটা সান্ত্বনা ছিল। সে তখনো মেয়েটিকে ভালবাসে এবং তার মনে হচ্ছিল মেয়েটি তাকে না চিনলেও তাকে ভালবাসে। সে যেমন তার কথা ভাবে তেমনি সেও হয়ত তার কথা ভাবে। তার চিন্তার এই দুর্বার তরঙ্গমালা তার মনের তটে গিয়ে আঘাত হানে। রাত্রির নির্জনতায় যখন স্বপ্ন সবচেয়ে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে তখন তার মনটা যেন স্বচ্ছ হয়ে ওঠে আরও। তখন সে তার মনের আবেগ ও অনুভূতিগুলো লিখতে থাকে। অতৃপ্ত প্রেমের যন্ত্রণায় তার আত্মা স্বচ্ছ সুন্দর হয়ে উঠে যেন এক বিরল মহত্ত্ব ও ভাব সমুন্নতি লাভ করে। আত্মার

সেই সুন্দর স্বচ্ছতায় সে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবতে থাকে। তার মনে হয় আত্মার অতলান্তিক গভীরে নামতে নামতে সে শেষ তলদেশে এসে পড়েছে। সে ভাবল সেখানে গিয়ে পৌঁছানোর আগে যদি একবার তাকে দেখতে পেতাম!

একদিন মেরিয়াস র‍্যু সেন্ট জ্যাক দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে র‍্যু দ্য লা সেন্ট ব্যারিয়েরের মধ্য দিয়ে গ্ল্যাসিয়ের পার হয়ে লে গবলিন নদীর ধারে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠটায় গিয়ে হাজির হলো। জায়গাটা ফাঁকা আর নির্জন। মাঠের মধ্যে ত্রয়োদশ লুই-এর আমলে নির্মিত বাগানসহ পাকা খামার বাড়িটা আজও দাঁড়িয়ে আছে। তার অদূরেই ছিল প্যানসিয়ল। মেরিয়াস সেই মাঠে বেড়াতে বেড়াতে একজন পথচারীকে দেখে সেই মাঠটার নাম জিজ্ঞাসা করল। পথচারী বলল, জায়গাটার নাম লার্কের মাঠ যেখানে একদিন উলবাক এক রাখালকন্যাকে হত্যা করে।

লার্কের নামটা শুনেই মেরিয়াসের তার প্রেমাস্পদের নামটা মনে পড়ল। তার মনে হলো তার প্রেমাস্পদ নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও থাকে। সে তাকে খুঁজে বার করবেই।

তার এ ধারণা যুক্তিহীন। কিন্তু অবুঝ আর দুর্বার সে ধারণাটা আচ্ছন্ন করে ফেলল তার মনটাকে। তার পর থেকে সেই লার্কের মাঠটায় প্রায়ই বেড়াতে যেত মেরিয়াস।

২

গর্বোর সেই বাড়িটাতে হানা দিয়ে জেভার্ত অপরাধীদের ধরে যে কৃতিত্ব লাভ করে তা সম্পূর্ণ হয়নি। সে পুরোপুরিভাবে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। প্রথমত এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা যে করে সেই নায়কের গায়ে এখনো হাত দিতে পারেনি সে। সে বুঝতে পারল খুনের শিকার যে ব্যক্তিটি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়, কর্তৃপক্ষের চোখে তার অপরাধের গুরুত্ব খুনী আসামীদের অপরাধের থেকে অনেক বেশি এবং তাকে ধরতেই হবে।

মঁতপার্নেসীও পালিয়ে গেছে। মঁতপার্নেসী প্রথমে পাহারা দিতে থাকা এপোনিনের কাছে গিয়ে গল্প করতে থাকে। বাবাকে সাহায্য করতে যাওয়ার থেকে তার মেয়ের সঙ্গে ভাব করাটাকেই বড় বলে মনে করে সে। পুলিশ গর্বোর বাড়িতে হানা দেবার সময় তারা সরে পড়ে। কিন্তু পরে জেভার্ত এপোনিনেকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দেয় তার বোনের কাছে। কিন্তু মঁতপার্নেসী এখনো ধরা পড়েনি।

তার উপর জেভার্ত যখন অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার পর তাদের লা ফোর্স জেলখানায় পাঠাচ্ছিল তখন অন্যতম প্রধান আসামী-ক্লাকেসাস পথে পালিয়ে যায়। পুলিশ পাহারার মাঝখান থেকে কি করে ঐন্দ্রজালিকভাবে পালিয়ে যায় সে তা বুঝতে পারেনি জেভার্ত। তবে কি পুলিশরা তাকে সাহায্য করেছে এ ব্যাপারে? লোকটা একজন পাকা অপরাধী হলেও তাকে পুলিশের গুপ্তচর এবং সাক্ষী হিসাবে ব্যবহার করা চলত। কিন্তু সে পালিয়ে গেছে এবং এতে বিস্ময়ের থেকে রাগ হলো জেভার্তের বেশি।

এরপর মেরিয়াস। এই ব্যাপারে তার গুরুত্ব কম থাকায় তার নামটা ভুলে গিয়েছিল

জেভার্ত। তার মনে হলো উকিল হিসাবে যুবকটা অপদার্থ, একটা কাপুরুষ। সে হয়ত ঘটনার ভয়াবহতায় তার স্বাভাবিক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তবে সে যদি সত্যি সত্যিই ওকালতি পাশ করে থাকে তাহলে তাকে খুঁজে বার করা খুব একটা কঠিন হবে না।

অবশেষে তদন্তকার্য শুরু হলো। কিছু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিচারপতি ম্যাজিস্ট্রেট ব্রুজোঁ নামে এক আসামীকে লা ফোর্স জেলখানার নির্জন কারাকক্ষ থেকে কুর শার্লেমেন জেলে পাঠিয়ে দেন। মাথায় লম্বা চুলওয়ালা এই ব্রুজোঁকেই ঘটনার দিন মেরিয়াস একটা বুড়ো লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে এবং তাদের কথাবার্তা শোনে ওৎ পেতে।

এই ব্রুজোঁর বাবার নাম লা ফোর্স জেলখানাব একটি দেওযালে লেখা ছিল। তার নাম ছিল ব্রুজোঁ। আমাদের বর্তমান আসামী ব্রুজোঁ ছিল ১৮১১ সালের ব্রুজোঁর পুত্র।

জেলখানার ভিতরেও বন্দী অপরাধীদের কর্মচঞ্চলতা স্তব্ধ হয না একেবারে। আইনের হাতে পড়েও তারা প্রতিহত হয না একেবারে। এক অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ হযেও আর এক অপরাধের পরিকল্পনা কবে তারা কারাবাসের মধ্যেই। শিল্পীরা যেমন তাদের স্টুডিওতে একটা ছবির কাজ শেষ করে অন্য একটা ছবিব কাজে হাত দেয।

১৮৩২ সালের ফেব্রুযারি মাসের শেষ দিকে দেখা গেল ব্রুজো তিনটে চিঠি বাইবে পাঠাবার জন্য জেল অধ্যক্ষের কাছে জমা দিযেছে। চিঠি তিনখানাতেই তার নাম না দিযে সে অন্য বন্দীদের নাম দিযেছে। এই চিঠি তিনটেতে ডাকটিকিটের জন্য খরচ হযেছে মোট পঞ্চাশ স্যু। খরচের বহরটা দেখে জেল অধ্যক্ষের নজর পড়ে ব্যাপারটার উপর।

তদন্ত করে দেখা গেল চিঠিগুলোর উপর তিনটে ঠিকানা লেখা আছে। একটা চিঠি যাবে প্যান্থিয়নে, যার জন্য টিকিট লেগেছে দশ স্যু, আব একটা চিঠি যাবে ভাল-দ্য-গ্রেস যার জন্য টিকিট লেগেছে পনের এবং আর একটা চিঠি যাবে ব্যারিয়েব দ্য গ্রেনেলে যার জন্য টিকিট লেগেছে পঁচিশ ফ্রাঁ। জেল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানাতেই পুলিশ দেখল চিঠি তিনটেয় যে তিনটে ঠিকানা লেখা হযেছে সেই ঠিকানায় বাইজারোতে, গ্লোরিও আর রারেকারোসে নামে তিনজন নামকরা দুর্বৃত্ত থাকে। পুলিশ আরও বুঝতে পারল এই তিনজন দুর্বৃত্ত পেত্রন মিনেত্তে দলের সঙ্গে জড়িত আছে যে দলের দু'জন নেতা বাবেত আর গুয়েলমার এখন জেলে আটক আছে। চিঠিগুলো নির্দিষ্ট ঠিকানাগুলোয় বিলি করা হলো না। যে তিনজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এই চিঠিগুলোর জন্য অপেক্ষা করছিল তাদের হাতে হাতে দেওয়া হয়। পুলিশ ভাবল চিঠিগুলোর মধ্যে নিশ্চয় নতুন কোনও অপরাধের ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা আছে। সেই মতো তাদের গ্রেপ্তার করা হলো। এবার পুলিশ ভাবল ব্রুজোঁর উদ্দেশ্য অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। একদিন কুর শার্লেমেনের জেলখানার ভিতর কয়েদীরা যেখানে থাকত সেখানে একটা ঢেলার সঙ্গে বাঁধা একটা কাগজ এসে পড়ে। কাগজটাতে লেখা ছিল, 'বাবেত, রুা প্লামেতে একটা কাজ আছে। লোহার গেটওয়ালা একটা

বাগান।' ব্রুজোই এই কাগজটা বাবেতকে পাঠায। পুলিশেব কড়া নজবে থাকলেও বাবেতেব হাতে ঠিক কাগজটা এসে পড়ে এবং সে ও সেটা খুলে দেখে।

এদিকে থেনার্দিযেবদেব মেযেদেব বিরুদ্ধে বিশেষ কোনও অভিযোগ বা সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকায তাদেব ছেড়ে দেওযা হয। এপোনিনে জেল থেকে বেবিযে এসেই ম্যাগননেব সঙ্গে দেখা কবে। ম্যাগনন তখন থাকত ক্য ক্লোশেপার্শতে। জেল গেট থেকে এপোনিনে বেবোতেই তাব হাতে ব্রুজোব একটা চিবকুট দেয। সেই মতো সে ক্য প্লামেতে লোহাব গেটওযালা বাগানবাড়িতে চলে যায।

৩

মেবিযাস তখন একমাত্র পাবেব মেবুফ ছাড়া আব কাবো কাছে যেত না। সে নিচে যেমন অন্ধকাবে সিঁড়ি বেযে ধাপে ধাপে পতনেব শেষ প্রান্তে নেমে যাচ্ছে, পাবেব মেবুফও তেমনি পতনেব সিঁড়ি বেযেই নেমে যাচ্ছিল।

এ সমযে মেবুফেব ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয। তাব আয অত্যন্ত কমে যায। সে শুধু একটি ডিম দিযে প্রাতবাশ কবত এবং ওই দিন সাবাদিন আব কিছু খাওযা হত না। যে মহিলাটি তাব ঘবেব কাজকর্ম কবত তাকে একটা ডিম দিত। তাব পনেব মাসেব বেতন দিতে পাবেনি। মেবিযাস সব কিছু বুঝে তাব বাসায যেত না। পথে মাঝে মাঝে দেখা হত, কথা বলা হত না। মেবুফেব মুখে আব সেই শিশুসুলভ হাসি নেই। সে সব সময চিন্তাশীল ও গম্ভীব হযে থাকে। মেবিযাসেব সঙ্গে দেখা হলেই সে মাথাটা একবাব নেড়ে চলে যেত। অথচ একদিন তাবা পবস্পবেব বন্ধু ছিল। দাবিদ্র্য মানুষে মানুষে সব সম্পর্ককে ধ্বংস কবে এইভাবে।

জার্দিন দে প্যান্তেতে একটু জমি পেযেছিল মসিযে মেবুফ। সেখানে সে কিছু নীলেব চাষ লাগিযেছিল। সাবাদিন সেখানেই কাজ কবত। সন্ধেব সময সে বাসায ফিবে তাব বাগানে কাজ কবত। গাছপালাব সামান্য কিছু ফল আব বই বিক্রি কবে যা পেত তাতেই কোনবকমে দিন চলত তাব। তাব আশা ছিল ভবিষ্যতে সে নীল চাষ কবে অনেক লাভবান হবে। সন্ধেব পব বাগানে বসে সে বই পড়ত।

সেদিন সন্ধ্যাব কিছু আগেই বাড়ি থেকে চলে এল মসিযে মেবুফ। তাব বযস তখন আশি। মেবে প্লুতার্কেব শবীবটা তখন ভাল যাচ্ছিল না। সে অসুস্থ অবস্থায বিছানায শুযে ছিল। মেবুফ এক পীস রুটি আব কিছু মাংস দিযে বাতেব খাওযা সাবল। তাবপব বাগানে গিযে একটা পাথবেব উপব বসে একটা বই এব পাতা ওল্টাতে লাগল। তাব হাতে তখন দুটো বই ছিল। একখানা বই দৈত্য দানবদেব নিযে লেখা আব একখানা বই প্রেতাত্মাদেব নিযে লেখা। দ্বিতীয বইটাব প্রতিই তাব আগ্রহ ছিল বেশি। তাব কাবণ সে শুনেছিল এই বাগানে একদিন ভূত প্রেত আসত।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। অন্ধকাব নেমে আসছিল ধীবে ধীবে। চাবদিন বৃষ্টি হযনি বলে গাছপালা সব শুকিযে গিযেছিল। শুকনো গাছপালাব অবস্থা দেখে কষ্ট হচ্ছিল মেবুফেব। কাবণ সে মনে কবে গাছপালাবও প্রাণ আছে। সে কুযো থেকে বালতি

করে জল তুলে গাছে দেবার জন্য উঠে গেল। কিন্তু সে দেখল সারাদিন নীল চাষের জমিতে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে এবং কুয়ো থেকে বালতি করে জল তোলার ক্ষমতা তার নেই। সে তাই তারাভরা আকাশের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হতবুদ্ধি হয়ে। বিশেষ করে একটি রডোডেনড্রেন ফুলগাছের জন্য তার বড় কষ্ট হচ্ছিল। কারণ এই ফুল দেখে দুঃখের মাঝে সান্ত্বনা পেত সে।

সন্ধ্যাকাল এমনই একটা সময় যা মানুষের সব দুঃখকষ্টের উপর যেন একই সঙ্গে বিষাদ আর অকারণ আনন্দের একটা প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। মেবুফ আবার বালতি তুলে নিয়ে জল তুলতে গেল। কিন্তু পারল না।

এমন সময় কোথা থেকে এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, পীয়ের মেবুফ, আমি তোমার বাগানে জল দিয়ে দেব?

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের ঝোপঝাড়েব ভিতর থেকে রোগা লম্বা একটি মেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

মঁসিয়ে মেবুফ ভীরু প্রকৃতির লোক ছিল বলে ভয়ে সে কথা বলতে পারল না। এদিকে সেই স্কার্টপরা মেয়েটি নীরবে বালতি দিযে জল তুলে বাগানের গাছগুলোর গোড়ায় দিতে লাগল। শুকনো গাছগুলোর পাতার উপর জল পড়ার শব্দটা বড় মিষ্টি শোনাচ্ছিল মেবুফের কানে।

একের পর এক করে অনেক বালতি জল তুলে গোটা বাগানের সব গাছগুলোকে জল দিল মেযেটি। জল দেওয়ার কাজ হয়ে গেলে তার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে মেবুফ বলল, তুমি মানুষ নও, দেবদূত।

মেয়েটি বলল, না, আমি শয়তান। অবশ্য আমার কাছে শয়তান আর দেবদূতের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

মঁসিয়ে মেবুফ বলল, আমি কি হতভাগ্য! তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই।

মেয়েটি বলল, কিন্তু আমায় দেবার মতো একটা জিনিস তোমার আছে।

কি সেটা?

তুমি আমাকে মঁসিয়ে মেরিয়াস কোথায় থাকে তার ঠিকানাটা বলতে পার?

মঁসিয়ে মেবুফ প্রথমে কথাটা বুঝতে না পেরে বিহ্বল হয়ে দাঁডিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মনে করে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ মঁসিয়ে মেরিয়াস—সে এখন আর সেখানে থাকে না। কিন্তু তার বাসার ঠিকানাটা আমি জানি না। তবে মাঝে মাঝে পথে দেখা হয়। তুমি যদি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও তাহলে লার্কের মাঠে যাবে। বিকালের দিকে সেখানে সে প্রায়ই বেড়াতে যায়।

মঁসিয়ে মেবুফ এবার খাড়া হয়ে ভাল করে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, মেয়েটি কোথায় চলে গেছে। সে তখন কিছুটা ভয় পেয়ে গেছে। আপন মনে বিড় বিড় করে সে বলল, যদি আমার বাগানের গাছগুলোতে জল দেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে ও প্রেতাত্মা।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল মঁসিয়ে মেবুফ যখন তার সমস্ত চিন্তা সমুদ্র পার হবার জন্য হঠাৎ মাছ হয়ে যাওয়া এক আশ্চর্য পাখির মতো ঘুমের নদী পার হওয়ার জন্য স্বপ্নের রূপ ধারণ করল তখন আবার সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ল তার। সে ভাবতে লাগল, মেয়েটি কি সত্যি সত্যিই প্রেতাত্মা না কোনও জীবন্ত নারী।

৪

মঁসিয়ে মেবুফের বাগানে সেই ঘটনাটি ঘটার কয়েকদিন পর একদিন সকাল বেলায় মেরিয়াস কুরফেরাকের কাছ থেকে থেনার্দিয়েরকে দেবার জন্য পাঁচ ফ্রাঁ ধার করার পর ঠিক করল সে কিছুক্ষণের জন্য বেড়িয়ে আসবে। তার আগে কাগজ-কলম নিয়ে কিছু অনুবাদের কাজ করার চেষ্টা করছিল। যে বিষয়টি সে এখন অনুবাদ করছিল সেটা হলো গালস ও স্যাভিগনে নামে দুই জার্মান আইনবিদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত এক বিখ্যাত বিতর্ক। কিন্তু তখন লেখায় মন বসছিল না মেরিয়াসের। তাই সে ভাবল লার্কের মাঠ দিয়ে বেড়িয়ে আসবে।

সেখান থেকে ফিরে এসে লেখায় যদি মন বসাতে না পারে তাহলে নিজের মনে সে বলবে কাল আর বেড়াতে যাব না, তাহলে লেখার ক্ষতি হবে। কিন্তু তার পরদিন আবার সে আগের মতোই বেড়াতে যাবে।

সেদিন সকালে লার্কের মাঠে রিভেয়ার দে পবলিন নদীর ধারে বসে ছিল।

তখন উজ্জ্বল সূর্যালোক গাছের পাতাগুলোর উপর পড়ার পর মেরিয়াসের গায়ের উপর পড়ছিল। সে তখন ভাবছিল সেই মেয়েটির কথা, তার প্রেমাস্পদের কথা। কিন্তু তার ভাবনাটা তিরস্কারের রূপ ধারণ করে তার মনের উপর ঘুরে ঘুরে আসছিল। যে অসাম্য আর আত্মিক অসাড়তা তাকে তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার জন্য নিজেকে তিরস্কার করছিল। তার মনের চারদিকে অন্ধকার এমন ঘন হয়ে উঠেছিল যে সে উজ্জ্বল সূর্যকে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল না।

সেই অসংলগ্ন চিন্তার মধ্যে যখন সে কাজের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছিল একেবারে তখন সেই বিষণ্ন আত্মচিন্তার মধ্যে বাইরের জগতের অনেক শব্দ কানে আসছিল তার। তার চারপাশে তখন ধোবানিরা কাপড় কাচছিল। আর তার মাথার উপর গান করতে করতে পতপত শব্দে পাখা নেড়ে পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল। তার মাথার উপর অবাধ মুক্তির সুললিত ধ্বনি, অকারণ আনন্দ আর আলস্যের ডানা ঝাপটানি আর তার চারদিকে দৈনন্দিন কাজ আর শ্রমশীলতার শব্দ, সে শব্দ তাকে বাস্তব অবস্থার প্রতি সচেতন করে তোলে।

সহসা এক পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে বাজল তার। কে বলল, ও, উনি এখানেই রয়েছেন।

মুখ তুলে তাকিয়ে সে দেখল যে মেয়েটি একদিন সকালে তার বাসায় গিয়েছিল সেই হতভাগ্য মেয়েটি—যে হলো থেনার্দিয়েরের বড় মেয়ে এপোনিনে। তাকে দেখে

তখন মনে হচ্ছিল তার দারিদ্র্য আর দেহসৌন্দর্য দুটোই বেড়েছিল। তার পাযে তখনো কোনও জুতো ছিল না। তার গায়ের জামা আরও মযলা এবং আরও ছেঁড়া। তার মাথাব চুলেব সঙ্গে খড়েব কুটো জড়িযে ছিল। তার মানে সে ওফেলিযাব মতো পাগল হযে যাযনি, তাব মানে তাকে কোনও আস্তাবলে শুযে বাত কাটাতে হযেছিল। কাবাবাসেব ফলে দবিদ্র মানুষদেব মুখে যেমন বিষাদককণ এক আতঙ্কেব ভাব ফুটে ওঠে এপোনিনের মুখেও ছিল সেই ভাব।

শুধু মেবিযাসকে দেখাব সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল তাব ম্লান মুখে। কিছুক্ষণ সে কোনও কথাই বলতে পারল না।

অবশেষে সে বলল, এতদিনে তোমাকে খুঁজে পেলাম। পীযেব মেবুফ তাহলে ঠিকই বলেছিল। তুমি জান না কত খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে। তুমি জান আমি একপক্ষকাল জেলে ছিলাম? আমাব বিরুদ্ধে কিছু না পেযে ওবা ছেড়ে দেয আমাকে। তাছাড়া পবিণত বযসেব থেকে দু'মাস কম আমাব বযস। দু' সপ্তাহ ধবে তোমাকে খুঁজছি। তুমি এখন আব গর্বোব বাড়িটাতে থাক না?

মেবিযাস বলল, না।

কেন তা বুঝতে পারছি। যা ঘটে গেছে তা মোটেই ভাল নয। তাই তুমি সবে গেছ, কিন্তু তুমি এমন পোশাক পবে আছ কেন? মাথাব টুপিটা কেমন পুবনো আর খাবাপ। তোমাদেব মতো যুবকদেব আবও ভাল পোশাক পবা উচিত। মেবুফ তো তোমাব নাম ব্যারন মেবিযাস আব যেন কি বলছিল। কিন্তু ব্যাবনবা তো বুড়ো হয। তাবা লুক্সেমবুর্গেব বাগানে বেড়াতে যায। একবাব এক ব্যাবনেব কাছে আমি চিঠি দিতে গিযেছিলাম। তাব বযস তো প্রায একশো হবে।"

মেবিযাস কোনও উত্তব দিল না।

এপোনিনে বলল, তোমার জামাতে একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে। আমি সেলাই কবে দেব।

হঠাৎ মুখেব ভাবটা আবার বদলে যেতে লাগল তার। বলল, আমাকে দেখে তুমি খুশি হযেছ বলে মনে হচ্ছে না।

তবু কোনও কথা বলল না মেরিযাস।

কিছুক্ষণ কি ভেবে নিযে এপোনিনে বলল, আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে খুশি করতে পারি।

মেরিযাস বলল, তার মানে কি বলতে চাইছ তুমি?

কিন্তু তার আগে কথা দাও তুমি শুনবে? তুমি যখন একটা কাজের ভাব দাও আমাকে তখন বলেছিলে আমি যা চাইব তাই দেবে।

হ্যাঁ বলেছিলাম।

কিছুটা ইতস্তত করার পর এপোনিনে বলল, সেই ঠিকানাটা আমি পেয়েছি।

মেরিয়াসের মনে হলো তার হৃৎপিণ্ডটা যেন থেমে গেছে।

যে ঠিকানাটা তুমি আমাকে খুঁজে বার করতে বলেছিলে। অর্থাৎ সেই মেয়েটির ঠিকানা।

এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

ঘাসের উপর যেখানে বসেছিল মেরিয়াস সেখান থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সে। বলল, আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে চল। তুমি যা চাইবে তাই দেব।

আবেগের বশে এপোনিনের দুটো হাত ধরে ফেলল মেরিয়াস। হাত দুটো ছাড়িয়ে এপোনিনে বলল, আমি বাড়ির নম্বর জানি না। তবে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারি। ডান দিকে শহরের শেষ প্রান্তে।

কথাটা এপোনিনে এমন দুঃখের সঙ্গে বলল যাতে যে কোনও মানুষ তা শুনলে তার অন্তরটা মোচড় দিয়ে উঠবে নিদারুণ ব্যথায়। মেরিয়াস কিন্তু সেটা লক্ষ্য করল না। এপোনিনে বলল, বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছ তুমি।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল মেরিয়াসের। সে এপোনিনের একটা হাত ধরে বলল, একটা বিষয়ে শপথ করে তোমায় কথা দিতে হবে।

শপথ করতে হবে?

হ্যাঁ শপথ করতে হবে।

তোমায় শপথ করে বলতে হবে এপোনিনে, এ ঠিকানা তুমি তোমার বাবাকে কখনো জানাবে না।

আমার নাম এপোনিনে, কে কথা জানাল তোমাকে এমন করে? যাই হোক, তোমার মুখে আমার নামটা শুনে বড় ভাল লাগল।

মেরিয়াস বলল, বল শপথ করবে?

এবার সে এপোনিনের দুটো হাত ধরল।

আমার বাবা? এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না তোমায়। আমার বাবা এখন জেলে। যাই হোক, আমার বাবার কথা ভাবব না।

কিন্তু তুমি এখনো শপথ করনি।

ঠিক আছে, আমার হাত ছেড়ে দাও। আমি শপথ করছি। শপথ করে বলছি আমার বাবাকে এ ঠিকানা জানাব না। হয়েছে?

অন্য কোনও কথা।

হ্যাঁ অন্য কোনও কথা।

ঠিক আছে। এবার আমাকে নিয়ে চল সেখানে।

এখনি?

হ্যাঁ, এখনি।

ঠিক আছে, এস আমার সঙ্গে। তোমাকে কত খুশি দেখাচ্ছে।

কিছুটা যাওয়ার পর এপোনিনে থামল। বলল, আমার পাশে খুব ঘন হয়ে যাবে না। আমি আগে আগে যাই, তুমি আমার পিছু পিছু এস। আমার মতো একজন মেয়ের সঙ্গে তোমার মতো এক যুবকের এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না।

তার কথাটার মধ্যে একটা করুণ সুর ছিল যা মেরিয়াসের মনটাকে স্পর্শ করল।

আবার কিছুটা যাওয়ার পর এপোনিনে থেমে বলল, তোমার মনে আছে, তুমি বলেছিলে এই ঠিকানার জন্য তুমি কিছু একটা দেবে?

মেরিয়াস তার পকেট থেকে পাঁচ ফ্রাঁ বার করে এপোনিনের হাতে সেটা দিল। এই টাকাটা সে কুরফেরাকের কাছ থেকে ধার করেছিল। থেনার্দিয়েরকে দেবার জন্য রেখেছিল।

এপোনিনে সেটা মাটিতে ফেলে দিয়ে গম্ভীরভাবে মেরিয়াসের দিকে তাকাল। সে বলল, আমি তোমার টাকা চাই না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

গত শতাব্দীর মধ্যভাগের কাছাকাছি হাইকোর্টের এক বিচারপতি ও পার্লামেন্টের সদস্য ফবুর্গ সেন্ট জার্মেন অঞ্চলের র‍্যু প্লামেতে একটা বাড়ি করেছিলেন। বাড়িটা দোতলা। নিচের তলায় ছিল দুটো বসার ঘর আর একটা রান্নাঘর। তার উপরে ছাদ। বাড়িটার সামনের দিকে ছিল লোহার গেটওয়ালা একটা বাগান, তার সামনে বড় রাস্তা। বাড়ির পিছনে ছিল একটা উঠোন আর তার একপাশে দুটো ঘর ছিল কটেজ ধরনের। প্রয়োজন মতো শিশুসহ কোনও ধাত্রীকে থাকার জন্য হয়ত তৈরি হয়েছিল ঘর দুটো। এই ঘর দুটোর পিছন দিকে একটা গোপন দরজা ছিল যার মধ্য দিয়ে একটা গলিপথে গিয়ে পড়া যেত।

যে বিচারপতি ম্যাজিস্ট্রেট এই বাড়িটা চেনেন তিনি ছাড়া এই গোপন দরজাটার কথা আর কেউ জানত না। বাড়ির পিছন দিকের অঞ্চলটার নাম র‍্যু দ্য বেবিলন। বর্তমানে কিন্তু এই বাড়িটা তার এমন এক মালিকের অধীনে আসে যিনি নিজে থাকেন না এ বাড়িতে এবং ১৮২৯ সালের অক্টোবর মাসে একজন ভদ্রলোক এই গোটা বাড়িটা ভাড়া নেয়। কিন্তু বাড়িতে লোক বলতে ছিল ভদ্রলোক নিজে, একটি তরুণী মেয়ে আর ঘর-সংসারের কাজকর্ম করার জন্য এক বৃদ্ধা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাড়ির এই নতুন ভাড়াটে সম্বন্ধে এ অঞ্চলে কোনও আলোচনা হয়নি, কারণ এ অঞ্চলে লোকবসতি মোটেই ঘন নয়।

একরকম অজানিতভাবে এই বাড়িটি মঁসিয়ে ফশেলেভেন্তের নামে যে ভদ্রলোক ভাড়া নেয় সে ভদ্রলোক হলো আসলে জাঁ ভলজাঁ। তার সঙ্গের তরুণীটি হলো কসেত্তে। তাদের কাজকর্ম করার জন্য যে বৃদ্ধা ছিল তার নাম ছিল তুসাঁ। সে একটা কারখানায় কাজ করত আগে। কিন্তু বার্ধক্যবশত কারখানার কাজ করতে পারত না বলে জাঁ ভলজাঁ তাকে আশ্রয় দিয়েছে তার বাড়িতে।

কিন্তু জাঁ ভলজাঁ পেতিত পিকপাসের কনভেন্ট ছাড়ল কেন?

তার উত্তর হলো এই যে, কিছুই ঘটেনি।

আমরা যতদূর জানি জাঁ ভলজাঁ কনভেন্টে খুব সুখেই ছিল। এত সুখে ছিল যে

তার বিবেক বিব্রতবোধ করত। কসেত্তেকে রোজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃসুলভ দায়িত্ববোধ বেড়ে যেত। সে তার আত্মিক উন্নতির কথা ভাবত। সে ভাবত পৃথিবীর কোনও লোক কসেত্তেকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তার কেবলি মনে হত কসেত্তে ভবিষ্যতে একজন সন্ন্যাসিনী হবে। কনভেন্টের পরিবেশ ধীরে ধীরে তাকে সন্ন্যাসিনী জীবনের দিকে নিয়ে যাবে এবং এই কনভেন্টই একদিন তাদের দু'জনেরই এক নিজস্ব জগতে পরিণত হয়ে উঠবে। কালক্রমে সে নিজে বুড়ো হয়ে উঠবে এবং কসেত্তে এক পূর্ণবয়স্কা নারীতে পরিণত হবে। তাদের মধ্যে আর কোনওদিন কোনও বিচ্ছেদ ঘটবে না। কিন্তু সে নিজেকে প্রায়ই প্রশ্ন করত এই সুখ এই মিলনের আনন্দ সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে কেন এক শিশুর আত্মত্যাগের বিনিময়ে লাভ করতে চলেছে। তার মনে হত সে যেন এই সুখ চুরি করছে এবং সংসার ও তার ভোগসুখের জগৎ ত্যাগ করার আগে সেই জগৎ সম্বন্ধে তার একটা জ্ঞান থাকা উচিত। তার কোনও মতামত না নিয়ে তাকে জীবনের সব ভোগ-সুখ থেকে চিরতরে বঞ্চিত করলে সে ভবিষ্যতে তাকে ঘৃণা করবে। এই চিন্তাই তাকে সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলল। ক্রমে কনভেন্ট জীবন অসহ্য হয়ে উঠল তার কাছে। সে কনভেন্ট ছেড়ে যাবার সংকল্প করল।

এই সংকল্পের কথাটা সে ভাল করে ভেবে দেখতে লাগল। অনেক ভেবে সে ঠিক করল সে এখান থেকে চলে যাবেই। এখন আর কোনও বিশেষ বাধা নেই। পাঁচ বছর ধরে কনভেন্টের এই চার দেওয়ালের মধ্যে সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করার ফলে সমস্ত আশঙ্কার কারণ এখন অপসৃত হয়ে গেছে। এখন তার বয়স আরও বেড়ে গেছে; তার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন কে তাকে চিনতে পারবে? তাছাড়া বিপদের যেটুকু ঝুঁকি আছে তা তার নিজস্ব। সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বলে সেই দণ্ড পরিহার করার জন্য কসেত্তের মতো নির্দোষ নিরীহ মেয়েকে সারাজীবন কনভেন্টের কারাগারে সন্ন্যাসিনী হিসাবে আটক করে রাখার কোনও অধিকার নেই তার। বিপদের ঝুঁকির থেকে কর্তব্য তার কাছে অনেক বড়। তাছাড়া সুবিবেচনা সহকারে সতর্কতা অবলম্বনের পথে তো তার কোনও বাধা নেই। কসেত্তের শিক্ষা এখন প্রায় সমাপ্ত। সে তাই কনভেন্ট ছেড়ে চলে যাবার একটা সুযোগ খুঁজতে লাগল এবং সে সুযোগ অল্প দিনের মধ্যে এসেও গেল। ফশেলেভেন্ত একদিন মারা গেল।

জাঁ ভলজাঁ একদিন কনভেন্টের প্রধানার সঙ্গে দেখা করল। প্রধানাকে বলল, তার ভাই মারা গেছে। তার ভাই তার জন্য কিছু সম্পত্তি রেখে গেছে যাতে কোনও কাজ না করেই তাদের চলে যাবে। তাই তারা কনভেন্ট ছেড়ে চলে যাবে। তবে যেহেতু কসেত্তে মাইনে না দিয়ে পাঁচ বছর পড়াশুনো করে সন্ন্যাসিনী হিসাবে শপথ নেয়নি সে জন্য কনভেন্টকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দান করে যাবে। এ বিষয়ে তাকে যেন অনুমতি দেওয়া হয়।

এইভাবে কনভেন্ট ছেড়ে কসেত্তেকে নিয়ে চলে যায় জাঁ ভলজাঁ। র‍্যু প্লামেতে একটা বাড়ি ভাড়া করে সে।

এ ছাড়া প্যাবিস শহবেব মধ্যে দু' জাযগায দুটো ঘব ভাড়া কবে বেখেছিল। হঠাৎ যদি দবকাব হয বা এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হয তাহলে সেখানে গিযে উঠতে পাববে।

নতুন বাসায আসাব পব থেকে বাড়ি থেকে খুব একটা বাব হত না ভলজাঁ। বাইবে বাব হলেই একটা গভীব আশঙ্কা বুক চেপে বসত তাব। পাছে সব সময একটানা বাড়িতে থাকলে কাবো মনে কোনও সন্দেহ জাগে এজন্য সে মাদাম তুসাকে বাড়িতে বেখে কসেত্তেকে নিযে মাঝে মাঝে প্যাবিসেব বাসায গিযে দিনকতক কাটিযে আসত। ব্যু প্লুমেতেব বাড়িতে এসে সে তাব নতুন নাম দেয আলতিমে ফশেলেভেন্ত। তবে বাড়িটা শহব থেকে দূবে এক নির্জন অঞ্চলে ছিল বলে তাতে ভয কম ছিল।

২

উপবতলাব বড শোবাব ঘবটাতে কসেত্তেব থাকাব ব্যবস্থা হলো। এই বাড়িব প্রথম মালিক সেই বিচাবপতিব আমল থেকে সৌখীন পর্দা ঝোলানো ছিল ঘবটায। তাব মধ্যে ছিল বড বড আর্মচেযাব। ভলজাঁ কসেত্তেব শোবাব জন্য একটা দামী খাট কিনে আনে। সোনাব জলে বাঁধানো বইগুলো বাখাব জন্য একটা আলমাবি কিনে আনে। এছাড়া কিনে আনে একটা লেখাপড়া কবাব টেবিল, আব আযনাসহ একটা দামী ড্রেসিং টেবিল। শীতকালে কসেত্তেব শোবাব ঘবটাকে উপব থেকে নিচ পর্যন্ত ভালভাবে গবম বাখাব ব্যবস্থা ছিল।

জাঁ ভলজাঁ বাড়িটাব উপবতলায বা নিচেব তলায থাকত না। সে থাকত উঠোনেব একপ্রান্তে সেই কটেজ ধবনেব ঘব দুটোব একটাতে। তাব ঘবে ছিল তোষকপাতা সাদাসিধে একটা বিছানা, একটা কাঠেব টেবিল, দুটো চেযাব, দেওযালে একটা কাঠেব তাক। আব কিছু বই। বড ঘবখানায আগুন জ্বালাবাব কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সে অবশ্য কসেত্তেব সঙ্গে যেত। এ বাড়িতে আসাব পব তুসা যখন কাজে নিযুক্ত হয তখন ভলজাঁ তাকে বলে দিযেছিল, কসেত্তেই হলো এ বাড়িব কর্ত্রী।

তুসা তখন আশ্চর্য হযে জিজ্ঞাসা কবেছিল, আপনি মঁসিযে ?

ভলজাঁ বলেছিল, আমি তাব বাবা।

কসেত্তেই সংসাব চালাত। কনভেন্টে থাকাব সময এ সম্বন্ধে তাব একটা জ্ঞান হয। তাব হাতেই সংসাবেব হিসাবপত্র সব থাকত। মোটামুটি সচ্ছলভাবেই খবচপত্র কবা হত। ভলজাঁ কসেত্তেকে নিযে বিকালেব দিকে বোজ লুক্সেমবুর্গেব বাগান দিযে বেড়াতে যেত। প্রতি ববিবাব সকালে সে সেন্ট জ্যাক দু হন্ট পাস চার্চে প্রার্থনাসভায যোগদান কবতে যেত। ভিখাবিদেব সে উদাবভাবে পযসা দিত। এজন্য ভিখাবিবা তাকে চিনত এবং এইজন্যই থেনার্দিযেব তাব মেযেকে তাব কাছে সাহায্য ভিক্ষা কবতে পাঠিযেছিল। থেনার্দিযেব তাকে সেন্ট জ্যাক চার্চেব পবোপকাবী ভদ্রলোক বলে সম্বোধন কবেছিল।

কোনও অতিথি আসত না জাঁ ভলজাঁব এই নতুন বাসায। তুসা বাজাব কবত।

ভলজাঁ নিজে বাইরের কল থেকে জল নিয়ে আসত। ভলজাঁ যে ঘরে থাকত তার পাশের ঘরের এক জায়গায় জ্বালানি কাঠ আর মদ রাখা হত। পোর্তে দ্য বেবিলনের দিকে খিড়কি দরজার পাশে বাইরে একটি চিঠির বাক্স ছিল। কিন্তু তাতে কোনও চিঠি আসত না। শুধু মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সের বিল আর নোটিশ আসত। জাঁ ভলজাঁ যখন পেতিত পিকপাসের কনভেন্টে থাকত তখন ১৮৩১ সালের লোকগণনায় তাকে আলতিমে ফশেলেভেন্ত নামে গার্দে ন্যাশনাল অর্থাৎ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সদস্য করা হয়। এজন্য বছরে তিন-চার বার সামরিক পোশাক পরে সে তার ডিউটি দিতে যেত। এটাই ছিল তার বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র যোগসূত্র। তার বয়স হয়েছিল তখন ষাট। অথচ তাকে দেখে পঞ্চাশের বেশি মনে হত না। নিয়মিত ট্যাক্স দিয়ে এবং গার্দে ন্যাশনালের সদস্য হয়ে এক সম্ভ্রান্ত নাগরিক হিসাবে গণ্য হতে চেয়েছিল ভলজাঁ।

কসেত্তেকে নিয়ে সে যখন বিকালে বেড়াতে যেত তখন সে একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের পোশাক পরত। কিন্তু সন্ধের পর সে একা কোথাও গেলে সে একজন সাধারণ শ্রমিকের পোশাক আর মুখঢাকা একটা টুপি পরত। হয়ত সতর্কতা হিসাবেই এ [illegible] পরত সে তার এই সব আচরণের দিকে কোনও নজর দিত না কসেত্তে। তুসাঁ সব ব্যাপারেই তাকে শ্রদ্ধা করত। তুসাঁ একদিন মাংস কিনতে গেলে এক কসাই তাকে বলেছিল, 'তোমার মালিক একজন অদ্ভুত খরিদ্দার।' তুসা তখন বলেছিল, উনি একজন সাধু পুরুষ।

দ্য বেবিলনের দিকের দরজাটায় তালাচাবি দেওয়া থাকত সব সময়। ভলজাঁ বাড়ির সামনের দিকের বাগানটা ব্যবহার করত না বা গাছপালার কোনও যত্ন করত না। এ বিষয়ে সে হয়ত ভুল করেছিল। সে হয়ত কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করার জন্যই বাগানটা ব্যবহার করত না।

৩

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অযত্নে পড়ে আছে বাগানটা। কোনও মালী না থাকায় বাগানটা প্রকৃতির খেয়াল-খুশিমতো বেড়ে উঠেছে। মাটিতে গজিয়ে ওঠা ঘাস আর আগাছাগুলো বড় হয়ে উঠেছে অত্যধিক। গাছের ডালপালাগুলো লম্বা হয়ে বেড়ে গেছে। দুটো পাথরের স্তম্ভের মাঝখানে লোহার গ্রিলওয়ালা একটা গেট ছিল। বাগানটার এককোণে একটা পাথরের বেঞ্চ আর দুটো মর্মরমূর্তি ছিল। বাগানের মধ্যে কোনও ফাঁকা জায়গা বা পথ ছিল না। সর্বত্র ঘাস আর আগাছায় ঢেকে গিয়েছিল। লতায় জড়ানো ছিল গাছের সব গুঁড়িগুলো। বাগানটাকে দেখে তখন আর বাগান বলে মনে হত না, মনে হত যেন একটা জঙ্গল। জনবহুল শহরের কোনও খিড়কী বস্তিতে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে বাস করে থাকা মানুষদের মতো অসংখ্য গাছ আর আগাছা ঘনসংবদ্ধ হয়ে বাস করত সেখানে। অথচ সেটা ছিল কোনও গীর্জার ভিতরটার ঘন অন্ধকার সমাধিভূমির মতোই নির্জন নীরব।

তবু প্রতিবার বসন্তকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে লোহার গেট আর পাথরের প্রাচীরঘেরা সেই অযত্নবর্ধিত বাগানটার মধ্যে চলত ফুল ফোটাবার আর নতুন পাতা গজাবার এক নীরব খেলা। প্রতিটি গাছপালার শিরায় শিরায় বয়ে যেত যেন এক নতুন রক্তের স্রোত। এক মহাজাগতিক ভালবাসায় স্পন্দিত কোনও জীবন্ত প্রাণীর মতোই তারা উদীয়মান সূর্যের তরুণ তাজা রশ্মিগুলোকে বরণ করে নিত প্রতিটি প্রভাতে। দুপুরবেলায় এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ে এসে ছায়াভরা বাগানের গাছগুলোর উপর বসত এবং তাতে এক অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হত। পাখির গান ছাড়া কত সব অদৃশ্য পোকামাকড়ের একটানা ডাক ছিন্নভিন্ন করে দিত বনভূমির নিস্তব্ধতাকে। সন্ধ্যা হলেই একরাশ কুয়াশা আচ্ছন্ন করে রাখত সমস্ত বাগানটাকে এক স্বর্গীয় বিষাদের মতো। অসংখ্য ফোটা ফুলের গন্ধের মাদকতায় আমোদিত হয়ে থাকত বাগানটা। সারাদিন ধরে গাছপালা আর পাখিদের অবিচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গতা মুখর করে তুলত সমস্ত বনভূমিটাকে। সারাদিন পাখিদের নিরন্তর ডানা ঝাপটানিতে পুলকের শিহরন জাগত গাছের পাতাগুলোর সবুজ গায়ে। রাত্রি হলেই সেই গাছপাতার মাঝেই ঘুমিয়ে পড়ত পাখিগুলো।

শীতকালে গাছগুলোর পাতা ঝরে যাওয়ায় শুকনো কঙ্কালসার গাছগুলোর মধ্য দিয়ে বাগানসংলগ্ন বাড়িটাকে রাস্তা থেকে দেখতে পাওয়া যেত। অন্য সময়ে ঘন লতাপাতায় ভরা গাছগুলো আড়াল করে রাখত বাড়িটাকে। শীতকালে ঝরা পাতাগুলোর উপর তুষারকণা জমে থাকত। তবে বছরের সব ঋতুতেই এক নিঃসঙ্গ বিষাদ প্রকৃতির এক অবাধ জনহীন স্বাধীনতা মূর্ত হয়ে থাকত যেন সমস্ত বাগানটায়।

অথচ এই নির্জন জায়গাটা খাস প্যারিস শহর থেকে খুব একটা দূরে নয়। এই নির্জন বাড়ি আর এই পরিত্যক্ত বাগানটার অদূরেই আছে রুা দ্য ভারেনে অঞ্চলের বড় বড় অট্টালিকা, ইনভালিদের বিরাট গম্বুজ, চেম্বার অফ ডেপুটিজ-এর কার্যালয়, রুা দ্য বুর্গনে ও রুা দ্য ডোমিনিকের রাজপথে কত রং-বেরঙের যানবাহনের যাতায়াত। তার মালিকের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর ধরে পরিত্যক্ত থাকার পর রুা প্লামেতের বাড়িটাতে আজ আবার ভাড়াটে এসেছে। কিন্তু বাগানটা তেমনিই পরিত্যক্ত ও অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। কত আগাছা ও কাঁটাগাছ মাটির ভিতর থেকে গজিয়ে উঠেছে, কত পোকা-মাকড় বাসা বেঁধেছে তার মাটি ও গাছপালায়।

গণিতের বিজ্ঞান মেঘেদের ক্ষেত্রেও খাটে। মেঘেদের গতিভঙ্গি গণিতজ্ঞ বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করবেন। নক্ষত্রের আলোয় গোলাপ লালিত হয়। কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই একথা অস্বীকার করবেন না যে ফুলের বর্ণ-গন্ধ নক্ষত্রমণ্ডলের কাছে মূল্যহীন। অণু-পরমাণুদের কথা কে আগে হতে বলতে পারে? ক্ষুদ্র ও বৃহত্তের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিমাপকে ঠিকমতো ধরতে পারে? বিশ্বসৃষ্টির ধ্বংসলীলা ও প্রতিটি বস্তুর গভীরের কার্যকারণের যে খেলা চলছে তার কথাই বা সঠিকভাবে কে বলতে পারে? সবকিছুই প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; প্রয়োজনের মাপকাঠিতে যা কিছু বড় তা ছোট হয়ে যায় এবং যা কিছু ছোট তা বড় হয়ে যায়। সজীব প্রাণিকুল ও নির্জীব জড়বস্তুর মধ্যে এক রহস্যময় সম্পর্ক আছে। সুদূর সৌরমণ্ডল থেকে শুরু

করে গরীবদের নোংরা বস্তি পর্যন্ত অন্তহীন অফুরন্ত পরিবেশের মধ্যে কোনও কিছুর প্রতি ঘৃণার কোনও অবকাশ নেই। প্রতিটি বস্তুরই কোনও না কোনও প্রয়োজন আছে। আলো কখনো পৃথিবীর কোনও সুবাস বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতন স্তরে তুলে ধরতে পারে না; একমাত্র অন্ধকারই তা পারে। আবার অন্ধকারই নক্ষত্রমণ্ডলের সুবাস ঘুমন্ত ফুলেদের উপর ছড়িয়ে দেয়। প্রতিটি উড়ন্ত পাখিই তার নখে অনন্তের কিছু ভগ্নাংশ নিয়ে আসে। সামান্য কোনও কীটপতঙ্গই হোক বা সক্রেটিসই হোক, প্রতিটি জীবের জন্মের এক তাৎপর্য আছে। যেখানে দূরক্ষণের কাজ শেষ হচ্ছে সেখানেই শুরু হচ্ছে অণুবীক্ষণের কাজ। কার দৃষ্টিশক্তি বেশি কে তা জানে? মনের জগৎ ও জড়বস্তুর মধ্যে সেই একই সম্পর্ক আছে, সে সম্পর্ক যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন। প্রকৃতি জগতের প্রতিটি পদার্থ আর মানুষের যত সব নীতি এক হয়ে মিশে আছে। তাদের মিলন পরস্পরের সম্পূরক হিসাবে কাজ করে। সব ঘটনাই এক নিয়ম আর নীতিকে লুকিয়ে রাখে তার মধ্যে। প্রতিনিয়ত যে এক মহাজাগতিক রূপান্তরের রহস্যময় তরঙ্গলীলা চলেছে তাতে কত জীবন যাওয়া-আসা করছে। তাতে প্রতিটি বস্তুরই মূল্য সূচিত হচ্ছে। এমন কি প্রতিটি ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নেরও একটা করে বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই মহাজাগতিক রূপান্তরের অবিরাম খেলায় কোথাও এক জীবনের বীজ উপ্ত হচ্ছে, আবার কোথাও বা একটি জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কোথাও আলো রূপান্তরিত হচ্ছে শক্তিতে, আবার কোথাও বা চিন্তার সব শক্তি পরিণত হচ্ছে জড়বস্তুতে। একমাত্র আত্মা ছাড়া সব বস্তুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। সব বস্তুই ধ্বংস হবার পরে শুধু তার আত্মা অবশিষ্ট থাকে। সব বস্তুই অবশেষে ঈশ্বরের এক একটি উদ্দেশ্য সাধন করে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। পৃথিবীর আবর্তন থেকে এক পতঙ্গের উড়ে চলা পর্যন্ত সব কিছুই এক অনন্ত বিশ্বসৃষ্টি প্রতিক্রিয়া এক গোপন অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪

বাগানটা আর সেই আগের মতো নেই। কিন্তু তা না থাকলেও এখনো সেখানে আছে গাছের শীতল ছায়া, বনভূমির শান্ত সবুজ নীরবতা। আছে গাছপালার মর্মরধ্বনি আর পাখির গান। দেখে মনে হয় পাখিডাকা সেই ছায়ামেদুর বনস্থলীর মাঝে যেন কোনও প্রতীক্ষমানা অন্তর প্রেমে আকুল হয়ে এক নিবিড় আস্থা, আশা, সরলতা আর এক শীতল কামনার সবুজ আস্তরণ বিছিয়ে কার পথ চেয়ে বসে আছে।

কসেত্তে যখন কনভেন্ট ছেড়ে চলে আসে তখন তার বয়স ছিল চৌদ্দর কিছু বেশি। সে তখন ছিল এক কিশোরী। তার চেহারাটা ঠিক কুৎসিত না হলেও খুব রোগা ছিল, প্রায় অস্থিচর্মসার। সে ছিল একাধারে লাজুক আর দুঃসাহসী।

তার শিক্ষা তখন সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার মানে ধর্ম ও ভক্তিতত্ত্বে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে সে। এ ছাড়া যে যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করে সে তা হলো ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, ফ্রান্সের রাজবংশ ও রাজনীতি, সঙ্গীত, চিত্রকলা আর গার্হস্থ্যবিজ্ঞান। কিন্তু বাস্তবজগতের অনেক কিছুই তার দেখা হয়নি তখনো। কোনও তরুণীর মনকে

খুব ধীরে শিক্ষা দিতে হয়। তাকে যেমন অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে নেই, তেমনি জ্ঞানের তীব্র আলোর হঠাৎ ঝলকানি দিয়ে চোখগুলো ধাঁধিয়ে দিতে নেই। তাদের কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি না করিয়ে বাস্তবের প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হয়। তাদের এমন শিক্ষা দিতে হয় যে শিক্ষা একই সঙ্গে তাদের যৌবনের ভয়াবহ দিকগুলিকে সরিয়ে দেয় তাদের কাছ থেকে এবং পতনের গত হতে রক্ষা করে।

এই শিক্ষা দেবার জন্য চাই মায়ের মন, যার মধ্যে থাকবে যৌবনসুলভ মনোভাবের সঙ্গে মাতৃসুলভ অভিজ্ঞতা। এর কোনও বিকল্প নেই। তাই একজন তরুণী যুবতীর মন গঠনে মায়ের স্থান কেউ নিতে পারে না।

কসেত্তের মা ছিল না, শুধু কনভেন্টের কয়েকজন সন্ন্যাসিনী মাদার ছিল। জাঁ ভলজাঁর অন্তরে তার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ ভালবাসা থাকলেও সে ছিল এক বয়োপ্রবীণ পুরুষ যার তরুণীর মন সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান ছিল না।

এই শিক্ষার ব্যাপারে কতখানি জ্ঞান, কতখানি কৌশলের দরকার হয়? কোনও তরুণীর মনে প্রেমাবেগ জাগিয়ে এবং সেই আবেগকে পরিপক্ক করে তুলতে কনভেন্টের মতো আর কোনও কিছুতে পারে না। এই কনভেন্ট তার মনকে অজানার চিন্তার দিকে নিয়ে যায়। তখন তার অন্তর বাইরে থাকার পথ না পেয়ে, বাইরে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে না পেরে সঙ্কুচিত হয়ে সে আত্মমুখী হয়ে ওঠে, নিজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়। তখন সে তার অবাধ কল্পনার বশবর্তী হয়ে অনেক প্রেমের কাহিনী গোপনে আপন মনে রচনা করে, অনেক দুঃসাহসী অভিযানের পরিকল্পনা করে।

কনভেন্ট ছেড়ে কসেত্তে যখন র‍্যু প্লামেতের বাড়িতে এসে উঠল তখন সে সবচেয়ে খুশি হলো। অথচ সে বুঝতে পারল না এই বাড়িটাই তার পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক। এখানেও কনভেন্টের মতো ছিল সেই একই নির্জনতা, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল স্বাধীনতা। এখানেও ছিল প্রাচীরঘেরা এক বাগান---গাছ, ফুল ও পাখির গানে ভরা। এখানেও ছিল কনভেন্টের মতো অন্তর্মুখী মনের মাঝে উদ্ধত দিবাস্বপ্নের ভিড। কিন্তু এখান থেকে কল্পিত প্রেমকাহিনীর জীবন্ত যুবকনায়কদের দেখা যেত। এখানেও ছিল একটা লোহার গেট, কিন্তু সে গেট দিয়ে রাস্তার সব কিছু দেখা যেত।

তবু কসেত্তে যখন এখানে প্রথম আসে, তখন তার তরুণী মন ছিল সত্যি সত্যিই অনভিজ্ঞ। জাঁ ভলজাঁ তাকে এই বাগানটা উপহার দিয়ে বলে, 'এটা তোমার, এটা নিয়ে তোমার যা খুশি করতে পার।' বাগানটা দেখে প্রচুর আনন্দ পায় কসেত্তে। সে প্রথমে বাগানের নিচের আগাছাগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। পাথরখণ্ডগুলোকে তুলে ফেলে দেয়। সে ভাবল বাচ্চা ছেলেরা খেলা করতে এলে অসুবিধা হবে, ঘাসের উপর যে সব পোকামাকড় বা কীটপতঙ্গ থাকে, পাথরগুলোতে তাদেরও অসুবিধা হবে।

সমস্ত অন্তর দিয়ে তার বাবা জাঁ ভলজাঁকে ভালবাসত সে। তার ভালবাসা, ভক্তি আরও মধুর আরও মনোরম করে তুলত ভলজাঁকে। মঁসিয়ে ম্যাদলেন যেমন বাড়িতে

প্রচুর পড়াশুনো করত তেমনি জাঁ ভলজাঁও অনেক বই পড়ত। তাই সে খুব ভাল কথা বলতে পারত। তার কথার মধ্যে জ্ঞানের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এক বিনম্র বাগ্মিতা ফেটে পড়ত। সে ছিল একই সঙ্গে কড়া এবং শান্ত, তার একটা সহজাত দয়া ও মমতাবোধ ছিল। সে তার দুটো ভাবই বজায় রেখে চলত। সে যখন লুক্সেমবুর্গ বাগানে কসেত্তেকে নিয়ে বেড়াতে যেত তখন তার প্রচুর পড়াশুনো আর অতীত দিনের দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা থেকে যে কোনও কথা তার মনে আসত সেকথা কসেত্তেকে বলত অকুণ্ঠভাবে। তার সব কথা শুনত কসেত্তে।

জাঁ ভলজাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত কসেত্তে। তাকে খুঁজত সব সময়। যতক্ষণ তার কাছে থাকত কসেত্তে ততক্ষণ সে খুব আনন্দ পেত। ভলজাঁ মূল বাড়িতে বা বাগানে বড একটা যেত না বলে কসেত্তে ভলজাঁর কটেজ ধরনের ঘরটাতে গিয়ে বসে থাকত। বাগান ও তার সাজানো সুন্দর ঘরখানার থেকে ভলজাঁর কাছে থাকতে বেশি ভালবাসত সে। ভলজাঁ তখন মাঝে মাঝে হাসিমুখে বলত, এবার তুমি যাও, আমাকে শান্তিতে একা থাকতে দাও।

ভক্ত মেয়ের মতো তার বাবাকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলত কসেত্তে, বাবা, এ ঘরে বড ঠাণ্ডা! মেঝেতে একটা কার্পেট আর একটা স্টোভ রাখ না কেন?

ভলজাঁ উত্তর দিত, কত লোক শীতে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের মাথা গোঁজার মতো একটা ঘরও নেই।

তাহলে আমার ঘরে আগুন জ্বলে কেন? স্বাচ্ছন্দ্যের সব উপকরণই আমার আছে।

তুমি মেয়েছেলে এবং তোমার বয়স কম।

বাজে কথা। তুমি কি বলতে চাও পুরুষরাই যত কষ্ট পাবে?

কিছু লোক।

বাবা, তুমি কি কালো রুটিটা খাও?

তার কিছু কারণ আছে বাছা।

তাহলে আমিও খাব তাই।

কসেত্তের জন্য তাই ভলজাঁ আর সেই কালো রুটি না খেয়ে সাদা পাঁউরুটি খেল।

শৈশবের কিছু স্মৃতি তখনো জেগে ছিল কসেত্তের মনে। কনভেন্টে থাকাকালে সে দিনরাত মাদারদের নির্দেশে প্রার্থনা করত। দুঃস্বপ্নে দেখা অবাঞ্ছিত মানুষদের মতো থেনার্দিয়েরদের কথা তার মনে পড়ত। তার মনে আছে এক সন্ধেবেলায় প্যারিস থেকে দূরে একটা বনে ঝর্ণায় জল আনতে গিয়েছিল। ভলজাঁ তাকে তার সেই আশঙ্কাগ্রস্ত জীবন থেকে উদ্ধার করে। রাত্রিতে সে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ত। যেহেতু ভলজাঁকে সে তার বাবা বলে ভাবতে পারত না, সে ভাবত ভলজাঁই তার মা, তার মায়ের আত্মাটা ভলজাঁর মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। মহত্ত্ব কি জিনিস সে বিষয়ে তখনো তার কোনও জ্ঞান হয়নি। মাঝে মাঝে সে তার হাতের উপর মাথা রেখে যখন ভাবত এবং চোখ থেকে এক বিন্দু জল গড়িয়ে ঝরে পড়ত তখন তার মনে হত, ভলজাঁ নামে এই লোকটিই হয়ত তার মা।

মাঝে মাঝে ভলজাঁর কাছ থেকে সে তার মার নাম জানতে চাইত। জিজ্ঞাসা করার সময় তার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোখে জল আসত। কিন্তু ভলজাঁ কোনও উত্তর দিত না। ফাঁতিনের নামটা গোপন করে রাখত ভলজাঁ।

কসেত্তে যখন শিশু ছিল তখন ভলজাঁ প্রায়ই তার মায়ের কথা বলত। কিন্তু এখন বড় হওয়ায় তার মার নাম উল্লেখ করত না কখনো। কেমন যেন একটা ধর্মীয় ভয় আচ্ছন্ন করে রাখত তাকে। তাছাড়া সে হয়ত ভাবত তাদের দু'জনের মাঝে মৃত ফাঁতিনেকে এনে দাঁড় করালে তার প্রতি কসেত্তের ভালবাসা খণ্ডিত হয়ে যাবে। কিন্তু ফাঁতিনের স্মৃতিটাকে সে যতই ছায়াচ্ছন্ন করে রাখার চেষ্টা করত ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত সে স্মৃতি। যে লজ্জার বোঝাটা জীবিত ফাঁতিনের জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে সে, মৃত ফাঁতিনের উপর সে লজ্জার বোঝাটা যেন আবার ভয়ঙ্করভাবে চেপে বসে তার উপর।

একদিন কসেত্তে ভলজাঁকে বলল, বাবা, গতকাল আমি আমার মাকে স্বপ্নে দেখেছি। তার দুটো ডানা ছিল।

এ কথায় খুশি হলো ভলজাঁ। ভলজাঁ যখন তাকে নিয়ে তার হাত ধরে বেড়াতে বেরোত তখন তার প্রতি কসেত্তের শ্রদ্ধা-ভালবাসার ছোটখাটো অনেক পরিচয় পেয়ে ভলজাঁর মনে হত এমন নির্দোষ নিষ্পাপ সরল হৃদয়ের এক মেয়ের ভালবাসা তার জীবনে এক পরম সম্পদ। জীবনে সে যত কষ্ট পেয়েছে আজকের এই সরল অনাবিল সুখের তুলনায় তা কিছুই নয়।

৫

একদিন কসেত্তে আয়নার দিকে তাকিয়ে আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, বাঃ! তার হঠাৎ মনে হলো সে যেন সুন্দরী এবং এই চিন্তাটা তাকে বিচলিত করে তুলল। এই মুহূর্তের আগে সে কখনো আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখেনি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধলেও সে দেখেনি নিজেকে। কনভেন্টে সবাই তার চেহারাটাকে বলত সাদাসিধে অর্থাৎ সে সুন্দরী নয় এবং এটাকেই সহজভাবে মেনে নিয়েছিল সে। একমাত্র জাঁ ভলজাঁ বলত, একথা সত্য নয়। তা সত্ত্বেও সে নিজেকে অসুন্দরী সাদাসিধে চেহারার বলেই ভাবত। কিন্তু আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখার পর তার মনে হলো ভলজাঁর কথাই সত্যি। একথা ভেবে সে এত বিচলিত হয়ে পড়ল যে সে রাতে একেবারে ঘুমোতে পারল না। পরদিন আয়নায় আবার সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। এবার দেখে কিন্তু নিজেকে মোটেই সুন্দরী বলে মনে হলো না। আসলে গতরাতে তার ঘুম না হওয়ায় তার মুখখানা ম্লান দেখাচ্ছিল এবং তার চোখের কোণে কোণে কালি পড়েছিল। তা দেখে দুঃখিত হলো সে। সে ভাবল সে যদি সুন্দরী হত। কনভেন্টের কোনও কোনও সুন্দরী মেয়ের মতো তার চোখমুখ আর পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

এরপর থেকে সে আয়নার সামনে কোনওদিন দাঁড়াত না। আয়নার নিজের চেহারাটা

কোনওদিন দেখত না। এমন কি চুল বাঁধার সময় আয়নার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধত।

এরপর থেকে সন্ধের সময় সূচীশিল্পের কাজ করত অথবা ভলজাঁর ঘরে গিয়ে বসে থাকত বা কোনও না কোনও কাজ করত। ভলজাঁ তখন আপন মনে বই পড়ত। একদিন সে হঠাৎ দেখল ভলর্জা বই পড়তে পড়তে তার পানে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এর অর্থ বুঝতে পারল না। আর একদিন বাইরে বেড়াতে যাবার সময় শুনতে পেল তাদের পিছনে কোনও একজন পুরুষ বলছে, মেয়েটি সুন্দরী, কিন্তু বাজে পোশাক পরে আছে। কিন্তু এর মানে সে বুঝতে পারল না। কারণ সে ভাবল সে দেখতে খারাপ, কিন্তু ভাল পোশাক পরে আছে। সুতরাং ও নিশ্চয় আমার কথা বলেনি।

আর একদিন তাদের বাড়ির সংলগ্ন বাগানে যখন বেড়াচ্ছিল তখন হঠাৎ তুসাঁ তার বাবাকে এক সময় বলল, মঁসিয়ে লক্ষ্য করেছেন, ম্যাদমযজেলের চেহারাটা কেমন সুন্দর হয়ে উঠছে? এর উত্তরে তার বাবা কি বলেছিল তা সে শুনতে পায়নি। কিন্তু তুসাঁর কথাটা বিচলিত করত তাকে। সে তার শোবার ঘরে ছুটে গিয়ে তিনমাস পর [illegible] আয়নায় খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। সে যা দেখল তাতে আনন্দিত হয়ে উঠল সে।

দেখল সে সত্যিই সুন্দরী। আর সে তুসাঁর কথা বা আয়নাব সাক্ষ্যকে সন্দেহ করতে পারে না। তার সারা দেহ কানায় কানায় ভরে উঠেছে যৌবনের লাবণ্যে, তার গায়ের চামড়া আগের থেকে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে, তার চোখ দুটো হয়ে উঠেছে আরও নীল আর চুলগুলো আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সে আবার সিঁড়ি বেয়ে বাগানে ছুটে গেল। রানীর মতো সৌন্দর্যগর্বে গরবিনী হয়ে উঠল সে। তার মনে হলো তুসাঁ ঠিকই বলেছে, রাস্তার সেই অচেনা পুরুষকণ্ঠও তারই উদ্দেশ্যে সেকথা বলেছে। বাগানের সব কিছুই সহসা সুন্দর হয়ে উঠল তার কাছে। অননুভূতপূর্ব এক আনন্দের আবেগে উল্লাসে সে দেখতে লাগল, গাছের শাখাপ্রশাখার ফাঁক দিয়ে সোনালী সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত বাগানময়, গাছের শাখে শাখে সুগন্ধী ফুল ফুটে আছে কত, পাখিরা গান করছে।

এক অব্যক্ত নিবিড় অস্বস্তিতে ভুগতে লাগল জাঁ ভলজাঁ। কিছুদন ধরে সে আনন্দের সঙ্গে কসেত্তের দেহ-সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করে আসছিল। এই সৌন্দর্যের আলোর মধ্যে অনেকে এক নতুন প্রভাতের উজ্জ্বলতা দেখলেও এই আলোর মধ্যে এক কুলক্ষণের অশুভ আভাস দেখতে পেল ভলর্জা। বেশ কিছুদিন ধরেই সুন্দরী দেখাচ্ছে কসেত্তেকে। কিন্তু সে সৌন্দর্যের প্রতি সে সচেতন ছিল না মোটেই। আজ এই সৌন্দর্যের আলোই তার স্বার্থপর চোখে ভয়ের বস্তু হয়ে উঠল। এর মধ্যে সে এমন এক পরিবর্তনের আভাস পেল যে পরিবর্তন অশুভ হয়ে উঠতে পারে তাদের জীবনে, অনেক কষ্ট ভোগ করেছে। যদিও লোহার হাতকড়া হাতে পরে ও পায়ে লোহার বেড়ী নিয়ে কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছে, আইনের অনুশাসন আজও তাকে অনুসরণ

করে বেড়াচ্ছে এবং তাকে পেলেই আবার কারাগারে নিয়ে যাবে তবু তার কোনও রাগ বা কারো বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। সে মানবজাতি, সমাজ বা ঈশ্বরের কাছ থেকে একমাত্র কসেত্তের ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চায় না।

সে শুধু একটা জিনিসই চায়। ঈশ্বর যেন তাকে কসেত্তের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত না করেন। এই ভালবাসাই তার জীবনের সব আঘাত সব ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারে। ঈশ্বর যদি আজ তাকে স্বর্গ দিতে চান তাহলে সে বলবে, আমার তাতে লোকসান হবে। নারীদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তার কোনও জ্ঞান ছিল না। নারীদের দিকে সে কখনো ভাল করে তাকাতও না। তবে সে সহজাত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে একটা কথা বুঝতে পেরেছিল, নারীদের সৌন্দর্য বড় ভয়ঙ্কর। আজ সে তার চেহারার অসৌন্দর্য ও বয়সের ব্যবধান অতিক্রম করে লক্ষ্য করতে লাগল কসেত্তের চেহারাটা কিভাবে যৌবনে সমৃদ্ধ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। সে আপন মনে বলে উঠল, কত সৌন্দর্য! কিন্তু আমার কি হবে?

এইখানেই মার সঙ্গে ভলজাঁর পিতৃত্বের তফাৎ। মেয়ের দেহে যৌবনের যে লাবণ্য দেখে মা কত আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে তা দেখে এক অপরিসীম উদ্বেগ ও অন্তর্বেদনায় আকুল ও আত্মহারা হয়ে উঠল।

পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণগুলি একে একে ফুটে উঠতে লাগল কসেত্তের মধ্যে।

যেদিন তার দেহসৌন্দর্যকে প্রথম আবিষ্কার করে কসেত্তে এবং তার প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে সন্দেহাতীতভাবে সেদিন থেকে সে চেহারার দিকে বেশি নজর দিতে থাকে। লোকের মুখে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনে তার মনে যে দুটি বীজাণুর সৃষ্টি হয় সে দুটি বীজাণু হলো, এক ছলনাময় অভিনয় আর প্রেম।

তার দেহ-সৌন্দর্যের প্রতি নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠার পর থেকে নারীসুলভ প্রকৃতিটা পুষ্পিত হয়ে উঠতে লাগল তার মধ্যে। তার আগের পোশাক ছেড়ে নতুন এক সাজ-পোশাক কিনল। তার বাবা তাকে কোনওদিন কোনও কিছু দিতে চায়নি। কসেত্তে এবার অনেক পছন্দ করে তার টুপি, গাউন, ক্লোক, দস্তানা, চটি কিনল এবং প্রতিটি পোশাকের রং পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে কিনল। মাসখানেকের মধ্যেই কসেত্তে হয়ে উঠল প্যারিসের অন্যতমা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, সুসজ্জিতা ও সৌখীন যুবতী যার পোশাকের পারিপাট্য এবং দেহসৌন্দর্যের আবেদন মোহপ্রসারী, গভীর এবং বিপজ্জনক। তার এবার ইচ্ছা করল সে রাস্তার লোকটার কাছে গিয়ে তার পোশাক দেখিয়ে তাকে বলে, দেখ দেখি এবার একবার আমাকে কেমন দেখাচ্ছে।

কসেত্তের এই পরিবর্তন দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল ভলজাঁ। তার কেবলি মনে হতে লাগল, কসেত্তে যদি এবার পাখা মেলে উড়তে শুরু করে তাহলে তাকে বুকে হেঁটে চলতে হবে অথবা বড় জোর পায়ে হেঁটে চলবে।

তবে এই পোশাকপরা অবস্থার কোনও মহিলা যদি তাকে দেখত তাহলে এক নজরেই বুঝতে পারত তার মা নেই। পোশাকপরার ব্যাপারে সে এমন দু-একটা ভুল করে বসত যা তার মা থাকলে ঠিক ধরিয়ে দিত।

যেদিন তার নতুন পোশাক পরে প্রথম বাইরে বার হলো কসেত্তে সেদিন পথে তার বাবার হাত ধরে যেতে যেতে একসময় জিজ্ঞাসা করল, এ পোশাকটা পরলে আমাকে তোমার চোখে ভাল দেখায় তো?

ভলজাঁ বলল, চমৎকার।

সেদিন বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে ভলজাঁ কসেত্তেকে বলল, তুমি কি তোমার আগের পোশাকটা আর কখনো পরবে না?

কসেত্তে তার আলমারি খুলে কনভেন্টের পোশাকটা বার করে বলল, এটা পুরনো হয়ে গেছে বাবা। এটা আর আমি কখনই পরব না। এটা পরলে আমাকে কাকতাড়ানো ডামির মতো মনে হবে।

ভলজাঁ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

যে কসেত্তে আগে বাড়িতেই বেশি থাকতে চাইত সেই কসেত্তে আজকাল প্রায়ই বাইরে বেড়াতে যেতে চাইত। কোনও সুন্দরী সুসজ্জিতা নারী তার পোশাক ও সৌন্দর্য আর পাঁচজনকে দেখাতে চাইবেই। ভলজাঁ আরও লক্ষ্য করল কসেত্তে আজকাল আর তার কটেজে যেতে চায় না। সে যখন একা একা তার কটেজে কুকুরের মতো বসে থাকত কসেত্তে তখন একা একা বাগানে পায়চারি করে বেড়াত।

তার এই রূপলাবণ্যের প্রতি যতই সচেতন হয়ে উঠতে লাগল কসেত্তে, তার সৌন্দর্যের প্রতি তার সেই আগেকার উদাসীন ভাবটা ততই হারিয়ে ফেলতে লাগল সে। যে নির্দোষ সরলতা যে কোনও সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়, যে অকৃত্রিম উজ্জ্বলতা সে সৌন্দর্যকে এক স্বর্গীয় সুষমা দান করে, কসেত্তে তা হারিয়ে ফেলতে লাগল ক্রমে ক্রমে। তবু তার নব যৌবনের এক বিপুল আনন্দ তার সব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও মনোহারিণী করে তুলল তাকে।

এই সময় একদিন তাকে লুক্সেমবুর্গের বাগানে দেখে ফেলল মেরিয়াস।

৬

মেরিয়াসের মতো কসেত্তেও একা একা নির্জনে বসে ভাবত। নির্মম নিয়তি রহস্যজনকভাবে ধীরে ধীরে এই দুটি জীবনকে পরস্পরের কাছে আনছিল, যেমন বজ্রমেঘ আর বিদ্যুৎ এক অন্তর্নিহিত প্রেমাবেগের তাড়নায় এক ঝলকে মিলিত হয় পরস্পরের সঙ্গে।

প্রথম দর্শনে প্রেম সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। সে সব কাহিনীকে আমরা তেমন গুরুত্ব না দিলেও দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্য দিয়েই সব প্রেম সঞ্চার হয়। দুটি দৃষ্টির মাধ্যমে প্রেমের যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঞ্চারিত হয় পরস্পরের অন্তরে তার থেকেই সৃষ্ট তড়িতাবেগে দুটি অন্তর অভিভূত হয়।

কসেত্তের যে দৃষ্টির আঘাতে মেরিয়াস আভভূত হয় সে দৃষ্টির শক্তি সম্বন্ধে কসেত্তে সচেতন।

মেরিয়াসকে সে আগেই দেখেছে। কিন্তু সব মেয়েদের মতো না দেখার ভান

করেছে। তাকে দেখতে সুদর্শন মনে হয়েছে। কিন্তু তাকে দেখে মেরিয়াসের তেমন সুন্দরী মনে হয়নি। মেরিয়াস তাকে ভাল করে দেখেনি বলে মেরিয়াসের প্রতি কোনও বিশেষ আগ্রহ জাগেনি তার মনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে লক্ষ্য করেছে তার চোখ, চুল সুন্দর, তার দাঁতগুলো সাদা ঝকঝকে। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময় লক্ষ্য করেছে তার কণ্ঠস্বর মনোরম। তার পোশাকটা অবশ্য তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু সেটা যদি কেউ সহজ বলে মেনে নেয় তাহলে সে দেখবে তার গতিভঙ্গির মধ্যে একটা সুষমা আছে। তার সমস্ত চেহারাটার মধ্যে একটা শান্ত সরলতা আর আত্মমর্যাদাবোধ আছে। কসেত্তে লক্ষ্য করেছে তাকে দেখতে গরীব মনে হলেও সে সৎ।

যেদিন প্রথম তাদের দৃষ্টি বিনিময় হয় কসেত্তে তার দৃষ্টির অর্থ কিছু বুঝতে পারেনি। তখন ভলজাঁ যে রু দ্য লোয়েস্তের বাড়িতে দু' সপ্তা ধরে বাস করছিল সেই বাড়িতে সে চিন্তান্বিতভাবে ফিরে যায়। পরদিন সকালে সে ঘুম থেকে উঠে আবার যখন সেই অদ্ভুত যুবকটির কথা মনে করল তখন সে বুঝতে পারল অনেকদিন ধরে মেরিয়াস তার প্রতি ঔদাসিন্য দেখালেও সেদিন তাকে দেখেছে। যদিও তার এই আকস্মিক পরিবর্তনটাকে সে ভালভাবে নিতে পারেনি। সে বরং তার অন্তরের মধ্যে এক প্রতিরোধের প্রাচীর তুলে এক শিশুসুলভ আনন্দের সঙ্গে তার উপর প্রতিশোধ নিতে চাইল। সে জানে সে সুন্দরী এবং তার দেহ-সৌন্দর্যই তার কাছে এখন পরম অস্ত্র। নারীরা তাদের সৌন্দর্য নিয়ে খেলা করে, শিশুরা যেমন ছুরি নিয়ে খেলা করতে করতে অনেক সময় হাত কেটে ফেলে।

মেরিয়াসের দ্বিধা ও বিহ্বলতার কথা আমাদের মনে আছে। সে তার বেঞ্চ থেকে উঠে তাদের কাছে যায়নি এবং তার এই নিষ্ক্রিয়তাই উত্তেজিত করে তোলে কসেত্তেকে। সে তখন তার কাছে যাবার জন্য তার বাবাকে বলে, বাবা, চল একবার ওদিকে ঘুরে আসি। একঘেঁয়েমিটা কাটানো যাবে। মেরিয়াস তার কাছে না আসায় সে নিজেই তার কাছে যায়। এই অবস্থায় নারীরা মহম্মদের পর্বতগমনের মতো পুরুষের কাছে এগিয়ে যায়। ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হলেও এই রকমই হয়। প্রেমের টানে নরনারী যখন কাছে আসে তখন একে অন্যের গুণ প্রাপ্ত হয়। পুরুষদের মধ্যে দেখা দেয় নারীসুলভ লজ্জা আর নারীদের মধ্যে দেখা দেয় পুরুষালি সাহসিকতা।

সেদিন কসেত্তের দৃষ্টির শরাঘাতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে মেরিয়াস, কিন্তু মেরিয়াসের দৃষ্টিশর কসেত্তের সমস্ত অন্তরটাকে কাঁপিয়ে তোলে। মেরিয়াস সেদিন বিজয়গর্বে বাসায় ফিরে যায়, কিন্তু কসেত্তের মনটা অশান্ত হয়ে ওঠে। তবে সেদিন থেকেই দু'জনে পরস্পরকে ভালবাসতে থাকে।

প্রথম প্রেমের আবিষ্কার বিহ্বল বিমূঢ় করে তোলে কসেত্তেকে, এক গভীর বিষাদের কালো ছায়া নিয়ে আসে তার অন্তরে। তার মনে হয় তার সমগ্র আত্মা কালো হয়ে গেছে। সে আত্মাকে যেন আর চিনতে পারবে না সে। সব কুমারী মেয়ের আত্মা যেন বরফের মতো হিমশীতল। সে আত্মা একমাত্র সূর্যসন্নিভ প্রেমের উত্তাপে গলে যায়।

কসেত্তে জানত না প্রেম কি বস্তু। প্রেমের পার্থিব অর্থ বা তাৎপর্য সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান ছিল না তার। কনভেন্টে যে গান প্রার্থনার স্তোত্র হিসাবে গাওয়া হত তাতে প্রেম কথাটা পাল্টে তার জায়গায় অন্য শব্দ বসিয়ে দেওয়া হত। ফলে এখন সে কি অনুভব করছে তা সে প্রকাশ করতে পারছে না। এ যেন কোনও রোগের নাম না জেনে সেই রোগে ভোগা।

ভালবাসার ব্যাপার না জেনেই গভীর ভালবাসার মধ্যে ডুবে যায় সে। কিন্তু সে জানত না এই ভালবাসার ফল ভাল না খারাপ, এটা নিষিদ্ধ না সমাজসম্মত বা নীতিসম্মত। সে শুধু ভালবেসে যাচ্ছিল। কেউ যদি তাকে বলত, তুমি ভাল করে ঘুমোও না, ভাল করে খাও না। তোমার অন্তর অনুক্ষণ স্পন্দিত হচ্ছে। কালো পোশাকপরা কোনও লোক দেখলেই তোমার মুখখানা মলিন হয়ে যায়। এগুলো কিন্তু খুব খারাপ, সে তাহলে উত্তর দিত, যে কাজ আমি না করে পারি না. যে কাজের ব্যাপারে আমি অসহায় সে কাজে যদি কোনও দোষ থাকে তো আমি কি করতে পারি ?

কসেত্তে নিজের মতো করে ভালবেসেছিল। তার ভালবাসা ছিল ঈশ্বরপ্রেমের মতো। তার প্রেম ছিল যেন জীবনের উপাসনা। তার ভালবাসা মানে এক অজানা অচেনা ব্যক্তিকে দেবতার আসনে বসিয়ে দূর থেকে তার ধ্যান করা, নির্জনে নীরবে শুধু তার কথা ভাবা। কল্পিত প্রেমের বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে রক্তমাংসের মানুষের মতো সাজানো. কিন্তু সে বস্তু দূরস্থিত, যার কোনও দাবি নেই. যে কিছুই চায় না তার কাছ থেকে। তার মনের মধ্যে প্রেম সম্বন্ধে তখনো এক ঘন কুযাশাজাল জমে থাকায় সে প্রেমের বস্তু যদি তখন তার খুব কাছে এসে দাঁডাত তাহলে সে ভয় পেয়ে যেত। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তখনো এক অলস ভীতি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে। যে কনভেন্টে সে দীর্ঘ পাঁচ বছর ছিল. যার রীতিনীতিতে সে ডুবে ছিল বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই কনভেন্টের আত্মাটা তার মন থেকে যতই উবে যাচ্ছিল ততই বাইরের জগৎটা কাঁপছিল তার চারদিকে। সেই কম্পমান দোলায়িত জগতের মাঝে একটা অবলম্বন চাইছিল সে, যে অবলম্বন সুন্দর. মনোহর. অথচ যাকে পাওয়া সম্ভব নয়। মেরিযাস ছিল সেই অবলম্বন। তাই সে মেরিয়াসের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসেছিল।

মেরিয়াসকে সেদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখে এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেছিল। তার মনে হযেছিল তার মনের কথাটাকে সে তার নীরব দৃষ্টি আর ঈষৎ হাসির স্বল্প আলোর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে। সে তাই আনন্দের আবেগে ভলজাঁকে বলেছিল, লুক্সেমবুর্গ বাগানটা কি সুন্দর!

এইভাবে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন আপন অন্ধকার জগতের মধ্যে বাস করছিল। তারা তখনো কথা বলেনি পরস্পরের সঙ্গে। তারা শুধু দেখেছিল পরস্পরকে। আকাশের অনন্ত শূন্যতার দ্বারা পরিবৃত দুটি নক্ষত্রের মতো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করছিল।

এইভাবে কসেত্তে পরিণত হয় পূর্ণ যুবতীতে। সে তার সৌন্দর্যের প্রতি সচেতন ছিল, কিন্তু তার প্রেম সম্বন্ধে তার কোনও সচেতনতা ছিল না।

৭

কে যেন অস্পষ্টভাবে জাঁ ভলজাঁকে ভিতর থেকে সতর্ক করে দেয়, মেরিয়াস ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। ভলজাঁ তাদের দৃষ্টি বিনিময়ের ব্যাপারটার কিছু না দেখলেও এক অগ্রপ্রসারী ছায়ার অশুভ বিস্তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল সে। এক অমোঘ ঐশ্বরিক বিধানের তাড়নায় আপনা থেকেই সতর্ক হয়ে ওঠে সে। তার পিতৃসুলভ প্রভুত্বটাকে সে যেন যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখে। ভলজাঁ শুধু মেরিযাসকে একবার চকিতে দেখেছে।

মেবিয়াসের আচরণটা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না তখন। সে তার মনের আসল ভাবটা লুকোতে যাওয়ার ফলে তাকে খারাপ দেখাচ্ছিল এবং তার সাহসিকতার মধ্যেও একটা দুর্বলতা ছিল। সে আগের মতো তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে না গিয়ে কিছু দূরে একটা বেঞ্চের উপর বসে বই নাড়ার ভান করছিল। কিন্তু কার জন্য সে ভান করছিল ? আগে আগে মেরিযাস ছেঁড়া পোশাক পরে আসত ; কিন্তু সেদিন এসেছিল সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে তার মাথার চুলে ক্রীম দিয়ে এসেছে। তার চোখ-মুখের ভাবটা ছিল অদ্ভুত। সে হাতে দস্তানা পরেছিল। মোটের উপর যুবকটির প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে জাঁ ভলজাঁর মনে।

এদিকে কসেত্তে কোনও কিছু প্রকাশ করেনি। কি ঘটছে সে চোখে তার কোনও জ্ঞান না থাকলেও একটা জিনিস সে বুঝেছিল, কিছু একটা ঘটেছে। তবে সেটা গোপন রাখতে হবে। কিন্তু পোশাক ও সাজসজ্জার প্রতি তার আকস্মিক আগ্রহ, মেরিয়াসের মতো কসেত্তের এক নির্দিষ্ট সময়ে বাগানে আসা এবং মেরিয়াসের পোশাকের উন্নতি—ঘটনার এই সব যোগাযোগ ভলজাঁর মনটাকে ভাবিয়ে তুলল। হয়ত এটা পূর্বকল্পিত নয়, কয়েকটি ঘটনার আকস্মিক মিল শুধু, তবু এ মিলের মধ্যে একটা কুলক্ষণের আভাস পেল ভলজাঁ। দীর্ঘ দিন ধরে সে এই অচেনা যুবকটির সম্বন্ধে কোনও কথাই বলেনি, আর সে সংযত করে রাখতে পারল না নিজেকে। একদিন যে জিভ যেমন কোনও যন্ত্রণাদায়ক দাঁতকে তুলে ফেলতে চায় তেমনি ভলজাঁ কথাটা বলে ফেলল, ঐ যুবকটিকে বড় বাজে মনে হচ্ছে।

এক বছর আগে কসেত্তের বয়স যখন আরও কম ছিল তখন হয়ত সে তার বাবার কথার উত্তরে বলতে পারত, কিন্তু আমার তাকে দেখে ভালই মনে হয়। আবার কয়েক বছর পরে মেরিয়াসের ভালবাসাটা তার অন্তর থেকে ছিন্নমূল হয়ে পড়লে সে হয়ত বলত, শুধু বাজে নয়, একবার চোখে চেয়ে দেখারও যোগ্য নয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনের যা অবস্থা ছিল তাতে সে শুধু বলল, তুমি কোন যুবকের কথা বলছ, যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ? কথাটা এমনভাবে বলল যেন সে এর আগে তাকে দেখেনি। তার মুখ থেকে একথা শুনে ভলজাঁ ভাবল সে তাহলে যুবকটিকে লক্ষ্যই করেনি, সে-ই তাকে খুঁচিয়ে দেখিয়ে দিল।

এইভাবে বার্ধক্যের সরলতা আর যৌবনের চাতুর্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে লাগল। এ দ্বন্দ্ব বাধার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ যৌবনের এক উন্মত্ত দ্বন্দ্ব। মনে হয় মেয়েরা কোনও ফাঁদে পড়ে না, যুবকরাই সব রকমের ফাঁদে পড়ে। মেরিয়াসের বিরুদ্ধে এক গোপন অভিযান শুরু করল, কিন্তু যৌবনসুলভ প্রেমাবেগের আবেশে তা বুঝতে পারল না। ভলজাঁ কত ফাঁদ পাতল তাকে ধরার জন্য। সে তাদের বাগানে যাওয়ার সময় পাল্টে দিল, বসার বেঞ্চ পরিবর্তন করল, বাগানে একা আসতে লাগল, তার রুমালটা ইচ্ছা করে একদিন ফেলে গেল।

এদিকে কসেত্তে তার আপন ঔদাসিন্য আর অটল প্রশান্তির এক দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করে তার মধ্যে বসে রইল। ভলজাঁ তখন ভাবল যার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে যুবকটি সে নিজেই জানে না সে প্রেমের কথা।

তবু ভয় পেয়ে গেল ভলজাঁ। কসেত্তে যে কোনও মুহূর্তেই সত্যি সত্যিই প্রেমে পড়ে যেতে পারে। ঔদাসিন্য দিয়েই এ সব কাজ শুরু হয়। তাছাড়া কসেত্তের একদিনের একটা কথা থেকেও ভলজাঁ ভয় পেয়ে যায়। একদিন বাগানে বেড়াতে গিয়ে এক ঘণ্টা বসার পর যাবার জন্য ভলজাঁ উঠে পড়তেই কসেত্তে বলে ফেলল, এত তাড়াতাড়ি ?

তবু লুক্সেমবুর্গ বাগানে যাওয়া বন্ধ করল না জাঁ ভলজাঁ। হঠাৎ কিছু একটা করে কসেত্তের মনে কোনও সন্দেহ জাগাতে চাইল না। কিন্তু যখনি দেখেছে সে মেরিয়াস কসেত্তের পানে তাকাচ্ছে তখনি ভয়ঙ্করভাবে সে মেরিয়াসের পানে তাকিয়েছে। এতদিন তার মনে কারো প্রতি কোনও ঈর্ষা ছিল না, কিন্তু আজ তার অন্তরের গভীরে এক প্রচণ্ড রোষের সঙ্গে এক বন্য বর্বর ঈর্ষা জাগল। কোন শয়তানের প্ররোচনায় ঐ নারকীয় যুবকটি জাঁ ভলজাঁর একমাত্র সুখের বস্তুকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য তার জীবনকে ভেঙে দিতে আসছে ?

ভলজাঁ ভাবল, ও প্রেম করতে আসছে। প্রেম ? আর আমি ? আমার মতো সব দিক থেকে সবচেয়ে হতভাগ্য এক লোক সবচেয়ে বঞ্চিত হতে চলেছি। ষাট বছর ধরে চরম দুঃখকষ্ট ভোগ করে, আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে, পাথরে, কাঁটায়, প্রাচীরে চোরের মতো কত রক্তপাত করে যখন আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পেয়ে একটু শান্তি আর আশ্রয় পেলাম তখন আমার কাছ থেকে সেই সুখের বস্তুকে কেড়ে নিতে আসছে একজন। কসেত্তেকে হারাতে হবে আমায়, আর কসেত্তেকে হারানো মানেই আমার সারাজীবন মাটি হয়ে যাওয়া। আমাকে সব কিছু হারাতে হবে, কারণ একটা লম্পট ছোকরা লুক্সেমবুর্গ বাগানে অলসভাবে ঘুরতে আসে।

এই সব ভাবতে গিয়ে তার চোখে এক কুটিল আলোর উজ্জ্বলতার ঢেউ খেলে যায়। একটা মানুষ যেন একটা মানুষের পানে তাকিয়ে নেই, যেন এক প্রহরী কুকুর একটা চোরের পানে তাকিয়ে আছে।

এর পরে কি হয়েছিল তা আমরা জানি। কসেত্তের পিছু পিছু সে রুা দ্য লোয়েস্তের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। সে বাড়ির দারোয়ানের কাছে ভলজাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে।

দারোয়ান আবার ভলজাঁকে বলে, একজন যুবক আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিল মঁসিয়ে। এরপর জাঁ ভলজাঁ এমন কড়া দৃষ্টিতে মেরিয়াসের পানে তাকায় যে সে দৃষ্টির অর্থ সে বুঝতে পেরেছিল। তারপর সে রু দ্য লোয়েস্তের বাড়ি ছেড়ে রু প্লামেতের বাড়িতে চলে আসে। প্রতিজ্ঞা করে এ বাড়ি আর লুক্সেমবুর্গ বাগানে আর জীবনে কখনো আসবে না সে। তারা রু প্লামেতে ফিরে গেল।

কোনও অভিযোগ করল না কসেত্তে। কোনও কথা বলল না সে, কোনও প্রশ্ন করল না, এর কারণ পর্যন্ত জানতে চাইল না। তার তখন একমাত্র ভয় ছিল যে সে ধরা পড়ে যাবে এবং সে নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছে। মেয়েদের এই সব অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে জাঁ ভলজাঁর কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। এইজন্যই সে কসেত্তের নীরবতার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। সে শুধু বুঝত কসেত্তের মনে শান্তি নেই এবং এতে আরও বিচলিত হয়ে পড়ত। এটা যেন একটি অনভিজ্ঞতার সঙ্গে আর একটি অনভিজ্ঞতার মিলন।

একদিন জাঁ ভলজাঁ তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি লুক্সেমবুর্গ বাগানে যাবে?

কসেত্তের গালদুটো রাঙা হয়ে উঠল। বলল, হ্যাঁ।

তারা লুক্সেমবুর্গ বাগানে গেল দু'জনে। কিন্তু মেরিয়াসকে দেখতে পেল না। তিন মাস ধরে সে বাগানে আসেনি। পরদিন ভলজাঁ আবার কসেত্তেকে জিজ্ঞাসা করল, আজ যাবে বাগানে?

কসেত্তে বলল, না।

কসেত্তের বিষাদ আর নম্রতা দেখে ভয় পেয়ে গেল ভলজাঁ। কসেত্তের অন্তরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার সে কিছুই বুঝতে পারল না। তার তরুণ অন্তঃকরণটা হঠাৎ এমন দুর্বোধ্য ও রহস্যময় হয়ে উঠল কেন? কি পরিবর্তন ঘটছে তার অন্তরে? এক একদিন সারা রাত ভলজাঁ বিছানায় বসে বসে ভাবত কসেত্তে কি চাইছে, কি সব চিন্তা করছে। এই সময় কনভেন্টের কথা মনে পড়ে গেল ভলজাঁর। সে ভাবত, যে কনভেন্টে অবহেলিত সব ফুলের গন্ধ, কারারুদ্ধ কুমারীদের সব উচ্চাভিলাষ স্বর্গাভিমুখে ধাবিত হয়, সে কনভেন্টে সে থেকে গেলে আজ কসেত্তের এ অবস্থা হত না। যে স্বর্গ থেকে সে স্বেচ্ছায় কসেত্তেকে নিয়ে চলে এসেছে নির্বুদ্ধিতাবশত সেখানে ফিরে যাবার আর কোনও পথ নেই। নিজের হাতে নিজেকে বলি দিয়েছে সে। সে শুধু বারবার এই অনুশোচনা করতে লাগল, আমি কি সর্বনাশ করেছি।

কিন্তু এ সব কথা সে কসেত্তেকে কিছুই বলেনি। কোনও রাগ বা নির্দয়তা দেখায়নি তার প্রতি। কসেত্তের মুখে অবশ্য আগের মতোই হাসি লেগে থাকত।

এদিকে মেরিয়াসকে দেখতে না পেয়ে দুঃখবেদনা বেড়ে যাচ্ছিল তার। ভলজাঁ যখন লুক্সেমবুর্গ বাগানে যাওয়া বন্ধ করে দিল তখন সে ভেবেছিল লুক্সেমবুর্গ বাগানে যাওয়ার প্রতি সে কোনও বিশেষ আগ্রহ না দেখালে তার বাবা আবার তাকে নিয়ে যাবে সেখানে। কিন্তু সপ্তার পর সপ্তা এবং মাসের পর মাস এইভাবে কেটে গেলেও যখন তার বাবা আর সেদিকে যাওয়ার নাম করল না তখন সে হতাশ হয়ে পড়ল।

অবশেষে সে একদিন সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভলজাঁ তাকে নিয়ে গেল লুক্সেমবুর্গ বাগানে। কিন্তু মেরিয়াসকে দেখা গেল না সেখানে। কসেত্তের মনে হলো তার জীবনে আসতে না আসতেই মেরিয়াস চিরদিনের মতো চলে গেছে সে জীবন থেকে। আর কোনও কিছু করার নেই। তাকে দেখতে পাবার আর কোনও আশা নেই। যে দুঃখের বোঝাভারে অন্তরটা ভারী হয়ে উঠেছিল তার বোঝাটা বেড়ে যেতে লাগল। দিনে দিনে চারদিকের বাস্তব অবস্থার কথা একেবারে ভুলে গেল সে। শীত, গ্রীষ্ম, রোদ, বৃষ্টি সব একাকার হয়ে গেল তার মনে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি কোনও আগ্রহই রইল না তার।

অবশেষে একদিন ভলজাঁ জিজ্ঞাসা করল কসেত্তেকে, তুমি কেমন আছ?

তার মুখখানা বিষাদে ম্লান ও বিবর্ণ হয়ে থাকা সত্ত্বেও সে বলল, ভালই আছি বাবা। কিন্তু তুমি কেমন আছ?

ভলজাঁ বলল, আমার শরীর তো ভালই আছে।

এইভাবে দুটি প্রাণ যারা একদিন একসঙ্গে কত সুখে বাস করে এসেছে, একে অন্যকে সুখী করে এসেছে, আজ তারা একে অন্যের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াল। অথচ কেউ কাউকে এ কথাটা জানাল না বা কোনও অভিযোগ করল না।

৮

তবে দু'জনের মধ্যে জাঁ ভলজাঁর দুঃখটাই বেশি। শত দুঃখের মাঝেও যৌবন এক সান্ত্বনা খুঁজে নিতে পারে। কিন্তু ভলজঁ তা পারেনি। এই কথা ভেবে সে প্রায়ই দুঃখে অভিভূত হয়ে যেতে লাগল যে কসেত্তে তার জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই কসেত্তের সেই পলাতক মনটাকে ঘুরিয়ে আনার জন্য মরীয়া হয়ে যেন লড়াই করে যেতে লাগল সে। একদিন রাজপথে প্যারিসের এক সেনাপতিকে উজ্জ্বল সামরিক পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে তার হঠাৎ মনে হলো সেও এক জমকালো পোশাক পরে একটা ঘোড়া কিনে তার উপর চড়ে তাক লাগিয়ে দেবে কসেত্তেকে। তুলিয়েরের প্রাসাদের পাশ দিয়ে সেখানকার বাগানে বেড়াতে যাবে সে। কসেত্তের মনটাকে এইভাবে সে ভুলিয়ে রেখে দিলে সে মন আর কোনও যুবকের দিকে ধাবিত হবে না। দুঃখের ক্রমাগত আঘাতে মনটা যেন শিশুর মতো অবুঝ হয়ে ওঠে তার।

পরে অবশ্য এক অপ্রত্যাশিত আঘাতে এই ধরনের শিশুসুলভ পরিকল্পনা বাতিল করে দেয় সে। রু্য প্লামেতের বাড়িতে আসার পর তারা রোজ ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখার জন্য বিশেষ এক জায়গায় যেত। যে সব যুবক-যুবতী জীবন শুরু করছে এবং যে সব বৃদ্ধ জীবনের শেষ প্রান্তসীমায় এসে পড়েছে তারা সবাই এই সূর্যোদয় দেখে প্রচুর আনন্দ পেত মনে। ভোরের স্নিগ্ধ আলো ঝরে পড়া পাখিডাকা নির্জন পথ দিয়ে হেঁটে যেতে খুব ভাল লাগত তাদের। কবে কোন পথ দিয়ে যাবে সে কথা দু'জনে আলোচনা করে আগের দিন ঠিক করে রাখত তারা। ভোর হতে না হতেই দু'জনেই উঠে পড়ত।

যে সব পরিত্যক্ত জায়গা দিয়ে বড় একটা লোকজন যায় না সেই দিকে যাবার প্রতি একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল ভলজাঁর মনে। প্যারিসে ব্যারিয়ের অঞ্চলে যে সব পতিত জমিগুলো কাঁটাগাছে ভরা ছিল সেই সব জমিওয়ালা ফাঁকা মাঠটা প্রিয় ছিল ভলজাঁর। জায়গাটা কসেত্তেও পছন্দ করত। জায়গাটা নির্জন বলে ভাল লাগত ভলজাঁর আর এখানে এলে অবাধ মুক্তি পাবে বলে ভাল লাগত কসেত্তের। কসেত্তে সে জায়গায় বেড়াতে গিয়েই ভলজাঁর হাঁটুর উপর তার টুপিটা রেখে বুনো ফুল তুলতে যেত। সে প্রজাপতির পাখা মেলে উড়ে যাওয়া দেখত, কিন্তু তাদের ধরতে যেত না। করুণা আর মমতা এই দু'য়েরই বশবর্তী হয়ে সে ধরতে চাইত না তাদের।

তাদের দু'জনেরই জীবনে দুঃখময় বোঝা নেমে আসা সত্ত্বেও তারা সকালে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাসটা ত্যাগ করেনি। তারা রোজ ভোর হলেই বেরিয়ে পড়ত বাড়ি থেকে। সেদিন ছিল ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসের এক স্নিগ্ধ সকাল। ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলেছিল ব্যারিয়ের দু মেনের দিকে। তখনো ভোরের আলো ফুটে ওঠেনি ভাল করে। ঝাপসা আকাশের গভীরে দু'চারটে তারা তখনো ছিল। পুব দিকটা ফর্সা হয়ে আসছিল। লার্ক পাখি ডাকছিল কোথায়। অপসৃয়মান অন্ধকার দিগন্তের মাথার উপরে ধ্রুবতারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। চারদিক নির্জন নিস্তব্ধ। শুধু দু' একজন শ্রমিককে কারখানার পথে ব্যস্তভাবে যেতে দেখা যাচ্ছিল।

যেতে যেতে একটা কাঠের কারখানার কাছে পথের ধারে একটা কাঠের উপর বসে ছিল ভলজাঁ। তার পিঠটা ছিল উদীয়মান সূর্যের দিকে। সেদিন তার চিন্তার জটিল জালে মনের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটোও এমনভাবে আটকে পড়ে যে সূর্যোদয় দেখার কোনও আগ্রহ ছিল না তার। সে ভাবছিল যদি তাদের দু'জনের মাঝখানে কোনও অঘটন না ঘটে তাহলে তাদের এই সুখ অব্যাহত থাকিবে। যে সুখের পশরা দিয়ে তার জীবনকে ভরে দিয়েছে কসেত্তে সে সুখের পশরা যেন না ফুরোয় কোনও দিন। ভলজাঁ যখন এই সব অলস দিবাস্বপ্নজাল রচনা করে চলেছিল আপন মনে, কসেত্তে তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখছিল দিগন্তজোড়া ধূসর মেঘগুলো কিভাবে গোলাপী হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে।

সহসা চিৎকার করে উঠল কসেত্তে, বাবা, কারা আসছে মনে হচ্ছে।

চোখ তুলে তাকাল ভলজাঁ। ব্যারিয়ের দু মেনের দিকে যে বড় রাস্তাটা সোজা চলে গেছে, কিছুদূরে আর একটা রাস্তা সেই বড় রাস্তাটাকে খণ্ডিত করে বুলভার্দের দিকে চলে গেছে। সেই চৌরাস্তার কাছ থেকে গোলমালের এক শব্দ আসছিল। পরে দেখা গেল ঘোড়ায় টানা একটা পুরনো আমলের গাড়ি ঝাপসা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চৌরাস্তা থেকে এগিয়ে আসছে ধীর গতিতে। কয়েকজন মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে চাবুক মারার শব্দ কানে আসছিল।

ক্রমে ওরা দেখল একটার পর একটা মোট সাতটা ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে আসছে এই দিকে। মনে হলো গাড়িগুলোতে মানুষ আছে এবং কোনও কোনও মানুষের হাতে অস্ত্র আছে।

ঘোড়ায় টানা মালগাড়িতে ছিল চব্বিশজন কয়েদী। তাদের ঘাড়ের উপর ছিল লোহার জোয়াল আর পায়ে বেড়ী। প্রতিটি গাড়িতে দুটি করে সারিতে কয়েদীরা বসেছিল। গাড়ির দু'দিকের মুখের কাছে দু'জন করে সশস্ত্র সৈনিক পাহারা দিচ্ছিল। গাড়িগুলোর আগে আগে একদল অশ্বারোহী পুলিশ যাচ্ছিল, তাদের হাতে ছিল মুক্ত তরবারি। গাড়িগুলো রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল।

এই শোভাযাত্রা দেখার জন্য পথের দু'ধারে দর্শকদের ভিড় জমে গিয়েছিল। একদল বাচ্চা ছেলে চিৎকার করছিল। চাবুক হাতে একজন সেনাপতি হাঁকডাক করে বন্দীদের উপর খবরদারি করছিল। প্রহরী সৈনিকরা মাঝে মাঝে তাদের হাতের লাঠি দিয়ে বন্দীদের মারছিল। তাদের পিঠের উপর সশব্দে লাঠির ঘাগুলো বসিয়ে দিচ্ছিল।

আকাশটাকে দেখে মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি নামবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘ ভেঙে সূর্য দেখা দিল। সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। বন্দী কয়েদীদের মাঝে একজন নিগ্রো ক্রীতদাস ছিল। শৃঙ্খলিত থাকার অভ্যাস ছিল তার। তাছাড়া অন্য কয়েদীরাও সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যাচ্ছিল।

এই সব দেখে ভলজাঁর অতীতের কথা মনে পড়ল। একদিন সেও এমনি করে বন্দা কয়েদী হিসাবে পশুর মতো একস্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়েছে। তাকেও এই সব অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। এই সব স্বচক্ষে দেখে মনটা তার বিষণ্ন হয়ে উঠল। সে ভয় পেয়ে গেল। ছুটে পালাতে ইচ্ছা করছিল তার। কিন্তু সেখান থেকে উঠতে পারল না সে।

কসেত্তেও এ দৃশ্য দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল অন্য কারণে। সে হতবুদ্ধি ও বিমূঢ় হয়ে রুদ্ধশ্বাসে এই সব দেখে যাচ্ছিল। সে একসময় বলল, এই সব লোক কারা বাবা?

ভলজাঁ বলল, ওরা কঠোর শ্রমে দণ্ডিত কয়েদী।

কোথায় যাচ্ছে ওরা?

জাহাজে কাজ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের।

এমন সময় লাঠির ঘা আর বেতের চাবুক চরমে উঠল। খাঁচাবন্দী নেকড়ের মতো বন্দীরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। এই বন্দীদের বিশেতার থেকে লে মাঁসের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ফঁতেনব্লোতে রাজার বাসভবন থাকায় এ দৃশ্য পাছে রাজার চোখে পড়ে তাই সেদিকে না গিয়ে তিন-চারদিনের ঘুরপথে ওদের এইভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

গভীর বিষাদে মগ্ন হয়ে কসেত্তেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল ভলজাঁ। পথে সে বন্দীদের কথা ভাবতে ভাবতে এমন অ ্যমনস্ক হয়ে পড়ল যে কসেত্তের কোনও প্রশ্নেরই সে জবাব দিতে পারল না। রাত্রিতে কসেত্তে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে যাবার সময় বলে গেল, পথে কোনও মানুষের উপর ঐ ধরনের অত্যাচার দেখলে এবার আমি ভয়ে মরে যাব।

পরদিন প্যারিসে সেন নদীর ধারে সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজের এক সরকারী

উৎসব ছিল। সন্ধের দিকে অনেক বাজী পোড়ানো ও আলোকসজ্জা হবে। বিকালের দিকে ভলজাঁ সেখানে উৎসব দেখার জন্য কসেত্তেকে নিয়ে গেল। এই উৎসব দেখলে গতকালকার অপ্রিয় অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার কথাটা হয়ত ভুলে যেতে পারবে সে। ভলজাঁ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর পোশাক পরে গেল সেখানে।

কয়েকদিন পরে সেদিন সকালবেলায় বাগানবাড়িতে ওরা দু'জনেই উজ্জ্বল রোদে বসেছিল। ভলজাঁ সাধারণত বাগানে বসে না। কসেত্তেও সাধারণত ঘরের মধ্যে একা বসে বসে ভাবতে থাকে। কিন্তু আজ ওরা এই উজ্জ্বল সকালে বাগানের এই গাছপালা আর ফুলের রাজ্যে এসে বসেছিল। কসেত্তে হালকা রঙের একটা পোশাক পরে ছিল। নক্ষত্রদের ঘিরে থাকা কুয়াশার মতো পোশাকটা জড়িয়ে ছিল তার গায়ে। গতরাতে তার ভাল ঘুম হওয়ায় তার গালগুলোকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সে একটা ডেইজি ফুল নিয়ে খেলা করছিল। তার বাবা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই খেলা দেখছিল। কসেত্তের এই আনন্দময় উপস্থিতিতে তার সব দুঃখের কথা ভুলে গিয়েছিল ভলজাঁ। তাদের মাথার উপর একটা পাখি ডাকছিল। আকাশে হালকা সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল।

ফুল নিয়ে খেলা করতে করতে হাঁসের মতো ঘাড়টা ঘুরিয়ে বলে উঠল কসেত্তে, বাবা, ওদের কোথায় কোন জাহাজে কাজ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

ধীরে ধীরে বিষাদের ছায়া ঘন হয়ে উঠতে লাগল তাদের জীবনে। এই দুঃখ আর বিষাদের জন্য তাদের একমাত্র সান্ত্বনা আর আনন্দের উৎসস্থল ছিল গরীব-দুঃখীদের অন্ন ও বস্ত্রদান। কসেত্তে যখন জাঁ ভলজাঁর সঙ্গে গরীব-দুঃখীদের বস্তিতে গিয়ে খাদ্য, টাকা-পয়সা ও পোশাক-আশাক দান করত তখন সেও প্রচুর আনন্দ পেত। তাদের দু'জনের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতার উত্তাপটা চলে গিয়েছিল, এই সব জনসেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে সেই উত্তাপটা আবার ফিরে পেত তারা। কত দুঃস্থ লোককে সাহায্য দান করত তারা। কত গরীব ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলত। এমনি এক সময়েই এপোনিনের কাছে চিঠি পেয়ে জনদ্রেত্তের বাড়িতে যায় তারা।

জনদ্রেত্তের বাসায় সে রাতের ঘটনার পরদিন সকালে জাঁ ভলজাঁ বাঁ হাতে এক ক্ষত নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। তার হাতটা ফুলে যায়। তার খুব জ্বর হয়। সে একমাস ধরে শয্যাগত হয়ে থাকে। কিন্তু কোনও ডাক্তার ডাকেনি। কসেত্তে তার সেবা করতে থাকে। কসেত্তে যেমন তার সেবা করে আনন্দ পায় ভলজাঁ তেমনি তার সেবা পেয়ে আগেকার সেই হারানো সুখ ফিরে পায়। কসেত্তে যখন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তার সেবা করত তখন সে তার দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে বলে উঠত, আমার এই অসুখ এই আঘাত পরম উপকার করেছে আমার। আমি সত্যিই ভাগ্যবান।

তার বাবা অসুস্থ থাকায় কসেত্তে তার বাবার কটেজেই সারাদিনের মধ্যে বেশির

ভাগ সময় কাটাত। তার বাবার বিছানার পাশে বসে ভ্রমণের বই পড়ে আনন্দ পেত সে। যেন এক নবজন্ম লাভ করল ভলর্জাঁ। লুক্সেমবুর্গ বাগান, সেই অচেনা অদ্ভুত যুবক, কসেত্তের ভাবান্তর—আগে যে সব কথা ভেবে কষ্ট পেত মনে, সে সব কথা মন থেকে সরে গেল তার॥ সে তখন মনে মনে বলতে লাগল, আমি বোকা, এসব আমার মনের কল্পনা মাত্র।'

নতুন সুখের মত্ততায় জনদ্রেত্তেই যে থেনার্দিয়ের এ নিয়ে আর বেশি ভাবল না সে। তা নিয়ে বেশি মনোকষ্ট পেল না। তাদের কথা ভাবতে গেলে শুধু একটা দুঃখই হয়। তারা বড় দুরবস্থার মধ্যে আছে। তারা এখন জেলখানায় আছে। সুতরাং তারা এখন আর কারো কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

কসেত্তে ব্যারিয়ের দু মেনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেনি।

কনভেন্টে থাকাকালে সিস্টার মেফতিলদে কসেত্তেকে কিছু গান শিখিয়েছিল। কসেত্তে এক একদিন সন্ধের সময় যখন ভলর্জাঁর কাছে তার কটেজে বসে থাকত তখন প্রাণ খুলে গান করে ভলর্জাঁকে প্রীত করত।

বসন্ত এল। বাগানটা ফুল আর কচি কিশলয়ে এমনভাবে ভরে উঠল যে তা দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে একদিন কসেত্তেকে বলল, তুমি বাগানে মোটেই যাও না। আমি চাই তুমি সেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে বেড়াও।

কসেত্তে বলল, তাহলে আমি নিশ্চয় যাব সেখানে।

তার বাবাকে খুশি করার জন্য একা একাই বাগানে বেড়াত কসেত্তে। রাস্তা থেকে গেট দিয়ে তাকে দেখে ফেলে এই ভয়ে ভলর্জাঁ বাগান দিয়ে বড় একটা যেত না।

ভলর্জাঁর হাতের ক্ষতটা এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিল দু'জনের জীবনধারায়। কসেত্তে যখন দেখল ধীরে ধীরে সেরে উঠছে ভলর্জাঁ এবং ক্রমে সে মনে মনে হালকা হয়ে উঠছে তখন সে মনে এমন একটা তৃপ্তির অনুভূতি লাভ করছিল যার কথা সে ভালভাবে বুঝতেই পারছিল না। তখন মার্চ মাস। বসন্ত শেষ হয়ে আসছিল। শীত বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে তা আমাদের মনের অনেক দুঃখ নিয়ে যায়। দেখতে দেখতেই মার্চ গিয়ে এপ্রিল এল। গ্রীষ্মের সকালগুলো বড় মনোরম, শৈশবকালের মতোই আনন্দময়। এই সময় সকালবেলায় আকাশ, মেঘ, মাঠ, বন, গাছপালা, ফুল প্রভৃতি থেকে এমন এক মায়াময় আলোকরশ্মি ঝরে পড়ে যা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ না করে পারে না।

কসেত্তের বয়স তখন কম থাকায় এপ্রিল মাসের এই ঐন্দ্রজালিক আবেদনে তার অন্তর ঠিকমতো সাড়া দিতে পারছিল না। কিন্তু সে ঠিক বুঝতে না পারলেও এ মাসের আলো তার মন থেকে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদের অনেকখানি তার অগোচরেই অপসারিত করে ফেলেছিল, যেমন মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলো গুহার অনেক অন্ধকার সরিয়ে দেয়। কসেত্তের মনে তখন সত্যিই কোনও দুঃখ ছিল না। সে তার মনের এই রূপান্তরের কথা ঠিক বুঝতে না পারলেও প্রায়দিন প্রাতরাশের পর যখন তার বাবাকে কিছুক্ষণের জন্য বাগানে বেড়াতে নিয়ে যেত এবং তার বাবার সঙ্গে পায়চারি করতে করতে তার বাবার ক্ষত হাতটায় হাত বোলাত তখন সে সত্যিই খুব আনন্দ পেত।

তার এই আনন্দের আবেগটা তার গাল দুটোতে তার দেহের স্বাস্থ্য আর মনের সুখের উজ্জ্বলতার প্রতীক হয়ে ফুটে উঠত যখন ভলজাঁ তখন তা দেখে আনন্দের আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠত। সে ভাবত, আমার ক্ষতটা সত্যিই আমাকে ভাগ্যবান করে তুলেছে। এ কথা ভাবতে গিয়ে সে থেনার্দিয়েরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব না করে পারত না।

ভলজাঁ একেবারে সেরে উঠলে সন্ধের সময় সে একা একা আবার পথে পথে ঘুরে বেড়াত আগের মতো।

কিন্তু প্যারিসের নৈশ নির্জন রাজপথে কেউ ঘুরে বেড়ালে কোনও ঘটনার সম্মুখীন হবে না কোনওদিন, এটা ভাবাই যায় না।

২

একদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখা গেল গাভ্রোশের সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। আগের দিনও তার কিছু খাওয়া হয়নি। ক্রমেই সে ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তাই সে ঠিক করল আজ রাতে যেখান থেকে হোক কিছু খাবার যোগাড় করতেই হবে। সালপ্রেত্রিয়ের পার হয়ে নির্জন পথ দিয়ে হেঁটে চলেছিল সে। সে পথে কোনও লোক দেখা না গেলেও সে ভাবল কোথাও কিছু পড়ে থাকলে দেখতে পাবে সে। হাঁটতে হাঁটতে সে বুঝল অস্টারলিৎস অঞ্চলে এসে পড়েছে।

আগে একবার এই অঞ্চল দিয়ে বেড়াবার সময় গাভ্রোশে একটা পুরনো বাগান দেখেছিল। সেই বাগানে একজন বয়োপ্রবীণ লোক একজন মহিলার সঙ্গে প্রায়ই বেড়াত। সে দেখেছে সেই বাগানে একটা আপেল গাছ আছে আর একটা চালাঘর আছে। সেই চালাঘরেও হয়ত গাছ থেকে পেড়ে আপেল জমা করে রাখা হয়েছে। আপেল এক ভাল খাদ্য, প্রাণশক্তির উৎস। যে আপেল একদিন আদমের স্বর্গচ্যুতি ঘটিয়েছিল, সেই আপেলই আজ গাভ্রোশের প্রাণ বাঁচাতে পারে। বাগানটার বাইরে এক নির্জন গলিপথ আছে। সে অঞ্চলে বাড়িঘর বেশি না থাকায় বাগানের পাশে পথের ধারে আগাছার ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠেছে।

গাভ্রোশে যখন বাগানটার কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে। কিন্তু বাগানটার পাঁচিলের কাছে আসতেই সে বাগানের ভিতর মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সে গেটের পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখল বাগানের ভিতর একটা বড় পাথরের উপর একজন বুড়ো লোক বসে আছে, আর তার সামনে একজন বৃদ্ধা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। গাভ্রোশে, সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

মহিলাটি বলল, মঁসিয়ে মেবুফ।

গাভ্রোশে ভাবল, 'মেবুফ' নামটা কি খারাপ!

বৃদ্ধ লোকটি কোনও উত্তর না দেওয়ায় বৃদ্ধা আবার ডাকল, মঁসিয়ে মেবুফ!

এবার বৃদ্ধ মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, কি বলছ মেরে প্লুতার্ক?

গাভ্রোশে ভাবল মহিলাটির নাম তাহলে প্লুতার্ক।

বৃদ্ধা মহিলাটি বলল, মঁসিয়ে মেবুফ, বাড়িওয়ালা ভাড়া চাইছে।

কিসের ভাড়া ?

ওরা তিন কোয়ার্টারের ভাড়া পাবে আপনার কাছ থেকে।

তাহলে আর তিন মাস পরে চার কোয়ার্টার পুরো হবে।

ওরা বলছে আপনাকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হবে।

তাহলে আমাদের চলে যেতে হবে।

তাছাড়া কাঠের দোকানদার বলছিল কাঠের বাকি দাম না মেটালে আর কাঠ দেবে না। কিন্তু জ্বালানী কাঠ না পেলে কি করে আগুন জ্বালাব শীতে ?

সূর্যের রোদ আছে।

মাংসের দোকানের মালিক বলছিল সে আর মাংস দেবে না।

শুনে খুশি হলাম। মাংস আর আমার সহ্য হচ্ছে না। বড় গুরুপাক।

কিন্তু কি খেয়ে আমরা বাঁচব ?

কেন, রুটি খেয়ে।

কিন্তু রুটিওয়ালারও সেই এক কথা। সেও আর ধারে রুটি দেবে না।

ভাল।

কিন্তু কি খেয়ে জীবন ধারণ করব আমরা ?

তাহলে কিছু আপেল খেয়ে থাকব।

কিন্তু মঁসিয়ে, এভাবে আমাদের টাকা ছাড়া চলতে পারে না।

আমার টাকা নেই।

বৃদ্ধা এবার বৃদ্ধ লোকটিকে সেইখানে একা রেখে চলে গেল। বৃদ্ধ একা একা সেইখানে বসে ভাবতে লাগল। এদিকে গাভ্রোশেও তখন ভাবছিল। তখন অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছিল বাগানে। গাভ্রোশে নিঃশব্দে চোরের মতো বাগানে ঢুকে মেবুফের পিছনের দিকে একটা ঝোপের ধারে এক জায়গায় তার শোবার জায়গা খুঁজছিল। হঠাৎ সে দেখল অন্ধকারে দুটো ছায়ামূর্তি বাগানের দিকে গলি থেকে এগিয়ে আসছে।

সে দেখল দু'জন লোকের মধ্যে প্রথম লোকটি বয়োপ্রবীণ। তাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় লোকটির বয়স কম। সে একটা কোট আর টুপি পরেছিল। সে প্রথম লোকটিকে অনুসরণ করছিল। গাভ্রোশে দ্বিতীয় লোকটিকে চিনতে পারল, সে মঁতপার্নেসী। গাভ্রোশে লুকিয়ে রইল এক জায়গায়। সে বুঝতে পারল মঁতপার্নেসী শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে এবং প্রথম লোকটিকে তার শিকার হিসাবেই অনুসরণ করছে। তার প্রথম লোকটির প্রতি দয়া হলো। কিন্তু কি করবে সে ? তার মনে হলো সে যদি বয়স্ক লোকটিকে উদ্ধার করতে যায় তাহলে তাদের দু'জনকেই মঁতপার্নেসী খেয়ে ফেলবে, তাদের দু'জনকেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

গাভ্রোশে যখন এই সব ভাবছিল তখন মঁতপার্নেসী প্রথম লোকটিকে আক্রমণ করল পিছন থেকে। যেন কোনও হিংস্র বাঘ একটা গাধার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গাভ্রোশে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু দেখল প্রথম লোকটি মঁতপার্নেসীকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর হাঁটু দিয়ে পাথরের মতো বসে পড়েছে।

গাভ্রোশে এটা আশা করতে পারেনি। বয়স্ক লোকটি শুধু মঁতপার্নেসীর আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারেনি, মঁতপার্নেসীকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার উপর বসে পড়েছে! মঁতপার্নেসী নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে যেন সে মরে গেছে। বয়স্ক লোকটি কোনও কথা বলল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে মঁতপার্নেসীকে বলল, ওঠ।

মঁতপার্নেসী উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তখনো তাকে ধরে ছিল বয়স্ক লোকটি। মঁতপার্নেসী প্রচণ্ড রাগ আর লজ্জার সঙ্গে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন মনে হবে একটা ভয়ঙ্কর নেকড়ে একটা সামান্য ভেড়ার দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে। ঘটনাটা অপ্রত্যাশিতভাবে উল্টে যাওয়ায় খুশি হয়েছিল গাভ্রোশে।

বয়োপ্রবীণ লোকটি মঁতপার্নেসীকে বলল, তোমার বয়স কত?

আমার বয়স উনিশ।

তুমি স্বাস্থ্যবান এবং বলবান। কেন তুমি কাজ করো না?

আমার ভাল লাগে না।

তুমি কি করো?

আমি ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়াই।

বাজে কথা বলো না। তোমাকে কোনও সাহায্য করতে পারি? তুমি কি হতে চাও?

চোর।

তারপর দু'জনেই চুপ হয়ে গেল। বয়স্ক লোকটি কি ভাবতে লাগল। সে তখনো মঁতপার্নেসীকে ধরে ছিল। মঁতপার্নেসী নিজেকে ছাড়াবার জন্য হাত-পা ছুঁড়ছিল। অন্ধকার ঘন হয়ে ছিল তাদের চারদিকে। বয়স্ক লোকটি মঁতপার্নেসীকে সেইভাবে ধরে এক বক্তৃতা দিয়ে চলল। সে বলতে লাগল, আলস্যই তোমার জীবনকে মাটি করে দিয়েছে। তুমি বলছ তুমি ভবঘুরে। কিন্তু তোমাকে খেটে খেতেই হবে। জীবনের পথ তোমায় পরিবর্তন করতে হবে। তুমি সৎভাবে জীবন যাপন করতে চাও না। পরিশ্রম করতে চাও না। পরিশ্রম সহকারে কাজ করে জীবিকার্জন করাই মানুষের ধর্ম। তুমি যদি কাজ করে জীবিকা অর্জন না করো তাহলে তোমাকে নিগ্রোদের মতো ক্রীতদাস হতে হবে। তোমাকে হয় মাঠে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করতে হবে অথবা নৌকার দাঁড় বাইতে হবে অথবা জ্বলন্ত চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে লোহা পিটাতে হবে। কাজ না করে চুরি করে জীবিকা যোগাড় করতে হলেও তোমাকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। দড়ির সাহায্যে জানালা দিয়ে কোনও বাড়িতে ওঠানামা করতে হবে অথবা ঘরের দরজার তালা ভাঙতে হবে। তার জন্য যন্ত্রপাতি যোগাড় করতে হবে। চুরি করার জন্য যত কলাকৌশলই দেখাও না কেন, তার পুরস্কার হচ্ছে জেলে যাওয়া। এটাই তোমার ভবিষ্যৎ। আলস্য আর সস্তা আনন্দের জীবন ফাঁদের মতো তোমার জীবনকে গ্রাস করবে। তুমি বিনাশ্রমে ভাল খাবার, পানীয়

আর নরম বিছানা চাও, কিন্তু তার পরিবর্তে পাবে শুধু কালো শক্ত রুটি, জল আর কাঠের তক্তা। তাছাড়া অনেক সময় বনে-জঙ্গলে তোমাকে জন্তু-জানোয়ারের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে। নিজের উপর একটু দয়া করো ছোকরা। তুমি ভুল পথে যাচ্ছ। এইভাবে কুড়ি থেকে জীবন শুরু করে দেখতে দেখতে তোমার বয়স বার্ধক্যে উপনীত হবে। তোমার মাথার চুল পেকে যাবে। অপরাধমূলক কাজ হলো সবচেয়ে কঠোর শ্রমের কাজ। আমার কথা শোন। সৎ জীবন যাপন তার থেকে অনেক ভাল। ঠিক আছে, তুমি আমার কাছ থেকে কি চাইছিলে? টাকার থলে? এই নাও?

লোকটি তার টাকার থলেটা পকেট থেকে বার করে মঁতপার্নেসীর হাতে দিতেই সে সেটা কত ভাবী তা পরীক্ষা করে দেখে তার কোটের পকেটে ভরে দিল। তার মনে হলো সে যেন সেটা চুরি করে নিয়েছে।

এরপর লোকটি শান্তভাবে তার পথে চলে গেল। এই বয়স্ক লোকটি কে তা বুঝতে আশাকরি পাঠকদের কষ্ট হবে না।

মঁতপার্নেসী তার পথের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বলল, বৃদ্ধ বাচাল।

গাভ্রোশে একটু দূরে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। সে বুঝল [illegible] মেবুফ এখনো হয়ত সেই পাথরটার উপর বসে ঝিমোতে ঝিমোতে ঘুমিয়ে পড়েছে। মঁতপার্নেসী তখনো আচ্ছন্নের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে কি ভাবছিল। গাভ্রোশে ধীর পায়ে মঁতপার্নেসীর পিছনে এসে তার টেলকোটের পকেট থেকে টাকার থলেটা তুলে নিল। মঁতপার্নেসী তা টের পেল না।

এবার গাভ্রোশে মেবুফ যেখানে পাথরটার উপর বসে বসে ঘুমোচ্ছিল সেখানে চলে গেল। সে তার সামনে পায়ের কাছে টাকার থলেটা ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে গেল।

থলেটা মেবুফের পায়ের উপর পড়তেই জেগে উঠল সে। থলেটা কুড়িয়ে নিয়ে সে সেটা খুলে দেখল তার মধ্যে ছটা নেপোলেয়ঁ বা স্বর্ণমুদ্রা আছে।

আনন্দের উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে মেবুফ সেগুলো মেরে প্লুতার্কের হাতে দিয়ে বলল, এই থলেটা নিশ্চয় স্বর্গ থেকে পড়েছে। এটা ঈশ্বরের দান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

এদিকে মাসকতক আগে কসেত্তের মনের যে বেদনাটা তীব্র ছিল, আজ সেটা ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল। যৌবনের স্বাভাবিক প্রাণচঞ্চলতা, বসন্তের উন্মাদনা, তার বাবার প্রতি ভালবাসা, পাখির গান আর ফুলের উজ্জ্বলতা এক স্নিগ্ধ বিস্মৃতির প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছিল যেন তার মনের উপর। তবে কি তার মনের মধ্যে গোপনে জ্বলতে থাকা অতৃপ্ত প্রেমের আগুনটা নিবে গিয়েছিল একেবারে না সেটা একরাশ ছাই-এর অন্তরালে তখনো জ্বলছিল? কিন্তু সে যাই হোক, সে কোনও বেদনার

আঘাত অনুভব করতে পারছিল না তার মনে। একদিন মেরিয়াসের কথাটা মনে হতেই সে ভাবল, আর আমি তার কথা ভাবি না।

কয়েকদিন পর কসেত্তে তাদের বাগানের গেটের কাছ থেকে দেখল সুদর্শন যুবকবয়সী এক অশ্বারোহী সামরিক অফিসার রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে। তার পোশাকটা ছিল বেশ চকচকে, মুখে মোচ, চমৎকার চুল, সুন্দর নীল চোখ, কোমরে তরবারি। তার উদ্ধত অহঙ্কারী চেহারাটা ছিল মেরিযাসের একেবারে বিপরীত। সে তখন একটা সিগারেট খাচ্ছিল। কসেত্তে ভাবল তাদের পাড়ায় র‍্যু দ্য বেবিলনের ব্যারাক বা সৈন্যনিবাসে যে সেনাদল আছে ঐ অশ্বারোহী যুবক সেই সেনাদলের অন্তর্গত।

পরদিন সেই নির্দিষ্ট সময়ে সেই অশ্বারোহী যুবককে দেখতে পেল কসেত্তে। তারপর থেকে রোজই সে দেখতে পেত তাকে একই সময়ে। ক্রমে সেই সেনাদলের অন্যান্য অফিসারেরাও লক্ষ্য করল ঐ অঞ্চলে ঝোপে-ঝাড়ে ভর্তি অযত্নলালিত অব্যবহৃত একটা বাগানের মধ্যে একটি সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক যখন তাদের লেফট্‌ন্যান্ট থিওদুল গিলেনর্মাদ সেই পথে যায়।

সেই সব অফিসারেরা একদিন থিওদুলকে বলল, তোমার উপর মেয়েটার নজর পড়েছে।

থিওদুল তখন তার উত্তরে বলল, কিন্তু যে সব মেয়েরা আমার দিকে তাকায তাদের দিকে তাকাবার মতো সময় কোথায় আমার ?

এদিকে মেরিয়াস তখন কসেত্তেকে দেখতে না পেয়ে গভীর হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। সে শুধু তখন মনে মনে এই কথা বলছিল, মরার আগে তাকে যদি একবার দেখতে পেতাম। কিন্তু যখন কসেত্তে এই যুবক অফিসারের দিকে তাকিয়ে থাকত তখন যদি তাকে সেই অবস্থায় মেরিয়াস একবার দেখত তাহলে ঘটনাস্থলেই মারা যেত মেরিয়াস।

কিন্তু এতে দোষটা কার ? কারোরই না। মেরিযাস ছিল এমনই এক যুবক যে একবার দুঃখে পড়লে সে দুঃখকে আলিঙ্গন করে থাকে, তাকে বুকে রেখে লালন করে চলে, কিন্তু কসেত্তে দুঃখকে গভীরভাবে অনুভব করার পর তার থেকে মুক্ত করে ফেলে নিজেকে। বেশিদিন সে দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে রাখে না নিজেকে।

কসেত্তের মনের অবস্থাটা তখন ছিল কোনও নারীসত্তার পক্ষে সত্যিই বিপজ্জনক। সে মন ছিল উদ্দাম এবং বল্গাবিহীন। আসলে নিঃসঙ্গ কোনও তরুণীর মন হচ্ছে আঙ্গুরলতার মতোই। আঙ্গুরলতা যেমন সামনে কোনও মর্মরমূর্তি বা কোনও পান্থশালায় স্তম্ভ বা কোনও গাছকে হাতের কাছে পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে, তরুণীর নিঃসঙ্গ মনও তেমনি হাতের কাছে পুরুষকে একবার ভাল লেগে গেলেই তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। ধনী-গরীব যাই হোক, যে সব তরুণীর মা থাকে না তাদের বিপদ আরও বেশি। ধন বা ঐশ্বর্য কাউকে কখনো কোনও ভুল-ক্রটির হাত থেকে বাঁচাতে পারে না। অনেক সময় কোনও যুবকের সঙ্গে মিশতে গিয়ে গরমিল দেখা দেয়। দু'জনের আত্মায় মিল হয় না। বাইরের চেহারা ও বেশভূষা নয়, পুরুষদের মনই

হচ্ছে নারীদের আশ্রয়স্থল। অনেক সময় দেখা যায় বংশগৌরবহীন এক অচেনা অজানা যুবক বাইরে নিঃস্ব হয়েও অন্তরের দিক থেকে কত উন্নত চিন্তা ও ভাবসম্পদে পরিপূর্ণ, এক মর্মরমূর্তির মতোই প্রস্তর কঠিন এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার চরিত্রগৌরব, অথচ আবার কোনও বিত্তবান ঐশ্বর্যবান যুবককে বাইরে দেখতে যাই মনে হোক, অন্তরের দিক থেকে কত নিঃস্ব, কত দীনহীন সে; কত সব হিংস্র চিন্তাভাবনা আর উদ্ধত আবেগ আর অনুভূতিতে সে অন্তর কত পরিপূর্ণ—যেন আঙ্গুরলতার দ্বারা আলিঙ্গিত যে কোনও পান্থশালার কাষ্ঠস্তম্ভ।

কিন্তু কসেত্তের অন্তরের অবস্থাটা সত্যি সত্যিই কেমন ছিল? আসলে তার প্রেমাবেগটা যেন তখন ঘুমিয়ে ছিল তার অন্তরের গভীরে। তার অন্তরের উপর দিকে কিছু তরল আবেগের অশান্ত অস্থির চঞ্চলতা থাকলেও তার প্রকৃত প্রেমসত্তাটি এক গভীরতম প্রদেশে স্তব্ধ হয়ে ছিল এক প্রশান্ত গাম্ভীর্যে। সেই সুদর্শন যুবক অফিসারের কথাটা সে তার মনের উপরিপৃষ্ঠে ভাবলেও তার সে মনের গভীরে কি মেরিয়াসের স্মৃতিটার তখনো কিছু অবশিষ্ট ছিল? সে হয়ত নিজেই তা জানত না।

এমন সময় একটা বিশেষ ঘটনা ঘটল।

২

সেবার এপ্রিল মাসের প্রথম পক্ষে একবার অল্প কিছুদিনের জন্য বাইরে বেড়াতে গেল ভলজাঁ। আমরা জানি ভলজাঁ মাঝে মাঝে এমনি করে দু' তিন দিনের জন্য বাইরে যেত। কিন্তু কোথায় কি জন্য যেত তা কসেত্তে জানত না। সেদিন ভলজাঁ যাবার সময় বলে গেল তার ফিরতে দু'দিন কি তিন দিন দেরি হবে। এবার সে একটা গাড়িতে করে কসেত্তেকে নিয়ে লা প্ল্যানশের পর্যন্ত গেল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে সে কোথায় চলে গেল। গাড়িটা কসেত্তেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। সংসার খরচের টাকা-পয়সায় টান পড়লেই ভলজাঁ এইভাবে [illegible]ন যেত মাঝে মাঝে।

ভলজাঁ চলে যেতে কসেত্তে সন্ধ্যাটা তার ঘরেই একা একা কাটাত। একঘেঁয়েমিটা কাটাবার জন্য এক একসময় সে পিয়ানো-অর্গানটা বাজিয়ে গান করত। গান শেষ করে ভাবত সে।

একদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ সে বাগানে কার পদশব্দ শুনতে পেল।

তখন রাত্রি দশটা বাজে। তার বাবা তখন বাড়িতে ছিল না এবং তুসাঁ তখন শুয়ে পড়েছে। কসেত্তে একটা বন্ধ জানালার ধারে গিয়ে কান পেতে শব্দটা শোনার চেষ্টা করল।

সেই পদশব্দ শুনে কসেত্তে বুঝল কেউ খুব ধীর পায়ে আসছে। কসেত্তে এবার তার শোবার ঘরে ছুটে গিয়ে বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে দৃষ্টি চালিয়ে দেখতে লাগল। সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত। পূর্ণ চাঁদের আলোয় সব কিছু দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু কোনও লোককে দেখতে পেল না কসেত্তে। সে জানালাটা খুলে দিল। দেখল বাগানে কোনও লোক নেই। গেটের ওপারে রাস্তাটাও একেবারে জনশূন্য।

কসেত্তে ভাবল, আসলে ওটা কারো পদশব্দ নয়, তার মনের ভুল। সে ওয়েবার রচিত যে কোরাস গানটা গেয়েছে একটু আগে সেই গানের দ্বারা সৃষ্ট এক ভয়াবহ আবেশ থেকেই এ ধারণা হয়েছে। সে গান শুনে শ্রোতাদের মনের মধ্যে এমন এক ভয়াল মায়াময় অরণ্যের ছবি ভেসে ওঠে যেখানে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকার অদৃশ্যপ্রায় শিকারীদের পায়ের দ্বারা দলিত পাতা আর হাত দিয়ে ডালপালা ভাঙার এক ভূতুড়ে শব্দ হয়।

পরদিন গোধূলিবেলায় সন্ধ্যার কিছু আগে বাগানে একা একা বেড়াচ্ছিল কসেত্তে। তার মনে সাহসের অভাব ছিল না। ভবঘুরে জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা আছে তার জীবনে। সে কপোত নয়, সত্যিই সে লার্ক। লার্ক পাখির মতোই দূর আকাশের অনিশ্চিত অজানা শূন্যতায় অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে সে। সে যখন বেড়াতে বেড়াতে এলোমেলোভাবে চিন্তা করছিল তখন তার কেবলি মনে হচ্ছিল কে যেন বাগানের মধ্যেই তার আশেপাশে গাছের গুঁড়ির আড়ালে চলাফেরা করছে সতর্কিত পদক্ষেপে। গতকাল রাতে যে পদশব্দ শুনেছিল এ শব্দ ঠিক তেমনি। আবার ভাবল হাওয়ায় গাছের ডালে ডালে ঘর্ষণের ফলেই হয়ত এ শব্দ হচ্ছে।

বাগান থেকে বেরিয়ে বাড়িতে ফিরে আসার জন্য সে যখন উঠোনটা পার হচ্ছিল তখন হঠাৎ ভয়ে চমকে উঠল সে। তার নিজের ছায়ার পাশে আর একটা মানুষের ছায়া দেখল সে। সে ছায়ামূর্তির মাথায় ছিল একটা টুপি। মূর্তিটা তার পিছনে কয়েক পা দূরে তারই দিকে এগিয়ে আসছিল।

চলতে চলতে থেমে গেল কসেত্তে। ছুটে পালাল না বা ভয়ে চিৎকার করল না। স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে তার অনুসরণকারী ছায়ামূর্তিটাকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু আশ্চর্য! কাউকে দেখতে পেল না। সে আবার বাগানে ফিরে গিয়ে সাহসের সঙ্গে খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু এবারও কাউকে দেখতে পেল না। তবে কি গতকালকার মতো এটাও তার মনের ভ্রান্তি! আবার এটা ভূতও নয়; ভূতেরা কখনো গোল টুপি পরে না মাথায়।

পরদিনই বাড়ি ফিরে এল ভলজাঁ। সে এলে তাকে এ কথাটা বলল কসেত্তে। সে বলল, বোকা মেয়ে কোথাকার! মুখে একথাটা বললেও মনে মনে কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠল সে।

ভলজাঁ তখনি বাগানে গিয়ে গেটটা ভাল করে পরীক্ষা করল। কিন্তু দেখল সেটা ঠিকই আছে।

সে রাতে মোটেই ঘুমোল না কসেত্তে। সারারাত জানালার ধারে বসে জেগে কাটাল। এক সময় আবার সেই পদশব্দটা শুনতে পেল।

বদ্ধ জানালার ফুটোটার ভিতর দিয়ে সে দেখল বাগানের মধ্যে একটা লোক মোটা একটা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কসেত্তে ভয়ে চিৎকার করতে যাচ্ছিল এমন সময় এক ঝলক চাঁদের আলো লোকটির উপর পড়তেই সে দেখল তার বাবা। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল কসেত্তে। ভাবল, তার বাবা কথাটা শুনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে।

কসেন্তে রাত্রিবেলায় তার ঘরের জানালার ফুটো দিয়ে দেখল পর পর দুটো রাত ভলজাঁ জেগে বাগানে ও বাড়ির সারা উঠোনটায় পাহারা দিয়ে কাটাচ্ছে।

তৃতীয় রাত্রিতে রাত্রি প্রায় একটার সময় হঠাৎ তার বাবার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল কসেত্তের। তার বাবা উঠোন থেকে এক উচ্চ হাস্যরোলের সঙ্গে তার নাম ধরে ডাকছে। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে ড্রেসিং গাউনটা পরে জানালার ধারে গিয়ে জানালাটা খুলে দাঁড়াল। দেখল তার বাবা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাবা তাকে বলল, আমি তোমাকে ডাকছিলাম এই জন্য যে সব ঠিক আছে। ঐ ছায়াটার দিকে তাকিয়ে দেখ।

এই বলে সে পাশের বাড়ির একটা চিমনির ছায়া দেখাল যে ছায়াটা উঠোনের ঘাসের উপর পড়েছে এবং সেটা দেখতে টুপিপরা একটা লোকের মতো দেখাচ্ছে।

কসেত্তেও হাসতে লাগল। পরদিন সকালে প্রাতরাশ খাবার সময় ক'দিন আগে দেখা সেই ভূতুড়ে ছায়াটা সম্বন্ধে হাসাহাসি করতে লাগল দু'জনে। সে আর এ নিয়ে ভাবল না। সে ভেবে দেখল না সে সেদিন যখন ছায়াটা দেখে তখন চাঁদ আকাশে আজকের মতো এই একই জায়গায় ছিল কি না এবং সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলে ছায়াটা কেন সরে যায় সেখান থেকে। মোট কথা, বাগানে সেদিন কোনও অচেনা লোক বাইরে থেকে ঢুকেছিল এই ধরনের চিন্তাটা সে সরিয়ে দিল তার মন থেকে।

কিন্তু দিনকতক পর আবার একটা ঘটনা ঘটল।

৩

বাগানে রাস্তার দিকের রেলিং-এর ধারে পাথরের একটা বসার জায়গা ছিল। সেটা রাস্তা থেকে রেলিং-এর ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যেত। একদিন সন্ধ্যার সময় কসেত্তে সেখানে একা একা বসে ছিল। ভলজাঁ তখন বাড়িতে ছিল না। কোথায় বেড়াতে বেরিয়েছিল। পাথরের বেঞ্চটার পাশে একটা ঝোপ ছিল। তখন এপ্রিল মাস। কসেত্তে তখন সন্ধ্যায় তার মার কথা ভাবছিল। তার মনে হচ্ছিল তার মার প্রেতাত্মা এই বাগানের ছায়ার মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য অবস্থায় লুকিয়ে আছে।

স্নিগ্ধ শীতল বাতাস বইছিল। শিশিরভেজা ঘাসের উপর দিয়ে বাগানটায় ঘুরে ঘুরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। সে ভাবল আরও মোটা জুতো না পরলে তার ঠাণ্ডা লাগবে। তার সর্দি হবে।

এরপর আবার সেই পাথরের বেঞ্চের উপর বসল কসেত্তে। বসতে গিয়ে তার চোখ পড়ল তার সামনে একটা বড় পাথর পড়ে রয়েছে, অথচ এ পাথর কিছুক্ষণ আগেও ছিল না। পাথরটা নিশ্চয় নিজে থেকে এখানে আসেনি, কেউ সেটা বাইরে থেকে এনেছে। কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যিই ভয় পেয়ে গেল সে। পাথরটার বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই তার। কিন্তু পাথরটাকে সে ছুঁল না। সে ছুটে তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বাগানের দিকের বাড়ির দরজাটাও তার আগে বন্ধ করে দিয়ে এসেছে। সে তুসাঁকে বলল, বাবা ফিরে এসেছেন?

এখনো আসেননি ম্যাদময়জেল।

ভলজাঁ যেদিন নৈশ ভ্রমণ করতে যায় সেদিন ফিরতে রাত হয় তার।

কসেত্তে বলল, ঘরের জানালাগুলো বিশেষ করে বাগানের দিকের জানালা-দরজাগুলো ঠিকমতো বন্ধ করে দাও তো? ঠিক মতো খিলগুলো এঁটে দাও তো?

তুসাঁ বলল, অবশ্যই ম্যাদময়জেল। কসেত্তে জানত না এ কর্তব্যে কোনওদিন অবহেলা করে না তুসাঁ।

কসেত্তে বলল, জায়গাটা বড় নির্জন।

তুসাঁ বলল, কথাটা সত্যি। বিশেষ করে মঁসিয়ে যখন বাড়িতে থাকেন না তখন আমাদের খুবই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। কেউ আমাদের খুন করলেও কেউ দেখবার নেই। রাত্রিবেলায় হঠাৎ উঠে হয়ত দেখবে ঘরে একজন লোক ঢুকে আছে। তুমি চিৎকার করলে হয়ত তোমার গলা কেটে ফেলবে।

কসেত্তে বলল, তালাচাবি সব ঠিক আছে তো?

সে রাতে এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল কসেত্তে যে সে তুসাঁকে বাগানে পাথরটাকে দেখে আসতে পর্যন্ত বলল না। সারা বাড়িটার দরজা-জানালাগুলোর খিল-কপাট ঠিকমতো বন্ধ করা হয়েছে কি না তা ভাল করে দেখে নিয়ে শুতে গেল কসেত্তে। কিন্তু সে রাতে ঠিকমতো ঘুম হলো না।

পরদিন সকালে রোদ উঠতে তার মনে হলো হয়ত সেদিনের সেই পদশব্দ শোনার মতো এটাও এক ভ্রান্তি। রাত্রির ভয় দিনের আলোতে উবে গেল। তবু কিছুটা বেলার পর বাগানে গিয়ে সেই পাথরটাকে একবার দেখতে গেল কসেত্তে। পাথরটা বড়, তবু দিনের আলোতে সাহস পেয়ে পাথরটা সরাবার চেষ্টা করল সে। পাথরটা সরাতেই অর তলায় খামেভরা একটা চিঠি দেখতে পেল। খামটার উপর কোনও ঠিকানা লেখা নেই আর আঁটাও নেই। খামটা খুলে তার ভিতর ভাঁজ করা কাগজটা খুলে পড়তে লাগল কসেত্তে। আর কোনও সাধারণ কৌতূহল নয়, এবার একটা আশঙ্কা দানা বেঁধে উঠল তার মনে। কিন্তু দেখল কাগজ নয়, একটা ছোট নোটবই। সেই নোটবইটাতে বিভিন্ন দিনে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত কয়েকটি করে ছত্র রয়েছে। কিন্তু সে অনেক খুঁজেও যার লেখা তার কোনও নাম খুঁজে পেল না। কসেত্তে উজ্জ্বল আকাশটার পানে তাকাল। বাগানের অ্যাকেসিয়া ফুলগুলোকে একবার দেখল। মাথার উপর একটা বাড়ির ছাদে একদল পায়রা কূজন করছিল, কিন্তু সব কিছুর থেকে চোখ দুটো সরিয়ে এনে নোটবইটার উপর নিবদ্ধ করল সে। সে বুঝল যে-ই লিখুক এগুলো নিশ্চয় তার জন্য লেখা হয়েছে, কারণ এটা তারই জন্য তার বাগানে এনে রাখা হয়েছে। সুতরাং এগুলো অবশ্যই পড়ে দেখতে হবে।

৪

কসেত্তে পড়ে দেখতে লাগল।

সমগ্র বিশ্ব একটি আত্মার মধ্যে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং সেই আত্মা প্রসারিত হতে হতে ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত চলে গেছে—এই আত্মাই হলো প্রেম।

প্রেম হচ্ছে নক্ষত্রমণ্ডলের প্রতি দেবদূতদের অভিবাদন।

অতৃপ্ত প্রেম অন্তরকে বিষাদে কত আচ্ছন্ন করে তোলে।

যে প্রেমময় আত্মা সারা জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে আছে সে আত্মার অনুপস্থিতিতে কি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। প্রিয়তমাই ঈশ্বরে পরিণত হয় একথা কত সত্য। ঈশ্বর এই জগতের সব বস্তু আত্মার জন্যই সৃষ্টি করেছেন আর সেই আত্মা সৃষ্ট হয়েছে প্রেমের জন্য।

লিলাক ফুলে সজ্জিত টুপির নিচে মিষ্টি মুখের সামান্য একফালি হাসি আমাদের আত্মাকে স্বপ্নের এক সৌধচূড়ায় পাঠিয়ে দিতে পারে।

সব বস্তুর আড়ালে ঈশ্বর আছেন লুকিয়ে। সব জড়বস্তু কালো, মানুষ এমনই এক বস্তু যা অস্বচ্ছ—এদের কারোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। কোনও মানুষকে ভালবাসা মানেই তাকে স্বচ্ছ করে তোলা।

এমন কিছু চিন্তা আছে যা প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন আমাদের দেহ যে ভঙ্গিতেই থাক না কেন, আমাদের আত্মা যেন নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে।

বিরহী প্রেমিকরা অসংখ্য কল্পনার প্রলেপ দিয়ে তাদের বিচ্ছেদবেদনার উপশম করার চেষ্টা করে। তারা তখন পরস্পরকে চিঠি লিখতে না পারলেও তারা তাদের প্রেমাস্পদের কাছে পাখির গান, ফুলের গন্ধ, শিশুর কলহাসি, সূর্যের আলো, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, নক্ষত্রমণ্ডলের জ্যোতি—বিশ্বসৃষ্টির সকল সৌন্দর্যের উপাদান দিয়ে তাদের প্রেমের উপাসনা করে তারা। ঈশ্বরের সকল সৃষ্ট বস্তুই প্রেমের সেবা করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। সকল বস্তুকে রূপান্তরিত করার মতো শক্তি প্রেমের আছে।

হে বসন্ত, তুমিই আমার চিঠি হয়ে তার কাছে যাও।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়ে কালের যে অনন্তত্ব সে অনন্তত্বের সব ফাঁক সব শূন্যতা একমাত্র প্রেমই পূরণ করে দিতে পারে। অনন্তত্বের মতো প্রেমও অফুরন্ত।

প্রেম ও আত্মার প্রকৃতি একই। আত্মার মতোই প্রেমও এক স্বর্গীয় জ্যোতি, অনাবিল, অবিভাজ্য ও অক্ষয়। এক আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গের মতো অমর অনন্ত এই প্রেম আমাদের অন্তরে বাস করে। কোনও পার্থিব শক্তি তাকে সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত বা তার আগ্নেয় তেজকে নির্বাপিত করতে পারে না। এই প্রেমের উত্তপ্ত জ্যোতিকে আমাদের অস্থিমজ্জায় অনুভব না করে পারি না আমরা ; তার উজ্জ্বলতা মর্তলোক হতে প্রসারিত হয়ে চলে যায় সুদূর স্বর্গলোকের গভীরে।

হে আমার প্রেম, দুটি অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মিলিত উপাদানে গড়া দুটি আত্মার এক বিশুদ্ধ আবেগ, আমার উপাস্য দেবতা, তুমি কি আসবে না আমার জীবনে ? আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখকে কি সম্ভূত করে তুলবে না আমার জীবনে ? আমরা দু'জনে

নির্জনে কত বেড়াব, কত উজ্জ্বল সুখের দিন উপভোগ করব! দেবদূতের পাখা থেকে ঝরে পড়া কয়েকটি বিরল মুহূর্ত সমৃদ্ধ করে তুলবে আমাদের দু'জনের জীবনকে।

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের আনন্দকে শুধু দীর্ঘায়িত করা ছাড়া ঈশ্বর তাদের আর কোনও উপকার করতে পারেন না। প্রেম মানুষের আত্মাকে যে অবিচ্ছিন্ন সুখের নিবিড়তা দান করে তা ঈশ্বরেরও অসাধ্য। ঈশ্বর স্বর্গকে পূর্ণতা দান করেন, প্রেম পূর্ণতা দান করে মানুষের জীবনকে।

আমরা নক্ষত্রের দিকে তাকাই প্রধানত দুটো কারণে। একটা কাবণ এই যে তা কিরণ দান করে, আর একটা কারণ তা দুর্গম রহস্যময়। কিন্তু আমাদের পাশে যে নারীকে পাই তার জ্যোতি নক্ষত্রের জ্যোতির থেকে কম হলেও তার রহস্যময়তা আরও বেশি।

বাতাস না হলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাই আমরা। কিন্তু প্রেমের অভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে আমাদের আত্মা।

প্রেম যখন দুটি ভিন্ন জীবনের ধাতুকে বিগলিত ও বিমিশ্রিত করে এক সুমহান ঐক্যবোধে উন্নীত করে, একমাত্র তখনি জীবনের আসল রহস্যটি ধরা পড়ে। প্রেম হচ্ছে একই ভাগ্যের দ্বারা চালিত দুটি জীবনের এক মিলিত সত্তা, একই আত্মার দুটি পাখা। প্রেম মানেই আত্মার পাখায় ভর দিয়ে আকাশ পরিক্রমা করে বেড়ানো।

যেদিনই কোনও নারী তোমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার চোখের আলো অথবা মুখের হাসি দান করবে তোমাকে সেদিনই নিজেকে হারিয়ে ফেলবে তুমি, তুমি প্রেমে পড়ে যাবে তার। তোমার সমস্ত চিন্তাশক্তিকে তোমার প্রেমাস্পদের উপর এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করবে যে সে তোমার কথা ভাবতে বাধ্য হবে।

প্রেম যা শুরু করে, একমাত্র ঈশ্বরই তা সম্পন্ন করতে পারেন।

কোনও একটি হারানো দস্তানা বা রুমাল পেয়ে প্রেমিকা হতাশায় ডুবে যেতে পারে অথবা আবেগের তরঙ্গদোলায় দুলতে পারে। তবে প্রেমের অনন্তত্বের জন্য চাই অন্তহীন দুর্মর আশা। প্রেম অণু থেকেও ক্ষুদ্রতর ও মহৎ হতে মহত্তর দুটি উপাদানে গড়া।

যদি পাথর হও তো চুম্বনের মতো আকর্ষণশক্তিসম্পন্ন হও, যদি গাছপালা হও তাহলে প্রাণচঞ্চলতায় ফেটে পড়; আর যদি মানুয হও তাহলে প্রেমময় হয়ে ওঠ।

প্রেম কখনো তৃপ্ত হয় না। প্রেমিকরা সুখ পেলে চায় স্বর্গোদ্যান আর স্বর্গলাভ করলে চায় ঈশ্বর।

প্রেমের মধ্যেই আছে সব কিছু। প্রেমের মধ্যেই আছে স্বর্গের সুখ। মর্ত্যের দুঃখ আর অনাবিল দেহতৃপ্তির আবেগ।

'সে কি এখনো লুক্সেমবুর্গ বাগানে বেড়াতে যায়?'...'না মঁসিয়ে'...'এই গীর্জায় কি সে উপাসনা করতে আসে?'...'সে এখানে আর আসে না'...'সে কি বাড়িতে থাকে?'...'না, সে অন্যত্র চলে গেছে'...'কোথায় গেছে তারা?'...'তা তো বলে যায়নি।'

নিজেরই আত্মার ঠিকানা না জানাটা কত দুঃখের।

প্রেমের কিছু শিশুসুলভ দিক আছে। অন্য সব আবেগের কতকগুলো ক্ষুদ্রতা বা নীচতা আছে। যে আবেগ আমাদের ক্ষুদ্র করে তোলে তা লজ্জার বস্তু ; তাকে আমরা ধিক্কার দিই ; কিন্তু যে প্রেম আমাদের শিশুর মতো সরল করে তোলে তাকে জানাই শ্রদ্ধা।

একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটে গেছে, তুমি সেটা জান কি? আমি অন্ধকারে ডুবে আছি। একজন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবার সময় আমার জীবনের সূর্যটা নিয়ে গেছে।

হায়, এক সমাধিগর্ভের ভিতরে দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে থাকাটাই আমার কাছে অনন্তত্ব। জানি, প্রেমের জন্য কষ্ট পাচ্ছ তুমি, তবু ভালবেসে যাও। প্রেমের জন্য মৃত্যুবরণ করা মানেই অমর হয়ে থাকা।

প্রেম ! আলো আর অন্ধকারের মিশ্রিত উপাদানে গড়া জীবনের এক অদ্ভুত রূপান্তর। যা বেদনার মাঝেও এনে দেয় আনন্দের এক গভীর আবেগ।

পাখিরা কত সুখী! তাদের বাসা আছে বলেই কণ্ঠে গান আছে তাদের।

প্রেম হচ্ছে স্বর্গ থেকে বয়ে আনা এক মুক্ত বাতাস।

জীবন মানেই ভাগ্যনির্দিষ্ট এক অজানিত পরিণতির পথে শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এগিয়ে চলা। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন সে জীবনের সব কিছুর মধ্যে অনন্ত বা অসীমকে দেখে ; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব অনন্ত শান্ত হয়ে যায়। শেষ বা সীমা বলে যদি কিছু থাকে তাহলে মানুষ তা একমাত্র মৃত্যুতেই দেখতে পারে। ভালবেসে দুঃখ বরণ করে যাও। আশা ত্যাগ করো না কখনো। যারা শুধু দেহকে ভালবাসে, রূপ আর চেহারাকে ভালবাসে, মৃত্যু এসে সে সব কেড়ে নেয় তাদের কাছ থেকে। তাই আত্মাকে ভালবেসে যাও তুমি যা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না কোনওদিন।

আমি পথে একজন গরীব কপর্দকহীন প্রেমিককে দেখলাম। তার টুপিটা পুরনো, জামা জীর্ণ। তার জুতোর ভিতরে কাদা ঢুকছে, কিন্তু পবিত্র নক্ষত্রলোকে পরিপ্লাবিত হচ্ছে তার আত্মা।

ভালবাসা পাওয়াটা আশ্চর্যের ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু ভালবাসতে পারাটা মহত্তর ব্যাপার। ভালবাসার আবেগই মানুষকে প্রকৃত বীরত্ব দান করতে পারে। প্রেমাবেগসমৃদ্ধ কোনও আত্মাই যা কিছু অপবিত্র ও ক্ষুদ্র তাকে প্রত্যাখ্যান করে ত্যাগ করে যা কিছু পবিত্র ও মহান তাকে বরণ করে নিতে পারে। কোনও হীন অশুভ চিন্তা তখন তার মনে বাসা বাঁধতে পারে না, হিমবাহের মধ্যে যেমন কোনও কাঁটাগাছ জন্মাতে পারে না। চিরপ্রশান্ত যে মহান আত্মা পৃথিবীর যত সব দুঃখবেদনার আবেগানুভূতি, ঘৃণা, মিথ্যাচার, অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে অরণ্যচ্ছায়ার প্রান্তভাগ ছাড়িয়ে মেঘমালার সীমা অতিক্রম করে সুদূর আকাশমণ্ডলের গভীরে বিরাজ করে সে আত্মা কখনো মর্ত্যলোকের ভাগ্যচক্রের লীলাচঞ্চলতাকে অনুভব করতে পারে না, যেমন কোনও পর্বতশৃঙ্গ ভূমিকম্পকে অনুভব করতে পারে না।

যে কখনো সূর্যকে ভালবাসেনি, কখনো কোনওভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে না তার জীবন।

৫

চিঠিটা ক্রমশই ভাবিয়ে তুলতে লাগল কসেত্তেকে। চিঠিটা পড়া তার শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অশ্বারোহী অফিসার ঘোড়ায় চড়ে বাগানের গেটটার পাশ দিয়ে চলে গেল। রোজ এই সময়েই সে যায়। আজ তাকে দেখে ঘৃণায় নাকটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল তার।

নোটবই-এর পাতাগুলো নেড়েচেড়ে দেখল কসেত্তে। হাতের লেখাটা বেশ ভাল। তবে কালিটা বিভিন্ন পাতায় বিভিন্ন রকমের দেখা যাচ্ছে—কোথাও ঘন কালো, কোথাও কালিটা পাতলা। সব কিছু পড়ে তার মনে হলো যে এসব লিখেছে সে ভাবনা-চিন্তা করে সাজিয়ে-গুছিয়ে কিছু লেখেনি, মন থেকে ঝরে পড়া এলোমেলো চিন্তাগুলো আবেগের সঙ্গে লিখে ফেলেছে সে। এ ধরনের পাণ্ডুলিপি জীবনে এব আগে কখনো পড়েনি কসেত্তে। প্রতিটি ছত্রই এক অপূর্ব ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে তার চোখের সামনে ভাসছিল। সেই দুর্বোধ্য লেখাগুলিব সব অর্থ সে বুঝতে না পারলেও সে লেখা এক নতুন চেতনা, এক নতুন উপলব্ধি এনে দিচ্ছিল তার অন্তরে। সে কনভেন্টে ছাত্রী থাকাকালে তার শিক্ষিকারা আত্মা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছে; কিন্তু তারা কখনো পার্থিব প্রেম-ভালবাসার কথা বলেনি। এ যেন আগুনে কয়লা ফেলার হাতাটার কথা না বলে আগুনের কথা বলা। এই পনের পাতার লেখাটা আলোকিত এক নতুন জগতের পথ খুলে দিল যেন। প্রেমের স্বরূপ ও দুঃখবেদনা, জীবন, ভাগ্য, অনন্ত, আদি, অন্ত—এই সব কিছুর অর্থ নতুন করে তলিয়ে দেখতে লাগল সে। এই লেখাগুলোর অন্তরালে লেখককে যেন দেখতে পাচ্ছে। তার আবেগপ্রবণ, উদার, সরল প্রকৃতি, তার বিরাট দুঃখ এবং বিরাট আশা প্রতিটি ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তার বন্দী অন্তরের মাঝে এক গভীর আবেগ ঢেউ খেলে খেলে যাচ্ছে। এই পাণ্ডুলিপিটা চিঠি ছাড়া আর কি? অথচ কোনও নাম-ঠিকানা নেই, তারিখ বা স্বাক্ষর নেই। চিঠিটা জরুরি, কিন্তু কোনও দাবি নেই। অথচ, এর প্রতিটি কথা সত্য; সত্যের উপাদানে রচিত রহস্যময় এক ধাঁধা। পাখাওয়ালা কোনও দেবদূতের দেওয়া যেন এক অভ্রান্ত প্রেমের নিদর্শন যা কোনও কুমারী পড়বে। এতে মিলনের সংকেত আছে, কিন্তু সারা পৃথিবীর মধ্যে সে মিলনের কোনও স্থানের নির্দেশ নেই। কোনও এক প্রেতের হাতে লেখা এক ভূতুড়ে চিঠি যা কোনও কাল্পনিক এক কুমারীর উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। এক শান্ত অথচ আবেগপ্রবণ এক অচেনা ব্যক্তি মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে তার প্রিয়তমার কাছে মানুষের ভাগ্যনির্দিষ্ট পরিণতি এবং জীবন ও প্রেমের এক রহস্যকে তুলে ধরেছে। সে যেন এক পা সমাধির মধ্যে রেখে একটা আঙুল আকাশের পানে তুলে ধরে এই চিঠি লিখেছে। কাগজের উপর যে ছত্রগুলি লেখা হয়েছে তা যেন আত্মা থেকে কতকগুলি বৃষ্টিফোঁটার মতো ঝরে পড়েছে।

কিন্তু এ চিঠি কোথা থেকে এসেছে? এর লেখক কে? এ চিঠি নিশ্চয় কোনও পুরুষের কাছ থেকে এসেছে। এ চিঠি পড়তে পড়তে যেন কসেত্তের চোখে দিনের উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠল। তার সব দুঃখ দূর হয়ে গেল। এক অনির্বচনীয় আনন্দ আর বেদনার ঢেউ খেলে যেতে লাগল তার অন্তরে। এ হলো সেই যুবক, যে এখানে এসেছিল। ঝোপের ধারে তার হাতটা এগিয়ে এসেছে। কসেত্তে যখন তাকে ভুলে গিয়েছিল, তখন সে তাকে খুঁজে বার করেছে। কিন্তু সে কি সত্যি সত্যিই ভুলে গিয়েছিল তাকে? কখনই না। সে যে ভুলে গেছে এই কথাটা ক্ষণিকের জন্যও পাগলের মতো বিশ্বাস করেছিল। সে তাকে প্রথম থেকেই ভালবেসে এসেছে। তার প্রেমের আগুনটা স্তিমিত হতে হতে নিভে গিয়েছিল হয়ত। কিন্তু এখন বুঝল সে আগুন নিভে যায়নি একেবারে, বরং সে আগুন তার অন্তরের গভীরে আরও প্রবলভাবে জ্বলে এসেছে এবং সে আগুন আজ এই মুহূর্তে আবার বাইরে ফেটে পড়েছে। সে আগুনের শিখায় তার সমগ্র সত্তা আলোকিত হয়ে উঠেছে। অপর একটি আত্মা থেকে একটি জ্বলন্ত দেয়াশলাইয়ের কাঠি অকস্মাৎ যেন তার আত্মার মধ্যে এসে পড়ে। তাতে তার সেই আপাত নির্বাপিত আগুনটা জ্বলে ওঠে। নোটবইয়ে লেখা শব্দগুলোর দিকে তাকিয়ে কসেত্তে মনে মনে বলে উঠল, আমি তাকে কত ভাল করে চিনি, এই সব কথা আমি আগেই তার চোখের দৃষ্টিতে পড়েছি।

পর পর তিনবার চিঠিটা পড়া শেষ হতেই কসেত্তে পাথরের উপর কার জুতোর শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল লেফটন্যান্ট থিওদুল গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাকে দেখে কসেত্তের মনে হলো লোকটা মোটা, দেখতে খারাপ, বেযাদব, আর ঘৃণ্য। তাকে কোনও একটা কিছু ছুঁড়ে মারার ইচ্ছা হলো তার।

বাগান থেকে তখনি বাড়ির ভিতরে চলে এল কসেত্তে। শোবার ঘরে ঢুকে নোটবইটা আবার পড়ল সে। সেটা যেন মুখস্থ করে ফেলল। তার কথা ভাবতে লাগল। অবশেষে সে নোটবইটা চুম্বন করে তার পোশাকের ভিতর বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখল। সব কিছু স্থির করে ফেলল সে। সে আবার অতৃপ্ত প্রেমের এক গভীরতর আবেগের গভীরে ডুবে গেল। স্বর্গীয় সুখের এক অন্তহীন দিগন্ত আবার উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল তার সামনে।

সেদিন থেকে দিনরাত কি ভাবতে লাগল কসেত্তে। কিন্তু কিছুই চিন্তা করত না, শুধু অজস্র কল্পনা ভিড় করে আসতে লাগল তার মনে। স্পষ্ট করে কিছুই অনুমান করতে পারত না সে, এক অস্পষ্ট ও কম্পমান আশার অস্থির আলোয় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত সে। কোনও বিষয়েই সে নিশ্চিত হতে পারত না। কোনও কিছু এক দৃঢ় প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সরিয়ে দিতেও পারত না মন থেকে। এক ম্লানিমা ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মুখে আর এক মৃদু কম্পন খেলে যেতে লাগল তার সারা দেহে। এক একসময় সে যেন স্বপ্ন দেখত জেগে জেগে এবং মনে মনে বলত, এটা কি সত্যি? তখন সে তার পোশাকের তলায় নোটবইটা তার বুকের উপর চেপে ধরে তার স্পর্শ অনুভব করত। জাঁ ভলজাঁ যদি তখন তার চোখ-মুখের পানে একবার

তাকাত তাহলে তা দেখে ভয়ে কেঁপে উঠত সে। সে ভাবত, হ্যাঁ, সে ই, এ চিঠি এসেছে তার কাছ থেকে। সে আরও ভাবত নিশ্চয় কোনও দেবদূত বা স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক সুযোগের মধ্যস্থতাই তাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে তার কাছে।

৬

সেদিন সন্ধ্যায় ভলজাঁ বেরিয়ে গেল বাইরে এবং কসেত্তে তার পোশাক পাল্টে সাজতে লাগল। সে যুবতী মেয়েদের এমন একটা গাউন পবল যা পরলে ঘাড আর বুকের কাছটা দেখা যায়। কেন সে এই সাজসজ্জা করছে তা সে নিজেই জানে না। সে কি কোনও অতিথির প্রতীক্ষায় আছে? না।

সন্ধ্যা হয়ে আসতেই সে বাগানে চলে গেল। তুসাঁ তখন বাড়ির পিছন দিকে রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিল। বাগানের নিচু ডালগুলোকে সরিয়ে সেই পাথরের বেঞ্চটায় গিয়ে বসল। দেখল সেই বড় পাথরটা তখনো পড়ে রয়েছে। সে যেন কৃতজ্ঞতার এক নিবিড় আবেগে হাত বুলোতে লাগল পাথরটায়। সহসা সে যেন পিছনে কার পদশব্দ শুনতে পেল। সে পিছন ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠল।

হ্যাঁ, সেই যুবক। তার মাথায় টুপি ছিল না। তার মুখখানা ম্লান এবং চেহারাটা রোগা রোগা দেখাচ্ছিল। তার কালো পোশাকটা অন্ধকারে দেখাই যাচ্ছিল না। তার চোখের দৃষ্টিটাও আচ্ছন্ন ছিল গাছের ছায়াতে। তার অতুলনীয় মুখসৌন্দর্যের অন্তরালে মৃত্যুর ছায়া, তার পলায়মান আত্মার ছায়া উঁকি মারছিল যা দেখে মনে হচ্ছিল সে কোনও প্রেতমূর্তি না হলেও সে যেন কোনও জীবন্ত মানুষ নয়। সে তার টুপিটা ঝোপের ধারে ফেলে দিয়েছিল।

মূর্ছিতপ্রায় কসেত্তে কোনও কথা বলতে পারল না। সে ধীর পায়ে যুবকের দিকে এগিয়ে গেল। তার চোখ-মুখ সে ঠিক দেখতে না পেলেও সে চোখে বিষাদের সঙ্গে এক ধরনের উত্তপ্ত আবেগ ফুটে ছিল।

কসেত্তে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে না দাঁড়ালে পড়ে যেত।

এরপর যুবকটি কথা বলতে শুরু করল। তার কণ্ঠস্বর এত মৃদু ছিল যে গাছপালার মর্মরধ্বনিকে ছাপিয়ে উঠতে পারল না তা। যুবক বলতে লাগল, এখানে আসার জন্য আমাকে ক্ষমা করবে। আমার মনে বড কষ্ট, আমি আর থাকতে পারলাম না, তাই না এসে পারলাম না। আমি বেঞ্চের নিচে যে চিঠিটা দিয়ে গিয়েছিলাম সেটা পড়েছ? তুমি হয়ত আমাকে চিনতে পেরেছ? তুমি ভয় পেও না। অনেক দিন আগের কথা হলেও তোমার হয়ত মনে আছে, তুমি লুক্সেমবুর্গের বাগানে আমার দিকে তাকিয়েছিলে। আর একদিন তুমি আমার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিলে। ঘটনা দুটো ঘটেছিল প্রায় এক বছর আগে ১৬ই জুন আর ২রা জুলাই তারিখে। তারপর আর দেখা পাইনি তোমার। তুমি রুা দ্য লোয়েস্তের বাড়িতে কিছুদিন ছিলে। আমি তা লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু পরে সেখান থেকে চলে যাও। একদিন ওদিনের খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তোমার মতো টুপিপরা একটি মেয়েকে দেখে তার পিছু পিছু

ছুটেছিলাম, কিন্তু পরে দেখলাম তুমি নও। অবশেষে আমি এই রাত্রিকালেই তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু ভাবনার কোনও কারণ নেই, কেউ আমাকে দেখেনি। আমি প্রায়ই এসে সন্ধের সময় তোমার জানালার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি এখানে নিঃশব্দে পদচারণা করি যাতে তোমার কোনও অসুবিধা না হয়। একদিন সন্ধেবেলায় আমি তোমার পিছনেই ছিলাম। কিন্তু তুমি ঘুরে দাঁড়াতেই আমি লুকিয়ে পড়ি। একদিন তোমার গান শুনে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। জানালা দিয়ে ভেসে আসা তোমার গান শুনলে কি তোমার কোনও ক্ষতি হয়? আমার কাছে তুমি এক দেবদূত। তুমি আমাকে মাঝে মাঝে আসতে দেবে এখানে। আমি মরতে বসেছি। তুমি যদি জানতে কত ভালবাসি তোমায়! এত কথা বলার জন্য আমাকে ক্ষমা করবে তুমি। জানি না কি বলছি, হয়ত তোমাকে আমি বিরক্ত করে তুলছি।

'ওমা!' এই বলে প্রায় মূর্ছিত হয়ে সেখানেই বসে পড়ল কসেত্তে।

কিন্তু সে বসার আগেই যুবকটি তাকে ধরে ফেলল। তাকে নিবিড়ভাবে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

কসেত্তেকে জড়িয়ে ধরে থাকার সময় যুবকটি কাঁপছিল। তার মনে হচ্ছিল কুয়াশাভরা তার মাথাটার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার মনে হলো সে একই সঙ্গে এক ধর্মীয় কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে অধর্মাচরণ করছে। তবে যে সুন্দরী তরুণীর দেহটি তার নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা আছে তার জন্য কোনও দেহগত কামনা অনুভব করছিল না সে।

কসেত্তে যুবকটির একটা হাত টেনে নিয়ে তার বুকের উপর চাপিয়ে রাখল। যুবকটি তার পোশাকের মধ্যে নোটবইটার অস্তিত্ব বুঝতে পেরে বলল, তাহলে কি তুমি আমাকে ভালবাস?

কসেত্তে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, অবশ্যই, তুমি তা জান।

তার কণ্ঠটা এত ক্ষীণ ছিল যে তা শোনাই যাচ্ছিল না। কথাটা বলেই সে তার মাথাটা যুবকের বুকের মধ্যে গুঁজে দিল। যুবকটিকে তখন বিজয়ী বীরের মতো মনে হচ্ছিল।

যুবকটি তখন বেঞ্চটার উপর বসল। কসেত্তে তার পাশে বসল। কেউ কোনও কথা বলল না। আকাশে তারা ফুটে উঠছিল একটা-দুটো করে। তাদের ঠোঁট দুটো একসময় মিলিত হলো। কেমন করে এই চুম্বনকার্য সমাধা হলো তা জানে না তারা। যেমন করে পাখিরা গান গায়, বরফ গলে যায়, গোলাপের পাপড়িগুলো একে একে খুলে যায়, যেমন করে পাহাড়ের চূড়ায় অন্ধকার গাছপালার আড়ালে দুধের মতো সাদা ভোরের আলো ফুটে ওঠে, তেমনি নিঃশব্দে এক অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই যেন তাদের ঠোঁট দুটি চুম্বনে নিবিড় হয়ে ওঠে।

দু'জনেই যেন কাঁপছিল। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছিল। শৈত্যনিবিড় রাত্রি আর বেঞ্চটার কনকনে ঠাণ্ডা, শিশিরভেজা ঘাস আর মাটির স্যাঁতসেঁতে ভাব,—কোনও কিছুরই খেয়াল ছিল না তাদের। তারা দু'জনে দু'জনের হাত ধরে দু'জনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

যুবকটি বাগানে কি করে এল সেকথা জিজ্ঞাসা করেনি কসেত্তে। তার মনে হলো এটা যেন খুবই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। মাঝে মাঝে তাদের হাঁটু দুটো ঠেকে যাচ্ছিল আর তাদের দেহ দুটো কেঁপে উঠছিল। এবার কসেত্তে কি বলতে গেল আমতা আমতা করে। তার ঠোঁট দুটো আর গলার স্বরটা কাঁপছিল, যেন ফুলের পাপড়ির উপর বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল।

শান্ত ও নক্ষত্রখচিত রাত্রি বেড়ে উঠছিল তাদের মাথার উপর। অশরীরী আত্মার মতো তারা নিজেদের সব কথা, তাদের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা ও ব্যর্থতার কথা বলল। তাদের দু'জনের মধ্যে দেখা না হলেও দূরে থেকে হতাশার মাঝেও কিভাবে পরস্পরকে ভালবেসে এসেছে সেকথাও বলল। তাদের যৌবন ও প্রেমের উত্তাপে বিগলিত হয়ে সরল বিশ্বাসে তাদের অন্তরের সব গোপন কথা বলল একে একে। এক ঘণ্টার মধ্যেই তারা যেন তাদের অন্তর বিনিময় করল নিজেদের মধ্যে। একে অন্যের আত্মায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

তাদের সব কথা বলা হয়ে গেলে কসেত্তে যুবকটির কাঁধের উপর মাথাটা রেখে বলল, তোমার নাম কি?

– আমার নাম মেরিয়াস। তোমার নাম?

কসেত্তে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

১৮২৩ সালের পর থেকে যখন মঁতফারমেলে থেনার্দিয়েরদের হোটেলটার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে, যখন তারা ছোটখাটো অনেক দেনায় ডুবে যায় তখন তাদের পর পর দুটি পুত্রসন্তান হয়। এই নিয়ে তাদের মোট সন্তানসংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ অর্থাৎ দুটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে। এতগুলি ছেলের ব্যয়ভার বহন করা সত্যিই তাদের পক্ষে কঠিন। মাদাম থেনার্দিয়ের তাই অদ্ভুতভাবে তার শেষ দুটি পুত্রসন্তানের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেল।

'অব্যাহতি পেল' কথাটা এইজন্য বলা হলো যে মাদাম থেনার্দিয়ের ছিল এমনই একজন নারী—যার স্নেহ-মমতার ভাণ্ডারটা খুবই সীমিত। মাদাম থেনার্দিয়ের শুধু তার মেয়েদের ভালবাসত। মেয়েদের অতিক্রম করে তার মাতৃস্নেহ আর বেশি দূরে প্রসারিত হতে পারত না। সমগ্র পুরুষজাতির ঘৃণাটা শুরু হয় তার পুত্র-সন্তানদের কেন্দ্র করে।

লা ম্যাগনঁন নামে যে মেয়েটির নাম উল্লেখ করেছি, সে আগে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত এবং সে পর পর দুটি বছরের মধ্যে দুটি পুত্রসন্তান প্রসব করে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের কাছে পাঠিয়ে দেয় তার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আমরা এটাও জানি যে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ ছেলে দুটিকে ম্যাগননের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের ভরণপোষণের জন্য প্রতি মাসে এক একটি ছেলের জন্য আশি

ফ্রাঁ করে দেবার ব্যবস্থা করেন। ম্যাগনন তখন কোয়ে দে সেলেস্তিনে অঞ্চলে নদীর ধারে একটা বাড়িতে বাস করতে থাকে। একবার মহামারীতে দুটি ছেলেই একদিনে মারা যায়। ফলে দারুণ বিপদে পড়ে ম্যাগনন। ছেলে দুটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমাসে একশো ষাট ফ্রাঁ তার বন্ধ হয়ে যাবে। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ ছ' মাস অন্তর একবার করে এসে দেখে যান ছেলে দুটিকে। তখন লা ম্যাগনন যে অঞ্চলে থাকত, থেনার্দিয়েররাও সেই অঞ্চলে থাকত। ম্যাগননের দুটি ছেলে দরকার। থেনার্দিয়েবদেব আছে দুটি অবাঞ্ছিত ছেলে—ম্যাগননের ছেলে দুটি যে বয়সের ছিল সেই একই বযসের। থেনার্দিযেরবা তাদের শেষ সন্তান দুটিকে ম্যাগননকে দিযে দিতে বাজী হযে গেল। তার জন্য শুধু প্রতিটি ছেলে পিছু মাসে দশ ফ্রাঁ করে ভাড়া চাইল। ম্যাগননও তাতে রাজী হযে গেল। তাতে তার কোনও লোকসান নেই। কারণ ঐ ছেলে দেখিযেই সে গিলেনর্মাদের কাছ থেকে আগের মতোই টাকা পেযে যেতে লাগল। গিলেনর্মাদ ছেলে দুটিকে দেখে কিছু বুঝতেই পারলেন না। সন্দেহ করার মতো কিছু খুঁজে পেলেন না। এরপর লা ম্যাগনন রু্য দ্য ক্লোশেপার্সে অঞ্চলে চলে যায় নতুন বাসা নিযে।

যতই হোক, মা হিসাবে ছেলে দুটোকে ম্যাগননের হাতে তুলে দেবাব পব থেনার্দিযেরপত্নী একটু মৃদু আপত্তি তুলেছিল। বলেছিল, এভাবে নিজেদের সন্তানকে ত্যাগ করা উচিত হবে না।

থেনার্দিযের তখন গম্ভীরভাবে বলেছিল, জাঁ জ্যাক রুশো এর থেকেও খারাপ জিনিস করেছিলেন।

তার স্ত্রী তখন বলেছিল, কিন্তু যদি মনে করো পুলিশ টের পায়? এটা তো অবৈধ কাজ।

থেনার্দিযেব তখন বলেছিল, গরীবদেব ছেলেমেযেদের কে খবর রাখে? কে বলছে পুলিশদেব? আমি যা করেছি ঠিক করেছি।

লা ম্যাগনন তখন ক্লোশেপার্সে অঞ্চলে একজন ইংরেজ মহিলার সঙ্গে যৌথভাবে একটা ঘর ভাড়া নিযে থাকত। ভাল সাজপোশাক পরত। চোর হিসাবে বদনাম ছিল সেই ইংরেজ মহিলার।

থেনার্দিযেবদেব ছেলে দুটি কিন্তু ম্যাগননের কাছে ভালভাবেই মানুষ হতে লাগল। ম্যাগনন তাদেব ভাল খাওযা-পরার কোনও অভাব রাখত না। খাওযা-পরার এমন সচ্ছলতা তারা তাদের বাবা-মার কাছে কখনই পেত না। তারা যখন বাড়ি থেকে চলে আসে তাদের ভাইবোনেরা তখন কিছু মনে করেনি। বড় বোন এপোনিনে বা বড় ভাই গাভ্রোশে কোনও প্রতিবাদ করেনি তাদের বাবা-মার কাছে। উৎকট দারিদ্র্য তাদের মনগুলোকে এমন ভযঙ্করভাবে উদাসীন করে তোলে যে তারা কেউ কারো খবর রাখত না।

কিন্তু গর্বোর বাড়িতে থেনার্দিয়েররা যখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তখন প্যারিস পুলিশ শহরতলীর অন্য সব বস্তি অঞ্চলে ব্যাপক খানাতল্লাশি করে কুখ্যাত চোর,

দাগী গুণ্ডাদের সব ধরপাকড় করে। তখন লা ম্যাগনন ও তার বাসার সেই ইংরেজ মহিলাটিও গ্রেপ্তার হয়। ম্যাগননের আশ্রিত সেই ছেলে দুটি তখন রাস্তায় খেলা করে বেড়াচ্ছিল। তারা হঠাৎ বাসায় ফিরে এসে দেখে ঘর বন্ধ। পাড়ার একজন তাদের হাতে একটা ঠিকানা লেখা একটুকরো কাগজ দিয়ে বলে এই ঠিকানাটা নিয়ে র‍্যু দ্য সিসিলেত্তে যাও।

সেখানে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের ভূসম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য একজন লোক থাকত। এই লোকের মারফৎ লা ম্যাগননকে টাকা পাঠাতেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। জোর বাতাস বইছিল। বড় ছেলেটি কাগজের টুকরোটা হাতে শক্ত করে ধরে থাকলেও একসময় মুঠোটা একটু আলগা হতেই কাগজটা হাওয়ায় উড়ে যায়। অন্ধকারে তারা আর খুঁজে পেল না কাগজটা। ফলে নিরাশ্রয় ও সহায়সম্বলহীন হয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগল ছেলে দুটি।

২

প্যারিসে বসন্তকালে মাঝে মাঝে এক একদিন জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে। ক্রমে সে হাওয়া ঝড়ের রূপ নিয়ে বসন্তের সব উল্লাসকে মাটি করে দেয়। একেবারে জমিয়ে না দিলেও কনকনে ঠাণ্ডায় হাড় কাঁপিয়ে দেয়। কেউ কোনও ঘরের দরজা-জানালা খুলে রাখতে পারে না।

এই ধরনের এক ঝড়ের আঘাতে জর্জরিত এক সন্ধ্যায় থেনার্দিয়েরদের বড় ছেলে গাভ্রোশে একটা শাল গায়ে জড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে একটা চুলকাটার সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। শীতে কাঁপতে থাকলেও হাসি-খুশির ভাবটা ঠিক মুখে ছিল তার। মেয়েদের একটা শাল কোথা থেকে কোনওরকমে যোগাড় করে শীতের প্রকোপটা কাটাতে থাকে সে।

উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল গাভ্রোশে গাউনপরা একটি মেয়ের চুল কাটা দেখছিল। কিন্তু তার নজর ছিল সামনে রাখা দুটো সাবানের উপর। সে শুধু ভাবছিল দুটো কি একটা সাবান তুলে নিয়ে গিয়ে শহরের অন্য প্রান্তের কোনও নাপিতকে বিক্রি করে কিছু পয়সা পাবে। এই ভাবে সাবান চুরি করে সেই পয়সায় সে রাতের খাওয়া সেরেছে। এ ব্যাপারে তার একটা কৌশলগত প্রতিভা আছে এবং সে নিজে গর্বের সঙ্গে বলত কাঁচির উপর কাঁচি চালাতে সে ওস্তাদ।

তার নজর যখন সাবানের উপর ছিল এবং সে চুরির কথা ভাবছিল, তখন আপন মনে বলছিল, 'মঙ্গলবার, আজ কি মঙ্গলবার?' তার মানে আজ শুক্রবার, তার মানে মঙ্গলবারের পর থেকে খাওয়া হয়নি তার।

কিন্তু সেলুনের নাপিত চুল ছাঁটার কাজ করতে করতে সাবানের উপর আর চোর ছেলেটার উপর কড়া-নজর রাখছিল। এদিকে গাভ্রোশে যখন সাবান দুটোর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ছিল, ভাল পোশাকপরা দুটো ছেলে দোকানে ঢুকে কি বলতে লাগল। তাদের মধ্যে ছোট ছেলেটি বিপন্নভাবে কাঁদতে থাকায় তার কথা বোঝা

যাচ্ছিল না এবং বড় ছেলেটির দাঁতগুলো শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকায় তারও কথা বোঝা যাচ্ছিল না। দোকানের মালিক ছেলে দুটিকে দোকান থেকে তাড়িয়ে দিল।

ছেলে দুটি বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল। গাভ্রোশে তাদের পিছু পিছু গিয়ে বলল, কি হয়েছে তোমাদের?

বড় ছেলেটি বলল, আমাদের শোবার কোনও জায়গা নেই।

গাভ্রোশে বলল, এই কথা! এজন্য কাঁদবার কোনও দরকার নেই। আমার সঙ্গে এস।

ছেলে দুটি গাভ্রোশের কথাটা মেনে নিল। সে যেন তাদের চোখে একজন মহামান্য আর্কবিশপ। তারা কান্না থামিয়ে তার অনুসরণ করতে লাগল। গাভ্রোশে তাদের সঙ্গে নিয়ে র‍্যু সেন্ট আঁতোনে হয়ে বাস্তিলের দিকে যেতে লাগল। কিন্তু যাবার সময় এক একবার পিছন ফিরে দোকানটার দিকে তাকাচ্ছিল।

পথে যেতে যেতে গাভ্রোশে দেখল একটি মেয়ে ঝাঁটা হাতে কোথায় যাচ্ছে। সে বলল, মাদাম, তুমি কি এই ঝাঁটাটা নিয়ে পালাচ্ছ?

এমন সময় পাশ দিয়ে যেতে থাকা চকচকে জুতোপরা একটি লোকের জুতোতে জল ছিটিয়ে দিল।

লোকটি চিৎকার করে বলল, শয়তান ছেলে কোথাকার!

গাভ্রোশে শাল থেকে মুখটা বার করে বলল, মঁসিয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করছেন?

লোকটি বলল, হ্যাঁ, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি।

গাভ্রোশে বলল, দুঃখিত। আজ কোনও অভিযোগ করে ফল হবে না, কারণ অফিস বন্ধ হয়ে গেছে।

আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে গাভ্রোশে দেখল পথের ধারে একটি দরজার সামনে একটি ভিখারিণী মেয়ে শীতে কাঁপছে। তার স্কার্টটা এত ছোট যে তার হাঁটু দুটো বেরিয়ে ছিল। সে পথ হাঁটতে পারছিল না।

গাভ্রোশে মেয়েটির কাছে গিয়ে তার গা থেকে শালটা খুলে তাকে দিয়ে বলল, এই নাও।

এবার তার মাফলারটাই গলায় জড়ানো থাকল। আর কোনও শীতবস্ত্র রইল না।

মেয়েটি গাভ্রোশেব দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। চরম দারিদ্র্যের সময়ে মানুষ যেমন তার ভাগ্যের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করতে পারে না, তেমনি তার উপকারীকে কোনও ধন্যবাদ দিতে পারে না।

এমন সময় বৃষ্টি নামল। গাভ্রোশে আক্ষেপ করে বলতে লাগল, বারে! আবার বৃষ্টি পড়ছে। কালো আকাশটা ভাল কাজের জন্য আমাকে এইভাবে শাস্তি দিচ্ছে। এভাবে বৃষ্টি পড়লে আমাকে তো শালটা আবার ফিরিয়ে নিতে হবে।

কিন্তু দেখল মেয়েটি শালটা তখন শীতে কাতর হয়ে গায়ের উপর জড়িয়ে ধরল।

ছেলে দুটোকে নিয়ে আবার এগিয়ে যেতে লাগল গাভ্রোশে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা লোহার রড দিয়ে ঘেরা জানালাওয়ালা একটি ঘরের সামনে এসে পড়ল। গাভ্রোশে বুঝল ওটা একটা রুটির দোকান।

গাভ্রোশে ছেলে দুটিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের খাওয়া হয়েছে?

আজ সকাল থেকে আমরা কিছু খাইনি।

তোমাদের বাবা-মা নেই?

আমাদের বাবা-মা আছে, কিন্তু কোথায় আছে তা জানি না। তাদের খুঁজে পাইনি।

গাভ্রোশে বলল, কুকুররাও অনেক কিছু পায়। তোমাদের বাপ-মার পাত্তা নেই? তাদে' খবর জান না? এটা খুব খারাপ। যাই হোক, আমাদের কোথাও কিছু খেতে হবে।

আর কোনও কথা সে তাদের জিজ্ঞাসা করল না। কারো ঘরছাড়া হওয়াটা তার কাছে এমন কোনও নতুন ব্যাপার নয়। বড় ছেলেটি হঠাৎ বলল, আমাদের মা আজ আমাদের পাম সানডের সাজসজ্জা দেখাতে নিয়ে যেতেন।

গাভ্রোশে বলল, তাই নাকি?

আমার মা একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং তিনি ম্যাদমযজেল মিসের সঙ্গে বাস করেন।

গাভ্রোশে বলল, এখনো হয়নি? কি?

তখনো তারা রুটির দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। গাভ্রোশে এক শান্ত তৃপ্তি আর একটা গর্বের ভাব নিয়ে বলল, ভাবনার কিছু নেই। আমার কাছে যা আছে তাতে তিনজনের খাওয়া হয়ে যাবে।

এই বলে সে তার পকেট থেকে একটা স্যু বার করল। তারপর সে ছেলে দুটোকে দোকানের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে সেই স্যুটা কাউন্টারের উপর রেখে বলল, কই দোকানদার, পাঁচ সেন্তিমের মতো রুটি দাও।

দোকানদার একটা পাঁউরুটি আর একটা ছুরি হাতে তুলে দিল।

গাভ্রোশে বলল, আমরা তিনজন আছি, তিন পীস রুটি দাও।

তারপর সে যখন দেখল দোকানদার একটা সস্তা বাজে রুটি বার করেছে তখন সে তার নাকের উপর একটা আঙুল ফ্রেডারিক দি গ্রেটের নস্যি নেওয়ার রাজকীয় ভঙ্গিতে রাগের সঙ্গে বলল, এটা কি?

দোকানদার তার কথাটার মানে বুঝতে পেরে বলল, কেন, রুটি, ভাল সেকেন্ড ক্লাস একটা রুটি।

গাভ্রোশে বলল, তার মানে কালো রুটি, জেলখানার রুটি। আমি চাই ভাল সাদা রুটি। আমি পয়সা দেব।

দোকানদার মুচকি হেসে একটা সাদা রুটি তুলে নিয়ে কাটতে কাটতে তার খরিদ্দারদের দিকে সহানুভূতির সঙ্গে তাকাল। তা দেখে রেগে গেল গাভ্রোশে। বলল, আমাদের পানে ওভাবে তাকাচ্ছ কেন?

রুটিটা কেটে দোকানদার গাভ্রোশের হাতে সেটা দিয়ে পয়সাটা তুলে নিল। গাভ্রোশে নিজে ছোট একটা টুকরো নিয়ে বড় টুকরো দুটো ওদের দিয়ে দিল। ছেলে দুটো গোগ্রাসে খেতে লাগল। দোকানদার তাদের দিকে রাগের সঙ্গে তাকাতে গাভ্রোশে তাদের বলল, বাইরে চল।

এই বলে সে তাদের নিয়ে বাস্তিলের দিকে যেতে লাগল আবার।

কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর ছোট ছেলেটা একটা আলোকিত দোকান দেখে তার কাছে গিয়ে তাকাতে লাগল। গাভ্রোশের রাগ হলেও সে আপন মনে বলল, ছেলেমানুষ, জ্ঞান নেই।

রুটিটা খাওয়া তাদের হয়ে গেলে র‍্যু দে ব্যালে পার হয়ে তারা লা ফোর্স জেলখানার সামনে এসে হাজির হলো।

একজন বলল, গাভ্রোশে তুই ?

গাভ্রোশে বলল, মঁতপার্নেসী তুমি ?

লোকটা মঁতপার্নেসীই, তার চোখে নীল রঙের চশমা থাকলেও তাকে চিনতে পারল গাভ্রোশে। সে বলল, তোমার কোটটা পুলটিসের মতো দেখালেও তোমার চশমাটাব জন্য তোমাকে প্রফেসর বলে মনে হচ্ছে। চমৎকার।

মঁতপার্নেসী বলল, খুব একটা খারাপ দেখায় না।

তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। মঁতপার্নেসী তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে একটা বাড়ির গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। ছেলে দুটি হাত ধরাধরি করে তাদের পিছু পিছু গেল। মঁতপার্নেসী বলল, জান আমি কোথায় যাচ্ছি ?

গাভ্রোশে বলল, ফাঁসির কাঠে।

বোকা কোথাকার, আমি যাচ্ছি বাবেতের সঙ্গে দেখা করতে।

সত্যিই তুমি বাবেতের কাছে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ সত্যি।

কিন্তু আমি তো জানতাম সে জেলে আছে।

হ্যাঁ জেলে ছিল। কিন্তু ওকে যেদিন কনসার্জারিতে বদলি করা হয় সেদিন সকালে প্যারেডের সময় ও পালিয়ে যায়।

গাভ্রোশে বাবেতের চাতুর্যের প্রশংসা করে বলল, সত্যিই ও একটা শিল্পীর মতো।

মঁতপার্নেসী বলল, শুধু তাই নয়।

মঁতপার্নেসীর কাছে খাপে ভরা একটা ছোরা ছিল। খাপ থেকে সেটা দেখা যাচ্ছিল। গাভ্রোশে বলল, তুমি দেখছি মারপিটের জন্য তৈরি হয়ে যাচ্ছ।

মঁতপার্নেসী গম্ভীরভাবে বলল, বলা যায় না, তৈরি থাকা ভাল।

গাভ্রোশে বলল, আসলে তুমি কি করতে চাও ?

প্রসঙ্গটা পাল্টে দিয়ে মঁতপার্নেসী বলল, ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে। দিনকতক আগে এক সন্ধেবেলায় আমি পথে একটা ভদ্রলোককে ধরি। সে আমাকে বেশ কিছু নীতি উপদেশ দেওয়ার পর টাকার একটা ব্যাগ আমাকে দিয়ে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তে দেখি ব্যাগটা আমার পকেট থেকে উধাও হয়ে যায়।

গাভ্রোশে বলল, শুধু নীতি উপদেশগুলো রয়ে যায়।

মঁতপার্নেসী তাকে বলল, কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

আমি এই ছেলে দুটোর শোয়ার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।

শোয়ার ব্যবস্থা ? কোথায ?

আমার বাসায়।

তোমার আবার বাসা আছে নাকি ?

হ্যাঁ আছে।

কোথায় ?

এলিফ্যান্টে।

মঁতপার্নেসী আশ্চর্য হয়ে বলল, এলিফ্যান্টে ?

হ্যাঁ, বাস্তিলের এলিফ্যান্টে। কিন্তু এতে অবাক হবার কি আছে ?

মঁতপার্নেসী বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিযে উঠে বলল, ঠিক আছে, বাসাটা কি রকমের ?

গাভ্রোশে বলল, খুব ভাল বাসা। ব্রীজের তলাব মতো নয়। বেশ আরামদায়ক বাসা।

কিন্তু কি করে ঢোক সেখানে ?

সে ব্যবস্থা করেছি।

তুমি কি বলতে চাও সেখানে একটা ফুটো আছে ঢোকার মতো ?

না, দু'পা দিয়ে উঠতে হয়। তবে এই বাচ্চা দুটোর জন্য একটা মই যোগাড করতে হবে। আমার তো মাত্র দু' সেকেন্ড সময় লাগে।

মঁতপার্নেসী তাদের পানে তাকিয়ে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, কোথা থেকে ওদের জোটালে ?

গাভ্রোশে বলল, একটা নাপিত তার দোকান থেকে আমায উপহার দিযেছে।

মঁতপার্নেসী বলল, তুমি তাহলে আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলে ?

কথাটা বলেই সে পকেট থেকে পালক আর তুলো জডানো দুটো জিনিস বার করে নাকের দুটো রন্ধ্রে ঢুকিযে দিল।

গাভ্রোশে বলল, এতে তোমার মুখটা একটু পাল্টে গেছে।

মঁতপার্নেসী এবার গাভ্রোশের কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলল, তোমাকে এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা বাজার নয়। বাজার হলে এবং আমার কুকুর, ছোরা আর আমার প্রেমিকা কাছে থাকলে আমি এত কথা বলতাম যে তুমি খুশি হয়ে আমাকে দশ স্যু দিতে।

এটা সাংকেতিক কথা। একথা শুনে সচকিত হয়ে চারদিকে তাকাল গাভ্রোশে। দেখল অদূরে একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। সে মঁতপার্নেসীকে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে বলল, এখন আমি যাচ্ছি। ছেলে দুটোকে নিয়ে যেতে হবে। আমি নিচের তলায় থাকি। রাত্রিতে দরকার হলে আমার খোঁজ করবে।

মঁতপার্নেসী বলল, ধন্যবাদ।

এরপর দু'জন দু'দিকে চলে গেল। মঁতপার্নেসী চলে গেল গ্রেভের দিকে আর গাভ্রোশে চলে গেল বাস্তিলের দিকে। গাভ্রোশে ধরেছিল বড ছেলেটার হাত আর বড় ছেলেটা ধরেছিল ছোট ছেলেটার হাত।

কুড়ি বছর আগে বাস্তিল দুর্গের দক্ষিণপূর্ব দিকে কাঠ ও চুনবালির পলেস্তারা দেওয়া চল্লিশ ফুট উঁচু একটা হাতি ছিল। নেপোলিয়নের আমলে নির্মিত এই হাতিটার গায়ে প্রথমে সবুজ রং দেওয়া হয়েছিল। রোদবৃষ্টিতে সে রংটা চটে যায় একে একে। রাত্রির শান্ত অন্ধকারে এই বিরাট হাতির মূর্তিটা বিশাল প্রেতমূর্তির মতো এক নারকীয় ঐশ্বর্যে দীপ্তিমান হয়ে উঠত যেন। পরে হাতিটার পরিবর্তে ব্রোঞ্জের এক বিরাট স্টোভ বসলো বাস্তিল দুর্গের সামনে। এট যেন সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার উপর বুর্জোয়া শিল্পোন্নয়নের জয়ের প্রতীক।

সেই হাতিটার আধভাঙা মূর্তিটার সামনে এসে গাভ্রোশে ছেলে দুটিকে বলল, ভয় করো না।

সে প্রথমে ছেলে দুটিকে নিয়ে বেড়াটা পার হয়ে ভিতরে গেল। তারপর যে মই দিয়ে রাজমিস্ত্রীরা কাজ করত সেই মইটা এনে হাতির মূর্তিটার সামনের পা দুটোর উপর লাগিয়ে দিয়ে বলল, এই মই দিয়ে উঠে হাতির পেটটার কাছে যে ফাঁক রয়েছে সেই ফাঁক দিযে ভিতরে ঢুকে যাও।

গাভ্রোশের উপর আস্থা ছিল ছেলে দুটির। কারণ সে তাদের আজ সন্ধের সময় রুটি দিয়েছে খেতে। তাদের শোবার জায়গা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবু মইয়ে উঠতে বললে তারা বিহ্বল হয়ে তাকাতে লাগল গাভ্রোশের দিকে।

গাভ্রোশে তাদের বলল, কি সাহস হচ্ছে না? কি করে উঠতে হয় দেখাচ্ছি।

এই বলে সে মই ছাড়াই হাতিটার পা ধরে তার পেটের কাছে ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে দুটিকে মুখ বার করে বলতে লাগল, এবার তোমরা ওঠ।

বড ছেলেটিকে আগে উঠতে বলল সে। বড ছেলেটি ম দিয়ে ভয়ে ভযে উঠতে লাগল। সে তার কাছে কোনওরকমে যেতেই গাভ্রোশে তার হাত ধরে টেনে ভিতরে ঢুকিযে নিল তাকে। তারপর সে নিচে নেমে পাঁচ বছরের ছোট ছেলেটিকে কোলে তুলে নিযে মই-এর উপর উঠিয়ে দিয়ে নিজে তার পিছনে উঠতে লাগল। এইভাবে সে ছেলেটিকে ঠেলা দিতে দিতে তাকে হাতিটার পেটের ভিতর ঢুকিযে দিয়ে আনন্দে হাততালি দিতে লাগল। তখন বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেছে।

যে সব ভদ্রলোক বাস্তিল দুর্গের পাশ দিয়ে দিনের বেলায় যেতে যেতে সম্রাট নেপোলিয়ন পরিকল্পিত ও নির্মিত হাতির মূর্তিটাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করত তারা জানত না সেই অবজ্ঞাত অবহেলিত মর্তিটা রাতের অন্ধকারে কয়েকটি নিরাশ্রয় পিতৃমাতৃহীন শিশুকে ঝড়বৃষ্টি ও তুষারপাতের কবল থেকে রক্ষা করে আশ্রয় দান করে তার নিরাপদ গর্ভে। যে মূর্তিটি নিজেই এক বিশালকায় ভিক্ষুকের মতো দেশবাসীর কাছ থেকে এক সযত্ন দৃষ্টি ভিক্ষা করে নীরবে, সেই মূর্তিটিই কয়েকটি অনাথ ভিক্ষুক বালককে আশ্রয় দান করে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে।

ভিতরটা অন্ধকার। গাভ্রোশে লাইটার দিয়ে আলো জ্বালল। সেই আলোয় তেলমাখা একটা বাতি ধরিয়ে সেই ধূমায়িত আলোয় ভিতরটা আলোকিত করে রাখল। গাভ্রোশে একটা কাঠ দিয়ে ফাঁকটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, আমি চাই বাইরে থেকে দারোয়ান যেন দেখতে না পায়, তাই মুখটা বন্ধ করে দিলাম।

ছোট ছেলেটি অস্বস্তি অনুভব করে তার দাদাকে অনুযোগের সুরে কি বলায় রেগে গেল গাভ্রোশে। সে বলল, কি ভাল লাগছে না? তবে তুলিয়েরে বরফ আর বৃষ্টির মধ্যে শোবে? আমি কোনও রাজাউজির নই। নাকেকাঁদা বন্ধ করে শুয়ে পড়।

ভিতরে অনেকটা জায়গা ছিল। মাথার উপরটা কড়ি-বরগাওয়ালা ঘরের ছাদের মতো। নিচেটা মেঝের মতো। হাঁটতে পারা যায়। তার মধ্যে গাভ্রোশের বিছানা ছিল। বিছানা বলতে খড়ের তোষক আর একটা পশমী কম্বল। বেশ গরম। গাভ্রোশে আবার উপদেশ দানের ভঙ্গিতে বলতে লাগল, বাইরে এখন অন্ধকার, চাঁদ নেই আকাশে, কিন্তু এখানে আলো আছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু এখানে বৃষ্টি নেই। বাইরে লোকের ভিড, কিন্তু এখানে কেউ তোমাদের বিরক্ত করবে না। আর কি চাও তোমরা?

যে জায়গায় বিছানাটা পাতা ছিল সে জায়গাটা গুহার মতো, গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হয়। দাঁড়াতে পারা যায় না। ছেলে দুটি ঢুকলে দুটো বড় পাথর মুখটার কাছে চাপিয়ে দিল যাতে বাইরে থেকে সহজে কেউ ঢুকতে না পারে। তার হাতে একটা বড় ইঁদুরের লেজ ছিল।

বড় ছেলেটি শুয়ে গাভ্রোশেকে বলল, ওটা কি জন্য?

গাভ্রোশে বলল, ইঁদুর তাড়াবার জন্য। এখন চুপ করে থাক।

গাভ্রোশে ছোট ছেলেটার গায়ের উপর কম্বলটা টেনে চাপিয়ে দিলে সে বলল, বেশ গরম।

গাভ্রোশে বলল, জার্দিন দে প্ল্যান্তে যে চিড়িয়াখানা আছে সেখানে গেলে অনেক কিছু পাওয়া যায়। সেখানে গিয়ে দেওয়াল বেয়ে উঠে জানালা দিয়ে হাত বাড়ালেই হলো। এই কম্বলটা বাঁদরের ঘর থেকে আর এই খড়ের তৈরি পুরু তোষকটা এনেছিলাম জিরাফের ঘর থেকে।

একটু থেমে গাভ্রোশে আবার বলতে লাগল, জন্তু-জানোয়ারদের এইসব আছে। তাদের কাছ থেকে এগুলো নিলে তারা কিছু মনে করে না। তাছাড়া দেওয়াল বেয়ে উঠলে কেইবা দেখছে, কেইবা সরকারকে গ্রাহ্য করে।

বড় ছেলেটি বলল, তুমি পুলিশকে ভয় করো না?

পুলিশ? পুলিশকে তো আমরা বলি কপস্।

সকালে গাভ্রোশে তাদের মতো এক ভবঘুরে, নিঃস্ব এবং নিরাশ্রয় একটি বালক হলেও ছেলে দুটির মনে হলো অতিপ্রাকৃত শক্তিধারী সে এক আশ্চর্য পুরুষ। অথচ তার মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে।

গাভ্রোশে বলল, দেখ কেমন বিছানা। ভাল লাগছে তো?

বড় ছেলেটি বলল, খুব ভাল।

গাভ্রোশে আত্মপ্রসাদ লাভ করল। সে এবার বড় ছেলেটিকে বলল, আচ্ছা, তোমরা তখন কাঁদছিলে কেন? তোমার ছোটভাই না হয় কাঁদতে পারে, কিন্তু তুমি তো বড়, তুমি কাঁদছিলে কেন?

বড় ছেলেটি বলল, আমরা বাড়িতে ঢুকতে পাইনি। আমাদের থাকার কোনও জায়গা ছিল না।

গাভ্রোশে বলল, ঠিক আছে। আর কোনও কান্নাকাটি করবে না কখনো। এবার থেকে তোমরা আমার কাছেই থাকবে। আমি তোমাদের দেখাশোনা করব। গ্রীষ্মকালে আমি তোমাদের নদীতে স্নান করতে নিয়ে যাব। উলঙ্গ হযে বালির চরে ছুটে বেড়াব। ধোবানীদের বিরক্ত করব। আমি তোমাদের থিয়েটার ও অপেরাতে নিয়ে যাব। কোম্পানির সঙ্গে আমার জানা-শোনা থাকায় আমি টিকেট পাই। শ্যাম্প এলিসীতে একটা লোক আছে, তাকে জীবন্ত কঙ্কালের মতো দেখায। আমি তোমাদের তাকে দেখাতে নিয়ে যাব। তারপর তোমাদের গিলোটিন দেখাব যাতে ফাঁসি হয়। ঘাতক মঁসিয়ে স্যামসনকেও দেখাব।

ঝড়ের বেগ বেড়ে গেল বাইরে। মাঝে মাঝে বজ্রগর্জন হচ্ছিল। হাতির মূর্তিটার উপরে সশব্দে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ছিল। আবার একটা বজ্রগর্জন হলো। ছেলে দুটো ভয় পেযে এমনভাবে চমকে উঠল যে তাদের পা লেগে বিছানার চারদিকে তারের জালটা ছিঁড়ে যেত আর একটু হলে। ইঁদুরের উৎপাত হতে রক্ষা পাবার জন্য তার বিছানাটা সরু তারের জাল দিযে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করে গাভ্রোশে।

গাভ্রোশে বাতির আলোটা নিবিয়ে দিতেই ইঁদুরগুলো কিচকিচ শব্দ করে ছুটে বেড়াতে লাগল। আলো থাকায় এতক্ষণ চুপ করে ছিল তারা। বড় ছেলেটি তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ছোট ছেলেটি বলল, মঁসিযে, এ কিসের শব্দ?

গাভ্রোশে বলল, বড় ইঁদুর।

আবার কিছুক্ষণ পর ছোট ছেলেটি বলল, মঁসিয়ে, আপনি বিড়াল রাখেন না কেন?

রেখেছিলাম একটা, তাকে ইঁদুরগুলো খেয়ে ফেলেছে।

আমাদের তাহলে খাবে না?

না, তারের জাল আছে। তাছাড়া আমি আছি। কোনও ভয় নেই।

এই বলে গাভ্রোশে তার একটা হাত বাড়িয়ে ছোট ছেলেটির গায়ের উপর রাখল। বড় ছেলেটি তাদের দু'জনের মাঝখানে শুয়েছিল।

কথার শব্দ পেয়ে ইঁদুরগুলো একটু চুপ করে ছিল। তারা ঘুমিয়ে পড়লে ইঁদুরগুলো আবার দাপাদাপি শুরু করে দিল। কিন্তু ওদের ঘুম আর ভাঙল না।

শেষ রাতের দিকে সেন্ট আঁতোনে থেকে বাস্তিলের কাছে পাহারারত পুলিশদের দৃষ্টি এড়িয়ে একজন ছুটে এসে হাতির মূর্তিটার পেটের কাছে 'ক্রিকিকু' এই সাংকেতিক শব্দ করে ডাকতে লাগল। তা শুনে গাভ্রোশে ভিতর থেকে প্রবেশপথের কাঠ-পাথর সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বলল, ঠিক আছে।

লোকটি হলো মঁতপার্নেসী। সে গাভ্রোশেকে দেখে বলল, আমাদের এখন সাহায্য চাই। তুমি চলে এস।

গাভ্রোশে বলল, আমি তৈরি।

আর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে পড়ল মঁতপার্নেসীর সঙ্গে। পথে দেখল তরকারি বোঝাই কতকগুলি গাড়ি বাজারের দিকে যাচ্ছে। কেউ তাদের দিকে লক্ষ্য করল না।

৩

সে রাতে লা ফোর্স জেলখানায় একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন বাবেত, ব্রুঁজ, গুয়েলমার আর থেনার্দিয়ের এই চারজন মিলে জেল থেকে পালিয়ে যাবার এক চক্রান্ত করে। বাবেত সেদিন সকালেই জেল থেকে পালিয়ে যায়, মঁতপার্নেসী সেকথা গাভ্রোশেকে বলেছিল। থেনার্দিয়েরকে একটা নির্জন ঘরে রাখা হয়েছিল। ব্রুঁজ একটা দড়ি আর পেরেক যোগাড় করে। তার সঙ্গে গুয়েলমারের দেখা হয়।

সেই সময় জেলখানার একদিকের ভাঙা ছাদটা মেরামৎ করা হচ্ছিল বলে তাদের পালানোর একটা সুযোগ এসে পড়ে। সেই ছাদ দিয়ে ব্রুঁজ পালিয়ে যায়। গুয়েলমারও বেরিয়ে যায়। সেইদিন সকালে বাবেত আগেই জেল থেকে পালিয়ে যায়। তখন তারা মঁতপার্নেসীর সঙ্গে এক চক্রান্ত করে থেনার্দিয়েরকে মুক্ত করার জন্য। তারা ঠিক করে গভীর রাতে জেলখানার ধারে গিয়ে অপেক্ষা করবে। ব্রুঁজ কুশলী, তার বুদ্ধি আছে, আর গুয়েলমারের শক্তি আছে। রাত্রিতে জোর বৃষ্টি নামায় ব্রুঁজ বলে, আজ রাতে পালাবার সুবর্ণ সুযোগ আছে। ব্রুঁজের হাতে একটা লম্বা মোটা দড়ি আর পেরেক ছিল। ব্রুঁজ আর গুয়েলমার বাবেত আর মঁতপার্নেসীর সঙ্গে মিলিত হয়। তারা বৃষ্টির মধ্যেই জেলখানার ধারে এসে জড়ো হয়।

এদিকে থেনার্দিয়ের সে রাতে একটুও ঘুমোয়নি। তার কাছে এক বোতল মদ ছিল ঘুমের ওষুধ মেশানো। সেটা সে জেলখানার লোকদের পয়সা দিয়ে আনিয়েছিল। তার পায়ে পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের লোহার বেড়ী ছিল। রোজ রাত চারটের সময় একজন পাহারাদার দু'জন পুলিশ নিয়ে এসে থেনার্দিয়েরকে একটা কালো পাঁউরুটি, একগ্লাস জল আর কিছু মদ দিয়ে যায়। দু' ঘণ্টা অন্তর প্রহরী বদলি হয় রাতে। থেনার্দিয়ের ইঁদুর তাড়াবার জন্য একটা লোহার শিক কাছে রাখার জন্য অনুমতি চেয়ে নেয়।

রাত দুটোর সময় থেনার্দিয়েরের ঘরের সামনে প্রহরী বদলি হয়। আগেকার অভিজ্ঞ কড়া প্রহরীর বদলে আসে একজন যুবক বয়সী প্রহরী। দু' ঘণ্টার মধ্যে দেখা যায় সেই যুবক অনভিজ্ঞ প্রহরী উপুড় হয়ে ঘুমে অচেতন হয়ে আছে তার জায়গায় আর থেনার্দিয়ের ঘরের মধ্যে নেই। কি করে সে পা থেকে লোহার বেড়ী খুলে সেই তিনতলা বাড়িটার ছাদে চলে যায় তা কেউ বুঝতে পারেনি এবং তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না। যে মুক্তিকামনার প্রবলতায় বন্দীর কাছে যে কোনও খাড়াই

পাহাড় একটা সংকীর্ণ নালায় পরিণত হয়, লৌহকঠিন গরাদ হয়ে ওঠে অশক্ত কাঠ, সাধারণ শক্তিহীন মানুষ হয়ে ওঠে কুশলী ব্যায়ামবিদ, নির্বুদ্ধিতা পরিণত হয়ে ওঠে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি প্রতিভায়, সেই মুক্তিকামনার প্রবলতা থেনার্দিয়েরকে পেয়ে বসেছিল কি না তা ঠিক জানা যায়নি।

থেনার্দিয়ের এক ছাদ থেকে আর এক ছাদে লাফ দিয়ে দিয়ে শেষে জেলখানার প্রাচীরের মাথায় গিয়ে হাজির হয়। প্রাচীরটা ছিল দশ ইঞ্চি চওড়া। তিনতলার সমান উঁচু। তখন তার অবস্থা হয়ে ওঠে চলৎ-শক্তিহীন। সে সটান শুয়ে পড়ে তার উপর। সে তখন বিমূঢ় হয়ে ভাবতে থাকে যদি আমি এর থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ি তাহলে অবশ্য আমার মৃত্যু ঘটবে আর যদি লাফ না দিয়ে এখানেই থাকি তাহলে আমি অবশ্যই ধরা পড়ব। রাত চারটের সময় প্রহরী বদল হলেই তার পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা চোখে পড়বে। তখন বিরাট হৈ-চৈ পড়ে যাবে গোটা জেলখানায়। পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠবে। বন্দুকধারী সিপাইরা ছোটাছুটি করবে চারদিকে।

থেনার্দিয়ের যখন সব এই সাতপাঁচ ভাবছিল তখন হঠাৎ সে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, বাইরের দিকে জেলখানার প্রাচীরের তলায় অর্থাৎ যার মাথায় সে ছিল, একে একে চারজন লোক এসে জড়ো হলো। তারা চোরদের পরিভাষায় যে সব সাংকেতিক কথাবার্তা বলছিল তার কিছু কিছু তার কানে আসতেই থেনার্দিয়ের তাদের চিনতে পারল। বুঝল তারা হলো ব্রুঁজ, বাবেত, গুয়েলমার আর মঁতপার্নেসী অর্থাৎ তার হবু জামাই।

ব্রুঁজ বলল, থেনার্দিয়ের হয়ত পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

মঁতপার্নেসী বলল, বন্ধুকে বিপদে ফেলে রেখে চলে যাওয়া উচিত নয়।

তারা অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কোথাও থেনার্দিয়েরকে দেখতে পেল না।

থেনার্দিয়ের তাদের চিনতে পারলেও চিৎকার করে ডাকতে পারল না পাছে জেলখানার প্রহরীরা তা শুনতে পায় এই ভয়ে। তার পকেটে দড়ির একটা ছেঁড়া টুকরো ছিল। সেটা বুদ্ধি করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাদের পায়ের কাছে ফেলে দিল থেনার্দিয়ের। সঙ্গে সঙ্গে ব্রুঁজ বলল, এটা আমারই দড়ির একটা অংশ।

মঁতপার্নেসী তখন বলল, তাহলে হোটেলমালিক এই পাঁচিলটার উপরেই আছে।

থেনার্দিয়ের তার মাথাটা বাড়িয়ে দিতেই তাদের চোখ পড়ল তার উপর।

মঁতপার্নেসী ব্রুঁজকে বলল, তোমার কাছে যে দড়ি আছে তার সঙ্গে এটাকে বেঁধে যোগ করে ছুঁড়ে দাও। ও সেটা ওখানে কিছুতে জড়িয়ে দেবে।

থেনার্দিয়ের বলল, আমি ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছি। আমার দেহ অসাড় হয়ে গেছে। আমি নড়তে পারছি না।

ব্রুঁজরা নিচেয় থেকে বলল, আমরা তোমাকে ধরে নেব। তুমি শুধু দড়ি ধরে নেমে পড়বে। তারপরই তোমার দেহটাকে তাপ দিয়ে গরম করে তুলব আমরা।

কিন্তু আমার হাত দুটো শীতে জমে গেছে।

দড়িটা আটকে দাও।

পারব না।

মঁতপার্নেসী বলল, আমাদের একজনকে উপরে যেতে হবে।

বাবেত বলল, কোনও বয়স্ক লোক নয়, একটা ছেলে হলে ভাল হয়।

ব্রুঁজ বলল, ঠিক বলেছ। একটা ছেলে চাই।

তখন মঁতপার্নেসী বলল, ঠিক আছে, আমি আনছি।

এই বলে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে গাভ্রোশের কাছে চলে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাভ্রোশেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে মঁতপার্নেসী। গাভ্রোশে এসেই বলে, আমাকে কি করতে হবে?

মঁতপার্নেসী বলল, চিমনি দিয়ে ঐ পাঁচিলটার উপর উঠে এই দড়িটা ওখানে যে একটা জানালা আছে তার সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে।

গুয়েলমার গাভ্রোশেকে বলল, তুমি যে বাচ্চা, এই বড়মানুষের কাজটা পারবে?

গাভ্রোশে একবার সব কিছু দেখে নিয়ে এমন একটা ভাব দেখাল যাতে মনে হবে এটা তার কাছে কিছুই না। সে বলল, আমি যা পারব তা তোমাদের মতো বড়মানুষরা পারবে না।

গাভ্রোশে উঠে গিযে থেনার্দিয়ের কাছাকাছি গিয়ে ভোরের আলোয় তার মুখ তার দাড়ি দেখে চিনতে পারল উপরের বন্দী লোকটি তার বাবা। তবু সে মুখে কিছু বলল না। সে তার কাজ করে নেমে এল। থেনার্দিয়েরও কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেমে এল।

গাভ্রোশে সেইখানে একটা পাথরের উপর বসে একটু অপেক্ষা করল। তার বাবা তাকে কিছু বলে কি না তা দেখতে লাগল। কিন্তু কিছু বলল না দেখে সে উঠে বলল, এই তো, আমার আর কিছু করার নেই তো? আমি তাহলে যাচ্ছি।

থেনার্দিয়ের বলল, এবার আমরা কার মাথা খাব?

ব্রুঁজ বলল, রু্য প্লামেতে একটা কাজ আছে। সেখানে একটা বড় বাড়িতে দু'জন মহিলা থাকে। বাগানের গেটটা মরচে পড়া। তোমার মেয়ে এপোনিনে বাড়িটা দেখেছে।

থেনার্দিয়ের বলল, সে বোকা নয়। যা করার ঠিক করবে।

গাভ্রোশে চলে গেল।

অন্য সবাই বিভিন্ন দিকে চলে গেল। বাবেত থেনার্দিয়েরকে বলল, ঐ ছেলেটাকে ভাল করে দেখেছ?

থেনার্দিয়ের বলল, দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

আমার মনে হয় ও তোমার ছেলে।

সে কি! ঠিক বলছ তো?

এই বলে সেখান থেকে চলে গেল থেনার্দিয়ের।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

পাঠকদের হয়ত মনে আছে ম্যাগননের কাছ থেকে রুা প্লামেতে কসেত্তেদের বাসার ঠিকানা পেয়ে সেটা খুঁজে বার করে তার চেনা দুর্বৃত্তদের সেখান থেকে ঠেকিয়ে রাখে এপোনিনে। তার জন্য কেউ কিছু করতে পারেনি। পরে সে মেরিয়াসকে সেই বাড়িটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেয়। মেরিয়াস দিনকতক লক্ষ্য রাখার পর একদিন সন্ধের সময় সাহস করে কসেত্তের সঙ্গে দেখা করে বাগানে। তার পর থেকে রোজ সেখানে যেতে থাকে। রোমিওর মতো জুলিয়েটের বাগানে যেতে থাকে প্রেমের টানে। তবে রোমিওর মতো তাকে বাগানের পাঁচিল বেয়ে উঠতে হয়নি। শুধু সন্ধ্যার নির্জন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বাগানের মরচে পডা গেটের ফাঁক দিয়ে গলে ঢুকে পড়েছে সে।

কসেত্তেও বাগানে এসে মিলিত হত মেরিয়াসের সঙ্গে। কিন্তু কসেত্তে যদি এই মিলনের ব্যাপারে বিশেষ বাডাবাডি করত, যদি স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে উচ্ছৃংখলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিত তাহলে সর্বনাশ হত তার। সাধারণত নারীরা এই সব ক্ষেত্রে কা[illegible]হীন হয়ে হৃদয়ের সঙ্গে তাদের দেহটাও বিলিয়ে দিয়ে থাকে। নারীদের হৃদযদানের সুযোগ নিযে তাদের দেহটাকে ভোগ করে পুরুষরা। তাই যে প্রেম সৃষ্টি ও ধ্বংস. জীবন ও মৃত্যুব দ্বৈত লীলায় চঞ্চল. যে প্রেম একদিকে আশার উজ্জ্বল আলো বিকীবণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসে কৃষ্ণকুটিল হতাশার সঘন অন্ধকার সে প্রেম কোনও বিপত্তি নিযে আসেনি কসেত্তের জীবনে।

সেই জঙ্গলাকীর্ণ চেনা-অচেনা কত ফুলের সুবাসে আমোদিত নির্জন বাগানটায় যখন দুটি সরলহৃদয় নিষ্পাপ তরুণ তরুণী বসে অবাধে প্রেমালাপ করে যেত তখন তাদের দেখে মনে হত তারা যেন মানুয নয় দেবমূর্তি, প্রথম দিনই শুধু তারা চুম্বন ও আলিঙ্গন করে পরস্পরকে। তারপর থেকে তারা শুধু ঘণ্টায় পাশাপাশি বসে থাকত। কখনো কখনো একে অন্যের হাত ধরত। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। যাবার সময় মেরিয়াস শুধু কসেত্তের হাতটা অথবা তার শালের প্রান্তভাগ অথবা তার চুলের একটা গোছা চুম্বন করে চলে যেত।

মেরিয়াস ভাবত কসেত্তের কুমারীজীবনের এই শুচিতা বা সতীত্ববোধ তাদের দেহ-মিলনের পথে একমাত্র বাধা আর কসেত্তে ভাবত মেরিযাসের এই আত্মসংযমই তার রক্ষাকবচ। শুধু দুটি বিমুগ্ধ বিমোহিত আত্মার মিলনের মধ্যে সীমায়িত ছিল তাদের প্রেম।

সাধারণত প্রেমের এই প্রথম স্তরে দেহগত কামনাকে অবদমিত রেখে শুধু আত্মিক মিলনের আবেগকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। একবার কোনও একটা জিনিস মাটি থেকে কুডোবার জন্য ঝুঁকে পডলে কসেত্তের বুকের কাছটা অনেকটা অনাবৃত হয়ে পড়ে যখন তখন মেরিয়াস তার চোখ দুটো সরিয়ে নেয়। তার শুধু মনে হত দেহভোগই যদি তার প্রেমের উদ্দেশ্য হয় তাহলে রাস্তা বা বাজারে ঘুরে বেড়ানো যে কোনও

বারবণিতার কাছে যেতে পারে, কসেত্তের কাছে এসে তার স্কার্ট তোলার কোনও প্রয়োজন নেই। তারা পরস্পরকে ভালবাসত। বাগানটাকে এক পবিত্র স্থান বলে মনে হত তাদের। যে সব ফোটা ফুল অকাতরে তাদের সুবাস বিলিয়ে দিত, তারা তাদের অন্তর উজাড় করে ঢেলে দিত সেই সব ফুলের উপর। গাছে গাছে কচি পত্রোদ্যমের জৈবিক উত্তেজনার এক সবুজ সমারোহ তাদের ঘিরে থাকত। তার মাঝে তারা যে সব প্রেমের কথা বলত সে সব কথা যেন এক মৃদু কাঁপন ধরিয়ে দিত গাছগুলোকে। তাদের তরুণ প্রাণের বীণাতন্ত্রীতে যে সব কথাগুলি অনুরণিত হয়ে উঠত, যে কথাগুলি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বাগানের বনপ্রকৃতিকে চঞ্চলিত করে তুলত, এক শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত সেই সব কথাগুলির মধ্যে হয়ত কোনও গভীরতর তাৎপর্য ছিল না। তথাপি এমন গভীর তাৎপর্য ও মাধুর্য মণ্ডিত কথা আর হতে পারে না। এসব কথা জীবনে যারা কখনো বলেনি বা শোনেনি তারা মানুষের মতো মানুষই নয়।

কসেত্তে একদিন বলল, তুমি জান—আমার আসল নাম হলো ইউফ্রেসিয়া।

মেরিয়াস বলল, ইউফ্রেসিয়া ? লোকে তো তোমায় বলে কসেত্তে।

ও নামটা বাজে নাম। আমার ছেলেবেলায় ও নামটা আমাকে ওরা দেয়। ও নামটা ভাল নয়, আমার আসল নাম হলো ইউফ্রেসিয়া। তুমি এ নাম পছন্দ করো ?

তা করি বটে...কিন্তু কসেত্তে নামটাও তো বাজে নয়।

তাহলে ঐ নামেই আমাকে ডাকবে তুমি। হ্যাঁ, নামটা ভালই। সুতরাং তুমি সব সময় এই নামেই ডাকবে আমায়।

কসেত্তের এই কথাগুলোর সঙ্গে যে মধুর হাসি ঝরে পড়ছিল তা যেন স্বর্গোদ্যানের উপযুক্ত।

আর একদিন কসেত্তে মেরিয়াসের চেহারাটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে বলতে লাগল, একটা কথা আমায় বলতে দাও তুমি, তুমি সুন্দর, সুদর্শন, বুদ্ধিমান, মোটেই বোকা নও, আমার থেকে অনেক বেশি বিদ্বান। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি তোমার সমতুল, সমকক্ষ—সেটা হলো এই যে আমি তোমাকে ভালবাসি।

মেরিয়াসের মনে হলো আকাশের সৌরমণ্ডল থেকে ঝরে পড়া ঐকতানের এক অশ্রুত সুরলহরী কসেত্তের মুখ দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে।

আর একদিন মেরিয়াসকে কাশতে দেখে কসেত্তে বলল, তুমি আমার সামনে কাশবে না। কাশি হচ্ছে অসুস্থতার পরিচায়ক। তুমি কাশলে তোমার শরীরের কথা ভেবে দুঃখিত হব আমি।

আর একদিন মেরিয়াস বলল, জান, একদিন আমি ভাবতাম তোমার নাম আরসুলা ?

এই কথাটা নিয়ে সেদিন সারা সন্ধেটা হাসাহাসি করতে থাকে তারা দু'জনে।

আর একদিন মেরিয়াস বলে, জান, একদিন এক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক তোমার আমার মাঝখানে হঠাৎ এসে পড়ায় আমি তার ঘাড় ভাঙতে চেয়েছিলাম।

এইভাবে কসেত্তের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেলে মেরিয়াস।

সে ভাবত এইভাবে রোজ সন্ধ্যায় এসে কসেত্তের পাশে বসা, তার মধুর স্পর্শ ও নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করা, দু'জনে কথা বলা—এক প্রেমঘন মিলনের কতকগুলি মুহূর্ত দিয়ে গড়া এই সব দিনগুলির যেন কখনো শেষ না হয়, অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে যেন তাদের এই মিলন। ইতিমধ্যে তাদের অলক্ষ্যে অগোচরে মেঘ জমতে থাকে আকাশে। এই মেঘের সঙ্গে সঙ্গে যে ঝড় পাগলের মতো ছুটে আসে তা যত সহজে মানুষের স্বপ্নকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তত সহজে ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না আকাশের মেঘগুলোকে।

তার মানে এই নয় যে চুম্বন আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রেমের দেহগত অভিব্যক্তির ব্যাপারে তাদের কোনও সাহস ছিল না। তাদের প্রেমকে আরও গভীরতর তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তোলার জন্যই তারা সে প্রেমের দেহগত অভিব্যক্তির দিকে নজর দিত না। প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে মেরিয়াস যে সব কথা বলত, গদ্যে-পদ্যে মেশানো এক মেদুর ও মদির তোষামোদের সুরে বলা সে সব কথা ছিল শুধু প্রেমের সূক্ষ্ম নির্যাসে সমৃদ্ধ, সে কথা যেন শুধু দেবদূতদের সঙ্গে আকাশে উড়ে চলা পাখিরাই বুঝতে পারে, সে কথা যেন অন্য এক আত্মার উদ্দেশ্যে ধ্বনিত একটি আত্মার মৃদু মর্মরধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মেরিয়াস একদিন বলল, তুমি কত সুন্দর! তোমার পানে তাকাতেই আমার সাহস হয় না, তাই দূর থেকে তোমার কথা ভাবি। তুমি হচ্ছ এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতিমা। তোমার স্কার্টের নিচে চটি জোড়াটা দেখলেই আমার মাথা ঘুরে যায়। তুমি যখন কিছু ভাব তখন তোমার মুখে-চোখে যে আলো ছড়িয়ে পড়ে তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই আমি। এক একসময় তোমাকে স্বপ্নে দেখা এক মূর্তি বলে মনে হয়। ও কসেত্তে, তুমি শুধু কথা বলে যাও আর আমি শুনে যাই। আমার মনে হয় আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। আমি যেন তোমার পা দুটো অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে আর তোমার আত্মাটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে দেখি।

এ কথার উত্তরে কসেত্তে বলল, প্রতিটি মুহূর্তে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা বেড়ে যায়।

তাদের এলোমেলো সব কথাবার্তায় প্রেমই একমাত্র বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

কসেত্তের সমগ্র সত্তা থেকে এক শুভ্র সরলতা আর স্বচ্ছতার আলো বিচ্ছুরিত হত। তাকে দেখে মনে হত সে যেন দিনের সকাল। প্রভাতের আলো মূর্ত হয়ে উঠেছে তার নারীমূর্তির মধ্যে।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে মেরিয়াস কসেত্তের মতো মেয়েকে ভালবাসবে, এবং তার গুণগান করবে। কিন্তু কনভেন্টের স্কুলে পড়া একটি মেয়ে কি করে এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে কথা বলছে তা ভেবে পেল না সে। তার প্রতিটি কথার মধ্যে উচ্ছ্বাস থাকলেও তার একটা অর্থ আছে। সে তার নারীহৃদয়ের সহজাত অন্তরবৃত্তির দ্বারা সব কিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় এবং কোনও বিষয়ে তাকে সহজে ভোলানো যায় না। তার প্রতিটি কথাই সহজ সরল মমতাময় অথচ গভীর ও অর্থপূর্ণ।

কথায় কথায় এবং ছোটখাটো নানা ঘটনায় চোখে জল আসত তাদের। কোনও এক পতঙ্গ কোনওভাবে নিষ্পেষিত হয়ে গেলে, অথবা পাখির বাসা থেকে কোনও পালক ঝরে পড়লে বা ফুলগাছ থেকে কোনও ডাল ভেঙে পড়লে চোখে জল এসে যেত তাদের। পরিপূর্ণ প্রেম থেকে এক করুণা জাগত তাদের মনে। মাঝে মাঝে তারা শিশুর মতো জোরে হেসে উঠত। কিন্তু তাদের প্রেমময় অন্তর যতই সৎ এবং নির্দোষ হোক না কেন, তাদের আত্মা যত পবিত্র হোক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য যত মহান এবং নিষ্কাম হোক না কেন, তাদের সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য এক অদৃশ্যশক্তি গোপনে রহস্যময়ভাবে কাজ করে যাবেই।

তারা পরস্পরকে ভালবাসত, হাত ধরাধরি করে হাসাহাসি করত, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে বাগানের নির্জনে বসে ফুল আর পাখির গানের মধ্যে নিজেদের অন্তর বিনিময় করত; এক পরম আনন্দের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত তাদের চোখমুখ। কিন্তু সেই সঙ্গে সুদূর আকাশমণ্ডলের মহাশূন্যতায় নক্ষত্ররা আপন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে তাদের কাজ করে যেত।

২

আপন আপন আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যেব নিবিড় সুখে তারা এমনভাবে ভুলে থাকত যে বাইরের জগতের কোনও ঘটনা তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে বা কোনও বিকার জাগাতে পারত না। সেই সময় যে কলেবা মহামারীরূপে সমগ্র প্যারিস শহরটাকে বিধ্বস্ত করে দেয় সেদিকে কোনও খেয়াল ছিল না তাদের। তারা নিজেদের অনেক কথা বলাবলি করত নিজেদের মধ্যে। কিন্তু তার বাইরে কিছুর উল্লেখ করত না। মেরিয়াস তার জীবন সম্বন্ধে বলে, শৈশব থেকে সে ছিল পিতৃমাতৃহীন, তার মার বাবা তাঁকে মানুষ করে, তার মাতামহ ধনী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় সে তাঁর বাড়ি থেকে চলে এসেছে, সে ওকালতি পাশ করেছে, কিন্তু ওকালতি করে না; প্রকাশকদের জন্য কিছু লেখার কাজ করে সে জীবিকা অর্জন করে। তার বাবা একজন কর্নেল ছিলেন, পরে ব্যারন উপাধি লাভ করেন, সেই সূত্রে সেও ব্যারন। কিন্তু ব্যারন কাকে বলে তা জানত না কসেত্তে। কসেত্তে তার জীবন সম্বন্ধে শুধু বলে সে পিকপাসের কনভেন্টে পডাশুনা করত। তার মা নেই, তার বাবা মঁসিয়ে ফশেলেভেন্তের কাছে সে থাকে। তার বাবার অবস্থা ভাল না হলেও তিনি গরীবদুঃখীদের উদার হস্তে দান করেন। আবার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক কিছুর ব্যবস্থা করলেও তিনি নিজে কিছু ভোগ করেন না।

প্রেমে মত্ত হয়ে অতীতের কোনও ঘটনার কথা তোলেনি মেরিয়াস। এমন কি থেনার্দিয়েরদের বাসায় ঘটে যাওয়া সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটারও উল্লেখ করেনি কখনো কসেত্তের কাছে। তাছাড়া এসব কথা প্রেমের আবেগের জোয়ারে মনে স্থান পায়নি তার। সে সব ভুলে গিয়েছিল। শুধু সেই সব ঘটনার কথা নয়, সে সকালে কি করেছে বা কাকে কি বলেছে তাও ভুলে যেত। সে যখন কসেত্তের কাছে থাকত

না তখন তার মনে হত তার দেহে যেন প্রাণ নেই। অথচ কসেত্তেকে কাছে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে প্রাণ ফিরে পেত যেন সে। সে যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করত। সব প্রেমই এক জ্বলন্ত বিস্মৃতি যা আর সবকিছুকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। মেরিয়াসের কাছে কসেত্তে আর কসেত্তের কাছে মেরিয়াস ছাড়া আর কারও কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তাদের চারদিকে সমস্ত জগৎ মেঘের মতো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এক মহাশূন্যতায়। তারা শুধু ফুল, পাখি, সূর্যাস্ত আর চন্দ্রোদয়ের কথা বলাবলি করত। প্রেমিকদের কাছে যা যথাসর্বস্ব বাস্তব জগতে তার কোনও অর্থ নেই।

তারা যেন এক কল্পনার জগতে বাস করত। তারা যেন স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝামাঝি এক জায়গায় বাস করত। তারা যেমন রক্ত-মাংসের মানুষের মতো পৃথিবীর মাটির উপর হাঁটতে পারত না, তেমনি তারা আত্মা আর আবেগসর্বস্ব হলেও দেবদূতদেব মতো নীল আকাশে মিলিয়ে যেতে বা স্বর্গলোকে উঠে যেতে পারত না। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমন্বিত কালপ্রবাহ বা ভাগ্যের বিধান তাদের নাগাল পেত না বা তাদের স্পর্শ করতে পারত না। মর্ত্য জীবনের যে মুহূর্তগুলো তারা অন্যমনস্কভাবে যাপন করত সে মুহূর্তগুলি এমনই অবাস্তব ও হালকা ছিল যে তারা যে কোনও সময়ে অনন্তলোকের এক শূন্যতার মাঝে উড়ে গিয়ে মিলিয়ে যেতে পারত।

এক একসময় তারা কখনো চোখ বন্ধ করে, কখনো বা চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বসে বসে ঝিমোত। দেহটা তাদের বাস্তব জগতে থাকলেও তাদের মনগুলো এক আলস্যের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে এক আদর্শ জগতে মগ্ন হয়ে থাকত। তাদের সেই মুদ্রিত চোখের অন্ধকারে তাদের মগ্ন চৈতন্য শুধু আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেত না।

এইভাবে তাদের প্রেম কোথায় তাদের নিয়ে যাচ্ছে তা তারা বুঝতে পারত না। অথচ সব মানুষই চায় প্রেম কোথাও না কোথাও নিয়ে যাক।

৩

জাঁ ভলজাঁ কিছুই সন্দেহ করেনি।

মেরিয়াসের থেকে কম স্বপ্নালু ছিল কসেত্তের মনটা। কসেত্তের মনের আনন্দ দেখে মেরিয়াস খুশি হত। কসেত্তের মনে সব সময় মেরিয়াসের চিন্তা আর ছবিটা বিরাজ করলেও তার মুখের সরল হাসিহাসি ভাবটা ঠিকই থাকত। কোনও দেবদূত যেমন হাতে করে পদ্মফুল বয়ে নিয়ে যায় তেমনি কসেত্তে তার পবিত্র প্রেমকে বয়ে নিয়ে বেড়াত তার অন্তরে। কসেত্তের মনে একটা সহজ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ভাব দেখে ভলজাঁ স্বস্তি অনুভব করত মনে। কসেত্তে তার ব্যাপারটা যথাসম্ভব গোপন করে চলত। মনের কোনও বিকার সে তার বাবার কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করত না। কসেত্তে ভলজাঁর কোনও ইচ্ছার বিরোধিতা করত না কখনো। সে বাইরে যেতে চাইলে যেত আবার ঘরে থাকতে চাইলে থাকত। সন্ধ্যার সময় ভলজাঁ কোথাও না বেরোলে সে সারা সন্ধ্যাটা তার কাছেই বসে থাকত। তখন সন্ধ্যার সময় আসত

না মেরিয়াস। এলেও রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করত বাগানের বাইরে। কসেত্তে দশটার সময় তার ঘরের দরজা খুলে বাগানে এলে তবে সে আসত। সে দিনের বেলায় কখনো না আসায় কোনও সন্দেহ করত না ভলর্জা। মেরিয়াসের কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সে।

ভলর্জার মতো বৃদ্ধা তুসাঁও কিছু জানতে পারেনি। কারণ সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ত এবং তার ঘুম ছিল গভীর।

বাড়ির ভিতরে কখনো ঢুকত না মেরিয়াস। তারা বাগানে অথবা একতলায় সিঁড়ির কাছে এমন এক জায়গায় বসে থাকত যেখান থেকে তাদের দেখতে পাওয়া যেত না অথবা তাদের কোনও কথা শুনতে পাওয়া যেত না। বাগানের বেঞ্চের উপর হাত ধরাধরি করে বসে গাছের শাখাপ্রশাখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত তারা। সে সময় বজ্রপাত হলেও তারা হয়ত কোনওরূপ বিচলিত হত না। পদ্মের পাপড়ির মতো এক পবিত্র প্রেমচেতনার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকত তারা।

মেরিয়াস বাগান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় লোহার গেটটা এমনভাবে দিয়ে যেত যাতে কেউ বাগানে ঢুকেছিল বলে কিছু মনে হত না। সে বাগান থেকে রাত দুপুরে বেরিয়ে কুরফেরাকের বাসায় শুতে যেত।

কুরফেরাক বাহোরেলকে বলত, বিশ্বাস করবে, মেরিয়াস আজকাল রাত দুপুরে বাসায় ফেরে।

বাহোরেল বলত, তাতে কি হয়েছে? স্থির শান্ত জল গভীরভাবে বয়ে যায়।

কুরফেরাক এক একসময় মেরিয়াসকে বলত, তুমি কিন্তু পথের বাইরে চলে যাচ্ছ ছোকরা।

সে খুবই বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ছিল বলে মেরিয়াস মনে মনে যে স্বর্গসুখ অনুভব করত তার কথা কিছু বুঝতে পারত না। মেরিয়াসের গতিবিধি লক্ষ্য করে সে শুধু বিরক্ত বোধ করত। একদিন সে মেরিয়াসকে বলল, আমার মনে হচ্ছে আজকাল তুমি চাঁদ আর স্বপ্নের জগতে বাস করছ। এই চাঁদ আর স্বপ্ন হচ্ছে সাবানের ফেনার রাজ্যের রাজধানী। এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো মেয়েটির নামটা বলবে?

কিন্তু কিছুতেই তার প্রেমিকার নামটা বলত না মেরিয়াস। তার প্রেম সম্বন্ধে কোনও কথাই বলত না। কোনও পীড়নই তার ভিতর থেকে কসেত্তে এই নামটা বার করতে পারবে না। প্রেমিকাদের মুখ সাধারণত সকালের আলোর মতো উজ্জ্বল হলেও সমাধিস্তম্ভের মতো নীরব থাকে। তবু কুরফেরাকের মনে হত মেরিয়াসের মনের এক অন্ধকার গোপনতা উজ্জ্বলভাবে সোচ্চার হয়ে উঠছে।

মে মাসের মাঝামাঝি মেরিয়াস আর কসেত্তের প্রেমানুভূতির তৃপ্তি চরমে উঠল। তারা মাঝে মাঝে কথাবার্তা আর হাসির উচ্ছলতায় ফেটে পড়লেও পাশাপাশি ঘন হয়ে অন্ধকারে বসে আকাশে মুখ তুলে একই তারার দিকে তাকিয়ে থাকত অথবা মাটির দিকে তাকিয়ে একই জোনাকির উড়ে চলা দেখতে সবচেয়ে ভাল লাগত তাদের। এই নীরবতার মাঝে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেত তারা।

এদিকে জটিলতার একটা মেঘ ঘনিয়ে উঠতে লাগল তাদের অলক্ষ্যে।

একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় মেরিয়াস বুলভার্দ দে ইনভালিদে হয়ে তাদের সঙ্কেতকুঞ্জের দিকে অভিসারে আসছিল। সে মুখ নিচু করে পথ হাঁটছিল। রু প্লামেতের দিকে মোড় ঘুরতেই কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।

শুভসন্ধ্যা, মঁসিয়ে মেরিয়াস।

মুখ তুলে তাকিয়ে সে দেখল এপোনিনে দাঁড়িয়ে আছে। অভিসারের পথে হঠাৎ একটা বাধা পেয়ে মনে মনে একটা জোর আঘাত পেল সে। যেদিন এপোনিনে তাকে র‍্যু প্লামেতের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে যায় সেদিনের পর থেকে তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি তার। তার কথা মুছে দিয়েছিল একেবারে। এপোনিনের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া তার উচিত ছিল। আজ যে প্রেমের সুখ উপভোগ করছে এর জন্য ঋণী সে তার কাছে। কিন্তু তাকে দেখে বিরক্তিবোধ করল সে।

প্রেম যতই নির্দোষ নিষ্পাপ বা সুখের হোক না কেন, সে প্রেম মানুষকে পূর্ণতা দান করে এটা মনে করা ভুল। প্রেম শুধু মানুষকে ভুলিয়ে দেয় সব কিছু। প্রেমিক যেমন খারাপ হতে ভুলে যায়, তেমনি ভাল হতেও ভুলে যায়। সব কৃতজ্ঞতা বা বাধ্যবাধকতাবোধ, দৈনন্দিন জীবনের সব কর্তব্যবোধ দূরীভূত হয়ে যায় তার মন থেকে। অন্য সময় হলে হয়ত এপোনিনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত, কিন্তু এখন তার মনটা কসেত্তের চিন্তায় মগ্ন থাকার জন্য তার নাম যে এপোনিনে এবং একমাস আগে কসেত্তের ঠিকানা যোগাড় করে দিয়ে তার উপকার করেছে সে একথা সে ভুলে গেল একেবারে। এমন কি তার প্রেমবোধের উজ্জ্বল আলোয় তার বাবার স্মৃতিটাও ম্লান হয়ে গেল অনেকখানি।

সে বিরক্তির সঙ্গে বলল, ও, তুমি এপোনিনে?

এপোনিনে বলল, এমন নীরসভাবে কথা বলছ কেন? আমি কি কোনও অন্যায় করেছি?

না।

আসলে এপোনিনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই ছিল না তার। মোট কথা হলো এই যে তার মনের সব নিবিড়তা, অন্তরের সবটুকু উত্তাপ কসেত্তের উপর কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্য এপোনিনের জন্য তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মেরিয়াস। এপোনিনে বলল, কিন্তু কেন— ?

তবে এপোনিনে বুঝল, এমন অমনোযোগী লোকের সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে না। তাই সে চুপ করে গেল। সে তার মুখের উপর হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সে শুধু বলল, 'ঠিক আছে।' তারপর আবার চুপ করে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বল· বিদায়, শুভরাত্রি মঁসিয়ে মেরিযাস।

এই বলে সে চলে গেল।

৪

এর পরের দিনটি ছিল ১৮৩২ সালের ৩রা জুন। এই দিনটি মনে রাখার মতো

দিন, কারণ তখন প্যারিসের মাথার উপর বজ্রগর্ভ এক মেঘের মতো বড় রকমের কতকগুলি ঘটনা ওৎ পেতে বসেছিল।

সেদিনও সন্ধ্যার সময় মেরিয়াস যথারীতি র‍্যু প্লামেতের দিকে হেঁটে চলেছিল একই পথ দিয়ে। তার মনে তখন ছিল একই চিন্তা, অন্তরে ছিল একই তৃপ্তিবোধ। সে দেখল গাছের আড়াল থেকে এপোনিনে তার দিকে এগিয়ে আসছে। পর পর দু'দিন এমন সময় তাকে দেখে বিরক্তি আরও বেড়ে গেল তার। সে কোনও কথা বলল না। সে সোজা তার পথে চলে গেল।

এপোনিনে আজ তাকে অনুসরণ করতে লাগল তার পিছু নিয়ে। এর আগে কখনো এ কাজ করেনি সে। এর আগে কিছুদিন সে তার পথের ধারে গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে মেরিয়াসকে। শুধু গতকালই প্রথম তার সামনে এসে কথা বলে।

এপোনিনে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখল র‍্যু প্লামেতের সেই বাড়িসংলগ্ন বাগানের লোহার গেট ঠেলে বাগানের ভিতর ঢুকে গেল মেরিয়াস। এপোনিনে মনে মনে বলল, ও তাহলে বাড়ির ভিতরে যাচ্ছে।

গেটের পাশে পাহারাদারের মতো সিঁড়ির উপর বসে পড়ল এপোনিনে। জায়গাটা এক কোণে থাকায় তাকে দেখা যাচ্ছিল না। সে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বসে বসে ভাবতে লাগল। দশটার সময় সহসা দেখল একজন একজন করে ছ'জন লোক গেটের সামনে এসে জড়ো হলো। তারা নিচু গলায় কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

একজন বলল, এই কি সেই বাড়িটা ?

আর একজন বলল, কুকুর আছে বাড়িতে ?

অন্য একজন বলল, জানি না, তবে কুকুরের জন্য খাবার এনেছি।

একজন বলল, জানালার কাঁচ ভাঙার জন্য গাম দেওয়া কাগজ এনেছ ?

হ্যাঁ এনেছি।

লোহার গেটটা পুরনো।

ঠিক আছে, রেলিংগুলো ভেঙে ভিতরে ঢুকতে অসুবিধে হবে না কোনও।

একজন গেটটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য এগিয়ে গেল। সে দেখল একটা রেলিং আলগা আছে আগে হতে। সেই রডটা সরিয়ে দিলে একজন ঢুকতে পারে। কিন্তু সেটা সে সরাতে যেতেই একটা হাত পাশ থেকে এসে ধরে ফেলল। এক নারীকণ্ঠ বলল, হ্যাঁ, কুকুর আছে। পাহারাদার কুকুর।

এবার একটি মেয়ের মূর্তি তার সামনে এসে হাজির হলো। অপ্রত্যাশিত বাধা পেয়ে থতমত খেয়ে গেল লোকটি। সে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে বলল, কোন শয়তান তুমি ?

তোমার মেয়ে।

লোকটি ছিল থেনার্দিয়ের। অন্য পাঁচজন ছিল, ক্লাকেসাস, গুয়েলবার, বাবেত, মঁতপার্নেসী আর ব্রুজোঁ। তারা থেনার্দিয়েরের চারপাশে এসে দাঁড়াল। তাদের হাতে নানারকমের অস্ত্র আর যন্ত্রপাতি ছিল।

থেনার্দিয়ের এপোনিনেকে বলল, এখানে কি করছিস? কি চাস তুই? তুই কি পাগল হয়ে গেলি?

কথাগুলো সে যতদূর সম্ভব নিচু গলায় বলল। সে আরও বলল, তুমি কি আমার সব কাজ পণ্ড করতে এসেছ?

এপোনিনে হাসতে হাসতে তার বাবার ঘাড়টা জড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, আমি এখানে আছি মানেই আছি। রাস্তার ধারে বসে থাকারও কি কোনও অধিকার নেই আমার? তোমারই এখানে আসা উচিত নয় একেবারে। আমি তো ম্যাগননকে আগেই বলে দিয়েছিলাম এখানে কিছু নেই। কত দিন তোমাকে দেখিনি। তুমি যখন আবার বাইরে এসেছ আমাকে অন্তত একটা চুম্বন করতে পার।

থেনার্দিয়ের বিরক্তির সঙ্গে এপোনিনের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। বলতে লাগল, ঠিক আছে, তুমি তো আমায় চুম্বন করেছ, এবার যাও।

এপোনিনে বলল, কিন্তু কেমন করে বেরিয়ে এলে জেল থেকে? সত্যিই খুব চালাক তুমি। মা কোথায়? মার কথা বল।

থেনার্দিয়ের বলল, সে ঠিক আছে, কোথায় আছে এখন তা জানি না। এখন যাও দেখি।

এপোনিনে বলল, কিন্তু আমি যেতে চাই না। কতদিন পর দেখা আর তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?

সে আরও জোরে জড়িয়ে ধরল তার বাবাকে।

বাবেত বলল, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

থেনার্দিয়ের এপোনিনেকে বলল, তাড়াতাড়ি চলে যাও, পুলিশ এসে পড়বে।

এপোনিনে অন্যদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কি মঁসিয়ে ব্রুজোঁ, মঁসিয়ে ক্লাকেসাস, শুভসন্ধ্যা! মঁসিয়ে গুয়েলমার, তোমরা আমাকে চিনতেই পারছ না? কেমন আছ মঁতপার্নেসী?

থেনার্দিয়ের বলল, ঠিক আছে, তোমাকে ওরা সবাই চেনে। এখন ঈশ্বরের নামে বলছি, চলে যাও। আমাদের শান্তিতে কাজ করতে দাও।

মঁতপার্নেসী বলল, এখন খেঁকশেয়ালের কাজ করার সময়, মুরগীদের নয়।

বাবেত বলল, দেখছ, আমাদের একটা কাজ করার আছে।

এপোনিনে মঁতপার্নেসীর একটা হাত ধরতেই সে বলে উঠল, সাবধান, ছুরিটা খোলা আছে।

এপোনিনে বলল, প্রিয়তম মঁতপার্নেসী, মঁসিয়ে বাবেত, গুয়েলমার, তোমাদের মনে নেই, এই জায়গাটার উপর নজর রাখতে বলা হয়েছিল আমাকে? তোমরা জান, আমি বোকা নই। আমি বলছি আমি দেখেছি, এখানে কিছু নেই। শুধু শুধু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কি লাভ?

গুয়েলমার বলল, এ বাড়িতে শুধু দু'জন মহিলা থাকে।

না, কেউ থাকে না, সব চলে গেছে।

বাবেত বলল, কিন্তু বাতি জ্বলছে।

গুয়েলমার হাত বাড়িয়ে দেখাল, গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাড়িতে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। কাচা পোশাক শুকোবার জন্য লণ্ঠনটা জ্বেলে রেখেছিল তুসাঁ।

এপোনিনে বলল, যাই হোক, ওরা বড় গরীব। মূল্যবান কিছু নেই।

থেনার্দিয়ের বলল, জাহান্নামে যাও তুমি। বাড়িটা উপর থেকে নিচে পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখব আমরা কি আছে না আছে।

থেনার্দিয়ের এপোনিনেকে সরিয়ে দিল।

এপোনিনে মঁতপার্নেসীকে বলল, তুমি আমার বন্ধু, তুমি ভাল ছেলে, তুমি ভিতরে যেও না।

মঁতপার্নেসী বলল, ছুরিতে হাত কেটে যাবে তোমার।

থেনার্দিয়ের গম্ভীরভাবে বলল, চলে যাও বলছি, আমাদের কাজ করতে দাও।

মঁতপার্নেসীর হাতটা ছেড়ে দিয়ে এপোনিনে বলল, তোমরা তাহলে ভিতরে ঢুকবেই ?

মঁতপার্নেসী বলল, ঠিক বলেছ।

এপোনিনে বলল, ঠিক আছে, আমিও তোমাদের কিছুতেই ঢুকতে দেব না।

এই বলে সে গেটের উপর পিঠটা দিয়ে ছয়জন সশস্ত্র লোকের সামনে দাঁড়াল। অন্ধকারে লোকগুলোকে দানবের মতো দেখাচ্ছিল। এপোনিনে দৃঢ় অথচ নিচু গলায় বলতে লাগল, আমার কথা শোন। যদি বাগানে ঢোকার চেষ্টা করো এবং এই গেটটায় হাত দাও তাহলে চিৎকার করে পাড়ার সব লোকদের জাগিয়ে দেব। তোমাদের সবাইকে ধরিয়ে দেব।

থেনার্দিয়ের ব্রুজোঁ ও মঁতপার্নেসীকে বলল, ও সত্যিই তা করবে।

এই বলে সে এপোনিনের দিকে এগিয়ে যেতেই সে বলল, খবরদার, আর এগোবে না।

থেনার্দিয়ের পিছিয়ে গেল, ওর মাথায় কি ঢুকেছে ? কুকুরী কোথাকার।

এপোনিনে হাসতে লাগল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। হাসতে হাসতে সে বলল, যা খুশি বলতে পার, আমি হচ্ছি নেকড়ের মেয়ে, কুকুরের নয়। তোমরা ছয়জন আর আমি একা মেয়েছেলে। তোমরা বাড়িতে ঢুকবে না। আমি পাহারাদার কুকুর, যদি ঢোক তাহলে আমি ঘেউ ঘেউ করে ডাকব। যেখানে খুশি যেতে পার, কিন্তু এখানে নয়। আমি তোমাদের ঢুকতে দেব না।

তাদের দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে এপোনিনে বলল, আমার কথা ভাবতে হবে না তোমাদের। আমি গ্রীষ্মকালে অভুক্ত থাকি আর শীতকালে হিমে জমে যাই। আমার বাবা যদি আমাকে পিটিয়ে মেরে আমার দেহটাকে পথের ধারে ফেলে দেয় তাতেও আমি গ্রাহ্য করি না। সুতরাং আমাকে ভয় দেখিও না।

হঠাৎ কাশিতে তার কথা আটকে গেল। বুকের ভিতর থেকে আসছিল কাশিটা। কাশি সামলে সে বলল, আমাকে শুধু একবার চিৎকার করতে হবে। তাহলে লোক ছুটে আসবে। তোমরা ছয়জন আছ, কিন্তু আমার পিছনে আছে জনগণ।

থেনার্দিয়ের এপোনিনের দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমি চলে যাও। ঠিক আছে, তুমি চেঁচিও না। আস্তে কথা বল। তুমি আমাকে কাজ করতে দেবে না? আমাকে জীবিকা অর্জন করতে হবে তো? তোমার বাবার উপর একটু দয়া নেই? আমাদের খেতে হবে তো?

তোমরা খাও না খাও আমার দেখার দরকার নেই।

এই কথা বলে সে আবার গেটের সামনে সিঁড়িতে বসে গান গাইতে লাগল আপন মনে।

একটা হাঁটুর উপর আর একটা হাঁটু দিয়ে, হাঁটুর উপর কনুই রেখে, আবাব হাতের উপর তার চিবুক রেখে পা নাডতে নাড়তে গান করছিল এপোনিনে। রাস্তার আলোর একটা ফালি এসে তার চেহারার উপর পড়েছিল। ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে তার কাঁধের হাডগুলো দেখা যাচ্ছিল।

এমন অদ্ভুত ছবি দেখাই যায় না।

ছযজন দুর্বৃত্ত ছাযাব মধ্যে অদৃশ্য হযে গেল। তারা একটি তরুণীর কাছে হেরে গেল। তারা প্রচণ্ড বাগের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে লাগল। বাবেত [illegible] নিশ্চয এর পিছনে কোনও কারণ আছে। মেয়েটা হযত কুকুরটার প্রেমে পডেছে। কিন্তু বাডিটাতে তো আছে দু'জন মহিলা আর একটা বুডো। তবে জানালা-দরজায ভাল ভাল পর্দা আছে। একবার দেখলে হত।

মঁতপার্নেসী বলল, তোমরা অন্য দিক দিযে ভিতরে যাও। আমি মেযেটাকে আটকে রাখব, তার সঙ্গে কথা বলব। যদি চেঁচামিচি করে তাহলে আমার ছুরি আছে।

থেনার্দিযের কোনও কথা বলল না। ওদেব হাতেই সিদ্ধান্তের ভারটা ছেডে দিল।

ব্রুজোঁব উপর ওরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। কারণ তার বুদ্ধি, সাহস আর শক্তি বেশি এবং এর আগে অনেকবার তার পরিচয়ও দিযেছে। ব্রুজোঁ কিন্তু এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। সে আবার মাঝে মাঝে কবিতা লিখত· সেইজন্য তারা সবাই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

বাবেত ব্রুজোঁকে বলল, কথা বলছ না কেন?

ব্রুজোঁ বলল, আজ সকালে আমি দুটো চড়ুই পাখিকে ঝগডা করতে দেখেছিলাম আর আজ বিকালে একটি মহিলার গায়ে আমার ধাক্কা লাগে। এ দুটোই কুলক্ষণ। সুতরাং চল এখান থেকে।

তারা সেখান থেকে চলে গেল। মঁতপার্নেসী বিডবিড় করে বলল, মেয়েটাকে দরকার হলে বেশ একটা শিক্ষা দিতে পারতাম।

বাবেত বলল, আমি মেয়েদের গায়ে হাত দিই না।

এপোনিনে দেখল ওরা কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। সে ওদের অলক্ষ্যে চুপিসাড়ে কিছুক্ষণ অনুসরণ করতে লাগল। তারপর দেখল ওরা বুলভার্দ পর্যন্ত গিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়ে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৫

র‍্যু প্লামেতের গেটের বাইরে ছয়জন দুর্বৃত্ত যখন এপোনিনের সঙ্গে ঝগড়া করছিল তখন মেরিয়াস কসেত্তের কাছে বাগানে বসেছিল। তারা এ সবের কিছুই জানতে পারেনি। এমন নক্ষত্রখচিত মনোরম রাত্রি তারা যেন আগে কখনো দেখেনি। সব গাছপালার মৃদু কম্পন, পাখির এমন গান তারা যেন এর আগে কখনো শোনেনি। তারা গাছপালার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাদের প্রেমের অশ্রুত সঙ্গীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্বের ঐকতানের সুরলহরী এমন মধুরভাবে কখনো বয়ে যায়নি। মেরিয়াস এতখানি মুগ্ধ আর কখনো হয়নি।

কিন্তু মেরিয়াস দেখল কসেত্তের মনটা ভাল নেই। সে কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো। এই প্রথম মেঘ জমল তাদের স্বচ্ছ অন্তরের আকাশে।

মেরিয়াস একসময় বলল, কি হয়েছে তোমার?

কসেত্তে তার পাশে বসে বলল, আজ সকালে বাবা আমাকে তৈরি হয়ে নিতে বলল। বলল কাজ আছে তার। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাদের।

মেরিয়াসের সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। জীবনের শেষে মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই এনে দেয় চিরবিচ্ছেদ, কিন্তু জীবন যখন শুরু সবেমাত্র, তখন বিচ্ছেদ মানেই মৃত্যু।

গত ছয় সপ্তার মধ্যে মেরিয়াস কসেত্তের মনটাকে ধীরে ধীরে জয় করে ফেলেছিল। এ জয় আত্মিক জয়, দেহের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এ জয় গভীরভাবে তার আত্মাটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। প্রথম প্রেমের ক্ষেত্রে তাই হয়। প্রথমে প্রেমিক প্রেমাস্পদের আত্মাটাকে জয় করে, তারপরে তার দেহ। পরে দেহই আত্মার উপর প্রাধান্য লাভ করে। তখন আত্মার কথা আর মনে থাকে না। মেরিয়াস কসেত্তের গোটা আত্মাটাকে যখন শতপাকে বেঁধে তার দিকে দুর্বারবেগে টানছিল, তার মুখের হাসি, নীল চোখের সব আলো, তার নিঃশ্বাসের সুগন্ধ, ত্বকের মসৃণতা, তার গ্রীবাদেশের ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য, তার সকল চিন্তা দিনে দিনে দখল করে ফেলেছিল সে। রাত্রিতেও মেরিয়াসের কথা একবার না ভেবে ঘুমোত না সে। সুতরাং তার জীবনের স্বপ্নের উপরেও অধিকার বিস্তার করে ফেলেছিল মেরিয়াস। কসেত্তের ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে থাকা সুন্দর চুলগুলোর উপর সে তাকিয়ে থাকত যখন, যখন তার নিঃশ্বাসে সে চুলগুলো নড়ত তখন সে ভাবত কসেত্তের এমন কিছুই নেই যা তার অধিকারের মধ্যে আসেনি। কসেত্তের সাজ-পোশাকের প্রতিটি বস্তু ও উপকরণগুলো দেখতে দেখতে তার মনে হত তার গায়ে যা কিছু আছে সেই সব কিছুরই সে-ই হলো একমাত্র স্বত্বাধিকারী। কসেত্তের পাশে বসে থাকতে থাকতে কসেত্তের জীবনের গোটা রাজ্যটাই তার দখলে। মনে হত তাদের দু'জনের আত্মা এমনভাবে মিশে গেছে পরস্পরের মধ্যে যে যদি কোনওদিন সে আত্মা দুটি বিচ্ছিন্ন হতে চায় তাহলে কার অংশ কতখানি তা কেউ বলতে পারবে না। তখন একজন আর একজনকে বলবে, যেটা তুমি তোমার অংশ বলে দাবি করছ আসলে

সেটা আমার। আসলে মেরিয়াস কসেত্তেরই একটা অংশ আর কসেত্তে মেরিয়াসেরই একটা অংশ। মেরিয়াস অনুভব করল কসেত্তের জীবন তার মধ্যেই মিশে আছে, সে একান্তভাবে আমার। কিন্তু এমন সময় কসেত্তে যখন বলল, 'আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে,' তখন মেরিয়াস সহসা বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে প্রথম সচেতন হয়ে বুঝল কসেত্তে তার নয়।

সহসা জেগে উঠল মেরিয়াস। ছয় সপ্তা ধরে সে যেন এই পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীর বাইরে গিয়ে এক অশরীরী অবাস্তব জীবন যাপন করছিল। আজ আবার বাস্তব জগৎ ও জীবনের মধ্যে ফিরে এল এক রূঢ় আঘাত খেয়ে।

কসেত্তে দেখল মেরিয়াসের হাতটা ভীষণভাবে ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। সে তাই বলল, কি হয়েছে তোমার?

মেরিয়াস ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছ।

কসেত্তে বলল, আজ সকালেই বাবা আমাকে বলল, তার সঙ্গে আমাকে ইংলন্ড যেতে হবে; আমি যেন মালপত্র গুছিয়ে রাখি। এক সপ্তার মধ্যে আমাদের রওনা হতে হবে।

মেরিয়াস বলল, কিন্তু এ যে ভয়ঙ্কর কথা।

তার মনে হলো টাইবেরিয়াস থেকে অষ্টম হেনরি পর্যন্ত যত অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসক পৃথিবীতে এসেছে তারা কেউ মঁসিয়ে ফশেলেভেন্তের মতো নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে পারেনি। তার মেয়েকে মেরিয়াসের কাছ থেকে অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া যেন মঁসিয়ে ফশেলেভেন্তের এক জঘন্য অপরাধ।

মেরিয়াস ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, ঠিক কবে যাচ্ছ তোমরা?

তা কিছু বলেনি।

মেরিয়াস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কখন তোমরা ফিরে আসছ?

তাও বলেনি।

তুমি কি সত্যিই যাচ্ছ কসেত্তে?

কিন্তু—

তুমি কি ইংলন্ডে যাচ্ছ?

তুমি আমার উপর এতখানি নিষ্ঠুর হচ্ছ?

তুমি যাচ্ছ কি না আমি শুধু তাই জিজ্ঞাসা করছি।

কিন্তু বাবা যদি যায় আমি কি করতে পারি?

কসেত্তে তার হাত দুটো মোচড়াতে লাগল।

মেরিয়াস বলল, ঠিক আছে, আমি চলে যাব।

কসেত্তের মুখখানা ভয়ে এতদূর সাদা হয়ে গেল যে অন্ধকারেও তা দেখা যাচ্ছিল। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, কি বলতে চাইছ তুমি?

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে মেরিয়াস দেখল কসেত্তে হাসছে। হঠাৎ হাসির ঝলকানিতে তার মুখটা চকচক করছে। সে বলল, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

মেরিয়াস বলল, কি বুদ্ধি?

আমাকে যদি যেতেই হয় তুমিও চল না ইংলন্ডে।

এবার পুরোমাত্রায় বাস্তব সচেতন হয়ে উঠল মেরিয়াস। সে যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠল। সে বলতে লাগল, তা কি করে সম্ভব? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? ইংলন্ডে যেতে হলে টাকার দরকার। আমার একেবারেই টাকা নেই। কুরফেরাকের কাছে ইতিমধ্যেই দশ লুই ধার হয়ে গেছে। অবশ্য সে আমার বন্ধু। আমি যে টুপিটা পরে আছি তার দাম তিন ফ্রাঁও হবে না। আমার জামার অনেক বোতাম নেই। আমার জুতো ফুটো হয়ে গেছে। আজ ছয় সপ্তা ধরে কোনও দিকে তাকাতে পারিনি। তোমাকে এ সব কথা জানাইনি। কিন্তু আমি সত্যিই খুব গরীব কসেত্তে। তুমি শুধু রাত্রিতে আমাকে দেখ, আমাকে তোমার হাত দাও, কিন্তু দিনের বেলায় দেখা হলে তুমি আমায় ভিক্ষা দেবে। ইংলন্ড! আমি পাশপোর্ট যোগাড় করতেই পারব না।

মেরিয়াস এবার উঠে দাঁড়িয়ে একটা গাছের গুঁড়ির উপর মুখটা ঠেকিয়ে দাঁড়াল। হতাশায় এমনভাবে ভেঙে পড়ল সে যে মনে হলো গাছে হেলান না দিয়ে থাকলে পড়ে যেত। এইভাবে অনেকক্ষণ রইল। পরে কিসের একটা মৃদু শব্দে পিছন ফিরে তাকাল। সে দেখল কসেত্তে কাঁদছে। মেরিয়াস তখন নতজানু হয়ে বসে কসেত্তের আঁচল ধরে পা দুটো চুম্বন করল। কসেত্তে কোনও কথা বলল না। সে দেবীর মতো বসে তার প্রেমিকের অঞ্জলি গ্রহণ করে যেতে লাগল নীরবে।

মেরিয়াস বলল, কেঁদো না।

কিন্তু আমাকে যদি যেতে হয় তাহলে তুমি তো যেতে পারবে না।

তুমি কি আমাকে ভালবাস?

কসেত্তে চোখে জল নিয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল, আমি তোমাকে দেবতার মতো পূজা করি।

মেরিয়াস তখন কম্পিত কণ্ঠে বলল, তাহলে কেঁদো না, আমার জন্য অন্তত এটুকু করো।

কসেত্তে বলল, তুমি আমাকে ভালবাস?

কসেত্তের একটি হাত নিয়ে মেরিয়াস বলল, কসেত্তে, আমি কাউকে কোনও প্রতিশ্রুতি দিইনি। কিন্তু আজ আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যদি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমি মরে যাব।

কথাটা এমন গম্ভীরভাবে বলল মেরিয়াস যাতে কসেত্তের মনের উপর সেটা বেশ প্রভাব বিস্তার করল। সে কান্না থামিয়ে চুপ করে রইল।

মেরিয়াস বলল, আমার কথা শোন। আগামীকাল আমাকে এখানে আশা করো না। কাল আমি আসব না।

কিন্তু কেন? কাল কি করবে?

পরশু আসব। পরশুর আগে নয়।

মেরিয়াস কসেত্তের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তার চোখের পানে তাকিয়ে তার মনের কথা বোঝার চেষ্টা করল।

মেরিয়াস বলল, আমার ঠিকানাটা দিচ্ছি, রেখে দেবে, যদি কোনও দরকার হয়। আমি ১৬ রু্য দ্য লা ভেরিয়েতে কুরফেরাক নামে আমার এক বন্ধুর কাছে থাকি।

পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বার করে মেরিয়াস পাঁচিলের গায়ে তার ঠিকানাটা খোদাই করে দিল।

কসেত্তে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর বলল, কি ভাবছ তুমি মেরিয়াস? মনে হয় কি তুমি ভাবছ। আমাকে বল, তা না হলে রাত্রিতে আমার ঘুমই হবে না।

আমি শুধু এই কথাই ভাবছি যে ঈশ্বর কিছুতেই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবেন না। আমি কাল বাদ পরশু সন্ধ্যাব সময় আবার আসব।

কিন্তু কাল আমি কি করব? তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার অনেক কাজ আছে। তুমি বাইরে বেড়াবে। তোমাদের সুবিধা আছে। কিন্তু আমি একা একা কি করব? কি করে সময়টা কাটাব? কাল সন্ধ্যায় তুমি কি করবে?

কাল আমি এক জায়গায় কাজের চেষ্টায় যাব।

আমি তোমার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করব। কাল সন্ধ্যায় আমি একটা গান গাইব যে পার্শনাব গানটা তুমি একদিন বাড়ির বাইরে থেকে শুনেছিলে, যে গানটা তুমি ভালবাস শুনতে। কিন্তু পরশু ঠিক ন'টায় আসা চাই, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।

মেরিয়াস বলল, ঠিক আছে। ঐ সময় আমি আসব এখানে।

এরপর তারা আবেগের সঙ্গে আলিঙ্গন করল পরস্পরকে। এক নিবিড় চুম্বনে ঠোঁটগুলি যুক্ত হলো তাদের। কিন্তু তাদের চোখগুলি আকাশের তারার পানে উত্তোলিত ছিল।

মেরিয়াস যখন বাগান থেকে বেরিয়ে এল তখন রাস্তাটা জনমানবহীন হয়ে উঠেছে। এপোনিনে সেই দুর্বৃত্তদের অনুসরণ করতে করতে বুলভার্দ পর্যন্ত চলে গেছে।

মেরিয়াস যখন একসময় বাগানে একটা গাছের গুঁড়িতে খ দিয়ে ভাবছিল তখন সে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়।

৭

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বয়স একানব্বই বছর পূর্ণ হয়েছে। তিনি তখনো তাঁর মেয়ের সঙ্গেই সেই বাড়িতে বাস করছিলেন। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের দেহটা এমন এক প্রাচীন ধাঁচে গড়ে উঠেছিল যাতে তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মৃত্যুর জন্য নির্ভীক ও খাড়াখাড়িভাবে অপেক্ষা করতেন। বয়সের ভার, বার্ধক্যের ভার নত করতে পারেনি তাঁকে। সবচেয়ে তিক্ত হতাশাও তাঁর মন দমাতে পারেনি।

তবু ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ প্রায়ই বলত, আমার বাবার শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে। আর তিনি আগের মতো চাকরদের বকাবকি করেন না, জুলাই বিপ্লব সম্বন্ধে মনিতিউর কাগজ পড়ে আর রাগারাগি করেন না আগের মতো। তিনি এক হতাশায় ভুগছেন। তাঁর দেহগত ও মনোগত প্রবৃত্তির অনমনীয়তার জন্য এই হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ

না করলেও তিনি বেশ বুঝতে পারতেন তাঁর অন্তরটা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। চার বছর ধরে তিনি আশা করে আসছেন মেরিয়াস একদিন না একদিন তাঁর বাড়িতে ফিরে আসবে। কিন্তু সে না আসায় এক অপরিহার্য অপরিসীম বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তিনি। আসন্ন মৃত্যু তাঁর কাছে এমন কিছু দুর্বিষহ ব্যাপার নয়। তাঁর একমাত্র চিন্তা মৃত্যুর আগে তিনি মেরিয়াসকে আর দেখতে পাবেন না।—এই চিন্তাটাই দুর্বিষহ তাঁর কাছে। এই চিন্তা আগে কখনো তাঁর মনে আসেনি, কিন্তু আজকাল এ চিন্তাটা ঘুরে ফিরে প্রায়ই তাঁর মনে আসে, তাঁকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। এ চিন্তা মেরিয়াসের প্রতি তাঁর স্নেহটাকে বাড়িয়ে দেয়। অথচ মেরিয়াসের সঙ্গে পুনর্মিলনের কোনও চেষ্টাই করেন না তিনি। মৃত্যুপথযাত্রী তাঁর বৃদ্ধ অন্তরটা এক নীরব হাহাকারে ফেটে পড়ে। মেরিয়াস নিজে থেকে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে, এ ব্যাপারে তাঁর কোনও দোষ নেই, তবু তার প্রতি এক গভীর গোপন মমতায় হৃদয় পরিপূর্ণ ও আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তাঁর কেবলি মনে হয় তিনি আর সহ্য করতে পারবেন না। তিনি এই দুঃখে মারা যাবেন। তাঁর দাঁতগুলো একে একে পড়ে যায়। এতে তাঁর অস্বস্তি আরও বেড়ে যায়।

তবু তিনি এটা বাইরে প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁর অন্তরের গভীর গোপনে অনুভূত এই দুঃখ আর হতাশার কথা বাইরে মুখ ফুটে বলতে পারেন না। এজন্য একটা প্রচণ্ড রাগ নিষ্ফল আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। তাঁর শোবার ঘরে ছোট মেয়ের ফটোটার দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকেন তিনি। ফটোটা তার আঠারো বছর বয়সে তোলা। সে এখন নেই। একবার তিনি ফটোটার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন আপন মনে, মেরিয়াস দেখতে তার মায়ের মতো।

ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ তা শুনে বলল, হ্যাঁ, ও দেখতে আমার বোনের মতো।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বলেন, ও ওর বাবার মতোও।

একদিন তিনি যখন হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে বসে ছিলেন তখন তাঁর মেয়ে বলে, বাবা, তুমি এখনো তার প্রতি রেগে আছ?

কার উপর?

বেচারা মেরিয়াসের উপর?

হ্যাঁ বেচারা মেরিয়াসই বটে। একটা অপদার্থ শয়তান ভদ্রলোক যার মধ্যে কোনও মায়ামমতা বা কৃতজ্ঞতাবোধ নেই।

তিনি মুখটা সরিয়ে নিলেন যাতে তাঁর চোখের জল তাঁর মেয়ে দেখতে না পায়। তিনি বললেন, আমি আগেই বলেছি, ওর কথা যেন আর উল্লেখ করা না হয়।

অবশেষে ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ এ বিষয়ে আর কোনও চেষ্টা করল না। ভাবল, তার বাবা তাঁর ছোট মেয়ে তাঁর অমতে বিয়ে করায় তাকে ঘৃণা করতেন এবং মেরিয়াসকেও ঘৃণার চোখে দেখেন। মেরিয়াসের পরিবর্তে সে থিওদুলকে তাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তাকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর অন্তরে মেরিয়াসের শূন্য আসনটা পূরণ করতে পারেনি সে। থিওদুল আনন্দোচ্ছল,

কিন্তু বড় বাচাল আর চপল প্রকৃতির। তাকে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের ভাল লাগেনি মোটেই। তিনি তাঁর মেয়েকে স্পষ্ট বলে দেন, তোমার যা খুশি করতে পারো, কিন্তু থিওদুলের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

সেদিন ছিল ৪ঠা জুনের সন্ধ্যাবেলা। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তাঁর ঘরে জ্বলন্ত আগুনের কাছে একটা আর্মচেয়ারে বসে ছিলেন। একই সঙ্গে তিক্ততা আর মমতার সঙ্গে তিনি মেরিয়াসের কথাই ভাবছিলেন। তাঁর অন্তরে স্নেহমমতার প্রবণতা সব সময় প্রচণ্ড ক্রোধে পরিণত হত। মেরিয়াসের আসার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না, কারণ সে এলে আগেই আসত। আর কোনও আশা নেই। মৃত্যুর আগে তার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তাই তিনি এ বিষয়ে চরম হতাশাটাকেই সহজভাবে বরণ করে নেবার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তবু তাঁর অন্তরের সব বৃত্তিগুলি তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। তিনি আগুনের দিকে প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে তাকিয়ে ছিলেন।

এমন সময় তাঁর ভৃত্য বাস্ক এসে বলল, মঁসিয়ে মেরিয়াস দেখা করতে চান।

কে ?

বাস্ক ভয় পেয়ে বলল, আমি ঠিক জানি না, আমি তাঁকে আগে কখনও দেখিনি। তবে নিকোলেত্তে বলল, মঁসিয়ে মেরিয়াস নামে এক যুবক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, নিয়ে এস তাকে।

এই বলে কম্পিত বুকে দরজার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল মেরিয়াস। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আহ্বানের অপেক্ষায় রইল। ঘরের আধো আলো-অন্ধকারের মাঝেও তার ছেঁড়া ময়লা পোশাকের দীনতা দেখা যাচ্ছিল। তবে তার শান্ত গম্ভীর মুখের বিষাদ-করুণ ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। সহসা ভূত দেখলে যেমন হয় তেমনি স্তম্ভিত ও অভিভূত হয়ে রইলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ। তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল। তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল ও কি সত্যিই মেরিয়াস ? আবার নিজেই বুঝতে পারলেন, হ্যাঁ সত্যিই মেরিয়াস।

দীর্ঘ চার বছর পর তাকে দেখছেন তিনি। কিশোর থেকে আজ পূর্ণ যুবকে পরিণত হয়েছে সে। তার আচরণ এবং গতিভঙ্গি শান্ত, নম্র এবং ভদ্র। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের মন মেরিয়াসকে সঙ্গে সঙ্গে আলিঙ্গন করতে চাইল উঠে গিয়ে। তাঁর সমগ্র সত্তা এ কথাটা চিৎকার করে বলতে চাইল। কিন্তু তাঁর রূঢ় প্রকৃতির ভিতর থেকে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ এসে সব ওলোটপালোট করে দিল। তিনি বললেন, কি কারণে এসেছ তুমি ?

বিব্রত বোধ করল মেরিয়াস। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, মঁসিয়ে—

ছুটে গিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে মেরিয়াসকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছিল মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের। মেরিয়াস ও তাঁর নিজের উপর রাগ হচ্ছিল তাঁর। তাঁর মনে হলো তিনি ভিতরে নরম এবং বিগলিত হয়ে উঠলেও বাইরে এত কঠোর কেন এবং মেরিয়াসই বা এত হিমশীতল কেন।

তিনি আবার বলে উঠলেন, তুমি কিজন্য এখানে এসেছ?

তার মানে তিনি বলতে চাইছিলেন সে যখন এসেছে তখন কেন তাঁকে আলিঙ্গন করছে না আবেগের সঙ্গে। মেরিয়াস হতবুদ্ধি হয়ে তার মাতামহের মর্মর প্রস্তরের মতো সাদা ফ্যাকাশে মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইল।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, তুমি কি ক্ষমা চাইতে এসেছ? তুমি কি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ?

কথাগুলো মেরিয়াসের আত্মসমর্পণের পথ পরিষ্কার করে দিলেও সে বলল, না মঁসিয়ে।

কারণ সে বুঝল ক্ষমা চাওয়ার অর্থ হলো তার পিতাকে অস্বীকার করা।

একই সঙ্গে ক্রোধ এবং বেদনায় ফেটে পড়লেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ, ঠিক আছে, তাহলে কি চাও তুমি আমার কাছে?

হাত দুটো জড়ো করে মুখ নিচু করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মেরিয়াস বলল, মঁসিয়ে, আমি শুধু আপনার একটু দয়া চাই।

কথাটা মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের অন্তরটা স্পর্শ করল। এ কথাটা আগে বললে তিনি হয়ত বিগলিত হয়ে যেতেন একেবারে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে।

লাঠি হাতে উঠে দাঁড়ালেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ। তিনি মাথাটা নাড়াতে নাড়াতে বলতে লাগলেন, তা বটে! তোমার মতো এক যুবক আমার মতো এক একানব্বই বছরের বৃদ্ধের কাছ থেকে দয়া ভিক্ষা করছ। যে জীবন শুরু হয়েছে তোমার মধ্যে সে জীবন শেষ হতে চলেছে আমার মধ্যে। থিয়েটার ও নাচ দেখে, কাফে ও হোটেলে গিয়ে জীবনকে উপভোগ করছ তুমি। জীবনের সব ঐশ্বর্য তোমার হাতে, অথচ আমি বার্ধক্য, দুর্বলতা আর নিঃসঙ্গতার দারিদ্র্যে জর্জরিত হয়ে ঘরের কোণে বসে আছি। আলোকোজ্জ্বল পৃথিবী তোমার পায়ের তলায় আর আমার চারদিকে অন্ধকার। তুমি প্রেমে পড়েছ, তোমার ভালবাসার অনেকে আছে, কিন্তু আমাকে ভালবাসার কেউ নেই। তবু তুমি আমার কাছে দয়া চেয়ে আমাকে উপহাস করতে এসেছ। কোনও হাস্যরসাত্মক নাটকে মলিয়ারও এটা কল্পনা করতে পারেননি।

এরপর সুরটা পাল্টে বললেন, ঠিক আছে, সত্যিই কি চাও তুমি?

মেরিয়াস বলল, মঁসিয়ে, আমি জানি এ বাড়িতে আমি সাদর অভ্যর্থনা পাব না। আমি শুধু একটা জিনিস চাইতে এসেছি। তারপরই আমি চলে যাব।

বৃদ্ধ গিলেনর্মাদ বললেন, বোকা ছোকরা কোথাকার! কে তোমাকে চলে যেতে বলল?

আসলে তিনি কিন্তু বলতে চেয়েছিলেন, আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। তিনি যখন দেখলেন মেরিয়াস তাঁর মধ্যে কোনও আন্তরিকতা না দেখে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে তখন তিনি বুঝলেন মেরিয়াস তাঁর মনের আসল কথাটা ধরতে পারেনি। অথচ তিনি এটাই চেয়েছিলেন। এটা বুঝতে পারায় তাঁর দুঃখ বেড়ে গেল এবং সেই দুঃখটা রাগে পরিণত হলো।

তিনি রাগের সঙ্গে বলতে লাগলেন, তুমি তোমার মাতামহকে ছেড়ে তাঁর বাড়ি থেকে কোথায় চলে গেছ তা কেউ জানে না। আমাদের একটা কথাও জানাওনি কোথায় আছ। হয়ত নিঃসঙ্গ জীবনযাপন বেশি আনন্দদায়ক ভেবেই তা বেছে নিয়েছ, কারণ তার মধ্যে আছে অবাধ স্বাধীনতা আর অসংযমের প্রচুর অবকাশ। হয়ত ঋণ করেছ, কিন্তু আমাদের কাছে টাকা চাওনি। তোমার মাসির অন্তরকে ভেঙে দিয়েছ, আসলে তিনি পুনর্মিলনের উপযুক্ত একটা নবম নমনীয় ভাব জাগাতে চেয়েছিলেন মেরিয়াসের মনে। কিন্তু পদ্ধতিটা ভুল এবং রূঢ় হওয়ায় তাতে আরও নিরুৎসাহিত হযে পড়ল মেরিযাস। সে চুপ করে রইল।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, ঠিক আছে, আসল কথায় আসা যাক। তুমি বলছিলে, কিছু একটা চাইতে এসেছ তুমি। কি সে জিনিস ?

একটা খাড়াই পাহাড থেকে শূন্যে ঝাঁপ দেওয়ার মতো এক মরীযা ভঙ্গিতে মেরিয়াস বলল, আমি আমার বিযেতে আপনার অনুমতি চাইতে এসেছি।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ ঘণ্টা বাজিযে বাস্ককে ডাকলেন। সে এলে তাকে বললেন, আমার মেয়েকে পাঠিযে দাও।

দরজা খুলে ম্যাদমযজেল গিলেনর্মাদ ঘবে ঢুকল। মঁসিযে গিলেনর্মাদ অশান্তভাবে সারা ঘরময় পাযচারি কবে বেডাচ্ছিলেন। মেরিযাস অপরাধীর মতো দাঁডিয়ে ছিল। মেয়েকে মঁসিযে গিলেনর্মাদ বললেন, ব্যাপাবটা অতি তুচ্ছ। মঁসিযে মেরিযাসকে দেখতে পাচ্ছ। উনি বিযে করতে চলেছেন। ওঁকে শুভেচ্ছা জানাও। তারপর চলে যাও।

ম্যাদমযজেল গিলেনর্মাদ মেরিযাসের দিকে এমনভাবে তাকাল যাতে মনে হলো সে তাকে চেনেই না। এবপরই সে বেরিযে গেল ঘর থেকে।

মঁসিযে গিলেনর্মাদ আবাব পাযচারি করতে শুরু করে দিয়ে বললেন, তাহলে তুমি বিযে করতে চাও— একুশ বছর বযসে। আমার অনুমতি নেওযার মতো একটা তুচ্ছ ব্যাপার ছাডা তুমি সব কিছুই ঠিক করে ফেলেছ। বস মঁসিয়ে। তুমি চলে যাওয়ার পর একটা বিপ্লব ঘটে গেছে এবং জ্যাকবিনরা তাতে জয়ী হয়েছে। তুমি হয়ত খুশি হযে প্রজাতন্ত্রী দলে যোগদান কবেছ। তাহলে তুমি বিযে করতে চলেছ, কিন্তু কাকে তা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

মেরিয়াস কিছু বলার আগেই মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, আমার মনে হয় পদমর্যাদা এবং সম্পদ দুটোই লাভ করেছ। ওকালতি করে কি রকম রোজগার করো ?

মেরিয়াস কডাভাবে উত্তর দিল, কিছুই না।

কিছুই না ? তাহলে তোমাকে দেবার বছরে যে বারোশো লিভার বরাদ্দ করেছি আমি, সেটাই তোমার একমাত্র আয় ?

মেরিয়াস কোনও উত্তর দিল না। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ আবার বললেন, তাহলে নিশ্চয় মেয়েটি ধনী।

আমার থেকে ধনী নয়।

তুমি কি বলতে চাও যৌতুক হিসাবে কিছু পাবে না ?

না।

কিছু পাবার আশা থাকবে না?

আমার মনে হয় না।

মেয়েটির বাবা কি করে?

আমি জানি না।

মেয়েটির নাম কি?

ম্যাদময়জেল ফশেলেভেন্ত।

বাঃ।

মঁসিয়ে!

মেরিয়াসকে কিছু বলতে না দিয়েই মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বলতে লাগলেন, তাহলে ব্যাপারটা হলো এই। মাত্র একুশ বছর বয়স, কোনও প্রতিষ্ঠা নেই, বছরে মাত্র বারোশো লিভার আয়। তাহলে তোমার স্ত্রী মাদাম লা ব্যারনী পঁতমার্সিকে তো বাজারে যাবার আগে পয়সা গুণে হিসেব করে যেতে হবে।

শেষবারের মতো বুকে আশা নিয়ে মেরিয়াস বলল, মঁসিয়ে, আমি নতজানু হয়ে দয়া ভিক্ষা করছি, আমার বিয়েতে অনুমতি দিন।

বৃদ্ধ গিলেনর্মাদ এক সকরুণ হাসি হেসে কাশতে কাশতে বললেন, তুমি বলতে চাইছিলে, তুমি মেয়ের বাপের কাছে গিয়ে বলবে আমার বয়স এখনো পঁচিশ হয়নি। আপনার মতামত গ্রাহ্য করি না। বলবে আমার পায়ে একজোড়া জুতো নেই, মেয়েটির গায়ে শেমিজ নেই। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার যা খুশি করতে পার, খুশি হয় বিয়ে করতে পার। কিন্তু আমার অনুমতির কথা-যদি বল তাহলে বলব কখনই আমি এ অনুমতি দেব না।

মাতামহ—

না, কখনই না।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ এমন কণ্ঠে কথাগুলো বললেন যা শুনে মেরিয়াসের আশা উবে গেল। সে তখন মাথা নিচু করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তখন উঠে তার পিছু পিছু গিয়ে দরজার কাছ থেকে তার জামার কলার ধরে টেনে নিয়ে এসে একটা আর্মচেয়ারের উপর বসিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, তোমার প্রেমের কথা সব বল।

'মাতামহ' এই কথাটা একটা পরিবর্তন আনে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের মধ্যে। তাঁর মুখের চেহারাটা পাল্টে যেতেই সেদিকে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে মেরিয়াস। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ আবার বললেন, তোমার প্রেমের কথা সব বল। ভয় করো না। তোমাদের মতো যুবকরা বড় বোকা। ভুলে যেও না, আমি তোমার মাতামহ।

টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসেছিল মেরিয়াস। টেবিলের উপর একটা বাতি জ্বলছিল। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের কণ্ঠে এমন একটা মিষ্টি সুর ছিল যাতে হতাশার পরিবর্তে আশা জাগল তার মনে। এদিকে বাতির আলোয় তার ছেঁড়া পোশাকগুলো

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের চোখে পড়ল। তিনি বললেন, তুমি সত্যিই কপর্দকহীন, তাই নয় কি? তোমাকে দেখতে একজন ভবঘুরের মতো দেখাচ্ছে।

এই বলে তিনি ড্রয়ার খুলে তার থেকে কিছু টাকা বার করে টেবিলের উপর রেখে বললেন, এখানে একশো লুই রইল। তুমি কিছু জামাকাপড় কিনে নেবে।

মেরিয়াস বলল, দাদু, তুমি যদি জানতে আমি কত ভালবাসি মেয়েটিকে। আমি যখন তাকে প্রথম দেখি লুক্সেমবুর্গ বাগানে তখন সে সেখানে রোজ যেত। প্রথম প্রথম তাকে ভাল করে দেখিনি। কিন্তু ক্রমে কেমন করে জানি না, মেয়েটিকে ভালবেসে ফেললাম তা বুঝতে পারছি না। তখন মনটা আমার অশান্ত হয়ে ওঠে। এখন অবশ্য রোজ আমাদের দেখা হয়। আমি তাদের বাড়িতে যাই। তাদের বাগানে আমি দেখা করি। তার বাবা আমাদের ভালবাসাবাসির কথা কিছু জানে না। কিন্তু তারা এখন ইংলন্ডে চলে যাচ্ছে। আমি কথাটা শুনে ভাবলাম, আমি আমার দাদুর কাছে গিয়ে সব কথা জানাব। না হলে আমি পাগল হয়ে যাব, না হয় অসুখে পড়ব অথবা নদীতে ঝাঁপ দেব। এই হলো আমার প্রেমের কথা। কোনও কথাই বাদ দিইনি। ওদের বাড়িটা হলো রু প্লামেতে। ওদের বাড়িতে একটা বাগান আছে, বাড়িটা ইনভ্যালিদের কাছে।

রু প্লামেতের নামটা শুনে চমকে উঠলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ। তিনি বললেন, রু প্লামেত? থাম এক মিনিট। কাছে একটা ব্যারাক আছে? তোমার আত্মীয় ভ্রাতিভাই থিওদুল মেয়েটির কথা আমাকে বলেছিল। রু প্লামেতের মরচে পড়া লোহার গেটওয়ালা একটি বাগানবাড়িতে দেখা একটি মেয়ের কথা বলেছিল সে। যেন আর এক পামেলা। তোমার কিন্তু রুচি আছে। যতদূর মনে হয় মেয়েটি সুন্দরী। তার উপর থিওদুলের নজর ছিল। কিন্তু তাদের ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছিল তা জানি না। যাই হোক, তার কথা বিশ্বাস করো না। ও বড় বাজে কথা বলে। তোমার মতো এক যুবক যে প্রেমে পড়বে সেটা খুবই স্বাভাবিক। তোমার বয়সে এটাই স্বাভাবিক। বিপ্লবে যোগদান করার থেকে সুন্দরী মেয়ের নাচ দেখা অনেক ভাল। একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছ আর মেয়েটি তার বাবাকে না জানিয়েই তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়—এই তো? এতে দোষের কি আছে? এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার আছে এবং আমিও এইভাবে একদিন অভিসারে গিয়েছি তোমার মতো। তবে আমার কথা হলো ব্যাপারটা বেশি গুরুত্ব দিও না। বিয়ের কথা তুলে নাটক করতে যেও না। শুধু প্রেম করে যাও। তোমার দাদুর ড্রয়ারে সব সময়ই কিছু লুই থাকে তা জান। টাকার দরকার হলে এসে নিয়ে যাবে। আমার কাছ থেকে যে টাকা নেবে পরবর্তী কালে তোমার নাতিকে তা দিয়ে শোধ করবে। বুঝলে ব্যাপারটা?

কথাটা শুনে এত দুঃখিত হলো মেরিয়াস যে তার মুখ থেকে কথা বার হলো না। সে শুধু মাথাটা নাড়ল। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তার হাঁটুতে একটা চাপ দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, মেয়েটিকে তোমার প্রেমিকাতে পরিণত করো না কেন?

মেরিয়াসের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল একেবারে। সে তার দাদুর কথা কিছু বুঝতে

পারল না। থিওদুলের প্রসঙ্গটাও বুঝতে পারল না। সে উঠে দাঁড়াল নীরবে। সে শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বলল, আজ হতে পাঁচ বছর আগে আপনি আমার বাবাকে অপমান করেছিলেন, আজ আপনি আমার ভাবী স্ত্রীকে অপমান করলেন। আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই চাই না মঁসিয়ে। বিদায়।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ হাঁ করে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে। তিনি চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কিছু করার আগেই মেরিয়াস ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা পিছন থেকে বন্ধ করে চলে গেল। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ এবার উঠে দরজার দিকে ছুটে গেলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, কে আছ ওকে ধর, যেতে দিও না।

তার মেয়ে ও চাকররা ছুটে এল সবাই। তিনি বললেন, ওকে ধরে আন। যেতে দিও না। কি আমি করেছি তার? ও কি পাগল হয়ে গেছে? ও চলে যাচ্ছে, ওকে ধর। এবার আর ও ফিরে আসবে না।

তিনি কথা থামিয়ে জানালার কাছে গিয়ে কম্পিত হাতে জানালা খুলে রাস্তার দিকে তাকালেন। তিনি কাঁপছিলেন এমন সময় বাস্ক এসে পিছন থেকে তাঁকে ধরে ফেলল। তিনি তখনো মেরিয়াসের নাম ধরে ডেকে চলেছিলেন।

কিন্তু মেরিয়াস তখন র‍্যু সেন্ট লুই পার হয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল।

এদিকে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তাঁর দু'হাত দিয়ে মাথাটা ধরে টলতে টলতে জানালা থেকে সরে এসে আর্মচেয়ারে বসে পড়লেন। তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। তাঁর মাথা আর ঠোঁট দুটো নড়ছিল। তাঁর চোখে ও অন্তরে এক অন্তহীন শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

যেদিন মেরিয়াস তার দাদুর সঙ্গে দেখা করতে যায় সেইদিন বিকাল চারটের সময় জাঁ ভলজাঁ শ্যাম্প দ্য মার্সের ছায়াচ্ছন্ন ঢালু জায়গাটায় একা একা বসেছিল। সতর্কতার জন্যই হোক অথবা নির্জনতার প্রতি তার স্বাভাবিক প্রবণতার জন্যই হোক অথবা অভ্যাস পরিবর্তনের এক অবচেতন ইচ্ছার বশেই হোক আজকাল সে কসেত্তেকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যেত না। সেদিন তার পরনে ছিল শ্রমিকদের মতো একটা আলখাল্লা, ধূসর রঙের একটা পায়জামা আর টুপি। আগেকার উদ্বেগ সব কেটে যাওয়ায় আজকাল কসেত্তের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ভালই চলছিল।

একদিন সে যখন বুলভার্দ দিয়ে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিল তখন থেনার্দিয়েরকে সে দেখতে পায়। কিন্তু তার পোশাকটা অন্য ছিল বলে তাকে চিনতে পারেনি থেনার্দিয়ের। এরপর সে আরও কয়েকবার দেখতে পায় থেনার্দিয়েরকে। সে বুঝতে পারে আজকাল ঐ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছে থেনার্দিয়ের। থেনার্দিয়েরই তখন তার পক্ষে যত সব

বিপদ আর ভয়ের একমাত্র কারণ এই ভেবে সে এক বড় রকমের সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে।

তাছাড়া প্যারিস শহরের রাজনৈতিক অবস্থা অশান্ত হয়ে পড়ায় পুলিশ আন্দোলনকারীদের ধরপাকড় করার জন্য সজাগ ও সতর্ক হয়ে ওঠে এবং তার ফলে ভলজাঁর উপর তাদের নজর পড়তে পারে।

এইসব চিন্তা যখন তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল তখন একদিন সকালবেলায় একটি ঘটনা তার মানসিক অস্বস্তি বাড়িয়ে তোলে। একদিন সকালবেলায় সে হঠাৎ বাগানে গিয়ে পাঁচিলের গায়ে ছুরি দিয়ে খোদাই করা একটা ঠিকানা দেখতে পায়—১৬, রু দ্য লা ভেরিয়ের। এর দ্বারা সে একটা জিনিস বুঝতে পারল, বাগানের বাইরের কোনও লোক নিশ্চয় ঢুকেছিল। এ বিষয় নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করলেও কসেত্তেকে বলল না কোনও কথা। কারণ তাতে সে ভয় পেতে পারে।

অনেক ভাবনা-চিন্তা করার পর সে ঠিক করে প্যারিস এবং ফ্রান্স ছেড়ে সে ইংলন্ডে চলে যাবে। সে কসেত্তেকে বলে দেয় এক সপ্তার মধ্যে সব যেন গুছিয়ে নেয়। আজ সে শ্যাম্প দ্য মার্সের নির্জন ঘাসের উপর একা বসে থেনার্দিয়ের, পুলিশ, বাগানের পাঁচিলে দেখা ঠিকানা, পাশপোর্ট বার করার সমস্যা প্রভৃতির কথা ভাবছিল।

সে যখন একমনে এই সব কথা ভাবছিল তখন তার পিছনে একটা লোকের ছায়া দেখতে পেল। সে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে যেতেই তার হাঁটুর উপর একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে যায়। সে উঠে পড়ে কাগজটা খুলে দেখে, 'চলে যাও এখান থেকে',—এই কথাটা লেখা আছে।

চারদিক তাকিয়ে সে কোনও লোককে দেখতে পেল না। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার চারদিকে তাকিয়ে সে দেখল তার মতো শ্রমিকের পোশাক পরা একটা লোক খালের ধারে ঘোরাঘুরি করছে।

ভলজাঁ চিন্তান্বিত অবস্থায় তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেল।

২

বিষণ্ন মনে তার মাতামহের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মেরিয়াস। সে অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিল সেখানে, কিন্তু ফিরে এল এক নিবিড় হতাশা নিয়ে। থিওদুলের কথাটা কোনও ছাপ ফেলতে পারল না তার মনের উপর। কোনও সন্দেহ জাগল না কারো উপর। যৌবন বয়সে কোনও সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে না মানুষের মনে। সন্দেহ খানিকটা বৃদ্ধ বয়সের ব্যাপার। ওথেলোর মনে যে সন্দেহ জাগে সে সন্দেহ ক্যান্ডিডার মনকে স্পর্শ করতে পারেনি।

নিজের অন্তরের ক্ষতটার মধ্যে মনটাকে গুটিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ হেঁটে চলেছিল সে।

বেলা দুটোর সময় সে কুরফেরাকের বাসায় গিয়ে পোশাক পরেই তার বিছানার উপর শুয়ে পড়ল। তার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে অস্বস্তিকর এক ঘুমের মধ্যে ঢলে

পড়ল সে। ঘুম ভাঙলে দেখল ঘরের মধ্যে কুরফেরাক, এঁজোলরাস, ফুলি আর কমবেফারে উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলছে।

কুরফেরাক মেরিয়াসকে বলল, জেনারেল ল্যামার্কের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করতে যাবে না ?

কথাটার মানে সে বুঝতে পারল না।

কুরফেরাকরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে মেরিয়াস একা বেরিয়ে গেল। বেরোবার সময় তার পকেটের মধ্যে জেভার্তের দেওয়া সেই গুলিভরা পিস্তলটা নিল। সেটা সে কেন নিল তা বোঝা গেল না।

সারাদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল মেরিয়াস। দু'এক পশলা বৃষ্টি হলো পথে। কিন্তু সেদিকে কোনও খেয়াল ছিল না তার। সে সেন নদীতে কখন একবার স্নান করল তাও বুঝতে পারল না। তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। সে আগুন তার সব চেতনা ও বুদ্ধিকে যেন গ্রাস করে। তার মনে তখন কোনও আশা বা ভয় ছিল না। তার মনে তখন একটা চিন্তাই স্পষ্ট হয়ে বিরাজ করছিল, আজ সন্ধ্যা ছ'টার সময় সে কসেত্তের কাছে যাবে। এই একটি ঘটনার মধ্যেই তার মনের সব চেতনা যেন নিহিত ছিল, তার পর সব কিছুই অন্ধকার। বুলভার্দ দিয়ে যাবার সময় মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছিল শহরে কোথায় গোলমাল হচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে সে ভাবতে লাগল, তবে কি লড়াই চলছে নাকি ?

রাত্রি ন'টা বাজতেই র‍্যু প্লামেতের বাড়ির বাগানের গেটের সামনে এসে হাজির হলো সে। দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে সে কসেত্তের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। আবার সে কসেত্তেকে দেখতে পাবে।

গেটটা পার হয়ে সে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু দেখল কসেত্তে যেখানে বসত সেখানে সে নেই। মেরিয়াস বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল জানালাগুলো বন্ধ। কোথাও কোনও আলো নেই। গোটা বাড়িটা পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে। একই সঙ্গে ভয় ও দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেল মেরিয়াস। সে পাগলের মতো একটা ঘরের বন্ধ জানালার উপর ঘা দিয়ে কসেত্তের নাম ধরে ডাকতে লাগল। বলতে লাগল, 'কসেত্তে, কোথায় তুমি ?' কিন্তু কোথাও কারো কোনও সাড়া-শব্দ পেল না। সমস্ত বাড়িটাকে স্তব্ধ অন্ধকার এক সমাধি-স্তম্ভের মতো মনে হচ্ছিল মেরিয়াসের।

অবশেষে সে বাগানে ফিরে এসে পাথরের যে বেঞ্চটার উপর কসেত্তের পাশে বসে কতদিন কত সময় কাটিয়েছে, সেই বেঞ্চটার দিকে একবার তাকাল। যে প্রেম একদিন তাকে কত আনন্দ কত তৃপ্তি দান করেছে, এই হতাশার মাঝেও সে প্রেমের জন্য নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগল সে। কসেত্তে চলে গেছে। জীবনে কোনও অবলম্বন রইল না তার। মৃত্যু ছাড়া আর তার কোনও গতি নেই।

সহসা রাস্তা থেকে তার নাম ধরে কে ডাকল, মঁসিয়ে মেরিয়াস !

মেরিয়াস মুখ তুলে তাকাল। বলল, কে ডাকে ?

আপনিই কি মঁসিয়ে মেরিয়াস ?

হ্যাঁ।

মঁসিয়ে মেরিয়াস, আপনার বন্ধুরা রু দ্য লা শাঁভ্রেরিতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

কণ্ঠস্বরটা এপোনিনের বলে মনে হলো মেরিয়াসের। সে ছুটে গিয়ে গেট থেকে বেরিয়ে গেল। গেট থেকে বেরোবার সময় তার মনে হলো একজন অচেনা যুবক ছুটে পালিয়ে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৩

গাভ্রোশের দেওয়া জাঁ ভলজাঁর টাকার থলেটা কোনও কাজে লাগেনি মঁসিয়ে মেবুফের। প্রথমে সে থলেটা স্বর্গ থেকে পড়েছে বলে বিশ্বাস করলেও এ বিশ্বাস টেকেনি। সে বিশ্বাস করতে পারেনি আকাশের নক্ষত্ররা স্বর্ণমুদ্রা লুইয়ে পরিণত করেছে। টাকার থলেটা তাই সে সোজা থানায় নিয়ে গিয়ে জমা দেয়। সে থলের কোনও দাবিদার না পাওয়া গেলেও তা মেবুফের কোনও কাজে লাগেনি।

মেবুফের আর্থিক অবস্থার নিম্নগতি অব্যাহত ছিল। নীলচাষে কোনও লাভ হয়নি। কোনও দিকেই আর্থিক অবস্থার কোনও উন্নতি হলো না তার। মেরে প্লুতার্কের মাইনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িভাড়াও প্রচুর বাকি পড়ে গেছে। এ অবস্থায় পড়ে সে তার ফুলের প্লেট, অনেক লেখা ও ছবি একে একে বিক্রি করে দিল। এরপর বাগানে বা জমিতে কাজ করা ছেড়ে দিল মেবুফ। পর পর সব কাজে লোকসান হওয়ায় কাজে উৎসাহ কমে যায়। তার জমি পতিত পড়ে থাকে। এখন ডিম-মাংস বাদ দিয়েছে। এখন রুটি আর আলুই তাদের খাদ্য। বাড়ির আসবাবপত্র সে সব বিক্রি করে দিয়েছে। অনেক বই সে বিক্রি করে দিলেও দামী কিছু বই রেখে দিয়েছে এখনো। তার শোবার ঘরে কোনও আগুন ছিল না। বাতি না কিনে অন্ধকারে বসে থাকত সন্ধের পর থেকে; তারপর অন্ধকারেই শুতে যেত। তার বই-এর আয় থেকেই কোনওরকমে অতি কষ্টে দিন চলত। তার বাড়িতে কোনও প্রতিবেশী আসত না। পথে কেউ কথা বলত না তার সঙ্গে। তবু তার মুখের উপর থেকে শিশুসুলভ সেই শান্ত সরলতার ভাবটি মুছে যায়নি আজও। কোনও বই-এর উপর চোখ পড়লেই আজও চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার। ১৮৪৪ সালে তার লেখা 'ডায়োজেনেস' বইটির যখন নতুন সংস্করণ ছাপা হয় তখন হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। বই-রাখা কাঁচের আলমারিটা আজও বিক্রি করেনি সে।

একদিন সকালে মেরে প্লুতার্ক তাকে বলল, আজ খাবার কেনার পয়সা নেই।

খাবার মানে একটা ছোট পাঁউরুটি আর চার-পাঁচটা আলু।

ধারে কিনতে পারবে না ?

আপনি জানেন ওরা ধার দেবে না।

কাঁচ লাগানো বই-এর তাক থেকে একটা বই বার করে সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল মেবুফ। পিতামাতা সন্তানকে বিক্রি বা বলি

দিতে গেলে প্রবল দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে অন্তর, মেবুফেরও তাই হচ্ছিল। যাই হোক, অনেকক্ষণ পর সে একটা বই নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দু' ঘণ্টা পর ফিরে এসে বই বিক্রির তিরিশ স্যু টেবিলের উপর রাখল। বলল, এতে রাতের খাবার হয়ে যাবে।

এরপর থেকে প্রায় রোজই একটা করে বই বিক্রি করে সেই পয়সায় তাদের খাবার কেনা হত। সে রোজই বই বিক্রি করতে যায় দেখে পুরনো বই কেনার দোকানদার তাকে বই-এর দাম কম দিত। যে একটি বই মেবুফ সেই দোকান থেকে কুড়ি ফ্রাঁ দিয়ে কিনেছিল সেই বই আজ তাকে মাত্র কুড়ি স্যুতে বিক্রি করতে হলো। দেখতে দেখতে এক এক করে তার সব বই বিক্রি হয়ে গেল। শুধু রয়ে গেল তার লেখা একটি বই ভায়োজেনেস লার্তিয়াস।

মেবুফ হর্টিকালচার সোসাইটির সদস্য ছিল। তার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাওয়ায় সোসাইটির সভাপতি কৃষিমন্ত্রীকে সেকথা জানান। কৃষিমন্ত্রীও স্বীকার করেন, মঁসিয়ে মেবুফ সত্যিই উদ্ভিদবিদ্যায় পণ্ডিত এবং সৎপ্রকৃতির লোক। তাঁর জন্য আমাদের কিছু করা উচিত।

পরদিন মেবুফ মন্ত্রীর বাড়িতে রাতের খাওয়ার জন্য এক নিমন্ত্রণপত্র পেল। রাত্রিতে সে অতি কষ্টে জামা কেচে পরিষ্কার করে বই বিক্রির টাকায় গাড়িভাড়া খরচ করে মন্ত্রীর বাড়িতে গেল। কিন্তু তার দীনহীন পোশাক দেখে বাড়ির দারোয়ান বা কোনও লোক তাকে ঢুকতে বলল না। প্রায় দুপুর রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে এক নিষ্ফল প্রত্যাশায় অপেক্ষা করার পর বাড়ি ফিরে এল মেবুফ।

এরপর মেরে প্লুতার্কের অসুখ করল। কিন্তু ঘরে পয়সা নেই। খাবার বা ওষুধ কেনার মতো কোনও পয়সাই নেই। সেদিন ছিল ১৮৩২ সালের ৪ঠা জুন। অবশেষে মেবুফ তার ভায়োজেনেস লার্তিয়াস নামে সবচেয়ে প্রিয় বইটি বগলে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। রু সেন্ট জ্যাক থেকে সেই বই বিক্রি করে সে একশো ফ্রাঁ নিয়ে এল। প্লুতার্কের বিছানার পাশের টেবিলে টাকাগুলো রেখে নীরবে শুতে চলে গেল সে।

পরদিন সকালে সে তার অবহেলিত বাগানটার একদিকে সেই পাথরটার উপর বসল। বিকালের দিকে রাস্তার গোলমালের শব্দে চমকে উঠল মেবুফ। বাগানের পাশ দিয়ে এক মালীকে চলে যেতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, কিসের গোলমাল হচ্ছে ?

মালী বলল, হাঙ্গামা হচ্ছে।

কিজন্য ?

লোকে লড়াই করছে।

কোথায় ?

আর্সেনালে।

মেবুফ ঘরের ভিতরে গিয়ে বই-এর খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু কোনও বই না পেয়ে টুপিটা মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে গেল শহরের পথে।

নবম পরিচ্ছেদ

১

৫ই জুন ১৮৩২

বিপ্লবের মধ্যে কি আছে? একদিক দিয়ে সব আছে, আবার কিছুই নেই। বিপ্লব হলো এক বিশাল অগ্নিকাণ্ডের অকস্মাৎ প্রজ্বলন, এক অনিয়ন্ত্রিত অসংযত শক্তির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্রিয়া, এক প্রবল ঝড়ের মত্ততা। এ ঝড় চিন্তাশীলদের মাথা, স্বপ্নালু মানুষদের মন, আর গরীবদুঃখীদের আত্মাগুলোকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দেয়। প্রজ্বলিত করে দেয় তাদের ধূমায়িত আবেগগুলোকে। যত সব অন্যায়-অবিচারকে ন্যায়ে পরিণত করার জন্য যেন মানুষ চিৎকার করে।

এই বিপ্লব কোথায় নিয়ে যায় মানুষকে?

বিপ্লব মানুষকে নিয়ে যায় রাষ্ট্র আর আইনের বিরুদ্ধে, সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের সম্পদ আর অহঙ্কারের বিরুদ্ধে।

প্রতিহত আত্মপ্রত্যয়, উত্তপ্ত ক্রোধাবেগ, অবদমিত হিংসাবৃত্তি, অপ্রদর্শিত বীরত্ববোধ, অন্তরের অন্ধ উত্তাপ, পরিবর্তনের প্রতি কৌতূহল ও প্রবণতা, অপ্রত্যাশিতের প্রতি এক উগ্র আগ্রহ, দীর্ঘসঞ্চিত হতাশা, ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিধান সম্বন্ধে এক আত্মম্ভরী বিশ্বাস, অলস স্বপ্ন, অবরুদ্ধ উচ্চাভিলাষ, এক বিক্ষুব্ধ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ রচনার এক আশান্বিত প্রয়াস—এইগুলি হলো বিপ্লবের উপাদান। যারা অলস, অকর্মণ্য, যাদের কোনও আত্মবিশ্বাস বা কোনও আদর্শে বিশ্বাস নেই, যারা শ্রমের থেকে ভাগ্যের উপর বেশি নির্ভর করে, যাদের নিজস্ব কোনও ঘরবাড়ি নেই এবং আকাশে ভাসমান মেঘেদের মতো ঘুরে বেড়ায় তারা সবাই বিপ্লবে যোগদান করে। রাষ্ট্র, ব্যক্তিজীবন ও ভাগ্যের বিরুদ্ধে যারা এক ক্রুদ্ধ বিদ্বেষ পোষণ করে অন্তরে তারাও আকৃষ্ট হয় বিপ্লবের প্রতি। বিপ্লব হচ্ছে সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে ওঠা এক ধরনের ঘূর্ণিবায়ু—যা সব কিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দিতে চায়, সবল ও দুর্বল সবাইকে আঘাত করতে চায়। সে ঘূর্ণিবায়ু যেন একদল মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের দিয়ে আর একদলকে ধ্বংস করতে চায়। বিপ্লবের ঘূর্ণিবায়ু বিপ্লবীদের এক অসাধারণ ও রহস্যময় শক্তি দান করে, তাদের সকলকে এক ধ্বংসের যন্ত্র ও অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করে। বিপ্লব সামান্য এক ছোট্ট পাথরখণ্ডকে কামানের গোলায় পরিণত করে, সামান্য এক শ্রমিককে সেনাপতিতে রূপান্তরিত করে। বুর্জোয়াদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

বিপ্লবের কতকগুলি ভাল দিকও আছে। বিপ্লব যদি দুর্বল হয়, যদি কোনও রাষ্ট্রের সরকারকে উচ্ছেদ করতে না পারে তাহলে সে বিপ্লব সরকারের হাতকে শক্তিশালী করে তোলে, পুলিশের পেশীকে শক্ত করে আর সেনাবাহিনীর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে। বিপ্লব যেন বলবৃদ্ধিকারী এক ব্যায়াম। কোনও মানুষ যেমন গাত্রমর্দনের পর চাঙ্গা হয়ে ওঠে তেমনি বিপ্লবের পর রাষ্ট্রশক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু তিরিশ বছর আগে বিপ্লব সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অন্যরকম ছিল। ১৮৩১

সালের জুলাই বিপ্লবে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় তা সে বিপ্লবের পবিত্রতাকে নষ্ট করে দেয়। জনগণের মনের অবরুদ্ধ আবেগ মুক্তি পায় এ বিপ্লবে। এ বিপ্লব প্রথমে এনে দেয় মুক্তিচেতনা; কিন্তু হাঙ্গামার পর তা ভয়াবহ হয়ে ওঠে মানুষের কাছে। বিপ্লবের অশুভ দিকগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমত হাঙ্গামা মারামারির ফলে দোকানপাট বন্ধ থাকে, চারদিকে আতঙ্ক ছড়ায়। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আর্থিক অনটনে দেউলে হয়ে পড়ে মানুষ। ধনীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠে টাকা মূলধনে খাটাতে চায় না, জনগণও সঞ্চয় করতে পারে না। ফলে মূলধনে টান পড়ে, শিল্পের অবনতি ঘটে। সর্বত্র নিরাপত্তাবোধের এক ব্যাপক অভাব দেখা যায়। বিভিন্ন শহরে প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথা তুলে ওঠে। তাছাড়া প্রচুর আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। হিসাব করে দেখা যায় বিপ্লবের প্রথম তিন দিনে একশো কুড়ি মিলিয়ন ফ্রাঁ ক্ষতি হয় ফ্রান্সে। কোনও নৌযুদ্ধে কোনও দেশের বিপর্যস্ত নৌবাহিনীর ষাটটি যুদ্ধজাহাজ বিধ্বস্ত হলে এই পরিমাণ ক্ষতি হয়।

তবে রাজপথে বিপ্লবজনিত হাঙ্গামা হয় যখন, যখন জনগণ রাস্তার মুখগুলো বন্ধ করে দিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তখন তা যুদ্ধের মতো দেখতে লাগে। সেনাবাহিনী গৃহযুদ্ধের সময় বড় সংকটে পড়ে। দেশের লোকের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করতে হয় তাদের। এই হাঙ্গামা একদিকে যেমন জনগণের দুঃসাহস বাড়িয়ে দেয় তেমনি বুর্জোয়াদের সাহস ও মনোবল কেড়ে নেয়।

কিন্তু এই রক্তপাতের কি প্রয়োজন ছিল? এই রক্তপাত দেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে দেশের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দেয়। দেশের সৎ ও সুন্দরমনা লোকদের জীবনকে অশান্ত করে তোলে। মোট কথা, এ বিপ্লব বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এতক্ষণ আমরা বিপ্লবের ফলের কথা বললাম। এবার তার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলব।

২

১৮৩২ সালের ঘটনাবলীকে ঐতিহাসিকরা কিভাবে বিচার করবেন? এ ঘটনাবলীকে বিপ্লব না বিদ্রোহ না গণবিক্ষোভ কি অ্যাখ্যা দেওয়া যাবে? বাইরে থেকে দেখে এ ঘটনাকে দাঙ্গাহাঙ্গামা বলে মনে না করে লোকে তাকে বিপ্লব হিসাবেই শ্রদ্ধা করতে থাকে। অনেকে বলতে থাকে এ ঘটনাবলী ১৮৩০ সালেরই শেষ প্রতিধ্বনি। অতৃপ্ত মস্তিষ্কে কল্পনাগুলি একবার উত্তপ্ত হলে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে চায় না। বিপ্লব কখনো অকস্মাৎ শেষ হয়ে যায় না। অনেক ভাঙাগড়া ও উত্থানপতনের পর সে বিপ্লব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৮৩২ সালের বসন্তকালে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়। তিন মাস ধরে এই মহামারী গোটা শহর জুড়ে তাণ্ডব চালিয়ে বহু লোকের প্রাণ সংহার করলেও এবং বহু লোকের মনোবল ভেঙে দিলেও এক বিরাট গণবিক্ষোভের জন্য যেন প্রস্তুত হয়ে ছিল প্যারিস নগরী। এই সমগ্র নগরী অগ্নিগর্ভ এক দাহ্য বস্তুর মতো শুধু

এক স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায় স্তব্ধ হয়ে ছিল। এই বছরের জুন মাসে জেনারেল ল্যামার্কের মৃত্যুই হলো সেই স্ফুলিঙ্গ। ল্যার্মাক ছিলেন খ্যাতিমান এক কাজের লোক। তিনি সম্রাট নেপোলিয়নের অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানায়ক হিসাবে এবং রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে আইনসভার সদস্য হিসাবে যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন যেমন বাগ্মী তেমনি সাহসী বীর। একদিন সেনানায়ক হিসাবে যিনি প্রভুত্বের সঙ্গে আদেশ দান করতেন আজ তিনিই জনগণের স্বাধীনতার প্রবক্তারূপে তাদের দাবি তুলে ধরেন। সমরকুশলী ল্যামার্ক ছিলেন অপরাজেয় বীর; সেনাপতি হিসাবে স্বয়ং নেপোলিয়নের পরেই তাঁর স্থান ছিল। ওয়াটারলু যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য মর্মাহত হন তিনি। অথচ সম্রাট নেপোলিয়নের পতনেব পর দেশে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনগণের অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন তিনি। তাই তাঁর মৃত্যুর দিনে সমগ্র জাতি শোকাহত হয়ে ওঠে। এই শোক থেকে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের আগুন।

৫ই জুন সারাদিন ধরে চলে রোদ-বৃষ্টির খেলা। পূর্ণ সার্মবিক মর্যাদাসহকারে বিরাট সমারোহে জেনারেল ল্যামার্কের শবযাত্রা গোটা শহর পবিভ্রমণ করে। সরকার থেকে অনেক নিরাপত্তারও ব্যবস্থা নেওয়া হয। দুটি পদাতিক বাহিনী ও দশ হাজার জাতীয় রক্ষীবাহিনীব সদস্য তরবারি হাতে শবানুগমন কবছিল। শবাধাব বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল একদল যুবক। শববাহীদের পিছনেই ছিল অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের এক মিছিল। তাদের সকলের হাতে ছিল লরেল গাছেব একটি করে ছোট ডাল। সবশেষে ছিল ছাত্র আর জনতা। জনতা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি দলে একজন করে নেতা ছিল। একজন লোক দুটি পিস্তল হাতে সব দল দেখাশোনা করছিল। জনতার মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল। পথের দু'ধারে সব বাড়ির বারান্দা, ছাদ, জানালা ও গাছগুলি লোকের ভিড়ে ভর্তি ছিল। তবে জনতার মধ্যে প্রতিটি লোকের হাতে লাঠি, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র ছিল। এই সশস্ত্র জনতার মিছিল দেখে দর্শকরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

আগে হতে বিক্ষোভের আভাস পেয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষও প্রস্তুত ছিল। প্লেস লুই পঞ্চদশ নামে এক জাযগায় অশ্বারোহী বাহিনীর চারটি দল শবযাত্রা অনুসরণ করতে থাকে। অশ্বারোহী সৈন্যদের প্রত্যেকের হাতে গুলিভরা বন্দুক ছিল। সংকেত পাওয়া মাত্র গুলি করার জন্য প্রস্তুত ছিল তারা। সেনাবাহিনীর বাকি দলগুলিও সেনানিবাসে সজাগ ছিল। শহরে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার। এ ছাড়া শহরের বাইরেও সেনাবাহিনীর কয়েকটি দল প্রস্তুত হয়ে ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিরিশ হাজার।

জনতার মিছিলের মধ্যে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল। কযেকজন লোক বলে বন্দুক কারখানার দু'জন কর্মী জনতাকে ঢুকতে দেবার জন্য গেট খুলে রাখবে। লোকগুলির পরিচয় কেউ জানতে পারেনি। জনতার মধ্যে অনেকের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তারা লুটপাট করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল এবং তারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

শবযাত্রা বুলেভার্দ হয়ে বাস্তিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি এলেও

জনতার ভিড় কমেনি কিছুমাত্র। পথে ছোটখাটো কয়েকটি ঘটনাও ঘটে। ভেঁসোম কোলামের কাছে শবযাত্রাটি আসতেই একটি বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা রাজতন্ত্রী একজন ডিউককে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ে জনতার একটি অংশ। একটি পতাকা হতে জুলাই রাজতন্ত্রের প্রতীকস্বরূপ মুরগীটিকে ছিঁড়ে ফেলে পতাকাটি পা দিয়ে মাড়িয়ে দেওয়া হয়। পোর্তে সেন্ট মার্তিনে একজন পুলিশ সার্জেন্টকে তরবারি দিয়ে আঘাত করা হয়। এক পলিটেকনিক স্কুলের ছাত্ররা মিছিলে এসে যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক' ধ্বনি দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্লেস দ্য লা বাস্তিলে বিরাট এক দর্শকদল মিছিলে যোগদান করে।

শবযাত্রা এবার বাস্তিল পার হয়ে ক্যানেলের ধার দিয়ে গিয়ে একটি ছোট সেতু পার হয়ে পঁত দ্য অস্টারলিৎস দুর্গের সামনের মাঠে এসে থমকে দাঁড়ায়। সেই মাঠ থেকে শুরু করে জনতার মিছিল কোয়ে বুদোঁ, বুলভার্দ, বাস্তিল ও সেন্ট মার্তিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবার শবাধারের চারদিকে একটি ব্যূহ রচনা করে জনতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। লাফায়েত্তে শেষবারের মতো ল্যামার্ককে বিদায় দিয়ে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কালো পোশাকপরা লাল পতাকা হাতে এক অশ্বারোহী সৈনিক শবাধারের কাছে এসে তাদের সেনাপতিকে কি বলতেই সেনাপতি শবযাত্রা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। বুলভার্দ বুদোঁ থেকে অস্টারলিৎস পর্যন্ত বিস্তৃত জনতার ভিড় থেকে গর্জনশীল সমুদ্রতরঙ্গের মতো এক বিক্ষুব্ধ ধ্বনি উত্তাল হয়ে উঠল। শবাধারবাহী যুবকেরা ল্যামার্কের কফিন লাফায়েত্তের জন্য গাড়ি থেকে নামানোর পর আবার সেটি গাড়ির উপর তুলে দিল।

এমন সময় আর এক অশ্বারোহী বাহিনী এসে সেতুর মুখটা বন্ধ করে দেয়। তারা শুধু সরে গিয়ে লাফায়েত্তের গাড়িটা থামার জন্য পথ করে দেয়। অশ্বারোহী বাহিনী আর জনগণ মুখোমুখি হয়। মেয়েরা মিছিল থেকে পালিয়ে যেতে থাকে ভয়ে।

তখন কিসের থেকে ঘটনার সূত্রপাত হয় তা কেউ ঠিক করতে পারবে না। যখন দুটো বিশাল মেঘ মুখোমুখি জমা হয় তখন অন্ধকার হয়ে ওঠে চারদিক। কোনও প্রত্যক্ষদর্শী বলে আর্সেনাল থেকে বিগ্‌ল বাজিয়ে গুলি করার আদেশ দেওয়া হয় সেনাবাহিনীকে। আবার অনেকে বলে একটি যুবক নাকি এক সৈনিককে ছোরা দিয়ে আক্রমণ করে প্রথমে আর সেই থেকে ঘটনার সূত্রপাত হয়।

সহসা তিনটি গুলি বর্ষিত হয়। প্রথম গুলিটিতে শোনেল নামে সেনাবাহিনীর এক অফিসার মারা যায়, দ্বিতীয়টিতে কাছাকাছি একটি বাড়ির জানালা বন্ধ করার সময় এক বৃদ্ধা মারা যায় আর তৃতীয়টি একজন সামরিক অফিসারের ব্যাজে লাগে। এইভাবে ঘটনার সূত্রপাত হয়। তখন সেতুর ওদিক থেকে আর এক সেনাবাহিনী এগিয়ে আসতে থাকে। জনতা সৈন্য ও পুলিশবাহিনীর উপর ইঁট-পাথর ছুঁড়তে থাকে আর পুলিশ ও সৈন্যরা গুলিবর্ষণ করতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে শহরের অন্য সব জায়গাতেও হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

৩

কোনও গণ অভ্যুত্থানের প্রথম ঢেউ-এর মতো এমন আশ্চর্যজনক ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। সব জায়গায় একই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে সে ঢেউ। মনে হয় সে ঢেউ যেন ফুটপাথ থেকে বেরিয়ে এল অথবা আকাশ থেকে পড়ল। কোথাও দেখা যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ অভিযান, আবার কোথাও বা দেখা যায় স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভের চরম বিশৃঙ্খলা। অনেক সময় দেখা যায় হঠাৎ কোথা থেকে এক নবাগত এসে বিক্ষুব্ধ জনতাকে নেতৃত্ব দিয়ে খুশিমতো যেদিকে সেদিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। তখন দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়। পথচারীরা ছুটে পালাতে থাকে ত্রস্ত পদক্ষেপে। রাস্তার ধারে যে কোনও রুদ্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে তার মধ্যে আশ্রয় নেবার জন্য।

জুলাই বিপ্লব শুরু হওয়ার মিনিট পনেরর মধ্যেই এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে। ব্রেতোনেরি অঞ্চলে এক কাফেতে কুড়িজনের এক যুবকদল ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনরঙা একটা পতাকা নিয়ে বেরিয়ে এল। তাতে লেখা ছিল 'প্রজাতন্ত্র অথবা মৃত্যু'। তিনজন সশস্ত্র লোক তাদের সামনে এসে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তাদের একজনের হাতে একটা বন্দুক, একজনের হাতে একটা তরবারি আর একজনের হাতে একটা বর্শা ছিল। বুলভার্দ সেন্ট মার্তিনে এক অস্ত্র কারখানা লুট হয়। রু্য বোবুর্গে ও আগে দুই জায়গায় মোট তিনটি বন্দুকের দোকানও লুণ্ঠিত হয়। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে জনতার হাতে ২৩০টি বন্দুক, চৌষট্টিটি তরবারি ও তেষট্টিটি পিস্তল আসে। এ ছাড়া আরও কিছু আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেওয়া হয় জনতার হাতে। অনেক যুবক বাড়িতে বাড়িতে কার্তুজ তৈরি করতে শুরু করে দেয়। রু্য দ্য পেরিতে বাড়ি নির্মাণরত এক রাজমিস্ত্রী বন্দুকের গুলি লেগে মারা যায়। রাস্তার আলোর কাঁচগুলো ভেঙে ফেলা হয়, অনেক গাছ উপড়ে ফেলা হয় ও আসবাবপত্র টেনে বার করে আনা হয়। এই সব কিছু দিয়ে পথের মোড়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। ব্যারাক থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে এসে রাজপথে মার্চ করে যেতে লাগল। জাতীয় রক্ষীবাহিনীগুলিও পথে পথে মার্চ করে যেতে লাগল।

এদিকে বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে ছাত্ররাও বেরিয়ে আসতে লাগল একযোগে। বিক্ষুব্ধ জনতা এক একটি বাড়িকে খালি করে দুর্গের মতো ব্যবহার করতে লাগল। আগে যে জনতা ইঁট-পাথর ছুঁড়ে লড়াই করত এখন তারা বন্দুক নিয়ে লড়াই করতে লাগল। সন্ধে ছটার সময় প্যাসেজ দ্যুর সামনে সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী জনতার মধ্যে রীতিমতো লড়াই চলতে লাগল।

কোনও কোনও সেনারা কুণ্ঠাবোধ করছিল। তারা ভাবছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে যে সব সেনাবাহিনী নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে লড়াই থেকে বিরত থাকে তারা বিপ্লবের পর পুরস্কৃত হয়। এই কুণ্ঠার জন্য তাদের মনোবল ভেঙে যায়। সরকার পক্ষের সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার ছিল দু'জন সেনাপতির হাতে। তাদের নাম হলো জেনারেল লোবাউ আর জেনারেল বোগদ। এদের দু'জনের মধ্যে লোবাউ ছিল পদমর্যাদার দিক থেকে বড়। সেনাবাহিনী জাতীয় রক্ষীবাহিনী আর পুলিশবাহিনীর সঙ্গে একযোগে রাস্তায় মার্চ করে এগিয়ে এসে বিপ্লবীদের ঘাঁটিগুলি পরিদর্শন করছিল।

যুদ্ধের মন্ত্রী মার্শাল সুল্ত একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং তিনি অস্টারলিৎস যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সারা শহর জুড়ে এই ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখে ভয় পেয়ে যান।

৪

গত দু' বছরের মধ্যে একাধিক গণঅভ্যুত্থান দেখেছে প্যারিস। তাই বিপ্লবের সময় অন্যান্য জেলা বা প্রদেশের থেকে সবচেয়ে নির্বিকার থাকে প্যারিস। বিপ্লবের ব্যাপারে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকার ফলে পথে সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবী জনতার লড়াই দেখেও প্যারিসের লোকরা বলে, এ হাঙ্গামা হচ্ছে, এমন কিছু না। দোকানপাট সাধারণত খোলাই থাকে, তবে কোনও দোকানদার যখন দেখে হাঙ্গামার স্রোত সেদিকে এগিয়ে আসছে তখন দোকান বন্ধ করে চলে যায়। একজন দর্শক আর একজনকে নির্বিকারভাবে বলে, সেন্ট মার্তিনে গোলমাল হচ্ছে। অনেকে আবার হাঙ্গামার অনতিদূরে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি ও গল্পগুজব করে। ১৮৩১ সালে রাজপথে এক জায়গায় যখন একটা বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল তখন দু' পক্ষই গুলিবর্ষণ থামিয়ে পথ করে দেয়। ১৮২৯ সালের ১২ই মে তারিখে র‍্যু সেন্ট মার্তিনে যখন একজন বৃদ্ধ মদের বোতলভরা একটা হাতে-টানা গাড়িকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে সরকারী ও বিপ্লবীদের মাঝখান দিয়ে যাবার সময় দাঁড়িয়ে তার গাড়ি থেকে মদের বোতলগুলো নিয়ে দু' পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। এটাই হলো প্যারিসের গণঅভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোনও রাজধানীতে পাওয়া যায় না। প্যারিস একই সঙ্গে ভলতেয়ার আর নেপোলিয়নের শহর।

কিন্তু ১৮৩২ সালের জুন মাসে ভিন্ন ব্যাপার দেখা গেল। সমগ্র প্যারিস শহর ভীষণভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এমন কি যে সব অঞ্চলে কোনও হাঙ্গামা বা লড়াই হয়নি, সেই সব অঞ্চলের লোকরাও ঘরের জানালা ও দোকানপাট বন্ধ করে রাখত। সাহসী লোকেরা অবশ্য যন্ত্রের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। দু' একজন পথচারী রাস্তা দিয়ে চলে যায়। চারদিকে নানারকম গুজব ছড়াতে লাগল। শোনা গেল বিপ্লবীরা ব্যাঙ্ক দ্য ফ্রান্স দখল করে নিয়েছে। সাহসী লোকরা সবাই অস্ত্র যোগাড় করে লড়াইয়ে নেমে পড়ল। যারা ভীরু কাপুরুষ তারা লুকিয়ে পড়ল। লোবাউ ও বোগদ এক পরিকল্পনা করল—সেনাবাহিনীর চারটি দল চারদিক থেকে বিপ্লবীদের মূল ঘাঁটি আক্রমণ করবে। সে চারটি দিক হলো, বাস্তিল, পোর্তে সেন্ট মার্তিন, প্লেস দ্য গ্রেভয়ার আর লে হ্যালে। কিন্তু সেনাবাহিনীকে প্যারিস শহর ছেড়ে শ্যাম্প দ্য মার্সে চলে যেতে হবে। শহরে কখন কি হবে তা কেউ বলতে পারে না। মার্শাল সুল্ত-এর কুণ্ঠাটা ক্রমশঃ অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। কেন তিনি বিপ্লবীদের ঘাঁটিগুলিকে অবিলম্বে আক্রমণ করলেন না? তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।

সেদিন সন্ধ্যায় শহরের কোনও থিয়েটার খুলল না। পুলিশ পাহারা বেড়ে গেল পথে পথে। পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে লাগল। পথচারীদের আটক

করে তাদের কাছে অস্ত্র আছে কিনা দেখতে লাগল। রাত্রি ন'টার মধ্যেই আটশো লোককে গ্রেপ্তার করা হলো। সমস্ত জেলখানাগুলো বিশেষ করে কনসাজারি জেলখানাটা একেবারে ভরে গেল। অনেক জেলখানায় বন্দী বিপ্লবীদের উঠোনে ফাঁকা জায়গায় রাখা হলো। ঘরে রাখা সম্ভব হলো না তাদের।

বাড়িতে মা ও স্ত্রীরা তাদের লোকদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ভয়ে ভয়ে। কে কখন বাড়ি ফিরবে তার ঠিক নেই। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দল রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, 'সবাই বাড়ি চলে যাও।' লোকে তাড়াতাড়ি করে তাদের আপন আপন বাড়ির দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিল। কখন গুলিবর্ষণ শুরু হবে তার জন্য শ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দেখতে দেখতে গোটা প্যারিস শহরটা বিপ্লবের লাল আগুনের আঁচে রাঙা হয়ে উঠল।

দশম পরিচ্ছেদ

১

আর্সেনালের সামনে যখন সেনাবাহিনী আর বিপ্লবী জনতার লড়াই চলছিল তখন একটি ছেলে হাতে একটা ফুলের ডাল নিয়ে মেনিলো মঁতাত থেকে ছেঁড়া জামা-প্যান্ট পরে আসছিল। পথে সে এই ডালটা কুড়িয়ে পায়। ফুলগুলো ছিঁড়ে দিয়ে সে ডালটা রেখে দেয়। পথ চলতে চলতে সে একটা পুরনো দোকানের সামনে একটা পিস্তল দেখল। একটি মহিলা দোকানের সামনে বসেছিল। এই ছেলেটি হলো গাভ্রোশে। সে পিস্তলটা দেখেই হাতের ডালটা ফেলে দিয়ে পিস্তলটা তুলে নিয়ে মহিলাটিকে বলল, মাদাম, এটা আমি ধার নিলাম তোমার কাছ থেকে।

এদিকে তখন ভীতসন্ত্রস্ত নগরবাসীরা র‍্যু আমেনল দিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। তারা পালাবার সময় দেখল একটা ছেলে একটা পিস্তল ঘোরাতে ঘোরাতে গান করছে।

গাভ্রোশে লড়াই করতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখল ত র পিস্তলে ঘোড়া নেই। সে নির্বিকারভাবে গান করে যেতে লাগল। কোনও ভয় বা ত্রাসের চিহ্ন নেই তার চোখে-মুখে। প্যারিসের বিভিন্ন জায়গায় প্রচলিত লোকগীতিগুলো তার জানা আছে। সে একবার একটা ছাপাখানায় কিছুদিন কাজ করে। মঁসিয়ে লর্মিয়া নামে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে ফাইফরমাস খাটার কাজও করে।

কিন্তু গাভ্রোশে তখনো জানত না সেদিন ঝড়ের রাতে সে যে ছেলে দুটিকে আশ্রয় দেয় তার বাসাব মধ্যে সে ছেলে দুটি আসলে তারই দুটি ছোট ভাই। সেদিন সন্ধ্যায় সে তার ভাইযের আশ্রয় দিয়ে সেই রাতেরই শেষ দিকে তার বাবাকে জেলখানার পাঁচিল থেকে উদ্ধার করে।

তার বাবাকে উদ্ধার করার পরই সে তার সেই হাতির পেটের বাসাটায় ছুটে চলে যায়। গিয়ে সেই ছেলে দুটিকে বলে, এখন তোমরা যাও, তোমাদের বাবা মার দেখা না পেলে সন্ধের সময় আবার তোমরা আমার কাছে চলে আসবে। আমি তোমাদের রাতের খাওয়া আর শোবার জায়গা দেব।

ছেলে দুটি তখন চলে যায় গাভ্রোশের কাছ থেকে। কিন্তু আর ফিরে আসেনি। তাদের পুলিশ ধরে কোনও জেলে নিয়ে গেছে না অন্য কোনও দুষ্কৃতকারী তাদের ধরে নিয়ে গেছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তা জানে না সে। তারপর থেকে প্রায় দশ-বারো সপ্তা কেটে গেছে। কিন্তু ছেলে দুটোর আর দেখা পায়নি সে। সে মাঝে মাঝে মাথা চুলকাতে চুলকাতে তাদের কথা না ভেবে পারে না।

পিস্তল ঘোরাতে ঘোরাতে পঁত অন শৌতে এসে পড়ল গাভ্রোশে। সে দেখল রাস্তাটার দু'পাশে এত দোকানের মধ্যে শুধু একটা দোকানই খোলা আছে। দোকানটা মিষ্টির। কিন্তু গাভ্রোশে দেখল তার পায়জামার পকেটে পয়সা নেই। কিছু করার আগে কিছু খাওয়া দরকার। কিন্তু খাবার কেনার পয়সা না থাকায় সে হতাশ হলো।

আবার তার পথে এগিয়ে চলল গাভ্রোশে। মিষ্টির দোকানে দেখা আপেলের মণ্ডটার কথা ভাবতে লাগল সে। যেতে যেতে তার সামনে দেখল ভাল পোশাকপরা একদল ভদ্রলোক আসছে। তাদের দেখে গাভ্রোশের মনে হলো লোকগুলো ধনী। ওদের চেহারাগুলো খুব মোটা। মনে হয় ওদের সব টাকা শুধু পেটেই যায়।

২

প্রকাশ্য রাজপথে পিস্তলটা ঘোরাতে ঘোরাতে এগিযে চলল গাভ্রোশে। প্রতিটি পদক্ষেপে সে যেন এক নতুন উদ্যম লাভ করছে। তার মনের তেজ বেড়ে যাচ্ছে। সে আপন মনে বলতে লাগল, সব ঠিক আছে। আমার বাঁ পাটায় একটা ক্ষত আছে। আমার বাতও আছে। তবু আমি ভালই আছি। শহরের যত সব ভদ্রলোকদের আমি গান গেয়ে শোনাব আর তারা তা শুনবে। আমার পিস্তলটায় একটা ঘোড়া থাকলে ভাল হত। বুলভার্দে এখন জোর হাঙ্গামা চলছে। এখন আমাকে সেখানে যেতে হবে। হে যুবকগণ, এগিয়ে যাও, বিশ্বাসঘাতকদের রক্তপাত করো। আমি দেশের কাজে জীবন দেব। আমার সুন্দরী প্রেমিকা লিলিকে আর হয়ত দেখতে পাব না আমি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে! লড়াই আমাকে করতেই হবে। স্বৈরাচার অনেক সহ্য করেছি।

এমন সময় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর এক অশ্বারোহী পথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে তার ঘোড়াটা পড়ে গেল। লোকটা ঘোড়াসুদ্ধ পড়ে যাওয়ায় গাভ্রোশে লোকটাকে ও তার ঘোড়াটাকে ধরে তুলে দিল। পিস্তলটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর তারা উঠে পড়লে গাভ্রোশে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। রু দ্য ফোরিগনের অবস্থাটা তখন শান্ত ছিল। চারজন মহিলা একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পরচর্চা করছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল রাস্তার ঝাড়ুদার আর তিনজন ছিল বাড়ির গিন্নী। এই তিনজনের নাম ছিল মাদাম পাতাগন, মাদাম ভার্ভলেম আর মাদাম বাপ্ত। তারা জিনিসপত্রের দাম আর দেশের অবস্থার কথা আলোচনা করছিল।

তাদের কথা শুনতে শুনতে গাভ্রোশে একসময় বলল, কি বুড়ী মেয়েরা, রাজনীতি আলোচনা করছ কেন ?

তখন চারজন মহিলাই তাকে গালাগালি করতে লাগল একযোগে। তারা বলল, আর একটা পাজী বদমাস।

একজন বলল, ওর হাতের মধ্যে ওটা কি? পিস্তল?

আর একজন বলল, এই বয়সে ছেলেটা পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করছে?

একজন বলল, ওরা আইনের বিরোধিতা করেই সবচেয়ে খুশি হয়।

গাভ্রোশে তার হাতের আঙুল দিয়ে তার নাকটা নাড়া দিতে লাগল।

ঝাড়ুদার মেয়েটি বলল, একটা নোংরা পাজী ছেলে।

মাদাম পাতাগন নামে মহিলাটি বলল, শহরে গোলমাল যে হচ্ছে এটা ঠিক। সেদিন দেখি আমাদের পাশের বাড়ির এক বালকভৃত্য একটা পিস্তল নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। সেদিন মাদাম বাপ্তা বলল পঁতয়ে বিপ্লব বেধে গেছে। আজ আবার দেখি এই ক্ষুদে দানবটা একটা পিস্তল নিযে যাচ্ছে। মনে হয় র‍্যু দে সেলিসতিন অঞ্চলটা কামানে ভরে আছে। এই সব পাজী ছোকরাদেব দমন করতে হয় সরকারকে। একদিন পথে রানীকে গাড়িতে করে যেতে দেখে মায়া হলো। তার উপর দেখ তামাকের দামটা কেমন যাচ্ছে বেড়ে। যাই হোক, আমি ঐ ছোঁড়াটার ফাঁসি যেন দেখতে পাই।

গাভ্রোশে ঠাট্টা করে মহিলাটিকে বলল, তোমার নাকটা লাফাচ্ছে, টিপে ধরো।

এরপর সেহ্ ঝাড়ুদার মেযেটিকে বলল, শোন মাদার স্ট্রীটকর্নার, বিপ্লবীদের গালাগালি করা তোমাদের কখনো উচিত না। আজ তোমাদের জন্যই আমরা পিস্তল ধরেছি। তোমরা যাতে ভালভাবে খাওয়া-পরা করতে পার তার জন্যই এই বিপ্লব।

এবার পিছন ফিরে গাভ্রোশে দেখল, মাদাম পাতাগন ঘুষি পাকিয়ে তার দিকে তাকিযে বলছে, তুই একটা অবৈধ সন্তান কারো না কারো।

গাভ্রোশে বলল, আমি তা গ্রাহ্য করি না।

এরপর সে হাঁটতে হাঁটতে লামগনন হোটেলের সামনে গিয়ে হাঁক দিয়ে বলতে লাগল, কই হে ছোকরারা, বেরিয়ে এস, সবাই যুদ্ধে চল।

এই বলে সে তার পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে দুঃখ করতে লাগল। সে বলল, আমি এখন কাজ করতে চাই, কিন্তু তুমি তো কাজ করবে না।

পথের ধারে একটা রোগা কুকুরকে দেখে তার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে সে ওর্মে সেন্ট গার্ভের দিকে এগিয়ে চলল।

৩

কিছুদিন আগে একটা সেলুনের নাপিত গাভ্রোশের দুটি ভাই আশ্রয় চাইতে এলে তাদের তাড়িয়ে দেয় সন্ধের সময়। নাপিতটা তখন একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের দাড়ি কামাচ্ছিল। দাড়ি কামাতে কামাতে সে সেই সৈনিকের সঙ্গে নেপোলিয়নের গল্প করছিল। এ যেন ক্ষুর আর তরবারির সংলাপ। নাপিতটা বলল, মঁসিয়ে, নেপোলিয়ন অশ্বারোহী হিসাবে কেমন ছিলেন?

লোকটি বলল, তিনি কখনো ঘোড়া থেকে পড়ে যাননি। পতন কাকে বলে তা জানতেন না।

আমার মনে হয় তাঁর অনেক ভাল ভাল ঘোড়া ছিল।

যেদিন তিনি আমাকে একটা ক্রস উপহার দেন সেদিন তাঁর ঘোড়াটাকে খুঁটিয়ে দেখি। সেটা ছিল একটা সাদা মাদী ঘোড়া। কানদুটো ঢালা ঢালা। মাথাটা সরু, তারকাচিহ্নিত ঘাড়টা লম্বা।

নাপিতটি বলল, খুব ভাল ঘোড়া তো।

হ্যাঁ, এই ঘোড়াটা সম্রাটের ছিল।

একটু থেমে সে আবার বলতে লাগল, সম্রাট নেপোলিয়ন জীবনে মাত্র একবার র‍্যাটিসবনে আহত হন।

কিন্তু আপনি নিশ্চয় জীবনে অনেকবার আহত হন।

সে কথা বলতে? ম্যারেঙ্গোতে কয়েকবার তরবারির আঘাত, অস্টারলিৎসে ডান হাতে আর নেনাতে ডান জানুতে একটা করে গুলির আঘাত। ফ্রীডল্যান্ডে একটা বেয়নেটের আঘাত পাই। এ ছাড়া মসকোয়াতে সাত-আটটি বর্শার আঘাত। লুৎজেনে বোমা ফেটে একটা আঙুল উড়ে যায়। ওয়াটারলুতেও জানুতে একটা আঘাত পাই।

নাপিতটি সব শুনে বলল, চমৎকার। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা কত গৌরবের! তাছাড়া আমার মতে শয্যাগত অবস্থায় ধীরে ধীরে ওষুধ খেয়ে মরার থেকে কামানের একটা গোলা লেগে এক মুহূর্তে মরা অনেক ভাল।

সৈনিকটি বলল, তুমি ঠিকই ভেবেছ।

তার কথা শেষ না হতেই জানালার কাঁচের উপর একটা জোর শব্দ হতে চমকে উঠল দু'জনে। নাপিত বলল, এবার গুলিগোলা শুরু হয়ে গেল।

সৈনিকটি কিন্তু জানালার কাছে মেঝের উপর থেকে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে দেখাল। বলল, এই তোমার গুলি।

নাপিত জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, গাভ্রোশে পাথর ছুঁড়ে ছুটে পালাচ্ছে। সে তখন বলতে লাগল, শয়তানটা পালাচ্ছে। আমি ওর কি করেছি?

৪

গাভ্রোশে মার্শে সেন্ট জাঁতে এসে দেখল পুলিশবাহিনীকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এঁজোলরাস, কুরফেরাক, কমবেফারে আর ফুলির নেতৃত্বে সশস্ত্র একদল যুবক সেখানে লড়াই করছিল। তাদের হাতে ছিল বন্দুক আর তরবারি। গাভ্রোশে তাদের কাছে যেতেই কুরফেরাক তাকে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলে যোগ দিল গাভ্রোশে। কমবেফারের বেল্টে একটা পিস্তল ছিল।

এই যুবকদল যখন মার্শে সেন্ট জাঁ থেকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন ছাত্র, শ্রমিক, শিল্পী প্রভৃতির এক বিরাট জনতা তাদের পিছু পিছু যেতে লাগল। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছিল তার দেহটিকে। গাভ্রোশে বলল, এ লোকটি কে?

কুরফেরাক বলল, এমনি একজন বৃদ্ধ লোক।

আসলে লোকটি ছিল মঁসিয়ে মেবুফ।

কুরফেরাক প্রথমে মঁসিয়ে মেবুফকে দেখে। মেরিয়াসের সঙ্গে এর আগে মঁসিয়ে মেবুফকে দেখেছে কুরফেরাক। তাই তাকে চিনতে পারল। দেখল তার মাথায় টুপি নেই, অথচ মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে।

কুরফেরাক মেবুফের কাছে গিয়ে বলল, মঁসিয়ে মেবুফ, আপনি বাড়ি যান।

কেন ?

লড়াই চলছে।

আমি তা গ্রাহ্য করি না।

তরবারি, গুলি নিয়ে লড়াই হচ্ছে।

খুব ভাল কথা। কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?

আমরা সরকারের উচ্ছেদ ঘটাতে যাচ্ছি।

ভাল।

মঁসিয়ে মেবুফ এই বলে তাদের দলে যোগ দেয়। সেই থেকে একটা কথাও বলেনি মেবুফ। সে ভাল করে পথ হাঁটতে পারছিল না। তা দেখে একজন শ্রমিক এসে তাকে একটা হাত দেয়। সেই হাত ধরে তাড়াতাড়ি পথ চলতে থাকে মেবুফ।

বিপ্লবী জনতার ভিড় ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। রু দে চিলেত্তেতে লম্বা চেহারা পাকা চুলওয়ালা একজন লোক বিপ্লবীদের দলে এসে যোগদান করল। তার বলিষ্ঠ চেহারাটা দেখে এঁজোলরাস ও তার বন্ধুরা মুগ্ধ হলো। গাভ্রোশে তখন সকলের আগে আগে যাচ্ছিল। দু'পাশের বন্ধ দোকানগুলোর দিকে তার দৃষ্টি থাকায় সে নবাগতকে দেখেনি।

ওরা যাচ্ছিল কুরফেরাকের বাসাটার পাশ দিয়ে। কুরফেরাক তার বাসায় গিয়ে তার টাকার থলে, মাথার টুপি আর একটা স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এল। মেরে ভুর্ভা নামে একটি মেয়ে কুরফেরাককে বলল, আমার বাসায় একজন লোক আপনার খোঁজ করছে।

এমন সময় শ্রমিকের ছেঁড়া পোশাকপরা মেয়েদের মতো দেখতে একটি যুবক এসে কুরফেরাককে বলল, আমি মঁসিয়ে মেরিয়াসকে খুঁজছি।

কুরফেরাক বলল, সে এখানে নেই।

সন্ধেবেলায় আসবে তো ?

আমি জানি না। আমি নিজেও হয়ত ফিরব না।

কেন ফিরবেন না ?

ফিরব না।

কোথায় যাবেন ?

সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

আপনার বাক্সটা আমায় বয়ে নিয়ে যেতে দেবেন ?

আমি ব্যারিকেডে যাচ্ছি।

আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

যেতে পার, রাস্তা সবার জন্যই খোলা আছে।

কুরফেরাক তার বন্ধুদের কাছে চলে গেল। তার বাক্সটা একজনের হাতে দিয়ে দিল। পরে দেখল অচেনা যুবকটি তার অনুসরণ করছে।

বিক্ষুব্ধ জনতা এক জায়গা যাব বলে আর এক জায়গায় যায়। বাতাসের বেগে যেন তারা উড়ে যায় এখানে-সেখানে। কোনও কারণ না জেনেই রু্য মেরী হয়ে রু্য সেন্ট ভেনিসে গিয়ে পৌঁছল তারা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

এর আগে কুরফেরাক যে ব্যারিকেডের কথা বলে সে ব্যারিকেড হলো শাঁভ্রেরির ব্যারিকেড। রু্য দ্য লা শাঁভ্রেরি অঞ্চলে কোরিনথের হোটেলে ওরা মিলিত হত। গ্রান্তেয়ার প্রথমে জায়গাটা আবিষ্কার করে। কুরফেরাকের দল সেখানে খাওয়া-দাওয়া করত আর নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করত। মালিক পীয়ের হুশেলুপ খুব ভাল লোক ছিল। খাদ্য ও পানীয়র জন্য ওরা কম টাকা দিত, অনেক সময় কিছুই দিত না। হোটেল মালিক হুশেলুপ কিছুই বলত না তার জন্য।

হুশেলুপের মুখে মোচ ছিল। তার উপরটা খুব কড়া আর কণ্ঠস্বরটা গম্ভীর ছিল। নবাগত খরিদ্দাররা তাকে দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে যেত। আসলে পিস্তলের মতো দেখতে নস্যির ডিবের মতো তার গম্ভীর ছদ্মবেশের অন্তরালে পরিহাসরসিক একটা মন লুকিয়ে থাকত। তার স্ত্রী মেরে হুশেলুপ দেখতে খুব কুৎসিত ছিল। পীয়ের হুশেলুপের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী হোটেল চালায়। কিন্তু তখন খাদ্য ও পানীয়র মান খারাপ হয়ে যায়। তবু কুরফেরাক আর তার বন্ধুর দল সে হোটেলে খেত। ১৮৫০ সালে পীয়ের হুশেলুপ মারা যাওয়ার পর মাতেলোত্তে আর গিবেলোত্তে নামে দু'জন মেয়েকে নিয়ে তার স্ত্রী হোটেল চালাত।

৫ই জুন সকালে কোরিনথের হোটেলের বাসিন্দা ল্যাগলে দ্য মিউ আর জলি প্রাতরাশ করছিল। তারা ঐ হোটেলেই দু'জনে একসঙ্গে খাওয়া-থাকা করত। তারা তখন প্রাতরাশ করছিল, তখন গ্রান্তেয়ার সেখানে হঠাৎ এসে পড়ে। গ্রান্তেয়ারকে দেখে আর এক বোতল মদ নিয়ে আসে গিবেলোত্তে। কিছু খাবার আগেই এক বোতল মদ শেষ করে ফেলল গ্রান্তেয়ার। তারপর বলল, হে আমার প্রিয় ল্যাগলে, তোমার জামাটা ময়লা আর ছেঁড়া।

ল্যাগলে বলল, আমার কুৎসিত চেহারাটার সঙ্গে এই জামাটা সঙ্গতিপূর্ণ। পুরনো পোশাক মানুষের পুরনো বন্ধুর মতো। যাই হোক, তুমি কি বুলভার্দে থেকে আসছ?

না, ওদিকে আমি যাইনি।

আমি আর জলি মিছিলটাকে ওদিকে যেতে দেখি। জলি বলল, দৃশ্যটা আশ্চর্যজনক। অথচ এ রাস্তাটা দেখ, কত নির্জন। এখান থেকে বোঝা যাবে না প্যারিস শহরে কি তুমুল কাণ্ড চলছে। মনে হবে এইসব গোটা অঞ্চলটা একটা গীর্জা আর এখানে যারা থাকে তারা সবাই সন্ন্যাসী যাজক।

গ্রান্তেয়ার বলল, ওদের কথা আর আমায় বলো না। যাজকদের কথা শুনতে আমার গায়ে জ্বালা ধরে। আজ সকালে বাজে ঝিনুকের মাংস খেয়ে আর হোটেলের কুৎসিত মেয়ে দেখে আমার মাথা ধরে গেছে। সমগ্র মানবজাতিকে আমি ঘৃণা করি। র‍্যু রিচলু দিয়ে আসার পথে একটা বড় লাইব্রেরি দেখলাম। তারপর আমি আমার পরিচিত মেয়েটাকে দেখতে যাই। মেয়েটাকে দেখতে বসন্ত সকালের মতো সুন্দর। দেখলেই আনন্দ হয়। গিয়ে দেখি একটা সোনারুপোর দোকানের মালিক তার প্রেমে পড়েছে। মেয়েরা টাকার গন্ধকে ফুলের গন্ধের মতো মনে করে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মাস দুই আগে মেয়েটা পরিশ্রম করে জীবিকার্জন করত এবং সুখেই ছিল। এখন সে টাকাওয়ালা এক ধনী লোকের সঙ্গ পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। তাকে আগের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছে। পৃথিবীতে নীতি বলতে কিছু নেই। মার্টেল ফুল হচ্ছে প্রেমের প্রতীক, লরেল হচ্ছে যুদ্ধের প্রতীক, অলিভ হচ্ছে শান্তির প্রতীক। পৃথিবীতে ন্যায়বিচার বলে কোনও কিছু নেই। সারা জগৎ শিকারী পশুতে ভর্তি। যত সব ঈগলগুলো মাংসের লোভে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গ্রান্তেয়ার তার গ্লাসটা তুলে আর এক গ্লাস মদ চাইল। মদের গ্লাসটা পান করার পর আবার কথা বলতে শুরু করল। সে বলল, যে ব্রেনাস রোম জয় করেছিল সে যেমন ঈগল ছিল তেমনি সোনারুপোর দোকানের যে মালিকটা সুন্দরী মেয়েটাকে হাত করে সেও একটা ঈগল। দু'জনেই সমান নির্লজ্জ। সুতরাং বিশ্বাস করার মতো কিছু নেই। শুধু মদ পান করে যাও। মদই একমাত্র সত্য। তোমার মতবাদ যাই হোক, তুমি যে দলের লোক হও না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি শুধু মদ খেয়ে যাও। তুমি একটু আগে বুলভার্দ আর মিছিলের কথা বলছিলে, তাতে কি হয়েছে? আর একটা বিপ্লব হতে চলেছে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে ঈশ্বর এ বিপ্লব ঘটাতে চলেছেন সেটা বড় বাজে লাগছে। আমি যদি ঈশ্বর হতাম, তাহলে সব কিছুর সোজাসুজি খাড়াখাড়ি ব্যবস্থা করে ফেলতাম। সমগ্র মানবজাতিকে এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাখতাম যে মানবজগতের কোনও ঘটনার মধ্যে কোনও অসংগতি বা অযৌক্তিকতা থাকত না, তার মধ্যে কোনও 'যদি', 'কিন্তু' বা ঐন্দ্রজালিক রহস্যময়তার অবকাশ থাকত না। তোমরা যেটাকে প্রগতি বল, সেই প্রগতির গাড়িটাকে চালায় দুটো জিনিস—মানুষ আর ঘটনা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এই মানুষ আর ঘটনাই প্রগতিরূপ গাড়ি চালাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে গাড়ি চালাবার জন্য সাধারণ মানুষের পরিবর্তে চাই প্রতিভাবান মানুষ আর ঘটনার পরিবর্তে চাই বিপ্লবের মতো বিশেষ ঘটনা। বিপ্লব দ্বারা কি প্রমাণ হয়? তার মানে ঈশ্বর হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। ঈশ্বর যখন দেখেন বর্তমান আর ভবিষ্যতের মধ্যের ফাঁকটাকে কোনওমতে পূরণ করা যাচ্ছে না তখন রাষ্ট্রযন্ত্রে একটা বড় রকমের পরিবর্তন আনেন। এ ছাড়া তিনি আর কোনওভাবে প্রতিকার করতে পারেন না। যখন আমি দেখি স্বর্গ ও মর্ত্যে সব জায়গায় দুঃখের অগ্নিস্রোত বয়ে যাচ্ছে, তখন আমি রাজারাজড়াদের ও সমগ্র মানবজাতির দুর্ভাগ্য ও সকরুণ পরিণতির কথা ভাবি। যখন দেখি শীতকাল আসার

সঙ্গে সঙ্গে আকাশটা ফুটো হয়ে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে, হিমেল বাতাস বয়ে যাচ্ছে, পাউডারের মতো তুষার ছড়িয়ে পড়ছে, যখন সূর্য আর চন্দ্রের কলঙ্কগুলো দেখি, মানবজগতে দেখি নানারকমের বিশৃঙ্খলা, যখন দেখি পরস্পরবিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনও ঐক্য বা শৃঙ্খলা নেই তখন ভাবি ঈশ্বরকে পরম ঐশ্বর্যবান বলে মনে হলেও তিনি নিঃস্ব, আসলে তাঁর কোনও ঐশ্বর্য নেই। কোনও দেউলে হয়ে পড়া ধনী ব্যবসায়ীর বলনাচের আসর বা ভোজসভার ব্যবস্থা করার মতো তখন তিনি বিপ্লবের ব্যবস্থা করেন। আজ ৫ই জুন। আমি সকাল থেকে সূর্য ওঠার জন্য অপেক্ষা করে আছি। কিন্তু সারাদিন অন্ধকার হযে আছে। সূর্যের আলো নেই। জগতের সব কিছুই বিরক্তিকর, কোনও বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল নেই। সব জাযগাতেই দেখবে বিশৃঙ্খলা। এই জন্যই আমি হযে উঠেছি তার বিরোধী, তাই বিপ্লবীদেব দলে যোগ দিয়েছি। আমার মনে কিন্তু কোনও হিংসা নেই কারো প্রতি। প্রকৃত অর্থে জগৎটা যা আমি তাই বলছি। পৃথিবীটা পুরনো আর বন্ধ্যা। আমরা বৃথা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে মরছি।

দীর্ঘ বক্তৃতার পর গ্রান্তেযার কাশতে লাগল।

জলি বলল, তুমি বিপ্লবের উপর বক্তৃতা দিচ্ছ আর মেরিযাস গলায গলায প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ল্যাগলে বলল, কার প্রেমে কিছু জান?

না।

গ্রান্তেয়ার বলল, মেরিযাস প্রেমে পড়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি তার চারদিকে কুযাশা। সে হচ্ছে কবি জাতের মানুষ, তার মানে পাগল প্রকৃতির। মেয়েটার নাম মেরি বা মেরিয়া বা মেরিয়েত্তে যাই হোক না কেন, তারা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। সব ভুলে আবেগভরে চুম্বন করতে করতে তারা স্বর্গে চলে যাবে। দুটি সংবেদনশীল আত্মা নক্ষত্রের রাজ্যে ঘুমোবে।

গ্রান্তেয়ার আরও এক বোতল মদ পান করতে যাচ্ছিল এমন সময একটি নবাগত তাদের সামনে এসে হাজির হলো। নবাগতের বয়স মাত্র দশ। পরনে ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক, অযত্নলালিত দেহ। ছেলেটি কোনও ইতস্তত না করেই ল্যাগলে দ্য মিউকে বলল, আপনি কি মঁসিয়ে বোসেত?

ল্যাগলে বলল, ওটা আমার অন্য নাম। কি চাও তুমি?

ছেলেটি বলল, তাহলে শুনুন। বুলভার্দে লম্বা চেহারার মাথায সুন্দর চুলওয়ালা এক যুবক আমাকে বলল মেরে হুশেলুপকে আমি চিনি কিনা। আমি তখন তাকে বললাম, আপনি কি র‍্যু শাঁভ্রেরি হোটেলের ভূতপূর্ব মালিকের বিধবা পত্নীর কথা বলছেন? সে বলল, হ্যাঁ ঠিক বলেছ। তুমি সেখানে গিয়ে মঁসিয়ে বোসেতের খোঁজ করবে এবং তাকে ‘এ বি সি’ এই কথাটা বলবে। এর জন্য সে আমাকে দশ স্যু দেয়।

ল্যাগলে বলল, জলি তুমি দশ স্যু আর গ্রান্তেয়ার, তুমিও দশ স্যু দাও।

এইভাবে ছেলেটি আরও কুড়ি স্যু পেল।

ল্যাগলে ছেলেটিকে বলল, তোমার নাম কি?

আমার নাম গাভ্রোশে।

তাহলে তুমি আমাদের কাছে থাক।

গ্রান্তেয়ার বলল, আমাদের সঙ্গে তুমি প্রাতরাশ খাও।

ছেলেটি বলল, তা আমি পারব না। কারণ আমি মিছিলে আছি। 'পলিতানাস্ক নিপাত যাক' এই ধ্বনি দিচ্ছি আমি।

গাভ্রোশে এক পা পিছিয়ে সম্মানের সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

গ্রান্তেয়ার বলল, রাস্তার ভবঘুরে ছেলে হলেও সরল এবং সৎ।

ল্যাগলে ভাবতে ভাবতে বলল, এ, বি, সি—মানে ল্যামার্কের শবযাত্রা।

গ্রান্তেয়ার বলল, লম্বা চেহারা সুন্দর চুলওয়ালা যুবকটি হলো এঁজোলরাস। সে তোমাকে ডেকে পাঠিযেছে।

বোসেত তাকে বলল, তুমিও যাচ্ছ তো?

আমি আগুনের মধ্য দিযে যাব বলে কথা দিযেছিলাম, জলের মধ্য দিয়ে নয। আমার সর্দিটাকে বাডাতে চাই না।

গ্রান্তেযার বলল, আমি এখানেই থেকে যাব। শবানুগমন থেকে প্রাতরাশ খাওযা অনেক ভাল।

ল্যাগলে বলল, ভাল কথা। আমরা যেখানে আছি সেখানেই থেকে যাই। আরও কিছু মদপান করা উচিত আমাদের। আমরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এড়িয়ে যেতে পারি, কিন্তু বিদ্রোহকে এডাতে পারি না।

জলি বলল, আমরা সবাই তাই চাই।

ল্যাগলে বলল, ১৮৩০ সালের অসমাপ্ত কাজ আমরা শুরু করতে চাই। জনগণ সব তৈরি।

গ্রান্তেয়ার বলল, আমি তোমাদের বিপ্লবের কিছু বুঝি না। তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আমি রাজ সরকারকে ঘৃণা করি না। যে রাজা মাথায় সুতোর টুপি পরে এবং যার রাজদণ্ড ছাতায় পরিণত হয়েছে সে রাজার বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। এই বৃষ্টির দিনে লুই ফিলিপ দুটো কাজ করতে পারে—জনগণের মাথার উপর সে তার রাজদণ্ডটা ঘোরাতে পারে আর ঈশ্বরের দিকে তার ছাতাটা তুলে ধরতে পারে।

আকাশে ঘন মেঘ থাকায় ঘরখানা অন্ধকার দেখাচ্ছিল। হোটেলে বা রাস্তায কোনও লোক ছিল না। সবাই মিছিল দেখতে গেছে।

বোসেত বলল, এখন মনে হয় রাত দুপুর। কিছু দেখা যাচ্ছে না। গিবোলেত্তে, একটা আলো এনে দাও।

গ্রান্তেয়ার মদ খেতে খেতে বলল, এঁজোলরাস আমাকে ঘৃণা করে। সে হয়ত ছেলেটাকে বোসেতের কাছে পাঠাবার কথা ভেবেছিল। জলি ভাল ছোকরা নয়, আর

গ্রান্তেয়ার মহান। তাই বোসেতের কাছে ওকে পাঠাই। তবে এঁজোলরাস নিজে এলে তার সঙ্গে আমি শয়তানের কাছেও যেতে পারি।

এইভাবে ওরা তিনজনেই রয়ে গেল। জলি আর বোসেতকে মদের লোভ দেখিয়ে আটকে রাখে গ্রান্তেয়ার। সেদিন বিকালের দিকে দেখা যায় তাদের টেবিলের উপর অনেকগুলো মদের খালি বোতল পড়ে আছে। দুটো বাতি জ্বলছে।

গ্রান্তেযার মদ খাওয়া থামিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিল। তার মুখে হাসিখুশির ভাবটা ঠিক ছিল। জলি আর বোসেত তার কাছে বসে তার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল সমানে। গ্রান্তেয়ার এক সময় বলল, সব দরজা খুলে দাও, সবাই আসুক ভিতরে, মাদাম হুশেলুপকে আলিঙ্গন করুক। মাদাম হুশেলুপ বযোপ্রবীণা, তুমি আমার কাছে সরে এস যাতে আমি ভাল করে দেখতে পারি তোমায়।

এরপর গ্রান্তেয়ার নেশার ঝোঁকে বলতে লাগল, কে আমার অনুমতি না নিয়েই আকাশ থেকে কযেকটা তারা এনে টেবিলের উপর জ্বেলে দিয়েছে। সেগুলো বাতি হয়ে জ্বলছে।

জলি বলল, শোন মাতেলোত্তে আর গিবেলোত্তে, তোমরা আর গ্রান্তেয়ারকে মদ দেবে না। ঈশ্বরের নামে বলছি। ও আজ জলের মতো পযসা খরচ করছে। সকাল থেকে ও ছ' ফ্রাঁ নব্বই সেন্তিমে খরচ করেছে।

এই সময় বাইরে গোলমালের শব্দ শোনা গেল। অনেকে ছোটাছুটি করছিল। 'অস্ত্র ধারণ করো' বলে অনেকে চিৎকার করছে।

গ্রান্তেয়ার মুখ ঘুরিয়ে দেখল এঁজোলরাস, কুরফেরাক, গাভ্রোশে, কমবেফারে, প্রুভেয়ারের নেতৃত্বে এক বিক্ষুব্ধ জনতা র‍্যু ডেনিস থেকে আসছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক, পিস্তল, তরবারি, হাতবোমা প্রভৃতি অস্ত্র ছিল।

বোসেত হাতে তালি দিয়ে কুরফেরাককে ডাকল। কুরফেরাক বলল, কি বলছ?

বোসেত বলল, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

ব্যারিকেড করতে।

এখানে ব্যারিকেড করছ না কেন? এটা তো ভাল জায়গা।

ঠিক বলেছ ল্যাগলে।

এই বলে সে অন্যদের লা শাঁশোরিতেই ব্যারিকেড তৈরি করার জন্য বলল।

৩

রাস্তা থেকে একটা সরু গলিপথ বেরিয়ে আসার জায়গাটা ব্যারিকেডের পক্ষে সত্যিই ভাল। বোসেত মদ খেয়ে মাতাল হলেও তার হ্যানিবলের মতোই দূরদৃষ্টি ছিল। চোখের নিমেষে হোটেলের জানালা-দরজা সব বন্ধ হয়ে গেল। কতকগুলো চুনের খালি পিপের ভিতর পাথরখণ্ড ভরে রাখা হলো। জানালাগুলো থেকে লোহার রড ছাড়িয়ে নেওয়া হলো। মাদাম হুশেলুপ কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করতে লাগল, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।

বোসেত বাইরে ছুটে কুরফেরাককে অভ্যর্থনা জানাতে গেল। গ্রান্তেয়ার ঘরের ভিতর থেকেই বলতে লাগল, তোমাদের মাথায় ছাতা নেই কেন? সর্দি হবে যে!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাইরে পথের পাথর, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে মানুষের থেকে উঁচু একটা প্রাচীর খাড়া করা হলো। তার উপর ভারী একটা বাসকে পথের উপর রাখা হলো। ঘোড়ার গাডিগুলো থেকে ঘোড়াগুলো খুলে দিয়ে গাড়িগুলোকেও ব্যারিকেডের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হলো।

মাদাম হুশেলুপ হোটেলের দোতলার ঘরে বসে সব কিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল আর বিড় বিড করে আপন মনে কি বলে যাচ্ছিল। জলি এক সময় তার পিছন থেকে তার অনাবৃত ঘাড়ের উপর একটা চুম্বন করে গ্রান্তেয়ারকে বলল, মেয়েদের ঘাড়টাকে আমার সবচেয়ে সুন্দর বলে মনে হয়।

এদিকে গ্রান্তেয়ার তখন মাতেলোত্তে ঘরে ঢুকতেই তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে হেসে বলল, মাতেলোত্তে কুৎসিত। মেয়েটা ভাল। আমি জোর করে বলতে পারি ও লড়াই ভাল করবে। মেরে হুশেলুপের বয়স হলেও চেহারাটা শক্ত। সেও ভালই লড়াই করতে পারবে। ওটা দু'জনে লড়াই করে গোটা অঞ্চলটাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলতে পারবে। বন্ধুগণ, আমরা সরকারের পতন ঘটাতে চাই। আমার অঙ্কে বুদ্ধি নেই বলে বাবা আমাকে দেখতে পারতেন না। আমি শুধু বুঝি প্রেম আর স্বাধীনতা। আমি হচ্ছি ভাল মানুষ গ্রান্তেয়ার। আমার টাকা নেই, টাকা রোজগারের কথা ভাবিওনি। আমি যদি ধনী হতাম তাহলে পৃথিবীতে কেউ গরীব থাকত না। উদার প্রকৃতির লোকরা ধনী হলে পৃথিবীর দুঃখ ঘুচে যেত। যীশুর যদি রথচাইল্ডের মতো ধনসম্পদ থাকত তাহলে তিনি কত লোকের উপকার করতেন, পৃথিবীর কত ভাল করতেন। মাতেলোত্তে, তুমি আমাকে চুম্বন করো। তোমার মধ্যে প্রেমের আবেগ আছে, তুমি লাজুক প্রকৃতির, তোমার গালদুটো সিস্টারের চুম্বনের জন্য আর তোমার ঠোঁটদুটো প্রেমিকের চুম্বনের জন্য তৈরি হয়েছে।

কুরফেরাক বলল, তোমার মাতলামি বন্ধ করো।

গ্রান্তেয়ার বলল, আমি হচ্ছি উঁচু দরের এক ম্যাজিস্ট্রেট আর আনন্দ উৎসবের রাজা।

এঁজোলরাস ব্যারিকেডের উপর দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে গ্রান্তেয়ারের পানে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল। সে ছিল যেমন স্পার্টানদের মতো বীর তেমনি পিউরিটানদের মতো গোঁড়া নীতিবাদী। সে বলল, গ্রান্তেয়ার, তুমি অন্য কোথাও গিয়ে ঘুমিয়ে তোমার মদের নেশাটা কাটাও গে। এখানে আবেগের মত্ততা আছে, কিন্তু মাতলামির কোনও অবকাশ নেই। ব্যারিকেডের অপমান করো না।

এঁজোলরাসের এই তিরস্কারে ফল হলো। গ্রান্তেয়ার টেবিলের উপর কনুই রেখে গম্ভীরভাবে বসে রইল। তারপর বলল, এঁজোলরাস, তুমি জান, তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে।

যাও, চলে যাও।

আমাকে এখানেই ঘুমোতে দাও।

এঁজোলরাস বলল, না, অন্য কোথাও গিয়ে ঘুমোও।

তবু গ্রান্তেয়ার বলল, আমাকে এখানেই ঘুমোতে দাও, দরকার হলে আমি এখানেই মরব।

এঁজোলরাস ঘৃণাভরে গ্রান্তেয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল, গ্রান্তেয়ার, তুমি কোনও কিছুই পারবে না। কোনও যোগ্যতাই নেই তোমার। তুমি কোনও কিছু বিশ্বাস করতে, চিন্তা করতে, ইচ্ছা বা সংকল্প করতে, বাঁচতে বা মরতে কোনও কিছুই পারবে না।

গ্রান্তেয়ার গম্ভীরভাবে বলল, তুমি দেখবে, দেখে নেবে।

সে আরও কি অস্পষ্টভাবে বলল। তারপর তার মাথাটা টেবিলের উপর গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। এটা হচ্ছে মদের নেশার দ্বিতীয় স্তরের প্রতিক্রিয়া।

৪

বাহোরেল ব্যারিকেড দেখে আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, এবার এ রাস্তাটা লড়াইয়ের উপযুক্ত জায়গা হয়ে উঠেছে, চমৎকার দেখাচ্ছে।

কুরফেরাক হোটেলের অনেক আসবাব, জিনিসপত্র ও জানালার রড ছাড়িয়ে ব্যারিকেডে দেওয়ার পর মাদাম হুশেলুপকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। সে বলল, মেরে হুশেলুপ, একদিন তুমি বলেছিলে গিবেলোত্তে জানালা দিয়ে একটা কম্বল ফেলেছিল বলে কে নাকি অভিযোগ করেছিল।

হুশেলুপ বলল, কথাটা ঠিক, মঁসিয়ে কুরফেরাক, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। তোমরা কি এই টেবিলটাকেও নিয়ে গিয়ে ব্যারিকেডের উপর চাপিয়ে দেবে? সেদিন গিবেলোত্তে একটা কম্বল আর ফুলদানি জানালা দিয়ে ফেলে দেওয়ায় সরকার একশো ফ্রাঁ জরিমানা করেছে।

আমরা তা তোমাকে দিয়ে দেব মেরে হুশেলুপ।

কিন্তু সে টাকা কোনওদিন পাবে বলে বিশ্বাস হলো না হুশেলুপের। উল্টে তার হোটেলের সব জিনিসপত্র নষ্ট হতে চলেছে।

তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। শ্রমিকরা অস্ত্র হাতে দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছিল। এঁজোলরাস, কমবেফারে আর কুরফেরাক সব কিছু তদারক করছিল আর নির্দেশ দান করছিল। তখন আর একটা ব্যারিকেড তৈরি করা হচ্ছিল। রু্য মঁদেতুরে তৈরি দ্বিতীয় ব্যারিকেডটা করা হচ্ছিল শুধু খালি পিপে আর পাথর দিয়ে।

তিরিশজন শ্রমিক একটা বন্দুকের দোকান লুট করে তিরিশটা বন্দুক হাতে নিয়ে ব্যারিকেডের কাজে যোগ দিল। তারা সকলেই উদ্যমের সঙ্গে কাজ করতে লাগল। এক বিরাট জনতা ছিল তাদের সঙ্গে। বিচিত্র ধরনের মানুষ, বিভিন্ন বয়সের লোক—সকলেরই মনে এক উদ্দেশ্য, সকলের মুখেই এক কথা। কোনও এক উৎসব থেকে কতকগুলো মশাল হাতে করে নিয়ে এসেছিল তারা। তারা সবাই বলাবলি করছিল রাত দুটো-তিনটের সময় বিরাট এক জনতা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

তারা সবাই কেউ কারো নাম না জানলেও সবাইকে ভাই বলে মনে করছিল। এক জাতীয় বিপর্যয় তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল এক মহান ভ্রাতৃত্ববোধ।

হোটেলের রান্নাঘরে আগুন জ্বালানো হলো। তাতে যত সব কাঁটা-চামচ প্রভৃতি ধাতুর জিনিসগুলো গালিয়ে গুলি তৈরির কাজে লাগানো হলো। গ্লাসে করে সবাইকে মদ বিতরণ করা হচ্ছিল। মাদাম হুশেলুপ, মাতেলোত্তে আর গিবেলোত্তে উপরতলার একটা ঘরে ভয়ে বসেছিল হতবুদ্ধি হয়ে। তাদের মধ্যে গিবেলোত্তে আর কয়েকজনের সঙ্গে কম্বল ছিঁড়ছিল। আহত লোকদের ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করার জন্য ছেঁড়া কম্বলগুলোর দরকার। যে তিনজন বিপ্লবী গিবেলোত্তেকে সাহায্য করছিল এ কাজে তাদের মাথায় চুল আর মুখে দাড়ি ছিল। তাদের মুখের সেই কালো দাড়ি আর বলিষ্ঠ চেহারাগুলো দেখলে ভয় লাগছিল মেয়েদের।

র‍্যু দে বিলেত্তেতে কুরফেরাক, কমবেফারে আর এঁজোলরাস অচেনা যে একজন বয়স্ক বলিষ্ঠ চেহারার লোককে তাদের দলে যোগদান করতে দেখে সেই লোকটি বড় ব্যারিকেডটার কাজ দেখাশোনা করছিল। ছোট ব্যারিকেডটা দেখাশোনা করছিল গাভ্রোশে। কুরফেরাকের বাসায় মেরিয়াসের খোঁজ করতে এসেছিল যে যুবকটি সে কখন চলে গেছে কেউ দেখেনি। গাভ্রোশে হাসতে হাসতে এমন লাফালাফি করে মাতামাতি করে কাজ করছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল সবার মধ্যে উদ্যম জাগানোই ছিল তার কাজ। নিরাশ্রয় দারিদ্র্যের সঙ্গে একটা অকারণ আনন্দ তাকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল এ কাজে। এক প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর মতো তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের দ্বারা আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। তাকে সব জায়গায় দেখা যাচ্ছিল এবং তার কথা শোনা যাচ্ছিল। যারা অলস প্রকৃতির এবং যারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল গাভ্রোশে ঘুরে ঘুরে তাদের উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করে তুলছিল। তার কথায় ও কাজে মজা পাচ্ছিল সবাই। আবার চিন্তাশীল প্রকৃতির যারা তারা বিরক্ত বোধ করছিল।

মাঝে মাঝে সে হাঁকাহাঁকি করে বলছিল, আরও পাথর চাই, আরও পিপে চাই। একটা ঝুড়ি চাই। ব্যারিকেডটাকে আরও উঁচু করতে হবে, এটা ঠিক হয়নি। দরকার হলে বাড়িটাকে ভেঙে দাও। ঐ দেখ, কাঁচওয়ালা একটা দরজা রয়েছে।

একজন শ্রমিক বলল, কাঁচওয়ালা ঐ দরজাটা নিয়ে কি করবে বালক লুমো?

গাভ্রোশে বলল, তুমি নিজে লুমো। কাঁচওয়ালা দরজা ব্যারিকেডে দিলে তাতে আক্রমণ করা সহজ হবে ব্যারিকেডটাকে, কিন্তু তার মধ্যে ঢোকা সহজ হবে না। তাতে সৈনিকদের হাত কেটে যাবে।

ঘোড়া ছাড়া পিস্তলটার জন্য বিরক্তিবোধ করছিল গাভ্রোশে। সে তাই একটা বন্দুকের জন্য চিৎকার করছিল, সে বলছিল, কেউ আমাকে একটা বন্দুক দেবে না?

কমবেফারে বলল, তোমার মতো ছেলে বন্দুক নিয়ে কি করবে?

কেন নেব না? ১৮৩০ সালে আমার হাতে একটা বন্দুক ছিল। তা দিয়ে দশম চার্লসকে তাড়াই।

এঁজোলরাস বলল, যখন সব প্রাপ্তবয়স্কদের হাতে বন্দুক তুলে দিতে পারব তখন ছেলেদের হাতে বন্দুক দেওয়ার কথা ভাবব।

গাভ্রোশে গম্ভীরভাবে বলল, তুমি মরে গেলে তোমার বন্দুকটা নেব।

এঁজোলরাস বলল, এঁচোড়পাকা ছেলে।

সবুজ শিংওয়ালা যুবক।

রাস্তার ওপারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করতে থাকা এক যুবকের দিকে ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। গাভ্রোশে চিৎকার করে তাকে বলল, চলে এস আমাদের দলে। তোমার গরীব দেশের জন্য কিছু করবে না ?

তার কথা শুনে যুবকটি পালিয়ে গেল।

৫

খবরেখ কাগজগুলোতে পরদিন খবর বেরোল র‍্যু দ্য লা শাঁভ্রেরিতে বিপ্লবীরা যে ব্যারিকেড তৈরি করেছে তা দোতলার সমান উঁচু। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। বিপ্লবীদের তৈরি কোনও ব্যারিকেডই ছ'-সাত ফুটের বেশি উঁচু নয়। ব্যারিকেডগুলো এমনভাবে তৈরি করা হত যাতে সামনের দিক থেকে কেউ তার উপর উঠতে না পারে। সামনের দিকে থাকত পিপে পাথর কাঠ আর ভাঙা গাড়ির লোহালক্কড়। পিছনের দিকে পাথরগুলো এমনভাবে সিঁড়ির মতো সাজানো থাকত যাতে কেউ সহজে উঠতে পারে তার উপর। র‍্যু মঁদেতুরের ব্যারিকেডটা ছোট ছিল। ব্যারিকেডের পিছনে যে সব বড় বড় পাকা বাড়ি ছিল সেগুলোতে লোক থাকলেও তাদের দরজা-জানালা সব বন্ধ ছিল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই দুটো ব্যারিকেড তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। যে দু'-একজন পথচারী সাহস করে রাস্তা দিয়ে র‍্যু ডেনিসের দিকে যাচ্ছিল তারা সে ব্যারিকেড দেখে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়। ব্যারিকেড তৈরির কাজ হয়ে গেলে তার উপর একটা করে লাল পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হলো। কুরফেরাক হোটেল থেকে একটা টেবিল এনে এক জায়গায় রাখল। এঁজোলস একটা বাক্স এনে তার উপর রেখে সেটা খুলে বন্দুকধারী লোকদের মধ্যে কার্তুজ বিতরণ করতে লাগল। অনেকের কাছে বারুদের পাউডার ছিল।

জয়ঢাকের যে ধ্বনি সরকারী সেনাবাহিনীকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল সে ধ্বনি শহরের বিভিন্ন জায়গায় ধ্বনিত হচ্ছিল। ধ্বনিটা ক্রমশই এগিয়ে আসছিল। বিপ্লবী জনতা সেদিকে কোনও কান দিচ্ছিল না। তাদের ঘাঁটির বাইরে তিন জায়গায় তিনজন প্রহরী মোতায়েন করে এঁজোলরাস। এরপর সবাইকে বন্দুকে গুলি ভরার হুকুম দিল সে। তখন গোধূলিবেলা। ঘনায়মান সান্ধ্য ছায়ার এক অটল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। সংকল্পে কঠিন, ব্যাপক অস্ত্রসজ্জার সমারোহে অশুভ সেই নিস্তব্ধতার মাঝে এক ভয়ঙ্কর ও বিষাদাত্মক ঘটনার প্রতীক্ষিত পদধ্বনি যেন অশ্রুত অথচ নির্মমভাবে ধ্বনিত হচ্ছিল।

৬

এই প্রতীক্ষার সময় তারা কি করছিল ? তারা যা করছিল সেটাও একটা মনে রাখার মতো ইতিহাস।

পুরুষ কর্মীরা যখন কার্তুজ তৈরি করছিল, মেয়েরা তখন ব্যান্ডেজ তৈরি করছিল, রান্নাঘরে একটা বড় কড়াই-এর উপর বন্দুকের গুলির জন্য সীসে গলানো হচ্ছিল, ব্যারিকেডের বাইরে প্রহরীরা যখন পাহারা দিচ্ছিল সজাগ দৃষ্টিতে আর এঁজোলরাস একমনে সবকিছু পরিদর্শন করে দেখছিল তখন কুরফেরাক, কমবেফারে, জাঁ প্রুভেয়ার আর কয়েকজন মিলে ব্যারিকেডের কাছে এক জায়গায় গুলিভরা বন্দুক নিয়ে বসে প্রেমের কবিতা আবৃত্তি আর গান করছিল। কবিতাটি ছিল এই:

প্রিয়া, আজো কি তোমার মনে পড়ে সেই কথা ?
আশা ছিল যবে মনের মাঝারে, বুকভরা যৌবন
কোনও চিন্তা ছিল নাকো মনে, ছিল নাকো কোনও ব্যথা,
মনপ্রাণ জুড়ে ছিল বিরাজিত প্রেমের গুঞ্জরন।
শিহরে জাগাত স্পর্শ আমার তোমার ব্যাকুল মনে
কত ফুল আমি এনে যে দিতাম তোমার পদ্মহাতে,
কত পথিকদৃষ্টি হত যে ধাবিত তব যৌবনপানে
অলির মতো উড়তে চাইত তব পুষ্পিত আঁখিপাতে।
চুম্বন আমি করেছিনু যবে প্রথম প্রেমের দিনে
শান্ত মানুষ সয়ে যেত সবে সকল অত্যাচার
কোনও দ্বন্দ্ব কোনও বিক্ষোভ ছিল নাকো কোনওখানে
বিশ্বাস ছিল ঈশ্বরপবে সব জীবনের সার।

অতীত যৌবনজীবনের প্রেমময় স্মৃতির সৌরভ, আকাশে প্রথম সন্ধ্যাতারা ফুটে ওঠার শান্ত মুহূর্ত, পরিত্যক্ত পথের সমাধিসুলভ নির্জনতা, এক অশুভ ঘটনার নির্মম আগমনের ভযাবহ আভাস—সব মিলিয়ে ওদের কণ্ঠে আবৃত্ত কবিতাটিকে এক সকরুণ ভাবমাহাত্ম্য দান করেছিল। জাঁ প্রুভেয়ার সত্যিই একজন কবি ছিল।

ছোট ব্যারিকেডটায় একটা ছোট আলো আর বড় ব্যারিকেডটায় একটা মোমের মশাল জ্বালানো হয়েছিল। হোটেলের নিচের তলার ঘরে গাব্রোশে কার্তুজ তৈরি করছিল। সেখানে একটা বাতি জ্বলছিল। কিন্তু উপরতলার ঘরে কোনও আলো ছিল না। এছাড়া হোটেলের বাইরে পথেঘাটে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছিল। ব্যারিকেডের মাথার উপর উড়তে থাকা লাল পতাকার রংটা এক অশুভ লক্ষণে কালো দেখাচ্ছিল।

৭

রাত্রি বাড়তে লাগল। কিন্তু কোনও ঘটনা ঘটল না। মাঝে মাঝে এক একটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। সরকার পক্ষের এই দীর্ঘ নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তার একটা অর্থ ছিল। তার অর্থ ছিল এই যে সরকার তখন সৈন্য সমাবেশে ব্যস্ত ছিল। এদিকে বিপ্লবীদের পঞ্চাশজন নেতা ষাট হাজার লোকের হত্যাকাণ্ডের অপেক্ষায় স্তব্ধ হয়ে ছিল।

বড় রকমের প্রতিকূল ঘটনার সম্মুখীন হয়ে দৃঢ়চেতা লোকরাও যেমন অধৈর্যে

বিচলিত হয়ে পড়ে, এঁজোলরাসও তেমনি বিচলিত হয়ে পড়েছিল কিছুটা। সে গাভ্রোশের খোঁজ করছিল।

এদিকে গাভ্রোশে যখন নিচের তলার একটা ঘরের মধ্যে একা কার্তুজ তৈরি করছিল একটা বাতির আলোয় তখন যে লোকটি রু বিলেত্তেতে বিপ্লবীদের দলে এসে যোগ দেয়, যাকে তাদের কেউ চিনত না, সেই লোকটি একটি ঘরের মধ্যে এসে অন্ধকার একটা কোণে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। তাকে একটা বড বন্দুক দেওয়া হয়েছিল। সেটা তখন তার দুটো হাঁটুর মধ্যে ছিল। যে লোক আসার পর বিরাট কর্মতৎপরতা দেখায় সে এখন শান্তভাবে কি ভাবতে লাগল। গাভ্রোশে আগে তাকে ভাল করে দেখেনি। কাজে মেতে ছিল সব সময়। এখন সে নিঃশব্দে পা ফেলে নবাগত অচেনা লোকটির কাছে গিয়ে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ সে আশ্চর্য হয়ে আপন মনে বলতে লাগল, না না, এ কখনো হতে পারে না—এ অসম্ভব। সে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। তার সমস্ত চেতনা ও বুদ্ধি সজাগ হয়ে উঠল।

এমন সময় এঁজোলরাস এসে ঘরে ঢুকে গাভ্রোশেকে বলল, তুমি ছোট আছ, কেউ দেখতে পাবে না। তুমি বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে রাস্তায় গিয়ে কি অবস্থা দেখে এস।

গাভ্রোশে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, আমরা ছোট হলেও কাজে লাগতে পারি। ঠিক আছে, আমি তা করব। কিন্তু এবার বড়দের দিকে একবার তাকাও।

এই বলে ইশারা করে ঘরের কোণে বসে থাকা লোকটির দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে দেখাল।

এঁজোলরাস বলল, কি হয়েছে?

ও পুলিশের গুপ্তচর। পুলিশের লোক।

তুমি ঠিক জান?

একপক্ষ কালও হয়নি, একদিন পঁত রয়ালে আমি যখন পথ হাঁটছিলাম ও আমাকে তুলে নিয়ে যায়।

এঁজোলরাস সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একজন শ্রমিকের কানে কানে একটা কথা বলে। শ্রমিক তিন-চারজন লোককে ডেকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকে কোণে বসে থাকা লোকটিকে ঘিরে দাঁড়ায়। এঁজোলরাস তখন সরাসরি লোকটির কাছে গিয়ে বলে, কে তুমি?

এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকে উঠে লোকটি। সে উঠে দাঁড়িয়ে কড়াভাবে তাকাল এঁজোলরাসের মুখপানে। একটুখানি হাসি হেসে দৃঢ়ভাবে বলল, বুঝেছি...হ্যাঁ আমি।

তুমি একজন পুলিশের চর।

আমি হচ্ছি আইনের প্রতিনিধি।

তোমার নাম কি?

জেভার্ত।

জেভার্ত কিছু করার আগেই এঁজোলরাস তার দলের সেই চারজন লোককে ইশারা করতেই তারা বেঁধে ফেলল লোকটিকে এবং তার পকেটগুলো হাতড়ে দেখতে লাগল। তার পকেটে একটা কার্ড আর কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেল। কার্ডটার একদিকে পুলিশের বড় কর্তার সই করা একটা নির্দেশনামা ছিল। তাতে একদিকে লেখা ছিল, ইন্সপেক্টর জেভার্ত, বয়স ৫২, তার রাজনৈতিক কাজ শেষ হলে সেন নদীর দক্ষিণ তীরে দুর্বৃত্তরা গা ঢাকা দিয়ে থাকে, এই বিবরণের সত্যাসত্য নিজে পঁত দ্য অঞ্চলে গিয়ে দেখে আসবে।

জেভার্তকে বাঁধা হয়ে গেলে সে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইল অবিচলভাবে। সে একটা কথাও বলল না। তার হাত দুটো পিছন দিকে বাঁধা ছিল। গাভ্রোশে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল নীরবে। সব কিছু দেখার পর সে জেভার্তের এই শাস্তি সমর্থন করল। তারপর সে জেভার্তকে বলল, তাহলে সামান্য ইঁদুরও বিড়ালকে ধরতে পারে।

জেভার্তকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো। খবর পেয়ে কুরফেরাক, কমবেফারে, ফুলি, বোসেত, জলি প্রভৃতি অনেকে ঘরে এসে দেখতে লাগল। এঁজোলরাস সবাইকে বলল, ইনি হচ্ছেন পুলিশের চর।

এবার জেভার্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল সে, আমাদের ব্যারিকেডের দু' মিনিট আগে তোমাকে গুলি করে মারা হবে।

জেভার্ত শান্ত ও নির্বিকারভাবে বলল, এই মুহূর্তে মারা হবে না কেন?

আমাদের একটা গুলি নষ্ট হবে।

আমাকে মারার জন্য একটা ছুরি ব্যবহার করতে পার।

এঁজোলরাস বলল, শোন, আমরা হচ্ছি সমাজের বিচারক, খুনী নই।

এরপর সে গাভ্রোশেকে বলল, তুমি চলে যাও, যা বলেছি করে এস।

গাভ্রোশে যেতে গিয়ে দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর বন্দুকটা আমাকে দাও। আমি বাদককে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলাম, কিন্তু তার ঢাকটা আমি চাই।

এই বলে সামরিক কায়দায় এঁজোলরাসকে অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গাভ্রোশে। ব্যারিকেডের পাশের সরু পথটা দিয়ে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল।

৮

গাভ্রোশে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিলে পাঠকরা গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। বুঝতে পারবেন না, বিপ্লবের জন্মলগ্নে সমগ্র দেশ কিভাবে প্রসব-বেদনায় ছটফট করে, গণবিক্ষোভকালে এক চরম বিশৃঙ্খলার সঙ্গে কিভাবে এক মহান গণসংগ্রাম মিশে থাকে।

বিপ্লবী জনতার মধ্যে আর একজন শ্রমিকের ছেঁড়া পোশাকপরা অচেনা লোক যোগদান করেছিল। তার নাম ছিল লে কিউবাক। তার আচরণটা ছিল অসংযত মাতালের

মতো। সে জনতার কিছু লোককে মদ খাবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে সে ব্যারিকেডের পিছনে যে একটা পাঁচতলা বড় বাড়ি ছিল সেটা খুঁটিয়ে দেখছিল। সহসা সে চিৎকার করে বলে উঠল, বন্ধুগণ, ঐ বাড়িটা থেকে গুলি চালানো সহজ হবে। জানালা থেকে গুলি চালালে রাস্তার দিকে কোনও শত্রুসৈন্য কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না।

একজন বলল, কিন্তু বাড়িটার সব দরজা-জানালা বন্ধ।

আমরা দরজায় ধাক্কা দিতে পারি।

ওরা দরজা খুলবে না।

আমরা তখন দরজা ভেঙে ফেলব।

বাড়িটার দরজা-জানালা একেবারে বন্ধ ছিল। বাড়ির সদর দরজাটা বেশ মজবুত। লে কিউবাক নিজেই দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। কিন্তু কোনও সাড়া না পেয়ে পর পর তিনবার সে জোর ধাক্কা দিল। কিন্তু তবু ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিল না।

কিউবাক বলল, ভিতরে কে আছে?

কেউ সাড়া দিল না।

লে কিউবাক তখন তার বন্দুকের বাঁট দিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল। দরজাটা পুরনো আমলের ওক কাঠ আর লোহা দিয়ে তৈরি। বন্দুকের বাঁটের ধাক্কায় বাড়িটা কেঁপে উঠল, কিন্তু দরজাটা ভাঙল না। তখন তিনতলায় একটা জানালা খুলে গেল। তাতে আলো দেখা দিল। আর সেই সঙ্গে পাকা চুলওয়ালা একটা লোকের মাথা দেখা গেল। হয়ত সেই ছিল বাড়ির দারোয়ান।

লোকটি বলল, আপনারা কি চান?

লে কিউবাক বলল, দরজা খোল।

দরজা খোলার হুকুম নেই।

তাহলেও ঢুকতে হবে।

দরজা খোলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

লে কিউবাক তার বন্দুকটা তুলে লোকটার মাথা লক্ষ্য করল। তারপর বলল, তুমি দরজা খুলবে কি না?

না মঁসিয়ে।

তুমি খুলবে না?

না মঁসিয়ে।

লোকটি কিউবাকের বন্দুকটা দেখতে পায়নি। কারণ কিউবাক রাস্তার উপর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানটা অন্ধকার ছিল।

লোকটার কথা শেষ হতে না হতেই লে কিউবাকের বন্দুকটা গর্জে উঠল। সে বন্দুকের গুলিটা লোকটার চিবুকে ঢুকে তার ঘাড় ফুটো করে বেরিয়ে গেল। তার নিস্পন্দ মাথাটা জানালার উপর ঢলে পড়ল। তার হাতে ধরা বাতিটা পড়ে গিয়ে নিভে গেল।

লে কিউবাক বন্দুকটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, এবার হলো তো?

কিন্তু তার কথা শেষ হতেই হঠাৎ একটা হাত এসে তার ঘাড়টা শক্ত করে ধবে ফেলল। বারবার এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল, নতজানু হয়ে বস।

লে কিউবাক মুখ ঘুরিয়ে দেখল এঁজোলরাস পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। গুলির শব্দ পেয়ে বেরিয়ে আসে সে।

এঁজোলরাস আবার বলল, নতজানু হও।

কুড়ি বছরের এক যুবক এক রাজকীয় প্রভুত্বের সঙ্গে পেশীবহুল চেহারার এক শ্রমিককে নলখাগড়া গাছের মতো নত হতে বাধ্য করল। লে কিউবাক বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে দেখল, এক অতিমানবিক শক্তির কবলে পড়ে গেছে সে। লম্বা অবিন্যস্ত চুলওয়ালা এঁজোলরাসের মেয়েদের মতো মুখখানা প্রাচীন গ্রীকদেবতার মতো মনে হচ্ছিল। তার চোখ দুটো এক ন্যায়সঙ্গত পবিত্র ক্রোধের উত্তাপে জ্বলছিল। তার নাসারন্ধ্র দুটো কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন পৌরাণিক যুগের ন্যায়ের দেবতা।

যে সব লোক চারদিকে ছড়িয়ে ছিল তারা ঘটনাস্থলে এল। কিন্তু এঁজোলরাসের কাছে আসতে সাহস পেল না। তারা জানত এ ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবাদ করা চলবে না।

লে কিউবাক এবার নিজেকে মুক্ত করার কোনও চেষ্টা না করে নত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। এঁজোলরাস তার ঘাড়টা ছেড়ে তার হাতঘড়িটার দিকে তাকাল। তারপর বলল, এবার তৈরি হও, মাত্র এক মিনিট সময় আছে। প্রার্থনা করো অথবা চিন্তা করো।

লে কিউবাক বলল, 'ক্ষমা করো।' তারপর মুখটা নিচু করে অস্পষ্টভাবে বিড বিড় করে কি বলতে লাগল।

এঁজোলরাস তার হাতঘড়ি থেকে একবারও চোখ ফেরাল না। এক মিনিট হয়ে গেলে সে রিভলবারটা হাতে তুলে নিয়ে লে কিউবাকের মাথার চুলগুলো মুঠোর মধ্যে ধরল।

লে কিউবাক নতজানু হয়ে বসতেই সে তার কানের কাছে পিস্তলের মুখটা ধরে গুলি করল। যে সব বিপ্লবী সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য হঠকারিতার সঙ্গে ছুটে আসে তারা তাদের মুখ ঘুরিয়ে নিল।

লে কিউবাকের নিথর-নিস্পন্দ দেহটা রাস্তার উপরেই পড়ে গেল। এঁজোলরাস সেই মৃতদেহটার উপর একটা লাথি মেরে বলল, এটা সরিয়ে ফেল।

তিনজন লোক সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহটা নিয়ে ছোট ব্যারিকেডটার উপর ফেলে দিল। এঁজোলরাস গভীরভাবে কি ভাবতে লাগল। তার আপাতশান্ত চেহারাটার অন্তরালে আর কোনও ভয়াবহ এক মেঘচ্ছায়া ঘনিয়ে উঠছে কিনা তা কে বলতে পারে। চারদিক একেবারে চুপচাপ।

এঁজোলরাস সহসা বলতে লাগল, হে নাগরিকবৃন্দ, এই লোকটি যা করেছিল তা ঘৃণ্য আর আমি যা করেছি তা ভয়ঙ্কর। সে অকারণে হত্যা করেছে। কারণ

বিপ্লব হবে নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন। অন্য ক্ষেত্রের থেকে বিপ্লবের ক্ষেত্রে অকারণ নরহত্যা অনেক বেশি অপরাধ। বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রের পুরোহিতগণ আমাদের সব কাজ বিচার করে দেখবেন। আমাদের কোনও কাজ যেন নিন্দনীয় না হয়। তাই এই লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড দান করেছি আমি। তবু আমি যা করেছি তা ঘৃণ্য এবং অনিচ্ছার সঙ্গেই করেছি। আমি আমার এই কাজের জন্য আমার নিজের বিচার করেছি এবং সে বিচাবের রায় একটু পরেই তোমরা জানতে পারবে।

উপস্থিত জনতার মধ্যে ভয়ের একটা শিহরন খেলে গেল।

কমবেফারে বলল, আমরাও তোমার ভাগ্যের অংশীদার হব।

এঁজোলরাস বলল, তা হতে পার। কিন্তু আমাব আরও কিছু বলার আছে। যে নির্মম প্রয়োজনীয়তার খাতিরে আমি এই লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড দান করেছি, প্রাচীন কালের লোকেরা সেই প্রযোজনীযতাকেই নিযতি বলত। অগ্রগতির নিযম অনুসারে এই নিয়তিই সেই ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসায় পরিণত হবে। এই ভালবাসাই আমাদের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতে কোনও মানুষকে কেউ হত্যা করবে না। জগতে কোথাও কোনও অন্ধকার বা বিদ্যুৎ থাকবে না, কোনও বর্ববতা ও গৃহযুদ্ধেব কোনও অবকাশ থাকবে না। এমন দিন অবশ্যই আসবে যেদিন পৃথিবী জুড়ে বিবাজ করবে শান্তি, ঐক্য, আনন্দ আর প্রাণচঞ্চলতার আলো। সেদিনকে ত্বরান্বিত করার জন্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে আমাদের।

এবার চুপ করে গেল এঁজোলরাস। যেখানে একটু আগে লে কিউবাককে হত্যা করেছে সে, সেইখানে পাথরের প্রতিমূর্তির মতো নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে। সে যেন একাধারে পুরোহিত এবং ঘাতক। তাব ঠোঁট দুটো বন্ধ করে সে জনতাব দিকে স্থির কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কমবেফারে আর জঁ প্রুভেযার হাত ধরাধরি করে স্তব্ধ হযে ব্যারিকেডের পাশে একাধারে দাঁড়িযে রইল। এঁজোলরাসের কঠোর মুখখানার পানে একই সঙ্গে প্রশংসা আর করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকাল। তার মুখখানা যেমন স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল তেমনি পাহাড়ের মতোই কঠোর এবং অকম্পিত।

পরে পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় আসলে লে কিউবাক ছিল ক্লাকেসাস। সে ছিল একজন দাগী অপরাধী। সে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরই কুরফেরাক দেখে যে যুবকটি আজ সকালে তার বাসায় মেরিয়াসের খোঁজ করতে এসেছিল সে তাদের দলে যোগ দিতে এসেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

সেদিন সন্ধ্যার সময় লা শাঁভ্রেরির ব্যারিকেডের কাজে যোগদান করার জন্য মেরিয়াসকে যখন ডাকা হয় তখন তার মনে হয় নিয়তি যেন তাকে ডাকছে। আশাহত বেদনায় ও নিবিড় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে সে যে মৃত্যুকে কামনা করেছে সেই মৃত্যুবরণের এটাই হলো প্রকৃষ্ট উপায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার সব দুঃখের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল সে।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে হাঁটতে লাগল। তার হাতে আগেই জেভার্তের দেওয়া পিস্তলটা ছিল। সে র‍্যু প্লামেত থেকে বুলেভার্দ ও শ্যাম্প এলিসী হয়ে র‍্যু দ্য রিভোলিতে চলে গেল। সেখানে দেখল দোকানপাট খোলা আছে, অনেকে দোকানে জিনিস কিনছে।

কিন্তু দেলোর্মে দিয়ে র‍্যু সেন্ট অনোরেঙে এসে মেরিয়াস দেখল সেখানে দোকানপাট সব বন্ধ। কিন্তু সব বাড়িতে আলো জ্বলছিল। ফুটপাথ দিয়ে লোক যাতায়াত করছিল। বাড়িগুলোর আধখোলা দরজায় লোকেরা জটলা করছে। কিন্তু আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মেরিয়াস দেখল সব বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। পথে লোকজন নেই। কোনও বাড়িতে আলো জ্বলছে না। দেখল অন্ধকার রাস্তার মোড়ে মোড়ে একদল করে জনতার ভিড। কিন্তু কোনও মানুষের মুখে কথা নেই। মাঝে মাঝে চাপা গলায় তারা কি সব বলাবলি করছিল। জনতার মধ্যে অনেকের গায়ে কালো কোট আর গোল টুপি ছিল। অনেকের গায়ে ছিল শ্রমিকদের আলখাল্লা। পথের উপর এক জায়গায় দেখল বন্দুক গাদা করা রয়েছে। পথে আলো জ্বলছে, কিন্তু কোনও লোক চলাচল নেই। আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখল, জনতার ভিড আর নেই। তার কিছু দূরে ওদিকে সেনাবাহিনী [illegible] দখল করে আছে। মাঝখানে অন্ধকার। মেরিয়াস তবু থামল না। যে আহ্বান এসেছে তার কাছে সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে যেতেই হবে।

কিছুদূর গিয়ে সে একটা ব্যারিকেড দেখতে পেল। পাশ কাটিয়ে আরও কিছুটা গিয়ে সে র‍্যু ব্যালেতে এসে পৌঁছল। র‍্যু ব্যালে থেকে একটা রাস্তা সেন্ট ডেনিসের দিকে চলে গেছে।

লে হ্যালে অঞ্চলের বিভিন্ন গলিপথে তখন বিপ্লবীরা ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। যে অন্ধকার সব বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থানের অদৃশ্য অভিভাবক, যে অন্ধকারের আবরণে বিদ্রোহীরা তাদের সংখ্যাগত অপূর্ণতাটাকে ঢেকে রাখে, সে অন্ধকার যেন প্রহরীর মতো সর্বত্র ছড়িয়ে থেকে বিদ্রোহী ঘাঁটিগুলোকে রক্ষা করে চলছিল। কোনও বাড়ির জানালায় কোনও আলো দেখা যাচ্ছিল না। কোনও জানালায় আলো দেখা গেলেই গুলি করা হচ্ছিল। ভয়ে, শোকে, বিস্ময়ে বাড়ির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল বাসিন্দারা। অন্ধকারের মাঝে মাঝে ব্যারিকেডগুলো থেকে একটা করে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছিল। সেন্ট মেরি ও তুর সেন্ট জ্যাকে দুটো ব্যারিকেড ছিল। অবরুদ্ধ এলাকার বাড়িগুলো অন্ধকারে সব স্তব্ধ হয়ে ছিল। সরকার ও বিদ্রোহী জনতা—উভয়পক্ষই অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে জিততে চায়।

প্রকৃতিও যেন বিপ্লবীদের সপক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করছিল। আকাশে কোনও তারা ছিল না। ঘন কালো মেঘ মৃতবৎ রাস্তাগুলোকে সবাধিগহ্বরের ছাদের মতো ব্যাপ্ত করে ছিল। মাঝে মাঝে নীরব নির্জন রাস্তাগুলো থেকে বিক্ষুব্ধ জনতার যে ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল সেই ধ্বনির মধ্যে একই সঙ্গে হিংস্র জন্তুর গর্জন আর দেবতার কণ্ঠস্বর যেন মিশ্রিত হয়ে ছিল। সে ধ্বনি একই সঙ্গে দুর্বলচিত্তদের মনে ভয় আর আত্মসচেতন ব্যক্তিদের মনে এক ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী হিসাবে কাজ করছিল।

২

লে হ্যালেতে পৌঁছে মেরিয়াস দেখল অন্যান্য রাস্তার থেকে এ অঞ্চলটা আরও শান্ত, আরও স্তব্ধ। সেখান থেকে অদূরে লা শাঁভ্রেরির মাথায় একটা জ্বলন্ত মশালের আলো দেখে সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে। মার্শে-অ-পয়রী আর র‍্যু দে প্রেশিউর পার হয়ে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে বিদ্রোহী প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে অবশেষে মঁনেতুরের গলিপথে ছোট ব্যারিকেডটার কাছে এসে পড়ল মেরিয়াস। দেখল গলিপথের ওধারে হোটেলটার কাছে আর একটা বড় ব্যারিকেড তৈরি হয়েছে। ব্যারিকেডের মাথা থেকে মোমবাতির মশালের ক্ষীণ আলোর একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছিল গলিপথে। একটা বাড়ির আড়ালে এক জায়গায় একটা পাথরের উপর বসে বসে ভাবতে লাগল সে। তার থেকে মাত্র কুড়ি গজ দূরে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি। সেখানে বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা করছিল।

মেরিয়াস প্রথমে তার বাবা কর্নেল পঁতমার্সির কথা ভাবতে লাগল। তার বাবা যে কর্নেল পঁতমার্সি নেপোলিয়নের অধীনে ফ্রান্সের সীমান্ত ও গৌরব রক্ষার জন্য এশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে যায় একদিন, সে একদিন জেনোয়া, আলেকজেন্দ্রিয়া, মাদ্রিদ, ভিয়েনা, মিলান, টুরিন, মস্কো প্রভৃতি ইউরোপের কত যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করে বেড়ায়, যে সারাজীবন ধরে সামরিক আদেশ পালন করে আর নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলে অকালে চুল পাকিয়ে ফেলে, সেই কর্নেল পঁতমার্সির রক্ত তার দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। আজ এবার তার পালা। আজ তাকে তার বাবার মতোই এক অটল সংকল্পে দৃঢ়চিত্ত হয়ে কামানের গোলার সামনে বুক পেতে দিতে হবে নির্ভীকভাবে।

এ ছাড়া আর কি-ই বা করবে সে? বেঁচে থেকে কি লাভ? কসেত্তে ছাড়া জীবনে বেঁচে থাকা অসম্ভব তার পক্ষে। একথা সে জেনেও তাকে না বলে, তার ঠিকানা জানা সত্ত্বেও তাকে কিছু না জানিয়ে কোথায় চলে গেছে। তার মানে তার মৃত্যুতে তার সমর্থন আছে।

তাছাড়া সে যখন এতদূর এসে পড়েছে তখন আর ফিরবে না সে। যে সব বন্ধুর কাছে সে এতদিন বাস করেছে, যারা এই বিপদের দিনে তাকে চায় তাদের ফেলে চলে যাওয়া মোটেই শোভা পায় না তার পক্ষে। বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ঝেড়ে ফেলে দেশের ডাকে সাড়া না দিয়ে কাপুরুষের মতো সে যদি পিছু হটে যায় তাহলে তার বাবার আত্মা বোধ হয় তার সেই পবিত্র তরবারিটা দিয়েই আঘাত করবে তাকে। দেশসেবার এক মহান কর্তব্য হিসাবে আজ যদি এ বিপ্লবে যোগ দেয় তাহলে কি সেটা কর্নেল পঁতমার্সির পুত্র হিসাবে অপমানজনক কাজ হবে তার পক্ষে?

মাথা নিচু করে সোজা হয়ে বসে ভেবে যেতে লাগল মেরিয়াস, অনেকে হয়ত বলতে পারে গৃহযুদ্ধ।

গৃহযুদ্ধ মানে কি? প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের কি কোনও বিশেষণ থাকতে পারে, যেমন বৈদেশিক যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি? যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায়টাই হলো বড় কথা। যে যুদ্ধ

মানুষের অধিকারকে পদদলিত করে, অগ্রগতিতে বাধা দেয়, যুক্তি, সভ্যতা, ন্যায় ও সত্যকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে সেই যুদ্ধই অন্যায় যুদ্ধ। অপরপক্ষে যে যুদ্ধ ন্যায় ও সত্যকে রক্ষা করে, মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেই যুদ্ধই ন্যায়যুদ্ধ। যতদিন পর্যন্ত সারা বিশ্বে মানবজাতির মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন এ যুদ্ধ চলবেই। ঐশ্বরিক অধিকারবোধে প্রমত্ত রাজতন্ত্র অত্যাচারী হয়ে উঠলে তা বৈদেশিক শত্রুর মতো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কোনও বৈদেশিক আক্রমণ যেমন দেশের ভৌগোলিক সীমানাকে লঙ্ঘন করে তার জাতীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে তেমনি স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী রাজা দেশের নাগরিকদের নৈতিক সীমানা লঙ্ঘন করে তার ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে। তাই বৈদেশিক আক্রমণকারীদের মতো স্বৈরাচারী রাজাকেও লড়াই করে বিতাড়িত করতে হয়। এমন এক একটা সময় আসে যখন কোনও প্রতিবাদ, কোনও যুক্তি বা চিন্তাশক্তি অত্যাচারের-অবিচারের প্রবল স্রোতের সামনে দাঁড়াতে পারে না, খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। তখন চাই বলপ্রয়োগ আর সংগ্রাম। যে জনগণ রাজার ঐশ্বরিক অধিকারের প্রমত্তা ও সীজারীয় গৌরবের কুটিল ঐশ্বর্যের বিশাল ছায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হযে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িযে সেদিকে অসহায়ভাবে তাকিযে থাকে, দেশের কিছু বীর যোদ্ধা ও সংগ্রামী নেতা সেই ছায়ার করালগ্রাস থেকে উদ্ধার করে সামাজিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন দেশে, জনগণের হাতে তুলে দেন তাদের হারানো স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বের অধিকার। 'অত্যাচারী নিপাত যাক।' কিন্তু অত্যাচাবী কে ? লুই ফিলিপ কি অত্যাচারী ? ইতিহাস তো রাজা লুই ফিলিপ আর রাজা ষোড়শ লুই দু'জনকেই ভাল রাজা বলে আখ্যাত করেছে। কিন্তু ইতিহাস যাই বলুক, মানুষ হিসাবে যতই ভাল বা নিরহঙ্কারী হোক লুই ফিলিপ, জনগণকে প্রতিশ্রুত অধিকার থেকে বঞ্চিত কবে তিনি দিয়েছেন এক অমার্জনীয় স্বৈরাচারিতার পরিচয়। সত্য কখনো অংশীভূত বা খণ্ডিত হতে পারে না। কোনও রাজা বা মানুষের একদিক ভাল আর একদিক খারাপ হলে তাকে কখনো ভাল বলা যায় না। যে ভাল সব দিকেই ভাল হবে। যে রাজশক্তি মানবজাতির ঐক্য, বিশ্বশান্তি ও সর্বত্র আইনের অনুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায হযে ওঠে, আজকের বিপ্লব সেই রাজশক্তির উচ্ছেদ চায়। অস্টারলিৎসের যুদ্ধ জয় করা গৌরবজনক কাজ ঠিক, কিন্তু বাস্তিল দুর্গ দখল করা আরও বড় কাজ।

হতাশার শেষ প্রান্তে এসে যুক্তিপারম্পর্যের এক অবিচ্ছিন্ন সুতো দিয়ে এমনি করে এক চিন্তার জাল রচনা করে যেতে লাগল মেরিয়াস।

এইসব কিছু ভাবতে ভাবতে ব্যারিকেডের ওদিকটায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে। বিদ্রোহী নেতাদের চাপা কথাবার্তা থেকে তার মনে হলো তাদের নীরবতা অস্বাভাবিক, এ নীরবতা এক ভয়ঙ্কর প্রত্যাশার শেষ স্তরের সূচক ছাড়া আর কিছুই নয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

তবু কিছু ঘটল না। সেন্ট মেরি গীর্জার ঘড়িতে রাত্রি দশটা বাজল। এঁজোলরাস

আর কমবেফারে বড় ব্যারিকেডটার পাশের সরু পথটার উপর বসে পড়ল। ওরা কোনও কথা বলছিল না, শুধু কান খাড়া করে দূরাগত এক সমবেত পদধ্বনি শোনার প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে ছিল।

হঠাৎ অদূরে একটি ছেলের আনন্দোচ্ছল কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা। এঁজোলরাস বলল, গাভ্রোশে।

গাভ্রোশে মনের আনন্দে গান করতে করতে ওদের এদিকেই আসছিল।

এঁজোলরাস ও কমবেফারে করমর্দন করল।

গাভ্রোশে ব্যারিকেডের উপর থেকে এদিকে লাফ দিয়ে পড়ল। এসেই সে বলল, ওরা আসছে। আমার বন্দুকটা কোথায় ? সেই বড় বন্দুকটা আমার চাই।

সে জেভার্তের বন্দুকটার কথা বলছিল।

বিপ্লবী জনতার প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হলো। মোট তেতাল্লিশজন বিপ্লবী বন্দুক হাতে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। ফুলি দু'জন বন্দুকধারী লোক নিয়ে হোটেলের দোতলার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে ব্যারিকেডের কাছে এঁজোলরাস ও তার বন্ধুরা বাকি লোকদের নেতৃত্ব দান করতে লাগল। তারাও সকলে নতজানু হয়ে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। গাভ্রোশেও একটা বন্দুক হাতে তাদের সঙ্গে প্রথম সারিতে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ওরা একসঙ্গে অসংখ্য সৈনিকের পদধ্বনি শুনতে পেল। কিন্তু তখনো কোনও লোককে দেখতে পাচ্ছিল না ওরা। অগ্রসরমান সেনাবাহিনীর মুখে কোনও কথা ছিল না। শুধু পথের পাথরের উপর তাদের ভারী বুটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। জ্বলন্ত মশালের আলোর আভায় তাদের চকচকে ব্যারেল আর বেয়নেটগুলোকে দেখা যাচ্ছিল অস্পষ্টভাবে।

সহসা সব পদধ্বনি থেমে গেল। এক ভয়ঙ্কর নীরবতায় জমাট বেঁধে উঠল যেন সব কিছু। এমন সময় ওদিককার অন্ধকারের ভিতর থেকে এক অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কে ওখানে ?

এদিক থেকে ওরা বুঝতে পারল ওদিকে সৈনিকরা বন্দুকে গুলি ভরছে।

এঁজোলরাস এদিকে গম্ভীর ও উঁচু গলায় বলল, ফরাসী বিপ্লব।

ওদিকে সেই কণ্ঠস্বর তখন গুলি করার হুকুম দিল জোর গলায়।

সহসা এক তীব্র আলোর ছটায় সামনেকার বাড়িগুলোর দেওয়াল চুল্লীর মুখের মতো ঝলসে উঠল। একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের গুলি সামনের বাড়িগুলোর গায়ে লেগে প্রতিহত হয়ে বিপ্লবীদের উপর পড়ায় তাদের কিছু লোক আহত হলো। ব্যারিকেডের উপর থেকে লাল পতাকাটা পড়ে গেল ওদের পায়ের কাছে। ওরা বুঝতে পারল এক বিশাল সৈন্যদল তাদের আক্রমণ করতে এসেছে।

কুরফেরাক বলল, বন্ধুগণ, এখন তোমরা গুলি খরচ করবে না। ওদের আবার গুলি করতে দাও।

এঁজোলরাস বলল, এখন এই পতাকাটা আবার ওখানে তুলে দিতে হবে।

ওরা শুনতে পেল ওধারে সৈনিকরা আবার গুলি ভরছে তাদের বন্দুকে। এঁজোলরাস আবার বলল. কার সাহস আছে? ব্যারিকেডের উপর পতাকাটা কে আবার তুলে দিয়ে আসবে?

তার নিজেরই ভয় হচ্ছিল তার নিজের এই আদেশ শুনে। শেষে সে আবার বলল, এমন কোনও স্বেচ্ছাসেবী নেই?

২

কোরিনথে ব্যারিকেড তৈরি হওয়ার সময় থেকে পীয়ের মেবুফের দিকে তারা কেউ নজর দেয়নি। মেবুফ তাদের দল ত্যাগ না করলেও তার কথা একরকম ভুলে গিয়েছিল তারা। মেবুফ কিন্তু সব সময় তাদের সঙ্গেই ছিল। তারা যখন সবাই ব্যারিকেড তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল মেবুফ তখন হোটেলের নিচের তলায় এক জায়গায় একা একা বসে কি ভাবছিল। কুরফেরাক ও আরও কয়েকজন তাকে আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে বলে। কিন্তু মেবুফ কোনও উত্তর দেয়নি সে কথার। শুধু তার ঠোঁট দুটো একটু কেঁপেছে। সে শুধু শূন্য নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে তাদের দিকে। তার চারদিকে কি ঘটছে না ঘটছে সেদিকে কোনও খেয়াল ছিল না তার।

সেনাবাহিনী ব্যারিকেড লক্ষ্য করে গুলি করার পরে যখন দ্বিতীয় দফায় আরও কিছু বিপ্লবী লড়াইয়ে যোগদান করে, তখন মেবুফের ঘরে মাত্র তিনজন লোক অবশিষ্ট ছিল। তারা হলো বন্দী জেভার্ত, মুক্ত তরবারি হাতে একজন বিপ্লবী প্রহরী আর মেবুফ। গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সে। তারপর এঁজোলরাস যখন পতাকা উত্তোলনের জন্য আহ্বান করে সকলকে তখন তার কাছে এগিয়ে যায় মেবুফ।

বিপ্লবী জনতার মধ্যে একজন বলে উঠল, উনি জনগণের প্রতিনিধি, রাজার মৃত্যুর জন্য ভোট দিয়েছিলেন।

সে কথায় কান না দিয়ে মেবুফ এঁজোলরাসের হাত থেকে পতাকাটা নিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ব্যারিকেডের উপর উঠে গেল। অশীতিপর বয়সের চাপে তার মাথাটা নড়তে থাকলেও তার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল দৃঢ়। বিপ্লবীরা নিচে থেকে শ্রদ্ধায় তাদের টুপি খুলে ফেলল মাথা থেকে। মাথায় সাদা চুল, শীর্ণ ম্লান মুখ, বিস্ময়াবিষ্ট ও বিস্ফারিত মুখগহ্বর, কুঞ্চিত ললাট, লোলচর্ম অশক্ত হাতে উত্তোলিত লাল পতাকা—সব মিলিয়ে আশ্চর্য মহিমা দান করেছিল মঁসিয়ে মেবুফের চেহারাটাকে। মশালের কম্পিত আলোয় অনেক বড় দেখাচ্ছিল তার চেহারাটা। মনে হচ্ছিল ১৭৯৩ সালের বিপ্লবের প্রেতাত্মা সন্ত্রাসের পতাকা হাতে সমাধিগহ্বর থেকে উঠে এসেছে। মৃত্যুর থেকে মহীয়ান ও বলবান এক শক্তিরূপে সে রাস্তার ওপাশের অদৃশ্য বারোশো সৈনিকের গুলির সামনে বুক পেতে ব্যারিকেডের উপর দাঁড়িয়ে উপহাস করছে স্বয়ং মৃত্যুকে। অন্ধকার

ব্যারিকেডটা মঁসিয়ে মেবুফের উপস্থিতিতে অলৌকিক এক অতিপ্রাকৃত মর্যাদা ও মহত্ত্ব লাভ করল।

মঁসিয়ে মেবুফ এবার পতাকাটা দোলাতে দোলাতে চিৎকার করে বলে উঠল, বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক। প্রজাতন্ত্রী দীর্ঘজীবি হোক। সৌভ্রাতৃত্ব সাম্য- মৃত্যু।

রাস্তার ওপার থেকে পুলিশ কমিশনারের গলা শোনা গেল, চলে যাও।

মঁসিয়ে মেবুফ উন্মাদের মতো পতাকাটা নাড়তে নাড়তে আবার বলল, প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক!

এদিকে ওদিকের সেনাবাহিনী আবার এক ঝাঁক গুলি করল। গুলিগুলো সব ব্যারিকেডে এসে লাগল। মঁসিয়ে মেবুফের হাত থেকে পতাকাটা পড়ে গেল। তার পা দুটো কাঁপছিল। চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। তার দেহে গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

নিজেদের নিরাপত্তার কথা সব ভুলে গিয়ে বিপ্লবীরা এগিয়ে গিয়ে মেবুফের মৃতদেহটা দেখতে লাগল। শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয় মিশে ছি‍ তাদের দৃষ্টিতে।

এঁজোলরাস বলল, সত্যিই এক ীরপুরুষ যিনি রাজার বিরুদ্ধে একদিন নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করেন।

কুরফেরাক বলল, আমি ভদ্রলোককে চিনতাম। এঁর নাম ছিল মেবুফ। সরল শান্ত প্রকৃতির ও সাদাসিধে মানুষ।

এঁজোলরাস বলল, সরল ও সাদাসিধে হলেও তাঁর অন্তরটা ছিল ব্রুটাসের মতো শক্ত।

এরপর এঁজোলরাস বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, বন্ধুগণ, আজ বৃদ্ধ মঁসিয়ে মেবুফ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন তা আমাদের মতো যুবকদের অনুসরণ করে যেতে হবে। যেখানে আমরা ইতস্তত করছিলাম, ভয়ে পিছিয়ে এসেছিলাম, তিনি সেখানে এগিয়ে যান অকুণ্ঠ ও নির্ভীকভাবে। এইভাবে বয়স ও বার্ধক্যের ভারে অবনত এক বৃদ্ধ ভয়ে কম্পিত যুবকদের শিক্ষা দিয়ে গেল। আজ তিনি দেশের সামনে এক মহান আদর্শ স্থাপন করে গেলেন। সুদীর্ঘ এক জীবন যাপনের পর উনি বরণ করলেন এক গৌরবময় মৃত্যু। এখন এই মৃতদেহটিকে পিতৃজ্ঞানে রক্ষা করা উচিত আমাদের। এই মৃতদেহের উপস্থিতি অজেয় করে তুলবে আমাদের এই ঘাঁটিটাকে।

জনতার মধ্য থেকে উত্থিত এক কলগুঞ্জন সমর্থন করল এঁজোলরাসের কথাগুলোকে।

এঁজোলরাস নত হয়ে মেবুফের মৃতদেহ একটু তুলে তার কপালটা চুম্বন করল। তারপর তার কোটটা খুলে দিল যাতে তার ক্ষতস্থান সবাই দেখতে পায়। এঁজোলরাস শেষে বলল, এটাই হবে আমাদের পতাকা।

৩

মাদাম হুশেলুপের একটা কালো শাল ছিল। সেই শালটা এনে মেবুফের মৃতদেহটাকে

ঢেকে দেওয়া হলো। ছ'টা বন্দুক দিয়ে একটা স্ট্রেচার বানিয়ে তার উপর মৃতদেহটা চাপিয়ে ওরা হোটেলের একতলায় একটা ঘরের টেবিলের উপর শ্রদ্ধার সঙ্গে নামিয়ে রাখল।

জেভার্তের পাশ দিয়ে যখন মৃতদেহটাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন এঁজোলরাস তাকে বলল, তোমারও সময় হয়ে এসেছে।

শোকাহত সবাই যেন নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়েছিল।

এমন সময় গাভ্রোশের জোর চিৎকারে তাদের হুঁশ হয়।

গাভ্রোশে একা যখন পাহারা দিচ্ছিল তখন সে দেখে একদল সৈনিক চুপিসারে নিঃশব্দ পদক্ষেপে ব্যারিকেডের দিকে এগিয়ে আসছে। তাই সে চিৎকার করে ওঠে।

নগররক্ষী সেনাবাহিনীর লোকেরা ব্যারিকেডের ফাঁক দিয়ে ঝাঁক বেঁধে এগিয়ে আসছিল। সে এক ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থায় বন্যার জল যেন বাঁধের কানায় কানায় উঠে পড়েছিল। আর এক মুহূর্ত দেরি হলেই বাঁধ ছাপিয়ে উঠত যেন সে জল। বিপ্লবীদের ঘাঁটি দখল করে নিত সেনাবাহিনী।

বাহোরেল এগিয়ে গিয়ে কাছ থেকে একটা সৈনিককে গুলি করে মারল। তখন আর একটা সৈনিক তার বেয়নেটের খোঁচা দিয়ে বাহোরেলকে মারল। আর এক সৈনিকের আঘাতে কুরফেরাক পড়ে গিয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগল। সেনাবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মাথার একটা লোক বেয়নেট দিয়ে গাভ্রোশেকে আক্রমণ করতে গাভ্রোশে জেভার্তের সেই বড় বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরল। কিন্তু ঘোড়া টিপলেও গুলি বার হলো না, জেভার্ত গুলি ভরেনি তার বন্দুকে। সৈনিকটা তখন হাসতে হাসতে বেয়নেট দিয়ে গাভ্রোশের দেহে খোঁচা মারতে গেল। কিন্তু বন্দুকটা তার হাত থেকে পড়ে যেতেই তার থেকে একটা গুলি বার হয়ে সৈনিকটার কপালটাকে বিদ্ধ করল এবং তার থেকে আর একটা গুলি বার হয়ে যে সৈনিকটা কুরফেরাককে আক্রমণ করেছিল তার বুকে লাগায় সে লুটিয়ে পড়ল।

এমন সময় মেরিয়াস এসে বিপ্লবীদের ঘাটিতে ঢুকল।

৪

র‍্যু মঁদেতুরের মোড়ের মাথা থেকে মেরিয়াস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সব দেখছিল। তখনো পর্যন্ত সে দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। তখনো তার বুকের ভিতরটা কাঁপছিল। কিন্তু এক অনিশ্চয় শূন্যতার রহস্যময় আঘাত সহ্য করতে পারছিল না সে। তার উপর মঁসিয়ে মেবুফ ও বাহোরেলের মৃত্যু, গাভ্রোশের উপর আক্রমণ, কুরফেরাকের সাহায্য প্রার্থনা,—পর পর ঘটে যাওয়া এই সব মর্মান্তিক ঘটনাগুলির আঘাতে তার মনের সব কুণ্ঠা নিঃশেষে দূরীভূত হয়ে গেল। দু'হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে এসে একটা পিস্তলের গুলি দিয়ে গাভ্রোশের আক্রমণকারীকে আর একটা পিস্তলের গুলি দিয়ে কুরফেরাকের আক্রমণকারীকে হত্যা করে তাদের উদ্ধার করল মেরিয়াস। পিস্তল দুটো খালি হয়ে পড়ল এবং আর গুলি নেই দেখে সে দুটো ফেলে দিল সে।

গোলমালের মধ্যে একদল সৈনিক ব্যারিকেডের উপর উঠে একটা দিক দখল করে নিল। তবে ব্যারিকেড থেকে নেমে বিপ্লবীদের অন্ধকার ঘাঁটিটাতে ঢুকতে পারছিল না তাবা। মেরিয়াস যখন নিরস্ত্র অবস্থায় হোটেলের নিচের তলায় বারুদের খোঁজে ঢুকতে যাচ্ছিল তখন একটা সৈনিক তাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলে ধরে। কিন্তু একজন বিপ্লবী শ্রমিক তীরবেগে তার কাছে গিয়ে সৈনিকের বন্দুকধরা হাতটা বন্দুকের বাঁটটা দিযে মেরে সরিযে দিযে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়। শ্রমিকটির হাতে গুলি লাগায় সে পড়ে যায। কিন্তু মেরিয়াস বেঁচে যায়।

মেরিযাস কিন্তু এ সবের কিছুই দেখেনি বা বুঝতে পারেনি। কারণ হোটেলে ঢোকার মুখটা ছিল অন্ধকারে ঢাকা এবং তার মনটা ছিল অন্য চিন্তায মগ্ন। এক চরম বিপদের মুখে বিহ্বলতার একটা কুয়াশা ঘিরে থাকায সে পিছন ফিরে তাকায়নি।

বিপ্লবীরা কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেও ভীত বা সন্ত্রস্ত হযে পড়েনি একেবারে। এঁজোলরাস তাদের বলল, মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করো। এলোমেলোভাবে গুলি ছুঁড়ো না।

বিপ্লবীদের বেশির ভাগ যোদ্ধা হোটেলের উপরতলায গিয়ে জানালার ধারে শত্রুসৈন্যদের দিকে লক্ষ্য রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। তবে এঁজোলরাস, কুরফেরাক, কমবেফারে আর জাঁ প্রুভেয়ার হোটেলের বাইরে বাড়িটার গা ঘেঁযে সেনাদলের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ছিল।

সেনাদলের এক অফিসার হঠাৎ একটা তরবারি তুলে ধরে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে বলল, অস্ত্র ত্যাগ করো।

এঁজোলরাস বলল, গুলি করো।

আবার দু'পক্ষে গুলি বিনিময় হলো। ধোঁয়ায় ভরে গেল চাঁরদিক। এদিকে মেরিয়াস হোটেলের নিচের তলায় ঘর থেকে বারুদের একটা থলে নিয়ে ধোঁয়ায গা ঢাকা দিয়ে ব্যারিকেডের গায়ে পাথরের একটা সিঁড়িতে যেখানে একটা মশাল জ্বলছিল সেখানে গিয়ে বারুদের থলেটা রাখল। তারপর সৈন্যদের লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলল, ব্যারিকেড থেকে সরে যাও, তা না হলে ব্যারিকেড উড়িয়ে দেব বারুদের আগুনে।

সৈন্যরা বলল, তুমিও তার সঙ্গে উড়ে যাবে।

মেরিয়াস নত হয়ে মশালটা নামিয়ে বারুদে আগুন লাগাতে গেল মনে হলো। তা দেখে সব সৈনিকরা ব্যারিকেড ছেড়ে রাস্তার ওপারে চলে গেল।

৫

মেরিয়াসকে এতক্ষণ তার বন্ধুদের কেউ দেখতে পায়নি। মেরিয়াসও কাউকে লক্ষ্য করেনি। তাকে এবার দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুরা ছুটে এসে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। কুরফেরাক গলাটা জড়িয়ে ধরল, তুমি তাহলে সত্যিই এসেছ?

কমবেফারে বলল, স্বাগত হে বন্ধু!

ল্যাগলে ওরফে বোসেত বলল, যথাসময়েই এসেছ।

কুরফেরাক বলল, তুমি সে সময় না এলে আমি মারা যেতাম।

গাভ্রোশে বলল, আমিও মারা যেতাম।

মেরিয়াস বলল, আমাদের নেতা কোথায় ?

এঁজোলরাস বলল, এখন তুমিই আমাদের নেতা।

আজ সারাদিন ধরে মেরিয়াসের মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলেছে। এখন তার মনে হলো একটা প্রবল ঘূর্ণিঝড় কোথা থেকে এসে তাকে তার জীবন থেকে বহু দূরে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। প্রজাতন্ত্রের জন্য মঁসিয়ে মেবুফের মৃত্যুবরণ এবং হঠাৎ তার বিপ্লবী নেতায় পরিণত হওয়ার ব্যাপার দুটো এমনভাবে ঘটে গেল যে সেসব সত্য কি না তা সে বুঝতেই পারছিল না। তার নিজের জীবনেরই ঘটনাগুলোকে এক দুর্বোধ্য নাটকের অলীক ঘটনাজাল বলে মনে হচ্ছিল।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মনটা বিব্রত ছিল বলে এতক্ষণ ঘরের এককোণে বাঁধা থাকা জেভার্তকে দেখতে পায়নি মেরিয়াস। জেভার্ত এতক্ষণ নির্বিকারভাবে উভয়পক্ষের যুদ্ধ এক শহীদসুলভ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দেখছিল।

আক্রমণকারী সৈনিকরা আর এগোয়নি। রাস্তার ওপার থেকে তাদের কথাবার্তার শব্দ কানে আসছিল। হয়ত নতুন আদেশনামার জন্য অপেক্ষা করছিল অথবা আরও সেনাদলের আসার অপেক্ষায় ছিল। তারা হয়ত বুঝেছিল বিপ্লবীদের এ ঘাঁটি দখল করা খুব একটা সহজ কাজ নয়।

মঁসিয়ে মেবুফের মৃতদেহটা নিচের তলার ঘরের একটা টেবিলের উপর শায়িত ছিল। হোটেলের বিছানা থেকে সব তোষক এনে ঘরের মেঝেয় পাতা হয়ে ছিল। তার উপর আহতদের শুইয়ে রাখা হয়েছে এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা আহতদের চিকিৎসা করছিল।

হঠাৎ দেখা গেল জাঁ প্রুভেয়ার নেই। আহত বা মৃতদের মাঝেও তাকে পাওয়া গেল না। তখন কমবেফারে এঁজোলরাসকে বলল, ওরা বোধ হয় প্রুভেয়ারকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। ঠিক আছে, ওবা আমাদেব বন্ধুকে নিয়ে গেছে, ওদের তেমনি এজেন্ট জেভার্তও আমাদের হাতে আছে। তুমি কি জেভার্তকে একান্তই মৃত্যুদণ্ড দিতে চাও ?

এঁজোলরাস বলল, তার বিনিময়ে জাঁ প্রুভেয়ারকে পেলে তা দিতে চাই না।

কমবেফারে বলল, তাহলে একটা সাদা রুমাল উড়িয়ে ওদের এই বন্দী বিনিময়ের প্রস্তাবটা দেব ?

এঁজোলরাস তাকে চুপ করতে বলল ইশারায়। সহসা গুলি বিনিময়ের শব্দ শোনা গেল। এক বীরত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, ফ্রান্স দীর্ঘজীবি হোক! প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ দীর্ঘজীবি হোক!

সে কণ্ঠস্বর জাঁ প্রুভেয়ারের।

কমবেফারে বলল, ওরা প্রুভেয়ারকে গুলি করেছে।

এঁজোলরাস জেভার্তের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, তোমার বন্ধুরা তোমাকেও হত্যা করল।

৬

যুদ্ধের এক আশ্চর্য রীতি এই যে আক্রমণকারীরা শুধু ব্যারিকেডের সামনেটাই আক্রমণ করে। তার পিছনে গিয়ে শত্রুপক্ষের ঘাঁটিটাকে আক্রমণ করতে চায় না। কারণ তারা গলিপথে ঢুকতে চায় না এবং তার উপর তারা গুপ্ত প্রতি আক্রমণের ভয় করে।

র‍্যু মঁদে'তুরের গলির মোড়ে যে ছোট ব্যারিকেডটা তৈরি করা হয়ে ছিল সেটারও দিকে কেউ এতক্ষণ নজর দেয়নি। সেখানে শুধু একটা ছোট মশাল জ্বলছিল। বিপ্লবী যোদ্ধাদের দৃষ্টি ছিল বড় ব্যারিকেডটার উপর।

মেরিয়াস এবার সেই ছোট ব্যারিকেডটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। তার পর সে যখন সেই ব্যারিকেড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অন্ধকার থেকে কে তার নাম ধরে ডাকল, মঁসিয়ে মেরিয়াস!

কণ্ঠস্বরটা চিনতে ভুল হলো না মেরিয়াসের। সে বেশ বুঝতে পারল মাত্র দু' তিন ঘণ্টা আগে এই কণ্ঠস্বরই র‍্যু প্লামেতের গেট থেকে তাকে ডেকেছিল। তবে এখন সে কণ্ঠস্বরটাকে অনেক ক্ষীণ মনে হলো।

কাউকে দেখতে না পেয়ে চলে যাচ্ছিল মেরিয়াস। তখন আবার সেই কণ্ঠস্বর তাকে ডাকল।

এবার মেরিয়াস একটা বাতির অস্পষ্ট আলোয় দেখল রক্তমাখা আলখাল্লা আর পায়জামা পরা কমবয়সী কে একটা লোক খালি পায়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে তার দিকে। সাদা ফ্যাকাশে মুখটা মেরিয়াসের দিকে তুলে সে লোকটি বলল, আমাকে চিনতে পারছেন?

না।

আমি এপোনিনে।

মেরিয়াস ঝুঁকে ভাল করে দেখল, পুরুষের পোশাকপরা এপোনিনেই তার সঙ্গে কথা বলছে।

এখানে কিজন্য এসেছ তুমি? কি করছ?

আমি এখন মরতে চলেছি।

এপোনিনের কথাগুলো এমনভাবে ধ্বনিত হলো তার কণ্ঠে যা শুনে ভয় পেয়ে গেল মেরিয়াস। সে ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগল, তুমি আহত, আমি তোমাকে হোটেলে বয়ে নিয়ে যাব। ওরা তোমার ক্ষততে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেবে।

মেরিয়াস হাত বাড়িয়ে এপোনিনেকে তুলে ধরতে যেতে সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

মেরিয়াস ব্যস্ত হয়ে বলল, তোমার লাগছে?

একটু লেগেছে।

এই বলে এপোনিনে তার একটা হাত তুলে দেখাল হাতের চাটুতে একটা ফুটো।

মেরিয়াস বলল, কি হয়েছে?

একটা গুলি ঢুকে বেরিয়ে গেছে। তোমার মনে নেই একটা সৈনিক বন্দুক উঁচিয়ে তোমাকে গুলি করতে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, আর একটা হাত তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়।

সে হাত আমার।

মেরিয়াস কেঁপে উঠল। বলল, কি পাগলামি! আমি তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দেব, ওরা হাতটা বেঁধে দেবে। শুধু হাতটা ক্ষত হলে মানুষ মরে না।

এপোনিনে বলল, শুধু হাতে নয়, গুলিটা আমার পিঠেও লাগে। পিঠ ভেদ করে বেরিয়ে এসে হাতে লাগে। আমাকে সরিয়ে নিয়ে গিযে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং তুমি আমার খুব কাছে এসে বস।

মেরিয়াস তাই করল। এপোনিনে তার মাথাটা মেরিযাসের হাঁটুর উপর রাখল। তারপর তার মুখের দিকে না তাকিযেই বলতে লাগল, আঃ, কত সুখ কত শান্তি! আর আমি কোনও যন্ত্রণা অনুভব করছি না। এবার সে মেরিযাসের মুখপানে তাকিয়ে বলতে লাগল, তুমি জান তুমি যখন রু প্লামেতের বাগানে গিয়েছিলে তখন আমি রেগে গিযেছিলাম। অথচ আমিই তোমাকে পথ দেখিযে নিযে যাই সেখানে। কিন্তু আমার জানা উচিত ছিল তোমাব মতো এক যুবক—

কথাটা বলতে বলতে কি যেন ভাবতে লাগল সে আব একফালি ক্ষীণ সকরুণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তারপর আবার সে বলতে লাগল, তুমি আমাকে কুৎসিত ভাব। কিন্তু তোমারও মৃত্যুর সময ঘনিযে এসেছে। কারণ এখান থেকে জীবন্ত কেউ বেরিয়ে যেতে পারবে না। আর আমিই তোমাকে এখানে ডেকে নিযে আসি। কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখ। কিন্তু আমিও এখানে চলে আসি, কারণ তোমার আগেই আমি মরতে চেযেছিলাম। সেদিনটার কথা তোমার মনে আছে, যেদিন আমি প্রথম তোমার ঘরে ঢুকে তোমার আযনায আমি মুখ দেখি। আমি যখন লার্কের মাঠে তোমার সঙ্গে দেখা করি সেই সমযটার কথা মনে পড়ে? দিনটা ছিল কত উজ্জ্বল আর উষ্ণ, একটুও ঠাণ্ডা ছিল না। মাঠে কত পাখি গান করছিল। পথে তুমি আমায় পাঁচ ফ্রাঁ দিতে এসেছিলে। কিন্তু আমি নিইনি, বলেছিলাম, তোমার টাকা আমি চাই না। তুমি কি সেটা কুড়িয়ে নিযেছিলে? আজ আমি কত সুখী! আমরা সবাই মরতে বসেছি।

আচ্ছন্নের মতো প্রলাপ বকছিল এপোনিনে। তার ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে তার বুকের ক্ষতটা দেখা যাচ্ছিল। সে হাত দিয়ে বুকের ক্ষতটা চেপে ধরল। তার থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছিল। সেই ক্ষতটার পানে তাকাতেই মেরিয়াসের বড় ব্যথা লাগল।

এপোনিনে বলল, আবার সেই যন্ত্রণাটা উঠছে। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

এমন সময় গাভ্রোশের গলা শোনা গেল। সে বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতে গান করছিল।

সে গান শুনে এপোনিনে বলল, ও আমার ভাই। ও যেন আমাকে না দেখে, ও তাহলে আমায বকবে।

মেরিযাস আশ্চর্য হযে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ভাই! কি বলছ?

সহসা তাব বাবা থেনার্দিযেবদের প্রতি যে কর্তব্যভার তাব উপর দিয়ে যায় সে কথা মনে পড়ে গেল মেবিযাসের। সে বলল, যে ছেলেটা গান করছে তার কথা বলছ?

হ্যাঁ, ও আমার ভাই।

মেরিয়াস উঠে ডাকতে যাচ্ছিল তাকে। কিন্তু এপোনিনে বলল, না, যেও না, আর বেশিক্ষণ আমি বেঁচে থাকব না।

একটু খাড়া হযে বসাব চেষ্টা করল এপোনিনে। তার হেঁচকি উঠছিল। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। সে মুখ তুলে বলল, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারব না। আমার পকেটে একটা চিঠি আছে। চিঠিটা আমাকে ডাকে ফেলে দিতে বলেছিল, কিন্তু আমি দিতে চাইনি। কিন্তু এখন সেটা না দিলে পরে যখন স্বর্গে আমাদের দেখা হবে তখন আমার উপর রেগে যাবে তুমি। আমরা তো সবাই এক জাযগাতেই যাচ্ছি। আবার আমাদের দেখা হবে।

অনেক কষ্ট করে চিঠিটা মেরিয়াসের হাতে তুলে দিল এপোনিনে। বলল, এই নাও।

মেরিয়াস চিঠিটা নিতেই স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল এপোনিনে। তার পর বলল, এখন তোমাকে একটা কথা দিতে হবে।

মেরিয়াস বলল, দিচ্ছি। বল কি করতে হবে?

এপোনিনে বলল, আমার মৃত্যুর পর আমার কপালে একটা চুম্বন করবে। আমি তা বুঝতে পারব।

এই বলে সে তার মাথাটা আবার মেরিয়াসের কোলের উপব রাখল। সে চোখ দুটো বন্ধ করল। মেরিয়াসের মনে হলো তার আত্মা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এপোনিনে আবাব চোখ খুলল। মেরিয়াস দেখল সে চোখে মৃত্যুর এক গভীর ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে। এপোনিনে ক্ষীণ কণ্ঠে টেনে টেনে বলল, তুমি হয়ত জান, আমি তোমাকে কিছুটা ভালবেসেছিলাম।

এপোনিনের কণ্ঠস্বরটা এমন মধুর শোনাল যে তার মনে হলো সে কণ্ঠ এ জগতের নয়, অন্য এক জগৎ থেকে ভেসে এসেছে। এপোনিনে একটুখানি হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল তার মুখে কিন্তু তার আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

৭

মেরিয়াস তার প্রতিশ্রুতি রাখল। হিমশীতল ঘাসে ভিজে যাওয়া এপোনিনের ফ্যাকাশে

কপালটার উপর চুম্বন করল মেরিয়াস। তারপর তার দেহটা মাটির উপর নামিয়ে রাখল।

এপোনিনের চোখ দুটো চিরতরে মুদ্রিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা খোলার জন্য দারুণ কৌতূহল জাগল মেরিয়াসের। তবু সে ভাবল এপোনিনের মৃতদেহটার পাশে বসে এ চিঠি পড়া উচিত হবে না। তাই হোটেলের নিচের তলার একটা ঘরে গিয়ে বাতির আলোয় চিঠিটা খুলল সে। খামে ভরা চিঠিটা পড়ার জন্য খামটা খুলে ফেলল। তার উপর মেয়েমানুষের হাতে তার ঠিকানা লেখা ছিল। চিঠিটাতে অল্প দু-চারটে কথা লেখা ছিল।

প্রিয়তম,

আমার বাবা আজ রাতেই এ বাসা ছেড়ে চলে যাবার জন্য জেদ ধরেছেন। আমরা এখন র‍্যু দ্য লা হোমি আর্মেতে চলে যাচ্ছি। এক সপ্তা পরেই ইংলন্ড রওনা হচ্ছি।—কসেত্তে। ৪ঠা জুন।

আসলে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল তা হলো এই, সব কিছুর জন্য এপোনিনেই দায়ী। ৩রা জুন তারিখে সন্ধ্যাবেলায় এপোনিনের মনে দুটো কাজের পরিকল্পনা ছিল। একটা কাজ হলো তার বাবা ও তার সহকর্মীরা র‍্যু প্লামেতের বাড়ি লুট করার মতলব করেছিল তা ব্যর্থ করা আর একটা কাজ ছিল মেরিয়াসকে কসেত্তের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এপোনিনে তাই একজন যুবকের সঙ্গে পোশাক বিনিময় করে নিজে পুরুষের পোশাক পরে আর যুবকটি মেয়েদের পোশাক পরে মজা পায়। শ্যাম্প দ্য মার্সে ভলজাঁ যখন একা একা বসে ভাবছিল তখন সে ভলজাঁকে একটা বেনামী চিঠি দিয়ে র‍্যু প্লামেতের বাড়ি ছাড়ার জন্য সতর্ক করে দেয়। ভলজাঁ সেদিন তাই বাড়ি ফিরেই কসেত্তেকে বলে, তুসাঁকে নিয়ে তারা সেই দিনই র‍্যু দ্য লা হোমির বাড়িতে চলে যাবে এবং পরের সপ্তাহে তারা ইংলন্ড চলে যাবে।

কসেত্তে তখন তাড়াতাড়ি মেরিয়াসকে একটা চিঠিতে জানিয়ে ভাবতে থাকে কিভাবে চিঠিটা সে ডাকে পাঠাবে। কোথায় ফেলবে। এমন সময় সে বাগানের গেটের সামনে এক যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখে তখন তাকে ডেকে চিঠিটা তাকে ফেলতে দেয়। চিঠিটা কসেত্তে ডাকে না ফেলে নিজের কাছে দু'দিন রেখে দেয়। ৫ই জুন সে মেরিয়াসের খোঁজে কুরফেরাকের বাসায় যায়। মেরিয়াসকে একবার চোখে দেখাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তারপর কুরফেরাক যখন বলে সে তার বন্ধুদের সঙ্গে ব্যারিকেড তৈরি করতে গেছে তখন এপোনিনে লুকিয়ে গিয়ে দেখে আসে কোথায় তারা ব্যারিকেড তৈরি করছে। পরে সে র‍্যু প্লামেতে চলে যায়, কারণ সে জানত সন্ধের সময় সেদিন মেরিয়াস সেখানে কসেত্তের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সে তখন অন্ধকারে মেরিয়াসকে ব্যারিকেডে তার বন্ধুদের কাছে যাবার জন্য বলে। পরে সে নিজে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে চলে যায়। এইভাবে অতৃপ্ত প্রেমজনিত এক প্রবল ঈর্ষার বশে নিজেকে এবং তার প্রেমিককে একই সঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় সে। ভাবে যে প্রেমিককে সে লাভ করতে পারবে না জীবনে তাকে যেন আর কেউ লাভ করতে না পারে।

কসেত্তের চিঠিটা পড়ার পর মেরিয়াস সেটাকে চুম্বন করল। কসেত্তে এখনো তাকে ভালবাসে, ভাবল, তাকে তাহলে বাঁচতে হবে কসেত্তের জন্য। কিন্তু সে এখন ইংলন্ড চলে যাচ্ছে এবং তার মাতামহ এ বিয়েতে মত দেননি। আবার হতাশার গভীরে ডুবে গেল সে। সে ভাবল মৃত্যু ছাড়া আর কোনও গতি নেই। কিন্তু তার আগে দুটো কাজ তাকে করতে হবে। সে তার পকেট থেকে নোটবইটা বার করে তার থেকে একটা পাতা নিয়ে কসেত্তেকে একটা চিঠি লিখল। তাতে লিখল, আমাদের বিয়ে সম্ভব নয়। আমার মাতামহের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি এ বিয়েতে মত দেননি। আমার টাকা নেই। আমি তোমার সঙ্গে দেখা কবতে তোমাদেব বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন তোমরা ছিলে না। তোমার কাছে যে শপথ আমি করেছিলাম সে শপ.থর কথা হয়ত তোমার মনে আছে। আমি মরব। আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি যখন এ চিঠি পড়বে তখন আমার আত্মা তোমার কাছেই থাকবে এবং তোমার পানে তাকিয়ে হাসবে।

খাম না থাকায় চিঠিটা লেখার পর সেটা ভাঁজ কবে তাব উপব কসেত্তের নতুন ঠিকানাটা লিখল। তারপব আর একটা কাগজে লিখল, আমাব নাম মেবিযাস পঁতমার্সি। আমার মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহ আমাব মাতামহ মঁসিযে গিলেনর্মাদেব কাছে ব্যু দে ফিলে দু কালভেরিতে নিয়ে যাওযা হবে।

এরপর সে গাভ্রোশেকে ডাকল। বলল, একটা কাজ তুমি আমাব করবে?

গাভ্রোশে বলল, তুমি যা বলবে। তুমি না হলে তো আমি মবেই যেতাম।

এই চিঠিটা দেখছ। এই চিঠিটা এই ঠিকানায দিয়ে আসতে হবে। এখনি যেতে হবে তোমায়।

গাভ্রোশে মাথা চুলকোতে লাগল। মেরিযাস বলল, চিঠিটা দিতে হবে ম্যাদময়জেল কসেত্তেকে, তার বাবাব নাম মঁসিযে ফশেলেভেন্ত। তাদেব বাড়ি ৭ নম্বব ব্যু দ্য লা হোমি আর্মেতে।

গাভ্রোশে বলল, তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমি চলে গেলে ওবা ব্যারিকেড দখল করে নেবে।

কিন্তু রাত্রিতে ওরা আর আক্রমণ করবে না। সকাল না হওযা পর্যন্ত ব্যারিকেডেব পতনের কোনও সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু চিঠিটা তো আমি সকালে দিয়ে আসতে পারি।

অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া সকালে রাস্তায় রাস্তায পাহারা বেড়ে যাবে। তখন যেতেই পারবে না।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে কুণ্ঠিত অবস্থায আবার কিছুটা ভাবল গাভ্রোশে। তারপর সে চিঠিটা নিল।

চিঠিটা নিয়ে গাভ্রোশে ভাবল, জায়গাটা দূরে নয়, এখন দুপুর রাত। এখনো সময় আছে। চিঠিটা একসময় নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েই চলে আসবে। কিন্তু কথাটা বললে মেরিয়াস আপত্তি করবে ভেবে তাকে বলল না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১

জাঁ ভলজাঁর অন্তরে তখন যে দারুণ বিপ্লব চলছিল তার তুলনায় প্যারিস শহরের গণবিপ্লব কিছু নয। তার ভবিষ্যৎ এবং তার বিবেক দুটোই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এক গভীর সন্ত্রাসের রাজত্ব চলতে থাকে তার অন্তরে। তার মনে হচ্ছিল হতাশার এক অতলান্তিক খাদের উপরে আলো আর অন্ধকারের দুটো দেবদূত এক ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে মত্ত হয়ে উঠেছে।

৫ই জুন রাত্রিতে যখন ভলজাঁ র্য প্লামেতের বাড়ি ছেড়ে হঠাৎ চলে আসে তখন কসেত্তে প্রতিবাদ করেছিল। জীবনে হয়ত এই প্রথম তার বাবার কাজে প্রতিবাদ জানায় সে। কিন্তু সে প্রতিবাদ টেকেনি। কারণ বেনামী চিঠিটা পেয়ে ভলজাঁ ভয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে ভাবতে থাকে হয়ত বা পুলিশ তার ঠিকানা জেনে ফেলেছে এবং তাকে ধরার চেষ্টা করছে। ভলজাঁ তাই পোশাক-আশাক ও দু'-একটি জিনিসপত্র ছাড়া বেশি কিছু আনেনি, কারণ তাহলে মালবাহকের দরকার হত এবং মালবাহকরা তাদের ঠিকানা বদলের সাক্ষী হত। তাই একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে তাড়াহুড়ো করে ... বেবিলনের পথ দিয়ে চলে আসে এখানে।

লা হোমি আর্মে জায়গাটার পরিবেশটা ছিল অনেক শান্ত এবং নির্জন। আসল শহর থেকে দূরে একটা সরু গলির দু'ধারে পুরনো আমলের কতকগুলো বাড়ি; কারো সঙ্গে কারো কোনও সম্পর্ক নেই। ওদের বাসাটা ছিল তিনতলায়। মোট তিনখানা ঘর। সবচেয়ে ছোট ঘরটার গায়ে ছিল রান্নাঘর। ছোট ঘরটাতে তুসাঁ থাকবে। পাশাপাশি দুটো ঘরের একটাতে থাকবে ভলজাঁ আর একটাতে কসেত্তে। বাড়িটার পিছন দিকে একটা ফাঁকা উঠোন ছিল।

সেদিন রাত্রিতে ওরা বাসায় পৌঁছনোর পর নীরবে শুতে চলে গেল। এ বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি আশ্বস্ত ও শান্ত হয়ে ... ভলজাঁর মনটা। তার ভয়ের অনেকটা কেটে গেল। রাত্রিতে ভাল ঘুম হলো তার।

পরদিন সকালে কসেত্তে তার ঘরে একাই প্রাতরাশ খেল। তুসাঁকে বলল, তার মাথা ধরেছে। ভলজাঁ যখন তার ঘরে প্রাতরাশ খাচ্ছিল তখন তুসাঁ একসময় বলল, শহরে দারুণ গোলমাল হচ্ছে। কিন্তু সে কথায় বিশেষ কান দিল না ভলজাঁ। তার মনটা আগের থেকে অনেক শান্ত আর স্বচ্ছ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে কসেত্তের কথাটা ভাবতে লাগল। তার মাথা ধরার ব্যাপারটা এমন কিছু ভাববার কথা নয়। ওটা দু'-এক দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। সে ভাবছিল তার ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে খুব সহজ বলে মনে হলো না। কসেত্তে সারাজীবন তার কাছেই থাকবে, তাদের এই সুখের দ্বৈত জীবনে বিচ্ছেদের কোনও অবকাশ নেই। তাছাড়া সে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলো যে সে র্য প্লামেতের বাড়ি ছেড়ে বিনা বাধায় এখানে আসতে পেরেছে, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এটাই যথেষ্ট তার কাছে। তবে ফ্রান্সের অবস্থা এখন ভাল নয়, তাই সে লন্ডনে গিয়ে মাসকতক কাটিয়ে

আসবে। কসেত্তে তার কাছে থাকলে পৃথিবীর যে কোনও দেশে যে কোনও দূরতম জায়গায় সে স্বচ্ছন্দে যেতে বা থাকতে পারবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল ভলজাঁ। সহসা আয়নায় কসেত্তের নোটবইটা প্রতিফলিত দেখল সে। বইটার একটা পাতা খোলা ছিল। তাতে কসেত্তের নিজের হাতে মেরিয়াসকে লেখা সেই ছোট্ট চিঠির প্রতিলিপিটা ছিল। তাতে লেখা আছে, প্রিয়তম, বাবা জেদ ধরেছেন আজই আমাদের এ বাসা ছেড়ে চলে যেতে হবে। আজই রাত্রে আমরা যাচ্ছি র‍্যু দ্য লা হোমি আর্মের বাড়িতে। এক সপ্তার মধ্যেই আমরা ইংলন্ড চলে যাব।—কসেত্তে। ৪ঠা জুন।

স্তম্ভিত হয়ে গেল ভলজাঁ।

কসেত্তে এখানে আসার পর নোটবইটা আয়নার কাছ থেকে তুলে রাখতে ভুলে গেছে। প্রথমে বিশ্বাস করতে মন চায়নি ভলজাঁর। পরে যখন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলো সে তখন কাঁপতে কাঁপতে পাশে আর্মচেয়ারটায় বসে পড়ল। বুকের ভিতরটা জ্বলতে লাগল তার। সে ভাবল আর কোনও উপায় নেই, জগতের সব আলো, সব আশা চিরদিনের মতো মিলিয়ে গেল নিশ্চিহ্নভাবে। তার বিক্ষুব্ধ আত্মা সেই হতাশার নিবিড় নিরভ্র অন্ধকারে নিস্ফল আক্রোশে গর্জন করতে লাগল। সে বেশ বুঝতে পারল কসেত্তে নিশ্চয় তার প্রেমিককে লিখেছে।

জীবনে এর আগে বহু দুঃখ ভোগ করেছে ভলজাঁ। এমন কোনও চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যের প্রান্তসীমা নেই যেখানে বাধ্য হয়ে পা দিতে হয়নি তাকে, সমাজের এমন কোনও অবজ্ঞা, অপমান ও লাঞ্ছনা নেই যা তাকে সহ্য করতে হয়নি। একে একে জীবনের সব স্বাধীনতা, সব সুখ, সব সম্মান বিসর্জন দিয়ে এক নীরব আত্মসমর্পণের সঙ্গে সব কিছু মেনে নিয়ে ধীরে ধীরে এক চরম আত্মনিগ্রহ ও ত্যাগের পথে ঠেলে দিয়েছে নিজেকে শহীদের মতো। দুর্ভাগ্য ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে তার বিবেক তার অন্তরাত্মাটাকে এক সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করে অপরাজেয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন কেউ তাকে দেখলে বুঝতে পারবে তার সেই অন্তরাত্মার দুর্গটা ধসে যেতে বসেছে। তার অপ্রতিহত বিবেক এক প্রতিহত বেদনার বিহ্বলতায় ভেঙে পড়েছে।

ভলজাঁ এখন বুঝল দুর্ভাগ্যের শত পীড়নের যন্ত্রণার থেকে আজকের এ পীড়নের যন্ত্রণা সবচেয়ে ভয়াবহ, সবচেয়ে মারাত্মক। জীবনের সবচেয়ে প্রিয়বস্তুকে হারানো সবচেয়ে বড় ক্ষতি। একথা ঠিক যে তার মতো এক নিঃস্ব বয়োপ্রবীণ মানুষ কসেত্তেকে কন্যার মতো ভালবাসে। কিন্তু তার আপন অন্তরের সীমাহীন শূন্যতা তার সেই পিতৃসুলভ ভালবাসাকে এক সর্বাত্মক সর্বগ্রাসী ভালবাসায় পরিণত করে। কসেত্তে একাধারে তার কাছে হয়ে ওঠে তার কন্যা, মাতা এবং ভগিনী। যেহেতু তার স্ত্রী বা কোনও প্রণয়িনী ছিল না, তার মনের অগোচরেই এক অন্ধ বিশুদ্ধতায় সব ভালবাসার আবেগ মিলে মিশে এক হয়ে যায়।

কসেত্তের সঙ্গে ভলজার সম্পর্কটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব বয়সের অনতিক্রম্য ব্যবধানে আত্মিক মিলনও সম্ভব ছিল না। তবু ভাগ্যের অমোঘ বিধান

এই দুটি জীবনকে পরস্পরের কাছে এনে দেয়। কসেত্তের প্রতি পিতৃসুলভ ভালবাসা সত্ত্বেও একাধারে সে তার কাছে হয়ে ওঠে তার পিতা, মাতা, তার ভ্রাতা এবং স্বামী। সে হয়ে ওঠে এমনই এক আশ্চর্য পিতা যার মধ্যে ছিল মায়ের স্নেহ এবং বিশ্বস্ত প্রেমিকের সর্বাত্মক ভালবাসা। কসেত্তে এইভাবে হয়ে ওঠে তার জীবনের একমাত্র আলো, একমাত্র আশ্রয়স্থল, তার পরিবার, দেশ, সমাজ এবং স্বর্গ।

ভলজাঁ তাই যখন দেখল তার সেই জীবনের একমাত্র আলো তার চোখের সামনে নিবে যাচ্ছে চিরতরে, তার একমাত্র আশ্রয়স্থল অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, স্বর্গীয় সুখ উবে যাচ্ছে, কসেত্তে জল বা কুয়াশার মতো তার আঙুলের ভিতর দিয়ে গলে যাচ্ছে, যখন দেখল অন্য একজন কসেত্তের অন্তরকে অধিকার করে ফেলেছে, তখন সে ভাবল কসেত্তে নিশ্চয় তাকে ছেড়ে চলে যাবে, তখন তার বেদনা দুঃসহ হয়ে উঠল। তখন তার অন্তরের সুগভীর শূন্যতা থেকে এক বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝা এসে তার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমিটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে ওলোটপালোট করে দিল তার জীবনের সব কিছু। মানুষ সহ্যের সব সীমা যখন পার হয়ে যায় তখন তার জীবনের প্রতিষ্ঠিত অন্তর্বৃত্তি, বুদ্ধি ও বোধি সব অন্তর্হিত হয়ে যায় একে একে।

ভলজার অন্তরের মধ্যে যখন এই ধরনের এক তুমুল আলোড়ন চলছিল তখন বাইরেটা কিন্তু অদ্ভুতভাবে শান্ত ছিল। কিন্তু মানুষের যে প্রশান্তি প্রাণহীন প্রতিমূর্তির এক হিমশীতল স্তব্ধতায় জমাট বেঁধে থাকে সে প্রশান্তি সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর। ভলজাঁ তার ভাগ্যবিড়ম্বিত এই অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে দেখল এক বিরাট খাড়াই পাহাড়ের নিচে এক গভীর অতলান্তিক খাদের অন্ধকার। কিন্তু এখন আর সে সেই পাহাড়ের উপর দাঁড়িযে নেই, কে যেন তার অজানিতে অকস্মাৎ সে খাদের অন্ধকার গভীরে ফেলে দিয়েছে তাকে। তার মনে হলো বাইরে পৃথিবীর আকাশে তখন সূর্য কিরণ দিতে থাকলেও তার জীবনের আলো নিবে গেছে।

মেরিয়াসের নামটা সে না জানলেও মুহূর্তমধ্যে লুক্সেমবুর্গ বাগানে দেখা তার চেহারাটা ভেসে উঠল তার মনের পটে। নারীলোলুপ সেই যুবক, অলস নির্বোধ এক অপদার্থ প্রেমিক এবং প্রতারক যে পিতার সাক্ষাতে তার কন্যার পানে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকাতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

যখন সে বুঝল এই যুবকটাই তাদের সব বিপত্তির মূলে তখন তার যে বিষাক্ত ঘৃণাটা তার সারা অন্তরজোড়া অখণ্ড প্রেমবোধের তাড়নায় অবলুপ্ত হয়ে যায় সেই ঘৃণার অবাঞ্ছিত প্রেতটা আবার যেন উঠে আসে কোথা থেকে।

দুঃখ থেকেই আসে দুর্বলতা, কমে যায় বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। মানুষের যৌবনকালে দুঃখ ও হতাশা বিপজ্জনক হলেও বার্ধক্যের মতো তত ক্ষতিকর নয়। যৌবনে যত দুঃখ যত হতাশার আঘাতই আসুক না কেন, তখন দেহের রক্ত থাকে উত্তপ্ত, প্রাণশক্তি থাকে অক্ষত, তখন এক কৃষ্ণাভ সৌন্দর্যে দীপ্ত কেশরাশির দ্বারা মণ্ডিত তার উদ্ধত মাথাটি জ্বলন্ত মশালের মতো জীবনের অমিত তেজে জ্বলতে থাকে, তখন তার মনে হয় এক বিরাট বিশ্ব বিস্তৃত হয়ে আছে তার সামনে, আছে কত প্রেম, কত

সৌন্দর্য, কত আশা আর হাসি গানের উজ্জ্বলতা। কিন্তু বার্ধক্যে জীবনসায়াহ্নে এসে মানুষ যখন আকাশে মুখ তুলে নক্ষত্রালোকের মধ্যে আসন্ন মৃত্যুর হাতছানি দেখতে পায়, যখন তার প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে আসে, যখন সে তার চারদিকে কোনও আশা, কোনও আলো দেখতে পায় না তখন কি নিয়ে বাঁচবে সে?

ভলজাঁ বসে বসে এইসব ভাবছিল তার ঘরে। তখন হঠাৎ তুঁসা ঢুকল সে ঘরে। তাকে দেখে ভলজাঁ বলল, তুমি যে বলছিলে কোথায় গোলমাল হচ্ছে, সেটা কোথায়?

তুসাঁ বলল, সেন্ট মেরির কাছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভলজাঁ ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে গিয়ে বাড়ির নিচে রাস্তার ধারে একটা পাথরের উপর খালি মাথায় কান খাড়া করে কি শোনার অপেক্ষায় বসে রইল।

২

কিন্তু কতক্ষণ সেভাবে বসেছিল সে? তার চিন্তার অবিরাম অবিচ্ছিন্ন জোয়ার-ভাঁটার কি কোনও ছেদ পড়েনি? সে কি একেবারে ভেঙে পড়েছিল অথবা তার অন্তরের মধ্যে আবার নতুন করে সোজা হয়ে দাঁড়াবার কোনও শক্ত ভিত্তিভূমি খুঁজে পেয়েছিল?

তখন রাস্তাটা ছিল একেবারে জনশূন্য। যে দু'-একজন পথচারী ত্রস্ত পায়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল তারা যদি ভলজাঁর দিকে তাকিয়ে একবার দেখত তাহলে তাদের মনে হত ভলজাঁ কোনও জীবিত মানুষ নয়, মানুষের এক মর্মরমূর্তি। স্থির হয়ে সেই পাথরের উপর বসে ছিল ভলজাঁ। হঠাৎ একঝাঁক গুলির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল সে। হয়ত র‍্যু শাঁভ্রেরির ব্যারিকেডটাকে আক্রমণ করল সেনাদল।

হঠাৎ কার পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল ভলজাঁ। রাস্তার আলোয় সে দেখল একটি প্রাণচঞ্চল ছেলে চারদিকের বাড়িগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে একটা বাড়ির নম্বর খোঁজ করছে। নম্বরটা না পেয়ে সে আপন মনে বলে উঠল, 'এবার রাস্তার বাতিগুলো ভাঙি।' ছেলেটো ছিল গাভ্রোশে।

কোনওদিকে নজর দেবার মতো মনের অবস্থা তখন ভলজাঁর ছিল না। কিন্তু ছেলেটির উদ্ধত ও প্রাণচঞ্চল ভাব দেখে তার প্রতি দুর্বারবেগে আকৃষ্ট হলো সে। সে বলল, কি চাইছ হে ছোকরা?

গাভ্রোশে বলল, কি চাইছি? আমি ক্ষুধার্ত! তুমি ছোকরা।

ভলজাঁ তার পকেটে হাত দিয়ে দেখল পাঁচ ফ্রাঁ আছে। গাভ্রোশে একটা পাথর কুড়িয়ে লাইটপোস্টের বাতি লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। তার শব্দে পাশের বাড়ির লোকগুলো জেগে উঠে বলে উঠল, এ যে দেখছি '৯৩ সালের সেই বিপ্লব আবার শুরু হলো।

গাভ্রোশে বলল, এ রাস্তায় দেখছি এখনো সব আলোগুলো জ্বলছে। এটা কিন্তু ঠিক নয়। এখানে কোনও শৃঙ্খলা নেই। আমি ঐ বাতিগুলো সব ভেঙে দেব।

ভলজাঁ এবার উঠে গাভ্রোশের দিকে এগিয়ে গেল। আপন মনে বলল, 'আহা বেচারা, ছেলেটা আধপেটা খেয়ে আছে।'

এই বলে সে পাঁচ ফ্রাঁর মুদ্রাটা গাভ্রোশের হাতে দিয়ে দিল।

গাভ্রোশে আশ্চর্য হয়ে মুদ্রাটা নিল। এ মুদ্রা সে কোনওদিন হাতে পায়নি জীবনে। সে খুশি হলো প্রথমে, কিন্তু পরক্ষণেই সে বলল, ধন্যবাদ মালিক, কিন্তু এতে আমি ভুলব না, আমি বাতিগুলো ভাঙবই। ও টাকায় আমার দরকার নেই।

ভলজাঁ বলল, তোমার মা আছে?

তোমার থেকে আমার বেশি মা আছে।

তাহলে এটা রেখে দাও, তাকে দেবে।

এ কথায় বিগলিত হলো গাভ্রোশের অন্তরটা। তাছাড়া লোকটার মাথায় টুপি না থাকায় সে আরও নরম হলো। সে বলল, তাহলে তুমি এটা নিতে বলছ? কিন্তু এটা দিয়ে তুমি কিন্তু আমার বাতিভাঙা বন্ধ করতে পারবে না।

যত খুশি বাতি ভাঙতে পার তুমি।

গাভ্রোশে মুদ্রাটা পকেটে রেখে বলল, ঠিক বলেছ। আচ্ছা, তুমি এই রাস্তাতেই থাক?

হ্যাঁ, কেন?

আচ্ছা সাত নম্বর বাড়িটা আমায় দেখিযে দিতে পার?

কিন্তু ও বাড়িটা কেন তুমি খুঁজছ?

গাভ্রোশে হাত দিযে মাথার চুল ধরে ইতস্তত করতে লাগল।

কি মনে হতে ভলজাঁ বলল, তুমি কি একটা চিঠি এনেছ? আমি চিঠিটার জন্যই অপেক্ষা করছি।

গাভ্রোশে বলল, তুমি? তুমি তো মেয়েমানুষ নও। চিঠিটা লেখা হযেছে ম্যাদমযজেল কসেত্তেকে।

ভলজাঁ বলল, আমি তাকে দিযে দেব। তার জন্যই আমি এখানে আছি। আমাকে দিতে পার।

মনে রেখো, আমি ব্যারিকেড থেকে আসছি। অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে এক গোপনীয় সংবাদ বহন করে এনেছি।

হ্যাঁ, আমাকে দিযে দাও চিঠিটা।

কিন্তু ভেব না, এটা সামান্য একটা চিঠিমাত্র। এটি একটি মেয়েকে লেখা। আমরা বিপ্লবী হলেও মেয়েদের শ্রদ্ধা করি। যারা মেয়েদের হাঁস, নেকড়ের মতো তাড়া করে বেড়ায় আমরা তাদের মতো নই। তোমাকে দেখে অবশ্য ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে।

চিঠিটা দিয়ে দাও।

গাভ্রোশে ভলজাঁর হাতে চিঠিটা দিয়ে বলল, ম্যাদময়জেল কসেত্তেকে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবে চিঠিটা।

ভলজাঁ বলল, একটা কথা, আমি কি এর উত্তর সেন্ট মেরিতে পৌঁছে দিতে পারি?

না, আমি আসছি শাঁভ্রোরির ব্যারিকেড থেকে। শুভরাত্রি নাগরিক।

অন্ধকারের মধ্যে তীরবেগে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল গাভ্রোশে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আর একটা রাস্তার বাতি ভাঙার শব্দে চমকে উঠল আশপাশের বাড়িগুলোর বাসিন্দারা।

৩

মেরিয়াসের লেখা চিঠিটা নিয়ে তার নিজের ঘরে চলে গেল ভলজাঁ। দেখল পাশের ঘরে কসেত্তে ও তুসাঁ ঘুমোচ্ছে। তার হাত দুটো কাঁপছিল। কম্পিত হাতে বাতি জ্বালিয়ে টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসল সে। তারপর খুলে ফেলল চিঠিটা।

যখন আমাদের অন্তর এক প্রবল আবেগে বিচলিত থাকে তখন কোনও চিঠি পড়তে গিয়ে সবটা পড়ার ধৈর্য থাকে না আমাদের। তখন চিঠিটার প্রথম কিছুটা পড়েই আমাদের দৃষ্টি লাফ দিয়ে চলে যায় শেষাংশে। ভলজাঁর তাই হলো। চিঠিখানার শেষের একটা লাইন দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। সেই লাইনটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রত্যাশিত এক আনন্দের আবেগে আত্মহারা হয়ে উঠল ভলজাঁ। লাইনটা হলো, আমি মরব...যখন তুমি এ চিঠি পড়বে তখন আমার অশরীরী আত্মা তোমার কাছে চলে যাবে।

যে ব্যক্তি তার জীবনের সব সুখকে বিঘ্নিত করে তুলেছিল, যাকে সে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করত, তাকে সরাবার জন্য কিছুই করতে হলো না ভলজাঁকে। সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে চলেছে। এর থেকে সুখসংবাদ আর কি হতে পারে? তবে যতদূর তার মনে হয় তার মৃত্যু এখনো ঘটেনি। কারণ সেনাবাহিনী ব্যারিকেডটা ঠিকভাবে আক্রমণ করবে আগামীকাল সকালে। সেটা কোনও কথা নয়। সে যখন বিপ্লবে যোগ দিয়েছে তখন আজ হোক কাল হোক মরতে তাকে হবেই। এতক্ষণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে হলো ভলজাঁর, কসেত্তেকে পুরোপুরিভাবে পাবার পথে আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বা অন্তরায় থাকবে না। তবে এই চিঠিটা তাকে গোপনে রেখে দিতে হবে। কসেত্তে যেন এ ব্যাপারে কিছু জানতে না পারে। কি সুখের কথা।

নিজেকে এইভাবে আশ্বস্ত করলেও কিসের একটা বিষাদ আবার বুক চেপে বসল তার। হঠাৎ সে নিচের তলায় গিয়ে দারোয়ানকে জাগাল। তারপর জাতীয় রক্ষীবাহিনীর পোশাক পরে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে সেই রাতেই বেরিয়ে পড়ল ভলজাঁ। লে হ্যালের দিকে এগিয়ে চলল সে।

৪

এদিকে রাস্তার বাতি ভাঙতে ভাঙতে ভিয়েলে হদ্রিয়েত্তে অঞ্চলে এসে পড়ল গাভ্রোশে। তারপর একটা গান গাইতে শুরু করে দিল। সে নাচতে নাচতে গান করছিল। হাওয়ায় উড়তে থাকা ছেঁড়া কাপড়ের মতো তার মুখের উপর নানারকম বিকৃত ভাব খেলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ রাস্তার ধারে কি একটা জিনিস দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল গাভ্রোশে। সে দেখল, রাস্তার ধারে একটা ঠেলাগাড়ি নামানো রয়েছে আর একটা চাষী লোক গাড়িটার উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। গাভ্রোশে ভাবল ঐ ঠেলাগাড়িটা ব্যারিকেডের কাজে লাগবে। এই ভেবে সে লোকটার পা দুটো আস্তে করে ধরে সরিয়ে গাড়িটা সরিয়ে আনল। তারপর পকেট থেকে কাগজ-পেনসিল বার করে তাতে লিখল, ফরাসী প্রজাতন্ত্র। একটি ঠেলাগাড়ি অধিগ্রহণ করা হলো। (স্বাক্ষর) গাভ্রোশে।

এই রসিদটা ঘুমন্ত চাষীটার পকেটে ঢুকিয়ে রেখে গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলে গেল গাভ্রোশে। ইম্প্রিমিয়ের রয়ালে এক সেনাবাহিনীর ঘাঁটি ছিল। সেখানে জাতীয় রক্ষীবাহিনীও ছিল। গাভ্রোশে তা খেয়াল করেনি। তাই সে একের পর এক করে রাস্তায় বাতি ভেঙেছে, তারপর গান গেয়েছে; এইভাবে এ অঞ্চলের সব বাসিন্দাদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। প্রহরারত সৈনিকরা অনেকক্ষণ থেকে এই সব কিছু লক্ষ্য করে তার জন্য ওৎ পেতে বসে ছিল।

আনমনে গাড়িটা ঘর্ঘর শব্দে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে পাহারাদার সৈনিকদের সামনে এসে পড়ল গাভ্রোশে। কোনও অবস্থাতেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে না গাভ্রোশে। সে সৈনিকদের সরাসরি বলল, এ যে দেখছি স্বয়ং কর্তৃপক্ষ! ভাল তো?

সার্জেন্ট বলল, কোথায় যাচ্ছ পাজী বদমাস কোথাকার?

গাভ্রোশে বলল, নাগরিক, আমি তো তোমাদের বুর্জোয়া বলিনি, কেন আমাকে গালাগালি করছ?

কোথায় যাচ্ছ ভাঁড় কোথাকার?

মঁসিয়ে, গতকাল তোমার যে বুদ্ধি মাথায় ছিল সে বুদ্ধি আজ গেল কোথায়?

আমি জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

তুমি বেশ ভদ্রভাবেই কথা বলছ। টাকার দরকার থাকলে মাথার চুলটা বিক্রি করতে পার।

কোথায় যাচ্ছ? কোন কাজে যাচ্ছ পাজী কোথাকার?

তোমার কথাটা বড় কুৎসিত। মদ খাবার আগে মুখটা ধুয়ে ফেলবে।

কোথায় যাচ্ছ তা বলবে কি বলবে না?

হে আমার শ্রদ্ধেয় সেনাপতি, আমার প্রভু, আমার স্ত্রীর প্রসবযন্ত্রণা ওঠার জন্য ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।

সার্জেন্ট তার অধীনস্থ সৈনিকদের হুকুম দিল, গুলি চালাও।

সার্জেন্ট উপর দিকে বন্দুক তুলে একটা ফাঁকা আওয়াজ করতেই অন্য সৈনিকরাও ব্যস্ত হয়ে গুলি করতে লাগল। তখন গাভ্রোশে ঠেলাগাড়িটা ফেলে কৌশলে পালিয়ে গেল। তীরবেগে অন্ধকারে ছুটে বহু দূরে গিয়ে একটা জায়গায় একটা পাথরের উপর বসে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাভ্রোশের হুঁশ হলো, সে তাদের ব্যারিকেডের ঘাঁটি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। এখনি তাকে ফিরে যেতে হবে। তাই সে আবার একটা গান ধরে গাইতে গাইতে ছুটতে লাগল।

এদিকে প্রহরারত সৈনিকরা ঠেলাগাড়িটা দখল করে তার মালিকের খোঁজ করে ধরে তাকে। পরে সেই চাষীর বিচার হয় সামরিক আদালতে এবং বিপ্লবীদের সাহায্যকারী হিসাবে তার মৃত্যুদণ্ড হয়।

গাভ্রোশের সেই অভিযানটা ইম্প্রিমিয়ের রয়ালে সামরিক ঘাঁটির উপর নৈশ আক্রমণ হিসাবে আজও সে অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে ফেরে।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

প্যারিসে অনেকবার অনেক বিপ্লব ও পথযুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সে বিপ্লব ও পথযুদ্ধের ইতিহাসে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ও পথযুদ্ধ হচ্ছে সবচেয়ে বড। সেই পথযুদ্ধটাতে পথে পথে বিপ্লবীদের দ্বারা যে সব ব্যারিকেড ও ঘাঁটি রচিত হয় তার মধ্যে ফবুর্গ সেন্ট আঁতোনে আর ফবুর্গ দ্য তেম্পলের দুটি ঘাঁটি মনে রাখার মতো।

তার মধ্যে আবার ফবুর্গ সেন্ট আঁতোনের ব্যারিকেড ছিল অপেক্ষাকৃত অনেক বড়। তার উচ্চতা ছিল তিনতলার মতো আর তার দৈর্ঘ্য ছিল সাতশো ফুট। ফবুর্গে যে তিনটি বড রাস্তা এসে মিলিত হয সেই তেমাথার মুখের সমস্ত জাযগা জুডে এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে ব্যারিকেড। তিনটি ছ' তলা বাড়ি ভেঙে তার যত কিছু লোহার গ্রিল, কাঁচ, কাঠ, কড়ি, বরগা, আসবাবপত্র সব ব্যবহার করা হয়েছিল এই ব্যারিকেড রচনার জন্য। প্যারিস শহরের বিভিন্ন পথের মোড়ে আরও উনিশটা ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়। কিন্তু সেগুলো ছিল ছোট এর থেকে। ফবুর্গ সেন্ট আঁতোনের ব্যারিকেড দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভয জাগত যে কোনও দর্শকের মনে। স্বর্গের অলিম্পাস পর্বতের মতো সেই ব্যারিকেডটা দেখে মনে হত কামানের গোলা পর্যন্ত সেটা ভেদ করতে পারবে না।

একটা বিরাট আকারের লাল পতাকা উড়ছিল ব্যারিকেডটার উপর। এই ব্যারিকেড রক্ষার জন্য বিপ্লবীদের যখন সরকারী সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হত তখন বহু মৃতদেহ সেই ব্যারিকেডের উপর পড়ে থাকত। তার আশেপাশে একদল বিপ্লবী জনতা বন্দুক, লাঠি, তরবারি, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে প্রতিরক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকত। বিদ্রোহী জনতার বিক্ষুব্ধ ধ্বনিতে মুখরিত সেই বিশাল ব্যারিকেডের উপর বিপ্লবের আত্মা যেন এক রক্তাক্ত ছায়া বিস্তার করেছিল। কিন্তু এ বিপ্লব কিসের জন্য? এ বিপ্লব ছিল জনগণের সার্বভৌমত্ব, অবাধ গণভোট, প্রজাতন্ত্র ও কতকগুলি অধিকার লাভের যুদ্ধ।

সেন্ট আঁতোনের ব্যারিকেড থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে শ্যাতো দ্য ইউর কাছে রচিত হয় ফবুর্গ দু তেম্পল-এর ব্যারিকেড। এ ব্যারিকেড ছিল দোতলা সমান উঁচু

এক বিশাল প্রাচীরের মতো। দেখে মনে হত বড় বড় পাথরগুলো পর পর সাজিয়ে সিমেন্ট না দিয়েই রোমের প্রাচীরের মতো গড়ে তোলা হয়েছে এই ব্যারিকেড। তার দিকে যে কেউ তাকালেই তাকে ভাবতে হত। কেউ যদি সে রাস্তায় একবার অসাবধানে গিয়ে পড়ত তাহলে আর রক্ষা ছিল না তার। তাকে আহত অথবা নিহত হয়ে ফিরে আসতে হত। সে ব্যারিকেডের সামনে ও দু'পাশে অনেক মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়ে ছিল।

সরকারী সেনাদলের একজন বীর সাহসী কর্নেল মন্তিনার্দ ঐ ব্যারিকেড দেখে একই সঙ্গে ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তার প্রশংসায় ফেটে পড়ে। সে বলে, কি চমৎকারভাবে এটা তৈরি হয়েছে! একটা পাথরও লাইন থেকে সরে যায়নি। মাটি দিয়েও এটা ঐ ভাবে তৈরি করা যেত।

সে যখন এই কথাগুলো বলছিল তখন বিপ্লবী পক্ষের কাছ থেকে একটা বন্দুকের গুলি এসে তার বুকটাকে বিদ্ধ করে এবং সে পড়ে যায়। বিপ্লবীরা বলতে থাকে, ওরা কাপুরুষ, আনাচে-কানাচে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে ওরা। সাহস থাকে তো সামনে এসে যুদ্ধ করুক।

ফবুর্গ দ তেম্পল-এর ব্যারিকেডে মাত্র আশিজন বিপ্লবী তিন দিন ধরে সরকার পক্ষে দশ হাজার সৈনিকের সঙ্গে লড়াই করে টিকিয়ে রেখেছিল সেটাকে। চতুর্থ দিনে সেনাদলের লোকেরা আশপাশের বাড়িগুলো ভেঙে তার মধ্যে ঢুকে তার ছাদ থেকে বাড়ির জানালাগুলোর ধার থেকে যুদ্ধ চালিযে এই ব্যারিকেড ও বিপ্লবীদের ঘাঁটি দখল করে। কিন্তু একজন বিপ্লবীও পালায়নি বা পালাবার চেষ্টা করেনি। এই বিপ্লবীদলের নেতা একমাত্র বার্থেলমি ছাড়া আর সবাই নিহত হয়।

সেন্ট আঁতোনে আর তেম্পল-এর ব্যারিকেড দুটো আসলে দুটো যুবকের দ্বারা তৈরি হয। তারা হলো কুর্নেত আর বার্থেলমি। দু'জনেই ছিল সাহসী আর দায়িত্বশীল। কুর্নেত ছিল বয়সে বড়। চওড়া কাঁধ, মোটা পেশীওয়ালা বলিষ্ঠ চেহারা। আগে সে ছিল নৌবাহিনীর এক অফিসার। তার কণ্ঠে যেন ছিল সামুদ্রিক ঝড়ের গর্জন। সে যখন যুদ্ধ করত মনে হত সে যেন সমুদ্র থেকে আসার সময় এক ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ডতা নিযে এসেছে এই যুদ্ধক্ষেত্রে।

কুর্নেত যেমন ছিল সেন্ট আঁতোনের লোক-বার্থেলমি তেমনি তেম্পল-এর অধিবাসী। বয়সে বার্থেলমি ছিল তরুণ যুবক। তার চেহারাটা ছিল রোগা রোগা। সরু মুখখানা সব সময় এক সকরুণ বিষাদে ভরা থাকত। একবার এক পুলিশ অফিসারের হাতে সে মার খায়। তারপর থেকে তার উপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। সুযোগ পেয়ে সেই পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে ধরা পড়ে। জেল খেটে বেরিয়ে আসার পর বিপ্লবে যখন যোগ দেয় তখন তার বয়স সতের-আঠারো। ফবুর্গ তেম্পল-এর ব্যারিকেডটা তারই হাতে গড়া, সেন্ট আঁতোনের ব্যারিকেডটা যেমন কুর্নেতের হাতে গড়া।

সেনাবাহিনীর কাছে দু'জনে হেরে গিয়ে সোজা লন্ডনে পালিয়ে যায় ওরা। সেখানে

প্রেমের ব্যাপারে ডুয়েল লড়তে গিয়ে বার্থেলমি কুর্নেতকে হত্যা করে। বিচারে তার লন্ডনেই ফাঁসি হয়। নির্মম দারিদ্র্য আর নৈতিক অন্ধকারে গড়া লৌহকঠিন এক যুবক ফরাসী দেশের এক কারাগারে যে জীবন শুরু করে, অবশেষে ইংলন্ডে এক বধ্যভূমিতে সে জীবনের অবসান হয়।

২

১৮৩২ সালের জুন বিপ্লব আর ১৮৪৮ সালের জুন বিপ্লবের মধ্যে ছিল ষোল বছরের ব্যবধান। কিন্তু ১৮৪৮ সালের বিপ্লবীরা ছিল আরও অনেক অভিজ্ঞ এবং কুশলী। লা শাঁভ্রেরির ব্যারিকেডটা ফবুর্গের ব্যারিকেড দুটোর তুলনায় ভ্রূণ পরিমাণ হলেও তাকে কেন্দ্র করে যে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা গড়ে উঠেছিল তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেকের।

সেদিন রাত্রিতে এপেনিনের মৃত্যুর পর মেরিয়াস আর কাজে মন দিতে পারেনি। তখন এঁজোলরাসকেই আবার নেতৃত্ব দিতে হয়। বড় ব্যারিকেডটাকে আরও দশ ফুট উঁচু করা হলো। সামনের দিকে আরও অনেক জিনিসপত্র দিয়ে সেটাকে আরও শক্তিশালী করা হলো। মঁদেতুরের ব্যারিকেডটার আশপাশে রক্ত ছড়ানো ছিল। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর চারজন লোক নিহত হয় যুদ্ধে। এঁজোলরাস তাদের পোশাকগুলো খুলে নিয়ে নিল। এঁজোলরাস সকলকে দু' ঘণ্টা করে ঘুমিয়ে নিতে বলল। তবু অনেকে কাজ করতে লাগল। ফুলি হোটেলটার সামনে 'জনগণ দীর্ঘজীবি হোক' এই কথাগুলো পেরেক দিয়ে খোদাই করতে লাগল। হোটেলের তিনজন মেয়ে অন্ধকারে হোটেল ছেড়ে পাশের একটা বাড়িতে চলে যায়। বিদ্রোহীরা তাদের ব্যাপারে অনেকটা স্বস্তি অনুভব করে। পাঁচজন লোক বিশেষভাবে আহত হয়, তাদের মধ্যে দু'জন জাতীয় রক্ষীবাহিনীর লোক।

হোটেলের নিচের তলার ঘরে ছিল শুধু মেবুফের মৃতদেহ আর জেভার্ত। এঁজোলরাস বলল, এ ঘরটা হলো মৃত্যুপুরী, মৃতদেহ রাখার জায়গা।

ব্যারিকেডের সামনের দিকে যে ভাঙা বাসটা ছিল তার উপর পতাকাটার পাশে মঁসিয়ে মেবুফের রক্তমাখা জামাটা ঝুলিয়ে রাখে ওরা। হোটেলে রুটি-মাংস বা কোনও খাবার ছিল না। ষোল ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চাশজন বিপ্লবী হোটেলের সব খাবার খেয়ে ফেলে। ফলে তাদের ক্ষুধা সহ্য করতে হচ্ছিল। সেন্ট মেরি ব্যারিকেডের নেতা জাঁ তার লোকেরা খেতে চাইলে বলে এখন রাত তিনটে বাজে, চারটের সময় আমরা সবাই মারা যাব, এখন আর খেয়ে কি হবে?

হোটেলের একটা ঘরে এঁজোলরাস পনের বোতল মদ পেল। কিন্তু সে মদ কাউকে খেতে দিল না।

কমবেফারে বলল, এ বোতলগুলো হয়ত পীয়ের হুশেলুপেব রাখা।

বোসেত বলল, গ্রান্তেয়ার এখন ঘুমোচ্ছে তাই, তা না হলে ওগুলো পাহারা দেবার কাজ বাড়ত আমাদের।

এঁজোলরাস মদের বোতলগুলো যে টেবিলে মঁসিয়ে মেবুফের মৃতদেহ ছিল সেই টেবিলের নিচে রেখে দিল। বলল, এগুলো যেন কেউ না ছোঁয়।

রাত দুটোর সময় উপস্থিত সব বিপ্লবীদের নাম ডাকা হলো। দেখা গেল মোট সাঁইত্রিশজন লোক আছে। তখন ভোর হয়ে আসছিল। জ্বলন্ত মশালটাকে নিবিয়ে দেওয়া হলো। কুরফেরাক ফুলিকে বলল, ভাল হলো। মশালের আলোটা হাওয়ায় কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল ওটা যেন কাপুরুষের অন্তর।

জলি একটা বিড়াল দেখে দর্শনের কথা বলতে লাগল। সে বলল, ইঁদুরের পর বিড়াল সৃষ্টি করেন ঈশ্বর। এর থেকে সৃষ্টি ব্যবস্থার উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

কমবেফারে একজন ছাত্রের সঙ্গে জাঁ প্রুভেয়ার, বাহোরেল, মেবুফ আর কিউবাকের মৃতদেহগুলোর সৎকারের কথা আলোচনা করছিল। প্রথমে জাঁ প্রুভেয়ারের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে করতে ওরা সীজারের মৃত্যু আর ব্রুটাসের বিষয়ের উপর এসে পড়ল।

কমবেফারে বলল, প্রতিভাবান পুরুষরা একে অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে একে অন্যকে আক্রমণ করে। সীজারকে হত্যা করে ব্রুটাস ন্যায়সঙ্গত কাজই করেছিল। সিসারোর এ কথার মধ্যে যুক্তি আছে। সীজার সিনেটরকে মান্য করতেন না, তিনি স্বৈরাচারী রাজার মতো চলতেন। হত্যা করার সময় তাঁর দেহে তেইশটা ক্ষত হয়। সেগুলোর থেকে যীশুর দেহের ক্ষত আমাকে বেদনা দেয় বেশি। কারণ সীজারকে মেরেছিল গণ্যমান্য সিনেটাররা, কিন্তু যীশুকে মারে যত সব হীন প্রকৃতির বাজে লোক। তবু বলতে হয় আমরা আমাদের ক্রোধের তীব্রতার মাঝে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি। হয়নাস হোমারকে আক্রমণ করেন। মেডিয়াস ভার্জিলকে আক্রমণ করেন, ভিসে মনিয়ারকে আর পোপ শেকস্‌পীয়ারকে আক্রমণ করেন।

৩

এঁজোলরাস চারদিকে ঘুরে একবার সব দেখে নিল। রাতের যুদ্ধের সাফল্যের মত্ততায় তারা ভুলে গিয়েছিল সকালে আবার আক্রমণ শুরু করবে সেনাবাহিনী। তাছাড়া বিপ্লবীদের আশা ছিল পরের দিন সন্ধের আগেই তাদের চূড়ান্ত জয় অনিবার্য। তারা আগামী দিনটাকে তিনভাগে ভাগ করে ধরে নিয়েছিল এই তিনভাগে এমন তিনটে ঘটনা ঘটবে যা সুনিশ্চিত করে তুলবে তাদের জয়কে। তারা ভেবেছিল আগামীকাল সকাল ছ'টায় সরকাবী সেনাদলের একটা অংশ তাদের দলে এসে যোগদান করবে। তাদের ধারণা সেনাদলের অনেকে তাদের বিপ্লবের আদর্শ বুঝতে পেরেছে অথবা ভয় পেয়ে গেছে। তার উপর দুপুরবেলায় প্যারিসের সমস্ত জনগণ বিপ্লবে যোগদান করবে। এখনো যারা বিপ্লবের কাছে এগিয়ে আসেনি তারা সবাই এসে লড়াই করবে। সুতরাং দিনের শেষে তারা চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করবে।

কিন্তু এঁজোলরাস ব্যারিকেডগুলোর চারদিকে ঘুরে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে বলল অন্য কথা। সে বলল, সরকার সব সেনাবাহিনী তলব করেছে। একটা

বাহিনীকে আমাদের দমন করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। তার উপর আছে জাতীয় রক্ষীবাহিনী। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা আক্রান্ত হব। শহরের জনগণ গতকাল বেশ উৎসাহ দেখিয়েছিল ; কিন্তু আজ তাদের কোনও উৎসাহ নেই। ফবুর্গের কোনও লোকই এগিয়ে আসছে না। আমাদের আর কোনও আশা নেই।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলের কলগুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। ভয়ের ছায়া নেমে এল সকলের চোখে-মুখে। কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে একজন অচেনা লোক যাকে শ্রমিক বলে মনে হচ্ছিল, বলে উঠল, ঠিক আছে নাগরিকগণ, ভয়ের কিছু নেই, আমরা ব্যারিকেডটা আরও কুড়ি ফুট উঁচু করব। আমরা দেশকে দেখিয়ে দেব জনগণ প্রজাতন্ত্রীদের ত্যাগ করলেও প্রজাতন্ত্রীরা তাদের ত্যাগ করেনি।

অনেকে আনন্দধ্বনি করে কথাগুলোকে সমর্থন করল।

৪

সেই অচেনা লোকটা যখন বলল, তাদের সব মৃতদেহগুলো ব্যারিকেডটার মাথায় স্তূপাকার করে দেবে সেটা আরও, তখন উপস্থিত সকলেই খুশি হলো সে কথায়। সকলেই এক বাক্যে বলল, আমরা সকলেই এখানে থাকব। শেষ পর্যন্ত থেকে মৃত্যুবরণ করব।

এঁজোলরাস বলল, সকলের থাকার কি দরকার ?

হ্যাঁ, সকলেই থাকব।

এঁজোলরাস বলল, আমাদের অবস্থা এখানে ভাল। তিরিশজনই এ ব্যারিকেড রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট। ছত্রিশজনের প্রাণ দেবার কি দরকার ?

তার উত্তরে ওরা বলল, কারণ কেউ এখান ছেড়ে যেতে চায় না।

এঁজোলরাস একটু রাগের সঙ্গে ঝাঁঝালো সুরে বলল, হে নাগরিকবৃন্দ, আমাদের প্রজাতন্ত্রে কাজের লোক কম। বীরদের অবশ্য প্রাণদানের প্রতি ঝোঁক থাকে। তবু কিছু লোকের কর্তব্য এখান থেকে চলে যাওয়া।

এঁজোলরাস ছিল বিপ্লবীদের সর্বজনবন্দিত নেতা। তার প্রভুত্বের প্রতি আস্থা ছিল সকলের। তথাপি উপস্থিত সকলের মধ্যে এক বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদের কলগুঞ্জন উঠল। তাদের একজন বলল, তাছাড়া শত্রুসেনারা আমাদের ঘিরে ফেলেছে চারদিক থেকে। এখান থেকে বেরোনও মুস্কিল।

এঁজোলরাস বলল, হ্যালের সব দিকে পাহারা নেই। মঁদেতুরের গলিপথটা ফাঁকা আছে। তোমরা মার্সে দে ইনোসেন্ত দিয়ে র‍্যু দে প্রেশেউরে গিয়ে পড়তে পার।

একজন বলল, আমরা সেখানে গেলে আমাদের পোশাক দেখে তারা জানতে চাইবে কোথা থেকে আমরা আসছি, তখন তারা গুলি করবে।

এঁজোলরাস তখন কমবেফারের কাঁধে হাত রেখে কি বলতে ওরা হোটেলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে কিছু পরেই জাতীয় রক্ষীবাহিনীর বন্দী চারজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া চারটে পোশাক হাতে বেরিয়ে এল। কমবেফারের হাতে তাদের শিরস্ত্রাণগুলো

ছিল। সেগুলো তাদের সামনে ফেলে দিয়ে এঁজোলরাস বলল, এগুলো পরে চারজন অন্তত বেরিয়ে যেতে পারবে।

তবু কারো মধ্যে চলে যাওয়ার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না। তখন কমবেফারে তাদের বলতে লাগল, কথা হচ্ছে তোমাদের ছেলে-পরিবার নিয়ে। এঁজোলরাস বলল, সে একটি বাড়ির জানালায় একজন বয়স্ক মহিলাকে সারারাত জেগে থাকতে দেখেছে। সে তার ছেলে ফিরে না আসায় উদ্বেগে ছটফট করেছে সারারাত। তোমাদের যাদের ঘরে মা, বোন বা স্ত্রী ও শিশুসন্তান আছে, যারা শ্রমের কাজ করে সংসার প্রতিপালন করো তাদের অবিলম্বে চলে যাওয়া উচিত। বিপ্লব কখনো কারো সংসারের ক্ষতি করতে বলে না। তোমাদের হাতে বন্দুক আছে, তোমরা লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত থাকতে পার। মরবার জন্য উদ্যত হতে পার। কিন্তু কাল তোমরা থাকবে না, তখন তোমাদের উপর নির্ভরশীল নারী ও শিশুদের কি হবে ভেবে দেখেছ ? তারা তোমাদের অবর্তমানে পথের ভিখারী হবে। পুরুষ মানুষ অভাবে ভিক্ষা করতে পারে, কিন্তু নারীদের দেহদান করতে হয়। বেশ্যাগিরি করতে হয। যাদের বাড়িতে ছেলে-পরিবার আছে তাদের চলে গিয়ে বাকি যারা থাকবে তাদের কাজ করতে দেওয়া উচিত। তাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে সব কিছু ভেবে দেখা উচিত। ভেবে দেখা উচিত, সমাজে মেয়েদের সুযোগ দিই না, তাদের স্বাধীনভাবে সব কিছু ভাবতে শেখাই না, তাদের স্বাবলম্বী হতে দিই না, রাজনীতিতে যোগদান করতে দিই না। এই সব নারীরা তাদের স্বামীদের অকালমৃত্যুতে কি করে দিন চালাবে ? আমি যখন হাসপাতালে এক সহকারী ডাক্তার হিসাবে কাজ করতাম তখন একটি শিশু ভর্তি হয় সেখানে। তার বাবা অকালে মারা যায়। মা ছিল খুব গরীব, সহায়-সম্বলহীনা। অভাবে উনুন জ্বলত না। শিশুটি খাবার না পেয়ে ছাই আর মাটি খেত। কাদা ঘাটত খাদ্যের আশায়। তার হাত-পা শীর্ণ হয়ে যায়, পেটটা ফুলে যায। হাসপাতালে তার পেটে মাটি আর দাঁতে ছাই পাওয়া যায়। শিশুটি মারা যায়। যাদের পরিবার আছে, সন্তান আছে, তাদের এই শিশুটির কথা নিজের মতো করে ভাবা উচিত। আমি তোমাদের সম্বন্ধে কিছু বলছি কি ? কিছু না। আমি জানি তোমরা সাহসী, বীরপুরুষ, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আত্মবলি দেবার জন্য তোমাদের অন্তর উন্মুখ। সকলেই আত্মত্যাগের গৌরব লাভ করতে চাও। সেটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু তোমরা একা নও। সংসারে আর যারা আছে তাদের জন্যও ভাবতে হবে তোমাদের। যে সব পরিত্যক্ত ও পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশু আছে দেশে, পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ মারা যায়। যাবা সংসারের কথা ভাবে না তারা আত্মকেন্দ্রিক।

কমবেফারের কথা শুনে সবাই মাথা নত করে চুপ করে রইল।

মেরিয়াস এতক্ষণ কোনও কাজ না করে ভাবছিল বসে বসে। ওদের কথাবার্তা সব শুনছিল। আশার সুউচ্চ শিখর থেকে হতাশার গভীরে ডুবে যায় সে। সে তার শেষ পরিণতির এক চরম মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্নের মতো অপেক্ষা করছিল। হতাশার এক গভীর আবেশে আচ্ছন্ন থাকায় তার সামনে যে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল তার

খুঁটিনাটিগুলো সে গ্রাহ্য না করলেও মোটামুটি আসল ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছিল। সে নিজে একান্তভাবে মৃত্যুকামনা করলেও কয়েকটি জীবনকে যাতে বাঁচাতে পারে তার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠল সে।

মেরিয়াস হঠাৎ বলে উঠল, এঁজোলরাস আর কমবেফারে ঠিক বলেছে। অহেতুক অনাবশ্যক প্রাণবলি চলবে না এ বিষয়ে আমিও একমত। আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। তোমাদের মধ্যে যাদের বাড়িতে মা, স্ত্রী ও শিশুসন্তান আছে তাদের চলে যেতে হবে। বিবাহিত যে সব লোকদের সংসার চালাতে হয় তারা চলে যাও।

মেরিয়াসের কথাটার গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ এঁজোলরাস নেতা হলেও সে বড় রকমের একটা বিপদ থেকে সকলকে রক্ষা করে। সে তাদের রক্ষাকর্তা।

এঁজোলরাস বলল, হ্যাঁ, এটা আমাদের আদেশ।

মেরিয়াস বলল, আবার আমি তোমাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

অবশেষে কমবেফারের দীর্ঘ বক্তৃতা, এঁজেলরাসের আদেশ, মেরিয়াসের আবেদন সব মিলিয়ে বিপ্লবীদের মনে প্রভাব বিস্তার করল। তারা একে অন্যকে বলতে লাগল, হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। 'তুমি তো বিয়ে করেছ, তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আছে।'...'তোমার দুটি বোন আছে।'...'তোমার মা আছে।'

কুরফেরাক বলল, তাড়াতাড়ি করো। এরপর খুব দেরি হয়ে যাবে।

এঁজোলরাস বলল, নাগরিকবৃন্দ, তোমরা প্রজাতন্ত্রের লোক, কাদের যেতে হবে তা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নাও।

তার কথামতো কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা ঠিক করে ফেলল, পাঁচজন লোককে যেতে হবে দল থেকে।

মেরিয়াস বলল, পাঁচজন লোক, কিন্তু চারজনের পোশাক আছে বেরিয়ে যাবার।

তখন সেই পাঁচজন বলল, তাহলে একজনকে থেকে যেতে হবে।

কুরফেরাক বলল, তাড়াতাড়ি করো।

একজন মেরিয়াসকে বলল, তুমি ঠিক করে দাও কে থাকবে আমাদের মধ্যে।

মেরিয়াস একবার নির্বাচিত পাঁচজন লোক আর চারটে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর পোশাকের দিকে তাকাল। সে যখন ভাবল মৃত্যুর জন্য একজন লোককে নির্বাচিত করতে হবে তখন তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।

এমন সময় উপর থেকে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর একটা পোশাক পড়ে গেল। মনে হলো যেন আকাশ থেকে পোশাকটা পড়েছে।

মেরিয়াস মুখ ঘুরিয়ে দেখল মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত। সে আন্ডারপ্যান্ট পরে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর পোশাকটাই খুলে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ আগে জাঁ ভলজাঁ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর পোশাক পরে বন্দুক হাতে মঁদেতুরের গলিপথ দিয়ে বিপ্লবীদের ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ে। সে কিজন্য এখানে আসে তা বলা শক্ত। সে খবর পেয়ে ব্যারিকেড দেখার জন্য কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এখানে আসে নাকি বিপ্লবের প্রতি তার কোনও সহজাত প্রবৃত্তি বা প্রবণতার বশে এখানে আসে

তা কেউ জানে না। গলিপথের মোড়ে বিপ্লবীদের যে পাহারাদার ছিল সে ভলজাঁকে আটকায়নি, কারণ সে ভেবেছে অচেনা আগন্তুক জাতীয় রক্ষীবাহিনীর লোক হলেও সে একা, এবং সে হয়ত বিপ্লবীদের দলে যোগদান করবে, আর যদি যোগদান না করে তাহলে সে বন্দী হবে, একা কখনো লড়াই করতে পারবে না।

ভলজাঁ যখন প্রথম এসে ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ে তখন কেউ তাকে দেখেনি, কারণ তখন সকলের দৃষ্টি ছিল যে পাঁচজন লোক ঘাঁটি ছেড়ে চলে যাবার জন্য নির্বাচিত হয়েছে তাদের উপর নিবদ্ধ। ভলজাঁ তাদের সব কথাবার্তা শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তারপর সে তার পোশাকটা খুলে দেয়।

বোসেত বলল, কে এই লোকটি?

কমবেফারে বলল, যেই হোক, আমাদের একজনের জীবনকে রক্ষা করতে চায়।

মেরিয়াস গম্ভীরভাবে বলল, আমি ওঁকে চিনি।

এঁজোলরাস জাঁ ভলজাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, এটাই যথেষ্ট। আর কোনও কথা নেই।

এরপর সে ভলজাঁকে বলল, নাগরিক, তুমি স্বাগত আমাদের মাঝে। তুমি হয়ত জা[illegible]দের মৃত্যুকাল আসন্ন।

ভলজাঁ নীরবে পাঁচজনের মধ্যে যার পোশাক ছিল না তাকে তার পোশাকটা পরিয়ে দিল নিজের হাতে।

৫

তাদের ঘাঁটির বিপন্ন অবস্থাটা এঁজোলরাসের বিষাদকরুণ মুখের উপর স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছিল। এঁজোলরাস ছিল বিপ্লবের পূর্ণ প্রতীক। তবু কতকগুলো অপূর্ণতা ছিল তার মধ্যে। প্রথম দিকের এবিসি সোসাইটি আর কমবেফারের চিন্তার দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিল সে। পরে সে সংকীর্ণ গোঁড়ামি [illegible] মুক্ত হয়ে উন্নততর সমাজবিপ্লবের মহান আদর্শকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ক্রমে তার জাতীয় প্রজাতন্ত্রকে প্রসারিত করে মানবজাতির প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার কথা ভাবতে থাকে সে। হিংসা বলপ্রয়োগেব দিক থেকে ১৮৭২ সালের ফরাসী বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঘটাবার ব্যাপারে সে অটল। ব্যারিকেডের একটা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ফাঁসিকাঠের আসামীর মতো মৃত্যুভয়ের বাতাসে কাঁপছিল সে তবু তার চোখে ছিল এক অন্ধ আগুনের ধূমায়িত আভা। তার মাথার সুন্দর চুলগুলো পিছনের দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, নক্ষত্রমণ্ডলের রথের উপর আরূঢ় কোনও দেবদূত অথবা কেশরওয়ালা কোনও সিংহ।

এঁজোলরাস বলতে লাগল, হে নাগরিকবৃন্দ! তোমরা একবার ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখেছ? যে ভবিষ্যতে সব শহরের পথগুলো হবে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত, দু'ধারে থাকবে বড় বড় বাড়ি, সব মানুষ হবে উন্নতমনা, পৃথিবীর সব জাতিগুলো পরস্পরে মিলেমিশে বাস করবে, সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা স্বাধীনতাকে চিন্তা করবে,

সব ধর্মের লোক আইনের চোখে পরিগণিত হবে সমানভাবে, স্বর্গই হবে একমাত্র ধর্ম। ঈশ্বর হবেন সে ধর্মের পুরোহিত আর মানুষের বিবেক হবে সে ধর্মোপসনার বেদী। সকল রকমের ঘৃণার অবসান ঘটবে, কোনওরকমের শ্রেণীবৈষম্য বা দ্বন্দ্ব থাকবে না, সকল মানুষ কাজ পাবে, সকল মানুষ পাবে ন্যায়বিচার আর শান্তি, শ্রমিক আর ছাত্ররা ভাই-এর মতো মিলেমিশে বাস করবে। সব কাজের জন্য থাকবে শাস্তি আর পুরস্কারের সমান ব্যবস্থা। যুদ্ধ আর রক্তপাত চিরদিনের মতো বন্ধ হবে। প্রকৃতিজগৎকে বশীভূত করাই হবে প্রথম কাজ, দ্বিতীয় কাজ হবে আদর্শের পরিপূরক। ইতিমধ্যেই মানুষ যে কৃতিত্ব অর্জন করেছে তা একবার ভেবে দেখ। আদিম মানুষ হায়েড্রা, ড্রাগন, গ্রিফিন, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয় করত। আজ মানুষ বুদ্ধির ফাঁদ পেতে তাদের কবল থেকে মুক্ত করেছে নিজেদের। তারা বাষ্পযান, এঞ্জিন এবং বেলুন আবিষ্কার করেছে। আজ মানুষ সমস্ত জীবজগতের প্রভু হয়েছে। আজ আমাদের লক্ষ্য কি? সত্যের আলোর উপর প্রতিষ্ঠিত ন্যায়বিচারসমৃদ্ধ এক সরকার। সে সত্যের আলোর সঙ্গে দিনের আলোর সার্থক সাযুজ্য থাকবে। আমরা চাই পৃথিবীর সব জাতির মিলন আর মানবজাতির মহান ঐক্য। একমাত্র বুদ্ধির পার্লামেন্টের দ্বারা শাসিত হবে সমগ্র জগৎ। হে নাগরিকবৃন্দ, সাহস অবলম্বন করো, এগিয়ে যাও। একদিন গ্রীকরা যা শুরু করেছিল আজ ফ্রান্স তা সম্পন্ন করবে। হে আমার বন্ধু ফুলি শোন; তুমি হচ্ছ এক বলিষ্ঠ শ্রমিক, জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি। তুমি ঠিকভাবে ভবিষ্যৎকে দেখতে পার, ঠিকমতো ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পার। তোমার চিন্তাধারা স্বচ্ছ। তোমার পিতামাতা নেই। সমগ্র মানবজাতিই তোমার মাতা আর ন্যায়বিচারই তোমার পিতা। তোমাকে এইখানেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। তার মানে তুমি এক গৌরবময় জয় লাভ করবে। হে নাগরিকবৃন্দ, আজ যাই ঘটুক না কেন, পরাজয়ের মধ্যেও তোমরা লাভ করবে জয়ের গৌরব। আমরা বিপ্লবকে সার্থক করে তুলবই। এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড যেমন সমগ্র শহরকে আলোকিত করে তোলে, তেমনি বিপ্লবের আগুন সমগ্র মানবজাতিকে করে তুলবে আলোকিত। কিন্তু আমরা কি ধরনের বিপ্লব চাই? আমি আগেই বলেছি সে বিপ্লব হলো সত্যের বিপ্লব। আমরা চাই নিজের উপর নিজের সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা। কোনও দেশের প্রতিটি মানুষ যখন এইভাবে আত্মসংযমের মাধ্যমে এই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে তখনি তাকে আমরা বলি রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের সব মানুষ আপন আপন সার্বভৌমত্বের কিছু কিছু ত্যাগ করে আইনের অনুশাসনকে সম্ভব করে তুলবে। আইনের অনুশাসন প্রতিটি মানুষের অধিকারকে রক্ষা করে চলবে। সকল মানুষের সমান স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব ত্যাগকেই বলা হয় সাম্য। সকল মানুষ যখন সকল মানুষের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করে চলে তখন তাকে বলে সৌভ্রাতৃত্ব। যে আধারে সকল সার্বভৌমত্ব পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় সেই আধারকেই বলে সমাজ। সকল সার্বভৌমত্বের এই শান্তিপূর্ণ মিলনই হলো সামাজিক বন্ধন বা সামাজিক চুক্তি যার মাধ্যমে সকল মানুষ পরস্পরের কাছে আসে, মিলিত হয়। সাম্য মানে এই নয় যে সব গাছের মাথাগুলো এক মাপে বেড়ে উঠবে,

সব ঘাস, আগাছা আর বনস্পতি পাশাপাশি অবস্থান করবে। নাগরিক অর্থে সাম্য মানে হলো সকল প্রতিভার সমান বিকাশ। রাজনৈতিক অর্থে সাম্য হলো সকলের ভোটের মূল্য সমান। ধর্মীয় অর্থে সাম্য হলো সকলের সমান অধিকারভোগ। সাম্য প্রথমে সকল মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক অবাধ শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। শিক্ষার আলো থেকেই সব কিছুর জন্ম হয়। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দী মহান ঠিক, কিন্তু বিংশ শতাব্দী হবে সব দিক দিয়ে সুখী। আজকের সব ভয় হবে দূরীভূত—যুদ্ধ এবং দিগ্বিজয়ের অভিলাষ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম, বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের কূটনীতি, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী রাজাদের উত্তরাধিকার, অনন্তত্বের অরণ্যে মাথা খুঁড়তে থাকা ভেড়াদের মতো বিভিন্ন ধর্মের দ্বন্দ্ব-সংঘাত—এই সব কিছুর অবসান ঘটবে। মানুষকে আর দুর্ভিক্ষ বা শোষণকে ভয় করতে হবে না, অভাবের তাড়নায় কোনও মেয়েকে বেশ্যাগিরি করতে হবে না, কাজের অভাবে কোনও বেকারকে নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না, কোনও মানুষকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে না, বা হিংসাজনিত উগ্র সংগ্রামের শিকার হতে হবে না। সব মানুষ সুখে জীবন যাপন করবে। সূর্যের চারদিকে যেমন সব গ্রহেরা ঘোরে তেমনি সত্যকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হবে সব আত্মা। সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আর আমাদের মৃত্যুরূপ মূল্য দান করতে হবে না যে ভবিষ্যতে মানবজাতি হবে বন্ধন হতে মুক্ত, সব দিক দিয়ে উন্নত এবং সুখী। একথা আমরা আজ এই মুহূর্তে এই ব্যারিকেড থেকে ঘোষণা করছি। ভাইসব, এ ব্যারিকেড সামান্য পাথর দিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে গড়া এক বস্তু নয়, যারা চিন্তা করে আর দুঃখভোগ করে তাদের মিলনস্থল হলো এই ব্যারিকেড। দুঃখভোগ আর আদর্শ—এই দুই উপাদানে গড়া হলো এই ব্যারিকেড। দিন রাত্রিকে আলিঙ্গন করে বলে, আমি মরে যাব, কিন্তু আমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করবে তুমি। তেমনি আজ এখানে হতাশার দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে জন্মলাভ করবে এক নতুন আশা। দুঃখ আনে মৃত্যু, কিন্তু আদর্শ বা চিন্তাধারা নিয়ে আসে অমরত্ব। সব দুঃখবেদনা ও অমরত্ব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে আমাদের মৃত্যুর মধ্যে। ভাইসব, ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল আলোয় অভিস্নাত হয়ে মৃত্যুবরণ করব আমরা। এক নতুন প্রভাতের আলোয় পরিপ্লাবিত হয়ে উঠবে আমাদের সমাধিভূমি।

এঁজোলরাস এবার চুপ করল। তবু তার ঠোঁট দুটি কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল কণ্ঠটি তার নীরব হয়ে গেলেও সে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে। শ্রোতারা তার কথা আরও শুনতে চাইছিল। শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে উঠল তাদের মাথা। এক চাপা প্রশংসার কলগুঞ্জনে ফেটে পড়ল সবাই তারা।

৬

এবার মেরিয়াসের মনের অবস্থার কথা কিছু বলতে হবে। বাস্তব জগতে তখনো মনটা ফিরে আসেনি তার। মৃত্যুচিন্তার একটা আবেশে তখনো আচ্ছন্ন হয়ে ছিল

সে। মৃত্যুর দুটো কালো ডানার বিশাল ছায়ান্ধকারে তখনো ঘোরাফেরা করছিল সে যেন।

এই মানসিক অবস্থার মধ্যেই সে ভাবতে লাগল, মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত কেন এবং কিভাবে এল এখানে। এ প্রশ্নের কোনও যুক্তি সে খুঁজে না পেলেও সে ভাবল তারই মতো সেও হয়ত মরতে এসেছে। তবে কসেত্তের জন্য চিন্তা হচ্ছিল তার।

মেরিয়াস যখন প্রথম জাঁ ভলজাঁকে দেখে এবং বলে সে তাকে চেনে তখন সে কোনও কথা বলেনি ভলজাঁর সঙ্গে। তার সঙ্গে কোনও কথা বলার প্রবৃত্তি মেরিয়াসেরও ছিল না।

বিপ্লবীদের দল থেকে নির্বাচিত পাঁচজন লোক মঁদেতুরের গলিপথ দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় তারা উপস্থিত সকলকে আলিঙ্গন করল। তাদের চোখে জল এসেছিল।

এঁজোলরাস এবার বন্দী জেভার্তের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু চাও তুমি?

জেভার্ত বলল, কখন তোমরা আমায় হত্যা করছ?

তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এখন আমাদের গুলি দরকার।

তাহলে আমাকে একটু পানীয় দাও।

জেভার্তের হাত-পা বাঁধা থাকায় এক গ্লাস জল এনে তার মুখের কাছে ধরল এঁজোলরাস।

জেভার্তের জল খাওয়া হয়ে গেলে সে বলল, আর কিছু চাও?

জেভার্ত বলল, আমার বড় অস্বস্তি হচ্ছে। আমার জন্য একটু শোবার ব্যবস্থা করে দাও। কোনও একটা টেবিল হলেই চলবে।

এঁজোলরাসের আদেশে একটা টেবিলে জেভার্তের শোয়ার ব্যবস্থা করে দিল কয়েকজন লোক। বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে টেবিলে শুইয়ে তার দেহটাকে টেবিলের সঙ্গে বেঁধে রাখল।

জেভার্ত শোয়ার পর দেখল দরজার সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছে তাকে। লোকটি এগিয়ে এলে সে তাকে চিনতে পারল। দেখল জাঁ ভলজাঁ।

ভলজাঁ শান্ত কণ্ঠে বলল, তাহলে আমরা দু'জনেই এখানে এসে পড়েছি?

৭

তখন ভোর হয়ে এসেছে। তবু কেউ তখনো জাগেনি। আশপাশের বাড়িগুলোর কোনও জানালা কেউ তখনো খোলেনি। লা শাঁভ্রেরি আর রু্য ডেনিস থেকে সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পর রাস্তাটা একেবারে খালি হয়ে যায়। ভোরের আলোয় রাস্তাটা ফাঁকা দেখাচ্ছিল। কিছু দেখা না গেলেও কিছুদূরে পাথরের রাস্তার উপর লোহার চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ওরা বুঝল অস্ত্রবাহিনী আগে আসছে তাদের আক্রমণ করতে। শাঁভ্রেরি ও মঁদেতুরের ব্যারিকেড দুটোকে আগের থেকে আরও দুর্ভেদ্য করে তোলা হলো। যাওয়া-আসার পথগুলো বন্ধ করে দেওয়ায় ব্যারিকেডগুলো দুর্গম হয়ে উঠল। কমবেফারে বলল, এটা শুধু দুর্গম দুর্গ নয়, ইঁদুরের ফাঁদ হয়ে উঠল।

তিরিশটা পাথর দিয়ে হোটেলের মুখটা বন্ধ করে দিল বোসেত। অস্ত্রবাহিনীর চাকার শব্দ পেয়ে এঁজোলরাস সকলকে বন্দুক হাতে এক একটি জায়গায় দাঁড় করিয়ে বা বসিয়ে দিল। তাদের সকলকে মদ বিতরণ করল। বিপ্লবীরা অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হয়ে শত্রুসেনাদের চিন্তার মধ্যে সমস্ত প্রাণমনকে কেন্দ্রীভূত করল। এঁজোলরাস একটা দোনলা বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে রইল। গভীর হতাশা থেকে অনেক সময় জয়ের উদ্ভব হয়। সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে অনেক সময় মানুষ জাহাজডুবির হাত থেকে বাঁচে।

ওদের সকলের দৃষ্টি রাস্তার উপর নিবদ্ধ ছিল। সেন্ট লিউ-এর দিক থেকে অস্ত্রবাহিনীর ট্যাঙ্কগুলো এগিয়ে আসছিল। গাড়িগুলোর সঙ্গে লোহার শিকল বাঁধা থাকায় শিকলের শব্দ আসছিল।

অস্ত্রবাহিনীর গাড়িগুলো দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এঁজোলরাস গুলি করার হুকুম দিল। অস্ত্রবাহিনীর সেনাদের লক্ষ্য করে ওরা একসঙ্গে অনেকগুলো গুলি করল। সেনারা কাজ থামিয়ে দিলেও তাদের কেউ হতাহত হলো না গুলিতে। কুরফেরাক আর বোসেত বলল, 'খুব ভাল হয়েছে।' এই বলে তারা উৎসাহ দিতে লাগল সকলকে।

এঁজোলরাস তার লোকদের আবার গুলি ভরতে বলল। কামানের গোলার আঘাতে কিভাবে ব্যারিকেডটা টিকবে সেই কথা ভাবতে লাগল ওরা।

এমন সময় কোথা থেকে গাভ্রোশে এসে বলল, আমি ফিরে এসেছি।

সেনাবাহিনীর লোকেরা যখন ব্যারিকেডটাকে লক্ষ্য করে কামান থেকে গোলা বর্ষণ করল ঠিক তখনি গাভ্রোশে এসে হাজির হলো। সে গুলিতে ব্যারিকেডের সামনের দিকে ভাঙা বাস আর ঠেলাগাড়ির অংশগুলো এদিক-সেদিক হয়ে গেলেও তা কারো গায়ে লাগেনি। বিপ্লবীরা তা দেখে হাসতে লাগল।

৮

গাভ্রোশেকে ঘিরে সকলে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। কিন্তু সে কারো কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই মেরিয়াস তাকে সরিয়ে নিয়ে গে নির্জনে।

মেরিযাস তাকে কড়াভাবে বলল, তুমি আমার চিঠিটা দিয়েছ তো?

গাভ্রোশে মিথ্যা করে বলল, ম্যাদমযজেল তখন ঘুমোচ্ছিল। বাড়ির দারোয়ানের হাতে তাই চিঠিটা দিয়ে এসেছি।

মেরিয়াসের সন্দেহ হলো চিঠিটা হযত ভলর্জাঁর হাতে পড়েছে। সে তাই ভলর্জাঁকে দেখিয়ে গাভ্রোশেকে বলল, তুমি এঁকে চেন?

গাভ্রোশে বলল, না।

সে তাকে রাত্রিতে দেখায় ঠিক তাকে চিনতে পারল না।

মেরিয়াস ভাবল ভলর্জাঁ হযত প্রজাতন্ত্রী, তাই এই বিপ্লবীদের দলে এসে যোগদান করেছে।

গাভ্রোশে এবার তার বন্দুকটা চাইল। কুরফেরাক তার বন্দুকটা তার হাতে দিয়ে দিল। গাভ্রোশে বলল, চারদিক থেকে সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেলেছে। কোনও রাস্তা বাদ নেই।

কামানের গোলায় কোনও কাজ না হওয়ায় সেনাবাহিনী আর গুলি করেনি। তারা তখন পাথর দিয়ে রাস্তার উপর একটা পাঁচিল তৈরি করার কাজে ব্যস্ত ছিল। যে সব বিপ্লবীরা গাভ্রোশেকে দেখার জন্য আপন আপন জায়গা থেকে চলে এসেছিল, এঁজোলরাস তাদের ফিরে যাবার হুকুম দিল। কিন্তু তারা আপন আপন জায়গায় ফিরে যেতে না যেতে শত্রুসৈন্যরা আবার গুলি বর্ষণ করল। তাতে এ পক্ষের দু'জন লোক নিহত আর তিনজন আহত হলো। এঁজোলরাস বলল, এ ভুল যেন আমাদের আর না হয়।

ওরা দেখল সেনাবাহিনীর এক যুবক সার্জেন্ট তাদের লক্ষ্য করে তার বন্দুক তুলেছে। এদিকে এঁজোলরাসও তাকে লক্ষ্য করে তার বন্দুক তুলল। কমবেফারে বলল, দেখ দেখ, সার্জেন্টটা বয়সে যুবক, পঁচিশের বেশি বয়স হবে না। কি সুন্দর দেখতে। ওর হয়ত প্রেমিকা আছে, বাড়িতে বাবা-মা আছে।

এঁজোলরাস তাকে লক্ষ্য করে গুলি করতেই সে পড়ে গেল। তার পিঠ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সৈন্যরা তার মৃতদেহটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

এদিকে ব্যারিকেডের মধ্যে বিপ্লবীরা আলোচনা করতে লাগল, এভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে রাইফেলের গুলির সামনে ওরা বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। তাছাড়া দুর্ভেদ্য ব্যারিকেডটার মধ্যে একটা বড় ফুটো হয়েছে, সেটা বন্ধ করা দরকার।

এঁজোলরাস বলল, একটা মোটা তোষক এনে ওটা বন্ধ করে দাও।

কমবেফারে বলল, আর একটা তোষকও নেই। আহতরা সব তোষকে শুয়ে আছে।

ওরা সবাই দেখল পাশের একটা ছয়তলা বাড়ির একটা বড় খোলা জানালায় একটা মোটা তোষক পর্দার মতো করে বাইরের দিকে ঝোলানো রয়েছে। উপর দিকের দুটো কোণের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝোলানো ছিল সেটা।

ভলজাঁ এতক্ষণ ঘরের এক কোণে তার বন্দুকটা নিয়ে বসে ছিল চুপ করে। এতক্ষণ কোনও কাজে অংশগ্রহণ করেনি সে। ওদের সব কথা শোনার পর ভলজাঁ উঠে এসে ওদের বলল, আমাকে কেউ একটা দোনলা বন্দুক দিতে পার?

এঁজোলরাস তার বন্দুকটা ভলজাঁর হাতে দিয়ে দিল। ভলজাঁ দু'বার দুটো গুলি করে যে দড়ি দুটোতে তোষকটা ঝোলানো ছিল সেই দুটো কেটে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে ঝোলানো তোষকটা নিচেতে পড়ে গেল।

ওরা সবাই হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দন জানাল ভলজাঁকে। সবাই বলে উঠল, তোষক পাওয়া গেছে।

কমবেফারে বলল, পাওয়া তো গেছে, তোষকটা তুলে আনবে কে?

তোষকটা পড়ে ছিল দু'পক্ষের মাঝখানে খালি জায়গাটাতে। সে জায়গাটাতে এ ধার থেকে কেউ গেলেই ও ধারের সেনাবাহিনীর লোকেরা গুলি করতে পারে। সেনাবাহিনীর লোকেরা তখন তাদের সার্জেন্টের মৃত্যুর পর বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে গুলি করার জন্য উদ্যত হয়ে ছিল। ভলজাঁ তখন কাউকে কিছু না বলে ব্যারিকেডের

পাশ দিয়ে গুলিবর্ষণের ভয়কে তুচ্ছ করে তোষকটা পিঠের উপর তুলে নিয়ে এদিকে চলে এল। তোষকটা আনা হলে সেটা দিয়ে ব্যারিকেডের ফুটোটা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

এঁজোলরাস এবার ভলজাঁকে বলল, নাগরিক, আমাদের প্রজাতন্ত্র তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

বোসেত হাসতে হাসতে বলল, সামান্য একটা তোষক দিয়ে কামানের গোলাকে আটকানো হচ্ছে।

৯

লা শাঁভ্রেরির ঘাঁটিতে যখন এই সব কাণ্ড চলছিল ঠিক সেই সময় কসেত্তে জেগে ওঠে। প্যারিসে যে সব কাণ্ড চলছে তার কিছুই জানে না সে। গত রাতে সে যখন বিছানায় শুতে যায় তখন তুসাঁ তাকে বলেছিল, শহরে গোলমাল হচ্ছে। তারপর আর কিছু জানে না সে। গতরাতে তার ঘুম ভালই হয়েছে। শেষ রাতের দিকে মেরিয়াসকে স্বপ্নে দেখে সে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমটা ভেঙে যায় তার। দেখে সকাল হয়ে গেছে।

ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর কোনও দুঃখকে আমল দিল না কসেত্তে। ভলজাঁর মতো তার আত্মাও শক্ত হয়ে উঠেছে আঘাতে আঘাতে। এক নতুন আশায় সঞ্জীবিত হয়ে সে আত্মা সব দুঃখ-দুর্ভাগ্যের আঘাতকে প্রতিহত করতে শিখেছে যেন।

আজ তিন দিন হলো মেরিযাসকে দেখেনি সে। সে ভাবল এতক্ষণ সে নিশ্চয় সে চিঠি পেয়েছে এবং তাদের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সে নিশ্চয় আজ সন্ধের সময় এসে পড়বে। ঈশ্বরের বিধানে তিনটি দিন সে দেখতে পায়নি মেরিয়াসকে। মেরিয়াসকে ছাড়া জীবনে বেঁচে থাকা অসম্ভব তার পক্ষে। তবু সে এই তিনটি দিনের বিরহ ব্যথা সহ্য করেছে নীরবে। আজ সে ব্যথার অবসান ঘটবে আজ নিশ্চয় মেরিয়াস এসে তাকে সুসংবাদ দান করবে। যৌবনের দুর্মর প্রাণশক্তি এইভাবে ভাগ্যের সব নিষ্ঠুর পরিহাসকে ও বিপদের ভয়াবহতাকে হেলাভরে অস্বীকার করে এক কৃত্রিম সুখে মত্ত হয়ে থাকে।

মেরিয়াসের সঙ্গে তার যেদিন শেষ দেখা হয় সেদিন চুপ করে কি ভাবছিল এবং সে কেন তার কাছে এতদিন আসতে পারবে না তার কারণ হিসাবে সে তাকে কি বলেছিল তা সে মনে করতে পারল না। তার স্মৃতিব স্বল্পতার জন্য বিরক্তিবোধ করল কসেত্তে। মেরিয়াসের কথা ভুলে যাওয়ার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হলো তার।

বিছানা থেকে উঠে একই সঙ্গে তার ভুলের জন্য প্রার্থনা আর প্রসাধনের কাজ দুটো সারল। কোনও কুমারী মেয়ের শোবার ঘর হলো মুদ্রিত শতদলের কোরকাভ্যন্তরভাগের মতো যার মধ্যে বিরাজ করে ছায়াচ্ছন্ন শুভ্রতায় ভরা এক স্বতঃশুদ্ধ গোপনতা। সূর্যের উত্তাপে তার পাপড়িগুলি উজ্জীবিত না হওয়া পর্যন্ত সে অভ্যন্তরভাগ

কেউ দেখতে পায় না। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত লাবণ্য এক লজ্জার আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখে সে।

উদীয়মান সন্ধ্যাতারার মতো সদ্য নিদ্রোত্থিতা কোনও কুমারীর দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে হবে পুরুষকে। কুমারী মেয়ে হচ্ছে স্বপ্নের বস্তু, তাকে জাগ্রত অবস্থায় খোলা চোখে দেখতে নেই। কোনও পুরুষ যদি তার নির্লজ্জ দৃষ্টিশর দিয়ে তার অস্পৃশনীয় অবগুণ্ঠনটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তার দেহের লাবণ্যলতাকে বিদ্ধ করতে চায় তাহলে তা অধর্মাচরণের সামিল হবে। প্রাচ্যদেশীয় এক রূপকথায় বলে ঈশ্বর যখন প্রথম গোলাপ সৃষ্টি করেন তখন তা শুদ্ধ ছিল, কিন্তু তার উপর একদিন প্রথম পুরুষ আদমের দৃষ্টি পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তা লজ্জায় গোলাপী হয়ে ওঠে।

কসেত্তে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে পোশাক পরে ও চুল বেঁধে তার জানালাটা খুলল। কিন্তু বাড়ির পিছন দিকে উঁচু পাঁচিল থাকায় রাস্তার একটুখানি অংশ দেখতে পেল। উঁচু পাঁচিলের ওধারে ফোটা ফুলের বাগান থাকায তাতে রাস্তাটা ঢাকা পড়ে গেছে। সে ভাবল মেরিয়াস ঐ পথে এলে সে দেখতে পাবে না। তাই তার জীবনে আজ প্রথম ফুলগুলোকে সবচেয়ে কুৎসিত মনে হলো তার। তাই সে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আকাশের পানে তাকাল। মেরিয়াস হয়ত আকাশপথে নেমে আসবে তার কাছে—এই ধরনের অবান্তর কথা মনে হলো তার। কিছু না বুঝলেও বাতাসে যেন এক অজানা বিপদের আভাস পেল। এক আশাহত দুঃখে ও বেদনায় চোখে জল এল তার।

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে এক গ্রাম্য নীরবতা বিরাজ করছিল। বাড়িটার মধ্যে অনেক ঘর থাকলেও কোনও ঘরের দরজা-জানালা খোলা হয়নি। তুসাঁ তখনো ওঠেনি। এমন কি দারোয়ানের ঘরের দরজাও বন্ধ। কসেত্তে ভাবল তার বাবা হয়ত তার ঘরে ঘুমুচ্ছে তখনো। দূর থেকে কিসের ভারী শব্দ আসছিল। কিন্তু সে শব্দ কামানের গোলা না বন্দুকের গুলির শব্দ তা সে বুঝতে পারেনি। সে বুঝতে পারল না কেন সব বাড়ির লোকেরা জানালাগুলো একবার খুলেই আবার বন্ধ করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

কসেত্তের ঘরের জানালার নিচে কার্নিশে একটা পাখির বাসা ছিল। সে বাসাতে পক্ষীমাতা ডানা মেলে ধরে ছিল তার শাবকদের উপর। পিতা ঘুরে ঘুরে কোথা থেকে খাবার যোগাড় করে এনে দিচ্ছিল। এই পাখির বাসাটা কসেত্তের কুমারী মনের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করল। মেরিয়াসের কথাটা মনে পড়ে গেল তার। মা-বাবা ও সন্তানদের দ্বারা পরিপূর্ণ এক সুখী বাসার ছবি ভেসে উঠল তার মনের মধ্যে।

১০

আক্রমণকারী সেনাবাহিনী তখনো বন্দুক আর স্টেনগান থেকে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি হয়নি। শুধু হোটেলের দোতলার জানালাগুলো

ভেঙে গিয়েছিল। সেই সব জানালার ধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা সরে গিয়েছিল। বিপ্লবীদের ঘাঁটি বা ব্যারিকেড আক্রমণ করার এটাই হলো রীতি। আক্রমণকারীরা সমানে গুলি চালিয়ে বিপ্লবীদের কাছ থেকে গুলির প্রতিদান চায়, কারণ তারা জানে বিপ্লবের গুলির পরিমাণ কম। তারা যদি নির্বোধের মতো বেশি গুলি খরচ করে তাহলে তা ফুরিয়ে গেলে তারা পালাতে থাকে আর তখনই ঘাঁটি দখল করে আক্রমণকারী সেনাদল। এঁজোলরাস এই ফাঁদে ধরা দেয়নি। সে যখন-তখন গুলি চালিয়ে শত্রুপক্ষের গুলির প্রত্যুত্তর দেয়নি। যতবার সৈন্যরা গুলি ছুঁড়ছিল ততবার গাভ্রোশে তার জিবটা বার করে গালের উপর বুলিয়ে ভেংচাচ্ছিল। আর কুরফেরাক তাদের বিদ্রূপ করছিল।

যোদ্ধাদের মধ্যে কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। সেনাবাহিনীর লোকেরা যখন দেখল বিপ্লবীরা কোনও গুলির প্রত্যুত্তর না দিয়ে চুপ করে আছে তখন তাদের ঘাঁটিতে কি ঘটেছে, ভয়ঙ্কর কোনও প্রতি-আক্রমণের জন্য নীরবে গোপনে প্রস্তুত হচ্ছে কি না তা দেখার কৌতূহল হলো তাদের। এই দেখার জন্য সেনাদলের অফিসারেরা একজন সৈনিককে কাছাকাছি একটা বাড়ির পাইপ বেয়ে উপরে ওঠার হুকুম দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপ্লবীরা দেখল লোহার শিরস্ত্রাণপরা এক সৈনিক তাদের দিকে পিছন ফিরে একটা বাড়ির গায়ের পাইপ বেয়ে উপরে উঠছে।

তখন কোনও কথা না বলে তার বন্দুকটা দিয়ে একটা গুলি করল ভলর্জা। গুলিটা সৈনিকের শিরস্ত্রাণটায় লাগতেই সেটা নিচে পড়ে গেল।

তখন সেনাদলের এক অফিসার সেই পাইপটা বেয়ে উপরে উঠতে থাকলে ভলর্জা আবার গুলি করল। এবার তারও শিরস্ত্রাণটা সেইভাবে গুলি লেগে পড়ে গেল।

বোসেত ভলর্জাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি ওদের হত্যা না করে শিরস্ত্রাণ দুটো ফেলে দিলে কেন?

ভলর্জা তার কোনও উত্তর দিল না।

বোসেত কুরফেরাককে কথাটা বলতে কুরফেরাক বলল, দয়া করে ওদের মারেনি।

সেনাবাহিনীর অবিরাম গুলিবর্ষণ দেখে এঁজোলরাস বিরক্ত হয়ে বলল, ওরা বোকা, অকারণে ওরা আমাদের গুলি খরচ করাতে চাইছে।

এঁজোলরাস যেন জন্মবিপ্লবী নেতা। সে জানত বিদ্রোহী আর বিদ্রোহ দমনকারী সেনাবাহিনী এক নয়। এটা অসম যুদ্ধ। এ যেন একশো জনের বিরুদ্ধে একজনের যুদ্ধ। বিপ্লবীদের একটা গুলি খরচ হলে বা একটা যোদ্ধা মারা গেলে তা পূরণ করতে পারে না। তাদের লোক বা অস্ত্রশস্ত্র সীমিত। কিন্তু সরকারী সৈনাবাহিনীতে অনেক সৈন্য, তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানা আছে। তবে যদি সমগ্র দেশ বিপ্লবে ফেটে পড়ে, যদি প্রতিটি শহরের ইঁট-কাঠ-পাথর জেগে ওঠে তবেই সরকারী সেনাদলকে হারিয়ে তারা মাথা তুলে উঠে জয়লাভ করতে পারে।

১১

বিপ্লবীদের ব্যারিকেডের মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো জিনিস কাজ করে। সেখানে

আছে বীরত্ব, আছে যৌবন, আত্মসম্মান, উৎসাহ, আদর্শ, আত্মপ্রত্যয়, আর আছে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। এক একসময় তারা এক নতুন আশার উত্তাপে উজ্জ্বলতায় সজীব হয়ে উঠে পরক্ষণেই আবার হিমশীতল হতাশায় নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে যায়।

হঠাৎ এঁজোলরাস চিৎকার করে বলে উঠল, ঐ শোন, আমার মনে হচ্ছে সমগ্র প্যারিস শহর জেগে উঠেছে।

কথাটা ঠিক। ৬ই জুন ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টা দুই-এর জন্য শহরের লোকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। রু্য দু পঁয়তিয়ের ও রু্য দে গ্রেভিনিয়েরে দুটো ব্যারিকেড গড়ে ওঠে। পোর্তে সেন্ট মার্তিনে এক যুবক একা এক অশ্বারোহী দলের সেনাপতিকে সামনে থেকে গুলি করে হত্যা করে। পরে অবশ্য তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করা হয়। রু্য সন্ট ডেনিসে একজন নারী একটা ঘরের জানালা থেকে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর একজন লোককে গুলি করে। রু্য দ্য লা কসোনেরিতে চৌদ্দ বছরের একটি ছেলের পকেটে অনেক কার্তুজ পাওয়া যায়। রু্য বার্তিন নগরীতে জেনারেল কাভেগনাকের নেতৃত্বে এক সেনাদল আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। রু্য প্ল্যানশে মিব্রেতে সরকারী সেনাবাহিনীর উপর বাড়ির ছাদ থেকে যত সব লোহা ও কাঠের জিনিসপত্র ফেলা হয়।

এই সব কথা এঁজোলরাস না জানলেও কান খাড়া করে চারদিকে গোলমালের শব্দ পায়। সব ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণের দ্বারা বিদ্রোহীদের দমন করে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তেজিত জনতার সব বিদ্রোহ, সব বিক্ষোভের আগুন নিবে যায়। ক্ষণিকের জন্য যে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে সে বিদ্যুৎ থেকে বজ্রপাত হয় না।

সূর্য উঠল আকাশে। শাঁভ্রেরির ঘাঁটিতে বিপ্লবীদের একজন বলল, আমাদের দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে। আমাদের কি না খেয়ে মরতে হবে?

নীরবে ঘাড় নাড়ল এঁজোলরাস।

কুরফেরাক তখনো সেনাবাহিনীর লোকেরা গুলি বর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিদ্রূপ করে যাচ্ছিল সমানে। বোসেত একসময় এঁজোলরাসের অপরিসীম ধৈর্য দেখে বলল, আমি সত্যিই প্রশংসা করি এঁজোলরাসের। বিপদে কত শান্ত এবং ধীর, অথচ সে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। তার কোনও প্রেমিকা নেই। আমাদের প্রত্যেকের প্রেমিকা আছে। আমরা তাদের কাছ থেকে উৎসাহ পাই। একজন প্রেমিক বাঘ-সিংহের মতো হিংস্রভাবে যুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু সে নিজের মন থেকেই সব উৎসাহ-উদ্দীপনা পায় না। সে কখনো বরফের মতো ঠাণ্ডা, কখনো আগুনের মতো গরম।

এঁজোলরাস অন্যমনে একসময় বলে উঠল, 'প্যাত্রিয়া'। কথাটা সে অনুচ্চস্বরে বলায় কেউ শুনতে পেল না।

সেনাবাহিনী এবার দ্বিতীয় একটা কামান এনে গোলাবর্ষণের জন্য তৈরি হলো। এঁজোলরাস বিরক্ত হয়ে বলল, ওদের এই বাঁদরামি বন্ধ করতে হবে। ওদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়।

এতক্ষণ ধরে নীরব হয়ে থাকা ব্যারিকেড থেকে একঝাঁক গুলি বেরিয়ে গেল। তাতে সেনাবাহিনীর কয়েকজন গোলন্দাজ সামনে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

বোসেত বলে উঠল, চমৎকার। এ এক বিরাট সাফল্য।

এঁজোলরাস বলল, আর একবার এ সাফল্য লাভ করতে গেলেই আমাদের সব কার্তুজ ফুরিয়ে যাবে।

কথাগুলো মনে হয় গাভ্রোশের কানে গিয়েছিল।

কুরফেরাক হঠাৎ দেখল গাভ্রোশে হোটেল থেকে একটা ঝুড়ি বার করে গুঁড়ি মেরে রাস্তায় চলে গেল ব্যারিকেডের পাশ দিয়ে। যে সব নিহত সৈনিকের মৃতদেহগুলো রাস্তায় পড়েছিল সে তাদের থেকে কার্তুজের বাক্সগুলো বার করে ঝুড়িতে ভরতে লাগল। দু'পক্ষের গুলিবর্ষণের ফলে রাস্তায় তখনো চাপ চাপ ধোঁয়া ছিল। সেই ধোঁয়ায় তাকে দেখা যাচ্ছিল না।

কুরফেরাক চিৎকার করে বলল, কি করছিস গাভ্রোশে ?

আমি আমার ঝুড়ি ভর্তি করছি।

ওরা গুলি ছুঁড়ছে যে।

তাতে কি হয়েছে ?

চলে আয় তাড়াতাড়ি।

ঠিক সময়ে যাব।

কুয়াশায় এতক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়নি গাভ্রোশেকে। কুয়াশাটা পাতলা হয়ে যেতেই তাকে দেখতে পেয়ে ওধার থেকে সৈনিকরা গুলি করতে লাগল তাকে লক্ষ্য করে। প্রথম গুলিতে তার কার্তুজভরা ঝুড়িটা উল্টে গেল। গাভ্রোশে আবার কার্তুজগুলো কুড়িয়ে ভর্তি করে ফেলল তার ঝুড়িটা। গাভ্রোশে একটা গান ধরল নির্বিকারভাবে। পর পর আরও দুটো গুলিতে উল্টে গেল গাভ্রোশের ঝুড়িটা। গাভ্রোশে গান করতে করতে কুড়োতে লাগল। মাঝে মাঝে সৈনিকদের চোখের সামনে সে নাচতে লাগল। সৈনিকরাও হাসতে লাগল। এক একটা গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে এক একটা নতুন গান শুরু করল সে। চড়ুই পাখির মতো লাফাতে লাগল, চতুর্থ গুলিটা তার দেহের পাশ দিয়ে চলে গেল। একটুর জন্য বেঁচে গেল সে। ব্যারিকেডের সবাই ভয়ে কাঁপতে লাগল। গাভ্রোশে কিন্তু নির্বিকার। সামান্য একটা রাস্তার ছেলে মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল যেন। কিন্তু অবশেষে একটা গুলি তার গায়ে লাগতেই সে টলতে লাগল। তার গা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল, সে খাড়া হয়ে বসে রইল। তবু সে গান গাইতে লাগল। কিন্তু তার গান শেষ না হতেই আবার একটা গুলি তাকে ধরাশায়ী করে দিল। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এবার তার প্রাণপাখি বেরিয়ে গেল দেহ থেকে।

১২

লুক্সেমবুর্গ বাগানে তখন দুটি ছেলে হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিল। একজনের

বয়স সাত আর একজনের বয়স প্রায় পাঁচ। বৃষ্টিতে তাদের সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিল। বড় ছেলেটি ছোট ছেলেটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। ছোট ছেলেটি বলল, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

বড় ছেলেটি বাঁ হাত দিয়ে ছোট ছেলেটিকে ধরেছিল আর তার ডান হাতে একটা ছুরি ছিল। রাত্রিতে এ বাগানে সেনাবাহিনীর একটা দল ছাউনি করে ছিল। সকাল হতেই তারা তাদের কাজে চলে গেছে। বাগানে রাস্তার ভবঘুরে ছেলেদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। তবু তারা গতকাল সন্ধের সময় যখন বাগানের গেট বন্ধ করা হয় তখন দারোয়ানের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনওরকমে ঢুকে পড়েছে।

এই দুটি ছেলেকেই একদিন গাভ্রোশে রাত্রিতে তার বাসায় আশ্রয় দেয়। এরা দু'জনেই থেনার্দিয়েরের সন্তান যাদের তারা লা ম্যাগননের হাতে তুলে দেয়। লা ম্যাগনন বাড়িছাড়া হলে তারাও বৃন্তচ্যুত পাতার মতো ছিটকে পড়ে। নিরাশ্রয় হয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকে। একদিন যাদের পরনে ভাল পোশাক থাকত আজ তাদের পরনের সব পোশাক ছেঁড়া ও ময়লা হয়ে গিয়েছে। পুলিশ একবার ধরে তাদের পরিত্যক্ত সন্তান হিসাবে চিহ্নিত করে।

তখন গোলমালের সময় বলেই বাগানে সকলের অলক্ষ্যে ঢুকে রাত কাটাতে পায় তারা। কারণ বাগানের দারোয়ানদের চিন্তা বাইরের হাঙ্গামার দিকে থাকায় বাগানের ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে তাদের খেয়াল ছিল না।

গত রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিল। বসন্তের বৃষ্টি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। দিনের বেলায় বৃষ্টির পরক্ষণেই রোদ ওঠে। আকাশটা আরও নীল দেখায়, গাছপালা আরও সবুজ হয়ে ওঠে। উপরে ঝকঝকে নীল আকাশ আর নিচে সবুজ গাছপালা। বসন্তের প্রকৃতি উপরে-নিচে দু' রঙের জামা পরে। সেদিন ৬ই জুন তারিখে বেলা এগারোটার সময় লুক্সেমবুর্গ বাগানের সবুজ গাছপালাগুলো যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের সঙ্গে এক নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিল। বাদাম গাছে বুলবুল আর কাঠঠোকরা পাখি ডাকছিল। এক অমিত প্রাণচঞ্চলতার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য ঝরে পড়ছিল আলোছায়াভরা নগ্নসবুজ গাছপালার মধ্যে।

বাগানের ভিতর যে একটা পুকুর ছিল তাতে হাঁস চরে বেড়াচ্ছিল। ছেলে দুটি পুকুরের ধারে গিয়ে হাঁসের ঘরটায় বসল। মাঝে মাঝে লে হ্যালে থেকে গোলাগুলির শব্দ আসছিল। সেদিকে কোনও মনোযোগ দিল না ওরা।

এমন সময় মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক তার শিশুপুত্রকে নিয়ে বেড়াতে এল বাগানে। তারা পুকুরের ধারে একটা বেঞ্চের উপর বসল। ছেলেটির হাতে একটা মিষ্টি পাঁউরুটি ছিল। ছেলেটিকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল তার পেট ভর্তি ছিল, ক্ষিদে ছিল না মোটেই।

এবার ভদ্রলোকের হাঁসের ঘরে বসে থাকা ছেলে দুটির উপর নজর পড়ল। সেই সময় দূর থেকে গুলিবর্ষণের শব্দ এল। ছেলেটি তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, ও কিসের শব্দ ?

তার বাবা বলল, অরাজকতা চলছে চারদিকে। বাগানের মধ্যেও অরাজকতা ঢুকে পড়েছে।

ছেলেটি বলল, আমার ক্ষিদে নেই।

তার বাবা বলল, একটা কেক খেতে ক্ষিদের দরকার হয় না।

আমার এটা ভাল লাগছে না, এটা বাসি।

তাহলে ঐ হাঁসদের দিয়ে দাও।

ছেলেটি দিতে চাইছিল না। তার বাবা তখন বলল, উদার হও, না খেতে পারলে খাবার জিনিস জন্তু-জানোয়ারদের দিযে দিতে হয়।

অবশেষে পাঁউরুটিটা জলের উপর ফেলে দিল ছেলেটি। তার বাবা হাততালি দিযে হাঁসগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল।

এবার আরও জোর গুলি আর চেঁচামিচির শব্দ কানে এল ওদের। তার উপর আকাশে মেঘ করে এল।

ভদ্রলোক তার ছেলেকে বলল, মনে হচ্ছে সেনাবাহিনী তুলিযের আক্রমণ করেছে। এখান থেকে বেশি দূরে নয়। তার উপর মেঘ করেছে, বৃষ্টি হতে পারে। তাডাতাডি বাডি চল।

ওরা চলে যেতেই ছেলে দুটি হাঁসের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তাদের দৃষ্টি ছিল জলে উপব ভাসতে থাকা পাঁউরুটিটার উপর। হাঁসগুলো তখন পাঁউরুটিটার দিকে এগিযে যাচ্ছিল, কিন্তু ধরতে পারেনি তখনো। বড ছেলেটি তার ছডিটা দিয়ে হাঁসগুলোকে তাডিয়ে পাঁউরুটিটাকে তুলে নিযে এল জল থেকে। তারপর সেটাকে দু'ভাগ করে বড অংশটা তার ছোট ভাইকে দিল।

১৩

গাভ্রোশে মারা যাওযার সঙ্গে সঙ্গে মেরিযাস কমবেফারের সঙ্গে ব্যারিকেড থেকে ছুটে বাস্তায চলে গেল। মেবিযাস গাভ্রোশের মৃতদেহটাকে নিজের কাঁধের উপর তুলে নিল আব কমবেফারে কার্তুজভরা ঝুডিটা তুলে নিল। দু নে এক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এল তাদের ঘাঁটির মধ্যে। আসার সময় মেরিয়াসের মাথার খুলিতে অল্প একটু গুলি লাগায় রক্ত ঝরছিল তার মাথা থেকে। এই বি পদের ঝুঁকি নিয়ে সে যেন থেনার্দিযেদের প্রতি তার ঋণ শোধ কবছিল।

কুরফেরাক মেরিযাসের মাথাটা ব্যান্ডেজ করে দিল। কমবেফারে গাভ্রোশের মৃতদেহটাকে টেবিলের উপর মেবুফের মৃতদেহের পাশে রেখে দিল। তারপর কমবেফারে ঝুডি থেকে কার্তুজগুলো নিয়ে পনের রাউন্ড করে গুলি সকলকে ভাগ করে দিল। কিন্তু ভলজাঁকে তার ভাগ দিতে গেলে সে নিল না। সে এঁজোলরাসকে বলল, উনি আমাদের দলে এসে যোগ দিলেও বোধ হয় যুদ্ধ করতে চান না।

এঁজোলরাস বলল, তা হলেও দরকারের সময় সাহায্য করেন।

ব্যারিকেডের উপর ক্রমাগত গোলাগুলি বর্ষণ চলতে থাকলেও প্রতিরক্ষাকারী বিপ্লবীরা তাতে বিচলিত হলো না কিছুমাত্র। অবস্থা যতই সংকটজনক হয়ে উঠতে লাগল, সংকটটা যতই বিপদে পরিণত হয়ে উঠতে লাগল, বিপ্লবীদের মনোবল ততই

বেড়ে উঠতে লাগল, ততই তাদের বীরত্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। কুরফেরাক আহতদের ক্ষত জায়গাগুলোতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিল। বোসেত আর ফুলি গাভ্রোশের ঝুড়ি থেকে বারুদের পাউডার নিয়ে আরও কার্তুজ তৈরি করছিল। জাঁ ভলজাঁ তার পিছনের দিকের দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে নীরবে কি ভাবছিল। কয়েকজন বিপ্লবী একটা ড্রয়ারের মধ্যে কিছু রুটি পেয়ে গোগ্রাসে তাই খাচ্ছিল। কুগুর্দ থেকে আসা কয়েকজন যুবক গল্প করছিল নিজেদের মধ্যে।

গৃহযুদ্ধের সময় বিপ্লবীদের ঘাঁটিগুলোতে এই রকম অবস্থাই দেখা যায়। তার ভিতরটা যখন শান্ত থাকে, যখন অজানা ও অনিশ্চয়তার একটা কুয়াশা ঘিরে থাকে তখন সহসা এক প্রচণ্ড বিক্ষোভের আগুনে ফেটে পড়ে সেটা।

ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে বেলা দুটো বাজতেই চমকে উঠল লা শাঁভ্রেরির ঘাঁটির বিপ্লবীরা। এঁজোলরাস উঠে দাঁড়িয়ে হুকুম দিল, আরও পাথর এনে একতলার মেঝেটা ভরে দাও। তোমাদের অর্ধেক বন্দুক হাতে পাহারা দাও আব বাকি লোক পাথর বয়ে আন। এক মিনিট সময়ও নষ্ট করলে চলবে না।

ওদিকে রাস্তার ওপারে সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে কুড়ুল হাতে একদল লোক এল। ব্যারিকেড ভাঙার জন্য ওদের দরকার হবে।

এঁজোলরাসের আদেশ অবিলম্বে পালিত হলো। সেনাবাহিনী দুটো কামান ঠিক করে রেখেছে ব্যারিকেডটাকে উড়িয়ে দেবার জন্য। তারা এবার জোর আক্রমণ চালাতে চায়। এঁজোলরাস এবার মৃতদেহ-রাখা টেবিলটার তলা থেকে মদের বোতলগুলো বার করে সবাইকে ভাগ করে দিল।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আক্রমণের দেরি হচ্ছিল বলে এঁজোলরাস সব কিছু গুছিয়ে নেবার সময় পেল। সব ঠিক হয়ে গেলে এঁজোলরাস মেরিয়াসকে বলল, আমরা দু'জন নেতা। তুমি বাইরে থেকে সব কিছু লক্ষ্য রাখবে, হুকুম দেবে আর আমি ভিতর থেকে হুকুম দেব।

মেরিয়াস ব্যারিকেডের উপর একটা জায়গা তার পর্যবেক্ষণ স্থান হিসাবে বেছে নিল। এঁজোলরাস হোটেলের যে রান্নাঘরে আহতদের রাখা হযেছিল তার দরজাটা বাইরে থেকে পেরেক এঁটে বন্ধ করে দিল যাতে গোলাগুলির কোনও টুকরো তার মধ্যে ঢুকতে না পারে। ফুলি তার আদেশগুলো ঘর থেকে জোর দিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

এঁজোলরাস আবার আদেশ দিল, সিঁড়িগুলো ভেঙে দেবার জন্য কুড়ুল ঠিক করে রাখ হাতের কাছে, সৈনিকরা যাতে উপরতলায় সহজে উঠে যেতে না পারে।

সে আবার বলল, আমরা মোট কতজন আছি?

ছাব্বিশ জন।

কতগুলো বন্দুক আছে?

চৌত্রিশটা।

তাহলে আটটা বাড়তি আছে। ওগুলোতে গুলি ভরে হাতের কাছে রেখে দাও।

কুড়িজন বাইরে ব্যারিকেড রক্ষার কাজে থাকবে আর ছয়জন দোতলার ঘরে জানালার ফাঁক দিয়ে গুলিচালনার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

এইভাবে সবকিছু বুঝিয়ে দেবার পর এঁজোলরাস জেভার্তের দিকে মুখ ফেরাল। বলল, আমি তোমার কথা ভুলিনি। সব শেষে যে লোক এই ঘর ছেড়ে যাবে সে তোমাকে গুলি করবে। এই টেবিলে একটা পিস্তল রইল।

একজন বলল, এখনি ওকে হত্যা করা হোক না কেন।

এঁজোলরাস বলল, না। মঁদেতুরের ছোট ব্যারিকেডটার উপর নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হবে ওকে।

জেভার্ত নীরবে নির্বিকারভাবে শুনে গেল সব কিছু।

ভলজাঁ ছিল ব্যারিকেডে প্রতিরক্ষাকারীদের দলে। সে এঁজোলরাসের কাছে এগিয়ে এসে বলল, তুমিই এখানকার বিপ্লবীদের নেতা ?

হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ আগে তুমি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলে।

আমি ধন্যবাদ দিয়েছিলাম প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে। মেরিযাস আর তুমি দু'জনে ব্যারিকেড রক্ষা করেছিলে।

আমি কোনও পুরস্কারের যোগ্য বলে মনে করো ?

নিশ্চয়।

তাহলে আমি একটা পুরস্কার চাই।

কি সে পুরস্কার ?

জেভার্তের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আমি এই লোকটার মাথাটা গুলি করে উড়িয়ে দিতে চাই।

জেভার্ত ভলজাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, খুব ভাল কথা।

এঁজোলরাস তার দোনলা বন্দুকটায় গুলি ভরছিল। সে বলল, এ বিষয়ে কারো আপত্তি আছে ?

কেউ কোনও কথা বলল না। এঁজোলরাস তখন ভলজাঁকে বলল, ঠিক আছে, এই গুপ্তচরটা তাহলে তোমার হাতেই পড়ল।

ভলজাঁ জেভার্তের পাশে টেবিলের একধারে বসে পিস্তলটা হাতে নিল। ঠিক সেই মুহূর্তে মেরিয়াস বাইরে থেকে চিৎকার করে উঠল, প্রস্তুত হও।

এঁজোলরাস উপর থেকে হুকুম দিল, ব্যারিকেডের লোকরা সবাই বাইরে চলে যাও।

জেভার্ত ভলজাঁকে বলল, তোমাদের অবস্থা আমার থেকে একটুও ভাল নয়।

সকলেই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও ভলজাঁ বেরিয়ে গেল না। সে জেভার্তের কাছেই বসে রইল। যে দড়িটা দিয়ে জেভার্ত টেবিলের সঙ্গে বাঁধা ছিল সেটা খুলে দিয়ে তাকে উঠে দাঁড়াতে বলল ভলজাঁ। জেভার্ত একটুখানি ক্ষীণ হাসি হেসে উঠে

দাঁড়াল। ভলজাঁ এবার তার কোটের কোমরে যে বেল্ট ছিল তা ধরে তাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে মঁদেতুরের ছোট ব্যারিকেডটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, একমাত্র মেরিয়াস ছাড়া কেউ দেখতে পেল না তাদের। কারণ সকলেই তখন পিছন ফিরে ব্যারিকেড রক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিল।

ব্যারিকেডটার উপর উঠে ভলজাঁরা দেখল অদূরে কতকগুলো মৃতদেহ স্তূপাকার করা আছে। তার মধ্যে এপোনিনের মৃতদেহটাও ছিল। সেটা দেখে জেভার্ত বলল, মনে হচ্ছে আমি চিনি মেয়েটিকে।

ভলজাঁ তখন বলল, তুমি আমাকেও চেন।

জেভার্ত বলল, প্রতিশোধ নাও।

ভলজাঁ পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে সেটা খুলল।

জেভার্ত বলল, ছুরি দিয়ে মারবে? ভাল। সেটাই তোমার পক্ষে সহজ হবে।

জেভার্তের ঘাড়ে আলগাভাবে যে ফাঁসের দড়িটা পরানো ছিল সেটা তার ছুরি দিয়ে কেটে দিল। তারপর বলল, এবার তুমি চলে যাও।

জেভার্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। তার প্রভূত আত্মসংযম সত্ত্বেও সে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারল না। সে ভলজাঁর মুখপানে হাঁ করে তাকিয়ে রইল

ভলজাঁ বলল, এখান থেকে আমি জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারব না। তবে যদি পারি তো দেখা হবে। আমার ঠিকানাটা জেনে রাখ। আমি ফশেলেভেন্ত নাম ধারণ করে ৭ রু্য দ্য হোমি আর্মেতে থাকি।

জেভার্তের ঠোঁটের কোণটা একটু কুঁচকে উঠল। ভলজাঁ বলল, দেরি করো না, চলে যাও।

ভাবতে ভাবতে বাজারের পথে এগিয়ে চলল জেভার্ত। ভলজাঁ সেই দিকে তাকিয়ে রইল। যেতে যেতে হঠাৎ পিছন ফিরে বলল, আমার কেমন অস্বস্তি লাগছে। আমি চাই তুমি আমাকে হত্যা করো।

ভলজাঁ বলল, চলে যাও শিগগির।

জেভার্ত তার দৃষ্টিপথের সীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলে পিস্তল থেকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করল ভলজাঁ। জায়গাটা একটা বাড়ির আড়ালে ছিল বলে বিপ্লবীরা দেখতে পেল না। গুলি করার পর ভলজাঁ ফিরে এসে বলল, সব শেষ।

ব্যারিকেড রক্ষার ব্যাপারে মেরিযাসের মনটা ব্যস্ত এবং চঞ্চল থাকলেও গুলির শব্দে তার হুঁশ হলো। হঠাৎ তার মনে হলো যে লোকটাকে ভলজাঁ একটু আগে মারল গুলি করে সেইটি হয়ত সেই পুলিশ ইনসপেক্টার জেভার্ত যে একদিন তাকে দুটো পিস্তল দিয়েছিল। সে এঁজোলরাসকে জিজ্ঞাসা করতে এঁজোলরাসও বলল, ওরই নাম জেভার্ত।

কিছুটা আগে একথা জানলে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করত মেরিয়াস। কিন্তু এখন আর সময় নেই। ভলজাঁ এসে বলেছে, সব শেষ হয়েছে।

১৪

একই সঙ্গে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, দু'পাশে সারবন্দী বাড়িগুলোর ভয়ঙ্কর নীরবতা, রাস্তার উপর পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর আনাগোনা, গোলাগুলির মুহুর্মুহু শব্দ, চারদিকে উড্ডীয়মান ধোঁয়ার কুণ্ডলি—সব মিলিয়ে সেদিনের সেই সময়টাকে এক চরম মুহূর্তে পরিণত করে তুলেছিল।

গতকাল সন্ধ্যা থেকে রাস্তার দু'পাশের বড় বড় সারবন্দী বাড়িগুলোর দরজা-জানালা সব সময় বন্ধ থাকায় সেগুলো দুর্গের মতো দেখাচ্ছিল।

সেকালে দু' ধরনের বিপ্লব দেখা যেত। রাষ্ট্রপতি খুব বাড়াবাড়ি করছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ প্রতিকারের অতীত দেখে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে বিপ্লবে যোগদান করত, যে বিপ্লবে সব শ্রেণীর লোকদের সমর্থন থাকত, যে বিপ্লবকালে প্রতিটি বড় বাড়ি স্বেচ্ছায় এক একটি দুর্গে পরিণত হত সে বিপ্লব অবশ্যই সফল হত। কিন্তু যে বিপ্লব শুধু বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত, যাতে দেশের বেশির ভাগ লোকের সমর্থন থাকত না সে বিপ্লবের জয়লাভের কোনও আশা থাকত না, সে বিপ্লবকালে শহরের সব পথঘাটগুলোকে জনহীন মরুভূমি বলে মনে হতো, তখন রাস্তায় শুধু সেনাবাহিনী টহল দিয়ে বেড়াত আর দু'পাশের বাড়িগুলো থাকায় বিপ্লবীদের পালাবার কোনও পথ থাকত না।

জনগণের এগিয়ে চলার এক বিশেষ গতিমাত্রা আছে। তারা যে গতিতে চলতে চায় তার থেকে বেশি দ্রুত গতিতে তাদের চালাতে চেষ্টা করা বৃথা। কোনও দেশের সব মানুষকে, একটা গোটা জাতিকে কখনো জোর করে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। বিপ্লবীরা তা চাইলে জনগণ তাদের পরিত্যাগ করে, তাদের মহামারীর মতো এড়িয়ে চলে। রুদ্ধদ্বার বাড়িগুলো এক ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্যে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা বাড়িও দরজা খুলে একজন বিপ্লবীকেও আশ্রয় দিয়ে বাঁচায় না। যে ভয়ের অজুহাতে বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ রাখে বেশির ভাগ লোক তারা কিন্তু সে ভয়কে প্রচণ্ড ক্রোধে পরিণত করে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? কেউ দায়ী নয়, আবার সবাই দায়ী। অনেক সময় অপরিণত অবাস্তব কোনও ভাবাদর্শ বিপ্লবের রূপ ধারণ করে, যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদের পরিবর্তে অনেকে অস্ত্র ধারণ করে, মিনার্ভাকে প্যালাসে পরিণত করে। যে জনগণের উন্নতির জন্য বিপ্লবীরা এত কিছু করে সেই জনগণই তাদের প্রতি উদাসীন ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে কেন তা কেউ জানে না।

প্রগতি হলো সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতি। এই প্রগতি যে সব সময় শান্তিপূর্ণ হবেই এমন কোনও কথা নেই। নদীর পথ যেমন সব সময় সহজ-সরল ও মসৃণ হয় না, অনেক সময় তাকে পাহাড় ভেঙে পাথরের বাধা ঠেলে চলতে হয় তেমনি মানবজাতির অগ্রগতির পথেও অনেক সময় আসে অনেক বাধাবিপত্তি। এই সব বাধাবিপত্তি দূর করার নামই হলো বিপ্লব বা অন্তর্যুদ্ধ। যতদিন পর্যন্ত না বিশ্বশান্তি

ও মানবজাতির মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে ততদিন মানবজাতির অগ্রগতির বিরাম হবে না আর বিপ্লবেরও শেষ হবে না।

এই প্রগতির জন্যই এক একটি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু বীর প্রগতির পায়ে প্রাণবলি দেয়। আসলে ১৮৪৮ সালের এই জুন বিপ্লবে ফ্রান্সের বিপ্লবীরা রাজা লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। আসলে রাজার বিরুদ্ধে তাদের বিশেষ কোনও অভিযোগ ছিল না। রাজা লুই ফিলিপ যে মানুষ হিসাবে ভাল একথা তারা মুখে স্বীকার করত। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্স থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ। তাদের বিশ্বাস ছিল ফ্রান্স থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হলেই সারা পৃথিবী থেকে স্বৈরাচারী শক্তির অবসান ঘটবে।

ফ্রান্সের জনগণের মনের একটা নিজস্ব ঐশ্বর্য আছে। সে ঐশ্বর্য হলো এই যে তারা পেটে খাওয়াটাকেই বড় করে দেখে না। তারা এক পরম শিল্পীর মতো শুধু সমগ্র ইউরোপের নয়, সমগ্র মানবসভ্যতাকে এক আদর্শ রূপ দান করতে চায়। ইউরোপীয় সভ্যতার যে মশাল একদিন গ্রীস জ্বালে, যে মশাল পরে গ্রীস ইতালিকে দেয়, সেই মশালই ইতালি আবার ফ্রান্সের হাতে তুলে দেয়। ফ্রান্স একাধারে গ্রীস আর রোমের দুটো শ্রেষ্ঠ গুণ লাভ করতে চায়। সে এথেন্সের সৌন্দর্য আর রোমের শক্তি ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে চায়। তাছাড়া সে উদার। সে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য বারবার বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে। সে রাত্রিতে সবার শেষে ঘুমোয় এবং সকালে সবার আগে জাগে। ফ্রান্স একাধারে কবি এবং বিজ্ঞানী হতেও চায়। সে কবির মহান কল্পনাকে বিজ্ঞানের সাহায্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এক একটি সামাজিক আদর্শ ও সৌন্দর্যকে রূপায়িত করে তুলতে চায়। মানবসভ্যতার আদর্শ রূপকার হিসাবে ফ্রান্সের জনগণ একাধিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মিথ্যা থেকে সত্য, অন্ধকার থেকে আলো, অন্যায় থেকে ন্যায়ে, নরক থেকে স্বর্গে, অন্ধ ক্ষুধা থেকে মুক্তি আর নীতির রাজ্যে নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে চায় তারা। তাদের এই যাত্রাপথের প্রথম স্তরে বস্তুর প্রাধান্য থাকলেও শেষ স্তরে তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো আত্মা।

জনগণ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রগতিকে রূপায়িত করে তোলার জন্য অনেক সময় এক অলীক অপরীক্ষিত আদর্শকে আঁকড়ে ধরে। বিপ্লবীরা ব্যর্থ হলে আমরা তাদের অভিযুক্ত করি। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাতে অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে মানুষের দুঃখকষ্টকে বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে আমরা তিরস্কার করি তাদের।

তার উত্তরে তারা বলে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে যে কোনও সমস্যার প্রতিকার ভাল একথা জেনেও "আমরা সমাজের মঙ্গলের জন্যই এই সব করি। সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এক মহান আদর্শের খাতিরেই আমরা আত্মত্যাগ করি।

১৫

সহসা জয়ঢাক বেজে উঠল।

ঝড়ের বেগে শুরু হলো আক্রমণ। রাত্রিকালে যে আক্রমণ চলেছিল চুপিসারে গোপনে, এখন উজ্জ্বল দিবালোকে সে আক্রমণ শুরু হলো প্রকাশ্যে। প্রথমে ব্যারিকেডটাকে লক্ষ্য করে কামান দাগা হতে লাগল। আর সেই সঙ্গে পদাতিক বাহিনী সরাসরি এগিয়ে যেতে লাগল ঘাঁটি আক্রমণের জন্য। বিপ্লবীরাও জোর গুলি চালাতে লাগল। সেনাবাহিনীর সঙ্গে এবার জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অনেক লোকও ছিল। উভয় পক্ষেই বীরত্ব হয়ে উঠল এক হিংস্র বর্বরতা।

এঁজোলরাস ছিল ব্যারিকেডের একপ্রান্তে আর মেরিয়াস ছিল ব্যারিকেডের বাইরের দিকের আর এক প্রান্তে। তার মাথাটা খালি ছিল। তার দেহের নিচের অংশ অর্থাৎ কোমর পর্যন্ত ব্যারিকেডের আড়ালে থাকলেও উপরের অংশটা দেখা যাচ্ছিল।

কুরফেরাকের মাথাটা খালি দেখে বোসেত বলল, তোমার টুপি কোথায়?

কুরফেরাক বলল, একটা গুলি এসে আমার টুপিটা খুলে নিয়ে গেছে।

আক্রমণ চলল অব্যাহত গতিতে। ব্যারিকেড নয়, যেন অবরুদ্ধ এক ট্রয়নগরী। কয়েকজন ক্লান্ত, অবসন্ন ও অভুক্ত বিপ্লবী যারা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে খায়নি বা ঘুমোয়নি তারা এক বিরাট ও দুর্ধর্ষ সেনাদলের সঙ্গে লড়াই করে যেতে লাগল সমানে। আক্রমণের চাপ এবং প্রবলতা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়ে আসতে লাগল।

বিপ্লবীদের ক্রমে গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় তারা সৈনিকদের সঙ্গে ছোরা, তরবারি আর বেয়নেট দিয়ে হাতাহাতি জনে জনে যুদ্ধ করতে লাগল। সে যুদ্ধে বোসেত, জলি, ফুলি, কুরফেরাক মারা গেল। কমবেফারেও বেয়নেটের তিনটে খোঁচায় মারা গেল। নেতাদের মধ্যে বেঁচে রইল শুধু মেরিয়াস আর এঁজোলরাস।

আঘাতে আঘাতে মেরিয়াসের মাথা আর মুখটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছিল। তার মাথা ও মুখ থেকে রক্ত ঝরছিল ক্রমাগত। একমাত্র এঁজোলরাসের সারা দেহের মধ্যে কোনও আঘাত লাগেনি বা কোনও ক্ষত দেখা যায়নি। তার এক হাতে ছিল একটা তরবারি, আর অন্য হাতে ছিল গুলিহীন দোনলা এক বন্দুক।

মেরিয়াস আর এঁজোলরাস ছাড়া আর মাত্র সাত-আটজন বিপ্লবী জীবিত ছিল। এবার তারা সবাই পিছু হটতে লাগল। এতক্ষণ ধরে প্রাণের আশা ত্যাগ করে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করার পর যখন তারা দেখল তাদের ঘাঁটি রক্ষার আর কোনও উপায় নেই, যখন মৃত্যু এবার অবধারিত তখন আত্মত্যাগের প্রবণতার জায়গায় আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠল।

অবশিষ্ট বিপ্লবীদের নিয়ে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল এঁজোলরাস। তারা ডবল খিল এঁটে সিঁড়িগুলো ভেঙে উপরতলায় উঠে গেল। ক্রমাগত গোলাগুলির আঘাতে হোটেলের উপরতলার দেওয়ালগুলো ও ছাদের কয়েক জায়গা ধসে যায়। প্রচুর ক্ষতি হয় বাড়িটার।

কিন্তু আহত মেরিয়াস বাইরে পড়ে ছিল। আর একজন বাইরে ছিল। সে হলো জাঁ ভলজাঁ।

একটা গুলি লেগে কাঁধের হাড় বেরিয়ে যায় মেরিয়াসের। সে পড়ে যায়। সে

চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল। তার মনে হলো কে একজন ধরেছে তাকে। কসেত্তের কথা মনে পড়ল তার। সে অস্ফুটস্বরে বলল, আমি বন্দী হলাম। আমাকে ওরা গুলি করে মারবে।

হোটেলের দোতলায় আশ্রয় নেওয়া লোকদের মধ্যে মেরিয়াসকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হলো এঁজোলরাস। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নেই। দরজায় খিল দেওয়া হয়ে গেছে। সেই রুদ্ধ দরজার উপর সৈনিকরা জোর ধাক্কা দিচ্ছে ঘরে ঢোকার জন্য। এঁজোলরাস বলল, 'আমরা মরব, কিন্তু আমাদের জীবন উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনতে হবে ওদের।' এই কথা বলে সে মেবুফের ঝুলতে থাকা হাতটা চুম্বন করল।

'বজা ভেঙে ঘরে ঢুকে সৈনিকরা দেখল নিচেরকার ঘরে টেবিলের উপর একটা চাদর ঢাকা দুটো মৃতদেহ রয়েছে আর কয়েকজন আহত লোক আর্তনাদ করছে। অবশিষ্ট জীবিত বিপ্লবীরা উপরতলায় আশ্রয় নিয়েছে। এঁজোলরাসের আদেশ পেয়ে বিপ্লবীরা একসঙ্গে গুলি ছুঁড়ল অনেকগুলো। এই ছিল তাদের শেষ গুলি। আর কোনও কার্তুজ নেই তাদের। এরপর মদের খালি বোতলগুলো উপর থেকে ছুঁড়তে লাগল তারা। উপরে ওঠার সময় তারা ঘোরানো সিঁড়িটা ভেঙে দিয়ে যাওযার জন্য সৈনিকরা উঠতে পারছিল না।

কুড়িজন আক্রমণকারী সৈনিক সিঁড়ির যে অবশিষ্ট অংশটা ঝুলছিল সেটা দিয়ে ও দেওয়াল বেয়ে কোনওরকমে উপরতলায উঠে দেখল একমাত্র এঁজোলরাস ঘরেব এক কোণে একটা বিলিয়ার্ড টেবিলের ওধারে দাঁড়িযে আছে। বাকি সবাই মারা গেছে। তার গুলিহীন বন্দুকের বাঁট দিয়ে সৈনিকদের মাথায মারতে মারতে সেটা ভেঙে যায়। সেই বাঁটভাঙা বন্দুক ছাড়া আর কোনও অস্ত্র ছিল না তার হাতে।

একজন সৈনিক তাদের অফিসারকে বলল, ঐ হচ্ছে নেতা। ও আমাদের অস্ত্রবাহিনীর লোকদের মেরেছে।

ওকে আমরা এখনি এখানে গুলি করে মারতে পারি।

এঁজোলরাস এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাঙা বন্দুকটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার বুকটা এগিয়ে দিয়ে বলল, গুলি করো।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ধরনের সাহসিকতার উচ্ছ্বাস দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল সৈনিকরা। এঁজোলরাস যখন তার হাত দুটো জড়ো করে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলো তখন সৈনিকদের সব গোলমাল স্তব্ধ হয়ে গেল।

ফোটা ফুলের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল এঁজোলরাসের মুখখানাকে। এত ক্লান্তি, এত কষ্ট ও সংগ্রাম সত্ত্বেও সে মুখসৌন্দর্য বিকৃত হয়নি এতটুকু। তার লম্বা কালো চুলগুলো ছড়িয়ে ছিল মাথার চারদিকে। এক উদ্ধত গর্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছিল যেন সে মুখের সৌন্দর্যকে।

একজন সৈনিক তাকে গুলি করার জন্য তার বন্দুক তুলে বলল, আমার মনে হচ্ছে যেন একটা ফোটা ফুলকে গুলি করছি আমি।

একজন সার্জেন্ট বলল, গুলি করো।

কিন্তু তাদের অফিসার বলল, থাম।

অফিসার এঁজোলরাসকে বলল, তোমার চোখের ক্ষতটা ব্যান্ডেজ করে দেব ?

না।

আচ্ছা তুমিই কি আমাদের অস্ত্রবাহিনীর সার্জেন্টকে গুলি করে হত্যা করো ?

হ্যাঁ।

এমন সময় গ্রান্তেয়ারের ঘুম ভাঙল। যে ঘুম এত চিৎকার, এত গোলাগুলির শব্দ ও এত যুদ্ধতেও ভাঙেনি সে ঘুম সব গোলমাল নিঃশেষে থেমে যাবার পর ভেঙে গেল। ঘুম থেকে উঠে গ্রান্তেয়ারের মনে হলো সে যেন স্বপ্ন দেখছে। চারদিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারল না সে। অবশেষে সব কিছু দেখে এবং এঁজোলরাস ও সৈনিকদের পানে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চিৎকার করে ধ্বনি দিতে লাগল, প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক। আমি প্রজাতন্ত্রেরই একজন।

গ্রান্তেয়ার এবার উঠে দাঁড়াল। যে যুদ্ধে সে একবারও যোগদান করেনি, যার কথা সে একবারও ভাবেনি, সে যুদ্ধের আগুন তার মাতাল চোখের মধ্যে হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন। সে ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে দর্পিত পদক্ষেপে হেঁটে গিয়ে এঁজোলরাসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বন্দুকধারী সৈনিকদের লক্ষ্য করে বলল, এক ঢিলে দুটো পাখিই মারতে পার তোমরা।

এই বলে সে হাসিমুখে এঁজোলরাসের পানে তাকিয়ে বলল, কিছু মনে করো না।

এঁজোলরাস হাসিমুখে তার একটা হাত ধরল।

কিন্তু তাদের দু'জনের মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে না যেতেই একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জন করে উঠল। এঁজোলরাসের গাটাকে আটটা গুলি বিদ্ধ করে দেওয়ালের সঙ্গে তার দেহটাকে সেঁটে দিল। গ্রান্তেয়ার মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

সৈনিকরা তখন বিপ্লবীদের মৃতদেহগুলো জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। তাদের মধ্যে কিছু আহত আর্তনাদ করছিল।

১৬

মেরিয়াস তখন সত্যিই বন্দী হয়েছিল। তবে শত্রুসেনাদের হাতে নয়, জাঁ ভলজাঁর হাতে।

কাঁধে গুলি লাগার পর সে যখন পড়ে যাচ্ছিল তখন ভলজাঁর হাতই তাকে ধরে ফেলে। ভলজাঁ এতক্ষণ যুদ্ধে একবারও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি। একটা শত্রুসৈনিককেও গুলি করে মারেনি সে। সে শুধু সর্বক্ষণ আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করেছে, তাদের ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে।

সে যখন দেখে মেরিয়াস পড়ে যাচ্ছে, তখন সে ছুটে গিয়ে শিকার ধরার মতো ধরে ফেলে তাকে। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল সে যেন মেরিয়াসের দিকে তাকাচ্ছে না একবারও। কিন্তু আগে সে সর্বক্ষণ লক্ষ্য করছিল মেরিয়াসকে তার সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

কুড়িজন আক্রমণকারী সৈনিক যখন হোটেলে ঢোকার জন্য দরজায় ঘা দিচ্ছিল এবং দরজায় লাথি মেরে দরজা ভাঙার চেষ্টায় দারুণভাবে ব্যস্ত ছিল, ভলজাঁ তখন আহত মেরিয়াসকে কাঁধের উপর চাপিয়ে নিয়ে হোটেলটার পিছন দিকের দেওয়ালের আড়ালে চলে যায়। সৈনিকরা তখন পিছন ফিরে একবারও তাকায়নি বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল তার পক্ষে।

ভলজাঁ আহত অচেতন মেরিয়াসকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটির উপর রাখল। কিন্তু বুঝল বেশিক্ষণ সেখানে তাদের থাকা চলবে না। সৈনিকরা এখন হোটেলের ভিতর দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েছে। ভিতরে তুমুল লড়াই-এর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরা বেরিয়ে এসে এদিকে চলে এলেই তাদের দু'জনেরই প্রাণ যাবে।

কিন্তু কোন দিকে কোথায় যাবে ভলজাঁ? এখন সব পথেই সেনাবাহিনী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পথের মোড়ে সেনাদল ঘাঁটি করে আছে। হোটেলের উল্টো দিকে বড় বাড়িটার পানে একবার তাকাল সে। দেখল বাড়িটার দরজা-জানালা সব বন্ধ। মনে হলো সেটা যেন সমাধিস্তম্ভ, ভিতরে কোনও জীবিত মানুষ নেই। বিপ্লবীরা পরাজয়ের পর হোটেলের ভিতর আশ্রয় নেবার আগে বারবার এ বাড়ির দরজায় ঘা দেয়। কিন্তু সে বাড়ির দরজা খোলেনি কেউ। সে বাড়িতে একবার আশ্রয় পেলে তারা প্রাণে বেঁচে যেত। বাড়ির পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে যেতে পারত তারা।

এমন সময় মাটির দিকে তাকাতেই—একটা জিনিস নজরে পড়ল তার। সে দেখল কতকগুলো পাথরখণ্ডের মাঝখানে লোহার রডওয়ালা দু' ফুট চওড়া একটা ঢাকনা রয়েছে। ঢাকনার তলায় একটা সুড়ঙ্গপথ আছে। ঢাকনা তুলে ফেললে একটা লোক তার মধ্যে ঢুকতে পারবে। ভলজাঁ ক্ষিপ্র হাতে ঢাকনাটা সরিয়ে মেরিয়াসকে কাঁধে নিয়ে তার মধ্যে নেমে পড়ল। দেখল তলায় টালিপাতা একটা মেঝে রয়েছে। ভিতরে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথটা লম্বা এবং এঁকেবেঁকে কোথায় চলে গেছে। ভলজাঁর মনে পড়ল অতীতে সে একদিন এমনি করে কসেত্তেকে নিয়ে রাস্তা থেকে পাঁচিল ডিঙিয়ে কনভেন্টের বাগানের মধ্যে পড়ে। সে তখনো বাইরে থেকে আসা সৈনিকদের হোটেল দখল করার চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল। ভলজাঁ নালার ভিতরে নেমেই ঢাকনাটা আবার চাপিয়ে দিয়েছিল তার মুখের উপর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

গোটা প্যারিস শহরের প্রতিটি রাস্তার তলা দিয়ে দশ শতাব্দী ধরে অসংখ্য ময়লাবাহী নালার জাল বিস্তার করা হয়। নেপোলিয়ন, অষ্টাদশ লুই, দশম চার্লস, লুই ফিলিপ, প্রজাতন্ত্রী সরকার সব মিলিয়ে মাটির তলায় যত নালা তৈরি করে তার দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় মোট তেইশ হাজার মিটার। ১৮২৬ সাল থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা ড্রেন বা নালার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয়। তখন সারা প্যারিস শহরে দু' হাজার দুশো বড় রাস্তা ছিল, আর সেই সব রাস্তার তলায় ঐ সংখ্যক জল ও ময়লানিকাশী ড্রেন ছিল।

ভলর্জার মনে হলো সে আছে লে হ্যালে অঞ্চলের রাস্তার তলায়। দু'দিকে সিমেন্টের পাকা দেওয়াল, হাত বাড়িয়ে ধরা যায়। রাস্তাটা সরু আর অন্ধকার, নিচে টালিপাতা মেঝেয় অল্প একটু জল আছে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সে দেখল বাঁ ও ডান দিকে দুটো ঐ ধরনেব নালা চলে গেছে। এই নালাটা শেষ হয়েছে সেখানে। দুটোর একটা পথ তাকে বেছে নিতে হবে। সে ভাবল সে যদি জাঁর দিকে যায় তাহলে মিনিট পনেরর মধ্যেই পঁত শেঞ্জ ও পঁত নুফে অঞ্চলে সেন নদীর ধারে গিয়ে পড়বে। স্পষ্ট দিবালোকে জনবহুল শহরের সকলের সামনে গিযে পড়বে সে এবং তার গ্রেপ্তার অনিবার্য। তার থেকে এই নিরাপদ অন্ধকার গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ানো ভাল। সে তাই ডান দিকে ঘুরল। মেরিযাসের হাত দুটো তার সামনে আর তার পা দুটো তার পিছনে ঝুলছিল। তার গলাটা ভলর্জার গালের সঙ্গে লেগে ছিল। তার মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ভলর্জা।

দু'দিকের দেওয়ালে হাত দিয়ে সে দেখল এখানে পথটা সরু। পাযের তলার জলের স্রোতটা যাচ্ছে নিচের দিকে। এ পথ কোথায় তাকে নিযে যাবে তা সে জানে না। ভয হতে লাগল তার। ভাবল তারা হযত আর কোনওদিন পৃথিবীর আলোয় বার হভে পারবে না, রক্তক্ষরণ আর ক্ষুধায মেরিযাস হযত মারা যাবে আর সেও মারা যাবে। দুটো কঙ্কাল পড়ে থাকবে এই অন্ধকাব নালার মধ্যে। সে বুঝল সে এখন সেন্ট ডেনিস অঞ্চলে নেই। সেন নদীর দিকে এগিযে চলেছে। পথটা যেখানে সরু সেখানেই সেটা শেষ হয়ে আর এক পথে গিযে মিশে যায়। অন্ধকারটা এখানে আরও ঘন মনে হলো। হঠাৎ একসময় পিছন ফিরে দেখল একটা লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে দূরে আর তার পিছনে রযেছে আট-দশটা লোক।

২

সেদিন সকালে পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্যারিসের রাস্তার তলা নর্দমাগুলোর ভিতরে বিপ্লবীদের খোঁজ করার আদেশ দেয। এজন্য একদল করে সশস্ত্র পুলিশ লণ্ঠন হাতে মাটির তলায অন্ধকার নালাগুলোতে নেমে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভলর্জা দেখল লণ্ঠনটা তার দিকে আর এগিয়ে আসছে না।

আসলে ভলর্জা যেখানে দু'দিকে দুটো মোড়ে এসে কোন দিকে কোন পথে যাবে বলে ভাবতে থাকে সেখানে এসে পুলিশদলও ভাবতে থাকে। অবশেষে পুলিশরা ভলর্জার মতো ডান দিকে না গিযে বাঁ দিকের পথ ধরে। কিন্তু পুলিশ যদি সেখানে দু'দলে ভাগ হয়ে দু'দিকে গিয়ে খোঁজ করত তাহলে ধরা পড়ে যেত ভলর্জা।

সেকালে বিপ্লবের বা গৃহযুদ্ধের সময় পুলিশ তার কর্তব্যকর্ম ঠিক করে যেত। তারা অপরাধীদের পিছু পিছু ছুটত। অনুসন্ধানকার্য যথারীতি করত। ৬ই জুন তারিখে সেন নদীর ধারে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে। জায়গাটা হলো পঁত দে ইনভার্নিদে অঞ্চলে।

ঐ দিন তখন নদীর ধারে দু'জন লোক পরস্পরের দিকে তাকাতে তাকাতে পথ

হাঁটছিল। আগের লোকটি তার পিছনের লোকটিকে এড়িয়ে যেতে চাইছিল। পিছনের লোকটি যেন তাকে ধরতে চায়। কিন্তু বাইরে এ বিষয়ে সে কোনও তৎপরতা দেখাচ্ছিল না। তারা দু'জনেই সমান গতিতে হাঁটছিল বলে তাদের মাঝখানের দূরত্ব সমান ছিল। আগের লোকটিকে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখাচ্ছিল। তার চেহারাটা ছিল বেঁটে আর রোগা রোগা। অন্যদিকে অনুসরণকারী পিছনের লোকটি ছিল লম্বা আর বলিষ্ঠ চেহারার।

নদীর ধারটা ছিল জনশূন্য। অনুসৃত লোকটি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দারুণ ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তার চোখে-মুখে। ছেঁড়া ময়লা একটা আলখাল্লা ছিল তার পরনে। তখন সেখানে কাছাকাছি কোনও পথচারী বা কোনও লোক ছিল না। নদীতে কাছাকাছি কোনও নৌকোও ছিল না। নদীর ওপার থেকে তাদের দেখা যাচ্ছিল। পাতলা আলখাল্লাপরা লোকটি শীতে কাঁপছিল। অনুসরণকারী লোকটির পরনে ছিল পুলিশের পোশাক।

পুলিশের পোশাকপরা লোকটি হঠাৎ একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেয়ে ডাকল। ড্রাইভার গাড়ি আনলে সে তাতে চেপে অনুসৃত লোকটি যে দিকে যাচ্ছিল সেই ঘাটের দিকে যেতে বলল। ঘাটের কাছে বাঁধের নিচে অনেক ভাঙা পাথর পড়েছিল। পুলিশের লোকটি ভাবল অনুসৃত লোকটি তার আড়ালে লুকিয়ে আছে। কিন্তু সেখানে সে নেমে দেখল লোকটা নেই। সে বাঁধের উপর উঠে চারদিকে তাকিয়ে খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু কোথাও দেখতে না পেয়ে সে আশ্চর্য হলো। চারদিকে তাকাতে তাকাতে সে দেখল লোহার জাল দেওয়া একটা ঢাকনার তলায় একটা সুড়ঙ্গপথ রয়েছে নিচে। ঢাকনাটা তোলার অনেক চেষ্টা করেও সে তুলতে পারল না। গাড়িটা তার কাছেই অপেক্ষা করতে লাগল।

৩

ভলজাঁ যে পথটা ধরে এগোচ্ছিল তার ছাদটা ছিল মাত্র পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি উঁচু। মেরিয়াসকে কাঁধে নিয়ে এগোতে কষ্ট হচ্ছিল তার। শহরের নিষ্কাশিত ময়লা জলের দুর্গন্ধ নাকে লাগছিল তার। সে যখন এইভাবে প্রধান নালাটার কাছে এসে পড়ল তখন বেলা বোধহয় তিনটে হবে। সেখানে এসে দেখল নালাটা অনেকটা চওড়া আর ছাদটা উঁচু আগের থেকে। এখানে জলের গভীরতা আর স্রোতটাও বেশি।

সেখানে এসে দেখল দু'দিকে দুটো নালা চলে গেছে। একটা নিচের দিকে নেমে গেছে আর একটা উপর দিকে উঠে গেছে। তাকে ঠিক করতে হবে কোন দিকে যাবে সে। সে ভাবল তাকে সেন নদীর মুখে যেতে হবে। তাই সে বাঁ দিকের পথটা ধরল। ডান দিকে গেলেও বাস্তিলের কাছে আর্সেনাল অঞ্চলে সেন নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছতে পারত। কিন্তু সে পথ এমনই গোলকধাঁধায় ভরা যে সে তা ঠিক করতে পারত না। তাই সে ঠিক পথই ধরেছিল।

কিছুদূর গিয়ে একটু আলো দেখতে পেল ভলজাঁ। মেরিয়াসের দেহটা কাঁধ থেকে এক জায়গায় নামাল একবার। দেখল মেরিয়াসের মুখটা মড়ার মতো দেখাচ্ছে। তার

মুখের এক কোণে রক্ত লেগেছিল। তবে তার বুকে হাত দিয়ে দেখল তার দেহে তখনো প্রাণ আছে। হৃৎস্পন্দন ঠিক চলছে। সে তখন তার নিজের জামাটা ছিঁড়ে মেরিয়াসের ক্ষতস্থানগুলোয় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। তারপর সে এক অব্যক্ত ঘৃণার সঙ্গে তার অচেতন দেহটার দিকে তাকিয়ে রইল। মেরিয়াসের জামার পকেট খুঁজে দুটো জিনিস দেখতে পেল সে। একটা পাঁউরুটি আর একটুকরো লেখা কাগজ। তাতে লেখা ছিল, 'আমার নাম মেরিয়াস পঁতমার্সি। আমার মৃতদেহটাকে মারে অঞ্চলে ৬ রু্য দে ফিলে কালভেরিতে আমার মাতামহের কাছে নিয়ে যাবে।'

ভলজাঁ রুটিটা খেয়ে নিয়ে ঠিকানাটা মুখস্থ করে কাগজটা মেরিয়াসের পকেটে রেখে দিল। তারপর সে মেরিয়াসের দেহটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল। রুটিটা খেয়ে গায়ে একটু বল পেল সে।

ভলজাঁ বুঝতে পারল না সে শহরের কোন অঞ্চলে এসে পড়েছে। তবে মাঝে মাঝে রাস্তার উপরে লোহার জালের ঢাকনা দেওয়া যে জলনিকাশী নর্দমার মুখ ছিল তার ফাঁক দিয়ে আশেপাশের আলো দেখে বুঝল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। উপরে গাড়িঘোড়ার বিশেষ শব্দ হচ্ছে না। তাতে বুঝল এটা প্যারিস শহরের কেন্দ্রস্থল নয়, অপেক্ষাকৃত নির্জন কোনও শহরতলী। এখানে যানবাহনের চলাচল খুব কম। লোকের ভিড়ও অনেক কম। ঘরবাড়ির সংখ্যাও কম। অন্ধকারে আবার এগোতে লাগল ভলজাঁ। কিন্তু তার পক্ষে হাঁটাটা কষ্টকর হয়ে উঠল ক্রমশ।

ভলজাঁ দেখল এখানে টালির মেঝে নেই। এখানে নর্দমাটা কাঁচা মাটির। জল বেশি নেই। কিন্তু পা দুটো বসে যাচ্ছিল। সে দেখল সে চোরাবালির রাজ্যে এসে পড়েছে। এখানে জলের স্রোত বেশি বলে নর্দমাটা পাকা করা হয়নি। তার উপর গতকাল জোর বৃষ্টি হওয়ায় এখানে জলের পরিমাণ বেশি হয়ে উঠেছে। যতই যাবার চেষ্টা করতে লাগল ভলজাঁ ততই তার পা দুটো বসে যেতে লাগল। উপরে জল আর নিচে কাদা। দেখতে দেখতে তার প্রায় গোটা দেহটাই ডুবে গেল। শুধু মাথাটা আর হাত দিয়ে তুলে ধরা মেরিয়াসের দেহটা জলের উপরে জেগে রইল।

হঠাৎ সে তার পায়ের কাছে একটা পাথর অনুভব করল। সে কোনওরকমে এক পা এগিয়ে গিয়ে সেই পাথরের উপর উঠে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তার মনে হলো মরতে মরতে বেঁচে গেছে সে। সে যখন দেখল এ জায়গাটার নিচেটা পাথর দিয়ে গাঁথা তখন সে আবার নতুন উদ্যমে মেরিয়াসকে কাঁধে নিয়ে হাঁটতে লাগল। সে দেখল এখানে নালাটা ক্রমশ কম চওড়া হয়ে আসছে। মাথার ছাদটাও নিচু হয়ে আসছে।

এইভাবে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবার পর একটা মোড় ঘুরেই সে বাইরের জগতের আলো দেখতে পেল। গুহার অন্ধকারে হঠাৎ আসা কোনও চকিত অস্পষ্ট আলো নয়। দিনের স্পষ্ট আলো। সে ভাবল এইবার এতক্ষণে সে এই পূতিগন্ধময় নরককুণ্ড থেকে বেরোবার পথ পেয়ে গেছে। এখানে লোকজন নেই এবং এখানে সে অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু সেই আলোর মুখে এসে থমকে দাঁড়াল ভলজাঁ। দেখল লোহার গ্রিল দেওয়া একটা বড় গেট তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো বড় তালা দেওয়া আছে তাতে। ভলজাঁ ভাল করে তালা দুটো পরীক্ষা করে দেখল। সে তালা ভাঙা সম্ভব নয়। গেটের লোহার গ্রিলগুলোর উপর তার দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চাপ দিয়ে দেখল সে গ্রিল ভাঙা সম্ভব নয় তার পক্ষে। ভলজাঁ হতাশ হয়ে বসে পড়ল গ্রিলের গেটের উপরে পিঠ দিয়ে।

ভয়ঙ্কর লৌহকঠিন মাকড়শার জালের মধ্যে আটকে পড়েছে যেন তারা যার থেকে মুক্তিলাভের কোনও আশাই নেই। তখন শুধু একজনের কথাই তার মনে পড়ল। মেরিয়াসের নয়, সে হলো কসেত্তে।

৪

ভলজাঁ যখন এইভাবে ভাবতে ভাবতে হতাশার গভীর অন্ধকারে মুক্তির আলো খুঁজছিল তখন হঠাৎ কে একজন তার কাঁধের উপর হাত দিল। বলল, ভয় নেই আমরা একজন একজন করে বার হব।

ভলজাঁর মনে হলো সে যেন স্বপ্ন দেখছে। সে মুখ তুলে দেখল একজন লোক নিঃশব্দে কোথা থেকে এসে দাঁডিযে রয়েছে তার পাশে। লোকটার পরনে ছিল পাতলা ময়লা একটা আলখাল্লা। তার জুতো দুটো হাতে ধরা ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হলেও ভলজাঁ এক নজর দেখেই চিনতে পারল লোকটা থেনার্দিয়ের।

কিন্তু ভলজাঁর মুখখানা এত ক্লান্ত, অবসন্ন ও রক্তাক্ত ছিল যে গ্রিলের ভিতর দিয়ে বাইরের আলো থাকা সত্ত্বেও তাকে চিনতে পারল না থেনার্দিয়ের।

অবশেষে থেনার্দিয়েরই প্রথমে কথা বলল। বলল, কেমন করে বেরোবে এখান থেকে?

ভলজাঁ কোনও কথা বলল না।

থেনার্দিয়ের বলল, তালা খোলার কোনও উপায় নেই। তবু আমাদের বেরোতে হবে এখান থেকে।

তা তো বটে।

আমরা একে একে যাব।

তার মানে?

তুমি একটা লোককে খুন করেছ। আমার কাছে চাবি আছে। আমি তোমাকে চিনি না, তবু আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি আমার বন্ধু।

ভলজাঁ এবার বুঝতে পারল থেনার্দিয়ের তাকে খুনী ভেবেই সাহায্য করতে চাইছে।

থেনার্দিয়ের বলে যেতে লাগল, শোন বন্ধু, তুমি হয়ত ওর পকেটে কি আছে তা না দেখেই খুন করেছ ওকে। ওর কাছে যা আছে তার অর্ধেক ভাগ আমাকে দিলেই আমি তালা খুলে দেব।

এই বলে একটা বড় চাবি বার করল সে। বলল, দেখছ কত বড় চাবি?

ভলজাঁর মনে হলো ঈশ্বর যেন তার মুক্তির জন্য থেনার্দিয়েরের ছদ্মবেশে এক দেবদূতকে পাঠিয়েছেন।

থেনার্দিয়ের তার পকেট থেকে একটা দড়ি বার করে বলল, এটাও আমি দেব তোমাকে।

ভলজাঁ বলল, কিজন্য ? ওটাতে কি হবে ?

তুমি বড় বোকা। এই লাশটাকে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে নদীতে ফেলে দেবে। তা না হলে ভাসতে থাকবে।

অবশ্য নীরবে দড়িটা নিল ভলজাঁ।

থেনার্দিয়ের বলল, আমি তোমাকে চিনি না, তবু তুমি একটা কাজ করে ফেলেছ এবং বিপদে পড়েছ। আমি তোমাকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করব। ভাল লোকদের সাহায্য করাই আমার কাজ। আচ্ছা, তুমি লাশটাকে ফেলে এলে না কেন ?

ভলজাঁ চুপ করে রইল।

থেনার্দিয়ের বলল, বুঝেছি ড্রেনের মধ্যে রাখলে ধরা পড়ার ভয় আছে। কালই মেথররা এই ড্রেন পরিষ্কার করতে আসবে। তারপর লাশ পেয়ে তারা পুলিশকে বলবে। এদিকে তো কেউ আসে না। পুলিশ আবার খুঁজে বেড়াবে। তার চেয়ে নদীতে লাশ ফেলে দিলে কোনও ঝামেলা থাকবে না। নদীতে লাশ ভাসলে কারো কিছু বলার থাকবে না। কে খুন করেছে ? না প্যারিস খুন করেছে। তখন তদন্তের কোনও কারণ থাকবে না।

ভলজাঁ যতই চুপ করে থাকছিল বাচাল থেনার্দিয়ের ততই বকতে লাগল। সে বলল, আমার কাছে চাবি আছে। কই, তোমার কাছে কি টাকা আছে দেখি। লোকটার কাছে কত ছিল ?

থেনার্দিয়ের কথা বলছিল আর মাঝে মাঝে ঠোঁটের উপর আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলছিল ইশারায়। তার কোনও কারণ বুঝতে পারল না। সে ভাবল থেনার্দিয়েরের সঙ্গে হয়ত আরও কিছু লোক লুকিয়ে আছে। তাদের কোনও ভাগ দিতে চায় না বলেই হয়ত কথাটা তাদের শোনাতে চায় না সে।

ভলজাঁ এবার তার পকেটটা খুঁজে দেখল। কিন্তু সে গতকাল বাড়ি থেকে বার হবার সময় টাকা পয়সা বেশি নেয়নি। টাকার থলেটাও আনেনি। সে তার পকেটটা হাতড়ে মোট ছ' ফ্রাঁ পাঁচ স্যু পেল। তারপর সেটা থেনার্দিয়েরের হাতে দিয়ে দিল।

থেনার্দিয়ের বলল, তুমি দেখছি শুধু শুধু খুন করেছ লোকটাকে।

ভলজাঁ যখন আনমনে ভাবছিল দাঁড়িয়ে থেনার্দিয়ের তখন তার ও মেরিয়াসের পকেটগুলো খুঁজে দেখল। সে আর কোনও টাকা-পয়সা পেল না। মেরিয়াসের পকেট থেকে একটা কাগজ পেয়ে সেটা সে ভলজাঁর অলক্ষ্যে অগোচরে নিজের আলখাল্লার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। ভাবল এই কাগজটাতে হয়ত খুনী আর যাকে খুন করা হয়েছে তাদের ঠিকানা আছে।

থেনার্দিয়ের এবার বলল, থাক, তুমি যখন টাকা মিটিয়ে দিয়েছ তখন তোমাকে

ছেড়ে দিতে হবে। ভলজাঁ মেরিয়াসের দেহটাকে কাঁধে তুলে নিতেই গেটের তালা খুলে দিল থেনার্দিয়ের। ভলজাঁ বেরিয়ে গেলে সে আবার সেই ড্রেনের অন্ধকারে ঢুকে পড়ল।

ভলজাঁ বাইরে এসেই নদীর ধারে মেরিয়াসকে কাঁধ থেকে নামাল। অবশেষে পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় এসে প্রাণটা বাঁচল তার। সেই ভয়াবহ অন্ধকার, দুর্গন্ধ, মৃত্যুভয় সব পিছনে পড়ে রইল। মুক্ত হাওয়ায় প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিল সে। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। নীল আকাশে দু'-একটা করে তারা ফুটে উঠছিল। ভলজাঁ কিছু জল নিয়ে মেরিয়াসের চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিল। তবু মেরিয়াসের চোখ খুলল না। তবে তার শ্বাসপ্রশ্বাস চলছিল এবং ঠোঁট দুটো কাঁপছিল।

ভল্জাঁ আর একবার জল নিয়ে মেরিয়াসের চোখে-মুখে দিতে যেতেই কার পায়ের শব্দে চমকে উঠল সে। মনে হলো এ শব্দ তার চেনা। মুখ ফিরিয়ে ভলজাঁ জেভার্তকে চিনতে পারল। জেভার্তের মাথায় টুপি আর গায়ে লম্বা কোট ছিল। তার বগলে ছিল একটা লাঠি।

বিপ্লবীদের ঘাঁটি থেকে ছাড়া পেয়েই জেভার্ত পুলিশ অফিসে গিয়ে সব খবরাখবর দিয়ে আবার কাজে চলে যায়। পাঠকরা হয়ত বুঝতে পেরেছেন এর আগে এই জেভার্তই থেনার্দিয়েরের খোঁজ করছিল নদীর ধারে। জেভার্তের তাড়া খেয়ে থেনার্দিয়ের ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে ড্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

আমরা এটাও বেশ বুঝতে পারি যে তাড়াতাড়ি গেট খুলে ভলজাঁকে বার করে দেবার পিছনে থেনার্দিয়েরের একটা কৌশল ছিল। সে জানত জেভার্ত তখনো নদীর ধারে অপেক্ষা করছে তার জন্য। ভলজাঁর কাছে মৃতদেহটা দেখলেই জেভার্তের দৃষ্টি তার উপর পড়বে। এই ভাবে তার ধৈর্যের পুরস্কার পাবে জেভার্ত আর সে নিজে ছয় ফ্রাঁ পেয়ে গেছে।

জেভার্ত কি ভলজাঁকে চিনতে পারেনি। সে তাই বলল, কে তুমি?

আমি।

কে তুমি?

জাঁ ভলজাঁ।

জেভার্ত এবার ভলজাঁর কাঁধের উপরটা হাত দিয়ে শিকারের মতো ধরল। সে এবার ভলজাঁকে চিনতে পারল।

ভলজাঁ বলল, ইনসপেক্টার জেভার্ত, আজ সকাল থেকে নিজেকে আমি আবার বন্দী হিসাবে ভাবছি। পালিয়ে যাবার ইচ্ছা থাকলে আমি আপনাকে আমার বাসার ঠিকানা দিতাম না। তবে একটা অনুমতি আমায় দিতে হবে।

জেভার্ত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভলজাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, কি করছ তুমি এখানে? এই লোকটিই বা কে?

ভলজাঁ বলল, এরই জন্য অনুরোধ করছি আপনাকে। একে আমি প্রথমে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিতে চাই। তারপর আপনি আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারেন।

জেভার্ত অরাজী হলো না। সে তার পকেট থেকে রুমালটা বার করে জলে ভিজিয়ে মেরিয়াসের কপালের রক্ত মুছিয়ে দিল। তারপর যে গাড়িটা তার জন্য অপেক্ষা করছিল সেই গাড়িটাকে ডাকল। গাড়িটা এলে মেরিয়াসকে তার উপর চাপিয়ে ভলজাঁ ও জেভার্ত তার উপর বসল। ভলজাঁ তাদের গন্তব্যস্থলের ঠিকানাটা বলে দিল। গাড়িতে কেউ কোনও কথা বলল না। জেভার্ত একসময় বলল, এরই নাম মেরিয়াস। এ ব্যারিকেডে ছিল।

ভলজাঁ বলল, এ আহত হয়েছে। আমি ওর অচেতন দেহটাকে তুলে নিয়ে আসি।

জেভার্ত বলল, ও মারা গেছে।

ভলজাঁ বলল, না এখনো মরেনি।

কিন্তু মেরিয়াসকে মৃতের মতোই মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল গাড়িটার মধ্যে এক মৃতদেহের দু'ধারে এক ছায়ামূর্তি আর এক প্রস্তরমূর্তি বসে রয়েছে।

৫

ওরা যখন গিলেনর্মাদের বাড়িতে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জেভার্ত প্রথমে গাড়ি থেকে নেমে সদর দরজায় ঘা দিতে লাগল। গোটা বাড়িটা এরই মধ্যে ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে। এই অভিজাত পল্লীর সব বাড়িগুলো বিপ্লবের ভয়ে সব দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে সন্ধ্যা হতেই।

বাড়ির দারোয়ান দরজা খুলে দিতেই জেভার্ত জিজ্ঞাসা করল, এটা মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বাড়ি ?

দারোয়ান বলল, কি চাই ?

আমরা তাঁর আহত পুত্রকে ব্যারিকেড থেকে নিয়ে এসেছি।

তাঁর পুত্র ? দারোয়ান আশ্চর্য হলো।

ভলজাঁ মাথা নাড়ল নীরবে। ভলজাঁর কাদা ও রক্তমাখা পোশাক দেখে দারোয়ান ভয় পেয়ে গেল।

জেভার্ত বলল, যাও, তোমার মালিককে ডেকে আন। তাঁর ছেলে ব্যারিকেডে মরতে গিয়েছিল। ও মরে গেছে। আগামীকাল ওকে কবর দিতে হবে।

দারোয়ান প্রথমে বাড়ির ভৃত্য বাস্ককে ডাকল। বাস্ক নিকোলেত্তেকে ডাকল। নিকোলেত্তে ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদকে ডাকল।

মেরিয়াসকে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ তার বাবার ঘুমের ব্যাঘাত না করে ডাক্তার ডাকতে পাঠাল।

জেভার্ত এবার ভলজাঁর কাঁধে একটা হাত রাখতেই ভলজাঁ তার মানে বুঝতে পারল। তারা দু'জনে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল। দারোয়ান তাদের চলে যেতে দেখল।

গাড়ি ছেড়ে দিলে ভলজাঁ বলল, ইনসপেক্টার, আমাকে আর একটা অনুমতি দিতে হবে। আমাকে মিনিট খানেকের জন্য একবার আমার বাড়ি যাবার অনুমতি দিতে হবে।

জেভার্ত চুপ করে কি ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ গাড়ির জানালা খুলে ড্রাইভারকে হুকুম দিল, ৭ রু্য দ্য লা হোমি আর্মেতে চল।

গাড়িতে কেউ কোনও কথা বলল না। বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া গলিপথটার মোড়ের মাথায় গাড়িটা থামাল ড্রাইভার। বলল, গাড়িটা ঢুকবে না সরু গলিটাতে।

জেভার্ত আর ভলজাঁ নেমে পড়ল।

ড্রাইভার জেভার্তকে বলল, মঁসিয়ে আমার গাড়িটার ভাল সীটটাতে রক্ত লেগে আছে।

এই বলে সে তার পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে বলল, এ বিষয়ে কিছু একটা লিখে দিন।

জেভার্ত হাত দিয়ে তার নোটবইটা সরিয়ে দিয়ে বলল, এর জন্য কত লাগবে বল। আর তোমার ভাড়াই বা কত হয়েছে বল।

ড্রাইভার বলল, সওয়া সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। তার উপর গাড়ির সীটটা নতুন। সব মিলিয়ে আশি ফ্রাঁ লাগবে।

কোনও কথা না বলে জেভার্ত চারটে নেপোলিয়ঁ বা স্বর্ণমুদ্রা বার করে দিয়ে দিল ড্রাইভারকে। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

ভলজাঁ ভাবল জেভার্ত তাকে প্রথমে থানায় নিয়ে যাবে। অথবা ফাঁড়িতে। দুটোই এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ওরা দু'জনে গলিপথ দিয়ে এগিয়ে চলল। পথটা একেবারে জনশূন্য। কিন্তু ভলজাঁ কি করতে চায় ?

যে জীবন নতুন করে শুরু করেছিল সে জীবন শেষ করে দিতে চায় সে। সে প্রথমে কসেত্তেকে মেরিয়াসের খবরটা জানাবে। তাকে আরও কিছু কথা জানাবে। কিছু নির্দেশ হয়ত দেবে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত সব ব্যাপার শেষ হয়ে গেছে। সে জেভার্তের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে। নিজের জীবনের সব কিছু শেষ করে দিয়েছে।

বাড়িটার সামনে গিয়ে জেভার্ত বলল, তুমি যাও, আমি এখানেই থাকব।

ভলজাঁ দারোয়ানকে ডাকতে সে উঠে দরজা খুলে দিল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চলল সে।

ভলজাঁ তিনতলায় গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে নিচে বাড়ির সদর দরজার সামনেটা দেখল। রাস্তার আলোয় সব কিছু দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু দেখল কেউ কোথাও নেই। সে আশ্চর্য হলো। জেভার্ত চলে গেছে।

৬

বাস্ক আর দারোয়ান দু'জনে মিলে মেরিয়াসকে দোতলার ঘরে শুইয়ে দিয়েছিল। ডাক্তার এসে গেছে। ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। সে একবার বলল, এমন হবে আমি জানতাম।

ডাক্তার এসে মেরিয়াসের নাড়ী পরীক্ষা করে দেখল তার হৃৎস্পন্দন ঠিক আছে।

তার বুকেতে কোনও বড় আঘাত লাগেনি। তার ঠোঁটে যে রক্ত লেগেছিল তা তার নাসারন্ধ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। বালিশ ছাড়াই তাকে চিৎ করে শুইয়ে দেওয়া হলো যাতে সে সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারে। নিম্নাঙ্গে কোনও আঘাত লেগেছে কি না তা দেখার জন্য তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দেওয়া হলো। ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ পাশের ঘরে চলে গেল। দেখা গেল দু' একটা গুলি তার মাথার খুলি আর পাঁজরগুলোর উপর আঁচড় কেটে চলে গেলেও তা গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে কোনও আঘাতই গুরুতর হয়নি। এ ছাড়া নিম্নাঙ্গে বা দেহের আর কোনও অংশে কোনও আঘাত লাগেনি। মুখে কোনও ক্ষত নেই। তার কাঁধে যে গুলি লাগে তাও ভিতরে ঢুকতে পারেনি। কাঁধটা কেটে যাওযায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেই সে অচেতন হয়ে পড়ে। তার এই অচেতন ভাবটাই ভয়ের কথা। এই ধবনের অচৈতন্য অবস্থা থেকে অনেকেরই আর জ্ঞান ফেবে না।

বাস্ক আর নিকোলেত্তে চাদব ছিঁড়ে ব্যান্ডেজেব কাপড় নিযে এল। মেবিযাসের বিছানার পাশের টেবিলে একটা বাতি জ্বলছিল। টেবিলেব উপব ডাক্তারেব যন্ত্রপাতি সাজানো ছিল। ডাক্তার প্রথমে মেবিযাসেব চুল, মুখ ও দেহেব ক্ষতগুলো ধুযে দিযে ক্ষতস্থানগুলোতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

ডাক্তাব ভয় পেযে গিযেছিল বলে কোনও কথা বলছিল না। বোগীব অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছিল না সে। এমন সময ঘবের দরজা ঠেলে মঁসিযে গিলেনর্মাদ ঘরে ঢুকলেন।

শহবের বিপ্লবীদের ঘাঁটিগুলোতে যুদ্ধ চলতে থাকাব জন্য গতকাল সারাদিন ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত ছিলেন মঁসিযে গিলেনর্মাদ। গতকাল তাডাতাড়ি শুযে পড়েন। রাতে ঘুম হযেছিল। কিন্তু উত্তেজনায ঘুমটা গভীর হযনি। তাঁর ঘুম কেউ না ভাঙালেও মেরিয়াসকে যে ঘবে রাখা হযেছিল সে ঘবটা তাঁব শোবার ঘরেব পাশেই বলে লোকজনের কথাবার্তা ও ব্যস্ততার শব্দে তাঁব ঘুমটা ভেঙে যায এবং তিনি বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

ঘরের ভিতর না ঢুকে তিনি দবজায একটা হাত দিযে দাঁডিযে ছিলেন। পরনে ছিল শোবার গাউন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনও প্রেতমূর্তি একটা সমাধির দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি দেখলেন ঘরের ভিতর বিছানার উপর একটা নগ্ন ও ক্ষতবিক্ষত দেহ শাযিত আছে। তার চোখ দুটো বন্ধ, মুখটা খোলা, ঠোঁট দুটো বিবর্ণ এবং দেহের কযেকটা জাযগায লাল ক্ষত রয়েছে।

বৃদ্ধ গিলেনর্মাদের আপাদমস্তক কাঁপতে লাগল। রাগে চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলতে লাগল। তাঁর সমস্ত মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল। তাঁর হাত দুটো শিথিল হয়ে দেহের দু'পাশে ঝুলতে থাকল। তিনি কোনওরকমে ঘরের ভিতর ঢুকে আশ্চর্য হয়ে বললেন, মেরিয়াস!

বাস্ক বলল, কিছুক্ষণ আগে ওকে আনা হয মঁসিয়ে। ও ব্যারিকেডে ছিল...

গিলেনর্মাদ বললেন, ও মাবা গেছে, দস্যু কোথাকার!

এবার দেহটাকে তিনি সোজা-শক্ত ও খাড়া করে বললেন, আপনি ডাক্তার? একটা কথা বলুন তো, ও কি সত্যিই মারা গেছে?

উদ্বিগ্ন ও অনিশ্চিত ডাক্তার কোনও কথা বলতে পারল না। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ পাগলের মতো জোর হাসিতে ফেটে পড়ে বলে উঠলেন, রক্তপিপাসু দুর্বৃত্তটা আমার উপর ঘৃণাবশত ব্যারিকেডে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে এবং আমাকে শাস্তি দেবার জন্য আবার আমার কাছেই ফিরে এসেছে। আমার জীবনের সকল দুঃখের কারণ আজ শেষ হয়ে গেল।

এবার তিনি জানালার ধারে গিয়ে জানালাটা খুলে দিযে যেন রাত্রির সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, এখন ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজেকে শেষ করে ফেলেছে। সে জানত আমি তাব জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তার ঘরটা প্রস্তুত হযে ছিল তারই জন্য। তার ছেলেবেলাকার ছবি ছিল আমার বিছানার পাশে। সে জানত তার ফিরে আসার জন্য এক ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে আমি আগুনের পাশে বসে পাগলের মতো প্রতীক্ষা করছি। এবার তুমি যদি ফিরে এসে বলতে 'এই তো আমি এসেছি' তাহলে এ বাড়ির সমস্ত ভার তোমার হাতে তুলে নিয়ে আমি তোমার আদেশ সব বিষয়ে পালন করতাম। তোমার বৃদ্ধ মাতামহ তোমার আজ্ঞাবহ দাস হয়ে থাকত। কিন্তু তা না করে এখানে ফিরে না এসে তুমি ব্যারিকেডে গিয়ে মানসিক বিকৃতিবশত হত্যা করলে নিজেকে। ঠিক আছে, এখন শান্তিতে ঘুমোও, এই আমার শেষ কথা। তুমি বলেছিলে ও রাজতন্ত্রী বলে ফিরে যাব না ওর কাছে।

ডাক্তার দেখল বৃদ্ধ গিলেনর্মাদও এক রোগীতে পরিণত হতে চলেছেন। সে তাই তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে তাঁর একটি হাত টেনে নিল।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, ধন্যবাদ ডাক্তার। আমি শান্তই আছি। আমি ষোড়শ লুই-এর মৃত্যু নিজের চোখে দেখেছি। তাছাড়া কত মৃত্যু দেখেছি। আসল কথা কি জানেন ডাক্তার, খববের কাগজগুলোই সব আজেবাজে গরম গরম বক্তৃতা ছেপে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে ঝড় তুলে তরুণ যুবকগুলোর মাথা খায়। ও মেরিয়াস, তুমি আমার আগে মারা গেলে! ব্যারিকেড! ডাক্তার, আপনি হয়ত এই পাডাতেই থাকেন। আমি আপনাকে চিনি। আপনি ভাববেন না আমি রেগে গিয়েছি। মৃত্যুর উপর রাগ করা বৃথা। তবে কি জানেন? এই ছেলেটাকে আমি মানুষ করি। ও যখন তুলিয়েরের বাগানে খেলা করত, কোদাল দিয়ে মাটি কাটত তখন আমি নিজের হাতে মাটি দিয়ে খালগুলোকে বুজিয়ে দিতাম। সেই ছেলে একদিন বড় হয়ে বলল, 'অষ্টাদশ লুই নিপাত যাক।' এই বলে চলে গেল বাড়ি থেকে। এটা আমার দোষ নয়। ও দেখতে খুব সুন্দর ছিল। ওর গায়ের রংটা ছিল গোলাপী আর চুলগুলো ভারী সুন্দর। ওর মা মারা যায়। ও ছিল লয়েরের এক দস্যুর ছেলে। কিন্তু বাপের অন্যায় কর্মের জন্য ছেলেরা তো দায়ী হতে পারে না। ওর চেহারাটা এত সুন্দর ছিল যে লোকে ওকে দেখার জন্য পথ দিয়ে যেতে যেতে ঘুরে তাকাত। ও যখন ছোট ছিল আমি লাঠিটা মারার ভঙ্গিতে তুলতাম। কিন্তু ও বুঝত আমি ঠাট্টা করছি।

ও যখন রোজ সকালে আমার ঘরে আসত তখন মনে হত এক ঝলক সূর্যের তাজা আলো এসে ঢুকল। লাফায়েত্তে না কি ঐ সব বিপ্লবীরাই আমার সব শেষ করে দিল।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ এবার মেরিয়াসের বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। তিনি আবার কথা না বলে পারলেন না। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, বিদ্রোহী, পাজী বদমাস কোথাকার! আমাকেও মরতে হবে। সারা প্যারিস শহরে যেন ফুর্তি করার জন্য মেয়ে ছিল না। যুবক বয়সে মেয়ে নিয়ে ফুর্তি না করে, নাচগান না করে উনি গেলেন প্রজাতন্ত্রীদের হয়ে ব্যারিকেডে যুদ্ধ করতে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে উনি যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন। দুটো মৃতদেহ এই বাড়ি থেকে যাবে সমাধিভূমির দিকে। ঠিক আছে, খুব ভাল হয়েছে, আমি এটাই ভেবেছিলাম। আমি শেষ করব নিজেকে। আমার তো একশো বছর বয়স হয়ে গেছে। অনেক আগেই মরা উচিত ছিল। কেন বৃথা চেষ্টা করছেন ডাক্তার? ও মরে গেছে। যা হয়েছে ভালই হয়েছে। আসল কথা, এই যুগটাই খারাপ। যতসব ভাবধারা, আদর্শ, তত্ত্বকথা, বিদ্বান, পণ্ডিত, ডাক্তার, লেখক, দার্শনিক, তুলিয়েরের কাকতাড়ানো বিপ্লব—এ যুগের সবটা বাজে। আর যেমন তুমি আমার কথা না ভেবে, আমার প্রতি কোনও দয়া না দেখিয়ে নিজেকে হত্যা করেছ, আমিও তেমনি তোমার মৃত্যুর জন্য কোনও দুঃখ করব না। বুঝলে খুনী?

এমন সময় মেরিয়াসের চোখ দুটো খুলে গেল। সে বিস্ময়ের আবেশে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের দিকে তাকাল।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ চিৎকার করে উঠলেন, মেরিয়াস! আমার বাছা, আমার অন্তরের ধন, তুই বেঁচে আছিস তাহলে?

এই বলে মেঝের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন তিনি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

জেভার্ত জীবনে এই প্রথম মাথা নিচু করে এবং পিছন দিকে হাত দুটো করে র‍্যু দ্য লা হোমি আর্মে থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। এর আগে পর্যন্ত সে সব সময় নেপোলিয়নের মতো মাথা উঁচু করে এবং হাত দুটো আড়াআড়ি করে বুকের উপর এক দৃঢ় সংকল্পের পরিচায়ক হিসাবে রাখত। পিছনের দিকে হাত রাখা হলো অনিশ্চয়তার এবং সিদ্ধান্তের অভাবের পরিচায়ক। এটা কোনওদিন দেখা যায়নি তার মধ্যে। কিন্তু আজ তার জীবনে যেন এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। আজ এক ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তার চিহ্ন তার চেহারা ও চোখমুখের উপর ফুটে উঠেছে।

নৈশ নির্জন রাস্তা দিয়ে একা হাঁটতে হাঁটতে সে সেন নদীর ধারে পর্যন্ত নোতার দ্যামের কাছে প্লেস দু শ্যাবেলেতের পুলিশ ফাঁড়ির কাছাকাছি একটা জায়গায় এল। তারপর ঘাসের উপর এক জায়গায় হাতের উপর চিবুকটা রেখে বসল।

আজ সারাদিন ধরে তার মনটা বড় অশান্ত হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছিল তার মধ্যে যেন ভয়ঙ্কর একটা বিপ্লব চলছে এবং সে বিপ্লবে তার আত্মাটা পীড়িত হচ্ছে। তার মনে হচ্ছিল সে তার কর্তব্যকর্ম ঠিকমতো করতে পারছে না। সে যখন আজ সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে নদীর ধারে ভলজাঁর দেখা পেয়ে যায় তখন পরস্পরবিরুদ্ধ দুটো অনুভূতির তরঙ্গাঘাতে দুলতে থাকে তার মনটা। তার একবার মনে হচ্ছিল সে যেন নেকড়ে এবং সে তার শিকার ধরে ফেলেছে। আবার মনে হচ্ছিল সে যেন কুকুর এবং সে তার প্রভুকে দেখতে পেয়েছে।

আজ সে তার জীবনে প্রথম তার সামনে দুটো পথ দেখতে পেল। এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র একটা পথই ছিল তার সামনে। একটি পথে গেলে তাকে ভলজাঁর মতো আইনের চোখে এক দাগী অপরাধীর কাছ থেকে তার জীবনকে ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করে বেঁচে থাকতে হবে এবং তাহলে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে তার কর্তব্যবোধকে বিসর্জন দিতে হবে এবং সমাজের সঙ্গে প্রতারণা করতে হবে। অন্য পথে গেলে তার বিবেকের উপর আস্থা রেখে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভিক্ষাব দানস্বরূপ পাওয়া জীবনকে ত্যাগ করতে হবে।

এই দুটো পথের একটাকে বেছে নিয়ে এই উভয় সংকট থেকে মুক্তি তাকে পেতেই হবে। ভলজাঁ তাকে দয়া করবে এবং সেই দয়া তাকে গ্রহণ করতে হবে সেকথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। কিন্তু কি এখন করবে সে? ভলজাঁকে গ্রেপ্তার করা তার পক্ষে অসম্ভব, আবার তাকে ছেড়ে দেওয়াটা সমান খারাপ হবে। তাকে ছেড়ে দিলে আইনরক্ষক এক অফিসার একজন অপরাধীতে পরিণত হবে। এবং একজন অপরাধী আইনের চোখে ধুলো দিয়ে মাথা উঁচু করে বেড়াবে।

নিজের কর্তব্যকর্মের বাইরে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার অভ্যাস নেই তার, কারণ তার মনে হয় যে কোনও গভীর চিন্তার মধ্যেই একটা দ্বন্দ্ব আছে। সে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হওয়া সত্যিই কষ্টকর বলে সে এই ধরনের চিন্তাকে এড়িয়ে যায়। কিন্তু আজকের ঘটনার পর এ চিন্তাকে পরিহার করতে পারল না সে এবং সে চিন্তা এক নিদারুণ পীড়ন ও যন্ত্রণার ব্যাপার হয়ে উঠল তার কাছে।

সে যা করেছে তা ভাবতে গেলেও সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে তার। তার মতো এক কড়া পুলিশ অফিসার হয়ে সব নিয়মকানুন ও বিধি অগ্রাহ্য করে অপরাধীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে সে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা না ভেবে ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখেছে সে। এটা কি এক অমার্জনীয় অপরাধ নয়? কিন্তু এখন কি করতে পারে সে? এখন একমাত্র পথ হলো এখনি ভলজাঁর ঠিকানা নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা। এ পথ বা উপায়ের কথা জানত সে কিন্তু সে পথ সে উপায় গ্রহণ করতে পারেনি সে।

করতে পারেনি, কারণ কি একটা জিনিস যেন বাধা দিচ্ছিল তাকে। কিন্তু কি সে জিনিস? বিচার, রায়, দণ্ড, সরকারী কর্তৃত্ব এবং পুলিশ—এ ছাড়া জীবনে আর কোনও জিনিস আছে কি? এক মহা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ল জেভার্ত। একজন

দণ্ডিত অপরাধী বিচারের রায়কে ব্যর্থ করে দিয়ে পালিয়ে বেড়াবে আর যার হাতে আইনরক্ষার ভার, সবাইকে আইনের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য করাই যার কাজ, সে তাকে আইনের কাছ থেকে দূরে পালাতে সাহায্য করবে। তাহলে এই দু'জন লোক অর্থাৎ সে নিজে এবং ভলর্জা দু'জনেই কি আইনভঙ্গকারী হচ্ছে না? সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভলজাঁ ঘুরে বেড়াবে আর জেভার্তই সমাজের ক্ষতি করে সরকারের টাকায় বেঁচে থাকবে।

ব্যারিকেড থেকে নিয়ে আসা আহত বিদ্রোহীর কথাটা মাঝে একবার মনে পড়েছিল তার। তার অপরাধ ভলর্জার অপরাধের থেকে অনেক কম। তাছাড়া এতক্ষণ সে হয়ত মারা গেছে। একমাত্র জাঁ ভলর্জার চিন্তাই তাকে একই সঙ্গে পীড়িত ও ভীত করে তুলেছিল। যে সব নীতি দিয়ে মানুষকে এতদিন বিচার করে এসেছে সে, সে সব নীতির কাঠামোটা আজ হঠাৎ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তার চোখের সামনে।

তার প্রতি ভলর্জার উদারতা সত্যিই আশ্চর্যান্বিত করে তোলে তাকে। ভলর্জাঁর পিছনে মঁসিয়ে ম্যাদলেনের মূর্তিটাও দেখতে পায় সে যেন। দুটি মূর্তিই আজ যেন মিশে এক হয়ে গেছে। দুটি মূর্তিই শ্রদ্ধার যোগ্য। আজ জেভার্তের চেতনার নিষিদ্ধ সীমানায় ভয়ঙ্কর একটা ভাব যেন অনধিকার প্রবেশ করল—সে ভাব হলো এক দণ্ডিত কয়েদীর প্রতি শ্রদ্ধা। এটা ভাবতে শিউরে উঠছিল সে। তবু এই শ্রদ্ধার ভাবটাকে অস্বীকার করে এড়িয়ে যেতে পারল না সে। অন্তরের মধ্যে ঐ অপরাধীর মহত্ত্বকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারল না। যে অপরাধী দেবদূতেরই সমতুল। অবশ্য বিনা দ্বন্দ্বে এ স্বীকৃতি দান করতে পারেনি সে। সে এক মুহূর্তের জন্য একথা অস্বীকার করতে পারেনি যে আইন এবং আইনকে বলবৎ করার মতো সহজ কাজ আর কিছু হতে পারে না। তবু সে যখন আজ ভলর্জাকে গ্রেপ্তার করার জন্য তার কাঁধের উপর একটা হাত রাখে তখন তার অন্তরাত্মার গভীর হতে বেরিয়ে এসে একটা কণ্ঠস্বর তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, তুমি তোমার মুক্তিদাতাকে বন্দী করবে? সে তখন আপনা থেকে ছোট হয়ে যায় ভলর্জার কাছে।

আজ তার হঠাৎ মনে হলো সে যেন আইন, নীতি আর আচরণবিধি নিয়েই বাঁচতে পারবে না সারা জীবন এবং আজ সে সেই আইন ও নীতির রাজ্যসীমানা অতিক্রম করে দয়া, মানবতা, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি সমন্বিত এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছে। আজ তার জগতে যেন এক নতুন সূর্য উঠেছে এবং যে ছিল একদিন সামান্য এক অন্ধকারের পেঁচা আজ তাকে ঈগল হয়ে সে সূর্যকে বরণ করে নিতে হবে। আজ সে কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে পৃথিবীতে দয়া বলে একটা জিনিস আছে। ভলর্জার মতো লোক যদি দয়া দেখাতে পারে তাহলে সে কেন দয়া দেখাবে না?

অনেক নতুন প্রশ্ন জাগল তার মনে এবং তার উত্তরগুলো অভিভূত করে তুলল তাকে। তাকে দয়া দেখিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে ভলজাঁ কি কোনও কর্তব্য সাধন করেছে? সে কি উচিত কাজ করেছে? না, তার থেকে আরও বড় কাজ করেছে? কিন্তু

সে নিজে সেই দয়ার প্রতিদান দিয়ে তার কর্তব্যে অবহেলা করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের জীবনে কর্তব্যকর্মের উর্ধ্বেও একটা জিনিস আছে। এইখানেই তার চিরাচরিত ভাবধারার কাঠামোটা ভেঙে যাওয়ায় সে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। আইন-শৃঙ্খলা ছাড়া জীবনে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালনীয় বস্তু আর কি আছে? যদিও ধর্ম ও চার্চকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে সে তবু তার মনে হয় ধর্ম সামাজিক শৃঙ্খলারই একটি দিক। পুলিশবাহিনীই তার কাছে প্রকৃত ধর্ম আর আইন-শৃঙ্খলাই তার জীবনের একমাত্র ব্রত। মঁসিয়ে গিসলকেত নামে তার এক উপরওয়ালা অফিসার ছিল। তার আদেশ মেনে চলা তার জীবনের পবিত্র কর্তব্য। তার সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মতবিরোধ হলে তার পদত্যাগ করা উচিত। অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে উপরওয়ালাকে সে দেবতার মতো মানে।

মোট কথা, একজন অপরাধীকে ছেড়ে দিয়ে আইনভঙ্গের এক অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী হয়ে উঠেছে সে। সে বুঝল সরকারী কর্তৃত্বের সব অধিকার জীবন থেকে চলে গেছে তার। তার বেঁচে থাকার কোনও যুক্তি নেই।

আবেগ মানুষকে একবার আচ্ছন্ন করে বসলে তা ক্রমশ বেড়ে যায়। সে খালি ভাবতে থাকে দয়ার দ্বারা দয়ার প্রতিদান দিয়ে অন্যায় করে ফেলেছে সে। বরফের মতো কঠিন হয়েও সে গলে গেছে। এতদূর কঠোর বাস্তববাদী ও কাজের লোক হয়েও আজ পথ হারিয়ে ফেলল জেভার্ত। আজ সে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো কোনও কিছুই অভ্রান্ত নয় জগতে। সব অভ্রান্তের মধ্যেও একটা ভ্রান্তি আছে; সব গোঁড়ামি ও নীতিবাদিতার মধ্যে ত্রুটি আছে; কোনও সমাজ সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত নয়; অমোঘ অপরিবর্তনীয় কোনও নীতি বা নিয়মকানুনের মধ্যেও ভুল আছে; বিচারকরাও রক্তমাংসের মানুষ আর আইনও ভুল করে। রেললাইনের মতো সোজা জেভার্তের জীবনের পথটা আজ কেমন যেন একেবারে ভাঙচুর হয়ে গেল।

কিন্তু আজ পর্যন্ত জেভার্ত অজ্ঞাত অজানিত কোনও সত্যে বিশ্বাস করেনি। অথচ আজকের সব চিন্তা ক্রমশ তার জীবনের যত সব পরীক্ষিত প্রমাণিত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যের দিকেই নিয়ে যেতে লাগল তাকে। তার জীবনের সব বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিটা বিপর্যস্ত হয়ে গেল একেবারে অথচ নতুন কোনও বিশ্বাস বা মূল্যবোধকে নিঃসংশয়ে আঁকড়ে ধরতে পারল না সে। একদিকে দয়া করার অপরাধ আর একদিকে কর্তব্যকর্মে ত্রুটির অপরাধ—এই দুই অপরাধবোধের দ্বারা নিষ্পেষিত হতে লাগল তার মনটা। আজ জেভার্ত দেখল তার সামনে কোনও পথ নেই, শুধু এক বিরাট অন্তহীন তলহীন এক অন্ধকার খাদ।

সে ভাবতে লাগল মানবজগতে যে সব ঘটনা ঘটে তা সবই ঈশ্বরের দান। তাহলে যে সব অরাজকতা ও বিপ্লবের ঘটনা ঘটে তাও কি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটে?

জেভার্তের চোখমুখ সহসা কঠোর হয়ে উঠল। মনে হলো সে যেন এক দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছে।

সে বুঝতে পেরেছে সব আইন, সব ন্যায়নীতি, সব জ্ঞান, সব বিধি বিশৃঙ্খলায় ও বৈপরীত্যে ভরা। এই ধরনের অবস্থা কখনো সহ্য করা যায় না।

এইভাবে এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ল জেভার্ত। তার সামনে এখন মাত্র দুটো পথই খোলা আছে। হয় তাকে ভলজাঁকে ধরে তাকে জেলে পাঠাতে...

নদীর ধার থেকে উঠে পড়ল জেভার্ত। মাথা উঁচু করে পথ হাঁটতে লাগল। সোজা প্লেস দ্য শ্যাতেলেত্তে থানায় চলে গেল। থানাটাতে তখন লণ্ঠনের আলো জ্বলছিল। সার্জেন্টকে তার কার্ড দেখিয়ে ঢুকে গিয়ে অফিস ঘরেব টেবিলে বসে রিপোর্ট লিখল জেভার্ত। রিপোর্ট লেখার পর এই ভাবে স্বাক্ষর করল, প্রথম শ্রেণীর ইনস্‌পেকটার জেভার্ত প্লেস দ্য শ্যাতেলেত্তে বসে এই রিপোর্ট লিখল, ৭ই জুন প্রায় রাত্রি একটা।

রিপোর্টের কাগজটা ভাঁজ করে তার উপর ঠিকানা লিখে থানা থেকে বেরিয়ে এল জেভার্ত। নদীর ধারের সেই জায়গাটাতেই ফিরে গেল সে। তখন আকাশে মেঘ থাকায় একটা তারাও দেখা যাচ্ছিল না। আশপাশের কোনও বাড়ির আলোও দেখা যাচ্ছিল না। রাস্তায় কোনও পথচারী ছিল না।

জেভার্ত নদীর ধারের যেখানটায দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে আমরা জানি নদীর স্রোত খুব প্রবল। মাঝিরা সেদিকে যায় না। সেখানে একবার পড়লে ভাল সাঁতার জানা লোকও উঠে আসতে পাবে না কখনো।

নিচে দিকে একবার তাকাল জেভার্ত। অন্ধকারে নদীর বুকটাকে দেখা যাচ্ছিল না মোটেই শুধু জলস্রোতের অবিরাম শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জেভার্তের মনে হলো সে যেন জগৎ ও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে। তার সামনে পৃথিবীর আর কোনও অংশ নেই, জীবন নেই, কোনও পথ নেই। তার সামনে আছে শুধু সর্বগ্রাসী এক শূন্যতা। অনেকক্ষণ ধরে নিশ্চল হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল জেভার্ত। পরে সে তার মাথার টুপিটা খুলে ঘাসের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। ক্রমে তার লম্বা চেহারা অন্ধকার নদীর দিকে ঝুঁকতে ঝুঁকতে অবশেষে পড়ে গেল।

জলের উপর একটা শব্দ হলো মাত্র, তারপরই সব শেষ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

মঁতফারমেল গাঁযের রাস্তামেরামতকারী বুলাত্রিউয়েলের কথা আমরা প্রথম দিকে আগেই বলেছি। তারপর কযেক বছর কেটে গেলেও তার তখনো বিশ্বাস ছিল মঁতফারমেলের প্রান্তবর্তী সেই বনটায গুপ্তধন আছে। সেই গুপ্তধনের মায়া সে তখনো ত্যাগ করতে পারেনি। তার আশা সে একদিন সে গুপ্তধন খুঁজে পাবেই। ইতিমধ্যে সে পকেটমারার কাজে মন দেয়।

কিন্তু একদিন ধরা পড়ে যেতে যেতে কোনওরকমে বেঁচে গিয়ে সে তার জীবনের পথ পরিবর্তন করে সুবুদ্ধির পরিচয় দেয়। একদিন জনদ্রেত্তে অঞ্চলে একটা বাড়ির ছাদে কয়েকজন চোর-ডাকাতের সঙ্গে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু সে তখন মাতাল অবস্থায় থাকার জন্য ছাড়া পায়, কারণ সে যে অসৎ উদ্দেশ্যে অপরাধের মনোভাব নিয়ে সেখানে ছিল, সে তখন মদের নেশার ঘোরে মাতাল অবস্থায় থাকার

জন্য তা প্রমাণ হয়নি। এরপর থেকে সে গ্যাগনি থেকে ন্যাগনি পর্যন্ত যে রাস্তাটা চলে গেছে সেই রাস্তায় পাথর ভাঙার কাজে যোগদান করে। কারণ মদ খাওয়ার জন্য তার টাকার দরকার।

একদিন সকালবেলায় সে তার কাজে যোগদান করার আগে মঁতফারমেল গাঁযের শেষে সেই বনটায় চলে যায়। বনের মধ্যে যেতেই সে একটি অচেনা লোকের পিঠটা দেখতে পায়। তার মনে হলো বছর কতক আগে সে যেন এই লোকটাকে দেখেছে এই বনে। বুলাত্রিউলের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল। তাই কথাটা মনে পড়ে গেল তার।

দখতে দেখতে লোকটা বনের মধ্যে অদৃশ্য হযে গেল কোথায। বুলাত্রিউল তাই একটা গাছের উপর উঠে লক্ষ্য করতে লাগল লোকটা কোথায যায। লোকটা গাছেব আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেও তার মনে হলো লোকটা এক জায়গায বসে কি কাজ করছে। তার মনে সন্দেহ জাগল।

বুলাত্রিউল তখন ধৈর্য ধরতে না পেরে গাছ থেকে নেমে লোকটা যেদিকে চলে গেছে সেইদিকে ঝোপঝাড ঠেলে এগিযে যেতে লাগল। কিন্তু লোকটা যেখানে ছিল বলে মনে হচ্ছিল তার সেখানে কোনওরকমে গিযে দেখল লোকটা সেখানে নেই। কতকগুলো পাথর আব জিঙ্ক প্লেট পডে রযেছে সেখানে। পাথরখণ্ডগুলোর মধ্যে একটা গর্ত রযেছে দেখল। কিন্তু সেটা পরীক্ষা করে দেখল বুলাত্রিউল, গর্তটা খালি।

বুলাত্রিউল হতাশ হয়ে বলে উঠল, পাজী বদমাস কোথাকার!

২

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বাড়িতে আসার পর জ্বর হয মেরিয়াসের। জ্বর বাড়াব সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বকতে থাকে সে। জ্বরের ঘোরে বারবার কসেত্তের নাম করতে থাকে। তার দেহের কতকগুলো ক্ষত ভয়ের কারণ হয়ে উঠল। কারণ ডাক্তার ভাবল সেগুলো থেকে গ্যাংগ্রীন হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া যেদিন খারাপ থাকত সেদিন ডাক্তারের ভয় হত বেশি।

ডাক্তার বলল, রোগী যেন কোনও অবস্থাতেই উত্তেজিত না হয়। তখনকার দিনে প্লাসটারের ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষতস্থান ধোয়া ও ব্যান্ডেজ করা বিশেষ কষ্টকর ছিল। এইভাবে দিনের পর দিন যেতে থাকে। মেরিয়াস যতদিন অসুখের ঘোরে থাকে এবং তার অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকে ততদিন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ নিদারুণ উদ্বেগে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকেন। তাঁকে দেখে জীবিত না মৃত তা বোঝাই যায় না।

দারোয়ান বলল, রোজ ভাল পোশাকপরা মাথায সাদা চুলওয়ালা এক ভদ্রলোক বাড়ির গেট থেকে মেরিয়াসের খবর নিয়ে যায় আর ব্যান্ডেজের জন্য কতকগুলো কাপড় দিয়ে যায়।

অবশেষে তিন মাস পর সেপ্টেম্বর মাসে একদিন ডাক্তার জানাল মেরিয়াসের বিপদ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। তবে তার ক্ষতস্থানগুলো সম্পূর্ণরূপে সারিয়ে তোলার

জন্য আরও ছ' মাস তাকে বিশ্রাম নিতে হবে, কোনও চলাফেরা করা যাবে না। এই বিশ্রামটা ভালই হলো মেরিয়াসের পক্ষে। কারণ তাহলে বিপ্লবী হিসাবে তার ধরপাকড়ের কোনও ভয় থাকবে না। ফ্রান্সে কোনও বিপ্লবের পর ছ' মাস কেটে গেলে বিপ্লবীদের শাস্তিদানের কথা সরকারের আ. মনে থাকে না। তাছাড়া কোনও গণবিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সব লোককে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও পুলিশের বড়কর্তা পিসকেড সব ডাক্তারদের উপর আদেশ জারি করেছিলেন কোনও আহত বিপ্লবী তাঁদের কাছে চিকিৎসা করতে এলেই তাঁরা যেন সরকারকে জানিয়ে দেন, তবু ডাক্তাররা সে কথা মানত না এবং সেদিক দিয়ে মেরিযাসেব কোনও বিপদ ছিল না।

মেরিয়াসের যতদিন জ্ঞান হয়নি, তার অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক, ততদিন মঁসিযে গিলেনর্মাদের মনে শান্তি ছিল না। তিনিও অনেক কষ্ট করেন। সেবার লোকের কোনও অভাব না থাকলেও তিনি ইচ্ছা করে অনেকদিন রাত জাগতেন। রোগীর সব বিষয়ে তদারক করতেন। কিন্তু মেরিয়াসের অবস্থা বিপদ থেকে মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে . . . উল্লসিত হয়ে উঠলেন তিনি। ডাক্তারের মুখ থেকে কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আনন্দেব আবেগে বাস্ককে তিন লুই বখশিস্ দিলেন। সে রাত্রিতে তিনি তাঁর ঘরে আপন মনে নাচগান করলেন। তারপর নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগলেন। বাস্ক এটা দরজার ফাঁক দিয়ে স্বচক্ষে দেখেছিল। অথচ তিনি এর আগে কোনওদিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেননি।

মেরিযাসের অবস্থা যত ভালর দিকে যেতে থাকে মঁসিযে গিলেনর্মাদও তেমনি শিশুর মতো আনন্দোচ্ছল হয়ে ওঠেন। একদিন তিনি পাশের বাড়ির এক সুন্দরী মহিলাকে একটা ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দেন। তাতে তার স্বামী রেগে যায়। এমন কি তিনি একদিন নিকোলেত্তেকে তাঁর কোলে বসাবার চেষ্টা করেন। মেরিয়াসকে তিনি মঁসিযে লে ব্যারন বলে ডাকতে থাকেন এবং একদিন 'প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক' বলে ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং বার্ধক্যের মাঝেও যেন অকাল যৌবনের অভ্যাগম হয়। তিনি এমন ভাব দেখাতে থাকেন যাতে মনে হত মেরিযাসই বাড়ির সর্বময় কর্তা।

এদিকে মেরিযাসের মনে একমাত্র কসেত্তের চিন্তা ছাড়া আব কোনও চিন্তা ছিল না। কে তাকে উদ্ধার করে এখানে নিযে আসে তা সে জানে না। কারণ সে তখন সম্পূর্ণ অচৈতন্য ছিল। এখানকার লোকরা বলে দু'জন অচেনা লোক তাকে একটা গাড়িতে করে এ বাড়িতে নিয়ে আসে। ব্যারিকেডে জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পর কি ঘটেছিল বা কারা ছিল সে বিষয়ে অস্পষ্ট একটা ছবি ভেসে ওঠে তার মনে। এপোনিনে, গাভ্রোশে, মেবুফ, থেনার্দিয়ের, আর তার বন্ধুদের কিছু কিছু কথা মনে পড়ে তার।

তার মাতামহ যতই তার জন্য উচ্ছ্বসিত বা উল্লসিত হোন না কেন, তাঁর সে উচ্ছ্বাসে বা উল্লাসে মেরিয়াস কোনও সময় সাড়া দিত না। একটা হিমশীতল ঔদাসিন্যে আচ্ছন্ন করে রাখত সে তার মনটাকে। সে তার মাতামহকে 'দাদু' বলেও ডাকত

না, মঁসিয়ে বলে ডাকত। সে মনে মনে সংকল্প করে বসেছিল, কসেত্তেকে সে খুঁজে বার করবেই এবং তাকে পাবার জন্য দাবি জানাবে সে তার মাতামহের কাছে। কিন্তু তিনি আগের মতো এ বিষয়ে অনমনীয় বা কঠোর থাকলে সে তার ক্ষতগুলো থেকে সব ব্যান্ডেজ তুলে দেবে এবং তার খাওয়া বন্ধ করবে। মনটা তাই আগে থেকে সে শক্ত করে রাখে।

একদিন সকালে মেরিয়াসের ঘরে খবরের কাগজ পড়তে পডতে ১৭৯৩ সালের ফরাসী বিপ্লবে যে কনভেনশন গঠিত হয় সেই কনভেনশন এবং দাঁতন, সেন্ট জাস্ট, রোবোসপীয়ার প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের নাম করেন গিলেনর্মাদ। তা শুনে মেরিয়াস বলে ওঠে, ১৭৯৩ সালের বিপ্লবী নেতারা সত্যিই বীরপুরুষ ছিলেন।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তখন আর কোনও কথা বলেননি। আপোসহীন রাজতন্ত্রী মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের এই অর্থপূর্ণ নীরবতার মাঝে এক অবদমিত ক্রোধের আভাস পেয়েছিল মেরিয়াস।

৩

একদিন যখন ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ মেরিয়াসের ঘর পরিষ্কার করছিল তখন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ মেরিয়াসের উপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে মাছ না খেয়ে মাংস খেতাম বেশি। কারণ মাংসই তাডাতাড়ি সারিয়ে তোলে মানুষকে।

মেরিয়াসের দেহে তখন শক্তি ফিরে এসেছিল। সে বিছানার উপর উঠে বসত। সে তার মাতামহের দিকে তাকিয়ে আক্রমণের ভঙ্গিতে বলল, আপনাকে একটা কথা বলার আছে।

কি কথা ?

আমি বিয়ে করতে চাই।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ হাসতে হাসতে বললেন, অবশ্যই, এটা এমন আর কি কথা!

'অবশ্যই' মানে কি আপনি বলতে চাইছেন ?

মানেটা খুবই সহজ! তুমি তাকে পাবে।

এক মধুর বিস্ময়ের আবেগে কাঁপতে লাগল মেরিয়াস।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ আবার বলতে লাগলেন, তুমি তাকে অবশ্যই পাবে। আমি খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, সে তোমাকে সত্যিই ভালবাসে। মেয়েটি সুন্দরী এবং ভদ্র। সে রোজ তোমার খবর নেয়। তুমি আহত হওয়ার পর থেকে সে তোমার জন্য কান্নাকাটি করে দিন কাটায়। সে সাত নম্বর র‍্য দ্য লা হোমি আর্মেতে থাকে। তুমি ভেবেছিলে কথাটা তুললে আমার সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে এবং একটা পাগলা ষাঁড়ের শিং ধরে তাকে বশ করতে হবে। আমি এত বোকা নই। আমি সব ঠিক করে রেখেছি। মেয়েটি তোমাকে এত ভালবাসে যে তোমার মৃত্যু ঘটলে সেও মারা যেত। তখন আমাদের মোট তিনজনের জন্য তিনটে কফিনের দরকার হত। আমি তাকে

তোমার বিছানার পাশে আনিনি, কারণ সেটা ভাল দেখায় না। কিন্তু জেনে রেখো, কসেত্তে তোমার এবং আমি তাকে তোমার হাতে তুলে দেবই। তোমরা বিয়ে করে সুখী হও এটাই আমি চাই।

এই কথা বলেই মেরিয়াসের মাথাটা বুকের উপর জড়িয়ে ধরলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ। ওরা দু'জনেই কাঁদতে লাগল।

মেরিয়াস ডাকল, দাদু!

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, তাহলে তুমি আমাকে সত্যিই ভালবাস ? তুই আমাকে অবশেষে দাদু বলে ডাকলি ?

এক পরম সুখের আবেশে দু'জনেই বিভোর হয়ে উঠল।

খুব আস্তে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে মেরিয়াস শান্ত কণ্ঠে বলল, দাদু, এখন আমি ভালই আছি। আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

অবশ্যই যাবে। কালই যাবে।

আজ নয় কেন ?

ঠিক আছে, আজই যাবে। তুমি তিনবার আমাকে দাদু বলেছ, তোমার আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেছে। আঁদ্রে শেনিয়েরের কবিতার এখানেই শেষ, যে আঁদ্রে শেনিয়েরের মাথাটা '৯৩ সালের বীর বিপ্লবীরা কেটে ফেলে।

কথাটা বলে ফেলেই ভুল করেছেন ভেবে শুধরে নিয়ে বলতে লাগলেন, না না, তারা সত্যিই বীর ছিল। তবে আঁদ্রে শেনিয়েরকে কোনও কারণে মানতে পারেনি বলে তাকে ফাঁসি দেয়।

এই বলে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ। মেরিয়াস তখন কসেত্তের কথাটা একমনে ভাবতে থাকায় তার দাদুর কথাটা ভাল করে শোনেনি বা সে কথায় কিছু মনে করেনি।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ ঘর থেকে বেরিয়েই বাস্ককে দেখতে পেয়ে তার জামার কলার ধরে বললেন, এই শয়তানটাই তাঁকে খুন করেছে।

বাস্ক ভয়ে ভয়ে বলল, কাকে খুন করেছে?

আঁদ্রে শেনিয়েরকে।

বাস্ক বলল, নিশ্চয় মঁসিয়ে।

৪

কসেত্তে আর মেরিয়াস আবার মিলিত হলো দু'জনে। মেরিয়াসকে যেতে হলো না। খবর দিয়ে কসেত্তেকে আনানো হলো মেরিয়াসের কাছে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বাড়িতে। সঙ্গে জাঁ ভলজাঁ মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত নাম ধারণ করে এল।

কসেত্তে মেরিয়াসের ঘরে ঢুকতেই বাড়ির সব লোক, সব চাকরবাকর এসে ভিড় করল তার চারদিকে। কসেত্তে যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করতে লাগল। কসেত্তের চেহারাটাকে যেন এক আলোর জ্যোতি ঘিরে ছিল। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ কসেত্তেকে

দেখেই বলে উঠলেন, চমৎকার। এতদিন পর মেরিয়াসকে দেখতে পেয়ে এক পরম সুখে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল কসেত্তে। দু'হাত দিয়ে মেরিয়াসকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু ঘরে অনেক লোক থাকায় তা পারছিল না।

কসেত্তের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত নামে জাঁ ভলজাঁ। তার পরনে ছিল সুন্দর কালো পোশাক। তার বগলে ছিল সবুজ কাগজে মোড়া একটা বড় প্যাকেট।

নিকোলেত্তে নিচু গলায় বলল, ঐ প্যাকেটে বই আছে?

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তার উত্তরে বললেন, বিদ্বান লোকদের বগলে বই থাকে সব সময়।

এবার মাথাটা নত করে গলা উঁচু করে বলতে লাগলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ, মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত! আমি আমার কন্যার পুত্র ব্যারন মেরিয়াস পঁতমার্সির পক্ষ থেকে বিবাহের জন্য আপনার কন্যার পাণি প্রার্থনা করছি।

মানুষের নামের আদি অক্ষরটা মনোযোগ দিয়ে না শুনে বিকৃত করে উচ্চারণ করাটা মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের এক অভিজাতসুলভ অভ্যাস।

নীরবে মাথা নত করল মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, তাহলে তো সব ঠিক হয়ে গেল।

এরপর মেরিয়াস আর কসেত্তের কাঁধের উপর দুটো হাত রেখে বললেন, এবার তোমরা অবাধে ভালবাসতে পার পরস্পরকে।

একথা আর দু'বার বলার প্রয়োজন ছিল না। কসেত্তেই প্রথমে কথা শুরু করল। মেরিয়াসের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে। আর সেই বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কসেত্তে বলতে লাগল, তোমার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে একথা ভাবতেই পারিনি। কেন তুমি যুদ্ধ করতে গিয়েছিলে? কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! চার মাস আমার কিভাবে যে কেটেছে তুমি তার কি জানবে? আমার প্রায়ই মনে হত আমি যেন আর বেঁচে নেই। আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। তবু তুমি যুদ্ধে গিয়ে নিষ্ঠুরের মতো কাজ করেছ। যা হোক, এবারকার মতো ক্ষমা করলাম। ভবিষ্যতে আর যেন কখনো এ কাজ করো না। চারমাস ধরে শুধু চোখের জল ফেলেছি। তারপর যখন এখানে আসার জন্য আমাকে খবর দেওয়া হলো তখন আমার মনে হলো আনন্দের আবেগে আতিশয্যে আমি বোধ হয় মারা যাব। আমি ভাল করে সাজগোজ করিনি।...তুমি কোনও কথা বলছ না কেন? আমিই শুধু বকে চলেছি। আমরা লা হোমির বাড়িতেই আছি। তোমার দাদু তো ভালই লোক। না, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করো না, এতে খারাপ হতে পারে। আজ আমার কি সুখ! এখন আমাদের বাড়িটাতে কিন্তু বাগান নেই।

মেরিয়াস শুধু প্রেমিক হিসাবে অতি সাধারণ একটা কথা বলল, হে আমার দেবদূত!

কথাটা বলে ঘরে অনেক লোক থাকায় চুপ করে গেল। তারা শুধু পরস্পরের হাত ধরল।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ ঘরে উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা গোলমাল করো না, ওরা তাহলে কথা বলতে পারবে না।

এরপর কসেত্তে ও মেরিয়াসের উপর ঝুঁকে বললেন, সহজভাবে কথা বলে যাও তোমরা, ভয় করো না।

ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ সাতান্ন বছর বয়সে বিস্ময়ের সঙ্গে যেন এক সফল প্রেমের বিজয় গৌরব দেখছিল। তার সে দৃষ্টির মধ্যে কোনও ঈর্ষা বা আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

তার বাবা একবার একসময় তাকে নিচু গলায় বললেন, এরকম ঘটবে আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম।...পরের প্রেমের সুখ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

এবার মেরিয়াস ও কসেত্তের সঙ্গে ঠাট্টা করতে লাগলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ। বললেন, মেরিয়াস, তুই একটা পাজী বদমাস ছেলে, ছবির মতো সুন্দর মুখওয়ালা এই মেয়েটা একা তোর হবে! আমার বয়স যদি এর থেকে আর পনের বছরের কম হত তাহলে আমি এই মেয়েটার জন্য তোর সঙ্গে ডুয়েল লড়তাম। হে সুন্দরী তরুণী, আমিও তোমার প্রেমে পড়েছি। বিয়েটা খুব ভাল করেই দিতে হবে। আমাদের এ অঞ্চলেও একটা চার্চ আছে। কিন্তু তোমাদেব বিয়েটা দেওযা হবে সেন্ট পল চার্চে। জেসুটদের দ্বারা নির্মিত ঐ চার্চ আরও অনেক ভাল। সেন্ট লুই গীর্জার কারুকার্য আরও অনেক ভাল। সেখানে তোমরা যাবে বিয়ে হবার পর। হে তরুণী, এখন বিবাহিত হযে সুখী ও সন্তানবতী হও। নারীদের এটাই ধর্ম, আচ্ছা মেরিয়াস, তোমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না?

মেরিয়াস বলল, হ্যাঁ ছিল। তার নাম কুরফেরাক।

সে এখন কোথায়?

সে মারা গেছে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ এতক্ষণে কসেত্তেকে বসতে বললেন। এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর আবার বলতে লাগলেন, কসেত্তে এত সুন্দরী যে তাকে একাধারে তরুণী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা বলে মনে হচ্ছে। যাই হোক, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমার বিষয় সম্পত্তি যা কিছু আছে তার আয় উপস্বত্ব সব বার্ষিক বৃত্তি হিসাবে ধার্য করা আছে। আমার মৃত্যুর পর কি করবে তোমরা?

এমন সময় মঁসিয়ে ফশেলেভেন্তের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে বলল, ম্যাদময়জেল ইউফ্রেসি ফশেলেভেন্তের ছয় লক্ষ ফ্রাঁ আছে।

জাঁ ভলজাঁ এতক্ষণ চুপ করে সব কথা শুনে যাচ্ছিল আর প্রেমিকদের কথা ভাবছিল তন্ময় হযে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, ম্যাদময়জেল ইউফ্রেসি কে?

কসেত্তে বলল, আমি মঁসিয়ে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ আশ্চর্য হয়ে বললেন, ছয় লক্ষ ফ্রাঁ!

ভলজাঁ বলল, ছয় লক্ষ থেকে কিছু কম।

এই বলে সে তার বগল থেকে কাগজে মোড়া প্যাকেটটা বার করে ম্যাদময়জেল

গিলেনর্মাদের কাছে জমা দিয়ে সেটা গুণতে বলল। সেই প্যাকেটটা ব্যাঙ্কনোটে ভর্তি ছিল। এক হাজার ফ্রাঁর নোটই বেশি, কিছু একশো ফ্রাঁর নোটও ছিল।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ তাঁর মেয়েকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, তাহলে তো সব ব্যাপার চুকেই গেল। পাজী বদমাস মেরিয়াস তার স্বপ্নের পুরীতে এক রাজকন্যাকে পেয়ে গেছে। একটা যুবক ছাত্র সে এমন একটি মেয়েকে পেয়ে গেল যার আছে ছয় লক্ষ ফ্রাঁ।

ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ বলল, পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার মানেই ছয় লক্ষ।

এই সব টাকার হিসাবের দিকে মন না দিয়ে মেরিয়াস ও কসেত্তে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

৫

পাঠকদের হয়ত মনে আছে শ্যাম্প ম্যাথিউকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে যায় তারপর ধরা পড়ার ভয়ে ভলজাঁ লাফায়েত্তে ব্যাঙ্ক থেকে তার ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার ফ্রাঁ তুলে সেই সব ব্যাঙ্কনোটগুলো মঁতফারমেল বনের মাঝে এক জায়গায় পুঁতে রেখে আসে। তারপর যখন যেখানেই থাকত সে দরকারমতো টাকা সেখান থেকে নিয়ে আসত। তার থেকে এতদিন খরচ চালাবার পর সে মাত্র পাঁচশো ফ্রাঁ তার কাছে রেখে বাকি টাকা সে কসেত্তের যৌতুকস্বরূপ মেরিয়াসের মাতামহের হাতে তুলে দিল।

এদিকে বিয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। তখন ডিসেম্বর মাস চলছিল। ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করায় ডাক্তার পরামর্শ দেয় ফেব্রুয়ারি মাসে বিয়েটা হোক।

বিয়ের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাওয়ায় প্রেমিকরা সুখে দিন কাটাতে লাগল সমস্ত দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত হয়ে। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদেরও সুখের পরিমাণ কম ছিল না। তিনি প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কসেত্তের কথা ভাবতেন।

তিনি একদিন বললেন, আমি এমন সুন্দরী, শান্ত ও আনন্দদায়িনী মেয়ে জীবনে কখনো দেখিনি। বৎস মেরিয়াস, তুমি একজন ব্যারন এবং ধনী। ওকালতি করে বৃথা সময় নষ্ট করো না।

মেরিয়াস একদিন কসেত্তেকে বলল, দাদুর কথা সব বুঝতে পারছ?

কসেত্তে বলল, না। আমি শুধু অনুভব করছি ঈশ্বরের সদয় দৃষ্টি আমাদের উপব আছে।

এদিকে জাঁ ভলজাঁ নিজে একদিন মেয়র থাকায় কসেত্তের সামাজিক মর্যাদা ও জন্মপরিচয় সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা করে ফেলল। সে দেখাল দুই ফশেলেভেন্ত ভ্রাতা পেতিত পিকপাসের কনভেন্টে একসময় মালীর কাজ করত। কসেত্তে হচ্ছে তার বড় ভাই-এর মেয়ে এবং বড় ভাই মারা যাওয়ার পর কসেত্তের অভিভাবক হয়ে ওঠে সে। কসেত্তের নাম ইউফ্রেসি ফশেলেভেন্ত। এই মর্মে সে কাগজপত্রও সব ঠিক করে ফেলল। কনভেন্টের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সাক্ষী আছে।

যৌতুকের সব টাকা এক ট্রাস্টির মাধ্যমে কসেত্তের নামে রাখা হলো। তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সে টাকা সে পাবে। উত্তরাধিকারসূত্রে সে মোট পায় পাঁচ লক্ষ চুরানব্বই হাজার ফ্রাঁ, তার থেকে দশ হাজার ফ্রাঁ তার শিক্ষাবাবদ খরচ হয়।

কসেত্তে যদিও বুঝল, যে ফশেলেভেন্তকে সে এতদিন তার বাবা বলে জেনে এসেছে সে তার পিতা নয়, পিতৃব্য, তথাপি সে তাকে বাবা বলেই ডেকে যেতে লাগল। যদিও তার অতীত জীবন ও জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে এক রহস্য তাকে তখনো ঘিরে ছিল তথাপি সে রহস্য নিয়ে আর সে মাথা ঘামাল না, কারণ সে তার মেরিয়াসকে পেয়ে গেছে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদকে তার ভালই লাগে। তিনি নিত্য নতুন ভাল ভাল পোশাক উপহার দেন।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বাড়িতে তখন রোজ উৎসবের হাওয়া বইছিল। তিনি আসন্ন বিয়ে উপলক্ষে উৎসব আর জাঁকজমকের কথা বলতেন বারবার আর সেই সব কথা ভাবতেন।

তিনি একদিন মেরিয়াসকে বললেন, ভালবাসা ব্যাপারটা খুবই ভাল। কিন্তু তার সঙ্গে আরও কিছু চাই। প্রেমের সুখের সঙ্গে চাই ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্য। এ ব্যাপারে কিছু অমিতব্যয়িতা, কিছু আতিশয্য থাকবেই। কিন্তু উনিশ শতকের লোক উৎসব বা আনন্দ করতে জানে না। তারা জানে না ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যহীন প্রেমের আনন্দ বা সুখ হচ্ছে মাখনহীন রুটির মতো। তা কোনও রকমে গলাধঃকরণ হয়, কিন্তু তা তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হয় না, তা দিয়ে ভোজসভার অনুষ্ঠান হয় না। উৎসবের মধ্যে কিছু ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের প্রকাশ থাকবে। থাকবে আতিশয্য। কিন্তু আজকের লোকেরা সে আতিশয্যকে বুর্জোয়া ভাবধারা বলে তাকে এড়িয়ে চলে, কারণ তারা বেশি মিতব্যয়ী সাজতে চায়। কিন্তু তারা জানে না হেলেনের রূপসৌন্দর্যের সঙ্গে তার পোশাকের জাঁকজমক না থাকলে ট্রয়যুদ্ধ হত না। আজ হোমার বেঁচে থাকলে কসেত্তেকে নিয়ে তিনি ইলিয়াড মহাকাব্য লিখতেন এবং সে মহাকাব্যে আমি হতাম বৃদ্ধ বিজ্ঞ নেস্টার। আজ জাতির জীবন থেকে জাঁকজমক চলে গেছে। বিপ্লবের পর থেকে আজকের লোকেরা পাতলুন পরে। তারা মনে করে তাদের ভাল দেখায়, কিন্তু তাতে তাদের খারাপই দেখায়। তাদের নাচগানের মধ্যেও কোনও অনাবিল আনন্দ নেই! নাচগানের মধ্যেও তারা নীতিশিক্ষা চায় কোনও না কোনও। চার্চে বিয়ের প্রথাগত অনুষ্ঠান গুরুগম্ভীর হোক, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের পর উৎসব হবে জাঁকজমকপূর্ণ। কোনও কার্পণ্য সেখানে চলবে না। উৎসবের দিন গাছে গাছে বেহালা বাজবে, আকাশ থাকবে রূপালি আর নীল, পরীর মতো নগ্ন মেয়েরা নাচবে।

ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ তার স্বভাবসুলভ ঔদাসিন্যের সঙ্গে এই সব কিছু প্রত্যক্ষ করে যেত। বিপ্লব এবং ব্যারিকেডের যুদ্ধে যোগদান, মৃতের মতো মেরিয়াসের বাড়িতে ফিরে আসা, তার প্রেম, তার বিয়ের ব্যাপার এবং যৌতুকস্বরূপ ধনসম্পদলাভ—এই

সব ঘটনা অভিভূত করে তোলে তাকে। ফলে সে নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়ে আরও বেশি করে ঈশ্বরচিন্তা আর উপাসনার মধ্যে ডুবে যায়। সে বেশি করে মালা জপ করতে থাকে।

মেয়ের এই ক্রমবর্ধমান ঔদাসিন্য দেখে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ একদিন বললেন, সর্দি হলে মানুষ যেমন কোনও গন্ধ অনুভব করতে পারে না, তোমারও তাই অবস্থা হয়েছে।

টাকার ব্যাপারে ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদের একটা দায়িত্ব ছিল। তার বাবার বেশি টাকা নেই। কিন্তু তার মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে সে ধনী। মেরিয়াস যদি বিনা যৌতুকে এক গরীব ঘরের মেয়েকে বিয়ে করত তাহলে তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হত। কিন্তু মেরিয়াস এ বিয়েতে অনেক টাকা পাওয়ায় সে ভাবনা আর ভাবতে হবে না তাকে। সে টাকায় তাদের জীবন ভালভাবেই কেটে যাবে।

ঠিক হলো, বিয়ের পর মেরিয়াস কসেত্তেকে নিয়ে তার মাতামহের বাড়িতেই থাকবে। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন তাঁর শোবার ঘর হবে মেরিয়াসদের শোবার ঘর। আর তাঁর লাইব্রেরি হবে ওকালতির অফিস ঘর। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, তাঁর শোবার ঘরে নবদম্পতিরা শুলে তিনি নবযৌবন লাভ করতেন তাদের মতো। তাঁর ঘরে তাদের মধুচন্দ্রিমা হবে, এটা কত বড় সুখের কথা তাঁর পক্ষে।

কসেত্তে রোজ মঁসিয়ে ফশেলেভেন্তকে সঙ্গে করে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বাড়িতে আসত। ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ একদিন বলল, মেয়ে পুরুষের কাছে রোজ আসবে এটা দেখতে খারাপ লাগে। কিন্তু মেরিয়াসের পক্ষে এখন বেশি চলাফেরা করা উচিত নয়, তার জন্য কসেত্তেকে আসতে হত। তাছাড়া মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ কসেত্তের উপস্থিতি এবং সাহচর্য পছন্দ করতেন এবং তাদের রোজ তাঁর বাড়িতে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন বলে না এসে পারত না তারা।

যেন এক গোপন চুক্তি অনুসারে মেরিয়াস আর মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত কেউ কারো সঙ্গে কোনও কথা বলত না। মাঝে মাঝে মেরিয়াস রাজনীতি নিয়ে দু'-একটা কথা বলত। দেখত তাঁর সঙ্গে মঁসিয়ে ফশেলেভেন্তের মতের মিল হচ্ছে এবং সে অল্প দু'-চার কথায় উত্তর দিচ্ছে। একদিন মেরিয়াস বলল, রাষ্ট্রের সকলের জন্য অবাধ শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। ফশেলেভেন্ত একথা মেনে নিল। মেরিয়াস দেখল ফশেলেভেন্তের ভাল ভাষাজ্ঞান ও চিন্তাশক্তি আছে এবং সে ভাল কথা বলতে বা আলোচনা করতে পারে।

কিন্তু এই লোককেই সে সেদিন ব্যারিকেডে দেখেছিল কিনা তা ঠিকমতো স্মরণ করতে পারে না মেরিয়াস। মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত তার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কেন্দ্র করে ব্যারিকেডে সেদিনকার সেই যুদ্ধের কথা মনে পড়ে। মঁসিয়ে মেবুফ, এপোনিনে ও গাভ্রোশের মৃত্যুর কথা একে একে মনে পড়ে তার। কিন্তু সে গুলির আঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়ার পর থেকে আর কোনও কথা মনে নেই তার। কিছু জানতেও পারেনি। এঁজোলরাস, কুরফেরাক, কমবেফারে, জাঁ প্রুভেয়ার প্রভৃতি তার

বন্ধুরা কি সব মারা গেছে? যদি তারা বেঁচে থাকে তাহলে আজ তারা কোথায় গেল? আজ সে ধনী, তার আর আগেকার সেই দুরবস্থা নেই। সে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রেমিকার সঙ্গে পরিণীত হতে চলেছে। তবু তার বন্ধুদের কথা ভেবে দুঃখ হয়। আজ তার পাশে কসেত্তে না থাকলে, কসেত্তের প্রেমচেতনা তাকে আচ্ছন্ন করে না থাকলে সে দুঃখ ভুলতে পারত না সে কিছুতেই।

তার বিছানায় কসেত্তের পাশে যখন বসে থাকে ফশেলেভেন্ত, মেরিয়াস তখন তার পানে বরাবর তাকিয়েও বুঝতে পারত না, এই লোক আর সেদিন ব্যারিকেডে দেখা সেই লোক এক কি না। কথাটা একদিন তোলে মেরিয়াস। ফশেলেভেন্তকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা শাঁভ্রেরির সেই ব্যারিকেডের কথাটা মনে আছে আপনার?

ফশেলেভেন্ত আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, কোন শাঁভ্রেরি? আমি তো তার কিছুই জানি না।

এরপর চুপ করে গেল মেরিয়াস। বুঝল, সেই মানুষ আর এই মানুষ এক নয়, দু'জনের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য আছে। সে মানুষটি দেখতে অনেকটা এর মতো হলেও দু'জনে এক নয়।

৬

প্রেমাবেগে মত্ত হয়ে থাকলেও কয়েকটা চিন্তার পীড়ন থেকে মনটাকে মুক্ত করতে পারল না মেরিয়াস। মনে মনে সংকল্প করে বসল সে, বিয়ের আগে দুটি লোককে কৃতজ্ঞতাবোধ ও মানবতার খাতিরে খুঁজে বার করতেই হবে। তাদের একজন হলো থেনার্দিয়ের যে তার বাবা ব্যারন পঁতমার্সিকে বাঁচিয়েছিল। তার প্রতি সে তার যথাকর্তব্য পালন করতে পারেনি। আর একজন হলো যে তাকে ব্যারিকেডের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অচৈতন্য অবস্থায় এ বাড়িতে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। তার প্রতিও তার একটা কর্তব্য আছে। তার প্রাণরক্ষার জন্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও পারেনি সে। এই দুটি কর্তব্য পালন না করে নতুন জীবনে প্রবেশ করলে সে জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

থেনার্দিয়ের একটা আস্ত শয়তান, একটা পাকা দুর্বৃত্ত এ কথা সত্যি হলেও সে যে তার বাবাকে ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে এবং তার প্রাণ বাঁচায় এ বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নেই। সে তাই লোক পাঠিয়ে তার খোঁজ নেবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ থেনার্দিয়েরের বর্তমান ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারল না। শুধু জানা গেল থেনার্দিয়ের জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। তার স্ত্রী জেলের মধ্যেই মারা গেছে। তার বড় মেয়ে এপোনিনে মারা গেছে তার বড় ছেলে গাভ্রোশে মারা গেছে। আজেলমা তার বাবার কাছে আছে। তার বাকি দুটি ছেলে নিরুদ্দেশ। কোথায় তারা আছে তা কেউ জানে না।

থেনার্দিয়েরের স্ত্রী মারা গেছে, বুলাত্রিউল ছাড়া পেয়েছে, ক্লাকেসাস, ব্রুঁজ প্রভৃতি দুর্বৃত্তেরা জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ায় গর্বোর মামলাটা খারিজ করে দেওয়া হয়। এছাড়া থেনার্দিয়ের সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।

আর যে লোকটি মেরিয়াসকে ব্যারিকেড থেকে বাড়িতে দিয়ে যায় তার সম্বন্ধেও খোঁজ নিয়ে বিশেষ কিছু জানতে পারেনি মেরিয়াস। যে ঘোড়ার গাড়িটি তাকে এখানে নিয়ে আসে তার খোঁজ পেয়েছিল অনেক চেষ্টার পর। কিন্তু চালক বলে, সেদিন সে একজন পুলিশ অফিসারের আদেশে অনেকক্ষণ ধরে সেন নদীর ধারে অপেক্ষা করেছিল। সন্ধ্যার দিকে শহরের বড় ঢাকা নর্দমাটা যেখানে নদীর কাছে এসে শেষ হয়েছে, সেই গেটের মুখে একজন লোক সহসা মৃতবৎ একটি আহত লোককে তুলে নিয়ে আসে। পুলিশ অফিসার তাকে দেখে গ্রেপ্তার করে এবং আমার গাড়িতে করে আহত লোকটিকে এই বাড়িতে দিয়ে যায়। তারপর আমাকে র‍্যু হোমি অঞ্চলে যেতে বলে। আমি তখন র‍্যু দে আর্বিডের গলির মুখে গাড়ি থামাই এবং তারা দু'জন গলিপথে ঢুকে সেই পথ দিয়ে চলে যায়। এরপর আর আমি কিছু জানি না।

মেরিয়াস ভাবতে লাগল, কোনও পুলিশ নিশ্চয় তাকে ব্যারিকেড থেকে নদীর ধারে তুলে আনেনি। কোনও একজন লোক নিশ্চয় তাকে বয়ে এনেছে এবং সে নিশ্চয় ঢাকা নর্দমার ভিতর দিয়ে তাকে বয়ে আনে। এটা তার আত্মত্যাগের আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। আজ সে তার সেই উদ্ধারকর্তা ও পরিত্রাতাকে খুঁজে বার করতে চায়, অথচ কোনও খোঁজ পাচ্ছে না। গাড়ির চালক বলে পুলিশ তাকে সেদিন গ্রেপ্তার করে। সেই সূত্র ধরে স্থানীয় থানায় গিয়ে সে খোঁজ নেয়। কিন্তু পুলিশ বলে সেদিন কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। হলে তার রেকর্ড থাকত। পুলিশ বলল, গাড়িচালক একথা বানিয়ে বলেছে।

ক্রমে রহস্যটা ঘোরাল হয়ে উঠল মেরিয়াসের মনে। তার উদ্ধারকর্তা সেই লোকটিকে হয়ত বিপ্লবী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু সে গেল কোথায়? তাকে যে গ্রেপ্তার করেছিল সেই পুলিশই বা গেল কোথায়? তবে কি গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য আসামী পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বশীভূত করে পালিয়ে গেছে? কিন্তু মেরিয়াসের সঙ্গে দেখা করবে না কেন, যাকে বাঁচাবার জন্য এত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে একাজ করেছে সে বেঁচে রইল কি না, তার খবর নিল না কেন? বাস্ক আর নিকোলেত্তে এসব কিছুই দেখেনি। একমাত্র বাড়ির দারোয়ান বাতি হাতে মেরিয়াসের উদ্ধারকর্তা সেই লোকটিকে দেখেছিল। কিন্তু তার মুখ তখন এমন কাদা ও রক্তমাখা ছিল যে তাকে দেখলে এখন হয়ত চিনতেই পারবে না।

একদিন সন্ধেয় মেরিয়াস কসেত্তে আর ভলজাঁর সামনে তার উদ্ধারকর্তা সম্বন্ধে এই রহস্যের কথাটা তোলে। কিন্তু ভলজাঁর ঔদাসিন্য দেখে মেরিয়াস রেগে গেল। রাগতভাবে সে বলতে লাগল, জানেন মঁসিয়ে, সে কি করেছে আমার জন্য? স্বর্গ থেকে সে যেন দেবদূতের মতো এসে পড়ে। সে তার নিজের জীবন বিপন্ন করে আমায় যুদ্ধের জায়গা থেকে তুলে নিয়ে ঢাকা নর্দমার মধ্যে ঢুকে মাটির তলার সুড়ঙ্গপথ দিয়ে আড়াই মাইল পথ কাদাজলের মধ্যে হেঁটে আমাকে বাইরে আনে। বাইরে আসার পরেই সে গ্রেপ্তার হয়: এতকিছু করেছিল সে শুধু একজন মুমূর্ষু লোককে বাঁচাবার

জন্য। কোনও পুরস্কার সে পায়নি, বা চায়নি। আজ আমি যদি তাকে খুঁজে পাই তাহলে তার জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত দিতে পারি। হায়, কসেত্তের ঐ টাকা যদি আমার হত।

ভলজাঁ বাধা দিয়ে বলল, ওটা তোমারই টাকা।

মেরিয়াস বলল, আমি তাকে খুঁজে বার করার জন্য ঐ সব টাকা খরচ করব।

জা ভলজাঁ চুপ করে রইল। কোনও কথাই বলল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

১৮৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আবহাওয়াটা ছিল মোটামুটি ভাল। রাত্রিতে অন্ধকার থাকলেও আকাশটা ছিল পরিষ্কার। এই রাত্রিতেই মেরিয়াস আর কসেত্তের বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন মাঝে মাঝে এক পশলা করে বৃষ্টি হলেও পরক্ষণেই পরিষ্কার হয়ে যেত আকাশটা।

বিয়ের দিনকতক আগে ছোটখাটো এক পথদুর্ঘটনায় জা ভলজাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে চোট লাগে। আঘাতটা খুব বেশি না হলেও ডান হাতটা তার গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। তার হয়ে তার অনুমতি নিয়ে বিয়ের কাগজপত্রে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ স্বাক্ষর করেন। বিয়ের কথাটা যেদিন স্থির হয় সেদিন যে টাকাটা ভলজাঁ মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের কাছে রাখতে দিয়েছিল, বিয়ের আগের দিন সে টাকাটা সে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের সামনে মেরিয়াসের হাতে তুলে দেয়।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের ইচ্ছানুসারে বিয়ের উৎসবটা হবে 'মার্দিগ্রাস' ধরনের। তখনকার দিনে ফ্রান্সে অভিজাত সমাজে এই ধরনের বিবাহোৎসবই অনুষ্ঠিত হত।

অনেকগুলি গাড়িসহ বিয়ের শোভাযাত্রা রু্য দে কালভেরির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেন্ট পল চার্চের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রথম গাড়িতে ছিল কসেত্তে, ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ, মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ আর জা ভলজাঁ। দ্বিতীয় গাড়িতে ছিল মেরিয়াস। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বহু আত্মীয়-কুটুম্ব নিমন্ত্রিত হয়। তাদের নিয়ে অনেক গাড়ি শোভাযাত্রায় যোগদান করে। দেখা গেল গাড়ির লাইন ম্যাদলেন থেকে বাস্তিল পর্যন্ত চলে গেছে। কতকগুলি খোলা গাড়িতে মুখোশধারী ছেলেমেয়েরা নানা অঙ্গভঙ্গিসহকারে নাচছিল। কুৎসিত নাচের মধ্য দিয়ে সমাজের অনেক দুর্নীতিকে দেখাচ্ছিল তারা। কুৎসিত হলেও তা দেখে রাস্তার দু'পাশে ভিড় করে থাকা দর্শকরা হাসাহাসি করছিল। শোভাযাত্রা চলাকালে একসময় থেনার্দিয়েরের ছোট মেয়ে আজেলমা শীতে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তার ধার থেকে একজন যুবককে প্রথম গাড়িতে বসে থাকা ভলজাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ঐ ভদ্রলোককে চেন?

যুবকটি বলল, না, তুমি চেন?

আজেলমা বলল, কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে। মনে হয় ও-ই মেয়ের বাবা। শোভাযাত্রা কোথায় যায় এবং কোন বাড়িতে ফিরে আসে তা অনুসরণ করে দেখ।

যুবক বলল, তাতে লাভ কি?

পরে কাজে লাগতে পারে। ওরা ধনী লোক।

তুমি দেখ না কেন!

আমি রাস্তায় বার হলেই পুলিশ ধরবে।

আমাকেও ধরবে।

সব মানুষের স্বপ্ন কখনো সফল হয় না। মানুষের স্বপ্নপূরণের ব্যাপার নিয়ে স্বর্গে হয়ত দেবদূতদের মধ্যে ভোট হয়। সেই ভোটে কসেত্তে আর মেরিযাস জযলাভ করে। তাদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয।

বিয়ে্র আনুষ্ঠানিক সব কাজকর্ম সেন্ট পল চার্চে ঠিকমতো সম্পন্ন হলো। কসেত্তেকে জমকালো পোশাক পরিয়ে তুসাঁ সাজিযে দিযেছিল। এবার থেকে কসেত্তেব খাস ঝি হিসাবে তুসাঁ তার কাছেই থাকবে। ভলর্জাঁ ঠিক করে দিযেছে। মঁসিযে গিলেনর্মাদ তার বাড়িতে ভলর্জাঁর জন্য একটা ঘর নির্দিষ্ট করে রেখে দিযেছিলেন। বিযের পর সে সেখানেই থাকবে এবং এতে সে রাজী হয়েছে।

তুসাঁ আর নিকোলেত্তে দু'জনে মিলে সাজিয়েছে কসেত্তেকে। দুধের মতো ঝকঝকে সাদা পোশাক, গলায মুক্তোর হার, মাথায় কমলালেবু রঙের মুকুট। তাকে দেবীর মতো মনে হচ্ছিল। মেরিয়াসের পরনে ছিল কালো পোশাক। তাব মাথার সুন্দর চুলগুলোতে সুবাস মাখানো হযেছিল। কপালে দু'-একটা ক্ষতেব দাগ তখনো দেখা যাচ্ছিল।

চার্চের অনুষ্ঠান শেষ হযে গেলে মেরিয়াস আর কসেত্তে একটি গাড়িতে সামনের সীটে পাশাপাশি বসল। তাদের পিছনের সীটে বসলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ আর জাঁ ভলর্জাঁ। কসেত্তে একসময মেরিয়াসের কাঁধের উপর ঝুঁকে বলল, আজ থেকে তোমার নাম আমার নাম এক হয়ে গেল। আমি হব মাদাম তুমি।

অতীতে তারা একসময় দারুণ দুঃখকষ্ট পেয়েছে বলে আজকের সুখটাকে অনেক বড় অনেক মধুর বলে মনে হলো তাদের। কসেত্তে আরও চুপি চুপি বলল, আমরা কিন্তু রুা প্লামেতের বাগানে একবার যাব।

রুা কালভেরির বাড়িতে ফিরে এল তারা। বাড়ির সদর দরজার কাছে অনেক ভিখারি ও গরীবদুঃখী জড়ো হয়েছে। তাদের সবাইকে ভিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল।

বরকনে বাড়ির ভিতর ঢুকলে নিমন্ত্রিত অতিথিরা বসার ঘরে বসল। ভোজসভার ঘরে তখন খাবার দেওয়া হচ্ছিল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আত্মীয় হিসাবে ক্যাপ্টেন থিওদুলও ছিল। সে কিন্তু কসেত্তেকে দেখে চিনতে পারেনি। অনেক মেয়েকে সে ভালবাসায় কোনও বিশেষ মেয়ের প্রতি কোনও আসক্তি দানা বাঁধে না তার মনে এবং বিশেষ কোনও মেয়ের কথা মনেও রাখে না সে।

জাঁ ভলর্জাঁ ঘরের এক কোণে একটি টেবিলের ধারে বসেছিল। কসেত্তে একসময় তার কাছে গিয়ে বলল,' বাবা তুমি খুশি তো?

হ্যাঁ মা, খুব খুশি।

তবে হাসছ না কেন?

এই তো হাসছি।

এর পরই বাস্ক অতিথিদের ডাকল। বলল, খাবার ঘরে আসুন।

ভোজসভায় কসেত্তের চেয়ারের দু'পাশে দুটি আর্মচেয়ার রাখা হয়েছে। তার একটি মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের জন্য আর একটি জাঁ ভলজাঁর জন্য। কিন্তু মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত ঘরের মধ্যে কোথাও নেই। বাস্ককে জিজ্ঞাসা করা হলো সে কিছু জানে কিনা।

বাস্ক বলল, মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত তাঁর হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে বলে কোথায় চলে গেছেন। বলে গেছেন আগামীকাল সকালে আসবেন।

ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিলেন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ। তিনি বললেন, যন্ত্রণা হওয়ার জন্য ভোজসভা থেকে সরে গিয়ে ভালই করেছেন মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত। অতিথিরাও সহজভাবে নিল ব্যাপারটাকে।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ বললেন, মঁসিয়ে ফশেলেভেন্তের খালি চেয়ারটায় যদিও মেরিয়াসের মাসির বসার অধিকার, তথাপি মেরিযাস তাতে বসবে। কারণ তার মাসি এসব পছন্দ করে না।

মেরিযাস সে চেয়ারটাতে বসাতে সবাই খুশি হলো। বিশেষ করে ভলজাঁর অনুপস্থিতিতে কসেত্তের মনটা খারাপ হযে যায, মেরিযাস তার কাছাকাছি বসাতে সে খুশি হলো। মেরিয়াস কাছে থাকলে এমন কি ঈশ্বরের অনুপস্থিতিকেও সহ্য করবে সে এবং তার দুঃখের কিছু থাকবে না।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ উঠে দাঁড়িযে একটা মদের গ্লাস হাতে করে বরবধূর স্বাস্থ্যপান করলেন। তিনি বরবধূকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, তোমরা সুখী হও। এ বিযযে দার্শনিকদের কথা শুনবে না। তাঁরা বলেন, আনন্দ উৎসবের ব্যাপারে মধ্যপন্থী হবে, সংযতভাবে আনন্দ করবে। কিন্তু আমি বলি আনন্দে মত্ত হয়ে উঠবে। দার্শনিকরা নিপাত যাক! তাদের বাজে কথায় কান দেবে না। আমরা কি ভালর জন্য মঙ্গলের জন্য সুখী হই না কি সুখের জন্যই ভাল হই? জীবন এই সব ধাঁধার মতো প্রশ্নে ভবা। আমরা তার উত্তর জানি না। আমরা শুধু অন্ধ উপাসকের মতো সুখরূপ সূর্যের সাধনা করে যাব। প্রেমই হলো এই সুখের সূর্য আর প্রেম মানেই নারী। নারী ছাড়া ভালবাসার কোনও অর্থ হয় না। প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে নারীই সর্বশক্তিময়ী। আজ মেরিয়াসের মতো বিপ্লবী যুবক কসেত্তের কাছে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ এবং আনন্দের সঙ্গে দাসত্বকে মেনে নিয়েছে। তোমরা রোবোসপীয়ারের কথা বলতে পার, কিন্তু আসলে নারীই শাসন করে। রাজশক্তি বলে যদি কোনও জিনিস থাকে তো আসলে নারীই হলো সে শক্তি। ঈভ ছাড়া আদমের অর্থ হয় না, কারণ ঈভের দ্বারাই আদম চালিত হয়। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক বিপ্লব হয়েছে, কিন্তু নারীদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, একটি সুবাসিত রুমালের বিরুদ্ধে কখনো বিপ্লব হয়েছে? বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবীতে অনেক কিছুর আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু ভালবাসাবাসির ব্যাপার থেকে

পরিত্রাণের কোনও পথ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পেরেছে মানুষ? কোনও পথ নেই। নারীকে ভালবেসেই যেতে হবে। প্রেমময় চুম্বন ও আলিঙ্গনের ঐন্দ্রজালিক বৃত্তবলয় থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে পারবে না কখনো। আমি তো পারলে আবার সেই বৃত্তের মধ্যেই ঢুকব। তোমরা সবাই আকাশে শুকতারাকে উঠতে দেখলেই আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠ। এই শুক্রগ্রহ হলো প্রেমের প্রতীক। তেমনি কোনও সময় আমরা যতই আমাদের ক্রোধাবেগের প্রচণ্ডতায় ফেটে পড়ি না কেন, সুন্দরী নারী একবার আমাদের সামনে এলেই নতজানু হয়ে পড়ি। প্রেম হচ্ছে এমনই এক বৃদ্ধশিশু যার বয়স হলো দু' হাজার বছর। এই প্রেমের সুতো দিয়েই চিরকাল ধরে এক মধুর ইন্দ্রজাল রচনা করে আসছে মানুষের যৌবন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে পৃথিবীর সব নরনারী এই প্রেমের এক অঘোষিত চুক্তিতে আবদ্ধ। শয়তান পৃথিবীর যত ক্ষতি করেছে প্রেম তার থেকে অনেক মঙ্গল সাধন করেছে। এই প্রেম চির পুরাতন হয়েও চিরনতুন। সুতরাং ভালবেসে যাও, প্রেমের সদ্ব্যবহার করো। কসেত্তে হবে মেরিয়াসের সূর্য যাকে প্রদক্ষিণ করে যাবে তার জীবন আর মেরিয়াস হবে কসেত্তের পৃথিবী। ভালবাসাবাসি ব্যাপারটাই হলো সূর্য ও পৃথিবীর খেলা। সে খেলায় একজন একজনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, একজন একজনকে প্রদক্ষিণ করে যাবেই। প্রেমই হবে স্বামীস্ত্রীর ধর্ম। আপন আপন স্ত্রীকে ভালবেসে যাওয়াই হলো ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠ উপায়। সুন্দরী এবং সুখী স্ত্রীই হলো স্বামীর কাছে সবচেয়ে আনন্দের বস্তু। প্রেম ছাড়া বসন্তের দাম কোথায়? সুন্দরী নারী আছে বলেই ফুল, পাখি, আলো, হাওয়া প্রভৃতি পৃথিবীর সব সুন্দর জিনিস এত অর্থময়।

মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হলে নাচগান—হৈ-হুল্লোড় শুরু হলো। কিন্তু হঠাৎ বরবধূ ঘর থেকে চলে যাওয়ায় সব আনন্দোৎসব স্তব্ধ হয়ে গেল।

বরবধূ একটি রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। একটি রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে যখন প্রেমিক-প্রেমিকার দুটি দেহ দুটি আত্মা বিগলিত হয়ে মিলে মিশে এক হয়ে গেল তখন হয়ত বাইরের রাত্রির অন্ধকার কিছুটা কেঁপে উঠল। এক পবিত্র প্রেমে উৎসর্গীকৃত দুটি মুখ যখন পরস্পরের কাছে সরে এসে এক নিবিড় চুম্বনে আবদ্ধ হয়ে সৃষ্টিযজ্ঞে মেতে ওঠে তখন তাদের সেই অমৃতনিষ্যন্দী চুম্বনের অশ্রুত ধ্বনিতে আকাশের তারারা কেঁপে উঠবে না—তা কি হয়? প্রেমের এই সুখ ছাড়া জীবনের আর সব কিছুই দুঃখময়, ছায়াময় ও অশ্রুসজল।

২

কিন্তু জাঁ ভলজাঁ কোথায় গেল?

কসেত্তের অনুরোধে একটুখানি হাসার পর ভলজাঁ উঠে পাশের ঘরে চলে যায়। আট মাস আগে সে এই ঘরেই প্রথম মেরিয়াসকে অচেতন অবস্থায় দিয়ে যায়। সে ঘরে তখন বাস্ক ভোজসভার জন্য ফুলের তোড়া তৈরি করছিল। তার চলে যাবার কথা সে বাস্ককে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বাইরে গিয়ে ভোজসভার ঘরের জানালার তলায় একবার দাঁড়াল সে। ভোজসভার ঘরে তখন বেহালা বাজছিল। অতিথিরা হাসিঠাট্টা ও হৈ-হুল্লোড় করছিল। সকলের গলা ছাপিয়ে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের কথা শোনা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কসেত্তের দু'-একটা কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ তা শোনার পর কালভেরির বাড়ি ছেড়ে রু্য হোমি আর্মের বাড়িতে চলে যায় ভলজাঁ।

রু্য সেন্ট লুই ও ব্যাঙ্ক মাতোর পথটা দূর হলেও এই পথেই সে কসেত্তেকে নিয়ে আসা-যাওয়া করত, তাই সেই পথেই গেল সে। তার বাসায় গিয়ে প্রথমে বাতি জ্বালিয়ে উপরতলার ঘরে চলে গেল। সব ঘর খালি। তুসাঁ নেই। তুসাঁ ও কসেত্তের বিছানাগুলো গোটানো আছে। সব আলমারিগুলো খালি। সেগুলো খোলা ছিল। ভলজাঁ সেগুলো বন্ধ করে দিল। ঘরগুলোতে শুধু কিছু আসবাবপত্র আছে আর আছে শূন্য দেওয়ালগুলো। ফাঁকা ঘরগুলো একবার ঘুরে ফিরে দেখে অবশেষে সে তার নিজের ঘরে এসে জ্বলন্ত বাতিটা তার টেবিলের উপর রাখল। তার যে ডান হাতটা বাঁধা অবস্থায় ঝোলানো ছিল সে হাতের বাঁধনটা খুলে দিয়ে হাতটা মুক্ত করে দিল। দেখল হাতে কোনও ব্যথা নেই।

সে এবার তার বিছানায় গিয়ে বসল। হঠাৎ তার কসেত্তের সেই কালো বাক্সটার উপর চোখ পড়ল। এই বাক্সটা কসেত্তে সব সময় নিজের বিছানার কাছে রাখত। কনভেন্ট থেকে রু্য প্লামেতের বাড়িতে, তারপর সেখান থেকে এই বাড়িতে নিয়ে আসে। কসেত্তের বিছানার কাছে একটা টুলের উপর রাখা ছিল বাক্সটা।

বাক্সটা খুলে কসেত্তের অতীতের পুরনো পোশাক-গুলো বার করল। এ পোশাকগুলো হচ্ছে সেই কালো পোশাক যে পোশাক সে তার জন্য কিনে মঁতফারমেলে থেনার্দিয়েরদের হোটেলে নিয়ে যায়। কারণ সে তখন ভেবেছিল শোকসূচক এই কালো পোশাক কসেত্তে পরলে তার মার মৃত আত্মা খুশি হবে। সেদিন ছিল ডিসেম্বরের এক ঠাণ্ডা রাত্রি। একে একে সেদিনের সব কথা মনে পড়ল তার। সে রাতে মঁতফারমেল বনের মধ্য দিয়ে তারা দু'জনে নিঃশব্দে পথ হেঁটেছিল। পাতাঝরা গাছগুলোর মধ্য দিয়ে অন্ধকারে যখন তারা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন বনে কোনও পাখি ছিল না, আকাশে কোনও তারার আলো ছিল না।

কসেত্তের সেই ছেলেবেলাকার পোশাকগুলো তার বিছানার উপর ছড়িয়ে রাখল। কসেত্তে তখন এই পোশাক পরে সেই বড় পুতুলটা হাতে নিয়ে তার সঙ্গে হোটেল থেকে চলে গিয়েছিল তার সঙ্গে। সেদিন কসেত্তে তার কাছে ছিল বলে কত আনন্দে ছিল। কোনও দুঃখকেই দুঃখ বলে মনে হয়নি তার।

কসেত্তের একটা জামার মধ্যে মুখটা গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ভলজাঁ। তখন যদি সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাইরের কোনও লোক ভলজাঁর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াত তাহলে সে তাকে এইভাবে শিশুর মতো কাঁদতে দেখতে পেত।

ভলজাঁর মনের মধ্যে আবার সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম শুরু হলো। দেবদূতের সঙ্গে জ্যাকবের সংগ্রাম মাত্র একদিন স্থায়ী হয়। কিন্তু আপন বিবেকের সঙ্গে ভলজাঁর সংগ্রামের

অন্ত নেই। কখনো তার জীবনের পথে চলতে চলতে পা পিছলে গেছে, কখনো বা পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। তার বিবেক কত দৃঢ়তার সঙ্গে কতবার সংগ্রাম করেছে তার সঙ্গে। কত নির্মম সত্যের উপলব্ধি এক-একটা ভারী বোঝার মতো তার বুকের উপর এনে চাপিয়ে দিয়েছে। কতবার সে বিশপের দেওয়া বাতিটার সামনে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তার বিদ্রোহী আত্মা সহজ সরল কর্তব্যজ্ঞানের চাপে নিষ্পেষিত হতে হতে কতবার বেদনায় আর্তনাদ করেছে। আত্ম আরোপিত আঘাতে কতবার হৃদয়ে রক্ত ঝরেছে তার যার কথা সে ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। এই নীরব অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অদৃশ্য সংগ্রামের সব দুঃখ ঝেড়ে ফেলে আবার শান্তিতে এগিয়ে গেছে সে তার জীবনের পথে।

কিন্তু আজ রাত্রিতে ভলর্জার মনে হলো তার অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। আজ এক বিরাট প্রশ্ন দেখা দিল তার মনে। সে বুঝল মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য আগে থেকে ঠিক করলেও সে লক্ষ্যে সে সোজা সরাসরি পৌঁছতে পারে না; অনেক বাধাবিপত্তি আসার ফলে ঘুরে ঘুরে তাকে যেতে হয় সে পথে। সে লক্ষ্য করেছে যখনি তার জীবনে কোনও সংকট উপস্থিত হয়েছে তখনি তার সামনে দুটো পথ বিস্তৃত হয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা পথ তাকে আলোকিত করেছে আর একটা পথ তাকে ভীত করে তুলেছে।

এবার প্রশ্নটা হলো এই যে সে কি কসেত্তে আর মেরিয়াসের নববিবাহিত জীবনের সঙ্গে তার জীবনকে মিলিয়ে নিয়ে তাদের সুখে সুখী হবে? কসেত্তে আজ অন্য একজনের স্ত্রী হলেও তাকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করে। ভলর্জা ভাবল সে কি তার অতীত জীবনের কোনও কথা না বলে আইনের অশুভ ছায়াটাকে দূরে সরিয়ে রেখে সেই শ্রদ্ধা লাভ করে যাবে? সে ভাবল মানুষের আত্মার পরিবর্তন হয়, ভাগ্যেব পরিবর্তন হয় না কেন? তার নিষ্করুণ নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব দিকগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে। যদি সে কসেত্তের কাছাকাছি থেকে তার জীবনকে জড়িয়ে থাকে তাহলে সে নিরাপদ, কিন্তু যদি তাকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে আবার তাকে এক শূন্য গহ্বরে গিয়ে পড়তে হবে।

এ প্রশ্নের সমাধান আপাতত করতে না পারলেও অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদার পর কিছুটা স্বস্তি পেল সে। কিছুটা শান্ত হয়ে উঠল সে। তার মনে হলো, মানুষের বিবেক যেন এক একসময় এক অতল অন্তহীন খাদের মতো মানুষের সব কিছুকে গ্রাস করতে আসে। সে খাদের মধ্যে বিবেকের দংশনে মানুষকে তার সারা জীবনের শ্রম, স্বাধীনতা, সুখ, শান্তি সব কিছু এমন কি তার অন্তরটাকে ফেলে দিতে হয়। বস্তুজগতে সব বস্তুর মধ্যে গতি থাকলেও সে গতি নানারকমের বাইরের শক্তি ও বাধার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বস্তুর গতি যদি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে আত্মার গতি নিয়ন্ত্রিত হবে না কেন? কোনও গতিই যখন চিরন্তন নয়, তখন কোনও বিশেষ নীতির প্রতি আত্মার গতি বা আসক্তিই বা চিরন্তন হবে কেন? কসেত্তের বিয়ে আর শ্যাম্প ম্যাথিউর ব্যাপারটা—এই দুটো ঘটনার মধ্যে পার্থক্য কি? জেলে যাওয়া আর নরকের প্রান্তভাগে যাওয়া এই দুই-এর মধ্যেই বা পার্থক্য কি?

ভলজাঁ ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত ও আগের থেকে শান্ত হয়ে ঠিক করল আজ তাকে দুটো পথের মধ্যে একটাকে বেছে নিতেই হবে। আজ তাকে হয় সুখী নবদম্পতির উপর তার অতীত ঘৃণ্য কয়েদীজীবনের সব তথ্যপুঞ্জের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের অনাবিল সুখের মাঝে দুঃখের ছায়া নিয়ে আসতে হবে অথবা তার আত্মাকে হারাতে হবে। হয় কসেত্তেকে ত্যাগ করতে হবে অথবা নিজের আত্মাকে ত্যাগ করতে হবে।

সারারাত ধরে এইভাবে বিছানার উপর ঝুঁকে মুখ গুঁজে হাত দুটো টান করে ছড়িয়ে ভেবে যেতে লাগল সে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তাকে ক্রুশ থেকে নামানো হয়েছে। কিন্তু বাইরে তাকে মড়ার মতো মনে হলেও তার মাথার মধ্যে তখন চলছিল চিন্তার এক অবিরাম অবিচ্ছিন্ন আলোড়ন।

অবশেষে ভোরের দিকে একসময় উঠে বসে কসেত্তের পোশাকগুলো তার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

বিয়ের পরদিন সকালে সব বাড়িই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নবদম্পতি দেরি করে ওঠে। বাড়িতে লোকজন দেরি করে আসে। বেলা বারোটার পর বাস্ক যখন ঘরের ভিতর কাজ করছিল হঠাৎ সে দরজায় মৃদু করাঘাত শুনতে পেল। দরজা খুলে দেখল, মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

বাস্ক ব্যস্ত হয়ে বলল, আজ আমাদের উঠতে দেরি হয়ে গেছে মঁসিয়ে।

তোমাদের মালিক উঠেছেন?

কোন মালিক—পুরনো না নতুন?

মঁসিয়ে পঁতমার্সি।

আপনার হাতটা কেমন আছে?

ভাল।

আপনি বসুন, আমি মঁসিয়ে লে ব্যারন পতমার্সিকে ডেকে দিচ্ছি।

সেকালের গৃহভৃত্যরা তাদের মালিকদের উপাধি ও সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিল। কারণ ঐ উপাধিতে তারাও গৌরবান্বিত বোধ করত নিজেদের। একদিন এই উপাধির জন্য মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ কত ঝগড়া করেন মেরিয়াসের সঙ্গে। অথচ মেরিয়াস যখন উপাধি সম্বন্ধে উদাসীন একেবারে তখন মঁসিয়ে গিলেনর্মাদই মেরিয়াসের এই উপাধির ব্যাপারে বেশি আগ্রহান্বিত।

বাস্ক ঘর থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল মেরিয়াসকে ডাকার জন্য, জাঁ ভলজাঁ তখন তাকে সাবধান করে দিল, আমার কথা বলবে না। বলবে কে একজন গোপনে দেখা করতে চায়।

বাস্ক চলে গেলে ভলজাঁ একা বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। গতরাতে একেবারে ঘুম না হওয়ায় তার মুখচোখ ম্লান আর রোগা রোগা দেখাচ্ছিল। তাঁর কালো কোটটাকেও

পাটভাঙা আর ময়লা দেখাচ্ছিল। মেঝের উপর কাঁপতে থাকা একফালি সূর্যরশ্মির দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে ছিল ভলজাঁ।

এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল মেরিয়াস। গতরাতে তারও ঘুম হয়নি। ভলজাঁকে দেখেই সে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, বাবা আপনি! বাস্ক তো বলেনি। তবে আপনি হয়ত একটু আগে এসে পড়েছেন, এখন মাত্র সাড়ে বারোটা, কসেত্তে এখনো ওঠেনি।

বিয়ের আগে ভলজাঁ সম্বন্ধে একটা রহস্য বরাবর দানা বেঁধে ছিল মেরিয়াসের মনে। তাই সে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারত না তার সঙ্গে। কিন্তু এখন প্রেমের আবেগে আগেকার সেই ভাবটা দূর হয়ে যায়। মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত যখন কসেত্তের বাবা তখন বিয়ের পর থেকে সে তারও বাবা। তাই ভলজাঁকে বাবা বলেই ডাকল সে।

মেরিয়াস আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। কাল হঠাৎ আপনি চলে যাওয়ায় আমরা সকলেই আপনার কথা বলাবলি করছিলাম। আপনার হাতটা ভাল আছে তো ? কসেত্তে আপনার কথা বলছিল। সে আপনাকে খুব ভালবাসে। আপনার হয়ত মনে আছে এ বাড়িতে আপনার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরটা আমাদের ঘরের পাশে এবং তার পাশেই বাগান। বসন্তকালের রাত্রিতে আপনি নাইটিঙ্গেল পাখির গান শুনতে পাবেন। দিনের বেলায় কসেত্তে কত কথা বলবে। সে আপনার বই ও জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবে। রু্য হোমির বাড়িতে একা একা থাকার কোনও দরকার নেই। আপনি আজই চলে আসবেন। কসেত্তে চায় আপনি এখানেই থাকুন আমাদের কাছে। বিকালে আপনি যেমন লুক্সেমবুর্গ বাগানে কসেত্তেকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন তেমনি এখানেও তাকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন। আমাদের সুখে আপনিও অংশগ্রহণ করবেন বাবা। হ্যাঁ, আজ আপনি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে যাবেন।

সব কিছু চুপ করে শুনে এতক্ষণে কথা বলল ভলজাঁ। সে বলল, আমার একটা কথা বলার আছে মঁসিয়ে। আমি একজন পলাতক কয়েদী।

কথাটা মেরিয়াসের কানে গেলেও সে তার মানে বুঝতে পারেনি। সে বিহ্বল হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভলজাঁর পানে তাকিয়ে দেখল তার মুখখানা খুবই বিব্রত এবং ম্লান।

ভলজাঁ সহসা তার হাতের বাঁধনটা সরিয়ে হাতটা মেরিয়াসের দিকে বাড়িয়ে দেখিয়ে বলল, আমার হাতে কিছুই হয়নি। আমি তোমাদের বিয়ের ভোজসভা থেকে দূরে থাকার জন্যই হাতভাঙার কথা বলেছিলাম। তাছাড়া পরে যদি কোনও বিপত্তি দেখা দেয় এই ভয়ে আমি তোমাদের বিয়ের কাগজপত্রে সই করিনি।

মেরিয়াস বলল, কিন্তু এ সবের অর্থ কি ?

ভলজাঁ বলল, অর্থ এই যে আমি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ছিলাম। আমার উনিশ বছরের কারাদণ্ড হয়। প্রথমে চৌর্যবৃত্তির অপরাধে, পরে জেল থেকে পালানোর জন্য। বর্তমানে আমি পলাতক কয়েদী।

মেরিয়াস ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে একথা অবিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু সে একথা মেনে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আপনি সব কথা বলুন। আচ্ছা, আপনি কি সত্যিই কসেত্তের পিতা ?

ভলজাঁ খাড়া হয়ে বসে যথেষ্ট আত্মমর্যাদাসূচক গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, আমার কোনও কথা আইন-আদালতে গ্রাহ্য না হলেও এ বিষয়ে আমার কথা বিশ্বাস করতে পার তুমি। আমি কসেত্তের পিতা নই এবং তার সঙ্গে আমার কোনও আত্মীয়তা নেই। আমাব নাম ফশেলেভেন্ত নয়। আমার নাম জাঁ ভলজাঁ। আমি ফেবারোল গাঁয়ের এক চাষী পরিবারের ছেলে। সেখানে আমি প্রথম জীবনে গাছকাটার কাজ করতাম।

মেরিয়াস বলল, এ কথার প্রমাণ ?

আমার কথাই আমার প্রমাণ।

মেরিয়াস ভলজাঁর পানে তাকিয়ে দেখল তার চোখেমুখে যে হিমশীতল এক বিষাদঘন প্রশান্তি বিরাজ করছিল তার মাঝে এক প্রস্তরকঠিন নিষ্ঠা আর সততা স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। তার সে মুখ থেকে কোনও মিথ্যা বেরিয়ে আসতে পারে না।

ভলজাঁ বলল, যদি বল কসেত্তের সঙ্গে আমার তাহলে সম্পর্ক কি, তাহলে বলব, দশ বছর [illegible] আমি তার অস্তিত্বের কথা জানতাম না। আজ থেকে নয় বছর আগে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে তখন খুবই ছোট। পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুর প্রতি কোনও বয়স্ক লোকের পিতৃসুলভ স্নেহমমতা জাগা স্বাভাবিক। আমারও তাই হয়েছিল। আমার অন্তঃকরণ বলে একটা জিনিস ছিল এবং আমি আমার সেই অন্তরের সব স্নেহমমতা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলাম তাকে। তখন তার সে স্নেহমমতার দরকার ছিল। আমার এ কাজ ভাল বা তুচ্ছ যাই বল আমি তখন তা করেছিলাম। তাকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করেছিলাম আমি। এখন সে বিবাহিত, এখন তার প্রতি আমার আর কোনও দায়দায়িত্ব নেই। এখন তার ও আমার পথ সম্পূর্ণ পৃথক। যে টাকা আমি তোমাদের দিয়েছি ওটা এক ট্রাস্টের সম্পত্তি [illegible] তার নামে। কি করে সেটা আমার হাতে এল সেকথা এখন নিষ্প্রয়োজন। আমি তা এতদিন সযত্নে রক্ষা করে এসেছি। আমি আমার নিজের জন্য তোমাকে সব কথা বললাম, আমার আসল নাম বললাম।

মেরিয়াস তখন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। মদের নেশায় যেন মাতাল হয়ে পড়েছিল সে। তার মনে হলো ভলজাঁ যেন তাকে এক গুরুতর আঘাত দিয়েছে এইসব অবাঞ্ছিত কথা বলে।

সে বলল, এসব কথা আপনার মনের মধ্যে না রেখে আপনি আমাকে বলতে গেলেন কেন ? কে আপনাকে বাধ্য করেছে এ সব কথা বলতে ? আপনাকে কেউ ধরতে আসেনি। আপনার নামে কোনও পরোয়ানা বার হয়নি। অবশ্য আপনার কোনও ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে একথা বলার। কিন্তু কি সে কারণ ? আমার মনে হয় আরও কিছু গোপনীয় কথা আছে। আপনি সে কথা খুলে বলুন।

ভলজাঁ বলল, তার শুধু একটা কারণ আছে এবং সেই অদ্ভুত কারণ হলো আমার

সততা। আমি আমার অন্তরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম এ বিষয়ে। আমি সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারতাম, আমি দূরে চলে যেতে পারতাম কোনও কথা না বলে। কিন্তু আমার অন্তরটা পড়ে থাকত এখানে। তাই যাবার আগে অন্তরটাকেও ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তোমরা হয়ত বলবে আমি কত বোকা! কেন, আমিও তো এখানেই থাকতে পারি। এখানে তোমরা ঘর দিয়েছ থাকতে, এখানে কসেত্তের ভালবাসা আছে। তোমার দাদু আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এই সুখী পরিবারের একজন হয়ে আমি সুখে থাকতে পারতাম।

ভলজাঁর মুখের ভাবটা বদলে গেল হঠাৎ। সে তার কণ্ঠটাকে ঝাঁঝাল করে বলতে লাগল, আমার কোনও পরিবার নেই, আমি তোমাদের পরিবারের কেউ নই। আমি মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বহিষ্কৃত এক কয়েদীমাত্র। আমার আর কেউ কোথাও নেই, কখনো ছিল না। এক একসময় মনে হয় আমার মা-বাবাও হয়ত ছিল না। আমার শুধু জীবনে একজনই ছিল, সে এখন পর হয়ে গেছে, সে এখন বিবাহিত। আমি তার জন্যই এতদিন আমার আসল নাম গোপন করে তোমাদের ঠকিয়ে এসেছি। এখন সে কাজ আমার হয়ে গেছে। তাই সারারাত আমি নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমাকে সব কথা খুলে বলতে এসেছি। একথা না বলে আমি হয়ত সুখ পেতাম, কিন্তু মনে শান্তি পেতাম না। সারাজীবন আমাকে তাহলে মিথ্যা আর প্রতারণার সঙ্গে বেঁচে থাকতে হত। আমার খাওয়া, শোয়া, বসা, আমার হাসি, কথাবার্তা - সব কিছুর মধ্যে থাকত মিথ্যা আর প্রতারণা। তোমাদের মাঝখানে থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার কেবলি মনে হত, আমার আসল পরিচয় জানলে তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিতে। তোমাদের ঝি-চাকরেরা পর্যন্ত সে পরিচয় পেলে ভয়ে শিউরে উঠত। যে জন্ম থেকে সারা জীবন অবহেলিত, অবজ্ঞাত তার আবার সুখ কিসের?

ভলজাঁকে কোনও বাধা দিল না মেরিয়াস। বাধা দেওয়া বৃথা, কারণ আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার অন্তর। সে আবার আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, তোমরা হয়ত বলতে পার এখন আমাকে কেউ ধরেনি বা ধরা পড়ার বিপদও নেই। কিন্তু বাইরের কেউ না ধরলেও আমার বিবেক, আমার কর্তব্যবোধের হাতে আমি ধরা পড়ে গিয়েছি। আমার আত্মাই আমাকে প্রতিনিয়ত অনুসরণ করছে পিছন থেকে। এই কর্তব্যবোধ এই বিবেক বড় সাংঘাতিক জিনিস, তাদের বিধান অমোঘ নির্মম। তারা মানুষকে শাস্তি দেয় আবার পুরস্কারও দেয়। তারা যদি আমাকে নরকে নিক্ষেপ করে তাহলে সেখানে গিয়েও আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব, স্বর্গসুখ অনুভব করব। আমার অন্তর ভেঙে গেলেও মনে শান্তি পাব।

ভলজাঁর কণ্ঠটা আবার বদলে গেল। মর্মস্পর্শী কণ্ঠে সে আবার বলতে লাগল, এ কথা সব বলার পর আজ নিজেকে সম্মানিত মনে হচ্ছে আমার। নিজেকে ছোট না করে অপরের কাছ থেকে শ্রদ্ধা বা সম্মান পেতে পারি না আমি। এক অপরাধী কয়েদীর বিবেক এত তীক্ষ্ণ কেন হলো—এটাকে অনেকের বৈপরীত্য বলে মনে হতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল ভলজাঁ। বলল, যদি কোনও মানুষের মাথায় এই ধরনের কলঙ্কের কালিমা নেমে আসে তাহলে অপর কারো মাথায় তাকে না জানিয়ে সে কালিমা সঞ্চারিত করে দেবার কোনও অধিকার নাই তার। যেমন প্লেগরোগগ্রস্ত কোনও রোগীর অপরের মধ্যে সে রোগ সংক্রামিত করে দেবার কোনও অধিকার নেই। আমি চাষী ঘরের ছেলে হলেও কিছুটা লেখাপড়া শিখেছি। আমার বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে। দেখছ তো আমি কথাবার্তাও ভাল বলতে পারি। আমি নিজে শত কষ্ট পাব সে ভাল, কিন্তু কোনও সৎ ও ভদ্র মানুষকে ঠকাতে পারব না। কখনই না। একদিন আমি বাঁচার জন্য একটা পাঁউরুটি চুরি করেছিলাম, কিন্তু আজ আমি বেঁচে থাকার জন্য একজনের নাম চুরি করতে পারি না। যদিও সে নামটা আমি তার একটা উপকার করার জন্য ফশেলেভেন্ত নামে একটা লোকই দিয়েছিল। কিন্তু সে নাম ব্যবহার করার কোনও অধিকার নেই আমার।

মেরিয়াস বলল, কিন্তু শুধু বেঁচে থাকার জন্য ও নাম ধার করার কোনও প্রয়োজন নেই আপনার।

ভলজাঁ বলল, কিন্তু এর মানে কি তা আমি জানি।

এরপর কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ রয়ে গেল। ভলজাঁ ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল আর মেরিয়াস টেবিলের উপর হাতে মাথা রেখে ভাবতে লাগল। দু'জনে মগ্ন হয়ে রইল আপন আপন চিন্তায়।

পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে একসময় দেওয়ালে টাঙানো আয়নার উপর নিজের প্রতিফলনটা একবার দেখে বলল, এখন আমি অনেকটা স্বস্তিবোধ করছি।

এই কথা বলে আবার পায়চারি করতে লাগল ভলজাঁ। সে যখন দেখল মেরিয়াস তারই পানে তাকিয়ে রয়েছে, তখন আবার বলতে লাগল, মনে করো, আমি তোমাদের কিছুই বলিনি, আমি তোমাদের সঙ্গেই এ বাড়িতে একসঙ্গে বাস করেছি, তোমাদেরই একজন হয়ে তোমাদের সুখে সুখী হয়ে মঁসিয়ে ফশেলেভেন্তরূপে সম্মানিত জীবন যাপন করছি। মনে করো তোমাদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গিয়েছি, হাসাহাসি ও গল্প করছি, এমন সময় কেউ আমাকে জাঁ ভলজাঁ নামে ডেকে ফেলল অথবা কোনও পুলিশ এসে আমার কাঁধের উপর হাত রাখল এবং আমাকে ধরে নিয়ে গেল। তখন তুমি কি বলবে?

মেরিয়াস কিছুই বলতে পারল না। তার কিছুই বলার নেই এ বিষয়ে।

ভলজাঁ বলল, এবার তাহলে বুঝতে পারছ কেন আমি এসব কথা না বলে থাকতে পারলাম না। কিন্তু কিছু মনে করো না। তোমরা সুখী হও, সুখে থাক। আমার মতো একজন সমাজ বহির্ভূত লোক কিভাবে তার কর্তব্য পালন করে তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন নেই।

মেরিয়াস এগিয়ে গিয়ে ভলজাঁর একটা হাত ধরল। কিন্তু সে হাত মর্মরপ্রস্তরের মতোই শক্ত আর হিমশীতল।

মেরিয়াস বলল, আমার দাদুর অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, আমি আপনাকে খালাস করে দেব।

ভলজাঁ তার হাতটা ছাড়িয়ে বলল, তার আর দরকার হবে না। আমি মরে গিয়েছি বলে সবাই জানে, এটাই যথেষ্ট। আমি আমার কর্তব্য করে যাব। আমার বিবেকই আমায় মুক্তি দিতে পারে।

এমন সময় ঘরের দরজাটা আধখানা খুলে গেল এবং কসেত্তে তার ভিতর মুখটা বাড়িয়ে দিল। তার সুন্দর চুলগুলো তখন আলুথালু অবস্থায় ছিল এবং তার চোখ দুটো ঘুমে ভারী হয়ে ছিল। পাখি যেমন তার বাসার ভিতর থেকে মুখ বার করে দেখে তেমনি কসেত্তে মুখটা বাড়িয়ে তার স্বামী ও ভলজাঁর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, তোমরা হয়ত রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছ। কি অবান্তর ব্যাপার, তোমরা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতে।

ভলজাঁ চমকে উঠল। মেরিয়াস বিব্রত হয়ে আমতা আমতা করে বলল, কসেত্তে—।

তারা দু'জনেই নিজেদের অপরাধী ভাবল।

কসেত্তে তার উজ্জ্বল চোখ দুটো দিয়ে তখনো তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বলতে লাগল, আমি তোমাদের ধরে ফেলেছি। দরজা খুলেই আমি তোমাদের বিবেক এবং কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা শুনে ফেলেছি। ওসব রাজনীতির কথায় আমার কোনও দরকার নেই। বিয়ের পরদিন কেউ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে না।

মেরিয়াস বলল, তুমি ভুল করছ, আমরা ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলছিলাম। কিভাবে টাকাটা খাটানো যায় আমরা বলছিলাম তারই কথা।

কসেত্তে ঘরের ভিতর ঢুকে বলল, এই কথা? আমি তাহলে তো তোমাদের সে কথায় যোগদান করতে পারি।

কসেত্তে এমন সাদা জমকালো গাউন পরেছিল যাতে তার ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ছিল। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে বলল, আমি তোমাদের পাশে বসছি। খাবার প্রস্তুত হতে এখনো আধঘণ্টা দেরি আছে। তোমরা যা খুশি আলোচনা করতে পার। আমি তোমাদের বাধা দেব না। আমি খুব ভাল মেয়ে।

মেরিয়াস তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, আমরা ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলছিলাম। এ সব অঙ্কের ব্যাপার তোমার ভাল লাগবে না।

কসেত্তে বলল, না, ভাল লাগবে। তোমার নেকটাইটা কত সুন্দর মেরিয়াস। তোমাকে খুব চটপটে দেখাচ্ছে।

মেরিয়াস বলল, না, তোমার ভাল লাগবে না।

আমি তা বুঝতে না পারলেও শুনে যাব। তোমাদের দু'জনের কাছে আমি থাকতে চাই। তোমাদের কণ্ঠস্বরটাই যথেষ্ট আমার কাছে।

প্রিয়তমা কসেত্তে, সেটা অসম্ভব।

অসম্ভব!

হ্যাঁ।

কসেত্তে বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাদের কতকগুলো মজার খবর দিই। যেমন

ধরো, দাদু এখনো ঘুমোচ্ছেন, মাসিমা চার্চে প্রার্থনা সভায় গেছেন। নিকোলেত্তে ঝাড়ুদার ডাকতে গেছে। নিকোলেত্তে তুসাঁর তোতলামির জন্য তাকে ক্ষেপাচ্ছিল বলে তাদের দু'জনের এরই মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে। এসব কথা তোমরা জানতে না। প্রিয়তম মেরিয়াস, আমাকে এখানে থাকতে দাও।

প্রিয়তমা কসেত্তে, আমি শপথ করে বলছি, আমাদের দু'জনকে এখন নির্জনে থাকতে হবে।

কিন্তু আমি নিশ্চয় বাইরের লোক নই।

ভলর্জা এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। কসেত্তে এবার তার দিকে ঘুরে বলল, বাবা, তুমি আমাকে এসে চুম্বন করো। তুমি কি ধরনের বাবা? দেখছ না আমার স্বামী আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

ভলর্জা তার কাছে যেতেই কসেত্তে তার কপালটা বাড়িয়ে দিল এবং ভলর্জা তার উপর চুম্বন করল। কসেত্তে বলল, তোমার মুখখানা এমন ম্লান দেখাচ্ছে কেন বাবা? তোমার হাতটায় কি এখনো ব্যথা করছে?

না।

তোমার মনে কি কোনও অশান্তি আছে?

না।

তাহলে আমার কপালটায় আবার চুম্বন করে হাস।

ভলর্জাঁ আবার তার কপালে চুম্বন করে এক ভুতুড়ে হাসি হাসল।

কসেত্তে বলল, এবার তাহলে তুমি আমার পক্ষ অবলম্বন করে ওকে বক। ওকে বল আমি এখানে থাকতে পারি। তুমি ভাবছ আমি খুব দুষ্টু। কিন্তু ব্যবসা, টাকা লগ্নী—এসব ব্যাপার এমন কি কঠিন? পুরুষরা সব ব্যাপারকেই ঘোরালো ও জটিল করে তোলে অকারণে। আমি এখানে থাকব। আজ আমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তাই না মেরিয়াস?

এই বলে সে মেরিয়াসের পানে মদির দৃষ্টিতে তাকাতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ খেলে গেল তার চোখে। মেরিয়াস উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করল। ভলর্জাঁর উপস্থিতির কথা যেন ভুলে গেল।

কসেত্তে এবার বিজয়িনীর হাসি হেসে বলল, তাহলে আমি থাকছি।

মেরিয়াস বলল, না প্রিয়তমা। একটা ব্যাপার আজ আমাদের ঠিক করতেই হবে।

তবু নয়?

আমি বলছি সেটা অসম্ভব।

ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। বাবা, তুমি কিন্তু আমায় সমর্থন করলে না। তোমরা দু'জনেই অত্যাচারী, নিষ্ঠুর। আমি দাদুর কাছে গিয়ে অভিযোগ করব। তোমরা যদি ভাব আবার আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব তাহলে ভুল করবে। আমি আর আসব না তোমাদের কাছে, তোমাদেরই যেতে হবে আমার কাছে। আমি যাচ্ছি।

যেতে যেতে দরজাটা বন্ধ করার সময় উঁকি মেরে বলল, আমি কিন্তু তোমাদের দু'জনের উপরেই খুব রেগে গিয়েছি।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে ঘরখানা আবার অন্ধকার হয়ে উঠল। মেরিয়াস হতাশ হয়ে বলল, হায়, বেচারা কসেত্তে! সে যখন শুনবে...

সে কথা শুনে ভলজাঁর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। সে পাগলের মতো মেরিয়াসের দিকে তাকিয়ে বলল, তা তো বটেই। সবার সব কথা সহ্য করার শক্তি থাকে না। আমার অনুরোধ, তুমি কথা দাও, ওকে একথা বলবে না। তুমি নিজে জানলেই হবে। কয়েদী, সশ্রম কারাদণ্ড —এসব কথা শুনলে সে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়বে।

ভলজাঁ একটা আর্মচেয়ারে বসে তার হাতে মুখ ঢাকল। সে কোনও কথা বলল না। কিন্তু তার কান্নার মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ভলজাঁ চেয়ারে গা এলিয়ে দিযে মড়ার মতো শুয়ে পড়ল। চোখ দুটো বন্ধ করে বলে উঠল, এর থেকে মৃত্যু ভাল ছিল।

মেরিয়াস বলল, ভাববেন না। আমি আপনার কথা গোপন রেখে দেব।

তার কণ্ঠ থেকে বোঝা গেল ভলজাঁ আর তার মধ্যে নতুন অবস্থার জটিল পরিপ্রেক্ষিতে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে সে বিষযে সে সচেতন পূর্ণমাত্রায়।

মেরিয়াস বলল, ট্রাস্টের টাকাটা আপনি যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। আপনি কোনও কুণ্ঠা বা দ্বিধা না করে সে পুরস্কারের টাকাটা কত হওয়া উচিত তা বলে ফেলুন।

ভলজাঁ শুধু শান্তকণ্ঠে বলল, ধন্যবাদ মঁসিয়ে। সব কিছু ঠিক হয়ে গেল, শুধু একটা জিনিস বাকি রয়ে গেল।

কি সে জিনিস ?

তুমি হচ্ছ এখন মালিক। তুমি কি মনে করো কসেত্তের সঙ্গে আমার আর দেখা হওয়া উচিত নয় ?

মেরিয়াস নীরসভাবে বলল, আমার মনে হয় সেটাই ভাল হবে।

ভলজাঁ বলল, তাহলে আমি আর দেখা করব না।

এই বলে সে উঠে দরজার দিকে চলে গেল।

কিন্তু যাবার জন্য দরজাটা একটু খুলেই আবার মেরিয়াসের কাছে ফিরে এল ভলজাঁ। তার মুখখানা শুধু ম্লান নয়, মৃতের মতো সাদা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তার চোখে কোনও জল ছিল না। তার পরিবর্তে যেন আগুন ছিল সে চোখে। কিন্তু কণ্ঠটা আশ্চর্য রকমের শান্ত ছিল।

সে বলল, মঁসিয়ে, মাঝে মাঝে এসে কসেত্তেকে দেখে যাবার অনুমতি দাও আমাকে। মাঝে মাঝে দেখে যাবার অনুমতি পাব বলেই আমি এসব কথা বলেছি তোমাকে তোমার সম্মানের খাতিরে! তা না হলে কিছু না বলেই ঘরে চলে যেতাম। আজ নয় বছর ধরে সে আমার কাছে কাছে আছে। প্রথমে গর্বোর ব্যারাক বাড়িটাতে, তারপর কনভেন্টে, তারপর রু প্লামেতের বাড়িতে, অবশেষে লা হোমিতে। এই নয় বছরের মধ্যে বেশিদিনের জন্য আমরা কেউ কারো কাছছাড়া হইনি। এখন হঠাৎ দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সত্যিই কঠিন হবে। তবে

আমাকে অনুমতি দাও, আমি মাঝে মাঝে এসে নিচের ঘরে এসে তার সঙ্গে দেখা করে যাব। আমি খুব বেশি আসব না এবং বেশিক্ষণ থাকব না। তাছাড়া আমি একেবারে না এলে অনেকে কথা বলতে পারে। আমি বরং সন্ধ্যার দিকে অন্ধকার হয়ে উঠলে আসব।

মেরিয়াস বলল, আপনি রোজ সন্ধ্যায় আসবেন।

ভলর্জা খুশি হয়ে বলল, মঁসিয়ে, সত্যিই তোমার অসীম দয়া।

তারা করমর্দন করল। ভলর্জা বিদায় নিল। মেরিয়াস ভলর্জাকে দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

আপন মনে ভাবতে লাগল মেরিয়াস। কসেত্তের পিতা হিসাবে পরিচিত মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত নামে যে লোকটিকে দেখে সব সময় তার মনে হত লোকটি যেন কি একটা গোপন রহস্য চেপে রেখে দিয়েছে তার অন্তরের মধ্যে, যার সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশার কোনও উৎসাহ পেত না সে, আজ তার কারণটা নিশ্চিতরূপে জানতে পারল সে। কিন্তু আজ তার সুখের দিনে তার সেই গোপন রহস্যটা জানতে পারাটা সুখী কপোতের বাসায় একটা কাঁকড়া বিছে দেখতে পাওয়ার মতোই এক অবাঞ্ছিত ঘটনা বলে মনে হলো। এখন থেকে তার ও কসেত্তের জীবনের সব সুখ কি ঐ লোকটার উপরে নির্ভর করবে এবং তাদের বৈবাহিক বন্ধনের একটা শর্ত হিসাবেই কি মেনে নিতে হবে তাকে? সত্যিই কি সে এক জেলপলাতক কয়েদী?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে আবার একথাও ভাবতে লাগল যে এ বিষয়ে তারও একটা দোষ আছে। তার কি বাস্তব বুদ্ধি-বিবেচনা সব লোপ পেয়েছিল এবং সে কি ইচ্ছা করেই তার চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছিল? এটা সে অস্বীকার করতে পারে না যে তার প্রকৃতিটাই কল্পনাপ্রবণ এবং প্রেমাবেগের বশবর্তী হয়ে সে কসেত্তের প্রতি ভালবাসার গভীরে ডুবে যাওয়ার আগে তার বাস্তব জীবন সম্বন্ধে কোনও খোঁজখবর নেয়নি। রু্য প্লামেত্তের বাগানে ছয়টি সপ্তাহ ধরে সে যখ ' কসেত্তের সঙ্গে নিবিড় প্রেমালাপে মত্ত হয়ে ছিল তখন সে একটি দিনের জন্য গর্বোর বাড়িতে দেখা সেই নাটকীয় ঘটনার কথাটার একবারও উল্লেখ করেনি কসেত্তের কাছে। থেনার্দিয়েরদের সম্বন্ধেও কোনও কথা বলেনি তাকে। ছয়টি সপ্তাহ একটা স্বপ্নের মতো কেটে যায়। তখন ভালবাসার কথা ছাড়া আর কোনও কথাই মনে পড়েনি।

আবার ভাবল কসেত্তেকে সে সব কথা বললেই বা কি হত? জাঁ ভলজাঁ সম্বন্ধে যে কথা সে জানতে পেরেছিল সেকথা কসেত্তেকে বললেই বা কি হত? তাতে কসেত্তের প্রতি তার মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হত? তার প্রতি দুর্বার প্রেমাবেগকে কি সে ঠেকিয়ে রাখতে পারত? মোটেই না। সুতরাং এ বিষয়ে অনুশোচনা বা দুঃখ করার কোনও কারণ নেই। অন্ধভাবে যে পথ সে অনুসরণ করেছিল, খোলা চোখে সে সেই একই পথ ধরে চলত। যে প্রেম তাকে অন্ধ করে দেয় সেই প্রেমই তাকে নিয়ে যায় স্বর্গসুখের এক ঐন্দ্রজালিক রাজ্যে।

জাঁ ভলজাঁ নামে ঐ লোকটার প্রতি যে হিমশীতল ঔদাসিন্য তার কাছ থেকে

তাকে দূরে ঠেলে রেখেছিল এতদিন আজ সেই ঔদাসিন্যটা এক অব্যক্ত ভীতি, করুণা এবং বিস্ময়ের এক মিশ্র অনুভূতিতে পরিণত হলো। যে লোক চোর, জেলপলাতক কয়েদী সেই লোকই ছয় লক্ষ ফ্রাঁ তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। সে টাকার কথা কেউ জানত না। সে টাকাটা সে নিজের জন্য রেখে দিতে পারত। কিন্তু তা না করে সে টাকা সব সে দিয়ে দিয়েছে তাদেরি সুখের জন্য। সে তাদের পরিবারে নিরাপদে ও সুখে বাস করতে পারত কাউকে কোনও কথা না বলে, কিন্তু সে লোভ সংযত করে তার গোপন সব কথা বলে দিয়েছে। এটা তার নিশ্চয় নিষ্ঠা, সততা ও মহত্ত্বের পরিচায়ক। কোনও নীচাশয় হীন প্রকৃতির মানুষের মধ্যে এই ধরনের সততা দেখা যায় না। সে আর যাই হোক, তার বিবেক এবং নীতি আছে। একদিন সে যত খারা'ই থাক, পরে নিশ্চয় তার জীবনের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। আর এই পরিবর্তনই তার মধ্যে নিয়ে আসে নিষ্ঠা আর সততা। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। মঁসিয়ে ফশেলেভেন্তের মধ্যে তবু এক রহস্যময় অবিশ্বস্ত আর ঔদ্ধত্যের ভাব ছিল, কিন্তু জাঁ ভলজাঁ অন্য মানুষ; সে যেন সততা এবং বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক।

ভলজাঁর দোষগুলোকে চিরে চিরে নিক্তিতে চাপিয়ে ওজন করে দেখতে লাগল মেরিয়াস। জনদ্রেত্তের ঘরের জানালা দিয়ে পুলিশ দেখে পালায় সে। অবশ্য তার একটা কারণ ছিল, সে পলাতক কয়েদী। কিন্তু সে ব্যারিকেডে যায় কেন? সেখানে সে যুদ্ধে কোনও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি। তবে কি জেভার্তের উপর তার প্রতিশোধ নেবার জন্যই সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করছিল সে? এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সে জেভার্তকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে খুন করে।

তবে একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেল মেরিয়াসের মনে। অনেক ভেবেও তার কোনও উত্তর খুঁজে পেল না। কসেত্তের মতো মেয়ে কিভাবে ভলজাঁর সংস্পর্শে এল এবং কি করেই বা দীর্ঘ নয় বছর তারা রইল একসঙ্গে? নিয়তির কোন নিষ্ঠুর চক্রান্ত বা ঈশ্বরের কোন অদ্ভুত খেয়ালের ফলে এক দেবদূত এসে দানবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রইল এতদিন তা বুঝে উঠতে পারল না সে। এমন সাক্ষাৎ অপরাধ আর সাক্ষাৎ নির্দোষিতার সহাবস্থান বড় একটা দেখা যায় না। একটি মেষশাবক ঘটনাক্রমে এসে পড়ল এক নেকড়ের গুহায় আর নেকড়ে সেই মেষশাবকটিকে ভালবেসে নয় বছর ধরে তার অস্তিত্ব রক্ষা করে এল এক অভূতপূর্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে। আর সেই অসম ভালবাসার আশ্চর্য এক ছায়ায় কসেত্তের বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবন লালিত হলো। এ ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময় বলে মনে হলো মেরিয়াসের। তার মাথাটা ঘুরতে লাগল।

বাইবেলের জেনেসিসে আবেল আর কেন এই দুই ধরনের মানুষের কথা আছে। উচ্চ এবং নীচ প্রকৃতির দুটি মানুষ। কিন্তু ভলজাঁর মতো নীচ প্রকৃতির মানুষ কসেত্তের মতো নিষ্পাপ সরল প্রকৃতির মেয়েকে মানুষ করল। এক অন্ধকারের জীব যেন একটি নক্ষত্রকে লালন করে আকাশে তার আবির্ভাবকে সম্ভূত করে তুলেছে। ঈশ্বর

যেন কসেত্তেকে মানুষ করার জন্যই ভলজাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেটা কি ভলজাঁর দোষ ?

মেরিয়াস ভাবল, যাই হোক, কসেত্তে আজ তার। সে তাকে ভালবাসে। ভলজাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার কোনও প্রয়োজন নেই। ভলজাঁ নিজেই বলেছে কসেত্তের সঙ্গে কোনও আত্মীয়তা নেই। সে এতদিন কসেত্তেকে মানুষ করেছে ঠিক, কিন্তু কসেত্তের জীবনে তার আর কোনও ভূমিকা নেই, কোনও প্রয়োজন নেই তার। কসেত্তে আজ তার স্বামী আর প্রণয়ীকে পেয়ে ভলজাঁকে ফেলে রেখে পাখা মেলে যেন সুদূর স্বর্গরাজ্যে উড়ে চলে গেছে।

ভলজাঁকে নিয়ে মেরিয়াস যাই ভাবুক না কেন, যাই চিন্তা করুক না কেন, ঘুরে ফিরে সে একটা অবাঞ্ছিত জায়গায় এসে পৌঁছচ্ছিল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল যাই হোক ভলজাঁ সমাজপরিত্যক্ত এমনই এক ভয়ঙ্কর মানুষ যে মানবসমাজের সব স্তরগুলি একে একে অতিক্রম করে অধঃপতনের শেষ প্রান্তে নেমে গেছে। মেরিয়াস গণতন্ত্রবাদী হলেও সে আইন আর সমাজের পক্ষপাতী ছিল। তার মনে হলো আইনের দিক থেকে সামাজিক কোনও অধিকার ভলজাঁর প্রাপ্য নয়। মেরিয়াস মুখে প্রগতির কথা বললেও তখনো পুরোপুরি প্রগতিবাদী হয়ে উঠতে পারেনি। ঈশ্বরের বিধান এবং মানুষের বিধান, আইন এবং ন্যায় ও নীতি—এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কোনও ক্ষমতা ছিল না তার। তার মনে হলো ভলজাঁর মতো লোকের পক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগের বিধানই উপযুক্ত শাস্তি। তাকে ঘৃণ্য জীব বলে মনে হচ্ছিল তার।

জনদ্রেত্তে, ব্যারিকেড, জেভার্ত প্রভৃতি বিষয়ে কোনও প্রশ্ন ভলজাঁকে করেনি মেরিয়াস। করলে কি উত্তর দিত তা বলা যায় না। আসল কথা প্রেমাবেগের আতিশয্যবশত কোনও বিষয়েব গভীরে দৃষ্টি দিয়ে সত্যাসত্য যাচাই করার মতো মনের অবস্থা তার তখন ছিল না। এই সব প্রশ্ন যদি সে করত তাহলে তার উত্তর কসেত্তের নিরীহ নির্দোষ জীবনের উপর কোনও অশুভ আলোকপাত করত কি না তা কে জানে ? মেরিয়াস তাই ভয় পেয়ে এ প্রশ্ন তুলতে সাহস পায়নি ভলজাঁর সামনে। অনেক সময় এসব ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে অনেক পবিত্র ও শুচিশুভ্র জীবন কলঙ্কের কালিমায় লিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। সে শুধু কসেত্তেকে চায়। তাকে আঁকড়ে ধরে ভলজাঁর দিকে চোখ বন্ধ করে থাকতে চায়।

কিন্তু সবশেষে একটা কথা ভাবতে গিয়ে অনুশোচনার বেদনায় মুহ্যমান হয়ে উঠল মেরিয়াস। সে নিজে ভলজাঁর সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না রাখলেও কসেত্তের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঠিকই থাকবে, কসেত্তের সঙ্গে রোজ তার দেখা হবে এবং সে নিজেই তার অনুমতি দান করেছে। সে এখন আক্ষেপ করতে লাগল, ভলজাঁর প্রতি আরও কঠোর হওয়া উচিত ছিল তার, তাকে বাড়ি থেকে চিরদিনের মতো তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আবেগের বশবর্তী হয়ে আবেগের স্রোতে ভাসতে ভাসতে ঠিকমত বিচার সে করতে পারেনি। নিজের উপর নিজেরই রাগ হতে লাগল তার।

কিন্তু এখন সে কি করবে ? সে যখন আসার ব্যাপারে ভলজাঁকে অনুমতি দিয়েছে

তখন আর কোনও কথা নেই। সে যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভলজাঁকে, সে যত খারাপ লোকই হোক, সে প্রতিশ্রুতি তার রক্ষা করে চলা উচিত। তাছাড়া কসেত্তের প্রতিও তো তার একটা কর্তব্য আছে।

এই চিন্তার একটা ছায়াম্লান প্রভাব মেরিয়াসের মুখচোখের উপর ফুটে উঠলেও সে কৌশলে কসেত্তেকে অন্য কথা বলে এড়িয়ে গেল। সে কৌশলে কসেত্তেকে কয়েকটা প্রশ্ন করে জানল সুদূর শৈশবকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভলজাঁ যতদিন তার সঙ্গে ছিল সে তাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসত। তার ব্যবহার ছিল খুবই সম্মানজনক। তাদের সম্পর্ক ছিল খুবই পবিত্র।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

পরদিন সন্ধে হতেই মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের বাড়িতে এসে দরজার কড়া নাড়তে লাগল জাঁ ভলজাঁ। বাস্ক দরজা খুলে দিল। তাকে বলে রাখা হয়েছিল ভলজাঁ এসময় আসবে। বাস্ক বলল, মঁসিয়ে, লে ব্যারন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন আপনি উপরকার ঘরে যাবেন না নিচের তলার ঘরেই বসবেন।

ভলজাঁ বলল, আমি নিচের তলার ঘরেই বসব।

বাস্ক যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে নিচের তলার একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল ভলজাঁকে। সে ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, আপনি বসুন, আমি মাদামকে খবর দিতে যাচ্ছি।

ঘরটার মধ্যে দুটো আর্মচেয়ার পাতা ছিল। আগুন জ্বলছিল। ঘরটা স্যাঁতসেঁতে। আলো-বাতাস কম।

ভলজাঁ খুব ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সে দিনকতক ধরে কিছু খাযনি বা ঘুমোয়নি। সে একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়ল। বাস্ক একটা বাতি হাতে নিয়ে ফিরে এসে জ্বলন্ত বাতিটা ঘরে রেখে দিয়ে চলে গেল ঘর থেকে।

ভলজাঁ মুখটা নামিয়ে বসেছিল। সে কোনওদিকে তাকায়নি। কিন্তু সে হঠাৎ কসেত্তের নিঃশব্দ উপস্থিতি অনুভব করল ঘরের মধ্যে। মুখ তুলে দেখল কসেত্তে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু ভলজাঁ তার দেহের সৌন্দর্য নয়, তার আত্মার প্রকৃত অবস্থাটা দেখতে চাইছিল।

কসেত্তেই প্রথমে কথা বলল, বাবা, আমি জানি তুমি অদ্ভুত ধরনের লোক, কিন্তু এটা আমি আশা করতে পারিনি তোমার কাছ থেকে। মেরিয়াস আমাকে বলেছিল তোমার অনুরোধেই এখানে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভলজাঁ বলল, একথা সত্যি।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। এটা নিয়ে কিন্তু বেশ একটা ব্যাপার হবে। সে যাই হোক, এখন আপাতত আমাকে একটা চুম্বন করো।

এই বলে সে একটা গাল বাড়িয়ে দিল ভলজাঁর দিকে। কিন্তু ভলজাঁ নড়ল না। তার পা দুটো যেন মেঝের উপর গাঁথা আছে।

কসেত্তে বলল, এটা কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কি দোষ আমি করেছি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বললে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব। আজ তুমি আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে।

আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

আমার বিশ্বাস হয় না। আমি মঁসিয়ে গিলেনর্মাদকে বলে তাঁকে দিয়ে তোমায় বকুনি খাওয়াব। বাবাদের জব্দ করতে হলে দাদুদের দরকার। চল তুমি উপরে আমার ঘরে।

তা অসম্ভব।

কসেত্তে হতাশ হয়ে বলল, কিন্তু কেন? কেন তুমি দেখা করার জন্য সবচেয়ে এই নোংরা ঘরটা বেছে নিয়েছ?

প্রথমে কসেত্তেকে তুই ও তুমি বলে সম্বোধন করার পর 'মাদাম আর্পনি' বলে সম্বোধন করতে লাগল ভলজাঁ। বলল, মাদাম জানেন আমি এক অদ্ভুত লোক। এটা আমার অদ্ভুত খেয়াল।

কসেত্তে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বাঃ বেশ বেশ। মাদাম আর আর্পনি —এটাও তোমার খেয়াল। কিন্তু এর মানে কি?

ভলজা শুধু নীরবে হৃদয়বিদারক এক সকরুণ হাসি হাসল। তারপর বলল, তুমি মাদাম হতে চেয়েছিলে এবং তা এখন হয়েছ।

কিন্তু সেটা তোমার কাছে নয় বাবা।

তুমি আর আমাকে বাবা বলে ডাকবে না।

কি?

তুমি আমাকে এবার হতে মঁসিয়ে জাঁ বা ইচ্ছা করলে শুধু জাঁ বলে ডাকবে।

তুমি বলতে চাও তুমি আর আমার বাবা নও? এরপর তুমি বলবে আমি আর কসেত্তে নই। এসবের মানে কি? কি হয়েছে? তুমি আমাদের কাছে থাকবে না, আমার ঘরেও আসবে না। এটা তো একটা বিপ্লব। কিন্তু কি দোষ আমি করেছি? নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে।

কিছুই হয়নি।

তাহলে?

যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে।

তুমি তোমার নামটা বদলে দিয়েছ কেন?

তোমার নামও পাল্টে গেছে। তুমি যদি এখন মাদাম পঁতমার্সি হও তাহলে আমিও মঁসিয়ে জাঁ হতে পারি।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এ সব ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে। আমি মেরিয়াসকে জিজ্ঞাস করব ঐ নামে তোমায় ডাকব কিনা। তুমি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ। সব ওলোটপালোট করে দিচ্ছ। মানুষের খেয়াল থাকা ভাল, কিন্তু সেই খেয়াল দিয়ে অপরের মনে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। তুমি একজন দয়ালু প্রকৃতির লোক হয়ে এমন নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয়।

ভলজাঁ কোনও উত্তর দিল না। কসেত্তে ভলজাঁর দুটি হাত নিয়ে তার গলার উপর রাখল। বলল, আমার উপর দয়া করে আমাদের সঙ্গে থাক, আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করো। আমার বাবা হও আগের মতো।

ভলজাঁ তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এখন তুমি স্বামী পেয়েছ, আর বাবার কোনও প্রয়োজন নেই তোমার।

কসেত্তে রাগের সঙ্গে বলল, বাবার কোনও প্রযোজন নেই? এ কি কথা! এ কথার কোনও মানে হয়?

ভলজাঁ বলল, আজ যদি তুসাঁ থাকত তাহলে সে বুঝত আমি খেয়ালী লোক। আমি একা থাকতে ভালবাসি।

কিন্তু এ ঘরটা ঠাণ্ডা। এখানে ভাল করে বসা বা দেখা যায় না। তোমাকে মঁসিয়ে জাঁ বা আপনি বলা আমার মোটেই ভাল লাগে না।

কসেত্তে এবার কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলতে লাগল, তুমি আমাকে কিন্তু ভীষণ রাগিয়ে দিচ্ছ। আমি তোমার জন্য এ বাড়িতে চমৎকার একটা ঘরের ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু সেখানে তুমি থাকবে না। আমাদের সঙ্গে খাবাব ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু তুমি খাবে না। আমার বাবা মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত হওযাব পরিবর্তে তুমি হলে মঁসিযে জাঁ এবং মাকড়শার জাল আর বোতলে ভর্তি এই নোংরা ঘরটা বেছে নিলে দেখা করার জন্য। রু হোমির সেই ঘৃণ্য বাসাতেই তুমি থাকছ। আমার বিরুদ্ধে কি তোমার বলার আছে? তবে তুমি কি আমার সুখে সুখী নও? আমার সুখ দেখে তোমার কি জ্বালা ধরছে, রাগ হচ্ছে?

ভলজাঁর মনে হলো কসেত্তে যেন ঘামাচি মারতে গিযে তার অন্তরটাকে উপড়ে ফেলেছে ঘা দিয়ে। সে আপন মনে বলল, তার সুখই ছিল আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

এরপর সে বলল, কসেত্তে, তুই এখন সুখী এবং আমার কাজ ফুরিযে গেছে।

কসেত্তে আনন্দের আবেগে তার দু'হাত দিয়ে ভলজাঁর ঘাড়টাকে জড়িয়ে ধরল। তুমি আমাকে তুই বলেছ। কী মজা!

ভলজাঁ এবার কসেত্তের হাত দুটো আস্তে আস্তে সরিযে দিয়ে মাথায টুপিটা তুলে দিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি মাদাম। আপনাকেও এখন অন্যত্র যেতে হবে। দরজার কাছে গিয়ে বলল, আমি আপনাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেছি। তার জন্য ক্ষমা করবেন। আপনার স্বামীর কাছে কথা দিচ্ছি এরকম ভুল আর হবে না।

এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভলজাঁ। বিস্ময়ে হতবাক ও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কসেত্তে।

২

পরদিন সন্ধের সময়ে সেই একই সময়ে কসেত্তের সঙ্গে দেখা করতে এল ভলজাঁ। আজ আর তার অদ্ভুত খেয়াল-খুশি সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করল না কসেত্তে। সে

ভলজাঁকে বাবা বা মঁসিয়ে জাঁ—দুটোর কোনওটা বলেই সম্বোধন করল না। ভলজাঁ তাকে মাদাম আর আপনি বলাতেও কোনও আপত্তি তুলল না।

গতকাল ভলজাঁর ব্যাপারটা সে মেরিয়াসের কাছে তোলায় মেরিয়াস তাকে সব কিছু মেনে নিতে বলেছে এবং কসেত্তেও হয়ত তাই তার স্বামীর অনুরোধে প্রেমের খাতিরে সবকিছু সহজভাবে মেনে নিয়েছে।

তবে যে ঘরে তারা দেখা করত সেই ঘরখানার চেহারা কিছুটা পাল্টেছে। বাস্ক খালি বোতলগুলো সরিয়েছে আর নিকোলেত্তে মাকড়শার জালগুলো পরিষ্কার করেছে। ভলজাঁ এর পর থেকে রোজ সন্ধ্যাতে আসতে লাগল। তবে সে যখন আসত তখন মেরিয়াস কাজের অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে যেত। কোনওদিন ঐ সময় বাড়িতে থাকত না। আইনের কাজে ব্যস্ত থাকত।

ভলজাঁর এই সব খেয়াল-খুশির ব্যাপারগুলোকে বাড়ির আর সকলেও সহজভাবে মেনে নেয়। মঁসিয়ে গিলেনর্মাদও ধীরে ধীরে ভুলে যান মঁসিয়ে ফশেলেভেন্তকে। তিনি তার সম্বন্ধে বলতে থাকেন, লোকটা একেবারে খাঁটি গেঁয়ো মানুষের মতো, কোনওরকম ছল-চাতুরি নেই। মার্কুই দ্য কানাপল্স্-এর খেয়ালও এর থেকে বাজে ছিল। তিনি এক বিরাট প্রাসাদ কিনে নিজে চিলেকোঠার ছাদের ঘরটায় থাকতেন। ম্যাদময়জেল গিলেনর্মাদ ধর্মকর্ম নিয়ে থাকত বেশি।

কিন্তু আসল কথা কেউ জানত না। এই ঘটনার আসল পটভূমিকা কি তা কেউ কিছু জানতে পারেনি। বাতাসে বেগ না থাকলেও জলে এত ঢেউ আসছে কোথা থেকে তা কেউ বুঝতে পারত না বা তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ চলতে লাগল। ভলজাঁর এই নতুন জীবনযাত্রা প্রণালী ও আচরণবিধির সঙ্গে দিনে দিনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল কসেত্তে। তাছাড়া এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর সময় নেই তার। বাড়ির গৃহিণী হিসাবে দায়দায়িত্ব বেড়েছে তার। তার উপর সে মেরিয়াসের সঙ্গে একা থাকতে চায় এবং তার সঙ্গে সে বেড়াতে যেতে চায়। একসঙ্গে দু'জনে বেড়াতে গিয়ে দু'জনেই আনন্দ পা· প্রচুর।

কসেত্তের শুধু একটা বিষয়েই বিরক্তিবোধ হয়, তুসাঁ এখানে আসার পর থেকে নিকোলেত্তের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না। যখন কোনওমতেই তাদের বনিবনাও হলো না তখন তুসাঁই একদিন চলে গেল এ বাড়ি ছেড়ে।

একদিন কসেত্তে ভলজাঁকে বলল, তুমি আমার বাবা নও, কাকা নও, মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত নও, তবে তুমি সত্যি সত্যি কে?

ভলজাঁ বলল, আমি হচ্ছি জাঁ।

কসেত্তে হেসে বলল, মঁসিয়ে জাঁ।

তাহলে তো আরও ভাল।

৩

কসেত্তেকে রোজ একবার করে দেখতে যায় ভলজাঁ—এইটাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

এই দেখাটাই তার জীবনের একমাত্র সম্বল। সে কসেত্তের দিকে তাকিয়ে নীরবে বসে থাকবে, কখনো অতীত জীবনের ও ছেলেবেলাকার গল্প করবে, কনভেন্টের বন্ধুদের কথা বলবে—এতেই খুশি সে। আর কিছু চায় না।

এপ্রিল মাসের একদিন বিকালবেলায় মেরিয়াস কসেত্তেকে রু প্লামেতের সেই বাগানটাতে বেড়াতে নিয়ে গেল যেখানে তাদের প্রথম আলাপ হয়। যেহেতু জাঁ ভলজাঁ সেটাকে লীজ হিসাবে নিয়েছিল সেইহেতু সেটা কসেত্তের সম্পত্তিতেই পরিণত হয়েছিল।

সেখানে গিয়ে আর সব কথা ভুলে গেল। সন্ধে হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরল না। ভলজাঁ কসেত্তের সঙ্গে দেখা করতে এসে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর হতাশ হয়ে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় এসে ভলজাঁ ওদের রু প্লামেতের বাগানে বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনে কসেত্তেকে জিজ্ঞাসা করল, ওখানে কিসে করে গেলে?

পায়ে হেঁটে।

এলে কি করে?

গাড়িতে।

ভলজাঁ ক'দিন ধরে কতকগুলো বিষয়ে মেরিয়াসের কার্পণ্য আর অত্যধিক মিতব্যয়িতার পরিচয় পেয়ে বিচলিত হয়ে ওঠে মনে মনে। সে কসেত্তেকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা একটা গাড়ি কেন না কেন? তাতে হয়ত তোমাদের পাঁচশো ফ্রাঁ করে বাড়তি খরচ হবে। কিন্তু এ টাকাটা তোমরা সহজেই খরচ করতে পার।

কসেত্তে বলল, আমি জানি না।

ভলজাঁ বলল, তারপর তুসাঁ চলে গেছে, তার পরিবর্তে অন্য কোনও মেয়েলোক রাখা হয়নি কেন?

নিকোলেত্তেই যথেষ্ট।

কিন্তু তোমার নিজের জন্য একজন দাসী দরকার।

আমার মেরিয়াস আছে।

তোমাদের দু'জনের একটা নিজস্ব আলাদা বাড়িরও দরকার। তাতে তোমাদের নিজস্ব দাসদাসী থাকবে, গাড়ি থাকবে, থিয়েটারে বা অপেরাতে তোমাদের জন্য বক্সের ব্যবস্থা থাকবে। যে সম্পদ মানুষের সুখকে বাড়িয়ে দেয় সে সম্পদ তোমাদের থাকা সত্ত্বেও তার সুযোগ নিচ্ছ না কেন?

কসেত্তে কোনও উত্তর দিল না।

আজকাল সন্ধের সময় কসেত্তেকে দেখতে এসে ভলজাঁ তাড়াতাড়ি চলে যেত না। আজকাল সে অনেকক্ষণ ধরে থাকতে লাগল। দিনে দিনে তার থাকার সময় বেড়ে যেতে লাগল। বেশিক্ষণ কাটাবার জন্য সে কসেত্তের কাছে মেরিয়াসের প্রশংসা করে কসেত্তেকে খুশি করার চেষ্টা করত।

এক একদিন রাত এত বেড়ে যেত যে বাস্ক এসে কসেত্তেকে বলতে বাধ্য হত, মঁসিয়ে গিলেনর্মাদ আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন যে খাবার দেওয়া হয়েছে।

এই সব দিনে ভলজাঁ বাড়ি ফেরার সময় ভাবত বেশি রাত করার জন্য মেরিয়াস হয়ত রাগ করবে তার উপর।

একদিন সবচেয়ে বেশি রাত হলো।

পরদিন ভলজাঁ এসেই দেখল ঘরে আগুন জ্বালানো নেই। কসেত্তে এসে বলল, আগুন না থাকলে ঠাণ্ডায় বসা যায়? বাস্ক আগুন জ্বালায়নি কেন?

ভলজাঁ বলল, এখন এপ্রিল মাস। আমার মতে আগুনের দরকার নেই।

এটাও তোমার একটা খেয়াল।

অথচ ভলজাঁ জানত কেন সে ঘরে আগুন জ্বালানো হয়নি।

পরের দিন ভলজাঁ এসে দেখল ঘরের মধ্যে আর্মচেয়ার দুটো যেখানে থাকত সেখানে নেই, ঘরের এককোণে জড়ো করা আছে।

কসেত্তে এসে চেঁচামিচি করতে ভলজাঁ নিজে চেয়ার দুটো যথাস্থানে নিয়ে এল। তবে সেদিন আগুন জ্বালা ছিল ঘরে।

যাবার জন্য ভলজাঁ উঠে দাঁড়ালে কসেত্তে বলল, আজ আমার স্বামী আমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলল। বলল, আমাদের দু'জনের মোট বার্ষিক আয় মাত্র তিরিশ হাজার লিভার। তাতেই চালাতে পারবে তো? একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম, একথা বলছ কেন? সে তখন বলল, আমি এমনি জানতে চাইছিলাম পারবে কি না।

সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনও কথা খুঁজে পেল না ভলজাঁ। সে রাতে ভলজাঁর মনটা এমন চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে সে তার বাসায় না গিয়ে ভুল করে অন্য এক বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কয়েকটা সিঁড়ি ওঠার পর তার হুঁশ হলো। ভলজাঁর মনে হলো যে ছয় লক্ষ ফ্রাঁ সে যৌতুক হিসাবে তাদের দিয়েছে তার উৎস সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে মেরিয়াসের মনে। সে হয়ত ভেবেছে টাকাটা আসলে ভলজাঁর এবং সে কোনও অসদুপায়ে সংগ্রহ করেছে। তাই সে সে-টাকায় হাত না দিয়ে কষ্ট করে সংসার চালাতে চায় কসেত্তেকে নিয়ে।

পরদিন সন্ধ্যায় কসেত্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার সন্দেহটা আরও জোরাল হলো। সে দেখল তাদের বসার ঘরে আর্মচেয়ার দুটো নেই। সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

কসেত্তে এসে চেঁচামেচি করতে লাগল। বলল, এর মানে কি?

ভলজাঁ বলল, আমি বাস্ককে তা নিয়ে যেতে বলেছি। হয়ত তার দরকার আছে অন্য ঘরে সেগুলো রাখার।

কিন্তু কেন?

হয়ত বাইরে থেকে কোনও অতিথি আসবে।

না, কোনও অতিথি আসার তো কথা নেই। কিন্তু কি করে বসব আমরা?

ভলজাঁ বলল, আমরা দু' মিনিট দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি।

কসেত্তে বলল, তুমি চেয়ার দুটো বাস্ককে নিয়ে যেতে বলেছ, একদিন আগুন জ্বালাতে বারণ করেছিলে। সত্যিই তুমি অদ্ভুত লোক।

ভলজাঁ বলল, বিদায়।

এক গভীর দুঃখ আর হতাশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে বাড়ি থেকে। আসলে কি ঘটেছে তা বুঝতে কিছু বাকি রইল না তার।

পরের দিন সন্ধ্যায় ভলজাঁ আর এল না কসেত্তের সঙ্গে দেখা করতে। তার আসার সময় একেবারে পার হয়ে গেলে তার কথাটা মনে করে তুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু এমন সময় মেরিযাস এসে তাকে চুম্বন করতে সে সব ভুলে গেল।

পরের দিন সন্ধ্যাতেও এল না ভলজাঁ।

তার পরদিন সকালে কসেত্তে নিকোলেত্তেকে ভলজাঁর শরীর খারাপ হয়েছে কি না তা দেখার জন্য তার র‍্যু হোমির বাসায় পাঠাল। নিকোলেত্তে ফিরে এসে জানাল, মঁসিয়ে জাঁর শরীর ভালই আছে। তবে তিনি বাইরে কোথায় যাবেন বলে কয়েকদিন আসতে পারবেন না। বাইরে থেকে ফিরে এসে তিনি দেখা করবেন মাদামের সঙ্গে।

৪

ভলজাঁ কিন্তু কোথাও যায়নি। সে তার বাসাতেই ছিল। পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতেই লে হোমির বাসা ছেড়ে সে বিষণ্নভাবে পথ হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট লুই-এর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সেন্ট লুই থেকে র‍্যু কালভেরির মেরিয়াসদের বাড়িটা দূর থেকে দেখতে লাগল। বাড়িটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে একটা সুখের অনুভূতি জাগছিল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। যেন সে কোনও অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে অশ্রুত ধ্বনিতে নীরব ভাষায় কথা বলছে। খুব ধীর পায়ে সে এগিয়ে যাচ্ছিল বাড়িটার দিকে। বাড়িটার কাছে এসে এমন বিষাদগ্রস্ত হয়ে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল সেদিকে যেন মনে হবে এক নিষিদ্ধ স্বর্গরাজ্যে এসে পৌঁছলেও সেখানে সে ঢুকতে পাবে না। এই সময় তার চোখে যে জল এসেছিল তার ফোঁটাটা বড় হতে হতে তার গাল বেয়ে ঝরে পড়ল এবং তা ঠোঁটের উপর আসায় তার তিক্ততাটা আস্বাদ করতে পারল।

এক পাথরের মূর্তির মতো কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর ফিরে এল সে। যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই সে বাসায় ফিরে গেল শূন্য মনে।

এর পর থেকে রোজ একবার করে সে সন্ধ্যার সময় বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু ক্রমেই সে তার সান্ধ্য ভ্রমণের পরিধিটা কমিয়ে আনতে লাগল। দ্বিতীয় দিন সে সেন্ট লুই থেকে র‍্যু কালভেরির বাড়িটা দেখেই ফিরে এল, তার কাছে আর গেল না। তার পরদিন সে সেন্ট লুই পর্যন্ত গেল না। র‍্যু পেভী থেকেই ফিরে এল। তার পরদিন সে ফিরে এল র‍্যু ত্রয় পেভিলন থেকে। তার পরদিন র‍্যু দে লাঁ মাঁতো থেকেই ফিরে এল। দম ফুরিয়ে আসা ঘড়ির দোলকের মতো তার গতি

ক্রমশই স্তিমিত হয়ে আসছিল। তার চোখে আর কোনও আশার আলো ছিল না, চোখে আর জলও আসত না।

আবহাওয়া মেঘলা থাকলে বা বৃষ্টি পড়লে সঙ্গে একটা ছাতা নিত সে। কিন্তু সে ছাতা সে খুলত না। তা হাতেই থাকত।

আশপাশের বাড়িগুলোর মেয়েরা তাকে দেখে বলাবলি করত, লোকটি বড় সাদাসিধে। কিন্তু বাচ্চা ছেলেরা তাকে আধপাগলা ভেবে হাসাহাসি করত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

সুখী হওয়াটা অনেকের কাছে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাদের কাছে সুখী হওয়া মানেই এক মিথ্যা আত্মপ্রসাদে মগ্ন হয়ে পড়া। সুখ অনেক সময় জীবনের এমন একটা ভ্রান্ত দিক হয়ে দাঁড়ায় যেদিকে গেলে মানুষ জীবনের আসল দিকটার কথা ভুলে যায়, জীবনের অন্য সব কর্তব্যের কথা ভুলে যায়।

তবু এজন্য দোষ দেওয়া যায় না মেরিয়াসকে। বিয়ের আগে সে মঁসিয়ে ফশেলেভেন্ত সম্বন্ধে কিছু জানতে চায়নি। বিয়ের পরেও সে জাঁ ভলজাঁর কতকগুলো জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে ভয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি। তাই ভলজাঁর কাছ থেকে তার স্বীকারোক্তি শোনার পর তার মনে হলো সে ভলজাঁকে নিয়মিত তাদের বাড়িতে কসেত্তের সঙ্গে দেখা করতে আসার অনুমতি দিয়ে ভুল করেছে। সে তার কোনও কথা কসেত্তেকে বা অন্য কারোকে বলবে না প্রতিশ্রুতি দিয়েও ভুল করেছে বলে মনে হলো তার।

সে তাই ধীরে ধীরে কৌশলে ভলজাঁকে তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করল। তার আসা বন্ধ করে দিল। ভলজাঁ আর কসেত্তের মাঝখানে ক্রমশ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে কসেত্তের মন থেকে ভলজাঁকে একেবারে অপসারিত করার চেষ্টা করতে লাগল।

এ ব্যাপারে যা কিছু প্রয়োজনীয়, যা কিছু ন্যায়সঙ্গত বলে ভাবতে লাগল তাই করে যেতে লাগল সে। একটা মামলার ব্যাপারে সে একসময় লাফায়েত্তে ব্যাঙ্কের এক কর্মচারীর সংস্পর্শে আসে। তার কাছে সে কিছু দরকারী তথ্য পায়। কিন্তু তার উপর ভিত্তি করে সে কোনও খোঁজখবর নিতে পারেনি বা বেশিদূরে সে ব্যাপারে এগোতে পারেনি। কারণ সে ভলজাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এ বিষয়ে আর সে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না। তাছাড়া ভলজাঁর বিপজ্জনক অবস্থা দেখেও সে সাহস পায়নি। এই সময় সে ভলজাঁর দেওয়া ছয় লক্ষ ফ্রাঁ অন্য একজনের নামে রাখার ব্যবস্থা করছিল। কিন্তু তার নাম-ধাম ভাল করে জানার জন্য অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে সে টাকায় সে হাত দেয়নি।

এ বিষয়ে কসেত্তেকে দোষ দেওয়া যায় না। সে এই সব গোপন কথার কিছুই জানত না। তার উপর মেরিয়াসের প্রভাব এমনই বেশি ছিল যে মেরিয়াসের ইচ্ছা ও চিন্তাভাবনার বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কিছু ভাবতে পারত না। ভলজাঁর ব্যাপারে মেরিয়াস যা বলত, যা ঠিক করত, সে অন্ধভাবে তাই সমর্থন করত। কোনও কারণ

জানতে চাইত না। মেরিয়াসের সত্তার মধ্যে তার সত্তা এমনভাবে মিশে যায় যে মেরিয়াসের মন থেকে যা মুছে যেত তা তার মন থেকেও আপনা থেকে অবলুপ্ত হয়ে যেত। তার জন্য কোনও চেষ্টা করতে হত না তাকে।

তবে ভলজাঁর কথাটা কসেত্তে ভুলে গেলেও সে বিস্মৃতি তার মনের উপরিপৃষ্ঠের মধ্যেই ছিল সীমায়িত। সে বিস্মৃতি তার মনের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। অন্তরে সে ভলজাঁকে ভালবাসত তখনো। তার কথা ভাবত। যাকে সে এতদিন বাবা বলে এসেছে এবং যার কাছ থেকে পিতামাতার স্নেহ, আদর নয় বছর ধরে লাভ করে এসেছে তার স্মৃতিটা সে একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি তার অন্তর থেকে।

মেরিয়াসের কাছে ভলজাঁর কথা প্রায়ই তুলত কসেত্তে। তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য বিস্ময় প্রকাশ করত। কিন্তু মেরিয়াস তাকে বলত, ভলজাঁ এখন এখানে নেই। বাইরে গেছে বলেই সে আসতে পারেনি। কসেত্তে জানত মাঝে মাঝে বাইরে যেত ভলজাঁ। কিন্তু এতদিন সে তার আগে কখনো থাকেনি বাইরে।

এর মধ্যে কসেত্তেকে নিয়ে একবার ভার্নলে যায় মেরিয়াস। সেখানে তার বাবা কর্নেল পঁতমার্সির কবরটা দেখিয়ে আনে তাকে। এইভাবে ভলজাঁর কথাটা ভুলিয়ে দেয় কসেত্তেকে।

বৃদ্ধদের প্রতি যুবক যুবতীদের এই অকৃতজ্ঞতার প্রতিরূপ প্রকৃতিজগতেও দেখতে পাই আমরা। আমরা দেখতে পাই পত্রসবুজ সজীব শাখাপ্রশাখাগুলি বৃক্ষকাণ্ডকে ছেড়ে আলো আর হাওয়ার বাইরের দিকে এগিয়ে চলে। যুবক যুবতীরাও তেমনি বৃদ্ধদের ছেড়ে আনন্দ, উৎসব, আলো আর প্রেমের সন্ধানে বাইরের দিকে ছুটে চলে। বৃদ্ধরা তাদের জীবনটাকে ক্রমশই গুটিয়ে এনে শুধু মৃত্যুচিন্তা আর অবক্ষয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে সে জীবনকে। ফলে বৃদ্ধ আর যুবক, প্রাচীন আর নবীনদের মধ্যে ব্যবধানটা কমার পরিবর্তে বেড়ে যায় দিনে দিনে।

২

একদিন সন্ধ্যার দিকে ভলজাঁ তার বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সামনের রাস্তাটা ধরে কয়েক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল তার। সে বাড়ির কাছে একটা পাথরের উপর বসে পড়ল। গত ৫ই জুন রাত্রিতে এই পাথরটায় বসে থাকাকালেই গাভ্রোশের সঙ্গে দেখা হয় তার। সেখানে মিনিট কতক বসে থাকার পর আবার সে বাড়ির ভিতর ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে তার ঘরে ফিরে গেল।

পরদিন সে আর তার ঘর থেকে বার হলো না। তার পরদিন বিছানা ছেড়েই উঠল না।

বাসা থেকে সবাই চলে যাওয়ার পর থেকে বাড়ির দারোয়ান ভলজাঁর খাবার রান্না করে দিয়ে যেত। তার খাবার বলতে ছিল কিছু শুয়োরের মাংস, বাঁধাকপি অথবা কিছু আলু।

সেদিন দুপুরে দারোয়ান ভলর্জার খাবার দিতে এসে আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, আপনি তো কালকের খাবার কিছুই খাননি। দেখল তার খাবারের প্লেটটা যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে।

দারোয়ান বলল, এ কি, গতকাল যে খাবার দিয়েছিলাম তা খাননি ?

ভলর্জা বলল, হ্যাঁ খেয়েছি।

প্লেটটা যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেছে।

কিন্তু জলের মগটা দেখ, সেটা খালি।

তার মানে আপনি শুধু জল খেয়েছেন, আর কিছু খাননি।

তার মানে আমার শুধু জলেরই দরকার ছিল। কিছু খাবার ইচ্ছা ছিল না।

কিছু যদি খাবার ইচ্ছা না থাকে তাহলে আপনার নিশ্চয় জ্বর হয়েছে।

আমি আগামীকাল কিছু খাব।

আজ না খেয়ে কাল খাবেন কেন ? নতুন আলুগুলো কত ভাল ছিল।

আমি কথা দিচ্ছি ওগুলো খাব।

আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না।

ভলর্জা যে বাসায় থাকে সে বাসায় কেউ আসে না। ঘরে কোনও লোক নেই। কিছুদিন আগে সে বাইরে বেরিয়ে দোকান থেকে একটা তামার ক্রস কিনে এনে দেওয়ালে এঁটে রাখে। সেইটার দিকে প্রায়ই তাকাত।

সে সপ্তায় ভলর্জা একদিনও ঘর ছেড়ে বাইরে বার হলো না।

দারোয়ান তার স্ত্রীকে বলল, ভদ্রলোক ওঠে না, কিছু খায় না। এমন ভাবে ও ক'দিন বাঁচবে ? আমার মনে হয় খুব একটা দুঃখ পেয়েছে। আমার মনে হয় মেয়ের বিয়েটা ভাল হয়নি।

তার স্ত্রী বলল, ভদ্রলোকের যদি পয়সা থাকে ডাক্তার ডাকবে আর যদি পয়সা না থাকে তাহলে মারা যাবে।

দারোয়ান একদিন রাস্তা দিয়ে এক স্থানীয় ডাক্তারকে যেতে দেখে ডেকে এনে ভলর্জার ঘরে পাঠিয়ে দিল। ডাক্তার ভলর্জাকে দেখে ফিরে এলে দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু ?

উনি তো বললেন ভাল আছেন। তবে দেখে মনে হলো উনি ওঁর জীবনের কোনও একান্ত প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। এই ধরনের আঘাতে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

আপনি আবার একবার আসবেন ?

আসব। তবে ডাক্তাররা থেকে ওঁর এখন আপনার লোকের দরকার।

৩

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভলর্জা বিছানার উপর অতিকষ্টে উঠে বসল। তার নাড়ীর স্পন্দন এত কমে গেছে যে সে তা অনুভব করতে পারছিল না। সে বুঝল আগের থেকে সে অনেক বেশি দুর্বল হয়ে গেছে। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। সে হাঁপাচ্ছিল।

সে উঠে কোনওরকমে শ্রমিকের পোশাকটা পরল। আজকাল সে রাত্রিতে ঘুরতে বার হয় না বলে এ পোশাক আর পরে না। পোশাকটা পরতে গিয়ে তার ঘাম বেরিয়ে গেল।

কাঠের টুলের উপর রাখা বাক্স থেকে কসেত্তের পোশাকগুলো বার করে বিছানার উপর ছড়িয়ে রাখল। বাতি রাখার জায়গায় বিশপের যে বাতিদান দুটো ছিল তাতে ড্রয়ার থেকে দুটো মোমবাতি বার করে জ্বেলে দিল। ঘরের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে যেতে হলেও তাকে মাঝে মাঝে বসে বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। সে বুঝল এটা সাধারণ ক্লান্তি নয়, সে ক্লান্তি তাড়াতাড়ি কেটে যায়। এ হচ্ছে তার ক্ষয়িষ্ণু প্রাণশক্তির এমনই অভাব যা আর কোনওদিন পূরণ হবে না।

বড় আয়নাটার উল্টো দিকে একটা চেয়ারে বসল সে। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখে সে যেন চিনতেই পারছিল না। তাকে দেখে এখন আশির উপর বয়স বলে মনে হচ্ছিল। অথচ কসেত্তের বিয়ের আগে তাকে দেখে পঞ্চাশের বেশি বয়স বলে মনে হত না। তার কপালে যে কুঞ্চনের রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তাতে মৃত্যুর ছায়া ফুটে উঠেছিল। এক-একটা রেখা যেন মৃত্যুর এক-একটা নিষ্ঠুর আঙুল। তার গাল দুটো ঝুলে গেছে। গায়ের চামড়ার রংটা কবরের মাটির মতো দেখাচ্ছিল।

এই অবস্থায় একটা চিঠি লেখার জন্য সে কাগজ-কলম বার করল। তার পিপাসা পেয়েছিল। কিন্তু জলের জগটা ধরে জল খেতে গেলে জগটা পড়ে গেল। হাতটা কাঁপছিল। লিখতে গিয়ে দেখল দোয়াতে কালি শুকিয়ে গেছে। কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে কালিটা ভিজিয়ে সে কলমটা তুলে নিয়ে অতিকষ্টে লিখতে লাগল। লিখতে লিখতে কপালের ঘাম মুছতে লাগল সে। হাতটা কাঁপছিল। সে লিখল,

কসেত্তে, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি। একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। আমাকে দূরে চলে যেতে হবে একথাটা আমায় বুঝিয়ে দিয়ে তোমার স্বামী ঠিকই করেছে। সে যা ভেবেছিল তা ঠিক না হলেও—সে ঠিকই করেছে। সে ভাল লোক। আমার মৃত্যুর পরেও তাকে ভালবেসে যাবে।

মঁসিয়ে পঁতমার্সি, তুমিও আমার প্রিয় সন্তান কসেত্তেকে ভালবেসে যাবে। আমি টাকাটা কোথা থেকে পেয়েছি, কিভাবে রোজগার করেছি সেই কথা বলার জন্যই এই চিঠি লিখছি। ও টাকা তোমার নিজস্ব। মন্ত্রিউলে আমার যে কাঁচের কারখানা ছিল তাতে স্বচ্ছ পাথরের মতো এক ধরনের কাঁচ তৈরি হত যা ধাতুর তৈরি জিনিসপত্রে ও সোনার গয়নায় লাগে। এ কাঁচ স্পেনে খুব বিক্রি হত। এই কাঁচ তৈরির জন্য তার উপাদান আগে নরওয়ে, ইংলন্ড ও জার্মানি থেকে আমদানি করতে অনেক খরচ হত। কিন্তু আমি সে উপাদান নকল করে ফ্রান্সেই তৈরি করি এবং তাতে অনেক খরচ বেঁচে যায়।...

আর লিখতে পারল না ভলজাঁ। সে বিছানার উপর ঢলে পড়ল। হাতে মাথাটা রেখে কাঁদতে লাগল সে। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া সে মর্মভেদী সকরুণ কান্না শোনার আর কেউ ছিল না সেখানে। কাঁদতে কাঁদতে মনে মনে সে বলে যেতে লাগল,

হায়, আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেল। এক উজ্জ্বল হাসির আলো হয়ে সে আমার জীবনে এসেছিল এবং সে আমার জীবন থেকে চিরদিনের মতো চলে গেল। মৃত্যুর সময় শেষবারের মতো দেখা হলো না তার সঙ্গে। মৃত্যুটা কিছুই নয় আমার কাছে। কিন্তু মৃত্যুকালে তার সঙ্গে দেখা না হওয়াটা কি ভয়ঙ্কর। সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসত, দুটো কথা বলত, তাতে কার কি ক্ষতি হত? কিন্তু এখন সব কিছু শেষ হয়ে গেল। আর তাকে আমি দেখতে পাব না।

ঠিক এই সময় তার ঘরের দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনতে পেল সে।

৪

সেইদিনই রাতে খাওয়ার পর মেরিয়াস যখন তার পড়ার ঘরে মামলার কাগজপত্র দেখছিল তখন বাস্ক একটা চিঠি এনে তার হাতে দিল। বলল, এ চিঠির লেখক হলঘরে অপেক্ষা করছে। এক একটা চিঠিও এক একজন মানুষের মতো দেখতে কুৎসিত হয়। সে চিঠি দেখলেই বিরক্তি আসে।

মেরিয়াস তার হাতে যে চিঠিটা পেল সেটাও ছিল এমনি এক ধরনের চিঠি। চিঠিটা থেকে তামাকের গন্ধ আসছিল। চিঠিটার উপর লেখা আছে লে ব্যারন পঁতমার্সিকে।

চিঠিটা থেকে তামাকের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা কথা মনে পড়ে তার। চিঠিতে তামাকের গন্ধ, বাজে কাগজ, ভাঁজ করার পদ্ধতি, জলো কালি, —সব মিলিয়ে জনদ্রেত্তের সেই ঘরটার কথা মনে পড়ছিল তার।

মেরিয়াস ভাবল, সে দু'জন লোককে খুঁজছিল। ঘটনাক্রমে তাদের দু'জনের একজন স্বেচ্ছায় এসে গেছে তার কাছে। তার মানে পত্রলেখক থেনার্দিয়ের ছাড়া আর কেউ নয়।

চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল মেরিয়াস।

মঁসিয়ে লে ব্যারন,

ঈশ্বর যদি আমাকে উপযুক্ত প্রতিভা দান করতেন তাহলে আমি আকাদেমি দে সায়েন্সের সদস্য ব্যারন থেনার্দ হতে পারতাম। আমি তাঁর নাম বহন করছি। এই কথা বিবেচনা করে যদি আপনি আমাকে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করেন তাহলে বিশেষ সুখী ও বাধিত হব। আপনি আমার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করবেন আমি তার অবশ্যই প্রতিদান দেব। আপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি সম্বন্ধে এক গোপনীয় তথ্য আমি জানি এবং সে তথ্য আপনার কাজে লাগতে পারে। যে বাড়িতে মাদাম লা ব্যারনীর মতো উচ্চ অভিজাতবংশীয়া মহিলা থাকেন সে বাড়িতে ঐ ধরনের লোক থাকা কোনও মতেই উচিত নয় এবং এ লোককে কিভাবে তাড়াতে হবে বাড়ি থেকে সে উপায় আমি বলে দেব। পাপ এবং পুণ্য কখনো এক বাড়িতে থাকতে পারে না। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। ইতি—

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে থেনার্দ।

থেনার্দিয়ের নামটা কিছু সংক্ষিপ্ত করে থেনার্দ করা হয়েছে। কিন্তু তা করা হলেও

চিঠির ভাষা আর লেখার ভঙ্গিমা দেখে এ চিঠি কার লেখা তা বুঝতে বাকি রইল না মেরিয়াসের।

মেরিয়াস ভাবল একজনকে পেয়ে গেল। একটা দিকে নিশ্চিন্ত হলো সে। তার বাবার উদ্ধারকর্তাকে পেয়ে গেল। এবার যদি সে তার উদ্ধারকর্তাকে সে পেয়ে যায় তাহলে তার জীবন একেবারে মুক্ত হবে সব চিন্তা থেকে। সে ড্রয়ার থেকে ব্যাঙ্কনোট বার করে তার পকেটে ভরে রাখল। তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে বাস্ককে ডাকল।

বাস্ক এলে তাকে বলল, ভদ্রলোককে এখানে নিয়ে এস।

বাস্ক ঘোষণা করল, মঁসিয়ে থেনার্দ এসে গেছেন।

তাকে দেখে চিনতেই পারছিল না মেরিয়াস। মাথায় পাকা চুল, বড নাক, চোখে চশমা, থুতনিটা সরু হয়ে বেঁকে গেছে। পরনে কালো ছেঁড়া পোশাক। কোমরে ঝোলানো একটা ঘড়ির কার ছিল। তার একটা পুরনো টুপি ছিল। তার পেটটা বাঁকা থাকায় সে কুঁজো হয়ে হাঁটছিল।

থেনার্দিয়ের যে পোশাকটা পরেছিল সে পোশাকটার দিকে প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো মেরিয়াসের। পোশাকটা তার গায়ে বড় হচ্ছিল এবং বেশ বোঝা যাচ্ছিল সেটা তাব নয়। তার চেহারাটা আগের তুলনায় পাল্টে যাওয়ায় তাকে ঠিক চিনতে না পারলেও তার নাম সইটা দেখে এবং চিঠিটা পরীক্ষা করে সে যে থেনার্দিয়ের এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইল না তার।

সেকালে আর্শেনালের কাছে একজন ইহুদী পুরনো পোশাকের এক ব্যবসা খুলেছিল। সেখানে প্রতিদিন তিরিশ স্যুর বিনিময়ে পোশাক ভাড়া পাওয়া যেত। সে পোশাক পরে অনেক দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকও দু'-একদিনের জন্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সাজতে পারত। অনেক চোর সেই দোকানটায় গিয়ে তিরিশ স্যু জমা দিয়ে তার পছন্দমতো এক সাজ-পোশাক বেছে নিয়ে পরে চলে যেত। পরের দিন সে পোশাকটা ফেরৎ দিয়ে যেত। কিন্তু মুস্কিল হত এই যে পোশাকটা প্রায় লোকেরই গায়ের সঙ্গে খাপ খেত না।

মেরিয়াস এই পোশাক ভাড়ার ব্যাপারটা জানত না বলে এ লোক থেনার্দিয়ের নয় বলে সন্দেহ জাগল তার মনে। সে হতাশ হলো।

লোকটা তার সামনে এসে খুব নত হলো।

মেরিয়াস কড়াভাবে জিজ্ঞাসা করল, কি চাও তুমি ?

আগন্তুক কুমীরের হাসির মতো মুখটা অদ্ভুতভাবে বিকৃত করল। তারপর বলল, আমি মঁরিয়ে লে ব্যারনকে এর আগে প্রিন্সেস বাগ্রেশন, ভিকোঁতে সাম্ব্রে প্রভৃতি অভিজাত সমাজের ব্যক্তিদের বাড়িতে দেখিনি একথা বিশ্বাস করতেই পারছি না।

অভিজাত সমাজের যে সব লোকদের সঙ্গে কোনও পরিচয় নেই তাদের সঙ্গে পরিচয়ের ভান করা ভণ্ড প্রতারকদের এক ছলনাময় কৌশল।

মেরিয়াস মন দিয়ে তার কণ্ঠস্বরটা শুনতে লাগল। কিন্তু তার নাকি সুরের কথাগুলো থেনার্দিয়েরের শুষ্ক নীরস কণ্ঠস্বর থেকে একেবারে আলাদা। মেরিয়াস বলল, আমি ওদের কাউকেই চিনি না।

মেরিয়াসের চোখমুখের কড়াভাব দেখেও কিছুমাত্র দমে না গিয়ে আগন্তুক বলতে লাগল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়ত শ্যাতোব্রিয়াদেঁর বাড়িতে দেখেছি আপনাকে। তিনি আমাকে মদপানের জন্য তাঁর বাড়িতে যেতে বলেন।

মেরিয়াস এবার ভ্রূকুটি করে বলল, আমি শ্যাতোব্রিয়াদঁকেও চিনি না। তুমি কি আসল কথাটা বলবে? আমি কি করতে পারি তোমার জন্য?

আগের মতোই মাথাটা নত করে আগন্তুক বলতে লাগল, আপনি অন্তত দয়া করে আমার কথাটা মন দিয়ে শুনতে পারেন। আমেরিকার পানামা অঞ্চলে লা বোয়া নামে একটা গাঁ আছে। সে গাঁয়ে একটা মাত্র বাড়ি আছে। রোদে পোড়ানো ইঁট দিয়ে তৈরি তিনতলা সেই বাড়িটা বেশ বড় এবং বর্গক্ষেত্রাকার। বাড়িটার এক-একদিকের দেওয়ালগুলো পাঁচশো ফুট করে লম্বা। ভিতরের উঠোনটায় অনেক মালপত্র জমা করা আছে। বাড়িটাতে কোনও ঘরে কোনও জানালা নেই। শুধু বাতাস চলাচলের জন্য কিছু ফুটো আছে। কোনও দরজাও নেই; দরজার পরিবর্তে মই আছে। একতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত মই আছে এবং দোতলা থেকে তিনতলা পর্যন্তও মই আছে। ভিতরের দিকে উঠোন থেকে দোতলা-তিনতলায় যাবার জন্যও মই আছে। রাত্রিতে মইগুলো তুলে নেওয়া হয়। তাই বাড়িটা দিনে বাড়ি এবং রাত্রিতে দুর্গের মতো হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে আটশো লোক বাস করে। সেই বাড়িটাই একটা গোটা গাঁ। তবে আপনি বলতে পারেন বাড়িটাতে এত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন কি? তার কারণ হলো এই যে, ঐ অঞ্চলটায় বহু নরখাদকের বাস। আপনি বলতে পারেন কেন তাহলে ওখানে সভ্য জগতের লোকেরা যায়? যায় এইজন্য যে ওখানে অনেক সোনা পাওয়া যায়।

ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিল মেরিয়াস। সে বলল, এসব কথা আমাকে বলছ কেন?

বলছি এই জন্য যে আমি একজন ক্লান্ত ও অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিবিদ। রাষ্ট্রদূতের কাজ করেছি বহু জায়গায়। আধুনিক সভ্যতা পীড়াদায়ক আম পক্ষে। আমি তাই ঐ সব বন্য বর্বর আদিবাসীদের সঙ্গে বাস করতে চাই।

কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

অহঙ্কারই জীবনের ধর্ম মঁসিয়ে লে ব্যারন। সব আপন আপন স্বার্থপূরণ আর অহঙ্কার নিয়ে যখন শহরের ধনী ব্যক্তিরা ঘোড়ার গাড়িতে করে মাঠের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পথের উপর দিয়ে যায় তখন চাষীরা সেদিকে তাকায় না। সকলেই আপন স্বার্থ আর সম্পদে মত্ত হয়ে আছে।

এই স্বার্থপূরণ ও সম্পদের জন্য চাই টাকা।

কিন্তু তুমি আসল কথাটা বলনি এখনো।

আমি লা বোয়াতে বসবাস করতে চাই। আমরা মানে তিনজন—আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার অতি সুন্দরী এক কন্যা।

তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

বহু দূর দেশ। সেখানে যেতে অনেক খরচ। আমার কিছু টাকার দরকার।

আমি তার কি করতে পারি?

শকুনির মতো ঘাড়টা বাড়িয়ে লোকটা হাসিমুখে বলল, মঁসিয়ে আমার চিঠিটা পড়েছেন?

আসলে হাতের লেখাটার দিকে নজর দিতে গিয়ে চিঠিটা ভাল করে পড়া হয়নি মেরিয়াসের। তাছাড়া লোকটা যখন বলল, তার স্ত্রী আর মেয়ে আছে তখন তার আশা হলো। ভাবল লোকটা হয়ত থেনার্দিয়েরই হবে।

তাই তার কথাটার জবাব না দিয়ে মেরিয়াস বলল, আর কিছু তোমার বলার আছে?

ঠিক আছে মঁসিয়ে লে ব্যারন। আমার কাছে একটা গোপন তথ্য আছে। সেটা আমি বিক্রি করতে পারি।

সে তথ্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি আছে?

হ্যাঁ কিছুটা আছে।

ঠিক আছে কি সে তথ্য তা বল।

আমার মনে হয় এ বিষয়ে আপনি অবশ্যই আগ্রহান্বিত হবেন।

ঠিক আছে।

মঁসিয়ে, আপনি একজন চোর আর নরঘাতকের সঙ্গে বাস করছেন।

আমার কাছে এমন কেউ থাকে না।

এতে কিছুটা বিচলিত হয়ে আগন্তুক লোকটা বলতে লাগল, একটা চোর এবং নরঘাতক। আমি তার অতীতের অপরাধ ও পাপকর্মের কথা বলছি না। সেটা আইনের ব্যাপার। সেসব হয় আইনের দিক থেকে বাতিল বা খাবিজ হয়ে গেছে এবং তা হয়ত অনুশোচনার দ্বারা স্খালন হয়ে গেছে। কিন্তু সম্প্রতি সে যা করেছে তা এখনো আইনের চোখে ধরা পড়েনি। এই লোকটা কৌশলে আপনার বিশ্বাস অর্জন করে এক অন্য নাম ধারণ করে আপনার পরিবারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমি তার আসল নামটা বলব আপনাকে।

ঠিক আছে, আমি শুনছি।

তার নাম জাঁ ভলজাঁ।

আমি তা জানি।

আমি বলব সে কি প্রকৃতির লোক।

বল।

সে এক জেল পলাতক কয়েদী।

আমি তাও জানি।

আমি বললাম বলেই তা জানলেন।

না, আমি আগেই তা জেনেছি।

মেরিয়াসের কণ্ঠস্বরের নীরস ভাষা এবং তার ঔদাসিন্য দেখে দমে গেল আগন্তুক।

এক প্রবল রাগে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো। সে একবার মেরিয়াসের দিকে কটাক্ষপাত করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। তার চোখের মাঝে একরাশ নারকীয় আগুন জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল মুহূর্তে।

আগন্তুক মৃদু হেসে বলতে লাগল, আমি আপনার কথা অস্বীকার বা খণ্ডন করতে চাইছি না মঁসিয়ে লে ব্যারন। তবে যাই হোক, আপনি দেখেছেন আমি অনেক তথ্য জানি। আমি যে কথা বলতে এসেছি সেকথা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেটা হচ্ছে মাদাম লা ব্যারনীর সম্পত্তি সম্পর্কিত। এটা কিন্তু মূল্যবান এক গোপন তথ্য এবং এটা আমি কুড়ি হাজার ফ্রাঁ নিয়ে বিক্রি করব।

আগের তথ্যগুলো যেমন আমার সব জানা তেমনি তোমার এ তথ্যও আমি জানি।

আগন্তুক তার দামটা কমানো যুক্তিসঙ্গত মনে করে বলল, তাহলে দশ হাজার দেবেন।

আমি বলছি, নতুন কিছু বলার তোমার নেই। আমি আগেই সব জেনে ফেলেছি।

কিন্তু আমাকে যেতে হবে মঁসিয়ে লে ব্যারন। দয়া করে আমার এই গোপন তথ্যটি অন্তত দশ ফ্রাঁ দিয়ে কিনে নিন।

তার মুখের ভাবটা একেবারে পাল্টে গিয়েছিল।

মেরিয়াস বলল, আমি যেমন জাঁ ভলজাঁর নাম জানি তেমনি তোমার নামও জানি।

সেটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, আমার চিঠিতে আমাব নাম লেখা ছিল। থেনার্দ নামটা স্বাক্ষরে ছিল।

কিন্তু তোমার নামের সবটা লেখনি।

তাহলে সেটা কি ?

থেনার্দিয়ের।

সে আবার কে ?

বিপদে পড়ে শজারুরা যেমন গায়ের কাঁটাগুলোকে খাড়া করে তোলে থেনার্দিয়ের তেমনি বিপদে পড়ে ভয় না পেয়ে হাসতে লাগল।

মেরিয়াস বলল, তুমি শুধু থেনার্দিয়ের নও, তুমি শ্রমিক জনদ্রেত্তে, অভিনেতা ফাবান্ত, কবি জেনফ্লট, স্পেনদেশীয় ভন আলজারেজ এবং বিধবা বলির্জাদ। এক সময় মঁতফারমেলে একটা হোটেল ছিল তোমার।

হোটেল ? কখনো না।

তোমার আসল নাম হলো থেনার্দিয়ের।

আমি তা অস্বীকার করছি।

তুমি একটা পাকা জুয়োচোর এবং দুর্বৃত্ত। তবু এই নাও। এই নিয়ে চলে যাও।

এই বলে সে পকেট থেকে একটা নোট বার করে দিল।

থেনার্দিয়ের তা নিয়ে দেখল পাঁচশো ফ্রাঁ। সে বলল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ মঁসিয়ে। কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গেল।

এবার সে তার সব ছদ্মবেশ খুলে ফেলল। তার ঢোলামতো কোট, নকল বড়

নাক, সবুজ চশমা সব খুলে ফেলতে তার কপালে কতকগুলো কুঞ্চিত রেখা দেখা গেল।

এবার নাকি সুরের কথা ছেড়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, সত্যিই আপনি সম্ভ্রান্ত মঁসিয়ে লে ব্যারন। আমিই থেনার্দিয়ের।

এবার সে কুঁজো ভাবটা কাটিযে সোজা হয়ে বসল।

এটা সত্যিই আশা করতে পারেনি থেনার্দিয়ের। গোপন তথ্য জানিয়ে দিযে মেরিযাসকে বিস্ময়ে তাক লাগিযে দিতে এসে নিজেই বিস্ময়ে হতবাক হযে পড়ে। যে সব কথা বলতে এসেছিল সে সব কথা মেরিয়াস আগে হতে জেনে ফেলায সে অপমানিত বোধ করে। তবে সে অপমানের পুরস্কার স্বরূপ পাঁচ শো ফ্রাঁ নোট পেয়ে যাওয়ায় তার বিস্ময় আরও বেড়ে যায়।

ব্যারন পঁতমার্সিকে জীবনে সে প্রথম দেখছে। সে যে মেরিযাস এটা সে বুঝতে পারেনি। তাকে চিনতে পারেনি। তবু ব্যারন পঁতমার্সি তার ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তাকে চিনতে পেরেছে। সে ভলজাঁ সম্বন্ধেও সব কিছু জানে। দাড়িহীন এই যুবক একই সঙ্গে একাধারে এক হিমশীতল কঠোরতায় প্রস্তরীভূত এবং উদারতায বিগলিত। যে লোকচরিত্র বোঝে এবং সবার সব কথা বোঝে এবং অভিজ্ঞ বিচারকের মতো দুষ্ট প্রকৃতির বিচার করে, যে মেরিযাস একদিন তার পাশের ঘরে বাস করত, তার ছিল নিকটতম প্রতিবেশী, যার কথা তার মেয়েদের মুখে শুনেছে এবং এই ব্যারন পঁতমার্সি—এই দু'জনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক সে ধরতে পারেনি। ওয়াটারলু যুদ্ধে পঁতমার্সি নামটা সে শুনলেও সে নাম নিয়ে সে মাথা ঘামাযনি, কারণ তাতে কোনও টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

তার মেয়ে আজেলমাকে ধন্যবাদ। সেই ১৬ই ফেব্রুযারি মেরিযাসের বিয়ের দিন রাস্তা থেকে বিয়ের শোভাযাত্রায় একটি গাড়িতে ভলজাঁকে দেখে তার বাবাকে বলে। সেই সূত্রেই থেনার্দিয়ের জানতে পারে জাঁ ভলজাঁ মেরিয়াসদের বাড়ির সঙ্গে এক বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। এর আগে সে একদিন সন্ধ্যার সময় সেন নদীর ধারে সেই ঢাকা নর্দমার মুখে এক মৃতবৎ আহত লোকের সঙ্গে ভলজাঁকে দেখে এবং গেটের চাবি খুলে দেয়। সে এও বুঝতে পারে যে ব্যারনের স্ত্রী ব্যারনেস পঁতমার্সিই হলো কসেত্তে। এই কসেত্তে এক অবৈধ সন্তান এবং তার অতীতের কথা সে জানে। কিন্তু এ কথা সে ব্যারন পঁতমার্সির মুখের উপর বললে সে রেগে যাবে এবং তাতে তার ক্ষতি হবে বলে সে-কথা বলতে সাহস পায়নি।

থেনার্দিয়েরের আসল কথাটা কিন্তু বলা হয়নি, শুধু তার ভিত্তিভূমিটা রচিত হয়েছে মাত্র। এরই মধ্যে সে পাঁচ শো ফ্রাঁ পেয়ে গেছে। সে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। এবার সে ভাবছিল যে কথা সে বলতে এসেছে এবং যে কথার তথ্য প্রমাণাদি সে সংগ্রহ করে এনেছে সেকথাটা কিভাবে তুলবে। সে তাই সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

মেরিয়াস ভাবছিল, যে লোকটাকে খুঁজে বার করার জন্য সে কত চেষ্টা করে

সে লোক এখন তার সামনে হাজির। এবার সে তার পিতার প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারে। তার দায় থেকে মুক্ত হতে পারে। এই ধরনের এক দুষ্ট প্রকৃতির লোক তার পিতাকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে উদ্ধার করে এ কথা মনে করে অপমান বোধ করে সে। যাই হোক, পিতার ঋণ থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পেয়ে মনে মনে খুশি হলো মেরিয়াস।

তার একটা কর্তব্য আছে। কসেত্তেকে দেওয়া টাকার রহস্যটার তাকে সমাধান করতে হবে এবং এ বিষয়ে থেনার্দিয়ের কাজে লাগতে পারে।

মেরিয়াস দেখল থেনার্দিয়ের টাকাটা পকেটে ভরে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসছিল। মেরিয়াস এই সুযোগে বলল, থেনার্দিয়ের, আমি তোমার আসল নাম বলেছি। এবার তুমি যে কথা বলবে বলছিলে সে কথাটা বলতে পার। তুমি জান আমি অনেক কিছু জানি। তোমার থেকে হয়ত বেশি কিছু জানি। জাঁ ভলজাঁ চোর এবং খুনী। সে মঁসিয়ে ম্যাদলেন নামে এক ধনী ব্যবসায়ীর সব টাকা আত্মসাৎ করে এবং পুলিশ অফিসার জেভার্তকে খুন করে।

থেনার্দিয়ের বলল, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না মঁসিয়ে লে ব্যারন।

মেরিয়াস বলল, আমি বুঝিয়ে দেব। ১৮২২ সালের কাছাকাছি পাস দ্য ক্যালেতে একটা লোক বাস করত। কোনও কারণে আইনের ভয়ে আত্মগোপন করে পরে মঁসিয়ে ম্যাদলেন নামে নিজেকে নতুনরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। সে মন্ত্রিউল-সুর-মেরে কালো কাঁচের এক কারখানা স্থাপন করে সমস্ত শহরটাকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলে। এই কারবারে প্রচুর লাভ হয় তার। কিন্তু তার লাভের টাকা সে অকাতরে গরীবদুঃখীদের দান করত। তাদের জন্য অনেক স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপন করে। বিধবা ও অনাথ শিশুদেরও দেখাশোনা করত। মোট কথা, ঐ সমগ্র অঞ্চলের গরীবদুঃখীদের অভিভাবক হয়ে ওঠে সে। সে শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়। একজন জেলফেরত কয়েদী তাকে চিনতে পেরে ধরিয়ে দেয় এবং তার গ্রেপ্তারের সুযোগ নিয়ে প্যারিসের লাফিত্তে ব্যাঙ্কে মঁসিয়ে ম্যাদলেনের যে মো. টাকা জমা ছিল সেই টাকা সে স্বাক্ষর জাল করে তুলে নেয়। প্রায় ছয় লক্ষ ফ্রাঁ। এই জেলফেরত কয়েদীই জাঁ ভলজাঁ। আর তার খুনের কথা যদি বল, তাহলে বলব সে পুলিশ অফিসার জেভার্তকে খুন করে, আমি নিজে ঘটনাস্থলে ছিলাম।

থেনার্দিয়ের এমনভাবে মেরিয়াসের মুখপানে তাকাল যাতে করে মনে হলো সে দাঁড়াবার যে জায়গাটা হারিয়ে ফেলেছিল সে জায়গাটা আবার পেয়ে গেছে এবং এবার তার জয় সুনিশ্চিত। পরাজয়ের সব অপমান ঝেড়ে ফেলে সে বলল, আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন মঁসিয়ে লে ব্যারন।

মেরিয়াস বলল, সেকি, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? কিন্তু এ ঘটনা সত্য।

না, ও ঘটনা সম্পূর্ণ অসত্য। এর আগে মঁসিয়ে লে ব্যারন যে সব কথা বলেছেন তা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু একথা মানতে পারব না। এবার এ ব্যাপারে আসল কথাটা বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। সত্য এবং ন্যায় সব কিছুর ঊর্ধ্বে।

কোনও লোক অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হোক এটা আমি চাই না। জাঁ ভলজাঁ মঁসিয়ে ম্যাদলেনের টাকা আত্মসাৎ করেনি এবং জেভার্তকেও সে খুন করেনি।

কি করে তুমি তা বুঝলে ?

দুটো কারণে। প্রথমত সে মঁসিয়ে ম্যাদলেনের টাকা অপহরণ করেনি কারণ সে নিজেই মঁসিয়ে ম্যাদলেন।

সে কি করে হয়... ?

এবং দ্বিতীয়ত সে জেভার্তকে খুন করেনি, কারণ জেভার্ত নিজেই নিজেকে খুন করে। এটা আত্মহত্যার ঘটনা।

মেরিয়াস আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, কিন্তু এ কথার সমর্থনে কোনও প্রমাণ আছে ?

পুলিশ অ'ফিসার জেভার্ত জলে ডুবে আত্মহত্যা করে এবং পঁত-অ শেঞ্জেব কাছে সেন নদীতে একটা নোঙর করা নৌকোর পাশে তার মৃতদেহ পাওযা যায়।

তার প্রমাণ দাও।

থেনার্দিযের তার পকেটে ভাজঁকরা খবরের কাগজের একটা বড খাম বার করল। তারপর সে বলতে লাগল, মঁসিযে লে ব্যারন, আমি আপনাব স্বার্থেই জাঁ ভলজাঁ সম্বন্ধে সব খবর সংগ্রহ করি। যখন আমি বলছি আপনাকে ভলজাঁ এবং ম্যাদলেন একই লোক এবং সে জেভার্তকে খুন করেনি তখন আমি তার সমর্থনে প্রমাণ দেখাতে পারি। হাতের লেখা প্রমাণ নয়, মুদ্রিত তথ্যই আসল প্রমাণ।

কথা বলতে বলতে থেনার্দিয়ের ভাঁজকরা দুটো পৃথক খবরের কাগজ বার করল। কাগজগুলো থেকে কড়া তামাকের গন্ধ আসছিল। তার মধ্যে একটা কাগজ বেশি পুরনো। কাগজ দুটো জনসাধারণের কাছে পরিচিত। পুরনো কাগজটা হলো দ্রেপো ব্লাঁর ১৮৪২ সালের ২৫ শে জুলাই সংখ্যা যাতে জাঁ ভলজাঁ আর মঁসিয়ে ম্যাদলেনকে একই লোক বলে দেখানো হয়েছে। আর একটি কাগজ হলো ১৮৩২ সালের ১৫ই জুন সংখ্যার 'মন্ত্রিউর' যাতে জেভার্ত-এর আত্মহত্যার খবর প্রকাশিত হয় এবং তার সঙ্গে একথাও প্রকাশিত হয় যে জেভার্ত পুলিশের বড়কর্তার কাছে স্বীকারোক্তি করে লা শাঁভ্রেরির ব্যারিকেডে বিপ্লবীদের হাতে বন্দী হওয়ার পর একজন বিপ্লবীর মহানুভবতায় তার প্রাণরক্ষা হয় যে বাতাসে ফাঁকা আওয়াজ করে তাকে ছেড়ে দেয়।

থেনার্দিয়ের আরও বলল, এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। খবরের কাগজে যে ঘটনা প্রকাশিত হয় তা নির্ভরযোগ্য, কারণ তার উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই ছাপা হয়, থেনার্দিয়েরের কথায় তা ছাপা হয়নি।

এতক্ষণে মেরিয়াস বুঝতে পারল ভলজাঁ সম্বন্ধে তার ধারণা কত ভুল। সে সব কিছু বুঝতে পেরে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, তাহলে তো ভলজাঁ এক চমৎকার লোক। টাকাটা তাহলে তারই কারণ সেই ম্যাদলেন। সে আবার জেভার্তের রক্ষাকর্তা, উদ্ধারকর্তা। সে সত্যিকারের একজন বীর এবং সাধুপুরুষ।

থেনার্দিয়ের বলল, সে এর কোনওটাই নয়। সে চোর এবং খুনী।

সে এমনভাবে কথাগুলো বলল যাতে মনে হবে তার কথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

মেরিয়াস আশ্চর্য হয়ে বলল, সে কি! আবার কি অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে?

থেনার্দিয়ের বলল, হ্যাঁ আছে। ভলজাঁ ম্যাদলেনের টাকা নেয়নি, তবু সে চোর। সে জেভার্তকে হত্যা করেনি ঠিক, তবু সে খুনী।

মেরিয়াস বলল, তবে কি তুমি তার চল্লিশ বছর আগেকার এক অপরাধের কথা বলছ? খবরের কাগজের বিবরণ অনুসারে সে তো স্খালন হয়ে গেছে।

থেনার্দিয়ের বলল, আমি সত্য ঘটনার কথা বলছি মঁসিয়ে লে ব্যারন যে কথা আজও কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং সে কথা আজও কেউ জানতে পারেনি। এ টাকা তার নয়, পরের ধনসম্পদ নিয়েই সে আপনার পত্নীকে দান করেছে চাতুর্যের সঙ্গে। এইভাবে কৌশলে সে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে নেয়।

মেরিয়াস বলল, এখানে আমার একটা আপত্তি আছে। কিন্তু তুমি বলে যাও।

হ্যাঁ আমি আপনাকে সব বলব। এর পুরস্কার সম্বন্ধে আপনার উদারতা ও বদান্যতার উপর আমি নির্ভর করছি। এই গোপন তথ্যের দাম অনেক। আপনি হয়ত বলবেন আমি ভলজাঁর কাছে কেন যাইনি। যাইনি, কারণ তার কাছে গেলে আমার কোনও লাভ হবে না। তার কাছে আর টাকা নেই, সে সব টাকা আপনাদের দিয়ে দিয়েছে। লা বোঝার থাবার জন্য আমার এখন টাকা চাই এবং আপনিই এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি বলে আপনার কাছে আমি আবেদন করেছি। আমি কি বসতে পারি?

মেরিয়াস তাকে বসতে বলে নিজেও বসল।

থেনার্দিয়ের খবরের কাগজগুলো ভাঁজ করে খামের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে তার গোপন তথ্য বিবৃত করে যেতে লাগল। সে বলল, গত বছর ৬ই জুন তারিখে যেদিন শহরে নানা জায়গায় বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে সেদিন সন্ধ্যার সময় প্যারিসের সবচেয়ে বড় যে ঢাকা নর্দমাটা ইনভ্যালিদে আর দ্য লেনার মাঝখানে সেন নদীতে পড়েছে সেইখানে মাটির তলায় নর্দমার সুড়ঙ্গপথে একটা লোক লুকিয়ে ছিল।

মেরিয়াস তার চেয়ারটা থেনার্দিয়েরের আরও কাছে টেনে আনল। আগ্রহান্বিত শ্রোতার সামনে সফলকাম বক্তার মতো আশ্বস্ত হলো থেনার্দিয়ের। সে আবার বলতে লাগল, আমার কাছে সেই নর্দমার গেটের চাবি ছিল। আমি সেখানে এমন এক কারণে যাই যার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। তখন সন্ধ্যা আটটা হবে। আমার পদশব্দ শুনে লোকটা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু গেট দিয়ে আসা আলোয় আমি দেখতে পাই লোকটার কাঁধে একটা মৃতদেহ ছিল। নরহত্যা এবং চুরির স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কারণ কেউ কখনো বিনা কারণে কাউকে খুন করে না। খুনী লোকটা মৃতদেহটা নর্দমার জলা জায়গায় না রেখে সেই নদীতে ফেলে দেবার জন্য অনেক কষ্ট করে সুড়ঙ্গপথের জলকাদা ভেঙে কাঁধে করে সেটা বয়ে নিয়ে আসছিল। কারণ সে হয়ত ভেবেছিল নর্দমার মধ্যে মৃতদেহ দেখে পরদিন সকালে মেথররা কাজ করতে এসে হৈচৈ করবে। এটা সে চায়নি বলেই সে নদীতে মৃতদেহটা ফেলতে যাচ্ছিল।

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধু ভাবছিলাম লোকটা ঐ মৃতদেহ বহন করে এতটা দুর্গন্ধময় নর্দমার সুড়ঙ্গপথ পার হয়ে জীবন্ত অবস্থায় এল কি করে।

মেরিয়াস তার চেয়ারটা আরও কাছে সরিয়ে নিয়ে এল। থেনার্দিয়ের একবার হাঁপ ছেড়ে আবার বলতে লাগল, আমি খুনী লোকটার মুখোমুখি হতেই সে আমাকে গেটের চাবি খুলে দিতে বলল। আমার কাছে গেটের চাবি ছিল সে তা জানতে পারে। আমার থেকে সে অনেক বেশি বলবান। আমি তাই রাজী না হয়ে পারিনি। কিন্তু সে যখন মৃতদেহটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন আমি তার অলক্ষ্যে অগোচরে মৃত ব্যক্তির জামা থেকে একটা অংশ ছিঁড়ে নিই যাতে আমি পরে খুনের প্রমাণ হিসাবে তা উপস্থাপিত করতে পারি। আমি তাকে গেটটা খুলে দিতে সে মৃতদেহ নিয়ে বাইরে চলে গিয়ে নদীর ধারে সেটা নামিয়ে রাখে। এবার আপনি নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। সেই খুনী লোকটা হলো জাঁ ভলজাঁ এবং আমারই সঙ্গে তার সেখানে দেখা হয়।

থেনার্দিয়ের এবার তার কোটের পকেট থেকে মৃতদেহের জামা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া অংশটা মেরিয়াসের চোখের সামনে তুলে ধরল।

সেটা দেখেই চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল মেরিয়াস। ক্ষিপ্রগতিতে চাবি নিয়ে তার পোশাকের আলমারিটা খুলে ব্যারিকেড থেকে অচেতন অবস্থায় আসার সময় যে রক্তমাখা জামাটা তার গায়ে ছিল সে জামাটা বার করল। তারপর থেনার্দিয়েরের হাত থেকে সেই ছেঁড়া অংশ নিয়ে দেখল সেটা তারই. সেই জামার অংশ দুটোকে জোড়া লাগালে ঠিক খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

থেনার্দিয়ের বলল, আমার বিশ্বাস মঁসিয়ে লে ব্যারন, মৃত ব্যক্তি ছিল কোনও ধনী বিদেশী যার কাছে প্রচুর টাকা ছিল বলে ভলজাঁ তাকে খুন করে ফেলে কৌশলে। মৃতদেহটি ছিল বয়সে যুবক।

মেরিয়াস বলল, আমিই সেই ব্যক্তি। আর এটা আমার জামার অংশ।

সে সেটা ভাল করে দেখিয়ে দিল থেনার্দিয়েরকে।

থেনার্দিয়ের স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভাবল, আমি গেলাম এবার।

মেরিয়াস বসার পর আবার উঠে দাঁড়াল। তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। কিন্তু তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ছিল। উঠে গিয়ে থেনার্দিয়েরের মুখে একটা ঘুষি মেরে তার পকেট থেকে আরও দেড় হাজার ফ্রাঁর নোট নিয়ে থেনার্দিয়েরের হাতে গুঁজে দিল।

মেরিয়াস বলল, তুমি একটা মিথ্যাবাদী ঘৃণ্য লোক। তুমি তাকে দোষী সাজাতে এসে তাকে দোষমুক্ত করে দিলে। তুমি তাকে ধ্বংস করতে এসে নিজে ধ্বংস হয়ে গেলে। শোন থেনার্দিয়ের জনদ্রেত্তে, আমি নিজে সেই ব্যারাকবাড়িতে দেখেছি তুমি চোর এবং খুনী। তোমার সব কীর্তি আমি দেখেছি। আমি তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারতাম। তার যথেষ্ট প্রমাণ আমার কাছে আছে। তোমাকে জেলে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু ওয়াটারলুর ঘটনাই তোমাকে বাঁচিয়ে দিল। তুমি সেখানে এক কর্নেলের জীবন রক্ষা করেছিলে।

থেনার্দিয়ের বলল, কর্নেল নয় জেনারেল।

জেনারেলের জীবনের জন্য আমি একটা পয়সাও তোমায় দিতাম না। এখন আরও তিন হাজার ফ্রাঁ নিয়ে বিদায় হও। আর তোমার মুখদর্শন করতে চাই না আমি শয়তান কোথাকার। তোমার স্ত্রী তো মারা গেছে। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাবে বলছিলে, যাও এই টাকা নিয়ে। তুমি সেখানে গেছ জানতে পারলে সেখানকার ব্যাঙ্ক থেকে কুড়ি হাজার ফ্রাঁ টাকা যাতে তুলতে পার তার ব্যবস্থা করে দেব। সেখানে গিয়ে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলবে তুমি।

থেনার্দিয়ের নত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বলল, আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।

এই ঘটনার দু'দিন পরেই আমেরিকা চলে যায় থেনার্দিয়ের। সঙ্গে ছিল তার ছোট মেয়ে আজেলমা। ব্যাঙ্কের চিঠি নিয়ে গিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে সে কুড়ি হাজার ফ্রাঁ তোলে। কিন্তু তার স্বভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি। সে দাস ব্যবসা শুরু করে সেই টাকা দিয়ে।

থেনার্দিয়ের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাগানে ছুটে গেল মেরিয়াস। সেখানে মঁসিয়ে গিলেনর্মাদের সঙ্গে বেড়াচ্ছিল কসেত্তে।

মেরিয়াস চিৎকার করে ব্যস্ত হয়ে বলল, কসেত্তে, তাড়াতাড়ি করো, আমাদের এখনি বেরোতে হবে। বাস্ক, একটা গাড়ি ডাক। হা ভগবান, তিনিই সেই লোক যিনি আমায় উদ্ধার করেন। এক মিনিট সময়ও নষ্ট করা চলবে না। তুমি তোমার শালটা নিয়ে নাও।

কসেত্তে ভাবল মেরিয়াস হয়ত পাগল হয়ে গেছে। তবু ওর কথামতো কাজ করল।

মেরিয়াসের হৃদস্পন্দন প্রবল হয়ে উঠল। সে নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। সে তার বুকের উপর হাত রাখল। সে কসেত্তেকে জড়িয়ে ধরে বলল আমি কত বোকা।

তার মনে হলো ভলজাঁ যেন সহসা কয়েদী থেকে খৃস্টে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ভলজাঁ অবর্ণনীয়ভাবে মহান শান্ত এবং বিনয়ী। এত অভিভূত হয়ে পড়েছিল সে যে তার অনুভবের কথাগুলি বুঝিয়ে বলতে পারছিল না।

কসেত্তে বলল, কি সুখের কথা! আমি তোমাকে র‍্যু হোমির কথা ভয়ে বলতে পারিনি। আমরা তাহলে মঁসিয়ে জাঁকে দেখতে চলেছি।

তোমার বাবা কসেত্তে। তার থেকেও বড়। আমি এইরকমই একটা ভেবেছিলাম। কসেত্তে, আমি গাভ্রোশেকে দিয়ে তোমাকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তা তুমি পাওনি বলেছিলে। আমি জানি কি হয়েছিল। সে চিঠি তোমার বাবার হাতে পড়ে এবং তিনি আমাকে উদ্ধার করার জন্য, আমার জীবন রক্ষা করার জন্য ব্যারিকেডে গিয়েছিলেন। মানুষকে বাঁচানোই তাঁর কাজ। তিনি জেভার্তের প্রাণরক্ষা করেন এবং আমাকে সেই নরককুণ্ড থেকে মাটির তলায় নর্দমার মধ্যে গিয়ে বয়ে এনে তোমার হাতে তুলে দেন। ওঃ, আমি কত অকৃতজ্ঞ! তিনি নর্দমার জলকাদা ভেঙে কত কষ্ট করে নিরাপদে বাইরে নিয়ে আসেন আমায়। সেখানে দু'জনেই আমরা মরে

যেতে পারতাম। আমি অচেতন অবস্থায় ছিলাম বলে কি হচ্ছে কিছুই জানতে পারিনি। আমরা তাঁকে জোর করে এখানে নিয়ে আসব। কোনও কথা শুনব না। তাঁর যদি একবার দেখা পাই তো এখানে নিয়ে আসবই। সারাজীবন তাঁকে শ্রদ্ধা করে যাব। গাভ্রোশে তাহলে চিঠিটা তাঁর হাতে দিয়েছিল! এইবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল, বুঝলে?

কসেত্তে কিছুই বুঝতে পারল না।

গাড়িটা র‍্যু হোমির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

৫

জাঁ ভলজাঁ দরজায় করাঘাত শুনে মুখ ঘুরিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, ভিতরে এস।

দরজা খুলে কসেত্তে আর মেরিয়াস ঘরে ঢুকল।

ভলজাঁ বিছানার পাশের চেয়ারটায় খাড়া হয়ে বসে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, কসেত্তে!

তার সাদা ফ্যাকাশে মুখখানা সহসা অপরিসীম খুশির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। কসেত্তে তার দু'হাতের বন্ধনে ধরা দিল। বলল, বাবা!

মেরিয়াস তখন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল।

ভলজাঁ ভাঙা ভাঙা কথায় তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, তাহলে তুমি আমায় ক্ষমা করেছ?

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মেরিয়াসের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমিও আমায় ক্ষমা করেছ?

মেরিয়াস কথা বলতে পারল না। ভলজাঁ বলল, ধন্যবাদ।

কসেত্তে তার টুপি আর শালটা খুলে বিছানার উপর রেখে ভলজাঁর মাথার চুলগুলো সরিয়ে তার কপালে চুম্বন করল। ভলজাঁ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। কসেত্তে তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

ভলজাঁ আমতা আমতা করে বলতে লাগল, আমি কত বোকা! আমি ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। জান মঁসিয়ে পঁতমার্সি, তোমরা যখন ঘরে ঢুকলে তখন আমার মনে হলো, সব শেষ হয়ে গেল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কসেত্তের ছেলেবেলাকার পোশাকগুলো বিছানায় রেখে দেখছিলাম, কারণ ভেবেছিলাম আর তার দেখা পাব না এ জীবনে। আমার মনের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে আমি ঈশ্বরে সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল ভলজাঁ। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল তার। তারপর সে আবার বলতে লাগল, কসেত্তেকে দেখার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। ভালবাসার বস্তুকে দেখতে না পেয়ে অন্তর বাঁচতে পারে না। কিন্তু আমি যেতে পারিনি, কারণ আমি ভেবেছিলাম আমি সেখানে অবাঞ্ছিত। আমি নিজেকে এই বলে বুঝিয়েছিলাম যে তোমাকে তাদের প্রয়োজন নেই, জোর করে কখনো কারো উপর নিজেকে চাপিয়ে দিতে নেই। আজ আমি আবার কসেত্তেকে দেখছি। কিন্তু তোর পোশাকটা তো তেমন ভাল নয়। তোর

স্বামী কি এটা পছন্দ করে কিনেছে? মঁসিয়ে পঁতমার্সি, আমি যদি তুই বলে ডাকি কিছু মনে করো না। বেশিক্ষণ আর এভাবে ডাকতে পারব না।

কসেত্তে বলল, তুমি কি নিষ্ঠুর বাবা! কোথায় ছিলে এতদিন? এতদিন তো কোথাও থাক না। আগে তিন-চারদিনের বেশি বাইরে কোথাও থাকতে না। আমি নিকোলেত্তেকে প্রায়ই তোমার খোঁজে পাঠাতাম: সে বলত, তুমি বাইরে কোথায় গেছ, বাসায় নেই। তুমি ফিরে এসে আমাদের জানাওনি কেন? তোমার চেহারার কত পরিবর্তন হয়েছে। তুমি অসুস্থ, সেকথাও আমাদের জানাওনি। মেরিয়াস হাতটা দেখ, কত ঠাণ্ডা!

জাঁ ভলজাঁ বলল, মঁসিয়ে পঁতমার্সি, তুমি কি সত্যি সত্যিই আমায় ক্ষমা করেছ?

এ কথার পুনরাবৃত্তিতে মেরিযাস একেবারে ভেঙে পড়ল। সে বলল, কসেত্তে, শুনছ উনি কি বলছেন? উনি আমাকে ওঁকে ক্ষমা করতে বললেন। তিনি আমার জীবন বাঁচান, তার থেকেও বড় কথা, তিনি তোমাকে আমার হাতে তুলে দেন এবং আমাদের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে আত্মনিগ্রহ ও আত্মত্যাগের দিকে নিজেকে ঠেলে দেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে বাঁচিযে উনি আমাকে ক্ষমা করতে বলছেন। কি নির্দয, নিষ্ঠুর এবং অকৃতজ্ঞ আমি। তাঁর সাহস, সাধুতা, নিঃস্বার্থপরতার সীমা-পরিসীমা নেই। তার কোনও দাম দেওযা যায না।

ভলজাঁ মৃদু অনুযোগের সুরে বলল, ওসব কথা বলার কোনও প্রযোজন নেই।

কণ্ঠে কপট তিরস্কারের সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশিয়ে মেরিয়াস বলল, কেন আপনি নিজে একথা বলেননি? এটা আপনার কিছুটা দোষ। আপনি একজনের জীবন বাঁচিয়ে তাকে সেকথা বলবেন না? উল্টে আপনি যে স্বীকারোক্তি করলেন তাতে নিজের গুণের কথা না বলে শুধু দোষের কথাটা বললেন।

ভলজাঁ বলল, সত্য কথাই আমি বলেছি।

না সত্য মানে সমগ্র, কোনও অংশ নয়। আপনি বলেননি মঁসিয়ে ম্যাদলেন এবং জাঁ ভলজাঁ একই ব্যক্তি এবং জেভার্তকে ছেড়ে দিয়েছেন সেকথাও বলেননি। আপনি বলেননি আমার জীবনের জন্য আপনার কাছে আমি ঋণী।

আমি ভেবেছিলাম তুমি এটা জানতে। ভেবেছিলাম তুমি যা করছ ঠিকই করছ। তাই নিজেকে দূরে সরিয়ে আনি আমি। তোমার প্রাণ বাঁচাবার কথাটা বললে তুমি আমাকে তোমাদের বাড়িতে রেখে দিতে। তাহলে হয়ত সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে যেত।

মেরিয়াস বলল, কিসের ওলোটপালোট হয়ে যাবে? আপনি কি ভাবছেন আমরা কি আপনাকে এখানে রেখে যাব? আমরা আপনাকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব। একবার যখন ঘটনাক্রমে সবকিছু জানতে পেরেছি তখন আর আপনাকে ফেলে রেখে যাব? আপনি আমাদেরই একজন। আপনি কসেত্তের এবং আমার দু'জনেরই পিতা। এই ভয়ঙ্কর নির্জন ঘরে আর একটা দিনও থাকতে দেব না।

জাঁ ভলজাঁ বলল, কাল অবশ্য আমি থাকছিই না।

মেরিয়াস বলল, তার মানে? আমরা আর আপনাকে বাইরে যেতে দিচ্ছি না। আমাদের ছেড়ে আর কোথাও যেতে দিচ্ছি না।

কসেত্তে বলল, নিচেতে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দরকার হলে জোর করে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।

এই বলে হাসতে হাসতে ভলজাঁর হাত দুটো ধরল কসেত্তে, তোমার ঘরটা এখনো আমরা খালি রেখে দিয়েছি। বাগানটা এখন কত সুন্দর হয়েছে। বাগানের ভিতরের পথগুলো সমুদ্রের বালি দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে। সে বালির মধ্যে ছোট ছোট কত নীল ঝিনুক আছে। আমি জামগাছে নিজে জল দিই। তুমি আমার জামগুলো খেতে পার। আর 'মাদাম', 'আপনি' এসব চলবে না। আমরা এদিক দিয়ে প্রজাতন্ত্রী। মেরিয়াস আর আমি দু'জনে দু'জনকে তুই বলে ডাকি। কিন্তু বাবা, একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে। একটা বুলবুল আমার ঘরের বাইরের দিকের দেওয়ালে বাসা বেঁধেছিল। সে প্রায়ই আমার জানালা দিযে উঁকি মারত। একদিন একটা বিডাল তার বাসায় গিযে খেয়ে ফেলে তাকে। আমি বিড়ালটাকে মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু এখন আমরা সবাই সুখী, এখন আর মারব না। দাদু তোমাকে নিযে গেলে খুব খুশি হবেন। বাগানের একটা দিক ছেডে দেওযা হবে তোমাকে। তুমি তোমার খুশি মতো গাছ বসাতে পার সেখানে। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। তবে তোমাকেও অনেক সময় আমার কথা শুনতে হবে।

ভলজাঁ কসেত্তের কথাগুলো সব মন দিয়ে শুনে গেল। তার কণ্ঠস্বর মধুর গানের মতো শোনাচ্ছিল তার কানে। আত্মার মুক্তো হয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু তার চোখে এসে টলটল করতে লাগল। সে শান্ত মৃদু কণ্ঠে বলল, এর থেকে বোঝা যায় ঈশ্বর কত দয়ালু।

কসেত্তে বলল, লক্ষ্মী বাবা আমার!

জাঁ ভলজাঁ বলল, সত্যি। একসঙ্গে একবাড়িতে থাকাটা সত্যিই কত সুখের। বাগানের গাছগুলো ফুল আর পাখিতে ভরে আছে। সে বাগানে আমি কসেত্তের সঙ্গে বেড়াব। আমরা বাগানের মধ্যে আপন আপন জায়গায় চাষ করব, গাছ লাগাব। কসেত্তের গাছ থেকে আমি জাম খাব আর কসেত্তে আমার গাছ থেকে গোলাপ তুলে নেবে। সত্যিই কত আনন্দের কথা। শুধু—

তার চোখ দুটো জলে কানায় কানায় ভরে উঠলেও সে জল গড়িয়ে পড়ল না। তার উপর সকরুণ এক হাসি ফুটিয়ে তুলল সে। কসেত্তে তার হাত দুটো টেনে নিল তার হাতের মধ্যে।

কসেত্তে বলল, তোমার হাত দুটো কি ঠাণ্ডা! তুমি অসুস্থ? এখনো কি যন্ত্রণা হচ্ছে?

ভলজাঁ বলল, না, আমার আর কোনও যন্ত্রণা নেই। শুধু—

বলতে বলতে থেমে গেল।

শুধু কি?

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি মারা যাব।

কসেত্তে ও মেরিয়াস দু'জনেই চমকে উঠল। ভয়ে অন্তর দুটো কেঁপে উঠল।

মেরিয়াস বলল, মারা যাবেন?

জাঁ ভলজাঁ বলল, হ্যাঁ, সেটা এমন কিছু না। কসেত্তে তুমি কথা বলে যাও। তোমার কণ্ঠস্বর আমি প্রাণভরে শুনে যাই।

মেরিয়াস স্তম্ভিতের মতো ভলজাঁর পানে তাকিয়ে রইল আর কসেত্তে এক মর্মভেদী কান্নায় ভেঙে পড়ল। কাতর কণ্ঠে বারবার বলতে লাগল, না বাবা, তোমাকে মরতে দেব না। তোমাকে বাঁচতে হবে। আমি চাই তুমি বাঁচবে। বুঝলে?

ভলজাঁ কসেত্তের মুখপানে তাকিয়ে বলল, আমি তো মরেই যাচ্ছিলাম। মৃত্যু এসে গিয়েছিল। তোমরা হঠাৎ এসে পড়ায় মৃত্যু বাধা পেল কিছুটা। কিছুক্ষণের জন্য আমি যেন নবজন্ম লাভ করেছিলাম।

মেরিয়াস বলল, এখনো আপনার দেহে শক্তি আছে, প্রাণশক্তি আছে। আপনি এতদিন অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন। আজ আপনার সব দুঃখকষ্টের অবসান হয়েছে। এখন আমি নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইছি। আপনাকে বাঁচতে হবে এবং আমাদের কাছেই থাকতে হবে। অনেক অনেকদিন ধরে বাঁচতে হবে। আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। এবার থেকে আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখাই হবে আমাদের একমাত্র কাজ এবং চিন্তা।

কসেত্তে চোখে জল নিয়ে বলল, দেখছ বাবা, মেরিয়াস বলছে তোমায় মরতে দেবে না।

ভলজাঁ হাসিমুখে বলতে লাগল, আমাকে যদি তোমরা নিয়ে যাও পঁতমার্সি তাহলে আমি কি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে উঠব? না, ঈশ্বর কিন্তু তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন করেননি। আমার চলে যাওয়াই ভাল। মৃত্যুই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। ঈশ্বর জানেন আমাদের কাকে কিসে মরতে হবে। তিনি ঠিকই ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা সুখী হও। রৌদ্রস্নাত প্রভাতী প্রান্তরের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক তোমাদের জীবন। তোমাদের চারদিকে ফুল আর পাখিরা তোমাদের ঘিরে থাক। এক অনাবিল অফুরন্ত আনন্দের স্রোত বয়ে যাক তোমাদের জীবনে। আমার জীবন ফুরিয়ে এসেছে। আমি আর কোনও কাজে লাগব না। আমার পক্ষে মৃত্যুই ভাল। আমাদের সব কিছু বোঝা উচিত। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার মৃত্যুকাল এসে গেছে। কিছুক্ষণ আগে একবার মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। গতরাতে জগের সব জলটা খেয়ে ফেলেছি। তোমার স্বামী কত ভাল কসেত্তে। এখন তার কাছেই সুখে-শান্তিতে থাকবে।

দরজায় আবার করাঘাত হলো। ডাক্তার ঘরে ঢুকল।

ভলজাঁ বলল, একই সঙ্গে অভ্যর্থনা এবং শেষ বিদায় জানাচ্ছি ডাক্তার। এরা আমার দুটি সন্তান।

মেরিয়াস ডাক্তারের কাছে গিয়ে প্রশ্নের সুরে বলল, মঁসিয়ে—

ডাক্তার তার উত্তরে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মেরিয়াসের দিকে।

ভলজাঁ বলল, সব সময় সব ঘটনা আমাদের মনঃপূত হয় না। তার জন্য ঈশ্বরকে দোষ দেওয়া উচিত নয়।

কিছুক্ষণ এক অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ঘরে। ভলজাঁ কসেত্তের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন তার ছবিটা অনন্তের পথে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। আসন্ন মৃত্যুর যে ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে সে ডুবে যেতে বসেছে সেই ছায়ার মধ্যেও কসেত্তেকে দেখতে পেযে আনন্দের এক উজ্জ্বল আবেগের ঢেউ খেলে যেতে লাগল। কসেত্তের সুন্দর মুখের জ্যোতিটা তার ছায়াচ্ছন্ন মুখের উপর ফুটে উঠল। মৃত্যুর মধ্যেও আনন্দ পেতে লাগল সে।

ডাক্তার ভলজাঁর নাড়ী দেখতে লাগল। সে মেরিয়াসকে বলল, আপনাদের দেখতে চাইছিলেন উনি। আপনাদের অভাবটাই খুব বেশি করে বোধ করছিলেন উনি। আপনারা এলেন, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে বড় দেরি হয়ে গেল।

কসেত্তের উপর থেকে দৃষ্টি না ফিরিযেই ভলজাঁ বলতে লাগল, মরাটা এমন কিছু কষ্টের নয়, কিন্তু জীবন ছেড়ে চলে যাওয়া সত্যিই বড কষ্টের।

হঠাৎ জোর করে উঠে দাঁডাল ভলজাঁ। মৃত্যুর সময় এমনি করে হঠাৎ এক শক্তির উচ্ছ্বাস দেখা যায। ডাক্তার ও মেরিয়াসের বাধা ঠেলে সে দেওয়ালের কাছে গিযে দেওয়াল থেকে তামার সেই ক্রসটা এনে তার চেয়ারের সামনে টেবিলটার উপর রাখল। রেখে বলল, যীশু হচ্ছেন সবচেয়ে বড শহীদ।

তার মাথাটা ক্রসের উপর ঢলে পড়ল। হাতের আঙুলগুলো তার পায়জামার উপর আঁচড় কাটতে লাগল।

কসেত্তে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভলজাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বলল, বাবা, তোমাকে কি হারাবার জন্য খুঁজে পেলাম?

মড়ার মতো হয়ে গিয়েও কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে বসল ভলজাঁ। মরতে মরতে মানুষ এমনি করে জীবনের দিকে যেন পিছন ফিরে চায়। জীবনমৃত্যুর খেলা চলে। কসেত্তের জামার আস্তিনটা চুম্বন করল ভলজাঁ।

মেরিয়াস বলল, ডাক্তারবাবু, ওঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে।

ভলজাঁ আবার বলতে লাগল, আমার দুঃখের কথাটা এবার বলব তোমাদের। সবচেয়ে আমার দুঃখ লেগেছে কখন জান? যখন তোমরা আমার দেওয়া টাকাটা ব্যবহার করনি। এটা সত্যিই তোমার স্ত্রীর টাকা মেরিয়াস। তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে। আমি এবার সব বুঝিয়ে বলতে পারব তোমাদের। ব্রেসলেটে বসাবার জন্য আমি এক ধরনের কাঁচ আবিষ্কার করি। কাঁচটা যেমন সুন্দর তেমনি সস্তা। এই কাঁচের কারখানা এবং কারবার করে প্রচুর টাকা লাভ করি আমি। সুতরাং কসেত্তেকে যা দিয়েছি তা তার নিজস্ব সম্পদ। তার মধ্যে কোনও জাল-জুয়োচুরি নেই। তোমাদের মনে যাতে সংশয় না থাকে তার জন্যই একথা বললাম।

বাড়ির দারোয়ানের স্ত্রী এসে মুমূর্ষু ভলজাঁকে বলল, কোনও যাজক দরকার আপনার?

জাঁ ভলজাঁ বলল, আমার যাজক আছে।

এই বলে সে উপর দিকে তাকাল। মনে হলো ঘরের মধ্যে এমন একজন আছে যার অদৃশ্য উপস্থিতি কারো চোখে না পড়লেও সে তাকে দেখতে পাচ্ছে। তার মনে হচ্ছিল বিশপ মিরিয়েল তার মৃত্যুর সময় তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভলজাঁর পিঠের নিচে একটা বালিশ এনে দিল কসেত্তে।

ভলজাঁ বলতে লাগল, আমার টাকাটা তোমরা ব্যবহার না করলে আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যেত মেরিযাস। আমি মরেও সুখী হতাম না।

কসেত্তে ও মেরিযাস কোনও কথা না বলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মুমূর্ষু ভলজাঁর মুখপানে।

ভলজাঁ যেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এক অন্ধকার দিগন্তের পানে এগিয়ে চলেছে। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝে একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে। তার হাত পাগুলো শক্ত হযে উঠেছিল। কিন্তু তার দেহের শক্তিটা স্তিমিত হযে আসার সঙ্গে সঙ্গে যতই সে দুর্বল হযে পড়ছিল ততই তার আত্মার মধ্যে একটা শক্তি খুঁজে পাচ্ছিল সে। জীবনাতীত এক রাজ্যের স্বর্গীয জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তার মুখখানা।

তার চোখ দুটো ম্লান হযে গেলেও তার দৃষ্টিশক্তি যেন গভীর হযে উঠছিল আরও। মনে হচ্ছিল ভলজাঁ যেন মরছে না, দেবদূতের মতো পাখা মেলে কোথায় উড়ে চলেছে।

কসেত্তে এবং মেরিযাস দু'জনকেই ইশারায় কাছে ডাকল ভলজাঁ। বলল, তোমরা দু'জনেই আমার খুব কাছে এস। আমি তোমাদের দু'জনকেই গভীরভাবে ভালবাসি। এভাবে মরতে পারাটা কত সুখের। কসেত্তে, তুই আমার জন্য অল্প একটু কাঁদবি, বেশি কাঁদবি না। আনন্দ করবি, জীবনকে উপভোগ করবি। পঁতমার্সি, তুমি কোনও কুণ্ঠা করবে না। এটা আমার সৎভাবে উপার্জিত টাকা। সরল মনে ওটা ভোগ করতে পারি। তোমরা এতে ধনী হয়ে উঠবে। একটা গাড়ি কিনবে। কসেত্তেকে ভাল পোশাক-আশাক কিনে দেবে। থিয়েটারে একটা বক্স রেখে দেবে। মাঝে মাঝে বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে খাওয়াবে। তোমরা সব দিক দিয়ে সুখী হও। ঐ দুটো রুপোর বাতিদান আমি কসেত্তেকে দিয়ে গেলাম। ও দুটো যিনি আমাকে দিয়ে গেছেন, জানি না আজ তিনি স্বর্গ থেকে আমাকে দেখে খুশি হচ্ছেন কিনা। আমার ড্রয়ারে পাঁচশো ফ্রাঁর নোট আছে। আমি তার থেকে খরচ করিনি কিছুই। ওটা গরীবদুঃখীদের দিয়ে দেবে। মনে রাখবে আমি গরীব। আমাকে একটা খালি জায়গা দেখে কবর দেবে। কবরের উপর শুধু একটা পাথর থাকবে। কিছু লিখতে হবে না। কসেত্তে ও তুমি যদি মাঝে মাঝে আমার সে কবরে যাও তো আমি খুশি হব। মেরিয়াস, আমি সব সময় তোমার উপর খুশি হতে পারিনি। তুমি তার জন্য ক্ষমা করো আমায়। এখন আর সে প্রশ্ন ওঠে না। কারণ এখন তুমি আর কসেত্তে এক। এখন তোমাদের একজনকে ভালবাসা মানেই দু'জনকে ভালবাসা! মনে আছে কসেত্তে, দশ বছর আগে কত সুখে ছিলাম আমরা! কেঁদো না কসেত্তে! মরে গেলেও দূরে থাকব

না। আমি সব কিছু লক্ষ্য করব তোমাদের। অন্ধকার রাত্রিতে তাকালেই আমার হাসিমুখ দেখতে পাবে। মঁতফারমেলের কথা মনে আছে কসেত্তে? তুমি সে রাত্রিতে একা চলতে কত ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। সেদিন প্রথম আমি তোমার হাত ধরি। সেদিন তোমার হাত দুটো লাল ছিল, আজ তা সাদা হয়েছে। তোমার সেই পুতুলটার কথা মনে আছে, পুতুলটাব নাম দিয়েছিলে ক্যাথারিন। কনভেন্টে থাকার সময় সেটা নিয়ে যেতে চাইলে আমি হেসেছিলাম। তোমার চোখের আলো, মুখের হাসি এখন সব মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি চিরদিন আমারই থাকবে, এইখানেই ভুল করেছিলাম আমি। থেনার্দিয়েররা খুব দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। কিন্তু তাদের ক্ষমা করা উচিত। কসেত্তে, এখন তোমার মার নামটা বলা উচিত। তার নাম হলো ফাঁতিনে। এ নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নত করবে। সে জীবনে অনেক কষ্ট পায়। সে তোমাকে খুব ভালবাসত। তুমি যে পরিমাণে সুখী হয়েছ সে ছিল সেই পবিমাণে দুঃখী। ঈশ্বর এইভাবে সব কিছুর বিধান করে থাকেন। তিনি সব সময় স্বর্গ থেকে আমাদের উপর লক্ষ্য রাখেন। সব কিছু দেখেন। আমি এখন তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। পরস্পরকে ভালবাসবে তোমরা। ভালবাসার মতো মূল্যবান বস্তু জগতে আর কিছু নেই। কসেত্তে মা আমার, আমি তোকে শেষ ক'দিন দেখতে যেতে পারিনি। সেটা আমার দোষ নয় কিন্তু। আমি তোদের বাড়ির কাছে গিয়ে ফিরে এসেছি। আমি প্রায় দিনই যেতাম সেখানে। একদিন টুপি না পরেই গিয়েছিলাম। একদিন বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় দিইনি। লোকে আমায় পাগল বলত। আমি মরে গেলে মাঝে মাঝে আমার কথা শুধু ভাববি।

এখন আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না। আমি একটা আলো দেখতে পাচ্ছি। আমি এবার পরম সুখে মরতে পারব। তোমাদের মাথা দুটো একটু নত করো যাতে আমি হাত রাখতে পারি তার উপর।

তাদের চোখের জল মুছে ভলজাঁর দু'পাশে নতজানু হয়ে বসল কসেত্তে ও মেরিয়াস। ভলজাঁ তার হাত দুটো তাদের মাথার উপর রাখল। কিন্তু হাত দুটো আর নড়ল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। রুপোর বাতিদানে জ্বলতে থাকা দুটো মোমবাতির আলো ছড়িয়ে পড়ল তার মুখের উপর।

৬

পীয়ের ল্যাসের প্রশস্ত সমাধিভূমিতে সাধারণ গরীবদুঃখীদের এবং অভিজাত ধনীদের কবরখানার মাঝখানে একটু খালি জায়গা আছে। জায়গাটা কবরখানার পাঁচিলের কাছাকাছি। সে জায়গায় একটা ইউগাছের তলায় চারদিকে ফুল দিয়ে ঘেরা একটা পাথর আছে। পাথরটা কালো এবং সবুজ। সেই পাথরটার কাছে কেউ যেতে চায় না, কারণ সেখানে যাবার পথটা লম্বা লম্বা ঘাসে ভরে গেছে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সেই লম্বা লম্বা ঘাসগুলোর কাছে টিকটিকি-গিরগিটিরা এসে খেলা করে। ঘাসগুলো সজীব হয়ে নড়তে থাকে এবং গাছে গাছে পাখিরা গান করে।

কোনও সাজসজ্জা বা কারুকার্য নেই পাথরটাতে। এ খর যে মৃতের সমাধিস্তম্ভ তারই ইচ্ছামতো নির্মিত হয়েছে এভাবে। লম্বায় ও চওড়, একটা শায়িত মানুষের আচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট।

এ পাথরের উপর কোনও নাম নেই।

কিন্তু কয়েক বছর আগে কে একজন এই পাথরের উপ চারটে লাইন খড়ি দিয়ে লিখে দিয়ে যায়। বাতাস ও জলের ঝাপটায় ক্রমে তা মু যায়। লাইন চারটে হলো :

সে এখন ঘুমিয়ে আছে, জীবনে কিছুই পায়নি সে; শুধু এজনকে ভালবেসে জীবনকে আঁকড়ে ধরেছিল সে; সেই ভালবাসার জন্য তার কাছ েকে চলে যেতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। কিন্তু সে মৃত্যুর রূপ ছিল বড় মনোরম। রাত্রির পর যেমন দিন আসে তেমনি প্রশান্ত এবং নিঃশব্দ ছিল সে মৃত্যুর গতি।

—: সমাপ্ত :—